"বই মনের খাদ্য।
বেশি বেশি বই পড়ুন,
মনকে সুস্থ রাখুন।।"

মোঃ কবিরুল ইসলাম
(DMC K-69)

www.facebook.com/kabiruldmc
kabirul.dmc@gmail.com

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত সচিত্র মাসিকপত্র

সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

প্রথম ষাণ্মাসিক সূচীপত্র
১৯৭০

ত্রয়োবিংশ বর্ষ ঃ জানুয়ারী—জুন

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

পি-২৩, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
পরিষদ ভবন
ফোন ঃ ৫৫-০৬৬০

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

বর্ণানুক্রমিক ষাণ্মাসিক বিষয়সূচী

জানুয়ারী হইতে জুন—১৯৭০

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

ষাণ্মাসিক লেখক সূচী

জানুয়ারী হইতে জুন, ১৯৭০

চিত্র-সূচী

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস কর্তৃক পি-২৩, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬ হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ ৩৭।৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত সচিত্র মাসিকপত্র

সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

দ্বিতীয় ষাণ্মাসিক সূচীপত্র

1970

ত্রয়োবিংশ বর্ষ : জুলাই—ডিসেম্বর

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-6

'পরিষদ ভবন'

ফোন : 55-0660

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

বর্ণানুক্রমিক ষাণ্মাসিক বিষয়সূচী

জুলাই হইতে ডিসেম্বর—১৯৭০

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

ষাণ্মাসিক লেখকসূচী

জুলাই হইতে ডিসেম্বর—1970

চিত্রসূচী

বিবিধ

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

ত্রয়োবিংশ বর্ষ জানুয়ারী, ১৯৭০ প্রথম সংখ্যা

নববর্ষের নিবেদন

'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার বর্তমান সংখ্যায় ইহার ত্রয়োবিংশতিতম বর্ষের সূচনা হইতেছে। এই উপলক্ষে পত্রিকার পাঠক ও পৃষ্ঠপোষকগণকে তাঁহাদের শুভেচ্ছা ও সহযোগিতার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি।

বিজ্ঞান-কর্মীদের নিরলস সাধনায় বিজ্ঞানের যে কিরূপ বিস্ময়কর অগ্রগতি হইয়াছে, সাম্প্রতিক কালের সফল চন্দ্রাভিযান হইতে তাহা বুঝিতে পারা যায়। পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জীববিদ্যা প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে আজ নব নব দিগন্ত উন্মোচিত হইতেছে এবং বিজ্ঞানের সার্থক প্রয়োগে মানুষের জীবন ক্রমশঃই সম্ভাবনাপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে। তবে আমাদিগকে এই কথা অবশ্য মনে রাখিতে হইবে যে, বিজ্ঞান-চর্চা ও বিজ্ঞানের প্রয়োগে আমাদের দেশ এখনও বহুলাংশে অনগ্রসর। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আমাদের দেশকে যদি দ্রুত অগ্রসর হইতে হয়, তাহা হইলে ইহার আধুনিক ভাবধারা ও তথ্যাদি ব্যাপকভাবে জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করিতে হইবে।

গত বাইশ বৎসর যাবৎ 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকা তাহার সীমিত ক্ষমতার মধ্যে বিজ্ঞান-শিক্ষা ও বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। ইহা অনস্বীকার্য যে, পত্রিকাটিকে আরও ব্যাপক ও আরও বাস্তবোপযোগী করিবার প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, আর্থিক কারণে ইহার অস্তিত্বই বর্তমানে সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিয়াছে। ইহার প্রকাশনার ব্যয় সর্ব দিক দিয়া বৃদ্ধি পাইয়াছে অথচ বহু চেষ্টা সত্ত্বেও ইহার আয় তদনুরূপ বৃদ্ধি পায় নাই। এমতাবস্থায় এই পত্রিকার উৎকর্ষ রক্ষা করিবার জন্য বর্তমান সংখ্যা হইতে ইহার মূল্য বৃদ্ধি করিতে আমরা বাধ্য হইতেছি। আমরা বিশেষভাবে কামনা করি যে, বাংলা দেশের মানুষের নিকট তাঁহাদের মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞানের প্রচারে এই পত্রিকার যে ভূমিকা রহিয়াছে, তাহা স্মরণ করিয়া বাংলা দেশের জনসাধারণ তাঁহাদের অকুণ্ঠ সহযোগিতার দ্বারা ইহাকে সকল সংকট হইতে মুক্ত করিবেন ও তাঁহাদের প্রসন্ন দাক্ষিণ্যে ইহার ভবিষ্যৎ ক্রমশঃ উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর করিয়া তুলিবেন।

সূর্য

মহুয়া বিশ্বাস

আলো, বাতাস ও জল—জীবনধারণের জন্যে এই তিনটি বস্তু একান্তই অপরিহার্য। এদের মধ্যে আলোর উৎস হচ্ছে সূর্য—এই বিশাল সৌরমণ্ডলের পিতৃস্বরূপ। সূর্যের অস্তিত্ব ছাড়া জীবনধারণ অসম্ভব। সূর্যের সমগ্র তাপের এক অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ এই পৃথিবীতে এসে পৌঁছয়—এর থেকেই আমরা সূর্যের তাপের প্রচণ্ডতা উপলব্ধি করতে পারি।

বর্ণমণ্ডল
ছটামণ্ডল
রিভার্সিং লেয়ার
বা আলোক মণ্ডল

১নং চিত্র
সূর্যের বিভিন্ন স্তর

সূর্য আমাদের পৃথিবীর তুলনায় প্রায় ৩৩২০০০ গুণ ভারী। এই কারণেই সূর্যের মাধ্যাকর্ষণের টানও অনেক বেশী এবং এরই সাহায্যে সূর্য সব গ্রহকে এক অদৃশ্য বাঁধনে বেঁধে রেখেছে।

পৃথিবী থেকে সাধারণভাবে সূর্যের পূর্ণরূপ আমরা দেখতে পাই না, সূর্যের যে উজ্জ্বল গোলাকার অংশ আমরা দেখতে পাই সেটা হচ্ছে সূর্যের আলোকমণ্ডল বা ফটোস্ফিয়ার (১নং চিত্র)। এই অঞ্চলের তাপমাত্রা মোটামুটিভাবে ছয় হাজার ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড। জলের ঘনত্ব এক গ্রাম প্রতি ঘনসেন্টিমিটারে ধরলে, জলের তুলনায় আলোকমণ্ডলের গ্যাসের ঘনত্ব মোটামুটিভাবে $১০^{-৯}$ গ্রাম প্রতি ঘনসেন্টিমিটারে হবে বলে অনুমান করা হয়। কিন্তু এখানে একটা প্রশ্ন থেকে যায়, সাধারণতঃ এত কম ঘনত্ববিশিষ্ট গ্যাস স্বচ্ছ অবস্থায় থাকে, কিন্তু আলোকমণ্ডলে তা হয় না কেন? বৈজ্ঞানিকেরা গণনার সাহায্যে দেখিয়েছেন, আলোকমণ্ডলে প্রতি ঘনসেন্টিমিটারে গড়ে পরমাণুর সংখ্যা এত বেশী যে, এখানে গ্যাস স্বচ্ছ অবস্থায় থাকতে পারে না। আলোকমণ্ডল ও এর পরবর্তী নিম্নস্তরের মধ্যে তাপমাত্রার পার্থক্য যথেষ্ট বেশী, যার জন্যে এই দুটি স্তরের মধ্যে তাপের পরিচলন অবশ্যম্ভাবী। এই পরিচলন প্রক্রিয়া প্রকৃতপক্ষে ঘটে কিনা জানবার জন্যে আমাদের অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে আলোকমণ্ডল পর্যবেক্ষণ করা দরকার। দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে এরূপ পর্যবেক্ষণের ফলে সূর্যপৃষ্ঠের বহু উজ্জ্বল কণার মাঝে জায়গায় জায়গায় কালো অংশ দেখতে পাওয়া যায়। আলোকমণ্ডলের এই

কণাময় অবস্থাকে বলা হয় কণাময়তা (Granulation)। এই সব কণাগুলির স্থায়িত্ব কয়েক মিনিট মাত্র। এই কণাময়তা সূর্যের অক্ষাংশ (পর্যবেক্ষণের সুবিধার জন্যে সূর্যকেও অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমায় ভাগ করা হয়) ও সূর্যপৃষ্ঠের উপর সংঘটিত ঘটনাবলীর উপর নির্ভর করে না—এটা সূর্যের বায়ুমণ্ডলে একটা স্থিতিশীল ঘটনা এবং এটাকে তাপমাত্রার পার্থক্যের জন্যে উৎপন্ন একটা সদাসক্রিয় পরিচলন-ক্রিয়ার ফল হিসাবে ব্যাখ্যা করা হয়।

প্রাচীনকালে বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল যে, সূর্য একটা নিখুঁত জ্যোতিষ্ক, কিন্তু গ্যালিলিও প্রথম সূর্যের গায়ে বিক্ষিপ্ত কতকগুলি কালো দাগের অস্তিত্ব আবিষ্কার করেন। কয়েক জন বিজ্ঞানীর মতে এগুলি সূর্যের বুকে গড়ে-ওঠা প্রকাণ্ড গ্যাস আবর্ত এবং এগুলির তাপমাত্রা সূর্যপৃষ্ঠের তাপমাত্রার তুলনায় কম বলে এগুলিকে তুলনামূলকভাবে কালো দেখায়। এই অংশের তাপমাত্রা হ্রাসের কারণ হিসাবে বিজ্ঞানীরা বলেন যে, এখানে গ্যাসসমূহ প্রসারিত হবার দরুণ শীতল হয়ে যায়। কিন্তু, এই ধারণা ঠিক নয়। এর শীতলতা ও উজ্জ্বলতা হ্রাসের কারণ সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না। এরা সৌরকলঙ্ক নামে পরিচিত। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, সৌরকলঙ্কগুলি চৌম্বক ক্ষেত্র-সম্পন্ন। এই চৌম্বক ক্ষেত্রের সাহায্যে এর ব্যাখ্যা দেওয়া যায়। এই সৌরকলঙ্কগুলির স্থায়িত্বকাল কয়েক ঘণ্টা থেকে কয়েক মাস পর্যন্ত। দীর্ঘায়ু কলঙ্কগুলি সূর্যের এক প্রান্তে অদৃশ্য হয়ে পক্ষকাল পরে অপর প্রান্তে দেখা যায়। এরা প্রথমে সূর্যপৃষ্ঠের পূর্বদিকে দেখা দেয় ও আস্তে আস্তে পশ্চিম প্রান্তে মিলিয়ে যায়। এই ঘটনা পর্যবেক্ষণ করেই গ্যালিলিও প্রথম সূর্যের আবর্তনকাল ২৬ দিন হিসাবে স্থির করেন। দীর্ঘস্থায়ী সৌরকলঙ্কগুলি অধ্যয়ন করে বিজ্ঞানীরা সূর্য বিষয়ে প্রচুর তথ্য সংগ্রহে সমর্থ হয়েছেন। এই সৌরকলঙ্কগুলির আকৃতি স্থায়ী নয়। এদের বাড়বার বা কমবার পর্যায়কাল ১১ বছর। এই কলঙ্কগুলির ব্যাস মোটামুটি হিসাবে প্রায় হাজার থেকে দুই লক্ষ মাইল পর্যন্ত হয়ে থাকে। সৌর-কলঙ্কের চৌম্বক ক্ষেত্রের শক্তি আনুমানিক হিসাবে এক-শ' থেকে প্রায় সাড়ে চার হাজার গস্ পর্যন্ত এবং এই শক্তি সৌরকলঙ্কের ক্ষেত্রফলের সমানুপাতিক। সূর্যের বিপরীত গোলার্ধের কলঙ্কগুলিতে চুম্বকের মেরু বিপরীতধর্মী। জানা গেছে যে, চৌম্বকক্ষেত্র সম্পন্ন কলঙ্কগুলিতে উদ্ভূত চৌম্বক চাপ সৌরকলঙ্কের গ্যাসসমূহকে প্রসারিত করে এবং এদের তাপমাত্রা হ্রাস করিয়ে অবস্থা নিয়ন্ত্রণ করে। সৌরকলঙ্কে এই চৌম্বক ক্ষেত্রের উৎপত্তির রহস্য এখনও অজানা। এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, পৃথিবীর আবহাওয়ার উপর সৌরকলঙ্কের প্রভাব খুব বেশী। সৌরকলঙ্কের সংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি ও উদ্ভিদ-জগতের হ্রাস-বৃদ্ধি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। সৌর-কলঙ্কের সংখ্যা বাড়লে উদ্ভিদ-জগতের পুষ্টিও বাড়ে। এদের সংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধিতে পৃথিবীর নিজস্ব চৌম্বক ক্ষেত্রের পরিবর্তন ঘটে ও সূর্য থেকে আগত বেতার-তরঙ্গের তীব্রতারও হ্রাস-বৃদ্ধি হয়।

সূর্যের আলোকমণ্ডলের উপরের স্তরগুলি সাধারণভাবে দেখতে পাওয়া যায় না। সূর্যের পূর্ণগ্রহণের সময় আলোকমণ্ডল যখন চাঁদে ঢাকা পড়ে, তখন এই স্তরগুলি দেখা যায়। সূর্যের আলোকমণ্ডলের বাইরের দিকে প্রায় ১০০০ কিলোমিটার পর্যন্ত অঞ্চল অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা। এই অঞ্চলকে বলা হয় রিভার্সিং লেয়ার (১নং চিত্র)। এই রিভার্সিং লেয়ারের পরে রয়েছে বর্ণমণ্ডল বা ক্রমোস্ফিয়ার। সূর্যের গ্রহণের সময় এই বর্ণমণ্ডলকে উজ্জ্বল, রূপালী রঙের চাকার মত সূর্যের চারপাশে দেখা যায়। চাঁদের ছায়ায় সূর্যের আলোকমণ্ডল যখন ঢাকা পড়ে, তখন চাঁদের ছায়ার সীমানার বাইরে আগুনের শিখার মত গোলাপী আভা দেখা যায়—এগুলিকে বলা হয় সৌরউৎক্ষেপ বা সোলার প্রমি-

নেন্স (২নং চিত্র)। সবচেয়ে ছোট উৎক্ষেপের স্থায়িত্বকাল কয়েক মিনিট মাত্র। সূর্যের আভ্যন্তরীণ স্পন্দনের জন্যে অতি উত্তপ্ত গ্যাস উপরের দিকে ঠেলে উঠে বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে ও কিছুদূর যাবার পরেই জলে ওঠে।

সৌরশিখা। এরা লক্ষাধিক মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত এবং সূর্যের অভ্যন্তরস্থ অতিরিক্ত চাপ ও তাপের মুক্তিপথ। সূর্যের ভিতরের চাপ ও তাপ এদের মাধ্যমে বেরিয়ে আসতে পারে বলেই সূর্য নবতারা রূপে জলে

২নং চিত্র
সৌর প্রমিনেন্স।

মাঝে মাঝে আকাশে কোন একটা নক্ষত্রকে হঠাৎ খুব উজ্জ্বল হয়ে জলতে দেখা যায়। এদের বলা হয় নবতারা বা নোভা। নক্ষত্রের অভ্যন্তরে চাপ ও তাপের বৃদ্ধিই এই উজ্জ্বলতার কারণ। যেহেতু সূর্য একটা নক্ষত্র, কাজেই এরও নবতারা রূপে জলে ওঠবার সম্ভাবনা আছে। সূর্যের পিঠে প্রায়ই এখানে-সেখানে বিক্ষিপ্তভাবে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বিচিত্র আকৃতির অগ্নিশিখা ছড়িয়ে পড়তে দেখা যায়। এদের বলা হয়

উঠতে পারে না। সূর্য যদি কোনদিন নবতারার মত জলে ওঠে তবে আমাদের ধ্বংস অনিবার্য।

সূর্যের বর্ণমণ্ডলের নির্দিষ্ট কোন সীমা নেই, এর উষ্ণতা প্রায় ১০,০০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড। এখানে গ্যাসের ঘনত্ব আলোকমণ্ডলের চেয়েও অনেক কম। চাপের এই স্বল্পতার দরুণ আলোক মণ্ডলের তুলনায় বর্ণমণ্ডল অপেক্ষাকৃত কম ঘন ও স্বচ্ছ। এখন প্রশ্ন হলো বর্ণমণ্ডলকে সূর্যের সঙ্গে আটকে রাখবার জন্যে যে শক্তির প্রয়োজন,

সেটা আসে কোথা থেকে? প্রথমে মনে করা হতো বর্ণমণ্ডলস্থিত ক্যালসিয়াম আয়নের উপর আলোর চাপ থেকে এই শক্তি উদ্ভূত হয়। কিন্তু সমগ্র সৌরমণ্ডলে হাইড্রোজেনের তুলনায় ক্যালসিয়ামের পরিমাণ নিতান্তই নগণ্য এবং ক্যালসিয়াম, তারপর পর্যায়ক্রমে হাইড্রোজেন (প্রায় ১২,০০০ কিমি.) ও হিলিয়াম (প্রায় ৭,৫০০ কিমি.)। মোটামুটিভাবে দেড় হাজার কিলোমিটার পর্যন্ত সোডিয়াম, ম্যাগ্‌নেসিয়াম ও লৌহ, টাইটেনিয়াম, ক্রোমিয়াম আয়নগুলি প্রায়

৩নং চিত্র
পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণের সময় সৌর করোনার আলোকচিত্র।

একা ক্যালসিয়ামের পক্ষে বর্ণমণ্ডলের ভার সহ্য করা অসম্ভব। অবশেষে বর্ণমণ্ডলের গ্যাসসমূহের ক্ষিপ্ত গতিকে (Turbulent motion) বর্ণমণ্ডলের ভার বইবার জন্যে প্রয়োজনীয় শক্তির উৎস হিসাবে মনে করা হয়ে থাকে। বর্ণমণ্ডলের রঙের উৎসের প্রধান উপাদান হাইড্রোজেন। এই মণ্ডলের সর্বাধিক উচ্চতায় (প্রায় ১৪,০০০ কিমি.) থাকে আড়াই হাজার কিলোমিটার পর্যন্ত পৌঁছায়। বর্ণমণ্ডলের বর্ণালী-বিশ্লেষণ থেকে দেখা গেছে সৌর-বায়ুমণ্ডলে হাইড্রোজেনের পরিমাণ হিলিয়ামের প্রায় পাঁচগুণ।

ধাতু হিসাবে সূর্যের ভিতর লোহার উপস্থিতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সূর্যের প্রচণ্ড তাপে এইসব বস্তুর অবস্থা কি, সেটা জানবার কথা

আমরা জানি, তাপ প্রয়োগে কঠিন বস্তু প্রথমে তরল ও পরে বাষ্পে পরিণত হয়। সাধারণভাবে আমরা যদি লোহার কথা বিবেচনা করি তাহলে দেখি যে, প্রায় ১৫৩০° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় লোহা গলে ও প্রায় ২৪৫০° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় ফুটতে থাকে ও বাষ্পে পরিণত হয়। কিন্তু সূর্যের তাপমাত্রা এই গলনাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্কের তুলনায় অনেক গুণ বেশী; কাজেই ধাতুগুলি সূর্যের ভিতর বাষ্পীয় অবস্থায় থাকতে পারে না। এই অধিক উত্তাপে এদের আণবিক গঠনের বিপর্যয় ঘটে ও এরা ভেঙ্গে গিয়ে আয়নে রূপান্তরিত হয়। এই আয়নগুলি ও অধিকতর গতিসম্পন্ন ইলেকট্রনগুলি সূর্যের ভিতর প্রচণ্ড বেগে ছুটাছুটি করে। এদের মিলিত অবস্থা কঠিন, তরল বা বায়বীয় অবস্থা থেকে ভিন্ন। আমরা জানি কঠিন, তরল ও বাষ্পীয় অবস্থা ছাড়াও পদার্থের একটা চতুর্থ অবস্থা আছে—যার নাম প্লাজ্‌মা। সূর্যের ভিতর পদার্থগুলি এই চতুর্থ বা প্লাজ্‌মা অবস্থায় আছে।

বর্ণমণ্ডলের উপরে সৌর-বায়ুমণ্ডলের সর্বশেষ স্তর অর্থাৎ ছটামণ্ডল বা করোনা (১নং চিত্র)। ছটামণ্ডলের ছটাগুলি চতুর্দিকে লক্ষ লক্ষ মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত। পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ ছাড়া অন্য সময় ছটামণ্ডল দেখা যায় না। এই কারণে করোনা সংক্রান্ত গবেষণা নিতান্তই সীমিত। ৩নং চিত্রে সূর্যগ্রহণের সময় গৃহীত ছটামণ্ডলের আলোকচিত্র দেখানো হয়েছে। দেখা গেছে যে, করোনার আকৃতি সৌর-সক্রিয়তার পর্যায়কালের (অর্থাৎ ১১ বছর) সঙ্গে পাল্টায়। যখন সূর্য খুব অশান্ত (অর্থাৎ সৌর-সক্রিয়তা বেশী এবং বেশী সংখ্যায় সৌরকলঙ্ক আবির্ভূত হয়) তখন সূর্যের চারপাশে করোনার রশ্মিগুলিকে সুস্পষ্টভাবে দেখতে পাওয়া যায়। করোনায় গ্যাসের ঘনত্ব খুবই কম ও তাপমাত্রা প্রায় ১০ লক্ষ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড। এত উচ্চ তাপমাত্রায় করোনায় গ্যাসসমূহ আয়নে পরিণত হয় এবং অধিক তাপের প্রভাবে এক একটা পরমাণু থেকে নয় দশটা ইলেকট্রন পর্যন্ত খসে যায়। যেহেতু হাল্কা হাইড্রোজেন গ্যাস, বায়ুমণ্ডলে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করে ও সৌর-বায়ুমণ্ডলে করোনাই সর্বোচ্চ স্তর, সেকারণে করোনায় হাইড্রোজেনের অস্তিত্বের বিষয় চিন্তা করা স্বাভাবিক। কিন্তু করোনা থেকে কোন হাইড্রোজেন বিকিরণ পরিলক্ষিত হয় না, এর কারণ হচ্ছে উচ্চ তাপমাত্রায় উচ্চ আয়নীকরণের জন্যে হাইড্রোজেনের বিকিরণ দুর্বল হয়ে পড়ে। করোনায় উচ্চ তাপমাত্রা সৃষ্টি সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ আছে। প্রথমে মনে করা হতো পরিচলন অঞ্চল থেকে নির্গত গ্যাসীয় স্রোতের গতিবেগ করোনাকে নির্দিষ্ট তাপাঙ্ক পর্যন্ত উত্তপ্ত করবার পক্ষে নিতান্তই অপ্রচুর। আর একটা মতবাদ অনুযায়ী পরমাণু-কেন্দ্রীনের বিভাজন প্রক্রিয়ায় করোনা উত্তপ্ত হয়। কিন্তু এই ক্ষেত্রেও প্রমাণ করে দেখানো গেছে যে, করোনাকে নির্দিষ্ট তাপমাত্রা পর্যন্ত উত্তপ্ত করবার জন্যে প্রয়োজনীয় পরমাণুর সংখ্যা সৌর-বায়ুমণ্ডলে নিতান্তই অল্প। সর্বাধুনিক মতবাদ অনুযায়ী করোনার চরম আয়নীকরণের কারণ হিসাবে পরমাণু ও অন্যান্য মুক্ত ইলেকট্রনগুলির সংঘর্ষকে ধরা হয়। করোনা থেকে নির্গত অতিবেগুনী রশ্মি পৃথিবীর উর্ধ্বস্তরের বায়ুমণ্ডলের সংস্পর্শে এসে এখানকার গ্যাসীয় পরমাণুগুলিকে আয়নিত করে এবং এই স্তরগুলি তড়িৎ-পরিবাহী আয়নমণ্ডলে রূপান্তরিত হয়। এই স্তরগুলি পৃথিবী থেকে প্রেরিত বেতার-তরঙ্গ প্রতিফলিত করে এবং এই প্রতিফলনের মাত্রা মুক্ত ইলেকট্রনের ঘনত্বের সমানুপাতিক। প্রতিফলনাঙ্ক তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের ব্যস্তানুপাতিক অর্থাৎ তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য বাড়লে প্রতিফলনাঙ্ক হ্রাস পায়, বিপরীতক্রমে তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য কমলে প্রতিফলনাঙ্ক বৃদ্ধি পায়। বেতার সংযোগ ব্যবস্থা এই আয়নমণ্ডলের অবস্থা ও ধর্মের উপর নির্ভর করে।

আয়নমণ্ডলের সৃষ্টি ছাড়াও সূর্যরশ্মির ক্রিয়ায় পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে আর একটা চমকপ্রদ ব্যাপার হচ্ছে চাঁদহীন রাতের আলো। অমাবস্যার রাতে যে আলো দেখা যায়, সেটা সাধারণতঃ গ্রহ-নক্ষত্র থেকে আসছে বলেই আমরা জানি। কিন্তু দেখা গেছে যে, গ্রহ-নক্ষত্র থেকে যে আলো পাওয়া যায়, তার থেকে বেশী আলো আমরা পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল ও সূর্যরশ্মির সাহায্যে পাই। দিনের বেলা সূর্যরশ্মি পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের অণুগুলিকে পরমাণুতে বিভক্ত করে। রাত্রিবেলা এই পরমাণুগুলি আবার সংযোজিত হয়ে অণুর সৃষ্টি করে। অণুগুলি পরমাণুতে বিভক্ত হবার জন্যে যে শক্তি সূর্যরশ্মি থেকে শোষণ করে, রাত্রিবেলা পুনঃ সংযোজনের সময় এই শক্তিই পরমাণুগুলি আলোর আকারে বিকিরিত করে।

সৌরকলঙ্কের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধযুক্ত আর একটা ঘটনা হচ্ছে সৌর-বিস্ফোরণ। মাঝে মাঝে সৌরকলঙ্কের সন্নিহিত কোন অঞ্চল হঠাৎ খুব উজ্জ্বল হয়ে ওঠে—মনে হয় যেন সেখানে প্রচণ্ড কোন বিস্ফোরণ হয়েছে। এগুলিকেই বলা হয় সৌর-বিস্ফোরণ। এদের স্থায়িত্বকাল কয়েক মিনিট থেকে কয়েক ঘণ্টা পর্যন্ত এবং আয়তন কয়েক শত কোটি বর্গ কিলোমিটার পর্যন্ত। সৌর-বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গে এই সমস্ত অঞ্চল থেকে বিভিন্ন তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের অত্যন্ত শক্তিশালী বিদ্যুৎ-চুম্বক তরঙ্গ ও নানা রকমের কণিকা নির্গত হয়। এই সময় আয়নমণ্ডলের পরমাণুগুলি অধিক পরিমাণে আয়নিত হয়। বেতার-তরঙ্গের দৈর্ঘ্য যত বড় হয়, শোষণও তত বেশী হয়। এই কারণে সৌর-বিস্ফোরণের ফলে আয়নমণ্ডলে আয়নীকরণ বাড়লে এর নীচু স্তরগুলি হ্রস্ব ও মিডিয়াম বেতার-তরঙ্গ শোষণ করে, যার ফলে এই সমস্ত তরঙ্গগুলি আয়নমণ্ডল থেকে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসতে পারে না। এই জন্যেই সৌর-বিস্ফোরণের সময় পৃথিবীর আলোকিত গোলার্ধে মাঝে মাঝে বেতার সঙ্কেত সম্পূর্ণ অবলুপ্ত হয়ে যায়। কয়েক মিনিট থেকে এক ঘণ্টা পর্যন্ত এই অবলুপ্তি স্থায়ী হয়ে থাকে।

সূর্যের আলোকমণ্ডলের উপর স্থানে স্থানে কোন সময় উজ্জ্বল মেঘের মত অংশ দেখা যায়। এগুলি সূর্যের বায়ুমণ্ডলের তুলনায় উচ্চ তাপমাত্রাবিশিষ্ট এবং ফেকুলাস নামে পরিচিত। এগুলিকে সূর্যের গোলক প্রান্তে দেখা যায় না—এই গোলক প্রান্তের বাইরে অপেক্ষাকৃত শীতল স্তরগুলিতে ফেকুলাস দৃষ্ট হয়। এদের উৎপত্তি আলোকমণ্ডলের উচ্চতর স্থানসমূহে। এদের তাপমাত্রা বাইরের দিকের তুলনায় ভিতরের দিকে বেশী। এদের পরমাণুগুলি আলোকমণ্ডলের পরমাণুর তুলনায় বেশী উত্তেজিত। এই অধিক উত্তেজনার কারণ হিসাবে বিজ্ঞানীরা ফেকুলাসে উদ্ভূত অধিক অতিবেগুনী বিকিরণকে নির্দেশ করেন। এখানে আয়নিত ক্যালসিয়ামের পরিমাণ আলোকমণ্ডলের তুলনায় কম। ক্যালসিয়াম আয়নের এই স্বল্পতার জন্যে ফেকুলাসের বর্ণালী বিশ্লেষণে ক্যালসিয়াম আয়নের রেখাগুলি স্পষ্ট দেখা যায় না।

ফেকুলাসগুলি যখন বর্ণমণ্ডলে সম্প্রসারিত হয়, তখন তাকে ফ্লোকিউলাস বলা হয়। ফ্লোকিউলাসের তাপমাত্রা সৌর-বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রার তুলনায় যথেষ্ট বেশী হওয়ায় এখানে পরমাণুর উত্তেজনাও অনেক বেশী। এদের ক্ষেত্রফল ও তীব্রতা সৌর-সক্রিয়তার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ে। এদের আকৃতিও সূর্যের পর্যায়কালের সঙ্গে পরিবর্তনশীল। ফ্লোকিউলাস সূর্যের সমগ্র গোলকে দেখা যায়। স্পেক্ট্রোহিলিওস্কোপ নামক যন্ত্রে প্রাপ্ত সূর্যের প্রতিবিম্বের গায়ে কতকগুলি লম্বা, সরু ও কালো রঙের আকৃতি দেখা যায়। এগুলিকে বলা হয় ফিলামেন্ট। এদের দৈর্ঘ্য কোন কোন ক্ষেত্রে সূর্যের ব্যাসার্ধের চেয়েও বড় হয়। এগুলি ছাড়াও সূর্যপৃষ্ঠে অনেকটা প্রায় ফিলামেন্টেরই

মত দেখতে অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল ফোয়ারার মত অভিক্ষেপ দেখা যায়, যার কথা আগেই বলা হয়েছে—এরা প্রমিনেন্স নামে পরিচিত। এদের দৈর্ঘ্য ফিলামেন্টেরই সমতুল্য। ফিলামেন্ট ও প্রমিনেন্স সূর্যের সক্রিয় অঞ্চল (অর্থাৎ যেখানে সৌরকলঙ্ক ও ফেকুলাস দৃষ্ট হয়) থেকে বেশ দূরে দেখতে পাওয়া যায়। সৌরকলঙ্কের অধিক আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে প্রমিনেন্সগুলিও বেশী সংখ্যায় দেখা দেয়। প্রমিনেন্সে পরমাণুর আয়নীকরণ অত্যন্ত বেশী। এর অধিক আয়নীকরণকে বিজ্ঞানীরা সূর্যের করোনায় উদ্ভূত অতি-বেগুনী বিকিরণের দ্বারা প্রমিনেন্স প্রভাবিত হবার ফল হিসাবে ব্যাখ্যা করেন। প্রমিনেন্সে মুক্ত ইলেকট্রনের উপস্থিতি প্রমাণিত হয়—সময় সময় দৃষ্ট নিরবচ্ছিন্ন বর্ণালী থেকে। তাই অপর মতবাদ অনুযায়ী এই তীব্র আয়নীকরণের কারণ হচ্ছে মুক্ত ইলেকট্রনের সঙ্গে পরমাণুর সংঘর্ষ। সৌর-কলঙ্কের কাছাকাছি স্থানে যে সব প্রমিনেন্স দেখতে পাওয়া যায়, তাদের গতি যেন কোন চৌম্বক-ক্ষেত্রের বলরেখা বরাবর। এর কারণ হয়তো এদের উপর সূর্যের চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রভাব। এই প্রমিনেন্সের গতিকে বিজ্ঞানীরা তড়িৎ-চুম্বকীয় গতি হিসাবে ব্যাখ্যা করেন। উপরিউক্ত ধরণের গতি ছাড়াও কতকগুলি প্রমিনেন্সে আর এক প্রকার গতি লক্ষ্য করা গেছে। এগুলির গতি অনেকটা ধোঁয়া বা মেঘের গতির মত এবং এই গতির মধ্যে কোন নির্দিষ্ট নিয়ম দেখতে পাওয়া যায় না।

সূর্যের বিষুব রেখার উপর দিয়ে যখন কোন বড় সৌরকলঙ্ককে অতিক্রম করতে দেখা গেছে, তখনই পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রে অত্যন্ত বিশৃঙ্খলা পরিলক্ষিত হয়েছে। পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রের এই বিশৃঙ্খলাকে চৌম্বক ঝড় বলা হয়। এই চৌম্বক ঝড় কয়েক ঘন্টা থেকে একদিন পর্যন্ত স্থায়ী হতে দেখা যায়। বিজ্ঞানীদের মতে, সূর্য থেকে নির্গত আধানযুক্ত কণিকাস্রোতই চৌম্বক ঝড়ের উৎপত্তির কারণ। সৌর-বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়, তবে এই বিশৃঙ্খলা চৌম্বক ঝড়ের তুলনায় কম। আগেই বলা হয়েছে যে, সৌর-বিস্ফোরণের ফলে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের উপরকার স্তরগুলি আয়নিত হয় এবং এর ফলেই আয়নমণ্ডলের সৃষ্টি হয়। পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্র ও আয়নমণ্ডলের অবস্থা বিশেষ সম্পর্কযুক্ত। বিস্ফোরণের অঞ্চল থেকে নির্গত অতিবেগুনী বিকিরণ আয়ন-মণ্ডলের মাধ্যমে পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রকে প্রভাবিত করে। সূর্য থেকে নির্গত বিভিন্ন কণিকাস্রোত যখন পৃথিবীর উপরিভাগে এসে পৌঁছায় তখন পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্র এই স্রোতের কণাগুলিকে মাস-স্পেক্ট্রোগ্রাফ যন্ত্রের মত আলাদা করে দেয় (অর্থাৎ ধণাত্মক আধানযুক্ত কণিকাগুলিকে এক মেরুতে ও ঋণাত্মক আধানযুক্ত কণিকাগুলিকে অপর মেরুতে জড়ো করে) এবং এরই ফলে বিদ্যুৎ-স্রোতের সৃষ্টি হয়। এই বিদ্যুৎ-স্রোতকে বলা হয় রিং কারেন্ট এবং এটা কণিকাসমূহের চলাচলের জন্যেই সৃষ্টি হয়। এই বিদ্যুৎ-স্রোত পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রের উপর অতিরিক্ত প্রভাব বিস্তার করে, ফলে চৌম্বক ঝড়ের সৃষ্টি হয়। চৌম্বক ঝড়ের ব্যাখ্যা হিসাবে এটাই সর্বাধুনিক মতবাদ।

চৌম্বক ঝড়ের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর মেরু অঞ্চলে একটা ঘটনা লক্ষ্য করা যায়, যাকে বলা হয় মেরুজ্যোতি। সৌর-বিস্ফোরণের সময় শক্তিশালী কণিকাস্রোত প্রচণ্ডবেগে নির্গত হয়। এদের মধ্যে যারা সবচেয়ে শক্তিশালী, তারা সরাসরি পৃথিবীপৃষ্ঠে এসে পৌঁছায়—যাদের বলা হয় সূর্য থেকে আগত মহাজাগতিক রশ্মি। কণিকা-স্রোতের অধিকাংশ কণিকাগুলি পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্র কর্তৃক বিকর্ষিত হয়ে পৃথিবীতে পৌঁছুতে পারে না। এরাই পথভ্রষ্ট হয়ে তাঁদের কক্ষপথের

এক সমান দূরত্বে অবস্থান করে এবং রিং কারেন্ট সৃষ্টি করে। বিস্ফোরণের বেশ কয়েক ঘণ্টা পরে অপেক্ষাকৃত কম গতিবেগসম্পন্ন কণিকাগুলি—যেগুলি পৃথিবীতে এসে পৌঁছায় কিন্তু পৃথিবীপৃষ্ঠে আসতে পারে না—পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রভাবে মেরু অঞ্চলের দিকে আকৃষ্ট হয় এবং মেরুঅঞ্চলের আবহমণ্ডলের বায়ুকণাসমূহকে

নাইট্রোজেনের আয়নিত পরমাণু ও সোডিয়াম ইত্যাদির বিশিষ্ট উজ্জ্বল রেখা ও পার (Band) মেরুজ্যোতির বর্ণালীতে দেখতে পাওয়া গেছে। পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রের অবস্থা মেরুজ্যোতির আবির্ভাব ও উজ্জ্বলতার সঙ্গে খুবই সম্বন্ধযুক্ত।

যখন সূর্য শান্ত অবস্থায় থাকে, অর্থাৎ কম সংখ্যক সৌরকলঙ্কের আবির্ভাব ঘটে ও সৌর-
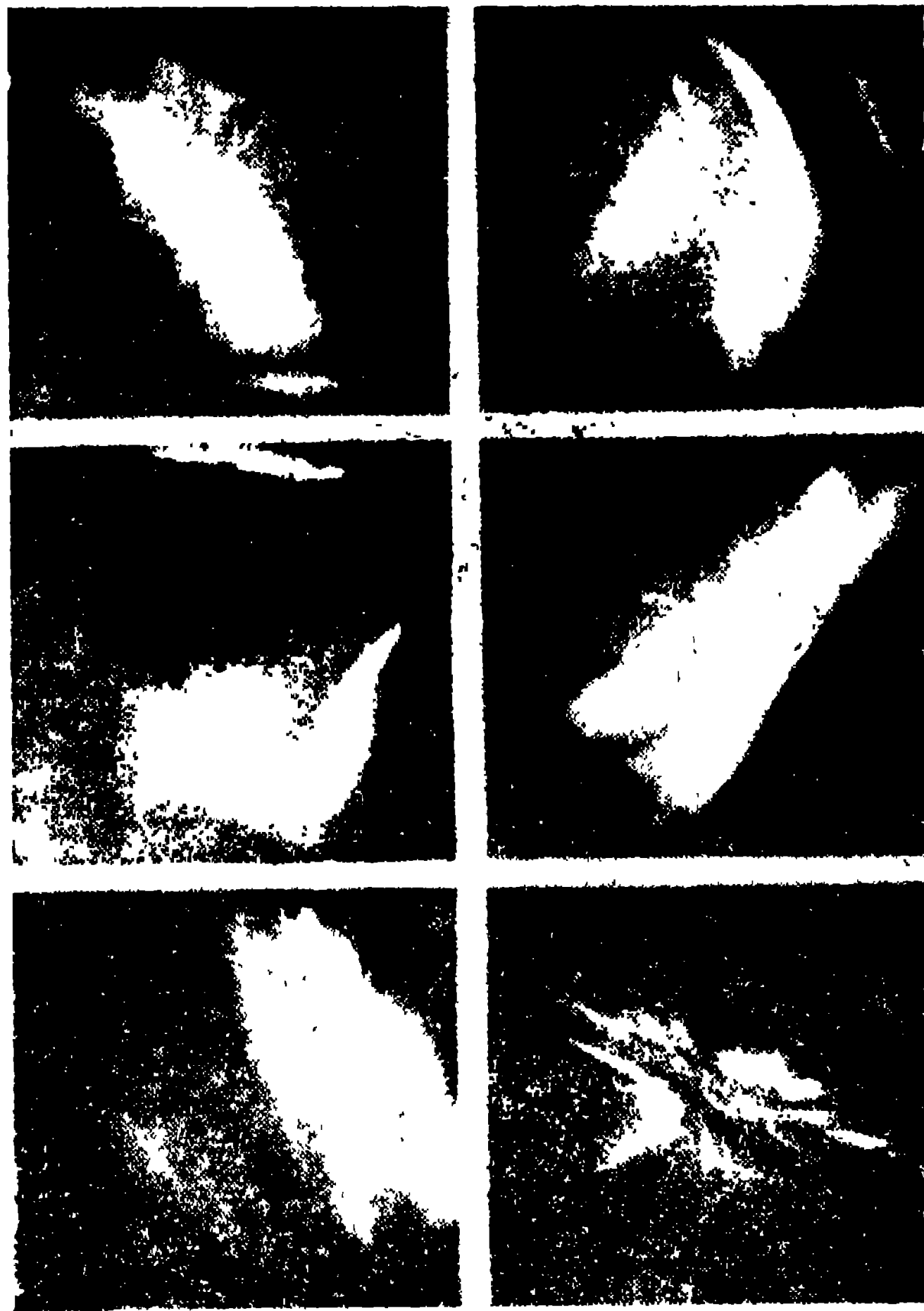
৪নং চিত্র
বিভিন্ন রকম মেরুজ্যোতির দৃশ্য।

উত্তেজিত করে। ফলে ওখানকার আকাশে দেখা যায় নানা রঙের খেলা, যাকে বলা হয় মেরুজ্যোতি (৪ নং চিত্র)। চৌম্বক ক্ষেত্রের বল বিষুব অঞ্চলের দিকে ক্রমশঃ কমে যায়, কাজেই কণিকাস্রোত এদিকে আসতে পারে না। তাই আমরা এই মেরুজ্যোতি দেখবার আনন্দ থেকে বঞ্চিত। নাইট্রোজেন, অক্সিজেন ও

বিস্ফোরণ ঘটে না, তখন সূর্য থেকে যে সব বেতার-তরঙ্গ নির্গত হয় সেগুলির তীব্রতা থাকে কম। কিন্তু যখন সূর্যপৃষ্ঠ অশান্ত তখন যে সব বেতার-তরঙ্গ নির্গত হয়, তাদের তীব্রতা তুলনামূলকভাবে অনেক বেশী। সূর্য থেকে নির্গত বেতার-বিকিরণের যে সব তরঙ্গের দৈর্ঘ্য প্রায় ·২৯ মাইক্রনের কম (১ মাইক্রন $= ১০^{-৭}$ সেঃ)

সেগুলি পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের ওজোন কর্তৃক শোষিত হয়। তিন মাইক্রনের বেশী দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট বেতার-তরঙ্গ পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের জলীয় বাষ্প ও অন্যান্য পদার্থের দ্বারা শোষিত হয়। সৌরকলঙ্কগুলি যত সূর্যের মেরিডিয়ান রেখা বা মধ্যরেখার দিকে এগোয়, সৌর-বিস্ফোরণের তীব্রতাও তত বৃদ্ধি পায় এবং কলঙ্কগুলি মধ্যরেখা অতিক্রম করবার পর বিকিরণের তীব্রতা ক্রমশঃ হ্রাস পায়। সূর্যের বেতার-বিকিরণের উৎসগুলি সৌরকলঙ্ক-গোষ্ঠীর উপর অবস্থিত। যখন কোন বৃহৎ সৌর-বিস্ফোরণ ঘটে, তখন সৌর বিকিরণের বর্ধিত তীব্রতা থেকে ধারণা করা হয় যে, বেতার-বিকিরণের উৎস সূর্যের আবহমণ্ডলে গতিশীল। এই গতি প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় কুড়ি হাজার থেকে একলক্ষ কিলোমিটারের মত।

বিপুল পরিমাণ শক্তি নানা জাতীয় বিকিরণের মাধ্যমে সূর্য থেকে প্রতিনিয়ত নির্গত হচ্ছে। মোটামুটিভাবে হিসাব করলে এই শক্তির পরিমাণ হচ্ছে প্রায় ৫.১ × ১০^২৩ অশ্বশক্তির সমান। সূর্যের শক্তির এই বিশালতা সম্বন্ধে পৃথিবীতে বসে পরিষ্কার ধারণা করা অসম্ভব। তবে তুলনামূলকভাবে এই শক্তির প্রচণ্ডতা উপলব্ধি করা যেতে পারে। এক পাউণ্ড কয়লা জ্বালিয়ে ১০০০ ওয়াটের একটা বৈদ্যুতিক চুল্লীকে যদি ৩ ঘণ্টা কার্যক্ষম রাখা যায়, তবে সূর্যের এক পাউণ্ড পরিমাণ বস্তু থেকে যে শক্তি বিকিরিত হয়, তার সাহায্যে ঐ চুল্লীকে ৩০ বছরেরও বেশী জ্বালিয়ে রাখা যায়। এই সামান্য একটা উদাহরণ থেকেই সৌরশক্তির বিশালতা সম্বন্ধে আমরা ধারণা করতে পারি। সূর্যের পৃষ্ঠদেশের তাপমাত্রা প্রায় ৬০০০° ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড, কিন্তু এর কেন্দ্রস্থ অঞ্চলের তাপমাত্রা প্রায় দু-কোটি ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড। আমরা সাধারণভাবে দেখি যে, কয়লার সঙ্গে অক্সিজেনের রাসায়নিক ক্রিয়ায় কয়লা জ্বলে ও তাপ সৃষ্টি হয়। সূর্যের তাপের উৎস কিন্তু এই রকম কোনও সাধারণ বস্তুর দহন-ক্রিয়া নয়। এখন পর্যন্ত এমন কোন বস্তুর সন্ধান পাওয়া যায় নি, যার দহনে দুই কোটি ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড তাপ-মাত্রা উৎপন্ন হতে পারে। বিজ্ঞানী কেল্‌ভিন ও হেলমহোলৎজের মতবাদ অনুযায়ী সূর্য-দেহের ক্রমাগত সঙ্কোচনের ফলেই এই শক্তি উৎপন্ন হয়। কিন্তু তাই যদি হয়, তবে সূর্য-দেহ সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হতে দু-কোটি বছর সময় লাগা উচিৎ। কিন্তু ভূতাত্ত্বিকদের মতবাদ অনুযায়ী সূর্যের বয়স কম করে ধরলেও ৩০০ কোটি বছরেরও বেশী। কাজেই এই হিসাব অনুযায়ী সৌরশক্তির উৎস প্রসঙ্গে সঙ্কোচনবাদকে বাতিল করতে হয়। আধুনিক মতবাদ অনুযায়ী সূর্যের মধ্যে পারমাণবিক সঙ্কোচন-প্রক্রিয়াই সূর্যের শক্তির মূল উৎস। আইনষ্টাইনের $E=mc^2$ সূত্র এই শক্তির পরিমাণের খবর দেয়, যেটা আমাদের প্রায় সকলেরই জানা। সংযোজন প্রক্রিয়ায় কয়েকটা হাল্‌কা কেন্দ্রীন একসঙ্গে মিলে অপেক্ষাকৃত ভারী একটা নতুন কেন্দ্রীনের সৃষ্টি করে। যেমন, বিশেষ অবস্থায় চারটি হাইড্রোজেন কেন্দ্রীন এক হয়ে একটা হিলিয়াম কেন্দ্রীন হতে পারে। এই প্রক্রিয়ায় কিছু পরিমাণ বস্তু অন্তর্হিত হয়, যা পূর্ববর্ণিত আইনষ্টাইনের সূত্র অনুযায়ী শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। সূর্যের মধ্যে যে সংযোজন-প্রক্রিয়া চলে, তা হান্স বেথের 'কার্বন-চক্রের' নিয়ম মেনে চলে। এই নিয়ম অনুযায়ী একটা কার্বন কেন্দ্রীন চারটি প্রোটনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটা কার্বন কেন্দ্রীন ও একটা হিলিয়াম কেন্দ্রীন তৈরি করে। এই প্রক্রিয়ায় গামা রশ্মি ও পজিট্রন কণা নির্গত হয়। সূর্যের কেন্দ্রে কার্বন-চক্র প্রক্রিয়া সম্ভব হতে প্রায় দুই কোটি ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা প্রয়োজন, যা সেখানে সহজেই মেলে। ঐ নির্গত গামা রশ্মি সূর্যের বাইরেকার

মণ্ডলে এসে অতিবেগুনী রশ্মি, তাপ, আলোক প্রভৃতিতে পরিবর্তিত হয়।

সূর্য ছাড়া পৃথিবীতে প্রাণের অস্তিত্ব অসম্ভব। সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সূর্য সম্বন্ধে মানুষের জিজ্ঞাসা স্বভাবতই স্বতঃস্ফূর্ত। অনুসন্ধিৎসু বিজ্ঞানীর সূর্য সম্পর্কীয় অনুশীলনের ফলেই আবিষ্কৃত হয়েছে বিভিন্ন যন্ত্র ও পদ্ধতি—সাধারণ লোকও আজ যার প্রয়োগে অভ্যস্ত। ফলে সূর্য সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান ও ধারণা ক্রমশঃ বৃদ্ধিলাভ করছে। আজ পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান থেকে বিজ্ঞানীরা সঙ্ঘবদ্ধভাবে সূর্য সম্বন্ধে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন। সূর্যের অশান্ত ও শান্ত অবস্থার সুযোগকেও বিজ্ঞানীরা পুরাপুরি কাজে লাগিয়ে নতুন নতুন তথ্য আবিষ্কার করছেন। এতেও সূর্য সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান প্রয়োজনের তুলনায় খুবই সীমিত, তবে আশা করা যায় যে, অদূর ভবিষ্যতে আমরা সূর্য সম্বন্ধে আরও অনেক জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে সমর্থ হবো।

মহাদেশ ও সমুদ্রের উৎপত্তি

দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

পৃথিবীর মানচিত্র পরীক্ষা করলে দেখা যাবে, পৃথিবীর প্রায় সত্তর ভাগ অংশই সমুদ্র আর বাদ বাকীটা স্থলভাগ দিয়ে তৈরি। সাধারণভাবে মনে হতে পারে জমির নীচু খানাখন্দ ভর্তি হয়ে যেমন সৃষ্টি হয় অগভীর জলাশয়ের, ঠিক তেমনিভাবেই ঢেউখেলানো উঁচু-নীচু পৃথিবী-পৃষ্ঠের নীচু জায়গাগুলি জলপূর্ণ হয়ে সৃষ্টি করেছে নীল সমুদ্রের। আর উঁচু জায়গাগুলি থেকে গেছে মহাদেশ হিসেবে। তথ্যগতভাবে কথাটা সঠিক হলেও ভূতাত্ত্বিকের দৃষ্টিতে পুরাপুরি সত্য নয়। বিজ্ঞানীরা বলতে চেয়েছেন, সমুদ্রতল কেবলমাত্র নীচু জায়গাই নয়, হয়তো এছাড়া আরও অনেক রহস্যই লুকিয়ে রয়েছে এর গভীরে: অর্থাৎ সমুদ্রতল, পর্বত বা মহাদেশীয় অঞ্চলের চেয়ে কেন নীচু—এই মূল তত্ত্বের গভীরে বিজ্ঞানীরা যেতে চেয়েছেন।

ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষায় দেখা গেছে, মহাদেশ ও সমুদ্রতলদেশের ভূতাত্ত্বিক বিন্যাসে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। কেবলমাত্র তাই নয়, তুলনামূলক ভাবে মহাদেশীয় শিলা সমুদ্রতলদেশের শিলার চেয়ে অনেক হাল্কা। এই তথ্যের উপর নির্ভর করে সমুদ্র ও মহাদেশীয় অঞ্চলের পারস্পরিক অবস্থানের প্রকৃতি নির্ধারণে প্রয়াসী হয়েছেন বিজ্ঞানীরা। সাম্প্রতিককালে আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে সমুদ্র, পর্বতমালা বা মহাদেশীয় অঞ্চলের তুলনামূলক মাধ্যাকর্ষণ শক্তির পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিমাপ করা সম্ভব হয়েছে। এই সমীক্ষার ফলে জানতে পারা গেছে কতকগুলি কৌতূহলোদ্দীপক তথ্য। সুদীর্ঘকাল ধরে বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল, পৃথিবীর বক্ষ বিদীর্ণ করে যে পর্বতমালা গগনচুম্বী হয়ে উঠেছে তা নিশ্চয়ই পৃথিবীর বুকে অতিরিক্ত ভারের সৃষ্টি করেছে। আসলে ব্যাপারটা কিন্তু তা নয়। মহাদেশ বা পর্বতাঞ্চলের মাধ্যাকর্ষণের নিম্নমান থেকে বিজ্ঞানীরা অনুধাবন করেছেন, লঘুভার শিলায় গঠিত পর্বতমালা বা মহাদেশ আসলে ভারী অন্তঃস্তরের (Substratum) উপরে ভাসছে, অনেকটা সমুদ্রবক্ষে ভাসমান হিমশৈলের (Iceberg) মত। পর্বত বা মহাদেশীয় শিলা হাল্কা বলে সমুদ্রতলদেশ থেকে আপেক্ষিকভাবে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে

আছে। এই বৈজ্ঞানিক তথ্য থেকেই উদ্ভূত হয়েছে সমস্থিতির তত্ত্ব (Isostasy)। আর এই তত্ত্বের প্রবক্তা হিসেবে মোটামুটিভাবে ডাটন, প্র্যাট, এয়ারি, হিসকানেন ও ভেনিং মেইনেসের নাম করা যায়।

ভূপদার্থবিদ্‌দের পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে, পৃথিবীর অন্তঃস্তলকে (Core) বাদ দিলে ভূপৃষ্ঠের বাদবাকী অংশটা (২৯০০ কিলোমিটার গভীরতা পর্যন্ত) কঠিন পদার্থে গঠিত। সুতরাং পাহাড় বা মহাদেশীয় অঞ্চলের ভাসমান থাকবার ব্যাপারটা কিছুটা হেঁয়ালির মত মনে হতে পারে। এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে ভূপদার্থবিদ্‌গণের অভিমত—পৃথিবীর গভীরে প্রচণ্ড তাপ ও চাপের ফলে ভারী ম্যান্টল অনেকটা অকঠিন অথচ অতরল অবস্থায় বিরাজ করছে, যদিও যে কোন সময়েই সামান্য চাপ ও তাপের হেরফেরে গলিত তরল পদার্থে পরিণত হতে পারে।

বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বিখ্যাত যুগোশ্লাভিয়ান ভূপদার্থবিজ্ঞানী মহরোভিসিক, ভূকম্পনজনিত তরঙ্গের গতিপ্রকৃতি বিশ্লেষণ করে বলেছেন, মহাদেশীয় অঞ্চলে ভূপৃষ্ঠের মাত্র ৩০-৪০ কিলোমিটার (কখনও বা ৬০ কিলোমিটার) নীচেই এবং সমুদ্রতলদেশের মাত্র ৫-১০ কিলোমিটার নীচে ভিন্ন ধরণের ভারী শিলা রয়েছে। হাল্কা ও ভারী শিলার এই সীমারেখাকে বলা হয়েছে মহরোভিসিক বিচ্ছিন্নতি রেখা (Mohorovicic discontinuity)। সাধারণভাবে এই সমীক্ষার পরই জানা যায়, ভূত্বক (Crust) কেবলমাত্র একটিমাত্র শিলায় গঠিত নয়—এতে আসলে দুটি ভিন্ন ধরণের শিলা রয়েছে। মহাদেশীয় অঞ্চলে সিয়াল (Sial) ও সমুদ্রতলদেশের কয়েক কিলোমিটার নীচেই সিমা (Sima) জাতীয় শিলার দেখা মিলবে। নামের মধ্যেই শিলাদ্বয়ের প্রকৃতি ধরা পড়েছে। যেমন Sial নামের দ্বারা বোঝানো হয়েছে, এতে সিলিকন (Silicon) ও অ্যালুমিনিয়াম (Aluminium)-ঘটিত পদার্থের প্রাচুর্য রয়েছে। অন্যদিকে Sima জাতীয় শিলায় রয়েছে সিলিকন (Silicon), লোহা ও ম্যাগ্‌নেশিয়াম (Magnesium)-ঘটিত পদার্থ। মোটামুটিভাবে বলা যেতে পারে, ভূত্বকের এই বৈজ্ঞানিক সমীক্ষার পর থেকে সমস্থিতি তত্ত্ব বিজ্ঞানীদের কাছে আরও অনেক বেশী গ্রহণীয় হয়ে ওঠে।

সমুদ্র ও মহাদেশের উৎপত্তির ব্যাপারে দুটি মূল তত্ত্ব রয়েছে। প্রথমত কিছু কিছু বিজ্ঞানী ধারণা করেছেন, সুদূর প্রাগৈতিহাসিক যুগে সমগ্র পৃথিবীতে একটিমাত্র মহাদেশই ছিল, যার নাম প্যানজিয়া (Pangea)। আর তাকে ঘিরে বিরাজ করছিল এক বিশাল অতলান্ত সমুদ্র—প্যানথ্যালোসা (Panthalossa)। দ্বিতীয় ধারণা অনুযায়ী, মহাদেশগুলি একই জায়গায় অনড়, অচল হয়ে অনাদিকাল ধরে দাঁড়িয়েছিল। তারপর বিভিন্ন যুগে বিবিধ প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার ফলে মহাদেশগুলি বাড়তে সুরু করে।

বিজ্ঞানীদের এক মহাদেশ তত্ত্ব একেবারে যুক্তিহীন নয়—মহাদেশীয় শিলা ও ফসিল পরীক্ষা করে তবেই তাঁরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। কালক্রমে বিভিন্ন প্রাকৃতিক ক্রিয়াকলাপে প্যানজিয়া মহাদেশটি ভাঙতে সুরু করে ও পরস্পর থেকে দূরে সরে যায়। আজকের মহাদেশগুলি আসলে সেই বিরাট মহাদেশেরই ভাঙা টুকরো। আর সেই প্রাগৈতিহাসিক প্যানথ্যালোসা সমুদ্র, স্থানকালের পরিবর্তন হলেও, আজকের পৃথিবীর পাঁচটি মহাসাগরের পূর্বসূরী ছাড়া কিছুই নয়।

প্যানজিয়া মহাদেশটির ভাঙনের কারণ বিশ্লেষণে বিজ্ঞানীরা দু-ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছেন। একদল (সুয়েস, চেম্বারলিন) বিশ্বাস করেন, পৃথিবী উত্তপ্ত গলিত অবস্থা থেকে ক্রমে ঠাণ্ডা হয়ে নিরেট জমাট পদার্থে পরিণত হচ্ছিল,

যার ফলে পৃথিবী ক্রমেই সঙ্কুচিত হয়ে আসছিল। এই সঙ্কোচনজনিত বলের (Force) ক্রিয়াকলাপের প্রভাব পৃথিবীপৃষ্ঠে লক্ষ্য করা যায় অত্যন্ত সঙ্গত কারণেই এবং এরই ফলে পার্থিব মহাদেশটিতে ভাঙ্গন ধরে।

আরেক দল বিজ্ঞানী (যেমন—আলফ্রেড ওয়েগ্‌নার, ড্যু টয়েট) পৃথিবীর সঙ্কোচনজনিত বলের উপর মোটেই গুরুত্ব আরোপ করেন নি। এঁদের মতে একটি পশ্চিম-মুখী ও আর একটি নিরক্ষরেখামুখী বলের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় প্যানজিয়া মহাদেশটি ভাঙতে সুরু করে এবং ভাঙা অংশগুলি পশ্চিম দিকে নিরক্ষরেখার দিকে সরতে থাকে। এমনিভাবেই মহাদেশগুলি আজকের অবস্থানে এসে পৌঁচেছে। পৃথিবীর মানচিত্র খুঁটিয়ে পরীক্ষা করলে আফ্রিকার পশ্চিম তটের সঙ্গে দক্ষিণ আমেরিকার পূর্ব তটের (অথবা উত্তর আমেরিকার পূর্বতট ও ইউরোপের পশ্চিম তট) একটা আশ্চর্য মিল লক্ষ্য করা যায়। শুধু মাত্র তটকূলের মিলই নয়, তটবর্তী অঞ্চলের পাথর ও ফসিল পরীক্ষা করে পরস্পর থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে অবস্থিত দুটি অঞ্চলের মধ্যে অদ্ভুত সাদৃশ্য দেখা গেছে। পারস্পরিক এই সাদৃশ্য থেকেই বিজ্ঞানীরা কল্পনা করেছেন, এই দুটি মহাদেশ হয়তো কোন সুদূর প্রাগৈতিহাসিক যুগে পরস্পরের সঙ্গে সংলগ্ন অবস্থায় অভিন্ন হয়ে বিরাজ করছিল। শুধুমাত্র এই দুটি মহাদেশই নয়, সমস্ত মহাদেশগুলিই—একসঙ্গে একটি অখণ্ড মহাদেশরূপে ছিল—যার নাম ছিল প্যানজিয়া। আর তার চারধারে ছড়িয়ে ছিল ঊর্মিমুখর সমুদ্র। বিখ্যাত ভূবিজ্ঞানী ওয়েগ্‌নারের মতে, খুব সম্ভবতঃ মেসোজয়িক (Mesozoic) যুগের প্রারম্ভে অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় ১৭-১৮ কোটি বছর আগে ভাঙতে সুরু করে মহাদেশগুলি। সেই প্রারম্ভিক পর্যায়ে প্যানজিয়ার অভ্যন্তরে টেথিস নামে একটি লম্বাকৃতি সমুদ্র গড়ে ওঠে। আর বর্তমানের হিমালয় পর্বতমালা সেই সমুদ্র ফুঁড়েই মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে দু-পাশের চাপের ফলে। আজকের ভূমধ্যসাগর সেই অতীত টেথিস সাগরের নীরব সাক্ষ্য বহন করছে। টার্শিয়ারী যুগের মধ্যেই (অর্থাৎ ২ থেকে ৬ কোটি বছর আগে) ইউরোপ উত্তর আমেরিকা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় উত্তরমুখী বেগের ফলে, যদিও সম্ভবতঃ গ্রীনল্যাণ্ড তুলনামূলকভাবে সাম্প্রতিককালে মূল মহাদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। বিজ্ঞানীদের মতে, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা ভূখণ্ডের উভয়ের পশ্চিমমুখী গতির ফলেই উভয় মহাদেশের পশ্চিম ভাগে দীর্ঘ ভঙ্গিল পর্বতমালা গড়ে উঠেছে। এই 'চলমান মহাদেশ' তত্ত্বের অন্যান্য প্রবক্তাদের মধ্যে টেলর, আরগ্যাণ্ড এবং ষ্ট্যাবের নাম উল্লেখযোগ্য।

বিখ্যাত প্রকৃতিতত্ত্ববিদ্ চার্লস ডারউইনের পুত্র জি. এইচ. ডারউইন প্রমুখ বিজ্ঞানীরা আর একটি মতবাদ প্রচার করেন—যাতে চাঁদের জন্মকেই মহাদেশ সৃষ্টির মূল রহস্য বলে মনে করা হয়। তাঁরা কল্পনা করেছিলেন, পৃথিবী থেকেই তরল অবস্থায় উৎক্ষিপ্ত হয়ে চন্দ্রের জন্ম হয়। সেই সময় পৃথিবী পুরাপুরি শক্ত নিরেট হয়ে উঠতে পারে নি, ভিতরে নরম গলিত অবস্থায় থাকলেও উপরে সরের মত পাত্‌লা একটি শক্ত ভূত্বকের আস্তরণ পড়েছে মাত্র। চন্দ্রের জন্মলগ্নে পৃথিবী থেকে চলে গেল সিয়ালের অংশ—সৃষ্টি হলো এক বিরাট গহ্বরের। হয়তো প্রশান্ত মহাসাগর সেই অতীত অতল গহ্বরের সাক্ষ্য দিচ্ছে।

এই মতবাদের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ এই যে, সিয়াল স্তর সৃষ্টি হবার পর পৃথিবী এমনই কঠিন হয়ে পড়বে যে, তখন আর চাঁদের উৎক্ষিপ্ত হওয়া সম্ভবপর নয়। চাঁদের জন্ম আরও অনেক আগেই হয়েছিল। প্রায় সমস্ত বিজ্ঞানীই মেনে নিয়েছেন যে, কেবলমাত্র চন্দ্রই

নয়, অন্যান্য গ্রহের উপগ্রহগুলিরও সৃষ্টি হয়েছে গ্যাসীয় অবস্থায়।

কালের প্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানীদের মধ্যে আর একটি মতবাদ বিশেষভাবে সমাদৃত হয়। ভেনিং মেইনেসের (Vening Meinsez) পরিচলন-প্রবাহ প্রকল্পে কল্পনা করা হয়েছে—গলিত অবস্থা থেকে তাপ বিকিরণ করে পৃথিবী যখন ক্রমে ঠাণ্ডা হয়ে আসছিল, তখন পৃথিবীর অভ্যন্তরে কতকগুলি প্রবাহের সৃষ্টি হয়। আখের রস থেকে গুড় জ্বাল দেবার সময় উপরের ও নীচের স্তরে তাপের বৈষম্যের ফলে রসের ভিতরে যেমন স্রোতের জন্ম হয়, পরিচলন-প্রবাহের স্বরূপ অনেকটা ওই ধরণের। প্রাথমিক পরিচলন স্রোতবৃত্ত পাশাপাশি দুটি গোলার্ধে সীমাবদ্ধ ছিল বলে কল্পনা করা হয়েছে। দুটি স্রোত দক্ষিণ মেরু থেকে সোজাভাবে উঠে উত্তর মেরুর কাছে দু-ভাগে আলাদা হয়ে ভূপৃষ্ঠ বেয়ে আবার দক্ষিণ মেরুতে মিলিত হয়। কিন্তু তখনও ভূত্বক, ম্যাণ্টল বা অন্তঃস্থল প্রভৃতি গড়ে ওঠে নি। এই দুই প্রবাহের ফলে গ্র্যানিট জাতীয় পাথরের একটি স্তর দক্ষিণ মেরুকে ঘিরে গড়ে উঠতে লাগলো, আর ধীরে ধীরে সমগ্র দক্ষিণ গোলার্ধকেই ঢেকে ফেললো। আর এই সময় পৃথিবীর অন্তঃস্তলের গঠনপর্ব সুরু হয়ে গেছে। গ্র্যানিটে তেজস্ক্রিয় পদার্থের আধিক্যের ফলে উত্তাপ জমতে সুরু করেছে। আর উত্তাপ বাড়বার ফলে প্রাথমিক স্রোতের গতিপথের পরিবর্তন ঘটলো—গড়ে উঠলো নতুন এক স্রোত। এই স্রোতের ফলে গ্র্যানিটের স্তরে ভাঙন ধরলো, যদিও গ্র্যানিটের স্তরের অংশ বিশেষ রয়ে গেল দক্ষিণ মেরুতে। এর পর নতুন স্রোতের প্রবাহে বিশাল বিচ্ছিন্ন গ্র্যানিটের স্তর আরও ছোট ছোট ভাগে ভেঙ্গে গেল। আর এই প্রভাবেই সৃষ্টি হলো পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন মহাদেশের।

হাল আমলে মহাদেশ গঠনের নতুন আর একটি মতবাদ ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে। কোন কোন ভূতাত্ত্বিকের মতে, (যেমন—জে টি. উইলসন) কেন্দ্রীয় একটি ভূখণ্ড প্রাকৃতিক ক্রিয়াকলাপে (যেমন পর্বতজনি—orogeny-জনিত কারণ) ধীরে ধীরে আকারে বর্ধিত হয়ে মহাদেশে পরিণত হতে পারে। আধুনিককালে তেজস্ক্রিয় পদ্ধতিতে পাথরের বয়স নির্ণয় করে দেখা গেছে, মহাদেশগুলির কেন্দ্র অঞ্চলের পাথরের বয়স সবচেয়ে বেশী এবং প্রান্তভাগের দিকে শিলার আপেক্ষিক বয়স ক্রমশঃই কমে গেছে। সমস্ত মহাদেশটির অভিন্ন বয়স না হয়ে, বয়সের এই পর্যায়ক্রম লক্ষ্য করা যায়, কেমনভাবে বিভিন্ন ভূতাত্ত্বিক যুগে ক্ষুদ্রকায় প্রাচীন মহাদেশ ক্রমেই আকারে বেড়ে যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ ভারত বা ক্যানাডা ভূখণ্ডের উল্লেখ করা যায়, যেখানে মহাদেশ বা উপমহাদেশের মধ্যাঞ্চল থেকে প্রান্তদেশ পর্যন্ত একটি বয়ঃক্রম লক্ষ্য করা গেছে।

মহাদেশ ও মহাসমুদ্র সম্বন্ধে কেবলমাত্র বিজ্ঞানীদেরই নয়, সাধারণ মানুষেরও জিজ্ঞাসার অন্ত নেই। প্রযুক্তিবিদ্যার এক অবিস্মরণীয় অধ্যায়ে মর্তলোকের মানুষ পাড়ি দিয়েছে গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে। তবু ভাবতে আশ্চর্য লাগে, পৃথিবীর প্রকৃতি ও আকৃতির বৈচিত্র্য সম্বন্ধে নিশ্চয় করে এখনও পর্যন্ত কিছু বলা সম্ভব হয় নি।

হোলোগ্রাফ

নলিনীরঞ্জন চক্রবর্তী

হোলোগ্রাফ শব্দটির 'হোলো' অংশটি পাওয়া গিয়েছে গ্রীকভাষার 'Holos' শব্দ থেকে। এই শব্দটির অর্থ হলো সমগ্র বা 'Whole'। সুতরাং বলা যেতে পারে যে, হোলোগ্রাফ শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হচ্ছে সামগ্রিক অনুলিখন।

অভিনব আলোকচিত্র—হোলোগ্রাফ (Holograph) হচ্ছে এক নতুন কায়দার আলোকচিত্র। এই ব্যবস্থায় কোন বস্তু বা দৃশ্যের মৌলিক আকৃতিকে আলোক-তরঙ্গের এক সংকেতচিত্রে বন্দী করে রাখা হয় এবং পরে যে কোন সময়, বিশেষ বন্দোবস্তের সাহায্যে সেই অবরুদ্ধ আলোক-তরঙ্গগুলি যথাযথ পারম্পর্যে মুক্ত করে ঐ সংকেতমায়া থেকে মূল বস্তু বা দৃশ্যের অবিকল প্রতিকৃতি আবার সংগঠিত করা চলে। চোখে-দেখা আসল বস্তুর বাস্তব চেহারা ঠিক যেমনটি, এক্ষেত্রে প্রতিকৃতিও হয় অবিকল সেইরকম—নিখুঁত, সঠিক এবং শূন্যে নিরালম্বভাবে ভাসমান, আসলের সঙ্গে তার কোন তফাৎই বোঝা যায় না।

কোন ঘনবস্তু দেখবার সময় তার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা—এই তিনটি মাত্রাই (Three dimensions) নজরে আসে। আলোকচিত্রে এই তিন মাত্রার মাত্র দুটি, অর্থাৎ দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের প্রকাশটুকুই সম্ভব। দর্পণে দেখা প্রতিবিম্বে উক্ত তিনটি মাত্রাই প্রতীত হয়। সেজন্যে আয়নায় দেখা প্রতিবিম্বে যে গভীরতার বোধ পাওয়া যায়, আলোকচিত্রে ঠিক সেটি মেলে না। অবশ্য আলো-ছায়ার মায়া দিয়ে আলোকচিত্রে কিছুটা গভীরতার বোধ ফুটিয়ে তোলা যায় এবং চিত্র যত নিপুণ হয় এই গভীরতার বৈশিষ্ট্যও ততই সুপরিস্ফুট হয়। তবু কিন্তু কিছুটা খুঁৎ থেকেই যায়, চোখে-দেখা আসলটির মত হয় না। চোখে-দেখবার সময় মাথা ঘুরিয়ে, চোখ সরিয়ে ভিন্ন ভিন্ন কৌণিক অবস্থান থেকে দর্শক লক্ষ্যবস্তুর পাশ বা পিছনের অংশও কিছুটা দেখতে পান। একটির পিছনে আড়াল পড়া অন্যান্য জিনিষও নজর ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ঠাহর করতে পারেন। আলোকচিত্র, ত্রৈমাত্রিক চলচ্চিত্র বা স্টিরিও-স্লাইড প্রক্ষেপণ প্রভৃতি কোন পদ্ধতিতেই উক্ত সুবিধাগুলি পাওয়া যায় না। হোলোগ্রাফে এই অভাবগুলিই মেটে, যে জন্যে হোলোগ্রাফ শুধু ত্রৈমাত্রিক প্রতিকৃতিমাত্রই নয়, তার বেশী আরও কিছু।

হোলোগ্রাফির বিবর্তন—একুশ বছর আগে হোলোগ্রাফির পদ্ধতির প্রবর্তন করেন বৃটিশ টমসন হাউষ্টন কোম্পানীর একজন ইংরেজ বিজ্ঞানী, তাঁর নাম ডাঃ ডেনিস গ্যাবর (Dr. Dennis Gabor)।

গ্যাবর-তত্ত্ব ঘোষিত হবার পর এই বিষয়ে অনেক গবেষণা হয়, তবে যথেষ্ট জোরালো ও সুসঙ্গত (Intense, Coherent) আলোর অভাবে সেই সব গবেষণায় সন্তোষজনক ফল পাওয়া যায় নি। ১৯৬০ সালে মার্কিন বিজ্ঞানী থিয়োডোর. এইচ. মেইম্যান (Theodore. H. Maiman) প্রথম লেসার টর্চ তৈরি করতে সফলকাম হন। তখন থেকেই হোলোগ্রাফি তার গুরুত্ব পেল এবং গবেষণা সুরু হলো নতুন উদ্যমে। এইভাবে ১৯৬৩ সালে একদিন মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এমেট. এন. লেইথ (Emett. N. Leith) ও তাঁর সহকর্মীরা

ওয়াশিংটনে অপ্‌টিক্যাল সোসাইটি অব্‌ আমেরিকার এক সভায় তাঁদের তৈরি হোলোগ্রাফ থেকে প্রতিকৃতি প্রদর্শন করে সকলকে বিস্মিত করে দেন।

হোলোগ্রাফির ব্যবস্থার গঠনবিন্যাস সম্বন্ধে মোটামুটি একটা কাজচলা গোছের ধারণা ১নং চিত্র থেকে পাওয়া যেতে পারে। রশ্মি-বিভাজনী আধাআয়না দ্বারা (Half-

১নং চিত্র
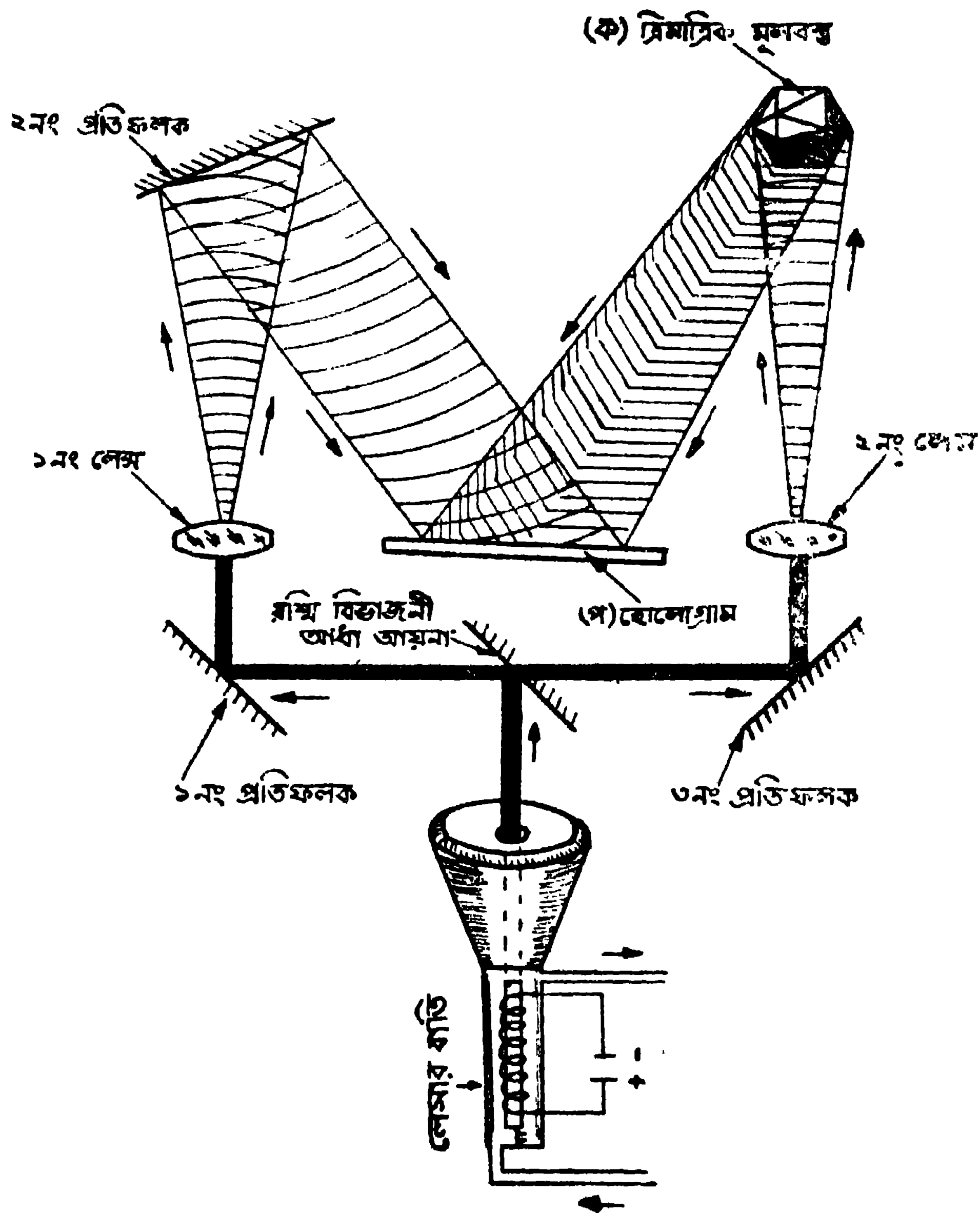
silvered beam splitter) দ্বিধাবিভক্ত লেসার-তরঙ্গের একাংশ ত্রৈমাত্রিক মূলবস্তুর (ক) গা থেকে প্রতিফলিত হয়ে অপবর্তিত তরঙ্গরূপে আপতিত হচ্ছে ফটোপ্লেটে। অন্য অংশটি প্রতিফলকগুলিতে প্রতিফলিত হয়ে ভূমি-

হোলোগ্রাফির ব্যবস্থার গঠন-বিন্যাস—হোলোগ্রাফের মর্মকথা নিহিত আছে আলোক-তরঙ্গের ব্যতিকরণ ও অপবর্তন তত্ত্বের (Interference and Diffraction) গূঢ়তায়। গণিততাত্ত্বিক সেই পর্যালোচনা অবশ্যই অনুশীলনসাপেক্ষ। তবে

তরঙ্গ রূপে (Referenee wave) ঐ একই ফটোপ্লেটে পড়ে।

এভাবে দু-দিক থেকে আসা তরঙ্গশ্রেণী ফটোপ্লেটের উপর অধ্যারোপিত (Superimposed) হয়ে এক জটিল ব্যতিকরণ নক্সা (Interference pattern) তৈরি করে। পরে ফটোপ্লেটটি পাকা করে নেওয়া হয় (Develope + fix)। এইভাবে তৈরি হলো যে প্লেট তাকে বলা হয় হোলোগ্রাম (Hologram)।

উক্ত হোলোগ্রাম থেকে মূলবস্তুর প্রতিকৃতি কেমন ভাবে পুনরায় সংগঠিত হয় (Wave-front reconstruction) ২নং রেখচিত্রে তাই অস্বচ্ছ। শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্রের দ্বারা পরীক্ষা করলে তার মধ্যে নানা রকম রেখা, বৃত্ত ও হিজিবিজি আঁকজোক দেখতে পাওয়া যায়। সেগুলির সঙ্গে মূল বস্তুর কোন সাদৃশ্য থাকে না বটে, তবু ঐ হোলোগ্রামের ব্যতিকরণ নক্সার মধ্যে লুকানো থাকে মূল-বস্তুর আকৃতি সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি। বিধিবদ্ধ পদ্ধতিতে হোলোগ্রাম রেকর্ডকে প্লে-ব্যাক করলেই তা থেকে মুক্তি পায় মূল বস্তুর প্রতিকৃতি।

৩নং ও ৪নং চিত্রে* একটি হোলোগ্রাম ও তাথেকে সংগঠিত প্রতিকৃতির আলোক-চিত্র দেওয়া হয়েছে। হোলোগ্রাম ও হোলোগ্রাফ
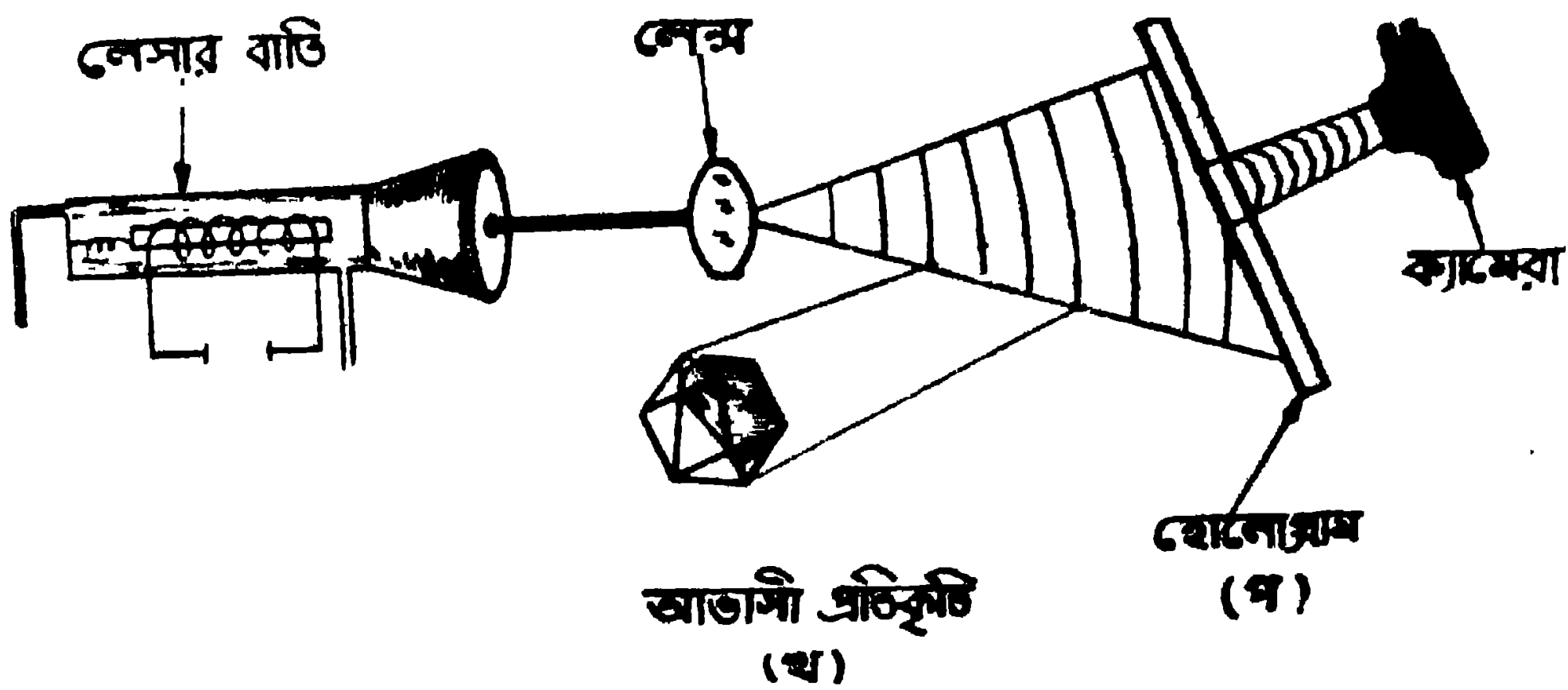
২নং চিত্র

দেখানো হয়েছে। পুনর্সংজনিত প্রতিকৃতির মধ্যে যেটি আভাসী (Virtual), তার প্রকাশ হয় শূন্যে নিরালম্ব ভাসমান অবস্থায়—ঠিক যেন জানালার কাচের ভিতর দিয়ে দেখতে-পাওয়া মূল বস্তুটি। হোলোগ্রামের অপর পাশে তৈরি হয় যে বাস্তব (Real) প্রতিবিম্বটি, সেটি চোখে তো দেখা যায়ই, আবার ক্যামেরাতেও ধরা যায়।

হোলোগ্রামের বৈশিষ্ট্য—হোলোগ্রাম প্লেটকে আলোর সামনে ধরলে যা দেখা যায়, তাথেকে মূল বস্তুর চেহারা সম্বন্ধে কোন আন্দাজই পাওয়া যায় না। হোলোগ্রাম প্লেট হয় ঘষা কাচের মত প্রায় সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা ঐ চিত্র দুটি থেকে পাওয়া যাবে।

হোলোগ্রাফির চলচ্চিত্র—রুশ দেশীয় অধ্যাপক ইউ. এন. ডেনিস্যুক (Yu. N. Denisyuk) ও

*মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাগারে গৃহীত ৩নং ও ৪নং চিত্র দুটি আধুনিক হোলোগ্রাফির পথিকৃৎ অধ্যাপক লেইথ-এর সৌজন্যে পাওয়া গিয়েছে। 'জার্নাল অফ দি অপটিক্যাল সোসাইটি অফ আমেরিকা'-র ইতিপূর্বে প্রকাশিত উক্ত চিত্র দুটি অধ্যাপক লেইথের বিশেষ অনুমতিক্রমে এই প্রবন্ধে ব্যবহৃত হয়েছে।

পোলারয়েড কর্পোরেশনের গবেষক ডাঃ হীরডেন—এই দু-জনে স্বতন্ত্রভাবে আবিষ্কার করেন যে, একটি হোলোগ্রাম প্লেটে একাধিক হোলোগ্রাম নেওয়া চলে। বিশেষ পদ্ধতিতে ঐ হোলোগ্রাম

৩নং চিত্র

রেকর্ডটি প্লে-ব্যাক করলে ঐ সব ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর চিত্র, আলাদা আলাদা ভাবে, যার যার প্রতিকৃতিতে একের সঙ্গে অন্যটিকে না মিশিয়ে পুনরুৎপাদন করা যায়।

উক্ত তত্ত্বের ইশারা ধরে অধ্যাপক এমেট. এন. লেইথ ও তাঁর সহকর্মীরা হোলোগ্রাফির চলচ্চিত্র নির্মাণের চেষ্টা করে চলেছেন। ইতিমধ্যেই তাঁরা সচল হোলোগ্রাফির চিত্র প্রদর্শন করেছেন। এক্ষেত্রে কাজ এভাবে চলতে থাকলে আশা করা যায় যে, শুধুমাত্র আলো-ছায়ার মায়া দিয়ে তৈরি যে পূর্ণাঙ্গ হোলোগ্রাফির চলচ্চিত্র আমরা অদূর ভবিষ্যতে দেখতে পাব, তাতে সেই চিরাচরিত 'ছবির রূপালী পর্দার' চিহ্নমাত্র থাকবে না। মঞ্চস্থ নাটকের অবিকল—নতায় শূন্যে মূর্ত হবে আগামী দিনের সেই নিরালম্ব, ভাসমান হোলোগ্রাফির চলচ্চিত্র। অভিনেতা-অভিনেত্রী থাকবে না, তবু দেখা যাবে আলো-ছায়ার তৈরি তাদের নিখুঁৎ সচল ত্রৈমাত্রিক ঘন প্রতিকৃতি। দর্শক চোখ সরিয়ে, মাথা হেলিয়ে যে কোন দৃশ্যে একের আড়াল

পর্দা অন্যান্য উপাদানও দেখতে পাবেন, ঠিক যেমনটি দেখা যায় রঙ্গমঞ্চের প্রকৃত অভিনয়ে।

বিজ্ঞানের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে হোলোগ্রাফের প্রয়োগ বিশেষ ফলপ্রসূ হয়েছে। পদার্থ-

৪নং চিত্র

হোলোগ্রাফির প্রযুক্তি—হোলোগ্রাফির পদ্ধতির বিবিধ প্রয়োগ ও প্রয়োগ-সম্ভাবনার সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে। বিশেষতঃ জীববিদ্যা ও চিকিৎসা-বিজ্ঞানের কয়েকটি প্রয়োজনীয় পরীক্ষায় হোলোগ্রাফির পদ্ধতির চূড়ান্ত প্রযুক্তি সফল হয়েছে। রুশ বিজ্ঞানী ডেনিস্যুক ও আই. বি. এম.

কর্পোরেশনের মার্কিন গবেষক ডাঃ কেইথ. এস. পেনিংটন (Dr Keith. S. Pennington), আলাদা আলাদা ভাবে রঙীন ত্রৈমাত্রিক হোলোগ্রাফ তৈরি করেছেন। আই. বি. এম-এর আর একজন গবেষক—ডাঃ লোম্যান, পদার্থ-বিজ্ঞানের নানা সূত্র কম্পিউটার মেশিনে ব্যবহারের উপযোগী ভাষায় অনূদিত করে—কম্পিউটার-নিয়ন্ত্রিত আলোক সম্পাতের সাহায্যে সেই সব সূত্রের হোলোগ্রাফ তুলতে চেষ্টা করছেন। এইভাবে অনেক অতীন্দ্রিয় দুরূহ তত্ত্বাদি প্রতিকৃতিতে অভাবনীয় রূপ পরিগ্রহ করে হয়তো দেখা দেবে আমাদের চোখে অদূর ভবিষ্যতে।

কালস্রোতে পৃথিবী

শ্রীমলয় চক্রবর্তী

পৃথিবীর বয়স কত—এই জিজ্ঞাসা মানুষের সুপ্রাচীন। কিন্তু এর সন্তোষজনক উত্তর জানা সহজ ছিল না। সাধারণের মনে যে ধারণা প্রচলিত ছিল তা সনাতন বিশ্বাসের ফল। যেমন, ভারতীয় পুরাণে উল্লেখ করা হয়েছে পৃথিবী দু-শ' কোটি বছরের পুরনো; আবার বাইবেলের মতে সৃষ্টির তারিখ হলো ৪০০৪ খৃষ্ট-পূর্বাব্দ এবং এই ধারণাই পশ্চিমী জগতে চালু ছিল। এই দুটি মতই কল্পনাপ্রসূত, যার স্বপক্ষে কোন বিজ্ঞানসম্মত প্রমাণ নেই। শুধুমাত্র এটুকু বলা যেতে পারে, কালের বিপুলত্ব সম্বন্ধে প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিকের মোটামুটি একটা বিশ্বাস ছিল।

বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে পৃথিবীর প্রাচীনত্ব নির্ণয়ের চেষ্টা আধুনিক বলা চলে। কালের প্রবাহে ভূপৃষ্ঠের উপর দিয়ে যে বিবর্তন ঘটেছে এবং আজও ঘটছে, তার বহু সাক্ষ্যই বিধৃত হয়ে আছে পৃথিবীর বহিরাবরণে, যার সঙ্গে রয়েছে আমাদের প্রত্যক্ষ পরিচয়। পৃথিবীর দেহের বেশ কিছুটা অংশ তৈরি হয়েছে থাকে থাকে সাজানো পলিপাথরের সুবিপুল স্তূপ দিয়ে। এর মধ্যে বিজ্ঞানীর সন্ধানী দৃষ্টি আবিষ্কার করেছে কালের স্বাক্ষর। আজকের সমুদ্রতলে কিংবা নদীর মোহনায় যে হারে পলি সঞ্চয় হচ্ছে, সেই হিসাবে ঐ ধরণের শিলাস্তর তৈরি হতে কত সময় লেগেছে, তা বের করবার প্রথম চেষ্টা করেছিলেন একজন ভূবিদ্ স্কটল্যাণ্ডের জেমস হাটন (১৭২৬-১৭৯৭ খৃঃ)। কিন্তু হিসাব করতে গিয়ে শেষ অবধি তিনি দেখলেন, এই শিলা সঞ্চয় হতে যে সময় লাগবার কথা, তা অকল্পনীয় দীর্ঘ। তাছাড়া পৃথিবীর বিবর্তনময় ইতিহাসের কোথায় যে শিলা সঞ্চয়ের সুরু, আর কোথায়ই বা শেষ, এর কোন সূত্র উদ্ধার করা সম্ভব নয়, এই মন্তব্য করে তিনি হাল ছেড়ে দিলেন। মজার কথা, এই ধরণের উক্তির জন্যে হাটনকে সেই যুগে অনেক বিরূপ সমালোচনা সহ্য করতে হয়েছিল। তাঁকে বলা হয়েছিল নাস্তিক এবং বাইবেলের সৃষ্টিতত্ত্বের বিরোধী, কেন না বাইবেলের মতে পৃথিবীর বয়স সাকুল্যে ছয় হাজার বছরেরও কম!

সৃষ্টির সময়ের উত্তপ্ত গলিত অবস্থা থেকে ধীরে ধীরে তাপ হারিয়ে আজকের কঠিন পৃথিবী তৈরি হয়েছে, এই মতবাদের ভিত্তিতে প্রখ্যাত পদার্থ-বিদ্ লর্ড কেলভিন ১৯শ শতকের শেষভাগে পৃথিবীর তাপহ্রাসের হার থেকে হিসাব করে রায় দিয়েছিলেন, পৃথিবীর বয়স হবে দুই থেকে চার

কোটি বছর। গাণিতিক বিচারে নির্ভুল হলেও কেলভিনের এই হিসাব ভূবিদ্‌দের কাছে যুক্তিসহ ছিল না। কারণ, তাঁদের অভিজ্ঞতায় শিলাস্তরের সাক্ষ্য থেকে পৃথিবীর বয়স হওয়া উচিত আরও বহুগুণ বেশী।

পুরা ছবিটা কিন্তু বদ্‌লে গেল রাতারাতি। নিতান্ত আকস্মিকভাবেই মণিকের মধ্যে আবিষ্কৃত হলো তেজস্ক্রিয়তা (১৮৯৮ খৃঃ), সেই সঙ্গে অবারিত হোল বিজ্ঞানের এক শ্রেষ্ঠ সম্ভাবনা—অমেয় কাল পরিমাপ করবার দুর্লভ সূত্র। দেখা গেল, কতকগুলি শিলা বা মণিকের মধ্যে পরিমাপ-যোগ্য পরিমাণে রয়েছে ইউরেনিয়াম, থোরিয়াম ইত্যাদি তেজস্ক্রিয় উপাদান, যা তাদের সৃষ্টির সময় থেকেই সুনির্দিষ্ট হারে স্বতবিক্রিয়াশীল; এর ফলে এরা ক্রমাগত অন্য উপাদানে (যেমন সীসা) পরিবর্তিত হয়ে চলেছে। এখন শিলা বা মণিকের মধ্যেকার তেজস্ক্রিয় আদি উপাদান এবং তার বিক্রিয়া বা ক্ষয়জাত অন্য উপাদানের অনুপাত যদি সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায়, তাহলে এই বিক্রিয়াকালের মোট দৈর্ঘ্য বের করা সম্ভব, আর তাই হবে মোটামুটিভাবে ঐ শিলা বা মণিকের বয়স। এইভাবে ভূপৃষ্ঠের প্রাচীনতম শিলার বয়স পাওয়া গেছে তিন-শ' কোটি বছর। সব মিলিয়ে পৃথিবীর নিজস্ব বয়স অনুমান করা হয়েছে প্রায় পাঁচ-শ' কোটি বছর।

সময়ের এই বিপুল বিস্তার সম্বন্ধে ধারণা করা আমাদের পক্ষে মোটেই সহজ নয়, বিশেষতঃ যেখানে আমরা দিন-মাস-বছরের হিসাবেই অভ্যস্ত। পৃথিবীর উপর দিয়ে কালের যে বিপুল স্রোত বয়ে গেছে, তার অন্তত তিন-শ' কোটি বছরের স্বাক্ষর রয়েছে তার শিলাদেহে। আবার আমাদের সামনেও অন্তহীন কালের স্রোত অপেক্ষমান, তার তুলনায় আমাদের সমগ্র মানব ইতিহাসই বা কতটুকু! ভূতাত্ত্বিক সাক্ষ্য এবং মণিকের তেজস্ক্রিয়তা তাই বিজ্ঞান-চেতনার মর্মমূলে বিপ্লব এনেছে বলা যায়। ধারণাতীত দীর্ঘ এই অতীতকালকে বিজ্ঞানীরা নাম দিয়েছেন ভূতাত্ত্বিক কাল (Geological Time)।

শিলাদেহ থেকে পরিবর্তনশীল পৃথিবীর সুদীর্ঘ ইতিহাসের ধারাবাহিক পাঠ উদ্ধার মোটেই সহজ নয়। এই অতীত চারণের কাজে সবচেয়ে মূল্যবান ভূমিকা নিয়েছে প্রাণের অবশেষ বা জীবাশ্ম, যাকে আমরা বলি ফসিল। জড় পৃথিবীর বুকে কি করে প্রথম প্রাণের অঙ্কুর এলো—এই রহস্যের সমাধান আজও হয় নি। তবে উদ্ভিদ এবং জীবের অবশেষবাহী প্রাচীনতম শিলাস্তরের বয়স বেরিয়েছে পঞ্চাশ কোটি বছর। ফসিলের সাক্ষ্য থেকে সম্ভব হয়েছে পৃথিবীর প্রাণময় অতীতের ক্রমবিভাগ রচনা এবং তৈরি করা হয়েছে ভূতাত্ত্বিক কালপঞ্জী (Geological Time Scale), যা নিবন্ধশেষে টেবিলের আকারে দেখানো আছে।

প্রাচীনতম ফসিলবাহী শিলাস্তর আজ থেকে পঞ্চাশ কোটি বছর আগে যে সময়কে চিহ্নিত করছে, ভূতাত্ত্বিক কালপঞ্জীতে তার নাম দেওয়া হয়েছে কেম্ব্রিয়ান যুগ (Cambrian Period)। দুর্ভাগ্যক্রমে এর আগের আড়াই-শ' কোটি বছরের ইতিহাস প্রায়-জীবাশ্মহীন, তাই কালের এই বৃহত্তম ভাগের ইতিহাস-পাঠ আমাদের কাছে সবচেয়ে শক্ত। এই দীর্ঘ কালসীমাকে বলা

হয়েছে প্রাক্-কেম্ব্রিয়ান মহাযুগ (Pre-Cambrian Era)। একটা কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে, পঞ্চাশ কোটি বছর আগের কেম্ব্রিয়ান যুগের শিলাস্তরে জীব এবং উদ্ভিদের যে অবশেষ পাওয়া গেছে, তাকে কোনমতেই আদিম বলা চলে না। প্রায় সব রকম অমেরুদণ্ডী প্রাণীরই অবশেষ পাওয়া গেছে এই যুগের শিলাস্তরে। কাজেই বিবর্তনের ধারায় সহজতর অবস্থা থেকে প্রাণের জটিলতর বিভাজন এবং বিশেষায়ণ আরও আগেই সুরু হয়েছিল—এমন মনে করাই সঙ্গত।

জীবাশ্ম-প্রমাণের ভিত্তিতে গত পঞ্চাশ কোটি বছরের কালকে ক্রমানুসারে তিনটি মহাযুগে (Era) ভাগ করা হয়েছে: পুরাজীবীয় (Palaeozoic Era), মধ্যজীবীয় (Mesozoic Era), নব্যজীবীয় (Kainozoic Era) মহাযুগ।

পুরাজীবীয় মহাযুগের প্রথম দিকেই মেরুদণ্ডী প্রাণীর আবির্ভাব ঘটে। এই সময়ে মাছের প্রধান শ্রেণীগুলি দেখা দিয়েছিল, যাদের কতগুলি বিবর্তনের ধারা বেয়ে আজও বেঁচে আছে। বিশেষভাবে উন্নত কিছু মাছের বংশধর থেকে উদ্ভূত হয়েছিল প্রথম স্থলজীবী মেরুদণ্ডী উভচর (Amphibian)। পুরাজীবীয় মহাযুগের শেষ ভাগে এদেরই আধিপত্য চলেছিল। এর পর টিকে থাকলেও এদের অগ্রগতি অনেক হ্রাস পেয়েছিল।

বিবর্তনের ধারায় উভচর থেকে এসেছিল সরীসৃপজাতীয় জীব (Reptile)। বেশ কয়েক কোটি বছর ধরে এরাই ছিল জীবজগতের সর্বেসর্বা। এদের পুরোধা ছিল অতিকায় ডাইনোসোর; মধ্যজীবীয় মহাযুগে স্থলের রাজা। বহু ধারায় বিবর্তনের ফলে এরা ছড়িয়ে পড়েছিল স্থলের নানা অংশে বিভিন্ন পরিবেশে। তার পর এক সময় রহস্যজনকভাবে এদের অবলুপ্তি ঘটলো।

ডাইনোসোরের অবলুপ্তির আগেই, এদের সুদীর্ঘ বিবর্তনময় ইতিহাসের গোড়ার দিকেই বলতে গেলে, সরীসৃপজাতীয় পূর্বপুরুষ থেকে এসেছিল মেরুদণ্ডীর দুটি বিশিষ্ট শাখা: পাখী এবং স্তন্যপায়ী জীব। প্রথমে ধীরে, তার পর দ্রুত এবং বহুধা বিবর্তনের ফলে এরা পরিণত রূপ পেয়েছিল। মধ্যজীবীয় মহাযুগের শেষ ভাগের মধ্যেই বিবর্তনের ধাপে ধাপে পাখীরা বেশ উন্নত হয়ে উঠেছিল। আর নব্যজীবীয় মহাযুগের গোড়ার দিকেই বিভিন্ন মহাদেশীয় অঞ্চলে এবং দ্বীপে প্রায় এখনকার চেহারা নিয়েই ছড়িয়ে পড়েছিল। মধ্যজীবীয় মহাযুগে স্তন্যপায়ীর বিকাশ ছিল ধীরগতি, কিন্তু নব্যজীবীয় মহাযুগে সুরু হলো এদের গৌরবময় জয়যাত্রা, বহু বিচিত্রভাবে এবং বিবর্তনের নানা ধারায়; আজও তা অব্যাহত। এই স্তন্যপায়ীর প্রধান গোষ্ঠী হিসাবে মানুষের আবির্ভাব নিতান্তই সাম্প্রতিক এবং তার বুদ্ধিদীপ্ত ক্রমিক অগ্রগতি মাত্র কয়েক লক্ষ বছরের ইতিহাস।

ভূতাত্ত্বিক কালপঞ্জী (Geological Time Scale)

মহাযুগ (Era)	মহাযুগের আরম্ভ-কাল, বছর পূর্বে	যুগ (Period)	প্রাণের বিকাশ
		বর্তমান (Recent)	
		প্লেইস্টোসিন (pleistocene)	
		প্লাইয়োসিন (Pliocene)	মানুষ
নব্যজীবীয় (Kainozoic)		মাইয়োসীন (Miocene)	
		ওলিগোসিন (Oligocene)	
		ইওসিন (Eocene)	ঘোড়া
	৭ কোটি	প্যালিওসিন (Palaeocene)	
মধ্যজীবীয় (Mesozoic)		ক্রিটেশাস (Cretaceous)	ডাইনোসরের বিলোপ
		জুরাসিক (Jurassic)	পাখীর আবির্ভাব
	২০ কোটি	ট্রায়াসিক (Triassic)	ডাইনোসরের আবির্ভাব
		পার্মিয়ান (Permian)	
		কার্বনিফেরাস (Carboniferous)	উভচর
পুরাজীবীয় (Palaeozoic)		ডেভনিয়ান (Devonian)	
	৫০ কোটি	সিলুরিয়ান (Silurian)	মাছ (প্রথম মেরুদণ্ডী)
		অর্ডোভিসিয়ান (Ordovician)	অমেরুদণ্ডী সামুদ্রিক প্রাণী (জীবাশ্মের প্রথম পর্যাপ্ত নিদর্শন)
		কেম্ব্রিয়ান (Cambrian)	
প্রাক্-কেম্ব্রিয়ান (Pre-Cambrian)	(প্রাচীনতম শিলার সৃষ্টি-কাল) ৩০০ কোটি	(যুগ হিসেবে যথাযথ ক্রমবিভাগ অসম্পূর্ণ)	আদিমতম অমেরুদণ্ডী ও এককোষী প্রাণী (জীবাশ্ম-প্রমাণ অপর্যাপ্ত)

জৈব ও অজৈব কম্পিউটার

গোপাল রায়

যন্ত্রের চিন্তা, যান্ত্রিক—যন্ত্র কিভাবে চিন্তা করে? চিন্তার পদক্ষেপগুলি যদি তর্ক ও গণিতশাস্ত্রের কতকগুলি ধরা-বাঁধা নিয়ম মেনে চলে, তবে তার প্রবাহটা হয় যান্ত্রিক। উচ্চতর গণিতশাস্ত্রের দুরূহ সমস্যার সমাধান, আবহাওয়ার বিভিন্ন সংকেত থেকে সেই সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী, রোগীর দেহের নানা লক্ষণ থেকে রোগ নির্ণয় প্রভৃতি কাজগুলি গণিত, আবহবিজ্ঞান ও শারীরবৃত্তের নানা সিদ্ধান্তকে নিখুঁৎভাবে মেনে চলে, অর্থাৎ যার মধ্যে অনুমান, আকস্মিকতা অথবা সৃজনশীলতার কোন স্থান নেই, সেই কাজগুলি যন্ত্রকে দিয়ে করানো যায়, তত্ত্বের দিক দিয়ে একথা অনস্বীকার্য।

চিন্তার পদ্ধতি ও মালমশলা—যদি জিজ্ঞাসা করা হয় ১৫৭১৯৪-এর সঙ্গে ৩৭২৫৮ গুণ করলে কত হবে, তবে এই গুণন-চিন্তার বিভিন্ন স্তরগুলি হবে কেমন?

(১) প্রথমে প্রশ্নটা কারো দ্বারা উপস্থাপিত হওয়া দরকার, যাতে শ্রবণেন্দ্রিয় বা দর্শনেন্দ্রিয় দিয়ে সংবাদটা মস্তিষ্কে পৌঁছতে পারে।

(২) গুণ বলতে কি বোঝায় এবং গুণনের যান্ত্রিক পদ্ধতি কি সেটা জানা দরকার এবং এই জ্ঞান স্মৃতির মাঝে আগে থেকে সঞ্চিত থাকা চাই। এই সঞ্চিত জ্ঞানটুকু যার নেই, তার পক্ষে এই গুণনের কাজটা করা সম্ভব নয়।

(৩) এবার এই জানা পদ্ধতির মাধ্যমে দিয়ে উপরের দুটি সংখ্যার গুণের কাজটা টেনে নিয়ে যাওয়া চাই।

(৪) এই পদ্ধতি যখন স্তরে স্তরে এগোতে থাকবে, তখন স্তরগুলির সময়বিন্যাস নিয়ন্ত্রণ করা চাই; অর্থাৎ কোন্ অঙ্কের সঙ্গে কোন্ অঙ্কের গুণ আগে হবে এবং পরে কোন্ অঙ্কের সঙ্গে সেটা যোগ করা হবে এবং তার পরেই বা কোন্টা করতে হবে প্রভৃতি স্তরগুলির সময়-ক্রম (Time-sequence) বজায় রাখা চাই। এ না হলে উত্তরে ভুল থাকবে।

(৫) নির্ধারিত উত্তর এবার প্রশ্নকর্তার কাছে পৌঁছে দেওয়া চাই।

ইলেকট্রনীয় পরিগণনযন্ত্রে ঠিক এই পাঁচটি অংশই আছে। প্রথম অংশটিকে বলা হয় অন্তর্গ্রহণ বিভাগ (Input section), দ্বিতীয়টিকে স্মৃতি (Memory), তৃতীয়টিকে পরিগণন বিভাগ (Arithmatic section), চতুর্থ অংশকে নিয়ন্ত্রণ বিভাগ (Control section) এবং পঞ্চম অংশকে বলা যায় ফলজ্ঞাপন বিভাগ (Output section)।

মস্তিষ্ক যা করতে পারে ইলেকট্রনীয় পরিগণন যন্ত্রও তাই করতে পারে, মস্তিষ্ক যা পারে না, পরিগণন যন্ত্রও তা পারে না। তফাৎ কেবল তাদের কাজের দ্রুততায়। বলা যায়, যে গুণে কাপড় বোনবার অথবা কাগজ তৈরির কল হাতে চালানো যন্ত্রকে ছাড়িয়ে গেছে, সেই একই গুণে পরিগণন যন্ত্রও মস্তিষ্ককে ছাড়িয়ে গেছে। কোন একটি যান্ত্রিক পদ্ধতির মাঝে সম-প্রকৃতির দ্রব্য উৎপাদন যন্ত্র করতে পারে অনেক নির্ভুলভাবে এবং পারে এক কল্পনাতীত দ্রুততায়। উদাহরণস্বরূপ Larc এবং Stretch পরিগণনযন্ত্রের নাম করা যায়। এর সময়-নির্দেশক পাল্সের বীপ্সা (Clocking-pulse frequency) সেকেণ্ডে ১০^{৭} বার। যে ধরণের

গাণিতিক সমাধানের ১৫ থেকে কুড়ি মিনিট সময় নেবার কথা, সেই রকমের চার পাঁচ লক্ষ প্রশ্ন ওই পরিগণনযন্ত্র সমাধান করে মাত্র এক সেকেণ্ডে।

কম্পিউটারের বুদ্ধি—আমাকে অথবা আপনাকে যে প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করা হোক না কেন, আমাদের মস্তিষ্কের কোষগুলিতে এই প্রশ্নের বৈদ্যুতিক তরঙ্গ (যা ইন্দ্রিয় স্থান থেকে সংবেদ-নার্ভ বেয়ে মস্তিষ্কে পৌঁছায়) দ্রুতবেগে সাঁতার কেটে বেড়ায় উত্তরের খোঁজে। বিভিন্ন সূত্রে সংগৃহীত জ্ঞানের বিভিন্ন অংশকে নানান পদ্ধতিতে জুড়ে অথবা ভেঙে উত্তর সৃষ্টির প্রচেষ্টা চলে। এই পদ্ধতির একটা গতিবেগ আছে। বুদ্ধিকে বলা যায় এই গতিবেগের ত্বরণ (Acceleration)। যার ত্বরণ বেশী তার বুদ্ধি বেশী এবং সে কম সময়ে উত্তর দিতে পারে। অন্তরকলনের (Differential calculus) সাহায্যে বলা যায় এই গতিবেগ যদি x হয় তবে বুদ্ধি (Intelligence) হয় dx/dt।

অবশ্য এটা ঠিক যে, বিভিন্ন পরিস্থিতিতে এই ত্বরণ বদ্‌লে যেতে পারে। বুদ্ধিমান মানুষ প্রেমে পড়লে বোকার মত ব্যবহার করে (আবার বোকা মানুষ প্রেমে পড়লে বুদ্ধিমান হয়ে যায়), সাহসী লোক বিপদে পড়লে অনেক সময় বুদ্ধি হারিয়ে ফেলে। মানুষের ক্ষেত্রে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে এই ত্বরণ মেপে তবে তার গড় বের করা দরকার। এই সংজ্ঞা অনুযায়ী কম্পিউটার মানুষের চেয়ে লক্ষগুণ বুদ্ধিমান এবং এত অসম্ভব বুদ্ধিমান বলেই কম্পিউটার এত অল্পসময়ে সমস্যার সমাধান করতে পারে।

আই-বি-এম ৬৫০ ও মস্তিষ্ক—যে কোন রকমের কথোপকথন, উত্তর-প্রত্যুত্তর, লেখা অথবা পড়া সম্ভব হয়, আমাদের মধ্যে আগের শিক্ষা ও অভিজ্ঞতাকে ধরে রাখবার ব্যবস্থা আছে বলেই। এই ব্যবস্থা অত্যন্ত জটিল এবং এখনও পুরোপুরি আমাদের জানার গণ্ডীর মধ্যে আসে নি। বহির্বিশ্বের সংবাদ আমাদের মধ্যে পৌঁছায় ইন্দ্রিয়-স্থানের মধ্য দিয়ে। এগুলি যেন শরীরের জানালা। এই জানালাগুলির পরিসর এত কম যে, বিশ্বের সমস্ত সংবাদের একটা নগণ্য অংশ আমরা পাই। এই সংবাদ আলো, শব্দ, তাপ, চাপ যে কোন রূপেই আসুক না কেন, ইন্দ্রিয়স্থানের দ্বার পথে যখন সংবেদ-নার্ভগুলিকে আঘাত করে তখন রূপান্তরিত হয় নানা আকারের বৈদ্যুতিক তরঙ্গে এবং ওই নার্ভগুলি বেয়ে মস্তিষ্কের সঞ্চয়-কেন্দ্রে পৌঁছায়। এই বিষয়ে প্রখ্যাত বিশেষজ্ঞ Atto Lowenstein বলেন—নার্ভগুলি আসলে নলের মত, যার ভিতরের ও বাইরের দেয়ালের মাঝে বৈদ্যুতিক চাপের তফাৎ আছে, যার পরিমাণ প্রায় ০·১ ভোল্ট। নলের ভিতর এক বিশেষ রাসায়নিক প্রক্রিয়া এই চাপ বজায় রাখে। যে কোন উত্তেজনায় এই ভোল্টেজের পরিমাণ ও দিক ক্রমাগত বদ্‌লাতে থাকে এবং বৈদ্যুতিক চাপের এই দোলা নল-বেয়ে তরঙ্গের আকারে ছুটতে থাকে। সঞ্চয় কেন্দ্রের নাম কর্টেক্স (Cortex)। গুরু মস্তিষ্কের ধূসর অংশ হলো এই কর্টেক্স, যা নীচের দিকে Rolando ও Sylvius বিভাজক রেখা পর্যন্ত নেমে এসেছে। সংকেত সঞ্চয়কারী কোষগুলির নাম নিউরোন (Neuron)। কর্টেক্সের মধ্যে এই নিউরোনের সংখ্যা প্রায় ১৪০০০,০০০,০০০-এর মধ্যে, অনেক কোষই ছোট এবং অপরিণত, যা ভবিষ্যৎ ব্যবহারের জন্যে সঞ্চিত থাকে। কারণ নিউরোনগুলি কোষ-বিভাজন প্রক্রিয়ায় দিনে দিনে বেড়ে চলে না, প্রাণীর জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এদের সংখ্যা সমানই থাকে। শরীরের বিভিন্ন অংশ থেকে সংবাদ সংগ্রহ ও তার পরিচালনার জন্যে পুরো কর্টেক্সটি ছোট অফিসে ভাগ করা—রাইটার্স বিল্ডিংস-এর বিভাগীয় অফিসগুলির মত।

এখন প্রশ্ন হলো—এই বৈদ্যুতিক তরঙ্গগুলি কিভাবে নিউরোনের মধ্যে অনুরূপ লিপি রেখে

দেয়। প্রথমেই স্বীকার করা ভাল, নিশ্চিতভাবে কিছু আমরা জানি না—নানারকম মত আছে ঐ সম্পর্কে। Genetic-coding-এ RNA, Ribosomes, DNA ও তার চারটি অংশ (Adenine, Cytosine, Guanine ও Thymine) যে ভাবে অংশ নেয়, নিউরোনের মধ্যে সম্ভবতঃ সেই একই প্রক্রিয়ায় কাজ চলে না, তবে দুটির মধ্যে কিছু সামঞ্জস্য থাকতেও পারে। যুক্তরাজ্যের একজন বিজ্ঞানী Dr. Samuel Barondes ইঁদুরের উপর পরীক্ষা করে সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, নিউরোনগুলির মধ্যে স্মৃতির সংকেত রয়ে যায় এক রকমের প্রোটিন-সংশ্লেষণের (Protein synthesis) ফলে। তিনি ইঁদুরের দেহে Acetoxycyclo heximide ইঞ্জেকশন দেন, যা সাময়িকভাবে প্রোটিন-সংশ্লেষণ বন্ধ করতে পারে। পরীক্ষায় দেখা গেছে, ইঞ্জেকশনপ্রাপ্ত ইঁদুরগুলির স্মৃতি ঘণ্টা তিনেক পরে দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে, অথচ ইঞ্জেকশন না-দেওয়া ইঁদুরগুলির স্মৃতি আগের মত আছে।

স্মৃতির এই লিখন পদ্ধতি যতই দুর্বোধ্য হোক না কেন, এর চেয়েও বড় একটা বিস্ময় এর মধ্যে লুকিয়ে আছে। ঘটনার বিভিন্ন অংশগুলি দেশ ও কালের (Space and time) বিন্যাস বজায় রাখে কি ভাবে? নিউরোনের সঙ্কেত লিপিগুলি যেন সিনেমার প্রোজেক্টর, যা ইচ্ছে করলেই বাস্তব দৃশ্যের অথবা ঘটনার একটা আত্মমুখী প্রতিবিম্ব (Subjective image) ফুটিয়ে তুলতে পারে এবং এই প্রতিবিম্ব দেশ ও কালের বিন্যাস অবিকৃতভাবে বজায় রাখে। ধরা যাক, সকালে উঠেই আমি বোনকে দেখলাম, তারপর মাকে। 'আগে বোন পরে মা' সময়ের এই ব্যবধান কিভাবে লিপিবদ্ধ হয়? দেশ ও কাল যা উভয়ই বিমূর্ত, তার লিপিকরণ নিঃসন্দেহে আরোও দুর্বোধ্য। এই সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান খুবই সীমাবদ্ধ।

কিন্তু প্রকৃতির এই নিগূঢ় কলাকৌশল পুরাপুরি জানবার জন্যে মানুষ অপেক্ষা করে নি। আই-বি-এম ৬৫০ কম্পিউটারের সঙ্গে মস্তিষ্কের একটা তুলনামূলক চিত্র খাড়া করবো বলে মস্তিষ্কের সংকেত-লিপি সম্পর্কে আমি এত কথা বললাম। এই বিশেষ কম্পিউটারে স্মৃতির কেন্দ্র হিসাবে যেটা কাজ করে, তা ১৬ ইঞ্চি লম্বা ও ৪ ইঞ্চি ব্যাসের একটা চোঙ, তার উপর কোবাল্ট-নিকেলের প্রলেপ দেওয়া। এক সঙ্গে ২০০০ সংখ্যা এই স্মৃতির কেন্দ্রে জমিয়ে রাখা যায়। এক সারিতে ৫০টা সংখ্যা, মোট ৪০টা কলাম আছে চোঙের উপর, এছাড়াও নীচের দিকে জায়গা আছে চোঙের অবস্থান নির্দেশক সূচক সংখ্যাগুলির জন্যে। প্রতিটি সংখ্যার মধ্যে ১০টি করে অঙ্ক থাকতে পারে এবং প্রতিটি অঙ্ক লেখবার জন্যে সাতটি করে সঙ্কেত-কণা (Bits of information) দরকার হয়। সুতরাং মোট দু-হাজার সংখ্যার প্রতিটির জন্যে ৭০টি করে সঙ্কেত-কণা দরকার হয়। এ ছাড়াও একটি কণা বেশী লাগে ধন অথবা ঋণ চিহ্ন নির্দেশের জন্যে। প্রতিটি সঙ্কেত-কণা হতে পারে ০ অথবা ১; স্মৃতিকেন্দ্রের একটি ক্ষুদ্র অংশ চুম্বকায়িত হলে সঙ্কেত-কণা ১ আর না হলে সঙ্কেতকণা হলো শূন্য। শূন্য এবং একের সাহায্যে যে কোন অঙ্ক লেখা যায়, এটা বীজগণিতের একটা বিশেষ শাখা—সেই পদ্ধতি এখানে কাজে লাগানো হয়েছে। সুতরাং দু-হাজার সংখ্যার প্রতিটি লেখা হয়েছে এক ও শূন্যের সত্তরটি সঙ্কেত-কণা দিয়ে, স্মৃতির কেন্দ্রে যার অর্থ হলো বিন্দুগুলি চুম্বকায়িত অথবা নিষ্ক্রিয় (Neutral)।

এবার এই সংখ্যাগুলিকে ব্যবহার করে গাণিতিক সমস্যার সমাধান করতে হবে। মানুষের মধ্যে যে চৈতন্যময় সত্তা (Conscious self) আছে সে এই কাজটা পরিচালনা করে; কম্পি-

উটারের মধ্যে তেমন কেউ নেই বলে, তাকে বাইরে থেকে নির্দেশ দিতে হয়। এর নাম 'কার্যসূচী' তৈরি করা (Programming), যা সাঙ্কেতিক অবস্থায় কম্পিউটারকে জানিয়ে দেয়—কি করতে হবে এবং কেমন করে করতে হবে।

যে কম্পিউটার নিয়ে আমি আলোচনা করছি, তার ক্ষেত্রে নির্দেশবাহী এই আদেশপত্রের কাজ করে একটা কার্ড; দৈর্ঘ্যে ৭২/৪ ইঞ্চি এবং প্রস্থে ৩১/৪ ইঞ্চি। আটটি সংখ্যা এর উপর লেখা যায়, প্রতিটিতে ১০টি করে অঙ্ক থাকতে পারে। পুরো আটটি সংখ্যাই যদি লেখা হয়, তবে দেখা যাবে ৮০টি ছিদ্রের সৃষ্টি হয়েছে, এটা করা হয় পাঞ্চিং মেশিনে। এবার এই কার্ডটি কম্পিউটারের অন্তর্গ্রহণ বিভাগে ঢুকিয়ে দিলেই তার উপর দিয়ে একটা বিদ্যুৎ-পরিবাহী ব্রাশ (Brush) ঘষে চলে যায়। কার্ডটি স্বয়ং অন্তরকের (Insulator) কাজ করে, কিন্তু ছিদ্রগুলির মধ্য দিয়ে বিশেষ বিশেষ সার্কিট সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং যন্ত্রের মধ্যে প্রয়োজনীয় কাজের প্রবাহ সৃষ্টি করে। বিদ্যুৎগতিতে এই প্রবাহ চলতে থাকে বলেই এত অকল্পনীয় কম সময়ে কম্পিউটার সমস্যার সমাধান করতে পারে।

এখানে আরও একটি কথা পরিষ্কার করে বলা দরকার। ধরা যাক, আমি একদিন শেয়ালদার কাছে ট্রামপোড়ানো দেখেছিলাম। মস্তিষ্কের একটা বিশেষ অংশে এই দৃশ্য সঞ্চিত হয়ে রইলো। যখন ঘটনাটা মনে করবার দরকার হবে, তখন সেই বিশেষ অংশটা চৈতন্যময় সত্তা নিজেই খুঁজে নেয়, তাকে ঠিকানা বলে দিতে হয় না। কম্পিউটার এটা পারে না বলে তাকে স্মৃতির ঠিকানা (Momery address) বলে দিতে হয়।

এবার একটা ছোট উদাহরণ দেওয়া যাক। মনে করা যাক, কার্ডের আটটি সংখ্যার মধ্যে প্রথমটি হলো ১০,০২৫১,০০১০ ; কমা দিয়ে এটাকে আমি তিন ভাগে ভাগ করেছি। প্রথম ভাগকে (অর্থাৎ এখানে ১০) বলা হয় Operation Code, যা কম্পিউটারকে সাংকেতিক ভাষায় জানিয়ে দেয় 'কি করতে হবে'। ১০-এর অর্থ হলো কার্ডখানা পড়, ঠিক তেমনি ১০-এর অর্থ হলো যোগ কর, ১৯-এর অর্থ হলো গুণ কর, ১৪-অর্থ হলো ভাগ কর ইত্যাদি। এর একটা নির্দিষ্ট তালিকা আছে। দ্বিতীয় চারটি অঙ্ক (অর্থাৎ ০২৫১) হলো স্মৃতির ঠিকানা, যেখান থেকে সুরু করে কম্পিউটার প্রয়োজনীয় তথ্য (মোট ৮টি সংখ্যা হতে পারে) জমিয়ে রাখবে। শেষ চারটি অঙ্ক (অর্থাৎ ০০১০)ও স্মৃতির ঠিকানা, যা কম্পিউটারকে পরবর্তী কাজের নির্দেশ দেবে।

আদেশপত্র দেওয়া হয় কম্পিউটারের অন্তর্গ্রহণ বিভাগে (Input section)। সেখান থেকে সুরু করে কাজের প্রবাহটা কেমন চলে তা ১নং চিত্রে দেখানো হয়েছে। ২নং চিত্রে স্মৃতি ও পরিগণন বিভাগের বিস্তারিত অংশ দেখানো হলো।

ধরা যাক, ছয়টি যোগ, গুণ ও ভাগ সমন্বিত একটা প্রশ্ন কম্পিউটারকে করা হলো, যার প্রতিটি সংখ্যায় ৮।৯টি করে অঙ্ক আছে। প্রথমে কম্পিউটার সংখ্যাগুলি স্মৃতির কেন্দ্রে (General Storage) জমিয়ে ফেলবে। যোগের বেলায় একটা সংখ্যা নামিয়ে আনবে Distributor-এ, অন্যটা Upper Accumulator-এ, যোগফলও Upper Accumulator-এ ফুটে উঠবে। গুণের বেলায় গুণিতক থাকবে Upper Accumulator-এ, গুণনীয়ক থাকবে Distributor-এ, গুণফল ফুটে উঠবে Upper ও Lower Accumulator জুড়ে। পুরা কাজটির এই সব স্তরগুলি বিদ্যুৎগতিতে একের পর এক পেরিয়ে যাবে।

বুলিয়ন-বীজগণিতের উপপাদ্যের উপর ভিত্তি

করে এই স্তরগুলির জন্যে যে অনুরূপ ইলেক্‌ট্রিক্যাল ইলেকট্রনিক সার্কিটের সৃষ্টি হয়েছে, তার আলোচনা এই ছোট প্রবন্ধে সম্ভব নয়। এখানে শুধুমাত্র গাণিতিক প্রশ্ন ও তার সমাধানের কথা আলোচনা করা হলো। কাজের প্রকৃতি জটিল হলে কম্পিউটারের গঠন ও কার্যসূচী জটিল হবে, তবে সব প্রশ্নই কম্পিউটার সমাধান করবে তার নিজস্ব সংখ্যাসূচক সাংকেতিক ভাষায়, কারণ আর কোন ভাষাই সে বোঝে না। আর প্রথমেই বলেছি কাজের প্রকৃতিটা হতে হবে যান্ত্রিক, যার প্রতিটি স্তর গাণিতিক অথবা তর্কশাস্ত্রীয় শৃঙ্খলে বাঁধা, যার মধ্যে অনুমান, আকস্মিকতা অথবা সৃজনশীলতার কোন স্থান নেই।

১নং চিত্র

আবেগপ্রবণ কম্পিউটার (Imotional Computer)—এই রকম কম্পিউটার তৈরি সম্ভব হতে পারে কি? কম্পিউটার প্রতিটি প্রশ্নের যা উত্তর দেয়, তা যুক্তিসিদ্ধ ও নিয়মসম্মত। কিন্তু বাস্তব জীবনে দেখা যায় যে, লোভ, ঈর্ষা, রাগ, ভাবাবেগ প্রভৃতি যুক্তিসম্মত উত্তরগুলিকে বদলে দেয়। পেটরোগা ছেলে লোভে পড়ে নিষিদ্ধ খাবার খাওয়াই ঠিক মনে করে; আমাদের কলেজের পাশে দু-জন টাইপিষ্ট বসে, একজন বৃদ্ধ আর একটি তরুণী। আমার ছাত্রদের দেখেছি টাইপ করবার দরকার হলেই তরুণীটির কাছে নিয়ে যায়, যদিও বৃদ্ধ মোটেই খারাপ টাইপ করে না। যদি কম্পিউটারের মধ্যে একটা আলাদা Imotional Unit সৃষ্টি করা যায় এবং কোন রকমে তার মধ্যে লোভ, ঈর্ষা প্রভৃতি আবেগগুলি সঞ্চিত থাকে এবং তা যদি প্রতিটি স্তরে কম্পিউটারের কর্মপ্রবাহের উপর হস্তক্ষেপ করে, তবে আমরা একটা আবেগপ্রবণ কম্পিউটার পেতে পারি। এই কল্পনা যতই অলীক হোক না কেন, মস্তিষ্কের মধ্যে সত্যই এটা ঘটে।

মনোবিজ্ঞানে জেমস-লেন্‌জ্‌ উপপাদ্য বলে, প্রতিটি ভাবাবেগের সঙ্গে জড়িয়ে আছে কিছু পেশীসংক্রান্ত চাঞ্চল্য। এই পেশীসংক্রান্ত চাঞ্চল্য নিয়ন্ত্রিত হয় স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুপুঞ্জের (Autonomic nervous system) দ্বারা, যাদের কেন্দ্র মস্তিষ্কের একটি বিশেষ অংশে নিহিত। এই বিশেষ অংশটির নাম Hypothalamus। এটা মধ্য মস্তিষ্কের (Inter brain) অংশ। আধুনিক

শারীরবৃত্তের ছাত্রেরা বিশ্বাস করেন, Hypothalamus ভাবাবেগগুলির সঞ্চয়কেন্দ্র। কিন্তু এখানেও সেই একই দুর্বোধ্য প্রশ্ন রয়ে যাবে। ভাবাবেগগুলি বিমূর্ত। কি ভাবে তা সঞ্চিত হয় এবং কিভাবেই বা এগুলি কর্টেক্সের ক্রিয়াকলাপকে প্রভাবিত করে?

সৃজনশীল কম্পিউটার (Creative Computer)—পরিকল্পনা, পরিচালনা প্রভৃতি উচ্চতর মানসিক কাজগুলির ক্ষেত্রে ছোট ছোট ঘটনা ও অভিজ্ঞতাকে বিচিত্র পদ্ধতিতে জুড়ে প্রায়ই নতুন সিদ্ধান্তে চলে যেতে হয়। এই কাজগুলির জন্যে মস্তিষ্কে দুটি কেন্দ্র আছে বলে মনে করা হয়। এর একটির নাম সংঘক্রিয়া পদ্ধতি (Collective type), যার কর্মকেন্দ্র কর্টেক্সের পিছন দিকটাতে। সেখানে প্রতিটি নিউরোনের সঙ্গে অনেকগুলি Axon যুক্ত, যেগুলি দিয়ে বিভিন্ন প্রকারের বৈদ্যুতিক তরঙ্গ একই নিউরোনে এসে জমা হচ্ছে এবং নার্ভের স্বতন্ত্র ইম্পাল্‌স্‌-গুলিকে জুড়ে একটি নতুন চিত্র রচনা করছে। দ্বিতীয়টির নাম বিভাগক্রিয়া পদ্ধতি (Distributive type) এর কর্মকেন্দ্র গুরুমস্তিষ্কের (Cerebrum) সামনের দিকটাতে (Frontal lobe)। এখানকার নিউরোনগুলিরও অনেকগুলি করে Axon, যা দিয়ে একটি তরঙ্গ বিভিন্ন পথে ভাগ হয়ে যায়। এই ধারণাগুলি যদিও খুবই চিত্তাকর্ষক, কিন্তু প্রমাণ করা দুরূহ।

সৃজনশীলতা যে যুক্তির সিঁড়ি অতিক্রম করে না, এই ধারণা পুরাপুরি ঠিক নয়। নিউটনকে যদি জিজ্ঞাসা করা হতো—'পৃথিবীর যে মাধ্যাকর্ষণ আছে একথা আপনার কি করে মনে হলো', অথবা আইনষ্টাইনকে যদি জিজ্ঞাসা করা হতো—'কোন বস্তু অথবা ব্যক্তি যদি বিভিন্ন গতিবেগে চলতে থাকে, তবে তার ভর ও সময় জ্ঞান যে বদলে যায়, এই কথাই বা আপনার কি করে মনে হলো'; তবে এর উত্তরে নিশ্চই তাঁরা বলতে পারতেন না—'এমনিই মনে হলো।' প্রতিটি ক্ষেত্রেই মনে হবার মত কিছু কিছু কারণ ঘটেছিল। তবুও একথা ঠিক, গাছ থেকে ফল পড়তে দেখে সকলের মনেই মাধ্যাকর্ষণের কথা জাগে না। এর থেকে বোঝা যায়, তাঁদের চিন্তাশক্তি, অনুভব করবার বিশেষ ধরণ, বহু লোকের মতামতের বিরুদ্ধে নিজের নিঃসঙ্কোচ মতটাকে

২নং চিত্র

অভ্রান্ত বলে দীর্ঘদিন জাগিয়ে রাখবার মত আত্মবিশ্বাস ও অন্যান্য মানসিক বৃত্তির গড়ন সাধারণের চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা এবং এগুলির মধ্যে সৃজনশীলতা যে কেমন করে বাসা বেঁধে থাকে তার অবিসংবাদিত বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা দেওয়া কঠিন।

আত্মমুখী অভিক্ষেপ (Subjective Projection)—আগেই বলেছি, নিউরোনগুলি যেন সিনেমার প্রোজেক্টর, যা সংগৃহীত অভিজ্ঞতার একটি আত্মমুখী প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করতে পারে। সহজ কথায় একে আমরা বলি স্মরণ করা বা মনে করা। মনযোগ যেন সার্চলাইট, যাকে নিয়ন্ত্রণ করে ইচ্ছা (Will)। এই সার্চলাইট যে নিউরোনগুলির উপর পড়ে, সেগুলিই কেবল প্রতিবিম্বের সৃষ্টি করে, অন্যগুলি তাদের সেলুলয়েডের ফিতে গুটিয়েই রাখে। বিষয়মুখী (Objective) নিউরোনগুলি থেকে আত্মমুখী এই প্রতিবিম্বের সৃষ্টি—এটিই মস্তিষ্কের ক্রিয়াকলাপের সবচেয়ে জটিল ও দুর্বোধ্য অংশ। উচ্চতর সমস্ত মানসিক গুণ, যেমন—সৃজনশীলতা, আত্মোৎসর্গের প্রেরণা, রসানুভূতি (Aesthetic appreciation), তুরীয় অনুভূতি (Transcendental feelings) প্রভৃতি সবকিছুই নির্ভর করে এই জটিল রহস্যময় প্রক্রিয়ার উপর।

উপসংহার—জৈব ও অজৈব কম্পিউটারের কাজ যে গণিত ও তর্কশাস্ত্রের অপরিবর্তনীয় নিয়মাবলী চালনা করে, তার মধ্যেও দুটি ধারণাতীত সংখ্যা রয়েছে—নেগেটিভ ও পজিটিভ ইনফিনিটি—দর্শনের ভাষায় আদি ও অন্ত। এই দুটি প্রান্তই রহস্যময়, মাঝখানের দেশ ও কালে সীমাবদ্ধ স্থানটুকুতে বস্তু ও শক্তির নানা রূপান্তরের খেলা। এই রূপান্তর কতকগুলি নিয়ম-শৃঙ্খলা মেনে চলে—আর সেগুলিই হলো বিজ্ঞানের নানা শাখার সূত্রাবলী। এইগুলির সাহায্যে একটি বৃহত্তর পরিসরে জগৎ ও জীবনকে বোঝা সম্ভব হয়েছে।

সঞ্চয়ন

অবক্ষয়ের সমস্যা

মানুষের দৃষ্টির অন্তরালে ভূমির অবক্ষয় ঘটছে। বহু উর্বর জমি ধীরে ধীরে বন্ধ্যা হয়ে যাচ্ছে। আজকের সুজলা-সুফলা বিরাট প্রান্তর অদূরকালেই মরুভূমিতে পরিণত হচ্ছে। লেবাননের বেইরুটস্থিত আমেরিকান ইউনিভার্সিটির ভূমি-সংরক্ষণ-বিজ্ঞানী ডাঃ ভেন ভিনসেন্ট এই সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন।

আমেরিকার উত্তর ক্যারোলিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমি-বিজ্ঞান বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডাঃ র‍্যালফ জে. ম্যাকক্র্যাকেন আবার এ-প্রসঙ্গে বলেছেন—পৃথিবীর গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলে লক্ষ লক্ষ একর অনাবাদী জমি পড়ে রয়েছে। এ সকল জমি আবাদ করলে, পতিত জমিতে চাষবাস করলে বহু ক্ষুধার্ত জনের অন্নের সংস্থান হতে পারে।

দুটি অভিমতই গ্রহণযোগ্য। পৃথিবীর উন্নতিশীল রাষ্ট্রসমূহে ভূমি অবক্ষয়জনিত বিপদ সম্পর্কে ডাঃ ভিনসেন্ট বলেছেন—যেখানে এককালে ছোটখাটো খাল ও নদীনালার সাহায্যে ভূমিতে জলসেচন করে চাষবাস করা হতো, ফসল ফলানো হতো, সেখানকার জমি বন্ধ্যা হয়ে গেলে সাধারণতঃ মানুষ ঐ সকল নদী নালাকেই

বন্ধ্যাত্বের কারণ বলে মনে করে থাকে। কিন্তু তাদের দৃষ্টির অন্তরালে জমির প্রকৃতি বদলে যাচ্ছে, কাদামাটি কলয়ডে রূপান্তরিত হচ্ছে। এই আঠালো মাটিই বন্ধ্যাত্বের কারণ

উন্নতিশীল রাষ্ট্রসমূহে যে পদ্ধতিতে চাষ-আবাদ এবং যে পরিমাণ ফসল উৎপন্ন হয়ে থাকে, জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্যে তার চেয়েও বেশী ফসল উৎপাদনের ও জমির সীমিত উৎপাদনশক্তি আরও বাড়াবার জন্যে চাপ আসছে। ফসলের উৎপাদনশক্তি বাড়াতে হলে মাটি নিয়ে গবেষণা চালাতে হবে। তার জন্যে প্রয়োজন অর্থ, কারিগরী-বিজ্ঞানী এবং যথেষ্ট সময়ের। এর কোনটাই এদের নেই। কৃষি-বিজ্ঞানের উন্নতির জন্যে তারা আর অপেক্ষাও করতে পারছে না। এই সকল দেশে যে দুর্ভিক্ষের কালোছায়া ঘনায়মান, তাতে কোন সন্দেহ নেই। তবে সমস্যাদি সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধান করতে হবে, পর্যালোচনা করতে হবে, বিশেষ পন্থা অবলম্বন করতে হবে—এখনও তার সময় আছে।

এই সকল পন্থার মধ্যে আছে, প্রথমতঃ কোন দেশে এবং অন্যান্য রাষ্ট্রে যে সকল ফসল উৎপন্ন হয়ে থাকে সেই সকল ফসলকে এবং মাটি নিয়ে আজ পর্যন্ত যে সকল গবেষণা হয়েছে সে সকল বিভিন্ন শ্রেণী অনুযায়ী বিভক্ত করতে হবে। দ্বিতীয়তঃ কম্পিউটার যন্ত্রে এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তাদের মধ্যে কোন মিল রয়েছে কিনা, তা নির্ধারণের জন্যে সে সকল বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করে দেখতে হবে। তৃতীয়তঃ মাটির বন্ধ্যাত্বের যে সকল কারণ নির্ণয় করা যায় নি, সে সম্পর্কে গবেষণা চালাতে হবে। গবেষণার ফলাফল ও সিদ্ধান্ত কার্যকরি করবার উদ্দেশ্যে এবং অবক্ষয় দূর করবার পথ নিরূপণের জন্যে সম্ভব হলে বিভিন্ন কৃষি ফাউণ্ডেশানের সাহায্য নিতে হবে।

ডাঃ ভিনসেন্টের কৃষি পরিকল্পনা এবং ভূমি-অবক্ষয় সম্পর্কে কুড়ি বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে। আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্য অঞ্চলে তিনি এই অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন। তিনি বলেছেন যে, পৃথিবীর বহু অঞ্চলেই এই সম্পর্কে একই বিষয়ে গবেষণা চালিয়ে পরিশ্রম, সময় ও অর্থের অপচয় ঘটানো হচ্ছে। বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রকমের গবেষণা চালানো হলে এই অপচয় দূর করা যেত এবং বহু তথ্যানুসন্ধান সম্ভব হতো। তিনি এই প্রসঙ্গে ভুট্টা উৎপাদনে নাইট্রোজেন সারের প্রয়োগ নিয়ে বিভিন্ন দেশে যে একই গবেষণা চলছে তার উল্লেখ করেন এবং বলেন যে—এই সকল গবেষণার সংখ্যা কয়েক শ' হবে।

ভূমি সম্পর্কে এ-পর্যন্ত যত তথ্য সংগৃহীত হয়েছে, যত প্রকার গবেষণা হয়েছে, সে সকল তথ্য ও গবেষণার ফলাফল কম্পিউটার যন্ত্রের সাহায্যে সংগ্রহ করবার জন্যেও তিনি সুপারিশ করেছেন।

ভূমি-অবক্ষয় সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ ও পর্যালোচনার পক্ষে কম্পিউটার যন্ত্র খুবই সহায়ক হতে পারে। তিনি বলেন—দ্রুত কাজ সম্পন্ন হলে বিশেষ করে উন্নতিশীল রাষ্ট্রসমূহ এই যন্ত্রের সাহায্যে মাত্র তিন বছরের মধ্যে সারা মধ্যপ্রাচ্য এলাকার কোন্ কোন্ অঞ্চলে জল সংরক্ষণ করা প্রয়োজন, তা নিরূপণ করা যাবে এবং কোন্ কোন্ এলাকায় ভূমি-অবক্ষয়ের সম্ভাবনা রয়েছে, তাও মানচিত্রের সাহায্যে জানা যাবে।

তিনি এই প্রসঙ্গে উন্নতিশীল রাষ্ট্রসমূহের ভূমি-সমস্যা সম্পর্কে এই সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন যে, ইতিমধ্যেই ঐ সকল দেশে জমির প্রচুর ক্ষয়-ক্ষতি হয়ে গিয়েছে। এই অবক্ষয় রোধ করতে হলে এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সমস্যার সমাধান করতে হলে এই বিষয়ে আশু ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন। এখনও সময় আছে এবং এই সকল ব্যবস্থা কার্যকরী করবার জন্যে যে সম্পদের প্রয়োজন, এখনও তাদের তা রয়েছে। নতুবা ঐ সকল দেশের কৃষির ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন।

বিশিষ্ট কৃষি-বিজ্ঞানী ডাঃ ম্যাক্ক্র্যাকেন পৃথিবীর ভূমির অবস্থা ও ভূমি সম্পদ সম্পর্কে কিন্তু অনেকখানি আশা পোষণ করেন। তিনি বলেন—সম্প্রতি সমগ্র পৃথিবীর ভূমি-বিজ্ঞানীরা খুবই উৎসাহিত হয়েছেন। গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলে বর্তমানে ১৯ কোটি একর জমিতে চাষ হয়ে থাকে। প্রয়োজন হলে আরও ১০০ কোটি একর জমিকে চাষের আওতায় নিয়ে আসা যেতে পারে। কিন্তু বর্তমানে দেখা যাচ্ছে, গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলে এর প্রায় দ্বিগুণ পরিমাণ চাষযোগ্য ভাল জমি রয়েছে।

যারা স্বল্পোন্নত রাষ্ট্রসমূহের বিরাট এলাকা জুড়ে দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা করছিলেন, এই আবিষ্কার তাদের সেই আশঙ্কা দূর করতে এবং দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন সাধনে সাহায্য করছে।

তারপর অনেকেই মনে করতেন যে, গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলের বেশীর ভাগ জমিই বন্ধ্যা, অনুর্বর। এই সকল জমিতে লৌহ এত বেশী যে, বন-জঙ্গল সাফ করে চাষ-আবাদ করলেও তাতে ফসল ফলবে না এবং কিছুদিন পরেই সেই জমি পাথরে পরিণত হবে।

কিন্তু পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে একথা সত্য নয়। গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলের বেশীর ভাগ জমির মূলে রয়েছে আগ্নেয়গিরি—এই সব জমি তাজা ও টাট্কা। আবহাওয়ার টানাপোড়েন এতে পড়ে নি। এই সকল জমির পুষ্টিবিধানের যে ক্ষমতা রয়েছে, তা আমেরিকার বহু অঞ্চলের জমিতেই নেই। তবে তার জন্যে চুন আর সার, বিশেষ করে ফস্ফরাস সার এই সকল জমিতে প্রয়োগ করতে হবে।

উত্তর ক্যারোলিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে আন্তর্জাতিক ভূমি-পরীক্ষা কার্যসূচী অনুসারে পৃথিবীর গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলের ভূমি নিয়ে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা হচ্ছে এবং ফসল উৎপাদন সম্পর্কে ঐ জমিতে যে সকল দোষ-ত্রুটি হয়েছে, তাও দূর করার ব্যবস্থা হচ্ছে। রাষ্ট্রসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার উদ্যোগে সমগ্র পৃথিবীর ভূমি সম্পর্কে একটি পূর্ণ মানচিত্র তৈরিরও ব্যবস্থা হয়েছে। ডাঃ ম্যাক্-ক্র্যাকেন এই মানচিত্র সম্পর্কে বলেছেন—পৃথিবীর যে কোন অঞ্চলের ভূমিসম্পদ সম্পর্কে তথ্যাদি এই মানচিত্র থেকে পাওয়া যাবে এবং ভবিষ্যতে পৃথিবীর খাদ্যোৎপাদনের পরিমাণ সম্পর্কেও এই মানচিত্র থেকে কিছুটা আঁচ করা যাবে।

সিঙ্কোনার ইতিকথা

অঞ্জলি রায়

আজকাল আমরা ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে অনেক কিছুই বলতে পারি। ম্যালেরিয়ার বীজাণুকে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখতে পাই। এই বীজাণু কেমন করে মানুষকে সংক্রামিত করে, কি ভাবে মশককুলকে ধ্বংস করে ম্যালেরিয়ার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় ইত্যাদি অনেক তথ্যই আমাদের জানা। তাছাড়া ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধক কুইনাইন আজ আমাদের হাতের কাছে এবং এই ওষুধ যে সিঙ্কোনা নামে এক প্রকার গাছের ছাল থেকে তৈরি হয়, তাও আমরা প্রায় সবাই জানি। কিন্তু এই গাছের জন্মভূমি যে দক্ষিণ আমেরিকা, সেকথা হয়তো আমাদের অনেকেরই জানা নেই। বহু শতাব্দী আগে যখন ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক তথ্য কিছুই জানা ছিল না, যখন পৃথিবীর বহু অঞ্চলে শত শত মানুষ এই রোগে মারা পড়তো, আরো হাজার হাজার মানুষ মৃতপ্রায় হয়ে বেঁচে থাকতো, সেই যুগে দক্ষিণ আমেরিকার রেড ইণ্ডিয়ানেরা কেমন করে বন্য এক-রকম গাছের ছালের মধ্যে ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধক ক্ষমতার সন্ধান পেয়েছিল, সেকথা ভাবলেও আশ্চর্য হতে হয়। বস্তুতঃপক্ষে এই রেড ইণ্ডিয়ান-দের কাছ থেকে ধার করা বিদ্যাই পরবর্তীকালে শিক্ষিত মানুষকে কুইনাইন আবিষ্কারে সাহায্য করে। কিন্তু কি ভাবে কুইনাইনের ব্যবহার দক্ষিণ আমেরিকার স্পেনিস উপনিবেশগুলি থেকে ক্রমে পৃথিবীর সর্বত্র প্রচলিত হয়, সেই রোমাঞ্চকর ইতিহাসের বিস্তৃত বিবরণের সঙ্গে আমাদের অনেকেরই পরিচয় নেই।

ম্যালেরিয়া রোগের উল্লেখ অতি প্রাচীন ইতিহাসেও দেখতে পাই। খৃষ্টের জন্মের বহু আগেও যে পৃথিবীতে কোন কোন অঞ্চলে এই রোগের প্রাদুর্ভাব ছিল, তার পরিচয় আমরা ইতিহাসে পাই। কথিত আছে গ্রীক সম্রাট আলেকজাণ্ডার যখন বিশ্বজয়ের পথে ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন, তখন তাঁর সুবিশাল সৈন্যবাহিনীর একাংশ এই ম্যালেরিয়া রোগাক্রান্ত হয়েই দুর্বল হয়ে পড়েছিল। তিনি নিজেও পরে এই রোগেই দেহত্যাগ করেন। সে সময়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বহু অঞ্চল জুড়ে এই রোগের বিস্তার ছিল এবং পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলের অধিবাসীদের কাছে উপরিউক্ত অঞ্চল-গুলি ছিল যেন এক বিভীষিকার রাজ্য। সেই যুগে কিন্তু এই রোগের নাম ম্যালেরিয়া ছিল না, এগু (Ague) বলেই সর্বত্র অভিহিত হতো।

যা হোক, দক্ষিণ আমেরিকার ইউরোপীয় মিশনারীরাই সর্বপ্রথম লক্ষ্য করেন যে, এগু রোগে রেড ইণ্ডিয়ানেরা স্থানীয় এক গাছের ছালকে ওষুধ হিসাবে কাজে লাগায়। ১৬৩৩ খৃষ্টাব্দে কালাঞ্চা (Calancha) নামে এক পাদ্রী দেখতে পান যে, লোক্সা, লিমা, পেরু প্রভৃতির নিকটবর্তী অঞ্চলের অধিবাসীরা fever tree নামে পরিচিত এক প্রকার গাছের বাদামী রঙের ছালকে গুঁড়া করে এই রোগের সময়ে জলের সঙ্গে গিলে খায়; ফলে আশ্চর্যজনকভাবে তারা এই রোগ থেকে সেরে ওঠে। উৎসাহিত হয়ে তখন মিশনারীরা দক্ষিণ আমেরিকার সভ্যসমাজে এই ছালের প্রচলনে উদ্যোগী হন। কিন্তু তাঁদের সেই চেষ্টা মোটেই ফলবতী হয় নি, কারণ তখনকার শিক্ষিত সমাজ, বিশেষতঃ চিকিৎসকেরা অশিক্ষিত রেড ইণ্ডিয়ান-দের রীতিনীতিকে সম্পূর্ণ অবজ্ঞার চোখে দেখতে অভ্যস্ত ছিলেন।

জানা যায় পেরুর বড়লাট কাউন্ট অব সিঙ্কোনই সর্বপ্রথম ইউরোপে এগু রোগ প্রতি রাধে এই ছালের প্রচলনের চেষ্টা করেন এবং তাঁরই নামানুসারে fever tree-র নতুন নামকরণ হয় সিঙ্কোনা গাছ। কিন্তু ইউরোপের চিকিৎসক সমাজ থেকে বাধা আসায় তিনিও এই কাজে বেশী দূর অগ্রসর হতে পারেন নি। রেড ইণ্ডিয়ানদের ব্যবহৃত পদ্ধতির গুণাগুণ বিচার করে দেখবার মানসিক প্রস্তুতি সেখানকার চিকিৎসকদের তখনও ছিল না। অতঃপর আরো কয়েকজন পাদ্রীর প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবার পর যিনি এই কাজে এগিয়ে এলেন, তিনি একজন ইংরেজ চিকিৎসক, নাম রবার্ট ট্যালবর। ট্যালবরই সর্বপ্রথম চিকিৎসক, যিনি তাঁর কাছে আনীত রোগীদের এই ছালের সাহায্যে সুস্থ করে তুলতে লাগলেন। চিকিৎসক হিসাবে তাঁর এই সফলতা সমকালীন চিকিৎসকেরা কেহই সুনজরে দেখেন নি, এমন কি অনেকেই তাঁকে ডাইনী বলেও আখ্যা দিতে থাকে। কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ তাঁর চিকিৎসার সফলতার ফলে ক্রমেই তাঁর রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং ইউরোপের বহু রাজপরিবার থেকেও তাঁর ডাক আসে। এক সময়ে তাঁর রোগী হয়ে এলেন ইংল্যাণ্ডের রাজা দ্বিতীয় চার্লস। ট্যালবর তাঁকে সুস্থ করে তোলেন এবং পুরস্কারস্বরূপ ইংলণ্ডেশ্বর রোগমুক্ত হয়ে তাঁকে নাইট উপাধিতে ভূষিত করেন। রাজানুকূল্য লাভ করবার পর স্বভাবতঃই ট্যালবরের জনপ্রিয়তা চতুর্গুণ বৃদ্ধি পায় এবং ইউরোপের চিকিৎসক সমাজের স্বীকৃতিলাভের পথেও তখন আর কোনও বাধা থাকে না।

ভারতবর্ষেও সে সময়ে ম্যালেরিয়ার অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব ছিল। দ্বিতীয় চার্লস ভারতে এই ছালের প্রচলনে সচেষ্ট হলেন। এদিকে দ্বিতীয় চার্লসের স্ত্রী ছিলেন পর্তুগীজ রাজকুমারী এবং পর্তুগীজ রাজকুমারীকে বিবাহ করে যৌতুকস্বরূপ দ্বিতীয় চার্লস বোম্বাই লাভ করেন। সেই সূত্রে ইংরেজেরা ভারতের পর্তুগীজ উপনিবেশগুলিতেও এই ছালের প্রচারের অধিকার লাভ করে। এই ভাবে দক্ষিণ আমেরিকা থেকে ক্রমে ইউরোপ ও পরে এশিয়ায় সিঙ্কোনার ছালের ব্যবহার বিস্তার লাভ করে এবং এই ব্যাপক প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে এইসব অঞ্চলের মানুষ নিজ নিজ অঞ্চলে সিঙ্কোনা চাষের প্রয়োজনীয়তাও উপলব্ধি করতে থাকে। কিন্তু হলে কি হবে, সিঙ্কোনার জন্মভূমি দক্ষিণ আমেরিকা তখনও বাইরের জগতের সম্পূর্ণ অগম্য স্থান। বিশেষতঃ সে সময়ে সেখনকার স্পেনিশরা দক্ষিণ আমেরিকার বন্দরগুলিতে বিদেশীদের যাতায়াত কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত করতো। এমনি সময়ে ১৭৩৫ খৃষ্টাব্দে একদল ফরাসী বৈজ্ঞানিক দক্ষিণ আমেরিকার বিষুবরেখা সন্নিহিত অঞ্চলের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি সম্বন্ধে গবেষণা করবার অনুমতি নিয়ে সেদেশে আসেন। এঁরা সকলেই ছিলেন ভূবিজ্ঞানী। কিন্তু সৌভাগ্য বশতঃ সেই দলে যোসেফ জুসিউ (Joseph Jussieu) নামে একজন কর্মচারী এসেছিলেন, যাঁর উদ্ভিদ-বিজ্ঞানের উপর সহজাত এক অনুরাগ ছিল। সাত বছর পরে সেই বৈজ্ঞানিকদল যখন দেশে ফিরে যান জুসিউ রয়ে গেলেন সেই রেড ইণ্ডিয়ানদের রাজ্যে। তাঁর উদ্দেশ্য, দেশে ফেরবার আগে সিঙ্কোনা সম্বন্ধে সবিশেষ জ্ঞান অর্জন করা, অর্থাৎ কোথায় কোন্ পরিবেশে এই গাছ জন্মায়, কেমন দেখতে, কি ভাবে এই ছালকে ব্যবহার করা হয় ইত্যাদি যাবতীয় তথ্য জোগাড় করে নেওয়া। তাঁর মনে আর এক বাসনাও উঁকি দিচ্ছিল। কে জানে, হয়তো সিঙ্কোনার উপর এই গবেষণাই তাঁকে একদিন দেশের বৈজ্ঞানিক মহলের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান ফরাসী অ্যাকাডেমির সভ্যপদ অলঙ্কৃত করবার সম্মান এনে দেবে। জুসিউ পূর্ণ বৈজ্ঞানিক মনোভাব

নিয়ে দক্ষিণ আমেরিকার বনে-প্রান্তরে ঘুরে সংগ্রহ করতে লাগলেন সিঙ্কোনা সম্বন্ধে তথ্য এবং সব কিছুই তিনি এনে রেখে দিতেন এক কাঠের বাক্সে। এইভাবে বছর ঘুরতে লাগলো জুসিউও যৌবন থেকে বার্ধক্যের দিকে এগোতে লাগলেন, আর ওদিকে তাঁর বাক্সও পূর্ণ হতে লাগলো। কিন্তু স্থানীয় যে চাকরটি তাঁর সেবা করতো, তার সর্বদাই সন্দেহ হতো তার মনিব না জানি কি মহামূল্যবান জিনিষ বছরের পর বছর ধরে সঞ্চয় করে যাচ্ছেন ঐ বাক্সে। অবশেষে সুদীর্ঘ ২৫ বছর পরে জুসিউ যখন তাঁর কাজ প্রায় শেষ করে এনেছেন এবং দেশে ফেরবার জন্যে তৈরি হচ্ছেন তখন আর সেই চাকরটি লোভ সামলাতে না পেরে একদিন সেই বাক্সটি নিয়ে উধাও হলো বনে, ভেঙ্গে দেখতে কি সে সম্পত্তি। বাক্স ভাঙ্গতে দেখা গেল শুধুই কতকগুলি কাগজ, ডাল, পাতা ইত্যাদি। ভগ্নোমনোরথ হয়ে সেগুলি সে সেখানেই ফেলে রেখে পালিয়ে যায়। ওদিকে বৃদ্ধ বৈজ্ঞানিকের তখন কি অবস্থা! তাঁর এতদিনের পরিশ্রম ও স্বপ্ন এক নিমেষে ধূলিসাৎ! তারপর তাঁর সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছু জানা যায় নি; শুধু জানা যায় দীর্ঘ ১০ বছর বনে বনে সেই চাকর ও কাঠের বাক্সের নিষ্ফল অনুসন্ধানের পর অবশেষে যখন দেশে ফিরে আসেন জুসিউ, তখন সে শোকে অর্ধ পাগল।

অতঃপর যিনি এই ব্যাপারে প্রয়াসী হলেন, তিনি একজন স্পেনিশ যুবক, নাম যোসি মিউটিস (Jose Mutis)। মিউটিস এই গাছের সন্ধানে এসে উপস্থিত হন বর্তমান কলম্বিয়াতে, যার তখনকার নাম ছিল New Kingdom of Granada। প্রকৃতপক্ষে মিউটিস ছিলেন একজন চিকিৎসক, কিন্তু উদ্ভিদ-বিজ্ঞানের উপর ছিল তাঁর জন্মগত অনুরাগ। মিউটিসের জন্ম স্পেনের কাডিজ বন্দরে। ছেলেবেলা থেকে তিনি দেখতেন সেই বন্দর থেকে নিয়মিত পণ্য-সম্ভার নিয়ে নূতন মহাদেশ ও স্পেনের মধ্যে জাহাজ যাতায়াত করছে, আর এই সব জাহাজের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বালক মিউটিস স্বপ্ন দেখতেন তিনিও যাবেন কোন একদিন ঐ জাহাজে করে সেই নূতন মহাদেশে। বড় হয়েও মিউটিস তাঁর বাল্যস্বপ্ন ভোলেন নি। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে উদ্ভিদবিদ্যার উপর অনুরাগও তাঁর ক্রমশঃ বাড়তে থাকে। চিকিৎসাবিদ্যায় পারদর্শিতা অর্জন করলেও তাঁর একমাত্র চিন্তা দাঁড়ালো কবে এবং কিভাবে ঐ নূতন মহাদেশের উদ্ভিদ নিয়ে গবেষণা আরম্ভ করতে পারবেন। সুযোগ খুঁজছিলেন তিনি এবং অবশেষে সেই সুযোগ এল। গ্রানাডের বড়লাট প্রস্তাব দিলেন যে, তাঁর ব্যক্তিগত চিকিৎসক নিযুক্ত হয়ে যদি মিউটিস দক্ষিণ আমেরিকায় আসতে রাজী থাকেন, তাহলে তিনি নিজেই মিউটিসকে তাঁর স্বপ্ন সার্থক করবার সবরকম সুযোগ-সুবিধা করে দেবেন। মিউটিস এই প্রস্তাব লুফে নিলেন ও একদিন এসে উপস্থিত হলেন তাঁর স্বপ্নপুরী দক্ষিণ আমেরিকায়। কিন্তু কালক্রমে দেখা গেল, মিউটিস যে উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছেন, তার কিছুই হচ্ছে না। কার্যকালে বড়লাট তাঁর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছেন। মানসিক এক যন্ত্রণায় দিনের পর দিন মিউটিস

অধীর হয়ে ওঠেন। অবশেষে অনেক আশা নিয়ে তিনি স্পেনের রাজা তৃতীয় চার্লসের কাছে সবিস্তারে এক চিঠি লেখেন। তাঁর সাম্রাজ্য দক্ষিণ আমেরিকা যে নানা মূল্যবান গাছগাছড়ায় সমৃদ্ধ এবং একমাত্র দেশ, সেখানে সিঙ্কোনার মত এতবড় মানব-কল্যাণকর গাছ জন্মায়, পত্রে তার উল্লেখ করে তিনি আবেদন করেন যাতে সেই অঞ্চলের উদ্ভিদসমূহের পূর্ণ বিবরণ জগৎ সমীপে উদ্‌ঘাটন করবার অনুমতি তাঁকে দেওয়া হয়। কিন্তু সামান্ত একজন চিকিৎসকের আবেদন স্পেন সম্রাটের মনে কোনও রেখাপাত করে না। এদিকে বয়স গড়িয়ে যায়, কিন্তু মিউটিস তখনও সিঙ্কোনার চিন্তায় মগ্ন। এমন সময় তিনি একজন পণ্ডিত পাদ্‌রীর সান্নিধ্যে আসেন, যাঁর কাছে তিনি তাঁর স্বপ্নের কথা ব্যক্ত করেন। পাদ্‌রী লোক চেনেন। তিনি মিউটিসকে স্বপ্ন চরিতার্থ করবার সুযোগ করে দিলেন; তাঁরই চেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হলো Botanical Institute Of New Granada। মিউটিস তখন কয়েকজন সহকর্মী নিয়ে পূর্ণোদ্যমে সেখানে কাজে লেগে যান এবং জীবনের শেষদিন পর্যন্ত গবেষণায় রত থেকে অবশেষে ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন।

ইতিমধ্যে সিঙ্কোনার মাহাত্ম্য পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়ে পড়তে সুরু করে। ফরাসীরাও এই ব্যাপারে উদ্যোগী হয়ে উঠতে থাকে। এমনি —ক-জন ফরাসী বৈজ্ঞানিক সিঙ্কোনার ছাল থে‹ কুইনাইন ও সিঙ্কোনাইন নামে ছুটি রাসায়নি‹ পদার্থ পৃথকীকৃত করে ফেলে প্রমাণিত রেন যে, সিঙ্কোনার ছালের মাহাত্ম্য এদের মধ্যেই নিহিত। এবার বড়ির আকারে কুইনাইনের প্রচার সুরু হলো এবং রোগীরাও ছালের গুঁড়ার চেয়ে কুইনাইনের বড়িকে সাদর অভ্যর্থনা জানালো। ক্রমে যতই চিকিৎসায় কুইনাইনের ব্যবহার বৃদ্ধি পেতে লাগলো, পৃথিবী জুড়ে তার চাহিদাও তত বাড়তে থাকে এবং পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ তাদের নিজ নিজ দেশে সিঙ্কোনার গাছ জন্মাবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে সুরু করে। ফলে দক্ষিণ আমেরিকায় তখন এই গাছের বীজ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে নানা জাতির পদার্পণ সুরু হয়। কিন্তু দক্ষিণ আমেরিকার অধিবাসীদের কাছে ততদিনে এই গাছের মূল্য স্বীকৃত হয়ে গেছে। স্বভাবতঃই তারা চায় নি তাদের দেশ থেকে এমন মূল্যবান একটি গাছের বীজ বিদেশীরা এসে নিয়ে যাক। কাজেই বিদেশীদের অনেক ছলচাতুরীর আশ্রয় গ্রহণ করে সেখান থেকে এই বীজ সংগ্রহ করতে হতো। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে স্প্রুশ (Spruce) নামে একজন ইংরেজ যুবক আমাজন অঞ্চলে আসেন। তিনি সেই গহন বনে নানা দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে ও বহু বিপদের ঝুঁকি নিয়ে সিঙ্কোনার বীচি সংগ্রহ করে ইংল্যাণ্ডে পাঠাতে থাকেন এবং পরে কিছু বীজ ভারতবর্ষ, সিংহল ও জাভাতেও পাঠাবার ব্যবস্থা হয়। এই ভাবে দক্ষিণ আমেরিকার বনে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে জীবন হাতে নিয়ে সুদীর্ঘ ২০ বছর কাটিয়ে স্প্রুস যে আত্মত্যাগের পরিচয় দেন, তার ফলেই সিঙ্কোনা বৃটিশ সাম্রাজ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ স্প্রুসের এত পরিশ্রম খুব ফলবতী হয় নি।

কালক্রমে দেখা যায় যে, তাঁর আনীত গাছ থেকে বেশী পরিমাণ কুইনাইন তৈরি করা যাচ্ছে না, তখন গেলেন চার্লস লেজার (Charles Ledger) নামে আর একজন ইংরেজ যুবক, সবচেয়ে ভালজাতের সিঙ্কোনার বীচি সংগ্রহের উদ্দেশ্যে। লেজার ওদেশে গিয়ে স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে আন্তরিকভাবে মেলামেশার চেষ্টা করেন। কিন্তু যতই আন্তরিকতা তিনি দেখান না কেন, তাঁর উদ্দেশ্যের কথা জানতে পেরে তারা তাঁকে সন্দেহের চোখে দেখতে আরম্ভ করে। কিছুতেই তারা লেজারকে ভাল গাছের সন্ধান দেয় না। কিন্তু লেজারের এক রেড ইণ্ডিয়ান ভৃত্য ছিল, নাম ম্যানুয়েল (Manuel)। সে দীর্ঘ ১৮ বছর প্রভুর সেবা করে এসেছে এবং মনিবকে সে খুবই ভালবাসতো। সে চাইতো কোন প্রকারে লেজারকে সাহায্য করতে, কিন্তু ওদিকে স্বজাতির ভয়েও সে সন্ত্রস্ত। এই সাহায্যের কথা কোনমতে একবার জানাজানি হলে তার নিজের দেশের লোকেরা তাকে কেটে দু-টুক্‌রো করে ফেলবে। তবু লেজার যখন প্রকৃত গাছের সন্ধানে হয়রান এবং কোন ভাবেই তার হদিস পাচ্ছেন না, তখন একদিন ম্যানুয়েল হঠাৎ চলে যায় বহু দূরে এক সিঙ্কোনার বনে, তার স্বজাতীয়দের মাঝখানে। সেখান থেকে আবার একদিন অতর্কিতে সে ফিরে আসে ৪ বছর পরে তার মনিবের কাছে কোন এক শীতকালে, দীর্ঘ ৮০০ মাইল দুর্গম পথ অতিক্রম করে এবং উপহার দেয় তার সুদীর্ঘ চুলের মাঝে লুকিয়ে আনা ভাল জাতের সিঙ্কোনার বীচি। কিন্তু তার এই প্রভুভক্তির জন্যে তাকে চরম দণ্ড পেতে হয়; বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধে তার স্বজাতীয়রা তাকে প্রাণদণ্ড দেয়। এই ভাবে প্রাণের বিনিময়ে ম্যানুয়েল যে বীচি লেজারের হাতে তুলে দেয়, লেজার সেই বীচি নিয়ে ফিরে আসেন ইংল্যাণ্ডে এবং ইংরেজ সরকার সেই বীচিই পরে পাঠান ভারতবর্ষ, সিংহল ও জাভাতে। এই সব অঞ্চলে বর্তমান যে সিঙ্কোনার চাষ হয়, তা ম্যানুয়েলের জীবনের বিনিময়েই পাওয়া।

কুইনাইনের বড়ি আজকাল পৃথিবীর সর্বত্র সহজলভ্য। কিন্তু একথা স্বীকার করতেই হবে যে, অসংখ্য লোকের আত্মত্যাগের ফলেই এই মূল্যবান জিনিষ আজ আমাদের হস্তগত হয়েছে। দক্ষিণ আমেরিকার এই সমস্ত অঞ্চল বর্তমান যুগে অনেক সহজগম্য; কিন্তু যখন এই বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে ছিল গহন বন, সেখানে বিরাজ করতো মৃত্যুর বিভীষিকা, সেই সময়েও শুধুমাত্র মানব-কল্যাণের প্রেরণার বশেই মানব-দরদীরা বছরের পর বছর মৃত্যুকে হাতে নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে এই বনে সিঙ্কোনার সন্ধানে। স্প্রুস, লেজার প্রভৃতির মত বিদেশীদের নামের সঙ্গে ম্যানুয়েলের মত আরও অনেক রেড ইণ্ডিয়ানের নামও কুইনাইনের ইতিহাসের সঙ্গে হয়তো জড়িত আছে।

চাঁদে গিয়ে লাভ কি ?

অলকরঞ্জন বসুচৌধুরী

কিছুদিন আগে মাদ্রাজের একটি সভায় বিশিষ্ট বিজ্ঞানী সার সি. ভি. রামন বলেছিলেন যে, কোটি কোটি ডলার খরচ করে মহাকাশ অভিযানের কোন সার্থকতা নেই, যখন পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষের দৈনন্দিন বাঁচবার সমস্যারই সমাধান হয় নি। এ ছাড়াও তাঁর ঐ বক্তৃতায় মহাকাশ-বিজ্ঞান সম্পর্কে তিনি অন্যান্য যে সব নানা মন্তব্য করেছিলেন, সেগুলি বাদ দিলেও এথেকে অন্ততঃ একটি ব্যাপার খুব স্পষ্ট হয়ে ওঠে, সেটি হলো জনসাধারণের মনের একটি স্বাভাবিক জিজ্ঞাসা—চাঁদে যাবার চেষ্টা করে লাভ কি? মহাকাশে মানবমনীষা ক্রমশঃই যত চমকপ্রদ ক্রিয়াকাণ্ড ঘটাচ্ছে, ততই এই প্রশ্ন সোচ্চার হয়ে উঠেছে। বিখ্যাত ব্যঙ্গচিত্রকর ভিকি তাঁর আঁকা একটি ছবিতে দেখিয়েছেন এক-দিকে একটি রকেট উঠে যাচ্ছে মহাকাশে, পাশেই নিরন্ন, দরিদ্র মানুষ শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। ইঙ্গিতটা খুবই স্পষ্ট—সেই একই প্রশ্ন। কোটি কোটি ডলার চন্দ্রাভিযানে খরচ না হলেই সেটা যে বুভুক্ষুর মুখে অন্ন জোগাবার কাজে ব্যয়িত হবে, এর কোন নিশ্চয়তা আছে কিনা সে প্রশ্ন করবো না, আমরা শুধু দেখাবার চেষ্টা করবো যে, মহাকাশ-বিজ্ঞানের অগ্রগতি সত্যসত্যই মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সমস্যা সমাধান করছে এবং অদূর ভবিষ্যতে তা মানুষের মুখে অন্নও জোগাতে পারে এবং পারে আরও অনেক এমন কিছু সম্পদ মানুষকে এনে দিতে—যাতে সেই কোটি কোটি ডলার সুদে-আসলে উঠে আসবে।

ছাতাটা যেমন শুধু রোদ আটকাবার জন্যে নয়, ওটা দিয়ে বৃষ্টির হাত থেকেও বাঁচা যায় (এবং সময় বিশেষে লাঠি বা বেড়াবার ছড়ি হিসেবেও ব্যবহার করা যায়), মানুষের মহাকাশবিদ্যাও তেমন আজ শুধু 'চাঁদের পিঠ দেখবার' (ডাঃ রামনের ভাষা) জন্যে প্রযুক্ত না হয়ে মানুষের জীবনের রকমারী গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সমাধানের কাজেও নিয়োজিত হয়েছে এবং এই বিষয়ে এর রয়েছে বিপুল ক্ষেত্র, সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ। আধুনিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগে মহাকাশচর্চা অসামান্য সম্ভাবনার সূচনা করেছে। কোন কোন বিভাগে নূতন প্রচেষ্টা ইতিমধ্যে সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে, কোন বিভাগে অচিরেই হবে বলে আশা করা যায় এবং কোন কোন বিভাগে হবার সম্ভাবনা রয়েছে। আমরা একে একে সেগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করছি।

মহাকাশ-বিজ্ঞান—মহাকাশযাত্রার দ্বারা মহাকাশ-বিজ্ঞানের একটি লাভ হবে এই যে, চাঁদ মহাকাশের দূরবর্তী গ্রহযাত্রার পথে একটি স্টেশন হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারবে। চাঁদের অভিকর্ষ দুর্বল হওয়ায় মহাকাশযানের পক্ষে উৎক্ষেপণ শক্তি কম দরকার হবে এবং এইভাবে মহাশূন্যে জয়যাত্রাও অব্যাহত থাকবে।

জ্যোতির্বিজ্ঞান—মহাকাশে মানুষের ক্লান্তিহীন অভিযানের ফলে স্বভাবতঃই জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কে নানা তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। সৌভাগ্যের বিষয়, বিভিন্ন দেশ এই বিষয়ে পরস্পরের সহযোগিতা করায় মানবসভ্যতা এই থেকে যথেষ্ট লাভবান হচ্ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় বিমানবিদ্যা ও মহাকাশ সংস্থা (N. A. S. A.) যুক্তরাষ্ট্রে এবং বিজ্ঞানে আগ্রহশীল বিভিন্ন

দেশের বিজ্ঞানীরা আবিষ্কারের মহান লক্ষ্য নিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করে চলেছেন। এই উদ্দেশ্য সাধনে এই প্রচেষ্টা সফল হয়েছে। এমন অনেক তথ্য পাওয়া গেছে, যেগুলির ৮৫ শতাংশই আমরা জানতাম না। সূর্য, নক্ষত্রপুঞ্জ, ভূ-চৌম্বককেন্দ্র ইত্যাদি বহু বিষয়ে নূতন অনেক কিছু জেনেছি ও পূর্বের ধারণা বদ্‌লেছি। মার্কিন কৃত্রিম উপগ্রহ এক্সপ্লোরার-১ (৩১. ১. ৫৮. উৎক্ষিপ্ত) পৃথিবীর চারদিকের ভ্যান অ্যালেন বেল্ট নামক বিকিরণ-বলয় আবিষ্কার করেছে। মার্কিন মার্কারী প্রকল্পের মহাকাশচারীরা গোধূলির আলো ও নৈশ জ্যোতি নিয়ে পরীক্ষা করেছেন। জেমিনির যাত্রীরা তথ্য সংগ্রহ করেছেন মেরুজ্যোতি সম্পর্কে। মহাকাশযাত্রার দ্বারা এই সব গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ ছাড়াও চাঁদ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি ইত্যাদি সম্পর্কে নানা মহাকাশযান কাছে গিয়ে বা দূর থেকে নানা খবর এনেছে। মহাকাশযানের সংগৃহীত তথ্য দ্বারাই উল্কা, গ্রহাণু, ধূমকেতু ইত্যাদি বিষয়েও মানুষের জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ হয়েছে। এই সব হয়েছে, কারণ মহাকাশে গিয়ে আমরা পার্থিব আবহমণ্ডলের পর্দার বাইরে যেতে পেরেছি। পৃথিবীর বাতাবরণ, তার ধূলিকণা, চৌম্বক ক্ষেত্র ইত্যাদি নানা কারণে বহির্জগতের রশ্মি, তরঙ্গ, অন্যান্য তথ্য ও সংকেত অবিকৃতভাবে পৃথিবীতে এসে পৌঁছতে পারে না বা একেবারেই পৌঁছায় না। চাঁদে একটা মানমন্দির স্থাপন করতে পারলে (অবশ্য যদি সেই চাঁদ হাতে পাই) আমাদের জ্যোতির্বিদ্যার জ্ঞানের সীমানা যে আরও বেড়ে যাবে, তাতে সন্দেহ নেই। এতে আমরা অনেক নূতন জিনিষ সম্পর্কে খোঁজ পাবো এবং অনেক পুরনো জিনিষেরও ভাল ব্যাখ্যা দিতে পারবো। পৃথিবীতে পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ খুবই বিরল, এবং হলেও খুব অল্পক্ষণ স্থায়ী হয়। আবার আকাশ মেঘলা থাকলে হয়তো দেখাই গেল না, অথচ সূর্যকিরীট, বর্ণালি ইত্যাদি বিষয়ের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষার প্রশস্ত সময় একমাত্র এটিই। পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা এই সুযোগ পান না বললেই হয়। কিন্তু চাঁদে প্রায়ই সূর্যগ্রহণ হয় এবং প্রায় চার ঘণ্টা পর্যন্তও থাকে। সুতরাং চাঁদে বিজ্ঞানশালা হলে এই বিষয়েও নূতন দিগন্ত উন্মোচিত হবে।

প্রশ্ন উঠতে পারে, মানুষ চাঁদে নামতে পারলেও সব দেশের বিজ্ঞান-সাধকেরা সেখানে গবেষণার সুযোগ পাবেন কিনা কিংবা চাঁদকে সামরিক ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করবার জন্যে জবরদখল করবার চেষ্টা হবে কি না। এই বিষয়ে আমরা মানুষের শুভবুদ্ধির উপর বিশ্বাস করবো। এথেন্সে মহাকাশ-বিজ্ঞানীদের এক সভায় প্রস্তাব নেওয়া হয়েছিল, চাঁদে কোন বৃহৎ শক্তিবর্গের একচেটিয়া অধিকার থাকবে না, আগ্রহী বিজ্ঞানীদের দেশ ও জাতি নির্বিশেষে সেখানে গিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুযোগ দেওয়া হবে। এছাড়া মহাকাশকে শান্তিপূর্ণ কাজে ব্যবহার করবার প্রস্তাব ও তদ্বিষয়ক চুক্তির খসড়া অধিকাংশ দেশের সমর্থনে রাষ্ট্রপুঞ্জে অনুমোদিত হয়েছে। এগুলি আশার কথা সন্দেহ নেই।

বেতার ও যোগাযোগ—মহাকাশ অভিযানের দ্বারা উপকৃত আধুনিক বিজ্ঞানের শাখাগুলির মধ্যে এটি আজ পর্যন্ত সবচেয়ে উন্নত হয়েছে। কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে কি করে বেতার-বার্তা পাঠানো যায়, সে কথা প্রথমে আলোচনা করা যাক। আমরা জানি বেতার-তরঙ্গ আলোকের মতই সরলরেখায় চলে। এই কারণেই চাঁদের অদৃশ্য দিকের সঙ্গে পৃথিবী থেকে বেতার যোগাযোগ রক্ষা করা যায় না। তবে বক্রাকার ভূপৃষ্ঠে এক গোলার্ধ থেকে আর এক গোলার্ধে কি করে বেতার-বার্তা আসছে? ভারতের লোকেরা Voice of America শুনছে কেমন করে? পৃথিবীর সকল দিক ঘিরে থাকা আবহমণ্ডলকে

ট্রপোস্ফিয়ার, স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার ইত্যাদি কয়েকটি স্তরে ভাগ করা হয়েছে। সবচেয়ে উপরের স্তরটির নাম আয়নোস্ফিয়ার। পৃথিবী থেকে পাঠানো বেতার-তরঙ্গ এই আয়নোস্ফিয়ারে প্রতিহত হয়। তারপর ভূপৃষ্ঠ এবং আয়নোস্ফিয়ারে পর্যায়ক্রমে প্রতিহত হয়ে বেতার-তরঙ্গ পৃথিবীর এক স্থান থেকে আর এক স্থানে যায় (১নং চিত্র)। কিন্তু টেলিভিশন-দৃশ্য পাঠাবার পর তা ত্রিশ-চল্লিশ মাইল দূরে দূরে অবস্থিত কয়েকটি পুনঃপ্রচার কেন্দ্রের (Relay centre) উঁচু টেলিভিশনটাওয়ারে ধরে পুনরায় প্রেরণ করা হয়। আবার তা মহাকাশে পালিয়ে যাবার আগেই পরবর্তী টাওয়ারে ধরা পড়ে এবং এভাবে হোঁচট খেতে খেতে টেলিভিশন তরঙ্গ এক কেন্দ্র থেকে অন্য
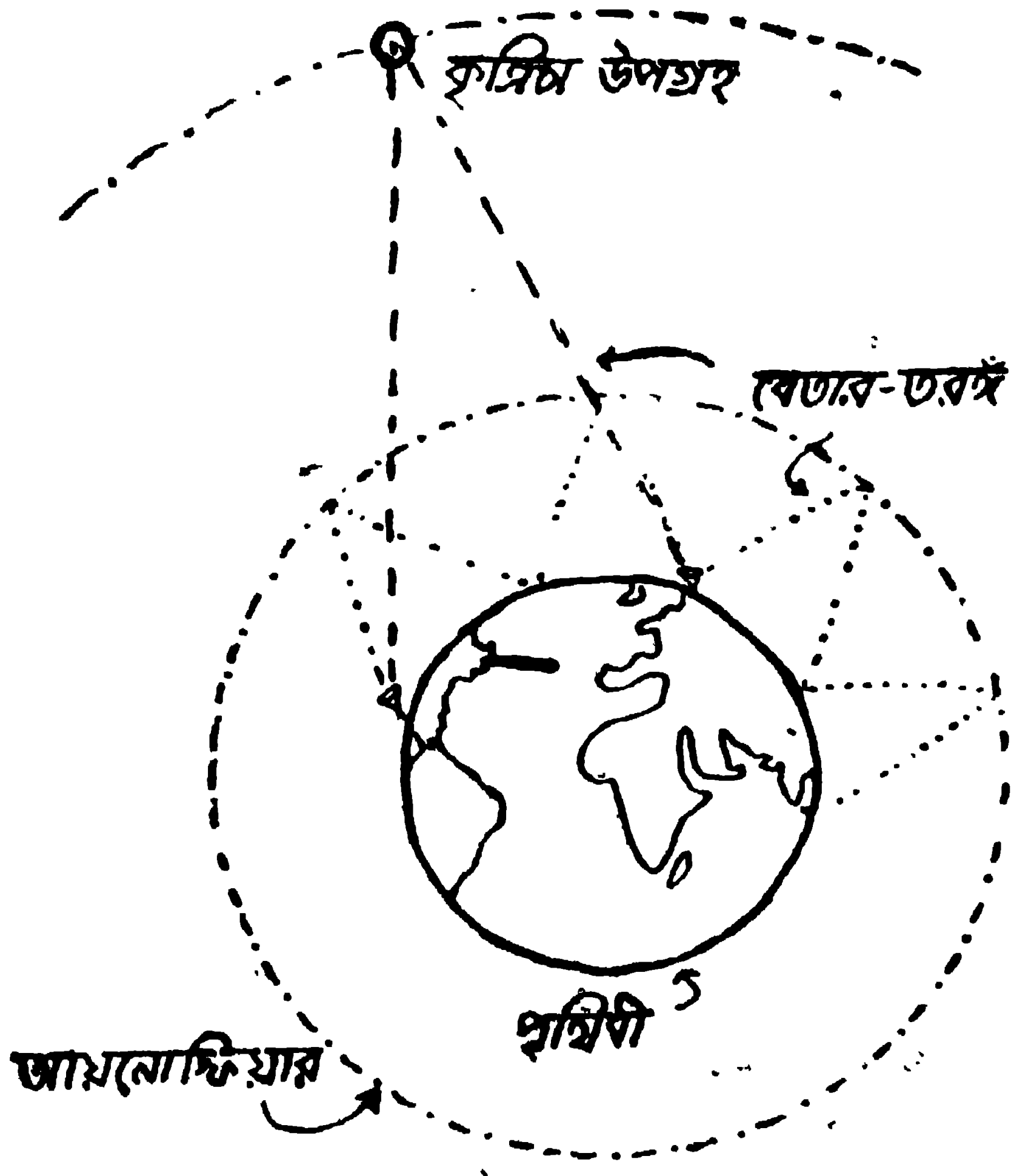
১নং চিত্র

সমস্যা দেখা গেল টেলিভিশনের তরঙ্গের ক্ষেত্রে। যে তরঙ্গকে মাধ্যম করে টেলিভিশনের দৃশ্য পাঠানো হয়, তা এতই সূক্ষ্ম যে, আয়নোস্ফিয়ার ভেদ করে মহাকাশের নিঃসীমতায় হারিয়ে যায়। তাই পৃথিবীব্যাপী টেলিভিশন যোগাযোগ সম্ভব করবার জন্যে একটি শ্রমসাধ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়েছে। কোন একটি টেলিভিশন কেন্দ্র থেকে কেন্দ্রে পৌঁছায় (২নং চিত্র)। এই ব্যবস্থা অত্যন্ত ব্যয়বহুল বলেই এতদিন পর্যন্ত পশ্চিম ইউরোপের কয়েকটা দেশে শুধু টেলিভিশন যোগাযোগ স্থাপন সম্ভব হয়েছিল। এখানেই আসছে কৃত্রিম উপগ্রহের প্রয়োজনীয়তা। মহাকাশে একটি চলমান কৃত্রিম উপগ্রহ একটি চমৎকার টেলিভিশনটাওয়ারের কাজ করবে। টেলিভিশন তরঙ্গ সেখানে প্রতিফলিত

হয়ে সমুদ্র-ব্যবধান পেরিয়েও এক দেশ থেকে আর এক দেশে সঞ্চারিত হতে পারবে। টাওয়ারের উচ্চতা যত হবে, টেলিভিশন-দৃশ্যের দূরসঞ্চারের ক্ষমতাও তত বাড়বে। সেই জন্যেই পৃথিবীর চতুর্দিকস্থ কক্ষপথে আবর্তনশীল কৃত্রিম উপগ্রহ এই বিষয়ে আশাতীত কাজ দেবে। শুধু তাই নয়, কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে বেতার-তরঙ্গও সুষ্ঠুভাবে প্রচারিত হতে পারবে। কারণ এই কাজে আয়নোস্ফিয়ার যথেষ্ট বা সন্তোষজনক নয়। সূর্যের প্রভাবজনিত আবহবিক্ষোভ বা আয়নোস্ফিয়ার স্তরে ফাটল-ধরা ইত্যাদি নানা কারণে পৃথিবীর বেতার যোগাযোগ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়। সেক্ষেত্রেও একটি কৃত্রিম উপগ্রহ চমৎকার কাজ দেবে। কার্যতঃ দিচ্ছেও তাই।

১৯৫৮ সালের ১৮ই ডিসেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের স্কোর নামক একটি কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ারের বাণী বেতারযোগে প্রথম পুনঃপ্রচারিত হয়। এর পর বিজ্ঞানের এই শাখা প্রচুর উন্নতি করেছে। টেলস্টার (মার্কিন শিশু-চাঁদ—১০-৭-১৯৬২) রীলে ইত্যাদি কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে আজ পৃথিবীব্যাপী বেতার ও টেলিভিশন যোগাযোগ স্থাপন করা সম্ভব হয়েছে। মাত্র তিনটি কৃত্রিম উপগ্রহ মহাকাশে পাঠিয়ে তা দিয়ে সমস্ত পৃথিবীকে বেতার-যোগে যুক্ত করবার সম্ভাব্যতাও প্রমাণিত হয়েছে। এছাড়াও আরও বিভিন্ন পরিকল্পনা রচিত হয়েছে। সুখের কথা, ভারতও কৃত্রিম উপগ্রহ মারফৎ বেতার যোগাযোগের এই

২নং চিত্র

আন্তর্জাতিক পরিকল্পনার অংশীদার হয়েছে। বিভিন্ন দেশে কৃত্রিম উপগ্রহের প্রেরিত বেতার-বার্তা ধরবার কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। পঃ জার্মেনীর একটি সর্বাধুনিক কেন্দ্রে রয়েছে একটি চলমান টাওয়ার ও অর্ধ বৃত্তাকার বেতার-তরঙ্গ প্রতিফলক বা অ্যান্টেনা, যা ৩৬০° কোণে ঘুরে কৃত্রিম উপগ্রহটি আকাশে উদিত হওয়া থেকে অস্ত যাওয়া পর্যন্ত অনবরত তার দিকে মুখ ফিরিয়ে থাকতে পারে। এই সব উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অদূর ভবিষ্যতে অল্প খরচে বিশ্বব্যাপী টেলিফোন যোগাযোগ, অলওয়েভ টেলিভিশন ইত্যাদি সম্ভব হবে ও বিভিন্ন দেশের পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নত হবে।

উন্নতি হবে আরও অনেক কিছুর। নবাবিষ্কৃত লেসার-রশ্মি বার্তা প্রেরণের একটি শক্তিশালী উপায়, কিন্তু পৃথিবীর আবহে এই রশ্মির চলাচল দুঃসাধ্য। আবহহীন চাঁদে বিজ্ঞানশালা প্রস্তুত করতে পারলে সেখান থেকে এই কাজ সুসাধ্য হবে। বেতারবিদ্যাকে সহায়তা করে মহাকাশ-বিজ্ঞান মানব-কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে।

আবহবিদ্যা—মহাকাশ অভিযানের সুফল প্রাপ্ত শাখাগুলির মধ্যে আবহ-বিজ্ঞানই মানুষের প্রত্যক্ষ উপকারে সবচেয়ে বেশী লাগতে পারে এবং এই উপকারের প্রভাব ব্যাপক এবং সুবিস্তৃত।

কৃত্রিম উপগ্রহে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি ভরে তাকে মহাকাশে পাঠিয়ে সেখানকার আবহাওয়া সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে পুনরায় বেতারযোগে সে সব তথ্যকে পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনবার কাজ বহুদিন সুরু হয়েছে। ১৯৬০ সালে এই উদ্দেশ্যে মার্কিন কৃত্রিম উপগ্রহ টিরোস-১-কে মহাকাশে পাঠানো হয়। আজ আবহাওয়ার সঠিক ভবিষ্যদ্বাণীর ক্ষেত্রে মহাকাশ-বিজ্ঞান কল্পনাতীত সাফল্যলাভ করেছে এবং টিরোস, নিম্বাসজাতীয় কৃত্রিম উপগ্রহগুলি এই ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছে। রাশিয়াও এই সব উদ্দেশ্যে কস্‌মস্ পর্যায়ের শতাধিক কৃত্রিম উপগ্রহকে ভূকক্ষে স্থাপন করেছে। বিভিন্ন দেশে এই উদ্দেশ্যে কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। তথ্য-সংগ্রহ ও গবেষণার ভিত্তিতে পারস্পরিক তথ্য-বিনিময়ের দ্বারা আন্তর্জাতিক সহায়তাও চলছে। সৌভাগ্যের বিষয়, আন্তর্জাতিক রাজনীতি বা পরমাণু-বিজ্ঞানের মত এই মহাকাশ চর্চা ও আবহ-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও ভারত শান্তির পথটি বেছে নিতে ভুল করে নি। ভারতও এই আন্তর্জাতিক সহযোগিতার অংশভাগী এবং তার মহাকাশ ঘাঁটি থুম্বা (কেরল) শুধু যে আবহাওয়া-বিষয়ক তথ্য সংগ্রহের একটি কেন্দ্র তাই নয়, চৌম্বক বিষুবরেখায় এটি বিশ্বের একমাত্র আবহরকেট কেন্দ্র।

এখনও আমাদের বিজ্ঞান আবহাওয়ার অভ্রান্ত পূর্বাভাস দিতে পারে না। প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর কার্যকারণ সম্বন্ধ অতি জটিল এবং কতকগুলি সদা পরিবর্তনশীল ঘটনার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল। তাই এই নিয়মাবলী মানুষ আজও সম্পূর্ণ আয়ত্ত করতে পারে নি বলে সব সময় সে বলতে পারে না, কোথায় ঠিক কতটার সময় ঝড়-ঝঞ্ঝা হবে, যেমন বলতে পারে সূর্যগ্রহণ বা জোয়ার-ভাটার ক্ষেত্রে। বিজ্ঞানীরা আশা করেন, আবহ-উপগ্রহগুলি শীঘ্রই এই সমস্যার সমাধান করবে। সেদিন কোথায় ঝড় হবে বা ভূমিকম্প হবে তা কয়েক ঘণ্টা আগে না জেনে কয়েক সপ্তাহ আগে জানা যাবে এবং তা থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে।

অনেক ক্ষেত্রে সাবধান হওয়া গেছেও। ১৯৬১ খৃষ্টাব্দে একটি টিরোস উপগ্রহ একবার প্রচণ্ড ঝড় সম্পর্কে আগে থেকে হুঁশিয়ার করে দেওয়ায় ১৯৬৪ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজের প্রচণ্ড ঝড়ের কথা দিল্লীর আবহকেন্দ্র পূর্বেই জানতে পারে।

মানুষের তৈরি কৃত্রিম উপগ্রহ এইভাবেই অগ্নিকাণ্ড, বন্যা, অনাবৃষ্টি, ভূমিকম্প, জলস্তম্ভ, ঘূর্ণিবাত্যা, চক্রবাত্যা, ঝঞ্ঝানীল (হারিকেন—প্রশান্ত মহাসাগরীয় মারাত্মক ঝড়) ইত্যাদি সম্পর্কে আগে ভাগেই জানতে পারছে এবং

পারবে। এর দ্বারা সে যে নিজে শুধু রক্ষা পাচ্ছে তাই নয়, অনেক ক্ষেত্রে প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করে এই সব বিপর্যয় রোধও করতে পারবে।

প্রাকৃতিক নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে বিখ্যাত মার্কিন বিজ্ঞানী ও মহাশূন্য গবেষক ডাঃ কুর্ট স্টেলিং বলেন যে, চক্রবাত্যা, ঝঞ্ঝানীলের গতিরোধ করে তার অন্তর্নিহিত মেঘঘূর্ণির মধ্যে তেজস্ক্রিয় পদার্থ ছিটিয়ে দিয়ে তাকে খণ্ড-বিখণ্ড করবার পরীক্ষায় আশাপ্রদ ফল পাওয়া গেছে।

কৃত্রিম উপগ্রহ কেমন করে ভূমিকম্পের কথা আগে থাকতেই টের পায়, সে সম্পর্কে ডাঃ স্টেলিং বলেছেন যে, কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে অবলোহিত রশ্মির দৃষ্টিতেই এই সব ধরা পড়ে। পৃথিবীপৃষ্ঠে হঠাৎ হঠাৎ কয়েকটি সূক্ষ্ম কুঞ্চনরেখা গজিয়ে ওঠে। ধরিত্রীমাতার গাত্রচর্মের এই বলিরেখাই আসন্ন ভূকম্পনের ভগ্নদূত এবং অবলোহিত রশ্মির আলোক-চিত্রে বহু উপরকার কৃত্রিম উপগ্রহের চোখে এই সব স্পষ্ট ধরা পড়ে এবং আশ্চর্যের বিষয়, স্বাভাবিক বলিরেখার সঙ্গে এগুলির পার্থক্যও অত উঁচু থেকে সূক্ষ্মভাবে দেখা যায় অবলোহিত রশ্মির চোখে।

যে কারণে বিভিন্ন ঘটনার উপর আবহাওয়ার গভীর প্রভাব রয়েছে, সে কারণেই আবহ-বিজ্ঞানের এই অগ্রগতি অন্যান্য ক্ষেত্রেও নানা সুখ-সুবিধার দ্বার খুলে দিয়েছে। আবহাওয়া সম্পর্কে কৃত্রিম উপগ্রহের সঠিক ভবিষ্যদ্বাণীর ভিত্তিতে আমরা যদি প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি, তবে পৃথিবীর তার ও বেতার যোগাযোগ ব্যবস্থা নির্বিঘ্ন থাকবে এবং প্রাকৃতিক প্রলয়লীলায় হাজার হাজার মানুষের ভবলীলা অকালে সাঙ্গ হবে না, পৃথিবীর অনেক সম্পদও বেঁচে যাবে ক্ষয়ক্ষতির হাত থেকে।

পরিবহন ও যাতায়াত—আবহাওয়া শান্ত থাকলে মোটর, রেল, বিমান ও জাহাজ চলাচল বিপদমুক্ত হবে। কৃত্রিম উপগ্রহ মারফৎ বিমান ও জাহাজগুলি নিজেদের মধ্যে বেতার যোগাযোগ রাখতে পারবে। সমুদ্রের নীচের লুক্কায়িত বরফপিণ্ডের অস্তিত্ব সম্পর্কে কৃত্রিম উপগ্রহগুলি সতর্ক করে দিলে নৌযাত্রা আরও নিরাপদ হয়। ভবিষ্যতের অতিবেগবান বিমানগুলি যাতে বায়ুর ঘর্ষণে জ্বলে না ওঠে, তার ব্যবস্থা করতেও উপগ্রহগুলি সমর্থ হবে বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন।

খাদ্য ও কৃষি-বিজ্ঞান—বন্যা, অনাবৃষ্টি ইত্যাদি কৃত্রিম উপগ্রহের কল্যাণে রোধ করা গেলে স্বভাবতঃই কৃষি-বিজ্ঞানের উন্নতি হবে ও খাদ্যোৎ-পাদন বাড়বে। সেচ ব্যবস্থার উন্নতি ও উদ্বৃত্ত জলসম্পদের সদ্ব্যবহার ইত্যাদির নির্দেশও উপগ্রহগুলি দেবে। দাবানল, ভূমিক্ষয়, শস্য রোগের সংক্রমণ ইত্যাদি ব্যাপারেও উপগ্রহগুলি পূর্বাভাস দিতে সক্ষম। সুতরাং আবহ-বিজ্ঞানের এই অগ্রগতি যদি অব্যাহত থাকে, তবে হয়তো অল্পদিনের মধ্যেই মহাকাশ-বিজ্ঞানীরা মানুষের মুখে অন্ন দিতে পারবেন। মানুষ চাঁদে যদি গবেষণাগার স্থাপন করতে পারে, তবে সেখানকার ভারহীনতায় (অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত ভারশূন্যতা) উন্নত ধরণের এমন গাছপালার হয়তো জন্ম দেওয়া যাবে, যা খাদ্য-সমস্যার সমাধান করবে।

মৎস্যসম্পদ ও সামুদ্রিক উদ্ভিদ—ডাঃ ষ্টেলিং কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে মৎস্য অনুসন্ধানের কথা বলেছেন। মহাসমুদ্রের গভীরে সন্তরণশীল মাছের ঝাঁক এবং তাদের গোপন আড্ডাগুলি মহাকাশ থেকে উপগ্রহগুলির অবলোহিত 'চোখ' ঠিক দেখতে পায়। মাছের এবং অন্যান্য নানা সামুদ্রিক জীব ও উদ্ভিদ যে স্রোতের অতলে গা ভাসিয়ে বেড়ায়, অন্য স্রোতের সঙ্গে তার মিলনরেখা রাত্রি বেলাতেও উপগ্রহের 'চোখ'কে ফাঁকি দিতে পারে না।

পরমাণু বিজ্ঞান—শুধু চাঁদেই নয়, মহাকাশ অভিযাত্রী মানুষ সূর্যের কক্ষপথেও কয়েকটি মহা-

কাশযান প্রেরণ করেছে। সূর্যের বুকে কয়েকটি পারমাণবিক ও তাপ-পারমাণবিক পরীক্ষাও হয়েছে, যা পৃথিবীবাসীকে পরমাণুর রহস্য উদ্‌ঘাটনের পথে আরও সাহায্য করেছে।

জীব-বিজ্ঞান ও শিল্প—চাঁদে বা মহাশূন্যের অন্য কোথাও মানুষ যদি গবেষণাগার তৈরি করে, তবে চিকিৎসাশাস্ত্রও খুব লাভবান হবে। মহাশূন্যের ভারহীন অবস্থায় নাকি পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীদের চিকিৎসার সুবিধা হবে—এই রকম মনে করা হচ্ছে (আর দুর্বল অভিকর্ষের জন্যে চাঁদ রক্তচাপের রোগীদের পক্ষে ভাল স্থান)। এই ওজনহীন অবস্থা জীবাণু নিয়ে পরীক্ষার ক্ষেত্রেও ফলপ্রদ হবে। মহাশূন্যের নির্বাততাও কয়েকটি গবেষণার সাহায্য করবে। বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা এবং শিল্প এর সাহায্যে উন্নতি করবে, কারণ পৃথিবীতে কৃত্রিম উপায়ে ওসব অবস্থা সৃষ্টি করবার খরচটা বাঁচবে।

ভূতত্ত্ব—ভূতত্ত্ব ও ভূ-পদার্থবিজ্ঞানের বহু অজ্ঞাত তথ্য আজ সমাধান হবার প্রতীক্ষায় চাঁদ তথা মহাকাশ অভিযানের মুখ চেয়ে বসে আছে। চাঁদের আবহ না থাকায় তার না আছে ঝড়ঝাপ্‌টার আন্দোলন বা অন্য কোন বহিঃপ্রাকৃতিক আঘাত-সংঘাতের বালাই। তাই আদি কাল থেকে চন্দ্রের পৃষ্ঠত্বক চেহারা ও চরিত্রে অবিকৃত আছে বলেই ধরা যায়। তাই চাঁদকে পর্যবেক্ষণ করে আমরা যে শুধু চাঁদ সম্পর্কেই জ্ঞানলাভ করবো তাই নয়, চাঁদকে দেখে প্রাকৃতিক বিবর্তনের ধারা বিশ্লেষণ করে পৃথিবী ও চাঁদের জন্ম-রহস্যও জানতে পারবো।

চাঁদের জন্ম কি করে হলো—পৃথিবী ও চাঁদ একই মহাজাগতিক ঘটনার ফলে জন্ম নিয়েছে, না পৃথিবীর দেহ থেকে চাঁদের জন্ম হয়েছে—এসবই খুব সম্ভব আমরা জানতে পারবো চাঁদের ভূত্বক ও ভূমধ্যবর্তী শিলাস্তর পরীক্ষা করে। সম্ভবতঃ জানা যাবে পৃথিবীর প্রাণবীজের জন্ম ঠিক পৃথিবীতে, না তা বহিরাগত—এই তথ্যও। চাঁদের ভূস্তর পরীক্ষা করে পৃথিবীর চৌম্বক ধর্ম সম্পর্কে আমাদের ধারণাগুলি যাচাই করে নেওয়া যাবে। চাঁদের চৌম্বক ধর্ম নেই, তাই চাঁদের ভূকেন্দ্র বিজ্ঞানীদের মতে তরল না হওয়াই উচিত, (পৃথিবীর কেন্দ্র তরল) যদি হয় তবে বুঝবো ভূচুম্বকত্ব সম্পর্কে আমাদের ধারণা ভুল। চাঁদের উল্কাপাত, অগ্ন্যুদ্গীরণ ইত্যাদি সম্পর্কে তথ্য সংগৃহীত হলে এই সব ব্যাপারে নতুন আলোকপাত হবে।

তৈল সম্পদ, প্রাকৃতিক ও খনিজ সম্পদ—মহাকাশ-বিজ্ঞানের অগ্রগতি থেকে মানুষ তৈল সম্পদে দু-রকমভাবে লাভবান হবে। একটি পৃথিবীর নিজস্ব তৈল সম্পদ এবং দ্বিতীয়টি চাঁদ বা অন্য কোন গ্রহের সম্ভাব্য অনাবিষ্কৃত তৈল সম্পদ। পৃথিবীর গর্ভে কোথায় তৈল বা গ্যাসবাহী স্তর আছে, কৃত্রিম উপগ্রহের পক্ষে তা বলে দেওয়া মোটেই শক্ত নয়। সেই অবলোহিত রশ্মির ফটোগ্রাফির কেরামতি। তাই কোন উপগ্রহ সন্ধানী চোখ মেলে ভূপৃষ্ঠ বা সমুদ্রের উপর ঘুরে বেড়ালেই অনেক অজ্ঞাত তেলের উৎসের খোঁজ পাওয়া যাবে।

সাধারণতঃ আপাতদৃষ্টিতে চাঁদকে মৃত বলেই মনে হয়। ক্যামেরার চোখে ও নিজের চোখে চাঁদকে সামনাসামনি দেখে মানুষও এর নিষ্প্রাণ রুক্ষতা ছাড়া আর কিছু দেখতে পায় নি। কিন্তু চাঁদের গিরিখাত ও গহ্বর, যেগুলি মৃত আগ্নেয়গিরি বলে পরিচিত সেগুলি কি সত্যই মৃত? তত্ত্বগতভাবে এই সমস্যার সমাধান আজও হয় নি। বহুদিন ধরে মাঝে মাঝেই চাঁদে অদ্ভুত আলো জ্বলতে দেখা গেছে। ১৯৫৮ সালে বিজ্ঞানী কজিরেভ দূরবীনে এই রকম একটা আলো জ্বলতে দেখেছিলেন। আর উনসত্তর সালেও মার্কিন নভোচারীদের চন্দ্র পরিক্রমার (জানুয়ারী) সময় পৃথিবী থেকে

চাঁদে এই রকম আলো দেখা গেছে। চাঁদের দেশে পৃথিবীর সন্তানদের অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে কেউ নিশ্চয়ই আলো হাতে বসে নেই। বিজ্ঞানীরা অনেকেই মনে করছেন এটা চাঁদের ঐ আলামুখগুলির আগ্নেয় উদ্‌গার। আর এই ধারণার সমর্থন মেলে আর একটি পরীক্ষায়। চাঁদে তেজস্ক্রিয় রশ্মি পাঠিয়ে দেখা গেছে, চাঁদে তেজস্ক্রিয় পদার্থের পরিমাণ পৃথিবীর ঐ পরিমাণের পাঁচ-ছয় গুণ বেশী। তা হলে এটা খুবই সম্ভব যে, চাঁদে আজও আগ্নেয়উদ্‌গীরণ হয়। চন্দ্রগর্ভে উত্তাপের প্রমাণ পাওয়ায় অনেক বিজ্ঞানীই আশা করছেন যে, চাঁদে হয়তো ইউরেনিয়াম মিলবে প্রচুর। সত্য সত্য যদি তা হয়, তবে মানুষের দৈনন্দিন প্রয়োজনের চাহিদা আরও অনেক মিটবে এবং তার বিজ্ঞানও অনেক এগিয়ে যাবে। এই একই কারণে অনেক বিজ্ঞানী মনে করেন চাঁদে গন্ধক, নিকেল, কোবাল্ট, ম্যাগ্নেশিয়াম, অ্যালুমিনিয়াম ইত্যাদি মূল্যবান ধাতু পাওয়া যেতে পারে। তাছাড়া কয়লা এবং অক্সিজেন, সিলিকন ইত্যাদি গ্যাসও পাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

জ্যোতির্বেত্তা কজিরেফ যে অগ্ন্যুদ্গার দেখতে পান, তিনি তার বর্ণালী-বিশ্লেষণ করেছিলেন এবং দেখেছিলেন তার মধ্যে প্রাকৃতিক গ্যাসের অস্তিত্ব আছে। সুতরাং আভ্যন্তরীণ উত্তাপ ও এই প্রাকৃতিক গ্যাসের চিহ্ন থেকে এই আশাই হয় যে, চাঁদে প্রাথমিক ধরণের কোন জৈব পদার্থ আর প্রাকৃতিক তৈল থাকতেও পারে। সেই তেলও আবার হতে পারে জৈব বা অজৈব। চাঁদের গর্ভে অজৈব তেল থাকলে আমরা বুঝবো যে, পৃথিবীর গর্ভে বা সমুদ্রতলেও অজৈব তেল থাকতে পারে। এইভাবে চাঁদে যাত্রা আমাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে খনিজ ও প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধতর করবে।

ভূগোল—কৃত্রিম উপগ্রহের সন্ধানী 'চোখ' তাল জরীপও করতে পারে। হাজার হাজার মাইল উপর থেকে এরা পৃথিবীর সাগর, পর্বত, নদী, অরণ্যের নিখুঁত ছবি তুলেছে, যার ফলে পৃথিবীর নির্ভুল মানচিত্র রচনা করে গেছে।

শক্তি—মহাকাশ অভিযান মানুষকে দিতে পারে অনেক নূতন নূতন শক্তি। কৃত্রিম উপগ্রহকে সূর্যের মত জ্যোতিষ্মান করে (অর্থাৎ একধারে চাঁদ এবং সূর্য) রাতের আকাশে আলো দেবার ব্যবস্থা করা যায়। চাঁদের জমি পৃথিবীর তুলনায় অনেক বেশী সৌরশক্তি পায়। এই সৌরশক্তিকে পরিবর্তিত করে ইচ্ছামত কাজে লাগাবার পরিকল্পনা রয়েছে। চাঁদের গর্ভের তাপশক্তি সম্পর্কেও অনুরূপ পরিকল্পনা রয়েছে।

জনসংখ্যা—সবশেষে আসে জনসংখ্যার সমস্যা। এই সমস্যা অবশ্য এখনই তত তীব্র নয়, কিন্তু এই জনবৃদ্ধির হার যদি অক্ষুন্ন থাকে তবে আর এক শতক পরের অবস্থা কম ভয়াবহ নয়। নিজের জন্মভূমিতে ঠাঁই না পেয়ে তখন আবার মানুষকে ফিরে তাকাতে হবে মহাকাশের দিকে। গ্রহান্তরে বসতি পাতবার পরিকল্পনাটা কি এখন আর অসম্ভবের পর্যায়ে পড়ে? আজ মহাকাশযানে চড়ে আমরা যখন চাঁদে গিয়ে পৌঁচেছি?

মহাকাশ-বিজ্ঞান কি করেছে এবং কি করতে পারে—এই হচ্ছে তার মোটামুটি হিসাব। লাভ-ক্ষতি-সচেতন সুক্ষ্মহিসাবী মানুষ, মহাকাশ-বিজ্ঞানের কাছ থেকে এতদিনে যা পেয়েছে, তা কি নিতান্তই অল্প? আর ভবিষ্যতেও যে অনেক কিছু সুফল পাওয়া যাবে, সে বিষয়ে বিজ্ঞানীরা আশান্বিত।

খড়গপুরে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৫৭তম অধিবেশন

মূল ও শাখা-সভাপতিদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

ডক্টর এল. সি. ভার্মন

মূল সভাপতি

ডক্টর লালচাঁদ ভার্মন ১৯০২ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর অমৃতসরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর ছাত্র জীবন কৃতিত্বপূর্ণ ছিল। ১৯২৭ সালে তিনি মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনার্স সহ ইঞ্জিনীয়ারিং বিষয়ে স্নাতক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ১৯২৮ সালে কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এস. ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৩০ সালে তিনি কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি-এইচ. ডি. ডিগ্রী লাভ করেন। এরপর ইঞ্জিনীয়ারিং-এর বিভিন্ন বিষয়ে, বিশেষ ভাবে মান নির্ধারণ সংক্রান্ত বিষয়ে (ষ্ট্যাণ্ডার্ডাইজেশন) সম্বন্ধে ব্যাপক গবেষণা করেন।

১৯৩১-৩৩ সাল পর্যন্ত তিনি ব্যাঙ্গালোরের ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব সায়েন্স-এর রিসার্চ ফেলো ছিলেন। ঐ বছরেই তিনি লণ্ডনের শেলাক রিসার্চ ব্যুরোতে রিসার্চ ফিজিসিষ্ট হিসাবে যোগদান করেন। ১৯৩৬ সালে দেশে প্রত্যাবর্তন করে তিনি কলিকাতার ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল রিসার্চ ব্যুরোতে রিসার্চ অফিসার হিসাবে যোগ দেন। ১৯৪০ সালে তিনি সি. এস. আই. আর-এর সহকারী ডিরেক্টর নিযুক্ত হন। ১৯৪৪-৪৭ সাল পর্যন্ত তিনি নূতন দিল্লীর ন্যাশনাল ফিজিক্যাল লেবরেটরীর অস্থায়ী ডিরেক্টর ছিলেন। ১৯৪৭ সালে তিনি ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাণ্ডার্ড ইনষ্টিটিউশনে ডিরেক্টর নিযুক্ত হন। পরে তিনি ঐ প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টর-জেনারেলের পদে উন্নীত হন এবং ১৯৬৬ সালে উক্ত পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

১৯৫১ সালে কেন্দ্রীয় সরকার তাঁকে মান নির্ণয় সংক্রান্ত বিষয়ে অবৈতনিক উপদেষ্টা নিয়োগ করেন। আই. এস. আই এর ডিরেক্টর-জেনারেল-এর পদ থেকে অবসর গ্রহণের পর তিনি ইকাফের (ECAFE) শিল্পজাত দ্রব্যাদির মান নির্ণয়ের জন্যে আঞ্চলিক উপদেষ্টা নিযুক্ত হন এবং বর্তমানেও সেই পদেই নিয়োজিত আছেন এবং এই পদাধিকার বলেই তিনি ইরান, ফিলিপাইনস, সিঙ্গাপুর, আফগানিস্থান সরকারের এবং সম্মিলিত রাষ্ট্রসঙ্ঘের শিল্পগত গবেষণা এবং মান নির্ণয়ের সমস্যা সংক্রান্ত বিষয়েরও উপদেষ্টা।

তিনি যুক্তরাষ্ট্রের ষ্ট্যাণ্ডার্ডস ইঞ্জিনীয়ারস সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হন। ১৯৫২-৫৪ সালে তিনি মান নির্ণয়ের আন্তর্জাতিক সংস্থার (I. S. O.) সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৬১-৬২ সালে তিনি ইনষ্টিটিউশন অব টেলিকম্যুনিকেশন ইঞ্জিনীয়ার্স-এর সভাপতি নির্বাচিত হন। এছাড়াও দেশে-বিদেশের বহু সংস্থার সঙ্গে তিনি সংশ্লিষ্ট আছেন। দেশ-বিদেশের বৈজ্ঞানিক পত্র-পত্রিকায় তাঁর ১০০-টিরও বেশী মৌলিক গবেষণার বিষয় প্রকাশিত হয়েছে।

১৯৬৪ সালে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের ষ্ট্যাণ্ডার্ডস ইঞ্জিনীয়ারস সোসাইটি থেকে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক লিও বি. মুর পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৬৮ সালে তিনি আমেরিকান সোসাইটি অব টেষ্টিং মেটিরিয়ালস-এর বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন। ১৯৬৭ সালে তিনি ইউ. কে. ইনষ্টিটিউট অব প্রোডাকশন ইঞ্জিনীয়ারস-এর লাকী পদক লাভ করেন।

ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাণ্ডার্ড ইনষ্টিটিউশনের প্রধান হিসাবে তিনি শিল্পজাত দ্রব্যের মান নির্ণয়ের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ১৬০০-রও বেশী কমিটি ও কাউন্সিল

গঠন করেন এবং এই সব কমিটি ও কাউন্সিলের কাজের মধ্যে সহযোগিতামূলক সমন্বয় সাধন করেন। ১৯০০-রও বেশী বিশেষজ্ঞ এই সব কমিটি ও কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন। গত উনিশ বছরে তাঁর নেতৃত্বে ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে ৩৬০০-রও বেশী ভারতীয় মান নির্ধারিত হয়েছে।

তাঁরই নেতৃত্বে আই. এস. আই. ইণ্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন ফর ষ্ট্যাণ্ডার্ডাইজেসন (আ. এস. ও)-এর কাজে সক্রিয় ভাবে অংশগ্রহণ করে। ইণ্টারন্যাশনাল ইলেক্ট্রোটেক্‌নিক্যাল কমিশন (আই. ই. সি)-এর কাজেও আই. এস.আই. অংশ গ্রহণ করে। ১৯৪৭ সালে থেকে ভারতবর্ষ আই. এস. ও-র কাউন্সিলের সদস্য পদ (অবশ্য ১৯৬১ সাল বাদে) বজায় রেখে আসছে। ১৯৫২ সালে ডক্টর ভার্মন কমিটি অব অ্যাকশন অব দি ইণ্টারন্যাশনাল ইলেক্ট্রোটেক্‌নিক্যাল কমিশন (আই. ই. সি)-এর সদস্যপদে নির্বাচিত হন।

প্রোফেঃ এন. কে সাহা

সভাপতি—পদার্থবিদ্যা শাখা

প্রোফেঃ এন. কে. সাহা অধুনা পূর্ব পাকিস্থানের অন্তর্গত পাবনা জেলার সাতবেরিয়া গ্রামে ১৯০৮ সালের ১লা জানুয়ারী জন্মগ্রহণ করেন। রাজসাহীর গভর্ণমেন্ট কলেজ থেকে স্নাতক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৩০ সালে বিশুদ্ধপদার্থ বিদ্যায় এম. এস-সি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরবর্তী বছরে তিনি প্রোফেঃ মেঘনাদ সাহার অধীনে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার কার্যে নিযুক্ত হন। সেখানে তিনি অ্যাটমিক অ্যাণ্ড মলিকিউলার অ্যাবসর্‌প্‌শন স্পেক্ট্রা, রেডিওঅ্যাক্টিভিটি অ্যাণ্ড ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল ফিজিক্স সম্বন্ধে গবেষণায় উৎসাহী হন।

১৯৩৫ সালে এন. কে. সাহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ ছাত্রবৃত্তি লাভ করেন এবং ১৯৩৬ সালে মিউনিকের Deutsche Akademie-র বৃত্তি লাভ করেন। ১৯৩৬ সাল থেকে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত তিনি জার্মেনীর ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক ইনষ্টিটিউট অব ফিজিক্স-এ এক্সপেরিমেণ্টাল নিউক্লিয়ার ফিজিক্স বিষয়ে কাজ করেন। ১৯৩৮ সালে তিনি হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন। জার্মেনী, সুইজারল্যাণ্ড, ইটালীর যে সব গবেষণা মন্দিরে নিউক্লিয়ার ফিজিক্স সংক্রান্ত গবেষণার কাজ হয়, তা তিনি পরিদর্শন করেন।

ভারতে প্রত্যাবর্তন করে তিনি কলিকাতার বসু বিজ্ঞান মন্দির, স্কটিশ চার্চ কলেজ এবং পুনা ও নয়াদিল্লীস্থিত ভারতীয় আবহতত্ত্ব বিভাগে বিভিন্ন সময়ে কাজ করেন। ১৯৪৫ সালে তিনি দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যার লেক্‌চারার হিসাবে কাজ করেন এবং এখন তিনি ঐ বিভাগে সিলেকশন গ্রেডে প্রোফেসর হিসাবে কাজ করছেন।

ডক্টর সাহা ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অব সায়েন্সেস অব ইণ্ডিয়ার ফেলো, আমেরিকান ফিজিক্যাল সোসাইটির সদস্য এবং ইণ্ডিয়ান ফিজিক্যাল সোসাইটির আজীবন সদস্য। তিনি প্রায় ৫০টি গবেষণা-পত্র প্রকাশ করেছেন।

ডক্টর অরুণকুমার দে

সভাপতি—রসায়ন শাখা

ডক্টর দে ১৯২২ সালের ২০শে অক্টোবর বারাণসীতে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৪৩ সালে ডক্টর দে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রসায়নে এম. এস-সি. ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৪৬ সালে ডি. ফিল এবং পরে ডি. এস-সি ডিগ্রী লাভ করেন।

১৯৪৭-৪৯ সালে ডক্টর দে সাগর বিশ্ববিদ্যালয়ে রিডারের লেক্‌চারার হিসাবে যোগ দেন

এবং ১৯৪৯ সাল থেকে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকমণ্ডলীতে আছেন। তাঁর তত্ত্বাবধানে অনেকেই ডক্টরেট ডিগ্রী অর্জনের জন্যে কাজ করছেন। ১৯৫৮ সালে তাঁর গবেষণার জন্যে তাঁকে ন্যাশনাল অ্যাকাডেমি অব সায়েন্স (ইণ্ডিয়া) ইউ. পি-র শিক্ষামন্ত্রীর স্বর্ণপদক পুরস্কার দিয়েছে। ১৯৪৬ সালে এলাহাবাদের ফ্যাকাল্টি অব সায়েন্সে গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্যে তিনি এস. এ. হিল স্মৃতি পুরস্কার লাভ করেন।

ডক্টর দে আমেরিকান কেমিক্যাল সোসাইটি, জাপানের ফিজিকো-কেমিক্যাল সোসাইটির সদস্য। তিনি ইণ্ডিয়ান কেমিক্যাল সোসাইটি এবং ন্যাশনাল অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সেস-এর ফেলো। এ ছাড়াও তিনি দেশ-বিদেশের বিভিন্ন বিজ্ঞান-সংস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আছেন। মিউনিক (১৯৫৯) এবং মন্ট্রিলে (১৯৬১) অনুষ্ঠিত ফলিত ও বিশুদ্ধ রসায়নের আন্তর্জাতিক কংগ্রেসে তিনি যোগদান করেন। ১৯৬১ ও ১৯৬৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত মাইক্রোকেমিক্যাল টেক্‌নিক্‌স সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক আলোচনা-চক্রে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৬৬ সালে জুরিখে অনুষ্ঠিত আলফ্রেড ওয়ার্নার শত-বার্ষিকী উৎসবে তিনি আমন্ত্রিত হয়ে যোগদান করেন। তিনি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করেছেন এবং সেখানকার রসায়ন গবেষণাগারের কাজও দেখেছেন।

প্রোফেঃ এস. ডি. চোপ্‌রা

সভাপতি—গণিত শাখা

প্রোফেঃ চোপ্‌রা অধুনা পশ্চিম পাকিস্থানের অন্তর্গত লাহোরে ১৯১৭ সালের ৩১শে ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর ছাত্রজীবন বরাবরই কৃতিত্বপূর্ণ এবং তিনি অনেক পুরস্কার, পদক ও বৃত্তিলাভ করেন।

এম. এ. পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হবার পর হোসিয়ারপুর ডি. এ. ভি. কলেজ, দয়াল সিং কলেজ এবং পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিতশাস্ত্রের অধ্যাপক হিসাবে তিনি কাজ করেন। দেশ বিভাগের পর তিনি নূতন দিল্লীস্থিত পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটি ক্যাম্প কলেজে গণিতের স্নাতকোত্তর বিভাগের ভারপ্রাপ্ত হন। ১৯৫৪-৫৭ সালে তিনি কেম্ব্রিজে সেন্ট জন্স কলেজে গবেষণার কাজে যোগ দেন। কেম্ব্রিজ থেকে তিনি ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করবার পর দেশে ফিরে এসে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন। ১৯৬০ সাল পর্যন্ত সেখানে কাজ করবার পর এক বছরের জন্যে শ্রীনগরের রিজিওনাল ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে তিনি যোগদান করেন। ১৯৬১ সালে তিনি কুরুক্ষেত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত-বিজ্ঞানের প্রোফেসর এবং প্রধান হিসাবে যোগদান করেন।

তিনি কুরুক্ষেত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে থিয়োরেটিক্যাল সিজ্‌মোলজি সংক্রান্ত গবেষণা বিভাগ গড়ে তোলেন এবং সেটি আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করে। প্রোফেঃ চোপ্‌রা অনেক পাঠ্যপুস্তক ও গবেষণা-পত্র লিখেছেন এবং জনপ্রিয় বক্তৃতাও দিয়েছেন।

প্রোফেঃ চোপ্‌রা ১৯৬৩ সালে ছয় মাসের জন্যে এডিনবরার রয়্যাল অবজারভেটরীতে থিয়োরেটিক্যাল সিজ্‌মোলজিতে ভিজিটিং ফেলো ছিলেন।

প্রোফেঃ চোপ্‌রা ইণ্ডিয়ান ম্যাথামেটিক্যাল সোসাইটির আজীবন সদস্য এবং লণ্ডনের রয়েল অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটি এবং কেম্ব্রিজ ফিলোজফিক্যাল সোসাইটির ফেলো। তিনি সি. এইচ. এইচ. পি. ম্যাথামেটিক্যাল সোসাইটির সভাপতি।

ডক্টর ভি. পুরি

সভাপতি—উদ্ভিদবিদ্যা শাখা

ডক্টর পুরি ১৯০৯ সালের ১০ই ডিসেম্বর নাগিনায় জন্মগ্রহণ করেন। আগ্রায় তাঁর কলেজীয় শিক্ষালাভ হয় (১৯২৮-'৩৪)। তিনি আগ্রা

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি. এস. সি. ডিগ্রী লাভ করেন ১৯৪০ সালে।

১৯৩৫ সালে তিনি মীরাট কলেজে জীববিদ্যার লেক্‌চারার হিসাবে কাজ করেন, পরে তিনি উক্ত বিভাগের প্রোফেসর পদে উন্নীত হন। ১৯৬৫ সালে ডক্টর পুরি উক্ত কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। ১৯৬৯ সালে তিনি মীরাট বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনষ্টিটিউট অব অ্যাড্‌ভান্সড্‌ ষ্টাডিজ-এর উদ্ভিদবিদ্যার সিনিয়র প্রোফেসর নিযুক্ত হন। ১৯৪৯-৫০ সালে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রোফেঃ এ. জে. জেমসের সঙ্গে কাজ করেন এবং ১৯৫৮-৫৯ সালে ইউ. এস. এ-র ওহিও ষ্টেট ইউনিভার্সিটিতে গবেষণার কাজে যোগ দেন।

তাঁর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত প্ল্যাণ্ট মর্ফোলজি সম্বন্ধীয় প্রায় ১০০টি গবেষণা-পত্র দেশ-বিদেশের বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে এবং তিনি স্বয়ং প্রায় ৬০টি গবেষণা-পত্র প্রকাশ করেছেন।

তিনি ইণ্ডিয়ান বটানিক্যাল সোসাইটির সম্পাদক (১৯৬১-৬৫) এবং সভাপতি (১৯৬৬-৬৭) ছিলেন। এছাড়াও তিনি বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে জড়িত আছেন। উদ্ভিদবিদ্যায় কৃতিত্বপূর্ণ গবেষণার জন্যে তিনি বীরবল সাহানি পদক পুরস্কার পান।

ষ্টকহোম (১৯৫০), মণ্ট্রিল (১৯৫৯) ও এডিনবরায় (১৯৬৪) অনুষ্ঠিত ইণ্টারন্যাশনাল বটানিক্যাল কংগ্রেসে তিনি অংশগ্রহণ করেন। ১৯৫৪ সালে পশ্চিম নেপালে বৃটিশ মিউজিয়াম কর্তৃক পরিচালিত উদ্ভিদতাত্ত্বিক অভিযানে তিনি ভারত সরকারের প্রতিনিধি ছিলেন।

সভাপতি—কৃষি-বিজ্ঞান শাখা

ডক্টর মুখার্জী ১৯১৪ সালে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৩৭ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উদ্ভিদবিদ্যায় এম. এস-সি ডিগ্রী লাভ করবার পর তিনি শান্তিনিকেতনে এক বছর উদ্ভিদবিদ্যার লেক্‌চারার হিসাবে কাজ করেন। তারপর তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরলোকগত প্রোফেঃ এস. পি. আগরকর-এর সঙ্গে কাজ করেন ঘোষ রিসার্চ স্কলার হিসাবে। ম্যাঞ্জিফেরা সম্পর্কিত গবেষণার জন্যে ১৯৪২ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত স্যার আশুতোষ মুখার্জী পুরস্কার এবং স্বর্ণপদক লাভ করেন। ১৯৫০ সালে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি. এস-সি. ডিগ্রী লাভ করেন।

ডক্টর মুখার্জী কোয়েম্বাটুরের সুগারকেন ব্রীডিং ইনষ্টিটিউটে সহকারী উদ্ভিদবিদ্‌ হিসাবে কাজ করেন। এখানে ইক্ষুসংক্রান্ত নানা বিষয়ে তাঁর গবেষণা প্রশংসা অর্জন করে। পরবর্তীকালে তিনি দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে উদ্ভিদবিদ্যার লেক্‌চারার হিসাবে যোগদান করেন এবং এর পর তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি বিভাগের জয়েণ্ট ডিরেক্টর ও হর্টিকালচারিষ্ট নিযুক্ত হন। নয়া-দিল্লীর ভারতীয় কৃষিগবেষণা পরিষদের হর্টিকালচারাল ডিভিশনের প্রধান হিসাবেও তিনি কাজ করেন। ১৯৬৯ সালের মে মাসে তিনি ভারত সরকারের অধীনে ভারতীয় উদ্ভিদতাত্ত্বিক সমীক্ষার ডিরেক্টর হিসাবে যোগদান করেন। ভারতে হর্টিকালচার সম্পর্কিত গবেষণা ও শিক্ষাদানের উন্নয়নে তাঁর দান অসীম। তিনি ইণ্ডিয়ান এগ্রিকালচারাল রিসার্চ ইনষ্টিটিউটের হর্টিকালচার ডিভিশনকে বর্তমান পর্যায়ে গড়ে তোলেন এবং এটি দক্ষিণ পূর্ব এসিয়ায় হর্টিকালচার গবেষণার একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। ডক্টর মুখার্জী উদ্ভিদবিদ্যা ও হর্টিকালচার সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য গবেষণা করছেন। বিশেষতঃ আমের জন্ম ও বৃদ্ধি, সাইটোলজি, ট্যাক্সোনমি সম্বন্ধে তাঁর গবেষণা উল্লেখযোগ্য। ১৯৬৬ সালে তিনি ওয়াটমল স্মৃতি পুরস্কার পান। তিনি ইণ্টারন্যাশনাল সোসাইটি অব হর্টিকালচারাল সায়েন্স-এর কাউন্সিলের সদস্য।

এছাড়াও তিনি দেশ-বিদেশের বিভিন্ন শিক্ষামূলক ও বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযুক্ত আছেন। তিনি প্রায় ১৫০টি গবেষণা-পত্র প্রকাশ করেছেন। ১৯৬৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রের মেরীল্যাণ্ডে অনুষ্ঠিত ইন্টারন্যাশনাল হর্টিকালচার কংগ্রেসে ডক্টর মুখার্জী প্রতিনিধিত্ব করেন।

ডক্টর শিবকুমার মিত্র

সভাপতি—মনস্তত্ত্ব ও শিক্ষা-বিজ্ঞান শাখা

ডক্টর এস. কে. মিত্র ন্যাশনাল কাউন্সিল অব এডুকেশনাল রিসার্চ অ্যাণ্ড ট্রেনিং-এর জয়েণ্ট ডিরেক্টর। তাঁর ছাত্রজীবন বরাবরই বিশেষ কৃতিত্বপূর্ণ এবং অনেক পুরস্কার ও বৃত্তি তিনি লাভ করেছেন। ছাত্রজীবনেই তিনি শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক যুক্তরাষ্ট্রের বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান Sigma XI-এর সদস্য মনোনীত হন।

১৯৬৭ সালে তিনি NCERT-এর জয়েণ্ট ডিরেক্টর নিযুক্ত হন, এর আগে এখানকার মনস্তত্ত্ব বিভাগের প্রধান হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন। NCERT-এর মনস্তত্ত্ব বিভাগটি ১৯৬৩ সালে তিনিই স্থাপন করেন। এই প্রতিষ্ঠানে যোগদানের পূর্বে তিনি আমেদাবাদের বি. এম. ইনষ্টিটিউট অব সাইকোলজি অ্যাণ্ড চাইল্ড ডেভেলপ্‌মেণ্ট-এর ডিরেক্টর ছিলেন। তিনি ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল ইনষ্টিটিউট এবং পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনষ্টিটিউট অব সাইকোলজিক্যাল রিসার্চ অ্যাণ্ড সার্ভিসে কাজ করেছিলেন। ১৯৪৪ সাল থেকে তিনি শিক্ষকতা ও গবেষণা সুরু করেন। সামাজিক, ক্লিনিক্যাল ও শিশু মনস্তত্ত্ব, শিক্ষাসংক্রান্ত পরীক্ষণ ও পরিমাপ সম্বন্ধে শিক্ষা ও গবেষণার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা তিনি লাভ করেন। তিনি অনেক গবেষণা-পত্র ও নিবন্ধ লিখেছেন এবং ষান্মাসিক গবেষণা-পত্রিকা ইণ্ডিয়ান এডুকেশন রিভিউও সম্পাদনা করেছেন। তিনি ইণ্ডিয়ান জার্নাল অব সাইকোলজির সম্পাদক।

তিনি নানা দেশ ভ্রমণ করেছেন এবং আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সভা ও সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করেছেন। ডক্টর মিত্র দেশ-বিদেশের বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক ও শিক্ষাসংক্রান্ত সংস্থার সঙ্গে জড়িত আছেন। কাউন্সিল অব দি ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন ফর দি ষ্টাডি অব অ্যাচিভমেণ্ট, ইউনেস্কো (UNESCO) প্যানেল এক্সপার্টস অব ইভ্যালুয়েশন অব এক্সপেরিমেণ্টাল লিটারেসি প্রোজেক্টস প্রভৃতির সঙ্গে তিনি নানাভাবে সংশ্লিষ্ট আছেন।

ডাঃ জে. নাগচৌধুরী

সভাপতি—শারীরবৃত্ত শাখা

অধুনা পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্গত ঢাকা জেলার বারোদি গ্রামে ১৯২২ সালে ডাঃ জে. নাগচৌধুরী জন্মগ্রহণ করেন। প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে শারীরবৃত্তে অনার্সে উচ্চতম স্থান অধিকার করে বি. এস-সি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জুবিলী বৃত্তি লাভ করেন। ১৯৪৬ সালে কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে এম. বি. বি. এস. ডিগ্রিলাভ করেন। এরপর তিনি কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে শারীরবৃত্তের ডেমনষ্ট্রেটর হিসাবে কাজ করেন এবং শিক্ষকতায় সুনাম অর্জন করেন।

লণ্ডনের মেডিক্যাল রিসার্চ কাউন্সিল লেবরেটরিজ-এর হিউম্যান নিউট্রিশন রিসার্চ ইউনিটে তিনি পরলোকগত প্রোফে. বি. এস. প্লাটের অধীনে ভিজিটিং স্কলার হিসাবে কাজ করেন। এরপর তিনি লণ্ডনের মেডিক্যাল রিসার্চ কাউন্সিল-এর কাজে যোগ দেন এবং লণ্ডন স্কুল অব হাইজিন অ্যাণ্ড ট্রপিক্যাল মেডিসিনে পুষ্টিবিদ্যায় শিক্ষকতা করেন। প্রায় পাঁচ বছর লণ্ডনে থাকাকালীন প্রোটিন-ক্যালোরির অভাবজনিত অপুষ্টিতে চর্ম ও কেশের

পরিবর্তনজনিত সমস্যা সম্পর্কে তিনি গবেষণায় ব্যাপৃত ছিলেন।

ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি কলিকাতার ইনষ্টিটিউট অব চাইল্ড হেলথ-এ শিক্ষকতায় যোগদান করেন এবং ১৯৫৭-১৯৬০ সাল পর্যন্ত কলিকাতা ইউনিভার্সিটির কলেজ অব মেডিসিন-এর শারীরবিভার স্নাতকোত্তর বিভাগে অধ্যাপনায় যোগদান করেন। ১৯৬০ সালের ডিসেম্বর মাসে বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্ণাঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনের পর ডাঃ নাগচৌধুরী সেখানে শারীরবিদ্যা বিভাগের প্রধান ও প্রোফেসর হিসাবে নিযুক্ত হন।

ডাঃ নাগচৌধুরীর তত্ত্বাবধানে অনেক ছাত্র গবেষণা করে এম. ডি এবং পি. এইচ. ডি ডিগ্রী লাভ করেন। তাঁর গবেষণার প্রধান ক্ষেত্র হচ্ছে পরীক্ষামূলক অপুষ্টি এবং ফলিত পুষ্টি। তাঁর বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফল দেশ-বিদেশের বিভিন্ন জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে। পুষ্টি-বিশেষজ্ঞ হিসাবে তিনি বিভিন্ন শিক্ষামূলক ও বৈজ্ঞানিক সংস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

ফুলব্রাইট কর্মসূচী অনুযায়ী তিনি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র পরিভ্রমণ করেন এবং ১৯৬৭-'৬৮ সালে ম্যাসাচুসেট্‌স্ ইনষ্টিটিউট অব টেক্‌নোলজিতে খাদ্য ও পুষ্টি-বিজ্ঞান বিভাগে প্রোফেঃ স্ক্রিমশ-এর সঙ্গে কাজ করেন।

বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে তিনি একটি থীসিস রচনা করেন।

ডেকান কলেজ থেকে তিনি ও তাঁর ছাত্রগণ গুজরাট, মহারাষ্ট্র, মধ্য প্রদেশ, অন্ধ্র, মহীশূর, রাজস্থান এবং কাশ্মীরে খননকার্য পরিচালনার সুযোগ পান। এই খননকার্যের ফলে ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্পর্কে অনেক প্রাচীন তথ্য জানা সম্ভব হয়েছে।

ডক্টর সাঙ্কালিয়া ভারতের ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক জাতিতত্ত্ব সম্বন্ধে শিলালিপি থেকে তথ্য সংগ্রহ করে পুনরায় এর ইতিহাস রচনায় উৎসাহী। এই জন্যে তিনি এবং তাঁর ছাত্ররা প্রায় খৃষ্টপূর্ব ২০০ থেকে ১২০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যেকার শিলালিপি থেকে তথ্যাদি সংগ্রহ করে উত্তর প্রদেশ, মহীশূর, রাজস্থান, মহারাষ্ট্র ও গুজরাটের সামাজিক গোষ্ঠী ও প্রশাসনিক একক সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ প্রস্তুত করেছেন। প্রিহিস্টোরী, প্রোটোহিস্টোরী ও পুরাতত্ত্বের অন্যান্য বিষয়ে ৩৫-এর বেশী তাঁর ছাত্রেরা ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেছেন। খোদন, ভাস্কর্য, স্থাপত্যরীতি, প্রাচীন-ইতিহাস, প্রোটোহিস্টোরী, প্রিহিস্টোরী ইত্যাদি বিষয়ে তিনি প্রায় ২৫০-র বেশী নিবন্ধ প্রকাশ করেছেন। ডক্টর সাঙ্কালিয়া ৮টি পুস্তক রচনা করেছেন। ১৯৬৮ সালের অগাষ্ট মাস থেকে তিনি জওহরলাল নেহেরু ফেলোশিপ পাচ্ছেন।

প্রোফেঃ এইচ. ডি. সাঙ্কালিয়া

সভাপতি—নৃতত্ত্ব ও পুরাতত্ত্ব বিভাগ

প্রোফেঃ এইচ. ডি. সাঙ্কালিয়া ১৯০৮ সালের ১২ই ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৩৯ সাল থেকেই ডেকান কলেজে পোষ্ট গ্রাজুয়েট অ্যাণ্ড রিসার্চ ইনষ্টিটিউটে শিক্ষকতা ও গবেষণায় রত আছেন। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি প্রত্নবিদ্যায় পি-এইচ. ডি ডিগ্রী লাভ করেন। নালন্দা

ডক্টর এ. পি. কাপুর

সভাপতি—প্রাণিবিদ্যা ও কীটতত্ত্ব শাখা

ডক্টর কাপুর ১৯৩৬ সালে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এস-সি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি নয়াদিল্লীর এগ্রিকালচারাল ইনষ্টিটিউটের অ্যাসোসিয়েটশিপ, লণ্ডন ইম্পিরিয়াল কলেজের ডিপ্লোমা এবং লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের পি-এইচ. ডি. ডিগ্রী লাভ করেন। বিদেশে যাবার পূর্বে তিনি

ফলিত কীটবিদ্যা সম্বন্ধে উড়িষ্যা ও কাশ্মীরে কাজ করেন।

১৯৪৫ সালের প্রথমভাগে তিনি লণ্ডনের কমনওয়েলথ ইনষ্টিটিউট অব এন্টমোলজিতে গবেষণার কাজে নিযুক্ত হন এবং সাউথ কেনসিংটনের বৃটিশ মিউজিয়ামে (ন্যাচারাল হিষ্টোরি) গবেষণা করেন।

১৯৪৯ সালে তিনি ভারতে ফিরে এসে ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অব সায়েন্সেস অব ইণ্ডিয়ার সিনিয়র রিসার্চ ফেলো হিসাবে জুওলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়ায় যোগ দেন। পরে জুওলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার ডিরেক্টরের পদে তিনি উন্নীত হন। তিনি অনেক গবেষণা-পত্র প্রকাশ করেছেন এবং বিজ্ঞানজগতে নতুন এমন এক-শ'রও বেশী পতঙ্গের শ্রেণীবিন্যাস করেছেন।

ইউনেস্কোর (UNESCO) অনুরোধে তিনি আর্দ্রগ্রীষ্মাঞ্চলের কীটতত্ত্ব সম্বন্ধীয় সমস্যার পর্যালোচনা করে একটি রিপোর্ট প্রস্তুত করেন এবং ইউনেস্কোর পক্ষে ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কমিশন কর্তৃক এই বিষয়ের উপদেষ্টা নিযুক্ত হন। ১৯৬৪ সালে ম্যানিলায় (ফিলিপাইন্স) আন্তর্জাতিক চাউল গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক চাউলের অনিষ্টকারী প্রধান কীট সম্বন্ধীয় আলোচনা-চক্রে তিনি আমন্ত্রিত হন। লণ্ডন (১৯৪৮), মন্ট্রিল (১৯৫৬) ও মস্কোর (১৯৬৮) অনুষ্ঠিত কীটতত্ত্ব সম্বন্ধীয় বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলনে তিনি ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন। তিনি দেশ-বিদেশের বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক সংস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আছেন। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েসন অব সিষ্টেম্যাটিক জুওলজিষ্টস-এর তিনি সভাপতি।

ডক্টর কল্যাণ বাগচী

সভাপতি—চিকিৎসা ও পশু-চিকিৎসা শাখা

ডাঃ বাগচী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি. এস-সি এবং এম. বি. বি. এস. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং পুষ্টি-বিজ্ঞানে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি-এইচ. ডি. ডিগ্রী লাভ করেন। অ্যাসিষ্টান্ট প্রোফেসর হিসাবে তিনি কলিকাতার অল ইণ্ডিয়া ইনষ্টিটিউট অব হাইজিন অ্যাণ্ড পাব্লিক হেলথ-এ যোগদান করেন এবং পরে তিনি পুষ্টি ও জৈবরসায়নের অ্যাসোসিয়েট প্রোফেসর নিযুক্ত হন। এই সময় তিনি পুষ্টি ও জৈবরসায়নের ক্ষেত্রে শিক্ষক ও গবেষক হিসাবে সুনাম অর্জন করেন।

১৯৬৬ সাল থেকে ডাঃ বাগচী ভারত সরকারের খাদ্য আইন এবং খাদ্য ও পুষ্টির মান নির্ণয় সংক্রান্ত বিষয়ের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তিনি জাতীয় পুষ্টি সংক্রান্ত উপদেষ্টা পর্ষৎ, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের খাদ্যের মান সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় কমিটি পরিবার পরিকল্পনা, ওয়ার্কস হাউসিং এবং শহরতলী উন্নয়ন সংস্থা প্রভৃতি সম্পাদক। ডাঃ বাগচী কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন কমিটির সঙ্গে যুক্ত আছেন। তিনি জেনেভাস্থিত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পুষ্টিসংক্রান্ত বিশেষজ্ঞ কমিটির সদস্য। ডাঃ বাগচী ভারতবর্ষের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে নানা ভাবে জড়িত।

খাদ্য ও পুষ্টিতত্ত্ব বিষয়ের বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলনে তিনি ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন। ডাঃ বাগচী খাদ্য ও পুষ্টিসংক্রান্ত বিষয়ে উল্লেখযোগ্য গবেষণা করেছেন। দেশ-বিদেশের বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় তিনি ৫০-টিরও বেশী মৌলিক নিবন্ধ প্রকাশ করেছেন।

প্রোফেঃ এ. আর. রায়

সভাপতি—পরিসংখ্যান শাখা

প্রোফেঃ রায় ১৯২০ সালের ১লা সেপ্টেম্বর মেদিনীপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৪২

সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিশুদ্ধ গণিতে এম. এস-সি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯৪৪ সালে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পরিসংখ্যানে এম. এস-সি. ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৪৫ সালে তিনি ভারত সরকারের কৃষি-গবেষণা পরিষদের কাজে যোগদান করেন। সে সময়ে কৃষিগবেষণা পরিষদ ভারতের শস্য উৎপাদনের পরিসংখ্যান সংগ্রহ করছিলেন। এই কাজে ডক্টর রায়ের ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। কৃষি ও গৃহপালিত পশু সম্পর্কিত গবেষণার ক্ষেত্রে পরিসংখ্যান সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্যাদি বিষয়ে উপদেশ দেবার জন্যে ডক্টর রায়কে অনুরোধ করা হয়। এই বিষয়ে তাঁর দান উল্লেখযোগ্য এবং তিনি এই সম্পর্কিত অনেক নতুন বিষয়ে গবেষণার জন্যে পরামর্শ দেন।

১৯৫২ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ষ্ট্যাণ্ডফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিসংখ্যান বিষয়ে উচ্চতর গবেষণার জন্যে তিনি যোগদান করেন এবং সেখান থেকে ১৯৫৫ সালে পরিসংখ্যানে পি-এইচ.ডি. ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৫৬ সালে তিনি ভারতে ফিরে আসেন এবং ১৯৫৯ সালে লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগের অধ্যাপক ও প্রধান' হিসাবে কাজে যোগদান করেন। এই মধ্যবর্তী সময়ে তিনি কৃষিগবেষণা পরিষদে পরিসংখ্যান বিষয়ের প্রোফেসর হিসাবে কাজ করেন।

ডক্টর রায়ের অনেক গবেষণা-পত্র দেশ-বিদেশের বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর তত্ত্বাবধানে গবেষণা করে অনেক ছাত্র পরিসংখ্যানে পি-এইচ. ডি ডিগ্রী লাভ করেছেন।

গোপালচন্দ্র চাটার্জী

সভাপতি—ভূগোল ও ভূবিদ্যা শাখা

শ্রীগোপালচন্দ্র চাটার্জী ১৯১১ সালে সিমলায় (হিমাচল প্রদেশ) জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৩৩ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে ভূবিদ্যায় অনার্সসহ স্নাতক পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হন। ১৯৩৭ সালে তিনি ইণ্ডিয়ান স্কুল অব মাইনসে অ্যাসোসিয়েট হন এবং চূড়ান্ত পরীক্ষায় তিনি হেডেন পদক পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৩৯ সালে তিনি জিওলজিক্যাল সার্ভেতে যোগদান করেন। ১৯৬৬ সালে তিনি জিওলজিক্যাল সার্ভের ডিরেক্টর জেনারেল নিযুক্ত হন। শিলা-তত্ত্ব ও খনিজবিদ্যা সম্বন্ধে তার গবেষণা প্রশংসা অর্জন করে। ১৯৪৯-'৫১ সাল পর্যন্ত তিনি যুক্তরাষ্ট্রের জিওলজিক্যাল সার্ভেতে গ্রাউণ্ড-ওয়াটার জিওলজি ও হাইড্রোলজি বিষয়ে শিক্ষা লাভ করেন। ভারতে ফিরে এসে তিনি ১'৪ মিলিয়ন বর্গ কিলোমিটারের বেশী অঞ্চলব্যাপী অল ইণ্ডিয়া গ্রাউণ্ডওয়াটার এক্সপ্লোরেশন প্রোজেক্ট (১৯৫৩-৫৯) কৃতিত্বের সঙ্গে পরিচালনা করেন।

তিনি কমিশন কর দি জিওলজিক্যাল ম্যাপ অব দি ওয়ার্ল্ড (আই. জি. সি. এবং আই. ইউ. জি. এস)-এর সহ-সভাপতি। ইন্টার-ন্যাশনাল হাইড্রোলজিক্যাল ডিকেডের ন্যাশনাল কমিটির তিনি সদস্য। এ ছাড়াও দেশ ও বিদেশের নানা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি সংশ্লিষ্ট আছেন।

১৯৬৮ সালে প্রাগে অনুষ্ঠিত ২৩শ আন্তর্জাতিক ভূতাত্ত্বিক কংগ্রেসে তিনি ভারতের প্রতিনিধিত্ব

করেন। ১৯৬৪ সালে নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত ২২শ আন্তর্জাতিক ভূতাত্ত্বিক কংগ্রেসের জল-বিজ্ঞান শাখার তিনি সভাপতি ছিলেন। তাঁর গবেষণা-পত্রও অনেক প্রকাশিত হয়েছে।

প্রোফেঃ এস. ভি. সি. আইয়া

সভাপতি—ইঞ্জিনীয়ারিং ও ধাতুবিদ্যা শাখা

প্রোফে. এস. ভি. চন্দ্রশেখর আইয়া বোম্বাই-এর এসপ্লানেড হাইস্কুল ও উইলসন কলেজ এবং কেম্ব্রিজের (ইউ. কে.) কলেজে শিক্ষা লাভ করেন। তাঁর ছাত্রজীবন ছিল কৃতিত্বপূর্ণ এবং তিনি পুরস্কার ও বৃত্তিও লাভ করেছিলেন। ছাত্রজীবনে খেলা, বক্তৃতা প্রতিযোগিতা এবং নাটকাভিনয়েও তিনি উৎসাহী ছিলেন। কেম্ব্রিজে ছাত্রাবস্থায় তিনি বিজ্ঞান সংক্রান্ত রচনা প্রতিযোগিতায় পুরস্কার লাভ করেন। ছাত্রজীবন শেষ করে তিনি অধ্যাপনা গ্রহণ করেন এবং বোম্বাই, পুণা, গুজরাট বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করেন। তিনি আমেদাবাদের এল. ডি. কলেজ অব ইঞ্জিনীয়ারিং-এর অধ্যক্ষ হয়েছিলেন। পরে তিনি ব্যাঙ্গালোরের ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট-এর ইলেক্ট্রিক্যাল কম্যুনিকেশন ইঞ্জিনীয়ারিং-এর প্রোফেসরের পদ গ্রহণ করেন।

প্রোফেঃ আইয়া বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আছেন। ইণ্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন অব রেডিও সায়েন্স-এর কমিশন ৮-এ ভারতের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করেন। প্রোফেঃ আইয়া ইঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষা এবং শিল্প গবেষণা সম্পর্কিত অনেক নিবন্ধ প্রকাশ করেছেন। রেডিও নয়েজ এবং বজ্রপাত পরিমাপের জন্যে তিনি কয়েকটি নতুন রকমের যন্ত্র উদ্ভাবন করেছেন। তিনি উন্নয়ন কার্য এবং শিল্প গবেষণার সঙ্গে সংযুক্ত আছেন এবং তাঁর অনেক গবেষণামূলক সিদ্ধান্ত নতুন যন্ত্র তৈরির কাজে লেগেছে।

কিশোর বিজ্ঞানীর

দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

জানুয়ারী — ১৯৭০

২৩শ বর্ষ — ১ম সংখ্যা

সাধারণতঃ বন্দী অবস্থায় সিংহীর কোন শাবক জন্মায় না। কিন্তু পশ্চিম জার্মেনীর হেগেনবেকের পশুশালায় এই পাঁচটি সিংহশাবক জন্মেছে। মা-বাবা বাচ্চাগুলিকে সযত্নে পালন করছে।

এরোপ্লেন আবিষ্কারের কাহিনী

আকাশে পাখীরা বেশ মনের আনন্দে উড়ে বেড়ায়। তাই দেখে মানুষেরও ইচ্ছা হলো পাখীর মতো ওড়বার। কিন্তু উড়বো বললেই তো ওড়া যায় না। পাখীর না হয় ডানা আছে,- যার সাহায্যে ওরা শূন্যে ভারসাম্য রক্ষা করতে পারে। পারে ডানা মেলে বাতাস কেটে এগিয়ে যেতে। কিন্তু মানুষের তো তাও নেই। কাজেই বুঝতে পারছো সবই কল্পনা। আর কল্পনাকে বাস্তবে রূপ দেবার জন্যে কয়েক জন বিজ্ঞানী চেষ্টা করলেন। তাই কখনো হয়! সুতরাং তাঁরা হাল ছেড়ে দিয়ে অন্য গবেষণায় মনোনিবেশ করলেন। এগিয়ে এলেন আরো কয়েকজন। চেষ্টা করলেন কিন্তু পারলেন না। এঁদের মধ্যে কয়েকজন পরীদের মত নিজের শরীরে নকল ডানা লাগিয়ে ওড়বার ব্যর্থ চেষ্টা করলেন। ব্যর্থ তো হবেই! হবে না কেন বলো, মুরগীও ভাল করে উড়তে পারে না, পারে না হাঁস, কেন না ডানা থেকে ওদের নিজের দেহের ওজন অনেক বেশী। আর মানুষতো তার নিজের দেহের ওজন নিয়ে হেঁটেই চলতে পারে না। তাই বলে মানুষ তো দমবার পাত্র নয়। নিজে সরাসরি না পারুক, অন্য কিছু অবলম্বন করেও সে শূন্যে উড়বে, বিচরণ করবে, হলোও তাই। ফরাসী দেশের একজন কাগজ-ব্যবসায়ীর দুই ছেলে জোসেফ ও জ্যাক সর্বপ্রথম কাগজের বেলুন তৈরি করে শূন্যে ওড়ালো। তারপর ধীরে ধীরে সেই বেলুনের উন্নতি ঘটিয়ে, ১৭৮৩ সালে একটি মেষ, মোরগ ও হাঁস— এই তিন যাত্রীসমেত আকাশে ছেড়ে দিলেন একটি বেলুন। বেলুনটি আট মিনিট আকাশে ভেসে বেড়িয়ে নিরাপদে যাত্রীসমেত ফিরে এল মাটির বুকে। এই ঘটনা মানুষের মনে প্রচুর উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি করলো। ফলে মানুষও বেলুনযাত্রী হয়ে পাখীর মত মহাশূন্যে বেড়াবার ইচ্ছা প্রকাশ করলো। সেই ইচ্ছা পূরণ করলো এক সাহসী ফরাসী যুবক। তারপর ১৭৮৪ সালে ইংল্যাণ্ডের লুনাডিও বেলুন চড়ে শূন্যে ঘুরে এলেন।

কিন্তু এতেও মানুষের সখ মিটলো না। সে পাখীর মত আরো বেশীক্ষণ সময় কাটাতে চাইলো আকাশে। আর এই সখ মেটাবার জন্যে সর্বপ্রথম এগিয়ে এলেন জার্মেনীর কাউণ্ট জেপ্‌লিন। তিনি এমন একটি উড়োযান তৈরি করতে চাই-লেন, যা বায়ু-প্রবাহের বাধা কাটিয়ে যেদিকে খুসী চলবে বা চালনা করা যাবে। কাউণ্ট আর দেরী করলেন না। সুরু করলেন গবেষণা। অচিরেই তার সুফলও পেলেন। তৈরি করলেন একটি উড়োজাহাজ। কিন্তু দুঃখের বিষয়, প্রথম উড়োজাহাজটি

তাঁর পরিকল্পনা মত হলো না। একটার পর একটা উড়োজাহাজ তৈরি করে চললেন। সে সময়ে সকলে পাগল বলে তাঁকে উপহাস করতে লাগলো। কিন্তু জেপ্‌লিন সমস্ত বিদ্রূপের উর্ধ্বে থেকে সত্যই খুব সুন্দর একটি উড়োজাহাজ নির্মাণ করতে সক্ষম হলেন্‌। শুধু তাই নয়—তাঁর এই জাহাজটি আকাশপথে ২৭০ মাইল উড়ে যেতে সমর্থ হলো। এরপর কাউন্ট জেপ্‌লিনের নাম দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়লো। যারা তাঁকে বিদ্রূপ করে বলেছিল—পাগল, তারা সকলেই নির্বাক হলো। এমন কি, জার্মান সরকার জেপ্‌লিনের তৈরি উড়োজাহাজ দেখে খুশী হয়ে তাঁকে ওই কার্যে উৎসাহিত করার জন্যে প্রচুর অর্থ দিয়ে সাহায্য করলেন।

এই আর্থিক সাহায্য পেয়ে জেপ্‌লিন এমন একটি উড়োজাহাজ তৈরি করলেন, যা ২৮০ মন ওজনসহ ২০ জন যাত্রী নিয়ে আকাশপথে উড়তে পারলো। নিজের তৈরি এই উড়োজাহাজের নাম দিলেন তিনি জেপ্‌লিন। তারপর দীর্ঘদিন মানুষ এই জেপ্‌লিন দিয়ে আকাশে চলাফেরা করে; করে মালবহন—এমন কি, প্রথম বিশ্ব যুদ্ধেও মানুষ জেপ্‌লিন ব্যবহার করে শত্রুঘাটি আক্রমণ করতো। কিন্তু প্রচুর অর্থব্যয়ে তৈরি হয়েও এই বিরাট উড়োজাহাজগুলি প্রথম মহাযুদ্ধের সময় তেমন সুবিধা করতে পারে নি। কারণ এই জেপ্‌লিনকে উর্ধ্বাকাশে নিয়ে যেত হাইড্রোজেনভর্তি গ্যাস-বেলুন। ফলে হাইড্রোজেনের থলেতে গুলি লাগলেই সমস্ত হাইড্রোজেন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠতো, আর সেই আগুন বিরাট জেপ্‌লিনটি পুড়ে একেবারে ছাই হয়ে যেত।

এই অসুবিধা কাটিয়ে ওঠবার জন্যে পরবর্তীকালে আমেরিকার বৈজ্ঞানিকরা চিন্তা করতে লাগলেন এবং দহনশীল হাইড্রোজেন গ্যাসের পরিবর্তে তাঁরা হিলিয়াম গ্যাস ব্যবহার করে প্রচুর সুফল পেলেন। ফলে জেপ্‌লিনে আগুন লাগবার কোন ভয় থাকলো না—এমনকি, ইঞ্জিনের গতিবেগও বৃদ্ধি পেল। তবু এতে নানা অসুবিধা থেকে গেল।

প্রথমেই বলেছি, মানুষ চায় পাখীর মত উড়ে বেড়াতে—নিরাপদে। তাতে অসুবিধা থাকলে চলবে কেন। তাইতো মানুষ আকাশে ওড়বার যন্ত্র নির্মাণে উৎসুক হয়ে উঠে। আবিষ্কার করে বেলুন, জেপ্‌লিন ও গ্লাইডার যন্ত্র। আর এই গ্লাইডার যন্ত্রের উন্নতি ঘটিয়ে পরবর্তীকালে রাইট ভ্রাতৃদ্বয় উদ্ভাবন করেন আজকের যুগান্তকারী এরোপ্লেন—সে এক সুন্দর গল্প।

সেটা ইংরেজী ১৮৯৫ সালের কথা। লিলিয়েনথ্যাল নামক একজন জার্মান বৈজ্ঞানিক একটি গ্লাইডার যন্ত্র উদ্ভাবন করেন। ওই যন্ত্রের সাহায্যে তিনি কয়েক বার আকাশ ভ্রমণ করেন। কিন্তু ইংরেজী ১৮৯৬ সালে গ্লাইডার যন্ত্রে চড়ে আকাশে ভ্রমণ করতে গিয়ে তিনি ঝড়ের মুখে পড়েন এবং যন্ত্রটি উল্টে গিয়ে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত

হন। লিলিয়ানথ্যালের মৃত্যুর পর ওই যন্ত্রের উন্নতিসাধনে অনেকেই চেষ্টা করেন, যেমন ইংল্যাণ্ডের পারসি পিলচার ও আমেরিকার অকটেভ সেণ্ট। কিন্তু তাঁরা এর কিঞ্চিৎ উন্নতি সাধন করলেও, প্রকৃত পক্ষে এই যন্ত্রের আমূল পরিবর্তন করেন রাইট ভ্রাতৃদ্বয়।

পাখীর মত ডানাসম্পন্ন ইঞ্জিনবিহীন গ্লাইডার যন্ত্রে উঠে কোন উঁচু জায়গা থেকে বায়ু-প্রবাহের গতি অনুযায়ী লাফিয়ে পড়লে হাওয়ার মুখে অনেকটা উড়ে যাওয়া সম্ভব হতো। কিন্তু হঠাৎ ঝড়ো হাওয়া বইলেই যন্ত্রটি উল্টে গিয়ে বিপদ ডেকে আনবে। এরকম বিপদ নিয়ে আকাশে ওড়াতো সম্ভব নয়। বিপদ-মুক্ত হতেই হবে।

এই ব্যাপারে রাইট ভ্রাতৃদ্বয় চিন্তা করতে লাগলেন—গ্লাইডার যন্ত্রগুলিকে এমন কি উপায়ে নির্মাণ করা কর়া যায়, যাতে কোন ঝড়ের মুখে পড়লে তা উল্টে না গিয়ে আপনা থেকে বিপদ কাটিয়ে চলতে পারে। সুরু করলেন গবেষণা।

এই সময় অর্থাৎ ১৯০৩ সালে বিজ্ঞানী ল্যাংলি মানুষ বইতে পারে এমন ধরনের একটি এরোপ্লেন তৈরি করলেন। কিন্তু ওড়বার আগেই এক দুর্ঘটনায় তা নষ্ট হয়ে গেল। কারণ মোটর ছিল ভারী।

রাইট ভ্রাতৃদ্বয় এই সুযোগ হাতছাড়া করলেন না। তাঁরা যন্ত্রের উন্নতি সাধন করতে লেগে গেলেন এবং সাফল্য লাভ করলেন। ১৯০৩ সালের ১৭ই ডিসেম্বর রাইটভ্রাতৃদ্বয় সর্বপ্রথম এরোপ্লেনে বায়ু ভেদ করে চললেন। ওই এরোপ্লেনের মোটরকে পেট্রল দিয়ে চালানো হলো। তারপর ওঁরা ক্রমে ইঞ্জিনের উন্নতি ঘটিয়ে এমন এক নিখুঁত এরোপ্লন তৈরি করলেন, যাতে করে ওঁরা কোন এক নির্জন স্থানের আকাশপথে বৃত্তাকারে তিন মাইল ঘুরে এলেন। সেটা ১৯০৪ সালের কথা।

এই ঘটনার কথা ওঁরা যুক্তরাষ্ট্রে সরকারকে জানালে সরকার ২৫ হাজার ডলারে এরোপ্লেনের পেটেন্ট ওঁদের কাছ থেকে কিনে নিলেন। সেটা ইংরেজী ১৯০৬ সালের কথা।

ইংরেজী ১৯০৮ সালে সর্বপ্রথম যুক্তরাষ্ট্র সরকারের অনুরোধে রাইট ভ্রাতৃদ্বয় সকলের সম্মুখে তা প্রদর্শন করেন। সেদিন হাজার হাজার দর্শকের সামনে ওঁরা দু-ভাই যখন নিজেদের তৈরি এরোপ্লেন নিয়ে আকাশে ঘুরপাক খাচ্ছিলেন, তখন নীচেকার বিস্ময়বিমুগ্ধ মানুষ ওঁদের হাততালি দিয়ে জানিয়েছিল স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন।

তারপর লোকের চোখ খুললো। ফ্রান্স, জার্মেনী, ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে নানা-ভাবে যন্ত্র-নির্মাণ কৌশলের উন্নতি হতে লাগলো। লর্ড নর্থ ক্লিফ ঘোষণা করলেন, ইংলিশ প্রণালী যে এরোপ্লেনে পার হতে পারবে, তাকে হাজার পাউণ্ড পুরস্কার দেওয়া হবে। ১৯০৯ সালের ২৫শে জুলাই একজন ফরাসী যুবক ইংলিশ প্রণালী

পার হয়ে এই পুরস্কার লাভ করলেন। ১৯১০ সালে আর একজন ফরাসী যুবক লণ্ডন থেকে ম্যাঞ্চেষ্টার ১৮৩ মাইল পথ, উড়ে গিয়ে দশ হাজার পাউণ্ড পুরস্কার পেলেন।

মানুষের চেষ্টারও বিরাম নেই, সাহসেরও অন্ত নেই। ১৯১৯ সালে অ্যালকক· আর ব্রাউন নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড থেকে আয়ার্ল্যাণ্ড এই ১৯৬৩ মাইল পথ, ১৫ ঘণ্টা ৫৭ মিনিটে অতিক্রম করে দশ হাজার পাউণ্ড পুরস্কার পেলেন। আর নাইট উপাধিতে ভূষিত হলেন।

ক্রমেই মানুষের আকাশে ওড়বার উৎসাহ-উদ্দীপনা বেড়ে চললো এবং সেই সঙ্গে এরোপ্লেনেরও যান্ত্রিক উন্নতি হতে লাগলো। ফলে ১৯২৭ সালের ২০ মে সকাল ৭টা ৫২ মিনিটের সময় একখানি ছোট এরোপ্লেন নিয়ে আমেরিকার নিউইয়র্ক সহর থেকে উপরে উঠলেন একটি পঁচিশ বছরের যুবক। এই যুবকের নাম লিণ্ডবার্গ। উদ্দেশ্য আটলান্টিক মহাসমুদ্র পার হয়ে ফ্রান্সের প্যারিস সহরে আসবেন। দূরত্ব ৩৬০০ মাইল। অসংখ্য লোক সহরের ময়দানে জমা হয়েছিল, ঔৎসুক্যের সঙ্গে তারা উপর দিকে তাকিয়ে রইলো—এরোপ্লেন ও এরোপ্লেনের আরোহীকে বোধ হয় এই শেষ দেখা। মুহূর্তের মধ্যে এরোপ্লেন অদৃশ্য হলো। সন্ধ্যা সাড়ে আটটায় একখানা এরোপ্লেনকে ফ্রান্সের সারবুর্গ পার হতে দেখা গেল। প্যারিসের কাছাকাছি নামবার মাঠে অসংখ্য লোক আকাশের দিকে তাকিয়ে—উজ্জ্বল আলো ফেলা হয়েছে। লিণ্ডবার্গ কি পৌঁচতে পারবেন? রাত্রি ১০টা ১০ মিনিটের সময় একখানা এরোপ্লেনের শব্দ শোনা গেল। মনে হলো এটা লিণ্ডবার্গের এরোপ্লেন। আরও কয়েক মিনিট গেল—হ্যাঁ, লিণ্ডবার্গের প্লেনই বটে! দেখতে দেখতে পাক খেতে খেতে এরোপ্লেন মাটিতে নামলো। লোকের সেকি বিপুল আনন্দ! লিণ্ডবার্গ বহু পুরস্কার, বহু পদক পেলেন। ফরাসী রাষ্ট্রের সভাপতি, বেলজিয়ামের রাজা, ইংল্যাণ্ডের সম্রাট পঞ্চম জর্জ তাঁকে সম্মানিত করলেন। শোনা যায় তিনি ডাকে ৩৫ লক্ষ অভিনন্দন পত্র পেয়েছিলেন।

অল্প দিনের মধ্যেই এরোপ্লেনের আরও উন্নতি ঘটলো। বিভিন্ন দেশের মধ্যে যাত্রী ও ডাক নিয়ে এরোপ্লেন যাতায়াত সুরু করলো। এমনকি, ১৯৩৭ সালের ১৪ই জুন রাশিয়ার তিন জন বৈমানিক মস্কো থেকে যাত্রা করে কোথাও না থেমে ৬২ ঘণ্টায় ৬৯০০ মাইল পথ অতিক্রম করে ক্যালিফোর্নিয়া এসে পৌঁছলেন। এমনি করেই ধীরে ধীরে এরোপ্লেন মানব-সভ্যতা বিকাশের দ্রুততম যান হয়ে দাঁড়ালো। শব্দের বেগ সেকেণ্ডে ১১২০ ফুট, পরবর্তী সময়ে সে বেগও ছাড়িয়ে গেল। আর আজ বিশ্বের দ্রুততম মহাকাশযান চাঁদের দেশে পাড়ি জমালো। চাঁদের দেশে লোক নাবালো। এসবই সম্ভব হলো মানুষের পাখীর মত ওড়বার সখ থেকে।

সুনীল সরকার

ওরিয়েণ্টার

তোমরা নিশ্চয়ই জান যে, বাদুড়েরা ওড়বার সময় শব্দ করতে থাকে। এই শব্দ-তরঙ্গ, আশে-পাশের বাধা থাকলে তা থেকে প্রতিফলিত হয়ে আবার ফিরে আসে। বাদুড়েরা ফিরে আসা শব্দ থেকেই বুঝতে পারে—বাধার উৎস কোথায়। আর তাই তাদের চলার পথের বাধাগুলিকে অদ্ভুত উপায়ে এড়িয়ে তারা সঠিক পথে চলাচল করে।

বাদুড়দের দেখে বিজ্ঞানীরা ভাবলেন—বাদুড়ের বাধা অতিক্রম করবার গুণটিকে কাজে লাগানো যায় কি না। তাঁরা এই বিষয়ে ভাবতে সুরু করলেন এবং পরীক্ষা করে দেখলেন—বাদুড়েরা যে শব্দ-তরঙ্গ পাঠায়, তা অত্যন্ত উচ্চ কম্পনাঙ্কবিশিষ্ট। মানুষের কানে এই শব্দ শোনা অসম্ভব; অর্থাৎ তাদের শোনবার বাইরে। এই শব্দ-তরঙ্গকে বলে সুপারসনিক ওয়েভ (Supersonic wave) বা শব্দোত্তর তরঙ্গ। সাধারণতঃ সেকেণ্ডে কুড়ি হাজার কম্পনাঙ্কের বেশী হলেই তাকে শব্দোত্তর তরঙ্গ বলা হয়।

বাদুড়ের শব্দোত্তর তরঙ্গের সাহায্যে বাধা অতিক্রম করবার এই বিশেষ ধর্মটিকে ব্যবহারিক কাজে লাগিয়ে রাশিয়ায় বৈজ্ঞানিকেরা একটি যন্ত্র বানিয়ে ফেললেন। যন্ত্র তৈরি হলো এবং তা বিশেষ বিশেষ কাজে ব্যবহৃত হতে লাগলো। হঠাৎ তাঁদের নজর পড়লো অন্ধদের দিকে, যাঁদের দৃষ্টিশক্তি নেই, যাঁদের কাছে চারিদিক শুধুই অন্ধকার।

পৃথিবীর সমস্ত দেশেই অন্ধ মানুষদের নতুন নতুন সুযোগ ও সুবিধা দেবার জন্যে চেষ্টা চলছে। দেখা গেছে, সাধারণ মানুষের চেয়ে অন্ধরা অনেক বেশী স্পর্শকাতর। অনেক আগেই তাঁরা কতগুলি জিনিষ বুঝতে পারেন। অভ্যাসের ফলে লেখা-পড়া, অন্যান্য কারুকর্ম, তাঁরা আস্তে আস্তে শিখতে পারেন। অন্ধদের জন্যে নতুন কোন যন্ত্র তৈরির সময় তাঁদের এই বিশেষ গুণ বা ধর্মের উপর নজর দেওয়া হয়।

তোমরা জান অন্ধদের অবলম্বন হাতের ঐ একটি লাঠি। লাঠি ঠুকে ঠুকে আর তার শব্দ শুনে তাঁরা চলা-ফেরা করেন। কিন্তু আজকের এই বিজ্ঞানের উন্নতির দিনে শুধু লাঠির উপরে নির্ভর করেই তাঁরা রাস্তায় চলা-ফেরা করবেন তাতো হতে পারে না। সব সময়ই একটা অজানা ভয় তাঁকে ঘিরে থাকবে। বাস-ট্রাম, গাড়ী-ঘোড়ার সঙ্গে সঙ্গে রাস্তার খানা বা গর্ত, এই সব বিপদের হাত থেকে রক্ষা পাবার উপায়ের কথাও তাঁদের চিন্তা করা দরকার।

বিজ্ঞনীরা চিন্তা করতে লাগলেন—কেমন করে শব্দোত্তর তরঙ্গের সাহায্যে নির্মিত যন্ত্রটিকে অন্ধদের পথ চলবার কাজে লাগানো যায়। অবশেষে এল ওরিয়েণ্টার। হাল্কা এই যন্ত্রটিকে গলায় ঝুলিয়ে রাস্তায় নিয়ে যাওয়া যায়। এর ওজন ২৩০ গ্র্যাম।

একাধারে প্রেরক ও গ্রাহক-যন্ত্রটি একটি নির্দিষ্ট উঁচু কম্পনাঙ্কে শব্দোত্তর তরঙ্গ পাঠাতে থাকে। এর গতিপথের চারধারে কোনও রকম বাধা থাকলে, প্রতিফলিত শব্দ-তরঙ্গ যন্ত্রটিতে ফিরে আসে। সঙ্গে সঙ্গে সুরু হয় গ্রাহক-যন্ত্রের কাজ। ফিরে আসা শব্দ-তরঙ্গকে গ্রহণ করে তার থেকে বিভিন্ন সঙ্কেতের সৃষ্টি হয়। কানের সঙ্গে তার দিয়ে গ্রাহক-যন্ত্রের সঙ্গে যোগাযোগ করা থাকে।

শব্দের সঙ্কেত অনুযায়ী তাঁরা বাধার আকৃতি ও প্রকৃতি বুঝতে পারেন। এক এক ধরণের বাধার জন্যে এক এক রকম সঙ্কেত যন্ত্রটি জানিয়ে দেয়। সামনে বাড়ী আছে, না গাড়ী-ঘোড়া আসছে, রাস্তায় খানা-খন্দ থাকলেও ওরিয়েণ্টার তা জানিয়ে দেয় সঙ্কেতের সাহায্যে। এমন কি ঐ বাধাটা অন্ধ লোকটির থেকে কোন্ দিকে, কতটা দূরে আছে ইত্যাদি বিষয় জানিয়ে দেয়। এক কথায় ওরিয়েণ্টার থাকলে অন্ধরা একেবারে নিশ্চিন্ত। শুধুমাত্র সঙ্কেতগুলিকে মনে রাখতে হবে।

দেখা যাচ্ছে জীবজগতের বাদুড়েরা যেমন খুব সূক্ষ্ম বাধাকে অবলীলাক্রমে এড়িয়ে যায়, তেমনি যাঁরা চোখে কম দেখেন বা একেবারেই দেখতে পান না, তাঁরাও রাস্তায় একান্ত নির্ভয়ে ও নিশ্চিন্তে ওরিয়েণ্টারের সাহায্যে পথ চলতে পারেন।

এই ছোট যন্ত্র ওরিয়েণ্টার আবিষ্কারের মূলে আছে প্রকৃতির থেকে নেওয়া বৈজ্ঞানিক শিক্ষা। প্রকৃত জানবার মন নিয়ে চেষ্টা করেছে বলেই মানুষ আজ তৈরি করেছে ওরিয়েণ্টার, যা অন্ধদের কাছে এনেছে নতুন আশ্বাস, নতুন করে জীবনে বেঁচে থাকবার স্বপ্ন। প্রকৃতির পাঠশালায় এরকম অনেক কিছুই শেখবার আছে।

অজয় গুপ্ত

প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ১। আমরা স্বপ্ন দেখি কেন?

মানসী দাস
কলিকাতা-৩৪

প্রশ্ন ২। আমাদের দেশে অনেকেই পান খাওয়ার নেশা করেন। এর কোন উপকারিতা আছে কি?

সুরজিৎ মান্না, প্রণব বসু
কলিকাতা-৪০

উত্তর ১। মানুষ যখন জেগে থাকে তখন তার মানসিক চিন্তাধারা সুসংবদ্ধ-ভাবে পরিচালিত হয়। ঘুমন্ত অবস্থায় মানুষ এমন সব ব্যাপার চিন্তা

করতে পারে, যার কোন বাস্তব ভিত্তিই নেই—যাকে আমরা স্বপ্ন বলি। তবে স্বপ্ন মাত্রই যে এলোমেলো চিন্তা—তা নয়। দেখা গেছে যে, অনেক সময় মানুষ ঘুমের মধ্যেও অঙ্ক কষে। স্বপ্ন সম্বন্ধে সাধাণতঃ দুটি মতবাদ বিজ্ঞানী মহলে প্রচলিত আছে। প্রথম মতবাদ অনুযায়ী স্বপ্ন শারীরিক কারণ থেকে উদ্ভূত হয়। এই মতে বিশ্বাসী বিজ্ঞানীদের ধারণা যে, একজন ঘুমন্ত লোকের গায়ে যদি জল ছিটানো যায়, তবে ঐ লোকটি ঘুমের মধ্যে বৃষ্টির স্বপ্ন দেখবেন। কিন্তু দ্বিতীয় মতবাদ অনুযায়ী, স্বপ্ন ব্যক্তিবিশেষের মানসিক চিন্তাধারার দ্বারা প্রভাবিত। এই মতবাদে বিশ্বাসী বিজ্ঞানীদের ধারণা যে, উপরিউক্ত ব্যক্তি ঘুমের মধ্যে বৃষ্টির স্বপ্ন দেখবেন, না স্নানের স্বপ্ন দেখবেন, সেটা তার মানসিক চিন্তাধারার উপর নির্ভর করে।

স্বপ্ন সম্বন্ধে প্রচলিত সর্বাধুনিক মতবাদ অনুযায়ী বলা যায় যে, স্বপ্নের মধ্যে মানুষ যে সব কথা চিন্তা করে সেগুলি আপাতদৃষ্টিতে খুব খাপছাড়া ও অবাস্তব বলে মনে হলেও এগুলির সঙ্গে মানুষের বাস্তব জীবনের চিন্তাধারার যথেষ্ট যোগ রয়েছে। দৈনন্দিন জীবনে মানুষের যে সকল আকাঙ্খা পরিতৃপ্ত হয় না, স্বপ্নের মাধ্যমে মানুষের সেই সব আকাঙ্খা পরিতৃপ্ত হয়। আকাঙ্খার অপরিতৃপ্তি মানুষের মনে যে অশান্তি সৃষ্টি করে, স্বপ্নে সেই মানসিক অশান্তি দূর হয় বলে অনেকে মনে করেন।

আমাদের মানসিক চিন্তাধারার সচেতন ও অবচেতন, এই দুটি দিক স্বপ্নের মধ্যে পূর্ণতা লাভের চেষ্টা করে। তবে ফ্রয়েডের মতে প্রতি স্বপ্নের মধ্যেই থাকে অবচেতন মনের ইচ্ছার পরিতৃপ্তি, যা সচেতন মনের ইচ্ছার ভিত্তিতেই গড়া। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চিন্তাধারার পরিবর্তন ঘটে। চিন্তাধারার এই পরিবর্তন স্বপ্নকেও প্রভাবান্বিত করে। ছোট শিশুদের ক্ষেত্রে আত্মসচেতনতা খুবই কম। তাই স্বপ্নে তাদের অপরিতৃপ্ত ইচ্ছা সোজাসুজি পরিতৃপ্ত হয়। যেমন, কোন শিশু যদি রূপকথা শুনে ভাবে যে, সে রূপকথায় বর্ণিত পরীর দেশে যাবে, তবে ঘুমিয়ে সে স্বপ্ন দেখে যে, সত্যই পরীর দেশে গিয়ে সে হাজির হয়েছে। কিন্তু রূপকথা যে রূপকথাই—বাস্তব নয়, এই বোধ না থাকায়, তার ইচ্ছা পরিতৃপ্তি লাভের পথে বাধাপ্রাপ্ত হয় না। কিন্তু বয়স্কদের ক্ষেত্রে রুদ্ধ ইচ্ছা সোজাসুজিভাবে পরিতৃপ্ত হয় না। তাদের আত্মসচেতনতা ঘুমের মধ্যেও প্রহরীর মত ইচ্ছা প্রকাশের পথে বাধা দেয়—কাজেই স্বপ্নে তাদের রুদ্ধ ইচ্ছা সোজাসুজিভাবে না হয়ে পরোক্ষভাবে পরিতৃপ্তি লাভ করে।

মানসিক অবস্থার দ্বারা স্বপ্ন বহুলাংশে প্রভাবিত হলেও, শারীরিক অসুস্থতার জন্যেও মানুষ অনেক সময় স্বপ্ন দেখে। অপাক বা অজীর্ণ রোগের মত শারীরিক কারণে অনেক সময় ঘুমন্ত অবস্থায় মানুষ বাক্‌শক্তিহীন হয়ে পড়ে, যাকে আমরা বলি বোবায় ধরা।

এতক্ষণ পর্যন্ত স্বপ্নের রহস্য নির্ধারণের জন্যে যে কারণগুলি আলোচনা করলাম, সেগুলি সবই প্রায় অনুমানভিত্তিক। স্বপ্নের উৎপত্তির রহস্য নিয়ে অনেক মনস্তত্ত্ববিদ্ এখন পুরোদমে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন। আমরা আশা করছি এমন দিন খুব বেশী দূরে নয়, যে দিন আমরা স্বপ্ন সম্বন্ধে সব তথ্যই জানতে পারবো।

উত্তর ২। পান হচ্ছে একপ্রকার লতাজাতীয় উদ্ভিদ। পান খাওয়ার গুণাগুণ বিচার করতে হলে এর সঙ্গে চুন, সুপারি, খয়ের, দোক্তা, এলাচ, লবঙ্গ প্রভৃতি বিভিন্ন মশলার কথাও চিন্তা করতে হবে। কারণ পান খাওয়ার আনুষঙ্গিক হিসাবে এগুলিকে আমরা গ্রহণ করি।

পানের মধ্যে গন্ধযুক্ত একটা উদ্বায়ী তৈলজাতীয় পদার্থ থাকে। এই তৈলাক্ত পদার্থের মধ্যে ফেনলজাতীয় চেভিকল নামে একপ্রকার যৌগ আছে, যার জীবাণু-নাশক ক্ষমতা যথেষ্ট বেশী। পানের মধ্যে জলীয়াংশ ও তৈলজাতীয় পদার্থ ছাড়াও প্রধানতঃ শ্বেতসার, শর্করাজাতীয়, ট্যানিন, ডায়াস্টেজ এন্‌জাইম, ক্লোরোফিল ইত্যাদি পাওয়া যায়। এই উপাদানগুলির মধ্যে ডায়াস্টেজ এন্‌জাইম শ্বেতসার জাতীয় খাদ্যদ্রব্য হজমের কাজে সাহায্য করে। পান, লবঙ্গ, এলাচ প্রভৃতিতে ঝাঁঝালো তেল থাকে। পান চিবানোর সঙ্গে সঙ্গে ঐ তেল বিভিন্ন লালাগ্রন্থিকে উত্তেজিত করে। ফলে লালারস নির্গত হয়, যা হজমের কাজে সাহায্য করে। পান মুখের লালা নিঃসৃত করে হজমের সহায়তা করে বলে গুরুভোজনের পরে সাধারণতঃ অনেকেই পান খেয়ে থাকেন। পান সাময়িকভাবে শরীরের মাংসপেশী ও মনের কার্যক্ষমতা বাড়িয়ে তোলে। কাঁচা সুপারি দিয়ে পান খেলে ১০ থেকে ১৫ শতাংশ পর্যন্ত কার্যক্ষমতা বেড়ে যায়। এরাবিন নামক একপ্রকার উপক্ষারই (Alkaloid) এই বর্ধিত কার্যক্ষমতার জন্যে দায়ী। এটি চুনের উপস্থিতিতে সুপারি থেকে নির্গত হয়। সর্দি, স্বরভঙ্গ ইত্যাদিতে পানের রস মধুর সঙ্গে মিশিয়ে খেলে উপকার পাওয়া যায়। পান খেলে নিশ্বাসের দুর্গন্ধ দূর হয় ও মনে প্রফুল্লতা আসে। আমাদের শরীর গঠনের পক্ষে অন্যতম প্রয়োজনীয় উপাদান হলো ক্যালসিয়াম। প্রতিটি খিলি পানের সঙ্গে আমরা প্রায় এক গ্রেন করে চুন খাই। কাজেই পানের মাধ্যমে আমরা সস্তায় কিঞ্চিৎ পরিমাণ ক্যালসিয়ামও পেয়ে থাকি।

অল্পমাত্রায় পান খেলে আমাদের কোন ক্ষতি হয় না। কিন্তু অতিরিক্ত মাত্রায় পান এবং তৎসহ জর্দা, তামাক ইত্যাদি অতিরিক্ত মাত্রায় খেলে অনেক সময় ঠোঁট, মুখ, জিভ ও গলায় বিভিন্ন প্রকারের রোগ দেখা যায়। অতিরিক্ত পান খাওয়ায় দাঁতের উপর ক্রমশঃই ঘন বাদামী রঙের আস্তরণ পড়তে থাকে এবং এই আস্তরণ আস্তে আস্তে দাঁতের মাড়ির মধ্যে প্রবেশ করে।

ফলে কোন কোন ক্ষেত্রে পাইওরিয়া রোগ দেখা যায়। অতিরিক্ত পান খাওয়ার ফলে আমাদের লালাগ্রন্থি থেকে অতিরিক্ত পরিমাণে লালা নির্গত হয়। শরীরের পক্ষে এই অতিরিক্ত লালা নিঃসরণ একটা অপচয়। পান, চুন, খয়ের ইত্যাদির মিশ্রিত ক্রিয়ায় জিভের উপর একটা আস্তরণ পড়ে যায়, যার জন্যে কোন জিনিষের স্বাদ ভাল করে বুঝতে পারা যায় না।

শ্যামসুন্দর দে

বিবিধ

পরলোকে বিখ্যাত উদ্ভিদতত্ত্ববিদ্ ডক্টর কালীপদ বিশ্বাস

বিখ্যাত উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী ডক্টর কালীপদ বিশ্বাস গত ২৯শে ডিসেম্বর মারা গিয়েছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭০ বছর।

উদ্ভিদবিদ্যায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র ডক্টর বিশ্বাস ১৯২১ সালে শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনের কিউরেটর নিযুক্ত হন। ১৯৩৬ সালে তিনি বৃটেনের কিউ গার্ডেনে গবেষণার জন্যে চলে যান।

উদ্ভিদবিদ্যায় এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করে তিনি দেশে ফিরে আসেন। ১৯৩৭ সালে স্থায়ীভাবে তিনি শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনের সুপারিনটেণ্ডেন্ট নিযুক্ত হন। এই সময়েই তিনি ভারতের প্রায় সব কয়টি অঞ্চল ঘুরে বেড়ান এবং অনেক গাছগাছড়া সংগ্রহ করেন। 'ভারতীয় বনৌষধি' নামক তাঁর পুস্তকটি যথেষ্ট প্রশংসা লাভ করে। এই পুস্তকের জন্যেই ১৯৫১-৫২ সালে তিনি বিজ্ঞানে রবীন্দ্র-পুরস্কার পান। ১৯৪৩ সালে তিনি ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের উদ্ভিদ শাখার সভাপতি হন। ১৯৫৪ সালে মস্কোয় কৃষি প্রদর্শনীতে আমন্ত্রিত হয়ে তিনি যোগ দেন। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বহু বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থা তাঁকে সম্মানিত করেছেন। ডক্টর বি. সি. রায়ের আমলে কিছুদিনের জন্যে তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভেষজ উদ্ভিদ কমিটির ডিরেক্টরও নিযুক্ত হয়েছিলেন। ভারতীয় কৃষি গবেষণাগার ও ভারতীয় শিল্প গবেষণা পর্ষদের সঙ্গেও তিনি নানাভাবে যুক্ত ছিলেন। ভারতে ইপিকাক ও অন্যান্য ভেষজ উদ্ভিদের চাষের উন্নয়ন সম্পর্কে ভারত সরকার তাঁর অমূল্য পরামর্শ গ্রহণ করেছেন।

পরলোকে অধ্যাপক ম্যাক্স বোর্ন

অধ্যাপক ম্যাক্স বোর্ন গোটিংগেনে (জার্মেনী) গত ৫ই জানুয়ারী পরলোকগমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৭ বছর।

তিনি ১৯১৪ সালে বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং ১৯২১ গোটিংগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার প্রধান অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। ১৯২৬ সালে প্রকাশিত পরমাণু পদার্থ-বিজ্ঞানের ভৌতিক ব্যাখ্যা সম্বন্ধীয় তাঁর মৌলিক গবেষণা খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

জাতিতে ইহুদি বলে ১৯৩৩ সালে জার্মেনী থেকে তিনি পলায়ন করেন। ১৯৩৯ সালে তিনি বৃটিশ নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে তিনি এডিনবরা, কেম্ব্রিজ ও বার্লিনে শিক্ষকতা করেন। ১৯৫৩ সালে তিনি অধ্যাপনা থেকে অবসর গ্রহণ করে জার্মেনীতে চলে যান। ১৯৫৪ সালে তিনি পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। বিজ্ঞান ও দর্শনবিষয়ক তিনি প্রায় ২০টি পুস্তক লিখেছেন।

এই সংখ্যার লেখকগণের নাম ও ঠিকানা

১। মহুয়া বিশ্বাস
১৫।বি, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

২। দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
বি-৩, সি. আই. টি বিল্ডিংস
৩০, মদন চাটার্জী লেন
কলিকাতা-৭

৩। নলিনীরঞ্জন চক্রবর্তী
৯২, যতীনদাস রোড
কলিকাতা-২৯

৪। গোপাল রায়
ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারীং ডিপার্টমেণ্ট
পাঞ্জাব ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ
চণ্ডীগড়

৫। মলয়কুমার চক্রবর্তী
বিভাগ
প্রেসিডেন্সী কলেজ
কলিকাতা-১২

৬। অঞ্জলি রায়
অবধারক—সোমেন্দ্রলাল রায়
মিশন কম্পাউণ্ড
বোলপুর, বীরভূম

৭। অলোকরঞ্জন বসুচৌধুরী
৩০৭, ভালবাসা
জামসেদপুর ৯
সিংভূম

৮। সুনীল সরকার
বি. পি. সি. জুনিয়র টেকনিক্যাল স্কুল
পোঃ কৃষ্ণনগর
জেলা—নদীয়া

৯। অজয় গুপ্ত
১।২৮২, নাকতলা
কলিকাতা-৪৭

১০। শ্রীশ্যামসুন্দর দে
ইনষ্টিটিউট অব রেডিও ফিজিক্স
অ্যাণ্ড ইলেকট্রনিক্স
বিজ্ঞান কলেজ
কলিকাতা-৯

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস কর্তৃক পি-২৩, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬ হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ
৩৭।৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

ত্রয়োবিংশ বর্ষ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭০ দ্বিতীয় সংখ্যা

ভিটামিন

অমলচন্দ্র সাহা

শারীর-বিজ্ঞানে প্রধান প্রধান বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারসমূহের মধ্যে ভিটামিন অন্যতম। কিন্তু পয়ষট্টি বছর আগেও বিজ্ঞান-জগতে ভিটামিনের সন্ধান ভালভাবে কেউ জানতো না। অবশ্য খাদ্যগুণ সম্পর্কে অস্পষ্ট ধারণা বিভিন্ন দেশে যে একেবারেই ছিল না একথা বলা যায় না। চরক-সুশ্রুতের যুগেও ভারতীয়রা জানতো, দৈহিকশক্তি বৃদ্ধির জন্যে দুধ, ডিম, চর্বি, মধু, মাখন প্রভৃতি আবশ্যক। বন্ধ্যাত্ব নিবারণের জন্যে লতা-পাতা ও মূলের পাঁচন প্রয়োজন হতো। দৈ, ঘোল, ছানা প্রভৃতি আন্ত্রিক ব্যাধির নিরাময়ক বলে গণ্য হতো। অঙ্কুরিত মুগ, ছোলা, কলাই ছিল নানা রকম চক্ষুরোগের প্রতিষেধক। ভারতবর্ষ ছাড়া মিশর, গ্রীস, চীন ও অন্যান্য প্রাচীন সুসভ্য দেশেও দৈহিকশক্তির বৃদ্ধি ও ব্যাধির প্রতিষেধকের জন্যে বিভিন্ন খাদ্যবস্তু গ্রহণের বিধান ছিল। উনবিংশ শতাব্দীতে জাহাজের নাবিকেরা জানতো টাট্‌কা ফল-মূল, শাক-সব্জী, মাছ-মাংস স্কার্ভি ও বেরিবেরি রোগের প্রতিষেধক। লুনিন (Lunin) ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে দেখতে পান, ইঁদুরকে শুধু প্রোটিন, ফ্যাট, কার্বোহাইড্রেট ও খনিজ পদার্থ মিশ্রিত খাদ্যের সাহায্যে বেশী দিন বাঁচাতে পারা যায় না। কিন্তু কেন বাঁচানো যায় না, তা তিনি ঠিক

করে বলে যেতে পারেন নি। ওলোন্দাজ আইকম্যান (Eijkmann) ছিলেন কারাগারের একজন চিকিৎসক, ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে তিনি দেখলেন কয়েদীরা প্রায়ই বেরিবেরি রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যাচ্ছে। প্রতিকারের জন্যে আইকম্যান চিন্তিত হলেন। অনুসন্ধান করে জানলেন যে, তাঁদের শুকনো স্টার্চজাতীয় খাদ্যবস্তু খেতে দেওয়া হচ্ছে। তিনি কয়েদীদের আহার্যে টাট্‌কা শাক-সব্জী, মাছ-মাংসের পরিমাণ বৃদ্ধি করলেন। খাদ্য পরিবর্তনে কয়েদীদের বেরিবেরি রোগ দূরীভূত হলো। কিন্তু আইকম্যান রোগ উদ্ভবের কারণ নিরূপণ করতে পারলেন না। অধ্যাপক হপ্‌কিন্স (Gowland H. Hopkins) ১৯১২ সালে প্রমাণ করেন, খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে একটি 'অত্যাবশ্যক সহকারী উপাদান' (Accessory factors of diet) আছে। খাদ্যবস্তুতে এর অভাবে প্রাণীর স্বাস্থ্যরক্ষা, দৈহিকশক্তির বৃদ্ধি ও জীবনধারণ অসম্ভব। লিষ্টার ইনষ্টিটিউটের বিজ্ঞানী ফুঙ্ক (C. Funk) চাল বিশ্লেষণ করে এমন একটি অত্যাবশ্যক সহকারী উপাদান পেলেন, যা বেরিবেরি রোগের প্রতিষেধক। বিজ্ঞানী ফুঙ্ক তাঁর গবেষণালব্ধ অত্যাবশ্যক সহকারী উপদান-এর নামকরণ করেন ভিটামিন। প্রাণীর জীবনধারণের জন্যে এটি অতীব প্রয়োজনীয়। ভিটা (Vita) মানে জীবন; আর অ্যামিন (Amine) জাতীয় রাসায়নিক পদার্থের অনুরূপ বলে এগুলি হলো ভিটামিন। কিন্তু বিজ্ঞানী ড্রামন্ড-এর মতে, অত্যাবশক সহকারী উপাদানগুলি প্রকৃতই অ্যামিনজাতীয় রাসায়নিক পদার্থ নয়। প্রোটিনজাতীয় খাদ্য গ্রহণে শরীরে অ্যামিনো অ্যাসিড তৈরি হয় এবং পরে তা রক্তের সঙ্গে মিশে যায়। বাংলায় ভিটামিনকে খাদ্যপ্রাণ বলা যেতে পারে।

বিজ্ঞানীদের অক্লান্ত চেষ্টার ফলে অনেক প্রকারের ভিটামিন আবিষ্কৃত হয়েছে। শুধু আবিষ্কারই নয়, সেগুলির ক্রিয়া ও প্রকৃতি জানা গেছে। ভিটামিন প্রধানতঃ উদ্ভিদ ও প্রাণী-জগতের দান। স্বাস্থ্যতত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন—খাদ্যে ভিটামিনের অভাব হলে দৈহিকশক্তির বৃদ্ধি সঠিকভাবে হয় না। দৈহিক যন্ত্রের জীবনীশক্তি কমে যায়। এমন কি উৎসাহ, উদ্যম, তেজস্বিতা এবং রোগ-প্রতিরোধের ক্ষমতা পর্যন্ত ক্রমে লোপ পেয়ে যায়। এই সময়ে নানা প্রকারের কঠিন সংক্রামক ব্যাধি আক্রমণ করে, যার ফলে অকালেই মৃত্যু ঘটে।

বর্তমানে নানা প্রকারের ভিটামিনের সঙ্গে আমরা পরিচিত। তবে সেগুলির ক্রিয়া, প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে সেগুলিকে মোটামুটি কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

ভিটামিন-এ দেহকে পুষ্ট ও সবল রাখে, রোগ-প্রতিরোধের ক্ষমতা যোগায় এবং উত্তাপে সহজে নষ্ট হয় না। প্রায় ১২০° সে. তাপাঙ্ক পর্যন্ত এটি অবিকৃত থাকে। তাই সিদ্ধ বা রন্ধনের সময়ে সহজে এর বিকৃতি ঘটে না। কিন্তু সূর্যকিরণের সংস্পর্শে অথবা রঞ্জেনরশ্মির প্রয়োগে এটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ভিটামিন-এ'র অভাবে দেহ দুর্বল, শীর্ণ ও খর্বকায় হয়, দৃষ্টিশক্তি কমে যায়, অস্থি ও দাঁতের বৃদ্ধি সঠিকভাবে হয় না। নানাবিধ রোগ, বিশেষতঃ চুল-ওঠা, নখ মরে যাওয়া, শ্লেষ্মা, সর্দিজ্বর, হাঁপানি, ব্রঙ্কাইটিস, চর্মরোগ, নিউমোনিয়ার আক্রমণ ঘটে। উপরন্তু, পুং ও স্ত্রী যৌনগ্রন্থির বন্ধ্যাত্ব ঘটে। মাছ, মাংস, ডিমের কুসুম, দুধ, সবুজ পাতাযুক্ত শাক-সব্জী, গাঁজর, পেঁপে এবং সামুদ্রিক কড্‌জাতীয় মাছের যকৃতের তেলে ভিটামিন-এ যথেষ্ট পরিমাণে থাকে।

ভিটামিন-বি হচ্ছে অনেকগুলি ভিটামিনের সমষ্টি। এগুলির মধ্যে আকৃতি ও প্রকৃতিতে সাদৃশ্য আছে।

ভিটামিন-বি$_1$ চাল, আটা, ছোলা, মুগ, মটর

ডাল, আলু, বাঁধাকপি, ডিম, মাছ ও মাংসে অত্যধিক পরিমাণে থাকে। এর অভাবে বদহজম, অস্থিরগতি, বিনা পরিশ্রমে ক্লান্তি এবং বেরিবেরি রোগের আক্রমণ ঘটে

ভিটামিন-বি$_2$ পালং, কল্মি, নটে শাক, টোম্যাটো, পিঁয়াজ, দুধ, ডিম, লেবু, বাদাম, গম, জোয়ার প্রভৃতিতে পাওয়া যায়। খাদ্যে এর অভাবে চোখে ছানি পড়ে, চোখ ওঠে, চুল ওঠে, মূর্ছা যায় এবং পেলাগ্রা রোগ দেখা দেয়। পেলাগ্রা রোগের আক্রমণ তখনই হয়, যখন ত্বক চর্মরোগসহ লাল্‌চে হয়ে ওঠে। জিহ্বা ও মুখগহ্বরে ক্ষতের সৃষ্টি হয়। অন্ত্র ও পাকস্থলী ঠিকভাবে কাজ করে না। ক্রমে শারীরিক ও মানসিক অবসাদ এবং বৈকল্য দেখা দেয়।

ভিটামিন-বি$_6$ গম, আকাঁড়া চাল, বাদাম, দুধ, ছোলা, মুগ ডালে যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান। আহার্য বস্তুতে এর অভাবে নিদ্রাহীনতা, রক্তাল্পতা ও চর্মরোগের আবির্ভাব ঘটে।

ভিটামিন-সি নানা প্রকার সংক্রামক রোগ প্রতিরোধক। সাধারণতঃ মটর-শুঁটি, টোম্যাটো, মূলা, পাকা লঙ্কা, লেবু, আলু, টাট্‌কা শাক-সব্জী, আম, আনারস, আঙ্গুর, অঙ্কুরিত ছোলা, কপি আর আমলকীতে বেশী পরিমাণে ভিটামিন-সি থাকে। অল্প উত্তাপেই ভিটামিন-সি নষ্ট হয়ে যায় বলে কাঁচা, টাট্‌কা অবস্থায় উপরিউক্ত খাদ্য গ্রহণ করলে বিশেষ ফলপ্রদ হয়। ভিটামিন-সি দেহের রক্ত বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে। এর অভাবে স্বার্ভি (Scurvy), ধনুষ্টঙ্কার, ডিপ্‌থেরিয়া, আমাশয়, হুপিংকাশির প্রাদুর্ভাব ঘটে।

ভিটামিন-ডি আমাদের মাংসপেশীকে সুদৃঢ় করে। মাখন, কাঁচা দুধ, ডিমের কুসুমে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন-ডি থাকে। চর্বিযুক্ত মাছ, মাংস ও বিভিন্ন প্রকার সব্জীর মধ্যেও কিছু কিছু ভিটামিন-ডি পাওয়া যায়। কড্‌লিভার অয়েল, হ্যালিবাট অয়েল, সার্কলিভার অয়েলে অধিক পরিমাণে ভিটামিন-ডি বিদ্যমান। খাদ্যে ভিটামিন-ডি-এর যথেষ্ট অভাবে শিশুদেহে রিকেট (Ricket) রোগ জন্মায়। এই রোগের উপর সূর্যালোকের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। রোগটির প্রাদুর্ভাব শীতপ্রধান দেশে বেশী। ইংল্যাণ্ড, নরওয়ে, ফিনল্যাণ্ডে অপ্রচুর সূর্যালোক শিশুদের রিকেট রোগ জন্মাবার অন্যতম কারণ। ভিটামিন-ডি-এর অভাবে দেহের অভ্যন্তরস্থিত ক্যালসিয়াম ও ফস্‌ফরাসের ব্যবহার ভালভাবে হয় না বলে অস্থিগুলি তুলনামূলকভাবে বাড়তে পারে না। আজকাল আলট্রাভায়োলেট রশ্মির সাহায্যে অনেক ক্ষেত্রে রিকেট রোগের চিকিৎসা করা হয়ে থাকে।

ভিটামিন-ই দৃষ্টিহীনতা, তোত্‌লামি, অগ্ন্যাশয় ও লিভারের প্রদাহজনিত পীড়ায় ব্যবহৃত হয়ে থাকে। হৃদ্‌রোগ, রক্তশিরা, বন্ধ্যাত্ব এবং করোনারি থ্রম্বোসিস, রোগে ভিটামিন-ই-এর প্রয়োগে সুফল পাওয়া গেছে। মাত্রাতিরিক্ত আরামপ্রিয়তা, অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রম, অত্যধিক পরিমাণে আমিষ ও তৈলাক্ত খাদ্য গ্রহণের ফলেই করোনারি থ্রম্বোসিস রোগের আবির্ভাব ঘটে। যাঁরা বিলাসিতাবর্জিত জীবনযাপন করেন, নিরামিষ খাদ্য গ্রহণ করেন এবং প্রয়োজনীয় শারীরিক পরিশ্রম করেন, তাঁরা এই রোগে আক্রান্ত হন না বললেই চলে। অত্যধিক আমিষ ও তৈলাক্ত খাদ্য গ্রহণের ফলে রক্তে কোলেস্টেরলের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। কোলেস্টেরলের প্রভাবে হৃৎপিণ্ডের করোনারি ধমনীর মধ্যের রক্তকণিকা জমাট বাঁধতে আরম্ভ করে। ফলে ধমনীর রক্তপ্রবাহ বন্ধের দরুণ হৃৎপিণ্ডের মাংসপেশীর খাদ্যের অভাব ঘটে। খাদ্যাভাবে হৃৎপিণ্ড ক্রমশঃ দুর্বল হয়, অবশেষে একদিন চিরকালের জন্যে স্তব্ধ হয়ে যায়।

ভিটামিন-ই-এর প্রয়োগে অকাল বার্ধক্যকে

নিবারিত করা যায়। এর নিয়মিত ব্যবহারে উৎসাহ, উদ্দীপনা ও মনের আনন্দ ফিরে পাওয়া যায়। সাধারণতঃ কড্‌লিভার অয়েল, ডিমের কুসুম, যব, সয়াবিন, বাদাম, মাখন ও বিভিন্ন প্রকার ফলে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন-ই থাকে। খাদ্যে এর অভাবে বীর্যবাহী নলগুলি সঙ্কুচিত হয়ে যৌন-ক্ষমতা লুপ্ত হয় আর বন্ধ্যাত্ব দেখা দেয়।

ভিটামিন-এফ. ভিটামিন-ই-এর সাহায্যকারী রূপে ক্রিয়া করে। বিজ্ঞানী ইভান্সের মতে, নিরপেক্ষ স্নেহজাতীয় খাদ্যে ভিটামিন-এফ বিদ্যমান।

ভিটামিন-জি, দুধ, ডিম, যকৃৎ ও ঘাসে পাওয়া যায় অতি অল্প পরিমাণে। অঙ্কুরিত ছোলাতে বেশী পরিমাণে ভিটামিন-জি থাকে।

ভিটামিন-এইচ সাধারণতঃ বায়োটিন নামে পরিচিত। ঈষ্ট, ছত্রাক, নানা প্রকারের নিম্নস্তরের জীবাণুর (Microorganisms) বেঁচে থাকা ও বংশ বিস্তারের পক্ষে ভিটামিন-এইচ সহায়ক। মানুষ, গিনিপিগ, খরগোস, কুকুর, মুরগী ও ইঁদুরের খাদ্যে এটির থাকা আবশ্যক। বিভিন্ন রকম ফল, ঘাস, ঝোলাগুড় (Molasses) ও দুধে ভিটামিন-এইচ বিদ্যমান। বর্তমানে সংশ্লেষণ পদ্ধতিতে গরু ও বাছুরের পেট থেকে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন-এইচ পাওয়া যায়।

ভিটামিন-কে$_1$ সবুজ লতা-পাতা, ঘাস ও খড়ে থাকে। আর চালের কুঁড়ায়, বাঁধাকপি ও চর্বিতে থাকে ভিটামিন-কে$_2$। সিদ্ধ বা রন্ধনের সময় অত্যুত্তাপে আলোক সংস্পর্শে বা ক্ষারীয় যৌগ সংযোগে ভিটামিনটির যথেষ্ট ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে।

ভিটামিন-পি পাতিলেবু, বাতাবিলেবু, সরবতীলেবু, কমলালেবু, তামাক ও অন্যান্য সবুজ পাতায় থাকে।

এই হলো ভিটামিনগুলির মোটামুটি পরিচয়। বিজ্ঞানীরা কেবল ভিটামিনের রাসায়নিক প্রকৃতি ও ধর্ম নিরূপণ করেই ক্ষান্ত হন নি, পরীক্ষাগারে কৃত্রিম উপায়ে তা তৈরি করে ফেলেছেন। তাই আজকাল আর ভিটামিনপূর্ণ খাদ্য ও ওষুধের জন্যে অযথা ছুটাছুটি করতে হয় না—অতি সহজেই বটিকা ও তরলাকারে দোকানে পাওয়া যায়। ভিটামিন-বি-কমপ্লেক্সের নামও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

এক ধরণের ভিটামিনের সঙ্গে অন্য প্রকারের ভিটামিনের বাহ্যিক সাদৃশ্য আছে। ভিটামিন-এ'র সঙ্গে ভিটামিন-ডি ও ভিটামিন-ই-এর সম্পর্ক আছে, আর ভিটামিন-সি-এর সঙ্গে আছে ভিটামিন-পি-এর সাদৃশ্য। অত্যধিক পরিমাণে ভিটামিন খেলে উপকারের পরিবর্তে অপকারই হয়। বেশী পরিমাণে ভিটামিন-ডি গ্রহণের ফলে অভাবের লক্ষণের বিপরীতই দেখা দেয়। প্রত্যেকেরই স্বাস্থ্যরক্ষার জন্যে নির্দিষ্ট পরিমাণ ভিটামিন-এ'র প্রয়োজন। কিন্তু যে সব খাদ্যে ভিটামিন-এ বিদ্যমান, সেগুলি আজকাল বাজারে দুর্মূল্য ও বিশুদ্ধ অবস্থায় প্রায় দুর্লভ। তাই ভিটামিন-এ'র পরিবর্তে অপেক্ষাকৃত সুলভ ও স্বল্পমূল্যের খাদ্য ব্যবহার করা যেতে পারে। তাজা ও সবুজ শাক-সব্জী, গাঁজর, পেঁপে, জাম, কলা, বাঁধাকপি, পাকা-লঙ্কা, টোম্যাটোজাতীয় খাদ্য ঋতুভেদে নিয়মিত খেলে দেহে ভিটামিন-এ'র অভাব হবার কথা নয়।

ভিটামিন প্রধানতঃ ফলমূল, শস্য ও তরিতরকারীর খোসার ঠিক নীচেই থাকে। এদের খোসা ছাড়াবার সময় তা অনেকটা চলে যায়। আবার, দুধ, মাখন, মাছ, মাংস, ডিম প্রভৃতির মধ্যে ভিটামিন প্রায় সবটা জুড়েই থাকে। এভাবে থাকলেও আমরা সবটা ভিটামিন পাই না। কারণ খাদ্য আহারোপযোগী করবার সময় তা কিছুটা নষ্ট হয়ে যায়। আর

খাদ্যদ্রব্যে পোকা ধরলে, ছেতলা পড়লে কিংবা বাসী হলে ভিটামিন খারাপ হয়ে যায়। আহার্য বস্তু কাঁচা কিংবা আধাসিদ্ধ করে খেলে যথেষ্ট ভিটামিন পাওয়া যায়। আদিমযুগে অরণ্য-জীবনে মানুষ নিজের অজ্ঞাতে প্রকৃতির কাছ থেকে অনায়াসে যে ভিটামিনপূর্ণ খাদ্য পেত, তা বর্তমান সভ্যযুগে কঠিন আয়াসেও সংগ্রহ করা সহজ নয়। টাটকা বা তাজা খাদ্যদ্রব্যেই সবচেয়ে বেশী ভিটামিন পাওয়া যায়। কিন্তু সহরে বেশীর ভাগ জিনিষই খাঁটি বা টাটকা অবস্থায় পাওয়া দুষ্কর। ফলমূল শুকনো বা পচনের হাত থেকে রক্ষা করবার জন্যে জলসেচ বা বরফ চাপা দেওয়া হয়। মাছ-মাংসকে বরফের সাহায্যে কোন প্রকারে পচনের হাত থেকে রক্ষা করা হয়। এতে মাছ-মাংস তরি-তরকারী পচে যায় না বটে, কিন্তু ভিটামিনের অধিকাংশই থাকে না। আর আছে কলে তৈরি ধবধবে সাদা ময়দা, কলে ভাঙ্গা চাল, ভেজাল দেওয়া দুধ, ঘি, তেল আরও কত কি। তাছাড়া আছে অতিরিক্ত তেল, মশলাযোগে অতি সিদ্ধ রুচিকর রন্ধন পদ্ধতি। এর ফলে খাদ্যদ্রব্য থেকে ভিটামিন খুব কম পরিমাণেই পাওয়া যায়।

মাটি

শ্রীহৃষীকেশ চৌধুরী

ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগে যে অংশে বৃক্ষলতাদি জন্মায়, তাকেই এক কথায় মাটি বলা হয়। স্থল-ভাগে আবার কোন কোন স্থানে জীবনের কোন চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায় না—থাকবার মধ্যে শুধু দিগন্ত বিস্তৃত বালুকারাশি এবং নীরেট শিলাস্তূপ। এইরূপ বালুকারাশি এবং নীরেট শিলাস্তূপকে প্রকৃত পক্ষে মাটি বলেঅভিহিত করা যায় না। মাটি কি? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়—মাটি একটি মিশ্র পদার্থ। নানা প্রকার খনিজ পদার্থ, জৈব পদার্থ এবং জল, বায়ু ইত্যাদি প্রাকৃতিক শক্তি ও বিভিন্ন প্রকারের জীবাণুর দ্বারা মাটি গঠিত। মাটিতে খাদ্য সঞ্চিত থাকবার দরুণ বৃক্ষ-লতাদি এতে জন্মায় ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। নানা প্রকার জীবাণু, ক্ষুদ্র ও বৃহৎ প্রাণী সর্বদাই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এই মাটির স্তরকে পরিবর্তিত করছে। আপাতদৃষ্টিতে মাটিকে শুষ্ক এবং নিশ্ছিদ্র মনে হলেও অল্প জল মাটিতে শোষিত অবস্থায় থাকে এবং যথেষ্ট ছিদ্র থাকবার দরুণ বাতাস ও জল সহজে মাটির অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারে।

চাষ-আবাদের সাফল্য অনেকাংশে মাটির প্রকৃতি, গুণাবলী ও স্থানীয় জল-বায়ুর উপরই নির্ভর করে। তাছাড়া মাটির শ্রেণীবিভাগ বহুলাংশে স্থানীয় জল-বায়ুর উপর নির্ভরশীল। ভারতবর্ষের মত উপমহাদেশে বিভিন্ন প্রকার জল-বায়ুর জন্যে বিভিন্ন ধরণের মাটি দেখতে পাওয়া যায়।

ভারতের মাটির শ্রেণী বিভাগের কথা প্রথম জানতে পারা যায় ভোয়েলকার (Voelcker) ও তাঁর পরবর্তী সময়ে লেথারের (Leather) গবেষণার মাধ্যমে। ভোয়েলকার ১৮৯৩ সালে ও পরে লেথার (Leather) ১৮৯৮ সালে ভারতের মাটিকে প্রধানতঃ চার ভাগে চিহ্নিত করেন।

(১) সিন্ধু-গাঙ্গেয় অ্যালুভিয়াম মাটি (Indo-

Gangetic Alluvium soil)—প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার বিকাশ এই মাটিতে হয়েছিল ও ভারতের কৃষিসম্পদে এই মাটির তুলনা হয় না। কৃষিকে কেন্দ্র করেই তৎকালীন মানুষ সঙ্ঘবদ্ধ জীবনের কথা প্রথমে চিন্তা করে। সেই জন্যে সর্বপ্রথমে গঙ্গা প্রভৃতি নদীর তীরে ঘন জনবসতি পরিলক্ষিত হয়। পশ্চিমে সিন্ধুনদ থেকে পূর্বে ব্রহ্মপুত্র পর্যন্ত যে বিরাট ভূমিখণ্ড দেখা যায়, তা সিন্ধু, গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র এবং তাদের অসংখ্য উপ ও শাখা-নদীর দ্বারা আনীত পলি মাটির দ্বারা গঠিত। কৃষিকার্যের সুবিধার জন্যে ভারতের এই ভূমিখণ্ডে ঘন জনবসতি লক্ষ্য করা যায়। প্রায় ৩০০,০০০ বর্গ মাইল স্থানব্যাপী এই জাতীয় মাটির অবস্থিতি দৃষ্টিগোচর হয়। অ্যালুভিয়াম মাটির গভীরতা খুব বেশী, কোন কোন স্থানে ৩০০০ ফুট পর্যন্ত লক্ষ্য করা যায়।

ভূতাত্ত্বিক বিচারে অ্যালুভিয়াম জাতীয় মাটিকে আবার দু-ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে।

(ক) খাদার (Khadar) অথবা নূতন অ্যালুভিয়াম—সাধারণতঃ বালিমিশ্রিত থাকায় সচ্ছিদ্রতাহেতু জলধারণের কম ক্ষমতা এই জাতীয় মাটির একটি বিশেষত্ব। এতে হাল্কা রঙ এবং কাঁকড়ের পরিমাণও কম লক্ষ্য করা যায়। নদীতীরস্থ এই জাতীয় মাটিতে অম্লত্ব কম, আবার অনেক স্থানে ক্ষার কিংবা নিরপেক্ষ মাটিরূপেও দেখা যায়। সাধারণতঃ এই জাতীয় মাটি যে কোন চাষের পক্ষে সম্পূর্ণভাবে উপযোগী। তবে চুন, পটাস ও ফস্‌ফরাসের পরিমাণ বেশী থাকলেও জৈব পদার্থ (হিউমাস) ও নাইট্রোজেনের পরিমাণ সেই অনুপাতে থাকে না।

(খ) ভানজার বা পুরাতন অ্যালুভিয়াম—এই মাটি সাধারণতঃ কাঁকড়পূর্ণ ও এতে কাদার পরিমাণ বেশী এবং কালো রঙ লক্ষ্য করা যায়। কাদার পরিমাণ বেশী থাকবার জন্যে জল নিঃসরণের পথে বাধা সৃষ্টি হয়। এর ফলে কয়েক ধরণের অনিষ্টকারী খনিজ পদার্থ, যেমন—সোডিয়াম ও ম্যাগ্‌নেসিয়াম প্রভৃতি লবণ জমবার ফলে জমি ক্রমশঃ অনুর্বর হতে থাকে। সাধারণতঃ এই জাতীয় মাটি অম্লপ্রধান।

অ্যালুভিয়াম মাটির প্রকৃতি ও বিস্তৃতি ইত্যাদি নিয়ে বর্তমানে নানা ধরণের গবেষণা চলছে। বালি ও কাদার সংমিশ্রণে তৈরি বলে অ্যালুভিয়াম মাটিকে দোআঁশ মাটির পর্যায়ে ফেলা যেতে পারে। যে কোন মাটির স্তরে প্রধানতঃ তিনটি পদার্থ থাকে যেমন—বালিকণা, পলিকণা ও কাদাকণা। উপরিউক্ত এই তিনটি কণার সংমিশ্রণে মাটি গঠিত। অ্যালুভিয়াম মাটির উপাদানের তারতম্য অনুসারে একে চার ধরণের মাটিতে ভাগ করা যায়। কৃষির সঙ্গে এই চার ধরণের মাটির সম্পর্ক, বিশেষতঃ পূর্ব ভারতে বেশী বলে সে বিষয়ে কিছু আলোচনা করা গেল।

(ক) বালিমাটি—বালিকণার অবস্থিতি সকল প্রকার মাটিতে লক্ষ্য করা যায়। তবে যে মাটিতে শতকরা ৭০ ভাগের উপরে বালিকণা থাকে, সেই মাটিকে বালিমাটি বলা হয়। বালিকণা অন্যান্য মাটির কণার চেয়ে আয়তনে বড় হবার ফলে সচ্ছিদ্রতা বেশী থাকায় জলধারণের ক্ষমতা কম হয়। জৈব পদার্থের অবস্থিতিও কম থাকায় প্রয়োজনীয় উদ্ভিদ-খাদ্য মাটি ধরে রাখতে পারে না বলে মাটি হিসাবে এটি নিকৃষ্টতর।

বালিকণার আকৃতির তারতম্য অনুসারে বালিমাটিকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়, যেমন—মোটা, মাঝারি এবং মিহি। মোটা বা মাঝারি বালিকণার গায়ে কোন কাদা বা পলির আস্তরণ না থাকায় এরা জল ও উদ্ভিদ-খাদ্য ধরে রাখবার ক্ষমতা প্রায় নেই বলে চাষ-আবাদের পক্ষে এই মাটি অনুপযুক্ত। মিহি বালিকণাযুক্ত মাটিতে প্রচুর জৈব সার প্রয়োগ ও জল-সেচনের মাধ্যমে মাটির সরসতার প্রতি লক্ষ্য

রাখলে কোন কোন ফসলের চাষ করা যেতে পারে। তরমুজ, ফুটি, শাকআলু, পটল ইত্যাদি বালিমাটিতে জন্মায়। বালিমাটির প্রকৃতি পরিবর্তন ও ক্রমশঃ ভাল ধরণের মাটিতে পরিবর্তিত করবার জন্যে জৈব সার নিয়মিত প্রয়োগ করলে মাটির সচ্ছিদ্রতা কমে জলধারণের ক্ষমতা ও অন্যান্য গুণাবলী কিছুটা বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়।

(খ) কাদামাটি—যে কোন খনিজ পদার্থ-কণা থেকেও এটি ক্ষুদ্রতর। কণা ক্ষুদ্র বলে জল সহজে এই জাতীয় মাটি থেকে সরে যেতে পারে না এবং এর ফলে গাছের গোড়া পচে যাবার সম্ভাবনা থাকে। এই জাতীয় মাটিতে ফসল জন্মাতে হলে জল নিষ্কাশনের প্রতি সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হয়। কাদা মাটিতে জৈব সার প্রয়োগ করলে মাটির সচ্ছিদ্রতা বৃদ্ধিহেতু জলধারণের ক্ষমতা কমে যায় এবং বাতাস ও আলো মাটির অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারে। জমি কর্ষণ করে না রাখলে অভ্যন্তরস্থ জল সূক্ষ্ম ছিদ্রপথের মাধ্যমে বাষ্পাকারে উবে যায়। এর ফলে মাটি শক্ত হয় এবং পরে কর্ষণ করা কঠিন হয়ে পড়ে। সকল জাতীয় ফসলের পক্ষে এটি উপযুক্ত নয়, তবে ধান, পাট ইত্যাদি জাতীয় ফসলের চাষ করা যেতে পারে।

(গ) দোআঁশ মাটি—বালি, পলি ও কাদা কণার সমপরিমাণ সংমিশ্রণে এই মাটি গঠিত। সাধারণতঃ উল্লিখিত এই তিনটির কোনটির প্রাধান্য দোআঁশ মাটিতে লক্ষ্য করা যায় না এবং এর ফলে সচ্ছিদ্রতা ও জলধারণের ক্ষমতার মধ্যে একটা ঐক্য লক্ষ্য করা যায়। এই মাটিতে উদ্ভিদ তার উপযুক্ত পরিবেশ পায় বলে যে কোন ফসলের পক্ষে এটি উপযুক্ত।

কিন্তু প্রাকৃতিক পরিবেশে মাটি কখনও এক অবস্থায় থাকতে পারে না। কারণ অহরহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তি ও মানুষের বহুল হস্তক্ষেপ-হেতু উদ্ভূত ক্ষয়ের ফলে মাটির সংগঠনেরও পরিবর্তন ঘটছে।

দোআঁশ মাটিকে আবার তিন ভাগে ভাগ করা যায়, যেমন—বালিকণার পরিমাণ বেশী থাকলে বেলে দোআঁশ, কাদাকণার আধিক্য থাকলে কাদা দোআঁশ ও পলির আধিক্যহেতু পলি দোআঁশ। দোআঁশ মাটিতে অন্য কোন মাটির কণার আধিক্য থাকলে সেই কণার বৈশিষ্ট্য ঐ মাটিতে লক্ষ্য করা যায়। বালি, পলি বা কাদাকণার আধিক্য আছে কি না, তা জমি থেকে তুলে মাটি আঙুলের মধ্যে নিয়ে অনুভব করলেই বোঝা যাবে। দোআঁশ মাটিতে বালির আধিক্য থাকলে আঙুলের মধ্যে কড়কড় করবে, পলির আধিক্য থাকলে পাউডারের ন্যায় মনে হবে এবং কাদাকণার উপস্থিতি বেশী থাকলে আঙুলের মধ্যে পিছলে যাবে। তাছাড়া জমির ৬ ইঞ্চি নীচু থেকে মাটি সংগ্রহ করে একত্রে মিশিয়ে এর কিঞ্চিৎ একটি জলভর্তি কাচের পাত্রে রেখে ভাল করে ঝেঁকে নিয়ে একটি সমতল স্থানে দুই-একদিন কাচের পাত্রটি রাখলে কাচের পাত্রে যে মাটির স্তর দেখা যায়, তার মাধ্যমেও সেই জমির মাটির সংগঠন জানা যায়।

(ঘ) পলিমাটি—নদীতে বন্যার পর জল সরে গেলে যে মাটি দেখা যায় তাই পলিমাটি। নদীর জলস্রোতে বাহিত হয়ে তলানি পড়ে পলিমাটির উৎপত্তি হয়। সিন্ধু-গাঙ্গের উপত্যকার অনেকাংশ এই পলিমাটির দ্বারা গঠিত। জৈব পদার্থ ও অন্যান্য উদ্ভিদ-খাদ্য এতে প্রচুর পরিমাণে থাকায় উদ্ভিদ প্রয়োজনীয় খাদ্য পায়। আবার বালি ও কাদার উপস্থিতির মধ্যেও অমিল না থাকায় উদ্ভিদ উপযুক্ত পরিবেশ পায় বলে প্রায় যে কোন ফসলই এই মাটিতে ভাল জন্মায়।

(২) কালো বা রিগার মাটি (Black cotton or Regur soil)—বোম্বে, হায়দরাবাদ, মধ্য প্রদেশের পশ্চিম অংশে, গুজরাট ও মাদ্রাজের

কিছু অংশে এই জাতীয় মাটি পরিদৃষ্ট হয়। তুলা-চাষের পক্ষে এটি সর্বোৎকৃষ্ট মাটি। রঙ কালো বলে এই মাটিকে কালো মাটি বা ব্ল্যাক কটন সয়েল (Black cotton soil) বলা হয়। কোন কোন কালো রঙের মাটি বেশ উর্বর, তবে পর্বতের উপরের মাটির উর্বরতা ততটা দেখা যায় না ও তাতে বালির পরিমাণ বেশী বলে জলধারণের ক্ষমতা কম থাকে এবং বর্ষাকাল ছাড়া অন্য সময় চাষ-আবাদ করা যায় না। পর্বতের নিম্নাংশের মাটি ভিজলে কাদামাটির মত আঠালো হয়, কিন্তু জল শুকিয়ে গেলে সঙ্কুচিত হয়ে কঠিন হয় এবং বিরাট ফাটলের সৃষ্টি করে। লৌহের পরিমাণ এই মাটিতে প্রচুর ও সেই সঙ্গে চুন, ম্যাগ্‌নেসিয়াম, কার্বোনেট, পটাসের উপস্থিতিও প্রচুর পরিমাণে লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু নাইট্রোজেন, জৈব পদার্থ ও ফস্‌ফরাসের পরিমাণ খুবই অল্প দেখা যায়। প্রয়োজনের অতিরিক্ত জলসেচের ফলে অনেক সময় মাটির অনিষ্টকারী খনিজ পদার্থ উপরে উঠে এসে জমিকে ক্ষার জমিতে পরিণত করে। এই জাতীয় জমিতে প্রচুর পরিমাণে নাইট্রোজেন, ফস্‌ফরাস ও জৈব সার প্রয়োগের সঙ্গে প্রয়োজনীয় জলসেচ করলে খুব ভাল ফসলই জমি থেকে পাবার আশা করা যেতে পারে।

(৩) লাল মাটি (Red soil)—মাদ্রাজের প্রায় বেশীর ভাগ অংশে মহীশূরে, দক্ষিণ-পূর্ব বোম্বাই, হায়দরাবাদের পূর্ব অংশে, মধ্যপ্রদেশে, উড়িষ্যা, ছোটনাগপুর ও বিহারের সাঁওতাল পরগণা, উত্তর প্রদেশের মীরজাপুর, ঝাঁসি এবং জামিরপুর, পশ্চিম-বাংলার বীরভূমে এই জাতীয় মাটির অবস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। প্রাচীন কেলাসিত ও পরিবর্তিত শিলার ভগ্নাংশ থেকেই লাল মাটির সৃষ্টি হয়। সাধারণতঃ বন্যভূমিতে গাছ-পালাপূর্ণ স্থানেও লাল মাটি দেখা যায়। লাল রঙের মাটির পাশে পাশে হলুদ রঙের মাটিও দেখা যায়। হলুদ রঙের মাটির বিষয়ে বিশেষ ভাবে কোন কিছুই এখনও জানা যায় নি। লাল রঙের কারণ মাটিতে লৌহের আধিক্য। এই জাতীয় মাটিতে নাইট্রোজেন, ফস্‌ফরাস এবং জৈব পদার্থের অভাব পরিলক্ষিত হয়। এর ফলে মাটির উৎপাদিকা শক্তিও কম লক্ষ্য করা যায়। কালো মাটির তুলনায় এতে চুন ও পটাসের পরিমাণ কম থাকবার ফলে এই মাটি সাধারণতঃ অম্ল-জাতীয়। চাষের উপযোগী করবার জন্যে প্রতি বর্গ গজে ৮ আউন্স (এই ধরণের অম্ল-জাতীয় লাল মাটিতে) চুন প্রয়োগে মাটির অম্লত্ব কমে যেতে দেখা যায় এবং সেই সঙ্গে এই জাতীয় মাটিতে যে সব উদ্ভিদ-খাদ্যের অভাব পরিলক্ষিত হয়, যেমন—নাইট্রোজেন, ফস্‌ফরাস ও জৈব পদার্থ প্রয়োগে সুফলই পাওয়া যায়। এই লাল মাটিকে অনেক সময় ল্যাটেরাইট মাটি বলে ভুল করা হয়।

(৪) ল্যাটারাইট (Laterite) মাটি—ভারতের মত উষ্ণভাবাপন্ন দেশে, যেখানে উষ্ণ আবহাওয়ার সঙ্গে আর্দ্র জলবায়ু লক্ষ্য করা যায়, সেইসব অঞ্চলে ল্যাটারাইটজাতীয় মাটির অবস্থিতি পরিলক্ষিত হয়। প্রাকৃতিক শক্তি, যেমন—জল, তাপমাত্রা ও বায়ু, মাধ্যাকর্ষণ শক্তি ইত্যাদির মাধ্যমে বিভিন্ন ধরণের শিলা থেকে এর উৎপত্তি হয়। উষ্ণতা ও আর্দ্র আবহাওয়ার দরুণ সঙ্কোচন ও প্রসারণের ফলেই এই জাতীয় মাটির উৎপত্তি হয়ে থাকে। দাক্ষিণাত্য, মহীশূর, কেরালা, মধ্য প্রদেশ, দক্ষিণ বোম্বাই, উড়িষ্যার পূর্বঘাট, পশ্চিম বাংলার দামোদর ও ভাগীরথী নদীর মধ্যবর্তী অংশ এবং আসামে সাধারণতঃ পর্বতশীর্ষে এই জাতীয় মাটি দেখতে পাওয়া যায়। পর্বতশীর্ষের শিলা প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাবে সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হবার ফলে ক্রমশঃ ভেঙ্গে টুক্‌রা টুক্‌রা হয়ে মাধ্যাকর্ষণ ও জলস্রোতে পর্বতগা বেয়ে নেমে এসে জমা হয়ে থাকে। পর্বতের নিম্নাংশে ল্যাটারাইটজাতীয় মাটিতে ধান জন্মাতে দেখা যায় এবং পর্বতের উপরের অংশে চা, কফি,

সিঙ্কোনা, রাবার ইত্যাদির চাষ হয়ে থাকে। ক্ষয়ীভবন ও নিঃসরণের ফলে এই জাতীয় মাটিতে সাধারণতঃ চুন ও ম্যাগ্‌নেসিয়ামের অভাব বেশ দেখা যায়। এতে নাইট্রোজেনের পরিমাণও অল্প এবং ফস্‌ফরাস প্রচুর পরিমাণে থাকলে তা লৌহের সঙ্গে মিশ্রিত অবস্থায় লক্ষ্য করা যায়। পটাসের পরিমাণও কম, তবে কোন কোন ল্যাটারাইটজাতীয় মাটিতে প্রচুর পরিমাণে জৈব পদার্থ দেখা যায়। চুনের অভাবহেতু তা অম্লপ্রধান। উদ্ভিদের অতি প্রয়োজনীয় খাদ্য, যা উদ্ভিদ মাটি থেকে গ্রহণ করে থাকে, যেমন—নাইট্রোজেন, ফস্‌ফরাস ও পটাসের অভাবহেতু এবং সেই সঙ্গে জৈব পদার্থও সাধারণতঃ এই জাতীয় মাটিতে কম থাকায় মাটি হিসাবে একে উৎকৃষ্ট বলা যায় না। লাল মাটির সঙ্গে এর অনেকটা মিল লক্ষ্য করা যায়।

প্রয়োজন অনুযায়ী প্রচুর জৈব সার জমি প্রস্তুতির সঙ্গে এবং প্রতি বর্গ গজ জমিতে ৮ আউন্স পরিমাণ চুন প্রয়োগে মাটির প্রকৃতি পরিবর্তিত হতে দেখা যায়। মাটির প্রকৃতি পরিবর্তিত করে ফসল অনুযায়ী উদ্ভিদের খাদ্য হিসাবে সার প্রয়োগে সুফল পাবারই কথা।

উপরিউক্ত চার প্রকারের মাটি ছাড়াও ভারতবর্ষে আরও চার প্রকারের মাটি দেখা যায়।

(ক) পাহাড় অঞ্চলের মাটি (Forest and hill soil)—ভারতবর্ষের মোট জমির প্রায় শতকরা ১৪ ভাগ অধিকার করে আছে বন। মাটি সৃষ্টিতে জৈব পদার্থ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। শিলামধ্যস্থ খনিজ পদার্থগুলির রাসায়নিক বা ভৌতিক পরিবর্তন হলেই শিলা দ্রবীভূত বা চূর্ণ-বিচুর্ণিত হয়, কিন্তু জৈব পদার্থের সঙ্গে ঐ খণ্ড-বিখণ্ডিত অংশের মিশ্রণ না ঘটা পর্যন্ত তাকে মাটি বলা যায় না। ভারতবর্ষের সমস্ত বনভূমির মাটি সম্বন্ধে যথেষ্ট গবেষণা এখনও হয় নি। বনভূমির পাতা ইত্যাদি থেকেই এই মাটির সৃষ্টি হয় বলে মাটির উপরের স্তরে প্রচুর জৈব পদার্থ দেখা যায়। আসামের বনভূমির মাটিতে সেজন্যে প্রচুর নাইট্রোজেন ও জৈব পদার্থ লক্ষ্য করা যায়। বনভূমির সঙ্গে বৃষ্টির সংযোগে মাটির প্রকৃতি অম্লপ্রধান হয়ে থাকে। পূর্বোক্ত উপায়ে অম্লের পরিমাণ কমিয়ে ফসল অনুযায়ী উদ্ভিদখাদ্য সাররূপে সরবরাহ করলে ফসল ভাল হতে পারে। বনভূমি ধ্বংস করে ফেলে রাখলে তা ক্রমশঃ ল্যাটারাইট মাটিতে পরিণত হয়।

(খ) মরু অঞ্চলের মাটি (Desert soil)—রাজপুতনা ও দক্ষিণ পাঞ্জাবের শুষ্ক অঞ্চলে এই জাতীয় মাটি দেখা যায়। একে ঠিক মাটি বলা উচিত নয়, কারণ তাতে কিছুই জন্মায় না। রাজপুতনায় থর মরুভূমি প্রায় ৪০,০০০ বর্গ মাইল বিস্তৃত এবং সেখানে বৃষ্টিপাত হয় না বললেই চলে। মরু অঞ্চলের মাটিতে জৈব পদার্থের পরিমাণ খুবই কম ও দ্রবণীয় লবণ প্রচুর পরিমাণে আছে। এটা সাধারণতঃ ক্ষারজাতীয় মাটি। ফসলের উপযোগী জল ও জমির প্রকৃতির পরিবর্তনের জন্যে প্রচুর পরিমাণে জলসেচ করলে মাটির প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটে থাকে। রাশিয়া নদীর গতিপথ মরুভূমিতে প্রবাহিত করিয়ে মরু অঞ্চলের মাটিকে চাষের উপযোগী করতে পেরেছে। তাছাড়া ক্যাক্‌টাস (Cactus) জাতীয় উদ্ভিদের (সাহারা মরু অঞ্চলের শুষ্ক আবহাওয়াতে জন্মাতে পারে) চাষ করে এবং এদের দেহ মাটিতে মিশ্রণহেতু জৈব পদার্থের পরিমাণ মাটিতে বাড়িয়ে মাটির প্রকৃতি পরিবর্তনে সাহায্য করা হচ্ছে।

বর্তমান মরু-বিশেষজ্ঞেরা মরুভূমি উদ্ধার ও মরু-প্রসার রোধ করবার জন্যে পেট্রোলিয়াম থেকে এক প্রকার রাসায়নিক তেল তৈরি করছেন। এই রাসায়নিক তেল বালির উপর সিঞ্চিত করলে

বালি প্রবল বাতাসেও উড়তে পারে না এবং মাটির অভ্যন্তরস্থ জলের বাষ্পীভবনও হতে পারে না। লুসার্ন নামক এক প্রকার ঘাস ও ইউক্যালিপ্‌টাস ইত্যাদির চারা রোপণ করে এই জাতীয় তেল জমির উপরিভাগে সিঞ্চন করলে অধিক ফলপ্রসূ হয়। সাড়ে সাত বিঘা জমির জন্যে মাত্র এক টিন তেল প্রয়োগই যথেষ্ট। চারাগুলি এক বছরের হলেই প্রবল বাতাসের গতিরোধ করে দাঁড়ায় বলে বায়ুচালিত বালুকারাশির গতিও বন্ধ হয়। অগত্যা সেই বালুকারাশির দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশের পথ সুগম না হওয়ায় চাষযোগ্য অঞ্চলসমূহ চাষের অনুপযুক্ত হয় না। লিবিয়াতে এসো নামক একটি বৃটিশ প্রতিষ্ঠান মরুঅঞ্চল উদ্ধারের চুক্তির দ্বারা ইতিমধ্যে ১০০০ একর জমিতে তেল সিঞ্চন করেছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মরুভূমির অগ্রগতি রোধ ও ঊষর জমিকে চাষযোগ্য করবার প্রচেষ্টা আরম্ভ হয়েছে। ভারতবর্ষও এই বিষয়ে গবেষণা করে মরুভূমির অগ্রগতি রোধে উদ্যোগী হয়েছে। লক্ষ্য করা গিয়েছে, রাজপুতনার মরুভূমিও দিল্লীর দিকেই ক্রম-সঞ্চরমান। বিজ্ঞানের সাহায্যে ইস্রাইল মরুভূমিকে জয় করে ঊষর মরু অঞ্চলকে উর্বর ভূমিতে পরিণত করেছে। এতে প্রমাণিত হয় যে, বিজ্ঞানের সাহায্যে ঊষর মরুভূমির বুকেও ফসল ফলানো যায়।

(গ) লবণাক্ত ও ক্ষার মাটি—ভারতবর্ষের প্রায় স্থানেই এই প্রকার মাটি দেখা যায়। উত্তর ভারতের বহু শুষ্ক অঞ্চলে, প্রধানতঃ উত্তর প্রদেশ, পাঞ্জাব, রাজপুতনা, বিহারের বিশেষভাবে পশ্চিম অংশে লবণাক্ত ও ক্ষার মাটি দেখতে পাওয়া যায়। ত্রুটিপূর্ণ কৃষি পদ্ধতির জন্যে যে কোন উর্বর মাটিতে উদ্ভিদের পক্ষে ক্ষতিকর প্রধানতঃ সোডিয়াম ও ম্যাগ্নেসিয়াম-ঘটিত লবণ সঞ্চয়হেতু মাটি লবণাক্ত বা ক্ষার মাটিতে পরিবর্তিত হতে পারে। এই ভাবে মাটির প্রকৃতির পরিবর্তনের জন্যে মাটির সচ্ছিদ্রতা অনেকাংশে দায়ী। ত্রুটিপূর্ণ কৃষি-পদ্ধতি ও অতিরিক্ত জল নিষ্কাশন না হবার ফলে মাটিতে লবণের পরিমাণ বৃদ্ধিহেতু উর্বর মাটিও এভাবে অনুর্বর হয়ে পড়ে। অনেক সময় নদী কিংবা খালের জল জমিতে সিঞ্চন করলে ও জমির মাটির সচ্ছিদ্রতা কম থাকলে মাটিতে লবণ জমে মাটি লবণাক্ত হয়ে পড়ে। সেজন্যে মাটির সচ্ছিদ্রতা কম থাকলে পাশে নালা খনন করা উচিত, যাতে অতিরিক্ত জল জমি থেকে সরে যেতে পারে।

ক্ষার বা লবণাক্ত মাটি বলতে এক জাতীয় মাটি বোঝায় না। দ্রবণীয় লবণের পরিমাণ মাটিতে বেশী থাকলে তাকে লবণাক্ত মাটি বলা হয়ে থাকে, কিন্তু যখন ক্ষারজাতীয় লবণ, যেমন প্রধানতঃ সোডিয়ামঘটিত লবণের পরিমাণ কোন কারণে বৃদ্ধি পেলেই তাকে বলা হয় ক্ষার মাটি। লবণাক্ত জমিতে চাষও করা যায় এবং প্রচুর জল সিঞ্চন করলে মাটির প্রকৃতিও পরিবর্তিত হয়। মাটি একবার ক্ষারধর্মী হয়ে গেলে তাতে শস্যের চাষ আর করা যায় না এবং অন্য কোন উপায়ে সহজে মাটির প্রকৃতিরও পরিবর্তন করা সম্ভব নয়, তবে গন্ধকজাতীয় জিনিষের প্রয়োগে ও জলসেচে প্রকৃতি কিছুটা পরিবর্তিত করে ফসল উৎপাদন করা হয়ে থাকে।

হিসাব করে দেখা গেছে যে, উত্তর প্রদেশের দুই লক্ষ একর জমি এবং পাঞ্জাবের পাঁচ লক্ষ একর জমি ইতিমধ্যে লবণাক্ত বা ক্ষার জমিতে পরিণত হয়ে চাষের পক্ষে অনুপযুক্ত হয়েছে। এ-ছাড়াও লক্ষ্য করা গেছে যে, পাঞ্জাবে প্রতি বছর প্রায় পঁচিশ হাজার একর জমি লবণাক্ত বা ক্ষার জমিতে পরিণত হচ্ছে।

(ঘ) পীট্‌ মাটি ও জলাজমির মাটি—আর্দ্র মাটিতে জৈব পদার্থের পরিমাণ বৃদ্ধিহেতু

জাতীয় মাটির সৃষ্টি হয়ে থাকে। সাধারণতঃ এই জাতীয় মাটি কেরালায় বেশী দেখা যায়। বর্ষাকালে এই জাতীয় মাটি সাধারণতঃ জলের নীচে থাকে ও বর্ষার শেষে এতে ধানের চাষ করা হয়ে থাকে। মাটির রঙ কালো ও তাতে অম্লত্বের পরিমাণ বেশী, তবে অনেক সময় লৌহের সংমিশ্রণে রঙ নীলও দেখা যায়। কেরালা ছাড়া উড়িষ্যায়, সুন্দরবনে, উত্তর বিহার, উত্তর প্রদেশের আলমোড়া অঞ্চলে এবং মাদ্রাজের দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলে এই জাতীয় মাটি দেখতে পাওয়া যায়। এই জাতীয় মাটির প্রকৃতি বিষয়ে বিশেষ কিছু জানা যায় নি, তবে চুন প্রয়োগে অম্লত্বের পরিমাণ কমিয়ে মাটির প্রকৃতি কিছুটা পরিবর্তন করলে অম্লধর্মী মাটির উপযোগী ফসল, যেমন—ধান ইত্যাদির চাস এই মাটিতে ভালই হয় ।

ভারতবর্ষের উপরিউক্ত আট প্রকারের মাটির মধ্যে ত্রিপুরাতে প্রধানতঃ নিম্নলিখিত মাটির উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়—

(১) অ্যালুভিয়াম মাটি—যেমন আগরতলা, খোয়াই, অমরপুর, উদয়পুর মহকুমা ও কমলপুর সোনামুড়া মহকুমার অধিকাংশ স্থান এবং বিলোনিয়া, সাবরুম মহকুমার উত্তরাংশ।

(২) লাল ও হলুদ রঙের মাটি—সোনামুড়া ও বিলোনিয়া ও সাবরুম মহকুমার অধিকাংশ স্থান।

(৩) অরণ্য ও পার্বত্য অঞ্চলের মাটি—ধর্মনগর ও কৈলাসহর মহকুমা ও কমলপুর মহকুমার কিছু পূর্বাংশ।

পরিশেষে বলা যায় যে, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষ করলেই শুধু হয় না, সেই সঙ্গে জমির ভূসংস্থান, মাটির গঠন ও বাঁধন বহুলাংশে শস্যচাষের উপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে। লাভজনক উপায়ে ফসলের আবাদ করতে হলে ফসলকে সুষ্ঠু বৃদ্ধির সর্বপ্রকার অনুকূল পরিবেশের মধ্যে চাষ নিশ্চয়ই করতে হবে। ফসল উৎপাদনের অনুকূল পরিবেশের মধ্যে মাটির প্রভাব অপরিসীম এবং বিভিন্ন প্রকার মাটি বিভিন্ন প্রকার শস্য চাষের উপযোগী। কোন শস্য বালিমাটিতে ভাল জন্মায়, আবার কোন ফসল এঁটেল বা পলি মাটিতে ভালভাবে জন্মায়। তবে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, অধিকাংশ ফসলই সুগভীর, নরম ও সচ্ছিদ্র দোআঁশ বা পলিমাটিতে ভাল জন্মায়। আবার মাটির অম্লত্ব বা ক্ষারত্ব ফসলকে প্রভাবিত করে। নিরপেক্ষ (অম্ল কিংবা ক্ষার নয়) মাটি যে কোন ফসলের উপযোগী হলেও লক্ষ্য করা গেছে যে, কোন কোন ফসল কিঞ্চিৎ অম্লত্ব বা ক্ষারত্বে ভাল জন্মায়, আবার কতকগুলি অম্ল কিংবা ক্ষার মাটিকে সহ্য করতে পারে না।

সুতরাং কোন্ মাটিতে কোন্ ফসলের চাষ ভালভাবে করা যেতে পারে, তা জানতে হলে বিভিন্ন মাটির উপযোগী ফসল বিষয়ে মোটামুটি ধারণা থাকা আবশ্যক এবং সেই সঙ্গে মাটির প্রকৃতি, অম্লত্ব এবং ক্ষারত্বের অবস্থা অনুসারে চাষ করলে সুফল পাবার কথা।

প্লুটোর পরবর্তী গ্রহ

গিরিজাচরণ ঘোষ

প্লুটো হলো সৌরজগতের নবম গ্রহ। এর পরবর্তী গ্রহ, অর্থাৎ দশম গ্রহ আছে কি নেই, এই নিয়ে জল্পনা-কল্পনা এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার অন্ত নেই। প্রকৃতপক্ষে প্লুটোর পরে দশম গ্রহ থাকবার মূলে কয়েকটি কারণ রয়েছে।

প্লুটো আবিষ্কৃত হয় ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে। এর আগে নেপচুন আবিষ্কৃত হয় ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে। এই দুটি গ্রহ আবিষ্কারের সময়ের ব্যবধান থেকে বোঝা যায়, সৌরজগতের শেষ সীমানার গ্রহ আবিষ্কারের কাজটা খুব সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। ইউরেনাস এবং নেপচুনের চলবার গতির তারতম্য লক্ষ্য করে নেপচুনের পরে কোন গ্রহ থাকা সম্ভব, এই অনুমানের বশবর্তী হয়ে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে পারসিভাল লোয়েল (Percival Lowell) অ্যারিজোনার ফ্ল্যাগস্টাফ মানমন্দিরে ঐ গ্রহ আবিষ্কারের ব্যাপারে আত্মনিয়োগ করেন। কিন্তু ঐ গ্রহ অবিষ্কারের পূর্বেই লোয়েলের মৃত্যু ঘটে। এর পর মাউণ্ট উইলসন মানমন্দিরে পিকারিং (Pickering) এবং মিল্টন হিউম্যাসন (Milton Humason) ঐ গ্রহ আবিষ্কারে মনোযোগ দেন। কিন্তু পরে তাঁরাও ঐ অনুসন্ধান পরিত্যাগ করেন। এরপর ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে ফ্ল্যাগস্টাফের জ্যোতির্বিদ্গণ পুনরায় বৃহত্তর দূরবীনের সাহায্যে এবং নতুন পদ্ধতিতে ফোটোগ্রাফিক প্লেটের দ্বারা ঐ অনুসন্ধান-কার্য চালাতে সুরু করেন। অবশেষে ক্লাইড টোমবাফ (Clyde Tombaugh) ফোটোগ্রাফিক প্লেটের উপর ক্ষীণ আলোক-ছটার স্বরূপ দেখে ঐ গ্রহটি আবিষ্কার করেন।

প্লুটো আবিষ্কারের এই দীর্ঘতর ইতিহাস এটা প্রমাণ করে যে, তার পরবর্তী গ্রহ আবিষ্কারের কাজ আরও অধিক শ্রম ও সময়-সাপেক্ষ ব্যাপার।

প্লুটোর পরবর্তী দশম গ্রহের অবস্থান সম্পর্কে ধূমকেতুর চলবার রহস্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গ্রহগুলি যেমন সূর্যকে উপবৃত্তাকার পথে পরিভ্রমণ করে চলে, ধূমকেতুগুলিও অনুরূপ ভাবে এক লম্বিত উপবৃত্তাকার-পথে সূর্যকে পরিক্রমা করে যায়। ধূমকেতুগুলি যখন সূর্যের কাছাকাছি এসে পড়ে, তখন সূর্যালোকের চাপে ওদের আলোর ছটা সূর্যের বিপরীতমুখী হয়ে দাঁড়ায়। এই ধূমকেতুগুলি যে শুধুমাত্র সূর্যের টানে প্রভাবিত হয়, তা নয়। অনেক সময় সৌরজগতের গ্রহগুলিও ওদের উপর আধিপত্য বিস্তার করে। দেখা গেছে, প্রায় পঞ্চাশটির মত ধূমকেতু আছে, যাদের যাত্রাপথের অপসূরগুলি (Aphelion—সূর্য থেকে অধিকতম দূরত্ব) রয়েছে বৃহস্পতি গ্রহের কক্ষপথের কাছাকাছি। কিন্তু তাদের অনুসূরগুলি (Perihelion—সূর্য থেকে নিকটতম দূরত্ব) রয়েছে সূর্যের নিকটে। অনুরূপভাবে শনিগ্রহ ছয়টি ধূমকেতু রেখেছে আপন অনুশাসনের মধ্যে, আর ইউরেনাস রেখেছে তিনটিকে এবং নেপচুন রেখেছে কমপক্ষে আটটিকে। বর্তমানে আরও পাঁচটি ধূমকেতু আবিষ্কৃত হয়েছে, যাদের অপসূরগুলি রয়েছে সূর্য থেকে ৩৭০ কোটি মাইল দূরে। এটা হলো সূর্য থেকে প্লুটোর কক্ষপথের মোটামুটি গড়-দূরত্ব। দেখা গেছে, প্রায় ষোলটির মত ধূমকেতু রয়েছে, যাদের অপসূরগুলির দূরত্ব সূর্য থেকে প্রায় ১০০ কোটি মাইল

দূরে। এই দূরত্বটা নতুন গ্রহ অবস্থানের এক আশাপ্রদ দূরত্ব।

যোশেফ পিয়াৎসির (Giuseppi Piazzi) সিরিস (Ceres) গ্রহাণুপুঞ্জ আবিষ্কারের পূর্বে জ্যোতির্বিদ জোহান্‌স্ কেপ্‌লার (Johannes Kepler) মঙ্গল এবং বৃহস্পতির দীর্ঘতর দূরত্বের মধ্যে কোন গ্রহের অবস্থান না দেখে অত্যন্ত বিস্মিত হন। কেপ্‌লারের মৃত্যুর কিছুকাল পরে ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে এক জার্মান জ্যোতির্বিদ্ বোড (Bode) একটি গাণিতিক প্রগতির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, যেটি টিটিয়াস (Titius) নামক অপর এক জার্মান কর্তৃক প্রবর্তিত হয়। এই প্রগতি বোড-টিটিয়াসের প্রগতি (Bode-Titius Progression) নামে পরিচিত। এই প্রগতির রূপ হলো এইরকম—

{(০×৩)+৪}÷১০=০·৪
{(১×৩)+৪}÷১০=০·৭
{(২×৩)+৪}÷১০=১·০
{(৪×৩)+৪}÷১০=১·৬
{(৮×৩)+৪}÷১০=২·৮
{(১৬×৩)+৪}÷১০=৫·২
{(৩২×৩)+৪}÷১০=১০·০
{(৬৪×৩)+৪}÷১০=১৯·৬
{(১২৮×৩)+৪}÷১০=৩৮·৮
{(২৫৬×৩)+৪}÷১০=৭৭·২
{(৫১২×৩)+৪}÷১০=১৫৪·০

এখন দশ কোটি মাইলকে একক হিসাবে ধরে নিলে দেখা যায়, সূর্য থেকে বিভিন্ন গ্রহগুলির দূরত্ব এই প্রগতি প্রায় মেনে চলেছে। এই প্রগতির সঙ্গে গ্রহগুলির আসল দূরত্ব তুলনা করা যেতে পারে—

গ্রহের নাম	বোড-টিটিয়াসের প্রগতি অনুসারে দূরত্ব (দশ কোটি মাইলের একক)	সূর্য থেকে গ্রহগুলির আসল দূরত্ব (দশ কোটি মাইলের এককে)
বুধ	০·৪	০·৩৯
শুক্র	০·৭	০·৭২
	১·০	১·০০
মঙ্গল	১·৬	১·৫২
সিরিস (গ্রহাণুপুঞ্জ)	২·৮	২·৭৭
বৃহস্পতি	৫·২	৫·২০
শনি	১০·০	৯·৫৪
ইউরেনাস	১৯·৬	১৯·১৯
নেপচুন	৩৮·৮	৩০·০৭
প্লুটো	৭৭·২	৩৯·৫০
দশম গ্রহ	১৫৪·০	?

এই তালিকা থেকে দেখা যাচ্ছে, গ্রহগুলির আসল দূরত্ব বোড-টিটিয়াসের প্রগতি ইউরেনাস পর্যন্ত চমৎকার ভাবে মেনে চলেছে। মঙ্গল এবং বৃহস্পতির কক্ষপথের মধ্যে যে দীর্ঘ ব্যবধান ছিল, সিরিস গ্রহাণুপুঞ্জ আবিষ্কৃত হবার পর দেখা গেল সেটি বোড-টিটিয়াসের প্রগতি অনুযায়ী যথার্থ দূরত্বে অবস্থান করছে, শুধু গোলমাল হলো নেপচুনের ক্ষেত্রে। প্লুটোর উৎকেন্দ্রিক কক্ষপথের তারতম্য ঘটে দশ কোটি মাইলের এককে ২৯·০০ থেকে ৪২·০০-এর মধ্যে, যার গড় হলো ৩৫·৫০। যদি নেপচুন গ্রহটি না থাকতো তাহলে বোড-টিটিয়াসের প্রগতির সঙ্গে প্লুটোর দূরত্ব চমৎকারভাবে মিলে যেত, কারণ উক্ত প্রগতি অনুসারে ঐ দূরত্ব হলো ৩৮·৮ একক এবং তখন দশম গ্রহের অবস্থান হতো সূর্য থেকে ৭৭·২ একক অর্থাৎ প্রায় ৭০০ কোটি মাইল দূরে। যদিও বোড-টিটিয়াসের প্রগতি একটি সাধারণ জ্যামিতিক প্রগতি

এবং এর সঙ্গে গ্রহগুলির অবস্থানের কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি হয়তো নেই, তথাপি ষোলটি ধূমকেতুর কক্ষপথের অপসূর সূর্য থেকে ১০০ কোটি মাইল দূরে হওয়ায় ঐ স্থানে দশম গ্রহের অবস্থান সম্পর্কে অনুমান যে একেবারে যুক্তিহীন, এই কথা হলপ করে বলা যায় না।

এখন কথা হলো এই দূরত্বটা এত অধিক যে, সেটি প্রত্যক্ষ করা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। তবে এ-কথা সত্য, যদি দশম গ্রহ থাকে তবে একদিন সেটি নিশ্চয়ই আবিষ্কৃত হবে।

এখন দশম গ্রহ সম্পর্কে কয়েকটি বিষয়ে অনুমান করা যেতে পারে, যেমন—সূর্য থেকে ১০০ কোটি মাইল দূরে থেকে ৫০০ পার্থিব বছরে ঐ গ্রহ সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করবে। ঐ গ্রহ থেকে সূর্যকে দেখাবে একটি নক্ষত্রের মত; অর্থাৎ সূর্যের সে রকম কোন আলোই ঐ গ্রহে গিয়ে পড়বে না। ঐ গ্রহের উপরিতলের উষ্ণতা চরম স্কেলের প্রায় শূন্য ডিগ্রী অর্থাৎ −২৭৩° সেন্টিগ্রেডের কাছাকাছি থাকবে। যদি ইউরেনাস এবং নেপচুনের গতিপথ প্লুটো অপেক্ষা ঐ দশম গ্রহের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে, তবে সেটি একটি বিরাট গ্রহ হবে, যার বিশালতা নেপচুন, ইউরেনাস, এমন কি বৃহস্পতিকেও ছাড়িয়ে যেতে পারে। আর ঐ দশম গ্রহ যদি বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস বা নেপচুনের মত গ্যাসীয় দানব (Gas giant) হয়, তবে তার উপগ্রহ থাকাও স্বাভাবিক। কিন্তু এই ধরণের একটি গ্রহ মৃত, অন্ধ এবং অজ্ঞাত অবস্থায় নিঃশব্দে সূর্যকে পরিক্রমা করে চলেছে। কে জানে কবে তার কালো পর্দার যবনিকা উন্মোচিত হবে!

সেলুলেজ

সত্যনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

সেলুলোজ নামক জৈব পদার্থটি পৃথিবীতে যেমন সহজপ্রাপ্য, তেমনি পাওয়াও যায় প্রচুর পরিমাণে। রাসায়নিক ভাষায় এই সেলুলোজের নাম গ্লুকোজের পলিমার (Polymer of glucose)। ইহার সাধারণ ফর্মুলা হলো $(C_6H_{10}O_5)n$ অর্থাৎ বহু সংখক গ্লুকোজ এককের সমবায়ে সেলুলোজ গঠিত।

বহুদিন পর্যন্ত মানুষ এই সহজপ্রাপ্য পদার্থটিকে কোন উপায়ে নিজেদের কাজে ব্যবহার করিবার পন্থা উদ্ভাবন করিতে পারে নাই। তাই বহুকাল যাবৎ এই সহজপ্রাপ্য প্রাকৃতিক পদার্থটি অকেজো বস্তুরূপে অবহেলিত ও নষ্ট হইত। কিন্তু কিছুকাল হইতে বিজ্ঞানীরা মানবজাতির ও শিল্প-জগতের বিভিন্ন চাহিদার কথা ভাবিয়া এই সহজপ্রাপ্য বস্তুকে কিভাবে মানবজাতির উপকারে লাগান যায়, তাহার জন্য অক্লান্ত গবেষণা করিয়া চলিয়াছেন এবং দেখিয়াছেন যে, এই সেলুলোজজাতীয় পদার্থটিকে আর্দ্রবিশ্লেষণ করিলে গ্লুকোজ ও অন্যান্য অনেক রাসায়নিক পদার্থ উৎপন্ন হয়, ফার্মেন্টেশন বা কিণ্বনশিল্পে যাহাদের ব্যবহার অনস্বীকার্য। গবেষণালব্ধ এই তথ্য বর্তমানে সেলুলোজ ও সেলুলোজজাতীয় পদার্থকে আর্দ্রবিশ্লেষণের কাজে বিজ্ঞানীয় ও বায়োকেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারদের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করিয়াছে। কারণ যদি সেলুলোজ ও সেলুলোজজাতীয় পদার্থকে আর্দ্রবিশ্লিষ্ট করিয়া গ্লুকোজ বা ফার্মেন্টেশনের কাঁচা মাল প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন করা যায়, তবে ভবিষ্যতে

বহু ফার্মেন্টেশন শিল্পের কাঁচা মাল প্রাপ্তির অসুবিধা দূর হইবার সম্ভাবনা থাকিবে।

এই সেলুলোজজাতীয় পদার্থকে আর্দ্রবিশ্লেষণ করিতে গিয়া বিজ্ঞানীরা দেখিয়াছেন যে, রাসায়নিক পদার্থের মধ্যে অ্যাসিড এবং জৈব রাসায়নিক পদার্থের (Biochemicals) মধ্যে এন্‌জাইম আর্দ্রবিশ্লেষণের কাজে বিশেষ উপযোগী। তবে রাসায়নিক উপায়ে সেলুলোজের আর্দ্রবিশ্লেষণের কাজে কতকগুলি বিশেষ অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হয়। কিন্তু এন্‌জাইমের দ্বারা আর্দ্রবিশ্লেষণ করিলে এই সকল অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হয় না। তাই বর্তমানে এন্‌জাইমের দ্বারা সেলুলোজের আর্দ্রবিশ্লেষণ-বিক্রিয়াটির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। এই এন্‌জাইম নামক জৈব রাসায়নিক পদার্থটি মাইক্রো-অরগ্যানিজম অথবা প্রাণীদেহের বিভিন্ন ইন্দ্রিয়-নিঃসৃত রসজাতীয় পদার্থ হইতে পাওয়া যায়।

এখন দেখা যাক, কোন্ ধরণের এন্‌জাইম সেলুলোজের আর্দ্রবিশ্লেষণ ঘটাইতে সক্ষম হয়। বিভিন্ন বিজ্ঞানী বিভিন্ন মাইক্রো-অরগ্যানিজম ও বিভিন্ন প্রাণীর বিশেষ ইন্দ্রিয়-নিঃসৃত তরল পদার্থ লইয়া গবেষণা করিয়া দেখিয়াছেন যে, সকল মাইক্রো-অরগ্যানিজম সেলুলোজের উপর ক্রিয়া করে এবং যে সকল প্রাণী রোমন্থন করে (যেমন গরু, ঘোড়া, ছাগল প্রভৃতি), তাহাদের রুমেনে (Rumen) অথবা অন্যান্য তৃণভোজী প্রাণীর অন্ত্রে (Gut) ও জারক রসে (Digestive juice) যে সকল এন্‌জাইম থাকে, তাহারা সেলুলোজের আর্দ্র-বিশ্লেষণ ঘটাইতে পারে। এই ধরণের এন্‌জাইমকে সামগ্রিকভাবে বলা হয় সেলুলেজ (Cellulase)।

সেলুলেজের দ্বারা সেলুলোজজাতীয় পদার্থকে আর্দ্রবিশ্লেষণ করিবার জন্য প্রচুর পরিমাণে সেলুলেজ উৎপাদন করিবার ব্যবস্থা আগে করা দরকার। K. W. King, E. T. Reese প্রমুখ বিজ্ঞানীরা দেখিয়াছেন যে, সেলুলোজ হজমকারী উপযুক্ত জীবাণু বা মাইক্রো-অরগ্যানিজমের দ্বারা সেলুলোজযুক্ত মাধ্যমের কিণ্বন বা ফার্মেন্টেশন ঘটাইয়া সেলুলেজ উৎপাদন করা যায়। নিমজ্জন কিণ্বন পদ্ধতিতে (Submerged fermentation) সেলুলেজ উৎপাদন, নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর বিশেষ ভাবে নির্ভরশীল :—

(১) মৃত্তিকা ছাঁকন (Soil screening) বা অন্য পদ্ধতিতে প্রচুর পরিমাণে ও সক্রিয় সেলুলেজ উৎপাদনোক্ষম জীবাণু খুঁজিয়া বাহির করা।

(২) ঐ বাছাই করা জীবাণু কর্তৃক প্রচুর পরিমাণে সেলুলেজ উৎপাদনের জন্য উহার খাদ্য হিসাবে উপযুক্ত মাধ্যমের সংযুক্তি নির্ধারণ করা।

(৩) নির্ধারিত মাধ্যমে জীবাণুগুলি কোন্ উষ্ণতা ও pH বা অম্লতায় সবচেয়ে বেশী পরিমাণে সেলুলেজ উৎপাদন করিতে পারে, তাহা নির্ধারণ করা।

(৪) জীবাণুগুলি নির্ধারিত মাধ্যমে উপযুক্ত উষ্ণতা ও pH-এর আওতায় কতদিনে সর্বাপেক্ষা বেশী পরিমাণ সেলুলেজ উৎপাদন করিতে পারে তাহা নির্ধারণ করা।

(৫) ফার্মেন্টেশন চলিবার সময় কি পরিমাণ জীবাণুমুক্ত বা স্টেরিলাইজকরা বায়ু ও আন্দোলিত করিবার ব্যবস্থার প্রয়োজন, তাহা নির্ধারণ করা।

এই বিষয়গুলির উপর লক্ষ্য রাখিয়া বিভিন্ন জীবাণুতত্ত্ববিদ্ বিভিন্ন সেলুলেজ উৎপাদনোক্ষম জীবাণুর সন্ধান পাইয়াছেন। এই জীবাণুগুলি ফাঙ্গাস (Fungus), ব্যাক্টিরিয়া (Bacteria) অথবা অ্যাক্টিনোমাইসিটিস (Actinomycetes) শ্রেণীর। ইহাদের মধ্যে ফাঙ্গাস শ্রেণীর জীবাণুরাই কিণ্বন পদ্ধতিতে সেলুলেজ উৎপাদনের জন্যে অধিক উপযোগী। অবশ্য রুমেন ব্যাক্টিরিয়া, যথা ব্যাসিলাস সাক্সিনোজিনিস্-এর (Bacillus

succinogenes) উপযোগিতাও কম নয়। তবে বর্তমানে ফার্মেন্টেশন পদ্ধতিতে সেলুলেজ উৎপাদনের কাজে ফাঙ্গাসজাতীয় জীবাণুই ব্যবহৃত হয়।

বিভিন্ন ফাঙ্গাস শ্রেণীর জীবাণুর মধ্যে ট্রাইকোডারমা ভিরিডে (Trichoderma viride), অ্যাসপারজিলাস নাইগার (Aspergillus niger), পেনিসিলিয়াম ভেরিয়েবল (Penicillium variable), মাইরোথেসিয়াম ভেরুকারিয়া (Myrothecium verrucaria) প্রভৃতি জীবাণুর নাম উল্লেখযোগ্য। তবে ইহাদের মধ্যে ট্রাইকোডারমা ভিরিডে 6a (Trichoderma viride 6a) এবং ট্রাইকোডারমা ভিরিডে N-35 (Trichoderma viride N-35) নামক ট্রাইকোডারমা জীবাণুর দুইটি ষ্ট্রেনের (Strain) সক্রিয় সেলুলেজ উৎপাদন ক্ষমতা খুব বেশী। বর্তমানে আমেরিকাতে ট্রাইকোডারমা ভিরিডে 6a এবং জাপানে ট্রাইকোডারমা ভিরিডে N-35 এবং প্রথমোক্ত জীবাণুগুলির দ্বারা সেলুলেজ উৎপাদন এবং সেলুলেজের বায়োকেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং তথ্যাদির উপর প্রভূত গবেষণা চলিতেছে। আমাদের দেশেও সেলুলেজ উৎপাদনের দিকে বিশেষ নজর দেওয়া হইয়াছে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োকেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টে, মহীশূরের C. F. T. R. I. (Central Food Technological Research Institute)-এ ও অন্যান্য কয়েক স্থানে সেলুলেজ উৎপাদন ও সেলুলেজের ক্রিয়ার উপর গবেষণা চলিতেছে।

এখন দেখা যাক, সেলুলেজ এন্‌জাইমের উৎপাদন কিভাবে করা যায়। সেলুলেজের শিল্পোৎপাদনের জন্য এখনও কোন প্রামাণ্য পদ্ধতি (Standard process) প্রচলিত হয় নাই। তবে ট্রাইকোডারমা ভিরিডে 6a জীবাণুর দ্বারা 'আলোড়িত ফ্লাস্ক নিমজ্জিত কিণ্বন পদ্ধতিতে' (Shake flask submerged fermentation process) যে ভাবে সেলুলেজ উৎপাদন করা হয়, তাহা নিম্নরূপ—

আলোড়িত ফ্লাস্ক-নিমজ্জিত কিণ্বন পদ্ধতি :

(ক) ফার্মেন্টেশনকারী জীবাণু—ট্রাইকোডারমা ভিরিডে 6a, (খ) ফার্মেন্টেশনের মাধ্যমে সংযুক্তি—উপরিউক্ত জীবাণু লইয়া বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর E. T. Reese, M. Mandels প্রমুখ জীবাণুতত্ত্ববিদ্‌গণ দেখিয়াছেন যে, যে মাধ্যমকে খাদ্যরূপে ব্যবহার করিয়া এই জীবাণুটি প্রচুর পরিমাণে সেলুলেজ উৎপাদন করিতে পারে, তাহার রাসায়নিক সংযুক্তি নিম্নরূপ :

উপাদান	প্রতি ১০০ সি. সি. জলীয় দ্রবণে উপস্থিতি
সেলুলোজ	১ গ্রাম
KH_2PO_4	•২ "
$(NH_4)_2SO_4$	•১৪ "
ইউরিয়া	•'০৩ "
$MgSO_4 \cdot 7H_2O$	•'০৩ "
$CaCl_2$	•'০৩ "
অত্যল্প পরিমাণে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন ধাতব লবণের জলীয় দ্রবণ	•'১• সি. সি.
ও পেপ্‌টোন	•'১• গ্রাম

উপরিউক্ত সংযুক্তিতে বিভিন্ন ধাতব লবণের মিশ্রণের দ্রবণে থাকে :

$FeSO_4 \cdot 7H_2O$	—	৫০০ মিলিগ্র্যাম
$MnSO_4 \cdot H_2O$	—	১৫৬ "
$ZnCl_2$	—	২০০ "
১১%HCl	—	১ সি. সি.
পাতিত জল	—	১০০ সি. সি.

(গ) ইনোকিউলাম (Inoculum)—উপরিউক্ত ফার্মেন্টেশন মাধ্যমের ফার্মেন্টেশন যাহাতে ঠিক ভাবে ঘটিতে পারে তাহার দিকে লক্ষ্য

রাখিয়া বায়োকেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারগণ ও জীবাণু-তত্ত্ববিদ্‌গণ দেখিয়াছেন যে, মাধ্যমের ভিতর তার মোট আয়তনের ১০ শতাংশ পরিমাণ ইনোকিউলাম দিয়া ফার্মেন্টেশন পরিচালনা করিলে ফার্মেন্টেশনের বেগ (Fermentation rate) বেশ ভালভাবে চলে। এই ক্ষেত্রে ইনোকিউলাম নিম্নরূপে প্রস্তুত করা হয়।

পাতিত জলে ০·৮৫% সাধারণ লবণের দ্রবণ (যাহাকে ইংরেজিতে বলা হয় Physiological salt solution) প্রস্তুত করিয়া উহাকে ষ্টেরিলাইজ অর্থাৎ জীবাণুমুক্ত করিয়া লওয়া হয় এবং তাহার পর জীবাণুমুক্ত অবস্থার পরিবেশে এই দ্রবণের ১০ সি. সি. একটি ট্রাইকোডারমা ভিরিডে 6a-র স্ল্যান্ট কালচারে (Slant culture) এমন ভাবে ঢালা হয় যাহাতে বিজাতীয় জীবাণু প্রবেশ করিতে না পারে। ইহার পর ঐ স্ল্যান্ট কালচারকে ভালভাবে নাড়িয়া ঐ জীবাণুর স্পোরের একটি সমমিশ্রণ (Uniform mixture) প্রস্তুত করা হয়। এই স্পোর মিশ্রণই ইনোকিউলামরূপে ব্যবহৃত হয়।

(ঘ) ফার্মেন্টেশনের উষ্ণতা ও pH—বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গিয়াছে যে, উপরিউক্ত সংযুক্তির ফার্মেন্টেশন মাধ্যমের ট্রাইকোডারমা ভিরিডে 6a জীবাণুর দ্বারা ভালভাবে ফার্মেন্টেশন ঘটাইয়া সর্বোচ্চ পরিমাণ সেলুলেজ উৎপন্ন করিতে ফার্মেন্টেশন মাধ্যমের pH ৫·৩ এবং ফার্মেন্টেশনের উষ্ণতা ২৯° সি. সবচেয়ে উপযোগী। মাধ্যমের এই উষ্ণতা ও pH ছাড়া অন্য উষ্ণতা ও pH-এ সেলুলেজের উৎপাদন অনেক কম হয়।

(ঙ) ফার্মেন্টেশনের সময় বাতান্বিতকরণ ও আন্দোলিতকরণের ব্যবস্থা (Aeration and agitation):—

ট্রাইকোডারমা ভিরিডে 6a একটি বায়ুভুক জীবাণু (Aerobic organism), কাজেই ফার্মেন্টেশনের সময় মাধ্যমের ভিতর উপযুক্ত পরিমাণে ষ্টেরিলাইজ করা বায়ুপ্রবাহ চালনা করিবার ব্যবস্থা করা দরকার, তাহা না হইলে জীবাণুর বৃদ্ধি ব্যাহত হইবে এবং ইহার ফলে সেলুলেজের উৎপাদন কমিয়া যাইবে। আরও দেখা গিয়াছে যে, এই ফার্মেন্টেশন চলিবার কালে মাধ্যমটিকে যদি ভালভাবে আন্দোলিত করিবার ব্যবস্থা করা না হয়, তাহা হইলেও সেলুলেজের উৎপাদন কমিয়া যায়। ইনোকিউলামযুক্ত ফার্মেন্টেশনের মাধ্যমকে প্রতি মিনিটে ১৬০-২০০ বার ঘূর্ণনযুক্ত আলোড়ক যন্ত্রে (Rotary shaker) আলোড়িত করিলে সেলুলেজের উৎপাদন খুব ভাল হয়।

(চ) ফার্মেন্টেশনের সময়কাল—E. T. Reese, M. Mandels প্রমুখ বিজ্ঞানীরা দেখিয়াছেন যে, ট্রাইকোডারমা ভিরিডে 6a জীবাণুর দ্বারা উপরিউক্ত সংযুক্তিবিশিষ্ট ফার্মেন্টেশনের মাধ্যমের ২৯° সি. উষ্ণতায় ও pH৫·৩-এ ফার্মেন্টেশন ঘটাইয়া সবচেয়ে বেশী পরিমাণ সেলুলেজ উৎপন্ন করিতে ১৪ দিন ধরিয়া আলোড়ক যন্ত্রে ফার্মেন্টেশন চালাইতে হয়।

(ছ) পদ্ধতি—২৫০ সি. সি. আয়তনবিশিষ্ট Erlenmeyer flask-এ ৫০ সি. সি. ফার্মেন্টেশনের মাধ্যম লইয়া উহার pH ৫·৩-এ আনা হয়। তুলার ছিপি দিয়া ফ্লাস্কের মুখ বন্ধ করিয়া একটি অটোক্লেভে প্রতি ইঞ্চিতে ১৫ পাউণ্ড ষ্টীমের চাপে ১৫ মিনিট ধরিয়া ষ্টেরিলাইজ করা হয়। তাহার-পর ফ্লাস্ককে ঠাণ্ডা করিয়া জীবাণুমুক্ত পরিবেশে উহার ভিতর ১০% ইনোকিউলাম ঢালিয়া পুনরায় উহার মুখ তুলার ছিপির দ্বারা বন্ধ করিয়া প্রতি মিনিটে ১৬০-২০০টি ঘূর্ণনযুক্ত আলোড়ক যন্ত্রে ফার্মেন্টেশন চালান হয়। ১৪ দিন ফার্মেন্টেশন চলিবার পর কিণ্বিত বা ফার্মেন্টেড (Fermented) মাধ্যম হইতে সেলুলেজকে পৃথক করা হয়।

(জ) সেলুলেজের পৃথকীকরণ (Isolation of cellulase)—সেন্ট্রিফিউগেশন (Centrifugation) যন্ত্রের সাহায্যে কিণ্বিত মাধ্যমের তরল অংশ হইতে গাদ অংশকে পৃথক করা হয়। তাহার পর তরল অংশ হইতে নিম্নলিখিতভাবে সেলুলেজকে পৃথক করা হয়:

সেন্ট্রিফিউগেশনের দ্বারা প্রাপ্ত তরল

↓

৪০-৭০% $(NH_4)_2SO_4$ দ্রবণ দ্বারা আংশিকভাবে সেলুলেজ পৃথকীকরণ

↓

পরিস্রাবণ

↓

অবশেষ | তরল পদার্থ

অবশেষ

↓

জলে দ্রবণ

↓

জলধারার সাহায্যে ১২ ঘণ্টা যাবৎ ঝিল্লি-বিশ্লেষণ (Dialysis)

↓

ষ্টার্চমণ্ডল ইলেক্‌ট্রোফোরেসিস (Starch zone electrophoresis)

↓

সেলুলেজ

সেলুলেজের ব্যবহার—সেলুলোজ জাতীয় পদার্থকে আদ্র´বিশ্লিষ্ট করিয়া ফার্মেন্টেশনের উপযোগী পদার্থ উৎপন্ন করিতে সেলুলেজ ব্যবহৃত হয়। ইহা ছাড়াও সেলুলেজ প্রধানতঃ নিম্নলিখিত তিনটি ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

(১) খাদ্যশিল্পে সেলুলেজের ব্যবহার—জাপানী বায়োকেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারগণ গবেষণায় দেখিয়াছেন যে, বহু সব্জীজাতীয় পদার্থ (Vegetables), যথা—আলু, গাজর, বাঁধাকপি প্রভৃতি ও ফলমূলজাতীয় পদার্থকে সেলুলেজের দ্বারা বিক্রিয়া করাইলে উহাদের কোষগুলির মধ্যস্থ সেলুলোজজাতীয় কোষ সংযোজক পদার্থসমূহ (Cell cementing substance) আদ্র´বিশ্লিষ্ট হইয়া যায় এবং ফলে এককোষী সব্জী বা ফলমূল জাতীয় পদার্থ উৎপন্ন হয়। এই এক-কোষী সব্জি বা ফল বেশ সহজপাচ্য। তাহা ছাড়া ইহাদের সংরক্ষণগুণ (Storage property), পরিবহন গুণ (Trnsportation property) প্রভৃতির প্রভূত উন্নতি ঘটে। বর্তমানে দেখা গিয়াছে যে, চাউলকে সেলুলেজের দ্বারা বিক্রিয়া করাইয়া তাহার পর উহাকে সিদ্ধ করিয়া শুকাইয়া লইলে উহা হইতে Minnte rice বা Instant rice প্রস্তুত করা যায়। ইহা ছাড়াও রাঙা আলু হইতে শ্বেতসার বা ষ্টার্চ প্রস্তুতির কাজে সেলুলেজের ব্যবহার খুব গুরুত্বপূর্ণ। জাপানে ওগোনোরি (Ogonori) নামক পদার্থ হইতে অ্যাগার (Agar) প্রস্তুত করিবার কাজে সেলুলেজ ব্যবহৃত হইতেছে।

(২) কাগজশিল্পে সেলুলেজের ব্যবহার—কাগজ প্রস্তুত করিবার জন্য যে মণ্ড (Pulp) প্রস্তুত করা হয়, সেই মণ্ডকে সেলুলেজের দ্বারা বিক্রিয়া করাইয়া লইলে উৎপন্ন কাগজের গুণ উন্নততর হয়।

(৩) ব্রুয়িং শিল্পে (Brewing Industries) ব্যবহার—জাপানে মিসো (Miso), সয়সস (Soysauce) ও নাট্টো (Natto) নামক ফার্মেন্টেড সয়াবিন খাদ্য প্রস্তুতির কালে সয়াবিনের উপরের খোসা দূরীকরণের জন্য সেলুলেজের ব্যবহার বেশ কার্যকরী।

এই সমস্ত বিষয়ে ব্যবহার ছাড়াও গবেষণার ফলে সেলুলেজের বিভিন্নমুখী ব্যবহারের কথা ক্রমশঃ জানা যাইতেছে এবং ভবিষ্যতে বিভিন্ন শিল্পে ইহা একান্ত প্রয়োজনীয় পদার্থরূপে গণ্য হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

কৃষি বিভাগের নূতন ঘোষণা

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র

আমরা কৃষি বিভাগের বহু ঘোষণার সম্মুখীন হইয়াছি। সব ঘোষণা মনে রাখা দুষ্কর। তবে মোটামুটি মনে আছে, একটি ঘোষণাতে বলা হইয়াছিল যে এই বৎসরে পশ্চিম বঙ্গে ধানের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে, পশ্চিম বঙ্গ ধানে স্বয়ংসম্পূর্ণ হইবে, এমন কি পশ্চিম বঙ্গ হইতে ধান রপ্তানী করা যাইবে। কৃষি বিভাগের এই সকল ঘোষণায় আমরা তেমন আস্থা স্থাপন করিতে পারি নাই; কারণ আমাদের অভিজ্ঞতা এই যে, কৃষি বিভাগের একটি ঘোষণার সহিত আর একটি ঘোষণার কদাচিৎ মিল হয়।

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের কৃষি বিভাগের মন্ত্রী ডাঃ কানাইলাল ভট্টাচার্য মহাশয় বলিয়াছেন (৬ই নভেম্বর, ১৯৬৯, Statesman পত্রিকা দ্রষ্টব্য) বর্তমান বৎসরে চালের উৎপাদন ৬০ লক্ষ টনের পরিবর্তে ৫৫ লক্ষ টন কম হইবে। ভট্টাচার্য মহাশয় ইহার প্রধান কারণ বলিয়াছেন—(১) অক্টোবর মাসে অনেক জেলায় উপযুক্ত পরিমাণ বৃষ্টির অভাব, (২) সময় মত কৃষি বিভাগের কৃষকদিগকে কৃষি-ঋণ দিবার অক্ষমতা। শেষোক্ত কারণটি নূতন নহে, ইহা বরাবরই ঘটিতেছে, বহু আবেদন-নিবেদনে কোন ফল হয় নাই। কিন্তু এই কারণটির জন্য কি কৃষি বিভাগকে দায়ী করা যায় না? কৃষি বিভাগের যে শাখার উপর কৃষি-ঋণ দিবার ভার ন্যস্ত আছে, তাঁহারা কি কৈফিয়ৎ দিবেন? তাঁহাদের কৈফিয়ৎ যদি সন্তোষজনক না হয়, তবে তাঁহাদের বিরুদ্ধে কি কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায় না? মন্ত্রী মহাশয় আরও বলিয়াছেন যে, অধিকতর ফলনশীল ধানের ক্ষতি এই কারণেই বেশী হইয়াছে; ২০ লক্ষ একর জমির পরিবর্তে দশ লক্ষ একর জমিতে অধিকতর ফলনশীল ধানের চাষ করা সম্ভব হইয়াছে। যাহা হউক, মন্ত্রী মহাশয় আত্মতৃপ্তি লাভ করিয়াছেন এই মনে করিয়া যে, ৫৫ লক্ষ টন কম হইলেও গত বৎসরের তুলনায় এই বৎসরে ৮০০,০০০ টন খাদ্য অধিক উৎপাদিত হইবে ১০০,০০০ টন আউস ধান, ২০০,০০০ টন বোরো ধান এবং ৬০০,০০০ টন গম লইয়া খাদ্যশস্যের উৎপাদন ৭০ লক্ষ টন হইবে। মন্ত্রী মহাশয় আশা করেন ১৯৭১ সালে পশ্চিম বঙ্গের খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভ করা সম্ভব হইবে। আমাদের আশঙ্কা হইতেছে মন্ত্রী মহাশয়ের এই আশাও বাস্তবে পরিণত হইবে না। কখনও হইয়াছে কি?

মন্ত্রী মহাশয়ের আরও ঘোষণা এই যে, সরিষার উৎপাদন ৬৮,০০০ টনের স্থলে ১০০,০০০ টন বৃদ্ধি করিবার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে। এই রাজ্যে সরিষার প্রয়োজন ১০ লক্ষ টন। সরিষার উৎপাদন বাড়াইয়া কি চালের ঘাটতি পূরণ করা যাইবে? আমাদের চালই প্রধান সমস্যা; তবে হয় তো খানিকটা সরিষার তৈল খাইয়া খাদ্যের ক্যালোরি পূরণ করা যাইবে। পুষ্টিবিদ্‌গণ কি বলেন?

পুরুলিয়ায় অনাবৃষ্টি প্রায়ই ঘটে, এই জেলার সমস্যার সমাধানকল্পে ডাঃ ভট্টাচার্য বলিয়াছেন যে, এই জেলায় যে সকল ধান শীঘ্র পাকে, সেই জাতীয় ধানের চাষ করা হইবে, যাহাতে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু শেষ হইবার পূর্বেই এই জাতীয় ধান পাকে। এই বৎসর ঐ জাতীয় ধান ২০,০০০ একর জমিতে চাষ করা হইবে; বাস্তবে কত পরিমাণ জমিতে চাষ করা হইবে এবং

কত পরিমাণ জমির ফসল খামারে আনা সম্ভব হইবে ও ফলন কি পরিমাণ হইবে, তাহা কেহ বলিতে পারেন না।

যে সকল উঁচু জমি ধান চাষের পক্ষে উপযুক্ত নহে, সেই সকল জমিতে ফুলকপি, বিলাতী বেগুন, আলু এবং অন্যান্য শাক-সব্জী চাষ করিবার জন্য কৃষকদিগকে উপদেশ দেওয়া হইতেছে।

এখন কৃষি বিভাগের একজন মুখপাত্রের কথা শুনুন। তিনি বলিয়াছেন বিভিন্ন অঞ্চলে বর্ষা ঋতুতে উপরিউক্ত সব্জীর চাষ করিয়া সন্তোষজনক ফল পাওয়া গিয়াছে; সেই জন্য এই রাজ্যের স্থানে স্থানে সদৃশ জমিতে এই সকল সব্জীর চাষ করা হইবে, বিশেষতঃ বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, বীরভূম এবং উত্তর বর্ধমানে। এই সকল জায়গায় চাষ করিবার উদ্দেশ্য এই যে, এখানকার উৎপাদিত সব্জী অনায়াসে কলিকাতায় এবং শিল্পাঞ্চলে (যেমন দুর্গাপুর, আসানসোল, ধানবাদ এবং টাটানগরে) চালান দেওয়া যাইবে এবং বাজারে সহজেই বিক্রয় হইবে। আলুর সম্বন্ধে তিনি বলেন, এই বৎসর ৩০০,০০০ মণ অতিরিক্ত আলুর উৎপাদন করা সম্ভব হইবে। ধানের ঘাটতি আলুতেই পূরণ করা যাইবে বোধ হয়।

বর্ষা ঋতুতে আলু এবং উপরিউক্ত সব্জীর চাষের কথা বলা হইয়াছে। কিন্তু কৃষকেরা জানেন, ঐ সকল সব্জীর চাষের জন্য জলের দরকার। কৃষি বিভাগ মনে করেন ঐ সকল সব্জী যখন বর্ষাকালে চাষ করা হইবে, তখন জলের প্রয়োজন হইবে না। সেই জন্য জলসরবরাহের কথা কিছু বলেন নাই। কিন্তু এইটুকু মনে রাখা উচিৎ যে, বর্ষাকালেও দিনের পর দিন অনাবৃষ্টি হইতে পারে, তখন জলের সরবরাহ কোথা হইতে আসিবে? বর্ষাকালে আমন ও আউস ধানের চাষ হইয়া থাকে, তখনও অনাবৃষ্টির কবল হইতে এই সকল ধান বাঁচাইবার জন্য জলসরবরাহের ব্যবস্থা রাখিতে হয়। মন্ত্রী মহাশয় প্রথমেই বলিয়াছেন যে, এই বৎসর অক্টোবর মাসে উপযুক্ত পরিমাণ বৃষ্টি না হইবার জন্য ধানের উৎপাদন কম হইবে। সুতরাং সব ঋতুতেই চাষের জন্য জলসরবরাহের ব্যবস্থা রাখা বিশেষ প্রয়োজন।

কৃষি বিভাগ কিরূপ এলোমেলোভাবে শাক-সব্জীর চাষের বিস্তৃতির চেষ্টা করিতেছেন তাহা পূর্ববর্তী সংখ্যা 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে' বলিয়াছি, এবারেও বলিতেছি। শাক-সব্জীর চাষ বাড়াইবার জন্য শাক-সব্জীর বীজ, চারা ইত্যাদি বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়; ইহাতে 'গৌরী সেনের' কত পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়, তাহা জানি না। দরখাস্ত করিলেই বীজ, চারা ইত্যাদি পাওয়া যায়, দরখাস্ত-কারীরা শাক-সব্জীর চাষের বিষয় জানুন বা না জানুন। কেবলমাত্র একটি উদাহরণ দিতেছি—কলিকাতার উপকণ্ঠে আমার পরিচিত এক ভদ্রলোক (চাষী নহে) দরখাস্ত করিয়া বিনামূল্যে কয়েক রকমের শাক-সব্জীর চারা ও বীজ পাইয়াছিলেন, কিন্তু এই সকল শাক-সব্জীর চাষ সম্বন্ধে তাঁহার কোন অভিজ্ঞতা না থাকাতে তিনি উহাদের চাষে কৃতকার্য হইলেন না। কৃষি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীগণের নিকট হাঁটাহাঁটি করিলেন, এমন কি তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন মহাশয়কে চিঠিও লিখিলেন, কিন্তু কোন ফল হইল না, লিখিত চিঠির উত্তরও পাইলেন না। ভদ্রলোক 'দূর ছাই' বলিয়া শাক-সব্জীর চাষ ত্যাগ করিলেন। এইরূপ অনেক উদাহরণ দিতে পারি।

এইবার গ্রামাঞ্চলের কথা বলিতেছি। কৃষি বিভাগ কি এমন একটি অঞ্চল, এমন একটি গ্রাম দেখাইতে পারেন, যেখানে গৃহস্থের গৃহের সংলগ্ন পতিত জমিতে শাক-সব্জীর চাষের প্রবর্তন করিতে পারিয়াছেন? এই সকল পতিত জমি নানা রকম রোগের জীবাণুর আবাস-স্থল হইয়া দেশের স্বাস্থ্যের প্রভূত অনিষ্টসাধন করিতেছে। গ্রামাঞ্চলে বিদ্যালয়সমূহের জমিতেও শাক-সব্জীর চাষের প্রবর্তন করা যাইতে পারে। ইহা বিদ্যালয়-

সমূহের ছাত্রদের, এমন কি তাহাদের অভিভাবকদেরও শিক্ষার সুযোগ ও সুবিধা দিতে পারে। আমার গ্রামের (হুগলী জেলার আঁটপুর) স্কুলেও শাক-সব্জীর চাষের ব্যবস্থা নাই। এইরূপ অনেক স্কুলের কথা বলিতে পারি, অথচ প্রত্যেক গ্রামে কৃষি বিভাগের গ্রামসেবক আছেন এবং তাঁহাদের উপরে Agriculture Extension Officer আছেন।

কৃষি বিভাগের কত কর্মচারী 'গৌরী সেনের' টাকায় জাপান পরিভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন, সেখানে খানাপিনা করিয়া আসিয়াছেন, এমন কি শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন মহাশয় যখন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, তখন তিনিও জাপান গিয়াছিলেন। কিন্তু জাপানের কৃষি প্রণালী, বিশেষতঃ শাক-সব্জীর চাষের প্রণালী কি এই দেশে প্রবর্তিত হইয়াছে? জাপানের প্রত্যেক গৃহস্থের গৃহের সংলগ্ন জমিতে শাক-সব্জীর চাষ হইয়া থাকে, এক টুকরা জমিও পড়িয়া থাকে না। প্রত্যেক গৃহস্থের গৃহ সংলগ্ন জমি পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন এবং শাক-সব্জীর বাগানে সুশোভিত। সেখানে একটি সুচ পড়িলে খুঁজিয়া পাওয়া যায়।

দেশের এই পরিস্থিতির কবে অবসান ঘটিবে বিধাতাই জানেন। মন্ত্রী মহাশয়গণ কৃষি বিষয়ে একেবারে অনভিজ্ঞ: এমন কি তাঁহারা জানেন না, কত পরিমাণ ধানে কত পরিমাণ চাল হয়। সকল বিষয়েই তাঁহাদের অধস্তন কর্মচারীদিগের উপর নির্ভর করিতে হয়। এই প্রসঙ্গে একটি উদাহরণ দিতেছি। আমার বন্ধু শ্রীভূতনাথ সরকার ইংরেজ আমলে বিহারের কৃষি বিভাগের অধিকর্তা হইয়াছিলেন। তিনি সাবোর কৃষি কলেজের এল, এজি ডিগ্রীপ্রাপ্ত, বিদেশে কোন দিন যান নাই। তাঁহার পুঁজি এদেশের কৃষির জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা। তাঁহার অধীনে ইংরেজ ও বিলাতী ডিগ্রীধারী অনেক কর্মচারী কাজ করিতেন। আমি তাঁহাকে কৌতূহলবশতঃ অনেক বার জিজ্ঞাসা করিয়াছি—তিনি তাঁহার এই বিদ্যার পুঁজি লইয়া কি ভাবে তাঁহার অধস্তন (ইংরেজ ও বিলাতী ডিগ্রীধারী) কর্মচারীদিগের সহিত কাজ করিতেন? তিনি উত্তরে বলিয়াছিলেন, এইরূপ কোন কর্মচারী কোন পরিকল্পনা দিলে আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতাম, এই পরিকল্পনার ফলে দেশের কি উপকার হইবে? তাঁহার উত্তর সন্তোষজনক হইলে আমি উহা মঞ্জুরের জন্য উপরিওয়ালাদের নিকট সুপারিশ করিতাম। জানি না, আজকাল ভূতনাথবাবুর ন্যায় কোন কৃষি অধিকর্তা এইরূপ প্রশ্ন করেন কিনা, না, রাজনীতির চাপে পরিকল্পনা মঞ্জুর করেন।

খুবই দুঃখের সহিত আমাদের সম্মানিত অতিথি বাদশা খান চীৎকার করিয়া বলিতেছেন ২২ বৎসর স্বাধীনতা লাভের পরেও আমরা খাদ্যের জন্য ভিক্ষার ঝুলি লইয়া দেশ-দেশান্তরে ঘুরিতেছি। তাঁহার কথা দেশের কর্ণধারগণ কি শুনিবেন? সকলেই রাজনীতির মাদকতায় উন্মত্ত।

পরিশেষে দেশের কর্ণধারগণকে নিবেদন করি যে, খাদ্যের অভ্যাস ত্যাগ করা খুবই কঠিন। বাঙ্গালী ভাত খাইতে অভ্যস্ত, গম, বাজরা বা মারুয়া খাইতে তাহারা অভ্যস্ত নহে, বর্তমানে দায়ে পড়িয়া খাইতেছে। বিশেষজ্ঞগণ বলেন, ভারতবর্ষে বিঘা প্রতি এক মণ ধানের উৎপাদন বাড়াইতে পারিলে আমরা যে চালের ঘাটতির অবসান করিতে পারিব কেবল তাহা নহে, আমরা চাল রপ্তানী করিতে পারিব। বিঘা প্রতি এক মণ চালের উৎপাদন বাড়ান কি এতই কঠিন?

গাগনিক বলবিদ্যার আধুনিক প্রয়োগ

দ্বিজেশচন্দ্র রায়

নূতনত্বের প্রতি মানুষের মন সহজেই আকৃষ্ট হয়। অজানাকে জানবার আগ্রহ মানুষের চিরকালের। এই আগ্রহের জন্যেই মানুষ আবিষ্কার করেছে নূতন নূতন দেশ, নূতন নূতন সম্পদ। বিজ্ঞানী আবিষ্কার করেছেন নূতন নূতন তত্ত্ব, নূতন নূতন যন্ত্র, যার জন্যে বিজ্ঞানের এত অগ্রগতি, মানুষের সভ্যতার এত উন্নতি। পৃথিবীর স্থলভাগ ও জলভাগ মানুষের সব চেনা-জানা হয়ে গেছে। এখন ডাক এসেছে মহাশূন্যের—Call of the Cosmos। এতে সাড়া দেওয়া মানে কত জ্ঞাত, কত অজ্ঞাত প্রাণসংশয়কর বিপদ। কিন্তু মানুষ মহাশূন্যের সেই আহ্বান মেনে নিয়েছে। ৪ঠা অক্টোবর ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দে সুরু হয়েছে মানুষের মহাকাশ জয়ের অভিযান। এইদিন সমস্ত বিশ্ববাসী চমৎকৃত হয়ে শুনলো, রাশিয়ার মহাকাশ-বিজ্ঞানীদের দ্বারা পৃথিবীর আকাশে স্পুটনিক-১-এর উৎক্ষেপণ ও তার সাফল্যের সঙ্গে পৃথিবীর চতুর্দিকে নির্দিষ্ট উপবৃত্তাকার পথে আবর্তনের সংবাদ। এর পেরিজী অর্থাৎ পৃথিবীর থেকে নিকটতম বিন্দু ছিল ২২৭ কি: মি: এবং অ্যাপজী অর্থাৎ দূরতম বিন্দু ৯৫০ কি: মি:। তারপর মাত্র এই বারো বছরে মহাকাশ-বিজ্ঞানের অসাধারণ উন্নতি হয়েছে রাশিয়া ও আমেরিকার বিজ্ঞানীদের দ্বারা। আজ মানুষের তৈরি কৃত্রিম গ্রহ সূর্যের চতুর্দিকে ও কৃত্রিম উপগ্রহ পৃথিবীর চতুর্দিকে কক্ষপথে আবর্তন করছে, মহাকাশযান চাঁদে নেমে ফটো পাঠাচ্ছে। পৃথিবীর মানুষ চাঁদের বুকে একাধিক বার হাঁটা-চলা করে আবার পৃথিবীতে ফিরে এসেছে, শুক্রগ্রহের, মঙ্গলগ্রহের পাশ দিয়ে গিয়ে নানারূপ সংবাদ পাঠাচ্ছে। মহাশূন্য সংক্রান্ত বহু মূল্যবান সংবাদ এখন মানুষের জানা হয়ে গেছে।

এখানে বলা প্রয়োজন যে, এই মহাকাশজয়ের অভিযানে সেরূপ কোন নূতন বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আবিষ্কৃত হয় নি। প্রয়োজন হয়েছে সেই পুরনো গাগনিক বলবিদ্যার। তবে এত দ্রুত অগ্রগতির মূলে আছে এই বলবিদ্যার সঠিক প্রয়োগ ও রকেট-বিজ্ঞান, স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র ও অন্যান্য যন্ত্রের অভাবনীয় উন্নতিসাধন। কোপার্নিকাস, কেপ্‌লার, গ্যালিলিও, নিউটন প্রভৃতি মহাবিজ্ঞানীদের বহু বছরের সাধনা ও চিন্তাধারায় আবিষ্কৃত হয়েছে এই গাগনিক বলবিদ্যা।

গ্রহগুলির চলন সংক্রান্ত কেপ্‌লারের বিখ্যাত তিনটি সূত্র ও নিউটনের অতি প্রসিদ্ধ মহাকর্ষ তত্ত্ব এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে।

কেপ্‌লারের নিয়মাবলী—(১) প্রতিটি গ্রহের কক্ষপথ এক একটি উপবৃত্ত, যার দুটি নাভির (Focus) একটিতে আছে সূর্য, (২) প্রতিটি গ্রহের আবর্তন এইরূপ যে, এটিকে সূর্যের সঙ্গে সংযুক্তকারী রেখা সমান সমান সময়ের অন্তরে সমান সমান ক্ষেত্র রচনা করে, (৩) কোন দুটি গ্রহের একটির আবর্তনকালের সময়ের বর্গের অনুপাত, তাদের সূর্য থেকে মধ্যক (Mean) দূরত্বের ঘনাঙ্কের (Cube) সমানুপাতিক।

নিউটনের মহাকর্ষ তত্ত্ব—এই বিশ্বের প্রতিটি বস্তু প্রতিটি বস্তুকে আকর্ষণ করে এবং এই আকর্ষণের বল (Force) বস্তু দুটির ভরের গুণফলের সমানুপাতিক এবং তাদের দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক।

নিউটনের এই তত্ত্ব থেকে আমরা জানতে

পারি যে, দুটি বস্তুর ভর যদি হয় m_1 ও m_2 এবং দূরত্ব হয় d, তাদের পরস্পরের আকর্ষণের বল যদি হয় f, তবে $f = \frac{Gm_1m_2}{d^2}$, এখানে G হচ্ছে মহাকর্ষীয় ধ্রুবক (Gravitational constant) এবং এর মান হলো ৬'৬৬×১০⁻⁸ সেন্টিমিটার গ্র্যাম মাত্রাতে। এখানে মনে রাখতে হবে যে, বস্তু দুটির ভর তাদের কেন্দ্রে অবস্থিত। এর থেকে আকর্ষিত বস্তুটির, ধরা যাক m_2, অভিকর্ষজ ত্বরণ, (Acceleration due to gravity) হবে $\frac{f}{m_2} = \frac{Gm_1}{d^2}$। আমরা এও জানি যে, m ভর বিশিষ্ট কোন বস্তু যদি অপর একটি বস্তু থেকে d দূরত্বে তার চতুর্দিকে v বেগে আবর্তন করতে থাকে (যেমনটি হয় একটি সুতার অগ্রভাগে ঢিল বেঁধে ঘোরালে), তবে কেন্দ্রাতিগ বল হবে $\frac{mv^2}{d}$। সৌরজগতে গ্রহগুলি সূর্যের চতুর্দিকে কিংবা গ্রহগুলির চাঁদ গ্রহগুলির চতুর্দিকে এই নিয়মেই আবর্তিত হচ্ছে, তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, মহাকর্ষজ বল $\frac{Gm_1m_2}{d^2}$ হবে কেন্দ্রাতিগ বল $\frac{m_2v^2}{d}$ এর সমান, যদি m_2 বস্তুটি m_1 বস্তুর চতুর্দিকে আবর্তন করে। এর থেকে আমরা পাই $v = \sqrt{\frac{Gm_1}{d}}$। এখানে কক্ষপথকে বৃত্তাকার ধরা হয়েছে।

পরমাণুর ভিতরে ইলেকট্রনগুলি প্রোটন ও নিউট্রন দ্বারা গঠিত কেন্দ্রীনের চতুর্দিকে আবর্তিত হচ্ছে আর কেন্দ্রাতিগ বল হচ্ছে $\frac{mv^2}{d}$। যদি কোন প্রকারে কেন্দ্রীনের আকর্ষণের বল বেড়ে যায়, তবে আবর্তিত বস্তুটি কাছে চলে আসবে এবং নূতন দূরত্ব d′ এমন হবে যে, নূতন বল $\frac{mv^2}{d'}$ হবে কেন্দ্রীনের বর্ধিত আকর্ষণ বলের সমান। আবার যদি আকর্ষণের বল কমে যায়, তবে আবর্তিত বস্তুটি দূরে চলে যাবে এবং নূতন দূরত্ব d″ এমন হবে যে, $\frac{mv^2}{d''}$ হবে কেন্দ্রীনের কমে যাওয়া বলের সমান। আবার যদি আবর্তিত বস্তুটির বেগ কমে কিংবা বাড়ে, তবে দূরত্ব একই নিয়মে কমবে কিংবা বাড়বে।

এইসব সূত্র থেকে গ্রহ-উপগ্রহের আবর্তন এবং মহাকাশযান সংক্রান্ত অনেক তথ্য জানা যায়, যেমন গ্রহ-উপগ্রহের নিজ নিজ কক্ষপথে আবর্তনের বেগ বের করা যায়। ধরা যাক পৃথিবীর ব্যাপার, সূর্যের ভর ১'৯৯×১০³³ গ্র্যাম, পৃথিবীর কক্ষপথের মধ্যক (Mean) ব্যাসার্ধ ১৪'৯৫×১০¹² সেঃ মিঃ। সুতরাং v যদি হয় পৃথিবীর আবর্তনের বেগ, তবে $v = \sqrt{\frac{GM}{d}}$ এই সূত্রে সূর্যের ভর, কক্ষপথের ব্যাসার্ধ ও G-এর মান বসিয়ে v-এর মান পাওয়া যায় ২৯'৭৮ কিঃ মিঃ / সেকেণ্ডে। এই ভাবে চাঁদের বেগ বের হবে ১'০২ কিঃ মিঃ / সে.।

পরিত্রাণ বেগ (Escape velocity)—একটি গাগনিক বস্তুর, যেমন—পৃথিবীর, অভিকর্ষের বল থেকে যদি কোন বস্তু, ধরা যাক একটি রকেট, পরিত্রাণ পেতে চায়, তবে তাকে যে বেগে ছুটতে হবে, সেই বেগকে বলা হয় পরিত্রাণ বেগ। এই বেগের কম হলে রকেটটি পৃথিবীর আকর্ষণে চতুর্দিকে উপবৃত্তাকারে ঘুরবে। পৃথিবী তার উপরিভাগের সব বস্তুকেই কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ করছে। কোন বস্তুর, যেমন—রকেটের, ভর যদি হয় m, তবে এই রকেটের উপর অভিকর্ষজ বল, যাকে বলা হয় ওজন, (Weight) হবে $\frac{GMm}{r^2}$। এখানে M= পৃথিবীর ভর এবং r= পৃথিবীর ব্যাসার্ধ। অভিকর্ষজ

ত্বরণ $= \frac{GM}{r^2}$। পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে উপরিভাগে রকেটটির অবস্থানহেতু স্থিতিশক্তি $= \frac{GMm}{r}$। আর রকেটটি যদি এই পিছটান শক্তিকে কাটিয়ে পরিত্রাণ পেতে চায়, তবে তাকে এই পরিমাণ গতিশক্তি অর্জন করতেই হবে। গতিশক্তি $= \frac{1}{2}mv^2$। $\therefore \frac{1}{2}mv^2 = \frac{GMm}{r}$ অর্থাৎ পৃথিবীর ভর $=৬\times১০^{২৭}$ গ্র্যাম ও $r=৬৩৮০$ কিঃ মিঃ এবং $G=৬.৬৮\times১০^{-৮}$, $\therefore v=$ প্রায় ১১.২ কিঃ মিঃ/সেঃ।

এমনি করে বের করা যায় চাঁদের উপরিভাগে পরিত্রাণ বেগ, যার মান হলো ২.৪ কিঃ মিঃ/সেঃ, চাঁদের ভর প্রায় ৭.২$\times১০^{২৫}$ গ্র্যাম ও ব্যাসার্ধ প্রায় ১৭৩৯ কিঃ মিঃ।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, কোন গাগনিক বস্তুর উপরিভাগের পরিত্রাণ বেগ বের করা যায়, যদি তার ভর ও ব্যাসার্ধ জানা যায়। মঙ্গলগ্রহের উপরের পরিত্রাণ বেগ হবে ৫ কিঃ মিঃ/সেঃ, শুক্রগ্রহের ১০.৩ কিঃ মিঃ/সেঃ, শনিগ্রহের ৩৬.৭ কিঃ মিঃ/সেঃ ও বৃহস্পতিগ্রহের ৬০.৮ কিঃ মিঃ/সেঃ।

পৃথিবীর আকাশে বিভিন্ন উচ্চতায় এই বেগ বিভিন্ন হবে। তখন কেন্দ্র থেকে রকেটটির দূরত্ব হবে ব্যাসার্ধ ও উচ্চতার যোগফল। এইভাবে হিসাব করলে বের হবে ১০০০ কিঃ মিঃ উচ্চতায় ১০.৪ কিঃ মিঃ/সেঃ, ৬০০০ কিঃ মিঃ উচ্চতায় ৮ কিঃ মিঃ/সেঃ। যত উপর থেকে রকেট উৎক্ষিপ্ত হবে, ততই তার পরিত্রাণ বেগ কম লাগবে, তার মানে রকেটটি ততই হাল্কা ও ইঞ্জিন কম শক্তিসম্পন্ন হলেই চলবে। এই জন্যে মহাকাশ-বিজ্ঞানীরা চিন্তা করছেন ভবিষ্যতে মহাশূন্যে কতকগুলি অন্তর্বর্তী মহাকাশ ষ্টেশন তৈরি করবার কথা, যেখান থেকে চাঁদ কিংবা গ্রহাভিমুখে রকেট উৎক্ষেপণ করা সহজ হয়।

বায়ুমণ্ডল—পরিত্রাণ বেগের উপর নির্ভর করে গ্রহ-উপগ্রহের আকাশে বায়ুমণ্ডলের অবস্থান। পৃথিবীর আকাশে বায়ুমণ্ডল আছে, কিন্তু আমাদের চাঁদের আকাশে কিংবা বুধগ্রহের আকাশে বায়ুমণ্ডলের অস্তিত্ব পাওয়া যায় নি। মঙ্গলগ্রহের আকাশেও অক্সিজেন ও জলীয় বাষ্পের অস্তিত্ব পাওয়া যায় নি, থাকলেও খুব কম পরিমাণে আছে। আছে শুধু কার্বনডায়োক্সাইড আর বোধ হয় নাইট্রোজেন। এর কারণ হচ্ছে গ্যাসের অণুগুলির নিরন্তর সর্বদিকে দ্রুত চলন ও পরস্পরের সঙ্গে সংঘর্ষ। এইসব অণুগুলির চলনের বেগ তাপমাত্রা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে যায় এবং একই তাপমাত্রাতে হাল্কা গ্যাসের অণুগুলির বেগ ভারী গ্যাসের তুলনায় বেশী। আমরা জানি যে, বায়ুমণ্ডল গঠিত হয় মূলতঃ নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন গ্যাসের মিশ্রণে, এ ছাড়া আছে অল্প পরিমাণে জলীয় বাষ্প, কার্বন ডায়োক্সাইড, হাইড্রোজেন, আর্গন, হিলিয়াম ইত্যাদি। বিজ্ঞানীরা দেখেছেন যে, 0° সেন্টিগ্রেডে মধ্যক বেগ প্রতি সেকেণ্ডে হাইড্রোজেনের বেলায় ১.৯ কিঃ মিঃ, জলীয় বাষ্পের ০.৬৪ কিঃ মিঃ এবং নাইট্রোজেন ও অক্সিজেনের প্রত্যেকটির ০.৫ কিঃ মিঃ। এই বেগগুলির মান ১০০° সেঃ প্রায় শতকরা ১৭ ভাগ বেড়ে যায়। অভিকর্ষজ আকর্ষণের বল অন্যান্য বস্তুর মত গ্যাসের অণুগুলির উপরেও সমভাবে প্রযোজ্য। সুতরাং অণুগুলির চলন বেগ যদি পরিত্রাণ বেগের চেয়ে বেশী হয়, তবে বন্ধনমুক্ত হয়ে উধাও হয়ে যাবে। হিসাবে করে দেখা গেছে যে, কোন একটি গাগনিক বস্তু তার আকাশের বায়ুমণ্ডলের অর্ধেক পরিমাণ হারাবে কয়েক সপ্তাহের মধ্যে, যদি পরিত্রাণ বেগ অণুগুলির বেগের তিন গুণের চেয়ে বেশী না হয়, কয়েক হাজার বছরের

ভিতরে যদি চার গুণের বেশী না হয় এবং অনেক কোটি বছর যদি পাঁচ গুণ হয়। তাহলে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে, পৃথিবীর ঠিক উপরে পরিত্রাণ বেগ ১১·২ কিঃ মিঃ/সেঃ জন্তে বায়ুমণ্ডল উধাও হয়ে যেতে পারে নি, কিন্তু চাঁদের ঐ বেগ মাত্র ২·৪ কিঃ মিঃ/সেঃ জন্তে সব বায়ুমণ্ডল উধাও হয়ে গেছে। অবশ্য পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের অতি উচ্চ স্তরে, যেখানে পরিত্রাণ বেগ কম ও তাপমাত্রাও কয়েক হাজার ডিগ্রী, সেখানে বায়ুমণ্ডলের হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম ইত্যাদি হাল্কা গ্যাস দ্রুত উধাও হয়ে যাচ্ছে।

আমরা জানি যে, মহাকাশযান কিংবা কৃত্রিম উপগ্রহ শূন্যে দূর-দূরান্তে পাঠাতে হলে রকেটের প্রয়োজন। কারণ রকেট ছাড়া অন্য কোন ইঞ্জিন ঐ বেগ দিতে পারে না। রকেট ইঞ্জিনে জেট ইঞ্জিনের মত অতি উত্তপ্ত গ্যাস, যার তাপমাত্রা ৩০০০°—৪০০০° সেণ্টিগ্রেডের মত, পিছনের একটি উন্মুক্ত পথ দিয়ে সবেগে বেরিয়ে যাবার জন্তে যে ধাক্কার সৃষ্টি হয়, সেই ধাক্কাই রকেটটিকে উল্টো-দিকে প্রচণ্ড বেগে ঠেলে দেয়। রকেটে রাসায়নিক গ্যাস, তরল কিংবা কঠিন জ্বালানী ব্যবহৃত হয়। হয়তো শীঘ্রই পারমাণবিক শক্তিতে রকেট চালানো সম্ভবপর হবে।

মহাকাশযানবাহী রকেট সাধারণতঃ তিন পর্যায়ের হয়। তিন পর্যায়ের রকেটে আছে তিনটি অংশ। প্রথম অংশটি নির্দিষ্ট উচ্চতায় উঠলে তার জ্বালানী শেষ হয়ে যায় ও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে যায়। পড়ে যাবার আগে বাকী অংশগুলিকে একটি বেগ দিয়ে যায়। তখন দ্বিতীয় অংশটির ইঞ্জিন কাজ করতে সুরু করে এবং নির্দিষ্ট উচ্চতায় উঠে বাকী অংশকে আরও বেশী বেগ দিয়ে খসে পড়ে। তৃতীয় অংশটির কাজ সুরু হয় ও নির্দিষ্ট উচ্চতায় উঠে প্রজ্বলনের (Ignition) দরুণ মহাকাশ যানটিকে অনুভূমিক দিকে (Horizontal direction) উপযুক্ত পরিমাণ বেগ দিয়ে ঠেলে দেয়, যার জন্তে মহাকাশযানটি নির্দিষ্ট কক্ষপথে আবর্তন করতে থাকে। চাঁদ কিংবা অন্য গ্রহের দিকে উৎক্ষিপ্ত হলে সেই দিকে নির্দিষ্ট কক্ষপথে ছুটে যায়। বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া, ঘুরে পড়ে সঠিক দিকে যাওয়া, কক্ষপথের সংশোধন করা ইত্যাদি কাজ সাধিত হয় স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের দ্বারা বা পৃথিবী থেকে রেডিও তরঙ্গের দ্বারা।

কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা—বেতার গ্রাহক-যন্ত্রে আমরা দেখতে পাই যে, সাধারণতঃ ১২ মিটার দৈর্ঘ্য হ্রস্ব তরঙ্গ, যার কম্পন সংখ্যা (Frequency) প্রতি সেকেণ্ডে ২৫ মেগাসাইকেল, পর্যন্ত ধরবার বন্দোবস্ত আছে। এর চেয়ে হ্রস্বতর তরঙ্গ ধরবার বন্দোবস্ত নেই। কারণ কোন ব্রডকাষ্টিং কোম্পানী এর চেয়ে হ্রস্বতর তরঙ্গে অনুষ্ঠান পাঠায় না। এর কারণ হচ্ছে এই যে, বেতার-তরঙ্গগুলির যেগুলি শুধু পৃথিবীর মাটি ছুঁয়ে যায় (Ground waves) সেগুলি ৩০/৪০ মাইল পর্যন্ত ধরা যেতে পারে। এই দূরত্ব নির্ভর করে প্রেরক-যন্ত্রের (Transmitter) শক্তি ও জমির পরিবাহিতার (Soil conductivity) উপর। আমরা আরও দূর থেকে যে সব তরঙ্গ বেতার গ্রাহক-যন্ত্রে ধরতে পারি, সেগুলি আয়নমণ্ডল থেকে প্রতিফলিত হয়ে পৃথিবীতে ফিরে আসে। এই আয়নমণ্ডলের দ্বারা বক্র হয়ে বড় জোর ২৫ মেগাসাইকেল কম্পন সংখ্যা (১২ মিটার দৈর্ঘ্যের তরঙ্গ) কিংবা কিছু বেশী কম্পন সংখ্যার তরঙ্গ পর্যন্ত পৃথিবীতে ফিরে আসতে পারে। এই সংখ্যা নির্ভর করে দিনের সময়, ঋতু, সৌরকলঙ্কগুলির কার্যকারিতা ইত্যাদির উপর। কিন্তু হ্রস্বতর দৈর্ঘ্যের তরঙ্গগুলির আয়নমণ্ডলের দ্বারা বক্রতা (Bending) এতই কম হয় যে, তারা আর পৃথিবীতে পৌঁছয় না। যত হ্রস্ব হবে তত তারা আয়নমণ্ডল ভেদ করে চলে যাবে। টেলিভিসনের প্রেরক-যন্ত্রের কম্পন সংখ্যা অনেক বেশীর জন্তে ৩০।৪০ মাইলের বেশী

দূরত্বে প্রচার করা সম্ভব হয় না। কিন্তু আমরা জানি যে, রেডার যন্ত্রে অতি হ্রস্ব দৈর্ঘ্যের তরঙ্গ ব্যবহার করে অনেক উঁচু দিয়ে উড়ে-যাওয়া এয়ারোপ্লেনের দিক ও দূরত্ব পরিমাপ করা যায়। এই সব তরঙ্গ ঐ এরোপ্লেনের শরীরে লেগে প্রতিফলিত হয়ে পৃথিবীতে ফিরে আসে। এই জন্যে আজকাল চেষ্টা করা হচ্ছে যে, যদি আকাশে বহু উচ্চে একটি কৃত্রিম উপগ্রহ স্থিরভাবে রাখা যায়, তবে যে কোন দৈর্ঘ্যের তরঙ্গ সেখান থেকে প্রতিফলিত হয়ে পৃথিবীতে ফিরে আসবে এবং আমরা বহু দূরে থেকেও সেই সব তরঙ্গ গ্রহণ করতে পারবো। এইভাবে টেলিভিসন, বেতার টেলিফোনী ও টেলিগ্রাফী বহু দূর জায়গায় পাঠানো সম্ভব হবে। কৃত্রিম উপগ্রহটির উচ্চতা ও বেগ এমন হবে যে, পৃথিবীর নিজের অক্ষের চতুর্দিকে ঘুরপাক খেতে যে সময় লাগে, প্রায় ২৪ ঘণ্টা, উপগ্রহটিরও নিজ কক্ষপথে পৃথিবীর চতুর্দিকে আবর্তন করতে সেই সময় লাগবে। তবেই আপেক্ষিকভাবে উপগ্রহটি আকাশে একই জায়গায় স্থির হয়ে থাকবে। আমরা পূর্বোল্লিখিত সূত্র দিয়ে এই উচ্চতা ও বেগ বের করতে পারি। ধরা যাক, পৃথিবীর উপরিভাগ থেকে কক্ষপথটির উচ্চতা হলো h কিঃমিঃ ও পৃথিবীর ব্যসার্ধ্য হলো r কিঃমিঃ, যেমনটি দেখানো হয়েছে ১নং চিত্রে। তাহলে বেগ

১নং চিত্র

$= \sqrt{\dfrac{GM}{(r+h)\times 10^5}}$ আবার এই বেগ ও উচ্চতা এমন যে, কক্ষপথটির পরিধি একবার আবর্তন করতে উপগ্রহটির সময় লাগবে ২৪ ঘণ্টা বা ৮৬৪০০ সেকেণ্ড।

পরিধি $= 2\pi\,(r+h)$। ∴ $= \dfrac{2\pi(r+h)\times 10^5}{86400}$

$= \sqrt{\dfrac{GM}{(r+h\times 10^5}}$। এই সূত্রে পৃথিবীর ভর ও

মহাকর্ষীয় ধ্রুবক G-এর মান বসিয়ে r+h হবে ৪২১০০ কিঃ মিঃ। এর থেকে r=৬৩৮০ কিঃ মিঃ বিয়োগ করলে h=৩৫৭২০ কিঃ মিঃ। বেগ v হবে ৩ কিঃ মিঃ/সেঃ।

কক্ষপথের আকার—কক্ষপথ বৃত্তাকার, উপ-বৃত্তাকার, অধিবৃত্তাকার ইত্যাদি হতে পারে। তবে উপবৃত্তাকারই বেশী। পৃথিবীর কিছু উপর দিয়ে যদি কোন রকেট বৃত্তাকারে পৃথিবীকে আবর্তন করে তবে $v=\sqrt{\frac{GM}{r}}$ সূত্র দিয়ে বেগ হবে ৭·৯ কিঃমিঃ/সেঃ এবং একবার আবর্তন করতে হচ্ছে কক্ষপথটির পরাক্ষের (Major axis) অর্ধেক। পৃথিবীর ঠিক উপর দিয়ে যদি m_2 বৃত্তাকারে আবর্তন করে, তবে a=r আর সূত্রটি দাঁড়াবে $v^2=G(m_1+m_2)\times\frac{1}{r}\approx\frac{mG_1}{r}$ যেহেতু m_2 অনেক ক্ষুদ্র m_1-এর তুলনায় এবং এর মান হবে ৭·৯ কিঃমিঃ/সেঃ, যা আমরা পূর্বেই বের করেছি। যদি বেগ v বাড়তে থাকে তবে a-এর মান দ্রুত বেড়ে যাবে, যদি কক্ষপথটি অধিবৃত্তাকার হয় তবে a হবে গণনাতীত সংখ্যা (Infinity) আর $\frac{1}{a}$ হবে
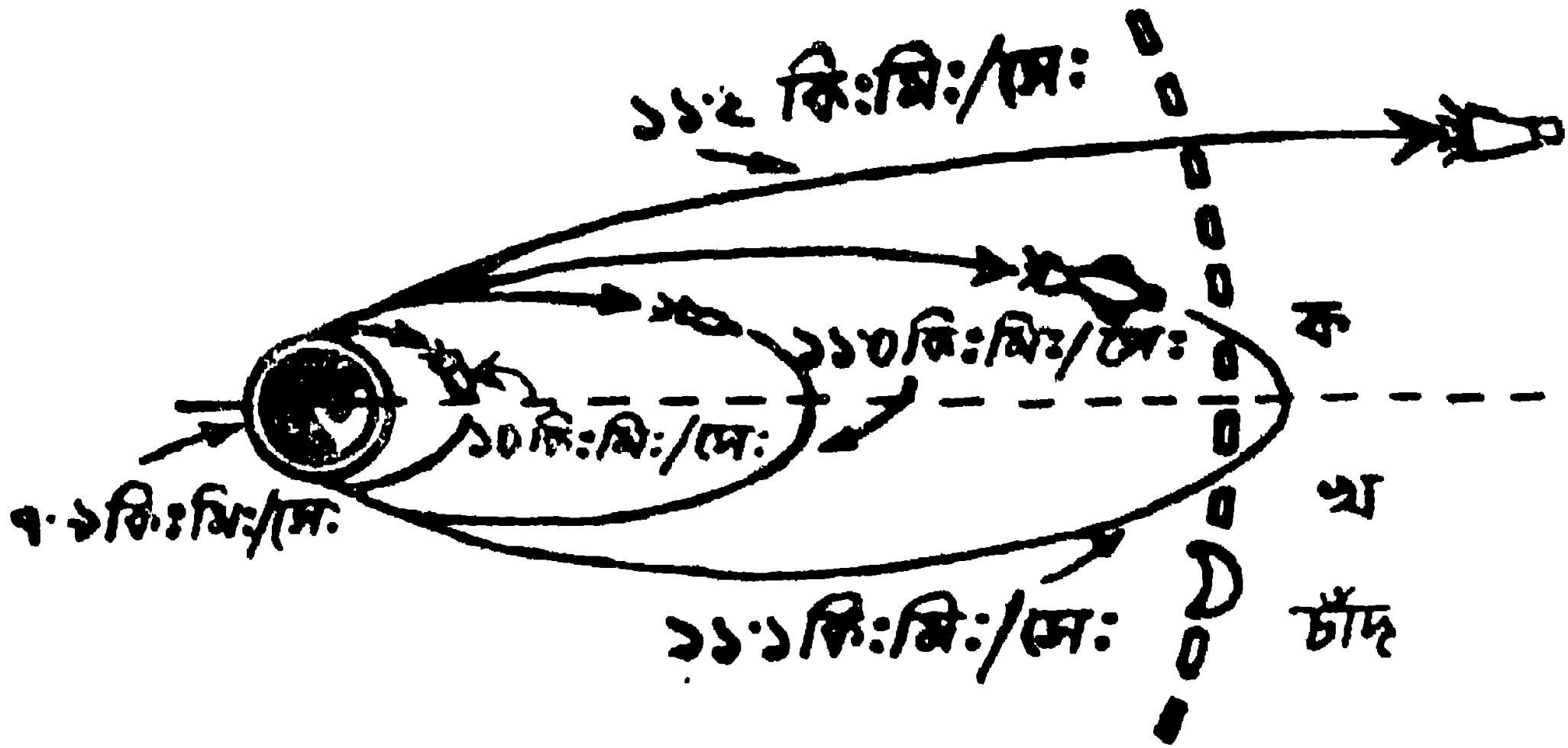
২নং চিত্র

সময় লাগবে $\frac{2\pi r}{v}$ =১ ঘন্টা ২৪ মিঃ প্রায়। কিন্তু ঐ কক্ষপথে যদি বেগ বেড়ে যায়, তবে নূতন কক্ষপথটি হবে উপবৃত্তাকার এবং বেগ যত বাড়বে কক্ষপথটি ততই বেশী উপবৃত্তাকার হবে, যেমন দেখানো হয়েছে ২নং চিত্রে।

কক্ষপথটি ঠিক কি আকারের হবে, তা নির্ভর করবে কেন্দ্রীয় বল এবং আবর্তিত বস্তুটির বেগের উপর। সাধারণ সূত্র হচ্ছে $v^2=G(m_1+m_2)\left(\frac{2}{r}-\frac{1}{a}\right)$ যেখানে m_1 হচ্ছে আকর্ষণকারী বস্তুর ভর, m_2 হচ্ছে আবর্তিত বস্তুর ভর, r হচ্ছে তাদের ভিতরের দূরত্ব ও a

O। তখন v হবে $\sqrt{2}\times\sqrt{\frac{Gm_1}{r}}$ =১১·২ কিঃ মিঃ/সেঃ, ইতিপূর্বে পরিত্রাণ বেগের বেলায় দেখানো হয়েছে। অধিবৃত্তাকার কক্ষপথ মানেই হলো m_2 আর ফিরে আসবে না, আকর্ষণের বাইরে মুক্ত হয়ে যাবে। বেগ v যদি হয় ১১·১ কিঃমিঃ/সেঃ, তবে রকেটটি চাঁদের কক্ষপথ, যার পেরিজী হচ্ছে ৩৫৬,৪০০ কিঃমিঃ ও অ্যাপজী ৪০৬,৬৭০ কিঃমিঃ ও মধ্যক দূরত্ব প্রায় ৩৮৩,০০০ কিঃমিঃ, পার হয়ে কিছুটা গিয়ে আবার পৃথিবীর দিকে ফিরে আসবে। যদি সময়, দিক ও বেগ হিসাব করে মহাকাশযানটিকে উৎক্ষেপণ করা

যায়, তবে এটি ক কিম্বা খ স্থানে (২নং চিত্রে) চাঁদে গিয়ে পড়তে পারে। এইভাবে লুনা-৯ মহাকাশযানটি সর্বপ্রথম চাঁদের পৃষ্ঠে অবতরণ করে সেখানকার চারপাশের ফটো পাঠিয়েছে টেলিভিসনের সাহায্যে। যদি কোন রকেটকে ১১.২ কি:মি:/সে: বেগে উৎক্ষেপণ করা যায় আর সেটি যদি চাঁদের আকর্ষণের দূরত্বের বাইরে দিয়ে যায়, তবে সূর্য সেটিকে টেনে নেবে, যেমনটি হয়েছে লুনা-১-এর ক্ষেত্রে, যেটি সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে প্রায় ৪৫০ দিনে। এইভাবে রকেটটি মঙ্গলগ্রহে কিংবা শুক্রগ্রহেও পৌঁছতে পারে।

সঞ্চয়ন

চান্দ্রশিলা পরীক্ষায় চাঁদের রহস্য উদ্‌ঘাটন

অ্যাপোলো-১১-এর মহাকাশচারীরা চাঁদের বুক থেকে যে উপলখণ্ডগুলি সংগ্রহ করে এনেছিলেন, তার মধ্যে ৬টি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সাধারণ মানুষের কাছে প্রদর্শিত হচ্ছে। এগুলির মধ্যেই একটি আনা হয়েছে ভারতে। চান্দ্রশিলাটি ভারতে প্রায় একমাস থাকবে। কলকাতায় এই চান্দ্রশিলার প্রদর্শনী হয়েছে ইডেন উদ্যানের ইণ্ডোর ষ্টেডিয়ামে ২রা থেকে ৭ই জানুয়ারী পর্যন্ত।

এই চান্দ্রশিলা নিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীরা এখনও গবেষণা করছেন। চাঁদের উৎপত্তি, গঠন ও বিবর্তনের কথা, পৃথিবীর সঙ্গে চাঁদের সম্পর্কের কথা এবং এমনি আরও কত রহস্য উদ্‌ঘাটিত হবে এই গবেষণার চূড়ান্ত ফলাফল থেকে।

এই চান্দ্রশিলাগুলির সম্পর্কে প্রাথমিক গবেষণার কাজ কিছুটা এগিয়েছে। এখানে অ্যাপোলো-১১ কর্তৃক আনীত চান্দ্রশিলা পরীক্ষার প্রাথমিক ফলাফল নিয়ে কিছু আলোচনা করা যেতে পারে।

১৯৬৯ সালের ২৫শে জুলাই অ্যাপোলো-১১-এর মহাকাশচারীরা সাড়ে ২১ কিলোগ্র্যাম চান্দ্রশিলা ও ধূলি পৃথিবীতে নিয়ে আসেন। এগুলির প্রাথমিক পরীক্ষা করে বিজ্ঞানীরা বলেছেন যে, এদের রাসায়নিক গঠন পৃথিবীর কোন পরিচিত শিলাখণ্ডের অনুরূপ নয়।

এই সিদ্ধান্ত থেকে কোন কোন বিজ্ঞানী একথা বলেছেন যে, চাঁদের উৎপত্তি সম্পর্কে প্রধান তিনটি তত্ত্বের অন্ততঃ একটি এখন আর সমর্থনযোগ্য বলে মনে হচ্ছে না।

হয়তো এ মত সঠিক হতে পারে যে, মহাকাশের অন্য কোন স্থান থেকে চাঁদের উৎপত্তি হয়েছিল, অথবা এ কথাও সত্য হতে পারে যে, চাঁদ ও পৃথিবী প্রায় একই সময়ে এবং একই বস্তু থেকে সৃষ্টি হয়েছিল।

তবে রাসায়নিক পরীক্ষায় চাঁদ ও পৃথিবীর মধ্যে যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেছেন, তাতে তৃতীয় তত্ত্বটি প্রায় বাতিল হয়ে যাচ্ছে। এই মত অনুসারে পৃথিবী যখন বয়সে তরুণ ছিল তখন পৃথিবীগাত্র থেকে একটি অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে এসেছিল—এটিই চাঁদ।

চাঁদে জীবনের বা জলের অস্তিত্ব আছে এমন কোন প্রমাণ চান্দ্রশিলায় পাওয়া যায় নি।

চাঁদের সমতল ভূমি নিস্তরঙ্গ সমুদ্র এলাকা থেকে কুড়িয়ে আনা শিলাখণ্ডগুলি পরীক্ষা করে বিজ্ঞানীরা বলেছেন এদের কোন কোনটি ৩৫০ কোটি বছরের প্রাচীন।

পরবর্তী চন্দ্রাভিযানগুলিতে আরও যে সকল শিলাখণ্ড পৃথিবীতে নিয়ে আসা হবে, তাতে সম্ভবতঃ এমন নমুনা পাওয়া যাবে, যার সৃষ্টি হয়েছিল সৌরমণ্ডলের সুরুতে।

চাঁদের পাহাড়ী অঞ্চলগুলি সমতলভূমির চেয়ে বেশী প্রাচীন বলে মনে করা হয়। মহাকাশ-চারীরা যখন এইসব অঞ্চলে পদার্পণ করবেন, তখন তাঁরা হয়তো এমন কোন শিলার সন্ধান পাবেন, যা ৪৫০ কোটি বছরের প্রাচীন। পৃথিবীর বয়স ৪৫০ কোটি বছর বলে অনুমান করা হয়।

অ্যাপোলো-১১-এর মহাকাশচারীরা যেসকল শিলাখণ্ড নিয়ে এসেছিলেন, তার অনেকগুলিই আগ্নেয়শিলা বলে বিজ্ঞানীরা পরীক্ষায় দেখেছেন। একদা এগুলি গলিত অবস্থায় ছিল, হয় অগ্ন্যুৎ-পাতের ফলে উৎক্ষিপ্ত, নতুবা উল্কাকণার সংঘাত-জনিত উত্তাপ থেকে সৃষ্ট

চাঁদের ২৩টি নমুনার রাসায়নিক বিশ্লেষণের ফলে দেখা গেছে, সমস্ত চান্দ্রশিলা ও ধূলিকণার গঠন একই প্রকার। এতে বোঝা যায়, চাঁদের নিস্তরঙ্গ সমুদ্র এলাকার বৈশিষ্ট্যসমূহ এগুলির মধ্যে রয়েছে।

চাঁদ থেকে আনা নমুনাগুলির মধ্যে এ যাবৎ জৈব উপাদানের কোন সন্ধান পাওয়া যায় নি। এতে এ-কথাই প্রমাণিত হয় যে, চাঁদে জীবনের অস্তিত্ব নেই। চাঁদ থেকে আনা নমুনা পদার্থগুলি মানুষ বা বীক্ষণাগারে রাখা জীব-জন্তুর দেহে রকম বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে নি।

পৃথিবীর শিলা ও চান্দ্রশিলার মধ্যে প্রধান পার্থক্য এই যে, চান্দ্রশিলায় প্রভূত পরিমাণ ক্রোমিয়াম, টাইটেনিয়াম, ইট্রিয়াম ও জারকোনিয়াম রয়েছে। এই পদার্থগুলি পৃথিবীর শিলায় দুষ্প্রাপ্য। এগুলি গলাতে হলে প্রচণ্ড উত্তাপের প্রয়োজন হয়।

পৃথিবীর শিলায় যে পরিমাণ ক্রোমিয়াম পাওয়া যায়; তার দশগুণ বেশী ক্রোমিয়াম চান্দ্রশিলায় আবিষ্কৃত হয়েছে। চাঁদের কেলাসিত আগ্নেয়শিলায় ১২ শতাংশ টাইটেনিয়াম অক্সাইড আছে। পৃথিবীর কোন কোন আগ্নেয়শিলায় টাইটেনিয়ামের সর্বোচ্চ পরিমাণ হলো ৪.৫ শতাংশ।

পক্ষান্তরে, সীসা, বিস্‌মাথ, সোডিয়াম ও পটাশিয়ামের মত যে সকল পদার্থ অল্প উত্তাপে গলে যায় এবং যা পৃথিবীর শিলায় মোটামুটি যথেষ্ট পরিমাণে রয়েছে, তা চান্দ্রশিলায় পাওয়া যায় নি। বিজ্ঞানীরা এতে বিস্মিত হয়েছেন।

যুক্তরাষ্ট্র ও অপর ৮টি দেশের ১৪১ জন বিজ্ঞানী অ্যাপোলো-১১ কর্তৃক আনীত চান্দ্র-শিলাগুলির আরও পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা ও বিশ্লেষণ করছেন। ১৯৭০ সালের প্রথম দিকেই তাঁরা রিপোর্ট পেশ করবেন। তখন সম্ভবতঃ চাঁদের উৎপত্তি, বিবর্তন এবং ভবিষ্যতে চাঁদ মানুষের কি কি কাজে লাগতে পারে, সে সম্পর্কে আরও অনেক তথ্য জানা যাবে।

চাঁদের ইতিহাস পৃথিবীর ইতিহাস থেকে পৃথক

আমেরিকার অ্যাপোলো-১১ যানের মহাকাশ-চারীরা চাঁদের নিস্তরঙ্গ সমুদ্র এলাকা থেকে চান্দ্রশিলা, মাটি প্রভৃতির যে সব নমুনা সংগ্রহ করে এনেছেন, সেগুলির প্রাথমিক পরীক্ষা থেকে বিজ্ঞানীরা প্রচুর নতুন তথ্য লাভ করেছেন।

এই সকল তথ্য থেকে চাঁদের জন্ম, ইতিহাস ও বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে কোন কিছু বোঝা যায় কিনা, চন্দ্রবিশেষজ্ঞদের কাছে তা এখনও পরিষ্কার হয় নি। তবে এই তথ্যগুলি এমন সব প্রমাণ উপস্থাপিত করেছে, যা থেকে এরকম

ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে যে, চাঁদের ইতিহাস পৃথিবীর ইতিহাস থেকে সম্পূর্ণ পৃথক।

প্রাপ্ত তথ্য থেকে আরও জানা যাচ্ছে যে, বর্তমানে চাঁদের সমগ্র দেহই সমান শীতল। কিন্তু ভূত্বকের উপরের স্তর শীতল এবং পৃথিবীর কেন্দ্রটি গলিত ধাতু ও প্রস্তরে পূর্ণ। এই দুটির মাঝখানের স্তরটি উষ্ণ।

বিজ্ঞানীদের সিদ্ধান্তগুলি মোটামুটিভাবে নিম্নরূপ :

১। চাঁদের উপরের ত্বকের নিম্নাংশ একটি বৃহৎ ভঙ্গুর বলের মত। এই বলটি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ভাঙ্গা পাথরের সমষ্টি। এই পাথরের গায়ে ফাটলগুলি চাঁদের দেহের গভীরে চলে গেছে।

২। সম্ভবতঃ চাঁদের মারিয়া বা শুষ্ক সমুদ্রগুলিতেই বস্তুর সংহত রূপ দেখা যায় এবং এই জন্যেই চন্দ্র-পরিক্রমারত মহাকাশযানের উপর চাঁদের অভিকর্ষ অসম।

৩। চাঁদের ধূলিকণার শতকরা ৫০ ভাগ কাচ-নির্মিত। এই কাচ অতি ক্ষুদ্র চকচকে শলাকা এবং গোলাকৃতি কণিকার সমষ্টি। টেক্সাসের হিউষ্টানে চান্দ্রগবেষণাগারে জুলাই মাসের শেষ দিকে চাঁদ থেকে আনা নমুনাপূর্ণ দুটি বাক্স যখন সর্বপ্রথম খোলা হলো তখন বিজ্ঞানীরা বলেছিলেন, চাঁদের ধূলিকণার এক-তৃতীয়াংশ কাচ।

মহাকাশচারী নীল আর্মষ্ট্রং ও এড্উইন অলড্রিন যে সকল আলোকচিত্র এনেছেন, তা দেখে মনে হয়, তাঁরা গাঢ় রঙের কাচের পাতলা আবরণের উপর দিয়ে হাঁটছেন। এই জন্যেই মহাকাশচারীরা জানিয়েছিলেন যে, চাঁদের পৃষ্ঠদেশ পিচ্ছিল।

প্রচুর পরিমাণ কাচের অস্তিত্ব, চন্দ্রপৃষ্ঠ থেকে আনীত নমুনায় প্রভূত পরিমাণ তেজস্ক্রিয়তা, চন্দ্রপৃষ্ঠের অবশিষ্টাংশের সঙ্গে তুলনায় চান্দ্রশিলার অতি ঘনত্ব, চন্দ্রপৃষ্ঠের ৩১০ কোটি বছর বয়স— এই সব কিছুই প্রমাণ করে যে, নিউ ইয়র্কের কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর পল গাষ্ট—'চাঁদের বিবর্তনের ইতিহাস পৃথিবী থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন' বলে যা বলেছিলেন, তা সত্য।

বিজ্ঞানীদের নতুন ব্যাখ্যাগুলি যদি নির্ভুল হয়, তাহলে বলতে হয় যে, চাঁদের জন্মের প্রথম ১৫০ কোটি বছর চন্দ্রপৃষ্ঠ উল্কার আঘাত ও আগ্নেয়গিরি বিস্ফোরণে বিক্ষুব্ধ হয়েছে, কিন্তু বিগত ৩০০ কোটি বছর এর অভ্যন্তরভাগ এবং চন্দ্রত্বক অপেক্ষাকৃত কম আলোড়িত হয়েছে। চাঁদের পৃষ্ঠদেশ খুবই প্রাচীন।

এর সঙ্গে তুলনা করলে পৃথিবীর অবস্থা বিপরীত। ভূবিদ্যার দিক থেকে পৃথিবী কোটি কোটি বছর আগে যেমন সক্রিয় ছিল এখনও তেমনি আছে। প্রচুর সংখ্যায় পাহাড়-পর্বত সৃষ্টি হয়েছে, আগ্নেয়গিরি অগ্নি উদ্গীরণ করেছে এবং মহাদেশগুলি ক্রমেই দূরে সরে গেছে— অতীতেও যেমন ছিল, এখনও তেমনই আছে।

চন্দ্রদেহ থেকে আনীত নমুনাসমূহ শীঘ্রই যুক্তরাষ্ট্র, পশ্চিম ইউরোপ এবং জাপানের ১৪০টি গবেষণা সংস্থাকে প্রদান করা হবে। সে সব দেশে নমুনাগুলি নিয়ে আরও গবেষণা চালানো হবে।

আর্মষ্ট্রং ও অলড্রিন চন্দ্রদেহে কম্পন লিপিবদ্ধ করবার জন্যে যে সিস্‌মোগ্রাফ চন্দ্রপৃষ্ঠে স্থাপন করে এসেছিলেন, তার প্রেরিত সঙ্কেত থেকে বিজ্ঞানীরা প্রথমে সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে, চন্দ্রের কম্পন পৃথিবীর কম্পনের অনুরূপ; অর্থাৎ চন্দ্রত্বকের বিন্যাস ভূত্বকের বিন্যাসেরই অনুরূপ।

কিন্তু পরে চন্দ্রপৃষ্ঠে স্থাপিত সিস্‌মোগ্রাফ থেকে যে সকল সঙ্কেত পাওয়া গেছে, তা থেকে বিজ্ঞানীরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, ভূকম্পনের সঙ্গে এর প্রচুর পার্থক্য রয়েছে। তাঁরা বলছেন ঐ যন্ত্রে ইলেকট্রনিক শব্দের ফলেই প্রথম সঙ্কেতগুলি ভূকম্পনের অনুরূপ মনে হয়েছিল।

নিউইয়র্ক সিটির নিকট কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের লামন্ট ভূবিদ্যা মানমন্দিরের ডক্টর গ্যারী লাথাম বলেন, পরবর্তী সঙ্কেতগুলি থেকে এই কথাই প্রমাণিত হয় যে, চাঁদের অভ্যন্তরভাগ পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগের মত নয়। ভূকম্পনের ক্ষেত্রে যে ধরণের সঙ্কেত পাওয়া যায়, চন্দ্রদেহ থেকে প্রেরিত সঙ্কেত আদৌ সে রকম নয়।

ডক্টর লাথাম বলেন, হয়তো চন্দ্রদেহে কম্পনের কোন বড় উৎস নেই, অথবা চন্দ্রদেহ বিভিন্ন-জাতীয় পদার্থে সৃষ্ট বস্তু, যা কম্পনের কিছুটা শোষণ করে নেয়।

ডক্টর লাথাম ও অন্যান্য চন্দ্র-বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, আদিম যুগে চন্দ্রদেহে উল্কার আঘাতের ফলেই গভীর ফাটলগুলির সৃষ্টি হয়েছে। বিভিন্ন জাতীয় পদার্থের অস্তিত্বের অর্থ, চাঁদের অভ্যন্তরভাগ কখনও সম্পূর্ণ গলিত ছিল না।

তিনি বলেন, 'স্তরবিহীন শীতল চাঁদের' তত্ত্বটি অনুমান মাত্র। আরও প্রমাণ ও পরীক্ষার দ্বারা যদি এই ধারণার সমর্থন পাওয়া যায় যে, চাঁদের দেহে প্রকৃত ফাটল রয়েছে, তাহলে গ্রহ-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এটি একটি চমকপ্রদ আবিষ্কার হবে।

মঙ্গলগ্রহে কোন প্রাণীর বেঁচে থাকা সম্ভব নয়

গত ৩১শে জুলাই ও ৫ই আগষ্ট ১৯৬৯ মার্কিন মহাকাশযান মেরিনার-৬ এবং মেরিনার-৭ মঙ্গল-গ্রহের পাশ কাটিয়ে চলে গেছে। তখন ঐ দুটি যান ও ঐ গ্রহের ব্যবধান ছিল ৩৪০০ কিলোমিটার। এই যাত্রীবিহীন, মহাকাশযান দুটি যাবার পথে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতির সাহায্যে ঐ গ্রহ সম্পর্কে বহু তথ্য সংগ্রহ করে এবং দু-শ'য়েরও বেশী আলোক-চিত্র গ্রহণ করে পৃথিবীতে পাঠিয়েছে।

আমেরিকার হিউষ্টনস্থিত জাতীয় বিমান বিজ্ঞান ও মহাকাশ সংস্থার সদর দপ্তরে বিশিষ্ট বিজ্ঞানীরা একত্রিত হয়ে এই সকল আলোকচিত্র ও অন্যান্য তথ্য পর্যালোচনা ও পরীক্ষা করে এ সকল তথ্যের উপর আলোকপাত করেছেন।

তাঁরা বলেছেন যে, এই গ্রহটিও গহ্বরময় রৌদ্রদগ্ধ উষর চাঁদের মত। তবে ঐ গ্রহের কিছুটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্যও আছে। যেমন সেখানে আছে সীমাহীন প্রান্তর। মাঝে মাঝে সেই অনন্ত প্রান্তরে রয়েছে ক্ষুদ্র শুষ্ক নদীর ধারার মত রেখা আর খাড়াই ঢালু জমি। পৃথিবীতে বিরাট ভূমিকম্পের ফলে জমিতে যে ফাটল দেখা যায়, গহ্বর সৃষ্টি হয়, ধ্বস নামে, এই জমি ঠিক তেমনি। ১৫০০০০ বর্গ কিলোমিটার জুড়ে রয়েছে এ রকম জমি।

ক্যালিফোর্ণিয়া ইনষ্টিটিউট অব টেক্‌নোলোজীর ডাঃ নরম্যান হোরোউইজ বলেছেন যে, যে সকল তথ্য ইতিমধ্যে সংগৃহীত হয়েছে তাতে এই কথাই প্রমাণিত হচ্ছে যে, সেখানে কোন প্রাণীর বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। মঙ্গলের আবহাওয়ায় বাষ্পাকারে সামান্য জল থাকতে পারে। তা থেকে তরলাকারে জল পাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু জীবনের জন্যে জলের একান্ত প্রয়োজন।

তবে এই কথাও তিনি এই প্রসঙ্গে বলেছেন যে, তাত্ত্বিক দিক থেকে জল না থাকলেও এক ধরণের প্রাণীর যে সেখানে উদ্ভব হতে পারে তা হয়তো প্রমাণ করা যেতে পারে।

কলোরাডো বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ চার্লস এ বার্থ এই প্রসঙ্গে বলেছেন যে, মঙ্গল গ্রহের উপরে সূর্যের অপরিশ্রুত অতি বেগুনী রশ্মি সর্বদাই আঘাত করছে। তারই জন্যে পৃথিবীর মত কোন প্রাণীর উদ্ভব সেখানে সম্ভব নয়। এই সৌরবর্ণ্মা বা সোলার উইণ্ডে আছে বিদ্যুতাবিষ্ট গ্যাস, তবে আত্মরক্ষামূলক অস্থি নিয়েই সেখানে প্রাণীর

আবির্ভাব ঘটতে পারে এই কথাও তাত্ত্বিক দিক থেকে বলা যেতে পারে। কিন্তু বিচারে তা টিকবে না, কারণ জীবনের বনিয়াদ যে সকল অণুর সমবায়ে গঠিত হয় সেই সকল অণু সূর্যের অতি বেগুনী রশ্মির আঘাতে ভেঙে পড়বেই। তাই প্রাণের আবির্ভাব সেখানে সম্ভব নয়।

ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ জর্জ পি মেন্টেল কিছুদিন আগে বলেছিলেন যে, মঙ্গল গ্রহের দক্ষিণ মেরু গ্যাসের ছত্রতলে অতি নিম্ন শ্রেণীর প্রাণীর আবির্ভাব সম্ভব হতেও পারে। বর্তমানে তিনি এই মত পরিবর্তন করেছেন; এবং বলছেন যে, ঐ গ্যাস মিথেন বা অ্যামোনিয়া নয়, এ হচ্ছে কার্বন ডায়োক্সাইড। পরীক্ষার ফলে যে অবলোহিত রশ্মির সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল, তাতেই ধরে নেওয়া হয়েছিল ঐ মেরুর অঞ্চলের আকাশের আচ্ছাদন মিথেন ও অ্যামোনিয়ায় ঢাকা—কার্বন ডায়োক্সাইডে নয়। পরবর্তী পরীক্ষায় ধরা পড়েছে এটি কার্বন ডায়োক্সাইডই।

টেলিভিশন বিষয়ে গবেষণার ব্যাপারে প্রধান বৈজ্ঞানিক ডাঃ রবার্ট লেইটন বলেছেন যে, মঙ্গল গ্রহের আবহমণ্ডল প্রকৃতপক্ষে অস্বচ্ছ নয়। ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর কনওয়ে লিয়োভী লেইটনের এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করে বলেছেন যে, মঙ্গলগ্রহের আবহমণ্ডলের পাঁচ থেকে দশ মাইল পর্যন্ত কুয়াশাচ্ছন্ন। এই কুয়াশা খুবই পাত্‌লা, ছায়া সৃষ্টি করে না। এই কুয়াশা কার্বন ডায়োক্সাইড গ্যাসের।

ডক্টর লেইটন বলেন, মঙ্গলগ্রহে প্রচুর খাল আছে বলে অনেকের ধারণা। প্রকৃতপক্ষে সেখানে কোন খালই নেই, তবে একই লাইনে বহু গুহা-গহ্বর আছে বলে ছবিতে এগুলি রেখার মত মনে হয়।

মঙ্গলের দক্ষিণ মেরু শৃঙ্গ কার্বন ডায়োক্সাইডের বরফে যে ঢাকা, সে বিষয়ে বিজ্ঞানীরা একমত হয়েছেন। তাঁরা বলছেন, তাতে কিছুটা জলের অস্তিত্ব থাকা অসম্ভব নয়।

ক্যালিফোর্ণিয়া ইনষ্টিটিউট অব টেক্‌নোলোজীর ডক্টর গিদো মাঞ্চ বলেছেন—ঐ গ্রহের দক্ষিণ মেরু অঞ্চলের তাপমাত্রা ১৫০ ডিগ্রী কেলভিন। কার্বন ডায়োক্সাইড বরফের তাপমাত্রা থেকে এটি চার অথবা পাঁচ ডিগ্রী বেশী। সুতরাং আমরা ধরে নিতে পারি, এর মধ্যে কিছুটা জলও বরফ আকারে থাকতে পারে। ডক্টর লেইটনও এই কথা সমর্থন করেছেন। মঙ্গলগ্রহের দক্ষিণ মেরু শৃঙ্গের ঐ বরফ বেশ কয়েক ইঞ্চি পুরু।

মঙ্গলগ্রহের আবহমণ্ডলের শতকরা ৯৮ ভাগই যে কার্বন ডায়োক্সাইডে অথবা পুরোপুরি ঐ গ্যাসে ভর্তি, সেখানে অক্সিজেন ও নাইট্রোজেনের মত প্রাণীর বেঁচে থাকার কোন উপাদান নেই সে বিষয়ে প্রায় সকল বিজ্ঞানীই একমত হয়েছেন। তবে মঙ্গল ভূমিতে আছে সিলিকা—ধূলির মূল উপাদান।

বিজ্ঞানীরা আরও বলেছেন যে, মঙ্গলে আছে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। দিনের তাপমাত্রা ২২০ থেকে ২৯০ ডিগ্রী কেলভিন পর্যন্ত আর রাত্রিতে ১৭০ থেকে ২২০ ডিগ্রী কেলভিন পর্যন্ত ওঠে।

এর আগে ১৯৬৫ সালে মেরিনার-৫-এর সাহায্যে জানা গেছে যে, পৃথিবীর মত মঙ্গলে কোন চৌম্বক ক্ষেত্র ও তেজস্ক্রিয় বলয় নেই এবং এর অভ্যন্তরও হয়তো ধাতব উপাদানে গঠিত নয়।

আমেরিকার জাতীয় বিমান বিজ্ঞান ও মহাকাশ সংস্থার পরিচালক ডক্টর টমাস পেন সম্প্রতি বলিয়াছেন যে, ১৯৮০ সালে যে দশক সুরু হবে, সেই দশকেই হয়তো মনুষ্যবাহী মহাকাশযান মঙ্গলগ্রহ অভিমুখে প্রেরণ করা যেতে পারে।

কয়লা

শ্রীশিবনাথ মিত্র

জ্বালানী হিসাবে যে বস্তু আমরা নিত্য ব্যবহার করি, তার নাম কয়লা। অবশ্য আজকাল সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন ইন্ধনের ব্যবহার সুরু হয়েছে, তবুও কয়লার প্রচলন হ্রাস পায় নি। শুধু যে রন্ধন কার্যে এর ব্যবহার হয় তা নয়, ইস্পাতশিল্পে গ্যাস প্রস্তুতকারকহিসাবে এবং অন্যান্য বহু প্রয়োজনীয় রাসায়নিক গবেষণাগারে এর ব্যবহার আছে। যে বস্তু আমাদের চিরপরিচিত, তার জন্ম কোথায় ও কি ভাবে হয়—তা হয়তো আমরা অনেকেই জানি না।

কয়লা একটি দাহ্য পাললিক শিলা এবং তার জনক মহীরুহ। কিন্তু মহীরুহ কি রূপে শিলায় পরিণত হয়? আর শিলায় পরিণত হলেও এত মহীরুহ (যা প্রচুর কয়লার উৎপত্তি করে) এলো কোথা থেকে? ভূ-বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন কারণ অনুসন্ধান করে বুঝতে পেরেছেন যে, এত উদ্ভিদের সমষ্টিগত অবস্থান দুটি কারণে হয়েছে।

(১) একই স্থানে উদ্ভিদের জন্ম ও মৃত্যু—যে গাছ যেখানে বৃদ্ধি পেয়েছিল, সেইখানেই তার মৃত্যু ঘটে এবং স্থান পরিবর্তনের কোন সুযোগ সে গাছ পায় না। এইসব ক্ষেত্রে কোন কোন জলাভূমিতে গভীর জঙ্গলের সৃষ্টি হয়। সেই সুগভীর দুর্ভেদ্য জঙ্গলের গাছ হঠাৎ জলস্ফীতি বা বন্যার ফলে স্ব স্ব স্থানে জলাভূমিতে ভূপতিত হয় এবং বন্যার জলরাশি আপন বেগে সেখানে প্রবহমান থাকে। ফলে আস্তে আস্তে ভূপতিত গাছগুলির উপর পলিমাটির প্রলেপ পড়ে। এই পলিমাটির আস্তরণ কয়েক বছর পরে বেশ মোটা হয়ে ওঠে, তখন তার উপর আবার উদ্যানের সৃষ্টি হয় এবং উপরে বর্ণিত ঘটনাগুলির প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠে। ফলে কয়লা ও পাললিক শিলার পর্যায়ক্রমিক অবস্থান দেখতে পাওয়া যায়।

(২) ভিন্ন স্থানে উদ্ভিদের জন্ম ও মৃত্যু—যদি কোন বন্যা বা জলরাশির গতিপথে, জঙ্গল বা মহীরুহের সমষ্টিগত অবস্থান থাকে, তখন সেই স্রোতে মহীরুহগুলি ভেসে যায় এবং বহুদেশ ও প্রান্তর পার হয়ে কোন এক বিরাট নিম্নভূমিতে এসে জমা হয়। সেই স্রোতে বৃক্ষগুলি ছাড়াও নানান ধরণের পাথর ও পদার্থ এসে পড়ে এবং ঐ মহীরুহগুলির সঙ্গে একই স্থানে জমা হয়। পরে কোন বৃহৎ কম্পন বা তাপের ফলে এই বৃক্ষগুলি কয়লায় পরিণত হয়। তাই এই কয়লা পূর্বপদ্ধতির দ্বারা প্রস্তুত কয়লার মতন পরিষ্কার ও উচ্চমানসম্পন্ন (High grade) নয় এবং চাপের ফলে মোটা কয়লার স্তরগুলি বিভাজিত হয়।

এই সব ঘটনা ঘটেছে লক্ষ লক্ষ বছর পূর্বে, তখন মানুষের আবির্ভাব ঘটে নি। পৃথিবীর রূপ তখন ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। জলাভূমি ও জঙ্গলে পরিপূর্ণ অতীতের পৃথিবীর ভৌগোলিক রূপও ছিল ভিন্ন। বর্তমানের সর্বোচ্চ হিমালয় পর্বতের ক্ষেত্রে বিরাজ করতো টেথিস নামক সমুদ্র। দক্ষিণ আফ্রিকা, দক্ষিণ ভারতবর্ষ, দক্ষিণ আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়া দেশগুলি একত্রিত ছিল এবং সেই বিরাট ভূখণ্ডের নাম ছিল গণ্ডোয়ানা ভূমি (Gondwana Land), যা বর্তমানে বিভক্ত। অতীতের পৃথিবীর রূপ মানুষের পক্ষে প্রত্যক্ষ দর্শন করা সম্ভব হয় নি। সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক যন্ত্র ও

পদ্ধতির উদ্ভাবন করে মানুষ পৃথিবীর অতীত চেহারার রূপ ও ইতিহাস জানতে পেরেছে। পৃথিবীর অতীত ইতিহাস জানবার জন্যে জীবাশ্মকেই প্রধান অবলম্বন বলে গণ্য করা হয়েছে।

তা হলে বোঝা গেল যে, কয়লার জন্ম উদ্ভিদ থেকেই হয়েছে এবং তার বর্তমানের স্থিতি, দুই পদ্ধতির মধ্যে যে কোন এক পদ্ধতিতে হয়েছে। কিন্তু ভারতবর্ষে আমরা যে কয়লা পাই, তার সমষ্টিগত অবস্থান কোন্ পদ্ধতির দ্বারা হয়েছে? এই প্রশ্নের জবাব অনুসন্ধান করে বিখ্যাত ভূ-বিজ্ঞানী ফক্স দেখেছেন যে, ভারতবর্ষের কয়লার সর্বোচ্চ স্তর ১৪০ ফুট চওড়া। পরীক্ষার সাহায্যে দেখা গেছে যে, ৩০০ ফুট সবুজবনের গাছ থেকে মাত্র ৫ ফুট চওড়া কয়লার স্তর সৃষ্টি হয়। তাই ১৪০ ফুট চওড়া কয়লা প্রস্তুত হতে যে পরিমাণ বৃক্ষরাজির প্রয়োজন, তা পাওয়া যায় একমাত্র পরিবাহিত বৃক্ষরাজির দ্বারা, অর্থাৎ পরিবাহিত বৃক্ষরাজির পক্ষেই বিপুল পরিমাণে সমষ্টিগতভাবে অবস্থান সম্ভব। তাছাড়া যদি ধরা যায় যে, ভারতবর্ষের কয়লার উদ্ভব প্রথম পদ্ধতির দ্বারা হয়েছে, তাহলে প্রত্যেক কয়লার স্তরের উপরে এমন একটি পাললিক শিলার স্তর দেখা যাবে, যার উপর মহীরুহের জন্ম সম্ভব। এই বিশেষ পাললিক শিলার স্তরকে সিট্ আর্থ (Seat earth) বা আসন বলে। ভারতবর্ষের কয়লার স্তরের উপরে এই আসন নেই। সুতরাং ভারতবর্ষে কয়লার উৎপত্তি দ্বিতীয় পদ্ধতির দ্বারাই হয়েছে।

গাছের কয়লায় রূপান্তরণের জন্যে তাকে দুটি অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়।

(ক) জৈব রাসায়নিক (Biochemical) পদ্ধতি

(খ) চাপ ও তাপ (Dynamochemical) পদ্ধতি।

যেসব উদ্ভিদ জলাভূমিতে জন্ম ও মৃত্যু লাভ করে, সেই সব উদ্ভিদ মৃত্যুর পর জলের সংস্পর্শে এসে রাসায়নিক ক্রিয়ায় গলিত হয়ে যায়। কতকগুলি ব্যাক্টিরিয়া (Bacteria) উদ্ভিদ্গুলির পচনের সহায়তা করে। পচনের পর এই পদার্থগুলি কোন আলোড়নের ফলে ভূগর্ভে স্থান পায় এবং সেখানকার চাপ ও তাপের ফলে আস্তে আস্তে কয়লায় রূপান্তরিত হয়। সুতরাং উপরিউক্ত দুটি পদ্ধতিই কয়লা সৃষ্টির জন্যে প্রয়োজন। কয়লার মুখ্যতঃ চারটি পর্যায় আছে। এই পর্যায় (Stage) তাদের মূল পদার্থের মিশ্রণের উপর নির্ভরশীল। সাধারণতঃ কয়লাগুলির ভিতরে কি পরিমাণ কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ইত্যাদি গ্যাস ও অন্যান্য উপাদান আছে, তার ভিত্তিতে কয়লার শ্রেণীবিভাগ বা পর্যায় ঠিক করা হয়েছে। এই শ্রেণীবিভাগের নাম, পিট (Peat), লিগ্নাইট (Lignite), বিটুমিনাস (Bituminus) অ্যান্থ্রাসাইট (Anthracite)। এদের ভিতরে পিট কয়লায় কার্বনের শতাংশ সবচেয়ে কম এবং অ্যান্থ্রাসাইট কয়লায় কার্বনের শতাংশ সবচেয়ে বেশী। যে কয়লায় কার্বনের শতাংশ যত বেশী থাকে, সেই কয়লা তত উচ্চমানের হয় এবং বাজারেও তার দাম ও চাহিদা বেশী হয়।

উদ্ভিদের মধ্যে যে পদার্থগুলি কয়লায় কার্বনের শতাংশ বৃদ্ধির সহায়তা করে—তার মধ্যে কার্বহাইড্রেট্সের (Carbohydrates) ভূমিকা সবচেয়ে বেশী। যে জলাভূমিতে উদ্ভিদগুলি পতিত হয়েছে, সেই জলাভূমির জল যদি কম বিষাক্ত (Toxic) হয়, তবে কার্বহাইড্রেট্স ভেঙে গিয়ে হেমিসেলুলোজ (Hemicellulose) ও লিগ্নাইট উৎপন্ন হয়। আবার জল যদি খুব কম বিষাক্ত হয়, কিন্তু জলের পরিমাণ বেশী থাকে, তখন হেমিসেলুলোজ ভেঙে নষ্ট হয়ে যায়। এতক্ষণ রাসায়নিক ক্রিয়ায়

উদ্ভিদ থেকে শুধু পিট, লিগ্‌নাইট ও সেলুলোজ সৃষ্টির কথা বলা হলো। কিন্তু কয়লার অন্যান্য শ্রেণীবিভাগ বা পর্যায়ের সৃষ্টি কিরূপে হয়? এই বিষয়ে মতভেদ আছে। একদল ভূ-বিজ্ঞানী মনে করেন লিগ্‌নাইট সহজে পচে না, ফলে ঐ জলের ভিতরে যে হিউমিক বা হিউমাস অ্যাসিড থাকে, তা ঐ উদ্ভিদকে উচ্চ-মানসম্পন্ন করতে সাহায্য করে। অপর দল মনে করেন যে, সেলুলোজ বা কার্বহাইড্রেট্‌স শ্রেণীভুক্ত, তা উদ্ভিদকে উচ্চমান-সম্পন্ন করতে সাহায্য করে।

রাসায়নিক ক্রিয়ার কাজকর্ম বন্ধ হলে এবং উদ্ভিদ মাটির তলায় চাপা পড়লে, চাপ ও তাপের কাজ সুরু হয়। তখন অক্সিজেনের অভাবে জীবাণুগুলি মারা যায়, ফলে রাসায়নিক ক্রিয়া বন্ধ হয় এবং ক্রমবর্ধমান চাপ ও তাপ উদ্ভিদকে তার রূপ পরিবর্তনে অর্থাৎ কয়লায় রূপান্তরণে সহায়তা করে। কিন্তু কয়লায় রূপান্তরিত হবার সময় উদ্ভিদ তার প্রথম পর্যায় থেকে চারটি পর্যায়ের মাধ্যমে শেষ পর্যায়ে যেতে পারে অথবা যে কোন এক পর্যায় বাদ দিয়ে পরবর্তী উচ্চকার্বন শতাংশবিশিষ্ট পর্যায়ে যেতে পারে। উদ্ভিদকে সর্বশেষ পর্যায়ে পৌঁছতে গেলে বা সর্বোচ্চ কার্বন শতাংশবিশিষ্ট কয়লায় পরিণত হতে গেলে যে পর্যায়গুলি পার হতে হয়, তার নাম ও কার্বন শতাংশের মোটামুটি পরিমাণ নিম্নে দেওয়া গেল।

পর্যায়	নাম	কার্বন শতাংশের সাধারণ পরিমাণ
প্রথম	পিট (Peat)	৫৭%
দ্বিতীয়	লিগ্‌নাইট (Lignite)	৬৭%
তৃতীয়	বিটুমিনাস (Bituminus)	৮৩%
চতুর্থ বা শেষ	অ্যান্থ্রাসাইট (Anthracite)	৯৩%

এই সব বিভিন্ন শ্রেণীর কয়লা ভারতবর্ষের কোথায় পাওয়া যায় তার একটু মোটামুটি আলোচনা এখানে করা হলো।

(ক) নিম্নশ্রেণীর অর্থাৎ কম কার্বনশতাংশ-বিশিষ্ট কয়লার নাম পিট। এই কয়লা প্রধানতঃ নীলগিরিতে পাওয়া যায়।

(খ) পিটের চেয়ে কিছু বেশী কার্বন শতাংশ-বিশিষ্ট কয়লার নাম লিগ্‌নাইট। এই কয়লা রাজস্থানের বিকানীর ও পালিনাতে এবং মাদ্রাজের নেভিলিতে পাওয়া যায়। তাছাড়া আসাম, পণ্ডিচেরি, কুডালোর, মালাবার কোষ্ট, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, হিমালয়ের পাদদেশ, দার্জিলিং, নেপাল, বার্মা ইত্যাদি স্থানে পাওয়া যায়।

(গ) লিগ্‌নাইটের চেয়ে কিছু বেশী কার্বন শতাংশবিশিষ্ট কয়লার নাম বিটুমিনাস, দক্ষিণ ভারতের প্রায় সর্বত্র, আসাম, দার্জিলিং, সিকিম ইত্যাদি স্থানে পাওয়া যায়।

(ঘ) সর্বোচ্চ কার্বন শতাংশবিশিষ্ট অ্যান্থ্রাসাইট কয়লা দার্জিলিং, কাশ্মীর, জলপাইগুড়ি ইত্যাদি স্থানে পাওয়া যায়।

কয়লায় রাসায়নিক পদার্থ ছাড়াও নানান ধরণের ক্ষুদ্র পদার্থ থাকে, সেই পদার্থের গুণাবলী মাইক্রোস্কোপে দেখে বিচার করা হয়। এই পদার্থগুলিকে ভূ-বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন নামে অভিহিত করেছেন। মাইক্রোস্কোপে দৃষ্ট এক একটি পদার্থের গুণাবলীর উপর ভিত্তি করে তাদের নামকরণ করা হয়েছে, যেমন—ভিট্রিনাইট (Vitrinite)। এটি খালি চোখে উজ্জ্বল দেখায়, কিন্তু ভালভাবে এই কয়লাকে এক বিশেষ ধরণের কাগজে ঘষে নিয়ে কয়লা দেখবার জন্যে প্রস্তুত মাইক্রোস্কোপে প্রতিফলিত আলোকে দেখলে ধূসর রঙের দেখায়। কোন কোন ভিট্রিনাইটের ভিতরে কয়লা উৎপাদক উদ্ভিদের সামান্য কিছু অবশিষ্ট দেখা যায়।

আর একটি ক্ষুদ্র পদার্থের নাম ফিউসিনাইট (Fusinite)। এটি মাইক্রোস্কোপে প্রতিফলিত

আলোকে দেখলে খুব উজ্জ্বল দেখায় এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে গাছের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষ-প্রাচীর (Cell wall) দেখতে পাওয়া যায়। অনুরূপভাবে কয়লার ভিতরে অবস্থিত ক্ষুদ্র পদার্থগুলি, যা উদ্ভিদেরই অংশ, তাদের ৯টি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। এই বিভক্তিকরণ মাইক্রোস্কোপে দেখা গুণাবলীর উপর নির্ভর করে করা হয়।

কয়লার ক্ষুদ্র পদার্থের এই গুণাবলী সম্পর্কে প্রথম কাজ আরম্ভ হয় বৃটেনে। বিখ্যাত ভূ-বিজ্ঞানী সাইলার (Seyler) ১৯৪৩ সালে বৃটেনে এই কাজ সুরু করেন। তিনি কয়লার ক্ষুদ্র পদার্থগুলির নামের বদলে অঙ্কের হিসাব ব্যবহার করেন এবং প্রতিটি অঙ্কের ক্ষুদ্র পদার্থের প্রতিফলিত সংখ্যার হিসাব লিখে রাখেন। ফলে ঐ প্রতিফলিত সংখ্যা পাঠ করেই অঙ্কের ক্রমিক সংখ্যা অনুসারে, ক্ষুদ্র পদার্থের নাম বলে দেওয়া যায়। যেমন—

পদার্থের অঙ্ক	প্রতিফলিত সংখ্যা
০	০'২৬
১	০'৩৪
২	০'৫১
ইত্যাদি	ইত্যাদি
৯	৪'৪১

এখানে ০ অঙ্ক সবচেয়ে কম প্রতিফলক ক্ষমতা-বিশিষ্ট ভিট্রিনাইটকে বুঝায় এবং ৯ অঙ্ক বোঝায় সবচেয়ে উচ্চ প্রতিফলক ক্ষমতাবিশিষ্ট পদার্থ বা ফিউসিনাইট। এদের মধ্যের সংখ্যাগুলির প্রতিফলক ক্ষমতা মাঝামাঝি। কয়লার ক্ষুদ্র পদার্থকে কোন কারণে চিনতে না পারলে এই পদ্ধতি অনুসারে সেই পদার্থের অঙ্ক লিখে রাখলে ক্ষুদ্র পদার্থটি সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা করা যায়। কারণ কয়লার ক্ষুদ্র পদার্থের প্রতিফলক ক্ষমতানুসারে অঙ্কের ক্রমিক সংখ্যা সাজানো হয়েছে। যে কয়লা, আগ্নেয়শিলার উত্তাপ সহ্য করেছে, সেই কয়লার ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি বিশেষ কার্যকরী। দেখা গেছে, কয়লা যতই আগ্নেয়শিলার নিকটবর্তী হয়, ততই তার প্রতিফলক ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। এই পদ্ধতি এত নির্ভুল যে, ১৯৬০ সালে আমেরিকা এই পদ্ধতির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে এবং স্প্যাক্‌ম্যান (Spackman) ও অন্যান্যরা এই বিষয়ে গবেষণা সুরু করেন। ভারতবর্ষও এই বিষয়ে পিছিয়ে নেই। ভারতের ভূ-বিজ্ঞানী ডক্টর বঙ্কিম মুখার্জী ও অন্যান্যরা এই প্রথায় কয়লার নামকরণ ও সনাক্তকরণ সম্বন্ধে গবেষণা করে মূল্যবান তথ্যাদি প্রকাশ করেছেন।

ভাইরাস

সমর চক্রবর্তী

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ, আব্রাহাম লিঙ্কন তখন মৃত। আলেকজেণ্ডার বেলের চেষ্টায় টেলিফোন তখন সদ্য আবিষ্কৃত হয়েছে। ঠিক এমনি এক সময়ে বিজ্ঞান-জগতে আলোড়ন আনলো ক্ষুদ্রতম প্রাণকণিকা, যার নাম দেওয়া হলো ভাইরাস (Virus)—জড় ও জীব সীমানার এক অপূর্ব নিশানা। প্রায় ২০০ বছরের উপর ক্ষুদ্রতম প্রাণকণিকা হিসাবে পরিচিত ব্যাক্টিরিয়ার একাধিপত্য হরণকারী ভাইরাস বলতে সাধারণভাবে পাস্তুর যা বুঝিয়েছিলেন, তা হলো প্রাণীদেহজাত এক ধরণের বিষাক্ত পদার্থ। পরবর্তীকালে পাস্তুরের দেওয়া এই বিশেষণে অনেক বিজ্ঞানীই হয়তো খুশী ছিলেন না; তাই বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে ভাইরাস বিভিন্ন নামে অভিহিত হয়েছে। সমসাময়িক কয়েকটি বিজ্ঞান বিষয়ক পত্র-পত্রিকায় ভাইরাসকে জীবাণু জগতের অদৃশ্য বামন (Midget of the microbial world) নামেও অভিহিত করতে দেখা গেছে।

বিচিত্র এই ভাইরাস, বিচিত্র তাদের দৈহিক গঠন ও আকৃতি। সাধারণ অণুবীক্ষণ যন্ত্রে অদৃশ্য, কেবলমাত্র ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপে দৃশ্য. বিভিন্ন ভাইরাসের আকৃতিও বিভিন্ন। কেউ কেউ গোলাকার, কেউ আবার লম্বা লাঠির মত, অনেকের দেহকে আবার পরিষ্কার লেজ, মাথা ও ধড়ে বিভক্ত করা যায় (চিত্র-১-ক), ব্যাক্টিরিয়াভোজী T_4 Virus)। আজ পর্যন্ত যে সব ভাইরাসের হদিস পাওয়া গেছে, আয়তনে তারা প্রত্যেকেই আঠারো থেকে তিন-শ' পঞ্চাশ মিলি মাইক্রনের মধ্যে (1 micron $= \frac{1}{1000}$ মিলিমিটার)। জৈব রাসায়নিক দিক থেকে দেখতে গেলে, এদের না আছে কোন নিউক্লিয়াস, না কোন আদর্শ সাইটোপ্লাজম। মাত্র কয়েক অণু নিউক্লিক অ্যাসিড (Nucleic acid) ও তাকে ঘিরে প্রোটিনের একটা

[ক] [খ]

১নং চিত্র

সাধারণ আস্তরণ। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার, ১৯৪৪ সাল থেকে আমরা শুনে আসছি জীবন তিনটি অক্ষরেরই অনুকরণ, যা হলো DNA বা ডি-অক্সিরাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড এবং কোষমধ্যস্থ এই DNA-র মধ্যেই আমাদের জীবনের সব গুণ নিহিত থাকে। প্রাণীদেহের সমস্ত সুক্ষাতিসুক্ষ্ম কার্য পরিচালনায় ডি এন এ একান্ত অপরিহার্য। কিন্তু এমন কিছু ভাইরাসের সন্ধান পাওয়া গেছে, যাদের মধ্যে ডি এন এ-র কোন অস্তিত্বই নেই, পরিবর্তে এদের প্রোটিন স্তরের অভ্যন্তরে রয়েছে মাত্র কয়েক অণু RNA বা রাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড।

সংগঠনের দিক থেকে যথেষ্ট সরল হলেও ব্যবহারের দিক থেকে ভাইরাস কিন্তু মোটেও সরল নয়। উদ্ভিদ, প্রাণী থেকে সুরু করে, মানুষের বিভিন্ন রোগের কারণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাক্টিরিয়াকে আক্রমণ করতেও এরা ছাড়ে না। ইনফ্লুয়েঞ্জা থেকে সুরু করে মাম্পস, বসন্ত—এমন কি, জলাতঙ্ক রোগের মূলেও এই ভাইরাস। লঙ্কাগাছের পাতা কুঁকড়ে যাওয়া অথবা ঢেঁড়স গাছের পাতায় হলদে ছোপ এই সবেরই উৎস এই ভাইরাস। বর্তমানে অনেক বিজ্ঞানীর মতে, প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ ভাবে ক্যান্সার রোগের জন্যেও ভাইরাসই দায়ী।

অন্যান্য ব্যাপারে যেমনই হোক না কেন, প্রজনন তথা বংশবিস্তারের ব্যাপারে ভাইরাস কিন্তু যথেষ্ট সচেতন। ব্যাক্টিরিয়া আক্রমণকারী ভাইরাসের কথাই ধরা যাক। বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় এদের বলা হয় ব্যাক্টিরিওফাজ (Bacteriophage)। এই সব ব্যাক্টিরিয়ার বংশবিস্তার কেবলমাত্র উপযুক্ত ভাইরাসের মধ্যেই সম্ভব হয়ে থাকে। আক্রমণকারী ভাইরাস প্রথমে লেজ ও তার উপাঙ্গের সহায়তায় ব্যাক্টিরিয়ার দেহপ্রাচীরের সঙ্গে নিজেকে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ করে। লেজের আবরণের আকস্মিক সঙ্কোচন ও প্রসারণের ফলে লেজের প্রান্তভাগ আক্রান্ত ব্যাক্টিরিয়ার দেহপ্রাচীর ভেদ করে এবং ভাইরাস ডি. এন. এ ব্যাক্টিরিয়ার দেহে প্রবেশ করে (চিত্র১-খ)। ব্যাক্টিরিয়ার দেহে প্রবেশের অব্যবহিত পরেই নবাগত ভাইরাস ডি. এন. এ কার্যরত ব্যাক্টিরিয়া-কোষের ডি. এন. এ-র কর্মক্ষমতা নষ্ট করে এবং কোষের সমস্ত কার্যকলাপ নিজের হাতে গ্রহণ করে। ব্যাক্টিরিয়ার নিজস্ব ডি. এন. এ তার স্বাভাবিক কর্মক্ষমতা হারাবার ফলে ব্যাক্টিরিয়ার প্রয়োজনীয় প্রোটিন উৎপাদন ব্যাহত হয়; পরিবর্তে ভাইরাস ডি. এন. এ-র নির্দেশে বার্তাবহ আর. এন. এ পরিবাহক আর. এন. এ-র সহায়তায় ভাইরাসের প্রয়োজনীয় প্রোটিন উৎপাদন সুরু করে। সাধারণ কোষে কিভাবে এই প্রোটিন সংশ্লেষণ সম্ভব হয় সংক্ষেপে তা আলোচনা করা প্রয়োজন। সহজভাবে বলা যায় যে, কোষের মধ্যে মোট তিন স্তরে এই প্রোটিন সংশ্লেষণ সম্ভব। আজ পর্যন্ত যতদূর জানা গেছে, তাতে দেখা যায় প্রথমে কোষ-কেন্দ্রস্থ ডি. এন. এ, অণুসমূহ লম্বালম্বিভাবে বিভক্ত হয়ে নিজেদের প্রতিলিপি তৈরি করে (Replicaltion of the DNA) সদ্যোৎপন্ন ডি. এন. এ-র ছাঁচের উপর তৈরি হয় ডি. এন. এ সদৃশ আর. এন. এ যাকে বলা হয় বার্তাবহ আর এন. এ। সদ্যোজাত বার্তাবাহ আর. এন. এ-র সহায়তায় ডি. এন. এ তার প্রয়োজনীয় বার্তা অর্থাৎ সঙ্কেত (কি ধরণের প্রোটিন তৈরি হবে) প্রেরণ করে কোষে অবস্থিত সাইটোপ্লাজমে। কোষমধ্যস্থ এই সাইটোপ্লাজমে ছড়িয়ে রয়েছে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণিকা, যাদের বলা হয় রাইবোসোম (Ribosome)। সাইটোপ্লাজমে উপস্থিত বার্তাবহ আর. এন. এ নিজেকে আবদ্ধ করে রাইবোসোমের সঙ্গে। অনেকের মতে বার্তাবহ আর. এন. এ এবার নিজেই কোষের প্রয়োজনীয় প্রোটিন সংশ্লেষণের নির্দেশনা দেয়।

এই অবস্থায় বার্তাবহ আর. এন. এ-র নির্দেশে সাইটোপ্লাজমে অবস্থিত আর এক বিশেষ ধরণের আর. এন. এ, যার নাম দেওয়া হয়েছে পরিবাহক আর. এন. এ. সাইটোপ্লাজম থেকে প্রয়োজনীয় অ্যামিনো অ্যাসিডসমূহ (একাধিক অ্যামিনো অ্যাসিড পরস্পর যুক্ত হয়ে একটি প্রোটিন অণু তৈরি করে) পর পর সঠিকভাবে রাইবোসোমের উপর সাজিয়ে দেয়। এইভাবে বিভিন্ন অ্যামিনো অ্যাসিড বিভিন্ন পর্যায়ক্রমে সজ্জিত হয়ে কোষের প্রয়োজনীয় প্রোটিন উৎপন্ন করে।

১৯৬৬ সালের শেষের দিকে দু-জন মার্কিন বিজ্ঞানী উইলিয়ম উড এবং আর. এড্গার প্রথম দেখালেন যে, আক্রান্ত হওয়ার পাঁচ মিনিটের মধ্যে ব্যাক্টিরিয়ার দেহে ভাইরাল ডি. এন. এ-র তত্ত্বাবধানে যে প্রথম প্রস্থ প্রোটিন উৎপন্ন হয়, তা কার্যরত ডি. এন. এ-র একাধিক প্রতিরূপ গঠনে সহায়ক এন্জাইম বা জারকরস হিসাবে কাজ করে। এর প্রায় চার মিনিট পরে ভাইরাল ডি এন এ-র তত্ত্বাবধানে যে দ্বিতীয় প্রস্থ প্রোটিন উৎপন্ন হয়, তা ভাইরাস বংশধরদের দেহাবরণীর সৃষ্টিতে সহায়তা করে। এই সত্তোজাত ডি এন এ এবং কাঠামো সৃষ্টিকারী প্রোটিন পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়ে অল্প কয়েক মিনিটের মধ্যেই জন্ম দেয় শত শত নতুন ভাইরাসের। সৃষ্টির অব্যবহিত পরেই সত্তোজাত ভাইরাস নিজের দেহ থেকে লাইসোজাইম (Lysozyme) নামে কোষ-প্রাচীর বিচ্ছিন্নকারী এক ধরণের জারকরস ক্ষরণ করতে সুরু করে। লাইসোজাইমের প্রভাবে কিছুক্ষণের মধ্যেই ব্যাক্টিরিয়ার কোষ-প্রাচীর বিচ্ছিন্ন করে বেরিয়ে আসে শত শত নতুন সক্ষম ভাইরাস, ফেলে আসে ব্যাক্টিরিয়ার প্রাণহীন কায়া। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার, আমরা জানি, কোন বস্তু অথবা প্রাণীর বিভাজনে অথবা প্রজননে প্রয়োজন অতিরিক্ত শক্তির এবং এই বাড়তি শক্তি প্রাণী অথবা কোষ তার প্রাপ্য খাদ্যের কোটা থেকে সঞ্চয় করে রাখে ভবিষ্যতের জন্যে। ভাইরাস কিন্তু এই ব্যাপারেও সম্পূর্ণ পরাশ্রয়ী। বিভাজনজনিত এই অতিরিক্ত শক্তির প্রয়োজনও সে মিটিয়ে থাকে আশ্রয়দাতা ব্যাক্টিরিয়ার দেহ থেকেই। এইভাবে মাত্র কিছুক্ষণ আগে যেখানে একটি মাত্র ভাইরাসের অস্তিত্বই ছিল প্রকট, কিছু-ক্ষণ পরে তার বাস্তব অস্তিত্বের আর কোন হদিসই পাওয়া যায় না; পরিবর্তে সেখানে জন্ম নেয় শত শত নতুন ভাইরাস। এইভাবে ভাইরাস সাম্রাজ্যে সবাই ভাই ভাই; নতুন সৃষ্টির জন্যে বিশেষ কারো প্রয়োজন সেখানে নেই।

এ কথা আমরা জানি যে, ডি এন এ কেবলমাত্র ভাইরাসের সমস্ত কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে এবং এই ডি. এন. এ-র আভ্যন্তরীণ গঠনের উপর নির্ভর করে ভাইরাসের জাতি ও প্রকৃতি। ওয়াটসন ও ক্রীকের মত অনুযায়ী ডি. এন. এ হলো পরস্পর পাকবদ্ধ একাধিক অণুর শৃঙ্খলিত অবস্থা মাত্র। এর প্রতিটি এককে রয়েছে ফস্ফরিক অ্যাসিড। ডিঅক্সিরাইবোজ জাতীয় শর্করা এবং চারটি বেস (Base) অথবা ভিত্তি, যা হলো অ্যাডে-নিন, সাইটোসিন, গুয়ানিন ও থাইমিন। এই একক বহনকারী শৃঙ্খল দুটি আবার পরস্পরের সঙ্গে হাই-ড্রোজেন বণ্ড অথবা হাইড্রোজেন যোগসূত্রের দ্বারা সংযুক্ত। এই চারটি বেস বা ভিত্তিকে আবার খুশীমত জোড়া লাগানো সম্ভব নয়। একটি নির্দিষ্ট বস্তুর জন্যে যেমন একটি নির্দিষ্ট এন্জাইম; একটি নির্দিষ্ট তালার জন্যে যেমন একটি নির্দিষ্ট চাবি, ঠিক তেমনিই একটি শৃঙ্খলের অ্যাডেনিন যুক্ত হয় কেবলমাত্র অপর শৃঙ্খলের থাইমিনের সঙ্গে এবং একটি শৃঙ্খলের সাইটোসিন যুক্ত হয় অপর শৃঙ্খলের গুয়ানিনের সঙ্গে। ইংরেজী চারটি অক্ষর L I F E যখন পাশপাশি সাজানো থাকে, তখন এর অর্থ হয় প্রাণ। কিন্তু এই পারস্পারিক অবস্থানের একটু পরিবর্তন

যেমন, F I L E অথবা I F E L হলেই তার অর্থও হয় যেমন ভিন্ন, ঠিক তেমনই ডি. এন. এ-র এই চারটি বেস বা ভিত্তির পারস্পরিক অবস্থানের উপরই নির্ভর করে কোন্ ভাই-রাস কি ধরণের হবে। ভাইরাস বিভাজনের সময় আমরা দেখেছি, আভ্যন্তরীণ ডি. এন. এ অণুসমূহ এক অদ্ভুত প্রক্রিয়ায় অবিকল দুটিতে বিভক্ত হয়। এই বিভাজনের সময় যে কোন একটি অণু যদি একটু ভুল করে বসে, কোন ভিত্তি অথবা বেসের অবস্থানে যদি বিন্দুমাত্র অঘটন ঘটে, তাহলে এই সামান্য অঘটন ভবিষ্যত ভাইরাস বংশধরদের মধ্যে আনবে বিরাট পরিবর্তন। এই পরিবর্তন যেমনই হোক না কেন, পরিবর্তিত ভাইরাসের বংশধরেরাও এই নতুন রূপেই জন্ম নেবে। অবশ্য এই ধরণের ভুলেরও যথেষ্ট মূল্য আছে। প্রয়োজন আছে এই ধরণের পরিবর্তনের, কারণ কোন একটি ক্ষতি-কর ভাইরাস বিভাজনের সময়ের সূক্ষ্ম ভুলের ফলে পরিবর্তিত হতে পারে একটি উপকারী ভাইরাসে।

এই ধরণের একটা আশা নিয়ে দিনের পর দিন, বছরের পর বছর পৃথিবীর বিভিন্ন গবেষণাগারে বিভিন্ন বিজ্ঞানী ভাইরাস ডি. এন. এ-র প্রতিলিপিকরণে একটা অঘটন ঘটাবার চেষ্টা করে চলেছেন। তাঁদের আশা অদূর-ভবিষ্যতে এমন মুহূর্ত নিশ্চয়ই আসবে, যখন ভাইরাসের বিভাজনে সামান্যতম ভুল মানব-সভ্যতায় আনবে বিপুল আলোড়ন। ভাই-রাসের রাসায়নিক গঠন যথেষ্ট সরল হওয়ায় বিভিন্ন গবেষণাগারে আজকাল অনেকেই প্রয়োজনীয় উপাদান পরিমাণমত মিশিয়ে টেষ্ট টিউবে ভাইরাস উৎপাদনে অনেকাংশে সক্ষম হয়েছেন। তাঁদের এই সাফল্য এবং নিষ্ঠা অদূরভবিষ্যতে আরও জটিল কৃত্রিম প্রাণ তৈরির সূচনা মাত্র। মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই হয়তো কৃত্রিম প্রাণ আমাদের হাতের মুঠোয় চলে আসবে। তবুও মনে সংশয় থাকে, হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবী কৃত্রিম প্রাণকে কি ভাবে স্বাগত জানাবে।

ধস্ নামার কারণ ও তার প্রতিকারের উপায়

সৌম্যানন্দ চট্টোপাধ্যায়

প্রকৃতির রুদ্ররূপের কাছে মানুষ এই বিংশ শতাব্দীতেও যে কত অসহায়, তা আমরা সম্প্রতি কয়নায় ভূমিকম্প এবং উত্তর বঙ্গের বন্যাতে প্রত্যক্ষ করেছি। এই প্রবন্ধে এইরূপ একটি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের গুরুত্ব, কারণ ও তার প্রতিকারের সম্ভাব্য উপায় নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে। অনেক সময়ে দেখা যায় পাহাড়ের ঢালু অংশে মাটি ও পাথর আল্গা হয়ে নীচে গড়িয়ে আসে ও সময়ে সময়ে রাস্তা-ঘাট ইত্যাদির ক্ষতিসাধন করে। এই প্রাকৃতিক বিপর্যয় বা মাটি, পাথরের স্থান-চ্যুতির নাম ধস (Landslide)। দার্জিলিং অঞ্চলে পূর্বে ১৯০৩, ১৯৩৪, ১৯৫০, ১৯৫৪ ও ১৯৬৮ খৃষ্টাব্দে এইরূপ ধস্ নেমেছিল। পার্বত্য অঞ্চলে, যেখানে লোকবসতি আছে, সেখানে ধস্ যাতায়াত ব্যবস্থার পক্ষে অত্যন্ত গুরুতর সমস্যা। বর্তমানের ধ্বংসলীলার পরি-প্রেক্ষিতে আমাদের মনে প্রশ্ন উঠতে পারে যে,

বর্তমানের এই ধস্ নামার কারণগুলি কি এবং তাতে সাবধান হবার কোনও উপায় আছে কিনা ?

পাহাড়ের গা থেকে মাটি, পাথর আল্‌গা হয়ে নীচের দিকে পড়াকেই আমরা ধস্ বলে থাকি। ধস্ নামা নির্ভর করে শিলার প্রকৃতি, তার অবস্থান, পর্বতের ঢাল, বৃষ্টি বা তুষারপাত প্রভৃতির দ্বারা পাহাড়ের গা পিছল হওয়া, ভূমিকম্প প্রভৃতির উপর। মানুষও তার প্রয়োজনে রাস্তাঘাট নির্মাণ করে পাহাড়ের ঢালে ধস্ নামার সাহায্য করে থাকে।

শিলা যদি অপেক্ষাকৃত ভঙ্গুর হয়, যেমন পাললিক রূপান্তরিত শিলাসমূহ, তাহলে এ সব শিলা পরস্পর দৃঢ়বদ্ধভাবে সংলগ্ন থাকে না এবং এই জন্যেই বৃষ্টি, ভূমিকম্প বা অন্য কোনও ভাবে ধাক্কা এলেই তা পাহাড়ের গা বেয়ে গড়িয়ে পড়ে। শিলার অবস্থান যদি পাহাড়ের ঢালের সমান্তরাল হয়, তবে তা সহজেই চূর্ণীভবনের (Weathering) প্রভাবে পড়ে ও কিছু হলেই ধসের আকারে গড়িয়ে যেতে পারে। ভূমিকম্প, আগ্নেয় উৎপাত প্রভৃতিও ধসের সাহায্যকারী হিসাবে কাজ করে। অনেক সময়ে রাস্তা তৈরি করতে গিয়ে পাথর, মাটি ইত্যাদি সরাবার ফলে উপরের পাথরগুলির স্থিতিস্থাপকতা নষ্ট হয় ও নিরালম্ব হয়ে ধ্বস নামার সাহায্য করে। খনি অঞ্চলে খনিজ দ্রব্যাদি আহরণের পর সেই শূন্য স্থানে ছাদ ঠিক রাখবার জন্যে যদি থামের ব্যবস্থা ঠিক মত না থাকে, তবে ছাদ ধসে গিয়ে ধ্বস নামে।

এখন দেখা যাক, আমাদের দেশে এই ধস্ নামার সাধারণ নিয়মাবলী কতদূর কার্যকরী। হিমালয় পর্বত অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগের ভঙ্গিল পর্বত (Fold mountain) এবং ভাঙ্গা পড়া পাললিক ও রূপান্তরিত শিলায় গঠিত বলে আভ্যন্তরীণ বা বহিঃস্থ কোনও পরিবর্তন যদি এর স্থিতিস্থাপকতা নষ্ট করে, তবে বড় রকমের ধস্ নামবে।

এ ছাড়া দার্জিলিং অঞ্চলের পর্বতগাত্রে অসংখ্য খরস্রোতা নদী অবিশ্রান্ত ধারায় নেমে আসে ও পাহাড়ের গায়ের মাটি আল্‌গা করে শিলাগুলির পারস্পরিক দৃঢ়বদ্ধতা নষ্ট করে এবং ধস্ নামায় সাহায্য করে। হিমালয় পর্বতের পূর্বাংশেই বৃষ্টিপাত বেশী বলে আমরা পশ্চিমাংশের চেয়ে পূর্বাংশেই বেশী ধস্ নামতে দেখি।

পাহাড়ের শৃঙ্গগুলি সবচেয়ে দুর্বল অংশ এবং পাহাড়ের ঢালু অংশ ধস্ নামার একটি উপযুক্ত স্থান। এই উপযোগিতা নির্ভর করে পর্বত ঢালের সঙ্গে সমতলের কৌণিক দূরত্বের (Slope angle) উপর। যে কোনও ঢালই যদি ৪০° বেশী কৌণিক দূরত্বসম্পন্ন হয়, তবে তা ধস্ নামার সহায়ক হবে। এই কৌণিক দূরত্ব ছাড়াও পর্বতগাত্রের জল নির্গমন ব্যবস্থা, শিলার প্রকৃতি ও বিন্যাস প্রভৃতির উপর ধস্ নামা নির্ভর করে।

যেখানে শিলাস্তরের বিন্যাস পর্বত-ঢালের সঙ্গে সমান্তরাল, সেখানে ধস্ নামার সম্ভাবনা বেশী থাকে, কারণ এক্ষেত্রে মাধ্যাকর্ষণ সহজেই শিলাগুলিকে আকর্ষণ করে, কিন্তু বিপরীত ঢালে ধস্ নামার সম্ভাবনা কম থাকে, কারণ এখানে শিলাস্তরের বিন্যাস সমান্তরাল নয়।

বৃষ্টিপাত পর্বতগাত্রে ধস্ নামাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। যদিও বৃষ্টির জলে বেশীর ভাগ অংশই (Suface water) প্রবাহিত হয়ে যায়, তবুও অল্প কিছু পরিমাণ বৃষ্টির জল শিলার ফাটল ও দুর্বল তলের মধ্য দিয়ে প্রবেশ করে। এর পরিমাণ যদি নির্দিষ্ট মাত্রা অতিক্রম করে, তখন তা বিরাট বিরাট শিলার স্তূপকে স্থানচ্যুত করে ধস্ নামাতে পারে। এছাড়া, শেল (Shale) জাতীয় কোমল শিলা যদি ছুটি

কঠিন শিলাস্তরের মধ্যে থাকে, তবে জল অভ্যন্তরে প্রবেশ করে শেলজাতীয় শিলাকে আর্দ্র করে ফেলে এবং শেল তখন পিচ্ছিলকারী দ্রব্যের মত উপরের শিলাস্তরকে নীচের দিকে নামতে বাধ্য করে। বৃষ্টির জল, যা পর্বতের উপর পড়ে গড়িয়ে যায়, তাও পাহাড়ের মাটি ধুয়ে নিয়ে গিয়ে ঢালের মাত্রা বাড়িয়ে দিয়ে ধস্ নামার সম্ভাবনা বৃদ্ধি করে।

পর্বতগাত্র যে সকল শিলার দ্বারা গঠিত হয়, তার প্রকৃতিও (Lithology) ধস্ নামার সহায়ক হয়। উদাহরণ স্বরূপ শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিঙ পর্যন্ত হিলকার্ট রোডের কথা ধরা যাক। শুক্না থেকে চুনাবাটি পর্যন্ত কোমল বেলেপাথর দেখা যায়। এর জলসংরক্ষণ ক্ষমতা বেশী। চুনাবাটি থেকে তিনধরিয়া পর্যন্ত বেলে-পাথর এবং মধ্যে মধ্যে নরম শেলজাতীয় পাথর এবং কয়লা দেখা যায়। তিনধরিয়ার পর গড়াবাড়ী পর্যন্ত দেখা যায় নরম ফিলাইট (Phyllite)। এই সকল কোমল শিলা ধ্বস নামার পক্ষে খুবই উপযোগী, বিশেষত দার্জিলিং অঞ্চলের ৮০ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত নরম শিলাকে সহজেই আল্‌গা করে দেয়। এই জন্যেই প্রবল বর্ষণের ঠিক অব্যবহিত পরেই সম্প্রতি দার্জিলিঙের ধস্ নামার কারণ সহজেই অনুমান করা যায়।

অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, পাহাড়ের গায়ে টেলিগ্রাফ ও বৈদ্যুতিক খুঁটিগুলি একদিকে হেলে পড়ছে, যদিও ভূসম্পাত বা ঐ জাতীয় ধ্বসের কোন চিহ্ন চোখে পড়ে না। এর কারণ পাহাড়ের গায়ের মাটির অতি ধীর অপসরণ, যা বৈজ্ঞানিক ভাষায় সয়েল ক্রীপ নামে পরিচিত। এই ধীর অপসরণ শিলাস্তরে সংঘটিত হতে পারে এবং সেই সঙ্গে যদি প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়, তবে সেটা খুব বিপজ্জনক হয়। ১৯৬৮ সালের অক্টোবর মাসে দার্জিলিং অঞ্চলে শিলার ধীর অপসরণের আগে এই রকম প্রবল বৃষ্টি হয়েছিল। এক্ষেত্রে পাহাড়ের গায়ের মাটি বেশী পরিমাণ সম্পৃক্ত হয়ে তার সংবদ্ধতা হারায় এবং পাহাড়ের ঢাল বেশী হলে গড়িয়ে নীচে নেমে আসে। সবচেয়ে ক্ষতি-কারক ধস্ বা ভূসম্পাৎ সংঘটিত হয়—যখন পাহাড়ের শিলা ও মাটির এক বিরাট অংশ নেমে আসে ও পাহাড়ী নদীর মধ্যে পড়ে তার গতিপথকে রুদ্ধ করে দেয়। জলস্ফীতি হয় প্রচণ্ড শক্তিতে এবং এই সাময়িক বাধা অপসারিত হয় ও বর্ধিত জল-ধারা তখন আশেপাশের সব কিছু ভাসিয়ে নিয়ে যায়। এই ভাবেই তিস্তার উপরের অ্যাণ্ডারসন সেতু ধ্বংস হয়েছিল এবং তিস্তার ধ্বংসলীলার প্রচণ্ডতা বৃদ্ধি পেয়েছিল।

ধসের এই ভয়াবহ ক্ষমতার কথা চিন্তা করলেই এর সঙ্গে মনে আসে এর প্রতিরোধের উপায়ের কথা?

জলধারাই ধ্বস নামার প্রধান সহায়ক। জলধারাই শিলাস্তরের দুর্বলতম অংশের মধ্যে প্রবেশ করে ও মাটি ধুয়ে বের করে দিয়ে ধ্বস নামায় বলে ধস্ প্রতিরোধের জন্যে প্রথমেই উত্তম জল নির্গমনের ব্যবস্থার প্রয়োজন। যার ফলে পাহাড়ের ঢাল যেখানে বেশী, সেখানে জল অল্প পরিমাণেই প্রবেশ করতে পারে। বৃষ্টিপাত অসম্ভব রকমের বেশী হলে, সঞ্চিত জলরাশি বের করে দিতে হবে।

পাহাড়ের গায়ে মাটির ধীর অপসরণ নিরোধ করা প্রয়োজন। ভূমিক্ষয় (Soil erosion) রোধ করা আশু প্রয়োজন। তার জন্যে বন-সংযোজন (Afforestation) সমন্নোতি রেখা বরাবর, পরিমিত ভাবে পশুচারণ ও চাষ ইত্যাদি করা প্রয়োজন।

এছাড়া সময়মত সংকেত পাঠাবার ব্যবস্থা করে মৃত্যুর সংখ্যা কমানো যায়। এজন্যে প্রয়োজন হলে প্রতিটি দুর্বল স্থানে পাহাড়ের ঢালে থাম বসিয়ে বর্ষাকালে তাদের অবস্থান সম্বন্ধে লক্ষ্য রাখা যেতে পারে। এই সমস্ত থামগুলির কোন রকম স্থান পরিবর্তনই ভূসম্পাত সম্বন্ধে সাবধানতা অবলম্বনের পক্ষে সহায়ক হবে।

বিজ্ঞান-সংবাদ

তারাপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের কারখানা

বোম্বাই সহরের ৬৫ মাইল উত্তরে তারাপুরে ভারতের পারমাণবিক বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের প্রথম কারখানাটি স্থাপিত হয়েছে। এর উৎপাদন-ক্ষমতা চারলক্ষ কিলোওয়াট। এটি এশিয়ার পারমাণবিক বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের বৃহত্তম কারখানা।

১৯শে জানুয়ারী প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী এই কেন্দ্রটিকে জাতির সেবায় উৎসর্গ করেন। সাত বছরের অক্লান্ত পরিশ্রম ও পারমাণবিক শক্তিকে ভারতের কোটি কোটি জনগণের কল্যাণ সাধনে নিয়োগের ফলস্বরূপ যে এই কারখানাটি, তারই স্বাক্ষর বহন করছে ১৯শে জানুয়ারীর অনুষ্ঠান। পরমাণু থেকে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের অধিকার পৃথিবীর যে কয়টি মুষ্টিমেয় রাষ্ট্র অর্জন করেছে, ভারতও যে তাদের অন্যতম এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তা ঘোষিত হয়েছে। এই অনুষ্ঠানে দেশ বিদেশের বহু বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও গণ্যমান্য ব্যক্তিই উপস্থিত ছিলেন।

পরমাণু-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ভারতকে এগিয়ে নিয়ে যাবার ব্যাপারে পরলোকগত ডক্টর হোমি জে. ভাবা ছিলেন বিশেষ অগ্রণী। ঐ চুক্তিতে যাঁরা স্বাক্ষর করেছিলেন, তিনি ছিলেন তাঁদের অন্যতম।

১৯৬৩ সালের ৭ই ডিসেম্বর ভারতের প্রধানমন্ত্রী ভারত ও আমেরিকার মধ্যে তারাপুরের এই কারখানা নির্মাণ সম্পর্কে যখন অর্থনৈতিক সহযোগিতামূলক এক চুক্তি সম্পাদিত হয়, তখন উপস্থিত ছিলেন। এই চুক্তি অনুসারে এই কারখানা নির্মাণের বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজনীয়তা মেটাবার জন্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ৭ কোটি ৫০ লক্ষ ডলার বা ৫৬ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা ঋণ হিসাবে দেয়।

আরব সাগরের তীরবর্তী এই কারখানাটি যে পৃথিবীর বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের অন্যতম বৃহত্তম কারখানা তা বাইরে থেকে দেখে বিশ্বাস করাই কঠিন। এর পরিবেশ শান্ত, নির্জন, তাপ-বিদ্যুৎকেন্দ্রের মত এর আকাশ ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন নয়। কারখানা ঘরে ১০০ ফুট উঁচু আধারে রয়েছে দুটি রিয়্যাক্টর বা পারমাণবিক চুল্লী। পাঁচ ইঞ্চি পুরু স্টেনলেস স্টিলে এটি মোড়া। এই চুল্লীতে ইউরেনিয়াম পরমাণু ভাঙবার ফলে যে প্রচণ্ড তাপ উৎপন্ন হয়, তারই সাহায্যে জলকে বাষ্পে পরিণত করে সেই বাষ্পের সাহায্যে ২ লক্ষ কিলোওয়াট বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনক্ষম দুটি টার্বো-জেনারেটর চালানো হয়। তিনতলা বাড়ীর সমান উঁচু বাড়ীতে জেনারেটর দুটি রয়েছে।

প্রায় সাড়ে ছয় হাজারেরও বেশী পুরুষ ও নারী দিন-রাত্রি খেটে এই কারখানাটি গড়ে তুলেছে। কিন্তু এটি চালায় ও রক্ষণাবেক্ষণ করে মাত্র কয়েক শ' লোক। এই কেন্দ্রটির পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের ভার ভারতীয় বিজ্ঞানী ও যন্ত্রকুশলীদের উপরই ন্যস্ত। এঁদের ৩০ জনেরও বেশী ক্যালিফোর্নিয়ার সান জোসের আই. জি আই. এ-র কারখানায় এবং ইটালীর সেজ-এর রিয়্যাক্টরে শিক্ষালাভ করেছেন। তারাপুরে ৬৫ জন ইঞ্জিনিয়ার ও বিজ্ঞানীসহ ২৫০ জন যন্ত্রকুশলী রয়েছেন।

তারাপুরের আই. জি. আই এ-র পক্ষে পরিচালক ম্যানেজার মিঃ জন মিলার বলেন যে, তারাপুরে ভারতীয় যন্ত্রকুশলীরা এই কেন্দ্রটি নির্বিঘ্নে চালাবার মত যথেষ্ট যোগ্যতা অর্জন করেছেন।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে আদি মানবসন্তান শক্তির উৎসের সন্ধান পেয়েছিল আগুনের মধ্যে। রান্নাবান্না ও তাপ উৎপাদন আগুনের সাহায্যেই হতো। ১৮৩১ সালে এ ক্ষেত্রে আসে যুগান্তর। মাইকেল ফ্যারাডে আবিষ্কার করেন ডায়নামো। বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদন সম্ভব হয় এবং এক স্থান থেকে শত শত মাইল দূরবর্তী স্থানে তা সরবরাহ করাও সম্ভব হয়ে ওঠে। তার পরের শতাব্দীতে জল, কয়লা ও তেল থেকে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের পন্থা উদ্ভাবিত হয়।

তারপর ১৯৪২ সালে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞানী ডক্টর এনরিকো ফের্মির নেতৃত্বাধীনে পরমাণু-শক্তির পৌনঃপুনিক পারমাণবিক প্রতি-ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণের পন্থা উদ্ভাবন করেন—অসীম শক্তির উৎস পরমাণু থেকে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের সন্ধান তাঁরা দেন।

পরমাণু যে কি পরিমাণ শক্তিশালী তারা-পুরের এই কারখানার কাজকর্ম থেকেই উপলব্ধি করা যায়। এই কারখানায় প্রতিদিন ১১০ পাউণ্ড ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধ পারমাণবিক ইন্ধন ব্যবহৃত হয়। ভারত সরকারের সঙ্গে সম্পাদিত একটি দীর্ঘমেয়াদী চুক্তি অনুসারে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এই ইন্ধন সরবরাহ করে আসছে। পরমাণুর বদলে কয়লার সাহায্যে বাষ্প উৎপাদন করে ঐ কারখানার দুটি জেনারেটর চালু করে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন করতে হলে প্রতিদিন তিনটি ট্রেনভর্তি বা ১ কোটি ২০ লক্ষ টন কয়লার যোগান দিতে হতো।

চাঁদের বয়স

চাঁদের বয়স কত? সৌরমণ্ডলের সৃষ্টি হয়ে-ছিল যতদিন আগে চাঁদের বয়সও ততদিন। অনুমান করা হচ্ছে চাঁদ সৃষ্টি হয়েছিল ৪৫০ কোটি বছর আগে। সৌরজগতেরও সৃষ্টি ৪৫০ কোটি বছর আগে বলেই অনুমান করা হয়।

আমেরিকার অ্যাপোলো-১১ এর মহাকাশ-চারীরা চাঁদের নিস্তরঙ্গ সমুদ্র এলাকা থেকে যে উপলখণ্ডগুলি সংগ্রহ করে এনেছেন, তার রাসা-য়নিক বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গেছে। তবে এই সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত নয়।

কিন্তু এই সিদ্ধান্ত যদি সঠিক হয়, তাহলে এই কথাই প্রমাণিত হয় যে, চাঁদ যখন প্রথম সৃষ্টি হয়েছিল, তখন থেকে আজ পর্যন্ত চাঁদের পৃষ্ঠদেশ খুব সম্ভবতঃ অপেক্ষাকৃত অবিকৃতই রয়েছে।

তেজস্ক্রিয়ার সাহায্যে তারিখ নির্ণয়ের যে অধিকতর সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি রয়েছে, তার দ্বারা সমর্থিত হলে এই আবিষ্কারের দ্বারা এই তথ্য প্রতিষ্ঠিত হয় যে, পৃথিবী তার শৈশবে যে অবস্থায় ছিল, এখন অবস্থাও সেইরকম। পৃথিবী এবং সৌরজগতের অন্যান্য গ্রহের জন্ম, বয়স ও বিবর্তন সম্পর্কিত সূত্র নিয়ে গবেষণার পক্ষে চাঁদ একটি প্রাকৃতিক গবেষণাগার হবে। এ ছাড়া সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের জীবন-চক্র সম্পর্কে অনেক কিছু এ থেকে জানা যাবে।

মার্কিন ভূতত্ত্ব সমীক্ষার ডক্টর ইউজীন শুমে-কারের মত যে সকল বিশিষ্ট বিজ্ঞানী চন্দ্রতত্ত্ব নিয়ে অনুশীলন করেন, তাঁদের ধারণা চাঁদের বয়স আরও অনেক কম হবে। তাঁদের মত চাঁদের বয়স সম্ভবতঃ ৫০ কোটি বছর মাত্র।

যাই হোক, এই আবিষ্কার চন্দ্রতত্ত্ববিশারদের জনক নোবেল পুরস্কার-বিজয়ী ডক্টর হ্যারল্ড উরের সিদ্ধান্তের সঙ্গে বেশ মিলে যাচ্ছে। ডক্টর উরে বিগত কয়েক দশক ধরেই বলে আসছেন যে, চাঁদের যখন জন্ম হয়েছিল, তখন এর পৃষ্ঠদেশ যেমন ছিল, এখনও অনেকটা সেইরকমই আছে।

চান্দ্র গবেষণাগারে চাঁদের উপলখণ্ড নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছেন চারজন বিজ্ঞানী। এঁরাই চাঁদের বয়স সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেছেন। এঁরা হলেন নিউইয়র্ক স্টেট বিশ্ববিদ্যা

লয়ের ডক্টর অলিভার শেফার, ডক্টর জন ফাক্‌হাউ-সার, পশ্চিম জার্মেনীর হাইডেলবার্গে অবস্থিত ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক ইনষ্টিটিউটের ডক্টর জোসেফ জারিঙ্গার এবং হিউষ্টোনের মানুষসহ মহাকাশযান উৎক্ষেপণ কেন্দ্রের ডক্টর ডোনাল্ড বোগার্ড।

চাঁদ থেকে আনা নমুনা পরীক্ষা করে এই যে বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তটি ঘোষণা করা হয়েছে, এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

তাঁরা স্পেকট্রোমিটারের সাহায্যে চান্দ্রশিলার নমুনাগুলি পরীক্ষা করেছেন। প্রিজ্‌ম্ যেমন আলোক রশ্মিকে সপ্ত রঙে বিচ্ছিন্ন করে প্রকাশ করে, তেমনি স্পেকট্রোমিটারও প্রস্তর খণ্ডের নমুনাকে বিভক্ত করে যে সকল রাসায়নিক মৌল পদার্থ দিয়ে ঐ প্রস্তরখণ্ড নির্মিত, সেগুলিকে পৃথক করে।

বিজ্ঞানীরা বলেন চান্দ্রশিলায় আর্গন জাতীয় যে সকল দুষ্প্রাপ্য গ্যাস প্রভূত পরিমাণে পাওয়া গেছে, তা এই কথাই প্রমাণ করে যে, ভূত্বকে প্রাচীনতম শিলাগুলি যত প্রাচীন, চান্দ্রশিলাও তত প্রাচীন এবং শেষোক্তগুলি ৪৫০ কোটি বছরের প্রাচীন হতে পারে।

পৃথিবীতে সবচেয়ে প্রাচীন যে শিলা এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়েছে, তার বয়স প্রায় ৩৩০ কোটি বছর। সেগুলি ভূপৃষ্ঠের বহু নীচে প্রোথিত রয়েছে।

আর্গন-৪০ গ্যাসের সঙ্গে পটাশিয়ামের অনুপাত হিসাব করে বয়স নির্ণয় করা হয়। পটা-শিয়াম-৪০ নামক তেজস্ক্রিয় পটাশিয়াম ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে আর্গন-৪০ সৃষ্টি হয়। পদার্থের মধ্যে যদি খুব সামান্ত পরিমাণ আর্গন-৪০ বর্তমান থাকে তাহলে পদার্থটি নতুন। নমুনার মধ্যে যদি আর্গন-৪০ প্রচুর পরিমাণে থাকে তাহলে নমুনাটি বহু প্রাচীন।

চান্দ্রশিলার যে নমুনাগুলি পরীক্ষা করা হয়েছে, তাতে প্রচুর পরিমাণ আর্গণের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে। এতে ঐ নমুনাগুলির প্রাচীনত্বই প্রমাণিত হয়। সূর্য থেকে নিয়মিত পরমাণু-কণা বিকিরিত হচ্ছে এবং অরক্ষিত চন্দ্রদেহে আঘাত করছে। একেই বলা হয় সৌর বাত্যা বা সোলার উইণ্ড। আর্গন এই সৌর বাত্যার উপজাত। চান্দ্রশিলায় প্রাপ্ত আর্গন কতখানি সূর্য থেকে এসেছে এবং কতখানি প্রাচীন কাল থেকে পটাশিয়ামের ক্ষয়ের ফল, তা অবশ্য এখনও নির্ণীত হয় নি।

চাঁদের সুবৃহৎ গহ্বর কোপারনিকাস সম্পর্কিত তথ্য

সৃষ্টির বেশ কিছুকাল পরে চাঁদে এক প্রচণ্ড উল্কাপাত ঘটে। এই দারুণ সংঘাতে সেখানে একটি বিরাট গহ্বারের সৃষ্টি হয়। এই গহ্বরটির গভীরতা দু-মাইল এবং এর ব্যাস ৬০ মাইল। এই বিরাট উল্কার আঘাতে চন্দ্রের বক্ষ বিদীর্ণ হয়ে গলিত পাথর ও লাভার স্রোত ২০০ থেকে ৩০০ মাইল পর্যন্ত স্থান জুড়ে চন্দ্রপৃষ্ঠের সকল দিকে প্রবাহিত হতে থাকে। এই গহ্বরটির নামকরণ করা হয়েছে কোপারনিকাস।

তখন যে পাথর সেই গহ্বর থেকে নির্গত হয়েছিল, তার একটি নিদর্শন বিজ্ঞানীদের হাতে এসেছে। এই নিদর্শনটি ঐ বিপর্যয় সম্পর্কে এবং চাঁদের অভ্যন্তর সম্পর্কে কিছুটা আলোক-পাত করতে পারে।

গত ৩রা ডিসেম্বর বিজ্ঞানীরা ঐ পাথরটি সম্পর্কে বলেছেন যে, অ্যাপোলো ১২-এর মহা-কাশচারীরা চন্দ্রপৃষ্ঠ থেকে যে ৭৩.১৫ পাউণ্ড ওজনের পাথর নিয়ে এসেছেন, সেগুলির মধ্যে ঐটি রয়েছে। এর দানাগুলি খুবই বড়। তাতেই মনে হয়, এটি এসেছে চন্দ্রের গভীর গহ্বর থেকে।

কোপারনিকাসের দক্ষিণ-পূর্বে দু-শ' মাইল দূরে সার্ভেয়ার নামে মার্কিন মহাকাশযানটি যে গহ্বরে পড়ে আছে, তারই কাছে মহাকাশচারীরা

এই পাথরটি পেয়েছিলেন। ঐখানেই মহাকাশ-চারীরা অবতরণ করেছিলেন।

জাতীয় বিমান-বিজ্ঞান ও মহাকাশ সংস্থার ভূ-বিজ্ঞানী ডক্টর রবিন ব্রেট এই সম্পর্কে বলেছেন—এই ধরণের মোটা দানার পাথর এর আগে আর আমরা দেখি নি। মনে হয় চন্দ্রপৃষ্ঠের বহু নীচেও কেলাসন ঘটতে পারে।

চন্দ্রের ধূলির সংস্পর্শে আসার পর যে সাতজন তথ্যসন্ধানী বিজ্ঞানীকে মহাকাশচারীদের সঙ্গে কোয়ারেনটাইন রাখা হয়েছিল ডক্টর ব্রেট তাঁদের অন্যতম।

ঐ অবস্থায়ই এক সাংবাদিক বৈঠকে পর্দার আড়ালে থেকে তিনি এই সম্পর্কে একটি প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন যে, এই পাথরটি কোপারনিকাস গহ্বর থেকেই এসেছে কি না, তা তিনি সুনিশ্চিতভাবে বলতে পারেন না। তবে এটি কোপারনিকাস গহ্বরের হতে পারে, এরকম সম্ভবনাও রয়েছে।

মহাকাশচারী কনর‍্যাড ও বীন ঐ অঞ্চলের চন্দ্রপৃষ্ঠের যে সকল ছবি তুলে নিয়ে এসেছেন, তার একটিতে একটি উঁচু ঢিবি রয়েছে। ঐটি দেখে ঐ দলের আর একজন বিজ্ঞানী ডক্টর এডুইন চাও বলেছেন, এটিও কোপারনিকাস গহ্বও থেকে নির্গত পাথরের ঢিবি হতে পারে। ঐ ধরণের যে সকল ঢিবি রয়েছে তাদের সম্পর্কে তিনি আরও বলেছেন—মনে হয় কোন গহ্বর থেকে নির্গত পাথর ভেঙে পড়ার ফলেই এই সকল ঢিবির সৃষ্টি হয়েছে।

অন্যান্য যেসকল পাথর নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছে, তাদের মধ্যে একটি আছে ৫·৩ পাউণ্ড ওজনের। এটি দৈর্ঘ্যে এগার ইঞ্চি। এত বড় পাথর চন্দ্রপৃষ্ঠ থেকে আর আনা হয় নি। এটির দানা মাঝারি ধরণের, এটি অ্যালুমিনিয়াম, ক্যালসিয়াম, পটাশিয়াম প্রভৃতি পদার্থে পূর্ণ পাথর। অ্যাপোলো-১১-এর যাত্রীরা সূক্ষ্ম দানার আবরণে আবৃত যে ধরণের পাথর নিয়ে এসেছিলেন, সে ধরণের পাথর এর মধ্যে একটিও নেই দেখে অনেকেই আশ্চর্য হয়েছেন।

ডক্টর ব্রেট এই প্রসঙ্গে বলেছেন যে, তিনি ঐ ধরণের পাথরের সন্ধান করবার জন্যে কনর‍্যাড ও বীনকে বলেছিলেন। কিন্তু মহাকাশচারীরা চন্দ্রলোক থেকে জানিয়েছিলেন যে, তাঁরা হাতের কাছে যা পাচ্ছেন, তা নিয়ে আসছেন।

অ্যাপোলো-১১-এর যাত্রীরা যে ধূলি নিয়ে এসেছিলেন, তাতে যে রকম কাচের কণিকা ছিল, সেই রকম কাচের কণিকা অ্যাপোলো-১২-এর মহাকাশচারীরা চন্দ্রপৃষ্ঠ থেকে যে ধূলি নিয়ে এসেছেন তার মধ্যে নেই।

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

ফেব্রুয়ারী — ১৯৭০

২৩শ বর্ষ — ২য় সংখ্যা
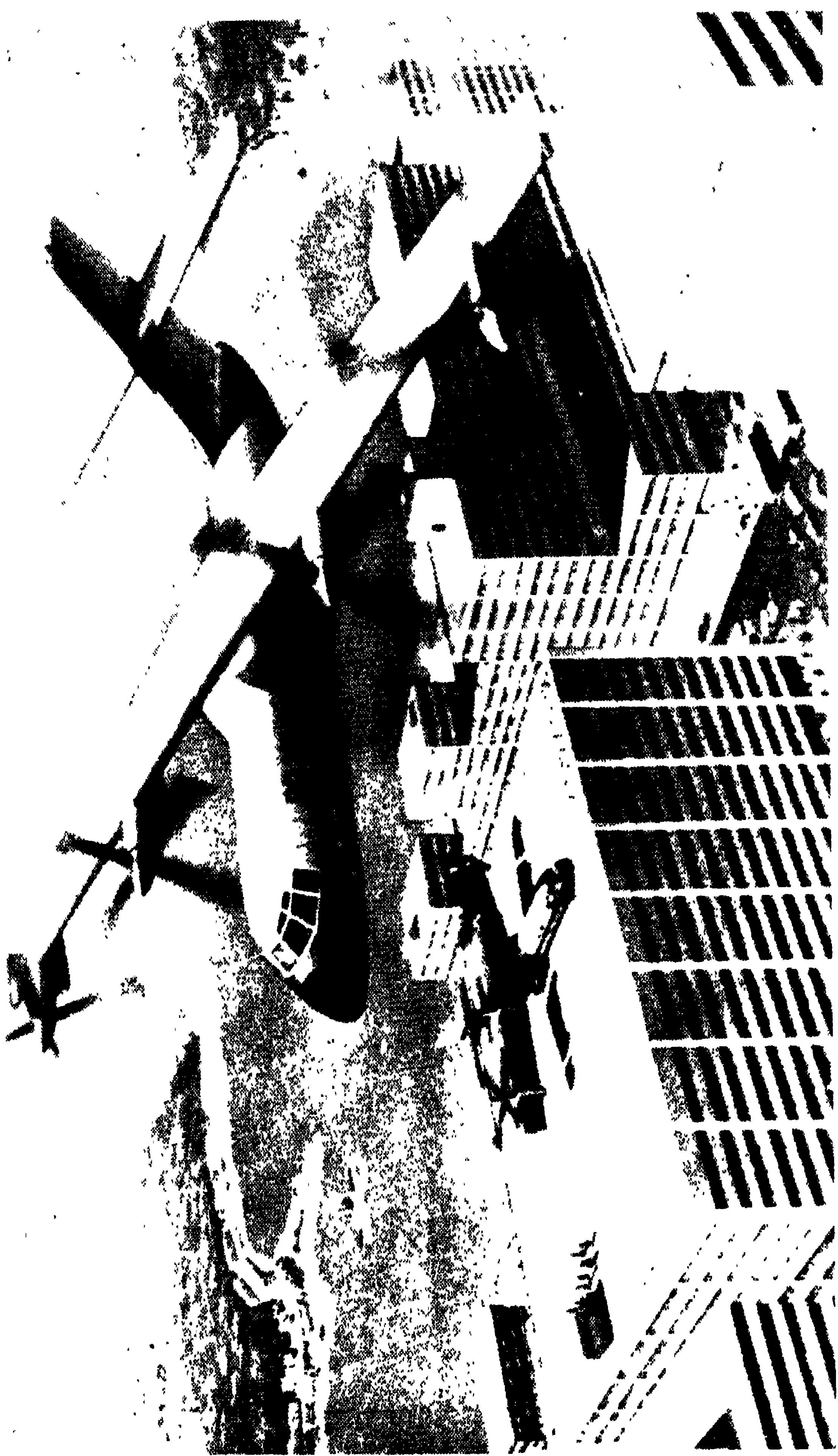
পশ্চিম জার্মেনীর চারটি বিমান কোম্পানী একটি করে নতুন ভার্টিক্যাল অথবা খাড়া ভাবে উড্ডয়নক্ষম বিমান বাজারে ছেড়েছে। এর কোনটার ডানা পঁয়ত্রিশ মিটার লম্বা এবং সমান্তরাল থেকে খাড়া হয়ে যেতে পারে আবার কোনটার ডানা সুইভেল ধরনের। কোনটায় জেট ইঞ্জিন, আবার কোনটায় বা টার্বো-প্রপ ইঞ্জিন। এর মেসেরস্মিট বেল্কো ব্লোম কোম্পানীর বিমানটি আশি থেকে একশ' যাত্রী নিয়ে ঘণ্টায় ৮৮০ কিলোমিটার উড়াতে পারে এবং সামরিক ও বেসামরিক বিমান হিসাবে একে

সাহারা

আফ্রিকা মহাদেশের উত্তর-প্রান্তে অবস্থিত বিশাল সাহারা মরুভূমির নাম সকলেরই জানা। সাহারা কথাটার প্রকৃত অর্থ বন্য বা রুক্ষ। আরবীয় শব্দ 'সাহ্‌রা' থেকেই এই মরুভূমির নামকরণ হয়েছে। সারা পৃথিবীতে প্রকৃতির খেয়ালের যত রকম নিদর্শন আছে, সাহারা মরুভূমি বোধ হয় তাদের মধ্যে উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত। উত্তর আফ্রিকার এই বৃহৎ মরুভূমি পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম। এক প্রান্তে আটলান্টিক মহাসাগর থেকে সুরু করে ঈজিপ্টের মধ্য দিয়ে, অপর প্রান্তে লোহিত সাগর পর্যন্ত, প্রায় ৩৫ লক্ষ বর্গ মাইল এলাকাব্যাপী বিশাল এই মরুভূমি অবস্থিত। এই আয়তন গোটা আমেরিকা অপেক্ষাও বৃহৎ আর সমগ্র আফ্রিকা মহাদেশের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ।

ভৌগোলিক হিসাবে সমগ্র সাহারাকে মূলতঃ পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয়েছে, তা হলো, আটলান্টিক সাহারা, মধ্য সাহারা, উত্তর সাহারা, দক্ষিণ সাহারা ও পূর্ব সাহারা। সাধারণতঃ সাহারা সমুদ্র-পৃষ্ঠ থেকে প্রায় ১০০০ ফুট উঁচুতে অবস্থিত। এই মরুভূমির মধ্যে সমতল অংশ ছাড়াও বেশ কিছু বড় বড় পর্বতও কয়েকটি আছে। তার মধ্যে আহাজ্জার ও তিবেস্তীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ভৌগোলিকদের মতে, বিশাল এই মরুভূমির সৃষ্টির পিছনে প্রকৃতির খেয়ালই অন্যতম কারণ। বহুযুগ আগে, প্রাকৃতিক কারণে বিভিন্ন শিলার বিন্যাসের ফলে সাহারার মূল ভূমির সৃষ্টি হয়। তার পরে, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ফলে বিভিন্ন স্তরের সৃষ্টি হয়। সাহারার বুকে বিশাল আগ্নেয়গিরি Emi Koussi আজও তার সাক্ষী হিসাবে দাঁড়িয়ে আছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, বহুকাল পূর্বে ঐ অঞ্চলটি বেশ স্যাঁতসেঁতে ছিল এবং বেশ কয়েকটি স্বাভাবিক নদীও এখানে ছিল। ফলে, ঘাসজাতীয় কিছু উদ্ভিদেরও অস্তিত্ব তখন এখানে চোখে পড়তো। কিন্তু প্রাকৃতিক কারণে ক্রমশঃ শুষ্ক হওয়ায় এবং প্রচণ্ড উত্তপ্ত হাওয়ার কবলে পড়ে, গাছপালা শুকিয়ে সমগ্র এলাকাটি এক বিশাল মরুভূমিতে পরিণত হয়। অবশ্য এত বিস্তীর্ণ এলাকাব্যাপী এরূপ শুষ্ক মরুভূমি সৃষ্টির প্রকৃত কারণ ও তথ্য আজও বিজ্ঞানীদের কাছে গবেষণাসাপেক্ষ।

সাহারার আবহাওয়া ও জলবায়ু কিন্তু খুবই বিচিত্র। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ এখানে খুবই সামান্য, তবুও সাহারার বিভিন্ন অঞ্চলে বৃষ্টিপাত বিভিন্ন রকমের। সাধারণতঃ উত্তরাংশের বৃষ্টিপাত বছরে ১০ ইঞ্চি অপেক্ষাও কম। আর দক্ষিণাঞ্চলে বছরে মাত্র ১৫ ইঞ্চির মত বৃষ্টি হয়। কিন্তু সাহারার মধ্য অঞ্চল একদম শুষ্ক। এখানে বৃষ্টিপাত একদম বিরল বলে এই অঞ্চলকে 'land of thirst' বলা হয়। সাহারার মধ্যে El

Golea নামে এমন এক জায়গা আছে, যেখানে গড়ে ৭ বছরে মাত্র একবার বৃষ্টি হয়। আর Tidikelt নামে আর এক জায়গায় বৃষ্টি হয় ১০ বছরে মাত্র হয়তো একবার। সুতরাং সেখানের ভয়াবহ পরিস্থিতির কথা সহজেই অনুমান করা যেতে পারে। মোটামুটিভাবে সমগ্র সাহারাতে গড়ে সারা বছরে বৃষ্টি হয় মাত্র ১৭ দিন।

এই তো গেল বৃষ্টির কথা। এবার বলি সেখানের উত্তাপের কথা। সাহারা মরুভূমি পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম উত্তপ্ত স্থান। সাধারণভাবে সমগ্র সাহারার বার্ষিক গড় তাপমাত্রা ৮০-৮৫ ডিগ্রী ফারেনহাইট। কিন্তু জুন-জুলাই মাসে সেখানে তাপমাত্রা প্রায়ই ১৩৫°-১৪০° মত হয়। কোন কোন জায়গায় তাপমাত্রা ঐ সময়ে ১৭০° পর্যন্তও ওঠে। ব্যাপারটা আমরা কল্পনাও করতে পারি না। দিনের বেলায় সাহারার উত্তাপ এত বেশী হলেও সন্ধ্যার পর কিন্তু তাপমাত্রা সেখানে খুব নেমে যায়। সাধারণতঃ দিন ও রাত্রের মধ্যে সেখানে তাপমাত্রার ৫০-৬০ ডিগ্রার মত হয়। এই ব্যাপারটা সাহারার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। এইরকম ব্যবধানের ফলে সূর্যাস্তের পর সেখানের পরিবেশটি খুবই মনোরম হয়। সাহারার আকাশ প্রায় সব সময়েই মেঘশূন্য থাকে, সেজন্যে আপেক্ষিক আর্দ্রতা এখানে খুবই কম—শতকরা মাত্র ১০ ভাগের মত আর এখানে যে বায়ু চলাচল করে, তা প্রধানতঃ উত্তর-পূর্ব আয়ন বায়ু।

সাহারা মরুভূমিতে জলাভাবহেতু গাছপালা নেই বললেই চলে। এর মধ্যেও মাঝে মাঝে কোন কোন জায়গায় সামান্য যা গাছপালা জন্মায়, সেখানে মরু-যাত্রীদের বিশ্রামের জন্যে ব্যবস্থা থাকে। সমগ্র সাহারা মরুভূমিতে এই ধরণের বেশ কয়েকটি মরূদ্যান আছে। উদ্ভিদ বলতে সাহারাতে প্রধানতঃ দুই ধরণের উদ্ভিদই জন্মায়। তা হলো, টার্পেন্টাইন গাছ এবং কাঁটাজাতীয় এক ধরণের ছোট গাছ। মরূদ্যানে অবশ্য খেজুর গাছ অনেক জন্মায় এবং এই গাছের অস্তিত্ব সেখানে খুবই প্রয়োজনীয়, কারণ স্থানীয় লোকেদের এই খেজুর ফল একটি প্রধান খাদ্য। এই গাছের ছায়ায় অবশ্য ডুমুর, পিচ প্রভৃতি ফলের গাছও কিছু কিছু জন্মায়, মরূদ্যানের এইসব গাছে জলসেচের ব্যবস্থা করা হয়, ছোট ছোট কূয়া খনন করে।

এবার আলোচনা করা যাক, সাহারায় বিভিন্ন প্রাণীদের কথা। জন্তু-জানোয়ারের মধ্যে সাহারায় উট, ছাগল, ভেড়া প্রভৃতি অনেক দেখতে পাওয়া যায়। এছাড়া, উত্তর ও দক্ষিণ সাহারায় বন্য হরিণ, বন্য শৃগাল, অস্ট্রিচ, বিছা এবং বিষাক্ত সাপও প্রচুর দেখতে পাওয়া যায়, নানা শ্রেণীর কীট-পতঙ্গও এখানে নতুন নয়। কুমীরের মত ছোট ছোট এক ধরণের সরীসৃপও সাহারায় প্রায় দেখা যায়। এত বড় বিশাল মরুভূমিতে এরকম নানা ধরণের প্রাণীর যে, বসবাস থাকবে তাতে আর বিচিত্র কি! তবে বিষাক্ত এই ধরণের প্রাণী ছাড়াও যে কয়েক জাতের মানুষের বসবাস সাহারায় আছে, সে কথা বোধ হয় অনেকের জানা নেই।

আগেই বলেছি যে, বহুকাল পূর্বে এর মরু অঞ্চল স্যাঁতসেঁতে ছিল এবং স্বভাবতঃই তখন মানুষের বসবাসও সেখানে অনেক বেশী ছিল। কিন্তু কালক্রমে রোমান যুগে সৈন্যরা মরু অঞ্চল দখল করায় সাধারণ মানুষের বসতি সেখানে ক্রমশঃ হ্রাস পেতে থাকে। সাহারাতে সর্বপ্রথম যারা বাস করতে আসে, তারা ছিল নিগ্রোজাতীয়। পরে বারবারদের আক্রমণে সেই নিগ্রোরা পালিয়ে যায় এবং আরও পরে আরবদের আক্রমণে বারবাররা মরু অঞ্চল ত্যাগ করে যেতে বাধ্য হয়। এই আরবেরাই সর্বপ্রথম মরুভূমিতে উটের প্রচলন করে এবং সাহারায় সমগ্র অধিবাসী-দের মধ্যে ইসলাম ধর্ম প্রবর্তন করে। এদেরই মধ্যে ক্রীতদাস-প্রথা প্রথম চালু হয় এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগ পর্যন্ত এরা এখানে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করে। এর পর নিগ্রো বারবার ও আরবের সংমিশ্রণ থেকে টুয়ারেগ, টিবু ও মুর নামে তিন শ্রেণীর লোকের উদ্ভব হয়। সাহারা অঞ্চলে এরাই হলো বর্তমান অধিবাসী। এরা সকলেই অবশ্য যাযাবর শ্রেণীর এবং সকলেই উটের সাহায্যে স্থানান্তরে যাতায়াত করে।

মনুষ্যবিবর্জিত এই মরুভূমিতেও কিন্তু সহরের মত ব্যবসায় বাণিজ্যও যথারীতি চলে। বাইরে থেকে গম, বার্লি, পশম ইত্যাদি এখানকার অধিবাসীদের কাছে রপ্তানী করা হয় এবং তার বিনিময়ে এখানকার অধিবাসীরা খেজুর সংগ্রহ করে চালান দেয়। এছাড়া এই মরুভূমি থেকে প্রচুর পরিমাণে লবণও রপ্তানী করা হয়ে থাকে। শুনলে বিস্মিত হতে হয় যে, সাহারা মরুভূমি থেকে বছরে প্রায় চৌদ্দ হাজার টন লবণ রপ্তানী হয়ে থাকে।

এবার বলি সাহারার যানবাহনের কথা। আগেই বলেছি যে, সাহারায় চলাচলের জন্যে উটই প্রধান বাহন। সাহারার নির্দিষ্ট দুই প্রান্তের মধ্যে নিয়মিত বাস চলাচলও করে। এই ভ্রমণে প্রায় দিন ছয়েকের মত সময় নেয়। সাহারার প্রান্তবর্তী জায়গাগুলির মধ্যে রেল চলাচলও করে। তবে এই রেলপথ সাহারার খুব ভিতর পর্যন্ত নানা কারণে অগ্রসর হতে পারে নি। সাহারার মধ্য দিয়ে একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত রেলপথ স্থাপন করে সাহারা অতিক্রম করবার পরিকল্পনা বহুদিন ধরেই রয়েছে। কিন্তু এই পরিকল্পনা রূপায়ণে যে বিপুল খরচ হবে, তার কথা চিন্তা করেই এই পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণ আজও সফল হয়ে উঠতে পারে নি।

সাহারার অধিকাংশ অংশই ফরাসী-শাসিত অঞ্চল, তবে এর কিছুটা অংশ অবশ্য স্পেন আর কিছুটা ঈজিপ্টের শাসনেও আছে। ফরাসী অধিকৃত অঞ্চল বেশী বলে ১৯৬১ সালে ফরাসী সরকার পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণের পরীক্ষা এই মরু প্রান্তরেই করেছিলেন।

সাহারার অভ্যন্তর ভাগ সম্বন্ধে ভৌগোলিকদের জ্ঞান বহুদিন যাবৎ খুবই সীমাবদ্ধ ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বিজ্ঞানীদের প্রচেষ্টায় প্রকৃতির বিস্ময়-

কর অবদান এই মরুভূমি সম্বন্ধে আমরা অনেক কিছু জানতে পারি। ১৮২২ ডেন্হাম ও ক্ল্যাপারটন নামে দুই বৃটিশ পর্যটনকারীর দুঃসাহসিক প্রচেষ্টায় সাহারা মরুভূমি অতিক্রম করা মানুষের পক্ষে প্রথম সম্ভব হয়। কিন্তু তখন এই মরুভূমিতে এত দুর্ধর্ষ লোকের বসবাস ছিল যে, তাঁদের অনুসরণকারী ভবিষ্যৎ পর্যটনকারীর মধ্যে অনেকেই নিহত হন। সাহারার রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে গিয়ে প্রাণ দিয়েছেন এরকম ভৌগোলিকের সংখ্যা অনেক। তবুও বিজ্ঞানীদের নির্ভীক প্রচেষ্টার ফলে আজ প্রকৃতির এই বিচিত্র মরুভূমি সম্বন্ধে কোন কিছুই আর আমাদের অজানা নেই। আজ মানুষের বুদ্ধি ও পরিশ্রমের ফলে সাহারার বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে টেলিফোন যোগাযোগ বা বিভিন্ন মরূদ্যানের মধ্যে রেল যোগাযোগের ব্যবস্থাও সম্ভব হয়েছে।

সমীরকুমার ঘোষ

পাখীর পালকের রঙ

রঙীন পাখীদের দিকে তাকালে চোখ জুড়িয়ে যায়, ময়ূরের নীল মরকত খচিত ডানা, বেনে বৌএর হলুদ কালো পালকের বাহার, টিয়ার সবুজ পান্না রঙ আর মাছরাঙার লাল, নীল, সাদা ছোপ লাগানো ডানা, সব কিছুতেই যেন একটা সুন্দর আভাস।

পাখীদের পালকের এই সব বিচিত্র রঙ নিয়ে বিজ্ঞানীরা অনেক মাথা ঘামিয়েছেন। কেউ বলেন এই বাহারী রঙ পাখীদের বিশেষতঃ পুরুষ পাখীদের স্ত্রী পাখীদের আকর্ষণের জন্যে, যাতে প্রকৃতির সৃষ্টিকার্য অব্যাহত ভাবে চলে। আবার কেউ বলেন, এই রঙ সূর্যের ক্ষতিকারক আলোক রশ্মি থেকে রক্ষা পাবার জন্যে এবং প্রখর উত্তাপ থেকে অব্যাহতি পাবার জন্যে। মেইনারট্‌জিগেন (Meinertzhagen) বলেন যে, মরুভূমির পাখীদের গোলাপী রঙ এই উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি হয়েছে। কেউ বলেন, রঙীন পালক বর্ণহীন পালকের চেয়ে দীর্ঘস্থায়ী। এভারিল (Averill) বলেন, পালকে মেলানিন রঙ থাকলে তা সাদা পালকের চেয়ে দীর্ঘস্থায়ী, আর তাই যে সব পাখীরা দীর্ঘপথ পরিক্রমা করে, তাদের সকলের পালকের ডগায় থাকে কালো রঙের বলয়। অনেকের মতে, পাখীদের রঙের বৈচিত্র্য অধিকাংশ সময়েই শত্রুর হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যে। শত্রু যখন আসে পাখীরা তার পালকের সাহায্যে গাছের ডালপালা, পাতা, কাণ্ডের সঙ্গে এমনভাবে মানিয়ে চলে যে, স্থির অবস্থায় এদের শত্রুরা টের পায় না। প্যাঁচা বা ছাতারের ধূসর রঙ, টিয়ার সবুজ ডানা ঠিক এই কারণে তৈরি। বহু ক্ষেত্রে পালকের রঙ এক থাকবার

জন্যে সুবিধাবাদী পাখীরা তাদের শত্রুর হাত দিয়েও নিজেদের কাজ করিয়ে নেয়। কোকিল তার কালো রঙের পালক দিয়ে কাকদের ঠকিয়ে নিজেদের বাচ্চাদের প্রতিপালন করিয়ে নেয়।

পাখীদের পালকের রঙের এই বৈচিত্র্যের পিছনে রয়েছে কতকগুলি রাসায়নিক রঙীন দ্রব্য। অনেক ক্ষেত্রে এই বর্ণ পাখীর পালকের গঠন এবং বিচিত্র বিন্যাসের উপরেও নির্ভর করে। সাধারণতঃ পাখীর পালকের মধ্যে যে সব রঙ থাকে তাদের বলা হয় বাইক্রোম্। বাইক্রোম্‌গুলিকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—মেলানিন (Melanin), ক্যারোটিনয়েড (Carotenoid) এবং পরফাইরিন (Porphyrin)। অধিকাংশ পাখীর পালকের রঙ সাধারণতঃ মেলানিনজাতীয় রঞ্জক দ্রব্য থাকবার জন্যে হয়। আর এই রঙ থাকবার জন্যে পাখার পালকের রঙ ঈষৎ হল্‌দে থেকে আরম্ভ করে লাল্‌চে বাদামী এবং ঘন বাদামী থেকে কালো হয়ে থাকে। পাখীরা এই মেলানিন নিজেদের দেহ থেকে সৃষ্টি করে নেয় এবং এই মেলানিন দানার আকারে পালকে ও ডানার চামড়ায় থাকে।

ক্যারোটিনয়েড রঞ্জক পদার্থ (যা গাজরের মধ্যে পাওয়া যায়) থাকবার জন্যে পাখার পালকের রঙ হয় হল্‌দে, কমলা বা লাল এবং এই রঙগুলি বিক্ষিপ্তভাবে ডানার চামড়ায় ও পালকের মধ্যে থাকে। ক্যারোটিনজাতীয় রঞ্জক পদার্থগুলিকে সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—(১) হাইড্রোকার্বনজাতীয় যৌগ পদার্থ, নাম ক্যারোটিন (Carotene) এবং (২) অক্সিজেনঘটিত ক্যারোটিন যৌগ জ্যান্থোফিল (Xanthophyll), এগুলির রঙ হলুদ বা কমলা রঙের হয়ে থাকে এবং (৩) ক্যারোটিনয়েড অ্যাসিড (Carotenoid acid), যেগুলি হলো লাল।

পাখারা এই ক্যারোটিনঘটিত রঙের জন্যে গাছের উপর প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল। এই সব রঞ্জক দ্রব্যের মধ্যে কিছু কিছু আবার পাখীরা আত্মসাৎ করে নেবার পর তাদের রঙ পরিবর্তন করে দেয়। পাখীদের লাল আর হলুদ রং (বিশেষতঃ পায়ের এবং ঠোঁটের রঙ) এই ক্যারোটিনঘটিত পদার্থের জন্যে হয়ে থাকে, আর এই রঙ তাদের খাদ্য থেকে তৈরি হয়। সাধারণতঃ খাদ্য আত্মসাতের সময় এই রঞ্জক দ্রব্যের বিশেষ কোন রাসায়নিক পরিবর্তন হয় না।

পাখীদের মধ্যে যে সব ক্যারোটিনঘটিত পদার্থ পাওয়া যায়, সেগুলি হলো লিউটিন (Lutein), অ্যাস্টাজ্যান্থিন (Astaxanthin), জিয়াজ্যান্থিন (Zeaxanthin), রোডোজ্যান্থিন (Rhodoxanthin), পিকোফুলভিন (Picofulvin), ক্যানারী জ্যান্থোফিল (Canary xanthophyll), আল্‌ফা ক্যারোটিন (Alpha carotene)। লিউটিন বেনে বৌ, খঞ্জনের ডানায়, জিয়াজ্যান্থিন পাহাড়ী মুরগীর পালকে, পিকোফুলভিন এবং আল্‌ফা ক্যারোটিন কাঠঠোক্‌রার ডানায় থাকে

পরফাইরিন হলো নাইট্রোজেনঘটিত পদার্থ। পাখীরা এই পরফাইরিনজাতীয় পদার্থ তৈরি করে নেয়। পরফাইরিন রঞ্জক পদার্থগুলি বিক্ষিপ্ত আকারে ডানার মধ্যে থাকে। পরফাইরিনঘটিত রঞ্জক দ্রব্য থাকবার জন্যে পাখাদের ডানায় উজ্জ্বল লাল প্রভা দেখা যায়। যে সব পরফাইরিনঘটিত রঞ্জক পদার্থ পাখীদের পালকে থাকে, সেগুলি হলো (ক) টুরাকভারডিন (Turacoverdin), যা থাকবার জন্যে পালক সবুজ বর্ণের হয়ে থাকে। (খ) টুরাসিন (Turacin), যা থাকবার জন্যে পালক লাল বর্ণের হয়ে থাকে, (গ) কপ্রোপরফাইরিন (Koproporphyrin), যা থাকবার জন্যে পালক গোলাপী রঙের হয়ে থাকে।

টুরাকভারডিন ও টুরাসিন আফ্রিকার টুয়ারকো গোত্রের পাখীদের মধ্যে দেখা যায়। আর কপ্রোপরফাইরিন গোলাপী রঙের সারসদের মধ্যে দেখা যায়।

বহু পাখাদের পালকের রঙ বদ্‌লাবার কারণ হচ্ছে রঙের রাসায়নিক পরিবর্তন, রঙ নষ্ট হয়ে যাওয়া, রঙের উজ্জ্বলতা হ্রাস পাওয়া, পুরনো পালকে নতুন ধরণের রঙের সৃষ্টি হওয়া। টেষ্ট দেখেছেন যে, সংঘর্ষ ইত্যাদিতে নষ্ট না হলে মেলানিন-জাতীয় রঞ্জক দ্রব্য দীর্ঘস্থায়ী হয়। ক্যারোটিনয়েডঘটিত লাল বা হলুদ রঙ প্রায় ৬৫ দিন উজ্জ্বল সূর্যালোকে রেখে দিলে তাদের উজ্জ্বলতা হ্রাস পেয়ে যায়।

রঙীন দ্রব্য ছাড়াও ডানার গঠন এবং পালকের সজ্জার উপরেও পাখীর পালকের রঙ নির্ভর করে। সাদা পালক সাধারণতঃ সূর্যের আলোর সমস্ত উপাদান-গুলিই প্রতিফলিত করে দেয়। উজ্জ্বল সাদা রঙ সাধারণতঃ ছিদ্রবিশিষ্ট বাতাসপূর্ণ পালকের জন্যে এবং অনুজ্জ্বল খড়িমাটির রঙের মত পালক ঘনবিবদ্ধ রোমের জন্যে হয়ে থাকে। অনেক পাখীর ডানার নীল রঙ তাদের পালকহীন ডানার গঠনের উপর নির্ভর করে। এই পালকহীন ডানাগুলির উপর ঘোলাটে রঙের একটি ছিদ্রবিশিষ্ট পর্দা থাকে, যার মধ্যে কোন রঙীন দ্রব্য থাকে না। আর এই পর্দার নীচে থাকে মেলানিনজাতীয় রঙের দানা। এই পর্দাগুলি সূর্যের আলোর নীল রঙের উপাদানকে প্রতিফলিত করে। কিন্তু অন্য রঙীন উপাদানগুলি সহজেই ভেদ করে চলে যায় এবং মেলানিনের দ্বারা শোষিত হয়ে যায়, তখন পাখীর পালক দেখায় নীল। বহু সবুজ পাখীর পালকের রঙ ঠিক অনেক ক্ষেত্রে এই নীল রঙের মতই সৃষ্টি হয়। এখানেও পালকহীন ডানার উপর থাকে ক্যারোটিনয়েডজাতীয় রঞ্জক পদার্থ, যার জন্যে পালক দেখায় সবুজ, আর যদি মেলানিনজাতীয় পদার্থ থাকে তবে পালক দেখায় জলপাই পাতার মতন সবুজ রঙের।

পাখীদের পালকের রঙ নিয়ে গবেষণা এখনও চলেছে, এর ফলে অনেক নতুন তথ্য জানা যাবে বলে আশা করা যায়।

অমলেন্দু হাজরা

বৈজ্ঞানিক স্মারক ভারতীয় ডাকটিকিট

যে সব বৈজ্ঞানিকের স্মৃতির প্রতি সম্মান দেখিয়ে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত ভারতীয় ডাক ও তার বিভাগ ডাকটিকিট প্রকাশ করেছেন, সেই সকল বৈজ্ঞানিকদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও ডাকটিকিটগুলির ছবি এখানে দেওয়া হলো।

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু—পদার্থবিদ ও উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী, জন্ম ১৮৫৮ সালে, মৃত্যু ১৯৩৭ সালে। লণ্ডনের ডি. এস-সি। কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপনা। পদার্থ-বিজ্ঞানে বেতার-তরঙ্গ বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আবিষ্কার। উদ্ভিদের স্নায়ুতন্ত্রও যে প্রাণী-দেহের মত আঘাত ও উত্তেজনায় সাড়া দেয়, তদ্বিষয়ক মৌলিক তথ্যাদি আবিষ্কার। তাঁর আবিষ্কৃত ক্রেস্কোগ্রাফ. যন্ত্র গাছের বৃদ্ধির গতি এক কোটি গুণ বাড়িয়ে লিপিবদ্ধ করে। জগদীশচন্দ্র ভারতে মৌলিক গবেষণার প্রসারের জন্যে কলিকাতায় বসু বিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯২০ সালে বিলাতের রয়েল সোসাইটির সদস্য (এফ.আর.এস.) নির্বাচিত হন। এই ডাকটিকিটটি প্রকাশিত হয় ৩০.১১.৫৮ তারিখে তাঁর জন্ম শত-বার্ষিকী উপলক্ষে।

এম. বিশ্বেশ্বরায়া—ইঞ্জিনীয়ার। মহীশূরের অধিবাসী। জন্ম ১৮৬০ সালে, মৃত্যু ১৯৬২ সালে। পুণার ইঞ্জিনীয়ারীং কলেজ থেকে স্নাতক হয়ে বেরিয়ে ১৮৮৪ সালে বোম্বাইয়ের ষ্টেট ইঞ্জিনীয়ারীং সার্ভিসে যোগদান করেন। ১৯০৯ সালে যোগ দিলেন মাইসোর সার্ভিসে প্রধান ইঞ্জিনীয়ার হিসাবে। ১৯১২ সাল থেকে ১৯১৮ সাল অবধি মহীশূরের দেওয়ান। মহীশূরের সর্বাঙ্গীন উন্নতির মূলে তিনি। তাঁর উদ্যোগে মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়; কাবেরী নদীকে কৃষ্ণরাজাসাগরে বাঁধা হয়। সারাভাতি ভ্যালি হাইড্রোলিক প্রোজেক্টের জনক তিনি। ভদ্রাবতী আয়রন অ্যাণ্ড ষ্টীল, স্যাণ্ডেল উড ম্যানুফ্যাকচারিং, সোপ ম্যানুফ্যাকচারিং প্রভৃতি বহু শিল্পসংস্থারই তিনি জন্মদাতা। বিশ্বেশ্বরায়া ১০২ বছর জীবিত ছিলেন। তাঁর জীবনের শত বছর পূর্তি উপলক্ষে ১৫.৯.৬০ তারিখে এই ডাকটিকিটটি প্রকাশিত হয়।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়—রসায়ন-বিজ্ঞানী। জন্ম ১৮৬১ সালে, মৃত্যু ১৯৪৪ সালে। এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি. এস-সি। কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপনা ও মৌলিক গবেষণা। তিনি রসায়নের বহু গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক তথ্য আবিষ্কার করেন। তাঁর প্রধান আবিষ্কার মারকিউরাস নাইট্রেট। প্রফুল্লচন্দ্র প্রাচীন হিন্দু-রসায়নের ইতিহাস প্রণয়ন করেন। তিনি ১৮৯৩ সালে এদেশে মৌলিক রসায়ন-শিল্পের সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠান বেঙ্গল কেমিক্যাল ওয়ার্কস স্থাপন করেন। প্রফুল্লচন্দ্র ছিলেন ঋষিকল্প,

দেশহিতব্রতী, বিজ্ঞান-সাধক। তাঁর সবচেয়ে বড় দান ও কৃতিত্ব বাংলা দেশে তাঁরই শিক্ষা-দীক্ষায় এক দল নব্য রাসায়নিকের সৃষ্টি। এই ডাকটিকিটটি প্রকাশিত হয় ২.৮.৬১ তারিখে তাঁর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে।

উপরের সারি—বাঁ-দিক থেকে—আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, ডক্টর এম, বিশ্বেশ্বরায়া, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। মধ্যের সারি—বাঁ-দিক থেকে—শ্রীনিবাস রামানুজন, ডক্টর ডারিউ. এম. হফকিন্স, ডক্টর হোমি ভাবা। নীচের সারি—বাঁ-দিক থেকে—ম্যাডাম কুরী, এ. কারসেট্‌জী ওয়াদিয়া।

এস. রামানুজন-—মাদ্রাজী ব্রাহ্মণ। গণিত-বিজ্ঞানী। জন্ম ১৮৮৭ সালে। কলেজে উচ্চশিক্ষা ব্যতীতই বিশ্ববিশ্রুত গণিতজ্ঞ হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন। জটিল গাণিতিক সমস্যা সমাধানে রামানুজন যে অসাধারণ প্রতিভা ও মৌলিকত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন,

তা তাঁকে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গণিতবিদের সম্মান দিয়েছিল। ১৯১৮ সালে রামানুজন এফ.আর.এস নির্বাচিত হন। এরপর তিনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রিনিটি কলেজের ফেলোশিপ পান। অসুস্থ অবস্থায় ইংল্যাণ্ড থেকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন এবং ১৯২০ সালে মাত্র তেত্রিশ বছর বয়সে তিনি মারা যান। এই ডাকটিকিটটি প্রকাশিত হয় ২২. ১২. ৬২ তারিখে তাঁর ৭৫তম জন্মবার্ষিকী স্মরণে।

ডাঃ ডাব্লিউ. এম. হফ্‌কিন—চিকিৎসা-বিজ্ঞানী। জন্ম ১৮৬০ সালে রাশিয়ার ওডেসা সহরে। ১৮৮৪ সালে ওডেসা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানের স্নাতক হয়ে ওডেসার প্রাণিবিদ্যার সংগ্রহশালায় চার বছর কাজ করেন। তারপর জেনিভা বিশ্ববিদ্যালয়ের শারীরবিদ্যা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক হন। হফ্‌কিন লুই পাস্তরের আহ্বানে প্যারী নগরে তাঁর জীবাণু-বিজ্ঞানাগারে যোগ দেন। এখানেই তিনি কলেরা রোগের প্রতিষেধক আবিষ্কার করেন। ১৮৯৩ সালে তাঁর নবাবিষ্কৃত ওষুধের কার্যকারিতা লক্ষ্য করবার জন্যে তিনি ভারতবর্ষে আসেন এবং এক বছরের মধ্যে এই ওষুধের সুনাম চারিদিক ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর ভারতবর্ষে অবস্থান কালে বোম্বাই সহরে ব্যাপকভাবে প্লেগ রোগ ছড়িয়ে পড়ে। মানব-দরদী হফ্‌কিন অক্লান্ত পরিশ্রম করে প্লেগ রোগের প্রতিষেধক আবিষ্কার করেন। হফ্‌কিন ১৯১৪ সালে ভারতবর্ষ ছেড়ে ফ্রান্সে চলে যান। সেখান ১৯৩০ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। বোম্বাইয়ে ডাঃ হফ্‌কিন যে জীবাণু-বিজ্ঞানাগার প্রতিষ্ঠা করেন, ভারতবাসী কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তাঁর নামকরণ করেছেন হফ্‌কিন্স ইনষ্টিটিউট। এই ডাকটিকিটটি তাঁর ১০৪তম জন্ম বার্ষিকী স্মরণে প্রকাশিত হয় ১৬.৩.৬৩ তারিখে।

হোমী জাহাঙ্গীর ভাবা—পদার্থ-বিজ্ঞানী। পার্শি পরিবারে ১৯০৯ সালে জন্ম। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতে ট্রাইপস্‌সহ উত্তীর্ণ হন। রোমে অধ্যাপক এন্‌রিকো ফের্মির অধীনে কাজ করেন। কস্‌মিক-রে ও নিউক্লিয়ার ফিজিক্স সম্পর্কিত গবেষণায় তাঁর মৌলিক অবদান আছে। ১৯৪১ সালে এফ. আর. এস. নির্বাচিত হন। ভারত সরকারের পরমাণু-শক্তি কমিশনের সভাপতি হন। ১৯৬৬ সালে ইউরোপে একটি যাত্রীবাহী বিমান দুর্ঘটনায় হোমী ভাবার মৃত্যু হয়। তাঁর এই আকস্মিক মৃত্যুতে পারমাণবিক বিজ্ঞানের গবেষণার ক্ষেত্রে ভারতের অপূরণীয় ক্ষতি হয়। এই ডাকটিকিটটি প্রকাশিত হয় ৪.৮.৬৬ তারিখে।

মেরী কুরী—পদার্থবিদ ও রসায়ন-বিজ্ঞানী। মেরি কুরীর জন্ম পোলাণ্ডের রাজধানী ওয়ার-স সহরে ১৮৬৭ সালে। তখন তাঁর নাম ছিল মানিয়া শ্‌ক্লোদোভস্কা। মেরি ছিলেন দরিদ্র পরিবারের কন্যা। অদম্য কর্মপ্রেরণায় তিনি মাতৃভূমি পোলাণ্ড ছেড়ে প্যারীতে পড়াশুনা করতে এসেছিলেন। অনাহার, অর্ধাহার, দারুণ শীতকষ্ট, অর্থাভাবে প্রয়োজনীয় পরিচ্ছদের অভাব—কোন বাধাই এই জ্ঞানপিপাসু রমণীর উদ্যমকে ম্লান করতে সমর্থ হয় নি। ১৮৯৫ সালে অধ্যাপক কুরীর তাঁর সঙ্গে বিবাহ হয়। তেজস্ক্রিয় ধাতু পোলোনিয়াম ও রেডিয়াম আবিষ্কারের জন্যে স্বামী অধ্যাপক কুরীর সঙ্গে কৃতিত্বের সমভাগী। ১৯০৩

সালে তিনি যুগ্মভাবে নোবেল পুরস্কার পান। অধ্যাপক কুরীর মৃত্যুর পর তিনি প্যারী বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপিকা হন; তেজস্ক্রিয়তা সম্পর্কে উন্নততর গবেষণা করেন। ১৯১১ সালে রসায়ন-বিজ্ঞানে পুনরায় নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। এই বিশ্ববিশ্রুত মহিলা ১৯৩৪ সালে পরলোক গমন করেন। এই ডাকটিকিটটি প্রকাশিত হয় ৬.১১.৬৮ তারিখে।

এ. কারসেট্‌জী ওয়াদিয়া—ইঞ্জিনীয়ার। বোম্বাইয়ের পার্শি সম্প্রদায়ভুক্ত যে ওয়াদিয়া পরিবার ভারতের জাহাজনির্মাণ শিল্পে অন্যতম পথিকৃৎ, সেই পরিবারে আরদাসীর কারসেট্‌জী ওয়াদিয়া ১৮০৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। খুব অল্প বয়সে কারসেট্‌জী জাহাজ-নির্মাণ ও জাহাজ-ইঞ্জিনিয়ারীংয়ে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি সর্বপ্রথম বাষ্প-চালিত পাম্পের প্রবর্তক। ১৮৩৪ সালে বোম্বাই সহরে তিনিই সর্বপ্রথম গ্যাস লাইটের প্রবর্তন করেন। ১৮৪১ সালে কারসেট্‌জী এফ. আর. এস নির্বাচিত হন। তিনিই সর্বপ্রথম ভারতীয় এফ. আর. এস। তাঁর মৃত্যু হয় ইংল্যাণ্ডে ১৮৭৭ সালে। এই ডাক-টিকিটটি প্রকাশিত হয় ২৭.৫.৬৯ তারিখে।

শ্রীঅমলকান্তি ঘোষ

উদ্ভিদ-কোষ

একটি বড় ঘর যেমন অনেকগুলি ইট সাজাইয়া তৈয়ারী করিতে হয়, ঠিক তেমনই উদ্ভিদের দেহও অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষের দ্বারা গঠিত। এই কোষগুলি এতই ক্ষুদ্র যে, অণুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া খালি চোখে মোটেই দেখা যায় না। উদ্ভিদ-কোষের প্রোটোপ্লাজমের চারদিকে সেলুলোজের (Cellulose) দ্বারা গঠিত একটি শক্ত, পুরু আবরণী থাকে, ইহাকে কোষ-প্রাচীর (Cell-wall) বলে। ইহা কোষকে রক্ষা করে। উদ্ভিদ-কোষের মধ্যে বর্ণহীন, অর্ধস্বচ্ছ, জেলীর মত যে সজীব পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাকে প্রোটোপ্লাজম (Protoplasm) বলে। এই কোষে প্রোটোপ্লাজম ব্যতীত আরও তিন প্রকারের সজীব বস্তু আছে:

(ক) নিউক্লিয়াস (Nucleus), (খ) প্লাস্টিড (Plastid); (গ) সাইটোপ্লাজম (Cytoplasm)।

(ক) নিউক্লিয়াস—প্রোটোপ্লাজমের সর্বাপেক্ষা ঘন অংশটিকে নিউক্লিয়াস বলে। ইহা সাধারণতঃ গোলাকার ও কোষের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। নিউক্লিয়াস কোষের সর্বপ্রধান অংশ।

নিউক্লিয়াসের চতুর্দিকে একটি সূক্ষ্ম ঝিল্লী থাকে, এই ঝিল্লীকে নিউক্লিয়-ঝিল্লী (Nuclear membrane) বলে। ইহার ভিতরে এক প্রকার অর্ধতরল পদার্থ থাকে, ইহাকে নিউক্লিয়োপ্লাজম (Nucleoplasm) বলে এবং এই নিউক্লিয়োপ্লাজমের মধ্যে যে সূক্ষ্ম সূতার মত এক প্রকার পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাকে নিউক্লিয়জালিকা (Nuclear reticulum) বলে। নিউক্লিয়াসের ভিতরে ঘন গোলাকার অংশকে নিউক্লিওলাস (Necleolus) বলে।

(খ) প্লাস্টিড—প্রোটোপ্লাজমের মধ্যে নউক্লিয়াস ছাড়া যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোলাকার দানার মত অংশ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাকে প্লাস্টিড (Plastid) বলে। ইহা সাধারণতঃ তিন প্রকারের: (১) ক্লোরোপ্লাস্ট (Chloroplast), (২) ক্রোমোপ্লাস্ট (Chromoplast), (৩) লিউকোপ্লাস্ট (Leucoplast)।

(১) ক্লোরোপ্লাস্ট—ইহা সাধারণতঃ সবুজ বা হরিৎ বর্ণের হয়। এই ক্লোরোপ্লাস্ট-গুলির ভিতরে এক প্রকার সবুজ বর্ণের পদার্থ জন্মায়, ইহাকে ক্লোরোফিল (Chlorophyll) বলে। এই ক্লোরোফিলের দ্বারা গাছ খাদ্য প্রস্তুত করে। গাছের পাতা এবং অপর সবুজ অংশে ক্লোরোপ্লাস্ট পাওয়া যায়।

(২) ক্রোমোপ্লাস্ট—ক্লোরোপ্লাস্ট ছাড়া অন্যান্য বর্ণের প্লাস্টিডকে ক্রোমোপ্লাস্ট বলে ; যেমন—লাল, হলুদ, কমলা রঙের প্লাস্টিড। ক্রোমোপ্লাস্ট সাধারণতঃ লাল, হলুদ বা কমলা রঙের ফুলের পাপড়ি বা ফুলের ত্বকের কোষে পাওয়া যায় এবং ইহা অনেক গাছের মূলেও থাকে, যেমন—গাজর।

(৩) লিউকোপ্লাস্ট—এই প্লাস্টিডের কোন বর্ণ নাই। উদ্ভিদের দেহের যে সব অংশ সূর্যের আলোক পায় না, সেইসব অংশে লিউকোপ্লাস্ট থাকে, যেমন—মূলা, রাঙাআলু, গাজর, আলু প্রভৃতি।

(গ) সাইটোপ্লাজম—প্রোটোপ্লাজমের মধ্যে নিউক্লিয়াস ও প্লাস্টিড ছাড়া অবশিষ্ট অর্ধতরল ঘন অংশকে সাইটোপ্লাজম (Cytoplasm) বলে। পরিণত অবস্থায় এই সাইটোপ্লাজমের ভিতর এক প্রকার গহ্বরের সৃষ্টি হয়। এই গহ্বরকে ভ্যাকুওল (Vacuole) বলে। ভ্যাকুওল ছোট, বড় বিভিন্ন আকারের হয়। ভ্যাকুওল যে জলীয় পদার্থের দ্বারা পূর্ণ থাকে, তাহাকে কোষ-রস (Cell-sap) বলে। এই কোষ-রসে নানা রকম প্রয়োজনীয় ও বর্জ্য পদার্থ থাকে। এই সকল বস্তু ছাড়াও উদ্ভিদ-কোষের মধ্যে নানা প্রকার জড় পদার্থ থাকে, যেমন—কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, ফ্যাট প্রভৃতি সঞ্চিত খাদ্যবস্তু, অন্তঃক্ষরিত পদার্থ, রেচক পদার্থ। ইহারা অর্ধতরল অবস্থায় সাইটোপ্লাজমের মধ্যে থাকে।

শ্রীঅশোককুমার নিয়োগী

জ্যোতির্বিজ্ঞানী উইলিয়াম হার্শেল

ফ্রেড্রারিক উইলিয়াম হার্শেল পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জ্যোতির্বিদ্‌গণের অন্যতম। ১৭৩৮ সালের ১৫ই নভেম্বর জার্মেনীর হ্যানোভারে হার্শেল জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মের দু-বছর আগে ল্যাক্‌রানজে ও নয় বছর পর লাপ্লাস জন্মগ্রহণ করেন। হার্শেলের পিতা হ্যানোভারের সৈন্যদলের বাদ্যকার ছিলেন। হার্শেল ১৭৫৩ সালে সৈন্যদলে বাদক হিসাবে যোগ দেন, কিন্তু ভগ্নস্বাস্থ্যের জন্যে তাঁকে সেই পেশা ত্যাগ করতে হয়। ১৭৬৬ সালে তিনি ইংল্যাণ্ডের বাথ সহরে এসে উপস্থিত হন। এখানে তিনি অক্টাগণ চ্যাপেল নামে এক গীর্জায় বংশীবাদকের কাজ পান। কিছুকালের মধ্যেই বাদক ও শিক্ষক হিসাবে তাঁর সুনাম ছড়িয়ে পড়ে।

এখানে তাঁকে কঠোর পরিশ্রম করতে হতো। তাঁর জীবনী থেকে পাওয়া যায় যে, দিনে ১৪ থেকে ১৬ ঘণ্টা পরিশ্রমের পরেও তিনি রাত্রে গণিতশাস্ত্র ও জ্যোতিষশাস্ত্র বিষয়ে পড়াশুনা করতেন। এই সময়েই দূরবীক্ষণ যন্ত্র বানাবার ও ব্যবহার করবার প্রতি তাঁর আগ্রহ জন্মায় এবং তিনি যে সমস্ত জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক তথ্য জেনেছিলেন, সেগুলিকে স্বহস্তে পরীক্ষা করে দেখবার ইচ্ছা তাঁর মনে জাগে। প্রথমে তিনি একটি ছোট প্রতিফলন দূরবীন ধার করেন। সেই সময় দূরবীনের এত দাম ছিল যে, তাঁর পক্ষে ঐ যন্ত্র ক্রয় করা অসম্ভব ছিল। তাই তিনি নিজের হাতেই দূরবীন বানাবার পরিকল্পনা করেন (১৭৭৩)। দূরবীনের লেন্স ঘষা ও পালিশ করবার কাজ খুব কঠিন। লেন্স তৈরির সময় তাঁকে ১৬ ঘণ্টাও দিনে খাটতে হয়েছে। এই সময় তাঁকে একান্তভাবে সাহায্য করতেন তাঁর বোন ক্যারোলিন হার্শেল। ক্যারোলিন তাঁকে নানারকম বৈজ্ঞানিক বিষয়েও সাহায্য করতেন এবং তাঁর কঠিন পরিশ্রমের সময় তিনি উচ্চ স্বরে আরব্য উপন্যাস, ডন কুইক্সোট প্রভৃতি বই পড়ে হার্শেলের পরিশ্রম লাঘব করবার চেষ্টা করতেন। এইভাবে নানা বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে হার্শেল একটি দূরবীন প্রস্তুত করেন এবং সেটির দ্বারা ১৭৭৪ সালের মার্চ মাসে তিনি ওরাইয়ন নীহারিকা (Orion Nebula) পর্যবেক্ষণ করে তার ফল লিপিবদ্ধ করেন। এই সময় তাঁর বয়স ছিল ৩৬ বছর।

১৭৭৫ সাল থেকে তিনি নানান ধরণের শক্তিশালী দূরবীনের সাহায্যে আকাশ পর্যবেক্ষণ সুরু করেন। তিনি আকাশে গ্রহ ও নক্ষত্রপুঞ্জের অবস্থান সঠিকভাবে নির্ণয় করে বহু রেখাচিত্র অঙ্কন করেন।

১৭৮১ সালের ১৩ই মার্চ রাত্রিতে তিনি একটি ৭ ফুট নিউটনীয় দূরবীনের (তাঁর নিজেরই তৈরির সাহায্যে এইচ-জেমিনোরাম-এর (H-Geminorum) প্রতিবেশী ছোট

নক্ষত্রগুলিকে পর্যবেক্ষণ করছিলেন। সেইসময় তিনি অপেক্ষাকৃত বড় ও উজ্জ্বল একটি তারার সন্ধান পান। এই তারাটিকে তিনি এইচ-জেমিনোরাম এবং ওরিগা ও জেমিনির (Auriga & Gemini) কোয়ারটাইলের (Quartile) মধ্যবর্তী তারাটির সঙ্গে তুলনা করে দেখেন যে, এই নতুন তারাটি অনেকগুণ বড়। একে তিনি ধূমকেতু বলে অনুমান করেন।

এই নতুন সৌরবস্তুটির কক্ষপথ হিসাব করে তিনি দেখেন যে, ধূমকেতুর কক্ষপথ এই রকম হতে পারে না। এইটি আবিষ্কৃত হবার চার মাস পরে অ্যাণ্ড্রু জোহান ল্যাক্সাল (১৭৪০-১৭৮৪) এটিকে নতুন গ্রহ হিসাবে চিহ্নিত করেন। হার্শেলের এই আবিষ্কার খুব সমাদৃত হয়েছিল, কারণ প্রায় এক শত বছরের মধ্যে কোন গ্রহ-উপগ্রহই আবিষ্কৃত হয় নি। তিনি এই নব-আবিষ্কৃত গ্রহটির নামকরণ করেন জর্জিয়াম-সাইডাস, ইংল্যাণ্ডের তৎকালীন রাজা তৃতীয় জর্জের নামানুসারে। কিছুকাল পরে এই গ্রহটির নতুন নামকরণ হয় হার্শেল। কিন্তু পরে অন্যান্য গ্রহদের ন্যায় এটির নামকরণ করা হয় ইউরেনাস। এই গ্রহটি সূর্যের সপ্তম গ্রহ এবং পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্বের প্রায় ১৯ গুণ দূরত্বে থেকে প্রায় বৃত্তাকার পথে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। আয়তনে এইটি শনির প্রায় দ্বিগুণ।

১৭৮১ সালের শেষের দিকে তিনি রয়েল সোসাইটির সদস্য নির্বাচিত হন। এর কিছুকাল পর ইংল্যাণ্ডের তৎকালীন রাজা তাঁকে বছরে ২০০ পাউণ্ড মাহিনায় রাজ-জ্যোতির্বিদের পদে নিযুক্ত করেন। এই সময় তিনি বাজনদারের কাজ ছেড়ে দেন। ১৭৮২ সালের অগাষ্ট মাসে তিনি বোন ক্যারোলীন হার্শেল সহ বাথ সহর ত্যাগ করে প্রথমে ডাচেট্ ও তারপর আরও কিছু স্থান ঘুরে ১৭৮৬ সালে স্ল্যাফে স্থায়ীভাবে বাস করেন। ১৭৮৮ সালের শেষভাগে তিনি বিবাহ করেন। এই সময় উন্নত ধরণের পর্যবেক্ষণের জন্যে তাঁর প্রচুর অর্থের দরকার হয়। বাজারে তাঁর নির্মিত দূরবীনের চাহিদা থাকায় তিনি দূরবীন বিক্রয় করে এই অর্থাভাব দূর করেন। ১৭৮৩ সালে তিনি একটি ১৮ ইঞ্চি ব্যাসের লেন্স দিয়ে ২০ ফুট লম্বা এক দূরবীন তৈরি করেন। ১৭৮৫ সালে ৪ ফুট ব্যাসের লেন্সসহ ৪০ ফুট লম্বা একটি দূরবীন তৈরির কাজে তিনি হাত দেন। যন্ত্রটির ব্যয়ভার তৎকালীন ইংল্যাণ্ডের রাজা বহন করেছিলেন। ১৭৮৭ সালের ১১ই জানুয়ারী তিনি একটি ২০ ফুট দূরবীনের সাহায্যে ইউরেনাসের দুটি উপগ্রহ অরাবান ও টাইটানিয়া আবিষ্কার করেন। এদিকে তিনি ৪০ ফুট দূরবীনটিকেও বহু বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও নির্মাণ করেন। ১৭৮৯ সালের ১৮ই অগাষ্ট বিকালে তিনি এটিকে প্রথম পর্যবেক্ষণের জন্যে ব্যবহার করেন এবং শনির ষষ্ঠ উপগ্রহ এনসিলাডাস আবিষ্কার ও পরে ১৭ই সেপ্টেম্বর ৭ম উপগ্রহ মাইমাসকে আবিষ্কার করেন। তাঁর বোন ক্যারোলীন হার্শেল সব সময় তাঁকে পর্যবেক্ষণ ও গণনাকার্যে সাহায্য করতেন এবং তিনি নিজেও ৮টি ধূমকেতু আবিষ্কার

করেন। এফ. ডাব্লিউ. হার্শেলের এই বিরাট প্রচেষ্টা দেখবার জন্যে বহু বৈজ্ঞানিক তাঁর স্লাফস্থিত বাড়ীতে আসেন। ১৮০১ সালে তিনি প্যারীস যাত্রা করেন এবং সেখানেই তাঁর সঙ্গে নেপোলিয়ন ও লাপ্লাসের সাক্ষাৎ হয়। ১৮০৭ সালে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। ১৮০৮ সালে তিনি তাঁর সমস্ত আবিষ্কারের নথিপত্র রয়েল সোসাইটিকে দান করেন। এর তিন বছর পরে তিনি দ্বিতারকাদের একটি তালিকা প্রস্তুত করেন। ১৮২২ সালের ২১শে অগাষ্ট এই বিজ্ঞানী প্রায় ৮৪ বছর বয়সে পরলোক গমন করেন।

তিনি জ্যোতির্বিজ্ঞানে বহু নতুন জিনিষ আবিষ্কার করে গেছেন, যেমন—দ্বি-তারকা ও তাদের পর্যবেক্ষণ, স্টার গজিং (Star Gauging), তারকার উজ্জ্বলতা থেকে তার দূরত্বের পরিমাপ, উজ্জ্বলতা পরিমাপ, নীহারিকা ও তারকাগুচ্ছ সম্বন্ধে মতবাদ, ছায়াপথের অবিচ্ছিন্নতা ও তার কারণ, বাইনারী তারকা (Binary Star), পরিবর্তনশীল তারকা, সূর্যের গঠন সম্বন্ধীয় মতবাদ ইত্যাদি। হার্শেল শেষ জীবনে জ্যোতির্বিদ্যা ছাড়া তাপ ও আলোক বিষয়ক পরীক্ষাও কিছু করেন।

অরূপ রায়

প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ১। আমাদের নিত্যব্যবহার্য বিভিন্ন সুগন্ধি দ্রব্যের সুগন্ধের উৎস কি?

কমলিকা রায়, বীরভূম
পীযূষ দেব, কলিকাতা-৩৭

প্রশ্ন ২। পদার্থের 'চতুর্থ অবস্থা' সম্বন্ধে কিছু জানতে চাই।

শ্রীমিহিরচন্দ্র তালুকদার, শিলিগুড়ি

প্রশ্ন ৩। ডি. ডি. টি জিনিসটা কি? ইহা মানুষের কোন ক্ষতি করে কি?

শ্রীঅতনু দাস, উত্তরপাড়া

উঃ ১। আমাদের নিত্যব্যবহার্য তেল, সাবান ও বিভিন্ন প্রসাধনী দ্রব্য ইত্যাদিতে নানারকম সুগন্ধ পাওয়া যায়। ফুল, গাছের আঠা, ছাল, পাতা, ফলের খোসা ও বিভিন্ন জাতীয় লতাগুল্মের মধ্যে নানা রকমের সুগন্ধি জৈব পদার্থ থাকে। এই সুগন্ধি দ্রব্যগুলি খুব সহজেই উবে যায় ও বায়ুর মাধ্যমে বাহিত হয়ে নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করে।

আগেকার দিনে সুগন্ধি দ্রব্য হিসাবে মৃগনাভ বা কস্তুরী, গাছের আঠা থেকে তৈরি ধুনা জাতীয় পদার্থের ব্যবহার প্রচলিত ছিল। বর্তমানে বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থের সংশ্লেষণ পদ্ধতিতে বহু মনোরম সুগন্ধি দ্রব্য তৈরি করা হয়। গোলাপ, জুঁই, বেল ইত্যাদি বিভিন্ন ফুল, লেবু-ঘাস, আদা-ঘাস ইত্যাদির নির্যাস সুগন্ধি দ্রব্য প্রস্তুতিতে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। রসায়নবিদেরা এই সমস্ত সুগন্ধি পদার্থকে আলাদাভাবে বিশ্লেষণ করে সেগুলির উপাদান নির্ধারণ করতে সক্ষম হয়েছেন। জানা গেছে যে, বিভিন্ন প্রকার সৌরভের মূলে রয়েছে সিট্রাল, বেঞ্জাইল অ্যাসিটেট ইত্যাদি বিভিন্ন জাতীয় যৌগ পদার্থ। কৃত্রিম-উপায়ে এগুলিকে এখন সংশ্লেষণ পদ্ধতির সাহায্য তৈরি করা সম্ভব হচ্ছে। জুঁই ফুলের মধ্যে সুগন্ধির মূল উৎস হিসাবে থাকে বেঞ্জাইল অ্যাসিটেট। কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত এই বেঞ্জাইল অ্যাসিটেটের সৌরভ হুবহু প্রায় জুঁই ফুলেরই মত। বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ মিশিয়ে যে সকল সুগন্ধি দ্রব্য প্রস্তুত করা হয়, সাধারণতঃ তাদের সৌরভ প্রাকৃতিক সুগন্ধি দ্রব্যের তুলনায় কিছুটা উগ্র। এই কারণে উগ্রতা কমাবার জন্যে কৃত্রিম সুগন্ধি পদার্থের সঙ্গে প্রায় একই রকম গন্ধবিশিষ্ট প্রাকৃতিক সুগন্ধি তেল মেশানো হয়ে থাকে।

তেল, সাবান ইত্যাদির মধ্যে যে সুগন্ধ আমরা পাই, তা তৈরির জন্যে তিনটে বস্তু অপরিহার্য। প্রথমতঃ সুগন্ধি দ্রব্য—যেটা রাসায়নিক উপায়ে বা জৈব তেল থেকে প্রস্তুত এবং যার উপর পদার্থের সৌরভ প্রধানতঃ নির্ভর করে। দ্বিতীয়তঃ সুগন্ধি দ্রব্য দ্রবীভূত করবার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত জৈব দ্রাবক। বিশেষ প্রণালীতে প্রস্তুত গন্ধবিহীন অ্যালকোহলকে সাধারণতঃ সুগন্ধি দ্রব্যের দ্রাবক হিসাবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। তৃতীয়তঃ, বিভিন্ন প্রকার রাসায়নিক পদার্থ, যার সাহায্যে সুগন্ধি দ্রব্যের সৌরভকে স্থায়ী করা হয়। মোটা-মুটিভাবে এগুলির উপর ভিত্তি করেই সুগন্ধি দ্রব্য তৈরি হয়ে থাকে।

উঃ ২। পদার্থের 'চতুর্থ অবস্থা' বা প্লাজ্মা সংক্রান্ত বিষয়ে উত্তরদাতা কর্তৃক লিখিত একটি প্রবন্ধ ১৯৬৯ সালের শারদীয় সংখ্যায় (অক্টোবর-নভেম্বর) প্রকাশিত হয়েছে। অতএব এখানে তা পুনরায় আলোচনা করা হলো না।

উঃ ৩। মশা, মাছি, বিভিন্ন কীট-পতঙ্গ ও জীবাণুর হাত থেকে রক্ষার ব্যাপারে ডি.ডি.টি-র প্রয়োগ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ডাইক্লোরো ডাইফেনিল ট্রাইক্লোরোইথেন—এই জৈব পদার্থের প্রথম অক্ষরগুলি নিয়ে ডি.ডি.টি শব্দটির উদ্ভব হয়েছে। ডি.ডি.টি একটি বিষাক্ত পদার্থ এবং যে কোন প্রাণীর পক্ষেই এটি কম মারাত্মক নয়। খাদ্যদ্রব্য ও নিঃশ্বাসের মাধ্যমে এটি প্রাণীর শরীরে প্রবেশ করে ও চর্বির মধ্যে সঞ্চিত হয়। ডি.ডি.টি স্নেহজাতীয় পদার্থে খুব সহজেই দ্রবীভূত হয়, কিন্তু জলে এর দ্রবণীয়তা খুবই কম। কীট-পতঙ্গদের মসৃণ আবরণে যে স্নেহজাতীয় পদার্থ থাকে, তা সহজেই ডি.ডি.টি-কে দ্রবীভূত করে ও এই স্নেহজাতীয় পদার্থের মাধ্যমে ডি.ডি.টি কীট-পতঙ্গের দেহে প্রবেশ করে বিষক্রিয়া ঘটায় ও তাদের ধ্বংস করে। ঠিক একই ভাবে ডি.ডি.টি মানুষের শরীরেও

প্রবেশ করে শরীরকে অসুস্থ করতে পারে। ডি. ডি. টি মানুষের শরীরে প্রবেশ করলে মাথাধরা, মাথাঘোরা, যকৃতের অসুস্থতা ইত্যাদি উপসর্গ দেখা দেয়। একবার শরীরে প্রবেশ করলে, জলে অল্প দ্রবণীয়তার দরুণ ডি.ডি.টি সহজে দেহ থেকে বের হতে পারে না।

আমাদের শরীরে এন্‌জাইমজাতীয় পদার্থের ক্রিয়ার ফলেই বিভিন্ন বিষাক্ত পদার্থ নির্দোষ পদার্থে পরিণত হয়। অনেক বিশেষজ্ঞের মতে, ডি.ডি.টি শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে এই সব এন্‌জাইমের শক্তি কমিয়ে দেয়, ফলে শারীরিক অসুস্থতা দেখা দেয়। শরীরের ভিতর বিষাক্ত পদার্থসমূহকে নির্দোষ করবার প্রক্রিয়া যকৃতের মধ্যে সংঘটিত হয়। বিভিন্ন লোকের যকৃতের কার্যকরী ক্ষমতা সমান নয়। দুর্বল যকৃতের পরিশোধন ক্ষমতাও কম। এইরূপ যকৃতে যদি ডি.ডি.টি-র মত বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ প্রবেশ করে, তবে তার পরিশোধন ক্ষমতা ক্রমশঃই কমতে থাকে, যার ফলে শরীর মারাত্মক ব্যাধিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা দেখা দেয়।

ডি.ডি.টি একদিকে ম্যালেরিয়া প্রভৃতি সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপ, শস্যক্ষেত্রে কীট-পতঙ্গের ক্ষতিজনিত অপচয়ের হাত থেকে মানুষকে রক্ষা করেছে, কিন্তু অন্যদিকে এটি মানুষের শরীরেরও যথেষ্ট ক্ষতিসাধন করে। এই কারণে বর্তমানে কীট-পতঙ্গ নাশক এমন প্রতিষেধক আবিষ্কারের চেষ্টা চলছে, যা মানুষের শরীরে কোন অনিষ্টসাধন করতে পারবে না।

শ্যামসুন্দর দে

বিবিধ

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের 'হাতে-কলমে' বিভাগ

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদে কিশোর-কিশোরীদের উপযোগী একটি 'হাতে-কলমে' বিভাগ গত ১২ই জানুয়ারী থেকে খোলা হয়েছে। ঐ বিভাগে বিজ্ঞানের সহজ পরীক্ষাদি, বৈজ্ঞানিক মডেল তৈরি প্রভৃতি কাজের জন্যে সুযোগ-সুবিধা আছে। পরিষদ ভবনে প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৫-৩০ থেকে ৭-৩০ পর্যন্ত বিভাগটি খোলা থাকে। যোগাযোগের ঠিকানা 'হাতে কলমে' বিভাগ, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, পি-২৩ রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬ (ফোন: ৫৫-০৬৬০)।

রেডারের সাহায্যে পঙ্গপালের সন্ধান

মরু পঙ্গপাল সন্ধানকার্যে বৃটিশ বিজ্ঞানীদের পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে আরও কার্যকরী পঙ্গপাল নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থার উদ্ভাবন হতে পারে।

লণ্ডনে প্রকাশিত অ্যান্টি-লোকাষ্ট রিসার্চ বিবরণীতে বলা হয়েছে, এ-এল-আর-সির

সঙ্গে কর্মরত লাফবরো কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা নতুন ধরণের বৃটিশ মেরিন রেডার এ-ই-আই-এসকর্ট-কে কাজে লাগিয়ে গবেষণার এই ক্ষেত্রে অনেকদূর অগ্রসর হয়েছেন।

ল্যাণ্ডরোভারের উপর স্থাপিত একটি বহন যোগ্য রেডার সেট্ সাহারায় নিয়ে যাওয়া হয় এবং এই রেডার সেটে কয়েক শত দিন ও রাত্রির পঙ্গপালের ছবি পড়ে।

বিবরণীতে বলা হয়েছে—১,৫০০ গজ পর্যন্ত দূরের বিচ্ছিন্ন নিঃসঙ্গ পঙ্গপালের গতিবিধি নিয়মিতভাবে ধরা সম্ভব হয়েছে এবং কখনো কখনো ৪,০০০ গজ দূরের পঙ্গপালের অস্তিত্বও এই যন্ত্রের সাহায্যে ধরা পড়েছে।

দিনের পঙ্গপালের অল্প ঘন ঝাঁক ২৫ মাইল দূর থেকেও এই যন্ত্রে ধরা সম্ভব হয়েছে।

এই পরীক্ষার সাফল্য লক্ষ্য করে এ-এল-আর-সি সেট্টি পূর্ব আফ্রিকায় ব্যবহারের জন্যে পাঠিয়ে দেন

মরু অঞ্চলে জলসরবরাহ

পৃথিবীতে মিঠা জলের উৎস খুব বেশী নয়। হ্রদ, নদী ও ভূগর্ভ থেকেই শুধু মিঠা জল সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। এভাবে যে জল পাওয়া যায়, তা ভূপৃষ্ঠের মোট জলের এক ভগ্নাংশ মাত্র।

বৃটিশ ইঞ্জিনীয়ারগণ, বিশেষ করে উইআর (Weir) সংস্থার সঙ্গে যুক্ত ইঞ্জিনীয়াররা সমুদ্রের লোনা জল থেকে মিঠা জল উৎপাদনে অনেক দূর অগ্রসর হয়েছেন। পশ্চিম এশিয়া ও পৃথিবীর অনেকগুলি শুষ্ক দেশের উপকূলে তাঁদের তৈরি মিঠা জলের প্লান্ট এখন কাজ করছে।

মরু অঞ্চলে ভূগর্ভস্থ মিঠা জলের জন্যে অনুসন্ধানের কাজও একই সঙ্গে চলেছে। সাহারা মরুভূমিতে কর্মরত বৃটিশ ইঞ্জিনীয়ারগণ সম্প্রতি বালিস্তূপের ২০০ ফুট গভীরে একটি ২০ মাইল মিঠাজলের হ্রদ আবিষ্কার করেছেন।

তাঁরা কঠিন পাথর ভেদ করতে পারে এমন যন্ত্রের সাহায্যে গভীর থেকে গভীরতর স্তরে খননকার্য চালান এবং মিঠা জলের বিরাট উৎসের সন্ধান লাভ করেন। দক্ষিণ লিবিয়ার বেনগাজি থেকে প্রায় ৬৫০ মাইল দূরে এই উৎসটি রয়েছে। আশা করা যায়, এখন ঐ অঞ্চলে চাষ-আবাদ ও পশুচারণ সম্ভব হবে।

পরীক্ষা করে দেখা গেছে, এই উৎস থেকে পাওয়া ভূগর্ভস্থ জল অত্যন্ত বিশুদ্ধ এবং অবিরল পাম্প করেও এই জল নিঃশেষ হয় নি।

এই আবিষ্কারের ফলে আশা করা হচ্ছে যে, ঐ অঞ্চলে আর্টেজিয় কূপ খনন করা সম্ভব হবে। আর্টেজিয় কূপে জল পাম্প করে তুলতে হয় না, তা চতুষ্পার্শ্বের পাথরের চাপে আপনা থেকে উঠে আসে।

এই সংখ্যার লেখকগণের নাম ও ঠিকানা

১। অমলচন্দ্র সাহা
মাইক্রোবায়োলজী বিভাগ
(রুম নং—১০৭)
অল ইণ্ডিয়া ইনষ্টিটিউট অব হাইজিন
অ্যাণ্ড পাব্লিক হেলথ
১১০, চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিউ
কলিকাতা-১২

২। গিরিজাচরণ ঘোষ
(পদার্থবিদ্যা বিভাগ)
বিদ্যাসাগর কলেজ
কলিকাতা-৭

৩। শ্রীহৃষীকেশ চৌধুরী
পোষ্ট গ্রাজুয়েট বেসিক ট্রেনিং কলেজ
আগরতলা, ত্রিপুরা

৪। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র
১৭৫।এ, রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৪

৫। শ্রীসত্যনারায়ণ মুখোপাধ্যায়
৯২।৫, দেওয়ান গাজী রোড
পোঃ বালী, হাওড়া

৬। শ্রীশিবনাথ মিত্র
ষ্টেশন রোড, বারাকপুর
পোঃ—বারাকপুর
জেলা—২৪ পরগণা

৭। সৌম্যানন্দ চট্টোপাধ্যায়
(ভূগোল বিভাগ)
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
৩৫, বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড
কলিকাতা-১৯

৮। দ্বিজেশচন্দ্র রায়
১৪।২, গল্ফ্ ক্লাব রোড
টালিগঞ্জ
কলিকাতা—৩৩

৯। সমর চক্রবর্তী
১২, মুন্সী বাজার রোড
কলিকাতা-১৫

১০। শ্রীঅমলকান্তি ঘোষ
৮।এ, পাইকপাড়া রো
কলিকাতা-৩৭

১১। সমীরকুমার ঘোষ
বিজ্ঞান সদন
বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়
শান্তিনিকেতন। বীরভূম

১২। শ্রীঅশোককুমার নিয়োগী
২, নরেন্দ্র ষ্ট্রীট
পোঃ উত্তরপাড়া
জেলা হুগলী

১৩। অমলেন্দু হাজরা
রসায়ন বিভাগ
বিবেকানন্দ কলেজ, ঠাকুরপুকুর
কলিকাতা-৮

১৪। অরুণ রায়
১, এ. সি. ব্যানার্জী রোড
কলিকাতা-৫৭

১৫। শ্রীশ্যামসুন্দর দে
অব রেডিও ফিজিক্স
অ্যাণ্ড ইলেকট্রনিক্স
বিজ্ঞান কলেজ
কলিকাতা-৯

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস কর্তৃক পি-২৩, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬ হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ
৩৭।৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

ত্রয়োবিংশ বর্ষ | মার্চ, ১৯৭০ | তৃতীয় সংখ্যা

লাল মাটি

হরেন্দ্রনাথ রায়

লাল, কালো, সাদা—তিন রঙের তিনটি পদার্থ। লাল মানে রেড হেমেটাইট, খনি অঞ্চলে লাল মাটি নামে প্রসিদ্ধ। কালো মানে অঙ্গার বা কোক কয়লা। আর সাদা মানে চুনাপাথর বা লাইম ষ্টোন। সবগুলিই খনিজ পদার্থ এবং খুবই সাধারণ পদার্থ। কিন্তু এই তিনের মিলনে যে অভিনব ধাতব পদার্থটি উৎপন্ন হয়, তারই উপর আধুনিক সভ্যতার ভিত্তি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত। দৈনন্দিন জীবনে এর সঙ্গে পরিচয় আমাদের নিবিড় আর সেটাই আমাদের কাছে লৌহ নামে পরিচিত।

লৌহ উৎপাদনে এই লাল রঙের খনিজ পদার্থটিই আসল। একে লৌহের জনকও বলা যেতে পারে। এটিই আকরিক লৌহ বা আয়রন ওর। পৃথিবী সৃষ্টির আদিতে কোন এক শুভ লগ্নে লৌহ-পরমাণুর সঙ্গে অক্সিজেন-পরমাণুর মিলন সংঘটিত হয়েছিল, যার ফল হলো আয়রন অক্সাইড। তারপর একদিন বিবর্তনের হিড়িকে এই অক্সাইডের দানাগুলি একত্রিত হয়ে জমাট বাঁধলো, তার পর স্তূপীকৃত হয়ে ছোট বড় পাহাড়ের আকারে পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে পড়লো। আর বৈজ্ঞানিকের পরিভাষায় তখন তার নাম হলো আয়রন ওর, অর্থাৎ খনিজ বা আকরিক লৌহ।

যে সব দেশে এই আকরিক লৌহের প্রাচুর্য বেশী, সে সব দেশ সৌভাগ্যশালী। ভারতবর্ষ এ সব দেশেরই অন্যতম। শুধু প্রাচুর্যের দিক দিয়েই নয়, উৎকর্ষের দিক দিয়েও এমন আকরিক লৌহ পৃথিবীর অন্যত্র বিরল। এদেশের স্থানে

স্থানে এমন আকরিক লৌহের স্তূপ বা পাহাড় আছে, যার মধ্যে বলা যেতে পারে প্রায় সবটাই লৌহ অক্সাইড। কিন্তু এমন দুর্লভ সম্পদের অধিকারী হয়েও ভারতবর্ষ এতকাল যেন নিদ্রাভিভূত ছিল। তাই এর যথোচিত মর্যাদা দেওয়া হয়ে ওঠে নি। অবশ্য এখন এর মর্যাদা দানের প্রস্তুতি চলছে।

পূর্বে বলা হয়েছে খনিজ লৌহ অক্সাইড বা আকরিক লৌহের আর এক নাম লাল মাটি। সাধারণতঃ স্থানীয় অধিবাসীদের কাছে ঐ নামেই এর পরিচয়। যে সব স্থানে পাহাড় কেটে এই পদার্থটি সংগৃহীত হয়, সে সব স্থান দিবা-রাত্র হোলি উৎসবে মেতে থাকে। সে সব স্থানের আকাশ লাল, বাতাস লাল, বাড়ী ঘরদোর, পথঘাট মায় নদী নালা, পুকুরের জল পর্যন্ত লাল। পোষাক-পরিচ্ছদের কথা বাদ দেওয়া যায় না। সেগুলি প্রতি মুহূর্তে লাল বা গৈরিকে পরিণত হতে থাকে।

ভারতবর্ষের মধ্যে উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জ রাজ্য, সুলাইপত অঞ্চল, বোনাই, বোলানি প্রভৃতি অঞ্চল, বিহারে কিরোপ্তোর, গুয়া, গরুমহাসানি, বাদাম পাহাড়, সিংভূম জেলার নোয়ামুণ্ডি প্রভৃতি স্থান লাল মাটির প্রসিদ্ধ অঞ্চল। প্রকৃত পক্ষে বিহারের বড় জামদাকে কেন্দ্র করে এর ক্ষেত্র দূর-দূরান্তর পর্যন্ত বিস্তৃত। পাহাড়ের পর পাহাড় শ্রেণীবদ্ধভাবে চলে গেছে উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিমে। আর এদেরই মধ্যে যুগ যুগ ধরে সঞ্চিত হয়েছে এই অমূল্য সম্পদ লাল মাটি। এর মোহে স্বদেশী এবং বিদেশী লুব্ধ বণিকের দল—বেসাতির আশায় চারিদিকে বসে গেছে নূতন নূতন কোম্পানী গঠন করে। একদা জনবিরল অঞ্চল আজ কোলাহলমুখর। অসমৃদ্ধ অঞ্চলে আজ সমৃদ্ধের বান ডেকেছে এই লাল মাটির প্রসাদে।

আকরিক লৌহের মান বা স্তর আছে; যথা—উৎকৃষ্ট, নিকৃষ্ট বা মাঝারি স্তরের। সব লাল মাটিরই মান যে উৎকৃষ্ট, তা নয়। নিম্নমানের মাটিও যেমন আছে, মধ্যমানেরও তেমনি আছে। উচ্চমান অপেক্ষা নিম্ন এবং মধ্যমানের লাল-মাটির প্রাচুর্যই বেশী। বিশুদ্ধ লৌহের অক্সাইড, যা একমাত্র রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত করা যায়, তার মধ্যে লৌহের পরিমাণ থাকে ৭০ শতাংশ। বাকীটা অক্সিজেন। লাল মাটি প্রকৃতিজ পদার্থ। সুতরাং বিশুদ্ধ লৌহ-অক্সাইড নয়। লৌহের অক্সাইড ছাড়া এর মধ্যে থাকে অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড, টাইটেনিয়াম অক্সাইড, সিলিকা বা বালি এবং কিছু পরিমাণ জলীয় বাষ্প। অবশ্য এদের পরিমাণ সামান্যই, তবুও সময় সময় উপেক্ষণীয় নয়। যে সব আকরিক লৌহের মধ্যে লৌহের (লৌহ ধাতুর) পরিমাণ ৬৩ শতাংশ বা আরও বেশী, সেগুলি উৎকৃষ্ট মানের লাল মাটি। এগুলির রং লাল নয়, কালচে ধরণের এবং আপেক্ষিক গুরুত্ব ও কাঠিন্যও বেশী। হাতে নিয়ে এগুলির ভার থেকেই অনুমান করা যায়, এগুলি কোন্ স্তরের

যে সব লাল মাটিতে ৫৫ শতাংশ বা তারও কম লৌহের অক্সাইড থাকে, তা আমাদের দেশে নিম্নস্তরের মাটির মধ্যে গণ্য। এগুলির রং মেটে এবং কাঠিন্যও কম, অর্থাৎ নরম প্রকৃতির মাটি। এগুলির মধ্যে অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড, বালি এবং জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেশী থাকে। সাধারণতঃ আমাদের দেশে এই প্রকৃতির মাটি লৌহ নিষ্কাশনের উপযোগী বলে বিবেচিত হয় না। অবশ্য অন্যান্য দেশে, যেখানে আকরিক লৌহ এত পর্যাপ্ত নয়, সে সব দেশে এই প্রকৃতির মাটি থেকেও লৌহ নিষ্কাশিত হয়ে থাকে। আবার যে মাটিতে লৌহ অক্সাইডের পরিমাণ ৫৭ শতাংশ থেকে ৬২ শতাংশের মধ্যে, তারা মাঝারি স্তরের মাটি। এগুলির রং মেটেও নয়, কালচেও নয়—লাল এবং কাঠিন্য উচ্চস্তরের মাটি অপেক্ষা কম। এই স্তরের মাটি ব্লাষ্ট ফার্নেসে লৌহ

প্রস্তুতের পক্ষে উপযোগী। উচ্চস্তরের লাল মাটি ওপেন হার্থ ফার্নেসে ইস্পাত প্রস্তুতে লাগে। কিন্তু লাল মাটির ব্যবহার এখনও সীমাবদ্ধ। তাই এই স্তরের মাটির কদর আমাদের দেশে এখনও তেমন নেই। হয়তো ভবিষ্যতে কোন নবতর পদ্ধতিতে এই মাটিকে কাজে লাগানো হবে। কেন না, দেশের এত প্রচুর সম্পদ চিরদিন এই ভাবে অবহেলিত হয়ে থাকতে পারে না এবং থাকতে দেওয়াও উচিত নয়।

নরম প্রকৃতির লাল মাটি, যা ভঙ্গুর বা অল্প চাপেই গুঁড়া হয়ে যায় এবং ঝামা প্রকৃতির (ঝাঁঝরা বা ফোঁপরা) লাল মাটি উচ্চস্তরের হলেও ইস্পাত বা লৌহ কোনটিরই প্রস্তুতের উপযোগী হয় না। আবার লাল মাটিতে অত্যধিক পরিমাণ অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড, বালি বা জলীয় বাষ্পের উপস্থিতিও অবাঞ্ছনীয়। এগুলি লৌহ প্রস্তুতে নানাপ্রকার জটিলতার সৃষ্টি করে। তাই এই সবের পরিমাণও সীমিত হওয়া প্রয়োজন।

প্রকৃতিতে খনিজ লৌহের আকর হচ্ছে পাহাড়ের স্তূপ। এই পাহাড়গুলি দৈর্ঘ্যে, প্রস্থে এবং উচ্চতায় খুব যে বিরাট আকৃতির হয়, তা নয়। তবে এরা শ্রেণীবদ্ধভাবে বিশাল অঞ্চল জুড়ে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে মাইলের পর মাইল। এই সব পাহাড় ফাটিয়ে আকরিক লৌহ বা লাল মাটি সংগৃহীত হয়। পাহাড়ের উচ্চশিখরে ড্রিলের সাহায্যে গর্ত করা হয়, তারপর সেই সব গর্তে বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। পূর্বে এই বিস্ফোরণ ঘটাবার জন্যে ডিনামাইটের সাহায্য নেওয়া হতো। আজকাল তরল অক্সিজেনের সাহায্যে এই কাজ সমাধা করা হয়। সাধারণতঃ প্রত্যুষে অথবা সন্ধ্যার নির্জনতায় এই বিস্ফোরণের কাজ সম্পন্ন হয়ে থাকে। বিস্ফোরণের ফলে পাহাড় ফেটে চৌচির হয়ে শত শত টন লাল মাটি ছোট বড় টুকরায় চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। তারপর ভাঙ্গা চাঁইগুলিকে ট্রাকে ভর্তি করা হয়। এই চাঁইগুলি ছোট, বড় ও বৃহৎ আকারের হয়ে থাকে। সেগুলিকে ভাঙ্গাই যন্ত্র বা ক্রামারের সাহায্যে নির্দিষ্ট আকারে ভাঙ্গা হয়। আকারে দুই থেকে তিন ইঞ্চি মাটির ডেলাগুলিই লৌহ প্রস্তুত করবার কাজে উপযোগী এবং ব্লাষ্ট ফার্নেস অথবা ওপেন হার্থ ফার্নেসে এগুলিকেই ব্যবহার করা হয়। খুব বড় বা ছোট ডেলা ফার্নেসের পক্ষে অনুপযোগী।

বড় ডেলাগুলিকে ভাঙ্গাই যন্ত্রে ভেঙ্গে স্বয়ংক্রিয় চালুনীর সাহায্যে বাছাই করা হয়। এই চালুনীর দ্বারাই তিন ইঞ্চির বড়, দু-ইঞ্চির ছোট ডেলাগুলিকে পৃথক করা হয়। বড় ডেলাগুলিকে সরিয়ে নিয়ে গাদা করে রাখা হয়।

এই সব নির্দিষ্ট আকারের ডেলাকে (২"-৩") সরাসরি ওয়াগনে বা লরীতে বোঝাই করা হয় না। এগুলিকে ফিডো ওয়েট বা ওজন যন্ত্রে ওজন করা হয়। সেখান থেকে সেগুলিকে বিদ্যুৎ-চালিত চলমান রবারের বেল্টের উপর নেওয়া হয়। বেল্টগুলি চওড়ায় প্রায় তিন ফুট। এগুলির গতিবেগ কমাতে বা বাড়াতে পারা যায়। এগুলি ২৫০-৩০০ টন মাল বহন করতে পারে অর্থাৎ এগুলির সাহায্যে যদি ওয়াগন বোঝাই করা হয়, তাহলে প্রতি ঘণ্টায় ৩০০ টন লাল মাটি ওয়াগনে বোঝাই করা যেতে পারে। এভাবে বোঝাই হয়ে ওয়াগনগুলি স্ব স্ব ফ্যাক্টরীর উদ্দেশ্যে রওনা হয়।

ওয়াগনগুলি নির্দিষ্ট ফ্যাক্টরীতে যাত্রা করবার পূর্বে লাল মাটির মান নির্ণয় করে দেখা হয়। দেখা হয় যে, এগুলি নিম্নমানের, না মধ্যমানের অথবা উচ্চমানের। এই মান নির্ণয় করা হয় ভারতীয় মান নির্ণয় সংস্থার নির্দেশানুযায়ী। চলমান বেল্টের উপর থেকে ঠিক নির্দিষ্ট সময় অন্তর কিছুটা পদার্থ—টন প্রতি প্রায় এক কিলোগ্রাম, বিদ্যুৎ-চালিত স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের সাহায্যে তুলে নেওয়া হয়। সেগুলিকে এক

জায়গায় জড়ো করে সংস্থার নির্দেশানুযায়ী ভাগা-ভাগি করে স্যাম্পেল প্রস্তুত করে সেগুলিকে রসায়নাগারে বিশ্লেষণ করে দেখা হয়।

এভাবে দৈনিক হাজার হাজার টন লাল মাটি ইস্পাত ফ্যাক্টরীগুলিতে চালান দেওয়া হয়। প্রত্যেক ফ্যাক্টরীর আকর বা খনি আছে, যেখান থেকে তাদের আকরিক লৌহ বা লাল মাটি প্রেরিত হয়ে থাকে। দুর্গাপুর ফ্যাক্টরীর জন্যে লাল মাটি সংগৃহীত হয় উড়িষ্যার অন্তর্গত বোলানি খনি থেকে। টাটার মাটি আসে গরুমহাসানি থেকে। রাউরকেল্লার বারসুয়া, বার্ণপুরের গুয়া প্রভৃতি অঞ্চল থেকে। এক এক অঞ্চলের মাটি যখন নিঃশেষিত হয়ে আসে, তখন অন্য খনির সন্ধান করে সেই সব খনি থেকে মাল সংগ্রহ করা হয়।

এই যে লক্ষ লক্ষ টন নির্দিষ্ট আকারের মাটি (২"-৩") মাসের পর মাস সংগৃহীত হচ্ছে, এর ফলে উৎপন্ন হচ্ছে লক্ষ লক্ষ টন গুঁড়া (এক ইঞ্চির ছোট)। সম্পদ যত অপরিসীমই হোক না কেন, তার যদি একটা মোটা অংশ ক্রমাগতই পরিত্যক্ত হতে থাকে, তাহলে অসীমও সসীম হয়ে আসে। এই গুঁড়া শুধু যে দেশের সম্পদকে সীমিত করে তুলছে তা নয়, খনির পক্ষেও এক সমস্যার ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভাল মাল উৎপন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গাড়ী বোঝাই হয়ে ফ্যাক্টরীতে চলে যায়, কিন্তু গুঁড়াগুলি পড়ে থাকে। অবাঞ্ছিত পদার্থ নিষ্ক্রমণের পথ নেই, সঞ্চিত হতে হতে ক্রমশঃই পাহাড়ের স্তূপ হয়ে ওঠে। খনির মূল্যবান জমি দখল করে কাজের ব্যাঘাত ঘটায়। এই লক্ষ লক্ষ টন পদার্থকে যদি কোন ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সুষ্ঠুভাবে প্রয়োগ করতে না পারা যায়, তাহলে দেশেরই ক্ষতি। দেশ একটা মূল্যবান পদার্থ থেকে বঞ্চিত হয়। এই গুঁড়ার সাহায্যে খনির ভিতরের এবং বাইরের পথঘাট প্রস্তুত হয় বটে, কিন্তু সে আর কতটুকু! তাতে সমস্যারও সমাধান হয় না আর ঐশ্বর্যও উদ্ধার হয় না। এ নিয়ে গবেষণা এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষাও প্রচুর হয়েছে। তার ফলে রাশিয়া, জার্মেনী প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশে এর একটা সুষ্ঠু সমাধানও হয়েছে। তারা ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এর প্রয়োগে সফলতাও লাভ করেছে। আমাদের দেশে কয়লার গুঁড়া, গোবর এবং মাটির দ্বারা যেমন গুল প্রস্তুত হয়, তেমনি এই গুঁড়া, কোক কয়লা এবং চুনাপাথরের গুঁড়ার দ্বারা ছোট ছোট ব্রিকেট বা থামি প্রস্তুত করা হয়। পরে সেগুলিকে উচ্চতাপে ঝলসে নিয়ে ব্লাষ্ট ফার্নেসে ব্যবহার করা হয় এবং একই প্রক্রিয়ায় এই ব্রিকেট থেকে লৌহ উৎপন্ন করা হয়। এতে ভাল ফল পাওয়া গেছে। এই অবাঞ্ছিত গুঁড়ার পাহাড়েরও একটা হিল্লে হয়েছে। শুধু তাই নয়, এখন ঐ সব দেশে প্রচেষ্টা চলেছে লাল মাটির ডেলা সরাসরি ফার্নেসে ব্যবহার না করে ব্রিকেটের সাহায্যে লৌহ উৎপাদন করা। এতে ঝামেলা নাকি অনেক কম এবং এই প্রণালী ফলপ্রসূও বটে। আমাদের দেশেও এই প্রণালীর সাহায্যে লৌহ উৎপাদনের চেষ্টা চলেছে। তবে এখানে দুটি মত প্রচলিত। সাবেক মতাবলম্বীদের ধারণা, এই প্রথা এই দেশে ফলপ্রসূ হবে না। টাটায় নাকি কিছুদিন পূর্বে এই প্রথায় লৌহ উৎপাদনের চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু সে প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ না হওয়ায় এই প্ল্যান্ট বন্ধ করে দেওয়া হয়। সুতরাং সেখানকার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বিচক্ষণদের বদ্ধমূল ধারণা, এই প্রথা অকার্যকর। প্রগতিশীলদের মতে, অন্যান্য দেশে এই প্রথা যখন সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে, তখন আমাদের দেশেও না হবার হেতু নেই। বাস্তবিক রাশিয়ার সাহায্যপুষ্ট ভিলাই ইস্পাত কারখানায় ইতিপূর্বেই এই প্রথা চালু হয়েছে এবং সুফলও পাওয়া গেছে। দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানাতেও কয়েক

বছর আগে থেকেই তোড়জোড় চলেছে। এই উদ্দেশ্যে সেখানে কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটা সিন্টারিং প্ল্যান্ট বা ব্রিকেট প্রস্তুত প্ল্যান্ট স্থাপন করা হয়েছে। এই প্ল্যান্ট চালু হলে গুঁড়া সমস্যার অনেকখানি সমাধান হবে। নির্দিষ্ট আকারের ডেলা মালের চেয়ে গুঁড়ার দাম কম। সুতরাং এই প্রথায় লৌহ উৎপাদনের খরচাও কম হবার সম্ভাবনা বেশী। সবচেয়ে বড় কথা, যে সম্পদ পরিত্যক্ত হয়ে আবর্জনায় পরিণত হয়ে নষ্ট হতে চলেছিল, তার পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা হওয়ায় শুধু লৌহশিল্পের উন্নতি নয়, দেশের কাঁচা মাল অর্থাৎ লাল মাটির পরিমাণও অনেক বেড়ে যাবে।

খনি থেকে লাল মাটি চালান দেওয়া হয় লৌহ উৎপাদন ফ্যাক্টরীগুলিতে। ফ্যাক্টরীতে প্রত্যহ হাজার হাজার টন লাল মাটি আসে। কিন্তু সব মাটি এক সঙ্গে ফার্নেসের মধ্যে চালান দেওয়া হয় না। এখানেও প্রয়োজন বোধে লাল মাটিকে বাছাই করা হয়।

ফ্যাক্টরীতে ব্লেণ্ডিং প্ল্যান্ট থাকে। সেখানে ভিন্ন মানের লাল মাটিকে ব্লেণ্ড করা হয় বা মিশিয়ে একত্রিত করা হয়। মিশ্রিত বা অমিশ্রিত সব লাল মাটিকে চলমান বেল্টের সাহায্যে শেষ পর্যন্ত বাঙ্কারে নেওয়া হয়। বাঙ্কার হচ্ছে লাল মাটি সঞ্চিত করে রাখবার জায়গা বা ষ্টোর। এখান থেকে লাল মাটি ট্রলিতে বোঝাই করা হয়। ট্রলি হচ্ছে ওয়াগনের ক্ষুদ্র সংস্করণ। রেল লাইনের উপর তার যাতায়াত। ব্লাষ্ট ফার্নেসের উচ্চতা ১২৫-১৫০ ফুট। নীচ থেকে তার মাথা পর্যন্ত ঢালুভাবে রেল লাইন পাতা থাকে। ইস্পাতের মোটা কাছি বা দড়ি ট্রলিখানির সঙ্গে আঁটা থাকে। ইলেকট্রিসিটির সাহায্যে কপিকলের মত এই দড়িই লাল মাটি বোঝাই ট্রলিখানিকে উপরে টেনে তোলে। ট্রলিখানি ফার্নেসের মাথায় পৌঁছেই উল্টে যায় এবং শূন্য গর্ভ হয়ে সব মাল ঢেলে দেয় ফার্নেসের গহ্বরে। ঠিক নির্দিষ্ট সময় অন্তর ট্রলিটি উঠা-নামা করে এবং কখনও লাল মাটি, কখনও কোক কয়লা আবার কখনও চুনাপাথর ফার্নেসের মধ্যে উজাড় করে ঢেলে দেয়। এই প্রথার নাম ফার্নেস চার্জ করা।

আকরিক লৌহ, মাটির ডেলা। তা থেকে কিভাবে লৌহ নিষ্কাশিত করা হয়, সেই কথাই বলছি। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, লৌহ-পরমাণু এবং অক্সিজেন-পরমাণুর মিলনে লৌহের অক্সাইড বা লাল মাটির উৎপত্তি হয়। এখন এগুলিকে যদি পৃথক করা যায়, অর্থাৎ লাল মাটি থেকে যদি অক্সিজেনকে সরিয়ে নেওয়া যায়, তা হলে যা পড়ে থাকে, তাই লৌহ। লাল মাটি থেকে এই অক্সিজেন পৃথকীকরণ প্রক্রিয়াটি করা হয় ব্লাষ্ট ফার্নেসের মধ্যে, অর্থাৎ বিজারণ প্রক্রিয়ায় লাল-মাটি থেকে অক্সিজেনকে অপসারিত করা হয়। জানি না, সুদূর অতীতে কোন্ বিজ্ঞানী অক্সিজেন এবং লৌহ-পরমাণুর মধ্যে মিলন ঘটিয়েছিলেন। কিন্তু বর্তমানে এদের পৃথকীকরণের মূল হচ্ছে কোক কয়লা। কোক কয়লা অক্সিজেনের সঙ্গে মিলিত হয়ে কার্বন ডায়োক্সাইডে রূপান্তরিত হয় আর সেই সঙ্গে লৌহকে অক্সিজেনের বাঁধন থেকে মুক্ত করে দেয়। এজন্যে প্রতি টন লৌহ উৎপাদনে প্রয়োজন হয় প্রায় ০·৮ টন কোক কয়লা এবং প্রায় ০·৩—০·৪ টন চুনাপাথর। এই কোক কয়লা এবং চুনাপাথর ট্রলির সাহায্যে ঠিক নির্দিষ্ট সময় অন্তর ফার্নেসের মধ্যে চার্জ করা হয়। ফার্নেসের গহ্বরটা ঠাসা থাকে লাল মাটি, কোক কয়লা এবং চুনাপাথরের দ্বারা। তলা দিয়ে যখন গলিত তরল লৌহ নির্গত হয়ে আসে, তখন সমগ্র চার্জটা ধীরে ধীরে নীচের দিকে নামতে থাকে। ১২৫ ফুট পথ এরা যখন ধীরে ধীরে অতিক্রম করে নীচের দিকে নামতে থাকে, তখন বিজারণ ক্রিয়া সুরু হয়।

কার্নেসের মধ্যে বিভিন্ন অংশের তাপ বিভিন্ন। তাই বিভিন্ন অংশের প্রক্রিয়াও হয় বিভিন্ন। কোথাও তাপের প্রভাবে চুনাপাথর বা ক্যালসিয়াম কার্বনেট বিশ্লিষ্ট হয়ে কার্বন ডায়োক্সাইড গ্যাসের সৃষ্টি করে, কোথাও এই কার্বন ডায়োক্সাইড গ্যাস যখন জ্বলন্ত কোক কয়লার স্তর ভেদ করে উপরে উঠতে থাকে, তখন কার্বনমনোক্সাইডে পরিণত হয়। আবার কোথাও এই অতি উত্তপ্ত কার্বন মনোক্সাইড গ্যাসের দ্বারা বিজারিত লাল মাটি অক্সিজেন মুক্ত হয়ে লৌহে পরিণত হয়। এইভাবে কার্নেসের মধ্যে ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার ধারা ঠিক নিয়মিতভাবেই চলতে থাকে। সংক্ষেপে বলতে গেলে প্রক্রিয়াগুলি এভাবেই সংঘটিত হয়। তবে এত সোজা এবং সরলভাবে নয়। প্রক্রিয়াগুলির জটিলতা অনেক বেশী।

উপর থেকে নীচে নেমে আসতে সময় লাগে। হর হর করে তারা নেমে আসে না, নামে ধীরে ধীরে। ১২৫ ফুট পথ অতিক্রম করতে সময় লাগে প্রায় চার ঘণ্টা। এরই মধ্যে সমস্ত জটিল প্রক্রিয়ার কাজ শেষ হয়ে যায় এবং লাল মাটি বিজারিত হয়ে তরল লৌহে পরিণত হয় এবং শেষ পর্যন্ত কার্নেসের তলায় এসে জমে। সেখান থেকে চার ঘণ্টা অন্তর এই গলিত লৌহকে বের করে নেওয়া হয়। লৌহকে কার্নেস থেকে বের করে নেওয়াকে বলা হয় ট্যাপ করা বা ঢালাই করা। এক একবার ঢালাইয়ে প্রায় ৫০০ টন পর্যন্ত মাল নির্গত হতে পারে। সেটা নির্ভর করে কার্নেসের আয়তনের উপর। তবে সাধারণতঃ ২০০-২৫০ টনের কার্নেস আমাদের দেশে সবিশেষ প্রচলিত। এই অত্যুত্তপ্ত গলিত লৌহকে ঢালাই করা হয় বড় বড় ল্যাডেল বা লোহার ঢালাই পাত্রে। ঢালাই পাত্রগুলি বসানো থাকে চাকাযুক্ত বিশেষ ধরণের গাড়ীর উপর। তারপর ইঞ্জিনের সাহায্যে সেগুলিকে নিয়ে যাওয়া হয় গন্তব্য স্থানে। গন্তব্য স্থান প্রধানতঃ তিনটি। প্রথম, ইস্পাত প্রস্তুত করবার জন্যে ওপেন হার্থ ফার্নেস, দ্বিতীয়, পিগ কাষ্টিং মেসিন এবং তৃতীয় ফাউণ্ড্রি।

এই গলিত লোহা থেকেই ওপেন হার্থ ফার্নেসে ইস্পাত প্রস্তুত করা হয়। ল্যাডেল থেকে গলিত লোহাকে ওপেন হার্থ ফার্নেসের গর্ভে ঢেলে দেওয়া হয় এবং সেখানে সাধারণ নিয়মে গলিত লোহা থেকে অঙ্গার বা কার্বনকে অক্সিডাইজ বা জারিত করে ইস্পাত প্রস্তুত করা হয় (লেখকের 'লৌহ ও ইস্পাত' পুস্তক দ্রষ্টব্য)।

পিগ কাষ্টিং মেসিন চলমান মেসিন। এখানে চলমান লোহার রোলারের উপর ছোট ছোট ছাঁচ সাজানো থাকে। মেসিন চলবার সময় ছাঁচগুলি একে একে এগিয়ে আসে। গলিত লোহা ল্যাডেল থেকে ছাঁচগুলিকে পূর্ণ করে তোলে। পূর্ণ হয়ে গেলে তারা খালি ছাঁচগুলির জন্যে স্থান ছেড়ে এগিয়ে যায় এবং নির্দিষ্ট স্থানে পিগগুলিকে আনে (নির্দিষ্ট আকারের ছাঁচে প্রস্তুত লৌহকে পিগ বলে। শূকরের ছানার সঙ্গে এর কাল্পনিক সাদৃশ্য অনুমান করে এগুলির নামকরণ হয়েছে পিগ)।

ফাউণ্ড্রি হচ্ছে ঢালাইখানা। এখানে প্রয়োজনানুযায়ী বিভিন্ন আকারের মাটির ছাঁচ প্রস্তুত করা থাকে। এই গলিত লৌহের দ্বারা সেই ছাঁচগুলি পূর্ণ করে নানা আকৃতির জিনিষ প্রস্তুত হয়। যে সব বড় বড় কারখানায় ব্লাষ্ট ফার্নেস আছে যেমন দুর্গাপুর, ভিলাই, টাটা, বার্ণপুর প্রভৃতি ইস্পাত কারখানা—সেখানে সরাসরি ফাউণ্ড্রিতে এই গলিত লৌহ ব্যবহার করা হয়। ছোট কারখানায় কঠিন পিগকে পুনরায় উনানে গলিয়ে সেই গলিত লোহা ছাঁচে ঢেলে বিভিন্ন আকারের জিনিষ প্রস্তুত করা হয়।

লাল মাটির তিন রকম মানের কথা পূর্বেই

বলা হয়েছে। এর মধ্যে মধ্যমানের লাল মাটি সাধারণতঃ ব্লাষ্ট ফার্নেসে লৌহ উৎপাদনে ব্যবহার করা হয়। উচ্চমানের লাল মাটি ব্যবহার করা হয় ওপেন হার্থ ফার্নেসে ইস্পাত প্রস্তুতে। কিন্তু দু-জায়গায় লাল মাটির কাজ সম্পূর্ণ বিপরীত-ধর্মী। ব্লাষ্ট ফার্নেসে যে প্রক্রিয়া ঘটে থাকে, তা বিজারণ প্রক্রিয়া (Reduction), অর্থাৎ কোক কয়লার সাহায্যে লাল মাটি থেকে অক্সিজেনকে বিজারিত করে বিতাড়িত করা হয়, ফলে লৌহ উৎপন্ন হয়। আর ওপেন হার্থে যে ক্রিয়া ঘটে, তা জারণক্রিয়া (Oxidation)। লৌহের মধ্যে থাকে প্রচুর কার্বন বা অঙ্গার। অঙ্গার বেশী থাকলে ইস্পাত হয় না। তাই লৌহস্থিত অঙ্গারকে বিতাড়িত করা হয় জারণক্রিয়ার সাহায্যে। লাল মাটির অক্সিজেনের দ্বারা এই জারণক্রিয়া সম্পন্ন হয়। এক প্রক্রিয়ায় কার্বনের সাহায্যে অক্সিজেনকে বিতাড়িত করা হয় আর এক প্রক্রিয়ায় অক্সিজেনের সাহায্যে কার্বনকে বিতাড়িত করা হয়ে থাকে।

লক্ষ লক্ষ বছর আগে প্রকৃতি নিজের খেয়ালবশে লৌহের এবং অক্সিজেনের পরমাণুকে নিজের কারখানায় একত্রে মিলিত করে লৌহের অক্সাইড বা লাল মাটি সৃষ্টি করেছিল, আজ মানুষ সেই লাল মাটি থেকে অক্সিজেনকে বিযুক্ত করে লৌহ উৎপন্ন করে আপন সভ্যতার হাতিয়ার প্রস্তুত করে চলছে। এমনটি যে একদিন ঘটবে, সে কথা সম্ভবতঃ প্রকৃতির অজানা ছিল না। তাই অক্সিজেন বিযুক্ত করবার জন্যে যে সব মাল-মসলার প্রয়োজন অর্থাৎ কয়লা, চুনাপাথর (কালো এবং সাদা), সেগুলিকে ঠিক এরই কাছাকাছি স্থানে সঞ্চিত করে রেখেছে। বিহার এবং উড়িষ্যায় যে সব স্থানে লাল মাটির খনি আছে, তারই কাছে আসানসোল এবং ঝরিয়ায় কয়লার খনি, এবং বীরমিত্রপুর, পান্নাপি, করণপুরা প্রভৃতি স্থানে চুনাপাথরের পাহাড় সৃষ্টি করে রেখেছে। এগুলির সমন্বয় ঘটিয়ে মানুষ সেই আদিম কালের লৌহকে পুনরুজ্জীবিত করে তুলেছে।

আগেই বলা হয়েছে যে, সিংভূম জেলা এবং উড়িষ্যা প্রদেশে খুব উচ্চাঙ্গের খনিজ লৌহ বা লাল মাটির স্তর আছে। এই অঞ্চলের সর্বোৎকৃষ্ট লাল মাটির পরিমাণ হবে তিন হাজার মিলিয়ন টন। অবশ্য এই হিসাব দিয়েছিলেন তদানীন্তন ইংরেজ গভর্নমেন্টের ভূতত্ত্ববিদ্ ডক্টর ফক্স। তারপর এই পরিমাণের সঙ্গে যোগ-বিয়োগ হয়তো আরও কিছু হয়েছে। তখন প্রতি টনের মূল্য ছিল প্রায় তিন টাকা। এখন এর মূল্য দাঁড়িয়েছে প্রায় ১৫-১৬ টাকায়। যুক্তরাষ্ট্রের লেক সুপিরিয়র অঞ্চলের লৌহস্তরই ছিল এক সময় পৃথিবীর মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট। তাতে লৌহের পরিমাণ ছিল ৫৫ থেকে ৬০ শতাংশ। কিন্তু সিংভূমের লাল মাটিতে লৌহের পরিমাণ ৬০-৬৭ শতাংশ। স্থানে স্থানে ৬৭ শতাংশেরও বেশী লৌহের পরিমাণযুক্ত স্তর দেখতে পাওয়া যায়। সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা যায়, ভারতবর্ষের লাল মাটিই পৃথিবীর মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট। পৃথিবীর বাজারে ভারতবর্ষের লাল মাটির চাহিদা অনেক। সে সব বাজারে এই মাটির চালান অব্যাহত রাখতে পারলে দেশের বাণিজ্যের বিশেষ অগ্রগতি হবে। জাপানে এই মাটির ক্ষেত্র বিরাট। সেখানে লাল মাটির স্তর বিশেষ নেই। সে দেশের সঙ্গে এই মাটির লেনদেনের ব্যাপারে একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। ইউরোপেও কোন কোন দেশের সঙ্গে এই মাটির ব্যাপারে আমরা চুক্তিবদ্ধ হয়েছি। সুতরাং এই মাটি আমাদের দেশের এক বিরাট সম্পদ। একে ঠিকভাবে নিয়োজিত করতে পারলে শুধু যে শিল্প ক্ষেত্রেই আমরা লাভবান হবো তা নয়, ব্যবসা-ক্ষেত্রেও আমাদের সমৃদ্ধি ঘটবে।

অবলোহিত রশ্মি

দেবেন্দ্রবিজয় গুপ্ত

আমাদের সীমিত ইন্দ্রিয়শক্তিতে সব তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের আলো দেখা যায় না। তাই তার বাইরের জিনিষকে দেখতে হলে সেই বিশেষ তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যকে ধরা চাই। এমনই এক ধরণের অদৃশ্য আলো হলো অবলোহিত রশ্মি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে ইনফ্রারেড বা অবলোহিত রশ্মি নিয়ে হৈ-চৈ সুরু হলেও এর অস্তিত্ব বিজ্ঞানীরা অনেক আগেই টের পেয়েছেন। ১৮০০ সালে জ্যোতির্বিজ্ঞানী উইলিয়াম হার্শেল বিভিন্ন শোধন-মাধ্যমে (Filter) সূর্যের রশ্মি নিয়ে পরীক্ষা করছিলেন। তাঁর পরীক্ষাতেই দেখা গেল যে, বিশেষ কয়েকটা শোধন-মাধ্যম ব্যবহার করে রীতিমত তাপ অনুভূত হচ্ছিলো —কিন্তু আলো ছিল না। আবার কতকগুলি মাধ্যম ব্যবহার করে শুধু আলোই পাওয়া গেল, কিন্তু তাপের অনুভূতি প্রায় ছিল না বললেই চলে।

হার্শেল ত্রিশির কাচ বা প্রিজ্‌ম নিয়ে বর্ণালী বিশ্লেষণের গবেষণায় মাতলেন। সূর্যরশ্মির সাতটা আলো বিশ্লেষিত হলো আলাদা আলাদা রঙে— বেগুনী থেকে সুরু করে শেষে লাল। তখন তিনি তাপমান যন্ত্র নিয়ে প্রতিটি বর্ণালীর তাপমাত্রার পরিমাপ করলেন। দেখা গেল, এক একটা রঙের ক্ষেত্রে তাপমাত্রাও এক এক রকম। সবচেয়ে উত্তপ্ত মনে হলো লাল রঙকে। দৃশ্যমান লাল রঙের ঠিক বাইরের (যেখানে আপাততঃ কোন রঙ দেখা যায় না) আপাত বর্ণহীন জায়গাটা লাল রঙের চেয়েও বেশী উত্তপ্ত। এই হলো সেই নতুন আলো, যা মানুষের চোখে অদৃশ্য। অন্যান্য নানা পরীক্ষায় দেখা গেল, এই নতুন বিকিরণও সাধারণ আলোক বিকিরণের সব নিয়ম-কানুন (যেমন প্রতিফলন, প্রতিসরণ প্রভৃতি) মেনে চলে এবং যে কোন উত্তপ্ত জিনিষ থেকেই এর উদ্ভব হয়। এই রশ্মির নাম দেওয়া হলো অবলোহিত বা ইনফ্রারেড। ল্যাটিনে ইনফ্রা মানে নীচে এবং এক্ষেত্রে হলো লালের নীচে (অদৃশ্য রশ্মি)।

১৯৬১ সালে তিনজন বৃটিশ চিকিৎসা-বিজ্ঞানী একটা গবেষণামূলক প্রবন্ধে লিখলেন যে, বুকে ক্যান্সার হলে সেখানকার তাপমাত্রা শরীরের অন্যান্য তন্তুর (Tissue) তাপমাত্রার চেয়ে কিছু বেশী হয়। এই প্রবন্ধ পড়ে ফিলাডেলফিয়া আইনষ্টাইন চিকিৎসা-কেন্দ্রের রেডিওলজী বিভাগের প্রধান ডক্টর জেকব গের্শন কোহেনের মনে হলো যে, তাপকে ক্যান্সারের নির্দেশক হিসাবে ব্যবহার করা হয়তো সম্ভব হতে পারে। তিনি বিশ্ববিখ্যাত অবলোহিত রশ্মি বিশেষজ্ঞ ডক্টর বাউলিং বার্নেসকে কথাটা জানিয়ে অনুরোধ করলেন—রোগীর শরীরের তাপমাত্রা সম্বল করে অতি সূক্ষ্ম অবলোহিত রশ্মির প্রতিচ্ছবি তোলবার মত কোন ব্যবস্থার উদ্ভাবন করতে। ডক্টর বার্নেস ছয় মাসের মধ্যে তৈরি করলেন অবলোহিত রশ্মির ক্যামেরা, নাম দেওয়া হলো থার্মোগ্রাফ বা তাপলেখ।

১৯৬৭ সালে ডক্টর গের্শন কোহেন যে রিপোর্ট পেশ করলেন, তাতে মোট ৩,৫০০ জন বুকের ক্যান্সারের রোগীর তাপলেখ-এর ৯৫% ক্ষেত্রেই দেখা গেল সুস্থ তন্তুর চেয়ে ক্যান্সার আক্রান্ত তন্তুর তাপমাত্রা অন্ততঃ ১° সেন্টিগ্রেড বেশী। কলাম্বিয়ার প্রেসবিটেরিয়ান চিকিৎসাকেন্দ্রের ডক্টর আর্চেই

উক্ত এই ব্যবস্থার সাহায্যেই আগে থেকেই স্ট্রোক-এর সম্ভাবনা বুঝতে পারেন। কি করে তা সম্ভব হয়? মুখের তাপলেখ বিচার করা যাক। রক্তপ্রবাহ স্বাভাবিক থাকলে দু-পাশের কপালের তাপলেখ একই ধরণের হবার সম্ভাবনা। কারণ রক্তের উত্তাপ সব দিকেই সমান। কিন্তু তা না হয়ে যদি এক দিকে কাল্‌চে, অন্ত দিকে সাদাটে ভাব থাকে, তাহলে বুঝতে হবে, যে মহাধমনী দিয়ে রক্ত মস্তিষ্কে আসছে তার মুখটা আংশিক রুদ্ধ হয়েছে। ফলে সবদিকে সমানভাবে রক্তসঞ্চালন হচ্ছে না। রক্তসঞ্চালন-জনিত তাপেরও তাই পার্থক্য ঘটেছে আর সেটাই ছবিতে ধরা পড়েছে। সুতরাং আগে থেকে সাবধান হওয়া যায়। অবলোহিত রশ্মির ক্যামেরার ভূমিকা চিকিৎসা-বিজ্ঞানে রীতিমত গুরুত্বপূর্ণ।

অবলোহিত রশ্মির ছবির কল্যাণে অতীতের দৃশ্যও দেখা সম্ভব। খুনী খুন করে চটপট লাশ সরিয়ে খুনের সমস্ত চিহ্ন মুছে চম্পট দিল। পুলিশ তদন্তে এসে আপাততঃ কিছুই পেল না। খুন আদৌ হয়েছে কিনা সেটাই তখন সন্দেহের কথা। কিন্তু সে ভুল ভাঙ্গাবে অহলোহিত রশ্মির ক্যামেরা। লাশ সরালেও গায়ের গরমে ঐ জায়গটা গরম—খুব সামান্য হলেও তাপলেখ ফুটে উঠবে।

ঝোপে জঙ্গলে লুকিয়ে থেকে চর্মচক্ষুকে ফাঁকি দিলেও যন্ত্রের চোখকে ফাঁকি দেওয়া সম্ভব নয়। গাছপালা ও কাণ্ডের সঙ্গে মানুষের দেহের তাপের তফাৎ আছে। তাই জঙ্গলে কোথায় কিভাবে কে আছে, কি করছে—সবই ধরা পড়বে অবলোহিত রশ্মির ক্যামেরায়। যুদ্ধের সময় এর উপযোগিতা তো রীতিমত বিস্ময়কর। বহু রকমের মারণাস্ত্রের সঙ্গে জড়িয়ে আছে অবলোহিত রশ্মি।

সতেজ সবুজ গাছপালা থেকে যত পরিমাণ অবলোহিত রশ্মি বের হয়—শুকিয়ে যাওয়া বা রোগগ্রস্ত গাছপালা থেকে তত পরিমাণ হয় না। তাই এই রশ্মি প্রতিফলনের মাত্রা থেকে বোঝা যায় গাছপালা কতটা সবুজ ও সতেজ। তাই অবলোহিত রশ্মির ক্যামেরার ছবি থেকে বোঝা যায় কোন জঙ্গলের বা বাগিচার গাছপালা সুস্থ, সতেজ, না রোগগ্রস্ত। মামুলি পর্যবেক্ষণে যা ধরা পড়ে, এই ছবিতে অনেক আগেই তা ধরা পড়ে। প্রযুক্তিবিদ্যা এবং ধাতুশিল্পে এর উপযোগিতা যথেষ্ট। দুই বা ততোধিক ধাতু মিশিয়ে বিভিন্ন ধরণের সঙ্কর ধাতু তৈরির আগে প্রত্যেকটি ধাতুর তাপমাত্রা আলাদা আলাদা ভাবে পরীক্ষা করা হয়। এই তাপ-মাত্রার একটু হেরফের হলেই সমস্ত সঙ্কর ধাতুটা নিকৃষ্ট পর্যায়ের হয়ে যেতে পারে। যেসব যন্ত্রপাতি সারাক্ষণ উৎপাদনের কাজে প্রযুক্ত, সেগুলির কলকব্জাগুলি ঠিকমত চলছে কি না বা ভবিষ্যতে খারাপ হওয়ার আশঙ্কা আছে কি না—এই সব পূর্বে পরীক্ষার জন্তে অবলোহিত রশ্মির ব্যবহার হয়। সাধারণ ক্যামেরার সঙ্গে কোন মিল নেই এই ক্যামেরার—কারণ এতে ছবি তোলা হয় তাপ থেকে—সাধারণ আলো থেকে নয়। সোজাসুজি ফিল্মের উপর তা নেওয়া হয় না। এই ক্যামেরা অনেকটা টেলিভিশন ক্যামেরার ধরণের। এতে থাকে একটা অবলোহিত রশ্মি-সন্ধানী, সেটির দ্বারা ছোট্ট একটা জায়গা প্রথমে রীতিমত চষে ফেলা হয়—একবারে অবশ্য এক একটা বিন্দুর হিসাবে। এভাবে সারা জায়গাটা তন্ন তন্ন করে (বিন্দু বিন্দু করে) চষে মোট যা অবলোহিত রশ্মি পাওয়া যায়, তাকে আবার বিদ্যুৎ-প্রবাহে রূপান্তরিত করা হয়। সেই বিদ্যুৎ-প্রবাহ আবার সূক্ষ্ম আলোর রশ্মির আকারে সাধারণ ফিল্মের উপর ফেলে পরিপূর্ণ ছবিটা পাওয়া যায়।

অবলোহিত রশ্মির এই সর্বাত্মক উপ-যোগিতা শুধু মাত্র গত আড়াই দশকের গবেষণার

কল। যুদ্ধ বা ধ্বংসের কাজে একে কিভাবে ব্যবহার করা যায়—সেটাই ছিল আসল তাগিদ। তৎসত্ত্বেও কিন্তু—জ্যোতির্বিজ্ঞান, মহাজাগতিক রহস্য উদ্‌ঘাটন, অপরাধ নির্ণয়, উদ্ভিদবিদ্যা, ধাতুশিল্প ও প্রযুক্তিবিদ্যা, ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি, রোগ নির্ণয় এবং রোগের সম্ভাব্যতা বিচার প্রভৃতি আরও নানা ক্ষেত্রে এর বিচিত্র এবং ব্যাপক ব্যবহার সম্ভব হয়েছে।

সূর্য ও পৃথিবীতে তার প্রভাব

সোমদত্তা সিংহ

চার-শ' বছর আগে গ্যালিলিও দূরবীন আবিষ্কার করেন। শক্তিশালী দূরবীনের সাহায্যে দূর আকাশের অনেক রহস্যের সমাধান সম্ভব হয়েছে। পরবর্তীকালে আরও উন্নত ধরণের যন্ত্র আবিষ্কৃত হওয়ায় বহু গ্যালাক্সির কথা জানা গেছে। এই মহাবিশ্বে বহু গ্যালাক্সি আছে। এইসব গ্যালাক্সি অসংখ্য তারা, গ্যাস ও ধূলিকণার সমন্বয়ে গঠিত। আমরা যে গ্যালাক্সিতে বাস করি, তাকে আমরা ছায়াপথ বলি। এর আকৃতি অনেকটা চ্যাপ্টা কুণ্ডলীর মত। আমাদের ছায়াপথের কেন্দ্র থেকে সূর্য ৩৩০০০ আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত এবং সূর্য ও অন্যান্য বহু তারা এই কেন্দ্র পরিক্রমা করে চলছে। আবার সূর্যকে কেন্দ্র করে পৃথিবীসহ নয়টি গ্রহ ঘুরে চলছে। সূর্য আমাদের কাছে সমস্ত শক্তির উৎস বলে পরিচিত—কিন্তু এই অতি বৃহৎ গ্যালাক্সিতে তার প্রভাব কতটুকুই বা। কিন্তু সূর্য নানাভাবে পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহের উপর প্রভাব বিস্তার করে। জ্যোতির্বিদ্‌দের একটি দলের মতানুসারে পৃথিবীর জন্মই হয়েছে সূর্য থেকে—এর স্বপক্ষে বড় একটি যুক্তি হলো এই যে, পৃথিবীতে এযাবৎ প্রাপ্ত অনেকগুলি স্থায়ী ও অপেক্ষাকৃত স্থায়ী মৌল সূর্যের মধ্যে আছে বলে জানা গেছে; যথা—তামা, লোহা, ক্যালসিয়াম, সোডিয়াম, নিকেল, অ্যালুমিনিয়াম, কার্বন, হিলিয়াম প্রভৃতি; তবে সবচেয়ে বেশী আছে হাইড্রোজেন।

সূর্য প্রধানত: যাদের মধ্যস্থতায় পৃথিবীর উপর প্রভাব বিস্তার করে, তাদের মধ্যে প্রথমটি হলো সূর্য থেকে নির্গত তড়িৎ-চৌম্বক তরঙ্গ (Electromagnetic wave)। সূর্য থেকে নির্গত যে সব তড়িৎ-চৌম্বক তরঙ্গ পৃথিবীতে এসে পৌঁছয়, তাদের মধ্যে প্রধান হলো র‍্যান্টগেন (Rantgen) রশ্মি (বা এক্স-রশ্মি), অতিবেগুনী রশ্মি, দৃশ্য আলো, অবলোহিত রশ্মি এবং বেতার-তরঙ্গ। অবলোহিত রশ্মি পৃথিবীতে এসে পড়লে তাপ উৎপন্ন করে এবং আবহাওয়ার পরিবর্তন করে। অতিবেগুনী রশ্মি আবহমণ্ডলের উপরের অংশকে উত্তেজিত করে কতিপয় আয়নিত স্তরের সৃষ্টি করে, যাকে সমগ্রভাবে আয়নমণ্ডল (Ionosphere) বলা হয়। এই আয়নমণ্ডল পৃথিবীর বেতার-বার্তা প্রতিফলনে অনেকটা প্রতিফলকের মত কাজ করে। পৃথিবী থেকে প্রায় ৮০ কিলোমিটার উচ্চে আয়নমণ্ডলের আরম্ভ। যখন সূর্য শান্ত অবস্থায় থাকে, তখন তা থেকে খুবই কম এক্স-রশ্মি নির্গত হয়। কিন্তু সূর্য যখন বিক্ষুব্ধ অবস্থায় থাকে, তখন সূর্যের গায়ে সৌরকলঙ্ক দেখা যায় এবং এক্স-রশ্মির বিকিরণ প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। এই সময় অতিবেগুনী ও এক্স-রশ্মির প্রভাবে আয়নমণ্ডলের

অবস্থা কিছুক্ষণের জন্যে পরিবর্তিত হয়। এই সব বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের তরঙ্গ অনুশীলন করে সূর্য সম্বন্ধে অনেক কিছু জানা যায়।

তড়িৎ-চৌম্বক তরঙ্গ ছাড়াও সূর্য থেকে বিভিন্ন শক্তির যেসব বস্তুকণা নির্গত হয়, তাদের প্রভাবে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে নানান ধরণের অদ্ভুত সব ঘটনা ঘটতে দেখা যায়। সূর্য থেকে প্রধানতঃ ইলেকট্রন, প্রোটন, আলফাকণা (হিলিয়াম-কেন্দ্রক) প্রভৃতি নির্গত হয়।

পূর্বেই সৌরকলঙ্কের কথা বলা হয়েছে। সূর্যের গায়ে স্থানে স্থানে ছোট-বড় নানা আকারের কৃষ্ণবর্ণের দাগ দেখা যায়—এদেরই সৌরকলঙ্ক বলা হয়। সৌরকলঙ্কে চৌম্বক বল অত্যন্ত বেশী। সূর্যের আভ্যন্তরীণ তাপে গ্যাস আয়নিত অবস্থায় থাকে এবং এই আয়নিত গ্যাস সৌরকলঙ্কের প্রচণ্ড চৌম্বক বলের প্রভাবে ভিতর থেকে বাইরে আসবার সময়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। ফলে আভ্যন্তরীণ তাপের পরিচলন (Convection) খুবই কমে যায়। এই কারণে যেসব স্থানে সৌরকলঙ্ক দেখা যায়, সেখানকার তাপমাত্রা অনেক কম। তাপমাত্রা কম হওয়ায় এই স্থানগুলি কালো দেখায়। বড় বড় সৌরকলঙ্কগুলির নিকটবর্তী কোনও কোনও স্থান হঠাৎ কখনো কখনো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। এইসব সহসা-সমুজ্জ্বল আলো-কে সৌরদীপ্তি বা ঝলক (Solar flare) বলা যেতে পারে। সৌরদীপ্তির সময়ে এইসব প্রজ্বলিত স্থানে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ হয় এবং এই স্থানগুলি থেকেই প্রবল কণাস্রোত—বিশেষত ইলেকট্রন ও প্রোটন প্রবাহিত হতে দেখা যায়। একে সৌরকণা রশ্মি বলা হয়। এই কণাপ্রবাহের গতিবেগ সময় সময় আলোর গতিবেগের কাছাকাছি হয়। এই দ্রুতগতিসম্পন্ন ইলেকট্রনগুলিই অনেক ক্ষেত্রে বেতার ঝলক (Radio-burst) উৎপন্ন করে। যে প্রোটনগুলি নির্গত হয়, তা অনেক সময় আন্তর্গ্রহমণ্ডলে ছড়িয়ে পড়ে। মহাকাশ যাত্রার পথে এগুলি যথেষ্ট অসুবিধার সৃষ্টি করে। এই সমস্ত কণা ক্রমে পৃথিবীতে এসে পৌঁছয়। এরা পৃথিবীর উপর কি প্রভাব বিস্তার করে, তা জানতে হলে প্রথমে পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্র সম্বন্ধে কিছু জানা দরকার। আমরা জানি যে, পৃথিবীর চৌম্বক বলরেখাগুলি দক্ষিণমেরু থেকে নির্গত হয়ে ঘুরে উত্তর মেরুতে প্রবেশ করে। মেরুপ্রদেশে যেখানে বলরেখাগুলি সোজা মহাকাশ থেকে এসে প্রবেশ করে, সেখানে সূর্য থেকে আগত দ্রুতগতিসম্পন্ন কণাগুলির বলরেখার সঙ্গে সঙ্গে প্রবেশ করবার সুবিধা হয়। তাই মেরুপ্রদেশে যেসব কণা প্রবেশ করে, সেগুলি আয়নমণ্ডলকে খুবই প্রভাবিত করে। যখন সূর্য অত্যন্ত বেশী সক্রিয় থাকে, অর্থাৎ যখন সূর্য থেকে অতিমাত্রায় রশ্মি ও কণার বিকিরণ হয় তখন আয়নমণ্ডলে অত্যন্ত বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। এর ফলে পৃথিবীর বেতার যোগাযোগ হয় অচল হয়ে যায়, না হয় বেশ কিছু সময় ধরে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। সৌরদীপ্তির সময়কার এই কণা-বিকিরণ ছাড়াও সব সময়ই সূর্য থেকে আর এক প্রকার কণার নির্গমন হয়। এটি হলো অপেক্ষাকৃত কম শক্তির এবং মন্দগতিসম্পন্ন কণা। এই কণা-বিকিরণের জন্যেই চৌম্বক ঝড়, বিকিরণ-বলয়, ধূমকেতুর পুচ্ছের সৃষ্টি, মেরুজ্যোতি প্রভৃতি দেখা যায়।

বহুদিন থেকে দেখা গেছে যে, কম্পাসের কাঁটা মাঝে মাঝে তার স্বাভাবিক অবস্থান (উত্তর-দক্ষিণ) থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়। কিন্তু তখন এই সম্বন্ধে কিছুই জানা ছিল না। অনেক বছর পরে বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেন যে, মেরুজ্যোতি যখন বেশী হয়, তখনই পৃথিবীর চৌম্বক বলের পরিবর্তন দেখা যায়। সূর্যই যে এইসব ঘটনার উৎস, তা অনেকে অনুমান করতে পারলেও যে কণাস্রোত এই ঘটনার জন্যে প্রত্যক্ষভাবে দায়ী, তা বহুদিন পর্যন্ত রহস্যাবৃত ছিল। ধূমকেতুর পুচ্ছের সৃষ্টি এই এই রহস্যের মীমাংসা করতে সাহায্য করে। দেখা গেছে যে, ধূমকেতুর গ্যাসীয় পুচ্ছটি সর্বদা সূর্যের

বিপরীত দিকে থাকে। এর থেকে সিদ্ধান্ত করা হলো যে, সূর্য থেকে নির্গত ধাবমান কণাস্রোতই এর জন্যে দায়ী। বস্তুতঃ দেখা গেছে যে, ধূমকেতুর পুচ্ছের এই রকম ব্যবহার সব সময়ই হয়; অর্থাৎ কণা-বিকিরণ সূর্যের একটি সাধারণ ঘটনা। সূর্য থেকে কেন কণাস্রোত চারদিকে ধাবমান, তা জানতে হলে আমাদের সূর্যের অভ্যন্তরের কথা একটু জানতে হবে।

সূর্য একটি মধ্যম আকারের নক্ষত্র এবং এটির রঙ হলুদ। এই রঙের তারাগুলি মাঝামাঝি তাপমাত্রার হয়। সূর্যের কেন্দ্রটি অত্যন্ত গরম এবং খুব ঘন। অভ্যন্তরের তাপমাত্রা প্রায় দেড় কোটি ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও ঘনত্ব জলের ঘনত্বের প্রায় এক শত গুণ। সূর্যের উচ্চ তাপমাত্রা ও চাপের জন্যে তা পদার্থের চতুর্থ অবস্থা বা Plasma-অবস্থায় রয়েছে। অর্থাৎ সূর্যের অভ্যন্তরের অণু-পরমাণুগুলি আয়নিত অবস্থায় রয়েছে। সূর্যকে বলা হয় সমস্ত শক্তির উৎস এবং এই শক্তি তাকে তার কেন্দ্রই প্রদান করে। সূর্যের অভ্যন্তরের এই প্রচণ্ড তাপমাত্রার জন্যে সেখানে ক্রমাগত পারমাণবিক প্রক্রিয়ায় অফুরন্ত শক্তি নির্গত হয়। সূর্যের কেন্দ্রে ক্রমাগত হাইড্রোজেন হিলিয়ামে রূপান্তরিত হওয়ায় প্রচণ্ড শক্তির উদ্ভব হয়। এই ধরণের পারমাণবিক প্রক্রিয়াকে ইংরেজিতে fusion বলে। হাইড্রোজেন বোমাতে এইভাবে শক্তি উদ্ভবের ব্যবস্থা করা হয়। সূর্যের অভ্যন্তরের এই শক্তি ক্রমাগত সূর্যের বাইরের অংশের দিকে বিকিরিত হয়। সূর্যের বহিরাবহমণ্ডল ফুটন্ত জলের মত সময় সময় বিক্ষুব্ধ অবস্থায় থাকে। এই আবহমণ্ডল মহাকাশে বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে। এই ছটামুকুট (Corona) এক কোটি কিলোমিটার পর্যন্ত দেখা যায়। সূর্যের দৃশ্য অংশটি অত্যন্ত উত্তেজিত হওয়ার ফলে তার থেকে যেসব শব্দ-তরঙ্গ বা মহাকর্ষজনিত তরঙ্গ নির্গত হয়, তা সূর্যের আবহমণ্ডলের এক অংশকে অত্যন্ত গরম করে দেয়। এই উত্তাপ সূর্যের ছটামুকুট তৈরি করতে সাহায্য করে। সূর্যের পূর্ণগ্রহণের সময় যখন চাঁদ সূর্যকে সম্পূর্ণ ঢেকে ফেলে, তখন সূর্যের এই ছটামুকুট খুব ভালভাবে দেখা যায়। সূর্যের এই উচ্চ তাপমাত্রাসম্পন্ন বহিরাবহমণ্ডলই অবিরাম কণাবর্ষণের জন্যে দায়ী।

সূর্যের আবহমণ্ডলের মত এত উত্তপ্ত কোন পরিমণ্ডলে কোন স্থিরতা বা সাম্য থাকা সম্ভব নয় এবং মহাকাশে তা নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রসারিত হতে থাকে। সূর্যের বহির্মণ্ডলে সূর্য থেকে অবিরাম এই প্রবাহের গতিবেগ প্রতি সেকেণ্ডে ৩০০-৪০০ কিলোমিটার হয় এবং এই প্রবাহ ২-৫ দিনের মধ্যে পৃথিবীতে এসে পৌঁছয়। একেই সৌরপ্রবাহ (Solar wind) বলে। এই সৌরপ্রবাহ পূর্ববর্ণিত কণাগুলির দ্বারা গঠিত। পৃথিবীর চারদিকে, বিশেষতঃ পৃথিবীর চৌম্বক-ক্ষেত্রের বহির্সীমার উপর এই প্রবাহের ফলে চৌম্বক ঝড় ও মেরুজ্যোতির মত ঘটনার সৃষ্টি হয়।

পৃথিবীর যে চৌম্বক ক্ষেত্র আছে, তা সূর্যের দিকে প্রায় ৬৪,০০০—৭০,০০০ কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত এবং এই ক্ষেত্রই পৃথিবীকে সূর্যের থেকে আগত ঐ সব দ্রুতগতিসম্পন্ন কণার হাত থেকে রক্ষা করে। সৌরপ্রবাহ যদি না হতো, তাহলে পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্র মহাকাশে আরও বেশী দূর পর্যন্ত বিস্তৃত হতো। এই সৌরপ্রবাহের জন্যেই চৌম্বক বলরেখাগুলি পৃথিবীর চারপাশে একটি বিশেষ সীমার মধ্যে সঙ্কুচিত থাকে। 'এই সীমার ভিতরকার স্থানকে চৌম্বকমণ্ডল (Magnetosphere) বলা হয়। চৌম্বকমণ্ডলের উপর দিয়ে সৌরপ্রবাহ বয়ে গেলে পৃথিবীর চৌম্বক সক্রিয়তা বেড়ে যায়। চৌম্বক সক্রিয়তা বলতে সাধারণতঃ বিক্ষেপ এবং চৌম্বক ক্ষেত্রের পরিবর্তনশীলতা বোঝায়। যখন সূর্য থেকে প্রবল প্রবাহ আসে এবং চৌম্বক ক্ষেত্রকে

তার স্বাভাবিক অবস্থান থেকে পৃথিবীর আরও কাছে সঙ্কুচিত করে দেয়, তখনই চৌম্বক ঝড় আরম্ভ হয়। এর ফলে পৃথিবীর কাছে চৌম্বক ক্ষেত্রের কিছু বৃদ্ধি দেখা যায়। অল্প পরে ঝড় যখন তার স্বাভাবিক পথে কিছু দূর অগ্রসর হয়ে যায়, তখন সৌরপ্রবাহের অত্যন্তরস্থ গ্যাস চৌম্বক ক্ষেত্রের মধ্যে নানা রকম ক্রিয়ার ফলে ক্ষেত্রটিকে মহাকাশের দিকে প্রসারিত করতে চায়। ঝড় যে ভাবে আরম্ভ হয়, এটি তার সম্পূর্ণ বিপরীত ধরণের ব্যাপার। এই ধরণের অবস্থা কয়েক ঘন্টা থেকে কয়েক দিন পর্যন্ত চলতে পারে। এইভাবেই চৌম্বক ঝড়ের সৃষ্টি হয় এবং এই সময় চৌম্বক ক্ষেত্রের এমন বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি হয় যে, তার দরুণ চৌম্বক-শলাকা তার স্বাভাবিক অবস্থান থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়। সৌরপ্রবাহের ফলে চৌম্বক ক্ষেত্রের সঙ্কোচন ও প্রসারণ হবার সঙ্গে সঙ্গে কণাগুলির গতিপথ আপাতভাবে চৌম্বক বলরেখার মধ্যে বিকৃত হয়। তাছাড়া সৌরপ্রবাহ-জনিত চাপের ফলে যখন চৌম্বক ক্ষেত্রটি ধীরে ধীরে সঙ্কালিত হয়, তখন ঐ সব কণা ক্ষেত্রের আরও গভীরে প্রবেশ করে। কণাগুলির গতিবেগ নানা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে ত্বরান্বিত হয় এবং সঙ্কালিত চৌম্বক ক্ষেত্রের সঙ্গে সঙ্গে যাবার সময় তারা পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের সঙ্গে ধাক্কা খায়। এই এই কারণেই আপাতভাবে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে উজ্জ্বল আলোর খেলা বা মেরুজ্যোতি দেখা দেয়। এই জ্যোতি শুধুমাত্র মেরুপ্রদেশেই দেখা যায়, কারণ পৃথিবীর চৌম্বক বলরেখাগুলি ঐ স্থানে লম্বভাবে মহাকাশ থেকে প্রবেশ করে এবং আয়নিত কণার পক্ষে ঐ স্থান দিয়ে বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করবার সুবিধা হয়। এই জন্যেই যখনই চৌম্বক ঝড় দেখা যায়, তখনই মেরুজ্যোতিও বেশী দেখা যায়। যদিও মেরুজ্যোতি সৃষ্টির মধ্যে অনেক জটিলতা আছে, তবু এটিই সম্ভবতঃ তার সৃষ্টির মূল কথা। সৌরদীপ্তির সময়ে যে দ্রুতগতি-সম্পন্ন কণার নির্গমন হয়, তার দ্বারা অল্প কিছু বিকিরণ সৃষ্টি হলেও মেরুজ্যোতির মত উজ্জ্বল ব্যাপার তার দ্বারা সৃষ্টি হয় না। এগুলি অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ শক্তির ও মন্থর গতি-কণার খেলার ফলেই সৃষ্টি হয়।

সূর্য পৃথিবীর অবহাওয়ার উপরও বেশ প্রভাব বিস্তার করে। এই প্রভাব পরিষ্কার বোঝা না গেলেও দেখা গেছে যে, সূর্য যখন সক্রিয়, তখনকার আবহাওয়া এবং সূর্য শান্ত থাকাকালীন আবহাওয়া এক হয় না। বায়ুপ্রবাহেরও নানা রকম পরিবর্তন এই সময় দেখা যায়। পৃথিবীতে বিভিন্ন সময়ে যে জলবায়ুর পরিবর্তন হয়েছে, অর্থাৎ কখনো হিমযুগ এবং কখনো উষ্ণ জলবায়ু ফিরে এসেছে—তার জন্যে সূর্যকে কিছু পরিমাণে দায়ী করা চলে, যদিও এর কারণ এখনও পরিষ্কার জানা যায় নি। অনেকে বলেন যে, মেরুজ্যোতির সময়ে যে সব আয়নের সৃষ্টি হয়, সেগুলি বৃষ্টিকণা সৃষ্টিতে সাহায্য করে। গাছপালা খাদ্য তৈরির সময়ে সৌরশক্তি সঞ্চয় করে। একে আলোকসংশ্লেষণ-ক্রিয়া (Photosynthesis) বলে। প্রাণীরা এই সব ফল খেলে এই সৌরশক্তির অধিকাংশই রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে তাপে রূপান্তরিত হয়। কাঠ পোড়ালে তার মধ্যে সঞ্চিত সৌরশক্তি রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় নির্গত হয়। কয়লা, তেল প্রভৃতি সবই সঞ্চিত সৌরশক্তি। বর্তমানে সৌরশক্তিকে অবতল দর্পণ প্রভৃতি দিয়ে একত্র করে প্রচণ্ড শক্তিসম্পন্ন চুল্লী তৈরি করা হচ্ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই ধরণের একটি চুল্লী তৈরি করা হয়েছে। সৌর-শক্তিকে সরাসরি বিদ্যুৎ-শক্তিতে রূপান্তরিত করা যায়। সিলিকন-ক্রিষ্ট্যাল যদি সূর্যালোকে উন্মুক্ত করে রাখা হয়, তবে তাতে যথেষ্ট বিদ্যুৎশক্তির উদ্ভব হয়। ছোট ছোট বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি পরিচালনায় এই ধরণের

তড়িৎ-কোষ যথেষ্ট সাহায্য করে। সৌরকোষের এই একটি ব্যাটারি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি স্থানে টেলিফোন লাইনে শক্তি সরবরাহ করে। মহাকাশযানের বেতার প্রেরক ও গ্রাহক-যন্ত্র এবং দূরেক্ষণ যন্ত্র প্রভৃতি চালাবার জন্যে সৌর-কোষ ব্যবহৃত হয়। এই কোষের সুবিধা এই যে, একে নতুন করে তড়িৎসম্পন্ন করবার প্রয়োজন হয় না। যে সব কৃত্রিম উপগ্রহ দূরেক্ষণ প্রভৃতির কাজে সহায়তা করে, সেগুলিতেও সৌরকোষ ব্যবহৃত হয়। এইভাবে পৃথিবীতে তার প্রভাব বিস্তার করে।

বর্তমান যুগে মানুষের মহাকাশ সম্বন্ধে গবেষণার ফলে সূর্যের কণা ও তরঙ্গ বিকিরণ প্রভৃতি নানা বিষয়ে জানবার সুবিধা হয়েছে। দশ বছর আগেও যা ছিল আমাদের কাছে অস্পষ্ট, আজ তা অনেকটা পরিষ্কার হয়েছে। যেদিন থেকে মানুষ পৃথিবীর আবহমণ্ডলকে ছাড়িয়ে উঠতে পেরেছে, তখন থেকেই সে সূর্য সম্বন্ধে নানা কথা জানতে পেরেছে। যদিও অনেক কিছুই এখনও জানা যায় নি, তবে আশা করা যায় যে, সূর্য একদিন তার অনেক রহস্যই আমাদের কাছে উদ্‌ঘাটিত করবে এবং তার সমাধানও সম্ভব হবে।

তোৎলামি

হেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

কত জাতির কত ভাষা, কত মানুষের কত রকম কথা বলবার ভঙ্গী। শিশু থেকে বৃদ্ধ অবধি সকলেই অনর্গল কথা বলে যাচ্ছে। কথা বলতে পারাটা এতই সহজ, এতই অনায়াস-সাধ্য যে, এর মধ্যে আমাদের যে ব্যক্তিগত কৃতিত্ব আছে, তা মনে করবার অবকাশই পাই না।

এত সহজ যে কাজটা, তা যদি আবার কারো পক্ষে কষ্টসাধ্য হতে দেখা যায়, তাহলে সেটা আমাদের কাছে বড়ই অস্বাভাবিক মনে হয় মাঝে মাঝে আমরা এমন শিশু বা ব্যক্তির সাক্ষাৎ পাই, যাদের বাক্‌স্রোতে মুহুর্মুহু বিরতি ঘটে এবং বাক্‌স্ফুরণ তাদের কাছে কষ্টসাধ্য বলে প্রতিভাত হয়। এদের আমরা বলি বাধিতবাক্ বা চলতি কথায় তোৎলা।

কথা বলবার সময় তোৎলা ব্যক্তিদের যে পরিশ্রম ও অস্বাধা ভোগ করতে দেখা যায়, তা স্বভাবতই সহানুভূতির কারণ হয়ে ওঠে আবার কোন কোন সময় তোৎলা ব্যক্তিকে হাসির পাত্র হতে হয়। এটা যে তাদের কাছে কতটা মর্মান্তিক, তা বলা বাহুল্য।

যদি মনের ভাব প্রকাশ করতে বারে বারে বাধার সৃষ্টি হয় এবং ইচ্ছামত মনের ভাব নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রকাশ না করতে পারা যায়, সেটা যে ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে একটা বিষম অক্ষমতা, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। জ্ঞান ও নৈপুণ্য থাকা সত্ত্বেও তোৎলা ব্যক্তিকে সর্বদা মনোকষ্টে থাকতে হয়। এই দুরতিক্রম্য অক্ষমতার জন্যে তার মনে একটা হীনমন্যতার ভাব থাকে। লোকসমাজে নিজেকে প্রকাশ করতে কুণ্ঠা ও ভয় হয়। তোৎলা ব্যক্তির সারা জীবনটাই সমস্যাসঙ্কুল হয়ে ওঠে।

বিনা আয়াসে অনর্গল এবং ইচ্ছামত কথা বলতে পারাটাই যদি স্বাভাবিক হয়, তাহলে মাঝে

মাঝে এর ব্যতিক্রম হয় কেন? কথা বলবার সময় যে সব শারীরযন্ত্রের প্রয়োজন, সেগুলির অক্ষমতা বা অসামঞ্জস্যের জন্যেই কি তোৎলামির উদ্ভব হয়?

অধিকাংশ তোৎলা ব্যক্তির বাক্য সুরুতেই অথবা কোন শব্দের প্রথম বর্ণটি উচ্চারণ করতেই প্রধান অসুবিধা। একবার সেই বর্ণটি পার হয়ে গেলে পুরো বাক্যটি বলে যেতে আর কোন বিরতি নাও ঘটতে পারে। এমনকি ঐ বিশেষ বর্ণটি যদি বাক্যের মাঝে বা শেষে থাকে, তাহলেও অধিকাংশ সময় সে বর্ণটি বিনা বাধায় উচ্চারিত হয়ে যায়। এমন তোৎলা ব্যক্তি আছে, যে সাধারণ কথাবার্তার সময় তোৎলামি করে অথচ বিনা বিরতিতে সহজভাবে একটি সম্পূর্ণ গান গাইতে পারে। এমনকি, কোন কোন তোৎলা ব্যক্তি রঙ্গমঞ্চে সহজভাবে অভিনয়ও করতে পারে। তোৎলা ব্যক্তিকে কোন বই থেকে পড়ে শোনাতে বললে প্রাঞ্জলভাবে পড়ে শোনাতে পারবে। তোৎলা ব্যক্তিদের কথার প্রতিবন্ধকতার হ্রাস-বৃদ্ধি সময় বিশেষ এবং পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করে।

উপরিউক্ত উদাহরণগুলিতে দেখা যাচ্ছে, একই রকম বাক্যবিরতি একই নিয়মে বার বার হচ্ছে না এবং ঐ বাক্য বিরতিগুলি এক পরিস্থিতিতে প্রকট হয়ে উঠেছে আবার আর এক পরিস্থিতিতে সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হচ্ছে। সুতরাং বাক্‌যন্ত্রের আঙ্গিক ত্রুটির (Organic defect) জন্যে তোৎলামি হওয়া সম্ভব নয়। বরং পারিপার্শ্বিক পরিবেশের প্রভাবেই বক্তার তোৎলামির হ্রাস-বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হচ্ছে। এথেকে অনুমান করা যুক্তিসঙ্গত যে, তোৎলামি মানসিক ব্যাধিস্বরূপ (Psychic)। তোৎলামি যে মানসিক, সে বিষয়ে আরো বিশদভাবে পর্যালোচনা করবার পূর্বে আমরা কেমন করে কথা বলি, সে বিষয়ে একটু আলোচনা করা যাক।

গ্রামোফোন রেকর্ডে পিন বসিয়ে ঘুরিয়ে দিলেই গান শোনবার আনন্দ লাভ করা যায়। কিন্তু ঘূর্ণায়মান রেকর্ডের উপর পিনের দ্বারা গায়কের কণ্ঠস্বর কেমন করে শোনা যায়, তা আমরা ভাববার অবকাশ পাই না। গ্রামোফোন যন্ত্রের অভ্যন্তরে অনেক সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি থাকে এবং সেই সব যন্ত্রের পরিকল্পনা, সুষ্ঠু সংস্থাপনার ব্যবস্থা দেখলে যেমন আশ্চর্যান্বিত হতে হয়, তেমনি সহজভাবে আমরা যে কত কথা বলে যাই, সেই কথাগুলি স্ফুরিত হতে যে কত বিভিন্ন শারীরযন্ত্রাদি (Organs) কাজ করে, তা জানলে আরও বিস্মিত হতে হবে।

স্বরের উৎপত্তি—স্বর সৃষ্টি করবার দুটি প্রধান অংশ আছে। একটি হলো ভাবপ্রকাশের পরিকল্পনা, যার স্থান হলো মস্তিষ্কে এবং অপর অংশ হলো সেটিকে বাস্তবে রূপান্তরিত করা, যা সংসাধিত হয় কয়েকটি শারীরযন্ত্রের দ্বারা, যথা—(ক) ফুস্‌ফুস, (খ) স্বরযন্ত্র (Larynx), (গ) গলনালী, জিহ্বা, অধরোষ্ঠ, মুখ ও নাসিকাগহ্বর।

ফুস্‌ফুস থেকে আসে প্রয়োজনীয় বায়ুর চাপ (হারমোনিয়ামের বেলোর মত)। ফুস্‌ফুস থেকে আগত বায়ু শ্বাসনালী দিয়ে 'স্বরযন্ত্রের পর্দাদ্বয়ে (Larynx-এর vocal cord) কম্পনের দ্বারা শব্দ-তরঙ্গ সৃষ্টি করে। ঐ শব্দ-তরঙ্গের নির্দিষ্ট স্বর নিয়ন্ত্রিত হয় মুখ, জিভ ও নাসিকাগহ্বরের দ্বারা। এই শারীরযন্ত্রগুলি পরিচালিত করবার জন্যে অগণিত ক্ষুদ্র ও বৃহৎ মাংসপেশী কার্যকরী হয় এবং এই পেশীগুলিকে সুসংবদ্ধভাবে পরিচালনার পশ্চাতে রয়েছে কোটি কোটি স্নায়ুর শাখা-প্রশাখা, অসংখ্য স্নায়ু ও পেশীর মধ্যে অনুভূতির আদান-প্রদান। এই যোগাযোগের ব্যতিক্রম ঘটলেই বাচনের অসুবিধা হবে।

যেমন জিহ্বার পেশী চালনা ব্যাহত হলে উচ্চারণের প্রভূত তফাৎ হয়ে যেতে পারে।

এই ব্যাপক স্নায়ুপেশীর সুসংবদ্ধ এবং সুনিয়ন্ত্রিত পরিচালনা ও যোগাযোগের সর্বময় কর্তা হচ্ছে গুরুমস্তিষ্ক (Cerebrum)। শুধু পেশী চালনায় কর্তৃত্ব নয়, এখানেই রয়েছে ব্যক্তি-বিশেষের চিন্তাধারা, কল্পনাশক্তি, অধীত বিদ্যার সংরক্ষণ এবং অভিজ্ঞতা, যার বলে আমরা মনের ভাব প্রকৃষ্টভাবে অর্থপূর্ণ বাক্যের দ্বারা প্রকাশ করতে পারি। এছাড়া রয়েছে ব্যক্তি বিশেষের ভাবপ্রবণতা এবং উদ্দীপকের প্রতি প্রতিক্রিয়ার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অভিব্যক্তি। এই ভাব-প্রবণতা আবার স্নায়ু পেশী গ্রন্থিগুলির উপর প্রচণ্ডভাবে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে এবং স্মৃতির পুনরুদ্রেক ক্ষমতাকে ব্যাহত করতে পারে। দেখা যাচ্ছে, শব্দাবলী বা বাক্য উচ্চারিত হতে আমাদের অজ্ঞাতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে কত শারীর-যন্ত্র কাজ করে যাচ্ছে, তা আমরা অনুভব করতে পারি না। সুতরাং এই জটিল ও সুবিস্তৃত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্রে সময়বিশেষে সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটা খুব অস্বাভাবিক নয়।

বহু মানুষই বাক্যেরদ্বারা মনের ভাব প্রকাশ কর-বার সময় অল্পস্বল্প বিরতি দেন বা শারীরিক ভঙ্গী করে (মাথা চুল্‌কে, হাত-পা ঈষৎ আন্দোলিত করে) স্মৃতিকে উত্তেজিত করতে চেষ্টা করেন। এগুলি এক প্রকার প্রতিবন্ধকতা বা বাক্‌স্রোতে বিরতিই বটে। কোন কোন সময়ে ব্যক্তি বা জায়গা বিশেষের নাম মনে করতে বেশ সময় লাগে। আবার কখন কখন মনের বিশেষ একটি ভাব সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ করবার সময় শব্দ নির্বাচনের জন্যে বারবার বাক্‌স্রোতে বিরতি ঘটতে দেখা যায়। এই প্রতিবন্ধকতাগুলি সাময়িক। এগুলি এত সামান্য বা ক্ষণস্থায়ী যে, অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। যদিও এগুলি এক ধরণের প্রতিবন্ধকতা, তবুও এগুলি প্রায় স্বাভাবিক দোষ-ত্রুটির পর্যায়ে পড়ে এবং এগুলির উপর কোন গুরুত্ব আরোপ করা হয় না।

যদি কোন ব্যক্তির বাক্‌স্রোতে প্রায়ই এবং নিশ্চিতরূপে বাধা বা বিরতি ঘটতে দেখা যায়, তাকেই আমরা বলি তোৎলা।

তোৎলামির উৎপত্তিগত কারণ—আমরা জেনেছি যে, মনের ভাব বাক্যের দ্বারা প্রকাশ করতে মস্তিষ্ক, স্নায়ুতন্ত্র এবং পেশীতন্ত্রের বিস্তৃত অংশের পারস্পরিক সংযোজনের এমন সূক্ষ্ম সামঞ্জস্যের প্রয়োজন হয় যে, বাক্‌স্রোতে ঈষৎ ত্রুটি বা বিরতি ঘটা আদৌ অস্বাভাবিক নয়। ঐ স্বাভাবিক ত্রুটিগুলি কখনো কখনো ব্যক্তিবিশেষের কাছে অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে অনুমিত হয়। প্রাথমিক অবস্থায় অপরের সমক্ষে কিছু প্রকাশ করতে গিয়ে নিজে নিজেই কিছু ত্রুটি বা প্রকাশের অস্বাভাবিকতার বিষয়ে সচেতন হয়। এই সামান্য ত্রুটি বা অক্ষমতা তার মনকে ভারাক্রান্ত করে রাখে এবং এই উদ্বেগের জন্যে ভবিষ্যতে বাক্‌স্ফূর্তির বাধাগুলি মনের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। এই অস্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ার জন্যে মনে একটি ভীতিপ্রবণতার উদ্ভব হয়। এইভাবে সামান্য অক্ষমতা ক্রমশঃ প্রকৃত তোৎলামিতে পর্যবসিত হয়ে যায়। আপন চেষ্টায় এর থেকে অব্যাহতি পাওয়া অসম্ভব বললেও অত্যুক্তি হবে না।

তোৎলামির সুরু—তোৎলামির দোষ অল্প বয়সেই সুরু হয়। সাধারণতঃ আড়াই থেকে চার বছরের মধ্যেই তোৎলামির সূত্রপাত হয়। যদিও চার বছরের উপর তোৎলামি সুরু হওয়া খুব অস্বাভাবিক নয়।

তোৎলামির সহায়ক কারণ:—

(ক) শিশুকালে ভাবধারায় সমন্বয় ও মানসিক অবস্থার সামঞ্জস্য পিতামাতার ব্যবহারের দ্বারাই সংশোধিত হয়। কিছু অভিভাবক আছেন, যাঁরা সন্তানের ব্যবহার বা কার্যাবলীর বিষয়ে অত্যধিক সচেতন। সন্তানদের কাজে বা কর্তব্যে কিছুমাত্র

ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখলে তৎক্ষণাৎ কঠোরভাবে শাসন করে থাকেন। সামান্ত ত্রুটি নিয়ে অত্যধিক শাসন করাতে শিশুও সে বিষয়ে অত্যধিক সচেতন হয়ে পড়ে। এটা তোৎলামির ত্রুটি স্থায়ী হয়ে যাওয়ার সহায়ক।

(খ) শিশুরা সাধারণতঃ অনুকরণপ্রিয়। অপর তোৎলাদের সংস্পর্শে এলে শিশুরা সহজাতভাবে তাদের অনুকরণ করে। ঐ পারিপার্শ্বিক অবস্থা অব্যাহত থাকলে অনুকরণজাত তোৎলামি স্থায়ী হওয়ার সম্ভাবনা।

(গ) কঠিন পীড়ায় দুর্বল শিশুর কণ্ঠস্বর ক্ষীণ এবং কথা বলবার ভঙ্গী অস্বাভাবিক হয়ে পড়ে। ঐ অবস্থা বেশী দিন চলতে থাকলে তার কথার জড়তা স্থায়ী হয়ে যেতে পারে।

(ঘ) পিতামাতার তোৎলামি থাকলে সন্তানের তোৎলা হবার সম্ভাবনা থাকে। এটা শুধু অনুকরণের জন্তে নয়। ভুক্তভোগী পিতামাতার সন্তানদের প্রতি সতর্ক ও কঠোর শাসনের কুফলও বটে।

(ঙ) কোন কোন শিশুর উচ্চারণ কিছু বিকৃত থাকে। যেমন আধো আধো কথা বলা বা ক বর্গের বর্ণগুলিকে ট বর্গের মত উচ্চারণ করা প্রভৃতি। এইসব ত্রুটির জন্তে অপরের কাছে হাস্তাস্পদ অথবা বিরূপ সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়। ভীতিপ্রবণতাহেতু অবশেষে তোৎলামির উদ্ভব হতে পারে।

(চ) অপ্রীতিকর পরিবেশ। আজকাল শিশুদের ইংরেজীর মাধ্যমে পড়াবার রেওয়াজ অধিকতর দেখা যায়। সব শিশুর পক্ষে সম্পূর্ণ বিপরীত ভাষা-ভাষীদের মধ্যে নিজেকে সত্বর সচল করে নেওয়া সম্ভব হয় না। শিশুর অপরিণত মনে এই অসুবিধার প্রভাব গভীরভাবে রেখাপাত করে। স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশে বিঘ্ন ঘটায় শিশুর মনে হীনমন্যতা জাগে, যার ফলে ভবিষ্যতে বাক্‌বিরতি ঘটে।

পাশ্চাত্যের নানা দেশের সংগৃহীত পরিসংখ্যানে জানা যায়, প্রতি হাজারে ৮ থেকে ১০ জন তোৎলা। এই পরিসংখ্যান অবশ্য সভ্য জনসংখ্যার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আমাদের দেশে এর কোন পরিসংখ্যান আছে বলে জানা নেই। আপাততঃ উপরিউক্ত অনুপাত মেনে নিলে অনুমিত হয় যে, আমাদের দেশে প্রায় ৩৮ লক্ষ তোৎলা থাকা সম্ভব।

তোৎলামিকে একটা সহজাত বা জন্মগত অক্ষমতা বিবেচনা করে সহজভাবে মেনে নেওয়া হয়। কিন্তু এটিকে একটি মানসিক রোগ বলে অভিহিত করা উচিত। তোৎলামির কারণগুলি পর্যালোচনা করে যেমন একদিকে শিশুদের তোৎলা হওয়া থেকে রক্ষা করবার চেষ্টা করা দরকার, অপর দিকে এটিকে অন্যান্ত রোগের মত মনোবিদ্‌দের সাহায্যে চিকিৎসা করানো উচিত।

মাতৃভাষায় বিজ্ঞান-শিক্ষা ও পরিভাষা

জ্ঞানেন্দ্রলাল ভাদুড়ী

শিক্ষার উদ্দেশ্য কি? এ প্রশ্ন চিরন্তন। অনেক সংজ্ঞা বা নিরুক্তি দিয়ে জ্ঞানী-গুণীরা বহু আলোচনা করেছেন। তবু দেখা যায় যে, আমরা কোন এক স্থির বা চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারিনি। কারণ, মনে হয় যে, পরিবর্তনশীল জগতে শেষ সিদ্ধান্ত বলে কিছু নেই। নূতন আবিষ্কৃত তথ্য বা সিদ্ধান্ত যুক্ত হয়ে পুরাতন সত্যকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। নূতন সিদ্ধান্ত নিয়ে আবার সুরু হয় কাজ। যে সকল সত্য সত্যই সত্য, তার পরিবর্তন সহজে ঘটে না। মানবমনে সহজ সংস্কারের মত চিরন্তনতা দাবী করে। শাশ্বত সত্য কি, জিজ্ঞাসায় বহু উত্তর মিলবে। কিন্তু জাগতিক বা পার্থিব সত্য, যা আমরা পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রাহ্য করে নিতে পারি, তাকে না মেনে উপায় নেই। এই সত্যের উপর নির্ভরশীল মানুষ অগ্রসর হতে চাইছে সর্বজ্ঞানী হতে, বিশ্বঘটনার উপর কর্তৃত্ব করতে। তাই তার অদম্য উদ্যোগ আজ জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে।

জীব প্রাণধারণ করে বেঁচে থাকে। তার মধ্যে মানুষ হলো অভিব্যক্তির শেষ বা অন্যতম অবদান। সে প্রাণীদের মধ্যে জীবীয় গুণে সর্বাপেক্ষা বিত্তশালী; মন তার বিশিষ্ট সম্পদ। জন্ম মৃত্যুর অধীন হলেও স্বল্প সময়ের জন্যে সে পৃথিবীতে বেঁচে থাকবার অধিকারী এবং তার জন্যে চায় সে এমন নিয়তজাগ্রত চেষ্টা ও অনুশীলন, যার দ্বারা সে জীবধর্ম পালন করে জীবনের দিনগুলি নিঃসংশয়ে অতিবাহিত করতে পারে। এই অনুশীলনই হলো পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে মননের শিক্ষা। জীবনযাত্রায় এটাই তার প্রধান পাথেয়।

পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা পরিবেশের সঙ্গে সংঘাতে যে জিনিষ জ্ঞান সঞ্চার করে, তাকে বোধগম্য করবার জন্যে আমরা কল্পিত শব্দে বা শব্দাবলী দিয়ে প্রকাশ করি। এই শিক্ষা প্রথমে নিজেদের মধ্যে অনুকরণের দ্বারা সাধিত হয়, পরে নূতন নূতন শব্দ বা কথা তৈরি করে তাকে আরও প্রাঞ্জল করবার চেষ্টা করে থাকি। সুতরাং ভাষাই হলো মানুষের জীবনসোপানের প্রথম ধাপ।

প্রাণিজগতে দেখা যায় যে, প্রাণীর জীবনধারণকল্পে কতকগুলি সংস্কারজাত ক্রিয়া আছে, যার শিক্ষা বা অনুকরণের দরকার হয় না; আর কতকগুলি আছে, যারা শিক্ষার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। স্বরযন্ত্রের দ্বারা শব্দ উৎপাদন স্বয়ংক্রিয় এবং সে-শব্দ ভাবব্যঞ্জক হলেও সীমিত অর্থজ্ঞাপক। কিন্তু যেখানে প্রাণীর নিজেদের মধ্যে ভাব বিনিময় দরকার হয়, সেখানে শব্দ বা ভাষা চাই, যা মনের ভাবকে রূপদান করে।

যে দেশে, যে সমাজে আমরা বাস করি, সেখানে জীবনকে সফল করে তুলতে হলে সেখানকার ভাষা শিক্ষা প্রথম দরকার। ভূমিষ্ঠ হবার পর থেকেই শিশু মাতৃদুগ্ধ পানের সঙ্গে সঙ্গে মাতৃভাষা আয়ত্ত করতে চেষ্টা করে। সেজন্যে চাই প্রথমে মাতৃভাষায় শিক্ষা, যতক্ষণ না সে নিজেকে পরিষ্কাররূপে প্রকাশ করতে পারে। এই শিক্ষা এমনভাবে অনুশীলিত হওয়া চাই, যা তার জীবনের সামগ্রিক শিক্ষাকে সফল করে তুলতে পারে।

বাংলা আমাদের মাতৃভাষা। সে-ভাষা যত সহজে, অল্প আয়াসে ও অল্প সময়ে শিক্ষালাভ করা যায়, এমনটি আর বিদেশী ভাষায় হয় না। দুটি ভাষা নিয়ে এক সঙ্গে শিক্ষারম্ভ করলে দুটিরই শিক্ষা হয় অসম্পূর্ণ। বস্তুত, দুটির মিশ্রিত শিক্ষায় আমরা বিদ্যার প্রাণীন পদার্থ হারিয়ে ফেলি। ফলে সে শিক্ষায় স্বাধীন চিন্তার ও ক্রিয়ার অবসর পাওয়া যায় না, তবে এটি অবিসম্বাদী সত্য যে, একটি ভাষার শিক্ষান্তে, অর্থাৎ নিজেকে সেই ভাষায় সম্পূর্ণ ভাব প্রকাশের ক্ষমতা অর্জনের পর, আরেকটি ভাষা যত সহজে শিক্ষা করা যায়, এমন আর দুটি ভাষার একত্র মিশ্রিত শিক্ষায় হয় না।

ব্যাপারটি আরও প্রাঞ্জল করবার জন্যে রবীন্দ্রনাথের 'শিক্ষার সাঙ্গীকরণ' প্রবন্ধের অংশ বিশেষের সাহায্য নিচ্ছি। তিনি লিখেছেন :

"শিক্ষায় মাতৃভাষাই মাতৃদুগ্ধ, জগতে এই সর্বজনস্বীকৃত নিরতিশয় সহজ কথাটা বহুকাল পূর্বে একদিন বলেছিলেম; আজও তার পুনরাবৃত্তি করব। সেদিন যা ইংরেজী শিক্ষায়-মন্ত্রমুগ্ধ কর্ণকুহরে অশ্রাব্য হয়েছিল আজও যদি তা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় তবে আশা করি, পুনরাবৃত্তি করবার মানুষ বারে বারে পাওয়া যাবে।"

"বাংলাভাষার দোহাই দিয়ে যে শিক্ষার আলোচনা বারবার দেশের সামনে এনেছি তার মূলে আছে আমার অভিজ্ঞতা। যখন বালক ছিলেম আশ্চর্য এই যে তখন অবিমিশ্র বাংলাভাষায় শিক্ষা দেবার একটি সরকারি ব্যবস্থা ছিল। * * * আমি সম্পূর্ণ বাংলাভাষার পথ দিয়েই শিখেছিলাম ভূগোল, ইতিহাস, গণিত, কিছু পরিমাণ প্রাকৃত বিজ্ঞান, আর সেই ব্যাকরণ যার অনুশাসনে বাংলাভাষা সংস্কৃতভাষায় আভিজাত্যের অনুকরণে আপন সাধু ভাষার কৌলীন্য ঘোষণা করত। এই শিক্ষার আদর্শ ও পরিমাণ বিদ্যা হিসাবে তখনকার ম্যাট্রিকের চেয়ে কম দরের ছিল না। আমার বারো বৎসর বয়স পর্যন্ত ইংরেজি-বর্জিত এই শিক্ষাই চলেছিল।"

"মনের চিন্তা এবং ভাব কথায় প্রকাশ করবার সাধনা শিক্ষার একটি প্রধান অঙ্গ। অন্তরে বাহিরে দেওয়া-নেওয়ার এই প্রক্রিয়ার সামঞ্জস্য-সাধনই সুস্থ প্রাণের লক্ষণ। বিদেশী ভাষাই প্রকাশ চর্চার প্রধান অবলম্বন হলে সেটাতে যেন মুখোষের ভিতর দিয়ে ভাবপ্রকাশের অভ্যাস দাঁড়ায়। * * * একদা মধুসূদনের মতো ইংরেজি বিদ্যায় অসামান্য পণ্ডিত এবং বঙ্কিমচন্দ্রের মতো বিজাতীয় বিদ্যালয়ে কৃতী ছাত্র এই মুখোষের ভিতর দিয়ে ভাব বাতলাতে চেষ্টা করেছিলেন; শেষকালে হতাশ হয়ে সেটা টেনে ফেলে দিতে হল।"

"নিজের ভাষায় চিন্তাকে ফুটিয়ে তোলা সাজিয়ে তোলার আনন্দ গোড়া থেকেই পেয়েছি। তাই বুঝেছি, মাতৃভাষায় রচনায় অভ্যাস সহজ হয়ে গেলে তার পরে যথাসময়ে অন্য ভাষা আয়ত্ত করে সেটাকে সাহসপূর্বক ব্যবহার করতে কলমে বাধে না, * * * অন্ততঃ আমার এগারো বছর বয়স পর্যন্ত আমার কাছে বাংলা-ভাষার কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না।"

পূর্বে এক প্রবন্ধে[১] শিক্ষার্থীর কোন্ স্তরে, বয়স বা শিক্ষার মান হিসেবে, দ্বিতীয় একটি ভাষার (এখানে ইংরেজী) শিক্ষা সুরু করতে হবে, এই প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলাম।

এখন (বাংলা) নর্মাল স্কুলও নেই, বহু পণ্ডিতের পাঠশালাও নেই; আছে দুই বিভাগের স্কুল, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক (উচ্চ)। আমার এখন মনে হয়, এই দুই বিভাগের কোনটিতেই ইংরেজী ভাষার আমল না দেওয়াই ভাল।

১। পরিভাষা: 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' শারদীয় সংখ্যা, ২২ (১০-১১), পৃ: ৬০৮-৬০২ (১৯৬৯)

কলেজে পাঠের সময় ইংরেজীকে একটু বড় করে স্থান দিলেই হলো এবং তারপরে যারা আরও উচ্চ শিক্ষার্থে যাবে, তাদের ইংরেজী শিক্ষা (ভাব প্রকাশ পর্যায়ের) অপরিহার্য। আর যারা সে মার্গে যাবে না, তারা মাতৃভাষায় জ্ঞানার্জন সীমাবদ্ধ রাখবে। অবশ্য একথা স্বীকার্য যে, ইংরেজীভাষা শিক্ষায় বহির্দেশের সঙ্গে আমাদের পরিচয় যতটা সহজ হবে, মাতৃভাষায় ততটা না হওয়াই সম্ভব।

উপরে যে প্রস্তাব উপস্থাপিত করেছি, তা মূলত ও মুখ্যত রবীন্দ্রনাথের হলেও মতসাপেক্ষ হবে জানি। কিন্তু না করে পারলাম না এই জন্তে যে, এর একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনা নেই বলে। এই প্রসঙ্গে আবার স্মরণ করিয়ে দিতে চাই রবীন্দ্রনাথ 'শিক্ষার সাঙ্গীকরণ' প্রবন্ধে যে কথাগুলি বলেছেন। "বিদেশী ভাষার চাপে বামন-হওয়া মন আমাদের দেশে নিশ্চয়ই বিস্তর আছে। প্রথম থেকেই মাতৃভাষার স্বাভাবিক সুযোগে মানুষ হলে সেই মন কী হতে পারত আন্দাজ করতে পারি নে বলে তুলনা করতে পারি নে।"

সত্যিকার দরকার বোধটা আমরা খাটো করে ক্ষান্ত হইনি, বহুকাল ধরে অবজ্ঞা করে এসেছি এবং তারই ঋণের সুদ দিতে দিতে এখন আমরা নাজেহাল হচ্ছি।

যা দেখি বা শুনি তা মাতৃভাষায় বিশুদ্ধ ও সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ করা সম্ভব কি না, তা আমরা সচরাচর যাচাই করে দেখিনা। অন্তপক্ষে দেখা যায় যে, অধিকাংশ জিনিষ যা দেখছি বা শুনছি তা সম্পূর্ণ বাংলায় প্রকাশ করি না এবং করাও সম্ভব নয়। তার প্রথম ও প্রধান কারণ, অভ্যাস এবং দ্বিতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিস্তারের সঙ্গে জীবনযাত্রার বহু উপকরণের দ্রুত পরিবর্তন। আর তা ছাড়া বহু নতুন নতুন বিদেশী জিনিষ আমদানী হচ্ছে, যার মাতৃভাষায় কোন প্রতিশব্দ নেই। সুতরাং তার প্রতিশব্দ তৈরি করতে হয়, অথবা অবিকল সেই শব্দটি গ্রহণ করতে হয়, এই যেমন আমরা করেছি রেডিও, ট্রানজিস্টর, টেরিলিন, টেরিকট, চেয়ার, বেঞ্চি, টেবিল, আলমারী, ট্রাম, বাস, মোটর, এরোপ্লেন প্রভৃতি। এর মধ্যে অনেকগুলি হয়তো মাতৃভাষায় রূপান্তরিত করা সম্ভব, কিন্তু তা করা যে পণ্ডশ্রম সে কথা সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করবেন।

প্রদীপের আলো আজ সীমাবদ্ধ জায়গায় মিটমিট করে জ্বলছে, পরিবর্তে এসেছে একটানা ইলেকট্রিকের আলো। আমরা তার প্রতিশব্দ তৈরি করেছি বৈদ্যুতিক বাতি বা আলো বলে। কিন্তু মনে হয় 'কাষ্ঠাসন' যেমন অমরত্ব প্রাপ্ত হয় নি, তেমনি বৈদ্যুতিকও হবে না, ইলেকট্রিকই হয়তো ক্রমান্বয় ব্যবহারের সঙ্গে ভাষায় মিশে আধিপত্য বিস্তার করে বসবে। এ-প্রসঙ্গে মনে পড়ে বিচারপতি সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের কথা। একদা তিনি যা বলেছিলেন তা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। তিনি বলতেন, 'ওহে আমার সর্বভুক্। যখন যা পাই গিলে ফেলি ও বেমালুম হজম করে নিই। আজকাল অনেক উকীল, মোক্তার ট্রামে (বাসে) চড়ে হাইকোর্টে জজের কাছে আপীল করে মোকদ্দমা করতে যান।' এটা যে নিছক প্রাঞ্জল বাংলা সে কথায় কেউ উদ্বেগ প্রকাশ করবেন না। অনূদিত প্রতিশব্দের পরিবর্তে অক্ষরান্তরিত শব্দ ব্যবহারের সঙ্গে সহজবোধ্য হয়ে ভাষার মধ্যে অজ্ঞাতসারে ঢুকে পড়ে। সেজন্তে মনে হয় বিদেশী শব্দ রূপান্তরিত করবার বৃথা চেষ্টা না করে প্রতিবর্ণীকরণের মধ্যে স্বচ্ছন্দ প্রকাশের মহিমা বেড়ে যাবে বৈ কমবে না।

জীবনযাত্রার আধুনিক উপকরণ, যা সব আমরা বিজ্ঞানের দৌলতে পেয়েছি, এই যেমন রেডিও, ট্রানজিস্টর, এরোপ্লেন, বাইনোকুলার, টেরিলিন, টেরিকট, সার্ট, সুট, হাফপ্যান্ট, টাই,

কলার, ক্রিকেট, উইকেট, ব্যাট-বল ইত্যাদি আজকের দিনে শিশুদেরও সহজবোধগম্য। এগুলির জন্যে আমরা যদি অনূদিত প্রতিশব্দ তৈরি করি এবং পাঠ্যপুস্তকে তাই যদি ব্যবহার করে শিশুদের গলাধঃকরণ করতে বাধ্য করি তো মর্মান্তিক পীড়াদায়ক হবে।

বহু বিদেশী শব্দ আমরা বাংলা হরফে খবরের কাগজ মারফত পাই; আর পাই বিজ্ঞাপন থেকে। সেগুলি শেষাবধি আমাদের অজ্ঞাতসারে ভাষার মধ্যে অবাধে প্রচলন ও প্রসার লাভ করে। যখন দেখি কথাবার্তায় আমরা নাভিরল, নার্ভ-টনিক, আনাসিন, লটারি, টিকিট, টেণ্ডার, নোটিস, হেজেলিন স্নো, পাউডার, ক্রীম এবং উল্লিখিত শব্দ প্রভৃতি স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করি, তখন মনে হয় সেগুলিকে মাতৃভাষার মমত্ববোধে বাংলায় প্রতিশব্দ তৈরি করা শুধু অবুদ্ধিমানের কাজ নয়, পণ্ডশ্রম মাত্র।

একদা ফিরিঙ্গী ভাষা ব্যবহারের দুর্নাম আমাদের ছিল। কিন্তু উপায় ছিল না মাতৃভাষায় প্রতিশব্দ তৈরি করে সহজবোধ্য করবার জন্যে। আমাদের সেগুলি বেমালুম হজম করে নিতে হয়েছে। দেখতে হবে আমরা যা দেখছি, শুনছি, সেটিকে সহজ সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ করতে পারছি কি না। কারণ তা প্রকাশ করাই জ্ঞানার্জন, জ্ঞান বিনিময়ের প্রধান উদ্দেশ্য। ভাষা শুধু বস্তুজ্ঞাপক নয়, ভাবজ্ঞাপকও করতে হয় তাকে। 'এক কাপ হট টী'র পরিবর্তে 'এক কাপ গরম চা' শিশুরও বোধগম্য।

বিজ্ঞানের বহু তথ্য, বহু জড় ও জীব-বস্তু বিদেশীরা যত তন্ন তন্ন করে জেনেছেন, আমরা তত জানবার চেষ্টা করিনি, অথবা চেষ্টা করে দেখবার সুযোগ-সুবিধা পাইনি। সুতরাং তাদের বহু নূতন শব্দ আমদানী করতে হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। এমন একদিন ছিল যখন অনেক অগ্রগামী জাতি নিজের নিজের ভাষায় প্রতিশব্দ তৈরি করে নিয়ে চালু করেছিল। কিন্তু আজকের দিনে জ্ঞান বিনিময় যথেষ্ট প্রসার পাওয়াতে যে-শব্দটি যে-ভাষায় প্রথম উদ্ভাবিত হয়েছে, তাকেই বিনা দ্বিধায় নিজ ভাষায় হুবহু মেনে নেওয়াই রেওয়াজ। উদ্দেশ্য যখন জ্ঞান বিনিময়, তখন একই জিনিষের পৃথক প্রতিশব্দের সার্থকতা কি!

বহুকাল পূর্বে ইউরোপে জ্ঞানার্জন ও জ্ঞান বিনিময়ের জন্যে ল্যাটিন ও গ্রীক ভাষা প্রচলিত ছিল, অবশ্য শিক্ষিত ও পণ্ডিতদের মধ্যে। পরে ফরাসী ভাষা আধিপত্য বিস্তার করে ভাববিনিময়ে প্রশস্ত ক্ষেত্র হয়েছিল। কিন্তু তাও টিকলো না। এখন দেখা যাচ্ছে যে, ভাব ও জ্ঞান বিনিময়ের প্রশস্ত রাজপথ মুখ্যত ইংরেজী ভাষা।

অদূর অতীতে বিজ্ঞানের জ্ঞান বিনিময়ের জন্যে ক'টি আন্তর্জাতিক ভাষা স্বীকৃতি পেয়েছিল তা বলা কঠিন। তবে নিঃসংশয়ে বলা চলে যে, মুখ্যত ইংরেজী, ফরাসী, জার্মান ও ইতালীয় বিজ্ঞানীরা মেনে নিয়েছিলেন। ইদানীং ওদের সঙ্গে যুক্ত করা যেতে পারে রুশ ও স্প্যানিশ ভাষা, অবশ্য এটি আমার অনুমান। জাপানী ভাষা বা অন্যান্য ভাষাভাষীরা সে স্বীকৃতি পায় নি। এ-কথা বলা বাহুল্য যে, ভাষার সংখ্যা বৃদ্ধি জ্ঞান বিনিময়ের অন্তরায়। সেজন্যে তা কয়েকটি ভাষার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা সমীচীন।

মাতৃভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষা, গবেষণা ইত্যাদি জাতির পক্ষে অনুকূল হলেও, বিজ্ঞানের অগ্র-গতির জন্যে কয়েকটি ভাষা বিজ্ঞানী শিখতে বাধ্য হয়, হয় প্রামাণ্য জ্ঞান হিসাবে, অথবা অপর ভাষাভাষীদের অবগতির জন্যে একটি জানা ভাষার মাধ্যমে অনুবাদকরণে। বহু বিদেশী জার্নালের মৌলিক প্রবন্ধের শেষে দু-তিনটি ভাষায় সারাংশ দেওয়ার রীতি ইদানীং প্রচলিত হয়েছে। উদ্দেশ্য জ্ঞান প্রচার ও বিনিময়।

অদূরভবিষ্যতে সর্বস্তরে মাতৃভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষা মেনে নিলেও, ইংরেজীকে আমাদের কলেজী ও উচ্চশিক্ষায় রাখতেই হবে। কেন না, এই ভাষার মাধ্যমে আমরা যতটা পেরেছি এগিয়েছি এবং এই অগ্রসরের অব্যাহত গতি রক্ষাকল্পে ইংরেজীকে আমাদের বহাল রাখতেই হবে, যেমন রেখেছে রুশ, ফরাসী, জার্মান প্রমুখ অন্যান্য বিদেশী ভাষা-ভাষীরা। সুতরাং মাতৃভাষায় শিক্ষা প্রবর্তনে ইংরেজীর স্থান অপরিহার্য। যে পরিভাষা তৈরি করতে আমরা উদ্যোগী হয়েছি, তা মুখ্যত ইংরেজী থেকেই এবং তাকে নিয়েই আমাদের যত মাথাব্যথা।

উপরে যে সকল নজির উপস্থাপিত করেছি, তা মুখ্যত ইংরেজী টেক্‌নিকাল শব্দের অক্ষরান্তরিত করে নেওয়ার অনুকূলে। এ-কথা পূর্বে প্রাণিবিজ্ঞানের পরিভাষার দ্বিতীয় প্রস্তাবের[১] মুখবন্ধে রামেন্দ্রসুন্দর, যোগেশ রায় প্রমুখ মনীষিগণের উক্তি উদ্ধৃত করে লিখেছিলাম। আমরা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে তাঁদেরই কথার প্রতিধ্বনি করছি মাত্র। সে যা হোক, বহু ইংরেজী শব্দ অক্ষরান্তরিত করে গ্রহণ করলেও অনেক শব্দের পারিভাষিক প্রতিশব্দ বাংলায় তৈরি করতে হবে, হয় ভাষার সামঞ্জস্য বিধানে, অথবা মাতৃভাষার প্রতি মমত্ববোধে। প্রকৃত সমস্যা সেইখানে। মনে করিয়ে দিতে চাই রবীন্দ্রনাথ এ-প্রসঙ্গে যা বলেছেন, "বাংলা ভাষায় বৈজ্ঞানিক পরিভাষা রচনা করাও অনেক চিন্তা ও চেষ্টার কাজ—বিজ্ঞানের যাথাতথ্য রক্ষাপূর্বক তাহাকে জনসাধারণের বুদ্ধিগম্য করিয়া সরল ভাষায় প্রকাশ করাও শক্ত।"[২]

গত ষাট-সত্তর বছরের মধ্যে বৈজ্ঞানিক পরিভাষা কম বেরোয় নি এবং সে প্রসঙ্গে আলোচনা সমালোচনাও পত্র-পত্রিকায় কম কিছু প্রকাশিত হয় নি। দুঃখের সঙ্গে বলতে হয় সব যেন অরণ্যে রোদন করা হয়েছে। কেন না অধুনা কেউই সে সম্বন্ধে অবহিত হয়ে কাজ করতে চান না। সে যা হোক, তার কিছু খোঁজ-খবর ১৩৩৪ সনের 'প্রকৃতি' পত্রিকার ১৪শ (গ্রীষ্ম) সংখ্যায় আমি 'বাংলা পরিভাষার গ্রন্থপঞ্জী' নাম দিয়ে প্রকাশ করেছিলাম। যতদূর মনে পড়ে, তার অধিকাংশই বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থাগারে আছে। তার পরে আর যা পরিভাষা সম্বন্ধে ছাপা হয়েছে তার কোন পৃথক প্রবন্ধ, তালিকাদি একত্রে সঙ্কলিত হয়ে প্রকাশিত হতে দেখি নি। এবং আমিও ব্যর্থমনোরথ হয়ে উক্ত গ্রন্থপঞ্জী প্রকাশ করবার পর সঙ্কলন সংগ্রহ কিছু করি নি। কিন্তু বহু প্রবন্ধ ও তালিকাদি যে বেরিয়েছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এমন কি হিন্দী ও কয়েকটি ভারতীয় ভাষায় তালিকা বেরিয়েছে। সেই জন্যেই বোধ হয় অধ্যাপক শান্তিময় চট্টোপাধ্যায়[৩] এই সকল সঙ্কলনের একত্র পুনর্মুদ্রণ প্রয়োজন মনে করেন।

বাংলা পারিভাষিক প্রতিশব্দ তৈরির কাজ যদি চিন্তা ও চেষ্টাসাধ্য হয়, তাদের একত্রে সঙ্কলনের কাজও কম শ্রমসাধ্য নয়। যাঁরা শুধুমাত্র ইংরেজী পরিভাষার বাংলা প্রতিশব্দের তালিকা প্রকাশ করেছেন, তাতে বিচার চলে না, মেনে নেওয়া বা অগ্রাহ্য করা চলে। কিন্তু একই বিষয়ের ভিন্ন ভিন্ন প্রতিশব্দের তালিকা একত্র গ্রথিত করলে, তাতে যাচাই ও বিচার উভয়ই করা চলে। এটাই শ্রেয়। অনেকেই এখন এই দ্বিতীয় পন্থায় সংগৃহীত সঙ্কলন একত্রে

১। প্রকৃতি, বর্ষা-শরৎ ২য়-৩য় সংখ্যা, পৃঃ ১৩৩-৩৪ (১৩৪৪)

২। প্রসঙ্গ কথা, শিক্ষা, রবীন্দ্ররচনাবলী, ১২শ খণ্ড, পৃঃ ৫০৯ (১৩৪৯)

৩। জ্ঞান ও বিজ্ঞান, শারদীয় সংখ্যা, পৃঃ ৬১৭-৬২৩ (১৯৬৯)

চায়; পায় না। সেজন্তে অনেকে প্রামাণ্য নজির দেখানো বাঞ্ছনীয় মনে করেন না। মোদ্দা কথা, যুক্তি মাথা হেঁট করলেও, সরাসরি বাংলা প্রতিশব্দ তৈরির কাজে আমাদের নিজ গুণ, জ্ঞান গরিমা অবনমিত করতে চাই না।

আমার 'প্রাণিবিজ্ঞানের পরিভাষা' সঙ্কলনের কাজ অল্প কয়েকজনের সমর্থন ও সুখ্যাতি লাভ করলেও, অনেকের নীরব তিরস্কার পেয়েছে। লোকমুখে শোনা গেছে যে, ইংরেজী অক্ষরান্তরিত পরিভাষা গ্রহণ যদি করতে হয় তো, অত পরিশ্রম করবার দরকার কি ছিল। সত্যি তো বাংলা ও ইংরেজী পরিভাষা মিশিয়ে একটা প্রবন্ধ বা পাঠ্যপুস্তক খাড়া করে তুলতে পারলেই যখন বাংলায় বিজ্ঞান পঠন-পাঠনের কাজ সুসম্পন্ন হতে পারে, তখন পরিভাষা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ কি!

পরিভাষা বলতে আমরা সম্যক কি বুঝি, কি চাই তা বুঝি না বলেই তর্কাতর্কি করি, বাদ-বিবাদের ধুলো উড়াই। বস্তুত, বাদ-প্রতিবাদ থাকবে না এমন কথা বলি না। কিন্তু তা এড়িয়ে তড়িঘড়ি কেমন করে কাজটি সুসম্পন্ন করা যায়, তাই ভেবে দেখতে বলি।

পূর্বসূরীদের কথা ছেড়ে দিলেও, ইদানীং কেউ কেউ পরিভাষা তৈরির ব্যাপারে মতামত প্রকাশ করছেন।[১] সভা-সমিতিতে আলোচনা করে এ-কাজ কী-রকম করে চালানো হচ্ছে, তা জানতে পারা যাচ্ছে না। বিষয়বস্তু হিসেবে হঠাৎ তালিকা প্রকাশিত হচ্ছে, এমনও দেখা যাচ্ছে। কিন্তু কী উপায়ে এ-কাজ আবার সুরু করা যেতে পারে তার একটি পরিকল্পনা আমি এখানে রাখতে চাই।

প্রথম কাজ এক একটি ইংরেজী পারিভাষিক শব্দের বাংলায় ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় যে সকল প্রতিশব্দ প্রকাশিত হয়েছে তার একত্র সঙ্কলন। এ-কাজ শ্রম ও অর্থসাপেক্ষ হলেও অত্যন্ত জরুরী বলে মনে করি। না করলে কী হবে—তার উত্তরে বলতে চাই যে, যথেচ্ছাচারে প্রতিশব্দ উদ্ভাবিত হয়ে পাঠ্যপুস্তক ও প্রবন্ধাদিতে ব্যবহৃত হবে।

পাঠ্যপুস্তক লেখকেরা যাঁরা সঠিক পরিভাষার ধার-ধারেন না বা মাথা ঘামান না, তাঁরা দিশেহারা হয়ে আভিধানিক বা নিজকৃত পরিভাষা ব্যবহার করবেন। তাতে কী রকম বিভ্রম সৃষ্টি হতে পারে তা মৃত্যুঞ্জয়প্রসাদ গুহের[২] প্রবন্ধটি পড়লেই জানা যাবে।

দ্বিতীয় কাজ, কী রকম পরিভাষা গ্রহণীয় হতে পারে, তার একটি পরিকল্পনা জানানো দরকার মনে করি। যাঁরা পরিভাষার তালিকা এবং তার আলোচনা-সমালোচনা তন্নতন্ন করে ঘেঁটেছেন এবং পড়েছেন, তাঁরা বলবেন যে, পরিভাষা চার রকম হতে পারে; অবশ্য এটি আমার মতে।

প্রথম, বাংলা প্রতিশব্দ, যার কোনো বিদেশী অক্ষরান্তরিত প্রতিশব্দের প্রতিদ্বন্দ্বী অবাঞ্ছনীয়। এ রকমের শব্দের এক বা একাধিক সাধু ও চলিত শব্দ গ্রহণ করা চলতে পারে। উদাহরণ: Absorption—শোষণ; Axis—অক্ষ; Liquid—তরল; Adaptation—অভিযোজন; Distillation—পাতন; Habit—আচরণ; Habitat—বসতি; Export—রপ্তানী; Evolution—অভিব্যক্তি; Symbiosis—অন্যোন্যজীবিত্ব; Claw—নখর; Neck—গ্রীবা, ঘাড়; Fat—মেদ, চর্বি, স্নেহ; Thorax—বক্ষ, বুক; Limb—অঙ্গ, পদ; Function—বৃত্তি, ধর্ম, ক্রিয়া, কর্ম।

১। সমর রায়চৌধুরী, মাতৃভাষায় মেডিক্যাল শিক্ষার সমস্যা, জুলাই (১৯৬৮)। ত্রিদিবরঞ্জন মিত্র, মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান-শিক্ষা, জ্ঞান ও বিজ্ঞান ২২ (৯) পৃঃ ৫২২-২৫ (১৯৬৯)

২। মৃত্যুঞ্জয়প্রসাদ গুহ, রসায়ন-বিজ্ঞানে শব্দ সঙ্কলন, জ্ঞান ও বিজ্ঞান, ২২ (১০-১১) পৃঃ ৬৪২-'৪৭ (১৯৬৯)।

দ্বিতীয়, বাংলা ও লিপ্যন্তর প্রতিশব্দ দুই-ই ব্যবহৃত হতে পারে। তবে তার মধ্যে বাংলা প্রতিশব্দের ব্যবহার বেশী বাঞ্ছনীয়। কিন্তু কেউ যদি বাংলা প্রতিশব্দের প্রতি উদাসীনতা প্রকাশ করে ইংরেজী লিপ্যন্তর শব্দ ব্যবহার করেন তো তাকে অমান্য করা উচিত নয়। উদাহরণ: Liver—যকৃৎ। লিভার; Parasite—পরজীবী। প্যারাসাইট; Uterus—জরায়ু। ইউটেরাস; Cone—শঙ্কু। কোণ; Zinc—দস্তা। জিঙ্ক; Silk—রেশম। সিল্ক; Marble—মর্ম। মারবেল; Brown—বাদামী। ব্রাউন; Number—সংখ্যা। নম্বর; Plan—নক্শা। প্ল্যান; Vacuum—শূন্য। ভ্যাকুয়াম; Starch—শ্বেতসার। স্টার্চ; Cashier—খাজাঞ্চী। ক্যাশিয়ার।

তৃতীয়, দ্বিতীয়টির ঠিক উল্টো, অর্থাৎ ইংরেজী লিপ্যন্তর প্রতিশব্দ বাঞ্ছনীয়; বাংলা প্রতিশব্দ যথাসম্ভব বর্জনীয়। মাতৃভাষার মমত্ববোধে কেউ যদি ব্যবহার করেন তো মার্জনীয়। যথা বা উদাহরণ Cell—সেল। কোষ; Nerve—নার্ভ। স্নায়ু; Atom—এটম বা অ্যাটম। পরমাণু; Oxygen—অক্সিজেন। অম্লযান; Chlorophyll—ক্লোরোফিল। পত্রহরিৎ; Kidney—কিড্নী। বৃক্ক; Credit—ক্রেডিট। জমা।

চতুর্থ, প্রথমটির ঠিক উল্টো, অর্থাৎ একমাত্র ইংরেজী লিপ্যন্তর শব্দের কোনরূপ প্রতিদ্বন্দ্বী না রেখে ব্যবহার বাঞ্ছনীয়। যথা, Sponge—স্পঞ্জ; Cork—কর্ক; Chronometer—ক্রোনোমিটার; Vector—ভেক্টর, Lever—লিভার; Syrup—সিরাপ; Gas jar—গ্যাস জার; Iodine—আয়োডিন; Galvanoscope—গ্যাল্ভানোস্কোপ; Oolite—উলাইট।

এর পর আমার বক্তব্য আরও সুস্পষ্ট। যে রকম প্রতিশব্দ আমাদের থাকুক না কেন, যে রকম প্রতিশব্দ আমরা তৈরি করি না কেন, যাকে আমাদের ভাষায় কায়েমী করে চালাতে চাই, তার প্রত্যেকটির একটি শব্দব্যাখ্যা যুক্ত করে অভিধান তৈরি করা। পরিভাষা সমিতির এটাই হওয়া উচিত এখন প্রথম ও প্রধান কাজ। এই পরিকল্পনা যথাসম্ভব আলোচনা করে স্থিরীকৃত করা প্রয়োজন। এ-কাজ বলা যত সহজ, করা তত নয়। কারণ এ-কাজে প্রচুর অর্থ, সময় ও যোগ্য লোকের প্রয়োজন। একক এ-কাজ করা সম্ভব নয়, এমন কি একটি প্রতিষ্ঠানের দ্বারা সম্ভব নাও হতে পারে। এ-কাজে সমগ্র বাঙ্গালী জাতির সমর্থন চাই। সরকার, বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠান, যারা এ-বিষয়ে অগ্রণী, তাদের সমবেত সমর্থন চাই। তবেই আমরা এগুতে পারব।

গোলাপের কথা

শ্রীমণীন্দ্রনাথ দাস

সুগন্ধ ও সুন্দর রঙের জন্যে গোলাপ সমস্ত ফুলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে আছে। খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে গ্রীক কবি সাফো গোলাপকে ফুলের রাণী বলে অভিহিত করে গেছেন। সাহিত্যে, শিল্পকলায়, সামাজিকতায়, ধর্মে, ইতিহাসে, কবিতায় এবং প্রতীকরূপে গোলাপ ফুল এক বিশেষ ভূমিকা নিয়ে রয়েছে। সাধারণ সুগন্ধ হিসাবেও সৌখিন সুমিষ্ট খাবারে আজও গোলাপের পাপড়ির বিলক্ষণ সমাদর আছে। পূর্ব-কালে গোলাপ ওষুধরূপেও ব্যবহৃত হয়েছে। পারস্য দেশ থেকে মধ্য যুগে মুসলমানদের সময়ে ভারতবর্ষে গোলাপ ফুলের আগমন ঘটে। গোলাপ নামটিও ফারসী ভাষা থেকে গৃহীত। এখন এই দেশীয় গোলাপের নাম Rosa indica।

বর্তমানকালে প্রায় ২০০ জাতীয় মৌলিক গোলাপ আছে। গোলাপ-বিশেষজ্ঞ ম্যাক্‌ফার-ল্যাণ্ডের মতে, এই সব গোলাপের সংমিশ্রণ ও সুনির্বাচনের ফলে প্রায় ৬০০০ রকম গোলাপ উৎপন্ন হয়েছে। উদ্ভিদতত্ত্ববিদ্‌দের মতে, Rosa canina নামক বুনো একহারা পাঁচ পাপড়ির গোলাপ ফুল থেকেই কালক্রমে বিবর্তনের ফলে এত প্রকার গোলাপ ফুলের উৎপত্তি হয়। গোলাপ ফুল সাধারণতঃ সাদা, হলদে কমলা, লাল, নীলাভ ও সবুজাভ হয়ে থাকে। মানুষের চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের ফলে কখনও কখনও একই গাছে বিভিন্ন বর্ণের গোলাপ ফোটানো সম্ভব হয়েছে। গোলাপগাছ সাধারণ; লতানো, ছড়ানো, ঝোপের মত—এই চার রকমের হয়ে থাকে। গোলাপ গাছের একটি সম্পূর্ণ পাতায় তিনটি, পাঁচটি বা সাতটি ছোট ছোট পত্রক থাকে, প্রত্যেক পত্রের ধার দাঁতের মত খাঁজ কাটা। বেড়াবাঁধা বুনো গোলাপের গোড়ায় পাঁচটি সবুজ কুণ্ডপত্র ও পরে পাঁচটি রঙীন পাপড়ি থাকে। গোলাপের কাঁটা রূপান্তরিত রোম। প্রত্যেক ফুলে কয়েকটি করে পুং-কেশর ও স্ত্রী-কেশর হয়।

ভাল জাতের গোলাপে অনেকগুলি রঙীন পাপড়ির দল থাকে। জাতি অনুযায়ী গোলাপফুলের ব্যাস আধ ইঞ্চি থেকে সাত ইঞ্চি পর্যন্ত হতে পারে। পারস্য, বুলগেরিয়া, ফ্রান্স ও ভারতবর্ষ গোলাপ চাষের জন্যে বিশেষ প্রসিদ্ধ। এদেশে গাজিপুর গোলাপফুলের জন্যে বিখ্যাত। ভাল জাতের গোলাপগাছে বছরে পাঁচ-ছয় মাস ধরে ফুল ফুটতে থাকে। চীন দেশের চা গোলাপ সারা বছরই প্রায় ফুটে থাকে। গোলাপের বংশ বিস্তার—বীজ বা কলম থেকে কিম্বা এক গাছের পাতার কুঁড়ি বা সরু ডাল অন্য গাছের ডালে জোড়া লাগিয়ে দিয়ে—সম্ভব হতে পারে। রাশিয়ান উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী টিমিরিয়াজেভের মতে লিলিফুলের ক্রমবিকাশের ফলে হয়তো গোলাপ-ফুলের উৎপত্তি হয়েছে।

নাতিশীতোষ্ণ আর্দ্র আবহাওয়া গোলাপগাছ রোপণের পক্ষে প্রশস্ত। সূর্যালোকপূর্ণ, উন্মুক্ত ও উঁচু জমি এবং দোআঁশ বালিযুক্ত মাটি গোলাপ চাষের পক্ষে উপযোগী। প্রয়োজনের বেশী জল যাতে জড়ো না হয় এবং অতিরিক্ত জল যাতে বের হয়ে যেতে পারে, সেদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। তিন হাত অন্তর এক হাত চওড়া ও এক হাত গভীর গর্ত করে তাতে গোময়-মিশ্রিত উর্বর মাটি দিয়ে মাঝখানে গোলাপের কলম পুঁততে হয়। মাটি যাতে ভিজা থাকে

সেজন্তে যথেষ্ট পরিমাণ জল সেচন করা দরকার। গোলাপগাছের সারের জন্তে গোময় ও অস্থিচূর্ণ ব্যবহার করা বিধেয়. এতে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি হয়, কিন্তু বর্ষাকালে সার দেওয়া নিষিদ্ধ। মধ্যে মধ্যে গোলাপে গাছের শুষ্ক ও দুর্বল ডালপালা ছেঁটে বাদ দেওয়া দরকার, এতে গাছে বেশী ফুল ধরে। টবেও গোলাপগাছ লাগানো যায়, কিন্তু টবটি এক ফুট উঁচু হওয়া দরকার এবং তার তলায় এমন একটা ছোট ছিদ্র থাকা চাই, যা ইটের টুক্‌রা দিয়ে ঢাকা যায়। ভাল মাটি ও সামান্ত সার দিয়ে টব ভর্তি করতে হবে। কখনও কখনও গোলাপগাছ নানা রকম অনিষ্টকারী কীট-পতঙ্গ ও রোগোৎ-পাদক ছত্রাকের দ্বারা আক্রান্ত হয়। এর প্রতি-কারের জন্তে বিশোধকরূপে তামাকের জল, তুঁতে মেশানো চুনের জল, গন্ধকচূর্ণ, ডি-ডি-টি কিম্বা গ্যামাক্সিন পাউডার প্রয়োগ করা প্রয়োজন।

আমেরিকায় এরিজোনা প্রদেশের অন্তর্গত টুসষ্টোনে একটি বিরাট গোলাপগাছ আছে। এই গাছের গুঁড়ি ৪০ ইঞ্চি মোটা এবং গাছটি প্রায় ৯ ফুট উঁচু। ১৮৮৪ সালে স্কটল্যাণ্ড থেকে যে কলম এনে লাগানো হয়েছিল, তা থেকে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়ে এত বড় গোলাপগাছ হয়েছে।

গোলাপফুলের পাপড়ি থেকে সুগন্ধ আহরণ করে আতর প্রস্তুত হয়। প্রায় ২০০ পাউণ্ড গোলাপের পাপড়ি থেকে এক আউন্স আন্দাজ আতর পাওয়া যায়। সাধারণতঃ ১০০টি গোলাপফুল থেকে মাত্র এক ফোঁটা আতর উৎপন্ন হয়। বুলগেরিয়া ও ফ্রান্স আতর প্রস্তুতের জন্তে প্রসিদ্ধ। বুলগেরিয়া দেশে ম্যারিজা উপত্যকায় যে গোলাপের ক্ষেত আছে, তা প্রায় ৪০ মাইল দীর্ঘ, এখানে কিঞ্চিদধিক কুড়ি হাজার কৃষক গোলাপের চাষ করে থাকে। এই বল্‌কান অঞ্চলে বছরে প্রায় ৬০০০ পাউণ্ড আতর প্রস্তুত হয়। এক সময় গাজিপুরে প্রায় ৩০০ বিঘা জমি গোলাপ চাষের জন্তে নির্দিষ্ট ছিল, তখন প্রতি বিঘায় প্রায় এক হাজার গোলাপ গাছ উৎপন্ন হতো। ভাল ঋতুতে এক একটি গোলাপগাছে প্রায় ১০০টি করে গোলাপফুল হয়। সুতরাং এক হাজার গোলাপগাছ থেকে নিশ্চয়ই এক লক্ষ ফুল পাওয়া সম্ভব। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে গোলাপের আতর প্রতি পাউণ্ড ২২৫ থেকে ৩০০ টাকার মধ্যে পাওয়া যেত। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় এই দাম বেড়ে গিয়ে আউন্স প্রতি ৭৫ টাকা হয়েছিল। বর্তমান কালে সর্বোৎকৃষ্ট গোলাপের আতরের মূল্য প্রতি আউন্স ২০০ টাকা।

বকযন্ত্রের মধ্যে জল ও গোলাপের পাপড়ি উত্তপ্ত করলে আতর তৈরি হয়। তাপের প্রভাবে জলীয় বাষ্পের সঙ্গে গোলাপের গন্ধসার গিয়ে অন্য পাত্রে জড়ো হয়।

চোঁয়ানো জলের উপর এই তৈলাক্ত ও সুগন্ধ-যুক্ত আতর ভেসে ওঠে আর ঐ পাতিত ও পরিত্যক্ত জলই পরিশেষে গোলাপজল নামে অভিহিত হয়। একটি সূক্ষ্ম পালকের সাহায্যে ঐ তৈলবৎ ভাসমান বস্তু তুলে নেওয়া হয়. কিম্বা পৃথকীকরণ করবার পাত্রের দ্বারা ঐ আতর জল থেকে আলাদা করা হয়ে থাকে। জলপাইয়ের তেল ও চর্বির সুগন্ধ আহরণের কিঞ্চিৎ ক্ষমতা আছে। কাঠের ফ্রেম কাচের সার্শি বসিয়ে তাতে বেশ করে চর্বি লাগিয়ে তার উপর গোলাপ-পাপড়ির স্তবক সাজানো হয়। চর্বির সঙ্গে যৎসামান্ত সংরক্ষক মেশানো থাকে। প্রতিদিন বাসি পুষ্পদল সরিয়ে নিয়ে তাজা গোলাপের-পাপড়ি স্থাপন করা হয়ে থাকে। এই প্রক্রিয়া কিছুদিন করবার পর যখন ঐ চর্বি গোলাপের গন্ধে পরিপূর্ণ হয়ে যায়, তখন সুরাসারের সাহায্যে ঐ সুরভি চর্বি থেকে গৃহীত হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে জলপাইয়ের তৈলসিক্ত বস্ত্রখণ্ডের উপর গোলাপফুল রেখে সুগন্ধ সংগ্রহ করা হয়। কখনও কখনও পাপড়ির পরিবর্তে গাছশুদ্ধ গোলাপ কাছে রেখে গন্ধ গ্রহণ করা

হয়ে থাকে। আজকাল সক্রিয় অঙ্গার অথবা সিলিকা জেলির সাহায্যেও সুগন্ধ সংগৃহীত হয়। বিশুদ্ধ গোলাপের আতর ঈষৎ পীতবর্ণের হয়। এই তৈলাক্ত দ্রব্যটি ২০° তাপমাত্রায় জেলির মত ঘন হয়ে যায়। রাসায়নিক গঠন—এতে জিরানিয়ল সিট্রোনেলল, নিরল, বিভিন্ন প্রকার ঈষ্টার এবং ৭৫% ফেনাইল-ইথাইল অ্যালকোহল থাকে, এ ছাড়া এতে ২০% মোমের মত জিনিষ থাকে। বর্তমান কালে কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত গোলাপের আতরের বিশেষ প্রচলন হয়েছে। কারণ, এর দাম স্বাভাবিক গোলাপের আতরের প্রায় সিকিভাগ মাত্র। সর্বোত্তম কৃত্রিম আতরে শতকরা দশভাগ স্বাভাবিক গোলাপের আতরও মিশিয়ে দেওয়া হয়।

টুকটুকে লাল রঙের গোলাপ ফুল ভিটামিন এ-বি-সি-তে পরিপূর্ণ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ভিটামিন সি-র জন্যে গোলাপফুল প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়েছিল। সুপ্রসিদ্ধ জার্মান ডাক্তার আর্নেষ্ট ফুক্স বলেন, চক্ষুর যন্ত্রণা নিবারণে গোলাপের তেল বিশেষ কার্যকরী। প্রাচীন-কালের চিকিৎসকেরা গোলাপের রস আভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণ বন্ধের জন্যে প্রয়োগ করতেন। চিনির রসে গোলাপের পাপড়ি পাক করলে যে সুগন্ধ-যুক্ত মিষ্টান্ন প্রস্তুত হয়, তাকে গুলকন্দ বলে। আধসের গোলাপের পাপড়ি ও আধসের চিনি আধসের জলে মৃদু উত্তাপে অল্পক্ষণ সিদ্ধ করলে সুমিষ্ট ও সুন্দর গন্ধযুক্ত গোলাপের জ্যাম তৈরি হয়।

ভূমধ্যসাগরের ক্রীট দ্বীপে প্রাচীন নসাস প্রাসাদের নিকট এক স্থান খনন করে সার আর্থার ইভান্‌স গোলাপের একটি সুন্দর প্রাচীর-চিত্র আবিষ্কার করেছিলেন। এই পুষ্পচিত্র চার হাজার বছর আগেকার মিনোয়া সভ্যতার নিদর্শন স্বরূপ বলে অনুমিত হয়। ১৮৮৮ সালে পুরাতত্ত্ববিদ্ সার ফ্লিণ্ডার্স পেট্রি ঈজিপ্টের পিরামিডের কাছে একটি সমাধি স্থান উন্মুক্ত করে শুষ্ক বিশীর্ণ প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বেকার একটি গোলাপ-ফুলের মালা পেয়েছিলেন।

গোলাপফুল ইংল্যাণ্ড ও পারস্যদেশের জাতীয় পুষ্পপ্রতীক। ইংরেজদের ইতিহাসপ্রসিদ্ধ গোলাপের যুদ্ধে (১৪৫৫-৮৫) বিবদমান ল্যাঙ্কাষ্টার পক্ষের চিহ্ন ছিল লাল গোলাপ আর ইয়র্ক পক্ষের চিহ্ন ছিল সাদা গোলাপ।

প্রবাদ আছে, মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীর নব-বিবাহিতা রাণী নুরজাহানকে সঙ্গে নিয়ে যখন রাজোদ্যানে বিচরণ করছিলেন, তখন পার্শ্ববর্তী পয়ঃপ্রণালী দিয়ে গোলাপ জলের স্রোত বয়ে যাচ্ছিল। সম্রাজ্ঞী নুরজাহান লক্ষ্য করলেন যে, জলের উপর এক রকম তৈলবৎ পদার্থ ভেসে যাচ্ছে। তাঁর আদেশে যখন ঐ বস্তুটি সংগ্রহ করে আনা হলো, তখন তা থেকে গোলাপের অপূর্ব সুগন্ধ বের হচ্ছিল। এই থেকে নুরজাহান এদেশে প্রথম গোলাপের আতরের প্রচলন করেন -এরকম একটা কিংবদন্তী রয়েছে

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ফ্রান্সে নেপোলিয়নের প্রথমা পত্নী জোসেফাইন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে সর্বোৎকৃষ্ট গোলাপের চারা আনিয়ে মালমেসন প্রাসাদ সংলগ্ন রাজ উদ্যান সুশোভিত করেছিলেন।

ফ্রান্সের স্যালেনসি বলে জায়গায় খুব সুন্দর এক সমাজিক প্রথা আছে। সেখানে প্রতি বছর কোন কুমারী মেয়ে তার সখীগণ কর্তৃক সবচেয়ে কর্তব্যপরায়ণ; শান্ত ও সুশীলা বিবেচিত হলে তার মাথায় গোলাফুলের মুকুট পরিয়ে তাকে গোলাপ-রাণী বলে অভিনন্দিত করা হয়।

খুব সম্ভব প্রাচীনকালে প্রথমে জপের মালা গোলাপফুল গেঁথে তৈরি করা হতো, সেই থেকে হয়তো ইংরাজী Rosary কথাটি এসেছে। রোমান ক্যাথলিক ধর্ম সম্প্রদায়ের সর্বাধিনায়ক

ইটালীর পোপ কখনও কখনও কোন বিশেষ ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা গির্জাকে পুণ্যকাজের জন্যে একটি সুন্দর সোনার গোলাপফুল উপহার দিয়ে আশীর্বাদ করে থাকেন। এছাড়াও গোলাপ সম্বন্ধীয় আরও বিচিত্র কাহিনী পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রচলিত আছে।

সঞ্চয়ন

সমুদ্র সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধান

সমুদ্র প্রাকৃতিক সম্পদে খুবই সমৃদ্ধ। কিন্তু এই সম্পদ সংগ্রহের পথটি খুবই কঠিন, এবং জটিল। যদি কেউ এই সম্পদ আহরণে ব্রতী হয়, তবে তার এই কথাটি বিশেষভাবে উপলব্ধি করতে হবে।

বিজ্ঞানীদের ধারণা, মানুষ এই সকল বাধা উত্তীর্ণ হয়ে ১৯৮০ সাল নাগাদ সমুদ্রের ২০০০ ফুট তলায় গিয়ে কাজকর্ম ও বসবাস করতে পারবে। তারা সেখান থেকে ২০ হাজার ফুট নীচে নেমে তথ্য ও সম্পদ সংগ্রহ করতে পারবে। মানুষেরা মাঠে যেমন গবাদি পশু চরায়, তেমনি তারা সমুদ্রের গভীরে গলদা চিংড়ি ও অন্যান্য নানা জাতের মাছের চাষ করতে পারবে। সমুদ্রের তলা থেকে কম খরচে কোন্ কোন্ ধাতু আহরণ করা যেতে পারে, তারও সন্ধান মানুষ করতে পারবে, তাছাড়া এই তথ্যানুসন্ধানের ফলে পৃথিবীর মহাদেশসমূহ কি করে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, ধীরে ধীরে সরে গেল—তা আরও বিশদভাবে জানতে ও বুঝতে পারবে। তখন এক সপ্তাহ পূর্বেই আবহাওয়ার পূর্বাভাস জ্ঞাপনও হয়তো সম্ভব হবে।

আগামী দশ বছরের মধ্যে সমুদ্রের গভীরে বৈজ্ঞানিক কর্মতৎপরতা খুবই বেড়ে যাবে বলেই আশা করা যায়। ১৯৭০ সাল থেকে যে দশক সুরু হলো, তার প্রথম দিকেই এই পরিকল্পনাকে রূপদান করা হবে বলে স্থির হয়েছে। ওয়াশিংটনের সমুদ্রোপকূল থেকে কিছুটা দূরে সমুদ্রের নীচে যে কবসী পর্বত রয়েছে, সেই পর্বতের চূড়ায় ছয়জন বিজ্ঞানী কিছুদিন কাটাবেন। এই পর্বত ৯০০০ ফুট উঁচু। আর তার চূড়াটি রয়েছে সমুদ্র পৃষ্ঠের ১২০ ফুট নীচে। যে সকল প্রাণী ঐ পাহাড়ে বসবাস করবে, তাদের সম্পর্কে তাঁরা তথ্য সংগ্রহ করবেন এবং বাতাস ও সমুদ্রের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সম্পর্কেও অনুশীলন করবেন।

তবে ১৯৭০ সাল থেকে যে দশক সুরু হয়েছে, সে সময়ে সমুদ্রের গভীরে গিয়ে সুদীর্ঘকাল থেকে তথ্য সংগ্রহের জন্যে উন্নততর সামুদ্রিক যান উদ্ভাবিত হবে। ১৯৬৯ সালে বেন ফ্রাঙ্কলিন নামে একটি ডুবোজাহাজের ছয় জন বিজ্ঞানী সমুদ্রের নীচে প্রায় এক মাস থেকে বহু তথ্য সংগ্রহ করেছেন, সেখানকার বহু ছবি তুলেছেন। বেন ফ্রাঙ্কলিন ছিলেন আমেরিকার একজন বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ও বিজ্ঞানী। তিনি প্রায় দু-শ' বছর আগে সমুদ্রের গভীরে যে উষ্ণ জলের প্রবাহ রয়েছে, তার সন্ধান দিয়েছিলেন। এই জাহাজটি সমুদ্র-পৃষ্ঠের ৬৫০ ফুট নীচে অবস্থিত কোরাল পর্বতমালার এবং সম্পূর্ণ মৎস্যবিহীন অঞ্চলের সন্ধান দিয়েছে। এই পর্বতমালার জন্যেই আভ্যন্তরীণ তরঙ্গের সৃষ্টি হয়ে থাকে।

এই সকল তথ্যসন্ধানী ডুবুরী জাহাজ সমুদ্র-গর্ভস্থ গিরিসঙ্কটে ও সমুদ্রের তলায় ভূতাত্ত্বিক ও ধাতব পদার্থের সমীক্ষার ব্যাপারে, হারানো

পদার্থের উদ্ধারের ক্ষেত্রে, তৈল কোম্পানীদের জন্যে তৈল সন্ধানের ও সমুদ্রতলে গহ্বর খননের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। এই সকল জাহাজ সমুদ্রের কোন্ অঞ্চলে মৎস্য পাওয়া যেতে পারে এবং তাদের গতিবিধি সম্পর্কেও বহু নূতন তথ্যের সন্ধান দিয়েছে।

ট্রিয়েস্ট নামে তথ্যসন্ধানী ডুবোজাহাজটি যাত্রীসহ সমুদ্রের ৩৫ হাজার ৮০০ ফুট নীচে পর্যন্ত নেমেছিল, আর ডুবুরীরা সমুদ্র-পৃষ্ঠ থেকে সমুদ্রের ৮৩১০ ফুট নীচে পর্যন্ত নামতে পেরেছে। তবে ২০ হাজার ফুট নীচে পর্যন্ত যে সকল ডুবোজাহাজ যেতে পারে, তাদের পক্ষে সমুদ্রের তলার শতকরা ৯৮ ভাগ স্থান সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ সম্ভব হয়ে থাকে। সমুদ্রের ২০ হাজার ফুট নীচে পর্যন্ত নামতে সক্ষম ডীপস্টার নামে এক ধরণের ডুবো-জাহাজ নির্মাণে আমেরিকার ওয়েস্টিং হাউস কর্পোরেশন উদ্যোগী হয়েছে। মাকিন নৌবাহিনীও আর এক ধরণের ডুবোজাহাজ তৈরি করছে। এ সকল জাহাজ উদ্ধার কার্যে ব্যবহার করা হবে এবং সমুদ্রের ৫০০০ ফুট নীচে পর্যন্ত যেতে পারবে। নৌবাহিনী সমুদ্রের ২০ হাজার ফুট নীচে বিচরণ-ক্ষম এক প্রকার জলযান তৈরি করছে। এটি সমুদ্রের গভীরে ৩০ ঘণ্টা পর্যন্ত অবস্থান করতে পারবে।

সমুদ্রে স্বর্ণ, রৌপ্য, হীরক, প্লাটিনাম, টাংস্টেন, লৌহ, গন্ধক, টিন, তৈল, গ্যাস প্রভৃতি বহু ধাতব ও প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ। কোন কোন সম্পদের আহরণ ইতি মধ্যেই সুরু হয়ে গেছে। পৃথিবীতে বর্তমানে প্রতি বছর ১২৬০ কোটি ব্যারেল তৈল উৎপন্ন হয়ে থাকে। এর শতকরা ১৬ ভাগ পাওয়া যায় সমুদ্রগর্ভ থেকে। ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত পৃথিবীতে ৪৭০০ কোটি ব্যারেল তৈল উৎপাদন হবে বলে বিজ্ঞানীদের ধারণা। এর এক তৃতীয়াংশই আসবে সমুদ্র থেকে। বিজ্ঞানীরা এই প্রসঙ্গে আরও বলেছেন যে, ১৯৬৪ সালে সমগ্র পৃথিবী-বাসী যে পরিমাণে ধাতব দ্রব্য ব্যবহার করেছে, তার তিন গুণ ধাতবদ্রব্যাদি তারা ১৯৮০ সাল পর্যন্ত ব্যবহার করবে। তারা সেই ধাতবপদার্থের সন্ধান পাবে সমুদ্রগর্ভে। তবে সমুদ্রগর্ভ থেকে খনিজ পদার্থের সন্ধান ও সংগ্রহ খুবই ব্যয়সাপেক্ষ ব্যাপার। সুতরাং ভবিষ্যতে আরও স্বল্প ব্যয়ে সমুদ্রগর্ভে ধাতবদ্রব্যাদির সন্ধানের পন্থা উদ্ভাবন করতে হবে।

বিজ্ঞানীরা আরও বলেছেন যে, ১৯৭০ সালে যে দশক সুরু হবে সেই দশকে সমুদ্রতলার গঠন-প্রণালী সম্পর্কে, ভূমিকম্প সম্পর্কে এবং ধাতব-পদার্থ কিভাবে এক স্থানে এসে জমা হয়, সে বিষয়ে অনেক কিছু জানা যাবে।

বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, সমুদ্রতলার বিস্তার ঘটছে এবং এই বিষয়ে আগামী দশকে আরও বহু তথ্য সংগৃহীত হবে। তাঁদের ধারণা ভূগর্ভের গলিত উপাদান সমুদ্রতলা ভেদ করে যখন উপরে উঠতে থাকে, তখন তা শক্ত হয়ে পড়ে এবং তারও নীচে থেকে আরও গলিত পদার্থ নির্গত হতে থাকে। ফলে সমুদ্রতলার বিস্তার ঘটে। আর এ সকল পদার্থই পরে সমুদ্রগর্ভে পর্বতের আকারে দেখা দেয়। এসব খুব ধীরে ধীরে ঘটে। মহাদেশ-সমূহের একটি যে অন্যটি থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, এ তার অন্যতম কারণ।

পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলের ঠিক উপরের স্তরকে বলে ম্যান্টেল। ভূগর্ভ থেকে নির্গত গলিত পদার্থ-সমূহ কঠিন হবার পর মহাদেশ সমূহের সীমানায় কাছাকাছি আসে এবং এদের কতক পুনরায় ম্যান্টেল স্তর পর্যন্ত চলে যায়। ফলে আগ্নেয়গিরির সৃষ্টি হয়। এ ঘটনা সত্য হলে সমুদ্রের গভীরে যে পর্বতমালা রয়েছে, তার কাছাকাছি অঞ্চলে পললের স্তর হবে খুবই হাল্কা। আর মহাদেশসমূহের সীমানার কাছাকাছি স্থানের স্তর হবে খুবই পুরু। আটলান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগরে গ্লোমার চ্যালেঞ্জার নামে একটি জাহাজের সাহায্যে যে

সকল তথ্য সংগৃহীত হয়েছে, তাতে এই কথা প্রমাণিত হয়েছে।

এই তথ্যানুসন্ধানী জাহাজটির সাহায্যে সমুদ্রের তলায় ৮০টি বিভিন্ন অঞ্চল থেকে নানা প্রকার পললের নমুনা সংগৃহীত হয়েছে। উপসাগর সমূহের উৎস, বয়স এবং এই সকল কি ভাবে গড়ে উঠেছে, তা নির্ধারণের উদ্দেশ্যেই এই সকল উপকরণ সংগ্রহ করা হয়েছে।

মহাদেশসমূহের উপকূল থেকে সমুদ্রের কিছুটা এলাকা পর্যন্ত রয়েছে সমুদ্রের অগভীর অঞ্চল। নরওয়ের উত্তর মেরু অঞ্চল থেকে আফ্রিকার উত্তমাশা অন্তরীপ পর্যন্ত উপকূল সন্নিকটবর্তী অগভীর অঞ্চল সম্পর্কে ২৮টি রাষ্ট্রের সহযোগিতায় একটি তথ্যানুসন্ধানের পরিকল্পনা আমেরিকা গ্রহণ করেছে। এর ফলে মহাদেশসমূহ কখন থেকে এবং কি ভাবে সরে আসছে, সে বিষয়ে অনেক কিছু জানা যেতে পারে। এছাড়া এর ফলে সমুদ্র-গর্ভে বহু পেট্রোলিয়াম এবং অন্যান্য ধাতব পদার্থের খনিরও সন্ধান পাওয়া যেতে পারে।

বিজ্ঞানীদের ধারণা, সমুদ্র সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের ফলে আগামী দশ বছরের মধ্যে খাদ্য-সমস্যারও অনেকটা সুরাহা হতে পারে। পৃথিবীর লোকসংখ্যা যে হারে বাড়ছে তার সঙ্গে খাদ্যোৎপাদনের সামঞ্জস্য রাখতে হলে পৃথিবীর খাদ্যোৎপাদন আগামী বিশ বছরের মধ্যে শতকরা ৫০ ভাগ বাড়াতে হবে। আর পৃথিবীর মোট অধিবাসীর প্রায় অর্ধেক লোক প্রোটিনসমৃদ্ধ খাদ্য পায় না। এই খাদ্যাভাব কিছুটা সামুদ্রিক মৎস্য মেটাতে পারবে।

বর্তমানে প্রতি বছর সমুদ্র থেকে ৫ কোটি মেট্রিক টন মাছ ধরা হয়। বিশেষজ্ঞদের ধারণা, এই পরিমাণ প্রতি বছর তিন থেকে চারগুণ বাড়ানো যেতে পারে। তবে তা করতে হলে মাছ ধরবার, বিননের এবং সমুদ্রের কোন্ এলাকায় মাছ রয়েছে, তা নিরূপণ করবার পদ্ধতির উন্নতি সাধন করতে হবে। এ ক্ষেত্রে কিছুটা অগ্রগতি হয়েছে। ১৯৬০ সাল থেকে প্রোটিনসমৃদ্ধ ও স্নেহবর্জিত সামুদ্রিক মৎস্যের গুঁড়া বাজারে চালু করা হয়েছে। এই গুঁড়া নানা প্রকার খাদ্যের সঙ্গে মিশিয়ে খাওয়া যায়।

সমুদ্র থেকে আবহাওয়ার জন্ম হয়। বাতাস ও জলের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে আগামী দশ বছরের মধ্যে বহু তথ্য সংগৃহীত হবে এবং ১৯৮০ সনের মধ্যে এক বা দু-সপ্তাহ পূর্বেই হয়তো আবহাওয়ার পূর্বাভাষ জ্ঞাপন সম্ভব হবে। তবে এই বিষয়ে সঠিকভাবে এখনই কিছু বলা সম্ভব নয়। কারণ এজন্যে সমুদ্রের বিভিন্ন স্থানে স্থাপিত বহু যন্ত্রপাতিসমন্বিত বয়া ও বেলুন, কৃত্রিম উপগ্রহ এবং বিমানের সাহায্যে বাতাস ও জলের তাপমাত্রা, প্রবাহ ও গতির মাত্রা, জোয়ার-ভাটা, তরঙ্গের উচ্চতা প্রভৃতি বহু বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে এবং বিশ্বের সকল অঞ্চল থেকে বিপুল পরিমাণ তথ্য সংগ্রহ করে প্রচণ্ড শক্তিশালী কম্পিউটার যন্ত্রের মাধ্যমে প্রণালীবদ্ধ করতে হবে। এজন্যে বর্তমানে যে সকল কম্পিউটার যন্ত্র রয়েছে, সেগুলির তুলনায় ১০০০ গুণ শক্তিশালী কম্পিউটার যন্ত্র নির্মাণ করতে হবে।

ক্যান্সার প্রতিরোধের জন্যে সংগ্রাম

বেথেসডার (মেরীল্যাণ্ড) ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব হেল্‌থের ক্যাম্পাসে চার তলা বাড়ীতে ক্যান্সার রোগ প্রতিরোধের জন্যে ব্যাপক প্রচেষ্টা চলেছে। এখানে কর্মরত বিজ্ঞানী, টেক্‌নিশিয়ান প্রভৃতি সকলেই এই তত্ত্ব স্বীকার করতে চলেছেন যে, বিভিন্ন

রকম ক্যান্সার রোগে মানুষ আক্রান্ত হয়, তার অনেকগুলিরই কারণ ভাইরাসের আক্রমণ। কখনও কখনও ভাইরাসের একক ক্রিয়ার ফলে ক্যান্সারের উৎপত্তি হয়, অবার কখনও কখনও এর সঙ্গে অন্য কারণও যুক্ত থাকে।

এই প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টর ডাঃ অ্যালফ্রেড হেলম্যান বলেছেন, ক্যান্সার রোগের আক্রমণ সম্পর্কে যে সব পশুর উপর পরীক্ষা করা হয়েছে, তাতে দেখা গেছে যে, তাদের প্রত্যেকে অন্ততঃ একটি ভাইরাসজাত ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হয়েছে। মানুষের ক্ষেত্রেও পৃথক ফল হবে না বলেই তাঁর ধারণা

ভাইরাসের দরুণ মানুষের দেহে কোন্ ধরণের ক্যান্সার রোগের আক্রমণ ঘটে, বিজ্ঞানীরা তা এখন নিরূপণের চেষ্টা করছেন এবং আশা করছেন যে, ক্যান্সারের প্রতিষেধক টীকাও উদ্ভাবন করা সম্ভব হবে।

ক্যান্সার রোগ সম্পর্কে গবেষণায় এই যে উন্নতি হয়েছে, তা হচ্ছে চিকিৎসার উন্নতি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অস্ত্রোপচার এবং তেজস্ক্রিয় রশ্মি প্রয়োগ করে রোগীর রোগ নিরাময় করা হয়। আরোগ্য লাভের পর পাঁচ বছরের মধ্যে যদি রোগের লক্ষণ পুনরায় দেখা না যায়, তবে ধরে নেওয়া হয় যে, রোগী রোগমুক্ত হয়েছে। যে সব ক্ষেত্রে রোগ আক্রমণের মূল স্থান থেকে দেহের অন্যান্য স্থানে ছড়িয়ে পড়ে সেখানে কেমোথেরাপি চিকিৎসা হয়। আশা করা যায়, এই চিকিৎসায়ও ক্যান্সার নির্মূল করা সম্ভব হবে। এই চিকিৎসায় ওষুধ প্রয়োগ করা হয়।

পশুর দেহে টিউমার বা আবের সঙ্গে ভাইরাসের যে যোগাযোগ আছে, এই তত্ত্ব বহুদিনের। ১৯১১ সালের নিউ ইয়র্কের একজন বিজ্ঞানী হাতেকলমে দেখিয়েছেন যে, মুর্গীর দেহে সারকোমাস নামে এক ধরণের টিউমার হয়, যার মূলে রয়েছে ভাইরাস। এর দুই দশক পরে বিজ্ঞানীরা ইঁদুর, খরগোস ও ব্যাঙের দেহের টিউমার নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা সুরু করেন এবং তারও মূলে ভাইরাসের ক্রিয়ার সন্ধান পান। হালে প্রমাণ পাওয়া গেছে যে, লিউ-কেমিয়া বা রক্তের ক্যান্সারের মূলে ভাইরাসের ক্রিয়া হামেশাই দেখা যায়; ফলে মানুষের দেহে এই ব্যাধির মূলেও যে ভাইরাস রয়েছে, বিজ্ঞানীরা এই তত্ত্ব মেনে নিচ্ছেন।

কোন কোন সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর মধ্যে লিউ-কেমিয়া ব্যাপক হারে দেখা দেয়। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, ভাইরাস বাহিত হয়ে এই ব্যাধি এক দেহ থেকে অন্য দেহে ছড়িয়ে পড়ে

ভাইরাসের অস্তিত্ব প্রমাণের জন্যে বিজ্ঞানীরা একটি পদ্ধতির আশ্রয় নেন। তাঁরা প্রথমে কোন প্রাণীর দেহে ভাইরাস ইঞ্জেকসন দেন এবং লক্ষ্য রাখেন—প্রতিরোধশক্তি সংক্রান্ত কোন প্রতিক্রিয়া তার মধ্যে দেখা দেয় কিনা। প্রতি-ক্রিয়ার লক্ষণ দেখা দিলে অ্যান্টিবডি বা রোগের আক্রমণ রোধের জন্যে দেহের মধ্যে যে জীবাণু জন্মায় তা পরীক্ষা করা হয় মূল ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়বার ক্ষমতা এর কতখানি, তা জানবার জন্যে। এই পরীক্ষার ফলে মূল টিউমার প্রতিরোধের জন্যে উৎপন্ন অ্যান্টিবডি এবং যে ভাইরাস ইঞ্জেকশন করে দেহে প্রবিষ্ট করানো হয়েছে তা প্রতিরোধের জন্যে উৎপন্ন অ্যান্টিবডির মধ্যে সম্পর্ক কতটা, তা নির্ণয় করা হয়। এই সম্পর্ক থেকে টিউমার ও ভাইরাসের সম্পর্ক স্থির হয়। অপর আর একটি পদ্ধতি হচ্ছে কোন ভাইরাস দেহ-কোষ আক্রমণ করলে সেটা কোন্ জাতের ভাইরাস, তার নিদর্শন রেখে যায়। সুতরাং কোন বিশেষ ধরণের ভাইরাসের সঙ্গে টিউমারের সম্পর্ক আছে কি না, বিজ্ঞানীরা তা নিরূপণের চেষ্টা করছেন।

বেথেসডার এই গবেষণাগারে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রতি সপ্তাহেই ক্যান্সার

আক্রান্ত দেহ-কোষের নানা নমুনা পাঠানো হয় পরীক্ষার জন্যে। শুধু তাই নয়, ভাইরাসগুলির তালিকা পর্যন্ত প্রস্তুত রাখা হয়।

বর্তমানে গবেষণার কাজ যে পর্যায়ে চলছে, সে সম্পর্কে ডাঃ হেলম্যান বলেছেন, মানুষের দেহে যে ক্যান্সার হয়, তার মধ্যে কয়টি ভাইরাসের দরুণ, তা সঠিকভাবে বলবার সময় এখনো হয় নি। তিনি বলেন, হতে পারে এক জাতের ভাইরাসের দরুণ এক প্রকারের টিউমার হয়, আর অন্য সব টিউমারের মূলে রয়েছে নানা রকম কারণ। এমনও হতে পারে ভাইরাস থেকে মানুষের দেহে নানান জাতের টিউমার হয় এবং সেটা নির্ভর করছে নানা পারিপার্শ্বিক ও শারীরিক কারণের উপর।

ফ্লোট গ্লাস

বৃটেনে উদ্ভাবিত কাচ তৈরির একটি নতুন পদ্ধতি এখন পৃথিবীর বহু জায়গায় অনুসৃত হচ্ছে।

কাচ এমন একটি মনুষ্য-নির্মিত দ্রব্য, যার উপাদানগুলি প্রাচীন কালের মতই অপরিবর্তিত রয়ে গেছে।

কয়েক হাজার বছর আগে থেকেই রোমানরা কাচের জানালা তৈরি করে আসছে। সম্ভবতঃ মিশরেই কাচ প্রথম উদ্ভাবিত হয় এবং পরে তা সিরিয়া ও রোমে প্রচলিত হয়ে পশ্চিম ইউরোপে পৌঁছয়।

১৮২৬ সালে উত্তর-পশ্চিম ইংল্যাণ্ডের ল্যাঙ্কাশায়ারের অন্তর্গত সেন্টহেলেন্স-এ পিলকিংটন পরিবার একটি কাচ তৈরির কারখানা স্থাপন করেন। এই পরিবারটি ঐ জেলায় দীর্ঘদিন ধরে বাস করেছিলেন। ঐ অঞ্চলে কাচ তৈরির জন্যে প্রয়োজনীয় সবগুলি উপাদান (বালি, সোডা, লাইমস্টোন, ডলোমাইট) সহজলভ্য।

আজকে সেই পারিবারিক শিল্পটি আধুনিক আকার ধারণ করে সেন্টহেলেনস-এ ৩০,০০০ লোকের কর্মসংস্থান করছে।

কাচ তৈরির ব্যাপারটা এই রকম—উপাদানগুলি একটি ফারনেস-এ চাপিয়ে উত্তপ্ত করা হয়। সোডা তরল হয়ে বালিকে দ্রবীভূত করে। এই দুয়ের মিশ্রণ প্রথমে একটি সিরাপের মত জিনিষ তৈরি করে। ঐ জিনিষটি উচ্চতাপমাত্রায় পাত্‌লা জলের মত হয়ে আসে। তার পর সেটাকে ঠাণ্ডা করলে তা কাচে পরিণত হয়।

এই অবস্থায় কাচ নরম থাকে। নরম কাচকে রোলারের সাহায্যে শীট্ বা পাতের আকার দেওয়া হয়। অবশ্য এই কাচকে ব্যবহারযোগ্য করে তুলতে গেলে আরও ঘষামজা করবার দরকার হয়।

নতুন পদ্ধতিতে গলিত কাচ একটি ফিতার আকারে ফারনেস থেকে ঢালা হয় একটি পাত্রে রাখা গলিত টিনের উপর। টিনের উপরিভাগ মসৃণ হওয়াতে এইভাবে পাওয়া কাচও মসৃণ হয় এবং এর আর মাজাঘষা করবার প্রয়োজন হয় না।

এভাবে নতুন রীতিতে তৈরি কাচকে বলা হয় ফ্লোট গ্লাস এবং এই রীতিতে উৎপাদন ব্যয় ২৫ শতাংশ কম পড়ে।

এই রীতির উদ্ভাবন হয়েছে মাত্র ১০ বছর। কিন্তু এরই মধ্যে পিলকিংটনের অনুমতিক্রমে পৃথিবীর বহু দেশে ফ্লোট গ্লাস তৈরি হচ্ছে।

খড়গপুরে বিজ্ঞান কংগ্রেস

রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়*

এক সময় ছিল যখন ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হতো দেশের শুধু বিশ্ববিদ্যালয়-নগরগুলিতেই। কিন্তু গত বছর অর্থাৎ ১৯৬৯ সাল থেকে এই প্রচলিত রীতির ব্যতিক্রম ঘটেছে। গত বছর বোম্বাই সহরের উপকণ্ঠে পাওয়াইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদাসম্পন্ন আই-আই-টি-র প্রাঙ্গণে বিজ্ঞান কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনের আসর বসেছিল। এই বছরও বিজ্ঞান কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হলো আর একটি আই-আই-টি-র প্রাঙ্গণে—খড়গপুরে।

স্বাধীনতার পর ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে উচ্চতর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা শিক্ষণের বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদাসম্পন্ন যে পাঁচটি কেন্দ্র স্থাপিত হয়, তার মধ্যে খড়গপুরের আই-আই-টি হচ্ছে সর্বপ্রথম ও সর্ববৃহৎ। এই বছরের সূচনায় গত ৩-৯ জানুয়ারী খড়গপুরের এই আই-আই-টি-র প্রাঙ্গণে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৫৭তম বার্ষিক অধিবেশনের আসর বসেছিল।

তেসরা জানুয়ারী সকালে আই-আই-টি-র সুসজ্জিত মণ্ডপে বিদেশাগত বিশিষ্ট বিজ্ঞানীদের ও ভারতের বিভিন্ন রাজ্য থেকে আগত প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বিজ্ঞান কংগ্রেসের উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী ভাষণে শ্রীমতী গান্ধী সামাজিক পরিবর্তনে

খড়্গপুর আই-আই-টি-র মূল ভবন

* দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং
কলিকাতা-২৯

বিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন এবং বিজ্ঞানীদের সমাজ চেতনায় উদ্বুদ্ধ হতে আহ্বান জানান। আর একটি বিষয়ের উপর তিনি গুরুত্ব দেন। তা হলো 'অফিসারী মনোভাব' বর্জন। তরুণদের মনে যাতে নিজের হাতে কাজ করবার আগ্রহ ও তাতে শ্রদ্ধার ভাব জেগে ওঠে, সেজন্যে তিনি আবেদন জানান।

শ্রীমতী গান্ধীর ভাষণের আগে পশ্চিম বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায় এবং অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি আই-আই-টি-র অধিকর্তা অধ্যাপক এস. কে. বসু সমবেত দেশী ও বিদেশাগত বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও প্রতিনিধিদের স্বাগত জ্ঞাপন করেন।

বিজ্ঞান কংগ্রেসের মূল সভাপতি ডক্টর লালচাঁদ ভার্মন তাঁর অভিভাষণে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার অগ্রগতির জন্যে পরীক্ষা ও বিশ্লেষণের মান নির্ণয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

বিজ্ঞান কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক অজিতকুমার সাহা বিদেশাগত বিশিষ্ট বিজ্ঞানীদের পরিচয় দেন। এবারের অধিবেশনে এসেছিলেন আফগানিস্থানের ডক্টর এ. জি. কোয়াই সুরানি, বুলগেরিয়ার অ্যাকাডেমিশিয়ান ই. জি. কামমফ এবং অ্যাকাডেমিশিয়ান কে. টি. ব্রাতানফ, সিংহলের এ. এন. এস. কুলসিংহা, চেকোশ্লোভাকিয়ার ডক্টর জে. টমকো, হাঙ্গেরীর অধ্যাপক এফ. সিসাকি এবং অধ্যাপক এফ. সুনগর, জাপানের অধ্যাপক সিগেরু সুৎসুমি, পোল্যাণ্ডের অধ্যাপক এম নালেজ, রুমানিয়ার অধ্যাপক ডি জুমিৎ রেস্কু; বৃটেনের লর্ড আলেকজাণ্ডার টড, ডক্টর এইচ. ডি. টারনার, অধ্যাপক এইচ. গুনবার্গ, অধ্যাপক জে. হাচিনসন এবং অধ্যাপক এইচ. ডবলু. পিরি, ফ্রান্সের ডক্টর এম. আর. কালেৎ, সোভিয়েট রাশিয়ার মিঃ জি. এইচ. বুনিয়াতিয়ান এবং ডক্টর (শ্রীমতী) টি. ভি. ভেচ্‌চিকোভা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধ্যাপক জেমস সিনক্লেয়ার। এছাড়া ভারতের বিভিন্ন রাজ্য থেকে প্রায় দেড় হাজার প্রতিনিধি ও বিজ্ঞানী এবারের অধিবেশনে যোগদান করেছিলেন।

দ্বিতীয় দিন অর্থাৎ ৪ঠা জানুয়ারী থেকে বিজ্ঞান কংগ্রেসের তেরোটি বিভিন্ন শাখার পৃথক পৃথক অধিবেশন সুরু হয়। এবার গণিত শাখায় সভাপতিত্ব করেন কুরুক্ষেত্রের ডক্টর এস. ডি. চোপ্‌রা, সংখ্যায়ন শাখায় লক্ষ্ণৌ-এর অধ্যাপক অনাদিরঞ্জন রায়, পদার্থ-বিজ্ঞান শাখায় দিল্লীর অধ্যাপক এন. কে. সাহা, রসায়ন শাখায় এলাহাবাদের ডক্টর অরুণকুমার দে, ভূতত্ত্ব ও ভূগোল শাখায় কলিকাতার শ্রী জি. সি. চ্যাটার্জি, উদ্ভিদবিদ্যা শাখায় মীরাটের অধ্যাপক ভি. পুরী, প্রাণীবিদ্যা ও কীটতত্ত্ব শাখায় কলিকাতার ডক্টর এ. পি. কাপুর, নৃতত্ত্ব ও পুরাতত্ত্ব শাখায় পুনার অধ্যাপক এইচ. ডি. সাঙ্কালিয়া, চিকিৎসা ও পশু-বিজ্ঞান শাখায় নয়াদিল্লীর ডাঃ কল্যাণ বাগচী, কৃষি-বিজ্ঞান শাখায় নয়াদিল্লীর ডক্টর এস. কে. মুখার্জি, শারীরতত্ত্ব শাখায় বারাণসীর অধ্যাপক জে. নাগচৌধুরী, মনস্তত্ত্ব ও শিক্ষাবিজ্ঞান শাখায় ব্যাঙ্গালোরের অধ্যাপক এস. ভি. চন্দ্রশেখর আইয়া।

বিভিন্ন শাখার সভাপতিগণ তাঁদের ভাষণে নিজের নিজের গবেষণার বিষয় ও তার গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনা করেন। এই সঙ্গে প্রত্যেক শাখায় আলোচনা-চক্র, বিশেষ বক্তৃতা ও গবেষণা-পত্র পাঠ হয়। বিভিন্ন শাখায় যাঁরা এবার বিশেষ বক্তৃতা দেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন অধ্যাপক জেমস সিনক্লেয়ার, ডক্টর জগদীশ শঙ্কর, অধ্যাপক এম. নালেজ, ডক্টর পি. কে. ভট্টাচার্য, মিঃ এম. এন. কুলসিংঘী, অধ্যাপক জি. পি. পাতিল, অধ্যাপক এম. কে. সিঙ্গল, অধ্যাপক এস. কে. ভট্টাচার্য, অধ্যাপিকা পার্বতী দেবী, অধ্যাপক আর. শ্রীধরণ, অধ্যাপক আর. এস. মিশ্র, অধ্যাপক ভি. ডি. সিং, ডক্টর এস. চ্যাটার্জি, অধ্যাপক ডি. এন. মিত্র প্রমুখ। এছাড়া দেশের ও বিদেশের কয়েকজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী কয়েকটি লোকরঞ্জক বক্তৃতাও প্রদান করেন।

নোবেল পুরস্কারবিজয়ী প্রখ্যাত রসায়ন-বিজ্ঞানী লর্ড আলেকজাণ্ডার টড বক্তৃতা দেন 'রসায়নের পরিবর্তনশীল ধারা', ডক্টর বি. ডি. নাগচৌধুরী বলেন, 'দেশের জন্য একটি বৈজ্ঞানিক নীতি অনুসরণের প্রয়োজনীয়তা', ডক্টর ডবলু. ডি. ওয়েস্ট আলোচনা করেন 'ভাসমান মহাদেশ ও গতিশীল পৃথিবী', অধ্যাপক টি. এস. সদাশিবন বলেন 'উদ্ভিজ্জ ভাইরাস ও ভাইরাস ব্যাধি', ডক্টর এ. এন. ঘোষ আলোচনা করেন 'যুগে যুগে মান নির্ণয়', অধ্যাপক নীলরতন ধর বলেন 'ধর্ম ও বিজ্ঞানের সহযোগিতা', ডক্টর এইচ. ডি. সাঙ্কালিয়া বক্তৃতা করেন 'কাশ্মীরে প্রস্তর-যুগের অস্ত্রশস্ত্র আবিষ্কার', অধ্যাপক এস. কে. ভট্টাচার্য বলেন 'রাসায়নিক শিল্পে অনুঘটক বিক্রিয়ার উপযোগিতা', ডক্টর সিগেরু সুৎসুমি আলোচনা করেন 'জাপানের পেট্রোকেমিক্যাল শিল্পের সাম্প্রতিক অগ্রগতি' এবং ডক্টর কে. এন. কাশ্যপ বলেন 'ভারতে জন্মনিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা' বিষয়ে।

প্রতি বছরের মত এবারও কয়েকটি স্মারক বক্তৃতার আয়োজন করা হয়। ন্যাশনাল ইনস্টিট্যুট অফ সায়েন্সস-এর রজত জয়ন্তী স্মারক বক্তৃতা দেন অধ্যাপক এস. রঙ্গস্বামী 'হৃদরোগে ভারতীয় ভেষজের অনুসন্ধান' বিষয়ে। কে. এস. কৃষ্ণান স্মারক বক্তৃতা দেন অধ্যাপক আর. কে. আয়েঙ্গার, তাঁর বিষয়বস্তু ছিল 'আইসোটোপ ও স্পেকট্রোস্কোপি'। মেঘনাদ স্মারক বক্তৃতা দেন অধ্যাপক সি. আর. রাও 'বৈজ্ঞানিক গবেষণায় কম্পিউটার' প্রসঙ্গে। বীরেশচন্দ্র গুহ স্মারক বক্তৃতা প্রদান করেন ডাঃ জে. বি. চ্যাটার্জি, তাঁর বিষয়বস্তু ছিল 'মানবদেহে লোহার ভূমিকার কয়েকটি দিক'। এই সঙ্গে কয়েকটি বিশেষ আলোচনারও ব্যবস্থা করা হয়। 'ব্যাঙ্কের জাতীয়করণ এবং ভারতীয় অর্থনীতিতে তার প্রতিক্রিয়া' বিষয়ে একটি মূল্যবান আলোচনার উদ্বোধন করেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ সেন। 'সমাজে কম্পিউটারের স্থান' এবং 'বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা ও মানবকল্যাণ' সম্পর্কে আরও দুটি মূল্যবান আলোচনা হয়। ভারতের বিজ্ঞান-লেখক সমিতির উদ্যোগে জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞানের প্রচার এবং বিজ্ঞান-রচনার নানা দিকে সম্পর্কে আর একটি মনোজ্ঞ আলোচনা হয় এবং তাতে অংশ গ্রহণ করেন ডক্টর নায়ার, ডক্টর দিবাকর মুখোপাধ্যায়, ডক্টর প্রণব বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকমলেশ রায় এবং বর্তমান লেখক।

প্রতি বছরের মত এবারও বিজ্ঞান কংগ্রেসের সঙ্গে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক সংস্থার বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। ভারতীয় উদ্ভিদ-বিজ্ঞান সমিতির বিশেষ অধিবেশনে বীরবল সাহানী স্বর্ণপদক প্রদান করা হয় এবং প্রথম দিনে এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও যুবকল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী ডক্টর ভি. কে. আর. ভি. রাও। গত বছরে পাওয়াই অধিবেশনের তুলনায় এবারের প্রদর্শনী হয়েছিল অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র।

এবারের অধিবেশনে দুটি জিনিষ সবচেয়ে আকর্ষণীয় ছিল। তার একটি হলো সারা ভারত ছাত্র-ছাত্রীদের আয়োজিত বিজ্ঞান-মেলা। এই মেলায় জয়পুরের (রাজস্থান) মাহেশ্বরী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, গৌহাটির কটন কলেজ, মুগবেড়িয়া গঙ্গাধাম হাই স্কুল, হিজলী হাই স্কুল এবং কলিকাতার সায়েন্স ফর চিলড্রেন, নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আবাসিক কলেজ, এগুজ স্কুল, লরেটো কলেজ এবং জগদীশচন্দ্র বসু জাতীয় মেধা বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের নিজেদের হাতে তৈরী নানারকম বৈজ্ঞানিক মডেল ও পরীক্ষা প্রদর্শন করে। এই মেলায় বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত পত্রিকা ও পুস্তকসমূহ প্রদর্শিত হয়। অধ্যাপক টি. আর. শেষাদ্রি এই বিজ্ঞান-মেলায় উদ্বোধন করে

তরুণ বিজ্ঞান-প্রতিভাদের উৎসাহিত করবার এই প্রচেষ্টাকে অভিনন্দিত করেন। তিন দিন ব্যাপী এই মেলা দেখতে প্রচুর জনসমাগম হয়।

দ্বিতীয় আকর্ষণীয় বিষয়টি ছিল অ্যাপোলো-১১ অভিযানের মহাকাশচারীদের আনীত এক খণ্ড চান্দ্রশিলার প্রদর্শনী। ৮ই জানুয়ারী মাত্র একদিনের জন্যে আয়োজিত এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন বিজ্ঞান কংগ্রেসের মূল সভাপতি ডক্টর লালচাঁদ ভার্মন। চান্দ্রশিলাটি দেখবার জন্যে খড়্গপুর ও আশেপাশের বহু নর-নারী ও ছেলে-মেয়ে এসেছিল। এই উপলক্ষে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের তরুণ ভারতীয় বিজ্ঞানী ডক্টর কে. গোপালন দুটি বিশেষ বক্তৃতা দেন। একটি বক্তৃতা তিনি দেন সকালে পদার্থবিদ্যা, রসায়ন এবং ভূগোল ও ভূতত্ত্ব শাখার যৌথ অধিবেশনে। এই বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল 'অ্যাপোলো-১১' অভিযানের চান্দ্র-শিলার বিশ্লেষণ ও বয়স। দ্বিতীয় বক্তৃতাটি তিনি দেন সন্ধ্যায়। এটি ছিল লোকরঞ্জক বক্তৃতা এবং এর বিষয়বস্তু ছিল 'অ্যাপোলো-১১ অভিযানের আগে ও পরে চন্দ্র'।

সারা দিনব্যাপী গুরুগম্ভীর আলোচনার পর সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন বিজ্ঞান কংগ্রেসের অন্যতম অঙ্গ। এবারও তার ব্যতি-ক্রম হয় নি বরং সাত দিন ধরেই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। প্রথম দিন আই-আই-টি-র ছাত্র-ছাত্রীরা সঙ্গীতালেখ্য, লোকগীতি এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের অর্কেষ্ট্রা পরিবেশন করে। তারপর ক্রমান্বয়ে শ্রীঅমলা-শঙ্করের পরিচালনায় উদয়শঙ্কর সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের বাসবদত্তা নৃত্যনাট্য, উচ্চাঙ্গ কণ্ঠ ও যন্ত্রসঙ্গীত সি-এল-টি-র রামায়ণ নৃত্যনাট্য, শ্রীমতী সংযুক্তা পাণিগ্রাহীর ওড়িশী নৃত্য এবং ডক্টর রমা চৌধুরীর পরিচালনায় প্রাচ্য বাণীর 'মেঘ-মেদুর-মেদিনীম' সংস্কৃত নাটক পরিবেশিত হয়।

স্থানীয় অভ্যর্থনা সমিতি প্রতিনিধিদের জন্যে দীঘা ভ্রমণ, হলদিয়া বন্দর এবং জামসেদপুরে টাটার লোহার কারখানা দেখবার ব্যবস্থা করে-ছিলেন। আমরা একদল দীঘা ভ্রমণে গিয়ে-ছিলাম। সেখানে জাতীয় গবেষণাগারের অধীনে পরিচালিত সামুদ্রিক মরিচা গবেষণা কেন্দ্রটি পরিদর্শনের সুযোগ আমরা পেয়েছিলাম। এখানে মরিচা এবং মরিচা নিবারণের উপায় সম্পর্কে যে সকল গবেষণা চলছে, তার পরিচয় পেয়ে আমরা যথেষ্ট লাভবান হয়েছি। আই-আই-টি-র কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন বিভাগ ও গ্রন্থাগার পরিদর্শনের সুযোগ আমাদের দিয়েছিলেন। বিভিন্ন বিভাগে আধু-নিক যন্ত্রপাতির সমাবেশ এবং গ্রন্থাগারে পুস্তক ও পত্রিকার বিরাট সংগ্রহ দেখে আমরা আনন্দিত হয়েছি। অভ্যর্থনা সমিতি বিদেশাগত বিজ্ঞানী ও এদেশের প্রতিনিধিদের সুখ-সুবিধার জন্যে সব সময় যেভাবে এগিয়ে এসেছিলেন এবং সহযোগিতা করেছিলেন, তাতে আমরা মুগ্ধ ও অভিভূত হয়েছিলাম বললে অত্যুক্তি হয় না।

স্বর্গীয় ডাক্তার বনবিহারী মুখোপাধ্যায়

শ্রীঅমূলেন্দু গুপ্ত

স্বনামধন্য ডাক্তার বনবিহারী মুখোপাধ্যায় মহাশয় পরলোকগমন করিয়াছেন। আমার তাঁহার সহিত বহুবার দেখা হইয়াছে। তাঁহার সরল কথাবার্তায় প্রচুর আনন্দ পাইয়াছি ও মন খুলিয়া হাসিয়াছি। কিন্তু তাঁহার সহিত এককভাবে মিলিত হইবার সম্ভাবনা অথবা সৌভাগ্য আমার কখনো হয় নাই। অন্য পাঁচ জন সহপাঠীর সহিত মিলিত হইয়া তাঁহার সঙ্গ লাভ করিয়াছি। সুশ্রী, সুঠাম, গৌরবর্ণ পুরুষটির বুদ্ধিদীপ্ত মুখখানি একবার দেখিলে মনের মধ্যে একটি স্থায়ী ছাপ পড়িয়া যায়। তাহার উপর চক্ষু দুইটি কেমন একটি কৌতুকের ছটায় সমুজ্জ্বল! অগাধ পাণ্ডিত্য, অসীম জ্ঞান ও গুণের অধিকারী হইয়াও তিনি সর্বসাধারণের সহিত এক হইয়া থাকিতেন। চতুর্দিকে গণ্ডী কাটিয়া নিজেকে পৃথক করিয়া রাখেন নাই। তথাপি তাঁহার নিজস্ব ব্যক্তিত্বে এবং আভিজাত্যে আমাদিগের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়া লইতেন। তাঁহার প্রত্যেকটি কথাবার্তায়, ভাব-ভঙ্গীতে এমন একটি রম্যরসের ভাব ফুটিয়া উঠিত, যাহাতে শেষের কবিতার 'অমিট্ রায়কে' মনে পড়াইয়া দিত। অনেক সময়ে সবুজপত্রের বীরবলকে যেন প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইতাম। তিনি সিনিক ছিলেন না, কিন্তু তাঁহার 'সিনিসিজম'-এর ছদ্ম আবরণ আমাদের ভাল লাগিত। তাঁহার সহিত কথোপকথনের কয়েকটি নমুনা এখানে দিতেছি। পাঠক মনে রাখিবেন, প্রায় অর্ধ শতাব্দী পূর্বের কথা, যাহা আজও স্মৃতির মণিকোঠায় বহু যত্নে সঞ্চিত রাখিয়াছি।

তখন নন্-কোঅপারেশনের প্রথম যুগ—গান্ধীজী বলিলেন 'স্কুল কলেজ ছাড়, এক বৎসরে স্বরাজ আনিয়া দিব।' চাকরী ছাড়, স্লেভ মেন্টালিটির দ্বারা স্বরাজের দুয়ার বন্ধ হইয়া যাইতেছে। আমাদের মধ্যে একজন বনবিহারী বাবুকে বলিল—সার, পাশ করে আর চাকরির উমেদার হবো না। প্রাইভেট প্র্যাকটিস করবো অন্ততঃ স্লেভ-মেন্টালিটি থেকে তো রেহাই পাবো।

বনবিহারী বাবু বলিলেন—সে কি হে, চাকরী করবে না কেন? প্রাইভেট প্র্যাকটিসে স্লেভ-মেন্টালিটি যে পেয়ে বসবে। এই দেখ না, আমি চাকরী করছি, রোজ একবার বার্নাডো সাহেবকে সেলাম দি, আর একজনকে, যাঁর আণ্ডারে আমি কাজ করি। তার পর সমস্ত দিন আমার ছুটি, কারোর তোয়াক্কা রাখি না, যেহেতু আমি নিজেই তখন আমার মালিক! আর প্রাইভেট প্র্যাকটিস করতে গিয়ে তুমি কি করবে।

রামধন পোদ্দার এলেন—দাও, দাও চেয়ার এগিয়ে দাও।

জগমোহন মিশির এলেন—দাও, দাও, চেয়ার এগিয়ে দাও। ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্কের হেড দারোয়ান। খাতির একটু না দেখালে সট্‌কে পড়বে।

তারপর এলেন, করিমবক্স মিঞা কর্ণোওয়ালিস স্ট্রীটের বিড়িওয়ালা—দাও, দাও, তাকেও চেয়ারখানা এগিয়ে দাও।

ডিসুজা রেলওয়ে গার্ড এলেন। দাও, দাও চেয়ার এগিয়ে দাও। টেঁশু হলেই বা, সাহেব তো। খাতির না করলে আসবে কেন?

তার পর এলেন, রাজা হৃষীকেশ লাহার কাপ্তেন ভাগ্নে—পকেট তো গড়ের মাঠ। দাও, দাও, তাকেও চেয়ারখানা এগিয়ে দাও। কোন

আশা নেই, তবু একটু খাতির করতেই হয়। বলাতো যায় না যদি একদিন মেওয়া ফলে যায়!

এখন বুঝে দেখ স্লেভ মেন্টালিটি কার। যে চাকরী করে তার—না, যে করে না, তার?

ছাত্রেরা জুরীস্-এর পিরিয়ডিক পরীক্ষা দিয়া বাহির হইয়া আসিল। বিকাল বেলায় কলেজ হাসপাতালে আসিয়া বনবিহারী বাবুকে ধরিল—সার, আপনি সার্জিকেল রেজিষ্ট্রার হয়ে জুরীস-এর পরীক্ষায় গার্ড দিতে গেলেন, এটা কোন্ হিসাবে হলো। ওদের ডিপার্টমেন্টে কি আর কেউ ছিল না? আপনাকে টানটানি করবার কি আবশ্যক ছিল।

বনবিহারী বাবু এক গাল হাসিয়া বলিলেন, আহা, তাও বুঝি জান না। হতবম্ব হইয়া সকলে বলিল, আজ্ঞে না। তৎক্ষণাৎ জবাব আসিল আমরা যে চাকরী করে খাই। একটি কথায় অতি সংক্ষেপে ছেলেদের কৌতূহল মিটাইয়া দিলেন।

একদিন ইমার্জেন্সী রুমের ও-ডি প্রভাস মাষ্টার ডিউটি করিতেছেন। পাশে বনবিহারী বাবু বসিয়া নিজের খাতাপত্র দেখিতেছেন। এমন সময় একজন জনবুল্ টাইপের অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান হ্যাট মাথায় সিগার মুখে মুরুব্বির টোনে কথাবার্তা বলিয়া চলিয়া গেল। খানিক পরে আসিয়া বলিল, তাহার কাজ হইল না। সে ওপরওয়ালার কাছে কম্প্লেন করিবে ইত্যাদি। লোকটার অহমিকা এবং স্পর্ধায় আমি বিরক্ত হইয়া প্রভাস মাষ্টারকে বলিলাম, আপনার অফিসে লোকটা গটগট্ করিয়া ঢুকিল আপনি উহাকে ম্যানারলি হইতে বলিয়া ধমক দিলেন না কেন? প্রভাস মাষ্টার বলিলেন—এসব করিয়া আর নিজের মেজাজটা খারাপ করিয়া লাভ কি?

বনবিহারী বাবু এতক্ষণ চুপ করিয়াছিলেন। এইবার বলিলেন, সে ঠিক কথা। সেদিন সকালে আমাকে ও-ডির কাজ করিতে হইয়াছিল। এক সাহেব টুপি মাথায় আসিয়া বলা নাই, কহা নাই, একেবারে আমার দিকে পিছন ফিরিয়া বোর্ডের ভ্যাকেন্ট লিষ্ট দেখিতে লাগিল। আমি নড়িয়াচড়িয়া বসিয়া একটা ধমক দিবার উপক্রম করিতেছিলাম, এমন সময়ে সাহেব একটু মুখ ঘুরাইতেই দেখিলাম—আরে এযে বার্ণাডো সাহেব। তাড়াতাড়ি চেয়ার ছাড়িয়া খানিকটা বিগলিত হইয়া বলিলাম গুড মর্ণিং, সার। সাহেব একটুও ভ্রূক্ষেপ করিলেন না, যেমন আসিয়াছিলেন তেমন চলিয়া গেলেন। আমি ফ্যাল ফ্যাল করিয়া তাকাইয়া রহিলাম। সেই অবধি মনে মনে ঠিক করিয়াছি, যদি কোন সাহেবের টুপি আমার নাক ঘেঁষিয়া রক্তারক্তি করিয়া দেয়, তবু একটা কথা বলিব না। রোগা শুঁটকো ট্যাঁস ফিরিঙ্গি হইলেই টেক অফ ইয়োর হ্যাট, প্লিজ বলিয়া সদম্ভে হুঙ্কার ছাড়িতে হইবে। আর বার্ণাডো সাহেবের মত জাঁদরেল আসিলেই চুপ মারিয়া যাইব এ কেমন কথা!

সার্জিকেল ওয়ার্ডের ছাত্রেরা, সার ফ্র্যাঙ্ক কর্ণেল কোনরের সহিত গ্রুপ ফটো তোলাইল। রেজিষ্ট্রার বনবিহারী বাবুও তাহার মধ্যে ছিলেন। প্রত্যেকে দাম দিয়া এক এক কপি ফটো নিল। একজন বনবিহারী বাবুকে জিজ্ঞাসা করিল, সার আপনি কি এক কপি নেবেন? কৌতুকের ছটায় তাঁহার চক্ষু দুইটি জলজল করিয়া উঠিল, বলিলেন—যখন জিজ্ঞাসা করছ নেব কিনা, তখন অবশ্যই বলতে হবে, না ভাই, আমি নেব না। ছেলেটা তাহার 'কিন্তু কিন্তু' ভাবের জন্ত বোকা বনিয়া গেল। তাহার বলা উচিত ছিল, আমরা সকলে লইয়াছি, আপনাকে এক কপি লইতে হইবে। তাহা হইলে তিনি আর দ্বিরুক্তি করিবার সুযোগ পাইতেন না।

বনবিহারী বাবুর দরজায় এক ভদ্রলোক

আসিয়াছেন। কুণ্ঠিতভাবে বলিলেন, দেখা করিতে আসিয়াছি, প্রাইভেট টক্ আছে। ভিতরে গিয়া সংবাদ দিলাম তিনি তখন নিবিষ্ট মনে রেজিষ্টার দেখিয়া হিসাব করিতেছিলেন। মুখ তুলিয়া বলিলেন—প্রাইভেট টকের মানে হলো ফল্স সার্টিফিকেট চাই অথবা গণরিয়া হয়েছে। তা নিয়ে এস। ভদ্রলোক আসিয়া বিনীতভাবে বলিলেন—আমরা ঠিক করেছি, রোগীর চিকিৎসার ভার আপনার উপর দেব। তিনি বলিলেন—বেশ, রোগীকে তো আমার একবার দেখা উচিত। কাল তো আপনি তাকে দেখেছেন। দেখেছি নাকি? না, কালতো রোগীর ঘরে বসে মেডিকেল কনফারেন্সে অ্যাটেণ্ড করে এসেছি। চিকিৎসা করতে হলে রোগীকে একবার দেখা প্রয়োজন।

বলা বাহুল্য, প্রথম দিন রোগীর ঘরে আরও অনেক ডাক্তার ছিলেন। রোগীর রোগ ও চিকিৎসা সম্বন্ধে নানা আলোচনাই হইয়াছিল, চিকিৎসার দায়িত্ব কাহারও উপর ছিল না।

বনবিহারী বাবু বলিলেন—লোকটা আউট-ডোরে এসে খুক্ খুক্ করে কাস্‌লো, একটু রক্তও পড়লো। আবার কাস্‌লো, এবার আর একটু বেশী রক্ত পড়লো। পরে, আরও একটু বেশী। সঙ্গে সঙ্গে জুনিয়র এইচ-পি একটা ইঞ্জেকশন দিলেন, খানিক পরে আরও প্রচণ্ড কাসির সঙ্গে প্রচুর রক্তপাত হলো, নিস্তেজ হয়ে ঢুলে পড়ে মরেই গেল। জুনিয়র কিন্তু মন দিয়ে শেষের রক্তপাতটা পরীক্ষা করে দেখে খুশীর সঙ্গে মন্তব্য করলেন, শেষের রক্তটা যে বের হয়েছে, তাতে একটু জমাট ভাব রয়েছে। আমার ক্যালসিয়ামটা বেশ কাজ দিয়েছিল। লোকটা মরে গিয়েই সব পণ্ড করে দিল।

প্রিন্সিপাল বার্ণাডো সাহেব বলিলেন, Why don't you see me everyday before going to work? বনবীহারী বাবু বলিলেন, Very well sir, I will do so every morning. বনবিহারী বাবু রোজই গিয়া সাহেবকে সেলাম দেন। সাহেব জিজ্ঞাসুনেত্রে তাকাইয়া থাকেন। বনবিহারী বাবু কিছু বলেন না—অতি বিনয়ের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া, একপাশে দাঁড়াইয়া থাকেন। শেষে একদিন বিরক্ত হইয়া সাহেব বলিলেন, You need not come anymore.

যবনিকা পতনের পর, বনবিহারী বাবুও হেলিয়া দুলিয়া বাহির হইয়া আসিলেন।

১৯২৫ সালের মাঝামাঝি। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুর পর তাঁহার স্মৃতিরক্ষার উদ্দেশ্যে বিরাট সমারোহে চাঁদা তোলা হইতেছে। কয়েক জন উৎসাহী ছাত্র গিয়া বনবিহারী বাবুকে ধরিল। তিনি নিতান্ত নিরীহ ব্যক্তির মত জিজ্ঞাসা করিলেন, চাঁদা? কিসের জন্য? কি হবে চাঁদায়?

জানেন না, স্যর! বিরাট সেবাসদন খোলা হবে মহিলাদের জন্য। দাশ মহাশয় তাঁর প্রাসাদতুল্য বাড়ীটা সেজন্য দান করে গিয়েছেন।

বটে! ফিমেল হস্‌পিটাল খোলা হবে। তা আমাদের হাসপাতাল কি দোষ করলো? কে যাবে সেখানে? তোমার বোন যাবেন? আমার স্ত্রী যাবেন, এঁর মা যাবেন, কেউ যাবেন না। ক্যাম্বেলের রক্তে মেজে ভেসে গেলেও কেউ যাবেন না।

স্যর, এমন একটা জনহিতকর অনুষ্ঠানে আপনার যখন সিম্প্যাথি নেই, তখন আমরা আর কি বলতে পারি! এমন একটা সিরিয়াস ব্যাপারকে আপনি হাল্কাভাবে উড়িয়ে দিচ্ছেন, এটা আমাদের পক্ষে বড়ই মর্মান্তিক।

আহা, তুমি হঠাৎ এমন নিরুৎসাহ হয়ে পড়লে কেন, বলতো? আমি তো এমন কথা বলি নি, ঐ 'স্টেপ অ্যাসাইডে' একটা বড় চৌবাচ্চা তৈরি করিয়ে তাতে অনেকগুলি সরু, মোটা,

মাঝামাঝি পাইপ সেট করিয়ে দেওয়া হউক, তারপর তাতে লাল, নীল, হলদে, সবুজ রঙের মদ ঢেলে দিয়ে বলা হউক, বিশ্বের লোক অন্ততঃ একদিনের জন্তও চুমুক দিয়ে বাঁচুক। সকলে হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। চাঁদা সংগ্রাহকের দল টুক করিয়া সরিয়া পড়িল।

বনবিহারী বাবু বলিলেন—দেখলে তো হে, কি পরিস্থিতি, কি উদ্দেশ্য এবং কি প্রয়োজন কিছুই জানা নেই—চাঁদাটা পেলেই হলো। তাও যদি একটুখানি গুছিয়ে বলতে পারতো তো চাঁদাটা পেয়েও যেত। আমরা জানি, পরে তিনি সেবাসদনের নির্মাণকল্পে একটি মোটা অঙ্কের চেক্ দিয়াছিলেন।

বনবিহারী বাবু বলিলেন, কর্ণেল স্টীলের মাথায় খানিকটা অনার্য বুদ্ধি আছে। Osteomyelitis, Osteomalacia, Pseudomuscular distrophy এসব বড় বড় কথা উনি একদম পছন্দ করেন না। ছোট সহজ কথায় তাঁকে বলতে হবে, তুমি ওসব কিছুই জান না। তবেই তিনি খুশী হবেন। যেহেতু তিনি নিজেও ঐ একই পর্যায়ে পড়েন।

আরও বলিলেন, আর যাই কর বাপু একজামিন হলে Common senseটিকে গুলে খেও না।

Zoologyতে একটির পর একটি ছেলেকে মৌখিক পরীক্ষায় ডাকা হচ্ছে। একজনের ইন তো আরেক জনের আউট। দরজার সামনে দু-জন ইন্টিমেটের দেখা হয়ে গেল। একজন হাতজোড় করে দেখিয়ে দিল। চোখে চোখে ইলেকট্রিসিটি খেলে গেল। অর্থাৎ Bivulve অথবা ঝিনুক সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। ততক্ষণে ডাক্তার একেন ঘোষ একটি ব্যাঙের পেক্টোরাল গার্ডল্ অপরজনের হাতে ধরিয়ে দিলেন। ছেলেটি বললো, বাইভাল্‌ব্। একটা ঝিনুক দেখিয়ে বললেন, তবে এটা কি? ছেলেটি মোটেই পেছ-পা হলো না। বরং অত্যধিক ফরওয়ার্ড হয়ে বললো, এটাও বাইভাল্‌ব্, ওটাও তাই। ওটা একটা Rudimentary বাইভাল্‌ব্।

আমি বনবিহারী বাবুর সান্নিধ্য লাভ করিয়াছিলাম, মাত্র দুই বৎসর কি তাহারও কিছু কম। পূর্বেই বলিয়াছি, তাঁহার সহিত একাকী পরিচিত হইবার সুযোগ আমার কখন হয় নাই। আমার বয়স তখন কম ছিল। তাঁহার সাহচর্য লাভের মূল্য যদি তখন সঠিক বুঝিতাম, তাহা হইলে আজ আমার ভাণ্ডার এমন সীমাবদ্ধ হইত না। কিন্তু তাঁহার অন্তরঙ্গতা লাভ করিবার সৌভাগ্য যাঁহাদের অধিক হইয়াছিল, তাঁহারা ইচ্ছা করিলে বনবিহারী বাবুর পরিচিত বহু ব্যক্তির নিকট হইতে কিছু কিছু সরস বিবৃতি আহরণ করিতে পারেন। সমগ্র আলাপ-আলোচনাগুলি একত্রে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইলে বাংলা দেশের ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্ত তাহা একটি স্থায়ী সম্পদরূপে গণ্য হইবে।

নিউক্লিয়াস ও ডি-এন-এ

শ্রীদিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

রাসায়নিক ক্রিয়া ব্যতীত জীবদেহের কোন কাজই সম্পন্ন হয় না। শ্বাসগ্রহণ, চলাফেরা খাদ্যগ্রহণ, দেখা, অনুভূতি ইত্যাদি প্রত্যেকটি কাজই সম্পন্ন হইবার জন্য শক্তির প্রয়োজন। এই শক্তি কোষের অভ্যন্তরে রাসায়নিক ক্রিয়ায় উদ্ভব হয়।

১নং চিত্র। কোষের গঠন

ক—নিউক্লিয়াস, খ—নিউক্লিয়ার মেমব্রেন
গ—ক্রোমাটিন, ঘ—নিউক্লিওলাস, ঙ—রাইবোজোম,
চ—এণ্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম, ছ—মাইটোকন্ড্রিয়ন,
জ—গল্‌গি বডি, ঝ—সেণ্ট্রিওলস, ঞ—লাইসোসোম,
প—প্লাজ্‌মা বা সেল মেমব্রেন

সুতরাং একটি কোষকে একটি রাসায়নিক কারখানাও বলা যায়। একটি এককোষী প্রাণীর দেহের যে কোন একটি কোষকে ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপে পরীক্ষা করিলে দুইটি প্রধান অংশ দেখা যায়। কোষের একেবারে কেন্দ্রে অবস্থিত অংশকে নিউক্লিয়াস বলে (১নং চিত্র) এবং ইহার বাহিরের অংশকে সাইটোপ্লাজম বলে; অর্থাৎ কোষ—নিউক্লিয়াস=সাইটোপ্লাজম অথবা কোষ—সাইটোপ্লাজম=নিউক্লিয়াস। এই নিউক্লিয়াস ও সাইটোপ্লাজমের অভ্যন্তরে নানা রকম বিচিত্র কলকজা আছে; যেমন—সাইটোপ্লাজমের অভ্যন্তরে আছে মাইটোকন্ড্রিয়ন (Mitochondrion), যাহাকে কোষের পাওয়ার হাউস বলে, এণ্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম, যাহার গায়ে সারি-

বদ্ধভাবে সাজানো থাকে রাইবোজোম নামক এক প্রকার ক্ষুদ্র অণু। ইহারা প্রোটিনের জৈব প্রস্তুতিতে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে। ইহা ছাড়াও সাইটোপ্লাজমের অভ্যন্তরে থাকে সেন্ট্রিওলস্, লাইসোসোম, গল্‌গিবডি ইত্যাদি।

আমাদের আলোচ্য বিষয় হইল নিউক্লিয়াস ও DNA। কোষের অভ্যন্তরে সর্বাপেক্ষা স্পষ্ট অংশটি হইতেছে নিউক্লিয়াস এবং ইহাই হইতেছে কোষ বা সেলুলার ফ্যাক্টরীর পরিচালকমণ্ডলী।

কোষে পরিণত হয় এবং ঐ কোষগুলি ক্রোমাটিনের নির্দেশে চালিত হইয়া হয় মানুষে, না হয় গরু, ছাগল, ইত্যাদিতে পরিণত হয়। অর্থাৎ ক্রোমাটিন হইতেছে এমনই একটি বংশগত উপাদান, যাহার উপর প্রত্যেক উদ্ভিদ ও প্রাণীর অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জড়িত থাকে।

ক্রোমাটিনের এই বংশপরম্পরায় প্রাপ্ত শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ কে করে? জেনেটিক্স বা প্রজনন-বিজ্ঞান অনুযায়ী বলা যায়—ক্রোমোজোম যে জিন বহন
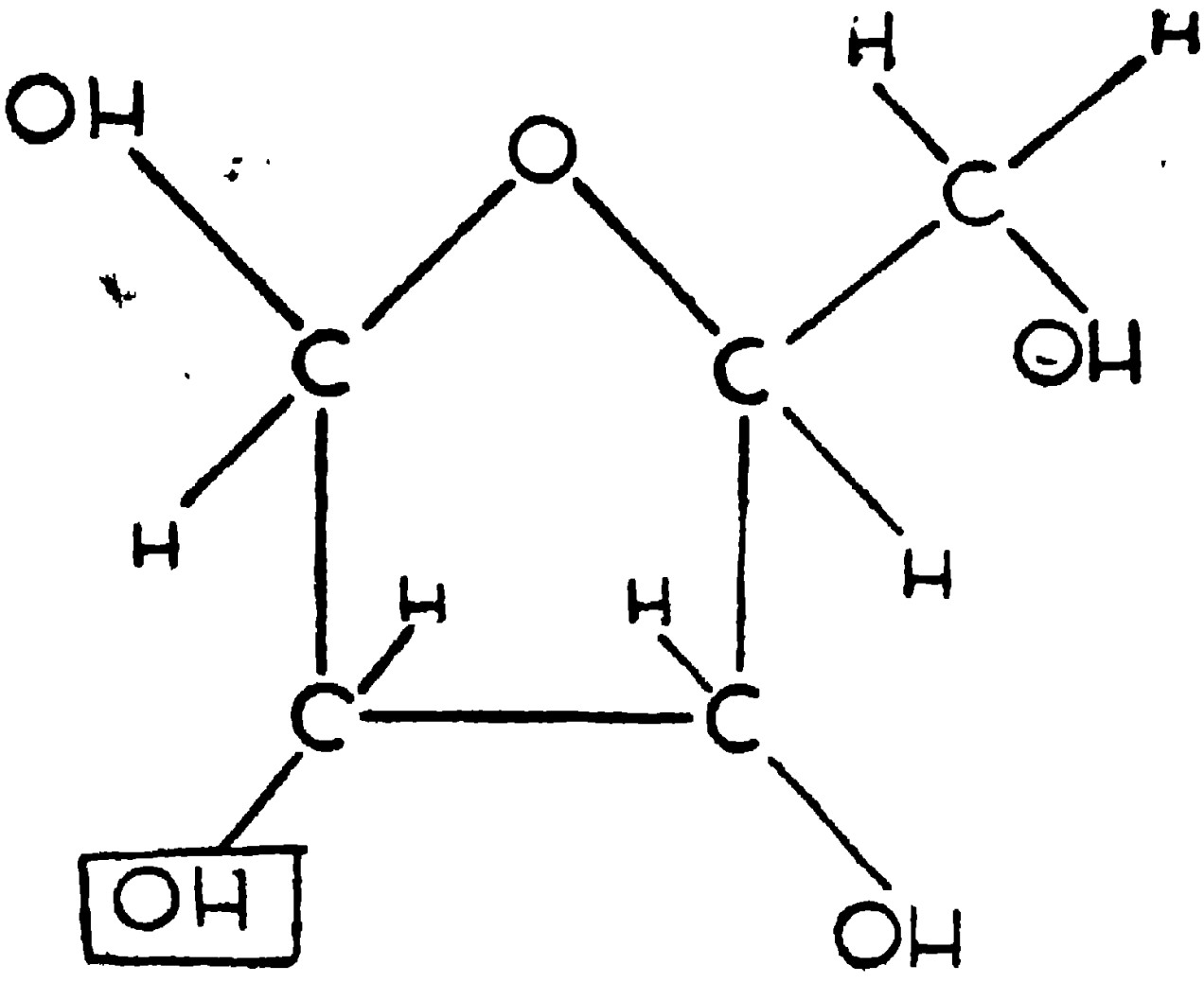
২নং চিত্র। রিবোজ
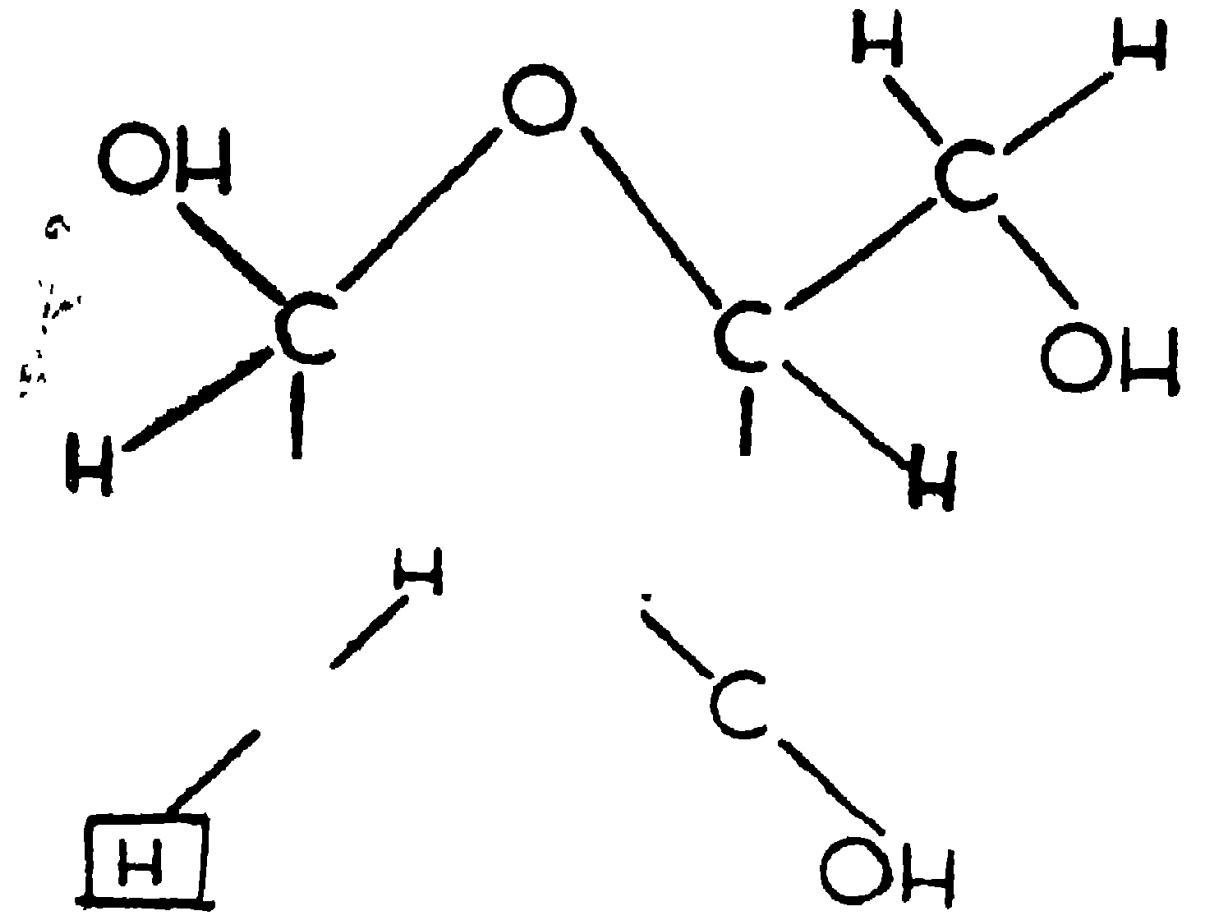
ডিঅক্সিরিবোজ

কারণ নিউক্লিয়াসের অভ্যন্তরে যে ক্রোমোজোম এবং জিন আছে, তাহারাই প্রত্যেকটি কোষের কাজ, গুণাগুণ, ঘনত্ব ইত্যাদি নির্দেশ ও নির্ধারণ করে। নিউক্লিয়াসটি একটি ঝিল্লী বা মেমব্রেনের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে। ইহাকে নিউক্লিয়ার মেমব্রেন বলে এবং ইহা প্লাজ্‌মা বা সেল মেমব্রেনের ন্যায় প্রোটিন ও লিপিডের দ্বারা গঠিত। নিউক্লিয়াসের অভ্যন্তরে খুব ঘন সূক্ষ্ম সুতার জালিকা দেখা যায়, ইহাকে ক্রোমাটিন বলে। ইহারা কোষের বিভাজনের সময় সুস্পষ্ট ও নির্দিষ্ট সংখ্যক ক্রোমোজোমে পরিণত হয়। ক্রোমাটিনকে কোষের হেরিডিট্যারী মেটেরিয়্যাল বা বংশগত উপাদান বলা যায়। নিষিক্ত ডিম ক্রমাগত ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করে, তাহারাই ঐ সকল গুণাগুণ নির্দেশ ও নির্ধারণ করে। ক্রোমাটিনকে রাসায়নিক বিশ্লেষণ করিলে আমরা চার প্রকারের অণু পাই (১) হিস্টোন। ইহা খুব নিম্ন আণবিক ওজন-বিশিষ্ট প্রোটিন, (২) হিস্টোনের তুলনায় অপেক্ষাকৃত জটিল ও উচ্চ আণবিক ওজনবিশিষ্ট প্রোটিন, (৩) ডিঅক্সিরিবোজ নিউক্লিক অ্যাসিড (Deoxyribose Nucleic Acid) বা DNA এবং (৪) রিবোজ নিউক্লিক অ্যাসিড (Ribose Nucleic Acid) বা RNA। এই চার প্রকারের অণু (যাহাদের হেরিডিট্যারী মলিকিউলও বলে) পরস্পর সংযুক্ত হইয়া ক্রোমাটিন গঠন করে। বিভিন্ন প্রাণী ও উদ্ভিদের ভিতর যে পার্থক্য, তাহা এই DNA-র উপরই নির্ভর করে।

ডি. এন. এ—রাসায়নিক বিশ্লেষণে দেখা গিয়াছে যে, DNA হইতেছে খুবই উচ্চ আণবিক ওজনবিশিষ্ট কম্পাউণ্ড বা যৌগিক পদার্থ। ইহা অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরস্পর সংযুক্ত অণুর দ্বারা গঠিত। এই সকল অণুর মধ্যে রহিয়াছে সুগার-এস, ডিঅক্সিরিবোজ, ফস্‌ফোরিক অ্যাসিড এবং চার প্রকারের নাইট্রোজেনযুক্ত বেস্‌। এই চার প্রকারের বেস্‌ হইল—অ্যাডেনিন-এ, থাইমিন-টি, গুয়ানিন-জি ও সাইটোসিন-সি। ইহার মধ্যে অ্যাডেনিন ও গুয়ানিন পিউরিনের অন্তর্ভুক্ত এবং থাইমিন ও সাইটোসিন পাইরিমিডিন-এর (Pyrimidines) অন্তর্ভুক্ত।

সুগার দুই প্রকারের যথা—ডিঅক্সিরিবোজ, (Deoxyribose) এবং রিবোজ (Ribose)। উহাদের ষ্ট্রাক্‌চারাল ফরমুলা ২নং চিত্রের মত। এই ফরমুলা হইতে দেখা যাইতেছে যে, রিবোজ ও ডিঅক্সিরিবোজের ভিতর পার্থক্য শুধুমাত্র একটি অক্সিজেনের অণুর উপর। ডিঅক্সিরিবোজে এক অণু অক্সিজেন রিবোজ অপেক্ষা কম।

ফস্‌ফোরিক অ্যাসিড, অ্যাডেনিন, থাইমিন,

H_3PO_4

ফস্‌ফোরিক অ্যাসিড

গুয়ানিন

N = নাইট্রোজেন, C = কার্বন, H = হাইড্রোজেন

অ্যাডেনিন

O = অক্সিজেন, H = হাইড্রোজেন
C = কার্বন, N = নাইট্রোজেন

থাইমিন

সাইটোসিন

৩নং চিত্র

সাইটোসিন ও গুয়ানিনের ষ্ট্রাক্চারাল ফরমুলা ৩নং চিত্রের মত।

এক্সরে অ্যানালিসিসের দ্বারা দেখা গিয়াছে DNA-এর গঠন একটা প্যাঁচানো সোপানের
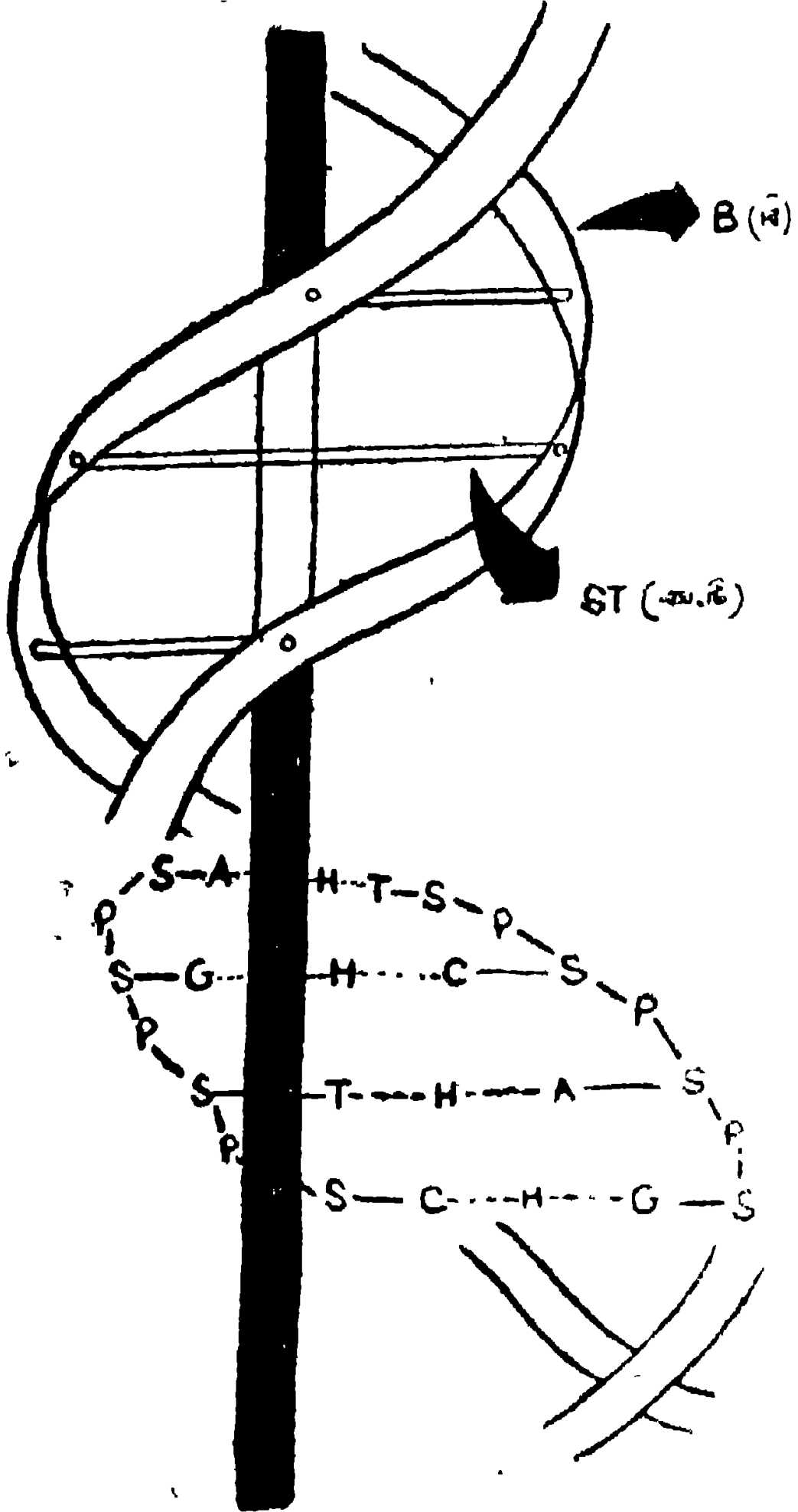
৪নং চিত্র। ডি-এন-এ-র গঠন ও বিন্যাস
B—ব্যানিস্টার বা সোপানস্তম্ভ
ST—স্টেপ (Step) বা ধাপ
S—সুগার (Sugar), P—ফসফেট (Phosphate),
A—অ্যাডেনিন (Adenine),
G—গুয়ানিন Guanine),
T—থাইমিন (Thymine),
C—সাইটোসিন (Cytosine)

মত। ইহার বাহিরের সোপান বা ব্যানিস্টার (Banister, ৪নং চিত্রে—B) পালাক্রমে সুগার (Sugar) এবং ফস্ফেট (Phosphate) দ্বারা গঠিত এবং সোপানের ধাপ (ST) এক এক জোড়া বেসের দ্বারা গঠিত। এই সকল বেসদ্বয়ের বা প্রত্যেক জোড়া বেসের বিন্যাস সব সময় নির্দিষ্ট; যেমন—অ্যাডেনিন ও থাইমিন এবং সাইটোসিন ও গুয়ানিন সব সময়ে সংযুক্ত থাকে। হাইড্রোজেন বণ্ড বেসদ্বয়কে সোপান স্তম্ভ বা ব্যানিস্টারের সহিত বাঁধিয়া রাখে। ৫নং চিত্র হইতে উহার ষ্ট্রাক্চার বা গঠন উপলব্ধি করা যায়।

RNA এবং DNA-র মধ্যে পার্থক্য এই যে, RNA-তে থাইমিনের পরিবর্তে ইউরাসিল (U racil) থাকে। ইহা ছাড়াও RNA-র সুগারে এক অণু অক্সিজেন বেশী থাকে। ইউরাসিলের স্ট্রাক্চারাল ফরমুলা ৬নং চিত্রের মত।

এখন DNAর অভ্যন্তরস্থ এক এক জোড়া বেসের দ্বারা গঠিত সোপানগুলি যে কোন নিয়মে সাজানো থাকিতে পারে এবং এই বিভিন্ন বিন্যাস বিভন্ন নির্দেশ দেয়। ইহাকেই জেনেটিক কোড বা বংশপরম্পরায় প্রাপ্ত গুণাগুণ সঙ্কেত বলা হয়। বর্ণমালায় যেমন আমরা অক্ষরগুলিকে পর পর সাজাইলে বিভিন্ন বাক্য গঠন করিতে পারি, ঠিক সেইরূপ কোডের ঐ সকল বেসদ্বয়ের বিন্যাস হইতে বিভিন্ন বাক্য গঠন করা যায় এবং যাহার পাঠোদ্ধার করিয়া ঐ কোষের গুণাগুণ জানা যায়; অর্থাৎ ঐ বেসদ্বয়ের বিন্যাসের উপর ঐ কোষের গুণাগুণ নির্ভর করে। কারণ প্রোটিন ও RNA-মেসেঞ্জার উৎপাদনের জন্য DNA-ই দায়ী এবং DNA-ই নিজের ছাঁচে RNA-মেসেঞ্জার তৈয়ারি করে। কোষের মধ্যে যে রাইবোজোম নামক অণু আছে, তাহারা RNA-এর লম্বা অণু ধরিয়া বরাবর যায় এবং ঐ সকল RNA-এর তিনটি কোডন বেসের নির্দেশে একটির পর একটি অ্যামিনো

অ্যাসিড লইয়া কোষের অভ্যন্তরে প্রোটিনের জৈব-অংশ প্রস্তুত করে।

বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, ইহা প্রোটিন ও RNA-এর দ্বারা গঠিত। প্রোটিন উৎপাদন ভিন্ন,
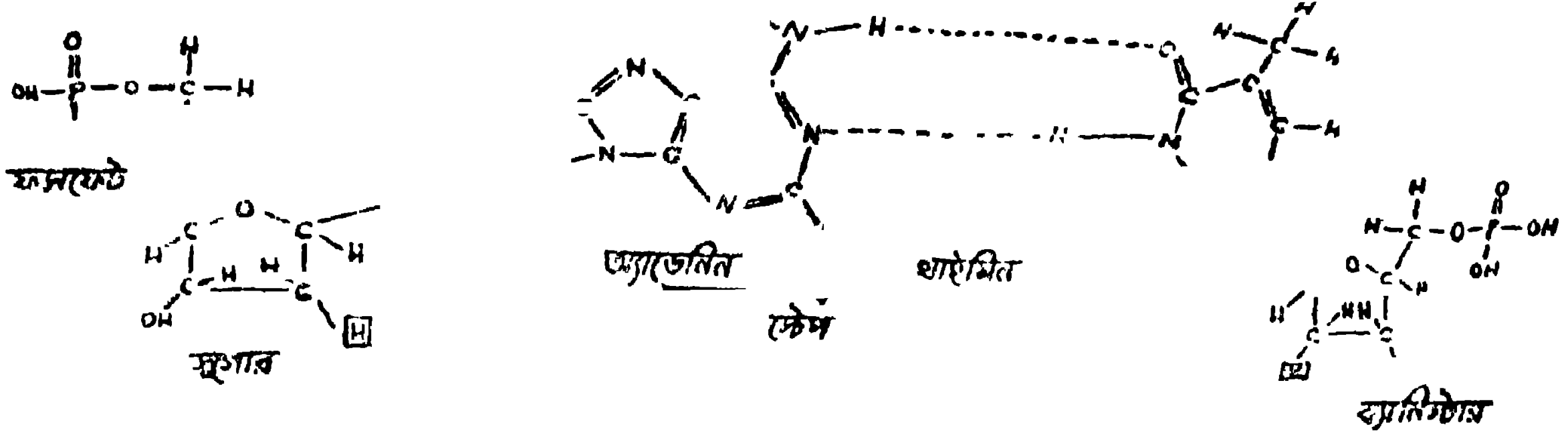
৫নং চিত্র

নিউক্লিয়াসের মধ্যে অপর যে অংশ বর্তমান, তাহাকে নিউক্লিওলাস বলে। ইহা বিশেষ

৬নং চিত্র

ক্রোমোজোমের দ্বারা নিউক্লিয়ার অর্গানাইজার নামক একটি বিশেষ স্থানে গঠিত হয়। ইহাকে ইহার অপর কোন কাজের বিষয় জানা যায় নাই। তবে কোষ-বিভাজনের সময়ে ইহা অদৃশ্য হইয়া যায় এবং নিউক্লিয়াস ও সাইটোপ্লাজমের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করিয়া জেনেটিক ইনফর-মেশন প্রেরণ করে।

কোষ-বিভাজনের সময়ে DNA নিজের অনুরূপ প্রতিলিপি তৈরি করে এবং ইহাকে সেল্ফ-ডুপ্লিকেসন বলে। যেহেতু DNA আত্মরক্ষণশীল, তাই ইহা সম্ভব। কোষ-বিভাজনের সময়ে পিতৃ-কোষের ন্যায় দুইটি ডটার সেল প্রস্তুত হয়। ডটার সেলের অভ্যন্তরে একই প্রকার পিতৃকোষের অনুরূপ DNA থাকে এবং এই ভাবে গুণাগুণ বংশপরম্পরায় থাকিয়া যায়।

মধুর কথা

শ্রীমাধবেন্দ্রনাথ পাল

বেদে মধু মকরন্দ নামে পরিচিত। প্রাচীনকালে ভারতবাসীর নিকট মধু অতীব পবিত্র ও শ্রেষ্ঠ দ্রব্যরূপে গণ্য হতো। তাদের নানাবিধ সামাজিক ও ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপের উপর মধুর বিবিধ ব্যবহার আজন্ম-মৃত্যু ব্যাপক ও নিবিড় প্রভাব বিস্তার করতো। নবজাত সন্তানের মুখে মধু স্পর্শ করানোর সুপ্রাচীন রীতি এখনও বহু হিন্দু পরিবারে প্রতিপালিত হয়। প্রাচীনকালে অতিথি বন্দনায় আবশ্যক পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয় ইত্যাদি চতুর্বিধ উপকরণের মধ্যে মধুপর্ক অন্যতম। জলমিশ্রিত দধি, ঘৃত, শর্করা বা চিনি ও মধু মধুপর্কের উপাদান। চূড়াকরণ, উপনয়ন, বিবাহ এবং শ্রাদ্ধ প্রভৃতি অনুষ্ঠানে এখনও মধুপর্কের ব্যবহারে মধুর প্রচলন বিশেষভাবে লক্ষণীয়। মধু ব্যুৎপত্তিগত অর্থে শ্রেষ্ঠত্বের সূচক।

উৎপত্তি — মধু ফুল ও মৌমাছির সমবেত প্রচেষ্টার অবদান। বস্তুতঃ উদ্ভিদ ও প্রাণী-জগতের অপূর্ব পারস্পরিক সহযোগিতার পরিণামে এই শ্রেষ্ঠ দ্রব্যটির উৎপত্তি হয়। আপন গরজে নানান রঙের হাতছানি দিয়ে ও বিচিত্র সৌরভ ছড়িয়ে ফুলের দল মৌমাছিদের ডাক দিয়ে আনে। মৌমাছিরা ফুলে ফুলে পুষ্পরস পান করতে থাকে। সেই অবসরে কখন অলক্ষ্যে তাদের পায়ে পায়ে ফুলের রেণুকণা লেগে যায়। রেণু-ঢাকা পা নিয়ে যখন মৌমাছিরা অপর ফুলে ফুলে গিয়ে পুষ্পরস পান করতে থাকে, রেণুর কণা সেই সকল ফুলের কেশরের উপর লেগে যায় ও পুষ্পের গর্ভসঞ্চার হয়। এইভাবে মৌমাছিদের পুষ্পরস আহরণ করা হয়ে যায় এবং ফুল থেকে ফুলে উড়ে উড়ে গাছে গাছে ফুলের গর্ভাধান বা ফলের উৎপাদনে মৌমাছিরা সাহায্য করে। প্রকাশ যে, একমাত্র আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়াতেই এইভাবে আট লক্ষ একর চাষের জমি মৌমাছিদের কর্মকুশলতার উপর নির্ভরশীল। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য আমেরিকাতেই পাঁচ লক্ষেরও অধিক মৌমাছি পালক আছেন এবং প্রতি বছরে তাঁদের দ্বারা উৎপন্ন বিক্রীত মধুর পরিমাণ প্রায় দু-শ' মিলিয়ন বা কুড়ি লক্ষ পাউণ্ড অথবা পঁচিশ হাজার মণ। এইভাবে মৌমাছির দল চাষীদের খরচের ত্রিশ গুণ লাভের অঙ্ক ফিরিয়ে দেয়।

কিন্তু পুষ্পরস থেকে কিভাবে মধু সৃষ্টি হয়, এখনও তা রহস্যে আবৃত। মৌমাছি-বিশেষজ্ঞদের অভিমত, কর্মী-মৌমাছিরা ফুলের মধু সংগ্রহ করে তার সঙ্গে মুখের লালা মিশিয়ে সেগুলিকে চাকের গর্তে সঞ্চিত করে রাখে।

মজার কথা, কোন মৌমাছির দল একবার যে ফুল থেকে রস আহরণ করতে থাকে, সেই ফুলের প্রতি আসক্তি ও নিষ্ঠা ত্যাগ করতে পারে না।

শ্রেণীবিভাগ—ঋগ্বেদে উল্লেখ আছে, প্রধানতঃ দুই প্রকার মৌমাছির কথা। এক, অপেক্ষাকৃত বৃহদাকৃতি আরঙ্গর এবং অপরটি ক্ষুদ্রকায় সারঘ। ক্ষুদ্রকায় সারঘের উৎপন্ন মধু বৃহদাকৃতি আরঙ্গর মৌমাছির উৎপন্ন মধু অপেক্ষা শ্রেয়তর বলে কথিত আছে। অপূপ বা পিষ্টকাদি মিষ্ট করবার জন্যে সারঘ মধুর ব্যবহার তখন প্রচলিত ছিল এবং সেটিই সম্ভবতঃ মধুর খাদ্যদ্রব্যরূপে প্রথম ব্যবহারের নিদর্শন। বৃহৎ, ক্ষুদ্র ও কুটির নামক এই ত্রিবিধ

মধুমক্ষিকাজাত মধুর উল্লেখ বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থাদিতে পাওয়া যায়।

আধুনিক কালে মধুর শ্রেণীবিভাগ হয় যে ফুল বা ফলের রস থেকে উৎপন্ন হয়, সেই ফুল বা ফলের জাতি অনুসারে। আপেল, পেয়ার, আম, পদ্ম, ইত্যাদির মধু নামে পরিচিত।

কিন্তু মৌমাছির ভূমিকার প্রাধান্ত বুঝবার জন্যে কিনা কে জানে, আয়ুর্বেদজ্ঞ পণ্ডিতেরা মৌমাছির জাতি অনুসারে আটটি শ্রেণীতে মধু-কে বিভক্ত করেন। সুশ্রুতের মতে যেমন, প্রথম—মাক্ষিক; দ্বিতীয়,—ভ্রামর; তৃতীয়,—ক্ষৌদ্র; চতুর্থ—পৌত্তিকম; পঞ্চম—ছাত্র; ষষ্ঠ—আর্ঘ্য; সপ্তম—ঔদ্দালক; এবং অষ্টম—দাল. এইরূপ আট প্রকার মধুর কথা জানা যায়। সচরাচর মধুমক্ষিকা নামে পরিচিত মৌমাছিদের সাহায্যে উৎপন্ন মধুকে বলে মাক্ষিক। বৃহদা-কৃতি ও কৃষ্ণকায় ভ্রমর নামে পরিচিত মৌমাছি-দের সাহায্যে সৃষ্ট মধু ভ্রামর নামে অভিহিত। এই মধু স্ফটিকের মত নির্মল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কপিলবর্ণ মৌমাছিদের দ্বারা উৎপন্ন মধু ক্ষৌদ্র নামে সুবিদিত। মশার ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ও কৃষ্ণকায় এবং অত্যন্ত পীড়াদায়ক একপ্রকার মধুমক্ষিকা বৃক্ষের কোটরাভ্যন্তরে মধু সঞ্চয় করে, এরা পুত্তিকা নামে পরিচিত। এদের অধ্যবসায়ে জাত মধু ঘৃতের ন্যায় ও তা পৌত্তিকম্ বা পৌত্তিক মধু নামে খ্যাত। কপিল ও পীতবর্ণ একপ্রকার মৌমাছি হিমালয়ের বনে বনে দেখা যায়; এরা ছত্রাকারে মৌচাক প্রস্তুত করে এবং এইরূপ মৌচাকে উৎপন্ন মধু ছাত্র নামে পরিচিত। এই মধু তৃপ্তিকর ও অধিক গুণবিশিষ্ট। এই মধু Haematemesis, কৃমি, শ্বেতি, গনোরিয়া, হিস্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে বিশেষ ফলপ্রদ। ভ্রমরের মত পীতবর্ণ অপর এক প্রকার মৌমাছির সাহায্যে জাত মধুকে বলা হয় আর্ঘ্য। কপিলবর্ণ ক্ষুদ্রকায় এক প্রকার মৌমাছি বল্মীক বা উইয়ের ঢিবির মধ্যে বাস করে। এই মৌমাছিরা অল্প পরিমাণে যে মধু উৎপন্ন করে, তার নাম ঔদ্দালক। যে মধু পুষ্প থেকে ক্ষরিত হয় ও পাতার উপর পড়ে সঞ্চিত হয়, তাকে বলে দাল মধু।

ধর্ম ও উপাদান—মধু সোনালী বর্ণাভ ও থকথকে সিরাপের মত স্ফটিকসদৃশ তরল পদার্থ। প্রধানতঃ গ্লুকোজ ও ফ্রাক্টোজ নামক দুই-প্রকার শর্করার মিশ্রণে মধু ভরপুর থাকে। ইক্ষুশর্করাকে (Cane sugar) কোন অ্যাসিড বা ইন্‌ভার্টেজ নামক এক প্রকার এন্‌জাইমের সাহায্যে আর্দ্রবিশ্লেষণ করলে সমপরিমাণ ডি গ্লুকোজ ও ডি-ফ্রাক্টোজ নামক শর্করা উৎপন্ন হয় এবং একত্রে এরা 'ইনভার্ট' শর্করা নামে পরিচিত। পোলারাইজ্‌ড্ আলোকের তলদেশকে দক্ষিণ মুখে ঘুরিয়ে দিয়ে থাকে বলে চিনি ডেক্স্ট্রো-রোটেটারী শর্করা এবং ইনভার্ট শর্করা ঐ আলোকের তলদেশকে তার বিপরীত দিকে অর্থাৎ বাম মুখে ঘুরিয়ে দিয়ে থাকে বলে তা লেভো-রোটেটারী শর্করা। মধুর ধর্ম লেভো-রোটেটারী শর্করার মত। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, মৌমাছির মধ্যে ইনভার্টেজ নামক এন্‌জাইম বিদ্যমান।

এই দুটি শর্করা ছাড়া মধুর মধ্যে প্রোটিন-জাতীয় পদার্থ, উদ্বায়ী সুগন্ধী তেল, মোম, আঠালো পদার্থ ইত্যাদি ও জল বর্তমান থাকে। তাছাড়া, স্নেহপদার্থ ও জলে দ্রাব্য উভয় প্রকার কিছু কিছু ভিটামিনও মধুতে বিদ্যমান। মধু-মক্ষিকার দেহনিঃসৃত একপ্রকার বিশেষ প্রোটিন ও অতি সামান্য মাত্রায় ফরমিক অ্যাসিড মধুতে পাওয়া যায়। সবচেয়ে রহস্যের কথা, মানুষের দেহে যে সমস্ত উপাদান বিদ্যমান, তার অধি-কাংশই অল্পবিস্তর মধুতে বর্তমান বলে জানা গেছে।

ব্যবহার—চিনি অপেক্ষা মধু বেশী পুষ্টিকারক ও নিরাপদ। মধুর প্রয়োগ প্রায় অফুরন্ত ও অশেষবিধ। দুধের সঙ্গে মিশিয়ে দিলে মধুকে

আদর্শ পানীয়রূপে গণ্য করা যায়। সদ্যোজাত মধু দেহের কোমলতা-প্রসাদক (Demulcent, soothing) ও সারক (Laxative)। একক কিংবা ঘৃতের সঙ্গে মিশ্রিত করে প্রয়োগ করলে মধু পোড়া-ঘা, নালী-ঘা (Ulcer) ইত্যাদি দ্রুত প্রশমিত ও নিরাময় করে। এক বছর অতিক্রান্ত হলে মধু পুরাতন হয়। পুরাতন মধু ধারক, রুক্ষ ও মেদনাশক এবং অত্যন্ত কৃশতাকারক। আয়ুর্বেদের মতে, মেদবাহুল্য নাশ করবার জন্যে অপেক্ষাকৃত পর্যাপ্ত মাত্রায় পুরাতন মধুর প্রয়োগ সুবিহিত। পেশীর পক্ষে মধু সর্বোচ্চ শক্তিগর্ভ ইন্ধনস্বরূপ কাজ করে। বস্তুতঃ যে হৃদয় অনবরতঃ বিরামহীন সক্রিয় থাকে, সেই হৃদয়-পেশীর পক্ষে মধু অত্যন্ত হিতকর। কথিত আছে, পুরাকালে গোলিয়াথ ও হারকিউলিয়াস আহার্যসামগ্রীর মধ্যে নিত্য মধু সেবন করতো। তাদের অনন্ত শক্তি, বীর্য ও ক্ষমতার উৎসই হচ্ছে মধু।

এক কাপ শীতল জলে দুই চামচ মধু মিশ্রিত করে শোবার পূর্বে পান করলে গভীর ও নিবিড় নিদ্রা হয়। শিশুদের মধু চাটিয়ে দিলেই ঘুমিয়ে পড়তে দেখা যায়। রক্তরোধক (Styptic) হিসাবেও মধুর ব্যবহার হয়। বহুমূত্র রোগীর পক্ষে মধু ক্ষতিকারক নয়। সেজন্যে বহুমূত্র রোগের অপর এক নাম মধুমেহ।

আয়ুর্বেদের মতে মধু যোগবাহী পদার্থ। অন্য যে কোন দ্রব্যে মধু মিশ্রিত করলে সেই দ্রব্যের গুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। মধু দেহাভ্যন্তরে সূক্ষ্ম স্রোতসমূহে দ্রুতগামী। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রমতে মকরধ্বজ মধুমিশ্রিত ছাড়া কোন ক্ষেত্রে কখনও ব্যবহারের বিধি দেওয়া হয় না। এতে মকরধ্বজের ভেষজ-ক্ষমতা বর্ধিত হতে দেখা গেছে।*

আধুনিক বিজ্ঞানের মতেও মধু একটি বিশিষ্ট মাধ্যম বা বাহক (Vehicle)। বিশেষতঃ শিশুদের সর্দি ও জ্বরে তিক্ত ও কটু ঔষধ (মিকৃশ্চার) মধু-মিশ্রিত করে দিলে তৃপ্তিকর হয়।

শিল্পক্ষেত্রেও মধুর ব্যবহার নানাভাবে হয়। পাউরুটি প্রস্তুত করতে এবং তামাক সুমিষ্ট ও স্থায়ী করবার উদ্দেশ্যে মধু প্রয়োগ করা হয়। এই জন্যে তামাকের কারখানাগুলিতে বছরে লক্ষ লক্ষ পাউণ্ড মধু কেনা হয়। পোড়া কাঠকয়লার চূর্ণ মিশিয়ে মধু দিয়ে দাঁত মাজলে তুষারের মত নির্মল ও ধবল হয়।

কর্মরীতির রহস্য—অশেষ গুণসম্পন্ন মধুর কর্ম রীতির রহস্য (Mechanism of action) প্রায় অনুদ্‌ঘাটিত বলা যায়। যে উৎস থেকে এবং যেভাবে মধু উৎপন্ন হয়, সেই উৎসের অবস্থা বিচার করলে মধু কিভাবে দেহাভ্যন্তরে তৎপর হয়, অর্থাৎ তার কর্মরীতির রহস্যের উপর কিছু আলোকপাত করা সম্ভব। ফুলের রসে শর্করা বর্তমান। মৌমাছিদের বার বার জিভ বের করা ও ঢুকাবার সময়ে মৌমাছি দের মধ্যে অবস্থিত ইন্‌ভার্টেজ এন্‌জাইমের সংস্পর্শে ফুলের দল থেকে আহৃত রসস্থিত শর্করা আর্দ্র-বিশ্লিষ্ট হয়ে যায় এবং কয়েক সপ্তাহের মধ্যে মধুর সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন শ্রেণীর মৌমাছির মধ্যে ইনভার্টেজের মাত্রা বিভিন্ন এবং এইরূপ বিভিন্ন মাত্রায় বিরাজমান ইনভার্টেজের জন্যে ভিন্ন ভিন্ন জাতির মৌমাছির সাহায্যে উৎপন্ন মধুতে গ্লুকোজ ও ফ্রাক্‌টোজের পরিমাণ ভিন্ন ভিন্ন হওয়া স্বাভাবিক বলে মনে হয় না কি? পূর্বে বর্ণিত আট প্রকার মধুর ভিন্ন ভিন্ন গুণাগুণের কারণ সম্বন্ধে এইভাবে ভেবে দেখা যেতে পারে কি না—তা পরীক্ষা-নিরীক্ষার অপেক্ষা রাখে। অধুনা মৌমাছি পালকেরা কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত মৌচাকের নিকটে চিনির রস দিয়ে লক্ষ্য করেছেন যে, মৌমাছিদের তৎপরতায় তা থেকে প্রচুর মধু

---

* এই বিষয়ে বিশদ বিবরণ 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার ২১ বর্ষ, মার্চ, ১৯৬৮, ৩য় সংখ্যায় প্রকাশিত লেখকের 'মকরধ্বজের রহস্য' প্রবন্ধে উল্লেখিত হয়েছে।

উৎপাদন করা যায়। সুতরাং ফুল বা ফলের জাতিভেদ অপেক্ষা মৌমাছিদের জাতিভেদ অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন মধুর নামকরণের আয়ুর্বেদীয় রীতি কত বেশী তাৎপর্যপূর্ণ, তাও বিবেচনার বিষয়।

মিচুরিন ও প্যাভ্লভের মতবাদের উপর নির্ভর করে জনৈক রুশ বিজ্ঞানী ৮৫ প্রকার নতুন মধু উৎপাদন করেছেন। এই সকল পরীক্ষা থেকে এই কথা প্রমাণিত হয় যে, ইচ্ছামত রাসায়নিক ও জৈব উপকরণে সমৃদ্ধ মধু যে কোন ঋতুতে মধুমক্ষিকার সাহায্যে প্রস্তুত করানো সম্ভব।

দেহের ভিতর শর্করার বিপাক-ক্রিয়া (Metabolism) কিভাবে সংঘটিত হয়, তা ভালভাবে বুঝতে পারলে মধুর ভূমিকা অনুধাবন করা সম্ভব। শর্করা আদ্র´বিশ্লেষণের পরিণামে প্রধানতঃ গ্লুকোজ ও ফ্রাক্টোজ শর্করাতে রূপান্তরিত হয়। অথচ মধুতে এই দুটি শর্করা পূর্ব থেকেই বিদ্যমান। সুতরাং মধুর কার্যকারিতা অধিকতর হওয়াটাই স্বাভাবিক নয় কি? আদ্র´বিশ্লেষণের পথে অপরিহার্য নানারূপ কলা-কৌশল ও সময়ের হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়াতে মধুর দ্রুত কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি সম্ভব হয়।

আমাদের যকৃৎ ও পেশীসমূহে ফ্রাক্টোজ শর্করা গ্লুকোজ শর্করাতে পরিণত হয়ে যায়। গ্লুকোজ শর্করা কালক্রমে মেদরূপে সঞ্চিত হয়। তরুণ বা নতুন মধু মেদ বৃদ্ধিকর; অথচ পর্যাপ্ত পরিমাণে পুরাতন মধু সেবন মেদনাশক। সুতরাং কালক্রমে মধুতে গ্লুকোজের হ্রাস ও ফ্রাক্টোজের বৃদ্ধি ঘটে কি না, এই বিষয়টি পরীক্ষা-নিরীক্ষার আলোকে বিচারের অপেক্ষা রাখে। মাধব নিদানম্ গ্রন্থে উল্লেখ আছে:—

"মেদসাবৃত মার্গত্বাৎ পুষ্যন্ত্যন্যে ন ধাতবঃ।
মেদস্তু চীয়তে তস্মাৎ অশক্তঃ সর্বকর্ম্মসু॥"

জীর্ণ আহারের প্রসাদে বা পরিণামে ক্রমান্বয়ে অন্নরস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র নামক এই সাতটি উপাদান বা ধাতু পর পর উৎপন্ন হয়, এটাই আয়ুর্বেদের অভিমত। কোন কারণে একবার মেদ অধিকমাত্রায় সঞ্চিত হতে থাকলে পরবর্তী অস্থি, মজ্জা ও শুক্র ধাতুসমূহের উৎপাদন বিঘ্নিত হয় এবং দেহের আভ্যন্তরীণ ক্রিয়াকলাপসমূহ বিশৃঙ্খলায় পর্যবসিত হয়। মাধব করের মতে এটাই পরিলক্ষিত হয়েছে। সেক্ষেত্রে পুরাতন মধুতে বিদ্যমান গ্লুকোজ ও ফ্রাক্টোজের মাত্রার তারতম্যের মধ্যে মেদনাশের কারণ নিহিত কিনা, সে দিকটিও ভাববার বিষয়।

মধু পুরাতন হ'লেই বেশী কার্যকর হচ্ছে লক্ষ্য করা যায়। মধুতে সামান্য পরিমাণে ফরমিক অ্যাসিড বর্তমান। ফরমিক অ্যাসিড অণুর একটি হাইড্রোজেন পরমাণু অপর আর একটি ফরমিক অ্যাসিড অণুর হাইড্রোজেন পরমাণুর সঙ্গে বিশেষ একভাবে জড়াজড়ি করে থাকবার ক্ষমতা রাখে। এই ব্যাপারটিকে আধুনিক বিজ্ঞানের ভাষায় বলে হাইড্রোজেন বণ্ডিং বা চেলেশন। সহজ কথায় বলতে পারা যায় হাইড্রোজেন-বন্ধন। বহুরাস্তে এইরূপ হাইড্রোজেন-বন্ধনের কাজটি সম্পূর্ণ হবার ফলে মধুর বিশেষ কার্য পরিলক্ষিত হতে থাকে কিনা, এই দিক থেকে ভেবে দেখবার বিষয় মনে হয়।

মধুতে ডায়াস্টেজ, ইনভার্টেজ, ক্যাটালেজ, পেরোক্সিডেজ ও লাইপেজ নামক এন্জাইমসমূহ বিদ্যমান বলে জানা গেছে। যে সকল খাদ্যদ্রব্যে এন্জাইমের পরিমাণ সর্বোচ্চ, তাদের মধ্যে মধু অন্যতম। স্টার্চ ও ডেক্সট্রিন্ ডায়াস্টেজ এন্জাইমের সাহায্যে চিনিতে রূপান্তরিত হয়। ইনভার্টেজ এন্জাইম বিট ও আখের চিনিকে গ্লুকোজ ও ফ্রাক্টোজ চিনিতে এবং লাইপেজ এন্জাইম্ ফ্যাট বা মেদজ পদার্থকে ফ্যাটি অ্যাসিড ও গ্লিসারিন এই দুই পদার্থে রূপান্তরিত করে। একদল বিজ্ঞানীর ধারণা, মধুর যে এত হিতকর ধর্ম বর্তমান,

তার কারণ মধুতে বিদ্যমান এন্‌জাইমসমূহের মধ্যে নিহিত আছে।

আয়ুর্বেদের মতে, গরম অবস্থায় মধু কখনও সেবনীয় নয় কেন, তাও পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাহায্যে স্থির করা দরকার। গরম অবস্থায় মধু সেবনে এন্‌জাইমসমূহের হিতকর তৎপরতা বিঘ্নিত হয় কি না, কে জানে!

মধুর মধ্যে জীবাণুনাশের ক্ষমতা বর্তমান, তা কতকগুলি পরীক্ষা-নিরীক্ষাতে জানা গেছে। সাদা ইঁদুরের দেহে হিমালাইটিক স্ট্রেপ্টো-কক্কাস্ জীবাণু সংক্রামিত করে মধু প্রয়োগ করলে জীবাণুর বংশবৃদ্ধির হার বাধাপ্রাপ্ত হতে দেখা গেছে। গিনিপিগের দেহে ক্ষত সৃষ্টি করবার পর তার মধ্যে জীবাণু সংক্রামিত করে মধু দিয়ে দেখা গেছে যে, নিয়ন্ত্রণাধীন ইঁদুর অপেক্ষা এইভাবে মধু-প্রযুক্ত গিনিপিগ দীর্ঘদিন বেঁচে থাকে। নানা জনে এর নানা কারণ দেখাতে চেষ্টা করেন। একদলের ধারণা, চিনি অত্যধিক মাত্রায় বর্তমান বলেই মধুর এইরূপ জীবাণুনাশের ক্ষমতা জন্মায়। মধুতে অ্যাসিড আছে বলে এইরূপ ক্ষমতা দেখা যায়, অনেকে এই কথা বলেন। আবার কারো কারো মতে, এন্‌জাইম ও চিনির মাত্রাধিক্যজনিত সম্মিলিত প্রভাবেই জীবাণুনাশের ক্ষমতা সৃষ্টি হয়। মধুর মধ্যে তাপ ও আলোর সংস্পর্শে অস্থায়ী অ্যাণ্টিবায়োটিক উৎপন্ন হয়—এই কথা একজন রুশ বিজ্ঞানী জানিয়েছেন। এইরূপ অ্যাণ্টিবায়ো-টিকসমূহকে তাঁরা জীবাণু বংশবৃদ্ধির ব্যাঘাত সৃষ্টি-কারী পদার্থ বা ইনহিবিটর বলে থাকেন।

উপসংহার—আমাদের জীবনে মধু যে কত-খানি ও কত গভীর স্থান জুড়ে আছে, আমরা তা প্রায়ই ভেবে দেখি না। প্রাচীন ভারতীয় ঋষিরা সে বিষয়ে সতত সজাগ থাকতেন, তার নিদর্শন বেদের মন্ত্রসমূহের মধ্যে পরিব্যাপ্ত। "মধু বাতা ঋতায়তে, মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ। মাধ্বী নঃ সন্তোষধীঃ॥"—"মধুময় বাতাস বইছে, বয়ে চলুক; নদীগুলি মধু ক্ষরণ করুক এবং ওষধি বা শস্যসমূহ মধুময় হোক।" এই ছিল তাঁদের নিরন্তর অন্তরের কামনা।

আধুনিক বিজ্ঞানের দৌলতে জানা গেছে, আলোকসংশ্লেষণের মাধ্যমে কার্বন ডায়োক্সাইড গ্যাস ও জল উদ্ভিদের পাতায় পাতায় গ্লুকোজ উৎপন্ন করে এবং তাদের অণুতে সৌরশক্তি আটক করে রাখে। গ্লুকোজ থেকে ধাপে ধাপে শর্করা, নানবিধ জটিল জৈব-রাসায়নিক প্রক্রিয়ার পথে শর্করা, কার্বোহাইড্রেট, আমিষ, স্নেহজাতীয় পদার্থ ও ভিটামিন ইত্যাদি পদার্থসমূহ উৎপন্ন হয়। প্রাণ-বস্ত পদার্থসমূহের মধ্যে এই সকল পদার্থ বিদ্যমান যখনই শক্তির আবশ্যক হয় প্রাণবন্ত পদার্থের মধ্যে, এই সমস্ত পদার্থ আবার বিপরীত প্রক্রিয়ায় ধাপে ধাপে বিভিন্ন এন্‌জাইমের সংস্পর্শে ভেঙ্গে-চুরে যায় এবং তাদের মধ্যে রুদ্ধ সৌরশক্তি নির্গত হয়। এইভাবে পরিণামে গ্লুকোজ তৈরি হয় এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে গ্লুকোজ সম্পূর্ণরূপে বিশ্লিষ্ট হয়ে কার্বন ডায়োক্সাইড গ্যাস ও জলের পুনরাবির্ভাব ঘটে এবং রুদ্ধ সৌরশক্তি মুক্তি পায়। কার্বন-ডায়োক্সাইড গ্যাস ও জল এইরূপ চক্রাকার পথে একবার সৌরশক্তিকে প্রাণবন্ত পদার্থের মধ্যে আটক করে রাখে এবং প্রয়োজন হলে আটক শক্তি মুক্ত করে দেয়। বলা বাহুল্য এইরূপ চক্রাকার প্রক্রিয়ায় গ্লুকোজের ভূমিকা প্রাথমিক ও চূড়ান্ত পর্যায়ে অতীব গুরুত্বপূর্ণ। মধুর ভূমিকা সেইরূপ ক্ষেত্রে কত তাৎপর্যপূর্ণ হওয়া সম্ভব, তা বিশেষভাবে অনুমেয়। সুতরাং আধুনিক বিজ্ঞানের কলাকৌশলের সাহায্যে মধুর ভূমিকা তথা মর্মোদ্‌ঘাটনের ব্যবস্থা, এটাই তো সাম্প্রতিক চিন্তাভাবনার অঙ্গ হওয়া উচিত।

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

মার্চ ১৯৭০

২৩শ বর্ষ — ৩য় সংখ্যা

চিড়িয়াখানার জলহস্তী দম্পতী টোনি আর গ্রেটেল। এরা বিগত সতেরো বছরের মধ্যে তেরোটি বাচ্চা প্রসব করেছে।

ভারতের জাতীয় প্রাণী—সিংহ

তোমরা অনেকেই হয়তো জান যে, পশুরাজ সিংহ ভারতের জাতীয় প্রাণী হিসাবে স্বীকৃত হয়েছে। এ মর্যাদা তার যথার্থ প্রাপ্য। সিংহ আমাদের জাতীয় সম্পদ। বন্য প্রাণী-জগতে সিংহ বিরলতম প্রাণী। একদিন ভারতের নানা স্থানে এরা বিচরণ করতো। ভারতের উত্তরাঞ্চলে প্রায় সর্বত্র আর দক্ষিণে নর্মদা পর্যন্ত এদের দেখা মিলতো। আর আজ গুজরাটের গির অরণ্য অঞ্চলের কয়েক শত বর্গমাইল ছাড়া তাদের অস্তিত্ব দেখা যায় না, তাও আবার সংখ্যায় গুণে বলা যায়। বর্তমানে প্রায় ৩০০টির অধিক সিংহের দর্শন মেলা ভার। সেই কারণে সিংহ এক অমূল্য জাতীয় সম্পদ। বিশ্বের নানা জায়গায়ও একদিন সিংহ পাওয়া যেত। কিন্তু আজকের দিনে আফ্রিকা আর ভারত ছাড়া সিংহের নিবাস আর কোথাও নেই।

সিংহ স্তন্যপায়ী শ্রেণীর কারনিভোরা বর্গের অন্তর্গত। এরা আমিষভোজী। সিংহের বৈজ্ঞানিক নাম প্যান্থেরা লিও। ভারতীয় সিংহ—প্যান্থেরা লিও পারসিকা আর আফ্রিকার সিংহ—প্যান্থেরা লিও লিও। কেশরের অধিকারী কেবল পুরুষ সিংহ। পশুরাজের আকৃতি রাজোচিত। মোটামুটি ভারতীয় সিংহ লেজসহ প্রায় সাড়ে নয় ফুট পর্যন্ত লম্বা হতে পারে এবং উচ্চতায় প্রায় চল্লিশ ইঞ্চি। ওজনও এদের চার-পাঁচ-শ' পাউণ্ড হওয়া বিচিত্র নয়। তবে আফ্রিকার সিংহ ভারতীয় সিংহ অপেক্ষা আকারে বড় হয়ে থাকে। সিংহের দেহবর্ণ পাটকেল বা অল্প বাদামী মেশান হলুদে বা অনেকটা স্বর্ণাভ। কেশরের রঙ দেহবর্ণ অপেক্ষা গাঢ় হয়। কেশরের লোম প্রায় এক ফুটের মত লম্বা। বন্দী অবস্থায় বা চিড়িয়াখানায় সিংহের কেশর বেশ ঝাঁকড়া আর বড় হয়ে থাকে। অনেকের মতে ঝোপ-ঝাড়ে চলাফেরার সময় বাধা সৃষ্টি করে বলেই বন্য সিংহের কেশর ছোট হয়। বিখ্যাত ই. পি. জীর মতে জলবায়ুর তারতম্যের জন্যেই এই তফাৎ।

সাধারণতঃ সিংহরা একা থাকে না, পরিবার নিয়ে থাকে, যাকে বলে প্রাইড। প্রাইডে একটি সিংহের সঙ্গে থাকে একাধিক সিংহিণী আর থাকে নানা বয়সের বাচ্চা। একটি সিংহকে যেমন একই সময় একাধিক সিংহিণীর সঙ্গে মিলিত হতে দেখা যায়, তেমনি আবার অনেক সময় একই সিংহিণীর সঙ্গে বসবাসের দৃষ্টান্তও আছে। সিংহ প্রায় ছয় বছরের মধ্যে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। বসন্তকালই এদের সন্তানের জন্ম দেবার সময় বলে জানা যায়। স্ত্রী সিংহ দুই থেকে তিন বা অনেক ক্ষেত্রে ছয়টি পর্যন্ত সন্তানের জন্ম দিয়ে থাকে। এরা বাঁচে প্রায় ত্রিশ-চল্লিশ বছর। সিংহের একটি বিশেষত্ব হচ্ছে যে, একটি দল বা প্রাইডের যে কোন সিংহিণীর বাচ্চা অন্য যে কোন সিংহিণীর দুধ পান করতে পারে। একের শাবককে অপরে দেখাশোনা ও যত্ন করে। সিংহ-শিশুর প্রায় তিন বছর

বয়সের সময় কেশর জন্মায়। শাবকদের দেহে দাগ থাকে। অবশ্য তা জন্মের প্রায় চার মাসের মধ্যেই মিলিয়ে যায়। বাচ্চারা শিকারের সময় মা-বাবার সঙ্গে যায় না। তারা তখন থাকে তাদের ডেরায়। পরে বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে তারা বাইরে যেতে আরম্ভ করে। তবে একা নয়, বাবা-মার মধ্যে একজন না একজন সঙ্গে থাকে। কেমন করে শিকার করতে হয় মায়েরা বাচ্চাদের শিখিয়ে দেয়। প্রায় পাঁচ-ছয় বছর বয়সের সময় থেকেই সিংহ-শাবক বাপ-মায়ের সঙ্গে শিকারে যায়।

সাধারণতঃ সিংহ রাত্রেই শিকার করে। বেশ ক্ষুধার্ত হলে দিনের বেলাতেও এরা খাদ্যের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে। মেঘলা দিনেও এরা কখনো কখনো শিকার করতে যায়। প্রধানতঃ সূর্যাস্ত থেকে মধ্য রাত্রি পর্যন্ত এদের শিকারের সময়, কিন্তু দিনের বেলায় সিংহ বিশ্রাম করতে পছন্দ করে। হরিণ, জেব্রা, শূকর প্রভৃতি এদের প্রিয় খাদ্য। প্রয়োজনে এরা গৃহপালিত পশু হত্যা করে। এই প্রয়োজন হয় খাদ্যাভাব ঘটলে। ক্ষুধার্ত না হলে সিংহ বড় একটা প্রাণী হত্যা করে না; আর নির্বিচারে প্রাণী হত্যা করে শিকারও নিশ্চিহ্ন করে দেয় না। সিংহের শিকারের শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার হচ্ছে তাদের নখওয়ালা প্রায় ১৮৷১৯ ইঞ্চি পরিমাপের থাবা। এই থাবার আঘাতে এরা শিকারের ভবলীলা সাঙ্গ করে দেয়। ঘাড়ে কামড় দিয়েও এরা প্রাণী হত্যা করে। কখনো নাকে বা মুখে কামড়ে ধরে খুব ঝাকুনি দিয়ে শিকারের ঘাড় মটকে দেয়। মোট কথা সিংহ অনায়াসেই যে কোন প্রাণীর মৃত্যু ঘটাতে পারে। এরা সাধারণতঃ দল বেঁধেই শিকার করে। শিকারকে তাড়া দেবার সময় সিংহের গতিবেগ হয় তীব্র। শিকার ছোট বড় দুই-ই হয়। শিকারের পর্ব শেষ হলে বড় সিংহরাই শিকারের প্রায় বেশীর ভাগ খেয়ে ফেলে। ছিটেফোঁটা প্রসাদ যা পড়ে থাকে, শাবকেরা তা নিয়েই উদরপূর্তি করে। এতে অনেক সময় এদের পেট ভরে না আর তাই এরা বাড়তেও পারে না। ফলে অনেকই মারা পড়ে ও সিংহের সংখ্যাও কমতে থাকে। পচা মাংস খেতেও সিংহের আপত্তি নেই। এরা অনেক সময় শিকারের কিছু অংশ খেয়ে অবশিষ্টাংশ লুকিয়ে রাখে। পরে তার সদ্ব্যাহার করে। যা হোক আহারপর্ব মিটে গেলে একটা জলাশয়ে গিয়ে বহুক্ষণ ধরে সিংহ বেশ কিছুটা জল পান করে নেয়। তার পর নিরিবিলি জায়গায় গিয়ে সুখনিদ্রায় মগ্ন হয়। সাধারণতঃ শুষ্ক নদীবক্ষ, জলভূমি তাদের অস্থায়ী সুখশয্যা। কিন্তু রাত্রির অবসানে এরা বাসায় ফিরে যায়, সেখানে আবার এদের একটানা দিবানিদ্রা।

সিংহ বনের শ্রেষ্ঠ জীব হলে কি হবে, এরা কিন্তু খুব গভীর অরণ্যে থাকে না। স্বভাবে এরা কুঁড়ে আর আয়েসী। শুয়ে আর বসে সময় কাটানোই এদের স্বভাব। খুব ক্ষুধার্ত হয়েও অনেক সময় এরা বড় একটা কষ্ট স্বীকার করতে চায় না। যদি একটা হরিণ মিলে যায়, তবে অন্য শিকার প্রায়ই খোঁজে না। অনেকের ধারণা সিংহেরা ভীতু ও কাপুরুষ, খালি বিপদ এড়াবার চেষ্টা করে, আক্রান্ত হলেও বাধা দেবার চেষ্টা করে না।

কিন্তু সব সময় এ ধারণা ঠিক নয়, এরা নির্ভীক ও সাহসী। অনেক সময় দেখা যায় বিপদেও ভয় নেই এদের। কাউকে এরা গ্রাহ্যের মধ্যে আনে না, এমন কি মানুষকেও না। শিকার দেখেও সিংহ তার পাশ দিয়ে চলে যাবে, ফিরেও তাকাবে না। সিংহ যে অঞ্চলে বাস করে সেখানে মানুষের যাতায়াত থাকলেও শোনা যায় তাদেরকে এরা আক্রমণ করে না। আবার এরা এমন হিংস্র ও নিষ্ঠুর হয়ে ওঠে, যার তুলনা মেলা ভার। আহত অবস্থায় সিংহ অতি ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে।

সিংহগর্জন বা সিংহনাদ আতঙ্কের সৃষ্টি করে। অনেক কারণেই সিংহ গর্জন করে—কখনো ক্ষুধার্ত হয়ে, কখনো ভয় পেয়ে, কখনো বা রাগে। এই গর্জনের ফলে অনেক সময় শিকার এসে যায় এদের আয়ত্তে। রাত্রে যদি এরা খাদ্য জোটাতে না পারে, তখন মাটির কাছে মুখ নিয়ে এসে এমন গর্জন করতে থাকে, যার ফলে ভয় পেয়ে বহু প্রাণী হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে বাসা ছেড়ে ছুটে পালাবার চেষ্টা করে, আর পালাতে গিয়ে পড়ে যায় সিংহের নাগালের মধ্যে। কখনো কখনো এরা লোকালয়ের বাইরে থেকে হুঙ্কার ছাড়তে থাকে। সেই সিংহনাদ শুনে গবাদিপশু তাদের বাঁধন ছিঁড়ে বেরিয়ে সিংহের খপ্পরে পড়ে যায়। এরকম নানা কারণে সিংহ গর্জন করে থাকে। এক সময়ে যুদ্ধে যে হুঙ্কার ও গর্জন করতে করতে যোদ্ধারা শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়তো, তাকে বলা হয় সিংহনাদ।

শৌর্য আর শক্তির প্রতীকরূপে সিংহ প্রাচীনকাল থেকে দেশে ও বিদেশে গণ্য হয়ে এসেছে। প্রাচীন গ্রীক ও রোমক সভ্যতায় শক্তি ও বীর্যের প্রতীকরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল পশুরাজ সিংহ। শক্তি ও শৌর্যের নিদর্শন ছিল সিংহকে পরাজিত করা। হারকিউলিস ও সামসনের গল্প তার সুস্পষ্ট প্রমাণ। শক্তিরূপা দুর্গা আমাদের দেশে সিংহ বাহিনী। ব্যক্তিত্ব ও বিরাটত্বের প্রতীক হিসাবে সিংহকেই ধরা হয়। প্রধান তোরণকে বলা হয় সিংহ দরজা বা সিংহ তোরণ। ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ও দৃঢ়চরিত্রের পুরুষকে বলি পুরুষ-সিংহ। একদা প্রাচীন রোমে সিংহ এবং মানুষের লড়াইয়ের জন্যে তৈরি হতো রঙ্গভূমি। সেখানে রোমান সম্রাটরা উপভোগ করতেন সিংহ ও মানুষের লড়াই। সে লড়াইয়ে সিংহকে পরাস্ত করতে পারলে বীর বলে স্বীকৃতি পাওয়া যেত। চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় নাকি মানুষ ও সিংহের মধ্যে লড়াইয়ের ব্যবস্থা করা হতো। দেশ-বিদেশে স্থাপত্য, শিল্প ও অলঙ্করণেও সিংহ বা সিংহের অঙ্গবিশেষ নানাভাবে শোভা পেয়েছে।

শ্রীবিশ্বনাথ মিত্র*

*প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন।

চোরাবালি

প্রকৃতি রহস্যময়ী একথা আমরা জানি। বিশাল এই পৃথিবীর নানা রহস্যময় রূপের সঙ্গে আমাদের পরিচয়ও আছে। কোথাও আকাশচুম্বী পাহাড়-পর্বত, কোথাও বিস্তীর্ণ সমতল ভূমি, কোথাও দিগন্ত বিস্তৃত সমুদ্র বা দু-কূলপ্লাবী নদী, আবার কোথাও বা রুক্ষ বালুকারাশিতে গঠিত বিশাল মরুভূমি। এসব বড় বড় রহস্য ছাড়া প্রকৃতির রাজ্যে ছোট ছোট রহস্যও ছড়িয়ে আছে অনেক। তার মধ্যে একটি ছোট রহস্যের নাম চোরাবালি। নাম শুনলেই মনে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। এই নামকরণ কে কবে করেছিলেন, তা না জানলেও আপাতদৃষ্টিতে বিচার করলে মনে হয় নামকরণের সার্থকতা আছে।

সাধারণ মানুষের চোরাবালি সম্পর্কে ধারণা খুবই ভয়প্রদ। এর মধ্যে কোন বস্তু, মানুষ বা জীবজন্তু পড়লে বুঝি আর রক্ষা নেই। আস্তে আস্তে সে চোরাবালির গর্ভে ডুবে যাবেই এবং তার হাত থেকে কোন ভাবেই পরিত্রাণ পাবার উপায় আর থাকে না। চোরাবালির এই রহস্যময় ক্ষমতার উপর ভিত্তি করে যুগে যুগে লেখা হয়েছে কত গল্প, উপন্যাস। শত্রুকে ডুবে যেতে দেখে আমরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছি, কিন্তু নায়ককে সেই অবস্থায় দেখলে বিচলিত হয়ে উঠেছি।

বিজ্ঞানীর মন কিন্তু ক্ষান্ত থাকে নি। সে ভেবেছে কি এই জিনিষ, যার হাত থেকে মানুষের পরিত্রাণ পাবার কোন উপায় নেই? কোথায় এর রহস্য? এর ফলে আজ আমরা জেনেছি যে, চোরাবালি সম্বন্ধে সাধারণ মানুষ এতকাল যে ধারণা পোষণ করে এসেছে, তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। বস্তুতঃ চোরাবালির ঐ জাতীয় ভয়ঙ্কর কোন ক্ষমতাই নেই। এর সত্যকারের উপাদান ও ধর্ম সম্বন্ধে জানলে এবং তাই বুঝে বিপদের মুখে কাজ করলে চোরাবালি আমাদের কোন ক্ষতিই করতে পারে না।

সাধারণতঃ বড় নদীর মুখে অথবা সমতল তীরভূমিতে চোরাবালি দেখতে পাওয়া যায়। এর তলায় শক্ত মাটি থাকে। চোরাবালির মধ্যে প্রধানতঃ রয়েছে জলমিশ্রিত বালি—হাল্‌কা ও আল্‌গা অবস্থায়। আপাতদৃষ্টিতে সাধারণ বালির সঙ্গে খুব বেশী তফাত বোঝা না গেলেও বিশেষভাবে পরীক্ষা করলে দেখা যাবে, এর দানাগুলি সাধারণ বালির মত কৌণিক নয়, গোলাকার। আগেই বলা হয়েছে, চোরাবালি জলমিশ্রিত বালি। সাধারণতঃ নদীর স্রোতে এই জল এসে ঢোকে এবং চোরাবালির নীচে সব সময় শক্ত মাটির প্রলেপ থাকায় জল বেড়িয়ে যেতে পারে না। ফলে বালুকণাগুলির পরস্পরের মধ্যবর্তী স্থানে জল ঢুকে পড়ে এবং এইভাবে তাদেরকে পরস্পরের থেকে আলাদা করে উপরের দিকে তুলে দেয়। আলাদা হয়ে যাওয়াতে এগুলি যেন খুব আল্‌গাভাবে ভেসে বেড়ায়। এজন্যেই এগুলি শক্ত ও অতিরিক্ত ভারী জিনিষের ভার রাখতে পারে না।

অনেক সময় চোরাবালির মধ্যে বালির অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। যে কোন জাতীয় আল্‌গা মাটি অথবা বালিকাদার মিশ্রণেও অনেক সময় চোরাবালির উৎপত্তি হয়।

পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে যে, চোরাবালি জল অপেক্ষা বেশী ভারী, সুতরাং মানুষ চোরাবালিতে জল অপেক্ষা অধিকতর সহজভাবে সাঁতার কাটতে বা ভেসে বেড়াতে পারবে। চোরাবালির মধ্যে পড়লে সবচেয়ে প্রথমে করণীয় হলো ধীরে ধীরে নড়াচড়া করা। এটা করবার উদ্দেশ্য হলো—এগুলিকে (চোরাবালি) যথেষ্ট সময় দেওয়া, যাতে এগুলি শরীরের চারদিকে ভেসে বেড়াতে পারে। একবার এ রকম সুরু হয়ে গেলে চোরাবালি ঠিক জলের মত কাজ করবে, যাতে মানুষ সাঁতার কেটে উঠে আসতে পারবে।

বাস্তব ক্ষেত্রে যা ঘটে থাকে, তা হলো প্রচলিত কুসংস্কারাচ্ছন্ন আতঙ্কের জন্যে কেউ চোরাবালিতে পড়ে গেলে সে অতিমাত্রায় ভীত হয়ে ওঠে এবং দিশাহারাভাবে চারদিকে হাত-পা ছুঁড়তে থাকে। এর ফলে ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায় এবং সে তখন আস্তে আস্তে নীচে নামতে আরম্ভ করে। কিন্তু এসব না করে ধীরে ধীরে নড়াচড়া করলে তার আর কোন ভয় নেই। সে অনায়াসেই নিরাপদ যায়গায় উঠে আসতে পারবে।

বিজ্ঞান এপর্যন্ত প্রকৃতির নানা রহস্যের সমাধান করেছে ও করছে, কিন্তু এখনও যে কত রহস্য অনাবিষ্কৃত থেকে গেছে, তা কে জানে!

দেবিকা বসু

একটি আবিষ্কারের ইতিহাস

তোমরা ছবি দেখতে খুব ভালবাস, তাই না? আর তোমার নিজেরই যদি একটা ক্যামেরা থাকে, তাহলে তো কথাই নেই। ছোট্ট কালো রঙের একটা বাক্স সামনে রেখে ক্লিক্ করে একটা শব্দ, ব্যাস! যে লোকের খুশী, যে জায়গার খুশী মনের আনন্দে ছবি তুলে বেড়াও। আজ তোমাদের কাছে আমি এই ক্যামেরা আবিষ্কারের ইতিহাস বলবো। আবিষ্কারের ইতিহাস বলছি এজন্যে যে, আজকে তোমরা যে উন্নত ধরণের ক্যামেরা দেখতে পাও, তা হঠাৎ একদিন কোন একজন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করেন নি। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক বিভিন্ন ঘটনার মধ্য দিয়ে গবেষণা করে আজকের ক্যামেরার এই উন্নত রূপ দিতে সক্ষম হয়েছেন।

১৭২৯ সালে জার্মেনীর প্রখ্যাত রসায়ন-বিজ্ঞানী জোহান হেন্‌রিক স্কাল্‌জ একটা মজার ব্যাপার লক্ষ্য করলেন—সাদা সিলভার ক্লোরাইড লবণকে সূর্যালোকে কিছুক্ষণ

রেখে দিলে লবণটির রং বেগুনী হয়ে ওঠে। সিলভার বা রূপার অন্যান্য লবণের যেমন, সিলভার ব্রোমাইড ও সিলভার আয়োডাইডেরও ঐ একই প্রকার ধর্ম স্কাল্‌জ লক্ষ্য করলেন। শুনলে অবাক হবে, স্কাল্‌জের সময় থেকে আজ পর্যন্ত ফটোগ্রাফিক ফিল্ম তৈরি করতে এই লবণগুলিই ব্যবহৃত হয়ে আসছে। অবশ্য বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আরও সুবেদী ও উন্নত ধরণের ফিল্ম নির্মিত হচ্ছে।

প্রায় দু-শ' বছর আগে জোসেফ নিসেফোর নিপ্‌সে নামে এক ফরাসী ভদ্রলোক তাঁর পড়ার ঘরের জানালার সামনে একটা সুবেদী (Sensitive) কাচের পাত্‌ রেখেছিলেন, আট ঘন্টা পরে নিপ্‌সে লক্ষ্য করেন, জানালাটির একটি অস্পষ্ট ছবি কাচের পাত্‌টিতে ধরা পড়েছে। এই ছবিই পৃথিবীর সর্বপ্রথম ফটোগ্রাফ এবং এটি এখনও সংরক্ষিত রয়েছে।

এক-শ' বছর আগে ক্যামেরাম্যানদের কত ঝামেলা ছিল জান? যেখানে ছবি তোলবার প্রয়োজন হতো, তাঁদের সেখানে একটা তাঁবু, জলের বোতল, বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্যের পাত্র, ভিতরে কালো কাগজের আস্তরণ দেওয়া কাঠের বাক্স (এগুলিকে সূচী-ছিদ্র ক্যামেরা বলে। চার-চৌকা কাঠের বাক্সটির একধারে খুব সূক্ষ্ম একটি ছিদ্র থাকে এবং তার ঠিক বিপরীতে ভিতরের দিকে থাকে সুবেদী কাচের পাত্‌, যার উপর যে বস্তুর ছবি তোলা প্রয়োজন, তার ওল্টানো ছবি উঠতো), কাচের পাত্‌ প্রভৃতি ঘাড়ে করে বয়ে নিয়ে যেতে হতো। তাঁবুটা এমন ভাবে খাটাতে হতো যেন ভিতরটা নিশ্ছিদ্র অন্ধকার হয়, অর্থাৎ কোনমতে আলো প্রবেশ করতে না পারে। ছবি তুলে সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য কাজগুলি (যেগুলিকে এখন আমরা ডেভেলপিং ও প্রিন্টিং বলে থাকি) করতে হতো। এতসব ঝামেলা থাকা সত্ত্বেও সেযুগে বেশ কয়েকজন দক্ষ আলোকচিত্রশিল্পী ছিলেন। ড্যাগুয়ের, ম্যাথু ব্র্যাডি, ফক্স ট্যালবট প্রভৃতির তোলা ফটোগ্রাফ আজও দর্শনীয় হয়ে আছে।

এর পর ১৮৭১ সালে রিচার্ড ম্যাড্‌ডক্স আলোকচিত্রশিল্পের বেশ কিছুটা উন্নতিসাধন করলেন। তিনি দেখালেন, পশুর হাড় থেকে পাওয়া জিলেটিন সিলভারের লবণের সঙ্গে মিশিয়ে সেই মিশ্রণ কাচের পাতে মাখিয়ে শুকিয়ে নিলে কাচের পাত্‌টি বেশ কিছু সময় সুবেদী থাকবে। বর্তমানের উন্নত আলোকচিত্রশিল্পের এটাই হলো প্রথম পদক্ষেপ। পরবর্তীকালে জর্জ ইষ্টম্যান [কুণ্ডলীর আকারে সুবেদী কাগজের ফিল্ম (এক-শ' ছবি তোলবার উপযুক্ত) এবং কোডাক ক্যামেরার প্রবর্তন করেন।

বর্তমান কালে আলোকচিত্রশিল্পের] প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছে। খুব আব্‌ছা আলোতে, ঝড়-বৃষ্টি ও কুয়াশার মধ্যে ছবি তোলবার উপযোগী করে লেন্স ও ফিল্ম মধ্য-হয়েছে। এক্স-রে ফটোগ্রাফের জন্যেও বিশেষ ধরণের ফিল্ম আবিষ্কৃত হয়েছে। উপরের জগতে সাম্প্রতিককালে বিস্ময়কর আবিষ্কার হলো আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বেড়ায়।

এডউইন হার্বার্ট ল্যাণ্ড কর্তৃক আবিষ্কৃত ল্যাণ্ড ক্যামেরা। এই ক্যামেরার সাহায্যে এক মিনিট সময়ের মধ্যে ছবি তোলা, ডেভেলপিং, প্রিন্টিং সমস্ত কাজ হয়ে যায়। রঙীন ছবি বা কালার ফটোগ্রাফিও ইতিমধ্যে বেশ অগ্রগতি লাভ করেছে।

জীবজন্তু, মানুষ বা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের ছবি তোলবার মধ্যেই কিন্তু আলোকচিত্র-শিল্পের কাজ সীমাবদ্ধ নয়। আজ মহাকাশ-বিজ্ঞানী, চিকিৎসক, সৈন্যবাহিনী, বৈমানিক প্রভৃতি সকলের কাছে আলোকচিত্রশিল্প অত্যাবশ্যক হয়ে উঠেছে।

অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সঙ্গে ক্যামেরা সংযুক্ত করে আজ অদৃশ্য জীবাণু-জগৎ, পদার্থের অণু-পরমাণুর ছবি তোলাও সম্ভব হয়েছে। পরমাণু-বিজ্ঞানে আমাদের আজকের যে জ্ঞান, তার পিছনে আলোকচিত্রশিল্পের দান নগণ্য নয়।

দূরবীক্ষণ যন্ত্রের লেন্স ক্যামেরায় সংযুক্ত করে বহু দূরের গ্রহ-নক্ষত্রের ছবি বিজ্ঞানীরা সংগ্রহ করতে পেরেছেন। আমেরিকা যুক্তরাষ্টের মাউন্ট প্যালোমার মানমন্দিরে পৃথিবীর বৃহত্তম দূরবীক্ষণ যন্ত্র বসানো হয়েছে, যার মধ্য দিয়ে মহাজগতের নূতন নূতন নক্ষত্র ধরা পড়ছে।

অনুরূপভাবে ক্যামেরার সঙ্গে দূরবীক্ষণ যন্ত্রের লেন্স লাগিয়ে নিরাপদ দূরত্ব থেকে হকি, ফুটবল ও ক্রিকেট মাঠে ক্রীড়ারত খেলোয়াড়দের সুস্পষ্ট ছবি তোলা আজ আর আলোকচিত্রশিল্পীর কাছে মোটেই শক্ত কাজ নয়। পৃথিবী থেকে অনেক উঁচুতে উঠে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের সুস্পষ্ট ছবি তুলে পৃথিবীর নির্ভুল মানচিত্র অঙ্কন সহজতর হয়েছে। কৃত্রিম উপগ্রহ মহাশূন্যে ঘূর্ণায়মান অবস্থায় থেকে শক্তিশালী ক্যামেরার সাহায্যে চাঁদ ও অন্যান্য গ্রহের ছবি তুলে পৃথিবীর মানুষের কাছে পাঠাচ্ছে।

জাল ডকুমেণ্ট নিয়ে পুলিশকে অনেক সময় দারুণ মুস্কিলে পড়তে হয়; ডকুমেণ্ট সংক্রান্ত তদন্তে হাতের লেখা, টাইপ করা এবং ঘষে তুলে দেওয়া, কাটাকুটি, সই জাল প্রভৃতির সতর্কতার সঙ্গে পরীক্ষা করতে হয়। ইনফ্রারেড বা আলট্রাভায়োলেট রশ্মির সাহায্যে ফটোগ্রাফ তুলে জাল ডকুমেণ্ট সম্পর্কিত সমস্যার, বিশেষ করে সন্দেহ-জনক চেক, বিল, ইন্সিওরেন্স পলিসি, পাশপোর্ট, লাইসেন্স, অফিসিয়াল রেকর্ড প্রভৃতি আসল কি না, সে সমস্যার সমাধান সম্ভব হয়েছে। অনেক সময় প্রতারণা বা বঞ্চনার উদ্দেশ্যে অফিসিয়াল রেকর্ডের গুরুত্বপূর্ণ অংশ মুছে ফেলে বা ঘষে তুলে বিকৃত করবার চেষ্টা করা হয়, আলট্রাভায়োলেট রশ্মির সাহায্যে ছবি তুলে প্রাথমিক অবস্থায় কি লেখা ছিল, তা ধরা পড়ে। ব্যবহৃত কালির ক্রোম্যাটোগ্রাফিক পরীক্ষায় কালির পার্থক্য (এক কালির লেখা মুছে ফেলে অন্য কালিত নূতন কিছু লিখে দিলে) খুব সহজেই ধরা পড়ে। প্রতারণা ও আত্মসাতের উদ্দেশ্যে একটি মনিঅর্ডার ফর্মে নাম-ঠিকানা মুছে সম্পূর্ণ অন্য নাম ও ঠিকানা লেখা হয়েছিল। ফর্মটির বিভিন্ন ক্রোম্যা-টোগ্রাম তুলে মুছে ফেলা অংশ ও নূতন করে লেখা অংশ সুস্পষ্ট বোঝা যায়।

আলোকচিত্রশিল্পের সবচেয়ে ব্যবহারিক প্রয়োগ হলো চলচ্চিত্র। ক্যামেরা আবিষ্কৃত না হলে চলচ্চিত্রের কল্পনা সম্ভব হতো না। চলচ্চিত্র বা সিনেমার ফিল্মে শুধুমাত্র দৃশ্যের ছবিই থাকে না, খুব সূক্ষ্মভাবে শিল্পীদের কথাবার্তা এবং অন্যান্য শব্দও মুদ্রিত থাকে।

একটা বেলুনের মধ্যে খুব বেশী বাতাস ঢুকিয়ে দিলে বেলুনটা যখন সশব্দে ফেটে যায়, তখন তার মধ্যে কি ক্রিয়া হয় এবং বুলেটের আঘাতে কোন কাচের আবরণ যখন ঝন ঝন করে ভেঙ্গে যায়, তখন কাচের পাতের মধ্যে কি ক্রিয়া হয়, তা দেখা যায় না। কারণ ঘটনাগুলি নিমেষের মধ্যে ঘটে যায়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক এগারটন অতি শক্তিশালী ক্যামেরার সাহায্যে এই সব দ্রুতগতিসম্পন্ন ক্রিয়ার ফটোগ্রাফ তুলতে সক্ষম হয়েছেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যদের লেখা ও সৈন্যদেরকে লেখা সকল পত্রের অনুলিপি মাইক্রোফিল্মিং-এর সাহায্যে রেকর্ড করে রাখা হতো। মাইক্রোফিল্মিং পদ্ধতি হলো খুব ছোট একটা ফিল্মে প্রয়োজনীয় দলিল, গুরুত্বপূর্ণ চিঠিপত্র, মূল্যবান পুস্তক প্রভৃতির ছবি তুলে রাখা।

অপরাধ সংঘটনের সঙ্গে অপরাধীর সুনির্দিষ্ট যোগসূত্র নির্ণয়ে আঙ্গুলের ছাপ বা ফিঙ্গার প্রিন্ট একটি বলিষ্ঠ হাতিয়ার। পুলিশ দপ্তরে দাগী আসামীদের আঙ্গুলের ছাপের রেকর্ড রাখা হয়। অকুস্থল থেকে পাওয়া আঙ্গুলে ছাপের সঙ্গে তাঁরা মিলিয়ে দেখেন, সেই অপরাধ সংঘটনে কোন পুরনো অপরাধী জড়িত আছে কিনা। পুলিশ দপ্তরে খুব দ্রুত আঙ্গুলের ছাপ খুঁজে বের করবার জন্যে সম্প্রতি আবিষ্কৃত লেসার হলোগ্রাফির সাহায্য নেওয়া হচ্ছে। হাজার হাজার আঙ্গুলের ছাপের হলোগ্র্যাম এক টুক্‌রা ফিল্মে খুব সুন্দরভাবে রেকর্ড করে রাখা যায়। এই পদ্ধতিতে প্রায় ১০,০০০ বিভিন্ন আঙ্গুলের ছাপ ১০ সেন্টিমিটার বর্গ একটি ছোট্ট ফিল্মে বিস্ময়করভাবে সংগৃহীত করে রাখা সম্ভব। কোন একটি নির্দিষ্ট আঙ্গুলের ছাপের হলোগ্র্যামের মধ্য দিয়ে লেসার রশ্মি পাঠালেই সেই বিশেষ ছাপটি সুন্দরভাবে পরিস্ফুট হয়ে উঠবে।

আলোকচিত্রশিল্পের ইতিহাসের কিন্তু এখানেই সমাপ্তি নয়। সারা বিশ্ব জুড়ে এখনও গবেষণা চলছে এবং নূতন নূতন আবিষ্কারের জন্যে পৃথিবীর মানুষ উন্মুখ হয়ে আছে। সম্প্রতি পশ্চিম জার্মেনীর পেন্টাকোন কারখানায় বিশ্বের সর্বপ্রথম ইলেকট্রনিক ব্যবস্থাসম্বলিত ক্যামেরা নির্মিত হয়েছে।

শ্রীজ্যোতির্ময় দুই

বাদুড়

বাদুড় সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের কৌতূহল কম নয়। পৃথিবীতে তের-শ' বিভিন্ন জাতের বাদুড় আছে। তার মধ্যে ভারতেই আশি রকম বিভিন্ন জাতের বাদুড় দেখা যায়। সবচেয়ে বড় বাদুড়ের দেহ এক ফুটেরও বেশী লম্বা হয়, আর প্রসারিত ডানার দৈর্ঘ্য হয় প্রায় পাঁচ ফুট। পৃথিবীর সবচেয়ে ছোট বাদুড়ের দৈর্ঘ্য ডানাসমেত প্রায় তিন ইঞ্চি; ওজন আধ আউন্সেরও কম।

বাদুড়ই হলো একমাত্র স্তন্যপায়ী জীব, যারা পাখীদের মত দীর্ঘ সময় আকাশে উড়তে পারে। দেখতে কুৎসিত, মুখটা শেয়ালের মত, কান দুটি দেহের তুলনায় বড়। লোমে আবৃত বুকের উপর থাকে স্তনযুগল। উপরের হাত দুটিকে কেন্দ্র করে পাতলা রবারের মত দুটি ডানা দেহের পাশ দিয়ে এসে দুটি পা ও লেজকে ঘিরে রয়েছে। লম্বা হাতের আঙ্গুলগুলি ডানার সঙ্গে জড়ানো। ওড়বার সময় ডানার আন্দোলনে সাহায্য করে, আর বিশ্রামের সময় ডানা দুটিকে ভাঁজ করে রাখে। এদের স্পর্শেন্দ্রিয় ও শ্রবণেন্দ্রিয় অত্যন্ত সূক্ষ্ম বোধশক্তিসম্পন্ন। অনেকে খায় ফলমূল, অনেকে আবার খায় কীট-পতঙ্গ। এরা থাকে অন্ধকার গুহা, পোড়া বাড়ী অথবা পরিত্যক্ত কয়লাখনিতে। পা দুটি উপরের দিকে তুলে কোন বস্তুকে আঁকড়ে ধরে এরা ঝুলে থাকে।

বাদুড় যখন কাজ করে, তখন এদের রক্ত হয় উষ্ণ, আর যখন এরা বিশ্রাম করে তখন এদের রক্ত হয় শীতল। এরা দ্রুত শরীরের উত্তাপ কমিয়ে ঘুমিয়ে পড়তে পারে। তখন এদের হৃদ্‌স্পন্দন এক মিনিটে আশি থেকে নেমে তিন হয় এবং শ্বাস-প্রশ্বাস সেকেণ্ডে আট থেকে মিনিটে আট হয়। গ্রীষ্মে খাবার খেয়ে দেহে কিছুটা চর্বি জমলেই এরা শীত-ঘুমে অচেতন হয়ে থাকে। ঐ অবস্থায় কোন খাবার না দিয়েও এদেরকে কয়েক মাস জীবন্ত অবস্থায় হিমঘরে রাখা যায়।

সাধারণ ভাবে স্তন্যপায়ীদের আয়ুষ্কাল তার দেহের আকারের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। একটি পূর্ণবয়স্ক বাদুড়ের আয়ুষ্কাল সাধারণতঃ কুড়ি-পঁচিশ বছর পর্যন্ত হয়ে থাকে।

আরও আশ্চর্যের বিষয়, সারা জীবন এরা সুস্থ, সবল এবং নীরোগ থাকে। বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে দেখেছেন, এক বছরের একটি বাদুড়ের ধমনী-প্রাচীর এবং কুড়ি বছরের একটি বাদুড়ের ধমনী-প্রাচীরের মধ্যে কোন তফাৎ নেই; রক্তের চাপও একই রকম। কি করে এটা সম্ভব হয়, হৃদ্‌রোগ বিশেষজ্ঞেরা সে বিষয়ে গবেষণা করছেন।

বাচ্চা প্রসবের ব্যাপারেও এদের সঙ্গে অন্য স্তন্যপায়ীদের পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। স্ত্রী-বাদুড় হচ্ছে একমাত্র স্তন্যপায়ী প্রাণী, যারা পুরুষ বাদুড়ের শুক্রাণুকে নিজের দেহে

ধারণ করে দীর্ঘদিন তাকে জীবিত অবস্থায় রেখে দিতে পারে। ইচ্ছানুযায়ী স্ত্রী-বাহুড় ডিম্বাণুর সঙ্গে শুক্রাণুর সংমিশ্রণ ঘটিয়ে বাচ্চার জন্ম দিতে পারে।

সাধারণতঃ বাহুড় জুন-জুলাই মাসে এক একটি করে বাচ্চা প্রসব করে এবং সেটি মায়ের বুকেই পালিত হয়। স্ত্রী-বাহুড় গর্ভবতী হলে পুরুষ বাহুড় একাকী অবস্থান করতে ভালবাসে।

সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা হলো বাহুড় এক রকম শব্দ উৎসারণ করে এবং সেই শব্দের সাহায্যে নৈশ বিহারের সময় পথ অনুসরণ করতে পারে। বাহুড় এক ধরণের বীপ বীপ শব্দ করে এবং সেই শব্দ বায়ুর মধ্যে শব্দোত্তর তরঙ্গের (Ultrasonic sound) সৃষ্টি করে, যা মানুষের কর্ণেন্দ্রিয়ে পৌঁছয় না। সেই শব্দ কোন বস্তুতে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে প্রতিধ্বনির আকারে আবার বাহুড়ের কাছে ফিরে আসে। সেই প্রতিধ্বনির সাহায্যেই বাহুড় তার চলার পথের বাধা অতিক্রম করে সঠিক খাদ্যের অবস্থান নিরূপণ করতে পারে। মানুষের উদ্ভাবিত রেডারের ক্রিয়াকৌশলও অনেকটা এইরকম। বৈজ্ঞানিকেরা পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, বাহুড়ের শব্দোত্তর তরঙ্গ উৎসারণ ও প্রতিশব্দের তরঙ্গ সৃষ্টির ক্ষমতা, মানুষের উদ্ভাবিত যে কোন রেডার যন্ত্র অপেক্ষা এক বিলিয়ান গুণ বেশী সংবেদনশীল।

আমেরিকার প্রতিরক্ষা গবেষণা কেন্দ্রে বাহুড়কে নিয়ে এক অদ্ভুত পরীক্ষা চালানো হয়। একটি অন্ধকার ঘরে চুলের মত সরু তার আঠাশটি করে ছাদের নানা দিকে ঝুলানো হয় এবং ঐ ঘরে এক সঙ্গে সত্তরটি লাউড স্পীকার বাজানো হয়। লাউড স্পীকার থেকে উৎসারিত শব্দ-তরঙ্গ বাহুড়ের বীপ বীপ শব্দের প্রতিতরঙ্গ অপেক্ষা দু-হাজার গুণ বেশী ছিল। সব লাউড স্পীকার বাজাবার সঙ্গে সঙ্গে বাহুড়গুলিকে উড়িয়ে দেওয়া হয়। বাহুড়ের কর্ণেন্দ্রিয় এত সূক্ষ্ম যে, তারা নিজেদের উৎসারিত শব্দের প্রতিতরঙ্গ অনুসরণ করে অতগুলি ঝুলানো তারের ফাঁক দিয়ে ঠিক ভাবে উড়ে যেতে সক্ষম হয়—তারের সঙ্গে তাদের ধাক্কা লাগে নি।

বাহুড় অন্ধকারে আহার্য পতঙ্গদের শব্দ-তরঙ্গের সাহায্যে চিনে নেয় এবং অখাদ্য পতঙ্গদের পরিহার করে। শিকার অনুসরণের সময় বাহুড় প্রতি সেকেণ্ডে দুই হাজার 'বীপ' শব্দ উৎসারিত করে।

হরিমোহন কুণ্ডু *

* প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, বাঁকুড়া সম্মিলনী কলেজ। বাঁকুড়া

প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন : বায়োটিন কি এবং কি কাজে লাগে ?

অমিতা বড়াল, শিবপুর

উত্তর : ভিটামিন-এইচ-কে বায়োটিন বলা হয়। উদ্ভিদ ও প্রাণীদেহে এই বায়োটিন অন্য পদার্থের সঙ্গে যুক্ত অবস্থায় থাকে। এর অস্তিত্ব প্রথম দেখা যায় ডিমের হলুদে কুসুমে। কিডনী, যকৃৎ, ঈষ্ট, দুধ, ডিমের কুসুম এবং এমনকি বিভিন্ন শাক-সব্জিতেও বায়োটিনের প্রাধান্য যথেষ্ট। প্রাণীদেহে বায়োটিনের উপকারিতা বা অপকারিতা সম্পর্কে এখনও আমাদের সঠিক কোন ধারণা নেই। তবুও জানা গেছে যে, বায়োটিনের অভাবে প্রাণীদেহের মাংসপেশীতে বেদনা অনুভূত হয় এবং বাতরোগে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা দেখা যায়। বায়োটিনের অভাবে বিভিন্ন প্রকার মানসিক উপসর্গও দেখা যায়। পশু-পক্ষীদের বেলায় বায়োটিনের অভাব হলে তাদের দেহের হাড় ঠিক মত তৈরি হয় না। প্রাণীদের দেহের পুষ্টিসাধনেও বায়োটিন কাজে লাগে।

ডিমের সাদা অংশে এভিডিন নামে এক প্রকার প্রোটিন থাকে। এটি বায়োটিনের সঙ্গে একটা যৌগিক পদার্থ তৈরি করে, যার ফলে অতিরিক্ত পরিমাণ ডিম গ্রহণ করলে শরীরে বায়োটিনের অভাব দেখা যায়। তখন বায়োটিনের অভাবজনিত বিভিন্ন উপসর্গ দেখা দিতে পারে।

এভিডিন ছাড়া অন্য প্রোটিনের সঙ্গে যখন বায়োটিন যোগ অবস্থায় থাকে, তখন পরিপাক প্রণালীতে বিভিন্ন ক্রিয়ায় এই যোগ ভেঙ্গে গিয়ে দেহের পুষ্টিসাধন করে। অনেক বিজ্ঞানীদের ধারণা যে, প্রাণীদেহে পরিপাকপ্রণালীতেও এই বায়োটিন তৈরি হতে পারে, যার ফলে বায়োটিনবিহীন খাদ্য গ্রহণ না করলেও প্রাণীদের শরীরে বায়োটিনের অভাবজনিত উপসর্গ দেখা দিতে নাও পারে। অবশ্য বায়োটিনযুক্ত খাদ্য আমরা প্রত্যহই গ্রহণ করি। বিজ্ঞানীদের ধারণা যে একজন পূর্ণবয়স্ক লোকের পক্ষে প্রত্যহ প্রায় ২২৫ মাইক্রোগ্র্যাম বায়োটিন প্রয়োজন হয়।

শ্যামসুন্দর দে *

*ইনষ্টিটিউট অব রেডিও ফিজিক্স অ্যাণ্ড ইলেকট্রনিক্স, বিজ্ঞান কলেজ। কলিকাতা-৯

শোক-সংবাদ

পরলোকে বার্ট্রাণ্ড রাসেল

প্রখ্যাত দার্শনিক, গণিতবিদ্ ও চিন্তানায়ক লর্ড বার্ট্রাণ্ড রাসেল গত ২রা ফেব্রুয়ারী উত্তর ওয়েলস-এ তাঁর বাসভবনে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৭ বছর।

১৮৭২ সালের ১৮মে বেডফোর্ডের বিখ্যাত ডিউক পরিবারে রাসেল জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রপিতামহ প্রথম আর্ল রাসেল রাণী ভিক্টোরিয়ার অন্যতম প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। ইনি ১৮৩২ সালে সংস্কার বিলের জন্যে খ্যাতি অর্জন করেন। বার্ট্রাণ্ড রাসেল ৩ বছর বয়সে তাঁর মা-বাবা দু-জনকেই হারান এবং তাঁর ঠাকুরমা তাঁকে লালনপালন করেন। এই ভদ্রমহিলা ছিলেন অত্যন্ত রক্ষণশীল। ১৮ বছর পর্যন্ত তিনি রাসেলকে স্কুলেই প্রেরণ করেন নি, গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করে বাড়িতে লেখাপড়ার ব্যবস্থা করেন। এভাবে সমবয়সী সঙ্গীদের সাহচর্য থেকে বঞ্চিত হলেও রাসেল কিন্তু জ্ঞানানুসন্ধানের আনন্দ থেকে বঞ্চিত হন নি। গণিতের মাঝে তিনি পেলেন পরম আনন্দের সন্ধান। ১১ বছরের বালক বার্ট্রাণ্ড ইউক্লিডের সূত্রে রসের আস্বাদ অনুভব করলেন। কিন্তু ইউক্লিডের প্রমাণহীন স্বতঃসিদ্ধগুলিকে মেনে নিতে তাঁর অনুসন্ধিৎসু মন চাইতো না। দুটি সমান্তরাল রেখা মিলিত হতে পারে বা সমগ্র অংশের চেয়ে বড় নাও হতে পারে—এই সব কথা রাসেলকে উদ্দীপিত করে তুলতো। প্রমাণহীন স্বতঃসিদ্ধগুলিকে মেনে নেবার এই নৈরাশ্যই পরবর্তীকালে তাঁর মনকে দর্শনাভিমুখী করে তোলে। রাসেল নিজেই বলেছেন, গণিতের সেতু বেয়ে তাঁর জীবনে দর্শন এসেছে।

১৮ বছর বয়সে রাসেল যখন কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন, তখন গণিত ও দর্শন উভয় শাস্ত্রেই তিনি পাঠ গ্রহণ করেন। এখানে তিনি খ্যাতনামা গণিতজ্ঞ ও পদার্থ-বিজ্ঞানী সার জর্জ ডারউইন, সার রবার্ট বেল এবং অধ্যাপক আলফ্রেড হোয়াইটহেড, বিখ্যাত গ্রীক মনীষী সার রিচার্ড জেব এবং বিশিষ্ট দার্শনিক হেনরী

বার্ট্রাণ্ড রাসেল

সিডউইক জেমসওয়ার্ড প্রমুখের সংস্পর্শে আসেন। শিক্ষাজীবন শেষ করবার পর রাসেল ১৮৯৮ সালে ট্রিনিটি কলেজে অধ্যাপকরূপে যোগদান করেন। কিন্তু তার এক বছর আগেই জ্যামিতির ভিত্তি সম্পর্কে রচিত তাঁর 'An Essay on the Foundation of Geometry' পুস্তকখানি প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকখানিতে গণিতের ভিত্তি বিষয়ে রাসেলের মৌলিক চিন্তাধারার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর এই চিন্তাধারা সার্থক পরিণতি লাভ করে ১৯০০ সালে। রাসেল

নিজেই ১৯০০ সালটিকে তাঁর মানস জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় বছর বলে অভিহিত করেছেন। ঐ বছর অধ্যাপক হোয়াইটহেডের সঙ্গে তিনি প্যারিসে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক দর্শন কংগ্রেসে যোগদান করেন। এই সম্মেলনে ইটালীর বিখ্যাত দার্শনিক পিয়ানোর মুখে তাঁর উদ্ভাবিত 'সাঙ্কেতিক ন্যায়শাস্ত্র' (Symbolic Logic) সম্পর্কে বক্তৃতা শুনে রাসেল বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হন। পিয়ানোর উদ্ভাবিত পথ অনুসরণ করে তিনি ১৯০৩ সালে গণিতের সূত্র সম্পর্কে তাঁর গবেষণা-নিবন্ধ 'Principles of Mathematics' প্রকাশ করেন। গণিতে তাঁর এই অনন্যসাধারণ অবদানের জন্যে ১৯০৮ সালে মাত্র ৩৬ বছর বয়সে রাসেলকে রয়েল সোসাইটির ফেলো (F. R. S) মনোনীত করা হয়।

অধ্যাপক হোয়াইটহেডের সহযোগিতায় রাসেল গণিতের ভিত্তি সম্পর্কে তাঁর মৌলিক গবেষণা আরও সম্প্রসারিত ও সুবিন্যস্ত করে ১৯১৩ সালে 'Principia Mathematica' প্রকাশ করেন। রাসেল-হোয়াইটহেডের এই যুক্ত প্রয়াস গণিত-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অন্যতম শ্রেষ্ঠ অবদান বলে অভিহিত হয়ে থাকে। শুধু গণিতের ক্ষেত্রে এর মূল্য অপরিসীম নয়, ন্যায়শাস্ত্রের ইতিহাসেও এটি একটি দিকনির্দেশক বলে আখ্যাত হয়। রাসেলের অনন্য মনস্বিতার জন্য ১৯৫০ সালে তাঁকে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার প্রদান করা হয়।

প্রিন্সিপিয়া প্রকাশের পর থেকেই রাসেল দর্শনের দিকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন এবং মানুষের সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যাপারে তাঁর মন গভীরভাবে নিবিষ্ট হয়। রাসেল ছিলেন আজন্মকাল শান্তিবাদী। এজন্যে স্বদেশে-বিদেশে তাঁকে নানা লাঞ্ছনা বা নিগ্রহ সহ্য করতে হয়েছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় যুদ্ধ বিরোধী আন্দোলন পরিচালনার জন্যে তাঁকে কারাগারে বন্দী করা হয়। বন্দীদশায় তিনি 'Introduction to Mathematical Philosophy' এবং 'Analysis of Mind' নামে দুটি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করেন।

শান্তি ও মানবতার একনিষ্ঠ সাধক রাসেল পারমাণবিক অস্ত্র এবং ভিয়েতনামে যুদ্ধের বিরুদ্ধে দীপ্তকণ্ঠে প্রতিবাদ জানিয়েছেন এবং আন্দোলন গড়ে তোলেন।

রাসেল ৫০টির বেশী গ্রন্থ রচনা করে গেছেন। তার মধ্যে দর্শন, বিজ্ঞান, সমাজনীতি প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ই ছিল। লোকরঞ্জক বিজ্ঞান গ্রন্থ রচনায় তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তার স্বীকৃতি স্বরূপ ১৯৫৭ সালে রাসেলকে বিজ্ঞানে কলিঙ্গ পুরস্কার প্রদান করা হয়।

মানুষের কল্যাণ ও জ্ঞান প্রসারের জন্যে বার্ট্রাণ্ড রাসেল যে চিরন্তন সাধনা ও প্রয়াস করে গেছেন, তাতে তাঁর নাম অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

র. ব.

বিবিধ

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের উদ্যোগে বিজ্ঞান-বিষয়ক বক্তৃতা ও চলচ্চিত্র প্রদর্শনী

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের উদ্যোগে পরিষদ ভবনে ১৯শে ফেব্রুয়ারী (বৃহস্পতিবার) অপরাহ্ণে ৫টায় এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সভার প্রারম্ভে পরিষদের কর্মসচিব ডক্টর জয়ন্ত বসু সমবেত ভদ্রমণ্ডলীকে স্বাগত জানাবার পর কলিকাতা বিজ্ঞান কলেজের ইন্‌ষ্টিট্যুট অব রেডিওফিজিক্স অ্যাণ্ড ইলেকট্রনিক্স-এর ডক্টর দীপক বসু 'মানুষের সফল চন্দ্রাভিযান' সম্পর্কে একটি লোকরঞ্জক বক্তৃতা প্রদান করেন। ঐ অভিযানের প্রস্তুতিপর্ব থেকে সুরু করে বর্তমান পর্যায় পর্যন্ত তিনি সংক্ষেপে বর্ণনা করেন ও এর বৈজ্ঞানিক তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। ডক্টর বসুর বক্তৃতার পর চন্দ্রাভিযান সম্পর্কিত 'অ্যাপোলো-১১' ও 'অ্যাপোলো-১২' নামক দুটি চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়।

অতঃপর পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন এবং এই বিষয়ে আমাদের দেশের কার্যসূচী ও তার গুরুত্ব সম্পর্কে ডক্টর জয়ন্ত বসু একটি নাতিদীর্ঘ কথিকার অবতারণা করেন। 'নিউক্লিয়ার পাওয়ার ফ্রম তারাপুর' নামক একটি চলচ্চিত্র প্রদর্শনের পর অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়

কলিকাতাস্থিত ইউনাইটেড স্টেট্‌স্ ইনফর্মেশন সার্ভিসেস-এর সৌজন্যে চলচ্চিত্রগুলি প্রদর্শিত হয়।

ইউনেস্কো পুরস্কারে সম্মানিত

আর. জি. কর মেডিক্যাল কলেজের রসায়ন-শাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপক ডক্টর মৃত্যুঞ্জয়প্রসাদ-গুহ ১৯৬৯ সালের ইউনেস্কো পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন। এঁর 'বিজ্ঞানের 'বিচিত্র বার্তা' সপ্তম ইউনেস্কো প্রতিযোগিতায় নবশিক্ষার্থীদের জন্যে বাংলা ভাষায় রচিত শ্রেষ্ঠ পাণ্ডুলিপিরূপে স্বীকৃত হয়েছে। রচনাটি অবশ্য ইতিমধ্যেই পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে। পুরস্কারের আর্থিক মূল্য এক হাজার চার-শ' টাকা।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, ডক্টর গুহ তাঁর 'আকাশ ও পৃথিবী' গ্রন্থের জন্যে ১৯৬৪ সালে রবীন্দ্র পুরস্কারে সম্মানিত হন। তিনি বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সদস্য এবং 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকায় প্রায়ই লিখে থাকেন।

হুইসপারিং হোভারক্র্যাফ্‌ট্

'সি-সি ৭' বা হুইসপারিং হোভারক্র্যাফ্‌ট্' (প্রায় নিঃশব্দ গতির জন্যে এই নাম) তার প্রথম জলযাত্রার পরীক্ষায় সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছে। দক্ষিণ ইংল্যাণ্ডের সমুদ্রেরজলে এই পরীক্ষা পরিচালিত হয়। কুশনক্র্যাফ্‌ট্ লিমিটেডের (নির্মাতা প্রতিষ্ঠান) জেনারেল ম্যানেজার বলেছেন যে, হোভারক্র্যাফ্‌ট্‌টি সন্তোষজনকভাবে কাজ করেছে।

২৪½ ফুট দীর্ঘ এই যানটি ৫০ নট গতিতে ১০ জন যাত্রী বহন করতে সক্ষম। ভাঁজ করা যায় বলে এটি খুব সহজে লরী বা বিমানে বহনযোগ্য। অন্যান্য হোভারক্র্যাফ্‌টের মত এটি এয়ার প্রোপেলারের দ্বারা চালিত হয় না। গ্যাসটারবাইন সেন্ট্রিফিউগ্যাল ফ্যানের দ্বারা এটি চালিত হয় বলে এতে সামান্যই শব্দ হয়।

সব রকম পরীক্ষা শেষ হলে এটি বৃটিশ কারিগরী মন্ত্রকের কাছে মূল্যায়নের জন্যে যাবে। শীঘ্রই ব্যবসায়িক ভিত্তিতে এটি নির্মিত হবার সম্ভাবনা আছে।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস কর্তৃক পি-২৩, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬ হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ
৩৭।৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

ত্রয়োবিংশ বর্ষ এপ্রিল, ১৯৭০ সং

স্নায়ু-রাসায়নিক বিক্রিয়া

শ্রীদেবব্রত নাগ ও শ্রীজগৎজীবন ঘোষ*

মস্তিষ্কের বিভিন্ন কার্যপ্রণালী যে সব কলকাঠির সাহায্যে পরিচালিত হচ্ছে, তাদের রাসায়নিক পরিচয় নিরূপণই হলো স্নায়ু-রসায়নবিদ্যার মুখ্য উদ্দেশ্য। ১৯ শতকের মধ্যভাগে (১৮৬৫-১৮৮২) জার্মান বৈজ্ঞানিক থুডিচুম (Thudichum) সর্বপ্রথম স্নায়ু-রসায়নশাস্ত্রের সূত্রপাত করেন। এর পর মস্তিষ্কের দেহভিত্তিক এবং রাসায়নিক পরিচয়গুলি সম্পর্কে অনেক গবেষণা হওয়া সত্ত্বেও বহু দিন ধরে বিজ্ঞানীদের এই ধারণাই ছিল যে, প্রাণীদেহের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মত মস্তিষ্কে পাচন-প্রক্রিয়া হয় না। এই রকম ধারণা হবার মূল কারণ হলো উন্নত যন্ত্রপাতি এবং প্রকৃত তথ্যের অভাব। ১৯৫১ সালের শেষভাগে মনোবিজ্ঞানী আই.পাজ (I. Page) সর্বপ্রথম স্নায়ু-রসায়নবিদ্যার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আভাস দিলেন। এর পরই মস্তিষ্ক সম্পর্কে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আরও বিশদ ও সূক্ষ্ম পরীক্ষার কাজ সুরু হলো। এপর্যন্ত মস্তিষ্ক সম্পর্কে যা জানা গেছে, তারই পরিপ্রেক্ষিতে মানসিক ব্যাধি ও মস্তিষ্কের বিকৃতিকে নির্ভুলভাবে পরিচালনা ও সংযত রাখবার উজ্জ্বল সম্ভাবনার আভাস পাওয়া গেছে। বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস, স্নায়ু-রসায়নবিদ্যার দ্রুত প্রসারলাভ প্রাণীদের ইচ্ছা, রুচি ইত্যাদি বিভিন্ন মানসিক কার্যপ্রণালীর রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে সক্ষম হবে। স্নায়ু-রসায়নবিদ্যার একটি উল্লেখযোগ্য অবদান

* প্রাণ-রসায়ন বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

হলো—যকৃৎ, কিড্‌নী ইত্যাদি অংশে যে সব প্রাণ-রাসায়নিক বিক্রিয়াগুলি অনবরত ঘটছে, সেগুলির মধ্যে সামান্ত পার্থক্য থাকলেও দেহের কোন নির্দিষ্ট অংশে তাদের মধ্যে পার্থক্য নেই বললেই চলে। কিন্তু মস্তিষ্কের বিভিন্ন স্তরে এবং একই স্তরের বিভিন্ন অংশের প্রাণ-রাসায়নিক বিক্রিয়াগুলি ভিন্ন হয়। কেবল তাই নয়, মস্তিষ্কের ক্রিয়াকলাপ মূলতঃ তড়িৎ-প্রবাহযুক্ত, কিন্তু অন্যান্য অংশের ক্রিয়াগুলি মূলত যান্ত্রিক ও রাসায়নিক।

স্নায়ুকোষগুলি তড়িৎ-প্রবাহের সাহায্যে ভাল মন্দ সব খবর দেহের সমস্ত অংশে পাঠিয়ে দেহযন্ত্রের সমস্ত অঙ্গকে সচেতন রাখছে। যদিও কিভাবে তড়িৎ-সঙ্কেতগুলি এত দ্রুত দেহের বিভিন্ন অংশে সঞ্চালিত হয়, তার গূঢ় রহস্য এখনও উদ্‌ঘাটিত হয় নি, কিন্তু একথা বিজ্ঞানীদের কাছে এখন পরিষ্কার যে, ঐ সব তড়িৎ-সঙ্কেতের উৎপত্তি ও সঞ্চালন কতকগুলি নির্দিষ্ট অতি সূক্ষ্ম অথচ দ্রুত রাসায়নিক বিক্রিয়া থেকে উৎপন্ন হয়। এমনিভাবেই বিভিন্ন রাসায়নিক বিক্রিয়া থেকে উৎপন্ন ভিন্ন ভিন্ন তড়িৎ-সঙ্কেত দেহের সমস্ত অঙ্গে সঞ্চারিত হচ্ছে।

হাত, পা, নাক, মুখ ইত্যাদি সমস্ত প্রাণিদেহে আছে এবং এদের পরিচালনা খুব সহজভাবেই মস্তিষ্ক করে থাকে। দেহ-সঞ্চালনের মূলে আছে কতকগুলি প্রাণ-রাসায়নিক পরিবর্তন। আবার উন্নততর প্রাণীদের মস্তিষ্ক দেহ-সঞ্চালন ছাড়াও চতুরতা, যুক্তি, স্বভাব, স্মৃতি, শিক্ষা ইত্যাদি পরিচয় বহন করছে। মনোজগতের ঐ সব সূক্ষ্ম বৈশিষ্ট্যগুলির মূলে আছে প্রাণ-রাসায়নিক বিক্রিয়া, যা মস্তিষ্কে অনবরত ঘটছে। এই সব বৈশিষ্ট্যগুলি ঔষধ কিংবা বিষাক্ত পদার্থের দ্বারা প্রভাবিত হয়। মনোজগতের আরও জটিল দিকগুলি, যাদের সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান সুশৃঙ্খল মানব সমাজ গঠনে সহায়তা করবে, তাদের মধ্যে প্রধান হলো চরিত্র, ব্যক্তিত্ব, উদ্ভাবনশক্তি, নৈতিক দিক ইত্যাদি। বর্তমান বিজ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে এটা আশা করা ভুল হবে না যে, মনোজগতের জটিল দিকগুলির সঠিক প্রাণ-রাসায়নিক সম্পর্কগুলি খুঁজে পাওয়া যায়।

প্রতিভা এবং স্নায়ু-রসায়নবিদ্যার সম্পর্ক হয়তো মস্তিষ্কের একটি ক্ষুদ্র স্থানে সীমাবদ্ধ। কেবল তাই নয়, দক্ষতা এবং প্রতিভার মধ্যে প্রাণ-রাসায়নিক পার্থক্যও হয়তো খুবই সামান্য। বৈজ্ঞানিকেরা আশা করেন, ভবিষ্যতে হয়তো এমন দিন আসবে, যেদিন মানুষ তার নিজ মস্তিষ্কের নিঁখুত মাপকাঠিতে মনুষ্যচরিত্রকে কোন দৈবের প্রভাব ছাড়াই বশে আনতে পারবে। সেদিন তৈরি হবে মনুষ্যচালিত এক অতিমানব সমাজ। যদিও আশাবাদী মানুষের অনেক কল্পনাই এমন নিছক বলে মনে হবে, কিন্তু অনেক অসম্ভব যেমন সম্ভব হয়েছে, ভবিষ্যৎ সুশৃঙ্খল মানবসমাজ গঠনও তেমনিভাবে বাস্তবে রূপায়িত হবে। এই প্রবন্ধে আমরা সেই উজ্জ্বল সম্ভাবনার কথা মানবসমাজকে অবহিত করাবো। বর্তমান প্রবন্ধের গোড়ার দিকে আমরা স্নায়ু-রসায়নবিদ্যার উল্লেখযোগ্য তথ্য পরিবেশন করাবো এবং পরিশেষে মানবসমাজ গঠনে এর উজ্জ্বল সম্ভাবনার কথা আলোচনা করবো।

মস্তিষ্কে আকৃতি ও প্রকৃতিগত পরিবর্তন

গত দশ বছর বহু মনস্তত্ত্ববিদ্, প্রাণ-রসায়নবিদ্ (Biochemist) এবং শারীরবিদ্ (Anatomist) দেখিয়েছেন যে, বিভিন্ন শিক্ষালাভের ফলে গুরুমস্তিষ্ক স্তরে (Cerebral cortex) রাসায়নিক ও আকৃতিগত পরিবর্তন ঘটে। আরও একটু পরিষ্কারভাবে বলা যায়, প্রাণীদের উন্নত সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা বা শিক্ষার্জনের ক্ষমতার সঙ্গে মস্তিষ্কের বিভিন্ন পরিবর্তনগুলির একটা সম্পর্ক আছে। যদিও একথা ঠিক যে, মস্তিষ্কে উপরিউক্ত পরিবর্তন হবার একটা সীমা আছে। বিভিন্ন

বাস্তব স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করবার জন্যে বৈজ্ঞানিকেরা পরীক্ষার উপাদান হিসাবে ইঁদুরকে কাজে লাগিয়েছেন। ইঁদুরগুলিকে শিক্ষা দেওয়া হয় সাধারণতঃ দুটি সম্পূর্ণ বিপরীত পরিবেশে। কতকগুলিকে শিক্ষা দেওয়া হয় নিস্তব্ধ, নিঃসঙ্গ অবস্থায়, আবার কতকগুলিকে উত্তেজিত পরিবেশে দেখা গেছে, শিক্ষাপ্রাপ্ত ইঁদুরগুলি কোন সমস্যা সমাধান করতে গিয়ে কম ভুল করে। ঐ ইঁদুরগুলির মস্তিষ্ক বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে, ওদের মস্তিষ্ক সাধারণ ইঁদুরগুলি থেকে অনেকাংশে পৃথক। বিশেষ করে উন্নত ইঁদুরগুলির গুরুমস্তিষ্ক স্তরের গঠন অনুন্নত ইঁদুরগুলির থেকে অনেক তফাৎ। কেবল তাই নয়, এদের মস্তিষ্কের বিভিন্ন স্তরে এবং বিভিন্ন অংশে প্রাণ-রাসায়নিক বিক্রিয়াগুলির মধ্যেও পার্থক্য যথেষ্ট। এখন আমাদের প্রশ্ন—নিরানন্দ, নিঃসঙ্গ, জীবনযাত্রায় কৃত্রিম শিক্ষাদানের ফল কতটা কার্যকরী? মস্তিষ্কে যে সব পরিবর্তন কোন উদ্দীপনা বা জটিল পরিবেশজনিত প্রভাবে দেখা যায়, সেগুলি উপযুক্ত শিক্ষার মাধ্যমে সংশোধন করা যায় কি? দেখা গেছে, কোন বিশেষ পরিবেশে মস্তিষ্কের কেবলমাত্র নির্দিষ্ট স্থানের আকৃতির দ্রুত বৃদ্ধি হয়ে থাকে। তাই মনে হয়, মস্তিষ্কের কোন ক্ষতিগ্রস্ত স্থান অথবা কোন অনুন্নত ইন্দ্রিয়ের উন্নতি বিশেষ শিক্ষার মাধ্যমে হওয়া একেবারে অসম্ভব নয়।

মস্তিষ্ক সম্পর্কে আমাদের জানবার আকাঙ্খা আজকের নয়। বহু প্রাচীনকাল থেকেই বৈজ্ঞানিকেরা বিশ্বাস করতেন যে, মস্তিষ্ককে প্রচুর পরিমানে ব্যবহার করলে এর আকৃতিগত এবং প্রকৃতিগত পরিবর্তন হয়। চার্লস ডারউইন প্রথম লক্ষ্য করলেন যে, গৃহপালিত র‍্যাবিটগুলির (Rabbit—শশকজাতীয় প্রাণীবিশেষ) মস্তিষ্ক অন্য র‍্যাবিটগুলির মস্তিষ্ক থেকে ছোট। তিনি বললেন—এর কারণ হলো বহু পুরুষ যাবৎ গৃহপালিত প্রাণীগুলি বন্যপ্রাণীগুলি থেকে দূরে থাকায় সহজাত প্রবৃত্তি ও বুদ্ধিকে ব্যবহার করতে পারে নি, তাই এদের মস্তিষ্ক ছোট, আর বন্যপ্রাণীরা প্রচুর পরিমাণে সহজাত প্রবৃত্তি ও বুদ্ধিকে কাজে লাগায় তাই তাদের মস্তিষ্ক বড়। তিনি আরও বললেন যে, মস্তিষ্কের কম পরিশ্রম বা মস্তিষ্ককে স্বল্প পরিমাণে উত্তেজিত করলে এর কার্যকমতা পঙ্গু হয়ে পড়ে। উনিশ শতকের প্রথম দিকে Laura Bridgman কানা, বোবা, অন্ধদের মস্তিষ্কের দৃষ্টি, কথোপকথন এবং শ্রবণসম্বন্ধীয় স্থানগুলির অনুন্নত গঠন দেখিয়েছেন। ইদানীং একদল প্রাণীকে অন্ধকারে বহুদিন রেখে দেখা গেছে, ওদের মস্তিষ্কের দৃষ্টি সম্পর্কিত অংশটি সাধারণ প্রাণীদের থেকে সঙ্কুচিত। সবচেয়ে ভাল হতো যদি একই প্রাণীতে দুটি সম্পূর্ণ বিপরীত পরিবেশে মস্তিষ্কের পরিবর্তনগুলি দেখা যেত। যেমন ধরুন, কোন একটি লোককে বহুদিন কঠিন মস্তিষ্কের কাজ করিয়ে এবং ঐ একই লোকের মস্তিষ্কে অলস অবস্থায় কি ধরণের পরিবর্তন হয়, তা লক্ষ্য করা। আরও এক রকম পরীক্ষা করা যেতে পারে, যেমন—যমজ ভ্রাতার একটিকে নিঃসঙ্গ কর্মহীন স্থানে এবং অপরটিকে সম্পূর্ণ আনন্দময় কর্মচঞ্চল অবস্থায় রেখে পরীক্ষা করা। অবশ্য মানুষের উপর এই ধরণের পরীক্ষা চালাবার ভার কেউই সহজে গ্রহণ করতে চাইবে না। এর জন্যে সুদূর ভবিষ্যতে সাজসরঞ্জামপূর্ণ পরীক্ষাগার এবং সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতির জন্যে অপেক্ষা করতে হবে। মস্তিষ্কের আয়তন ও আকৃতির সঙ্গে বুদ্ধিমত্তার যে একটা সম্পর্ক আছে, তা প্রায় ১৫-১৬ বছর আগের ধারণা। এই ধারণার মূল্য খুব কমই, যেহেতু অনেক বোকার মস্তিষ্ক আইনস্টাইনের মস্তিষ্ক থেকে বড়। শিক্ষার ফলে মস্তিষ্কে যে সব আকৃতিগত পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়, তার কারণগুলি সম্পর্কে অনুসন্ধান সুরু হলো ১৯৫৩ সালে। ইতিমধ্যে Dr. Krech ইঁদুর 'শিক্ষণে'র উপযুক্ত একটা বাক্স উদ্ভাবন করলেন। এই বাক্সটি লম্বা এবং এর চারটি প্রকোষ্ঠ আছে।

ক্ষুধার্ত ইঁদুরকে বাক্সে ছেড়ে দিলে সে প্রত্যেকটি প্রকোষ্ঠের ডান অথবা বাম দিকের যে কোন পথ বেছে নিতে পারে। বিভিন্ন পথের আবার কোথাও আলো এবং কোথাও অন্ধকার করে রাখা হয়েছে, যে কোন পথ বেছে নেওয়া যায়। হয়তো আলো এবং অন্ধকারমিশ্রিত পথে গেলেই লক্ষ্যস্থলে পৌঁছান যায়। কেবল অন্ধকার বা আলোর পথে হয়তো লক্ষ্যস্থলে নাও যাওয়া যেতে পারে। অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত নির্দিষ্ট লক্ষ্যস্থলে রেখে দেওয়া খাবার খেতে গেলে ইঁদুরকে কেবলমাত্র একটি পথই খুঁজে পেতে হবে। কয়েক বার অভ্যাস হলে ইঁদুরগুলি নির্ভুলভাবে একবারেই লক্ষ্যস্থলে পৌঁছে যাবে। এভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত ইঁদুরদের আমরা বলি উন্নত ইঁদুর। যখন কেউ চিন্তা করে বা কোন কাজ করতে উদ্যত হয়, তখন স্নায়ুকোষগুলি যাদের নিউরন বলা হয়, তারা বিভিন্ন সাঙ্কেতিক তরঙ্গ সঞ্চালিত করে। একটি স্নায়ুকোষ তার নিকটতম স্নায়ুকোষে প্রাণ-রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটায়। কোন বার্তা পৌঁছে দেবার সময় একটি স্নায়ুকোষ এবং তার চতুর্দিকের সমস্ত স্নায়ুকোষগুলির মধ্যে যে স্বল্প পরিমাণ ব্যবধান থাকে, সেখানে কতকগুলি রাসায়নিক পদার্থ নিঃসৃত হয়। এই রাসায়নিক পদার্থগুলিই হলো মস্তিষ্কের খবরাখবর পৌঁছে দেবার প্রেরক-যন্ত্র, তাই এদের বলা হয় স্নায়ু-প্রেরকযন্ত্র (Neurotransmitter)। স্নায়ু-প্রেরকযন্ত্রগুলি স্নায়ুকোষগুলির মধ্যেকার স্বল্প ব্যবধানটুকু ভরে রাখে। কোন উত্তেজক পদার্থ যখন স্নায়ুকোষকে উত্তেজিত করে, তখন স্নায়ু-প্রেরকযন্ত্রগুলি প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। অতি মাত্রায় স্নায়ু-প্রেরকযন্ত্রগুলি ব্যবহৃত হলে কোষের অনবরত উত্তেজিত হবার ক্ষমতা লোপ পায়। কোষকে অনবরত উত্তেজিত হবার হাত থেকে রক্ষা করবার জন্যে আবার কতকগুলি অনুত্তেজক পদার্থও একই সঙ্গে কাজ করতে থাকে। কোন উত্তেজনাবশতঃ যখন কোন প্রেরক বস্তু স্নায়ুকোষ থেকে নিঃসৃত হয়, তা পরমুহূর্তে জৈব অনুঘটকের সাহায্যে প্রশমিত হয়।

প্রথম যে স্নায়ু-প্রেরক বস্তুটি নিয়ে নানারকম অনুসন্ধান করা হয়েছিল, তার নাম অ্যাসেটাইল কোলিন (Acetyl Choline)। এই বস্তুটি দেহের প্রায় সর্বত্রই ছড়িয়ে আছে। পদার্থটি একটি স্নায়ুকোষ ও অপর একটি স্নায়ুকোষের মধ্যে যে ব্যবধান আছে, সেখানে নিঃসৃত হয়, তারপর জৈব অনুঘটক অ্যাসেটাইল কোলিন এস্টারেজ (Acetyl Choline Esterase) বা সংক্ষেপে AChE এবং কোলিন এস্টারেজ (Choline Esterase) বা সংক্ষেপে ChE-এর যৌথ আক্রমণে ভেঙ্গে যায়। স্নায়ুকোষগুলির সন্ধিস্থলের উত্তেজনা প্রশমিত হয় এবং ঐ স্থানটি পূর্বাবস্থা ফিরে পায়। দেখা গেছে, অ্যাসেটাইল কোলিনের উত্তেজক প্রভাব বিনষ্ট করবার জৈব অনুঘটক মস্তিষ্কে প্রচুর পরিমাণে আছে। ১৯৫০ সালের মাঝামাঝি অ্যাসেটাইল কোলিনকে ভেঙ্গে দেবার জৈব অনুঘটক নিয়ে প্রচুর কাজ সুরু হয়ে যায়। প্রথমে ধারণা হয়েছিল শিক্ষাপ্রাপ্ত ইঁদুরগুলির মস্তিষ্কে AChE-এর সক্রিয়তা বেশী। কিন্তু পরবর্তী পরীক্ষায় দেখা গেল যে, কিছু কিছু শিক্ষাপ্রাপ্ত ইঁদুরের মস্তিষ্কে ChE-এর সক্রিয়তা অধিক। কেবল তাই নয়, অনুন্নত ইঁদুরের মস্তিষ্কেও AChE-এর সক্রিয়তা অধিক।

মস্তিষ্কের বৃদ্ধি

এতদিন কেবল প্রাণ-রাসায়নিক পরিবর্তনগুলিই পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছিল। এবার গবেষকেরা মস্তিষ্কের বৃদ্ধি এবং তার সঙ্গে পরিবেশ ও রাসায়নিক প্রভাবের উপর বিশেষ নজর দিলেন। প্রথমে তাঁদের ধারণা হয়েছিল যে, বয়ঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কোন এক সময়ে মস্তিষ্কের ওজনের আর পরিবর্তন হয় না। এই ধারণা বহুদিন বদ্ধমূল ছিল। কিন্তু প্রতি একক

স্তরের স্নায়ুপেশীতে জৈব অনুঘটকগুলির সক্রিয়তা মাপতে গিয়ে লক্ষ্য করা গেল যে, পরিবেশজনিত বা রাসায়নিক প্রভাবে মস্তিষ্কের ওজনের খানিকটা তারতম্য ঘটে। অনেকের ধারণা হয়েছিল যে, একই প্রাণীগোষ্ঠীর অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিমানদের বোঝবার মাপকাঠি হলো বৃহৎ মস্তিষ্ক। কিন্তু এমন অনেক একই জাতির ইঁদুরের উন্নত এবং অনুন্নতদের মস্তিষ্কের ওজন এবং গঠনের কোন পার্থক্যই দেখা গেল না। অনেক সময় একই জাতের ইঁদুরের মধ্যে বৃহৎ মস্তিষ্কের ইঁদুরগুলি অনুন্নত বুদ্ধির পরিচয় দিল। সুতরাং কোন প্রাণীগোষ্ঠীর বুদ্ধির তারতম্য বোঝবার মাপকাঠি মস্তিষ্কের ওজন এবং গঠনের কোনটাই নয়। এবার মস্তিষ্ককে আরও বিশ্লেষণ করে দেখবার জন্যে পরীক্ষকেরা মস্তিষ্কের বিভিন্ন স্তরে এবং বিভিন্ন অংশে পরিবর্তনগুলি পর্যবেক্ষণ সুরু করলেন। মস্তিষ্কের রাসায়নিক পরিবর্তনগুলি গুরুমস্তিষ্ক স্তরে প্রধানতঃ চারটি অংশে পরীক্ষকেরা পরীক্ষা করে দেখলেন। মস্তিষ্কের অন্যান্য স্তর থেকে গুরুমস্তিষ্ক স্তরটিকে স্বতন্ত্র করে ঐ স্তরের চারটি বিভিন্ন অংশে পরীক্ষা করা হলো। দেখা গেল, গুরুমস্তিষ্ক স্তরেই জ্ঞানার্জনের অধিকাংশ পরিবর্তনগুলি হয়ে থাকে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, পূর্ববর্তী পরীক্ষায় যদিও শিক্ষাপ্রাপ্ত ইঁদুরের মস্তিষ্কের ওজনের বৃদ্ধি ধরা পড়ে নি, কিন্তু এবার দেখা গেল যে, উন্নত বুদ্ধির ইঁদুরগুলির গুরুমস্তিষ্ক স্তরের ওজন অনুন্নত বুদ্ধির ইঁদুরগুলি থেকে ৪% ভাগ বেশী। যদিও এই পরীক্ষার সত্যতা ভালভাবে যাচাই করা খুব সহজ কাজ নয়, কারণ মস্তিষ্কের অন্যান্য স্তর থেকে গুরুমস্তিষ্ক স্তরটিকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র করা খুবই কঠিন। গুরুমস্তিষ্ক স্তরের বিভিন্ন অংশে আরও সূক্ষ্ম পরীক্ষা করে দেখা গেল যে, বিশেষ কতকগুলি অংশ অন্য অংশগুলি থেকে অপেক্ষাকৃত বেশী বৃদ্ধি পায়। উন্নত বুদ্ধির ইঁদুরগুলির মস্তিষ্কের পশ্চাৎভাগের গুরুমস্তিষ্ক স্তরের ওজন অনুন্নত বুদ্ধির ইঁদুরগুলি থেকে প্রায় ৬% ভাগ বেশী, কিন্তু মস্তিষ্কের অন্যান্য অংশগুলিতে ওজনের বৃদ্ধি খুব সামান্যই হয়। ইতিমধ্যে গুরুমস্তিষ্ক স্তরে পরিবেশজনিত প্রভাবে কতটা পরিবর্তন হয়, তা নিয়ে আরও কতকগুলি উল্লেখযোগ্য কাজ হলো। বহুদিন অন্ধকারে রেখেদেওয়া ইঁদুরগুলির গুরুমস্তিষ্ক স্তরের দৃষ্টিসম্পর্কিত স্থানটি অপরিপুষ্ট দেখা গেল। পরীক্ষকেরা অনুরূপ পরীক্ষা দৃষ্টিহীন ইঁদুরেও করলেন। দুটি সম্পূর্ণ বিপরীত পরিবেশে রেখে দেখলেন যে, উপযুক্ত শিক্ষাপ্রণালীর মাধ্যমে এবং জটিল পরিবেশে দৃষ্টিহীন ইঁদুরগুলিকে মোটামুটি সাধারণ অবস্থায় শিক্ষাপ্রাপ্ত ইঁদুরগুলির মত তৈরি করা যায়। অর্থাৎ শিক্ষাপ্রাপ্ত দৃষ্টিহীন ইঁদুরগুলি এবং শিক্ষাপ্রাপ্ত সাধারণ ইঁদুরগুলির মধ্যে পার্থক্য শুধু একদল চোখে দেখতে পায় আর অন্য দল চোখে দেখতে পায় না, কিন্তু অন্যান্য পরিচয়গুলি প্রায় সবই এক রকম। যদিও প্রাণ-রাসায়নিক পরীক্ষা থেকে দেখা গেছে যে, দৃষ্টিহীন ইঁদুরদের এবং যাদের দৃষ্টি আছে, তাদের স্নায়ুকোষের জৈব অনুঘটকগুলির সক্রিয়তার মধ্যে বিশেষ পার্থক্য আছে। শিক্ষাপ্রাপ্ত উন্নত দৃষ্টিহীন ইঁদুরগুলির দৃষ্টি সম্পর্কিত গুরুমস্তিষ্ক স্তরের ৬% ভাগ বৃদ্ধি থেকে বেশ বোঝা যায় গুরুমস্তিষ্ক স্তরের ঐ স্থানটির বৃদ্ধি বা উন্নতি কেবলমাত্র দৃষ্টির উপরেই নির্ভর করে না, দৃষ্টিহীন অবস্থাতেও ঐ অংশটির কাজ চলতে থাকে। এথেকে বেশ বোঝা যাচ্ছে, পরিবেশজনিত প্রভাবে দৃষ্টিহীন প্রাণীদেরও গুরুমস্তিষ্ক স্তরের বিশেষ অংশগুলি উত্তেজিত হয় এবং দৃষ্টিহীন অবস্থাতেও ওরা কাজ চালিয়ে যেতে পারে।

বিভিন্ন রাসায়নিক পরিবর্তন

প্রথম দিকে আশা করা গিয়েছিল, জৈব অনুঘটক AChE-এর সক্রিয়তা উন্নত ইঁদুর-

গুলির মস্তিষ্কে বেশী থাকবে। ফলে স্নায়ু-কোষে স্নায়ু-প্রেরক অ্যাসেটাইল কোলিন বেশী পাওয়া যাবে। কার্যতঃ কিন্তু AChE জৈব অনুঘটকটির সক্রিয়তার পরিমাণ গুরুমস্তিষ্ক স্তরের বৃদ্ধির অনুপাতে কম দেখা গেল। যদিও গুরু-মস্তিষ্ক স্তরে AChE-এর সক্রিয়তা কমবার সঙ্গে সঙ্গে স্নায়ুকোষে ChE-এর সক্রিয়তা সমপরিমাণে বাড়তে দেখা গেল। আবার যখন AChE-এর সক্রিয়তা গুরুমস্তিষ্কে কমতে থাকে, তখন ঐ একই জৈব অনুঘটকটির সক্রিয়তা গুরুমস্তিষ্কের নিম্নস্তরে সমপরিমাণে বাড়তে থাকে। পরীক্ষকেরা প্রাণ-রাসায়নিক পরিবর্তনগুলি আরও ভাল ভাবে পরীক্ষা করে দেখলেন যে, উন্নত ইঁদুরের গুরুমস্তিষ্ক স্তরে ChE-এর সক্রিয়তা যখন বাড়তে থাকে, তখন ঐ স্তরে AChE-এর সক্রিয়তা কমতে থাকে। সুতরাং ChE এবং AChE জৈব অনুঘটক দুটির পরিমাণ ও সক্রিয়তা গুরুমস্তিষ্ক স্তর ও তার নিম্নস্তরে কতটা, তা উন্নত ও অনুন্নত বুদ্ধি বিচারের একটা সাধারণ মাপকাঠি হতে পারে। বৈজ্ঞানিকেরা যখন দুটি জৈব অনুঘটকের অনুপাত মস্তিষ্কের কতকগুলি বিশেষ স্থানে পরীক্ষা করে দেখছিলেন, তখন দৃষ্টিসম্পর্কিত মস্তিষ্ক স্তরে উন্নত এবং অনুন্নত ইঁদুরগুলিতে জৈব অনুঘটক দুটির সক্রিয়তা এবং পরিমাণের অনুপাতের বিশেষ তারতম্য লক্ষ্য করলেন। পরীক্ষকেরা এবার উন্নত ইঁদুরগুলির বিভিন্ন মস্তিষ্ক স্তরের ওজন বৃদ্ধির সঙ্গে মস্তিষ্কপেশীতে কি ধরনের পরিবর্তন হয়, তা আরও ভালভাবে দেখতে গিয়ে লক্ষ্য করলেন যে, স্নায়ুকোষ ছাড়াও মস্তিষ্কে আরও কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষ আছে। কোষগুলির নাম দেওয়া হয়েছে গ্লিয়া কোষ (Glia cell)। এরা স্নায়ুকোষ নয়, কিন্তু এদের গুরুত্ব অনেক। গ্লিয়া কোষে ChE-এর পরিমাণ স্নায়ুকোষ থেকে বেশী পাওয়া গেল। তাঁরা মনে করলেন হয়তো ক্ষুদ্র গ্লিয়া কোষগুলির উর্বরতাই উন্নত ইঁদুরের মস্তিষ্ক স্তরের ওজন বৃদ্ধির কারণ।

স্নায়ুকোষের বংশবৃদ্ধি

উন্নত এবং অনুন্নত ইঁদুরের দৃষ্টিসম্পর্কিত মস্তিষ্কের স্নায়ুপেশী সংগ্রহ করে স্নায়ুকোষ সংখ্যা এবং গ্লিয়া কোষ সংখ্যা গণনা করে তুলনামূলক বিচারে দেখা গেল যে, উন্নত ইঁদুরগুলিতে গ্লিয়া কোষ সংখ্যা অনেক বেশী। শুধু তাই নয়, ঐ ইঁদুরগুলির বিভিন্ন গ্লিয়া এবং স্নায়ুকোষ সংখ্যার অনুপাতও বেশী। গ্লিয়া সম্পর্কে এখনও ধারণা পরিষ্কার নয়। কিন্তু যতটুকু জানা গেছে তা হলো, গ্লিয়া কোষগুলি স্নায়ুকোষের পুষ্টিসাধন করে, আবার স্নায়ুকোষে উত্তেজনার পরিবর্তন ঘটিয়ে মস্তিষ্কের সক্রিয়তাকে বিভিন্ন রূপে পরিচালিত করে। পরিবেশজনিত জটিলতা কিংবা উত্তেজনা গ্লিয়া কোষগুলিকে উর্বর করে, ফলে স্নায়ুকোষের সক্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। যে সব তেজস্ক্রিয় মৌলিক পদার্থ গ্লিয়া এবং স্নায়ুকোষ গঠনে অংশগ্রহণ করে, তা ব্যবহার করে বৈজ্ঞানিকেরা প্রমাণ করেছেন যে, উত্তেজক পরিবেশে গ্লিয়া কোষের উর্বরতা বৃদ্ধি পায়। পরিবেশজনিত প্রভাবে কেবল গ্লিয়া কোষ সংখ্যারই বৃদ্ধি হয় না, মস্তিষ্কের কর্মক্ষমতা বাড়াতেও এরা অনেক ভাবে সাহায্য করে।

পরিবেশজনিত প্রভাবে মস্তিষ্কের পরিবর্তনসমূহ

পরীক্ষাগারে পরিবেশজনিত সমস্ত প্রভাবগুলিকে নিখুঁতভাবে পরিচালনা করলেও মস্তিষ্কে কোন একটি পরিবর্তনের সঠিক পরিবেশজনিত কারণ নির্ধারণ করা খুব সহজ কাজ নয়। যেমন ধরুন, মানুষ ও জন্তুজানোয়ারের উপর নিঃসঙ্গতার বিশেষ প্রভাব। ইঁদুরের উপর নিঃসঙ্গতার বিভিন্ন প্রভাব পরীক্ষা করে দেখা গেছে

নিঃসঙ্গতা ইঁদুরের মানসিক কতকগুলি পরিবর্তন ঘটায়। আরও লক্ষ্য করা গেছে যে, নিঃসঙ্গতা ইঁদুরগুলিকে বেশী হিংস্র এবং আক্রমণাত্মক করে তোলে। ফলে রসায়নাগারে এদের রক্ষণাবেক্ষণ বেশ কঠিন হয়ে পড়ে। এদের অ্যাড্রিনাল গ্রাণ্ডের (Adrenal gland) আকার বেড়ে যায়, চর্মে অস্বাভাবিক উত্তেজনা দেখা দেয় এবং আরও নানা রকমের শারীরিক পরিবর্তন প্রকাশ পায়। নিঃসঙ্গতা কতটা মস্তিষ্কে ও প্রাণীর আচার-ব্যবহারে প্রভাব বিস্তার করে, তা একদল বৈজ্ঞানিক উন্নত এবং অনুন্নত উভয় শ্রেণীর ইঁদুরের উপর পরীক্ষা করে দেখেছেন। দেখা গেছে, অনুন্নত ইঁদুরকে সামাজিক নিয়ন্ত্রণে রাখলে দৃষ্টি-সম্পর্কিত মস্তিষ্ক স্তরে আশাতীত ফল পাওয়া যায়। মস্তিষ্ক স্তরের ঐ অংশটির অবশ্যই সাধারণ অনুন্নত ইঁদুরগুলি থেকে বেশী বৃদ্ধি ঘটে।

আবার সমস্ত সামাজিক নিয়ন্ত্রণ থেকে প্রাণীকে বিচ্ছিন্ন করলে মস্তিষ্কে কি ধরণের পরিবর্তন হয়, তা পরীক্ষা করে দেখবার জন্যে এক বিশেষ ধরণের পরীক্ষা করা হলো। কতকগুলি ইঁদুরকে এমন একটি কক্ষে রাখা হলো, যেখানে উষ্ণতা অপরিবর্তনশীল এবং আলো নেই বললেই চলে। ইঁদুরগুলি কক্ষের বাইরে কিছুই দেখতে পায় না। এমন কি যখন খাদ্য ও পানীয় দেওয়া হয়, তখনও ইঁদুরগুলি পরীক্ষককে দেখতে পায় না। এরকম অবস্থায় কক্ষে ১২ ঘন্টা অন্তর আলো ও অন্ধকার সৃষ্টি করে ৮০ দিন রাখা হলো। তারপর নানা উত্তেজক পরিবেশে ইঁদুরগুলিকে উন্নত করা হলো। দেখা গেছে যে, সাধারণ উন্নত ইঁদুরগুলি যাদের কখনই এই ধরণের অভিজ্ঞতা হয় নি, তারা অনেকভাবে প্রথম শ্রেণীর ইঁদুরগুলি থেকে পৃথক। কেবল দেহভিত্তিক পরিচয়ে নয়, মস্তিষ্ক স্তরের পেশীর বিশেষ স্থানের ওজন ও ঐ সব স্থানের জৈব অণুঘটকগুলির সক্রিয়তারও অনেক পার্থক্য লক্ষ্য করা গেছে।

এখন আমাদের প্রশ্ন—সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গতার দরুণ মস্তিষ্ক যে সব কারণে অনুন্নত হয়, সামাজিক উত্তেজনা কিংবা পরিবেশজনিত উত্তেজনার অভাবেও কি একই রকম অনুন্নত মস্তিষ্ক তৈরি হয়? এই উক্তির সত্যতা যাচাই করবার জন্যে ভিন্ন মায়ের দুটি ইঁদুরকে সম্পূর্ণ নিরালায় কিছুদিন রেখে মস্তিষ্কের নমুনা তদন্ত করে দেখা গেছে যে, দুটি ইঁদুর নিরালায় একসঙ্গে থাকলেও নিঃসঙ্গতার প্রভাবগুলি এই অবস্থায় প্রশমিত হয় না। অর্থাৎ সামাজিক পরিবেশে মস্তিষ্কে যে সব পরিবর্তন হয়, তার যৎসামান্যই এদের মস্তিষ্কে দেখা যায়। একই রকম আরও পরীক্ষা করে দেখা গেল, সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গতা বা অনুত্তেজক পরিবেশে প্রায় সমস্ত ইঁদুরের মস্তিষ্ক স্তরে স্নায়ুপেশীর ওজন এবং জৈব অণুঘটকের সক্রিয়তার পরিমাণ প্রায় একই রকম বাড়ে বা কমে। এও লক্ষ্য করা গেল যে, ক্রমশঃ উন্নত পরিবেশ সৃষ্টি করে অনুন্নত ইঁদুরদের উন্নত করা যায়। তিনটি ইঁদুরকে নিরালায় রেখে দিলেও তাদের মস্তিষ্কের পরিবর্তনগুলি আগের মতই দেখা গেল। যদিও এক্ষেত্রে মস্তিষ্কের জৈব অণুঘটকগুলির অনুপাত অনেকটা উন্নত ইঁদুরদের কাছাকাছি দেখা গেছে। অনেকগুলি ইঁদুরকে এক সঙ্গে নিরালায় রাখলে গুরুমস্তিষ্ক স্তরের দৃষ্টি সম্পর্কিত স্নায়ুকোষের পরিবর্তনগুলি খানিকটা উন্নত ইঁদুরদের মত দেখা গেছে, তাই এদের উন্নত এবং অনুন্নত ইঁদুরদের মাঝামাঝি পর্যায়ে ফেলা যায়। এও দেখা গেছে, সামাজিক জটিল পরিবেশে অনুন্নত ইঁদুরগুলি যেমন উন্নত হয়, তেমনি সামাজিক পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন সম্পূর্ণ নিরালায় কেবল সংখ্যাবৃদ্ধিই উন্নত মস্তিষ্কের ইঁদুর তৈরি করতে পারে না। কিন্তু সম্পূর্ণ নিরালায় বিভিন্ন উত্তেজক পরিবেশ সৃষ্টি করে আবার দেখা গেছে যে, প্রাণ-রাসায়নিক ও দেহভিত্তিক পরিচয়গুলি মোটামুটি উন্নত ইঁদুরদের মত হয়।

পরিণত বয়সে পরিবেশজনিত প্রভাব

আমরা অনেক সময় লক্ষ্য করেছি যে, ছোটবেলার কথা বা ঘটনা পরিণত বয়সেও মনে থাকে, কিন্তু ঐ সব ঘটনা পরিণত বয়সে ঘটলে তা বেশী মনে থাকে না। অর্থাৎ জীবন গঠনের গোড়ার দিকে যে সব অভিজ্ঞতা মস্তিষ্কে রেখাপাত করে, তার গভীরত্ব পরিণত বয়সে একই অভিজ্ঞতার গভীরত্ব থেকে অনেক বেশী। মনোবিজ্ঞানে এর গুরুত্ব মানবজাতির ক্ষেত্রে অনেক। একদল বৈজ্ঞানিক প্রাপ্তবয়স্ক ইঁদুর এবং সভ্য মায়ের দুধ খাওয়া ছেড়েছে ইঁদুরগুলির (Weanlings) গুরু-মস্তিষ্ক স্তরে অভিজ্ঞতার প্রভাব দেখিয়েছেন। সুতরাং পরিবেশজনিত প্রভাব গুরুমস্তিষ্কে যে রেখাপাত করে, তা প্রাণীদের কৈশর থেকে পরি-ণত হওয়ার সাধারণ নিয়মিত বৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করবার ফলস্বরূপ নয়। মায়ের দুধ খাওয়া ছাড়বার পর (অর্থাৎ ২৫ দিন বয়সে) এবং ১০৫ দিনের মধ্যে ইঁদুরের মস্তিষ্ক বেশ ভালভাবেই তৈরি হয়ে যায়। ২৫ দিন বয়সের ইঁদুরগুলিকে যদি বিশেষ খাঁচায় ১০৫ দিন রাখা যায়, তা হলে দেখা যাবে যে, মস্তিষ্ক স্তরের ওজন প্রায় ২০% এবং বাদ বাকী অংশের ওজন ৪০% ভাগ বেড়েছে। আরও বেশীদিন খাঁচায় রাখলে মস্তিষ্কের বিভিন্ন-স্তরে স্নায়ুপেশীর ওজন খুব কমই বাড়তে দেখা যায়। ১০৫ দিন বয়সের ইঁদুরগুলিকে আরও ৮০ দিন উন্নত পরিবেশে রাখলে স্নায়ুপেশীর ওজন ৫% ভাগ বাড়তে দেখা গেছে। তাই ১০৫ দিন বয়সের ইঁদুরকে পরিণত ইঁদুর বলা যায়। এবার উন্নত এবং অনুন্নত পরিবেশে এদের উপর পরীক্ষা করা হলো। উদ্দেশ্য হলো, পরিবেশজনিত প্রভাব কতটা পরিণত মস্তিষ্কে পরিবর্তন ঘটাতে পারে। ১০৫ দিন বয়সের পরিণত ইঁদুরদের উন্নত ও অনুন্নত পরিবেশে রেখে দেখা গেল যে, এদের মস্তিষ্ক স্তরের ওজন অপরিণত ইঁদুরগুলি থেকে বেশী পরিবর্তিত হয়। যদিও উন্নত পরিবেশজনিত প্রভাব পরিণত ইঁদুরকে যেভাবে প্রভাবিত করে, অপরিণত ইঁদুরগুলিকে ঠিক তেমনটি করে না। আরও ভালভাবে পরীক্ষা করে দেখা গেছে, পরিণত ইঁদুরদের মস্তিষ্কের ওজনের বৃদ্ধি গুরুমস্তিষ্ক স্তরের নিম্নস্তরেই বেশী হয়ে থাকে। কেবল তাই নয়, জৈব অনুঘটকগুলির সক্রিয়তার তারতম্যও এদের মধ্যে যথেষ্ট দেখা গেছে। পরিণতদের মস্তিষ্ক স্তরে AChE-এর সক্রিয়তা কম দেখা গেছে এবং এদের মস্তিষ্কও সহজে প্রভাবিত হয়। তাই এটা খুবই আশাপ্রদ যে, মানসিক সক্রিয়তার উপর পরিবেশজনিত প্রভাব পরিণত মস্তিষ্কেও পরিবর্তন ঘটাতে পারে এবং নানারকম পরিবর্তন ঘটিয়ে অনুন্নত পরিণত মস্তিষ্ককেও উন্নত করা হয়তো ভবিষ্যতে কঠিন হবে না।

পরিবেশজনিত কলকাঠি ও বংশগত ধর্মের সম্পর্ক

কোন পরিবারে শিশুদের স্বভাবের ভিন্নতার মূলে কতখানি পরিবেশজনিত প্রভাব ক্রিয়া করে, ভবিষ্যৎ সুসংবদ্ধ সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলবার পক্ষে তার গুরুত্ব অনেক। গত ১২ বছর প্রজনন সম্পর্কিত বহু পরীক্ষা বিজ্ঞানজগতে এক নতুন পথের সন্ধান দিয়েছে। পরীক্ষাগারে বিশেষ শিক্ষাপ্রণালীর মাধ্যমে পক্ব বা চালাক এবং অপক্ব বা বোকা ইঁদুর তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। এই দুই জাতের ইঁদুরের প্রত্যেকটিতে উন্নত এবং অনুন্নত পরিবেশের স্বভাবজাত, প্রাণ-রাসায়নিক এবং দেহতাত্ত্বিক পরিবর্তন লক্ষ্য করা হয়েছে। এভাবে প্রায় ২৪০টি ইঁদুরকে ১০টি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করে প্রত্যেকটি ভাগে আবার ২৪০টি করে ইঁদুর রেখে তাদের উপর Reversal discrimination পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। এদের মস্তিষ্কে ময়না তদন্ত করে দেখা গেল যে, যে সব ইঁদুর সবচেয়ে বেশী ভুল করে, তাদের মস্তিষ্ক স্তরের

আকৃতি সম্পূর্ণ মস্তিষ্কের অন্যান্য অংশ থেকে ছোট। আরও লক্ষ্য করা হয়েছে যে, এদের মস্তিষ্কে AChE এবং ChE-এর অনুপাত প্রায় উন্নত ইঁদুরগুলির সমান। আবার ঐ একই মস্তিষ্কের ওজন ও জৈব অনুঘটক দুটির অনুপাতের সঙ্গে ইঁদুরের দক্ষতা বিশেষভাবে জড়িত। অনেক সময় পক্ক ইঁদুরগুলি উন্নত পরিবেশে তৈরী ইঁদুরগুলির মত হয়।

এসব পরীক্ষা থেকে আমাদের ধারণা হচ্ছে, বংশ ও পরিবেশ উভয়েই মস্তিষ্কে প্রাণ-রাসায়নিক ও দেহভিত্তিক পথে প্রাণীদের পরিবর্তনশীল অবস্থায় মানিয়ে চলবার ক্ষমতাকে পরিচালিত করে। এখন প্রশ্ন হলো উপযুক্ত পরিবেশে তৈরি ইঁদুরগুলির মস্তিষ্ক স্তরের বৃদ্ধি এবং জৈব অনুঘটকের অনুপাত, যা শিক্ষাপ্রাপ্ত ইঁদুরের মাপকাঠি বলে ধরা হয়, সে রকম পরিবর্তন ইঁদুরের মস্তিষ্কে পাওয়া গেলেই কি তাদের চালাক বলা যাবে? আরও অনেক পরীক্ষা থেকে অনেকটা এরকম সিদ্ধান্তেই আসা হয়েছে বলে আমরা জানি।

পরিবেশজনিত প্রভাব ও মস্তিষ্কে উপাদানগত পরিবর্তন

বহুমুখী ও সুদূরপ্রসারী গবেষণার ফলে একদিন হয়তো মস্তিষ্কের অনেক কিছুরই ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব হবে, কিন্তু আজ সে রকম ধারণা অনেকেই হেসে উড়িয়ে দেবেন। মস্তিষ্কে কতকগুলি নির্দেশকের সাহায্যে ভবিষ্যতে হয়তো বলা যাবে, কোন্ প্রাণী কতটা চালাক বা কোন্‌টি কতটা বোকা, তাদের স্বভাবে কতটা প্রভেদ আছে ইত্যাদি এবং আরও অনেক কিছু। অ্যাসেটাইল কোলিনের পরিমাণ এবং AChE-বিনাশকদের সক্রিয়তার পরিমাণ থেকে বেশ বোঝা যায়, পরিবেশ ইঁদুরকে পরিবর্তিত অবস্থায় মানিয়ে চলার ক্ষমতা অর্জন করতে কতটা সহায়তা করে। আরও অনেকগুলি প্রাণ-রাসায়নিক কলকাঠির সন্ধান পাওয়া গেছে। পরিবেশজনিত প্রভাবে এদের খুব কমই পরিবর্তন হয়। বৈজ্ঞানিক ডক্টর এডওয়ার্ড গেলার (Dr. Edward Gellar) দেখিয়েছেন, নরএপিনেফ্রিন (Norepinephrine) নামক জৈব পদার্থটির পরিমাণ উন্নত ইঁদুরগুলির মস্তিষ্কে বেশী পরিমাণে থাকে। যদিও পরবর্তী পরীক্ষায় দেখা গেছে যে, মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ এবং বিভিন্ন স্তরে নরএপিনেফ্রিনের পরিমাণ এক নয়। কতকগুলি অনুন্নত ইঁদুরের গুরুমস্তিষ্ক স্তরের ঠিক নীচের স্তরে নরএপিনেফ্রিনের পরিমাণ উন্নত ইঁদুরগুলি থেকে প্রায় পাঁচ গুণ বেশী পাওয়া গেছে। এখানে বলে রাখা দরকার যে, মস্তিষ্কের অধিকাংশ রাসায়নিক পদার্থ এই স্তরটিতে আছে এবং তাই গুরুমস্তিষ্ক স্তরের নীচের স্তরটিকে রাসায়নিক পদার্থের গুদাম ঘর বলা চলে।

একদল বৈজ্ঞানিক মনে করলেন, মস্তিষ্কের অধিক সক্রিয়তার ফলে মস্তিষ্কে প্রোটিনের পাচনক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে অর্থাৎ উন্নত ইঁদুরগুলির মস্তিষ্কে প্রোটিনের পাচনক্ষমতা বেশী পাওয়া যাবে। ডক্টর জোসেফ আলট্‌ম্যান (Dr. Joseph Altman) এবং তাঁর সহকর্মীরা এই ধরণের ধারণাকে ভুল প্রমাণ করেছেন। তাঁরা পরীক্ষা করে দেখিয়েছেন, কার্যতঃ পাচনক্ষমতা উন্নত ইঁদুরদের মস্তিষ্কে কম থাকে। তেজস্ক্রিয় লিউসিন নামক অ্যামিনো অ্যাসিডটি প্রয়োগ করে দেখা গেল যে, ঐ অ্যামিনো অ্যাসিডটি অনুন্নত ইঁদুরের মস্তিষ্কে বেশী স্থান পায়। যদিও এই ধরণের পরীক্ষা থেকে এখনও কোন স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছান যায় নি। তবে যা জানা গেছে তা হলো, পরিবেশজনিত উত্তেজনায় উন্নত ইঁদুরের মস্তিষ্কে প্রোটিনের পাচনক্ষমতা না বেড়ে বরং কমেই থাকে; অর্থাৎ প্রোটিনের কম পাচনক্ষমতা উন্নতমান ইঁদুরের পরিচয়।

মস্তিষ্কে পরিবেশজনিত প্রভাবে যে সব উপা-

দানগত পরিবর্তন হয়, তার আরও দু-একটি সম্পর্কে আলোচনা করবো। আমাদের সকলেরই ধারণা, যার স্মৃতিশক্তি বেশী, সে তত বেশী মনে রাখতে পারে এবং শিক্ষালাভ তার কাছে অন্যান্যদের থেকে সহজতর হয়। আজকাল স্মৃতিশক্তি সম্পর্কিত কতকগুলি পরীক্ষা থেকে ধারণা করা হচ্ছে যে, বিশেষ পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে স্মৃতিশক্তি হয়তো বাড়ানো যায়। এখানে বলা প্রয়োজন যে, বিশেষ ধরণের পরিবেশটি দু-রকমের হতে পারে—ভৌত অথবা রাসায়নিক। ম্যাগ্‌নেসিয়াম পেমোলিন নামক রাসায়নিক পদার্থটি ব্যবহার করে লক্ষ্য করা গেছে যে, ইঁদুরের স্মৃতিশক্তি সাধারণ অবস্থা থেকে প্রায় পাঁচ গুণ বেড়ে যায়। কেবল তাই নয়, যে সব ইঁদুর বিশেষ শিক্ষালাভের কিছু দিন পরেই সে শিক্ষা সম্পূর্ণ ভুলে যায়, তাদের ম্যাগ্‌নেসিয়াম পেমোলিন প্রয়োগ করে দেখা গেছে দু-সপ্তাহ পরেও শিক্ষালাভের প্রায় সব কিছুই তারা মনে রাখতে পারে। আজকাল অনেক বার্ধক্যজনিত অথর্ব রোগীদের ম্যাগ্‌নেসিয়াম পেমোলিন প্রয়োগ করে দেখা গেছে, তাদের স্মৃতিশক্তি অনেক বেড়ে যায়। যদিও এসব পরীক্ষার প্রাণ-রাসায়নিক পরিচয় এখনও সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। স্মৃতিশক্তি-উত্তেজক ঔষধ প্রয়োগে মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশে এবং বিভিন্ন স্তরে কি ধরণের প্রাণ-রাসায়নিক ও দেহভিত্তিক পরিবর্তন ঘটে, তার সঠিক পরিচয় পাওয়া গেলে ভবিষ্যতে আরও ভালভাবে স্মৃতিশক্তি উন্নতির জন্যে সাধারণ কিংবা রাসায়নিক পরিবেশ এবং বিভিন্ন আবেশক কিভাবে প্রয়োগ করা হবে, তার পরিচয় পাওয়া যাবে।

স্নায়ু-রাসায়নিক নিয়ন্ত্রণের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গী

প্রবাদ আছে, মহাপুরুষেরা সবাই একই রকম চিন্তা করেন। তাই মনে হয়, পৃথিবীর নানা স্থানে বৈজ্ঞানিকেরা যদিও মস্তিষ্কের ভিন্ন ভিন্ন পরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছেন, কিন্তু তাঁদের সকলেরই উদ্দেশ্য এক—তা হলো মস্তিষ্কের জটিল রহস্যগুলি খুঁজে বের করা। একজন আর একজন থেকে অনেক পৃথক। এর প্রধান কারণ হলো মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশের গঠন, রাসায়নিক উপাদানের প্রকৃতি এবং পরিমাণগত পার্থক্য। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এসবের মূলে আছে বংশজাত সম্পর্ক, কিন্তু বিভিন্ন পরীক্ষার ফল থেকে বেশ বোঝা যাচ্ছে যে, মস্তিষ্কের বহু বৈশিষ্ট্যকে চেষ্টা, পরিবেশজনিত প্রভাব কিংবা রাসায়নিক পদার্থ প্রয়োগ করে পরিবর্তন করা যাবে। দেখা গেছে, উন্নত এবং জটিল পরিবেশ অপরিণত মস্তিষ্কে যেমন পরিবর্তন ঘটায়, পরিণত মস্তিষ্কেও অনুরূপ পরিবর্তন ঘটাতে পারে। কতকগুলি প্রাথমিক পরীক্ষার ফল থেকে ধারণা হচ্ছে যে, বিশেষ পরিবেশজনিত সংঘাতে মস্তিষ্কের বিশেষ পরিবর্তনই হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, দৃষ্টিহীন প্রাণীদের বিশেষ উন্নত পরিবেশে রাখলে কেবল দৃষ্টিসম্পর্কিত মস্তিষ্ক স্তরে গঠনের এবং প্রাণ-রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে।

মস্তিষ্কে বিভিন্ন পরিবর্তনগুলি কিভাবে হচ্ছে এবং কিভাবে ভবিষ্যতে আমরা অনুরূপ কিংবা আরও উন্নত রাসায়নিক এবং ভৌত পরিবেশ সৃষ্টি করে এক অতি মানবসমাজ গড়ে তুলবো, তার জটিল রহস্য আজও আমাদের কাছে অজ্ঞাত। কিন্তু আজ পর্যন্ত আমরা যা পেয়েছি, তার পরিপ্রেক্ষিতে মস্তিষ্কের যান্ত্রিক পরিচালন ব্যবস্থার একটা রূপ দেবার প্রয়াস আমরা করতে পারি। জুলে ভার্ণের চন্দ্র-ভ্রমণের স্বপ্ন যেমন ভাবে বাস্তবে পরিণত হয়েছে, আমাদের অতি মানবসমাজের মস্তিষ্কের দার্শনিক মানচিত্রটি হয়তো তেমন ভাবেই সফল হবে বহু বৈজ্ঞানিকের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে। আমাদের পরিচালন ব্যবস্থা হবে মস্তিষ্কের প্রতিটি ক্ষুদ্রতম সত্ত্বা স্নায়ুকোষের স্তরে। এপর্যন্ত আমরা জেনেছি পারিপার্শ্বিক পরিবেশজনিত প্রভাব স্নায়ুকোষাভ্যন্তরে উপাদানগত পরিবর্তন

ঘটায়, ফলে স্নায়ুকোষে নতুন পরিবেশ সৃষ্টি হয়। এর মূলে আছে স্নায়ুকোষের বিভিন্ন স্তরে অ্যামিনো অ্যাসিড এবং বিভিন্ন হাঁ এবং না-ধর্মী আয়নের পরিমাণগত অসাম্যতা। স্নায়ুকোষাভ্যন্তরে যে নতুন পরিবেশের সৃষ্টি হলো তা কোষের কেন্দ্রস্থলে সঞ্চালিত হবে এবং ঐ নতুন সঙ্কেতগুলি ধরে রাখবার তাগিদে একটি বংশ-প্রবাহক সঙ্কেত কোষের কেন্দ্রস্থলে স্থান পাবে। এবার নতুন বংশ-প্রবাহক সঙ্কেত নিজেই নিজেকে তৈরি করবে এবং নতুন প্রোটিন অণুও তৈরি হবে। হয়তো নতুন বংশ-প্রবাহক সঙ্কেত এবং নতুন প্রোটিনের স্থায়িত্বই স্মৃতিশক্তির পরিচয়। যদি কোন বিশেষ প্রণালীতে উৎপন্ন বংশ-প্রবাহক সঙ্কেত কিংবা প্রোটিনের স্থায়িত্ব বাড়িয়ে দেওয়া যেত, তবে হয়তো পরিবেশ-জনিত ঘটনাগুলিকে বহুদিন মনে রাখা যেত।

ম্যাগ্‌নেসিয়াম পেমোলিন বা আরও উন্নত রাসায়নিক স্মৃতিশক্তিবর্ধক হয়তো একদিন স্নায়ু-কোষের কেন্দ্রস্থলে নির্দিষ্ট ইঙ্গিত পাঠিয়ে আমাদের দার্শনিক মানচিত্রটি এঁকে দেবে। তবে এরকম একটা ধারণা বদ্ধমূল করে এগিয়ে গেলে হয়তো বা স্নায়ুকোষ-বিজ্ঞান আরও পিছিয়ে যাবে। তাই আমরা কোন ধারণাই বদ্ধমূল করে এগিয়ে যাব না। সব দিক থেকে বিচার করে, সমস্ত পরীক্ষা সম্পূর্ণ করে তবেই মস্তিষ্কের কলকাঠি নাড়া আমাদের সমীচীন হবে নতুবা অজ্ঞতার অন্ধকারে আমরা একেবারেই নিঃশেষ হয়ে যাব। আমাদের এখন থেকেই তৈরি করতে হবে এক সচেতন মানবসমাজ, যা পরবর্তী পরীক্ষার উপাদান-গুলিকে মারণাস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করবে না, আগত অতি মানবসমাজের সঙ্গে অন্তর্দ্বন্দ্বে লিপ্ত হবে না কিংবা ভবিষ্যৎ অতি মানবসমাজকে বিপথে চালিত করবে না—তবেই হবে বিজ্ঞানের জয়যাত্রা সার্থক। সেদিন থেকে সুরু হবে ইতি-হাসের এক নতুন অধ্যায়, তার পরিসমাপ্তি আছে কিনা জানি না, তবে এখনই যেন তার গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। বিজ্ঞানের ইতিহাসে অনেক নতুন গুঞ্জন গুন্ গুন্ রবে বাসা বেঁধেছিল, কিন্তু 'কালের কবর তলে' ধীরে ধীরে অনেক স্মৃতি-সৌধই মলিন হয়ে গেছে, তবু 'ধন্য আশা...... তোমার মায়ায় মুগ্ধ মানবের মন, মুগ্ধ ত্রিভুবন'—যা বেঁচে থাকবে, তা দিয়েই আবার সুরু হবে বিজ্ঞানের জয়যাত্রা।

বাংলা দেশে আধুনিক বিজ্ঞান-চর্চার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

শ্রীত্রিদিবরঞ্জন মিত্র

নবাবী আমলের ইতিহাসে দেখা যায় বাংলা দেশে নানা রকমের অরাজকতার সঙ্গে রয়েছে শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের মধ্যে সমান হারে কুসংস্কারে বিশ্বাস ও অতীত বংশগৌরবের কাহিনী প্রচার করে নিজের সামাজিক মর্যাদা বাড়াবার চেষ্টা। নবাবী আমল থেকে ইউরোপীয়দের এদেশে আনা-গোনার সঙ্গে সঙ্গে কিছু সংখ্যক ব্যক্তি ওদের চিন্তাধারার সংস্পর্শে আসবার সুযোগ পেলেও বিশেষ কিছু করতে পারেন নি। ঠিক এই সময় বাংলা দেশে এলেন সার উইলিয়াম জোনস। তাঁরই প্রচেষ্টায় ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হলো রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল। সোসাইটির মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল প্রাচ্য সম্বন্ধে গবেষণা করা। ফলে বিলেত থেকে শিক্ষিত ব্যক্তিরা বাঙ্গলা দেশে আসবার সুযোগ পেলেন। তাঁরা তাঁদের নিজেদের কাজ ছাড়া এশিয়াটিক সোসাইটির সাহায্যে নিজের পছন্দমত বিষয়ে গবেষণা সুরু করেন। এদিকে বাঙ্গালীর মধ্যে কিছু সংখ্যক প্রতিভাধর ব্যক্তি সদাশয় শিক্ষিত ইংরেজদের সংস্পর্শে এসে বুঝতে পারলেন, ভারতবাসীর দুর্বলতার কারণ। সেই সময় থেকেই তাঁরা বাংলা দেশে যাতে আধুনিক বিজ্ঞান-শিক্ষা দেওয়া হয় তার জন্যে বিশেষভাবে চেষ্টা করতে থাকেন। এঁদের পুরোধা ছিলেন রাজা রামমোহন রায়।

রামমোহনের প্রচেষ্টায় তৎকালীন সদাশয় ইউরোপীয় এবং কিছু সংখ্যক প্রগতিশীল বাঙ্গালীর সাহায্যে ১৮১৭ খৃষ্টাব্দের ২০শে জানুয়ারী হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা হয়।* সেখানে ছাত্রেরা যাতে ইউরোপের জ্ঞান ও বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচয় লাভ করে তার জন্যে জ্যামিতি ও আধুনিক বিজ্ঞান পড়াবার ব্যবস্থা ছিল।[১]

আজ কারো বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে, ভারতবর্ষে আধুনিক বিজ্ঞান-চর্চার পথপ্রদর্শক হচ্ছেন রাজা রামমোহন রায়। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান-চর্চা সুরু হবার সাঁইত্রিশ বছর আগে ভারতবর্ষে বিজ্ঞান-শিক্ষার দাবী করেছিলেন রামমোহন। ১৮২২ খৃষ্টাব্দে রামমোহন কলিকাতায় অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান স্কুল নামে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। ওখানেও বিজ্ঞান পড়াবার ব্যবস্থা ছিল। এখানে জেনে রাখা দরকার, তৎকালীন সকল স্কুলেই ইংরেজীতে বিজ্ঞান পড়াবার ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু রামমোহন তাঁর স্কুলে বাংলায় বিজ্ঞান-শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। ঠিক এই সময় ১৮২১ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৮২৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে তাঁর সম্পাদিত সম্বাদ কৌমুদী নামে বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকায় তিনি পদার্থবিদ্যা, জীববিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ে কয়েকটি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এই সকল ছাড়াও তিনি ভূগোল, জ্যোতিষ,

---

* কলিকাতার ইতিহাস; সুবলচন্দ্র মিত্র সঙ্কলিত, পৃঃ ১৩৫ (১৩১৪)

১। হিন্দু কলেজের বিজ্ঞানের পাঠ্যতালিকা (আত্মজীবনী, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর)

Mathematics : First six books and Eleventh book, Algebra, Plain and spherical geometry, Analytical conic sections, Differential and Integral calculus.

Mixed Mathematics : Whewell's Mechanics, Berkley's Astronomy, Webster's Hydrostatics, Phelp's Optics, Calculation of Eclipses.

জ্যামিতি প্রভৃতির পাঠ্যপুস্তক রচনা করেন। তৎকালীন বাঙলা সরকার বাঙালীদের শিক্ষার উন্নতির জন্যে কলিকাতায় সংস্কৃত স্কুল স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিলে মহাত্মা রামমোহন ১৮২৩ খৃষ্টাব্দের ১১ই ডিসেম্বর তারিখে লর্ড আমহার্স্টকে লিখিত পত্রের এক অংশে বলেন, "** As the improvement of the native population is the object of the Government, it will consequently promote a more liberal and enlightened system of instruction, embracing mathematics, natural philosophy, chemistry and anatomy, with other useful sciences which may be accomplished wlth the sum proposed by employing a few gentlemen of talents and learning educated in Europe, and providing a college furnished with the necessary books, instruments and other apparatus".[২]

বাংলা দেশে বিজ্ঞান-চর্চার প্রথম অবস্থায় ইওরোপীয়দের দানও অনেক। তাঁরা ১৮২১ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুরে মিশনারি কলেজ স্থাপন করেন। এঁদের মধ্যে উইলিয়াম ইয়েট্স তাঁর অন্যান্য সাহিত্য ও ভাষাতত্ত্ব চর্চার সঙ্গে বাঙলা ভাষায় কতকগুলি বইয়ের মধ্যে বৈজ্ঞানিক বিষয়ের আলোচনা করেন। তাঁর রচিত পুস্তকের মধ্যে পদার্থবিদ্যা সার [ইংরেজী নাম: Elements of Natural Philosophy and Natural History in a series of dialogues (১৮২৫)], জ্যোতির্বিদ্যা (১৮৩০), সারসংগ্রহ [ইংরেজী নাম: Vernacular Class Book Reader for the Government Colleges and Schools (১৮৪৪)], প্রভৃতিতে বৈজ্ঞানিক বিষয়ের আলোচনা রয়েছে। শ্রীরামপুর মিশনারী কলেজের জন ম্যাক ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে কিমিয়াবিদ্যার সার (Principles of Chemistry) নামে বাংলায় একটি রসায়ন-বিজ্ঞানের বই লেখেন। বইটি বাংলা ভাষায় আধুনিক রসায়ন-বিজ্ঞানের প্রথম বই। তবে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা দিবার কোন উচ্চতর ব্যবস্থা ছিল না। একমাত্র কলিকাতার 'স্কুল ফর নেটিব্ ডক্টরস' নামে একটি স্কুলে হিন্দুস্থানী ভাষায় পাশ্চাত্য চিকিৎসাশাস্ত্রের মূল তত্ত্ব কিছু কিছু শিক্ষা দেওয়া হতো। পরে কলিকাতার মাদ্রাসায় মেডিক্যাল ক্লাস এবং সংস্কৃত কলেজে বৈদ্যক শ্রেণী খোলা হয় (ডিসেম্বর, ১৮২৬)।* এখানে ইংরেজীতে লেখা চিকিৎসা বিষয়ক পুস্তক যথাক্রমে আরবী ও সংস্কৃত ভাষায় অনূদিত হতো এবং ছাত্রেরা এই সকল অনুবাদ-গ্রন্থের মাধ্যমে চিকিৎসাশাস্ত্রের সঙ্গে পরিচিত হতেন। যথাক্রমে ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে সংস্কৃত কলেজের কাছে একটি বাড়ীতে ছাত্রদের প্রত্যক্ষ ব্যবহারিক শিক্ষা দেবার জন্যে একটি হাসপাতাল খোলা হয় এবং ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় মেডিক্যাল কলেজ খোলা হয়। মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনের ফলে বাংলা দেশে বিজ্ঞান-শিক্ষার ব্যবস্থা আর একটি ধাপে উঠে যায়। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দের ২৮শে অক্টোবর বাংলা দেশের বিজ্ঞান-চর্চার ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন। ঐ দিন বাঙালীরা প্রথম শবব্যবচ্ছেদ করেন। যাহোক, মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসাবিদ্যার[৩] সঙ্গে রসায়ন, পদার্থ এবং

২। The Life and letters of Raja Rammohun Roy. (Sophia Dobson Collet)

* ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়: কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পৃ ৩৫

৩। ১৮৪০-৪১ খৃষ্টাব্দে মেডিক্যাল কলেজের চিকিৎসাশাস্ত্রের পাঠ্যতালিকা [যোগেশচন্দ্র বাগল, সাহিত্যসাধক চরিতমালা, (১৬) পৃ ৬৯]। Anatomy, Physiology, Physics, Medical Chemistry, Botany, Materia Medica,

জীববিদ্যা সহ অন্যান্য বিষয় পড়াবার ব্যবস্থা ছিল। মেডিক্যাল কলেজের পণ্ডিত মধুসূদন গুপ্ত ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে The London Pharmacopoeia-এর বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন এবং সেটির নাম দেন লণ্ডন ফার্মাকোপিয়া। এঁর দ্বিতীয় পুস্তক অ্যানাটমী ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। তিনি দ্বিতীয় বইতে কিছু বৈজ্ঞানিক শব্দের বাংলা পরিভাষা দেন। মেডিক্যাল কলেজের শিক্ষকদের মধ্যে ওসোগনিস বিশেষভাবে বিখ্যাত। তাঁর প্রিয় ছাত্র ছিলেন মহেন্দ্রলাল সরকার। ওসোগনিস ভারতীয় ছাত্রদের সুবিধার জন্যে রসায়নশাস্ত্রের একটি বই লেখেন। অন্যদিকে প্রেসিডেন্সি কলেজে ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে সার আলেকজাণ্ডার পেড্‌লার যোগদান করায় ওখানেও রসায়ন বিভাগের বিশেষ উন্নতি হয়। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

প্রেসিডেন্সি কলেজ, মেডিক্যাল কলেজ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে কেবল মাত্র বিজ্ঞান পড়াবার ব্যবস্থা ছিল, গবেষণার কোন রকম ব্যবস্থা ছিল না। এই ব্যাপার মহেন্দ্রলাল সরকারকে বিশেষভাবে ব্যথিত করে। তিনি বুঝেছিলেন কেবল মাত্র বিজ্ঞানের বই পড়লেই বিজ্ঞানী হওয়া যায় না, তার জন্যে চাই উপযুক্ত গবেষণাগারে কোন বিষয়ের প্রকৃত রহস্যকে জানবার সাধনা। তিনি বুঝতে পারলেন বাংলা দেশে যা বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হয়, তাতে ইওরোপীয়দের নানা কাজে সাহায্য করা যায়, গবেষণা করা সম্ভব নয়। অতএব যে কোন প্রকারেই হোক বাংলা দেশে গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা করা দরকার। তিনি বললেন, "বর্তমানে আমাদের দেশবাসীদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক কৃষ্টির একটা দুঃখজনক অভাব দেখতে পাওয়া যায়। এই অভাব স্কুলের শিক্ষার দ্বারা দূর হবার নয়, যত ভালভাবেই গভর্নমেন্ট সেখানে বিজ্ঞান পড়াবার ব্যবস্থা করুন না কেন।"[৪] তিনি আরও বললেন, "...বিজ্ঞানীর অভাবে প্রয়োজন দেখা দিলেই সরকার ইংল্যাণ্ড থেকে লোক নিয়ে আসেন। এমন কি শিক্ষায়তনে অধ্যাপনার জন্যও লোক আসেন ইংল্যাণ্ড থেকে। আমার প্রস্তাবিত গবেষণাগার সফল হলে এদেশেও সে রকম লোক তৈরি না হবার কারণ আমি দেখি না।" ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, দ্বারকানাথ মিত্র, দিগম্বর মিত্র, নীলমণি মিত্র, কালীকৃষ্ণ ঠাকুর, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন, ফাদার লাফোঁ প্রভৃতি ব্যক্তিগণ। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কাল্‌টিভেশন অব সায়েন্সের প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য সম্পর্কে তিনি বললেন, "আমরা চাই বিজ্ঞানের পূজারী সৃষ্টি করতে। আমাদের অ্যাসোসিয়েশনের মূল উদ্দেশ্য হবে— যে গৌরব থেকে ভারতবর্ষ ভ্রষ্ট হয়েছে, সেই গৌরবের আসনে তাকে আবার প্রতিষ্ঠা করা।" অবশেষে ডাক্তার সরকারের বহু পরিশ্রমের ফলে ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েসন ফর দি কাল্‌টিভেশন অব সায়েন্স প্রতিষ্ঠিত হয়। ডাক্তার সরকারের কাজে অনুপ্রাণিত হয়ে যাঁরা বিনা পারিশ্রমিকে অ্যাসোসিয়েসনে বিজ্ঞান পড়াতে এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন তারাপ্রসন্ন রায়, রামচন্দ্র দত্ত, জগদীশচন্দ্র বসু, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, চুণীলাল বসু, নীলরতন সরকার, গিরিশচন্দ্র বসু, বনোয়ারিলাল চৌধুরী, ফাদার লাফোঁ প্রভৃতি বিজ্ঞানী ও শিক্ষাবিদ্‌গণ। এখানে গবেষণা করে বিখ্যাত হয়েছেন, সুধাংশুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়; কেদারেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, সি. ভি. রামন, কে, এস, কৃষ্ণান ও আরও অনেকে।

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েসন ফর দি ক্যালটিভেশন অব সায়েন্সের গবেষকবৃন্দ ছাড়াও প্রেসি-

Pharmacy, Theory and practice of Surgery।

৪। সমরেন্দ্রনাথ সেন, (১৯৬৯) জ্ঞান ও বিজ্ঞান, পঞ্চম সংখ্যা।

কলেজে জগদীশচন্দ্র বসু, ও প্রফুল্লচন্দ্র রায় যোগদানের ফলে ওখানেও বিজ্ঞানের গবেষণা সুরু হয়। আচার্য জগদীশচন্দ্র কলিকাতার সেন্ট্ জেভিয়ার্স কলেজে, কেম্ব্রিজের ক্রাইষ্ট কলেজে এবং লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন এবং ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে প্রেসিডেন্সি কলেজে যোগদান করেন। আচার্যদেব প্রথম পদার্থবিদ্যায়, পরে উদ্ভিদের শারীরতত্ত্ব সম্পর্কে গবেষণা করেন। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র এডিনবরায় শিক্ষালাভ করেন এবং অধ্যাপক ক্রাম ব্রাউনের গবেষণাগারে গবেষণা করেন। তিনি ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে প্রেসিডেন্সি কলেজে যোগদান করেন। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র সারা জীবন রসায়ন-বিজ্ঞানে গবেষণা করেন। আচার্যদ্বয় কেবলমাত্র নিজেদের জ্ঞানার্জনের জন্য ব্যস্ত থাকতেন না, তাঁরা যে প্রদীপ জ্বেলেছিলেন, তা যেন নিভে না যায় এবং তাঁদের ছাত্ররা যাতে ভবিষ্যত ভারতের বিজ্ঞানাচার্যের কাজ চালাতে পারেন, তার জন্যে তাঁদের গবেষণায় যথেষ্ট সুযোগ ও উৎসাহ দিতেন। এঁদের গবেষণা ও জীবনধারণ পদ্ধতি যাঁদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে অনুপ্রাণিত করে, তাঁদের মধ্যে মেঘনাদ সাহা, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, দেবেন্দ্রমোহন বসু, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ, শিশিরকুমার মিত্র, চন্দ্রভূষণ ভাদুড়ী, জ্যোতিভূষণ ভাদুড়ী, রসিকলাল দত্ত, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখার্জী, প্রিয়দারঞ্জন রায় প্রভৃতি বিজ্ঞানিগণ উল্লেখযোগ্য। রসায়ন-বিজ্ঞানের গবেষকগোষ্ঠী গঠন ছাড়া আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের জীবনে আর একটি মহৎ কীর্তি ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে বাংলা দেশে রসায়নশিল্পের প্রতিষ্ঠার জন্যে বেঙ্গল কেমিক্যাল স্থাপন করা। অন্য দিকে আচার্য জগদীশচন্দ্র তাঁর জীবনের সঞ্চিত অর্থের অধিকাংশ ব্যয় করে ভারতের গৌরব ও জগতের কল্যাণ কামনায় ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে বসু বিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ মন্দির প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য সম্পর্কে তিনি বলেছেন, "বিজ্ঞান অনুশীলনের দুইটি দিক আছে। প্রথমতঃ নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার; ইহাই এই মন্দিরের মুখ্য উদ্দেশ্য। তাহার পর, জগতে সেই নূতন তত্ত্ব প্রচার। সেই জন্যই এই সুবৃহৎ বক্তৃতা-গৃহ নির্মিত হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক বক্তৃতা ও তাহার পরীক্ষার জন্য এইরূপ গৃহ বোধ হয় অন্য কোথাও নির্মিত হয় নাই। দেড় সহস্র শ্রোতার এখানে সমাবেশ হইতে পারিবে। এখানে কোন বহু চর্বিত তত্ত্বের পুনরাবৃত্তি হইবে না। বিজ্ঞান সম্বন্ধে এই মন্দিরে যে সকল আবিষ্ক্রিয়া হইয়াছে সেই সকল নূতন সত্য এখানে পরীক্ষা সহকারে সর্বাগ্রে প্রচারিত হইবে। সর্বজাতির সকল নরনারীর জন্য এই মন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত থাকিবে। মন্দির হইতে প্রচারিত পত্রিকাদ্বারা নব নব প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব জগতে পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট বিজ্ঞাপিত হইবে এবং হয়তো তদ্দ্বারা ব্যবহারিক বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য সাধিত হইবে।"

ইতিমধ্যে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বাংলার শিক্ষাজগতেও বেশ আন্দোলন দেখা দেয়। এই আন্দোলন থেকে জন্ম নেয় ন্যাশন্যাল কাউন্সিল অব এডুকেশন। এখানে তৎকালীন বাংলা দেশের নেতাদের মধ্যে সকলেই ছিলেন। পুরাপুরি স্বদেশী পরিচালনায় গড়ে উঠলো স্কুল, কলেজ, টেক্‌নিক্যাল স্কুল প্রভৃতি। কাউন্সিলের কলেজে বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে পড়ানো হতো অঙ্ক, পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, শারীরতত্ত্ব প্রভৃতি। কাউন্সিলের শেষ পরীক্ষার উত্তীর্ণ হবার পর ছাত্রেরা নিজেদের পছন্দমত যে কোন একটি বিষয়ে শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে গবেষণা করবার সুযোগ পেতেন।

এতদিন পর্যন্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা করবার সুযোগ ছিল না। এদিকে ইংরেজ সরকারের অত্যাচার, বিদেশী দ্রব্য বর্জন আন্দোলন সারা বাংলা দেশে ছড়িয়ে পড়লো। এই সময় স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কলিকাতা

বিশ্ববিদ্যালয়কে গবেষণার উপযুক্ত স্থান করবার প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারলেন। তাই ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের সমাবর্তন ভাষণে তিনি বললেন, "No University can rightly be regarded as fulfiling the purpose of its existence unless it affords to the best of its students, adequate encouragement to carry on research."[৫] তাই ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে তৎকালীন বাংলার ধনী ও শিক্ষিতদের সাহায্যে বিজ্ঞান কলেজের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন এবং ১৯১৭ সালে অর্থাৎ হিন্দু কলেজ স্থাপনের এক-শ' বছর পরে ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে প্রথম বিজ্ঞান গবেষণার কাজ সুরু হয়। স্যার আশুতোষের আমন্ত্রণে এলেন আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র, জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখার্জী, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, যোগেন্দ্র-নাথ বর্ধন প্রভৃতি রসায়ন বিভাগে, পদার্থবিদ্যায় এলেন চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রামন, দেবেন্দ্রমোহন বসু, মেঘনাদ সাহা, সত্যেন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি এবং গণেশপ্রসাদ এলেন গণিত বিভাগে। ক্রমে ক্রমে কলিকাতা বিজ্ঞান কলেজে আধুনিক বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখা খোলা হয় এবং আজকের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগ পৃথিবীর বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সমান স্তরে উন্নীত হয়েছে বলা যায়।

উপরিউক্ত গবেষণাগার ও শিক্ষা কেন্দ্র ছাড়াও বাংলা দেশে অনেক শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে এবং প্রায় প্রত্যেকটিতেই বিজ্ঞান গবেষণার ব্যবস্থা আছে। গবেষণাগারগুলির মধ্যে প্রশান্ত চন্দ্র মহলানবিশের চেষ্টায় স্থাপিত ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটি-ষ্টিক্যাল ইনষ্টিটিউট বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ের গবেষণার জন্যে বিশেষভাবে বিখ্যাত হয়েছে। অন্যদিকে সাহা ইনষ্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজি-ক্স পারমাণবিক বিষয়ে গবেষণার জন্যে এবং ক্যান্সার বিষয়ে গবেষণার জন্যে ক্যান্সার ইনষ্টিটিউট বিশেষভাবে খ্যাতিলাভ করেছে। আজ বাংলা দেশে বিভিন্ন গবেষণাগার ছাড়া বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণার ফলাফল প্রকাশ ও আলোচনার জন্যে নানা বিজ্ঞান সমিতির দানও সামান্য নয়।

৫। মৃণালকুমার দাশগুপ্ত, (১৯৬৯), জ্ঞান ও বিজ্ঞান, পঞ্চম সংখ্যা।

কলিকাতার নগর-পরিকল্পনা ও আবহবিজ্ঞান

শ্রীরোহিণীলাল মুনি চক্রবর্তী*

সম্পদের পূর্ণ সদ্ব্যবহারের জন্মে নগর-সভ্যতার সৃষ্টি। এর জন্মে প্রয়োজন হয়েছে প্রাকৃতিক বিন্যাসের উপর মনুষ্য-প্রভাব। এই সুদূরপ্রসারী নগর-সভ্যতা আজ এক বিপ্লবের সম্মুখীন—তা হচ্ছে পৃথিবীর 'নগরায়ণ'। ঊনবিংশ শতকের প্রথমে পৃথিবীর জনসংখ্যার শতকরা ২ ভাগের কম বাস করতো এক লক্ষ জনঅধ্যুষিত শহরে এবং শতকরা ২½ ভাগের বাস ছিল বিশ হাজার জনঅধ্যুষিত শহরে। ১৯৬০ খৃষ্টাব্দে এই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় যথাক্রমে ১৩% এবং ২৫%। আজ প্রায় ১৪৪০টি নগরী রয়েছে যার জনসংখ্যা দশ লক্ষেরও উপর। প্রকাশ ১৯৯০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে পৃথিবীর জনসংখ্যার অর্ধেকই বাস করবে এরূপ নগরীতে। ভারত এমনই এক ব্যাপক নগর-সভ্যতার সম্মুখীন। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে এই দেশে ৭টি শহরের জনসংখ্যা ছিল প্রতিটিতে দশ লক্ষেরও উপর এবং হিসাব করে দেখা গেছে যে, ১৯৮১ খৃষ্টাব্দে এরূপ নগরীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়াবে ২২, তখন মোট ভারতবাসীর শতকরা ২২.৩ অংশই বাস করবে শহরে। এই প্রসঙ্গে তুলনীয়—২৭৪ খৃষ্টপূর্বাব্দে রোম শহরের আয়তন ছিল ১২.৮ বর্গ কিলোমিটার, আজ নিউইয়র্ক নগরীর বিস্তার ৬৩০০ ব: কি: মি:, লণ্ডনের ১৬৩০ এবং আমাদের কলিকাতার ১২২৫ ব: কি: মি:।

ভবিষ্যৎ নগরায়ণের এই দৃশ্য আমাদের অভিভূত করে, কিন্তু আমাদের বিবেচ্য হচ্ছে আবহাওয়া, তথা স্বাস্থ্য, কর্মক্ষমতা ও স্বাচ্ছন্দ্যের উপর এরূপ নগর-সভ্যতার প্রভাব। মাটির নিকটস্থ আবহাওয়া অর্থাৎ অণু-আবহাওয়ার (Micro-climate) নির্ণায়ক হচ্ছে ভূপৃষ্ঠের রং, তাপ-প্রতিফলন ক্ষমতা, ঘনত্ব, তাপধারণক্ষমতা, মাটির জলীয়মাত্রা এবং জলকণার ভেদমাত্রা, সমতলের কর্কশতা এবং বনরাজী ইত্যাদি। সূর্যকিরণের মান এবং পরিমাণ ও পুনর্বিকিরণজনিত তাপের ক্ষয়-হার দুই-ই হয় প্রভাবিত এবং পরিবর্তিত। সত্য বলতে কি, শহরের নিকটস্থ অণু আবহাওয়ার ঘটে প্রভূত পরিবর্তন।

আলিপুর আবহবীক্ষণাগার কর্তৃক সংগৃহীত গত ২৭ বৎসরের (১৯৩৯-১৯৬৬) দৈনিক তাপাঙ্ক পরীক্ষায় লক্ষিত হয়েছে যে, শীতকালের শৈত্যভাব কমে গিয়ে শহর কলিকাতা ধীরে ধীরে উষ্ণতর হয়ে উঠেছে (১নং চিত্র দ্রষ্টব্য)। বিশ্লেষণে নির্ণীত হয়েছে যে, এই নগরীর ক্রমবর্ধমান বিস্তৃতির ফলে ২০০০ খৃষ্টাব্দে হয়তো ঠাণ্ডা দিন (১৫° সে-এর কম তাপমাত্রা) আর থাকবে না এবং গরম (৩০° সে. থেকে ৩৫° সে.) দিনের সংখ্যা ১৯৪১ সালের তুলনায় হবে দ্বিগুণ। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, জাপানের ক্রমবর্ধমান শহর কিয়োতর বাৎসরিক তাপমাত্রার গড় ১৮৮০ থেকে ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বেড়েছে ১.৮° সে।

অণু-আবহাওয়ার উপর নগরায়ণের এই প্রভাব শহর কলিকাতা, বিমানবন্দর দমদম এবং নিকটস্থ (বারুইপুর) গ্রাম সাসনের দৈনিক তাপাঙ্কের তুলনামূলক বিচারে পরিস্ফুট হতে পারে। দমদম সাসনের চেয়ে উষ্ণতর, কিন্তু আলিপুর উষ্ণতম। সূর্যাস্তের অব্যবহিত পরে দৈনিক তাপাঙ্কের পরিস্থিতি (১নং চিত্র) বিশ্লেষণে লক্ষিত হয় যে,

---

* স্থাপত্য ও নগর-পরিকল্পনা বিভাগ, ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব টেক্‌নলজি, খড়্গপুর।

ঘনতর শহর এলাকায় পুনর্বিকিরণজনিত তাপক্ষয়ের হার যথেষ্ট ধীর। এটি শহরের মাটির আবরণ বৈচিত্র্য এবং শহরের দালান নির্মাণের প্রভাব—উভয়ই Gases) এবং বস্তুকণা—এ সবই শিল্পান্বিত নগরায়ণের দান। উপরন্তু উক্ত কারণগুলির বিভিন্ন মাত্রায় উপস্থিতি নগরমধ্যস্থ বিভিন্ন এলাকার তাপপ্রভেদ
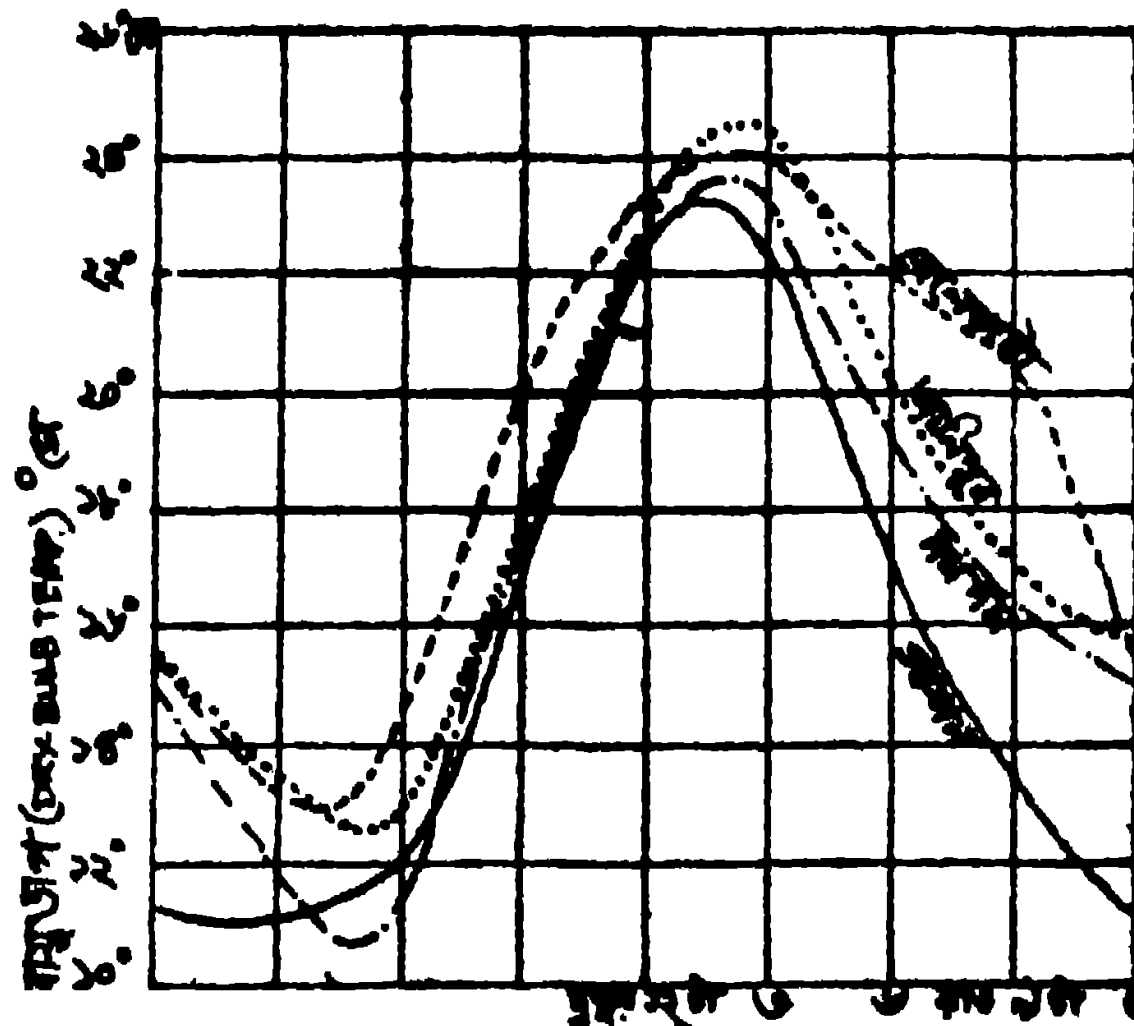
কলিকাতার বিভিন্ন শহর এলাকা ও নিকটবর্তী গ্রামের বায়ুতাপ
২০শে ডিসেম্বর, ১৯৭৫
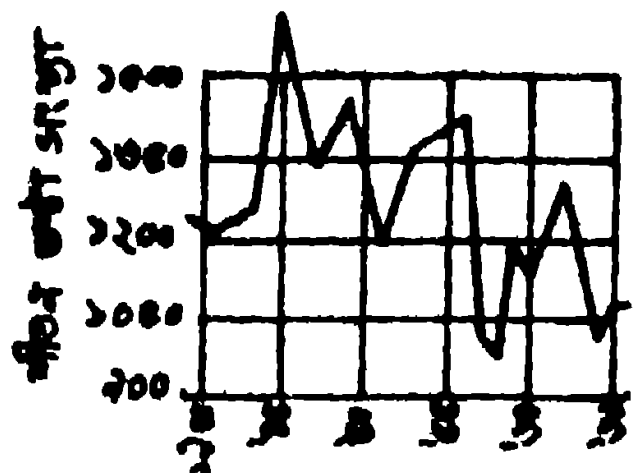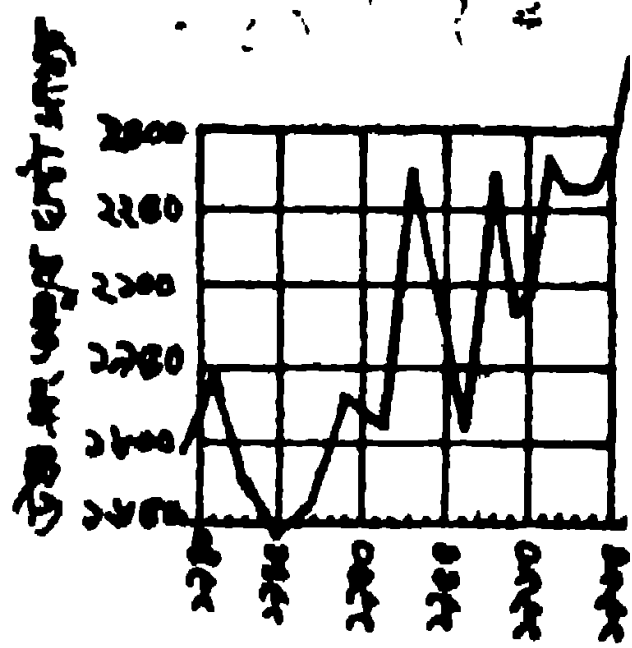
কলিকাতা শহরে মৃত্যুহার

১নং চিত্র
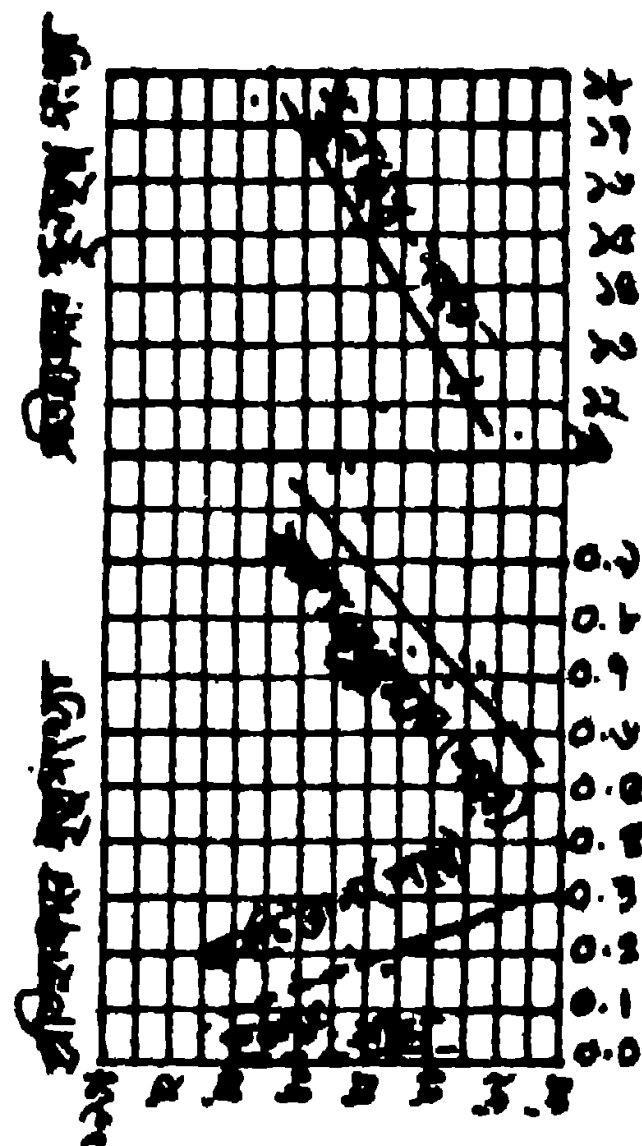
শহর-জনসংখ্যার সাহুপাতিক। দিগন্ত বিস্তৃত এবং উচ্চে বর্ধমান এই নগরীর আকার, কৃত্রিম তাপস্থষ্টি কখনও যা সূর্যকিরণের এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত ব্যাপক এবং বাতাসে দুষিত জান (Fumes, এজন্তে দায়ী। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখযোগ্য যে, কলিকাতার ঘন বসতি ভবানীপুর এলাকা অপেক্ষাকৃত কম বসতি আলিপুর থেকে ৪° সে. উষ্ণতর।

গ্রামসাসপের তাপাঙ্ক বিচারে শহর-গ্রাম

তাপ-প্রভেদ লক্ষিত হয়েছে শহর বেলেঘাটার (কলিকাতা) সঙ্গে। গ্রীষ্মকালের দিবাভাগের ৯ ঘণ্টা শহর গ্রামের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম উষ্ণ—সর্বাপেক্ষা প্রভেদ পরিলক্ষিত হয় দুপুর ৩টার সময়, যখন শহর প্রায় ২° সে. কম উষ্ণ। বিশ্রামের জন্যে নির্ধারিত অপর ১৫ ঘণ্টায় শহর থাকে উষ্ণতর—সর্বাপেক্ষা প্রভেদ লক্ষিত হয় রাত্রি ১০ টার সময়, যখন শহর প্রায় ৩°সে. উষ্ণতর। এই ঋতুতে শহরের দিবারাত্র তাপাঙ্ক বিস্তৃতি গ্রামের তুলনায় ৫° সে কম

শীতকালে শহর (বেলেঘাটা) সব সময়ই উষ্ণতর—সর্বাপেক্ষা প্রভেদ লক্ষিত হয় রাত্রি ৯টার সময়, যখন শহর গ্রামের চেয়ে প্রায় ৬'৫° সে. উষ্ণতর। স্বাভাবিক কারণেই বেলেঘাটার চেয়ে আরও ঘনতর শহর এলাকায় এই উষ্ণতার প্রভেদ বৃদ্ধি পাবে। এইরূপ শীতের উষ্ণতর দিবারাত্রি এবং গ্রীষ্মের কম উষ্ণতর দিবাভাগ সত্যকারের এক মনোরম নগরের পরিবেশ গড়ে তুলতে পারতো, কিন্তু তা হয় না। এর মূল কারণ হচ্ছে, শহরের অণু-আবহাওয়ার লক্ষণীয় পরিবর্তন, বাতাসের উষ্ণতার জন্যে বর্ধিত পরিচলন, আবহমণ্ডলের স্থিরতার বিচ্যুতি এবং শীতের দুর্বল বায়ুবেগে বাধাপ্রাপ্তি।

আবহতত্ত্ববিদ্ সানবর্গ এই শহর-গ্রাম তাপ-প্রভেদের কারণগুলিকে নিম্নলিখিত সম্বন্ধের মধ্যে স্থাপনা করেছেন।

তাপ-প্রভেদ °সে = অ + আ$_1$ম + আ$_2$গ + আ$_3$ত + আ$_4$ব। এখানে অ এবং আ$_1$ থেকে আ$_4$ হচ্ছে ধ্রুবাঙ্ক। শহরের বিভিন্ন বৈচিত্র্যে এরা হয় প্রভাবিত। ম হচ্ছে মেঘবিস্তার, আকাশের দশ ভাগের মাপে; গ হচ্ছে বায়ুর গতি, মিটার প্রতি সেকেণ্ডে; ত হচ্ছে শহরের তাপমাত্রা, ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেড এবং ব হচ্ছে বায়ুর বাষ্পচাপ, মিলিমিটারে। উপসালা শহরে নির্ণীত উপরিউক্ত ধ্রুবাঙ্কগুলির মূল্যের সাহায্যে সম্বন্ধটিকে নিম্নরূপে প্রকাশ করা যায়—

দিবাভাগে তাপ-প্রভেদ = ১'৪—০'০১ম—০'০৯গ—০'০১ত—০'০৪ব।

০'১০ম→রাত্রিভাগে তাপ-প্রভেদ = ২'৮—০'১০ম—০'৩৮গ—০'০২ত—০'০৩ব।

দিনের বেলা মেঘ ম-এর এবং রাত্রে বায়ুগতি গ-এর অবদান লক্ষণীয়। দিনের তুলনায় রাত্রে মেঘর প্রভাব ১০ গুণ এবং বায়ুগতির প্রভাব প্রায় ৪ গুণের বেশী। যদিও উপসালা শহরে নির্ণীত ধ্রুবাঙ্ক, ঠিক কলিকাতার অবস্থার প্রকাশ না'ও করতে পারে, তথাপি শহরের অসহনীয় নৈশ আবহাওয়া স্মরণে বায়ুগতির এরূপ প্রভাব বিশেষ বিবেচ্য। মেঘের প্রভাব যদিও উল্লেখযোগ্য তথাপি এর সুনিয়ন্ত্রণ সহজসাধ্য নয়, তাই নগরবিন্যাসে বায়ুগতির পূর্ণসদ্ব্যবহারের মাধ্যমেই ক্রমঅধঃপতিত অণু-আবহাওয়ার উন্নতিবিধান সম্ভব হতে পারে।

কলিকাতা শহরের এই তাপ-বৈচিত্র্য এখানকার কলুষিত আবহাওয়ার জন্যে যথেষ্ট দায়ী। শহরের উষ্ণতা সৃষ্টি করে বায়ুর কৃত্রিম পরিচলন। ৩° সে. তাপ বৃদ্ধির ফলে শহরসীমায় প্রতি ঘণ্টায় ১১ কিঃ মিঃ বেগে বায়ুর সৃষ্টি লক্ষিত হয়েছে। ভূমিসংলগ্ন প্রবাহমান এই বিচিত্র বায়ু, নগর পরিপার্শ্বস্থ কলুষিত এবং ধূমান্বিত আবহাওয়াকে শহরের অভ্যন্তরে আকর্ষণ করে। বায়ুবেগের উপর নগরের বাধাদান এবং তৎকারণ বায়ুবেগের প্রশমন এই দূষিত আবহাওয়ার স্থিতিকে উৎসাহিত করে। বৃষ্টি, কুয়াশা ইত্যাদি প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের সঙ্গে দূষিত বায়ুও এইভাবে শহরের অণু-আবহাওয়ার অঙ্গীভূত হয়ে উঠছে। পার্থক্য এই যে, শেষোক্তটি মনুষ্যসৃষ্ট। কলুষিত এই আবহাওয়াতে প্রভাবিত হয় সূর্যকিরণ, মেঘবিস্তার, বর্ষণ, কুয়াশা, দৃষ্টিমানতা, বায়ুর তাপ ও আর্দ্রতা এবং তজ্জনিত নগরবাসীর স্বাচ্ছন্দ্য, স্বাস্থ্য ও

মৃত্যুহার। এমনকি পূর্ণ বৈদ্যুতিকরণও নগরবাসীদের দূষিত আবহাওয়ার প্রকোপ থেকে মুক্তি দিতে হবে ব্যর্থ, যেহেতু এর মূল কারণ কেবল বায়ুদূষণীয় শিল্পকর্মকাণ্ডেই সীমাবদ্ধ নয় পরন্তু শহরের নিজস্ব তাপ-প্রভেদ ও বায়ু চলাচলে বাধাদান এবং প্রাপ্ত বায়ুবেগের পূর্ণ সদ্ব্যবহারের অভাব, ফলে শহর-সৃষ্ট ধূলিকণা ও ধোঁয়ার দীর্ঘ অবস্থিত, বিশেষ দায়ী মনে হয়।

নগরায়ণের ফল এই বিচিত্র আবহাওয়া বহু প্রকারের—পার্থিব এবং বিশেষতঃ দৈহিক ক্ষতির কারণ। সহজেই নজরে আসে বৃক্ষচ্ছেদন এবং জমির ব্যাপক বন্ধ্যাকরণ। নগরীর বিভিন্ন কর্মকাণ্ডনির্গত বিষাক্ত জ্ঞান পরিপার্শ্বস্থ আবাদের ক্ষতিকারক। শহরের বৃক্ষরাজির পত্রহরিৎকণার (Chlorophyll) উপর সার্থক আলোক সংযোগের অভাব পরিলক্ষিত হয়। উপরন্ত বায়ুর তাপ, আর্দ্রতা এবং সূর্যকিরণের উপর নগরপ্রভাবের ফলে গ্রামের তুলনায় শহরের বুকে অঙ্কুরায়ণের প্রস্তুতি এবং বিলুপ্তি দুই-ই হয় ত্বরান্বিত। বসন্তের স্থিতি হয় অতি সংক্ষিপ্ত।

নগরবাসীর দৈহিক স্বাচ্ছন্দ্য এই প্রকার নগরায়ণের ফলে ব্যাহত হয়। পরিবর্তিত হয় যথার্থ তাপ (Effective temp.), অর্থাৎ বায়ুতাপের অনুভব মাত্র যে অনুভূতি বায়ুর তাপ, আর্দ্রতা এবং বায়ুবেগের দ্বারা প্রভাবিত হয়। সিঙ্গাপুরবাসীদের দৈহিক স্বাচ্ছন্দ্যের যথার্থ তাপ নিম্নলিখিত সম্বন্ধে স্থিরকৃত হয়।

দৈহিক আরামদায়ক যথার্থ তাপ °সে $= \frac{1}{2}$(বায়ু তাপ °সে + জলীয় তাপ °সে)—$\frac{1}{2}$ বায়ুগতি সেঃ মিঃ প্রতি সেকেণ্ডে।

ভারতের জন্যে সাধারণভাবে এই যথার্থ তাপ নির্ধারিত হয়েছে ২৭° সে. (সর্বোচ্চ)। এখন কোন এক সময়ে গ্রাম সাসনের বায়ুতাপ যখন ৩০° সে. ও জলীয় তাপ ২৭° সে. তখন শহর বেলেঘাটায় লক্ষিত হয়েছে যথাক্রমে ৩২.৫° সে. এবং ৩০.০° সে.। উপরিউক্ত সম্বন্ধ ও ভারতীয়দের যথার্থ স্বাচ্ছন্দ্য তাপ ২৭° সে. এই বিধায় নির্ণয় করা যায় যে, যখন গ্রামে আরামের জন্যে প্রয়োজন প্রতি সেকেণ্ডে ৭.৫ সেঃ মিঃ বায়ুগতির, তখন শহরের প্রয়োজন ২০.০ সেঃ মিঃ।

১ থেকে ১৯ কিঃ মিঃ গতিসম্পন্ন বায়ু বিশ্লেষণ দেখা গেছে যে, শীতকালে আলিপুরের তুলনায় দমদম শতকরা ২২ ভাগ অধিক বায়ুময় এবং তখন সাধারণ বায়ুদিক হচ্ছে উত্তর। দমদম এবং শহরের উত্তরাংশের উপর দিয়ে প্রবাহিত এই বায়ু অনেক বাধা অতিক্রম করে শহরের দক্ষিণাঞ্চলে প্রবেশের সুযোগ পায়। অন্য দিকে ঐ একই প্রক্রিয়ায় আলিপুর গ্রীষ্মকালে শতকরা ১৫ ভাগ অধিক বায়ুময়, কারণ তখন সাধারণ বায়ুদিক হচ্ছে দক্ষিণ। শীত এবং গ্রীষ্মকালের সাধারণ বায়ু এই ভাবে শহর কলিকাতার দ্বারা অবিরত বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে, বিশেষতঃ যখন শহরের সঞ্চিত তাপ ও দূষিত আবহাওয়া বিতাড়নের এবং শহরবাসীর দৈহিক স্বাচ্ছন্দ্যর জন্যে প্রাকৃতিক বায়ুর সুব্যবহার অতি প্রয়োজন। এর জন্যে প্রধানতঃ দায়ী কলিকাতা নগরীর ভৌগোলিক অবস্থিতি, আকার, ত্রুটিময় বিস্তৃতিধারা এবং অবিজ্ঞোচিত পরিকল্পনা।

ফলে নগরবাসীরা জরাজীর্ণ এবং কর্মে অক্ষম হয়ে পড়ছেন। গ্রামবাসীদের অপেক্ষাকৃত কম রোগভোগ লক্ষণীয়। স্থূল মৃত্যুহারের তুলনায় শহরে শ্বাস-প্রশ্বাস সম্বন্ধীয় রোগের এবং কর্কট রোগের কারণে মৃত্যুহারের বৃদ্ধি লক্ষণীয়। বর্তমানের উন্নতমান চিকিৎসা পদ্ধতির ফলে যদি এর কিছুমাত্র উন্নতি ঘটতো তবে তা এই রোগের মৃত্যুহারে অবশ্যই লক্ষিত হতো (১নং চিত্র)। বরং উন্নতমান চিকিৎসা পদ্ধতি সত্ত্বেও বর্তমান উচ্চ মৃত্যুহারের এই রোগের ভয়াবহ প্রাদুর্ভাবকেই সূচিত করে। চিকিৎসার অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে, শ্বাসনালী সম্বন্ধীয় রোগ এবং প্রতিক্রিয়াজনিত অসুস্থতা

শীতকালে যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। শহরে কতকগুলি প্রায়শঃঘটিত রোগ হচ্ছে কর্কটরোগ, হাঁপানি, ডিপ্‌থেরিয়া, ইনফ্লুয়েঞ্জা, নিউমোনিয়া, প্লুরিসি, ক্ষয়রোগ, সর্দিকাশি, মৃদুজ্বর, চুল ওঠা, চর্মের সাধারণ ও বিধ্বংসী রোগ, হৃদ্‌পিণ্ড সংক্রান্ত অন্যান্য রোগ ইত্যাদি। ১৯৫০ থেকে ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দে যখন ফ্রান্স দেশে কণ্ঠনালী পীড়ার দরুণ মৃত্যু ছিল মোট মৃত্যুসংখ্যার শতকরা ১৭ ভাগ মাত্র, তখন প্যারিস নগরীতে সেই হার ছিল শতকরা ৩৮ ভাগ।

নগরায়ণের এক বিচিত্র অবদান—ধূলি, ধূম্র ও কুয়াশার মিশ্রণে সৃষ্ট ধূম্রাশা ১৯৫২ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বরের এক সপ্তাহে লণ্ডনে ৫০০০ প্রাণহানির কারণ হয়েছিল। রাস্তার মোড়ে কর্মরত দিক্‌-দর্শকপালদের (Traffic police) রক্ত পরীক্ষায় জানা গেছে যে, তাঁদের রক্তকণিকাদের ঘিরে রয়েছে অঙ্গার-এক-অম্লজান (Carbon monoxid)-এর এক প্রলেপ। শহরের দূষিত বায়ুতে ধূম্রাশা, রাসায়নিক আব, মেঘ, ধূলিকণা ইত্যাদির মাত্রাতিরিক্ত অবস্থিতির ফলে সূর্যকিরণের অতি-বেগুনী রশ্মি পায় প্রবল বাধা, যার ফলে লক্ষিত হয় শহরবাসীদের মধ্যে রিকেট এবং সাধারণ সূর্যকিরণের অভাবজনিত রোগের প্রাদুর্ভাব।

অপর দিকে, কীটবিদ্‌গণের মতে আবহাওয়ার তাপ-পরিবর্তন কীট-পতঙ্গাদির সমাবেশকে সবচেয়ে প্রভাবিত করে। বৃষ্টি, বায়ু, আর্দ্রতা, রাত্রের মেঘ এবং বায়ুচাপ—এগুলিও বিভিন্ন মাত্রায় প্রভাবিত করে। নগরায়ণের ফলে কৃত্রিম তাপজনিত বায়ুর ঊর্ধ্বগতির ফলে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়, তা চতুর্দিকস্থ বায়ুর আগমন ও তৎসহ কীট-পতঙ্গাদির আগমনে পূর্ণ হয়। কলিকাতার বর্তমান মশকবৃদ্ধি এবং অন্যান্য কীটবৃদ্ধি এই কারণেও ঘটতে পারে। উদাহরণ-স্বরূপ, ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে এই শহর থেকে ম্যালেরিয়া সম্পূর্ণ দূরীভূত হয়েছিল, কিন্তু ১৯৬৭ খৃষ্টাব্দে ১৪৩৪ জন শহরবাসী এই রোগে আক্রান্ত হয়েছিল।

প্রাচীনকালে বাসস্থান নির্মাতাগণ বাসস্থানের আবহাওয়াকে বিশেষ গণ্য করতেন। উদাহরণ-স্বরূপ উল্লেখ করা যায় মিশরের কাহুন এবং পশ্চিম পাকিস্থানের মহেঞ্জদরোর নগর-পরিকল্পনা শৈলী। প্রাচীন দার্শনিকগণ, যেমন অ্যারিষ্টটল্‌, মিলেটাস-বাসী হিপ্‌পোডেমাস, ভিট্রুভিয়স, শুক্রাচার্য এবং পানিনি বাসস্থান পরিকল্পনায় আবহবিজ্ঞানের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এই বিষয়ে আশ্চর্য রকমের সাহসিকতার পরিচয় মেলে কয়েকটি পরি-কল্পনায়, যেমন উত্তর নাইজেরিয়ার কানো, আরবের হুক্রমৎ, চীনের হোনান, পেরুর লিমা এবং মেক্সিকোর পুয়েব্লা প্রমুখ প্রাক্‌-শিল্পবিপ্লবের কয়েকটি শহরে।

বর্তমান শতাব্দীর নগরায়ণের রূপ হচ্ছে প্রকৃত পক্ষে এক বা ততোধিক ঘনকেন্দ্রীক বিস্তীর্ণ শ্রম-শিল্পান্বিত বা প্রায়-শ্রমশিল্পান্বিত এলাকা। বৃহৎ শিল্পপ্রকল্পগুলি নগরের পরিপার্শ্বস্থ সুলভ জমির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে বস্তুতঃ নগরীর আয়তন বিস্তৃতির সহায়তা করে চলেছে। নিকটস্থ শহরগুলি এই একই প্রক্রিয়ায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে পরস্পর একত্রীভূত এবং প্রধান নগরীর অঙ্গীভূত হয়ে যাচ্ছে। ফলে সৃষ্টি হচ্ছে নগরান্বিত এক বিস্তীর্ণ এলাকার, যার নেই কোন নির্দিষ্ট সীমা বা আকৃতি বা বৈশিষ্ট্য। জনবহুল নগরীর এই স্বাভাবিক, অবশ্যম্ভাবী এবং শাসনহীন বৃদ্ধি তৎসহ নগরবাসী-দের পৌরএলাকা-বহির্ভাগস্থ সুলভ জমিতে বসতি স্থাপনের প্রচেষ্টা নগরসীমাকে সুদূরপ্রসারী করছে। প্রাচীন শহরগুলির নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে অবস্থিতির সঙ্গে বর্তমান প্রসারণশীল নগরীর তুলনা করা উচিত হবে না।

বৈজ্ঞানিকগণ এবং বিশেষতঃ আবহবিজ্ঞানীরা অণু-আবহাওয়ার উপর নগরের প্রভাব সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন আছেন। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে চার্লস লিয়েল, ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে গ্রেগর ক্রস, ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে জর্জ মার্চ, ১৯০১ খৃষ্টাব্দে আলেক্সাণ্ডার উয়েকফ,

১৯২৭ খৃষ্টাব্দে রুড্‌লফ্‌ গেইগর, ১৯২৯ উইলহেল্ম স্মীৎ, ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে লুব্‌নার, ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে ক্রেৎঝার, ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে রুডিকা এবং ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে ল্যাণ্ডস্‌বার্গ এই বিষয়ে গবেষণা করেছেন। দুঃখের বিষয় যে, এঁদের মধ্যে নগর-পরিকল্পনাকার বা স্থপতি কাউকেই পাওয়া যাবে না। উপরিউক্ত বৈজ্ঞানিকগণের উদ্দেশ্য যে নগর-পরিকল্পনায় আবহবিজ্ঞানের ব্যবহার ছিল না, তা সহজেই অনুমেয়। ফলতঃ এই সব মূল্যবান গবেষণালব্ধ ফলের প্রকৃত সংযোগ সাধন হয় নি। অধুনা আবহবিজ্ঞান সংক্রান্ত যতটুকু তথ্য নগর পরিকল্পনায় ব্যাখ্যায় দেওয়া হয়, তা নিতান্তই নিয়মমাফিক জলবায়ুর তথ্য বিতরণ। এর ফলে উদ্ভূত হয়েছে যথেচ্ছ বিশ্লেষণ, ভুল ব্যাখ্যা এবং কুসংস্কারের। যেমন, সাধারণ বায়ুদিক নির্ধারণ পদ্ধতি এবং সেইমত শিল্পপ্রকল্প স্থাপন, বায়ুর শান্ত এবং প্রায় শান্ত অবস্থা তথা শান্ত অবস্থার অব্যবহিত পরবর্তী বায়ুর দিক ও গতির প্রতি যথেচ্ছ অবহেলা শীতের শীতল বায়ুর শহরের অভ্যন্তরে নির্বিঘ্ন প্রবেশে ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত বাধাদান ইত্যাদি।

সত্য বলতে কি, বর্তমান নগর-পরিকল্পনাকারগণ যে আবহবিজ্ঞানের গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত আছেন, তা সহজেই বোঝা যায় এবং বর্তমানের নগরায়ণের বৈচিত্র্য ও জটিলতার আবর্তে আবহবিজ্ঞানের প্রতি সম্যক গুরুত্ব দেওয়া যে অপেক্ষাকৃত সম্ভব নয়, তা অনুমেয়। কিন্তু এই প্রকার অবহেলার বিষময় ফল সম্বন্ধেও আমরা যথেষ্ট অবগত আছি এবং মনে হয় যে, বর্তমান সভ্যতার সঙ্গে চালিত এই নগরায়ণে ও নগরপরিকল্পনায় আবহবিজ্ঞানের সুষ্ঠু বিশ্লেষণ ও যথার্থ প্রয়োগ অতীব প্রয়োজনীয়।

অবশ্য নগর-পরিকল্পনায় শুধু আবহবিজ্ঞানই একমাত্র বিবেচ্য নয়, তথাপি বিশিষ্ট কোন কোন ব্যাপারে আবহবিজ্ঞানের বিশ্লেষণ এবং তার ব্যবহারিক সংযোগসাধন যথেষ্ট মূল্যবান মনে হয়। নগরীর বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের অবস্থিতি, নিজস্ব ভৌগোলিক অবস্থিতি, আয়তনের বিস্তৃতি, বৃদ্ধির অক্ষ, আন্তঃনগর উন্মুক্ত প্রান্তর, পথের দিক্‌ নির্ণয়, নগর গঠনের কাঠামো পদ্ধতি নির্দেশ, স্থপত্য ও ভূমিবিন্যাসের উপর অনুশাসন এবং আইনগত বিধিনিষেধ স্থির প্রভৃতি শুধু প্রকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক ধারাতেই সম্ভব এবং ব্যক্তিগত পছন্দ অপছন্দে নয়। সত্য বলতে কি, এই ধারাতেই নগরজীবনকে রোগমুক্ত ও আরামদায়ক করে তোলা যায় এবং সৃষ্ট হতে পারে কর্মদক্ষতার এক সুন্দর আবহপরিবেশ। বিশেষতঃ আজকের দিনে যখন নগরীর অভ্যন্তরে আণবিক-ধূলির প্রকৃষ্ট সমাবেশ ও দীর্ঘ অবস্থিত ঘটতে পারে এবং অতি ক্ষুদ্র ধূলিকণাময় শহরের আবহবিদ্যুৎতে আয়নিভবনের বৃদ্ধি ঘটতে পারে, তখন নগর কর্তৃক অণু-আবহাওয়ার তথা স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব বস্তুতঃই সর্বাগ্রে বিবেচ্য। উদাহরণস্বরূপ গ্রামের তুলনায় শহরের বায়ুতে ৩ গুণ প্রচ্ছন্ন বিদ্যুৎ লক্ষিত হয়েছে। শহরবাসীদের উপর এর প্রভাব নিশ্চয়ই সুদূরপ্রসারী।

আজকাল যেমন রোগগ্রস্ত বা দুর্বল নগরবাসীদের চিকিৎসকগণ নির্দেশ দেন কোন শহর-প্রভাবমুক্ত স্থানে, যেমন সমুদ্রতীর, পাহাড়, বা গ্রামে গিয়ে থাকতে, ঠিক তেমনটি নির্দেশ দিতেন খৃষ্টপূর্বাব্দ ৫ম শতাব্দীর হিপোক্রেটিক বিদ্যালয়ে শিক্ষিত চিকিৎসকগণ। এই বিষয়ে আমরা যে খুব অগ্রসর হই নি, তা বলা নিষ্প্রয়োজন। বর্তমান সভ্যতার সন্তুষ্টিবিধানে আমরা শুধু প্রাকৃতিক অবস্থার ধ্বংসসাধনই করেছি নিছক অদূরদর্শিতার ফলে। ভবিষ্যতে যদি আমাদের অপেক্ষাকৃত সুস্থতর জীবনযাপন করতে হয়, তবে প্রকৃতিকে করতে হবে পুনরুজ্জীবিত এবং প্রাকৃতিক শক্তিকে নিয়োজিত করতে হবে সুষ্ঠু নগর-পরিকল্পনায় ও নগরায়ণে এবং তা করা সম্ভব।

আত্মহত্যার মনস্তত্ত্ব

শ্রীসন্তোষকুমার দে

আত্মহত্যা মহাপাপ বলে প্রায় সব দেশেই গণ্য হয়ে থাকে। হিন্দুর শাস্ত্রে, মুসলমানের কোরাণে, খৃষ্টানের বাইবেলে কোথাও আত্মহত্যার সমর্থন পাওয়া যায় না। তবে প্রাচীন চীনদেশে আত্মহত্যার স্বপক্ষে কিছু সমর্থন মেলে। তারা বলে, প্রতিহিংসা গ্রহণের জন্যে আত্মহত্যা করলে কোন দোষ নেই, কারণ তাদের বিশ্বাস আত্মহত্যাকারী প্রেতলোকে শত্রুর উপর প্রতিশোধ নেবার সুযোগ পায়। প্রাচীন গ্রীসদেশে দেখা যায়, দার্শনিক পণ্ডিত (Hegesias of cyrene) বলেছেন—জীবনে পরিতৃপ্তির চেয়ে বেশী হলো যন্ত্রণা, আনন্দের চেয়ে বেশী হলো দুঃখ, তাই এই দুঃখ-যন্ত্রণার হাত থেকে পরিত্রাণের একমাত্র পথ হলো আত্মহত্যা। এই মতবাদ তিনি এমন নিপুণভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন যে, আলেকজেন্ড্রিয়া সহরে ঐ সময় আত্মহত্যার প্লাবন বইতে থাকে। ফলে বাধ্য হয়ে মিশরের সম্রাট দ্বিতীয় টলেমি তাঁকে মিশর থেকে নির্বাসিত করেন।

আমাদের দেশে জৈন ধর্মে আত্মহত্যার স্বপক্ষে সমর্থন মেলে, বিশেষ করে সে আত্মহত্যা যদি ধীরে ধীরে উপবাসজনিত হয়। তাঁদের মতে আত্মহত্যা হলো বেঁচে থাকবার অন্ধ বাসনার উপর আত্মার জয়। জৈন ধর্মের প্রবর্তক মহাবীর স্বয়ং দীর্ঘ উপবাসে দেহত্যাগ করেন। আচার্য হেমচন্দ্র এবং জৈন রাজা কুমারপালও উপবাসে দেহত্যাগ করেন। এই সম্প্রদায়ের সাধুসন্তেরা আজও মাঝে মাঝে উপবাসে আত্মহত্যা করে থাকেন।

যাই হোক, সব দেশের শাস্ত্রের বাধানিষেধ সত্ত্বেও মানুষ আত্মহত্যা করে থাকে। আমাদের এই কলকাতা শহরেই ১৯৬৬ সালে ৮২ জন নর-নারী আত্মহত্যা করেছে; আর এই আত্মহত্যার সংখ্যা প্রতি বছরেই বেড়ে চলেছে। ভারতবর্ষে সবচেয়ে বেশী আত্মহত্যার সংখ্যা হলো গুজরাটে। ১৯৬৬ সালের ১লা এপ্রিল থেকে ১৯৬৭ সালের ১৫ই মার্চ পর্যন্ত গুজরাটে ১১৬৪ জন অর্থাৎ মাসে ৯৭ জন আত্মহত্যা করেছে। এর মধ্যে আমেদাবাদে আত্মহত্যা করেছেন ৪৮ জন স্ত্রীলোক। গুজরাট বিধান বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীহিতেন্দ্র দেশাই এই তথ্যটি জানান। গুজরাট ছাড়া ভারতের সর্বত্রই পুরুষের আত্মহত্যার সংখ্যা বেশী। গুজরাটে আত্মহত্যার সংখ্যা সর্বাধিক। এরপরই যথাক্রমে মাদ্রাজ, অন্ধ্র ও মহীশূরের স্থান। পশ্চিমবঙ্গের স্থান পঞ্চম। পুলিশ রিপোর্ট অনুসারে ১৯৬৪ সালে সারা ভারতে না কি প্রতি ঘণ্টায় তিনটি করে আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছে। ঐ বছরে মোট ২৭,১৪২ জন আত্মহত্যা করেছে। সংখ্যা দেখলে মনে হবে খুব বেশী, কিন্তু তা নয়। ইউরোপ, আমেরিকার তুলনায় আমাদের দেশে আত্মহত্যার সংখ্যা অনেক কম। পৃথিবীতে আত্মহত্যার রেকর্ডে দেখা যায়, জার্মেনীর স্থান সর্বোচ্চে এবং আয়ারল্যাণ্ডের স্থান সর্বনিম্নে। প্রতি এক লক্ষ লোক হিসাবে আত্মহত্যার গড় বার্লিনে ৩৪ জন, পূর্ব জার্মেনীতে ২৭ জন, যুক্তরাষ্ট্রে ১০ এবং আয়ারল্যাণ্ডে ৩ জন। সম্প্রতি ভারত-সরকারের আমন্ত্রণে বার্লিনের আত্মহত্যা নিবারণ সংস্থার ডিরেক্টর ডাঃ টমাস ভারতের চৌদ্দটি শহরে আত্মহত্যার পরিসংখ্যান পর্যালোচনা করে

এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, অন্যান্য দেশে আত্মহত্যা সংঘটিত হয় সাধারণতঃ প্রেম, বিবাহ, যৌনক্ষুধা প্রভৃতি কারণে, কিন্তু ভারতে বেশীর ভাগ আত্মহত্যা করে হতভাগিনী বধূরা খাশুড়ীদের অত্যাচার আর গঞ্জনায়। পুলিশের মতে, রোগের কবল থেকে অব্যাহতি, বাপ-মা এবং শ্বশুরের সঙ্গে ঝগড়া, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া, দারিদ্র, মস্তিষ্ক-বিকৃতি, পরীক্ষায় অকৃতকার্যতা, নৈরাশ্য প্রভৃতিই আত্মহত্যার প্রধান কারণ।

সভ্যতার অভিশাপ—আত্মহত্যা মনে হয় যেন সভ্যতার এক অতি বড় অভিশাপ। অসভ্য অনুন্নত আদিবাসীদের মধ্যে (এরা তথাকথিত সভ্য সমাজের বিধিনিষেধ মেনে চলে না এবং প্রকৃতির সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নিয়ে স্বাভাবিকভাবে সরল জীবনযাপন করে) আত্মহত্যার কথা কদাচিৎ শোনা যায়। সবদেশের আদিবাসীদের সম্বন্ধে ঠিক একই বিবরণ পাওয়া যায়। অষ্ট্রেলিয়ায় আদিবাসীরা আত্মহত্যা করে না। ক্যারোলিন দ্বীপপুঞ্জে, দক্ষিণ আফ্রিকায় বুশম্যান ও হটেনটট্‌দের মধ্যে, টেরাডেল-ফিউগায় ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে এবং দক্ষিণ পশ্চিম আমেরিকায় জুনি জাতির মধ্যে আত্মহত্যার কথা কখনও শোনা যায় না। আন্দামান দ্বীপ পুঞ্জের আদিবাসীরা ভারতীয় ও ইউরোপীয়দের সংস্পর্শে আসবার আগে আত্মহত্যা কাকে বলে জানতো না। ভারতের কোল, ভীল, সাঁওতাল, ওঁরাও, মুণ্ডা, চাক্‌মা প্রভৃতি উপজাতির (এরা ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসে নি এবং আদিম জীবনযাপন করছে) মধ্যে আত্মহত্যার কথা শোনা যায় না।

আত্মহত্যার কারণ—জীবনের উপর মানুষের অসীম ভালবাসা। তবু মানুষ আপন হাতে সে জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটায় কেন? নিশ্চয় এর যথেষ্ট কারণ আছে। এই কারণগুলি খুঁজে বের করবার জন্যে মনোবিজ্ঞানীরা যথেষ্ট চেষ্টা করছেন আসছেন এবং কারণগুলি জানতেও পেরেছেন।

আত্মহত্যার কারণ একাধিক, একাধিক কোন অসংখ্য বলা যেতে পারে। আর এই জীবন-নাট্যের যবনিকাপাত হয় অসংখ্য উপায়ে। তাই বলা চলে জীবন-রঙ্গমঞ্চে প্রবেশের দ্বার একটি মাত্র, কিন্তু বহির্গমনের দ্বার অসংখ্য। এই জন্যে মনোবিজ্ঞানীরা এই কারণগুলির দফাদারি আলোচনা না করে, এক একটি প্যাটার্ন বা ধরণ হিসাবে আলোচনা করেছেন এবং এই ধরণ গুলি মানুষের স্বভাব ও চালচলনের উপর ভিত্তি করে নিরূপিত হয়েছে।

(১) পরিস্থিতি ধরণ—এই রকম একটি ধরণকে বলা হয়েছে পরিস্থিতি ধরণ বা সিচুয়েসন প্যাটার্ণ। এই শ্রেণীর আত্মহত্যা আবার অনেক কারণে হয়। এগুলির মধ্যে হঠাৎ আবেগপ্রসূত কারণ থেকে আরম্ভ করে ভেবেচিন্তে, পরিকল্পনা করে প্রভৃতি সব পর্যায়ের আত্মহত্যা পড়ে। বয়স্ক লোকের আত্মহত্যাকে প্রথমোক্ত পর্যায় ফেলা যায়। সংবেদনশীল হওয়ায় তরুণেরা অতি সামান্য কারণে আত্মহত্যায় প্রবৃত্ত হয়। ব্যর্থ প্রেমে, অভিভাবকেরা কিছু দেবার অঙ্গীকার করে না দিলে, কিছু সুখ-সুবিধার অভাব হলে, গুরুজনের কাছে তিরস্কৃত হলে, পরীক্ষায় অকৃতকার্য হলে বা খেলাধুলায় উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করতে না পারলে আত্মহত্যা করে থাকে। বৃদ্ধদের ক্ষেত্রেও এই ধরণের উদাহরণের অভাব নেই। ভগ্নস্বাস্থ্য, দুরারোগ্য ব্যাধি, প্রিয়জনের বিয়োগ, স্ত্রীর মৃত্যু, নিঃসঙ্গতা, ভোগে অবসাদ, জীবিকার্জনে অক্ষমতা প্রভৃতি নানা কারণে বৃদ্ধেরা যখন আত্মহত্যা করে, তাকে এই পরিস্থিতি ধরণের আত্মহত্যার পর্যায়ে ফেলা যায়।

(২) পরিত্রাণ ধরণ বা এস্‌কেপ প্যাটার্ণ-

মানুষ যখন জীবনের দায়-দায়িত্ব গ্রহণ ও পালনে পরাঙ্মুখ হয়, তখন আত্মহত্যার মধ্যে সহজ পরিত্রাণের পথ খুঁজে পায়। আকণ্ঠ ঋণে ডুবে গিয়ে মানুষ যখন দিশেহারা হয়ে পড়ে, আত্মহত্যা তখন তাকে এক নতুন দিগন্তের সন্ধান দেয়। যখন ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রভৃতি সব কিছু কাজে হাত দিয়ে মানুষ কোনটাতেই সফল হয় না, সব কাজেই লোকসানের পাল্লা ভারী হয়ে ওঠে, মানুষ তখন আত্মহত্যা করে সব জ্বালা জুড়ায় এমনিভাবে মানুষ জেলে যাবার ভয়ে, অসৎ কাজে ধরা পড়ে লোকসমাজে বেইজ্জত হবার ভয়ে, রাজনৈতিক কারণে ধরা পড়ে জেলে নির্মম নির্যাতনের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে আত্মহত্যা করে, মনে করে এইভাবে দুঃখের আঁধার রাত্রি কেটে যাবে। এগুলি পলায়নী মনোবৃত্তিজনিত আত্মহত্যার উদাহরণ।

(৩) ইচ্ছা-প্রতিবন্ধক ধরণ—এই ধরণের আত্মহত্যা অনেক রকমের। মানুষ যখন জীবনে বীতশ্রদ্ধ হয় কিংবা যা চায় তা পায় না, তখন সে আত্মহত্যা করে। যখন ভাল চাকুরীর চেষ্টা করেও পায় না বা যোগ্যতা সত্ত্বেও অফিসে উচ্চ পদে উন্নীত হতে পারে না, তখন তার উচ্চাশা বিফল হয়ে যায়। ফলে তার ইচ্ছার ব্যাঘাত ঘটায় সে আত্মহত্যা করে।

(৪) মানসিক-দ্বন্দ্ব ধরণ—দুটি আদর্শের মধ্যে যখন দ্বন্দ্ব বা সংঘাত বাধে এবং মানুষ যখন দুটির একটিরও সমাধান করতে পারে না, তখন সে আত্মহত্যা করে। যেমন একজন বিবাহ করতে চায়, কিন্তু যে মুহূর্তে বিবাহিত জীবনের দায়-দায়িত্বের কথা মনে পড়ে যায়, তখন আর বিবাহ করতে সাহসী হয় না। ফলে বিবাহ-প্রস্তাব সাময়িকভাবে স্থগিত রাখতে হয়, কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে মিলনের বাসনা চরিতার্থ না হওয়ায় পাওয়া আর না পাওয়ার মধ্যে চলতে থাকে এক প্রবল দ্বন্দ্ব, শেষে এই দ্বন্দ্বের সমাধান হয় আত্মহত্যায়। এইরকম উদাহরণ হাজার হাজার আছে। এইসব আত্মহত্যাকে এই পর্যায়ে ফেলা যায়।

(৫) জীবন-দ্বন্দ্বের আকস্মিক পতন—যেসব লোকের সামাজিক প্রতিষ্ঠা, অর্থনৈতিক অবস্থা, দৈহিক রূপ ও মানসিক গুণাবলী, যা একদিন খুব উচ্চগ্রামে বাঁধা ছিল, তা যদি হঠাৎ কোন কারণে ব্যাহত হয়, তাহলে মানুষ আত্মহত্যা করে। যেমন একজন নামী বক্তা বা গায়কের রোগভোগের ফলে হঠাৎ বাক্‌রোধ হয়ে গেল, কি কোন রূপসী নারী হঠাৎ অন্ধ হয়ে গেল কিংবা কোন বিখ্যাত লোকের দীর্ঘ দিনের জন্যে কারাবাসের ফলে তার সংসার অর্থাভাবে অকালে ভেঙ্গে গেল, স্বামী বা স্ত্রীর মধ্যে বিশ্বাসহীনতায় যখন সংসারে অশান্তি হয়, বৃদ্ধ বয়সে দয়িত বা দয়িতার মৃত্যু, ব্যাঙ্ক ফেলের জন্যে যখন শেষ সম্বলটুকু নষ্ট হয় যায় এবং তার ফলে সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য সবই হারাতে হয়, তখন মানুষের আত্মহত্যা ছাড়া আর কোন পথ থাকে না। এগুলি সবই হলো জীবন-দ্বন্দ্বের আকস্মিক পতনজনিত আত্মহত্যার উদাহরণ।

আত্মহত্যার বিশেষত্ব—সব জিনিষের মত আত্মহত্যারও কতকগুলি বিশেষত্ব আছে। (১) পৃথিবীর সর্বত্র দেখা যায়, স্ত্রীলোকের চেয়ে পুরুষেরাই বেশী আত্মহত্যা করে। ভারতবর্ষেও এই বিষয়ে ব্যতিক্রম নেই। ১৯৬২ সালে দেখা যায়, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি এক লক্ষ অধিবাসীদের মধ্যে পুরুষদের আত্মহত্যার সংখ্যা হলো ৪·৩%। আবার পুরুষদের চেয়ে মেয়েরা বেশী সংখ্যায় আত্মহত্যার চেষ্টা করে, (ভান করে) কিন্তু মরে না; চেষ্টা আন্তরিক না হওয়ায় বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে বেঁচে যায়। মেয়েদের এই আত্মহত্যার চেষ্টা লোকের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে—এটা সকল নয়।

(২) যুক্তরাষ্ট্রে কৃষ্ণকায়দের চেয়ে শ্বেতকায়রা

বেশী সংখ্যায় আত্মহত্যা করে, আর ভারতে দরিদ্র ও অশিক্ষিত লোকের চেয়ে শিক্ষিত, ধনী ও মধ্যবিত্তেরা আত্মহত্যা করে বেশী সংখ্যায়।

(৩) মানুষের বয়স যত বাড়তে থাকে, আত্ম-হত্যার ইচ্ছাও তত বাড়তে থাকে। ৬৫ বছরের উপরে যাদের বয়স, তাদের মধ্যে আত্মহত্যার সংখ্যা, ৪৫ বছরের নীচে যাদের বয়স, তাদের আত্ম-হত্যার তুলনায় তিন গুণ বেশী; আর ৪৫-এর উপর যাদের বয়স, তাদের মধ্যে আত্মহত্যার সংখ্যা সব রকম বয়সের আত্মহত্যার তুলনায় অর্ধেক।

(৪) ১৫-২০ বছর কিশোর ও যুবকদের মধ্যে আত্মহত্যার সংখ্যা অত্যন্ত কম; কারণ জীবনের সঙ্কটময় মুহূর্ত যাকে বলা হয়, তা সাধারণতঃ এই বয়সে উপস্থিত হয় না।

(৫) দশ-বছর বয়সের বালক-বালিকাদের মধ্যে আত্মহত্যার কথা শোনা যায় না, কারণ এই বয়সে অহং জ্ঞান বা আত্মমর্যাদাবোধ জন্মায় না—যাতে আঘাত পেয়ে মানুষ আত্মহননে প্রবৃত্ত হতে পারে।

(৬) ভারতবর্ষে মুসলমান ও খৃষ্টানদের চেয়ে হিন্দুরা বেশী সংখ্যায় আত্মহত্যা করে।

(৭) কুমার-কুমারীদের চেয়ে বিবাহিত লোকেরা আত্মহত্যা অনেক কম করে, কারণ তাদের জীবনের দায় ও দায়িত্ব অনেক বেশী। আমেরিকায় দেখা যায়, ১৯৫০ সালে যে সব বিবা-হিত লোকেরা আত্মহত্যা করেছে, তাদের সংখ্যা হলো ১৮% আর বিধবাদের আত্মহত্যার সংখ্যা হলো ৩০·৭% এবং বিবাহবন্ধন ছিন্ন ও দ্বিতীয়বার বিবাহিত নর-নারীদের মধ্যে আত্মহত্যার সংখ্যা হলো ৬৪·৩%।

(৮) পুত্রকন্যাবিশিষ্ট দম্পতি অপেক্ষা নিঃসন্তান দম্পতির মধ্যে আত্মহত্যার সংখ্যা অনেক বেশী।

(৯) যত লোক আত্মহত্যার চিন্তা বা কল্পনা করে, তত লোক প্রকৃতই আত্মহত্যা করে না।

(১০) অর্থসমৃদ্ধ দেশে, বিশেষ করে শিল্প-প্রধান দেশগুলিতে দেখা যায়, ব্যবসায়ের উত্থান-পতনের সঙ্গে আত্মহত্যার সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। আর যে বছর ব্যবসায়-বাণিজ্যে তেজীভাব দেখা দেয়, সেই বছরে আত্মহত্যার সংখ্যা হয় অনেক কম।

(১১) ছাত্রদের মধ্যে আত্মহত্যার হার বেশী। প্রত্যেক তৃতীয় ছাত্রের মৃত্যুর কারণ হলো আত্মহত্যা—তা সে পরীক্ষায় ফেলজনিত হোক বা প্রণয়ঘটিত ব্যাপারেই হোক। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলেন, প্রতি-দিন সারা পৃথিবীতে আত্মহত্যা করেন হাজার জনেরও বেশী।

(১২) বিখ্যাত লোকেরা আত্মহত্যা করলে (যেমন ধরুন মেরিলিন মনরোর আত্মহত্যা) আত্মহত্যাপ্রবণ লোকেরা প্রায়শঃই আত্মহত্যা করতে প্ররোচিত হয়।

প্রচলিত বিশ্বাস—আত্মহত্যা সম্বন্ধে সব দেশে একটি প্রচলিত বিশ্বাস হলো, আত্মহত্যা করবার আগে মানুষ অন্ততঃ সাময়িকভাবে উন্মাদ হয়ে পড়ে। প্রাচীন গ্রীকদের মধ্যে বিশ্বাস ছিল যে, যারা আত্মহত্যা করে, ভগবান প্রথমে তাদের বুদ্ধি হরণ করে নেন। এই রকম বিশ্বাসের কারণ, অতি দরিদ্রের কাছেও জীবন অতি প্রিয় বস্তু। কাজেই কোন সুস্থমনা মানুষ নিজের হাতে জীবন-প্রদীপ এক ফুৎকারে নিবিয়ে দিতে পারে না। কিন্তু এই বিশ্বাস সত্য নয়। নিউইয়র্কের মানসিক হাস-পাতাল থেকে যে রিপোর্ট বের হয়েছে, তাতে জানা যায়—সেখানে যে সব নরনারী আত্মহত্যা করেছে, তাদের মধ্যে কেউ কেউ মানসিক ও স্নায়বিক রোগ, বিষন্নতা, বুদ্ধিভ্রংশতা, উন্মত্ততা প্রভৃতি রোগাক্রান্ত ছিল। কিন্তু তাদের সংখ্যা, যত লোক আত্মহত্যা করেছে, তাদের অনুপাতে ১৫% থেকে ৩০%-এর বেশী নয়। কাজেই আত্মহত্যার আগে মানুষ পাগল হয়ে যায়, এই কথা সত্য বলা চলে না। অপর পক্ষে অনেক আত্মহত্যার ক্ষে ত্রে

দেখা যায় যে, যারা আত্মহত্যা করেছে, তারা বেশ সুস্থমস্তিষ্ক ছিল এবং ঠাণ্ডা মাথায় আত্মহত্যার জন্যে কাউকে দায়ী না করে বেশ সংযত ভাষায় চিঠি লিখে গেছে বা বিশেষ পরিকল্পনা করে আত্মহত্যা করেছে। তাদের এই চিঠিগুলি পড়লে বিকৃত মস্তিষ্কের কোন লক্ষণই দেখা যায় না।

নিবারণের উপায়—আত্মহত্যা নিবারণের কোন উপায় সম্ভবতঃ নেই। এটা হলো সভ্যতার অভিশাপ। পূর্বেকার সরল আদিম জীবনে ফিরে যেতে পারলে হয়তো এর প্রতিকার সম্ভব; কিন্তু সে তো সম্ভব নয়। তবে কোন উত্তেজনার কারণ যদি দূরীভূত করা যায় এবং শান্ত, সংযত ও নিরুদ্বিগ্ন জীবনযাপন করা যদি সম্ভব হয় এবং মানুষ যদি কিছুটা ঈশ্বর-মুখী হয়, তাহলে হয়তো আত্মহত্যার সংখ্যা অনেকটা কমে যেতে পারে। পরলোকে শাস্তির ভয়ও মানুষকে হয়তো আত্মহত্যা থেকে নিবৃত্ত করতে কিছুটা সাহায্য করতে পারে।

সঞ্চয়ন

অ্যাপোলো-১৩ মহাকাশযানের চন্দ্রাভিযান

গত এক বছরের মধ্যে মহাকাশ অভিযান কেন্দ্রের কাজকর্মের ক্ষেত্রে বিপুল পরিবর্তন ঘটেছে। এতকাল চাঁদে মহাকাশচারীদের কিভাবে নিরাপদে পাঠানো ও ফিরিয়ে আনা যেতে পারে, কারিগরী দিক থেকে তার পন্থা উদ্ভাবনই ছিল প্রধান লক্ষ্য। সেই লক্ষ্য প্রায় সাধিত হয়েছে। কিন্তু যে বিপুল অর্থ ও শ্রমের বিনিময়ে চন্দ্রাভিযানের পরিকল্পনা রূপায়িত হয়ে বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহ, সৌরমণ্ডলীর আবির্ভাব ও সৃষ্টির রহস্য উদ্ঘাটনের দিক থেকে তার গুরুত্ব ও মূল্য কতখানি, এই প্রশ্ন অনেকের মনেই জেগেছে। আজ ইঞ্জিনিয়ার, টেক্‌নিশিয়ান, মহাকাশচারী এবং বিজ্ঞানী সকলেই এই বিষয়টি বিশেষভাবে চিন্তা করছেন। পরবর্তী চন্দ্রাভিযানের পরিকল্পনাসমূহ বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহের গুরুত্বের পরিপ্রেক্ষিতেই যে কার্যকরী করা হবে, এই সিদ্ধান্ত সকলেই গ্রহণ করেছেন।

১১ই এপ্রিল (১৯৭০) ফ্লোরিডার কেপ কেনেডী থেকে মার্কিন মহাকাশযান অ্যাপোলো-১৩ মহাকাশচারী জেম্‌স্ লোভেল, টমাস কে. ম্যাটিংলী এবং ফ্রেড ডাব্লিউ. হেজ (জুনিয়ার)—এই তিন জন যাত্রী নিয়ে চন্দ্রাভিমুখে যাত্রা করবে। চাঁদের সঠিক বয়স নিরূপণই হবে এবারের তথ্যানুসন্ধানী অভিযানের মূল লক্ষ্য।

বহু বিজ্ঞানী মনে করেন, চাঁদের বয়স ৫০০ কোটি বছরেরও অনেক বেশী। এবারে চন্দ্রের গহ্বর থেকে যে সকল উপকরণ মহাকাশচারীরা সংগ্রহ করে পৃথিবীতে নিয়ে আসবেন, তা এই বিষয়টির উপর আলোকপাত করবে বলে তাঁদের বিশ্বাস। তাঁরা মনে করেন যে, চাঁদের সৃষ্টি হাজার কোটি বছর আগে হয়েছিল—এরকম প্রমাণও এই সকল উপকরণের মাধ্যমে মিলতে পারে। তাছাড়া সৌরমণ্ডলী ও সৃষ্টি-রহস্য সম্পর্কেও বহু তথ্যের সন্ধান এই সকল উপাদান দিতে পারে

এবারের চন্দ্রাভিযানের অধিনায়ক মহাকাশচারী জেম্‌স্ এ. লোভেল—বয়স ৪২। এবারের সফর হবে ১০ দিন, ১ ঘণ্টা ৩ মিনিট ১৬ সেকেণ্ডের। ১৬ই এপ্রিল লোভেল ও মহাকাশ-

চারী ফ্রেড. হেজ চান্দ্রযানের সাহায্যে ভারতীয় স্ট্যাণ্ডার্ড সময় সকাল ৮টা ২৫ মিনিটে চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণ করবেন এবং ১৭ই এপ্রিল সন্ধ্যা ৫টা ৫২ মিনিটে চন্দ্রপৃষ্ঠ থেকে ঐ যানেরই সাহায্যে অ্যাপোলো-১৬ মূল যানে উঠে এসে ২১শে এপ্রিল পৃথিবীতে ফিরে আসবেন। মূল যানটি চালাবেন টমাস কে. ম্যাটিংলী।

চাঁদের কোন্ অঞ্চলে সৃষ্টির আদিম দিনের চিহ্ন ও উপকরণ পাওয়া যেতে পারে, সেই স্থানটির সন্ধান করবার অনেক চেষ্টা বিজ্ঞানী ও পরিকল্পনা রচয়িতারা করেছেন। বিজ্ঞানীদের অভিমত, চন্দ্রপৃষ্ঠের যে পর্বতসঙ্কুল ফ্রামরো এলাকায় মহাকাশচারীরা অবতরণ করবেন তারই উত্তরে রয়েছে ইম্প্রিয়াম অববাহিকা। এটিই চাঁদের অন্যতম আদিম বৃহত্তম গহ্বর। চাঁদের জন্মের কিছু কাল পরেই এক প্রকাণ্ড উল্কার আঘাতে এই অববাহিকার সৃষ্টি হয়েছিল এবং সেই প্রচণ্ড আঘাতে যে শিলা ও প্রস্তর খণ্ড ছিট্‌কে এসে পড়েছিল, তাতেই গড়ে উঠেছিল ফ্রামরো এলাকা। এই গহ্বরটির গভীরতা ১০০ কিলোমিটারেরও বেশী।

কোটি কোটি বছর ধরে আগ্নেয়গিরি-নিঃসৃত উপাদানেই এই গহ্বরটির অনেকখানি ভর্তি হয়েছে। পৃথিবী থেকে চন্দ্রপৃষ্ঠের এই বিরাট গহ্বরের গোলাকার বেড়টি দৃষ্টিগোচর হয়। এরই বামে নীচের দিকে রয়েছে ফ্রামরো এলাকা।

চাঁদের প্রথম দিকের উপকরণ সংগ্রহ করতে হলে চন্দ্রপৃষ্ঠের ২০ বা ৩০ মিটার নীচু পর্যন্ত খনন করে উপাদান সংগ্রহ করা প্রয়োজন। এত গভীরে চন্দ্রপৃষ্ঠ খনন করে উপাদান সংগ্রহ করা মহাকাশচারীদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাহলেও চন্দ্রত্বকের ৩ মিটার নীচে থেকে নমুনা সংগ্রহের উদ্দেশ্যে মহাকাশচারীরা একটি বৈদ্যুতিক ড্রিল সঙ্গে নিয়ে যাবেন। চন্দ্রাভিযানে সর্বপ্রথম এই যন্ত্রটি নেওয়া হচ্ছে। তাঁরা যে স্থানে অবতরণ করবেন, তারই ৬ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত কোন ক্রেটার নামে একটি গহ্বরে তাঁরা নেমে উপকরণ সংগ্রহ করবেন।

১২২ ফুট উচ্চে অবস্থিত এই গহ্বরের মুখটি ৩০০ মিটার চওড়া এবং ১০০ মিটার গভীর। চাঁদের বিবর্তনের আদিম ইতিহাসের প্রধান তিনটি পর্যায়েরই উপকরণ এখান থেকে সংগৃহীত হবে বলে বিজ্ঞানীদের ধারণা। চন্দ্রের পার্বত্য এলাকায় এই প্রথম অভিযান চালানো হচ্ছে। অ্যাপোলো-১১ এবং ১২ সমতল এলাকা থেকে যে নমুনা সংগ্রহ করে নিয়ে এসেছিল, সেগুলি পরীক্ষা করেই চাঁদের বয়স ৪৬০ কোটি বছর ধার্য করা হয়েছে।

মহাকাশচারীরা বৈজ্ঞানিক তথ্যানুসন্ধানের উদ্দেশ্যে বহু নতুন যন্ত্রপাতি সঙ্গে নিয়ে যাবেন এবং চন্দ্রপৃষ্ঠে ১১ প্রকার পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাবেন। এর মধ্যে পাঁচটি হবে সম্পূর্ণ নতুন। এবার চন্দ্রপৃষ্ঠ থেকে সূর্য ও তারকামণ্ডলী সম্পর্কে বহু আলোক-চিত্র গ্রহণেরও ব্যবস্থা হবে। মহাকাশচারী লোভেল ও হেজ ১৬ ও ১৭ই এপ্রিল চান্দ্রযানের বাইরে এসে ফ্রামরো এলাকায় তথ্যানুসন্ধান ও স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি স্থাপনের জন্যে দশ ঘণ্টা কাটাবেন।

এই সফরের নিম্নলিখিত প্রধান পাঁচটি লক্ষ্য নির্দেশ করা হয়েছে:

১। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি নিয়ে পর্যবেক্ষণ—চন্দ্র থেকে শিলা ও অন্যান্য উপাদান সংগ্রহ, ২। চন্দ্রপৃষ্ঠে স্বয়ংক্রিয় তথ্যসন্ধানী যন্ত্রপাতি স্থাপন, ৩। চান্দ্রযানের যথানির্দিষ্ট স্থানে অবতরণের পরীক্ষা, ৪। চন্দ্রের পরিবেশ ও আবহাওয়ায় কাজকর্ম করবার ব্যবস্থা, ৫। ভবিষ্যৎ অবতরণের স্থান সম্পর্কে আলোকচিত্র গ্রহণ। তাছাড়া স্যাটার্ন-৫ রকেটের তৃতীয় পর্যায়ের অংশবিশেষ এবং চান্দ্রযানের উপরিভাগ

চন্দ্রপৃষ্ঠে নিক্ষেপ করা হবে। এদের আঘাতে চন্দ্রপৃষ্ঠে যে কম্পন সৃষ্টি হবে, তার প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ করা হবে।

মহাকাশচারীরা তিনটি টেলিভিশন ক্যামেরা সঙ্গে নিয়ে যাবেন। এদের মধ্যে একটি থাকবে মূল যানে আর দুটি থাকবে চান্দ্রযানে। এদের সাহায্যে যাত্রা থেকে প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত যাবতীয় কার্যসূচীর ছবি তোলা হবে।

পৃথিবীর উপর সূর্যগ্রহণের প্রতিক্রিয়া

গত ৭ই মার্চ সূর্যগ্রহণের সময়ে সূর্যের পূর্ণ-গ্রাসের ফলে পশ্চিম গোলার্ধের একটা সুবিস্তৃত এলাকায় অতি অল্প সময়ের জন্যে হলেও একটা ধূসর অন্ধকার নেমে এসেছিল। গ্রহণজনিত এই ছায়াপথটি প্রসারিত ছিল মেক্সিকোর দক্ষিণাঞ্চল থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পূর্বাঞ্চলের সমুদ্রোপকূল অবধি। প্রায় দশ লক্ষ লোক ছিল ঐ ছায়ামণ্ডিত পূর্ণগ্রাসের এলাকায়। তারা প্রত্যক্ষ করেছে, নীল উজ্জ্বল আকাশ হঠাৎ একটা হলদে ধূসর অন্ধকারে আবৃত হয়ে গেছে, অপরাহ্নের সুন্দর আবহাওয়া যেন রাতের হিমশীতল আবহাওয়ায় রূপান্তরিত হয়েছে। তারপর সূর্য ও পৃথিবীর মাঝখানে যে চাঁদ দাঁড়িয়েছিল, তা সরে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই সেই উজ্জ্বল নীলাকাশের সেই সুন্দর আবহাওয়ার আবির্ভাব ঘটলো।

সূর্যের প্রভাব থেকে পৃথিবীর সম্পূর্ণ দূরে থাকা —সূর্যগ্রহণের সময় যেমন ঘটে থাকে, তেমনটি প্রকৃতিতে অন্য সময়ে ঘটে না। এর ফলে পৃথিবীর আবহাওয়া প্রভৃতির ক্ষেত্রে কি প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, তা জানবার সুযোগ কেবলমাত্র ঐ সময়েই মিলে। এবার পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের শত শত বিজ্ঞানী ঐ সুযোগ নিয়েছেন। পশ্চিম গোলার্ধের পূর্ণগ্রাসজনিত ছায়াপথের মাঝখানে অবস্থিত ওয়ালপস্ আয়ল্যাণ্ডে বিভিন্ন রকম যন্ত্রপাতি নিয়ে বহু বিজ্ঞানী সমবেত হয়েছিলেন। সেখান থেকে তাঁরা আবহাওয়া এবং তার উপরিস্থিত ঊর্ধ্বা-কাশের গ্রহণজনিত তথ্য সংগ্রহ করেছেন।

মহাকাশে কক্ষপথে চাঁদের অবস্থিতির জন্যে ঐ স্থানে সূর্যের সামান্য মাত্র আলোও এসে পড়ে নি, সূর্য ছিল সম্পূর্ণ আবৃত। পনেরো মিনিটের মধ্যে বিজ্ঞানীরা এক ডজন তথ্যসন্ধানী রকেট ছেড়েছেন। তাঁরা তিন মিনিটের মধ্যে পর পর ছেড়েছেন সাতটি। আর আমেরিকার জাতীয় বিমান বিজ্ঞান ও মহাকাশ সংস্থা সারাদিনে ছেড়ে-ছেন ২৬টি রকেট। একদিনে এই পরিমাণ রকেট এর আগে আর ছাড়া হয় নি। ওয়ালপস্ আয়-ল্যাণ্ড, ফ্লোরিডার এলগিন বিমান ঘাঁটি এবং নিউ মেক্সিকোর হোয়াইট স্যাণ্ড থেকে এই সকল রকেট ছাড়া হয়েছিল। গ্রহণজনিত ছায়াপথের মধ্যে ছিল ওয়ালপস্ আয়ল্যাণ্ড। আর তার বাইরে ছিল নিউ মেক্সিকোর হোয়াইট স্যাণ্ড কেন্দ্রটি।

গ্রহণজনিত ছায়ামণ্ডিত এলাকায় সংগৃহীত তথ্যের সঙ্গে তুলনা করবার জন্যেই হোয়াইট স্যাণ্ডস্ থেকে আবহাওয়া ও আয়নোস্ফিয়ার সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ করা হয়েছে। গ্রহণের সময় এই রকম তথ্য সংগ্রহের বিপুল উদ্যোগ এর আগে আর কখনও হয় নি।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ, যেমন—আমেরিকা, ক্যানাডা, পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন দেশ, সোভিয়েট ইউনিয়ন, দক্ষিণ আমেরিকা, জাপান

প্রভৃতি দেশের পাঁচ শতেরও বেশী জ্যোতির্বিদ ও সৌরবিজ্ঞানী নানা ধরণের দূরবীক্ষণ যন্ত্র, স্পেক্‌ট্রোমিটার, ইন্টারফেরোমিটার ও ক্যামেরার সাহায্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ক্যানাডা ও মেক্সিকো থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছেন। এই সকল বিজ্ঞানীদের অর্ধেকই ছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের। মেক্সিকোর মিয়াহুয়েতলানের কাছেই সবচেয়ে বেশী সংখ্যক বিজ্ঞানীরা সমবেত হয়েছিলেন। আবহাওয়া ও আকাশ ছিল চমৎকার।

ভূপৃষ্ঠে স্থাপিত যন্ত্রপাতি ও রকেটের সাহায্যেও বহু তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। এসব তথ্য উদ্ধার করতে বেশ কিছু সময় লাগবে।

শনিগ্রহের বলয়ে অ্যামোনিয়া-বরফের সন্ধান

শনিগ্রহের চারপাশে যে বলয়গুলি রয়েছে, তাদের গঠন সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা নতুন তথ্যের সন্ধান দিয়েছেন। আমেরিকার অ্যারিজোনা বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যোর্তিবিজ্ঞানীরা এই সকল বলয় সম্পর্কে বলেছেন যে, এদের বেশীর ভাগই অ্যামোনিয়ার (NH_3) বরফ দিয়ে গঠিত। তাঁদের অভিমত এই যে, কোটি কোটি বছর আগে ঐ গ্রহটি গঠিত হবার পর সম্ভবতঃ অ্যামোনিয়া বাষ্পীয় আকারে ঐ গ্রহটি থেকে বেরিয়ে এসেছে।

ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের চন্দ্র ও গ্রহমণ্ডলী সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধানী গবেষণাগারের প্রধান ডক্টর জেরার্ড কুইপার এই সম্পর্কে বলেছেন যে, সৌরমণ্ডলীর সীমানার মধ্যে এই প্রথম বরফের সন্ধান পাওয়া গেল।

বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, মঙ্গল, বুধ, পৃথিবী, ইউরেনাস, প্লুটো ও নেপচুন সৌরমণ্ডলীর মোট এই নয়টি গ্রহ নিজ নিজ নির্দিষ্ট উপবৃত্তাকার কক্ষপথে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে। এর মধ্যে বৃহত্তম হচ্ছে বৃহস্পতি, তার পরেই শনির স্থান। শনির ব্যাস হচ্ছে ৭৫১০০ মাইল। শনির তিনটি বলয় ছাড়া নয়টি চাঁদও রয়েছে। ১০০ কোটি মাইলেরও বেশী দূরে থেকে এই গ্রহটি সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে। পৃথিবীর দিন-রাত্রির হিসাব অনুসারে ঐ গ্রহটির সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করতে লাগে প্রায় সাড়ে উনত্রিশ বছর।

অনেকেই আগে মনে করতেন, শনির সাদা উজ্জ্বল বলয়সমূহ কেলাসিত জলীয় বরফের দ্বারাই গঠিত। ঐ গবেষণাগারের ৬১ ইঞ্চি টেলিস্কোপের সাহায্যে এই বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। ১৯শে ও ২১শে নভেম্বর (১৯৬৯) ঐ বলয়গুলির অদৃশ্য অবলোহিত রশ্মি বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, এদের দ্বারা সূর্যের আলো বিশোষিত হয়—যেমন অ্যামোনিয়ার বরফের দ্বারা হয়ে থাকে। ঐ টেলিস্কোপটি তৈরি করেছেন আমেরিকার জাতীয় বিমান বিজ্ঞান ও মহাকাশ সংস্থা। এটি আমেরিকার দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের রাজ্য অ্যারিজোনার সান্টা ক্যাটালিনা পাহাড়ের উপর স্থাপিত

শনির বলয়ের ঐ অ্যামোনিয়া বরফের উৎস যে কোথায়, তা আজও উদ্‌ঘাটিত হয় নি। অনেকেই মনে করেন, এই গ্রহটি যখন ঠাণ্ডা হয়ে আসছিল, তখন এর উপরিভাগের অ্যামোনিয়া বাষ্প গ্রহের অভিকর্ষের টানে ঐ গ্রহ থেকে ছিট্‌কে বেরিয়ে আসে এবং সেগুলিই এর চার পাশে বরফাকারে রয়ে যায়। এই গ্রহের উপরিভাগে কিন্তু অ্যামোনিয়ার কোন চিহ্ন পাওয়া যায় নি।

তাহলে কোথা থেকে এল এই অ্যামোনিয়া? তার একমাত্র সম্ভাব্য উত্তর—মহাশূন্য থেকে গত কয়েক বছর ধরে এই বিষয়ে যে সকল তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে, তাতে জানা যায় যে, মহাকাশের তারকাসমূহের মধ্যবর্তী স্থান অ্যামোনিয়ার মত প্রচুর রাসায়নিক যৌগিক উপাদানে

ভর্তি। কিন্তু সৌরমণ্ডলীর আন্তগ্রহ এলাকায় এই রকম কোন উপাদানের সন্ধান পাওয়া যায় নি।

ডক্টর কুইপার এই প্রসঙ্গে বলেছেন যে, শনি গ্রহের বলয়সমূহ যে অ্যামোনিয়া বরফের দ্বারা গঠিত, এই বিষয়ে তিনি সুনিশ্চিত। কিন্তু মূল গ্রহে অথবা ঐ গ্রহ থেকে প্রতিফলিত আলোকে এর কোন সন্ধান পাওয়া যায় নি। এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন যে, ঐ বরফ বাষ্পাকারে গভীর মহাশূন্যে কেন যে উবে যাচ্ছে না, একই ভাবে বলয়ে রয়ে গেছে, তার কারণ ব্যাখ্যা করা কঠিন। শনির অবলোহিত রশ্মিসমূহ পর্যালোচনা করে জানা গেছে যে, পৃথিবীর তাপমাত্রার পরিমাণ অনুসারে ঐ সকল বলয়ের তাপমাত্রা ফারেনহাইট ডিগ্রির হিসাবে হিমাঙ্কেরও ৩০৮ ডিগ্রি নীচে, কিন্তু মহাশূন্যের তাপমাত্রা হলো ৪৬০ ডিগ্রীর নীচে। সুতরাং মহাশূন্যের তাপমাত্রার তুলনায় শনির বলয় উষ্ণতর।

ডক্টর কুইপার এই প্রসঙ্গে বলেছেন যে, অ্যামোনিয়া বরফ খুবই ঠাণ্ডা। তবে ঐ সকল বলয়ে জলীয় বরফের অস্তিত্বের জন্যেই হয়তো এরূপ উষ্ণতর মনে হতে পারে। এই গ্রহ সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধানের ফলে আরও জানা গেছে যে, কোটি কোটি বছর আগে পৃথিবীতে যেমন জীবনধারণের অনুকূল পরিমণ্ডলের সৃষ্টি হয়েছে, ঠিক সেই রকম পরিবেশ ও পরিমণ্ডল শনিগ্রহেও সৃষ্টি হচ্ছিল। কিন্তু সেই পথে বাধার সৃষ্টি হয় এবং তা আর সফল হয় নি।

নিয়ন্ত্রিত ক্ষেপণাস্ত্র

শ্রীভাস্কর মুখোপাধ্যায়

জল স্থল ও আকাশে যুদ্ধের সময়ে ব্যবহৃত নিয়ন্ত্রিত ক্ষেপণাস্ত্রের (Guided Missile) নিয়ন্ত্রণ প্রণালী ও ব্যবহারবিধি সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

প্রায় এক হাজার বছর আগে চীনদেশে প্রথম বারুদ আবিষ্কৃত হয়। প্রায় সেই সময়েই চীনা সৈন্যেরা যুদ্ধে প্রথম রকেট ব্যবহার করে। তারপর কয়েক শতাব্দী যুদ্ধক্ষেত্রে রকেটের সঙ্গে কামান, বন্দুক ইত্যাদির ব্যবহার প্রচলিত হয়। ভারতের টিপু সুলতান শ্রীরঙ্গপত্তনের যুদ্ধে ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রথম রকেট ব্যবহার করেন। সেই যুগের রকেটগুলি ছিল অতি সাধারণ, অনেকটা আজকালকার আতসবাজীর মত। সেগুলির লক্ষ্যভেদ ও ধ্বংসসাধনের ক্ষমতাও ছিল অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। ইতিমধ্যে কামান, বন্দুক প্রভৃতি আগ্নেয়াস্ত্রের প্রভূত উন্নতির ফলে রকেট বিজ্ঞান অবহেলিত হইতে থাকে এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় রকেট ছিল অনুপস্থিত।

লোকচক্ষুর অন্তরালে জার্মান-বিজ্ঞানীরা রকেট-বিজ্ঞানের যে প্রভূত উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন, তার প্রমাণ পাওয়া গেল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্যবহৃত V_2 ক্ষেপণাস্ত্রের দ্বারা (১৯৩৪-'৪৪ সালে)। এই V_2 রকেটগুলিই প্রকৃতপক্ষে আধুনিক নিয়ন্ত্রিত ক্ষেপণাস্ত্রের আদি সংস্করণ। মহাযুদ্ধের শেষে আমেরিকা, রাশিয়া প্রভৃতি মিত্র দেশগুলি V_2 ক্ষেপণাস্ত্রের ডিজাইনার, ইঞ্জিনীয়ার ও নক্সাকারদের (জাতিতে সবাই জার্মান) বন্দী করিয়া নিজেদের দেশে লইয়া যায়। তারপর সুরু হয়

আধুনিক নিয়ন্ত্রিত ক্ষেপণাস্ত্র উদ্ভাবনের এক তীব্র প্রতিযোগিতা।

নিয়ন্ত্রিত ক্ষেপণাস্ত্রের বিশেষত্ব এই যে, এই অস্ত্র দূরে অবস্থিত লক্ষ্যবস্তুর অভিমুখে একটি নির্দিষ্ট

১নং চিত্র

পথরেখা অনুসরণ করিয়া ছুটিয়া চলে। এই লক্ষ্যবস্তু যদি গতিশীল হয় অথবা ইহার অবস্থান পরিবর্তিত হয়, তাহা হইলে ক্ষেপণাস্ত্রের গতিপথও স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরিবর্তিত হয় এবং

২নং চিত্র

অবশেষে ইহা লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত করে। লক্ষ্যবস্তু হইতে ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ-স্থানের দূরত্ব কয়েক শত গজ (ট্যাঙ্ক-বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্রের ক্ষেত্রে) হইতে কয়েক হাজার মাইল (আন্তর্মহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র বা I. C. B. M-এর ক্ষেত্রে) হইতে পারে। সুতরাং দেখা যাইতেছে নিয়ন্ত্রিত ক্ষেপণাস্ত্রের চালচলন অনেকটা চিন্তাশক্তিবিশিষ্ট প্রাণীর মত।

যে পদ্ধতির সাহায্যে ক্ষেপণাস্ত্রটি লক্ষ্য স্থির রাখিয়া শত্রুর দিকে ধাবিত হয়, তাহার নাম গাইডান্স (Guidance)। এই গাইডান্স পদ্ধতির প্রকারভেদে নিয়ন্ত্রিত ক্ষেপণাস্ত্রগুলিকে নিম্নলিখিত শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়:—

(ক) ডিরেক্ট কমাণ্ড গাইডান্স (Direct Command Guidance)—এই প্রকার ক্ষেপণাস্ত্রের নিজস্ব কোন চিন্তাশক্তি নাই।

একজন অপারেটর উড্ডীয়মান ক্ষেপণাস্ত্রের সহিত বৈদ্যুতিক তারের সাহায্যে সংযোগ রক্ষা করেন এবং ইচ্ছামত উহার দিক পরিবর্তিত করিয়া

লক্ষ্যে আঘাত করেন। এই ধরণের ক্ষেপণাস্ত্র খুব ছোট ও অল্প পাল্লার (Range) হয়। ট্যাঙ্কবিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্রগুলি এই শ্রেণীতে পড়ে (১নং চিত্র)।

এই বেতার-সঙ্কেতের দ্বারা উৎক্ষিপ্ত এবং পরিচালিত হইয়া উড়ন্ত লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানে (২নং চিত্র)।
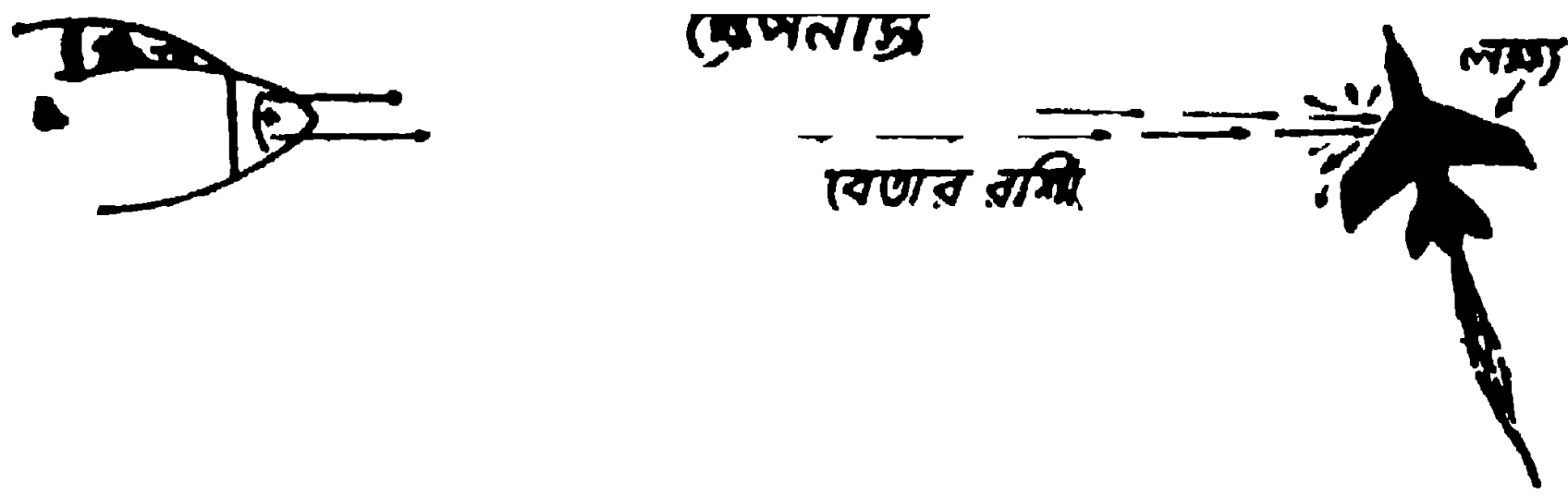
৩নং চিত্র

(খ) রেডার কমাণ্ড গাইডান্স (Radar Command Guidance)—এই গাইডান্স পদ্ধতি স্থল হইতে আকাশে নিক্ষেপযোগ্য ক্ষেপণাস্ত্রে (Surface to Air Missile, সংক্ষেপে SAM) ব্যবহৃত হয়। একটি রেডার যন্ত্র (এ) হ্রস্ব-তরঙ্গের বেতার-রশ্মি লক্ষ্যবস্তুকে সর্বদা অনুসরণ করে। লক্ষ্য হইতে প্রতিফলিত রশ্মিমালাকে একটি বিশেষ ধরণের ইলেকট্রনিক কম্পিউটার (বি) যন্ত্রের দ্বারা বিশ্লেষণ করিয়া প্রত্যেক মুহূর্তে লক্ষ্যটির ত্রিমাত্রার স্থানাঙ্ক (Co-ordinate in Space) নির্ধারণ করা হয় এবং এই তথ্য একটি ক্ষুদ্র তরঙ্গের বেতার প্রেরক-যন্ত্রের (সি) দ্বারা আঘাতকারী ক্ষেপণাস্ত্রে প্রেরণ করা হয়। ক্ষেপণাস্ত্রটি

(গ) বিম রাইডার গাইডান্স (Beam Rider Guidence)—এই ধরণের গাইডান্স পদ্ধতি বিমান হইতে বিমানে নিক্ষেপকারী ক্ষেপণাস্ত্রে (Air to Air Missile, সংক্ষেপে A. A. M.) ব্যবহৃত হয়। একটি সূক্ষ্ম বেতার রশ্মি আক্রমণকারী বিমান হইতে লক্ষ্যবস্তুর উপর পতিত হয় এবং এই বেতার রশ্মির গমন পথে (Track) ক্ষেপণাস্ত্রটিকে ছাড়িয়া দেওয়া হয় এবং ক্ষেপণাস্ত্রটি লক্ষ্যে আঘাত করে (৩নং চিত্র)।

৪নং চিত্র

সাধারণতঃ ক্ষেপণাস্ত্রের গতিবেগ লক্ষ্যবস্তুর (প্রায়শঃ জেট, জঙ্গী বা বোমারু বিমান) গতিবেগের কয়েক গুণ, ফলে খুব কমক্ষেত্রেই ক্ষেপণাস্ত্রটি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়।

(ঘ) অ্যাকটিভ হোমিং গাইডান্স (Active Homing Guidance)—এই ক্ষেত্রে ক্ষেপণাস্ত্রটির মধ্যেই একটি অতি ক্ষুদ্র তরঙ্গের (Microwave) বেতার প্রেরক ও গ্রাহক-যন্ত্র ও একটি নেভিগেশনাল কম্পিউটার থাকে।

৫নং চিত্র

৬নং চিত্র

সাধারণতঃ প্রেরক-যন্ত্র হইতে বেতার রশ্মি একটি বর্তুল প্রতিফলকের দ্বারা উড়ন্ত লক্ষ্যবস্তুতে নিক্ষেপ করা হয়। প্রতিফলিত বেতার রশ্মি পুনরায় বর্তুল প্রতিফলকের মাধ্যমে গ্রাহক-যন্ত্রে ফিরিয়া আসে। উড়ন্ত লক্ষ্যবস্তুর অবস্থান সংক্রান্ত তথ্য গ্রাহক-যন্ত্র হইতে নেভিগেশনাল কম্পিউটারে সরবরাহ করা হয়। কম্পিউটারটি ক্ষেপণাস্ত্রের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে পরিচালিত করে এবং অবশেষে তাহা অধিবৃত্তাকার পথ অতিক্রম করিয়া লক্ষ্যে বিস্ফোরণ ঘটায় (৪নং চিত্র)।

(ঙ) প্যাসিভ হোমিং গাইডান্স (Passive

Homing Guidance)—এই শ্রেণীর ক্ষেপণাস্ত্র উড্ডীয়মান লক্ষ্যবস্তু (সাধারণতঃ জেট বিমান) হইতে বিকিরিত তাপ-রশ্মি, শব্দ-তরঙ্গ অথবা লক্ষ্যবস্তু হইতে সৃষ্ট ইলেক্ট্রোস্ট্যাটিক অথবা ম্যাগ্‌নেটিক ফিল্ডকে (জেট বিমানের নোজ্‌ল্‌ হইতে বহিষ্কৃত গ্যাসপ্রবাহ নোজ্‌ল্‌ গাত্রের সহিত প্রবল ঘর্ষণের জন্য তড়িতাবিষ্ট হয়, ফলে চৌম্বক ক্ষেত্র বা ম্যাগ্‌নেটিক ফিল্ডের সৃষ্টি হয়) অনুভব করে।

ব্যালিষ্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ভূপৃষ্ঠে অবস্থিত স্থির লক্ষ্য-বস্তুতে (লক্ষ্যবস্তুর দূরত্ব অন্যূন ৩০০০-৪০০০ মাইল হয়) আঘাত করিবার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয় (৬নং চিত্র)।

যাত্রারম্ভের পূর্বেই ক্ষেপণাস্ত্রটির যাত্রাপথের সমস্ত তথ্য ক্ষেপণাস্ত্রস্থিত একটি বিশেষ ধরণের কম্পিউটারে প্রোগ্রাম করা থাকে। আকাশের কোন একটি বিশেষ তারকাকে ধ্রুবক (Reference) স্থির করিয়া লক্ষ্যাভিমুখে উড্ডীয়মান ক্ষেপণাস্ত্রটির
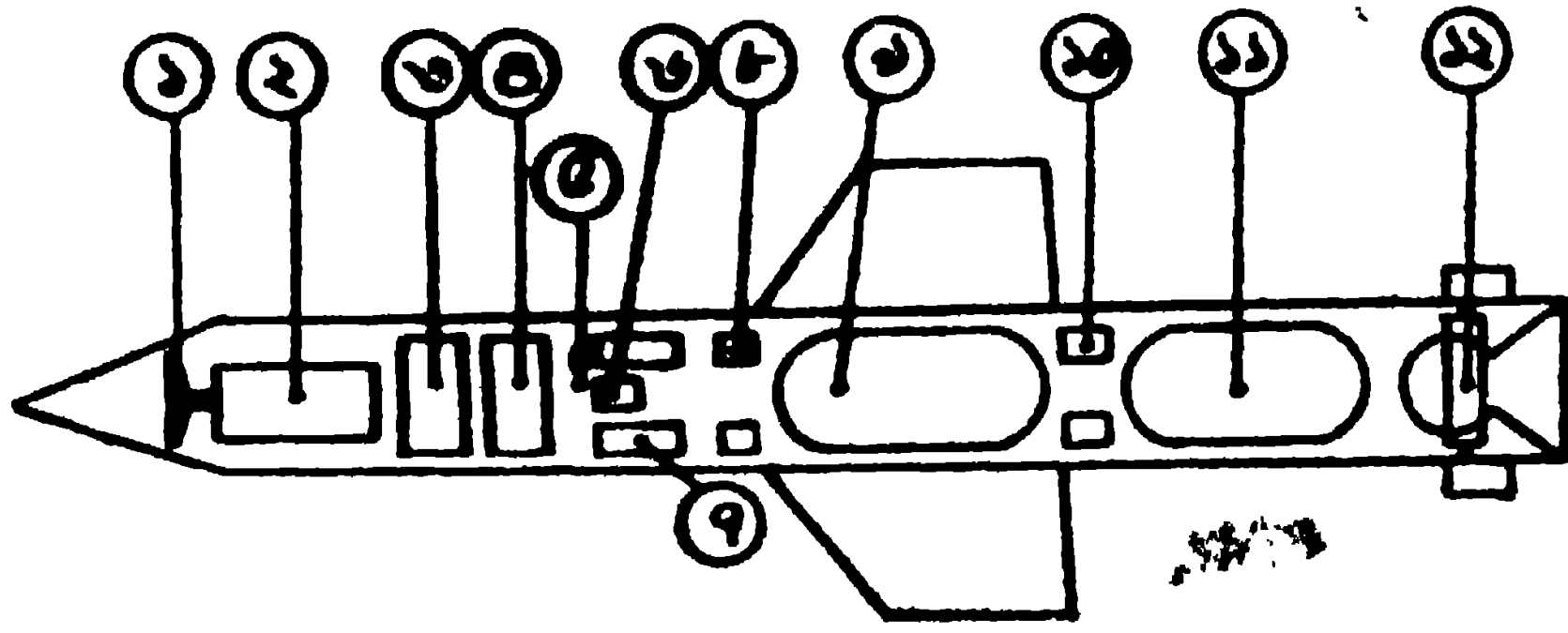
৭নং চিত্র

১। হোমিং ডিস, ২। গাইডান্স, ৩। বিস্ফোরক, ৪। জাইরোস্কোপ, ৫। অল্টারনেটর (এ. সি. ডায়নামো), ৬। ইলেক্‌ট্রো-হাইড্রলিক ট্র্যান্সডিউসার, ৭। হাইড্রলিক পাম্প, ৮। কম্প্রেষ্ট-এয়ার ট্যাঙ্ক, ৯। অক্সিড্যান্ট, ১০। টার্বো-পাম্প. ১১। জ্বালানী, ১২। নিয়ন্ত্রণ বলয়।

স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ক্ষেপণাস্ত্রটিকে লক্ষ্যাভিমুখে যাইতে সাহায্য করে।

এই ধরণের ক্ষেপণাস্ত্র সচরাচর জেট বিমানের উত্তপ্ত ইঞ্জিন (আর) হইতে বিকিরিত অবলোহিত রশ্মিমালাকে (বি) অনুভব করে এবং গ্রাহক-যন্ত্র (সি) এই কার্য সম্পাদন করে। ক্ষেপণাস্ত্রের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা (ডি) এই রশ্মির গতিপথের দ্বারা পরিচালিত হয়। এই ধরণের ক্ষেপণাস্ত্রের নাম ইনফ্রারেড হোমিং মিসাইল (Infrared Homing Missile) বা হিট্‌ সিকিং মিসাইল (Heat Seeking Missile—৫নং চিত্র)।

(চ) আন্তরীক্ষ গাইডান্স (Celestial Guidance)—সাধারণতঃ আন্তরীক্ষ গাইডান্স আন্তর্মহাদেশীয় বক্রগতি ক্ষেপণাস্ত্রে (Inter-continental Ballestic Missile, সংক্ষেপে I. C. B. M) ব্যবহৃত হয়।

প্রতি মুহূর্তের অবস্থান নির্ণয় করা হয়। সেই কারণে ক্ষেপণাস্ত্রের সঙ্গে একটি নক্ষত্র পর্য-বেক্ষক যন্ত্র (Star tracker) থাকে। ক্ষেপণাস্ত্রের যাত্রাপথের যাহাতে কোন আকস্মিক বিচ্যুতি না ঘটে, সেই জন্য ক্ষেপণাস্ত্রটির নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে একটি অটো-পাইলট ও একটি জাইরোস্কোপের সাহায্য লওয়া হয়।

এই ধরণের ক্ষেপণাস্ত্রে বহুস্তর (Multistage) এবং অনেক সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি থাকায় এক-একটির মূল্য হয় কয়েক কোটি টাকার মত। এই দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্রই মহাকাশযাত্রী রকেটের (Space Rocket) পূর্বগামী। ভবিষ্যৎ বিশ্বযুদ্ধে হাইড্রোজেন বোমাবাহী এই I. C. B. M-এর ব্যবহারে সমস্ত মানবজাতিই ধ্বংস হইয়া যাইবে।

৭নং চিত্রে ভূপৃষ্ঠ হইতে আকাশে উৎক্ষেপণযোগ্য ক্ষেপণাস্ত্রের গঠন-প্রণালী প্রদর্শিত হইয়াছে।

কার নিয়ন্ত্রিত ক্ষেপণাস্ত্রের বিভিন্ন তথ্য

নং	নাম	উৎপাদনকারী দেশ	ব্যবহার	দৈর্ঘ্য	ব্যাস	জ্বালানী	উইং স্প্যান	ওজন	গতিবেগ	পাল্লা
১	মাটরা এম ০৪	ফ্রান্স	স্থল হইতে আকাশে (SAM)	১৫ ফুট ১ইঃ	১৬ ইঃ	তরল	৫ ফুট ১০ ইঃ	১০০০ পাঃ	১১০০ মাইল/ঘঃ	৫ মাইল
২	অ্যাটলাস	যুক্তরাষ্ট্র	স্থল হইতে স্থলে (আই. সি. বি. এম)	১০০ ফুট	৫ ফুট	তরল	—	১০,০০০ পাঃ	১১৪০০ মাইল/ঘঃ	৫০০০ মাইল
৩	সাইডওয়াইণ্ডার	যুক্তরাষ্ট্র	আকাশ হইতে আকাশে (AAM)	৯ ফুট ২ ইঃ	৫ ইঃ	কঠিন	১ ফুট ৭ ইঃ	১৫৯ পাঃ	১৫০০ মাইল/ঘঃ	৫ মাইল
৪	ওরলিকন ৫৪	সুইজার-ল্যাণ্ড	স্থল হইতে আকাশে (SAM)	১৯ ফুট	১৫¾ ইঃ	তরল	৪ ফুট ৭ইঃ	৮২৫ পাঃ	১৪০০ মাইল/ঘঃ	১০ মাইল
৫	নর্ড ৫২০০	ক্যানাডা	স্থল হইতে আকাশে (SAM)	৩ ফুট	৭ ইঃ	কঠিন	২ফুট ৬ ইঃ	৩৫ পাঃ	২৫০ মাইল/ঘঃ	২ মাইল

মাটির উর্বরতা

শ্রীহৃষীকেশ চৌধুরী *

প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্বে চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে গ্রীকদূত মেগাস্থিনিসের বর্ণনায় ভারতবর্ষের মাটির উর্বরতা ও জমিতে ফলনের পরিমাণের যে ইতিহাস পাওয়া যায়, তাহা আমাদের গর্বের বিষয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, অতীতের সেই কৃতিত্ব বর্তমানে আর নাই। নিম্নে কয়েকটি দেশের একর প্রতি ফলনের পাউণ্ড পরিমাণ দেওয়া গেল—তুলনামূলকভাবে বিচার করিলে কৃষিক্ষেত্রে ভারতবর্ষ আজ কোথায়, তাহা লক্ষ্য করা যাইবে।

(১) ধান—অষ্ট্রেলিয়া (৫,৪৪২), সংযুক্ত আরব রিপাবলিক (৪,৪৭০), জাপান (৪৩৩৬), ইটালী (৪,২৯১), আমেরিকা (৩,৪২৬), মাদ্রাজ (২,০১৮), পশ্চিম বাংলা (১,৫৮৪)।

(২) গম—নেদারল্যাণ্ড (৪,১৫৭), ইংল্যাণ্ড (৩,১৮৫), জাপান (২,২৬৬), সংযুক্ত আরব রিপাবলিক (২,১৮৯), পাঞ্জাব (১০৬২), মধ্য প্রদেশ (৫৭৭)।

(৩) আলু—নেদারল্যাণ্ড (২৪,৭১৩), বেলজিয়াম (২১,৪১২), ইংল্যাণ্ড (১৯,৩৬০), জাপান (১৫,৫২৩), পশ্চিম বাংলা (৮,৮০৬), আসাম (৪,২৪৪)।

অজ্ঞতা, অলসতা, পরিশ্রমবিমুখতা ও উদাসীন মনোবৃত্তির জন্যই ভারতবর্ষের কৃষির বর্তমানে এই অবস্থা। জমিতে শুধু কিছু সার প্রয়োগ ও জমি কর্ষণ করাকে বর্তমান যুগে আর কৃষিকাজ বলা উচিত নয়, কারণ জমির উর্বরতা অক্ষুন্ন রাখিতে হইলে আরও অনেক পদ্ধতির প্রতি দৃষ্টি রাখা অবশ্যই কর্তব্য।

জমির উৎপাদিকা শক্তি সাধারণতঃ মাটির উর্বরতা, নিয়মিতভাবে ফসলে জলসেচন, মাটির অভ্যন্তরে জলের স্থায়ী স্তরের গভীরতা, স্থানীয় জলবায়ু এবং সেই সঙ্গে উত্তম কৃষি পদ্ধতি প্রভৃতি কতকগুলি কারণের উপরই নির্ভরশীল। মাটির উৎপাদিকা শক্তি যদিও মাটির উর্বরতার উপরই নির্ভর করে বেশী, তবে ইহা সত্য যে, প্রয়োজন অনুসারে উদ্ভিদ জল না পাইলে শুধু উর্বরতার দ্বারা জমির উৎপাদন বাড়ান যায় না। সেই জন্য ফসলের প্রয়োজন অনুসারে জলসেচন কৃষির সফলতার জন্য অনেকাংশে দায়ী।

কয়েকটি কারণের উপর জমির উর্বরতা নির্ভরশীল। সুতরাং এই বিষয়ে কেহ সচেষ্ট হইলে অবশ্যই সুফল পাইবার কথা।

(১) উত্তম কর্ষণ—আধুনিক কৃষিবিদ্যার জনক জেথ্রো টাল (১৬৭১-১৭৪১) বলিয়াছেন যে, কর্ষণই সার (Tillage is manure)। জেথ্রো টাল বিশ্বাস করিতেন যে, মাটিকে উত্তমরূপে কর্ষণ করিয়া সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কণায় পরিণত করিতে পারিলে উদ্ভিদ সোজাসুজি ঐ কণাগুলি হইতে খাদ্য শোষণ করিতে পারে। উত্তম কর্ষণের মাধ্যমে ঝুরঝুরে ও উপযুক্ত পিণ্ডের মত মাটি সৃষ্টি করা, যাহাতে বায়ু ও জল সহজে যাতায়াত করিতে পারে। ইহার ফলে ভূমির ক্ষয় (ক্ষয়ীভবন) নিবারণ করা সম্ভবপর হয় এবং উর্বরতা অক্ষুণ্ণ থাকে।

(২) আগাছা দমন—অস্থানে যে উদ্ভিদ দেখা যায়, তাহাই আগাছা। এই দৃষ্টিভঙ্গীতে

---

* কৃষিবিভাগ, স্নাতকোত্তর বুনিয়াদি শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়, আগরতলা, ত্রিপুরা।

আলুর ফসলে, বেগুন কিংবা পাটের ফসলে অতিরিক্ত বা অপ্রয়োজনীয় পাট, যাহা জমি হইতে তুলিয়া ফেলা হয়, তাহাদেরও আগাছা বলা হইয়া থাকে। আগাছার দরুণ জমি অনুর্বর হইয়া পড়ে, কারণ জমির খাদ্য ও রস আগাছা গ্রহণ করে। সেই জন্য আগাছাগুলিকে ফসলের প্রথম অবস্থায় উচ্ছেদ করিলে মাটির উর্বরতা অক্ষুণ্ণ থাকে।

(৩) পর্যায়ক্রমে শস্যের চাষ—একই ফসল কোন জমিতে ক্রমান্বয়ে চাষ করিলে জমির উর্বরতা হ্রাস পাইতে দেখা যায়। যেমন কোন একটি জমিতে বার বার শুধু ধানের চাষ করিলে জমিতে নাইট্রোজেনের পরিমাণ অবশ্যই কমিয়া যাইবে, কারণ ধানের চাষে নাইট্রোজেনের প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী। সেই জন্য বার বার একই জমিতে ধানের চাষ না করিয়া ছোলা, মুগ, বরবটি, বেগুন ইত্যাদি শস্যের চাষ করিয়া উদ্ভিদ-খাদ্যে একটা সমতা রক্ষা করিবার ফলে মাটির উর্বরতা অক্ষুণ্ণ থাকে। তাহা ছাড়া একই ফসলের উদ্ভিদের মূলবিন্যাস একই প্রকারের হইবে এবং ইহার ফলে মূল মাটির একটি নির্দিষ্ট স্তরে হইতে খাদ্য আহরণ করিবে। সেই জন্য মাটি শীঘ্রই একটি নির্দিষ্ট স্তরে বিভক্ত হইয়া যাইবে। কিন্তু উদ্ভিদের মূলের নীচের স্তরে অব্যবহৃতরূপে প্রচুর উদ্ভিদ-খাদ্য থাকিয়া যাইবে। এইসব ছাড়া বিশেষভাবে শিমজাতীয় উদ্ভিদের, যেমন ছোলা, কলাই, বরবটি ইত্যাদির চাষ আবর্তন করিলে জমির উর্বরতা বজায় থাকে। কারণ এইসব ফসলের চাষ করিলে উহাদের মূলে এক ধরণের ব্যাক্টিরিয়া বাসা বাঁধে, যাহারা বাতাস হইতে সরাসরি নাইট্রোজেন গ্রহণ করিয়া উদ্ভিদকে সরবরাহ করে ও উদ্বৃত্ত নাইট্রোজেন উদ্ভিদমূলে অর্বুদরূপে (Nodule) লক্ষ্য করা যায়। উত্তম কর্ষণের সাহায্যে এই জাতীয় উদ্ভিদকে মূলসহ মাটির সঙ্গে বর্ষাকালে মিশাইয়া দিলে মাটিতে জৈব পদার্থের সহিত অতিরিক্ত নাইট্রোজেন মিশ্রণের জন্য উর্বরতা বৃদ্ধি পায়। শস্যপর্যায় বলিলে ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন প্রকার শস্য ও ঘাস, (ধান, গম ইত্যাদি) সবুজ সারের (ছোলা, মটর, কলাই, বরবটি ইত্যাদি) চাষের আবর্তন করাকেই বুঝায়। একই জমিতে বার বার একই ফসলের চাষ করিলে ফসলে নানারূপ রোগ ও ক্ষতিকর কীট-পতঙ্গের প্রাদুর্ভাব ঘটে এবং জমির উৎপাদিকা শক্তি অনেক কমিয়া যায়। শস্যপর্যায়ের মাধ্যমে রোগ বা কীট-পতঙ্গের আক্রমণ হইতে উদ্ভিদকে রক্ষা করা যাইতে পারে। কারণ ধান গাছে যে কীট-পতঙ্গ বা রোগের আক্রমণ লক্ষ্য করা যায়, অন্য কোন ফসলে সেই সকল পোকা বা রোগ লক্ষ্য করা যায় না। সেই জন্য উপযুক্ত ফসলের আবর্তনের দ্বারা জমির উর্বরতা রক্ষা বা বৃদ্ধি করা সম্ভবপর হয়।

(৪) উদ্ভিদ ধ্বংসকারী কীট-পতঙ্গ ও রোগ দমন—মাঝে মাঝে বিভিন্ন ধরণের উদ্ভিদের ক্ষতিকর কীট-পতঙ্গ ও রোগের আক্রমণে ফসল সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হইয়া যায় এবং জমির উর্বরতাও কমিয়া যায়।

উদ্ভিদে কীট-পতঙ্গের আক্রমণ লক্ষ্য করিলে ঔষধ ছিটাইয়া আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে হইবে। জমির ফসল তুলিবার পর নির্দিষ্ট সময়ে উত্তমরূপে কর্ষণ ও জমির চারিপাশের জঙ্গল পোড়াইয়া ফেলিলে কীট-পতঙ্গের ডিম সমূলে বিনষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং কীট-পতঙ্গ দমনের উপর জমির উর্বরতা আংশিকভাবে নির্ভর করে।

বহিরাগত কোন জৈব বস্তু হইতে বা জীবনধারণের পক্ষে প্রতিকূল পরিবেশের ফলে উদ্ভিদও ব্যাধিগ্রস্ত হইতে পারে। উদ্ভিদ সাধারণতঃ তিন ভাবে রোগের দ্বারা আক্রান্ত হয়।

ছত্রাক-রোগ—ছত্রাকের দ্বারা আক্রান্ত উদ্ভিদের দেহে সাধারণতঃ পচনজনিত বিভিন্ন ধরণের চিহ্ন লক্ষ্য করা যায়। সময়মত আক্রমণ লক্ষ্য করিয়া

রোগ প্রতিরোধের ব্যবস্থা করিলে রোগের আক্রমণ কিছুটা প্রতিরোধ করা যায়। ফসলের একটি উদ্ভিদে সামান্যতম রোগের আক্রমণ লক্ষ্য করিলে সমস্ত উদ্ভিদে ছত্রাক ধ্বংসকারী ঔষধ প্রয়োগের দ্বারা রোগ প্রতিরোধ করিতে হইবে। একটি রোগাক্রান্ত উদ্ভিদ হইতে ছত্রাকের বীজরেণু অতি সহজে কিছুক্ষণের মধ্যে সমস্ত উদ্ভিদে ছড়াইয়া রোগ সংক্রমণের আশঙ্কা থাকে। ছত্রাকের বংশ বিস্তারের উপযোগী পরিবেশ হইতে উদ্ভিদকে রক্ষা করিবার জন্য নিম্নোক্ত কয়েকটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা দরকার।

(ক) প্রয়োজনের অতিরিক্ত জৈব সার মাটিতে প্রয়োগ না করা ও মাটিতে যেন জল না জমে।

(খ) নীরোগ, পুষ্ট, সুপক্ক বীজ সংগ্রহ করা ও বীজ বপনের আগে বীজ শোধন করা ও সম্ভব হইলে রোগ-প্রতিরোধক বীজ ব্যবহার করা।

(গ) ফসল তুলিবার পর জমি উত্তমরূপে কর্ষণ করা ও জমিতে রৌদ্র লাগাইবার ব্যবস্থা করা। তাহা ছাড়া ফসলের মাটি নিড়ানির দ্বারা সর্বদা ওলট-পালট করা উচিত, তাহাতে মাটিতে অবস্থিত ছত্রাকের বীজরেণু বিনষ্ট হয়।

(ঘ) উদ্ভিদের জীবনধারণের উপযোগী খাদ্য, যাহা তাহার বৃদ্ধি ও সুষ্ঠু জীবনধারণের পক্ষে প্রয়োজনীয়, তাহা সর্বদা সরবরাহ করিবার ব্যবস্থা করা ও বিশেষভাবে পটাসের অভাবে উদ্ভিদ ছত্রাক-রোগের দ্বারা আক্রান্ত না হয়, সেই বিষয়ে সচেতন থাকা।

ভাইরাস-রোগ—ভাইরাস আক্রমণের ফলে জাত রোগের উপসর্গের মধ্যে প্রধানতম হইতেছে উদ্ভিদের বৃদ্ধি বন্ধ, পাতার বিবর্ণতা, পাতা ছোট ও মোটা হওয়া ইত্যাদি। উদ্ভিদে ভাইরাসের আক্রমণ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইলে ফসল তুলিয়া পুড়াইয়া ফেলা উচিত ও জমিকে উত্তমরূপে কর্ষণ এবং রৌদ্রস্নাত করিয়া মাটি শোধন করা উচিত। পরের বৎসর এই জমিতে কোন ফসলের চাষ করাও উচিত নয়।

খাদ্যের অভাবজনিত রোগ—উদ্ভিদের দেহে প্রয়োজনীয় খাদ্য-উপাদানের অভাব ঘটিলে উদ্ভিদ-দেহে খাদ্যের তারতম্য অনুসারে বিভিন্ন ধরণের উপসর্গ পরিলক্ষিত হয়। এই সব উপসর্গ দেখিয়া তদনুযায়ী খাদ্যরূপ সার মাটিতে প্রয়োগ করিলে উদ্ভিদের রোগের উপসর্গ বা লক্ষণগুলি দূরীভূত হয়।

(৫) উপযুক্ত পরিমাণে উদ্ভিদ-খাদ্যের উপাদান সরবরাহ—উদ্ভিদের প্রয়োজনীয় দশটি খাদ্য-উপাদানের মধ্যে চারটি খাদ্য-উপাদান অর্থাৎ নাইট্রোজেন, ফস্‌ফরাস, পটাসিয়াম ও ক্যালসিয়াম উদ্ভিদ প্রচুর পরিমাণ গ্রহণ করে এবং যে সব মাটিতে নিয়মিতভাবে শস্য চাষ করা হইয়া থাকে, সেই সকল ফসলের মাটিতে এই খাদ্য-উপাদানগুলির অভাব পড়ে। উপযুক্ত পরিমাণ উদ্ভিদ-খাদ্যের উপাদান মাটিতে সরবরাহ করা ছাড়াও খাদ্য উপাদানগুলি যাহাতে জমি হইতে উদ্ভিদ অনায়াসে গ্রহণ করিতে পারে তাহার জন্য উত্তমরূপে কর্ষণের দ্বারা মাটিতে উপযুক্ত বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা ও জল সরবরাহ নিয়ন্ত্রণের দ্বারা খাদ্যের উপাদানগুলিকে উদ্ভিদের গ্রহণযোগ্য অবস্থায় পরিণত করা উচিত। মাটিতে ক্যালসিয়ামের (চুন) পরিমাণও নিয়ন্ত্রণ করা দরকার, কারণ পরিমিত ক্যালসিয়াম মাটির অগ্রহণযোগ্য খাদ্যের উপাদানগুলিকে উদ্ভিদের গ্রহণযোগ্য অবস্থায় পরিবর্তিত করে এবং মাটিতে কতকগুলি উপকারী ব্যাক্টিরিয়ার বংশবৃদ্ধিতে সাহায্য করে। এইভাবে জমির উর্বরতা রক্ষা ও বৃদ্ধি করা যাইতে পারে।

(৬) জৈব পদার্থ প্রয়োগ—জৈব পদার্থ উদ্ভিদের পক্ষে একটি সুষম খাদ্য। উদ্ভিদের প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয় খাদ্যের উপাদান সকল জৈব পদার্থে পাওয়া যায়। উদ্ভিদের খাদ্য-উপাদানগুলি জৈব

পদার্থে জটিল অবস্থায় থাকে বলিয়া মাটিতে প্রয়োগ করা মাত্র উদ্ভিদের গ্রহণযোগ্য অবস্থায় পরিণত হইতে পারে না। সেই জন্য তাহা বীজ বপন বা রোপণের আগে জমি প্রস্তুতির সঙ্গে মাটিতে প্রয়োগ করিতে হয়। রাসায়নিক সারের ব্যবহার বর্তমান যুগে প্রচলিত হইয়াছে। যদিও তাহা হইতে উদ্ভিদ নিজের পুষ্টি সাধনের জন্য উপযুক্ত খাদ্য পায়, তথাপি কয়েকটি বিষয় চিন্তা করিয়া রাসায়নিক সার ব্যবহারে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। ক্রমাগত শুধু রাসায়নিক সার ব্যবহারে জমিতে প্রচুর পরিমাণে নাইট্রেট উৎপন্ন হয়, ইহা বৈজ্ঞানিক গবেষণায় প্রমাণিত হইয়াছে। নাইট্রেট উপচায়ক (Oxidising agent) আবার অন্যদিকে হিউমাস বিয়োজন করে ও তাহাতে মাটির উৎপাদিকা শক্তিও ক্রমশঃ হ্রাস পায়।

জৈব পদার্থ প্রয়োগে অনুর্বর জমিও উর্বর জমিতে পরিবর্তিত হইয়া থাকে। শক্ত ও আঠালো মাটি এই সারের ব্যবহারে নরম হইয়া আসে ও তাহাতে উদ্ভিদের খাদ্য-সংগ্রাহক শিকড়ের পক্ষে মাটির অভ্যন্তরে প্রবেশ করা সহজসাধ্য হয়। বালিপ্রধান জমিতে এই সার ব্যবহারে জমির ঘনবদ্ধতা বৃদ্ধি পাইবার জন্য ইহাতে আবার জমির জলধারণের ক্ষমতাও বৃদ্ধি পায়। অন্য দিকে জৈব পদার্থ জমির উপকারী জীবাণু বৃদ্ধির সহায়ক। বর্তমানে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় প্রত্যক্ষ করা গিয়াছে যে, এই সকল জীবাণু বর্ধনশীল উদ্ভিদকে খাদ্য সংগ্রহে সাহায্য করে এবং অক্সিন সরবরাহ করে। উদ্ভিদের নানাবিধ রোগ-প্রতিরোধক হিসাবে ইহা অপরিহার্য। জৈব পদার্থস্থিত উদ্ভিদের খাদ্য-উপাদানগুলি অদ্রবণীয় অবস্থায় থাকে বলিয়া বৃষ্টির জল বা অন্য কোন উপায়ে সহজে নষ্ট হইয়া যায় না। জৈব পদার্থ প্রয়োগে মাটির বাফারিং ক্যাপাসিটি (Buffering Capacity) বৃদ্ধি পায়, অর্থাৎ অম্লত্ব ও ক্ষারত্ব সহজে কমিতে বা বাড়িতে দেয় না ও মাটিকে নিরপেক্ষ অবস্থায় রাখিতে সাহায্য করে। ইহার ফলে মাটি উত্তম চাষের উপযোগী থাকে। মাটিতে জৈব পদার্থ প্রয়োগ করিবার সময় একটি বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন অবশ্য করণীয়, যেমন জৈব পদার্থ মাটিতে প্রয়োগের উপযুক্ত হইয়াছে কিনা দেখিতে হইবে ও প্রয়োগের পরিমাণ যেন প্রয়োজনের অতিরিক্ত না হয়। মাটির উর্বরতা সংরক্ষণে জৈব পদার্থের প্রয়োগ অতীব প্রয়োজনীয়।

(৭) মাটির উপযুক্ত অম্লত্ব ও ক্ষারত্ব সংরক্ষণ—মাটিতে উপযুক্ত অম্লত্ব ও ক্ষারত্ব সংরক্ষণের দ্বারা মাটির উর্বরতা অক্ষুণ্ণ রাখাই একটি প্রকৃষ্ট উপায়। বিভিন্ন জাতীয় ফসল বিভিন্ন প্রকার অম্লত্ব ও ক্ষারত্বের মাধ্যমে বাঁচিয়া থাকে; যেমন ধান, গম, আলু, চা, চীনাবাদাম, তামাক ইত্যাদি অল্প অম্লাত্মক মাটিতে ভ'ল জন্মে। আবার তুলা, টম্যাটো, বীট ইত্যাদি ক্ষারধর্মী মাটিতে ভাল জন্মে। সুতরাং ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি শুধু জমির উর্বরতার উপরই একমাত্র নির্ভর করে না, সেই সঙ্গে জমি ও ফসলের প্রকৃতি বুঝিয়া চাষ-আবাদ করা উচিত। মাটির অম্লত্ব অথবা ক্ষারত্ব বেশী হইলে উদ্ভিদ তাহার প্রয়োজনীয় খাদ্যের উপাদানগুলি মাটি হইতে গ্রহণ করিতে অক্ষম হয়, কারণ উদ্ভিদের খাদ্যের উপাদানগুলি তখন তাহার পক্ষে গ্রহণযোগ্য অবস্থায় থাকে না। অম্লত্ব বা ক্ষারত্ব কমিয়া মাটি নিরপেক্ষ অবস্থায় থাকিলে প্রায় সকল প্রকার উদ্ভিদের চাষের পক্ষেই উপযুক্ত হয়।

সাধারণতঃ বৃষ্টিপাত যে সব স্থানে বেশী সেই সব অঞ্চলের মাটি অম্লাত্মক। সেই জন্যই ভারতের পূর্ব অঞ্চলের মাটি সাধারণতঃ অম্লাত্মক। কারণ বৃষ্টিপাত বেশী হইবার জন্য নিঃসরণের মাধ্যমে মাটিতে দ্রবণীয় চুন (ক্যালসিয়াম), ম্যাগ্নেসিয়াম, পটাসিয়াম এবং সোডিয়াম মাটির

উপরের স্তর হইতে সরিয়া যায় এবং অদ্রবণীয় অম্লাত্মক পদার্থ, যাহা সিলিকন, অ্যালুমিনিয়াম এবং লৌহের মাধ্যমে গঠিত, সেইগুলি মাটিতে সঞ্চয়ের জন্য মাটি অম্লাত্মক হইয়া যায়। অম্লাত্মক মাটিতে উদ্ভিদের খাদ্য-উপাদান, যথা—ফস্‌ফরাস, ক্যালসিয়াম, ম্যাগ্নেসিয়াম, লৌহ, ম্যাঙ্গানিজের উপস্থিতি অল্প লক্ষ্য করা যায়। উদ্ভিদের উপকারী ব্যাক্টিরিয়াও অম্লাত্মক মাটিতে সুন্দর ভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে পারে না। সেই জন্য কোন মাটিতে চাষ করিতে হইলেই মাটি অম্লাত্মক, না ক্ষারধর্মী, তাহা সর্বপ্রথমে জানা দরকার। সরকারী কৃষি বিভাগের মাটি পরীক্ষা কেন্দ্রে মাটি পাঠাইয়া সব খবরই ভালভাবে জানিতে পারা যায়। তাহা ছাড়া নিজেরা ইচ্ছা করিলে মাটির সামান্য পরিচয় জানিতে পারেন। যে বাগানের মাটি পরীক্ষা করিতে হইবে সেই বাগানের মাটি ৬ ইঞ্চি গভীর করিয়া বিভিন্ন স্থান হইতে মাটি সংগ্রহ করিয়া একত্রে মিশাইয়া এবং তাহা হইতে সামান্য অংশ পাত্রে লইয়া জলদ্বারা মিশ্রিত করিয়া তাহাতে লিটমাস পেপার প্রবেশ করাইতে হইবে। মাটি যদি অম্লাত্মক হয়, তবে লিটমাস পেপারের রঙ পরিবর্তিত হইবে। সামান্য অম্লাত্মক মাটিতে ফসল হইলেও বেশী অম্লাত্মক মাটি চাষের পক্ষে সম্পূর্ণ অযোগ্য। এই অবস্থায় অম্লত্ব দূরীকরণ ছাড়া জমিতে কোন ফসল ফলানো আর সম্ভব হয় না।

মাটির অম্লত্ব দূর করিতে হইলে প্রতি বর্গগজ অম্লাত্মক মাটিতে ২।১ বছর অন্তর ৮ আউন্স মরা চুন একক ভাবে জমি প্রস্তুতির সঙ্গে প্রয়োগ করিতে হইবে। চুনের সঙ্গে অন্য কোন সার দেওয়া উচিত নয় ও এক মাস মাটিকে বিশ্রাম দিবার পর অন্য কোন সার প্রয়োগ করা যাইতে পারে। ক্ষারত্ব অম্লত্বের মত সহজে দূর করা যায় না, তবে জমিতে জলসেচন এবং গন্ধক বা জিপ্‌সাম প্রয়োগে মাটির ক্ষারত্ব কমিতে দেখা যায়, তখন জমিতে ফসলের চাষ করা হয়।

মাটির অম্লত্ব বা ক্ষারত্ব মাপা হয় pH-এর মাধ্যমে। pH ৭-এর অর্থ নিরপেক্ষ মাটি। pH যদি ৭-এর কম হয়, তাহা হইলে বুঝা যাইবে মাটি অম্লাত্মক ও pH ৭-এর বেশী হইলে ইহার অর্থ মাটি ক্ষারধর্মী। উর্বর মাটির pH সব সময়ই ৭-এর ধারে কাছে থাকে ও সেই জন্য মাটির অম্লত্ব ও ক্ষারত্বের উপরই মাটির উর্বরতা অনেকাংশে নির্ভর করে।

৮। মাটির ক্ষয় নিবারণ বা সংরক্ষণ—উপরের স্তরে ৬ ইঞ্চি মাটিতে উদ্ভিদের-খাদ্য-উপাদান বেশী থাকে। যদি কোন ভাবে উপরের স্তরের মাটি বৃষ্টির জল বা প্রবল বায়ু প্রভৃতির দ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া স্থানান্তরিত হয়, তবে মাটি ক্রমশঃ রুক্ষ হইয়া অনুর্বর হইয়া পড়ে এবং চাষের পক্ষে অনুপযুক্ত হয়।

১৯৬৮ সালে হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ভারতে মোট খাদ্যশস্যের প্রয়োজন তখন ছিল ১০ কোটি টন, কিন্তু আমাদের দেশের খাদ্যশস্যের উৎপাদন হয় ৮ কোটি টনের মত বা কিছু উপরে। ভারতে মোট জমির পরিমাণ ৮০·৬ কোটি একর এবং ইহার মধ্যে মাত্র ৩২·৫ কোটি একর জমি চাষ-আবাদের উপযোগী। এই অবস্থায় ও ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপে খাদ্য আমদানী ছাড়া অন্য কোন উপায় বর্তমানে নাই। জমির উপযুক্ত ব্যবহার ও বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে উৎপাদিকা শক্তি অক্ষুন্ন রাখিলে দেশে খাদ্যের অভাব হওয়া উচিত নয়। বিশিষ্ট ভূমি-সমীক্ষক বৈজ্ঞানিক ডক্টর এন. আর. দত্তবিশ্বাস দিল্লীতে এক সাক্ষাৎকারে বলিয়াছিলেন, যে পরিমাণ জমি ও জলসম্পদ ভারতে অবস্থিত, তাহা সুষ্ঠুভাবে কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করিলে বর্তমানে খাদ্য-সমস্যার সমাধান হইবার কথা। এই প্রসঙ্গে ভারতের ভূমি সংরক্ষণের উপর

গতি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হয়ে আসবে। বস্তুর গতি যে দিকে, মাপকাঠির সঙ্কোচনও দেখা দেবে সেই দিকে। একই সঙ্গে তার ভরও বেড়ে যাবে। এই সকল গাণিতিক সিদ্ধান্তগুলিকে সংক্ষেপে প্রকাশ করা হয় এই ভাবে—

$$l-l_0 \sqrt{1-v_2/c_2},\ m \qquad \frac{m_0}{\sqrt{1-v_2/c_2}}$$

যেখানে l, m, এবং v বস্তুর দৈর্ঘ্য, ভর এবং গতিবেগ; l_0, m_0 হলো বস্তুর দৈর্ঘ্য এবং ভর যখন তার কোন গতি না থাকে, c হলো আলোর গতিবেগ।

আইনষ্টাইনের অনেক বছর পর বিভিন্ন পরীক্ষায় এই সকল সিদ্ধান্তের সমর্থন কিছু কিছু পাওয়া গেছে। যেমন—প্রোটন-সিনক্রোট্রন যন্ত্র থেকে যখন প্রোটন কণা প্রচণ্ড গতিবেগে বেরিয়ে আসে, তার ভর স্বাভাবিক অবস্থার চেয়ে বেশী হয় বলে প্রমাণিত হয়েছে। মহাকাশে মেসন নামে যে কণা পাওয়া যায়, তারা অত্যন্ত দ্রুত ধাবমান অবস্থায় থাকে। দেখা গেছে, তাদের ভর সাধারণ মেসন কণার চেয়ে

সময় সম্পর্কে আইনষ্টাইনের গাণিতিক পর্যালোচনা এক অভিনব ধারণায় অবতারণা করেছে। এতে বলা হয়েছে, কোন দ্রুত চলমান বস্তুর সঙ্গে একটি ঘড়ি বেঁধে দিলে স্থিতিশীল ঘড়ি থেকে তা আলাদা তালে চলতে থাকবে। বস্তুর গতি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ঘড়িটির কাঁটার গতিও কমতে থাকবে। চলমান বস্তুটি আলোকের গতিতে চলতে থাকলে ঘড়িটি সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যাবে।

অনুরূপভাবে কোন ব্যক্তি যদি দ্রুত গতিতে চলতে থাকে, তবে তার দৈহিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়া এবং হৃদ্‌স্পন্দনের গতিবেগও কমে আসবে। ফলে সময়ের গতিবেগ তার কাছে স্থির অবস্থার চেয়ে আস্তে বলে মনে হবে। মনে করা যাক, একজন যুবক প্রচণ্ড গতিশীল (ধরা যাক, আলোর গতিবেগের অর্ধেক) কোন মহাকাশযানে চড়ে মহাকাশ অভিযানে গেলেন। আর তার বন্ধু পৃথিবীতে বসে বছর বছর অপেক্ষা করতে লাগলেন। ধরা যাক, পৃথিবীর বন্ধুর বয়স যখন আরো ৩০ বছর বেড়ে গেছে, তখন মহাকাশযাত্রী মহাকাশ অভিযান শেষ করে পৃথিবীতে ফিরে এলেন। দেখা যাবে যে, হয়তো মহাকাশযাত্রীর বয়স মাত্র ৫ বছর বেড়েছে। গতিশীল মাপকাঠির সংকোচন, ঘড়ি আস্তে চলা, মানুষের দৈহিক ক্রিয়া মন্থর হওয়া প্রভৃতির সত্যতা এখনও প্রমাণিত হয় নি, তবে প্রমাণ করবার চেষ্টা হচ্ছে।

জ্যোতির্বিদেরা গাণিতিক বিশ্লেষণ করে দেখেছেন যে, ৫০০০ কোটি বছর পরে সূর্যের তাপমাত্রা এমন পর্যায়ে পৌঁছুবে যে, পৃথিবীর উপরের জল তখন ফুটতে সুরু করবে। ফলে তার বহু আগেই মানুষের সভ্যতার অবস্থা যে কি হবে, তা সহজেই অনুমেয়। অবশ্য মানুষ ইতিমধ্যেই ঠিক করে ফেলেছে যে, হয় তারা পৃথিবীকে সূর্য থেকে দূরে নিয়ে যাবে অথবা নিজেরাই অন্য কোন গ্রহে গিয়ে বসবাস করবে। সে যাই হোক, এখনকার মানুষ সেই অবস্থা প্রত্যক্ষ করতে পারবে না। কিন্তু ভবিষ্যতের মানুষ যখন প্রত্যক্ষ করতে থাকবে ঐ সব প্রাকৃতিক ঘটনা আর মিলিয়ে নেবে ভবিষ্যদ্বাণীগুলি, তখন আমাদের চেয়ে আরও বেশী করে উপলব্ধি করবে গণিতের অদ্ভুত ক্ষমতার কথা।

নক্ষত্রের গতি

গিরিজাচরণ ঘোষ *

রাতে মেঘমুক্ত আকাশের পানে তাকালে আমরা দেখতে পাই অসংখ্য নক্ষত্ররাজি। দেখা যায় এই নক্ষত্রগুলি পূবের আকাশ থেকে পশ্চিমাকাশে ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে। এই গতি কিন্তু নক্ষত্রের নিজস্ব গতি নয়; পৃথিবীর আহ্নিক গতির ফলে নক্ষত্রের ঐ আপেক্ষিক গতি পরিলক্ষিত হয়। যদি পৃথিবী আপন অক্ষরেখায় আবর্তিত না হতো বা সূর্যকে প্রদক্ষিণ না করতো, তবে নক্ষত্রের ঐ আপেক্ষিক গতি থাকতো না। তখন ধ্রুব নক্ষত্রের মত অন্য নক্ষত্রগুলিও দেখা যেত এক স্থানে রয়েছে স্থির অবস্থায়। দিনের পর দিন, বছরের পর বছর তাদের পানে দৃষ্টি রেখে তখন এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হওয়া যেত যে, মহাকাশে গ্রহদের গতি থাকলেও নক্ষত্রগুলি সবই গতিহীন। কিন্তু একথাও ঠিক নয়, নক্ষত্রদেরও নিজস্ব গতি রয়েছে। প্রতিটি নক্ষত্র এমন কি, আমাদের সূর্যও প্রচণ্ড বেগে ছুটে চলেছে। এই গতি কোন নক্ষত্রের ক্ষেত্রে দেখা গেছে প্রতি সেকেণ্ডে তিরিশ কিলোমিটার আবার কোন কোন নক্ষত্রের ক্ষেত্রে দেখা গেছে প্রতি সেকেণ্ডে আড়াই-শ' বা তিন-শ' কিলোমিটার। এখন কথা হলো মহাকাশের নক্ষত্রগুলি যদি এই প্রচণ্ড বেগে ছুটে চলে তবে তাদের আমরা গতিহীন দেখি কেন? তার কারণ ঐ নক্ষত্রগুলি আমাদের নিকট থেকে এমন বিরাট দূরত্বে অবস্থান করছে যে, আমাদের চোখে অতি ক্ষুদ্রতম কৌণিক সরণ সৃষ্টি করতেও ঐ নক্ষত্রগুলিকে বিরাট দূরত্ব অতিক্রম করতে হবে। ঐ বিরাট দূরত্ব অতিক্রম করতে নক্ষত্রদের কয়েক লক্ষ বছর লাগবে। কয়েক শতাব্দীর দৌড় দেখে নক্ষত্রের গতি উপলব্ধি করা অত্যন্ত কঠিন। কয়েক লক্ষ বছর অপেক্ষা করলে ঐ নক্ষত্রগুলির স্থান পরিবর্তন পরিলক্ষিত হবে। মহাকাশে আমরা বহু নক্ষত্র মণ্ডলী দেখি, যেমন—সপ্তর্ষিমণ্ডল, কালপুরুষ, বৃশ্চিকরাশি, সিংহরাশি, ক্যাসিওপিয়া ইত্যাদি। ঐ মণ্ডলীগুলির প্রত্যেকটির এক একটি নিজস্ব গঠন রয়েছে অর্থাৎ ঐ মণ্ডলীর প্রতিটি নক্ষত্র পরস্পরের সঙ্গে এমন দূরত্বে অবস্থান করে যে, বছরের পর বছর, শতাব্দীর পর শতাব্দী
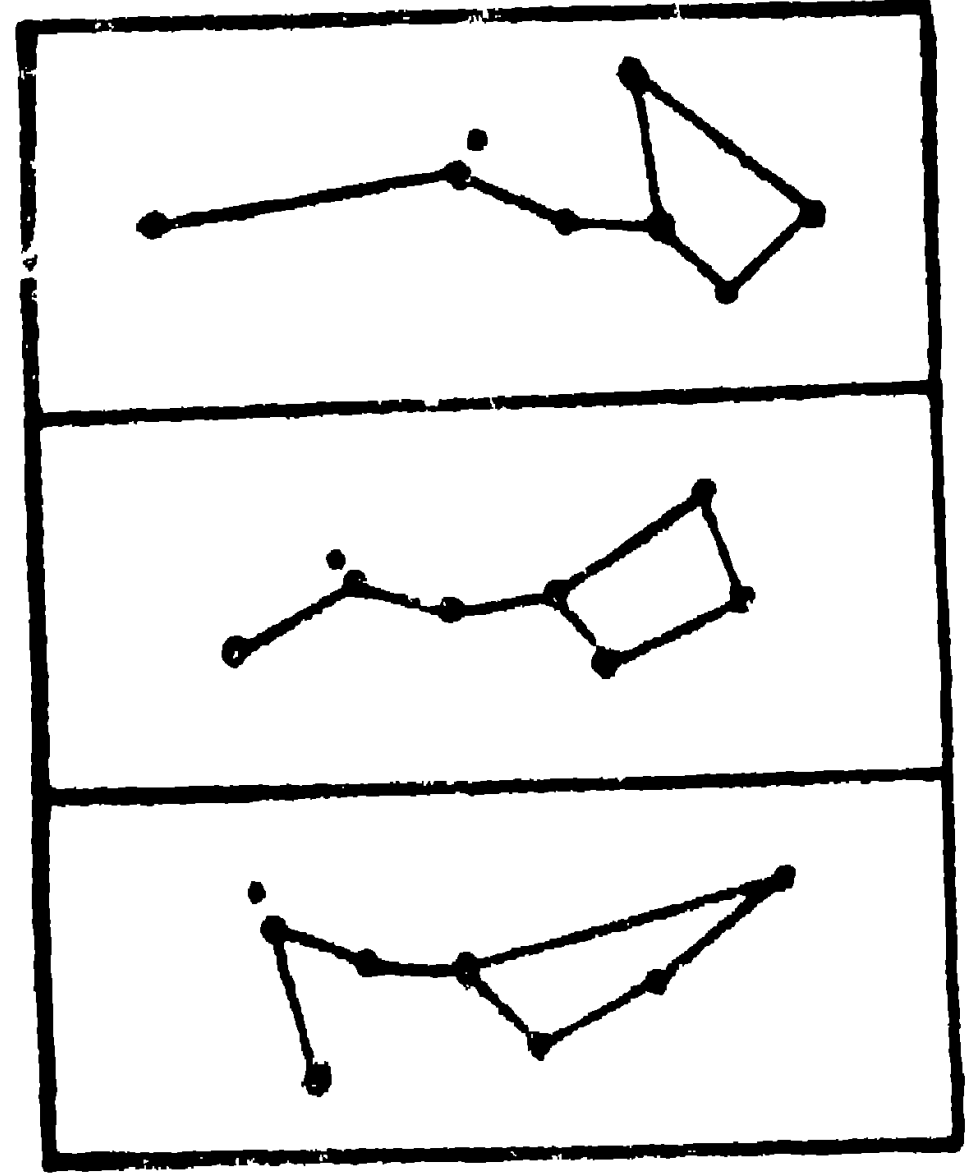
উপরে ছবি—এক লক্ষ বছর আগে সপ্তর্ষিমণ্ডলের রূপ, মাঝের ছবি—সপ্তর্ষিমণ্ডলের বর্তমান রূপ এবং নীচের ছবি—এক লক্ষ পরে সপ্তর্ষিমণ্ডলের সম্ভাব্য রূপ।

ঐ মণ্ডলীগুলির পানে তাকালে ওদের অপরিবর্তিত নিজস্ব রূপ দেখে সহজেই চেনা যায়। কিন্তু কয়েক লক্ষ বছর অপেক্ষা করলে দেখা যাবে,

* পদার্থবিদ্যা বিভাগ, বিদ্যাসাগর কলেজ, কলিকাতা-৬।

ঐ মণ্ডলীগুলির চেহারা সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়েছে। তখন সপ্তর্ষিমণ্ডলের বা কালপুরুষের পরিচিত চেহারা আর আমাদের চোখে পড়বে না। চিত্রে সপ্তর্ষিমণ্ডলের এক লক্ষ বছর আগেকার রূপ, বর্তমান রূপ এবং এক লক্ষ বছর পরের সম্ভাব্য চেহারা কেমন হবে, তা দেখানো হয়েছে।

এখন প্রশ্ন হলো নক্ষত্রগুলির এই গতির সম্বন্ধে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে যেখানে লক্ষ বছরের প্রয়োজন, সেখানে বিজ্ঞানীরা এই গতির খবর পেলেন কেমন করে? কিভাবে তাঁরা বুঝলেন প্রতিটি নক্ষত্র তীব্র বেগে ছুটে চলেছে? কিভাবে তাঁরা জানলেন আপাতদৃষ্টিতে যাদের স্থির মনে হচ্ছে, তারা হলো অতিমাত্রায় অস্থির? নক্ষত্রের চলবার এই রহস্য উদ্ঘাটিত হয় ডপ্লারের নিয়ম অনুসারে এবং বিজ্ঞানী ফিজু এই নিয়ম অনুসারে নক্ষত্র চলবার রহস্যের সমাধান-সূত্রটি খুঁজে পান বলে ঐ সূত্রটি 'ডপলার-ফিজু প্রভাব' নামে পরিচিত।

ডপ্লারের নীতি একটা সহজ দৃষ্টান্ত থেকে বোঝা যেতে পারে। মনে করা যাক, এক ভদ্র লোক একটি পোষ্ট অফিস থেকে ষাট কিলোমিটার দূরে রয়েছেন। ঐ পোষ্ট অফিস থেকে প্রতি পাঁচ মিনিট অন্তর একটি করে চিঠি ঐ ভদ্রলোককে দেবার জন্যে পিয়নেরা মোটর সাইকেলে চড়ে ছুটে যাচ্ছে। প্রতিটি মোটর সাইকেলের বেগ যদি ঘন্টায় ষাট কিলোমিটার হয়, তবে ভদ্রলোক প্রথম চিঠি পাবার পর প্রতি পাঁচ মিনিট অন্তর একটি করে চিঠি পেতে থাকবেন। এখন ধরা যাক, ঐ ভদ্রলোক তাঁর ঐ নির্দিষ্ট স্থান থেকে একটি সাইকেলে চড়ে ঘন্টায় পনেরো কিলোমিটার বেগে পোষ্ট অফিসের দিকে যাত্রা সুরু করলেন। এখন যাত্রার সুরুতে যদি তিনি একটি চিঠি পেয়ে থাকেন, তবে তার চার মিনিট পরে তিনি পরের চিঠিটি পাবেন। কারণ ঐ চার মিনিটে ভদ্রলোক পোষ্ট অফিসের দিকে এক কিলোমিটার পথ অগ্রসর হবেন, ফলে পিয়নের পক্ষে ঐ চার মিনিটে চার কিলোমিটার ছুটে এলেই ভদ্রলোককে চিঠি দেওয়া সম্ভব হবে। এইভাবে ভদ্রলোক যদি ঐ একই বেগে পোষ্ট অফিসের দিকে ছুটে যান, তবে তিনি প্রতিটি চিঠি চার মিনিট অন্তর পেতে থাকবেন, যদিও প্রকৃতপক্ষে পোষ্ট অফিস থেকে তা পাঁচ মিনিট অন্তর ছাড়া হচ্ছে এবং ঐ ভদ্রলোকের নিকট মনে হবে, একজন পিয়ন তার পশ্চাদ্বর্তী পিয়নের চেয়ে চার কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থান করছে, যদিও বাস্তবক্ষেত্রে তাদের দূরত্ব পাঁচ কিলোমিটার। পুনরায় মনে করা যাক, উক্ত ভদ্রলোক তাঁর স্থির অবস্থান থেকে পোষ্ট অফিসের বিপরীত দিকে যাত্রা সুরু করলেন এবং এবারেও তিনি সাইকেলে চড়ে ঘন্টায় পনেরো কিলোমিটার বেগে ছুটে চললেন। এখন ভদ্রলোক যদি তাঁর যাত্রার সুরুতে একটা চিঠি পেয়ে থাকেন, তবে সাধারণ গণিতের সাহায্যে দেখানো যাবে, তিনি তার পরবর্তী চিঠি পাবেন ৬⅔ মিনিট পরে। এক্ষেত্রে তিনি প্রতি ৬⅔ মিনিট অন্তর চিঠিগুলি পেতে থাকবেন এবং তখন তাঁর মনে হবে, একজন পিয়ন তার পশ্চাদ্বর্তী পিয়নের চেয়ে ৬⅔ কিলোমিটার তফাতে রয়েছে, যদিও এক্ষেত্রেও তাদের প্রকৃত ব্যবধান পাঁচ কিলোমিটার এবং পোস্ট অফিস থেকে ওদের ঐ পাঁচ মিনিট অন্তরই পাঠানো হচ্ছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে পোস্ট অফিসের দিক ছুটে গেলে ভদ্রলোকের চিঠি পাওয়ার হার বেড়ে যাবে এবং বিপরীত দিকে ছুটে গেলে চিঠি পাওয়ার হার কমে যাবে এবং পোস্ট অফিসের দিকে ছুটে গেলে ভদ্রলোকের নিকট দুটি পিয়নের ব্যবধান কম মনে হবে, কিন্তু বিপরীত দিকে গেলে তাদের ব্যবধান বেশী মনে হবে।

এই নীতি ডপ্লার প্রথম প্রয়োগ করেন শব্দের ক্ষেত্রে। কোন উৎস থেকে শব্দ নির্গত হলে

সেই শব্দ শ্রোতার নিকট তরঙ্গের আকারে ছুটে যায়। আমরা জানি একটি তরঙ্গের মধ্যে থাকে তরঙ্গ-শীর্ষ (Crest) এবং তরঙ্গ-পাদ (Trough)। পর পর দুই তরঙ্গ-শীর্ষ বিন্দুর ব্যবধানকে বলা হয় তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য। শব্দের তরঙ্গ-শীর্ষ বিন্দুগুলিকে আমরা পূর্ব দৃষ্টান্তের পিয়নদের সঙ্গে তুলনা করতে পারি। এখন ঐ শব্দ যখন কোন স্থির শ্রোতার নিকট যায়, তখন তরঙ্গ-শীর্ষ বিন্দুগুলির শক্তি শব্দের উৎস থেকে উত্থিত তরঙ্গের সমান সময়ের ব্যবধানে শ্রোতার কানে পৌঁছয় এবং শ্রোতার নিকট শব্দের কম্পাঙ্ক বা তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য অপরিবর্তিত থাকে। কিন্তু ঐ শ্রোতা যদি শব্দের উৎসের দিকে একটি নির্দিষ্ট বেগে ছুটে যায়, তবে তরঙ্গ-শীর্ষ বিন্দুগুলির শক্তি কিছুটা দ্রুত হারে শ্রোতার কানে পৌঁছুবে, ফলে শ্রোতার নিকট শব্দ-তরঙ্গের কম্পাঙ্ক বা তীক্ষ্ণতা (Pitch) প্রকৃত মান অপেক্ষা বেশী মনে হবে এবং তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য প্রকৃত মান অপেক্ষা কম মনে হবে। অনুরূপভাবে বলা যায়, শ্রোতা যদি শব্দের উৎসের বিপরীত দিকে ছুটে যায়, তবে শ্রোতার নিকট শব্দের কম্পাঙ্ক বা তীক্ষ্ণতা প্রকৃত মান অপেক্ষা কম বলে মনে হবে এবং তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য প্রকৃত মান অপেক্ষা বেশী মনে হবে। এখন শুধুমাত্র শ্রোতার গতির জন্তেই যে শব্দের কম্পাঙ্ক বা তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের পরিবর্তন ঘটবে তা নয়, শব্দের উৎসও যদি গতিশীল হয়, তাহলেও অনুরূপ পরিবর্তন পরিলক্ষিত হবে। শব্দের উৎস যদি শ্রোতার দিকে ছুটে যায়, তবে কম্পাঙ্ক বেশী এবং তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য কম বলে মনে হবে এবং শব্দের উৎস যদি শ্রোতার বিপরীত মুখে ছোটে, তবে কম্পাঙ্ক কম এবং তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য বেশী মনে হবে।

ডপ্‌লারের এই নীতি আলোরও ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, কারণ আলোও তরঙ্গের আকারে চলে। সুতরাং আলোর উৎস যদি গতিশীল হয়, তবে তার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের আপাত পরিবর্তন ঘটা স্বাভাবিক। মনে করা যাক, কোন নক্ষত্র থেকে আগত আলোক-রশ্মির তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য কোন বর্ণালীবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে সূক্ষ্মভাবে পরিমাপ করা হলো এবং সেই আলো পৃথিবীতে সৃষ্টি করে ঐ যন্ত্রের সাহায্যে ঐ আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য মাপা হলো। এখন যদি দেখা যায়, নক্ষত্র থেকে আগত আলোক-রশ্মির তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য পৃথিবীতে সৃষ্ট আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য অপেক্ষা বেশী, তবে বুঝতে হবে ঐ নক্ষত্র পৃথিবী থেকে দূরে ছুটে চলেছে। আর যদি দেখা যায় যে, নক্ষত্র থেকে আগত আলোক-রশ্মির তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য পৃথিবীতে সৃষ্ট আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য অপেক্ষা কম, তবে বুঝতে হবে ঐ নক্ষত্র পৃথিবী অভিমুখে ছুটে আসছে। সাধারণ গণিতের সাহায্যে প্রমাণ করা যায় যে,

$$\text{নক্ষত্রের গতিবেগ} = \frac{\text{তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের পার্থক্য} \times \text{আলোর গতিবেগ}}{\text{প্রকৃত তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য}}$$

উদাহরণ স্বরূপ মনে করা যেতে পারে, একটি নক্ষত্র থেকে আগত আলোক-রশ্মির তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য মেপে দেখা গেল ৫০০২ অ্যাংস্ট্রম একক (১ অ্যাংস্ট্রম একক = ·০০০০০০০১ সেন্টিমিটার) এবং পৃথিবীতে সৃষ্ট সেই আলোর প্রকৃত তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য পরিমাপ করে পাওয়া গেল ৫০০০ অ্যাংস্ট্রম একক। এখন আলোর গতিবেগ যদি প্রতি সেকেণ্ডে তিন লক্ষ কিলোমিটার ধরা হলে—

$$\text{নক্ষত্রের গতিবেগ} = \frac{২ \times ৩০০০০০}{৫০০০} = ১২০ \text{ কি. মি./সে.}$$

এই উদাহরণ থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, ঐ নক্ষত্র প্রতি সেকেণ্ডে এক-শ' কুড়ি কিলোমিটার বেগে পৃথিবী থেকে দূরে চলে যাচ্ছে। এইভাবে বিজ্ঞানীরা বহু নক্ষত্রের গতিবেগ নির্ণয় করেছেন এবং ঐ গতির ফলে লক্ষ বছর পরে পৃথিবীর আকাশ যে অন্য রকম রূপ ধারণ করবে—একথা সহজেই অনুমেয়।

বিজ্ঞান-সংবাদ

দক্ষিণ মেরু অঞ্চলে ২০ কোটি বছরের প্রাচীন জীবাশ্মের সন্ধান

দক্ষিণ মেরু অঞ্চলের ভূগর্ভে খনন করে মার্কিন বিজ্ঞানীরা এক প্রকার সম্পূর্ণ অবলুপ্ত বিরাটকায় প্রাণীর জীবাশ্মের সন্ধান পেয়েছেন। বিজ্ঞানীদের ধারণা, বিশ কোটি বছর আগে আফ্রিকায় ও এশিয়ায় জলহস্তীজাতীয় যে প্রাগৈতিহাসিক প্রাণী বিচরণ করতো, এই জীবাশ্মটি তাদেরই।

সুদূর দক্ষিণ মেরু অঞ্চলের ভূগর্ভে এই জীবাশ্মের সন্ধান পাওয়ায় প্রাচীন পৃথিবীর ভৌগোলিক গঠন সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের ধারণাই সঠিক প্রমাণিত হচ্ছে। তাঁরা মনে করেন তখন দক্ষিণ মেরু ছিল নিরক্ষবৃত্তের খুব কাছাকাছি। আর তার সঙ্গে যুক্ত ছিল বর্তমান আফ্রিকা। তখন দক্ষিণ আমেরিকা, ভারত এবং অস্ট্রেলিয়া গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ড নামে একটি বিরাট মহাদেশও স্থলভূমির অন্তর্ভুক্ত ছিল। সৃষ্টির সেই আদিম কালে পৃথিবীর স্থলখণ্ড ছিল দুই-একটি। তারপর কালস্রোতে প্রকৃতির নানা বিপর্যয়ের ফলে তা ভেঙে যায়, মহাদেশসমূহ সরে যেতে থাকে, নূতন ভাবে নূতন মহাদেশসমূহ গড়ে উঠে।

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অ্যারিজোনা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত ভূ-বিজ্ঞানী ডক্টর লরেন্স এম. গড্ এই জীবাশ্ম আবিষ্কার প্রসঙ্গে বলেছেন তায় দক্ষিণ মেরু অঞ্চলে এই জীবাশ্ম পাওয়ায় প্রাচীন পৃথিবীর দক্ষিণাঞ্চলের বিরাট মহাদেশ গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ডের অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহের আর কোন অবকাশ রইলো না।

এই জীবাশ্মটি হচ্ছে হিপোপোটেমাস বা জলহস্তীর মত একটি বিরাটকায় জন্তুর মাথা। এই জন্তুটির নাম লিষ্ট্রসরাস। এর বহু জীবাশ্ম ভারত এবং আফ্রিকার ভূগর্ভে পাওয়া গিয়েছে। জন্তুটি প্রধানতঃ জলচর হলেও তার পক্ষে বিরাট বিরাট সমুদ্র পাড়ি দিয়ে পৃথিবী থেকে বিছিন্ন দক্ষিণমেরু অঞ্চলে গিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস করা সম্ভব নয়। সুতরাং দক্ষিণ মেরু ছিল নিরক্ষবৃত্ত এলাকা, বর্তমান আফ্রিকা প্রভৃতি মহাদেশের সন্নিকটবর্তী এলাকা। ঐ অঞ্চলে এর আগে আর কোন মেরুদণ্ডী প্রাণীর জীবাশ্মের সন্ধান পাওয়া যায় নি। এটি কেবল ঐ এলাকারই নয়, সর্বকালেরই একটি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার এবং প্রাণী-জগতের একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন বলে ডক্টর গুল্ড্ মন্তব্য করেছেন।

ওহায়ো বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনষ্টিটিউট অব পোলার স্টাডিজ-এর ডক্টর ডেভিড এইচ ইলিয়টের নেতৃত্বাধীনে আমেরিকার ন্যাশন্যাল সায়েন্স ফাউণ্ডেশানের উদ্যোগে এই খনন-কার্য চালানো হয় এবং দক্ষিণ মেরু থেকে ৪০০ মাইল দূরবর্তী কুইন আলেকজেণ্ড্রা পর্বতমালায় বালিপাথরের মধ্যে এই জীবাশ্মের সন্ধান পাওয়া যায়।

মানুষ ও বানরের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক

বার্কলেস্থিত ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানী ডক্টর অ্যালান সি উইলসন এবং ডক্টর ভিনসেন্ট এম স্যারিশ বানরের ও মানুষের রক্ত কণিকা সম্পর্কে তুলনামূলক পর্যালোচনার পর বলেছেন যে, বানর ও মানুষের সম্পর্ক আমরা যতখানি ঘনিষ্ঠ মনে করি, তা তার চেয়ে ঘনিষ্ঠতর। তাঁদের ধারণা পঞ্চাশ লক্ষ বছর পূর্বে আফ্রিকার বৃহদাকার বানর এবং মানুষের পূর্বপুরুষ ছিল একই

কোন কোন নৃ-বিজ্ঞানীর অভিমত তিন কোটি বছর পূর্বে মানুষ ও বানরের পূর্বপুরুষ একই ছিল, তারপর বিবর্তনের পথে তারা পৃথক হয়ে গিয়েছে।

অভিনব ব্যাটারী

আমেরিকার বেল টেলিফোন লেবরেটরিজ একটি নূতন ধরণের বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদনকারী ব্যাটারী উদ্ভাবন করেছেন। বর্তমান অটোমোবাইলসমূহে যে সকল ব্যাটারী ব্যবহৃত হয়, তাদের তুলনায় এই সকল ব্যাটারী দ্বিগুণ টেকসই হবে, অন্ততঃ ৩০ বছর স্থায়ী হবে। বর্তমানে ঐ কোম্পানীর কাজকর্মে বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবেই এই সকল ব্যাটারী প্রয়োগ করা হবে

এই ব্যাটারী মোটর গাড়ী বা অটোমোবাইল সমূহে ব্যবহারের উপযোগী করে তৈরি করা হয় নি। তবে যে বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত ও প্রক্রিয়া অনুসারে এই ব্যাটারী নির্মিত হয়েছে, তাতে ভবিষ্যতে এই সকল ব্যাটারী অটোমোবাইলসমূহে ব্যবহার করা যাবে বলে কোম্পানী কর্তৃপক্ষ বলেছেন।

বর্তমানে আয়তাকারের বা রেক্‌টেঙ্গুলার-শেপের ব্যাটারি অটোমোবাইলসমূহে ব্যবহৃত হয়। নূতন ব্যাটারীর আকৃতি বেলনাকার বা সিলিণ্ড্রিক্যাল এবং এর গোলগ্রিড বা বিদ্যুৎবাহী তারজালি বিশুদ্ধ সীসায় তৈরি। প্রচলিত ব্যাটারীসমূহের গ্রিড সীসার সঙ্গে ক্যালসিয়াম অথবা অ্যান্টিমনি মিশিয়ে তৈরি করা হয়। মিশ্র ধাতু দিয়ে তৈরি করা হয় বলে ঐ সকল ব্যাটারী বিশুদ্ধ সীসায় তৈরী গ্রিডের তুলনায় কম টেক্‌সই হয়

ঐ সকল গ্রিডের উপর লেড ডায়োক্সাইডের একটা আস্তরণ থাকে এবং এদের সালফিউরিক অ্যাসিডের মধ্যে ডুবিয়ে রাখা হয়। তারপর তড়িৎ-পরিবাহী একটি তারের দ্বারা ধন-তড়িৎ কেন্দ্র বা পজিটিভ পোলের সঙ্গে ঋণ-তড়িৎ কেন্দ্র বা নেগেটিভ পোলের সংযোগ করা হয়। তারপর বিদ্যুৎপ্রবাহ চলতে থাকে। প্রচলিত গ্রিডের জালি-সমূহ ধীরে ধীরে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, ফলে লেড ডায়োক্সাইডের প্রলেপের জন্যে যে সংযোগ থাকে, তা নষ্ট হয়ে যাওয়ায় ব্যাটারীটি কার্যকরী হয় না। নূতন গ্রিডসমূহ একই কেন্দ্রাভিমুখী নানা পর্যায়ী রিং দিয়ে তৈরি এবং এদের ব্যাসার্ধ বরাবর দণ্ড দিয়ে সংযুক্ত করা হয়। সুতরাং এ সকল দণ্ড ক্ষয়প্রাপ্ত হলেও বিভিন্ন রিং-এর মধ্যে দূরত্ব সমানই থাকে এবং শক্তি উৎপাদনকারী লেড ডায়োক্সাইড প্রলেপের সঙ্গেও সংযোগ থাকে। ঐ কোম্পানীর মুখপাত্র এই প্রসঙ্গে আরও বলেছেন যে, ঐ সকল দণ্ড ক্ষয়ে যাওয়ায় লেড ডায়োক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং বয়স বাড়ার সঙ্গে নূতন ধরণের ব্যাটারীর বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদনের ক্ষমতাও বেড়ে যায়।

অগ্নিনির্বাপক পাউডার

পৃথিবীতে মৃত্যু ও ধ্বংসের অন্যতম কারণ, আগুন এবং এ বিপদ দিনে দিনে বেড়েই চলেছে। এখনও গৃহদাহের ক্ষেত্রে জলকেই সর্বোত্তম অগ্নিনির্বাপক বলে মেনে করা হয়।

কিন্তু পেট্রোল, তেল, রঙ, বিমান দুর্ঘটনা বা বিদ্যুৎ-জনিত আগুনের ক্ষেত্রে জল খুব ভাল অগ্নি প্রতিরোধক নয়, কারণ এগুলি খুব দ্রুত আগুন ছড়ায়। দেখা গেছে এই ধরণের আগুনের ক্ষেত্রে কতকগুলি কেমিক্যাল পাউডার স্প্রে করলে অতি দ্রুত সুফল পাওয়া যায়।

বৃটেনে এই জাতীয় একটি নতুন পাউডার উদ্ভাবিত হয়েছে, যা বড় বড় আগুন নেভাবার ক্ষেত্রে অন্যান্য পাউডারের চেয়ে বহুগুণ শক্তিশালী। মনেক্স (Monnex) নামের এই পাউডারের রঙ সাদা এবং এটি বিষাক্ত নয়। এটি আসলে একটি কঠিন পদার্থ, গুঁড়ো করে নেওয়া হয়েছে।

দু-বছর ধরে মনেক্স নিয়ে পরীক্ষা করা হয়েছে। একবার ১২৪ জন লোককে নিয়ে পরীক্ষা চালানো হয়। বয়স, যোগ্যতা ও স্ত্রী-পুরুষ ভেদে তাদের দুটি সমমানের গোষ্ঠীতে ভাগ করা হয়। তারপর তাদের সামনে সমান মাপের (১৫ ×৩০"×১") দুই সারি ট্রে সাজিয়ে দেওয়া হয়। ট্রেতে রাখা সমপরিমাণ গ্যাসোলিন পাঁচ সেকেণ্ড ধরে জ্বলবার পর তাদের তা নেভাতে আহ্বান করা হয়। একদল পুরনো ধাঁচের অগ্নি-নির্বাপক দিয়ে আগুন নেভাতে চেষ্টা করেন এবং অন্য দলটি মনেক্স ব্যবহার করেন। দেখা যায় অগ্নি নির্বাপনে মনেক্স ১৬ গুণ বেশী কার্যকরী।

এই নতুন পাউডার ছোট ছোট দানা তৈরি করে আগুনকে চাপা দিয়ে দেয়। এটি হস্ত-চালিত এক্সটিংগুইসার যন্ত্রের সাহায্যে অথবা স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে ব্যবহার করা যায়।

বৃটিশ ফার্ম ইম্পিরিয়াল কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ (আই-সি-আই) মনেক্স উৎপাদনের উদ্দেশ্যে বর্তমানে একটি প্ল্যান্ট স্থাপন করেছে।

সমুদ্রের গভীরে নামায় বিশ্ব রেকর্ড

বৃটেনের রয়াল ন্যাভাল সায়েন্টিফিক সার্ভিসের দু-জন সদস্য সমুদ্রের ১,৫০০ ফুট গভীরে কৃত্রিম আবহাওয়ায় পুরা ১০ ঘণ্টা থেকে বিশ্ব রেকর্ড স্থাপন করেছেন।

এখন প্রমাণ হলো যে, 'হিলিয়াম বেরিয়ার'-এরও (১২০০ ফুট) নীচে মানুষের পক্ষে নিরাপদে নামা সম্ভব হবে। ১৯৬৯ সালে যুক্তরাষ্ট্র ও ফ্রান্সের যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত পরীক্ষায় সমুদ্রের ১,১১০ ফুট নীচে ৪ মিনিটের জন্যে মানুষ পাঠানো সম্ভব হয়েছিল।

বর্তমান পরীক্ষায় দু-জন মানুষকে প্রেসার-চেম্বারে ঢুকিয়ে সমুদ্রের নীচে নামিয়ে দেওয়া হয় এবং চেম্বারটি একেবারে চাপশূন্য হয়ে এলে তাঁরা সেখান থেকে বেরিয়ে আসেন।

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

১৯৭০

২৩শ বর্ষ — ৪র্থ সংখ্যা
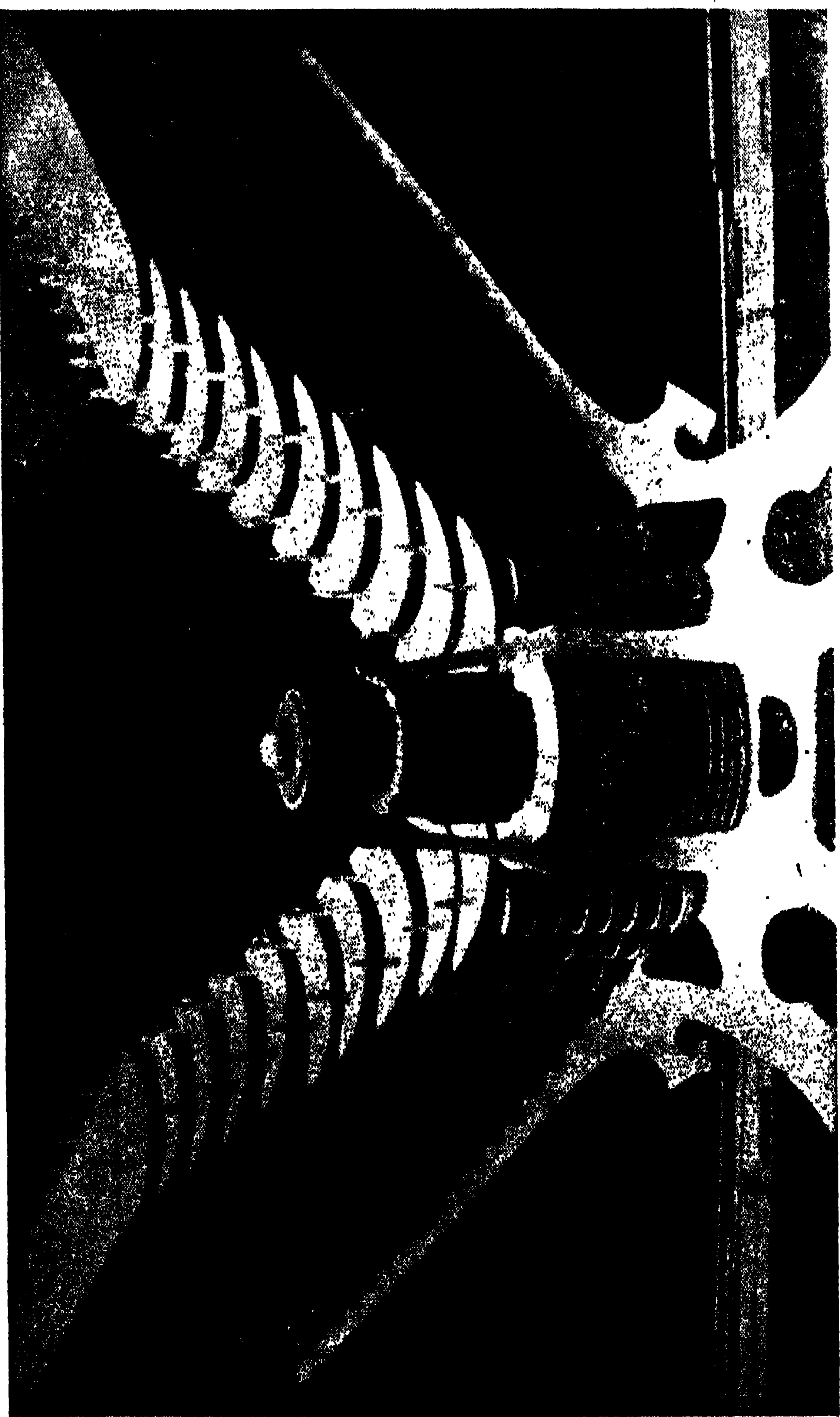
বর্তমান হিসাব অনুযায়ী আগামী ২০০০ শতকের মধ্যেই পৃথিবীর লোকসংখ্যা প্রায় দ্বিগুণিত হবে। তখন বড় বড় শহরগুলির অধিবাসীদের সুষ্ঠু বাসস্থানের জন্যে গুরুতর অবস্থার সম্মুখীন হতে হবে। এই সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে রবার্ট গ্যাব্রিয়েল নামে বার্লিনের (জার্মেনী) এক স্থপতি ১২৫০ মিটার উঁচু এরূপ অট্টালিকার পরিকল্পনা করেছেন। ৩৫৬ তলার এই রকম অট্টালিকায় ২৫০০০ লোকের বাসস্থানের সঙ্কুলান হবে।

জোনাকি

প্রাণিজগতে জোনাকি এক বিস্ময়কর সৃষ্টি। পৃথিবীতে কীট-পতঙ্গ সৃষ্টির সময় থেকে জোনাকির অস্তিত্ব রয়েছে। পৃথিবীর প্রায় সব মহাদেশেই এরা অল্প-বিস্তর ছড়িয়ে আছে।

সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে সন্ধ্যা আসবার পর ঝাঁক বেঁধে জোনাকি উড়ে বেড়ায় এবং আলো বিচ্ছুরণ করে—এটা তোমরা নিশ্চয়ই দেখেছ। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ছেলেমেয়েদের মনে এক অদ্ভুত ধাঁধার সৃষ্টি করে জোনাকির লেজ থেকে নির্গত এই আলো। শিশুর মনে স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগে, 'কিসের এই আলো, কেনই বা এই আলো জ্বলছে আর নিবছে?' শুধু শিশুরা কেন, বয়স্কেরাও কল্পনা করতে পারেন নি যে, জোনাকির লেজ থেকে নির্গত আলো বিজ্ঞানীমহলের গবেষণার বিষয়বস্তু হয়ে উঠবে। প্রথম প্রথম বিজ্ঞানীরা তাজ্জব বনে যান ব্যাপারটা দেখে। শেষ পর্যন্ত গবেষণা করে বেশ কিছু রহস্য উদ্‌ঘাটন করেছেন তাঁরা।

বহু শতাব্দী ধরেই সবার কাছে জোনাকির আলোর উৎপত্তির কারণ সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা প্রচলিত ছিল। সুন্দর সুন্দর অনেক উপকথাও রচিত হয়েছে জোনাকিকে নিয়ে। প্রাচীনকালে গ্রীস এবং রোমের নাগরিকেরা ক্রীতদাসদের সাহায্যে প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলায় জোনাকি সংগ্রহ করে তাদের প্রেমিকাদের উপহার দিত। তখন প্রেমিকারা জোনাকির লেজ থেকে উজ্জ্বল অংশটা ছিঁড়ে নিয়ে চুলের খোপায় গুঁজে দিত। ১৫৩২ সালে জনৈক স্প্যানীয় পরিব্রাজক ওয়েস্ট ইণ্ডিজ থেকে প্রচুর জোনাকি ধরে নিয়ে যান এবং গৃহিণীকে বাতির পরিবর্তে এই জোনাকির আলো ব্যবহার করতে পরামর্শ দেন। জোনাকির এই অপূর্ব আলো দেখে আগেকার দিনের লোকেরা জোনাকিকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করতো। এই সম্পর্কে নানা কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। শুনলে অবাক হবে, জাপানে জোনাকি পোকা আজও প্রচুর দামে বিক্রয় হয়। আগেকার দিনে উচ্চপদস্থ লোকের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্যে বোতল ভর্তি করে জোনাকি পোকা উপহার দেওয়া হতো।

আগেই বলেছি, জোনাকির আলোর উৎপত্তির কারণ সম্বন্ধে বিজ্ঞানীমহলে বহুদিন থেকেই আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। এর কারণ উদ্ভাবনের জন্যে দিনের পর দিন বিজ্ঞানীদের মধ্যে নতুন নতুন চেষ্টা চলতে থাকে। এই সম্পর্কে জন হপ্‌কিন্‌স্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাগারে নিযুক্ত গবেষক William D. Mcelory-র নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বহুদিন ধরেই জোনাকির উপর গবেষণা করে আসছেন তিনি। তাঁর গবেষণার ব্যাপারে সহায়তা

করে বাল্টিমোর স্কুলের ছোট ছোট ছেলেরা। সন্ধ্যাবেলায় মাঠ-ঘাট, পার্ক, তন্ন তন্ন করে খুঁজে তারা জোনাকি ধরে এনে বোতলে পুরে এই নীরব গবেষকের হাতে জমা দিত। এর জন্যে অবশ্য তারা যৎসামান্য দক্ষিণাও পেত।

বিজ্ঞানী Mcelroy-এর লেবটরীতে নিযুক্ত লোকেরা তখন ঐ জোনাকিগুলি রোদে শুকিয়ে নিয়ে লেজটি ছিঁড়ে রেখে দিত। প্রায় এক-শ' রকমের পরীক্ষা হয়েছে ঐ আলো-দেওয়া লেজ নিয়ে। Mcelroy দেখেছেন জোনাকির লেজটাকে রোদে শুকিয়ে গুঁড়া করে নিয়ে যে পাউডার তৈরি হয়, তাতে জল দিলে সেটা আবার জ্বলজ্বল করতে থাকে অন্ধকারে।

জোনাকির আলোর উৎপত্তির কারণ সম্পর্কে কিছু কিছু ধারণা লোকের মনে জন্মেছে বেশ কয়েক শতাব্দী আগে থেকেই। ১৮৫৫ সালে জনৈক বিজ্ঞানী আবিষ্কার করেন যে, জোনাকির লেজে দু'টি রাসায়নিক পদার্থ আছে। তিনি সেগুলির নাম দেন লুসিফেরিন এবং লুসিফারেজ। এই দুটি জিনিষের আবার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য আছে। লুসিফেরিন এমন একটা রাসায়নিক পদার্থ, যা আপনা থেকেই জ্বলতে পারে অথচ জ্বলতে জ্বলতে নিজে গরম হয় না। আর লুসিফারেজের কাজ শুধু লুসিফেরিনকে দ্রুত জ্বলতে সাহায্য করা।

এই সব তথ্য থেকে Mcelory লুসিফেরিন ও লুসিফারেজ সম্পর্কে আরও নতুন নতুন তত্ত্বের অবতারণা করেন। অন্ধকার পরীক্ষাগারে তিনি লুসিফেরিন ও লুসিফারেজ মিশ্রিত করে দেখলেন—তাথেকে উজ্জ্বল আলো নির্গত হচ্ছে। জোনাকির আলোর সঙ্গে এই আলোর আশ্চর্য মিল দেখা গেল। তখন বিজ্ঞানী Mcelroy এছাড়া অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থের খোঁজ করতে লাগলেন, যা থেকে এই ধরণের উজ্জ্বল আলো নির্গত হতে পারে। তাঁর এই প্রচেষ্টা নিষ্ফল হয় নি। শেষ পর্যন্ত তিনি একটা রাসায়নিক পদার্থের মিশ্রণ (ATP, অক্সিজেন ও ম্যাগ্‌নেসিয়াম সালফেট) বের করলেন। এগুলি সংগৃহীত হয়েছিল জোনাকির লেজ থেকেই এবং বিভিন্ন উপায়ে বিভিন্ন পরিমাণে মিশিয়ে তিনি নানারকম যৌগ তৈরি করলেন। প্রথমে লুসিফেরিনের সঙ্গে লুসিফারেজ মেশানো হলো। এই দুটির মিশ্রণের ফলে তৈরী যৌগের সঙ্গে ATP যোগ করে এই তিনের মিশ্রণে এক নতুন যৌগের সৃষ্টি হয়। ATP আর কিছুই নয়, বিজ্ঞানী Mcelroy একটা পদার্থ আবিষ্কার করে তার নাম দেন ATP। বিভিন্ন পদার্থের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে তিনি এই যৌগটি তৈরি করেছিলেন। এখন লুসিফেরিন, লুসিফারেজ ও ATP—এই তিনটির সংমিশ্রণে গঠিত নতুন যৌগের সঙ্গে ম্যাগ্‌নেশিয়াম সালফেট যোগ করবার ফলে সম্পূর্ণ নতুন ধরণের এক যৌগ উৎপন্ন হয়। এই রাসায়নিক পদার্থগুলি বিভিন্ন অনুপাতে মেশালে উৎপন্ন যৌগের উজ্জ্বলতাও বিভিন্ন হয়।

বিজ্ঞানী Mcelroy-এর প্রচেষ্টা এক নতুন যুগের দ্বার খুলে দিয়েছে বিজ্ঞানী মহলে। এখন আর বুঝতে বাকী রইলো না যে, জোনাকির লেজ থেকে আলো নির্গত হবার কারণ বিজ্ঞানী Mcelroy-এর আবিষ্কৃত যৌগ ATP-এর উপস্থিতি। বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে দেখেছেন, একটা জীবন্ত জোনাকির লেজে এই সমস্ত রাসায়নিক দ্রব্যের প্রাচুর্যের জন্যে লেজ থেকে নির্গত আলো এত জোরালো হয়। কিন্তু একটা প্রশ্ন স্বভাবতঃই জাগতে পারে যে, লেজের আলোর উজ্জ্বলতা চিরস্থায়ী নয় কেন? অল্প একটু জ্বলে পরক্ষণেই আবার সেটা নিভে যায় কেন?

এই সমস্ত ব্যাপার নিয়ে আরও অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে পরবর্তী সময়ে। বিজ্ঞানীরা দেখেছেন যে, জোনাকির লেজে এক ধরণের পদার্থ আছে, যা আলো-নির্গত-কারী পদার্থগুলিকে এক সঙ্গে আটকে রাখে। ফলে আলো নির্গত হতে পারে না। তবে এটা খুব অল্প সময়ই স্থায়ী হয়। তাই পরক্ষণেই আবার আলো বের হতে থাকে জোনাকির লেজ থেকে। আর একটা ব্যাপার হলো, জোনাকির লেজ থেকে আলো নির্গত হবার কারণ, জোনাকির দেহস্থিত বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থের মধ্যে যুক্ত হবার জন্যে স্নায়ুতন্ত্রগুলি নিজেদের মধ্যে এক ধরণের সঙ্কেত সৃষ্টি করে। আর এই পদার্থের সংমিশ্রণের সঙ্গে সঙ্গে আলো নির্গত হয়। পরক্ষণেই রাসায়নিক পদার্থগুলির মধ্যে মিশ্রণব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ফলে তখন আলো নির্গত হয় না। এই ব্যবস্থা খুব দ্রুত ঘটে বলে জোনাকির লেজ থেকে নির্গত আলো ক্রমান্বয়ে জ্বলতে ও নিভতে থাকে।

জোনাকি সম্বন্ধে গবেষণা করে বিজ্ঞানীরা আজ অনেক নতুন নতুন তথ্যের অবতারণা করতে সক্ষম হয়েছেন। মানুষের শরীরে কিভাবে শক্তি সঞ্চিত থাকে ও কিভাবেই তা কাজে লাগে, তার হদিশ মিলেছে জোনাকির লেজ থেকে নির্গত আলোর কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে।

হিল্লোল রায়

নীহারিকার কথা

সৌরজগতের সীমা ছাড়িয়ে বহুদূরের জ্যোতিষ্কগুলির অন্যতম সদস্য নীহারিকা। নীহারিকাগুলিকে অস্পষ্ট আলোকময় পদার্থের মত দেখায়। নীহারিকা শব্দটি ইংরেজী নেবুলা (Nebula) শব্দ থেকে এসেছে, ল্যাটিন ভাষায় যার অর্থ হলো মেঘ। কিন্তু এখন জানা গেছে যে, অনেক নীহারিকা গ্যাসপূর্ণ মেঘের মত বস্তু হলেও বাকী নীহারিকা-গুলি হলো বিশাল নক্ষত্রমণ্ডল, যেখানে নক্ষত্রগুলিকে সহজে স্বতন্ত্রভাবে বোঝা যায় না। নীহারিকা সম্বন্ধে সার উইলিয়াম হার্শেলই সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেন যে, নীহারিকার অধিকাংশই নক্ষত্রমণ্ডল ছাড়া আর কিছুই নয়।

এই নীহারিকাগুলি ছাড়া বাকীগুলি যে গ্যাসীয় পদার্থবিশেষ, তা দেখিয়ে ছিলেন বিজ্ঞানী হাগিন্স্। তিনি বর্ণালীবিশ্লেষণ যন্ত্রের সাহায্যে এই তথ্য প্রমাণ করেন। ঐ যন্ত্রের সাহায্যে তিনি দেখেন যে, নীহারিকার বর্ণালী কতকগুলি কালো রেখার দ্বারা খণ্ডিত, এই কালো রেখাযুক্ত বর্ণচ্ছত্র দেখে তিনি বলেন যে, নীহারিকাগুলি গ্যাসের মিশ্রণ মাত্র। তারপর হার্শেল অবশ্য দেখিয়েছিলেন যে, কতকগুলি নীহারিকা নক্ষত্র জগতের মত। অতি বিশাল নক্ষত্রসমূহের দ্বারা এরা গঠিত। কতকগুলি হলো ছায়াপথের অন্তর্গত নক্ষত্র, কতকগুলি ছায়াপথের সঙ্গে সংযুক্ত, কিন্তু ছায়াপথের সঙ্গে এক সমতলে অবস্থিত নয়। সর্বশেষ হলো আমাদের ছায়াপথের বাইরে অবস্থিত অন্য ছায়াপথের অন্তর্গত নক্ষত্রপুঞ্জ। নীহারিকাগুলির অবস্থানের এই তথ্য জানা দরকার। নীহারিকাগুলিকে মূলতঃ কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। সেগুলি হলো—গ্রহাকৃতি নীহারিকা, প্রতিফলনকারী নীহারিকা, বিকিরণকারী নীহারিকা।

গ্রহাকৃতি নীহারিকা—ছোট দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে এই প্রকার নীহারিকাকে দেখায় থালার মত। এরা উৎপন্ন হয়েছে একটি উত্তপ্ত নীল বর্ণের নক্ষত্রকে বেষ্টন করে থাকা গ্যাসীয় পদার্থপূর্ণ গোলকের অত্যুজ্জ্বল অংশ থেকে। এই গ্যাসের পরমাণুগুলি, কেন্দ্র-স্থিত মূল নক্ষত্র যে অতিবেগুনী রশ্মি বিকিরণ করে, তাথেকে শক্তি শোষণ করে। তারপর কিছু সময় বাদে পরমাণুগুলি এই শক্তিকে দৃশ্য আলোকরূপে পুনরায় বিকিরণ করে। এই নীহারিকার গ্যাসীয় দ্রব্যগুলির মধ্যে হাইড্রোজেনই হলো প্রধান বস্তু।

প্রতিফলনকারী নীহারিকা—এই প্রকার নীহারিকাগুলি গঠিত মহাজাগতিক রশ্মি কণিকা দিয়ে। এই কণিকাগুলি মেঘের মত পুঞ্জীভূত রূপ নিয়ে নীহারিকারূপে দেখা দেয়। এরা কাছাকাছি বা এদের মধ্যস্থিত নক্ষত্রের আলো প্রতিফলন করে ভাস্বর হয়ে ওঠে। এইরূপ নীহারিকার বর্ণালী অবিচ্ছিন্ন এবং কতকগুলি কৃষ্ণবর্ণ শোষণ রেখার দ্বারা খণ্ডিত হয়ে থাকে। কিন্তু পার্থক্য হলো যে, নীল এবং লাল রশ্মিগুলি সমভাবে প্রতি-

ফলিত হয় না। ফলে নীহারিকা এবং এর মধ্যের নক্ষত্রটিতে বর্ণ বণ্টনের বৈষম্য ঘটে নক্ষত্রাগত আলোক যখন প্রতিফলনকারী নীহারিকা ভেদ করে আসে, তখন তা বেশ খানিকটা লাল বর্ণে রঞ্জিত হয়ে যায়। বর্ণবিষয়ক এইসব পর্যবেক্ষণ থেকে গবেষণা করে বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন যে, নীহারিকা গঠনের উপাদান মহাজাগতিক রশ্মি কণিকার ব্যাস $১০^{-৫}$ ইঞ্চি। অর্থাৎ এক ইঞ্চির এক লক্ষ ভাগের এক ভাগ। নীহারিকার কণিকাগুলি হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ও কার্বনের আণবিক সমবায়ে গঠিত।

কৃত্তিকা নক্ষত্রপুঞ্জে মহাজাগতিক রশ্মি কণিকার পুঞ্জীভূত সমাবেশ হয়ে থাকে। একই ব্যাপার ঘটে বৃষ রাশির ক্ষেত্রে। সেইখানেও এইরূপ নীহারিকার ন্যায় পদার্থ সন্নিবিষ্ট হয়ে আছে।

বিকিরণকারী নীহারিকা—অতিমাত্রায় অতি বেগুনী রশ্মি বিকিরণে সক্ষম কোন উত্তপ্ত তারকাকে যখন অত্যন্ত ঘন মেঘের মত নক্ষত্রমণ্ডলীয় গ্যাস বেষ্টন করে থাকে অথবা তার নিকট সন্নিবিষ্ট থাকে, তখন তা বিকিরণকারী নীহারিকা নামে অভিহিত হয়। কালপুরুষে যে বৃহৎ নীহারিকা দেখা যায়, তা সৌন্দর্যে অতুলনীয়। এই নীহারিকা গ্যাসপূর্ণ অতি প্রকাণ্ড জিনিষ এবং এই গ্যাস হাইড্রোজেন, হিলিয়াম, ক্যালসিয়াম, সোডিয়াম, পটাশিয়াম, টাইটেনিয়াম প্রভৃতি মৌলের পরমাণুর সংমিশ্রণ। এই নীহারিকাটি সূর্য থেকে প্রায় ১৫০০ আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত। আলোচ্য নীহারিকার আড়াআড়িভাবে দেহের মাপ ২৫ আলোকবর্ষের সমান। যে গ্যাসের দ্বারা এর দেহ গঠিত, তার ভর হলো সূর্যের ভর অপেক্ষা ৩০০ গুণ বেশী। এটি নীহারিকা জগতে কতবড় স্থানের অধিকারী, তা এথেকে বোঝা যায়। বিকিরণকারী নীহারিকাগুলির মধ্যে ক্যারিনা নীহারিকা উল্লেখযোগ্য। সূর্য থেকে এই নীহারিকা ৫০০০ আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত হয়েও পূর্বের নীহারিকাটি অপেক্ষা কোন অংশে কম যায় না। এর প্রধান অংশ আড়াআড়িভাবে মাপলে দাঁড়ায় ২০০ আলোকবর্ষ এবং এর জড়পিণ্ডের ভর সূর্যের ভরের কয়েক হাজার গুণ বেশী। আরো একটি অতিকায় বিকিরণকারী নীহারিকা আছে, সেটি হলো ডোরাডাস নীহারিকা। এটি প্রায় সূর্য থেকে ২০ লক্ষ আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত। আড়াআড়িভাবে এর দৈর্ঘ্য ১০০০ আলোকবর্ষের সমান। এই নীহারিকাটি সব চেয়ে ভারী নীহারিকা।

বিকিরণকারী নীহারিকাগুলি তাদের মধ্যস্থিত নক্ষত্রগুলির কাছ থেকে বিকিরিত আলোক শোষণ করে তা পুনর্বিকিরণ করে এবং এইভাবে কিরণ দিতে থাকে। কালপুরুষ বা ওরাইয়ন নীহারিকাটি ট্র্যাপিজিয়ামাকৃতির গ্যাসপুঞ্জের দ্বারা গঠিত এবং এর উজ্জ্বল অংশে নীলাভ সাদা চারটি নক্ষত্র রয়েছে। ডোরাডাস এবং ক্যারিনা নীহারিকায় কয়েকটি অতিকায় নক্ষত্র রয়েছে। নীহারিকার মধ্যস্থিত তারকাগুলির উপরিতলের

উষ্ণতা প্রায় ৩০ হাজার কেলভিন ডিগ্রী এবং নক্ষত্রগুলির প্রতিটিই বহুল পরিমাণে অতিবেগুনী রশ্মি বিকিরণ করে।

এরূপ নীহারিকার ঘনতর অংশে প্রতি ঘন ইঞ্চিতে পরমাণুর গড় সংখ্যা ১০০০০-এর কাছাকাছি। কিন্তু নীহারিকার বাইরের দিক লঘুতর অংশে এই সংখ্যা ১০-এ নেমে যায়। নীহারিকার মধ্যে পরমাণু বণ্টনের ক্ষেত্রে চরমভাব লক্ষণীয়। পরমাণুগুলি প্রায় ১০ হাজার ডিগ্রী উষ্ণতাসম্পন্ন হয়ে নীহারিকার মধ্যে ঘুরে বেড়ায়।

নীহারিকার কথা অতি সংক্ষেপে বলা হলো। নীহারিকার বিষয়ে একটি কথা না বললে বক্তব্য অসম্পূর্ণই থেকে যায়। সেটি হলো বৈজ্ঞানিক লাপ্লাসের নীহারিকা-ভিত্তিক প্রকল্প। এই প্রকল্প অনুসারে সৌরজগৎ আদি অবস্থায় গঠিত ছিল ধীরে ধীরে ঘূর্ণায়মান নীহারিকার মত পদার্থ দিয়ে। প্রথমাবস্থায় এই পদার্থ ছিল অত্যন্ত উত্তপ্ত এবং গ্যাসীয়। ক্রমে ক্রমে এই নীহারিকার মত পদার্থ শীতল হতে থাকে এবং শীতল হবার সঙ্গে সঙ্গে সঙ্কুচিত হয়ে যায়। সঙ্কুচিত হবার সময় বাইরের দিক থেকে তার উপাদান দিয়ে গঠিত একটি বলয় খসে যায়। এই বলয়টি দৈর্ঘ্য বরাবর নিজেকে টানে। তার ফলে গ্রহে রূপান্তরিত হয়ে প্রধান অংশের চতুর্দিকে ঘুরতে থাকে। আবার এই গ্রহটি ক্রমে শীতল হবার পথে তার প্রান্তদেশ থেকে অনুরূপ বলয় ত্যাগ করে এবং তার ফলে উপগ্রহ সৃষ্টি হয়ে গ্রহের চারধারে ঘুরতে থাকে। পুনঃ পুনঃ সঙ্কোচনের ফলে মূল নীহারিকাটি একাধিক বলয় ত্যাগ করে বিভিন্ন গ্রহের সৃষ্টি করেছে। শেষে সৃষ্ট গ্রহগুলি ক্রমশঃই মূল অংশের কেন্দ্রের নিকটবর্তী ছিল বেশী। তার ফলে বিভিন্ন গ্রহ বিভিন্ন দূরত্বে অবস্থান করে মূল কেন্দ্রীয় গ্যাসীয় পিণ্ডের চারধারে ঘুরতে থাকে। অবশেষে তারা সুসংবদ্ধ জ্যোতিষ্কে পরিণত হয়। এই জ্যোতিষ্কই হলো সূর্য, যার চতুর্দিকে গ্রহগুলি প্রদক্ষিণ করছে। এই হলো লাপ্লাসের নীহারিকা প্রকল্প। বিশ্ব-সৃষ্টির রহস্য অনুধাবনে তাঁর প্রকল্প একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে রয়েছে।

অপরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য

আবিষ্কারের কাহিনী

তোমরা বোধ হয় অনেকেই জান যে, আমাদের দেশে এক সময়ে নীলের চাষ হতো। সেই সময়ে নীলকর সাহেবরা আমাদের দেশের গরীব চাষীদের উপর অকথ্য নির্যাতন চালিয়ে তাদের দিয়ে নীলের চাষ করিয়ে প্রচুর অর্থোপার্জন করতো। দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণ নাটকে সেই অত্যাচারের কাহিনীর বর্ণনা আছে। আশা করি, সেই নাটকটি তোমরা অনেকেই পড়েছ বা দেখেছ। এই সব কারণেই আমাদের দেশ থেকে নীলের চাষ উঠে যায়। নীলকরদের অত্যাচারে জর্জরিত চাষীরা এক সময় বিদ্রোহ ঘোষণা করে। বিদ্রোহের আগুন যখন সর্বত্র জ্বলে ওঠে, তখন সাহেবরা পালিয়ে বাঁচে। ফলে অত্যাচারিত চাষীরা মুক্তি পায়, কিন্তু নীলচাষ উঠে যায়। অবশ্য উঠে যাবার প্রধান কারণ এটা হলেও, আরো একটি কারণ ছিল। সেটি হলো কৃত্রিম নীল প্রস্তুতের উপায় আবিষ্কার। আজকাল কৃত্রিম নীলই আমরা ব্যবহার করে থাকি। চাষের সাহায্যে বরাবরই নীল তৈরি করা হতো। নীল তৈরির সহজ উপায় শেষ পর্যন্ত আকস্মিকভাবেই আবিষ্কৃত হয়।

রসায়নবিদেরা গবেষণা করে একটি সূত্র বের করলেন। সূত্রটি হলো, যদি কোন প্রকারে ন্যাপ্‌থালিনের সঙ্গে অক্সিজেনের রাসায়নিক সংযোগ ঘটানো যায়, তাহলে কৃত্রিম নীল তৈরি করা সম্ভব। কিন্তু শত চেষ্টা করেও তাঁরা পারলেন না ন্যাপ্‌থালিনের সঙ্গে অক্সিজেনের সংযোগ ঘটাতে। তাই বলে হাল ছাড়লেন না বিজ্ঞানীরা। গবেষণা চালিয়ে তাঁরা কৃত্রিম নীল তৈরির যে উপায় উদ্ভাবন করেন, তাতে নীল তৈরি করতে দীর্ঘ সময় লাগে, ফলে নীল তৈরিতে লাভ হয় না।

একদিন একটি পাত্রে এই পরীক্ষা চলছিল। আর তাতে লাগানো ছিলো উত্তাপ মাপবার একটি থার্মোমিটার। সেদিন ঘটে গেলো এক অঘটন। অসাবধানতায় ভেঙ্গে গেল থার্মোমিটারটি। ফলে শাপে বর হলো। তার ভিতরকার পারদটুকু ছিট্‌কে গিয়ে পড়লো পাত্রের মধ্যে, যেই না পড়া অমনি এক ভৌতিক ব্যাপার ঘটে গেল। দেখা গেল—প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ন্যাপ্‌থালিনের সঙ্গে অক্সিজেনের রাসায়নিক সংমিশ্রণ ঘটে গেছে। আর এই ঘটনাটিই বহু প্রত্যাশিত কৃত্রিম নীল উৎপাদনে সাহায্য করলো। ফলে আমাদের দেশ থেকে নীলের চাষ এক রকম উঠেই গেল।

কিন্তু একবার ভেবে দেখ তো, যে নীল উৎপাদনে বিজ্ঞানীরা মাসের পর মাস, বছরের পর বছর গবেষণা চালিয়ে নাজেহাল হয়েছেন, আকস্মিকভাবে থার্মোমিটারটি ভেঙে গিয়ে পারদ মিশ্রিত হবার ফলে সেই সমস্যার সহজ সমাধান সম্ভব হলো। বিজ্ঞানের বহু আবিষ্কারই এমনিভাবে হঠাৎ হয়ে গেছে।

সুনীল সরকার

হাইড্রা

হাইড্রা এক প্রকার অতি ক্ষুদ্র প্রাণী। ইহাদিগকে শীতের দিনে পুকুর বা জলাশয়ে দেখা যায়। জলাশয়ের জল কোন কারণে দূষিত বা নোংরা হইলে ইহাদের দেহ সঙ্কুচিত হইয়া গোল আকার ধারণ করে। ইহাদের জলাশয়ে জন্ম আর জলাশয়ে বাস। ইহারা জলজ লতা পাতার সঙ্গে সংযুক্ত হইয়া থাকে। হাইড্রার দেহ সরু ফাঁপা নলের মত। ইহাদের দেহ কয়েক মিলিমিটার লম্বা হইয়া থাকে। এই নলের এক প্রান্ত থাকে বন্ধ, আর এক প্রান্ত কোন জলজ বস্তুর সঙ্গে আটকাইয়া থাকে। দেহের যে অংশের সাহায্যে হাইড্রা জলজ বস্তুর সঙ্গে আট্‌কাইয়া থাকে সেই অংশকে বেসাল ডিস্ক বলে। সাধারণতঃ বেসাল ডিস্কের বিপরীত দিকে একটি উচ্চ কোণাকার অংশ দেখা যায়, তাহাকে হাইপোস্টোম বলা হয়। হাইপোস্টোমের অগ্রভাগে থাকে মুখগহ্বর। এই মুখগহ্বরের সাহায্যে হাইড্রা খাদ্য গ্রহণ করিয়া জীবনধারণ করে। হাইড্রার খাদ্য হইতেছে—জলজ কীট-পতঙ্গের শূককীট, ড্যাফনিয়াজাতীয় অতি ক্ষুদ্রকায় প্রাণী। হাইড্রা অজীর্ণ খাদ্য অতিরিক্ত জলের সহিত মুখগহ্বর দিয়া বাহির করিয়া দেয়। হাইড্রা তাহার কাছাকাছি বা নাগালের মধ্যে খাদ্য না পাইলে খুবই ব্যস্ত হইয়া পড়ে এবং দেহ সঙ্কুচিত করিয়া গোল হইয়া যায়। মুখগহ্বরের উপরিভাগে ছয়টি বা আটটি পাত্‌লা সুতার ন্যায় এক ধরণের জিনিষ দেখা যায়, সেগুলিকে কর্ষিকা বলে। এই কর্ষিকার ধারে ধারে বহু কোণাকৃতি উচ্চস্থান দেখা যায়। হাইপোস্টোমের নীচে বা দেহের ধারে ধারে এক বা একাধিক ছোট কোণাকৃতি অংশ দেখা যায়, তাহাকে শুক্রাশয় বলে। বেসাল ডিস্কের উপরিভাগে শুক্রাশয়ের চেয়েও বড় একটি কোণাকৃতি অংশ আছে, তাহাকে অণ্ডাশয় বলে। হাইড্রার একই দেহে উভয় লিঙ্গ বিদ্যমান। হাইড্রার কুঁড়ি কোণাকৃতি হইয়া থাকে এবং কিছুদিন পরে লম্বা এবং সরু নলের মত আকার ধারণ করে। তারপর ঐ নলে মুখগহ্বর জন্মায় এবং ঐ মুখগহ্বরকে বেষ্টন করিয়া কর্ষিকা গজায়। ইহার পর কুঁড়িটি একটি নূতন হাইড্রার রূপ গ্রহণ করে। এইরূপে একটি মাতৃ হাইড্রা হইতে এক বা একাধিক হাইড্রার উদ্ভব হয়। হাইড্রা অন্যান্য প্রাণীদের ন্যায় হাঁটিতে পারে। এই হাঁটা পাঁচ রকমের হইতে পারে যেমন—(১) হামাগুড়ি দিয়া চলা, (২) ডিগবাজি দিয়া চলা, (৩) সাঁতরাইয়া চলা, (৪) হড়কাইয়া চলা, (৫) গুড়ি মাড়িয়া চলা। পৃথিবীতে নানা রকমের হাইড্রা দেখা যায়, তাহার মধ্যে আমাদের দেশে সাধারণতঃ দুই রকমের হাইড্রা দেখিতে পাওয়া যায়, যথা—ধূসর রঙেরটিকে হাইড্রা ভালগারিস ও সাদা রঙেরটিকে পেলামটোহাইড্রা অ্যালিগ্যাকটিস বলে।

শ্রীপ্রবীরকুমার বিশ্বাস

অ্যালুমিনিয়াম-যুগ

সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আত্মরক্ষার উপযোগী অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যান্য নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিষ তৈরি করবার জন্যে মানুষ যে সব ধাতব ও অধাতব পদার্থ ব্যবহার করতো তাদের নামানুসারে বিভিন্ন যুগের নামকরণ করা হয়ে থাকে, যেমন—পুরা প্রস্তর-যুগ, নব্যপ্রস্তর-যুগ, তাম্র-যুগ, ব্রোঞ্জ-যুগ, লৌহ-যুগ ইত্যাদি। একটা বিশিষ্ট জিনিষের নামে সভ্যতার অগ্রগতিকে সহজেই বোঝানো চলতে পারে।

সভ্যতার সূচনায় মানুষের জীবনযাত্রার যুগটিকে চিহ্নিত করা হয়েছে পুরাতন প্রস্তর-যুগ রূপে। আর একটু উন্নতির পর এসেছে নব্যপ্রস্তর-যুগ। তার পর এসেছে তাম্র-যুগ, ব্রোঞ্জ-যুগ প্রভৃতি।

পাথরের যুগ ছেড়ে ধাতুর যুগে মানুষের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। পাথর ছেড়ে যেদিন মানুষ ধাতুর সন্ধান পেয়েছে, সে দিনই তার যথার্থ উন্নতি সুরু হয়েছে বলা চলে। প্রয়োগ নৈপুণ্যের উন্নতি এবং অপরিচিত ধাতুর আবিষ্কার ও তার সার্থক প্রয়োগ সভ্যতার যথার্থ অগ্রগতিই সূচিত করে। একটা যুগে যে ধাতুর ব্যবহার সব চেয়ে বেশী হয়ে থাকে, সেই অধ্যায়টিকে সেই ধাতুর যুগ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। অবশ্য সাধারণভাবে আমরা যে যুগে কোনও ধাতু সবচেয়ে বেশী ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়ে থাকে, তাকে সেই ধাতুর যুগ হিসাবেই চিহ্নিত করে থাকি। বর্তমান সভ্যতা লোহাকে অবলম্বন করে এগিয়ে চলেছে। বর্তমান যুগ তাই লৌহ-যুগ। আজ পৃথিবীতে বছরে প্রায় ২০ কোটি টন করে লোহা খরচ করা হচ্ছে। আর খনিতে আজও যা খনিজ পদার্থ সঞ্চিত আছে, তাতে মাত্র ৬০-৭০ বছর পর্যন্ত চলতে পারে।

অবশ্য সতর্কভাবে বলতে গেলে বর্তমান যুগকে পরিবর্তনের যুগ বলা যেতে পারে। লোহার বদলে আজ নতুন কিছু সেই যুগকে দখল করে তার কাজ চালাতে চাইছে। আর তাই লৌহ-যুগ শেষ হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই এই শূন্যস্থান পূরণের জন্যে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে অ্যালুমিনিয়াম এবং প্লাষ্টিক। দুটিই আমাদের অতি পরিচিত। কিন্তু জীবনের সব ক্ষেত্রে প্লাষ্টিকের চালু হতে আরও কিছুটা দেরী আছে।

এখন রূপার মত চক্‌চকে যে ধাতুটি লোহার কাজ চালাবে, তা হচ্ছে অ্যালু-মিনিয়াম। হয়তো আগামী যুগ হবে অ্যালুমিনিয়ামের যুগ। অথচ আজ অ্যালু-মিনিয়াম প্রচুর পরিমাণে (প্রতি বছর প্রায় ৩×১০^{৫} টন করে ব্যবহৃত হলেও এই ধাতুটি কিন্তু খুব বেশী দিন আগেও মানুষের পরিচিত ছিল না।

মাত্র ১৪৩ বছর আগে, অর্থাৎ ১৮২৭ সালে Wohler অ্যালুমিনিয়াম ধাতুটি আবিষ্কার করেন। কিন্তু এর শিল্পভিত্তিক নিষ্কাশন সুরু হয়েছে আরও অনেক পরে, মাত্র ১৮৮৬ সালে। আমেরিকার ছাত্র চার্লস মার্টিন হল সেদিন যুগান্তরের সূচনা করেছিলেন। অবশ্য সমসাময়িক কালে ফরাসী বৈজ্ঞানিক Heroult-ও স্বাধীনভাবে একই পদ্ধতিতে অ্যালুমিনিয়াম আবিষ্কার করেন।

বর্তমানে বিশুদ্ধ অ্যালুমিনিয়াম তৈরি করা হয় বক্সাইট আকরিক থেকে। শুনে অবাক হবে যে, এই ধাতুটি ১৮৫০ সালেও এত মূল্যবান ছিল যে, এক কিলোগ্র্যাম অ্যালুমিনিয়ামের দামই ছিল প্রায় ২,৫০০ টাকা। আর আজ অ্যালুমিনিয়ামের দাম সে তুলনায় কত কম, তা তোমরা জান।

অ্যালুমিনিয়াম নামটি মূলতঃ এসেছে অ্যালাম থেকে। অথচ অ্যালুমিনিয়াম আবিষ্কারের অনেক আগে থেকেই অ্যালাম ও অ্যালুমিনা জাতীয় যৌগের সঙ্গে মানুষের পরিচয় ছিল। স্ফটিক অ্যালাম-এ ধাতু হিসাবে প্রায় শতকরা ৬ ভাগে অ্যালুমিনিয়াম পাওয়া যায়।

পৃথিবীতে যে সব ধাতু পাওয়া যায়, তাদের মধ্যে প্রাচুর্যের হিসাবে আলুমিনিয়ামের স্থান তৃতীয়। সবচেয়ে বেশী আছে অক্সিজেন ৪৯.৮৫%, বালি (সাধারণ বালি 'সিলিকা' এবং অক্সিজেনের যৌগ) পাওয়া যায় ২৬.০৩%। আর পৃথিবীর উপরিভাগের সমস্ত পদার্থের ৭.২৮% ভাগ অ্যালুমিনিয়াম দিয়ে তৈরী, অথচ সে হিসাবে লোহার পরিমাণ ৪.১২%।

মাটিতে প্রচুর পরিমাণে অ্যালুমিনিয়াম পাওয়া যায়। কিন্তু রসায়নবিদ্যার এত উন্নতি সত্ত্বেও আজও 'ক্লে' থেকে অ্যালুমিনিয়াম বের করবার পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয় নি। অবশ্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বৈজ্ঞানিকেরা এসম্পর্কে গবেষণা চালাচ্ছেন। সম্প্রতি পোলাণ্ডের বৈজ্ঞানিকেরা জানিয়েছেন যে, তাঁরা 'ক্লে' থেকে এই ধাতু নিষ্কাশনে সক্ষম হয়েছেন। কিন্তু এই পদ্ধতিতে ধাতু নিষ্কাশন যাতে খুব সহজে এবং সুলভে হয়, বৈজ্ঞানিকেরা সে ব্যাপারে চেষ্টা করছেন।

অ্যালুমিনিয়াম আজ সর্বত্রই ব্যবহৃত হচ্ছে। অ্যালুমিনিয়ামে মরচে ধরে না। তাছাড়া এই ধাতু জল থেকে মাত্র ২.৭ গুণ ভারী, অথচ লোহা জল থেকে প্রায় ৮ গুণ ভারী। সেজন্যে অটোমোবাইল শিল্পে এর চাহিদা বেড়ে গিয়েছে। কেবলমাত্র বিমান বা মোটরগাড়ীর কাঠামোই নয়, শতকরা ২৫ ভাগ ইঞ্জিনও এই ধাতু দিয়েই তৈরি হচ্ছে। রেলওয়ে বগি এবং ই. এম. ইউ কোচও এই ধাতু দিয়েই তৈরি হচ্ছে।

হাল্কা, টেক্‌সই এবং তাপের ভাল পরিবাহী বলে গৃহকর্মের বাসনপত্রও এই ধাতু দিয়েই আজকাল প্রচুর পরিমাণ তৈরি করা হয়। বিদ্যুৎ পরিবহনের জন্যেও আজকাল তামার বদলে অ্যালুমিনিয়ামই ব্যবহৃত হচ্ছে। টেলিগ্রাফের যন্ত্রাদির

জন্যে অ্যালুমিনিয়াম ব্যবহার করা হয়। বিভিন্ন যন্ত্রের নল, টিউব প্রভৃতি নির্মাণে অ্যালুমিনিয়ামের ব্যবহার বাড়ছে। অ্যালুমিনিয়াম ধাতু হিসাবে খুবই নরম। রোলারের সাহায্যে উচ্চ চাপে অ্যালুমিনিয়াম থেকে খুব পাতলা পাত্ তৈরি করা যায়। এই রকম পাতের বেধ প্রায় এক ইঞ্চির হাজার ভাগের এক ভাগও হয়ে থাকে। সিগারেটের প্যাকেটে, জুতার কালির কৌটায়, চকোলেট মুড়বার কাজেও এই রকম পাতের বহুল ব্যবহার তোমরা দেখে থাকবে। থারমিট বোমা এবং অ্যামোনাল তৈরিতে এর ব্যবহার আছে। কালিপূজার বাজী তৈরিতে অ্যালুমিনিয়াম-চূর্ণ তোমরা তো সবাই প্রায় ব্যবহার করে থাক। অ্যালুমিনিয়াম-চূর্ণ তিসির তেলের সঙ্গে মিশিয়ে রং হিসাবেও ব্যবহার করা হয়।

তোমরা থারমিট পদ্ধতির কথা হয়তো শুনে থাকবে। ভাঙ্গা রেললাইন জোড়া দেওয়া, বীম জোড়া দেওয়া, এছাড়া যেসব বড় বড় যন্ত্রপাতি সহজে সরানো সম্ভব নয়, সেগুলির সারাবার কাজে এই পদ্ধতির প্রয়োগ করা হয়। আর এতেও প্রধান উপকরণ হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে অ্যালুমিনিয়াম। সত্য কথা বলতে কি, এই পদ্ধতির মূল তত্ত্বটি অ্যালুমিনিয়ামেরই একটি বিশিষ্ট ধর্মের উপর নির্ভরশীল। সার্চলাইটের জন্যে বিরাট প্রতিফলক দর্পণ তৈরির কাজে আজকাল অ্যালুমিনিয়াম ব্যবহার করা হচ্ছে। এছাড়া অ্যালুমিনিয়ামের পাত্ দিয়ে বাড়ী তৈরির কথাও তোমরা হয়তো শুনে থাকবে। পুল তৈরিতেও এই ধাতুর ব্যবহার হচ্ছে। লোহা এবং ইস্পাতশিল্পেও অ্যালুমিনিয়ামের ব্যবহার আছে। অ্যালুমিনিয়াম যোগ করলে গলিত ইস্পাতে দ্রবীভূত গ্যাস বেশ পরিমাণে দূর হয়। অনেক সময় বড় বড় অডিটোরিয়ামে গান, অভিনয় কিংবা বক্তৃতা হলে শ্রোতারা খুব ভাল করে শুনতে পায় না। এই অসুবিধা দূর করার জন্যে ইঞ্জিনীয়াররা একটা নতুন উপায় বের করার কথা চিন্তা করেন। এঁরা অডিটোরিয়ামের ছাদ তৈরি করবার সময় নানা দিক থেকে নানারকম ভাবে সেখানে ছোট ছোট অ্যালুমিনিয়ামের টুক্‌রা আটকে দেন। অ্যালুমিনিয়ামের টুক্‌রা ব্যবহারের ফলে ঘরের মধ্যে কোন রকম প্রতিধ্বনির সৃষ্টি হয় না। ফলে ঘরের মধ্যের সব রকম আওয়াজ খুব স্পষ্টভাবে শুনতে পাওয়া যায়। তাছাড়া অ্যালুমিনিয়ামের টুক্‌রাগুলি একটা বিশিষ্ট ভঙ্গীতে আট্‌কাবার ফলে রাতে সেগুলির উপর আলো প্রতিফলিত হয়ে ঘরটি আরও উজ্জ্বল হয়। অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল ব্যবহারে আমেরিকান বৈজ্ঞানিকেরা নানারকম সব্জীর উৎপাদন বাড়াতে সক্ষম হয়েছেন। এই হলো ধাতুটির ব্যবহারের কথা। তাছাড়া অ্যালুমিনিয়ামের সঙ্কর ধাতুরও (Alloy) নানারকম ব্যবহার আছে।

অ্যালুমিনিয়াম এবং ম্যাগ্‌নেসিয়ামের সঙ্কর ধাতু ম্যাগ্‌নেলিয়াম (অ্যালু ৯৫%); অ্যালুমিনিয়াম, তামা, ম্যাগ্‌নেসিয়াম এবং ম্যাঙ্গানিজের সঙ্কর ধাতু ডুরালুমিন (অ্যালু-৯৫%)

নানারকম যন্ত্রের বিভিন্ন অংশ, বিমান ও মোটরের যন্ত্রপাতি প্রস্তুতিতে এবং ব্যালান্স তৈরির কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

এই সঙ্কর ধাতুগুলি ইস্পাতের মত কঠিন অথচ অ্যালুমিনিয়ামের মতই হাল্কা। অ্যালুমিনিয়াম এবং তামার সঙ্কর ধাতু—অ্যালুমিনিয়াম ব্রোঞ্জ (অ্যালু-১০%) দেখতে অনেকটা সোনার মত। ফটোর ফ্রেম, বাসনপত্র এবং মুদ্রা তৈরির কাজে এর ব্যবহার আছে। ইস্পাত, অ্যালুমিনিয়াম, নিকেল ও কোবাল্টমিশ্রিত সঙ্কর ধাতু Alnico (অ্যালু-১২%) খুব ভাল চৌম্বক পদার্থ এবং একে স্থায়ী চুম্বক হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

চীনামাটির বাসন যা দিয়ে তৈরি হয়, তাকে বলে পোর্সিলেন। কেওলিন, ফেল্‌স্‌পার এবং কোয়ার্জ—এই তিনটি মাটি এবং বালিজাতীয় পদার্থ কাদার মত করে মিশিয়ে নেওয়া হয়। তখন সেগুলি দিয়ে তৈরি করা হয় নানাবিধ জিনিষ। এবার একে পুড়িয়ে নিলে পাওয়া যায় অতি সুন্দর কাপ, ডিস, প্লেট্‌, ফুলদানী প্রভৃতি।

পোর্সিলেনে যে জিনিষটি বেশী রয়েছে, তা হলো অ্যালুমিনিয়াম সিলিকেট। চুনি, পান্না, নীলা, পোখ্‌রাজ প্রভৃতি অলঙ্কার হিসাবে মূল্যবান। অথচ আসলে এগুলি অ্যালুমিনিয়ামের অক্সাইড ছাড়া আর কিছুই নয়। অ্যালুমিনিয়ামের অক্সাইড কোরাণ্ডামও দেখতে খুব সুন্দর। হীরার পরেই এটি দ্বিতীয় কঠিনতম পদার্থ। আজ এভাবে আমাদের জীবনযাত্রার সর্বত্রই অ্যালুমিনিয়ামের বহুল ব্যবহার ঘটছে। ভবিষ্যতে পৃথিবীতে যখন লোহা, তামা প্রভৃতি ধাতুর আকরিক ফুরিয়ে আসবে তখনও অ্যালুমিনিয়ামের অভাব ঘটবে না। আমাদের প্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিষপত্রেই অ্যালুমিনিয়াম বা তার সঙ্কর ধাতু আরও বেশী করে ব্যবহার করতে হচ্ছে এই পরিবর্তনের যুগে।

চুণীলাল রায়

প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন : ভ্যান অ্যালেন বিকিরণ বলয় কি ?

রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, মুর্শিদাবাদ।
কাজলী গুহ, দেবিকা রায় ও স্বপন দত্ত।
কলিকাতা-১২

উত্তর : পৃথিবী থেকে কয়েক হাজার কিলোমিটার দূরে শক্তিশালী তড়িতাবিষ্ট কণিকা দিয়ে পরিবেষ্টিত দুটি অঞ্চল রয়েছে। এদের বলা হয় ভ্যান অ্যালেন বিকিরণ বলয়। পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে প্রথমটির বা অন্তস্তরটির দূরত্ব প্রায় ১৩,০০০ কিলোমিটার এবং দ্বিতীয়টির বা বহিস্তরটির দূরত্ব প্রায় ২৫,০০০ কিলোমিটার। বলয় দুটির আকৃতি প্রায় তৃতীয়ার চাঁদের মত। ভ্যান অ্যালেন বিকিরণ বলয়ের প্রান্তভাগ সুদূর উত্তর ও দক্ষিণ মেরু অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত। এই বিশেষ আকৃতি ও অবস্থিতির সঙ্গে পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রের একটা ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে। বিকিরণ বলয়ের উৎস সম্পর্কে বিভিন্ন মত ও তত্ত্ব আছে। এসবের মধ্যে বার্কল্যাণ্ড ও ষ্টৌর্মারের তত্ত্বই সবচেয়ে যুক্তিসঙ্গত। আন্ত-র্জাতিক ভূ-পদার্থতাত্ত্বিক বৎসরের সর্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক অবদান হচ্ছে এই ভ্যান অ্যালেন বিকিরণ বলয়ের আবিষ্কার। এর পর এই বিকিরণ বলয় সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের আগ্রহ ক্রমশঃই বাড়তে থাকে এবং তাঁরা কৃত্রিম উপগ্রহ প্রভৃতির সাহায্যে এসম্পর্কে গবেষণা চালিয়ে বহু তথ্য জানতে সমর্থ হয়েছেন। বর্তমানে ভ্যান অ্যালেন বলয়ের উপ-রিউক্ত দুটি স্তর ছাড়াও তৃতীয় একটি স্তরের অস্তিত্ব ধরা পড়েছে। এই তৃতীয় স্তরটি বিজ্ঞানীমহলে প্রচুর আলোড়নের সৃষ্টি করেছে। জানা গেছে, অন্তস্তরটি সাধারণতঃ প্রোটন কণিকা দিয়ে তৈরি এবং বহিস্তরটি ইলেকট্রন কণিকা দিয়ে তৈরি। নির্দিষ্ট এক ধরণের কণিকা ছাড়াও উভয় স্তরেই অন্য-ধর্মীয় কিছু কিছু কণিকা পাওয়া যায়। এই সমস্ত কণিকাগুলি আসে সূর্য ও মহাজাগতিক রশ্মি থেকে। বিজ্ঞানীদের ধারণা যে, বহিস্তরের কণিকাগুলি আসে সূর্য থেকে এবং অন্তস্তরের কণিকাগুলি আসে সাধারণতঃ মহাজাগতিক রশ্মি থেকে। এই সমস্ত কণিকাগুলি বিভিন্ন কারণে বিভিন্ন জটিল পথে ঘুরে বেড়ায়। তার কারণ সম্পর্কে এখানে আলোচনা করা সম্ভব নয়।

মানুষের মহাশূন্য যাত্রার ক্ষেত্রে এই বিকিরণ বলয় প্রচণ্ড বাধাস্বরূপ। এই বিকিরণ বলয় আমাদের কিছু উপকার করে কি না তা এখনও জানা যায় নি। এসব বলা সত্ত্বেও কণিকাগুলির উৎপত্তির কারণ, বলয়ের মধ্যবর্তী অঞ্চলের অবস্থা প্রভৃতি অনেক ব্যাপারেই বিজ্ঞানীদের মধ্যে এখনও প্রচুর মতভেদ রয়ে গেছে, এসবের উত্তর সঠিক-ভাবে জানা গেলে পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্র, মহাজাগতিক রশ্মির উৎস প্রভৃতি ব্যাপারে আমরা অনেক কিছুই সুষ্ঠুভাবে জানতে পারবো।

শ্যামসুন্দর দে*

---

* ইনষ্টিটিউট অব রেডিও ফিজিক্স অ্যাণ্ড ইলেকট্রনিক্স, বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাতা-৯।

বিবিধ

মিনি বিমান

নয়াদিল্লী থেকে পি. টি. আই কর্তৃক প্রচারিত এক সংবাদে জানা যায়—ফুটবলের মাঠে নামতে পারে এমন একটি মিনি বিমান সম্প্রতি নয়াদিল্লীতে এসেছে।

দুই ইঞ্জিনের প্রপেলার-চালিত এই মিনি বিমান দেখতে প্রায় এয়ার ট্যাক্সির মত। বিমান-বন্দর থেকে শহরগুলিতে যাত্রীদের পৌঁছে দেওয়াই এর কাজ। বসার আসন আছে নয় জনের।

বিমানটি তৈরি করেছেন মেসার্স বৃটেন-নরম্যান লিঃ, খরচ হয়েছে সাড়ে ছয় লক্ষ টাকা। মাইল প্রতি চালাবার খরচ হয় ছয় পেনি।

টেষ্ট-টিউব বেবী

বার্মিংহাম থেকে রয়টার কর্তৃক প্রচারিত এক সংবাদে জানা যায়—বার্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভ্রূণতত্ত্বের অধ্যাপক ডক্টর কোহেন বলেন, সন্তান ধারণের ক্ষমতা যাঁদের নেই, সে সকল নারীদের ডিম্ব নিয়ে টেষ্ট-টিউবে ভ্রূণ সৃষ্টি করে অতঃপর সেটি পূর্ণ পরিণতির জন্য অন্য মায়ের গর্ভে রেখে আসা যেতে পারে। অন্য নারীর জন্যে যিনি আপন গর্ভে সন্তান বহন করে চলবেন, তাঁকে ৩ হাজার পাউণ্ড পর্যন্ত পারিশ্রমিক দেওয়ার প্রস্তাবও তিনি করেছেন।

টেষ্ট-টিউব সন্তান লাভের জন্য শ্রীমতী কেনেথ এলেন যে পরীক্ষায় অবতীর্ণ হচ্ছেন, তা নিয়ে প্রচণ্ড বাদ-বিতণ্ডা সুরু হয়েছে। ডক্টর কোহেন সেই বিতণ্ডায় যোগ দিয়ে বলেন, জীব-জন্তুর ব্যাপারে এই পরীক্ষা ইতিপূর্বেই সফল হয়েছে। মানুষের ক্ষেত্রেও এবছরের মধ্যেই সফল হবার সম্ভবনা। প্রসঙ্গতঃ ডক্টর কোহেন বলেন, দৈহিক সৌন্দর্য অক্ষুণ্ণ রাখার জন্যে অনেক নারী টেষ্ট-টিউবে তাঁদের সন্তান-ভ্রূণ সৃষ্টি করে অন্য মায়ের গর্ভে পূর্ণ পরিণতির জন্যে রেখে আসতে পারবেন।

হেপাটাইটিস রোগের ভাইরাস আবিষ্কৃত

মিলান থেকে রয়টার কর্তৃক প্রচারিত এক সংবাদে জানা যায়—মিলানের একটি গবেষণা পর্ষদ থেকে ঘোষণা করা হয়েছে যে, মানুষের শরীরে যে সব ভাইরাস থাকে, তার মধ্যে সবচেয়ে ক্ষুদ্র ভাইরাসটি চিনতে পারা গিয়েছে। রাসায়নিক দ্রব্যাদি ব্যবহার করে অতিশক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে ভাইরাসটিকে আলাদা করে ধরা হয়েছে।

ঐ পর্ষদের পক্ষ থেকে আরও বলা হয়েছে যে, হেপাটাইটিস ভাইরাস পাওয়া গিয়েছে। এই ভাইরাস আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে হেপাটাইটিস রোগের চিকিৎসার জন্যে ভ্যাক্সিন তৈরির পথ খুলে যেতে পারে।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস কর্তৃক পি-২৩, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬ হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ ৩৭।৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

ত্রয়োবিংশ বর্ষ মে, ১৯৭০

জৈব অর্ধপরিবাহী

শ্রীপ্রদীপকুমার দত্ত*

ছোটবেলায় জানতাম পদার্থের তিন রূপ—কঠিন, তরল ও বায়বীয়। এছাড়া পদার্থকে তার তাপ ও বিদ্যুৎ পরিবহনের ক্ষমতা অনুযায়ী তিন ভাগে ভাগ করা যায়—পরিবাহী, অপরিবাহী এবং পরিবাহী ও অপরিবাহী পদার্থের মধ্যবর্তী পরিবাহিতাবিশিষ্ট অর্ধপরিবাহী। পরিবাহী পদার্থগুলি তাপ ও বিদ্যুৎ খুব সহজে এবং বেশী পরিমাণে বহন করে, আর অপরিবাহী পদার্থগুলি বেশী তাপ ও বিদ্যুৎ পরিবহন করে না। একথাই সাধারণভাবে বলা হয়ে থাকে। কিন্তু বিজ্ঞানে বেশী বা কম কথাটির কোনও অর্থ হয় না, যদি কার তুলনায় বেশী বা কম বলা হচ্ছে—সেটা বলা না হয় অর্থাৎ বিজ্ঞানে বেশী বা কম কথাটি তুলনামূলক। তাই পরিবাহী ও অপরিবাহী পদার্থগুলিকে তাদের রোধাঙ্কের মানের দ্বারা পার্থক্য নিরূপিত হয়। যে পদার্থের রোধাঙ্ক $১০^{-৪}$ থেকে $১০^{-৬}$ ওহ্ম্-সে.মি-এর মধ্যে থাকে, সেগুলিকে বলা হয় পরিবাহী এবং যাদের রোধাঙ্ক $১০^{২২}$ থেকে $১০^{১০}$ ওহ্ম্-সে মি-এর মধ্যে থাকে, তাদের বলা হয় অপরিবাহী। যে সমস্ত পদার্থের রোধাঙ্ক এদের মাঝামাঝি, অর্থাৎ $১০^{৯}$ থেকে $১০^{-৩}$ ওহ্ম্-সে.মি-এর মধ্যে, তাদের বলা হয় অর্ধপরিবাহী (Semi-conductor)। তবে রোধাঙ্ক এই সীমার মধ্যে থাকলেও যদি তড়িৎ আয়নের দ্বারা পরিবাহিত হয়, তবে তাদের অর্ধপরিবাহী বলা হবে না। অর্ধপরিবাহীতে তড়িৎ পরিবহনের মাধ্যম হলো ইলেকট্রন

*পদার্থ-বিজ্ঞান বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান।

ও হোল (Hole)। হোল কি এবং কিভাবে তার উৎপত্তি, সে সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা হবে। অর্ধপরিবাহীর আর একটি প্রধান ধর্ম হলো—এদের তাপমাত্রা বৃদ্ধি করলে রোধ না বেড়ে বরং কমে যায় অর্থাৎ এদের তাপমাত্রার গুণাঙ্ক (Temperature coefficient of resistance) ঋণাত্মক। পরিবাহীর সঙ্গে অর্ধপরিবাহীর এটা একটা উল্লেখযোগ্য পার্থক্য, কারণ পরিবাহীতে তাপমাত্রার সঙ্গে রোধ বাড়ে, অর্থাৎ পরিবাহীর তাপমাত্রার গুণাঙ্ক ধনাত্মক।

বর্তমানে যে সমস্ত অর্ধপরিবাহীর ব্যবহার হয়, তা হলো সিলিকন, জার্মেনিয়াম, ইণ্ডিয়াম, অ্যান্টিমোনাইড জিঙ্ক অক্সাইড প্রভৃতি অজৈব পদার্থ। জৈব পদার্থের মধ্যেও অর্ধপরিবাহীর ধর্ম সম্বন্ধে খোঁজ-খবরের কাজ বেশ কিছুটা এগিয়ে গেছে। এর কারণ হলো পৃথিবীতে জৈব পদার্থের সংখ্যা ১০ লক্ষেরও বেশী। যদি জৈব পদার্থেরও অর্ধপরিবাহীর ধর্ম আবিষ্কার করা যায়, তবে অর্ধপরিবাহীর ব্যবহার শুধুমাত্র ২/৪টা অজৈব পদার্থের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, প্রচুর পরিমাণে জৈব অর্ধপরিবাহী মানুষের কাজে আসবে।

বর্তমান শতাব্দীর গোড়ার দিক থেকেই জৈব পদার্থে ইলেকট্রনের দ্বারা তড়িৎ পরিবহন সম্বন্ধে গবেষণা সুরু হয়। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে পোচেটিনো প্রথম এসম্বন্ধে কাজ আরম্ভ করেন। তিনি আবিষ্কার করেন যে, কঠিন অ্যান্থ্রাসিনে অতি বেগুনী রশ্মি আপতিত হলে তাতে তড়িতের সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ অ্যান্থ্রাসিনে ফটো পরিবাহিতা দেখা যায়। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে কোয়েনিগসবারজার ও শিলিং দেখান যে, অ্যান্থ্রাসিনের সাধারণ অবস্থাতেও (অর্থাৎ আলোকরশ্মি আপতিত না হলেও) কিছু পরিমাণ পরিবাহিতা আছে। এর পর প্রায় ৩০ বছরেরও বেশী এসম্বন্ধে আর বিশেষ কিছু কাজ হয় নি—মাঝে মাঝে দু-একটা গবেষণা-পত্র অবশ্য প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে সেন্ট গ্রেগরির একটি প্রস্তাবনা জৈব অর্ধপরিবাহীর গবেষণায় নতুন উদ্দীপনার সঞ্চার করে। তিনি তাঁর প্রস্তাবনায় বলেন যে, এক অণু থেকে অন্য একটি অণুতে π-ইলেকট্রনের গতিবিধি জৈব প্রক্রিয়ায় একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে তিনি বললেন যে, কয়েকটি রঙীন প্রোটিনে ফটো পরিবাহিতার অস্তিত্ব দেখা যায় এবং তা তাঁর আগেকার প্রস্তাবনার যাথার্থ্য প্রতিপন্ন করে। ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দে এসম্বন্ধে নতুন অধ্যায় সুরু হলো। এতদিন শুধু জৈব পদার্থে ইলেকট্রনের দ্বারা তড়িৎ পরিবহনের সম্বন্ধে গবেষণা সীমাবদ্ধ ছিল। এখন অর্ধপরিবাহীর অন্যতম প্রধান ধর্ম অর্থাৎ তাপমাত্রা বৃদ্ধির সঙ্গে পরিবাহিতা বৃদ্ধি—সে সম্বন্ধে জানা গেল ইলের গবেষণায়। তিনি পরীক্ষা করে দেখালেন যে, কয়েকটি থ্যালোসায়ানিনের পরিবাহিতা অজৈব অর্ধপরিবাহীর মতই তাপমাত্রা বৃদ্ধির সঙ্গে বৃদ্ধি পায়। পরবর্তী কালে এই ধর্ম অন্যান্য জৈব পদার্থেও দেখা গেছে। জৈব অর্ধপরিবাহীর গবেষণায় একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো অ্যাকামাটু, ইনোকুচি ও অ্যাটসুনাগা—এই তিন জাপানী বৈজ্ঞানিকের একটি আবিষ্কার। তাঁরা কয়েকটি Charge transfer complex-এর উচ্চ পরিবাহিতা লক্ষ্য করলেন। জৈব অর্ধপরিবাহী সম্বন্ধে আরও গবেষণা হয়েছে এবং হচ্ছে। আমাদের দেশেও কলিকাতার সাহা ইনষ্টিটিউট অফ্ নিউক্লিয়ার ফিজিক্সে এসম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য কিছু কাজ হয়েছে। এপর্যন্ত যে সব জৈব অর্ধপরিবাহী সম্বন্ধে গবেষণা হয়েছে, তাদের মধ্যে অ্যান্থ্রাসিন ও ন্যাপথলিন প্রধান। তাছাড়াও থ্যালোসায়ানিন, পাইরিন প্রভৃতির ধর্ম সম্বন্ধেও কিছু কাজ হয়েছে।

জৈব পদার্থে ইলেকট্রনের দ্বারা তড়িৎ-প্রবাহের কিভাবে সৃষ্টি হয়, তার কোনও সন্তোষজনক ব্যাখ্যা এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। এর একটা প্রধান

কারণ এই যে, জৈব পদার্থে অণুর মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ ধারণা নেই। এটির সমাধান কণাতম বলবিদ্যার দ্বারা করতে হবে। আর তা করতে গেলে প্রথমে পদার্থের শক্তিস্তরগুলির বিস্তার গণনা করতে হবে। যে কোনও পদার্থে ইলেকট্রনের শক্তি অনুযায়ী আমরা তিনটি স্তর পাই—যোজ্যতা স্তর, পরিবাহী স্তর এবং এই দুয়ের মাঝে নিষিদ্ধ স্তর। যদি পরিবাহী স্তরে কোনও ইলেকট্রন থাকে, তবেই পদার্থটি পরিবাহী হয়। পরিবাহী স্তরে কোনও ইলেকট্রন না থাকলে পদার্থটি হয় অপরিবাহী। পরিবাহী পদার্থে যোজ্যতা স্তর ও পরিবাহী স্তর পরস্পরকে অধিক্রমণ করে, অর্থাৎ এক্ষেত্রে নিষিদ্ধ স্তর শূন্য। যদি পরিবাহী ও যোজ্যতা স্তরের মধ্যে ব্যবধান থাকে, তবে যোজ্যতা স্তর থেকে ইলেকট্রন পরিবাহী স্তরে গেলে তবেই পরিবাহিতা দেখা যাবে। পরিবাহী ও যোজ্যতা স্তরের মধ্যে ব্যবধান কম হলে অর্থাৎ নিষিদ্ধ স্তর কম হলে কোনও ভাবে (তাপমাত্রা বৃদ্ধি করে অথবা আলোকপাত করে) ইলেকট্রনকে উত্তেজিত করে যোজ্যতা স্তর থেকে পরিবাহী স্তরে আনা যেতে পারে এবং তখনই কেবল পদার্থটি বিদ্যুৎ পরিবহন করতে পারে। এগুলিই হলো অর্ধপরিবাহী। এদের তাপমাত্রা বৃদ্ধি করলে বেশী ইলেকট্রন যোজ্যতা স্তর থেকে পরিবাহী স্তরে যাবে। ফলে পদার্থটির পরিবাহিতাও বৃদ্ধি পাবে। যোজ্যতা স্তর থেকে ইলেকট্রন চলে যাওয়ায় সেখানে ইলেকট্রনের ঘাটতি হবে এবং যে স্থানে ইলেকট্রনের ঘাটতি হয়, সেখানে সৃষ্টি হবে একটি হোল (Hole), অর্থাৎ হোল হলো কোনও অবস্থানের ইলেকট্রনের ঘাটতি। হোলগুলিকে তাই ধনাত্মক ধরা হয়। একটি ইলেকট্রন যখন পাশের হোলের সঙ্গে সংযুক্ত হয়, তখন ইলেকট্রনের প্রথম অবস্থানে ইলেকট্রন ঘাটতি হয়; ফলে সেখানে হোলের সৃষ্টি হয়। তাই আমরা মনে করতে পারি যেন পূর্বোক্ত হোলটিই স্থান পরিবর্তন করেছে। হোলের এবং ইলেকট্রনের স্থান পরিবর্তন বিক্ষিপ্ত হয়। কিন্তু যখন কোনও বিভব-প্রভেদ থাকে, তখন ইলেকট্রনগুলি ধনাত্মক তড়িদ্দ্বারের এবং হোলগুলি ঋণাত্মক তড়িদ্দ্বারের দিকে অগ্রসর হয়। ফলে তড়িৎ-প্রবাহের সৃষ্টি হয় পদার্থটির অভ্যন্তরে। তাহলে দেখা যাচ্ছে, অর্ধপরিবাহীর ক্ষেত্রে ইলেকট্রন ও হোল—এই দুই-ই বিদ্যুৎ পরিবাহী মাধ্যম। জৈব পদার্থেও এই একই ব্যাপার ঘটে বলে ব্যাখ্যা করা হয়। জৈব পদার্থে তাপ দিলে তা পরিবাহিতা দেখাবে বলে আশা করা যায় এবং যে সমস্ত পদার্থ সত্যই তা করে, তাদের বলা হয় নিজস্ব অর্ধপরিবাহী (Intrinsic semiconductor), যেহেতু এটা পদার্থের নিজস্ব ধর্ম। যদি পদার্থে অবিশুদ্ধতা থাকে, তবে অবিশুদ্ধতার পরিমাণ হ্রাস-বৃদ্ধি করে পরিবাহিতারও হ্রাস-বৃদ্ধি করা যায়, অর্থাৎ অবিশুদ্ধতা নিয়ন্ত্রণ করে পদার্থটির পরিবাহিতা নিয়ন্ত্রিত করা যায়। এই সমস্ত পদার্থকে বলে অবিশুদ্ধ অর্ধপরিবাহী (Extrinsic বা impurity semiconductor), যেহেতু এদের পরিবাহিতা অবিশুদ্ধতার উপর নির্ভরশীল। দুঃখের বিষয় এই যে, এখনও পর্যন্ত জৈব অর্ধপরিবাহীতে অবিশুদ্ধতার ভূমিকা সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান খুবই অল্প। যখন পদার্থে অবিশুদ্ধতার পরিমাণ খুব বেশী থাকে, তখনও তাদের সঠিক পরিমাণ নির্ণয় করা আজও সম্ভব হয় নি।

আলোকপাত না করেও জৈব পদার্থে যে পরিবাহিতা দেখা যায় (যাকে বৈজ্ঞানিক ভাষায় বলা হয় Dark conductivity), তাকে অনেকে জৈব পদার্থটির নিজস্ব অর্ধপরিবাহিতা বলেন। অবশ্য এই ধারণার যথার্থতা সম্বন্ধে কল্প প্রশ্ন তুলেছেন এবং তিনি জৈব অর্ধপরিবাহীতে তড়িৎ পরিবহনের কারণ হিসাবে একটি নতুন তত্ত্বের অব-

তারণা করেন, যেটি হোপিং মডেল নামে পরিচিত।

পূর্বেই অ্যান্থ্রাসিনের ফটো পরিবাহিতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এখন প্রশ্ন হলো এই যে, পরিবাহিতার জন্যে প্রয়োজনীয় তড়িদ্বাহীর উৎস কি? প্রথমে ধরে নেওয়া হয়েছিল যে, নিজস্ব অর্ধপরিবাহীর মত এখানেও বিভেদ স্তর অতিক্রম করে ইলেকট্রনকে উত্তেজিত করায় পরিবাহী পাওয়া যায়। কিন্তু পরবর্তী পরীক্ষায় এই তত্ত্ব ভুল বলে প্রমাণিত হয়। কি ভাবে তড়িৎ-বাহীর উৎপত্তি হয়, তা নির্ণয় করবার জন্যে আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের সঙ্গে তড়িদ্বাহীর সংখ্যার নির্ভরতা পরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে দেখা গেল যে, তড়িদ্বাহীর উৎপত্তি হয় পদার্থের তলে উত্তেজকের অভিব্যাপনের জন্যে। বর্তমান কালে এরেমেন্‌কো ও মেড্‌ভেডেভ এই একই সিদ্ধান্তে উপনীত হন। কল্‌ম্যান ও পোপ দেখেন ফটোতড়িতের পরিমাণ পদার্থের তলের উপর নির্ভরশীল।

জৈব অর্ধপরিবাহীতে চাপের প্রভাব সম্বন্ধে কয়েকজন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, চাপ বাড়ালে পদার্থের পরিবাহিতাও বৃদ্ধি পায় এবং চাপ ৮০ কিলোগ্রাম প্রতি বর্গ সেন্টিমিটারে পৌঁছুলে পর পরিবাহিতার আর কোন বিশেষ পরিবর্তন হয় না। এর কারণ সম্ভবতঃ এই যে, জৈব পদার্থ বেশী সঙ্কোচনশীল। চাপের প্রভাবে জৈব অর্ধপরিবাহীতে যে শুধু পরিবাহিতার পরিবর্তন হয় তাই নয়, উত্তেজক শক্তিরও পরিবর্তন হয়।

কয়েকজন বৈজ্ঞানিক জৈব অর্ধপরিবাহীর উপর গ্যাসের প্রভাব পরীক্ষা করেন, যদিও অক্সিজেন ছাড়া অন্য গ্যাসের প্রভাব সম্বন্ধে গবেষণা বেশী হয় নি। ভারট্যানইয়ান এবং ক্রাইনোয়েল্‌থ্‌ দেখেন যে, অক্সিজেন পরিবেষ্টিত অবস্থায় অ্যান্‌থ্রাসিনের ফটোপরিবাহিতা বৃদ্ধি পায়, কিন্তু নাইট্রোজেন বা আর্গন পরিবেষ্টিত অবস্থায় নয়। এর কারণ হিসাবে বলা হলো জৈব পদার্থের তলের ফটোজারণ। বায়ুর দ্বারা সংপৃক্ত বেঞ্জিন দ্রবণের আপেক্ষিক পরিবাহিতা বেঞ্জিনের আপেক্ষিক পরিবাহিতা অপেক্ষা প্রায় দশ গুণ বেশী। ফটোপরিবাহিতার উপর গ্যাসের প্রভাব মোটামুটি চার রকমের হতে দেখা যায়—(১) যাদের ফটোপরিবাহিতা বৃদ্ধি পায়, কিন্তু গ্যাসের প্রভাবমুক্ত করলেও তা আর পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসে না, (২) যাদের পরিবাহিতা বৃদ্ধি পায়, কিন্তু গ্যাসের প্রভাবমুক্ত হলে আবার পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে, (৩) যাদের পরিবাহিতা কমে এবং গ্যাসের প্রভাবমুক্ত অবস্থাতেও পূর্বাবস্থা প্রাপ্ত হয় না এবং (৪) যাদের পরিবাহিতা কমে এবং গ্যাসের প্রভাবমুক্ত হলে পূর্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়। যে সমস্ত গ্যাসের ইলেকট্রন গ্রহণের ধর্ম দেখা যায়, তাদের প্রভাবে জৈব অর্ধপরিবাহীর ফটোপরিবাহিতা বৃদ্ধি পায়, আর যে সব গ্যাসের ইলেকট্রন বর্জনের ধর্ম আছে, তাদের প্রভাবে ফটোপরিবাহিতা হ্রাস পায়।

পরিশেষে বলা দরকার যে, জৈব অর্ধপরিবাহীর পরিবাহিতা ও ফটোপরিবাহিতা সম্বন্ধে কিছু জানা গেলেও এখনও অনেক কিছুই আমাদের অজ্ঞাত। বিশেষতঃ জৈব অর্ধপরিবাহীর তত্ত্বগত দিক সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় নি।

এখন জৈব অর্ধপরিবাহীর কয়েকটি ব্যবহার ও সম্ভাবনা সম্বন্ধে সামান্য কিছু আলোচনা করছি। ঠিক এখনই এর সম্ভাবনাপূর্ণ ব্যবহারের কথা অনুমান করা সম্ভব নয়। নিঃসন্দেহে বর্তমানে এসম্বন্ধে গবেষণার উদ্দেশ্য হলো—একদিন যাতে এরা অজৈব অর্ধপরিবাহীর স্থান দখল করতে পারে। সে উদ্দেশ্য সফল হওয়া বা না হওয়া ভবিষ্যতের কথা। কিন্তু এটা ঠিক যে, অন্য অনেক গবেষণা মত এই গবেষণার ফল মানুষের কাজে আসবে, মানব-সভ্যতাকে এগিয়ে

নিয়ে যাবে। হয়তো তা হবে অজৈব অর্ধ-পরিবাহীর ব্যবহার থেকে অন্যভাবে। বর্তমানে অষ্ট্রেলিয়ার বৈজ্ঞানিকেরা জল লবণমুক্ত করবার কাজে জৈব অর্ধপরিবাহী ব্যবহার করছেন। লেসার ও মেসারের ক্ষেত্রেও এদের ব্যবহার হচ্ছে। হয়তো একদিন এর সাহায্যে নতুন নতুন যন্ত্রপাতি তৈরি করা সম্ভব হবে এবং বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সেদিন হবে এক দিগন্তের সূচনা।

খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষণে তেজস্ক্রিয় রশ্মির প্রয়োগ

পরিমল চট্টোপাধ্যায়*

নিষ্প্রাণ উদ্ভিদ এবং প্রাণীজ তন্তুসমূহ বিভিন্ন প্রকারের জীবগোষ্ঠীর প্রাণধারণের জন্যে ব্যবহৃত হয়। এই সব পুষ্টিকর দ্রব্য সংগ্রহ করবার জন্যে অহরহ প্রতিযোগিতা চলছে।

একদিকে যেমন দিনের পর দিন শিল্পসমৃদ্ধ দেশসমূহে সংরক্ষিত খাদ্যদ্রব্যের প্রাচুর্য বেড়ে চলছে, অন্যদিকে তেমনি উন্নতিকামী দেশসমূহে এই জাতীয় খাদ্যদ্রব্যের অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। উন্নততর জীবনযাপনের জন্যে মানুষ সর্বদাই খাদ্য-উৎপাদনের এলাকা ছেড়ে শিল্পাঞ্চলে চলে যেতে চায়। এর ফলেই খাদ্য সংরক্ষণ, উন্নত উপায়ে খাদ্যোৎপাদন এবং উন্নততর যোগাযোগ ব্যবস্থার অধিকতর প্রয়োজন হয়ে পড়ে। মূলতঃ খাদ্যোৎপাদন এবং সংরক্ষণ—এই দুটি ব্যবস্থার উপরই খাদ্যদ্রব্যের মূল্যায়ন নির্ভরশীল।

যে সব বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষিত হয়, তাদের মধ্যে পাত্রস্থকরণ (Canning), অনার্দ্রকরণ (Dehydration), হিমায়িতকরণ (Freezing) প্রভৃতি প্রক্রিয়াই বহুল প্রচলিত। তেজস্ক্রিয় রশ্মির সাহায্যে খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষণের ব্যবস্থাই হলো বিজ্ঞানের আধুনিকতম প্রক্রিয়াগুলির অন্যতম।

প্রকৃতিতে যে অবস্থায় খাদ্যদ্রব্য পাওয়া যায়, তাকে সেই অবস্থায় সংরক্ষিত করতে পারাই মানুষের বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। অন্যান্য প্রক্রিয়া থেকে তেজস্ক্রিয় রশ্মি প্রয়োগে খাদ্য সংরক্ষণের প্রক্রিয়ার সুবিধা হলো—এই প্রক্রিয়ায় খাদ্যদ্রব্যের তাপমাত্রার কোনও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয় না, যদিও বা হয়, তা কখনও ৫° ডিগ্রী ফারেনহাইটের বেশী হয় না। এর ফলে তাপমাত্রার পরিবর্তনজনিত খাদ্যবস্তুর গুণাগুণের পরিবর্তন হয় না বললেই চলে। তাই এই প্রক্রিয়াকে অনেকেই শৈত্য-নির্বীজন (Cold sterilization) বলেন। তাছাড়া এই প্রক্রিয়ায় খাদ্য সংরক্ষণের খরচও খুব কম।

এই প্রক্রিয়া সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করবার পূর্বে তেজস্ক্রিয় রশ্মির মাত্রা বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। সাধারণতঃ ১ গ্র্যাম খাদ্যবস্তু কর্তৃক ১০০ আর্গ শোষিত হওয়াকে একক মাত্রার তেজস্ক্রিয়তা বা র‍্যাড (Rad) বলা হয়। যে সব পদ্ধতিতে খাদ্যদ্রব্যের কোষতন্তুগুলির দ্বারা শোষিত তেজস্ক্রিয় রশ্মি মাপা হয়, সেগুলিকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে; যেমন—

(১) প্রাথমিক মানের মাত্রামাপক (Primary standard dosimeter)।

(২) চলমান মানের মাত্রামাপক (Operating standard dosimeter)।

---

*ফুড টেক্‌নোলজি অ্যাণ্ড বায়োকেমিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারীং বিভাগ। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। কলিকাতা-৩২

(৩) সংযত-উৎপাদন প্রক্রিয়ার মাত্রামাপক (Production control dosimeter)।

এই সকল মাত্রামাপকে সাধারণতঃ কোনও জ্ঞাত মানের মাত্রার সঙ্গে তুলনামূলকভাবে মাত্রা নির্ধারণ করা হয়। এস্থলে এই বিষয়ে বিশেষ আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

খাদ্যবস্তুর মত যে কোনও জৈব বস্তুর উপর তেজস্ক্রিয় রশ্মির প্রত্যক্ষ প্রভাবে জটিল জৈব যৌগের জৈব প্রক্রিয়া পরিবর্তিত অথবা বিলুপ্ত হতে পারে। দেখা গেছে, কোন জলীয় পদার্থে তেজস্ক্রিয় রশ্মি পাঠালে জলের অণু বিশ্লেষিত হয়ে অধিকতর সক্রিয় হাইড্রোজেন ও হাইড্রোক্সিল (OH^-) মূলক উৎপন্ন হয়। এই সব রাসায়নিক মূলকের বিজারণ এবং জারণ ক্ষমতা সর্বাধিক এবং এরাই জৈব পরিবর্তন সৃষ্টি করে।

পদ্ধতি: তেজস্ক্রিয় রশ্মির উৎস—পরমাণুর ক্রমিক বিভাজনের ফলে যে শক্তিশালী আল্ফা, বিটা এবং গামা রশ্মি পাওয়া যায়, সেগুলিই খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষণের জন্যে ব্যবহৃত হয়। শক্তিশালী নিউট্রন কণিকা বিক্রিয়ক প্রকোষ্ঠে ব্যবহৃত হলেও তা খাদ্য সংরক্ষণে ব্যবহার করা হয় না; কারণ এতে খাদ্যবস্তুতে তেজস্ক্রিয়তা আবিষ্ট হতে পারে।

পদ্ধতির প্রাথমিক পর্যায়ে তেজস্ক্রিয় রশ্মি জীবকোষে আঘাত করে। এর ফলে জিন মিউটেশন অথবা জীবকোষ সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

দ্বিতীয়াংশে জীবকোষ কর্তৃক তেজস্ক্রিয় রশ্মি শোষণের ফলে সাইটোপ্লাজমে সক্রিয় মাধ্যম সৃষ্টি হয় এবং সেই সঙ্গে নিউক্লিয়াসেরও পরিবর্তন ঘটে। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, তেজস্ক্রিয় রশ্মির প্রভাবে জীবকোষের যে সকল পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়, তা হলো জীবকোষের সম্পূর্ণ বিলুপ্তি, জিন মিউটেশন, নানাপ্রকার বৃদ্ধি মন্দীভূত এবং জীবকোষের বৃদ্ধির জন্যে প্রয়োজনীয় বস্তুর তারতম্য ইত্যাদি।

সাধারণতঃ খাদ্যদ্রব্যের গুণাগুণ এবং মানুষের স্বাস্থ্যের উপর লক্ষ্য রেখে খাদ্যসংরক্ষণে তেজস্ক্রিয় রশ্মির মাত্রা নির্ধারণ করা হয়। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, তেজস্ক্রিয় রশ্মির প্রভাবে প্রোটিন, অ্যামিনো অ্যাসিড, ভিটামিন, শর্করা, স্নেহজাতীয় পদার্থ—এমন কি, খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষণের জন্যে প্রয়োজনীয় নমনীয় মোড়কও আক্রান্ত হয়।

এই প্রতিক্রিয়ায় খাদ্যদ্রব্য জীবাণুমুক্ত করতে প্রতি পাউণ্ড বস্তুর জন্যে প্রতি মেগা র‍্যাডে ১'২ সেন্ট খরচ হয় এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ১ মেগা র‍্যাডেরও কম তেজস্ক্রিয় রশ্মির প্রয়োজন হয়। মানুষের স্বাস্থ্যের পক্ষে তেজস্ক্রিয় রশ্মির সাহায্যে নির্বীজিত খাদ্যদ্রব্য কতটা ক্ষতিকারক, তা এখনও গবেষণাসাপেক্ষ। যে সকল খাদ্যদ্রব্য মানুষের ব্যবহারের জন্যে এই প্রক্রিয়ায় নির্বীজিত করা যেতে পারে, তার মধ্যে নিম্নলিখিত পদার্থগুলি আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের অনুমোদন লাভ করেছে (তালিকা নং ১)।

তালিকা নং ১—মানুষের ব্যবহারের জন্যে অনুমোদিত তেজস্ক্রিয় রশ্মির সাহায্যে নির্বীজিত খাদ্যসমূহ।

খাদ্যদ্রব্য	তেজস্ক্রিয় রশ্মির উৎস	মাত্রা (মেগা র‍্যাড)	উদ্দেশ্য
বেকন	কোবাল্ট ৬০	৪.৫—৫.৬	নির্বীজন
গম এবং গম-জাতীয় খাদ্য	সিজিয়াম ১৩৭	০.০২—০.০৫	পোকা-মাকড় ধ্বংস করা
সাদা আলু	কোবাল্ট ৬০	০.০০৫—০.০১	অঙ্কুরোদ্গম বন্ধ করা
কমলা লেবু	কোবাল্ট ৬০ সিজিয়াম-১৩৭	০.০৭৫—০.২০	ফলের উপরিভাগের জীবাণু বিনষ্ট করা
খাদ্যদ্রব্যের মোড়ক	এক্স রে	১.০ (সর্বোচ্চ)	খাদ্যবস্তুর জন্যে নির্বীজিত মোড়ক

আমাদের দেশে বোম্বাইয়ের কাছে ট্রম্বেতে অবস্থিত ভাবা পরমাণু গবেষণা কেন্দ্রের জৈব রাসায়নিক বিভাগে তেজস্ক্রিয় রশ্মির সাহায্যে মাছ, মাংস প্রভৃতি প্রাণিজ প্রোটিন সংরক্ষণ সম্বন্ধে গবেষণা চলছে। মানব-জাতির কল্যাণে পরমাণু-শক্তির এই জাতীয় প্রয়োগ সাফল্যমণ্ডিত হোক, এই আমাদের একান্ত কাম্য।

ঐতিহাসিক কাজে কম্পিউটার

শিশির নিয়োগী

অটোমেশন ও কম্পিউটার নাম দুটি কেন জানি আজকাল অনেকটা সমার্থক হয়ে গেছে। পারমাণবিক শক্তি এবং পারমাণবিক বোমা যে এক জিনিষ নয়, এটা কাউকে বুঝিয়ে বলতে হয় না। কিন্তু অটোমেশন ও কম্পিউটার দুটা যে এক নয়, এটা এখনও অনেকের জানা নেই। এখনও তারা মনে করেন, কম্পিউটার মানেই অটোমেশন আর অটোমেশন মানেই ছাঁটাই।

আগের দিনে লেখাপড়া যেমন কেবল ব্রাহ্মণেরাই করতেন, পূজাপার্বণে মন্ত্রোচ্চারণের জন্যে, তেমনি কম্পিউটার এতকাল কেবল ইঞ্জিনিয়ার ও অঙ্কশাস্ত্রবিদ্‌দের কাজে লেগে এসেছে। লেখাপড়াটা যেমন কালক্রমে সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে চালু হয়ে এল, তেমনি কম্পিউটার চালু হয়ে যাচ্ছে সবার কাজেই। ডাক্তার, পদার্থবিদ্, উদ্ভিদবিদ্ সবারই প্রয়োজন হচ্ছে কম্পিউটারের। সম্প্রতি ঐতিহাসিকেরাও বলছেন—তাঁদেরও দরকার কম্পিউটারের। সেই কথাই বলছি।

আমেরিকা মহাদেশের মধ্যে মেক্সিকান সভ্যতা খুই প্রাচীন। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে প্রথম একজন আমেরিকান পর্যটক এই প্রাচীন সভ্যতার হদিস্ পান। প্রাচীন যুগের বাড়ীঘর, পিরামিড, মন্দির, স্টেডিয়াম—সব কিছুর গায়ে উৎকীর্ণ ছিল দুর্বোধ্য ভাষায় লেখা অনেক কথা। মানুষ বলতে পারে না কারা কোন্ আমলে এই সব বাড়ীঘর তৈরি করেছিল আর কারাই বা দেবাক্ষরে লিখে রেখে গেছে বিচিত্র এই সব তথ্য। মেক্সিকোর প্রাচীন সভ্যতার যে নিদর্শন পাওয়া যায়, তা দেখলে মনে হয়, ঐ যুগে মেক্সিকানরা ইজিপ্টের প্রাচীন সুসভ্য মানুষের তুলনায় কম ছিল না কোন দিক দিয়ে।

এই প্রাচীন সভ্যতাকে মায়া সভ্যতা আখ্যা দেওয়া হয়েছে। প্রাচীন মায়া সভ্যতার দেশে প্রথম উন্নত ধরণের চাষ-আবাদ সুরু হয়। তারা কোকো, তামাক, ভুট্টা, ভ্যানিলা প্রভৃতির চাষ করতে জানতো। মায়ারা জ্যোতির্বিদ্যায় পারদর্শী ছিল—অঙ্কশাস্ত্রেও তাদের জ্ঞান ছিল অসাধারণ। তারা হিসাব করে চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণের দিন বের করতে পারতো। মঙ্গল এবং অন্যান্য গ্রহের গতিবিধি তারা হিসাব করে ঠিক করতো। মায়ারা বছরকে দিন, ঘণ্টা, মিনিট ও সেকেণ্ডের সাহায্যে হিসাবে করতে ভুল করতো না। বর্তমান কালে আমরা যে গ্রেগরীয়ান ক্যালেণ্ডার ব্যবহার করি, মায়াদের ক্যালেণ্ডার তার চেয়ে অনেক বেশী নির্ভুল ছিল। আর সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা, মায়ারা লিখতে জানতো—আজকের দিনের মত তারা মনের ভাব প্রকাশ করতে পারতো।

এক সময় স্পেন দেশীয় দস্যুরা মায়াদের দেশ দখল করে এবং মায়া সভ্যতার নিদর্শন লুপ্ত করে দেবার জন্যে তখনকার দিনের সুন্দর সুন্দর স্থাপত্যকর্মগুলি ভেঙেচুরে নষ্ট করে দেয়, মূল্য-

খান পুঁথি ও পাণ্ডুলিপি পুড়িয়ে ফেলে। তিনটি পাণ্ডুলিপি আজ পর্যন্তও যা টিকে আছে, সেগুলি আজ মেক্সিকোতে নেই। একখানা আছে প্যারিসে আর একখানা মাদ্রিদে আর তৃতীয়খানা ড্রেসডেনে। এই পাণ্ডুলিপিগুলি কি ভাষায় লেখা, সেটা জানবার জন্যে সেই আমল থেকেই ঐতিহাসিকেরা পাগল হয়েছেন। কিন্তু হাজার চেষ্টা করেও সেগুলির পাঠোদ্ধার সম্ভব হয় নি। দু-খানা মূল্যবান বইও পাওয়া গিয়েছিল। বই দুটি হলো মোটুল ও চিলম বালম। বই দুটি মায়াদের যে ভাষায় লিখিত ছিল, সেটা ছিল বিচিত্র কিন্তু দুর্বোধ্য। অনেক প্রত্নতাত্ত্বিক ও ভাষাবিদ্ সেগুলিকে বোঝবার জন্যে অনেক চেষ্টা করেছেন। কিন্তু যেহেতু তাঁদের গবেষণার মধ্যে চিন্তাসূত্রের ভুল ছিল, সে জন্যে তাঁরা এগুতে পারলেন না মোটেই। যেটুকুও বা এগুলেন, পরে তাঁরাই বুঝলেন ভুল পথে এগিয়েছেন।

মায়াদের লেখা ছিল ছবি দিয়ে ভরা। এখনকার মত অক্ষর ছিল না তাদের। এক একটা ছবি ছিল তাদের ভাবপ্রকাশের ভাষা। অনেক সময় একখানা ছবির সাহায্যে একটা গোটা বাক্যকে বুঝিয়ে দেওয়া হতো। প্রত্যেকটি ছবি ছিল অতীত কোন ঘটনা বা কাহিনীর উপর ভিত্তি করে আঁকা, তাই নব্যযুগের মানুষদের পক্ষে সেই সব প্রাচীন আমলের কাহিনী জানাও সম্ভব ছিল না, ফলে ছবি ভাষার রূপ নিতে পারে নি অনেক দিন পর্যন্ত। এই সব ছবির মধ্যে অনেকগুলি ছিল তখনকার দিনের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ব্যবহারিক ধর্মের রূপে রূপায়িত। আর সবচেয়ে ঝামেলার ব্যাপার ছিল—এই ছবির সংখ্যা এত বেশী ছিল যে, মাথা খারাপ হয়ে যাবার মত অবস্থা আর কি! আমাদের ভাষা প্রকাশ করতে আমরা কয়েকটা বর্ণ বা অক্ষর ব্যবহার করে থাকি। এগুলিকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সাজিয়ে দিলেই এক-একটি অর্থ হয়ে যায়। কিন্তু মায়াদের ছবির অক্ষর ছিল অসংখ্য। তাই এগুলিকে ভালভাবে সাজিয়ে মনে রাখতে না পারলে এ-থেকে পাঠোদ্ধার করা অসম্ভব বই কি! কিন্তু এই অসম্ভবকে সম্ভব করলো কম্পিউটার।

কম্পিউটার তো ছবি চেনে না, চেনে সংখ্যা। সংখ্যা দিয়েই তার কাছে পরিচয় অক্ষরের। বিজ্ঞানীরা মায়াদের সব ছবিগুলিকে কতকগুলি নম্বরের আওতায় এনে ফেললেন। এইভাবে মায়াদের পূজ্য দেব-দেবীরা একটা করে কম্পিউটারের দেওয়া নম্বর পেয়ে গেলেন।

কম্পিউটারের একটা সুবিধা হলো এই যে, এর মগজটা বিশাল, আমরা যেখানে দশ-বিশটা নাম মনে রাখতে পারি না—কম্পিউটার সেখানে লক্ষ লক্ষ নাম চিরদিনের জন্যে তার স্মৃতিতে ধরে রাখতে পারে।

এড্‌গার অ্যালেনপোর কাহিনীতে এক জায়গায় আছে যে, একজন জলদস্যু একটা গুপ্তধনের নিশানা লিখে রেখেছিল কাগজে, যাতে অন্য কেউ সেই নিশানা বুঝতে না পারে। সে জন্যে জলদস্যু ইংরেজী বর্ণমালাগুলির বদলে একটা করে ছবি বসিয়ে দিয়েছিল প্রত্যেকটি বর্ণের জন্যে আলাদা আলাদা ভাবে। যখন সেটা উইলিয়াম লেগরাণ্ড-এর হাতে পড়তেই তিনি বুদ্ধি খাটালেন। তিনি জানতেন যে, ইংরেজী শব্দের মধ্যে ই (E) শব্দটির ব্যবহার সবচেয়ে বেশী। এথেকে তিনি বুঝতে পারলেন যে, গুপ্তলিপির মধ্যে যে ছবিটা বেশী করে ব্যবহার করা হয়েছে, সেটা ই এরই প্রতিকৃতি। এইভাবে ক্রমে ক্রমে অন্যান্য বর্ণগুলিও জানা হয়ে গেল। কিন্তু মায়াদের লিপি উদ্ধার করা এত সহজ ছিল না। কারণ মায়াদের লিপি কেন, ভাষার সঙ্গেও কারও পরিচয় ছিল না। তাছাড়া জলদস্যুর লিপির অর্থ উদ্ধার করতে লেগরাণ্ডকে ইংরেজী ২৬টি বর্ণের প্রতীক হিসাবে কেবলমাত্র ২৬টি বিভিন্ন ছবি নিয়েই খাট্‌তে হয়েছিল। কিন্তু মায়াদের দুটি বই চিলম বালম ও মোটুল থেকে

যথাক্রমে ৬৪০০০ ও ৩৫০০০ শব্দ বাছাই করে বিজ্ঞানীরা শব্দ-সমুদ্রে পড়লেন যেন। তবে তাঁরা এটাও দেখলেন যে, এই শব্দগুলির মধ্যে উ, টি, কা ও টু শব্দগুলি বারবার ব্যবহার করা হয়েছে এবং মোট শব্দের ব্যবহারের মধ্যে এগুলিই ½ অংশ জুড়ে আছে। বিজ্ঞানীরা আরও দেখলেন যে, মায়াদের লিপির মধ্যে আরও বৈচিত্র্য রয়েছে। কোন কোন ছবি শব্দের একটা বর্ণের প্রতিকৃতি হিসাবে কাজ করছে, কোন ছবি শব্দের একটি ভগ্নাংশ বা সিলেব্‌ল্‌-এর জায়গা নিয়েছে, আবার অনেকগুলি ছবি গোটা শব্দকেই বোঝাচ্ছে। কম্পিউটারের বিশাল মগজের মধ্যে এই বিশাল বর্ণ, শব্দাংশ ও শব্দমালাকে ঢুকিয়ে দেওয়া হলো। তারপর এক-একটা করে বাক্যের অর্থোদ্ধার করবার চেষ্টা চললো—অদ্ভুতভাবে কম্পিউটার তার কাজ করে যেতে লাগলো। বাক্য দেবার সঙ্গে সঙ্গেই কম্পিউটার আধুনিক ভাষায় তার অর্থ বলে দিতে লাগলো নিমেষের মধ্যে। কম্পিউটারের জয়-জয়কার হলো।

আর কিছুদিনের মধ্যেই কম্পিউটার আরও অনেক কাজ করতে পারবে। সেকেণ্ডের মধ্যে এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় সব কিছুই অনুবাদ করে দিতে পারবে কম্পিউটার। এখন প্রশ্ন হলো, এসব করবার প্রয়োজন আছে কি? ঐতিহাসিকেরা বলবেন—নিশ্চয়ই আছে। যে মায়া সভ্যতার কিনারা করতে, তাদের ভাষা বুঝতে, যুগ যুগ ধরে অসংখ্য মানুষ অন্ধের মত কেবল খেটেই মরেছে, অর্থোদ্ধার করতে পারে নি একবিন্দুও, কম্পিউটার সেখানে এক বছরের মধ্যেই সব কাজ সেরে ফেললো। মানুষের পক্ষে যা অসাধ্য, কম্পিউটার তা পারে। এমন জিনিষকে কি আমরা দূরে সরিয়ে রাখতে পারি?

তেজস্ক্রিয় অঙ্গার-১৪

রণধীর দেবনাথ

১৯১৪ খৃষ্টাব্দে আবিষ্কৃত হয় তেজস্ক্রিয় অঙ্গার-১৪। অসীম মহাকাশের মধ্য দিয়ে ধাবমান নানারকম রশ্মি পৃথিবীর উপরিস্থিত বায়ুস্তর ভেদ করে ভূপৃষ্ঠে এসে পৌঁছয়। পৃথিবীর পাঁচ মাইল উপরে নাইট্রোজেন পরমাণুর সঙ্গে ওই শক্তিশালী রশ্মিগুলির সংঘর্ষের ফলে তেজস্ক্রিয় অঙ্গার-১৪ পরমাণুর উৎপত্তি হয়। বায়ুমণ্ডলে উৎপন্ন উক্ত অঙ্গার-১৪ পরমাণু অক্সিজেনের সঙ্গে মিলিত হয়ে কার্বন ডায়োক্সাইড তৈরি করে। উদ্ভিদ এই কার্বনডায়োক্সাইড গ্রহণ করে। অনেক জীবজন্তু আবার ওই সব গাছপালা খায়—সেই সঙ্গে অঙ্গার-১৪ পরমাণুগুলি তাদের দেহে প্রবেশ করে। আমরা যখন উক্ত জীবজন্তু ও গাছপালা খাদ্যরূপে গ্রহণ করি, তখন পরোক্ষভাবে অঙ্গার-১৪ আমাদের দেহেও প্রবেশ করে।

কোন প্রাণীর মৃত্যু হলে তার অঙ্গার-১৪ গ্রহণ বন্ধ হয় এবং প্রাণীর দেহস্থ অঙ্গার নির্গত হতে থাকে। মৃত বস্তুর দেহ থেকে কতটা অঙ্গার বেরিয়ে গেছে এবং তাতে কতটা পড়ে আছে, বৈজ্ঞানিকেরা তার পরিমাণ নির্ণয় করতে সক্ষম। মৃতবস্তুর দেহে অবশিষ্ট অঙ্গার-১৪ পরমাণু নির্ধারণের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে বস্তুর প্রাচীনত্ব নির্ণয়ের একটি নূতন পদ্ধতি।

অঙ্গার-১৪ হচ্ছে একটি আইসোটোপ।

আইসোটোপ কি, তা জানতে হলে পরমাণুর গঠন সম্পর্কে কিছু জানা দরকার।

পৃথিবীর যাবতীয় বস্তুই—কঠিন, তরল, বা বায়বীয় যাই হোক না কেন, এক বা একাধিক মৌলিক পদার্থ নিয়ে গঠিত। পৃথিবীতে এইরূপ মোট ৯২টি প্রকৃতিদত্ত মৌলিক পদার্থ আছে। মৌলিক পদার্থের যে ক্ষুদ্রতম অংশে তার স্বকীয় চরিত্র বজায় বা অপরিবর্তিত থাকে, সেই অংশকে বলা হয় তার পরমাণু। পরমাণুর দুটি অংশ—বাইরের অংশকে বলা হয় ইলেকট্রন সেল এবং কেন্দ্রের অংশকে বলা হয় নিউক্লিয়াস। সৌরমণ্ডলে সূর্যকে কেন্দ্র করে গ্রহগুলি যেমন তাদের নির্দিষ্ট পথে সূর্যের চারদিকে অনবরত ঘুরে বেড়ায়, সেরূপ এক বা একাধিক ইলেকট্রন নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে তার চারদিকে অবিরাম আবর্তিত হয়। প্রত্যেক পরমাণুর নিউক্লিয়াসে বা কেন্দ্রস্থলে এক বা একাধিক প্রোটন থাকে। কোন পরমাণুর কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত প্রোটনের সংখ্যা তার ঘূর্ণায়মান ইলেকট্রনের সংখ্যার সমান এবং এই সংখ্যাকে বলা হয় পারমাণবিক সংখ্যা।

পরমাণুর নিউক্লিয়াসের আর একটি প্রয়োজনীয় অংশ হলো নিউট্রন। প্রায় সকল পরমাণুতেই নিউট্রন থাকে। কোন মৌলের ভর-সংখ্যা বলতে আমরা বুঝি, ঐ মৌলের পরমাণুর নিউক্লিয়াসে যে কয়টি প্রোটন ও নিউট্রন আছে সেগুলির সমষ্টি। কোন মৌলের পরমাণুতে নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রোটন থাকে, কিন্তু নিউট্রনের সংখ্যা বিভিন্ন হতে পারে। এতে মৌলিক পদার্থের মৌলিকত্বের কোন পরিবর্তন হয় না—কেবলমাত্র পারমাণবিক ওজনের পার্থক্য ঘটে। সুতরাং একই মৌলিক পদার্থের একাধিক বিভিন্ন ওজনের পরমাণু থাকতে পারে। এই জাতীয় পরমাণুগুলির পারমাণবিক সংখ্যা সমান—প্রোটন ও ইলেকট্রনের সংখ্যাও সমান। কিন্তু বিভিন্ন পরমাণুর কেন্দ্রস্থলে একই সংখ্যক প্রোটন ও বিভিন্ন সংখ্যক নিউট্রন থাকবার ফলে এগুলির পারমাণবিক ওজন বিভিন্ন হয়। এই ধরণের পরমাণুগুলিকে সেই মৌলের আইসোটোপ বলা হয়। অঙ্গার-১৪ হচ্ছে এরূপ একটি আইসোটোপ।

প্রকৃতিদত্ত প্রত্যেক মৌলিক পদার্থেরই আইসোটোপ আছে। আইসোটোপ দুই প্রকারের হয়ে থাকে। একটি হচ্ছে স্থাণু বা স্থির আইসোটোপ—যার কোন পরিবর্তন হয় না, অপরটি হলো অস্থির বা চঞ্চল আইসোটোপ। এই অস্থির আইসোটোপ থেকে তেজস্ক্রিয় রশ্মিপুঞ্জ নির্গত হয় এবং তার স্বরূপ পরিবর্তিত হয়ে যায়। পৃথিবীতে বর্তমানে ৯২টি মৌলিক পদার্থের প্রত্যেকটির ক্ষেত্রেই অস্থির আইসোটোপের সংখ্যা স্থির আইসোটোপের সংখ্যার চেয়ে কম। সত্য কথা বলতে কি, কোন মৌলিক পদার্থের বহুসংখ্যক স্থির আইসোটোপের তুলনায় অস্থির আইসোটোপগুলি বিরল। অঙ্গার-১৪ হচ্ছে অঙ্গারের একটি দুষ্প্রাপ্য অস্থির আইসোটোপ। একলক্ষ কোটি সাধারণ অঙ্গার-পরমাণুর মধ্যে পাওয়া যায় একটি অঙ্গার-১৪ পরমাণু।

অঙ্গার নামক মৌলিক পদার্থের তিনটি আইসোটোপ আছে—অঙ্গার-১২, অঙ্গার-১৩, অঙ্গার-১৪। প্রথমোক্ত দুটি হচ্ছে স্থির আইসোটোপ এবং অঙ্গার-১৪ হচ্ছে অস্থির তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ। অস্থির তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ থেকে তেজস্ক্রিয় রশ্মি নির্গত হয় এবং গাইগার কাউন্টার নামক যন্ত্রের সাহায্যে তা নির্ণয় করা যায়। অঙ্গার-১৪ এবং অন্যান্য সকল প্রকার তেজস্ক্রিয় আইসোটোপগুলির অর্ধ-জীবন বলতে বুঝায়—কোন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আইসোটোপ যতটা তেজস্ক্রিয় রশ্মি ত্যাগ করে, তাতে তার সত্তার অর্ধেকটাই নষ্ট হয়।

বিজ্ঞানীদের ধারণা, অঙ্গার-১৪-এর অর্ধ-জীবন ৫,৫৬৮ বছর। কিন্তু ১৯৬১ সালে মার্কিন সরকারের একটি বিজ্ঞান ও গবেষণা

বিভাগ অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর জানান যে, অঙ্গার-১৪-এর অর্ধ-জীবন হচ্ছে ৫,৭৬০ বছর। অঙ্গার-১৪-এর অর্ধ-জীবনের এই নূতন দৈর্ঘ্য ৫,৭৬০ সমস্ত বিশ্বের বৈজ্ঞানিকেরা এখনও স্বীকার করে নিতে পারেন নি। অর্ধ-জীবনের এই ৫,৫৬৮ সংখ্যাকে কাজে লাগিয়ে দেখা যায় যে, ৩৩,৪০৮ বছর পরে অঙ্গার-১৪ যখন ভেঙে যায়, তখন তার মূল পরিমাণের মাত্র ৳ অংশ টিকে থাকে।

আমরা জানি যে, কোন জীবজন্তুর মৃত্যু হলে তার অঙ্গার-১৪ গ্রহণ বন্ধ হয়, তখন তাতে প্রতি এক লক্ষ কোটি অঙ্গার-১২ পরমাণুর সঙ্গে অঙ্গার-১৪ পরমাণু থাকে একটি। কোন সুপ্রাচীন বস্তুতে অঙ্গার-১৪-এর অবস্থিতি জেনে নিয়ে বৈজ্ঞানিকেরা গত ৪০,০০০ বছরের মধ্যে নির্মিত বস্তুর বয়স নির্ণয় করতে পারেন। তাই এই অঙ্গার-১৪ হচ্ছে কাল নির্ণয়ের চাবিকাঠি। হাজার হাজার বছরের কত লুপ্ত বিস্মৃত কাহিনী আমরা জানতে পারি এই অঙ্গার-১৪-এর কল্যাণে। কোন্ জিনিষ কত পুরনো, তা আজ আমরা বলতে পারি অঙ্গার-১৪-এর দৌলতে। তাই অঙ্গার-১৪ প্রাচীন বস্তুর প্রাচীনত্ব নির্ধারণের প্রধান সহায়।

পাহাড়ে এত ঢেউ কেন ?

সুবিমল সিংহরায়

হিমালয়ের তরঙ্গায়িত বিন্যাসকে প্রস্তরীভূত ঊর্মিমালার সঙ্গে তুলনা করেছিলেন আচার্য জগদীশচন্দ্র। প্রকৃতপক্ষে শুধু হিমালয় পাহাড়ই নয়, সব পাহাড়ই ঢেউয়ের আকারে দূর থেকে দূরান্তরে বিস্তৃত—যেন এই স্তব্ধ তরঙ্গের শেষ নেই। সমুদ্রের উচ্ছল ঢেউয়ের মত যদিও এর অনন্ত গতি নেই, তবু এই বিন্যাসে অসীম বৈচিত্র্য আছে। পাহাড়ের এমনি কোন ঢেউয়ের শিখরে দাঁড়িয়ে দৃষ্টি গভীর উপত্যকার রহস্যময় অন্ধকারে তলিয়ে যায়, মেঘের পাৎলা আবরণের ভিতর থেকে চুঁইয়ে-পড়া গাঢ় নীল আকাশের আভায় উদ্ভাসিত রকমারী সবুজে ঢাকা পাহাড়ের অপূর্ব দৃশ্যে মন অভিভূত হয়ে পড়ে। কিন্তু পাহাড়ের এই বিচিত্র বিন্যাসের কারণ কি ?

পাহাড়ের এই বিচিত্র বিন্যাসের কারণ জানতে হলে পাহাড়ের ইতিহাসের আদিপর্বে ফিরে যেতে হবে। এই পর্বের সুরু একটি সমুদ্র দিয়ে। হিমালয় পাহাড়ের ক্ষেত্রে এই সমুদ্র ছিল বহুদূর বিস্তৃত—চীন থেকে স্পেন, নাম ছিল টেথিস। উত্তরে সাইবেরিয়া আর দক্ষিণে ভারত মহাদেশের পাথর গুঁড়িয়ে অধুনালুপ্ত অতীতের অসংখ্য নদীগুলি পলির স্তূপ নিয়ে ফেলেছিল সেই সমুদ্রে। যুগ যুগ ধরে চলেছিল এই পলির সঞ্চয়। এভাবে টেথিস ক্রমশঃ অগভীর হতে থাকে। তারপর ভূত্বকে বিচিত্র নিয়মে এই পুরু পলির স্তরে উত্তর-দক্ষিণে প্রচণ্ড চাপ পড়লো এবং ধীরে ধীরে সমতল থেকে মাথা তুলে দাঁড়ালো একটি পাহাড়ের শ্রেণী। হিমালয় পাহাড়কে আজকের আকারে এবং উচ্চতায় আসতে কম পক্ষে পাঁচ বার এভাবে মাথা তুলতে হয়েছে। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে পলির স্তর যখন পাহাড়ের উচ্চতায় উঠে আসে, তখন তাপ ও চাপের ফলে সেটা প্রস্তরীভূত হয়ে শক্ত পাথরে পরিণত হয়। আনুষঙ্গিকভাবে এই পাথরে বিচিত্র ভাঁজ (Fold) ও চ্যুতির (Fault) সৃষ্টি হয়।

একটি মোটা কাগজকে দু-দিক থেকে চাপ দিলে যে ধরণের ভাঁজ তৈরি হয়, পাহাড়ের প্রাথমিক অবস্থায় ঠিক সে রকম বিন্যাসের সৃষ্টি হয়। এই প্রাথমিক বিন্যাসের ক্রমবিকাশ ১নং চিত্র থেকে বোঝা যাবে।

যায় যে, সৃষ্টির প্রথম থেকেই পাহাড়ের কোন কোন অঞ্চল পারিপার্শ্বিক অঞ্চল থেকে অনেক বেশী উচ্চতায় উঠে গেছে। সে সব অঞ্চল প্রথম থেকেই তুষারাচ্ছন্ন। তবে পৃথিবীতে প্লাইস্টো-সিন মহাযুগে যখন তুষার যুগ এসেছিল, তখন হিম-
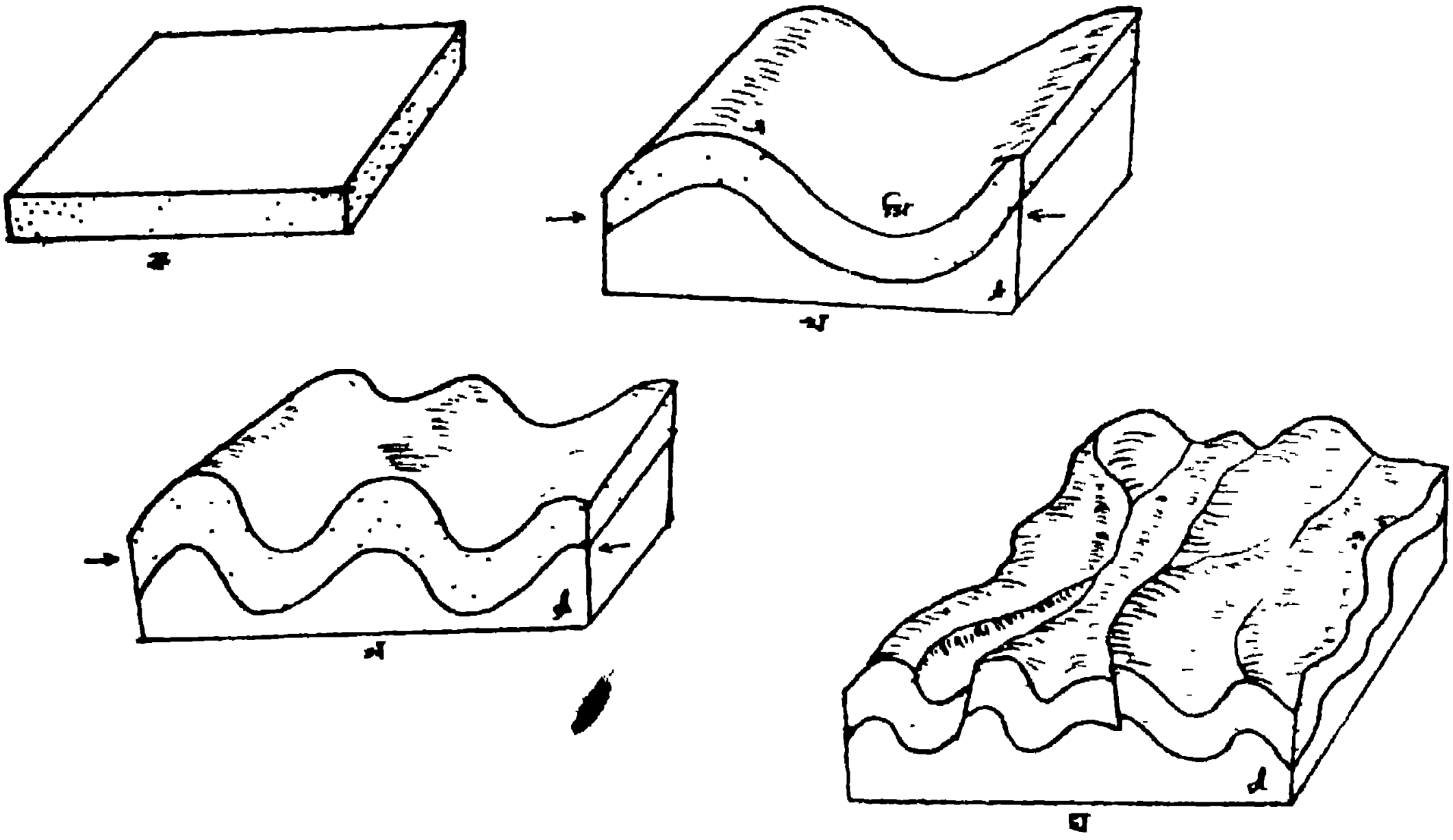
১নং চিত্র

(ক) প্রাথমিক অবস্থায় পলির স্তর। (খ) দু-পাশ থেকে চাপ (তীরচিহ্নিত) পড়বার ফলে পলির স্তরে প্রথমে আল্‌তোভাবে ভাঁজ পড়ে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে পলি প্রস্তরীভূত হয়ে যায়। ভূতাত্ত্বিক পরিভাষায় এই ভাঁজের নাম হলো—অ্যান্টিক্লাইন (Anticline)—স্তরের যে ভাগটি ডুমের আকারে উপরে উঠেছে (এ) এবং সিনক্লাইন (Syncline)—যে ভাগটি উপত্যকার মত নীচে নেমে গেছে (সি)। (গ) দু-পাশের চাপ যতই বাড়তে থাকে, আলতো ভাঁজগুলি অনেক ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং প্রকৃতপক্ষে অগুণ্‌তি অ্যান্টিক্লাইন ও সিনক্লাইনের উৎপত্তি হয়। (ঘ) পরে দু-পাশের চাপের তীব্রতার তারতম্যের ফলে এবং বিভিন্ন পাথরের মৌলিক ধর্মের পার্থক্যের জন্যে এসব অ্যান্টিক্লাইন ও সিনক্লাইন-গুলি এঁকেবেঁকে যায় এবং বড় বড় চ্যুতিরও সৃষ্টি হয়।

সহজ কথায় এই হলো পাহাড়ের ইতিহাসের আদিপর্ব। দ্বিতীয় পর্ব হলো পাহাড়ের সঙ্গে জল, বাতাস ও বরফের লড়াইয়ের ইতিহাস। পাহাড়ের জন্মের যে ধারাবাহিক ইতিহাস ১নং চিত্রে দেওয়া হয়েছে, তাথেকে এটা সহজেই বোঝা

রেখা ঐসব গিরিশৃঙ্গ থেকে নেমে প্রায় সমতলের কাছাকাছি চলে আসে। হিমালয় পাহাড়ের কোলে এর প্রচুর দৃষ্টান্ত আছে। সেই সময় হিমবাহের ঘর্ষণে পাহাড়ের গা থেকে প্রচুর পাথর ক্ষয়ে গেছে। এটা সহজেই অনুমান করা যায়

যে, যেহেতু বিরাটকায় অ্যান্টিক্লাইনগুলি তখন মাথা উঁচু করেছিল, ঘর্ষণের ফলে তাদের প্রাথমিক উচ্চতা বহুলাংশে হ্রাস পেয়ে যায়। অপর পক্ষে সিনক্লাইনগুলি এই ক্ষয়ের হাত থেকে অনেকটা এবং এখনও পাথর কাটছে। একই কারণে সিনক্লাইনগুলি সাধারণতঃ গিরিশৃঙ্গ তৈরি করে; যেমন—কাঞ্চনজঙ্ঘা একটি অতিকায় সিনক্লাইনের উপর অবস্থিত।
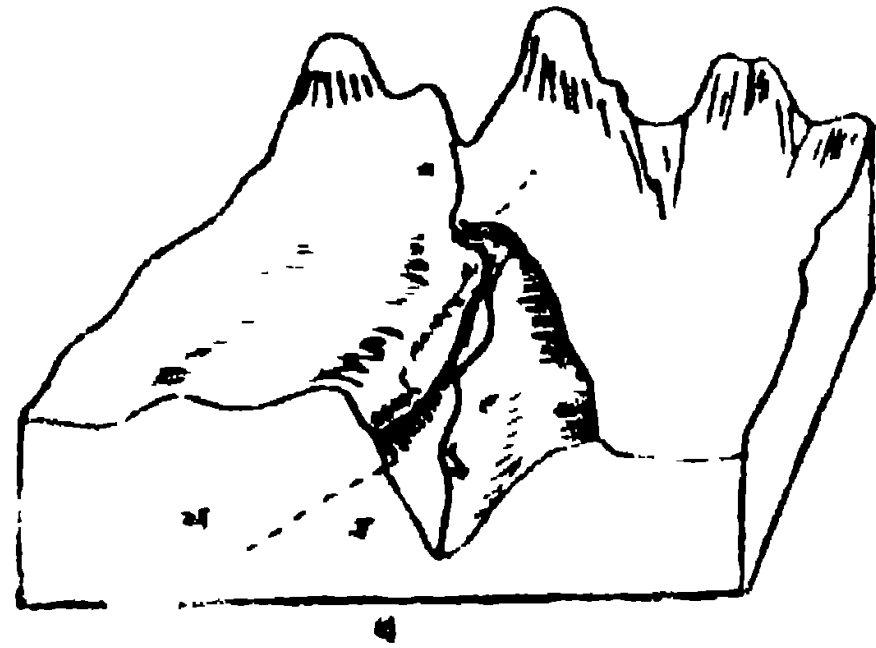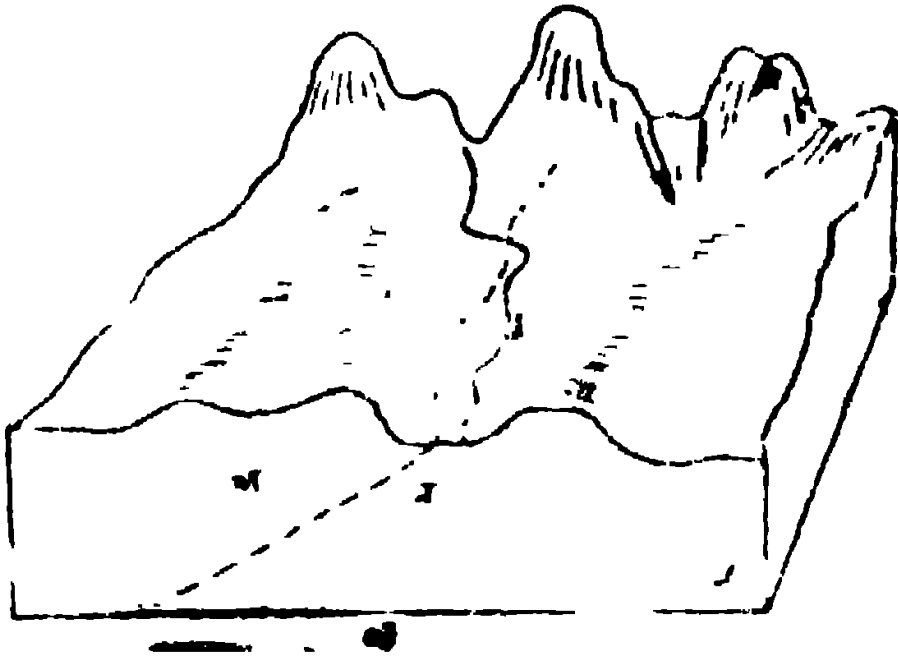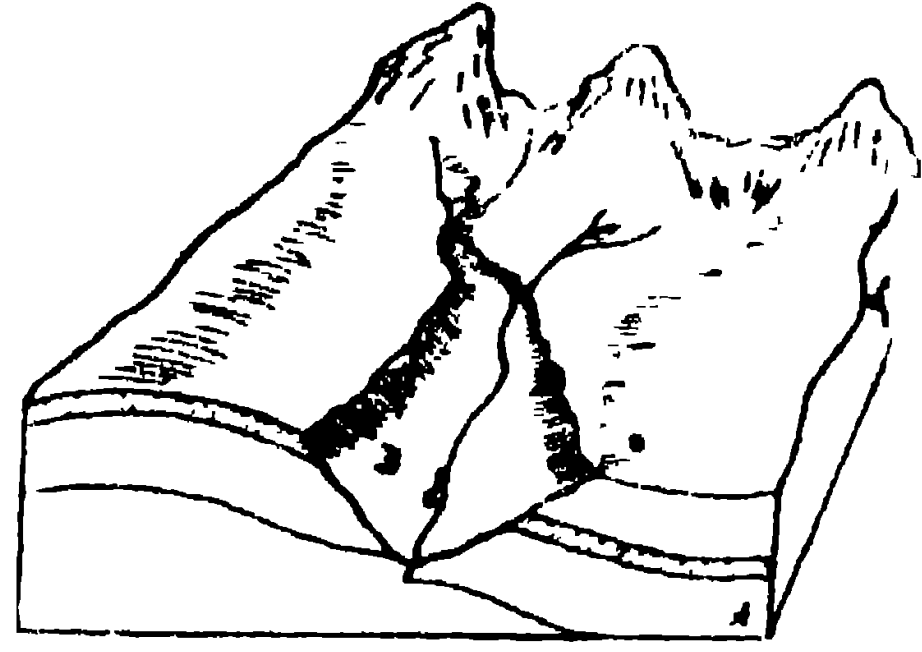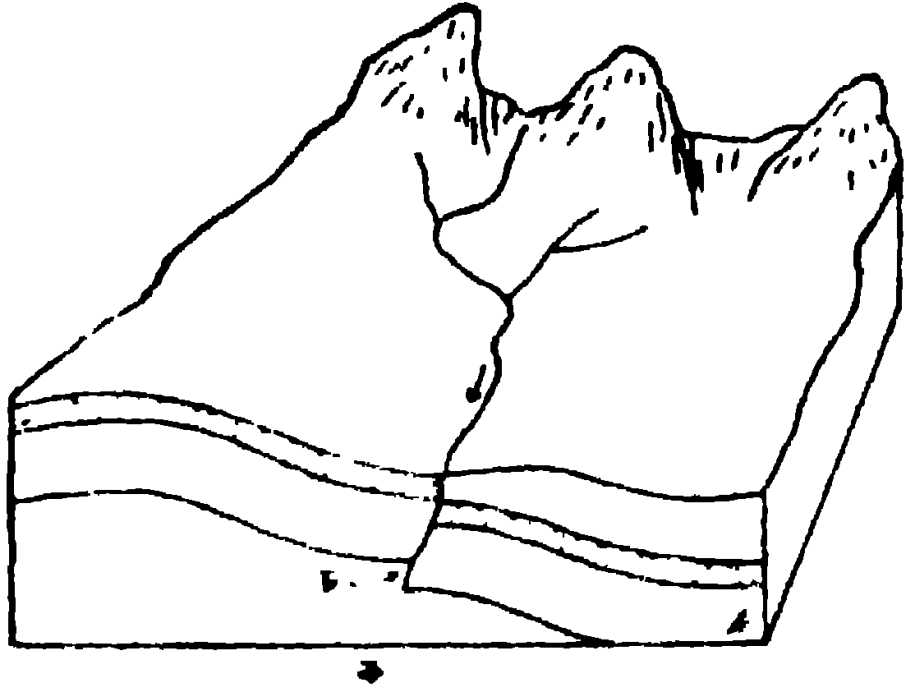
২নং চিত্র

(ক) পাথরে বড় রকমের চ্যুতি (চ) অথবা ফাটল থাকবার ফলে একটি দুর্বল তলের সৃষ্টি হয়। জলধারা (তীরচিহ্নিত) স্বভাবতঃই সেই অঞ্চল বেছে নেয়। (খ) সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পাথর কেটে কেটে ক্রমে প্রথমে একটি গভীর খাত ও পরে বিরাট উপত্যকার সৃষ্টি করে (উ)। (গ) জলধারা শক্ত পাথরের (শ) উপর দিয়ে গড়িয়ে এসে যখন নরম পাথরের (ন) উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়, তখন প্রাকৃতিক নিয়মে নদীর গতিপথ নির্ধারিত হয়ে যায়। চিত্রে শক্ত ও নরম পাথরের সীমানা খণ্ডিত লাইন দিয়ে দেখানো হয়েছে। (ঘ) শক্ত পাথরের তুলনায় নরম পাথরকে সহজে কেটে নদী উপত্যকা তৈরি করে এবং শক্ত পাথরের অঞ্চল পাহাড়ের শিরদাঁড়ায় (Ridge) পরিণত হয়।

রক্ষা পায়। অ্যান্টিক্লাইনগুলির ক্ষয় যখন একবার সুরু হয়, তখন থেকে তারা কোন দিনই নিষ্কৃতি পায় না। তাই দেখা যায়, হিমালয়ের বড় বড় অনেক নদী (যেমন অরুণ, তিস্তা প্রভৃতি) এই সকল অ্যান্টিক্লাইনের উপর দিয়ে বয়ে চলেছে

পাহাড়ের উঁচু অঞ্চল থেকে হিমবাহ নীচে নেমে যে জলপ্রবাহ এবং অপেক্ষাকৃত নীচু অঞ্চলে বৃষ্টির জল যে ধারার সৃষ্টি করে, তা স্বভাবতঃই জলের নিয়মে সহজ পথে অবাধ গতিতে নীচের দিকে ছুটে যায়। এই সহজ ও অবাধ পথ সে
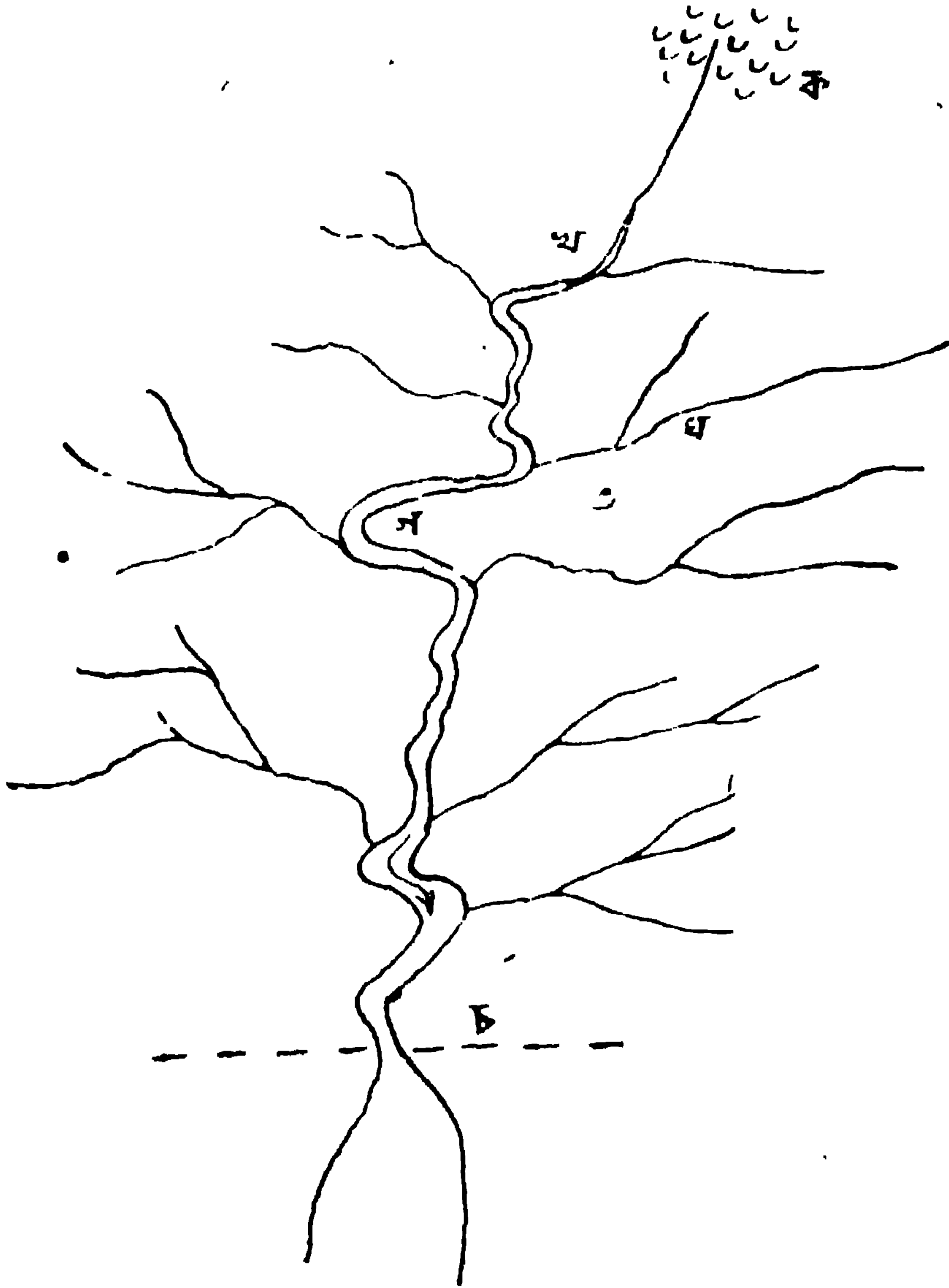
৩নং চিত্র

(ক) হিমবাহের সম্মুখভাগ। হিমবাহের উপত্যকা থেকে একটি নালার আকারে নদীটির জন্ম। এই অঞ্চলে তুষারাবৃত গিরিশ্রেণীর প্রাধান্য। (খ) অপেক্ষাকৃত নীচু পাহাড়ী অঞ্চলে নেমে আসবার সঙ্গে সঙ্গে নদী কিছুটা চওড়া হয়েছে এবং দু-পাশে উঁচু পাহাড়ের ভিতরে গভীর খাত কেটে নীচে নেমে এসেছে। (গ) গতিপথে নদী অনেক বাঁক নিয়েছে। বাঁক নেবার কারণ হচ্ছে—সহজ ও অবাধ পথ বেছে নেওয়া। হয়তো ঐ সকল অঞ্চলের পাথরে চ্যুতি অথবা ছোটখাটো ভাঁজ আছে কিংবা পাথরের প্রকৃতির আমূল পরিবর্তন হয়েছে। (ঘ) ছোট বড় অনেক নালা উপত্যকার ঢাল বেয়ে বড় নদীতে এসে মিশেছে। এই সকল নালা অপেক্ষাকৃত ছোট উপত্যকার সৃষ্টি করে। (ঙ) পার্শ্ববর্তী দুই নালার উপত্যকার মাঝে থাকে পাহাড়ের শিরদাঁড়া, যেগুলি বড় নদীর দিকে ক্রমশঃ নেমে যায় আর পাহাড়ের বিন্যাসে করে ঢেউয়ের সৃষ্টি। (চ) এখানে পাহাড়ের পাদদেশে এসে নদী অনেক চওড়া হয়ে গেছে। পাহাড়ের দুর্গম সুদূর উচ্চতায় যে একটি ছোট নালার মত দেখায়, সে পথে অসংখ্য জলধারায় পুষ্ট হয়ে বিরাট নদীর আকারে সমতলে নেমে এসেছে। এখান থেকে সুরু হয়েছে নদীর যাত্রাপথের আর একটি বিচিত্র অধ্যায়, যার শেষ সাগরসঙ্গমে।

কোথায় পায়? সহজ পথ অনেকগুলি কারণে তৈরি হতে পারে। তার মধ্যে সবচেয়ে সাধারণ কারণগুলি ২নং চিত্র থেকে কিছুটা বোঝা যাবে।

আগেই বলেছি, পাহাড়ের ইতিহাসের দ্বিতীয় পর্ব হলো লড়াইয়ের ইতিহাস। প্রকৃতির সঙ্গে পাহাড়ের এই লড়াই মানুষের জন্মের সহস্র সহস্র বছর আগে থেকে সুরু হয়েছে—এখনো থামে নি। অনেক ইতিহাসের ঘুরে-ফিরে বর্তমানে পুনরাবৃত্তি হয়, কিন্তু পাহাড়ের জীবনকথার এই পর্ব সুদূর অতীত থেকে বর্তমান পর্যন্ত প্রসারিত।

৩নং চিত্রে অত্যন্ত ছোট আকারে একটি পাহাড়ী নদীর উপত্যকার বিন্যাস দেখানো হয়েছে। এই চিত্রটির ব্যাখ্যা করলে পাহাড়ের বিন্যাস সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা হবে

মৌলিক পদার্থের নামকরণের বৈচিত্র্য

প্রবীরকুমার গুপ্ত

মৌলিক পদার্থের ইংরেজী নাম ও প্রতীকের উপর ভিত্তি করে আমরা বিজ্ঞান-চর্চা করে থাকি। কয়েকটি মাত্র মৌলিক পদার্থের ক্ষেত্রে অবশ্য অন্য ভাষালব্ধ প্রতীকের ব্যবহার হয়। বিভিন্ন মৌল অর্থাৎ মৌলিক পদার্থের নামকরণের ইতিহাস পর্যালোচনা করাই হলো আলোচ্য প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

এযাবৎ এক-শ' তিনটি মৌলিক পদার্থ আবিষ্কৃত হয়েছে (রাশিয়া অবশ্য আরেকটি নতুন মৌলিক পদার্থ আবিষ্কারের দাবী জানিয়েছে)। এই সব মৌলিক পদার্থের নাম খুবই বিচিত্র এবং অর্থবহ। কখনো তাদের গুণাবলীর উপর ভিত্তি করে, কখনো স্থান, দেশ বা মহাদেশের নামে, আবার কখনো বা আবিষ্কার-কালীন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বিজ্ঞানীরা মৌলিক পদার্থের নাম দিয়েছেন। আকাশের দিকে তাকিয়ে কখনো গ্রহ-উপগ্রহের কথা মনে পড়েছে। দেব-দেবী অথবা পুরাণের কোন চরিত্রও মৌলিক পদার্থের নামের মধ্যে স্থান পেয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে বিজ্ঞানীরা নিজের নামকে মৌলিক পদার্থের নামের মধ্যে চিরস্মরণীয় করে রেখেছেন। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে বিখ্যাত বিজ্ঞানীদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে তাঁদের নামে মৌলিক পদার্থের নামকরণ করা হয়েছে। বেশীর ভাগ মৌলের ক্ষেত্রেই নামকরণের উৎস হলো গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষা।

বহু শতাব্দী আগে থেকেই গোল্ড (স্বর্ণ), সিলভার (রৌপ্য), কপার (তাম্র), আয়রন (লৌহ), মার্কারী (পারদ), লেড (সীসা), সালফার (গন্ধক), কার্বন ও টিন প্রভৃতির সঙ্গে মানুষের পরিচয় ঘটেছিল। তাছাড়া আরও কয়েকটি মৌল, যেমন—বিস্মাথ, অ্যান্টিমনি ও জিঙ্ক (দস্তা) প্রভৃতির নামকরণের ইতিহাস আমাদের কাছে অস্পষ্ট।

থোরিয়াম মৌলের নামকরণ হয় স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার দেবতা থরের (Thor) নামানুসারে। মৌলিক পদার্থের যৌগিকগুলির সুন্দর বর্ণ দেখে বিজ্ঞানীরা মৌলের নাম দিলেন ভ্যানাডিয়াম, সৌন্দর্যের দেবী ভ্যানাডিয়ার (Vanadia) নামানুসারে। গ্রীক পুরাণের টাইটানের (Titan) নামে টাইটানিয়াম, প্রোমিথিয়াসের (Prometheus) নামে প্রোমিথিয়াম, রাজা ট্যান্টালাসের (Tantalus) নামে ট্যান্টালাম এবং তাঁর কন্যা

নায়োবের (Niobe) নামানুসারে নায়োবিয়াম মৌলের নামকরণ হয়।

কতকগুলি মৌলিক পদার্থের নামকরণের সময় বিজ্ঞানীদের মনে পড়লো বিভিন্ন গ্রহ-উপগ্রহের কথা। এজন্তেই পৃথিবীর নামে টেলুরিয়াম (ল্যাটিন ভাষায় Telluris—পৃথিবী), সূর্যের নামে হিলিয়াম (গ্রীক ভাষায় Helios—সূর্য), চন্দ্রের নামে সেলেনিয়াম (গ্রীক ভাষায় Selene—চন্দ্র), ইউরেনাসের নামে ইউরেনিয়াম, নেপচুনের নামে নেপচুনিয়াম, প্লুটোর নামে প্লুটোনিয়াম এবং সিরেস (Ceres) ও প্যালাসের (Pallas) নামে যথাক্রমে সিরিয়াম ও প্যালাডিয়াম আমাদের কাছে পরিচিত হলো।

ফরাসী আবিষ্কারক Lceoq de Boisbaudran নিজের নাম লেকক্ (গ্রীক অনুবাদ Gallus—মোরগ) চিরস্মরণীয় করে রাখলেন গ্যালিয়াম মৌলের মধ্যে। বৈজ্ঞানিকদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যেও বিভিন্ন মৌলের নামকরণ করা হয়েছে। সেই মৌলিক পদার্থগুলি হলো (বিজ্ঞানীদের নাম বন্ধনীর মধ্যে)—

সমরিয়াম (রাশিয়ার সমরস্কি), গ্যাডোলিনিয়াম (ফিনল্যাণ্ডের গ্যাডোলিন), কুরিয়াম (পোল্যাণ্ডের কুরি দম্পতি), আইনষ্টেনিয়াম (জার্মেনীর আইনষ্টাইন), ফের্মিয়াম (ইটালীর ফের্মি), নোবেলিয়াম (সুইডেনের নোবেল), মেণ্ডেলিভিয়াম (রাশিয়ার মেণ্ডেলিভ) এবং লরেন্সিয়াম (আমেরিকার লরেন্স)।

ইউরোপ ও আমেরিকা মহাদেশের নাম স্থান পেয়েছে ইউরোপিয়াম এবং আমেরিসিয়াম মৌলের মধ্যে। রাশিয়া, জার্মেনী, পোল্যাণ্ড, ফ্রান্স এবং ক্যালিফোর্নিয়ার নামানুসারে রুথেনিয়াম (রাশিয়ার ল্যাটিন নাম রুথেনিয়া), জার্মেনিয়াম, পোলোনিয়াম, ফ্রান্সিয়াম এবং ক্যালিফোর্নিয়াম মৌলের নামকরণ করা হয়েছে।

শহরের ল্যাটিন নাম ল্যুটেসিয়া (প্যারিস), হাফনিয়া (কোপেনহাগেন) এবং হোলমিয়া (ষ্টকহোম) থেকে ল্যুটেসিয়াম, হাফনিয়াম এবং হোলমিয়াম নামের উৎপত্তি হয়েছে।

স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার নামে দুটি মৌলের নামকরণ হয়েছে—স্ক্যাণ্ডিয়াম এবং থুলিয়াম (স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার পুরনো নাম থুল)। আমেরিকার শহর বার্কেলের নামানুসারে হয়েছে বার্কেলিয়াম ও স্কটল্যাণ্ডের গ্রাম স্ট্রনসিয়ার নামে হয়েছে স্ট্রনসিয়াম। জার্মেনীর রাইন নদীর নামের সঙ্গে মিলিয়ে রেনিয়াম মৌলের নাম করা হয়েছে।

মৌলিক পদার্থের নামকরণের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানীরা বোধ হয় সবচেয়ে বেশী সম্মান দিয়েছেন ষ্টকহোমের কাছে অবস্থিত ইটারবি (Ytterby) শহরকে। ইট্রিয়াম, ইটার্বিয়াম, টার্বিয়াম এবং আর্বিয়াম—এই চারটি মৌলের মধ্যে এই ছোট শহরটি চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। এই স্থান থেকে প্রাপ্ত খনিজ পদার্থের মধ্যে এই মৌলিক পদার্থগুলি আবিষ্কৃত হয়।

মৌলের বর্ণের সঙ্গে মিলিয়ে ক্লোরিন (গ্রীক ভাষায় Chloros—হরিদ্রাভ-সবুজ) এবং আয়োডিন (গ্রীক ভাষায় Iodes—বেগুনী) মৌল দুটির নামকরণ হয়।

মৌলিক পদার্থের যৌগিকগুলি বিচিত্র রঙের বলে নাম হলো ক্রোমিয়াম (গ্রীক ভাষায় Chroma—রং)। মেরিন অ্যাসিডে (অধুনা হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড) মৌলের বিচিত্র রঙের বাহার দেখে আবিষ্কারক নাম দিলেন ইরিডিয়াম (গ্রীক ভাষায় Iris—রামধনু) এবং যৌগিকের জলীয় দ্রবণ গোলাপী রঙের বলে মৌলিক পদার্থের নাম দেওয়া হলো রোডিয়াম (গ্রীক ভাষায়—Rhodon—গোলাপী)।

কয়েকটি মৌলের আবিষ্কার হয় বর্ণালী-বিশ্লেষণের সাহায্যে। মৌলিক পদার্থগুলির বর্ণালীর রং দেখে বিজ্ঞানীরা মুগ্ধ হয়ে নাম দিলেন সিজিয়াম, রুবিডিয়াম এবং থ্যালিয়াম। ল্যাটিন ভাষায় Caesius—আসমানী, Rubidus—লাল

এবং গ্রীক ভাষায় Thallos—সবুজ প্রবাহ। মৌলিক পদার্থের বর্ণালী Indigo—নীল রঙের বলে নাম দেওয়া হলো ইণ্ডিয়াম (Indigo নামের উৎস হলো India অর্থাৎ ভারত—কেন না, এই পদার্থ এদেশে প্রচুর পাওয়া যেত)।

গন্ধের বিচারে ব্রোমিন দুর্গন্ধপূর্ণ এবং অসমিয়াম (অক্সাইড) ঝাঁঝালো (গ্রীক ভাষায় Bromos—দুর্গন্ধ; Osme—গন্ধ)।

গুণাবলীর উপর ভিত্তি করে বেশ কিছু সংখ্যক মৌলের নামকরণ হয়েছে। ফরাসী বিজ্ঞানী ল্যাভয়সিয়ে নাম দিলেন অক্সিজেন (গ্রীক ভাষায় Oxys অর্থ অম্ল এবং Geinomai অর্থ আমি তৈরি করি)—যেহেতু তখনকার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অম্লমাত্রেই অক্সিজেন থাকবে। পরে এই সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়, কিন্তু মৌলিক পদার্থের নামের পরিবর্তন করা হয় না।

অক্সিজেনের সঙ্গে প্রজ্বলিত হয়ে জল তৈরি করে বলে একটি মৌলিক পদার্থের নাম রাখা হলো হাইড্রোজেন (গ্রীক ভাষায় (H)ydor—জল) এবং নাইটার সৃষ্টিকারক হিসাবে নাইট্রোজেন নামের উৎপত্তি হয়। পটাসিয়াম নাইট্রেটকে সে সময় নাইটার নামে অভিহিত করা হতো।

মৌলিক পদার্থের সক্রিয়তার জন্যে নাম দেওয়া হলো আর্সেনিক এবং নিষ্ক্রিয়তার জন্যে আর্গন (গ্রীক ভাষায় Arsenicos—সক্রিয় এবং Argos—নিষ্ক্রিয়)।

মৌলিক পদার্থটি রাতের অন্ধকারেও স্বতঃস্ফূর্ত আলোক বিচ্ছুরণ করে, তাই নাম হলো তার ফস্ফরাস (গ্রীক ভাষায়—Phosphoros—আলোক বহনকারী)।

তেজস্ক্রিয় মৌলিক পদার্থের ক্ষেত্রে ছটা বিচ্ছুরিত হয় বলে তাদের নাম হলো রেডিয়াম এবং অ্যাক্টিনিয়াম। ছটাকে ল্যাটিনে Radius এবং গ্রীকে Aktis বলে। মৌলিক পদার্থটি খুবই অস্থায়ী বলে তার নাম হলো অ্যাস্টাটিন (গ্রীক ভাষায় Astatos—অস্থায়ী)। তেজস্ক্রিয় মৌলটি একটি আল্‌ফা কণিকার বিচ্ছুরণে অ্যাক্টিনিয়াম মৌলিক পদার্থে পরিণত হলো, তাই নাম হলো তার প্রোটাক্টিনিয়াম (Protos—প্রথম)।

বিজ্ঞানীরা মৌলিক পদার্থের আবিষ্কারের ক্ষেত্রে অক্লান্ত চেষ্টার ফলে লাভ করেছেন পরিশ্রমের সার্থক পুরস্কার। তাই তাঁরা নাম দিয়েছেন ল্যান্থানাম, ডিসপ্রোসিয়াম, নিয়ন, ক্রিপ্‌টন এবং জেনন। গ্রীক ভাষায় Lanthano—অন্তরীণ থাকা, Dys-prositos—কষ্টে পাওয়া, Neos—নতুন, Kryptos—লুকানো এবং Xenos—অচেনা। সম্পূর্ণ এক কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্টি করা হয়েছিল বলে মৌলটির নাম রাখা হলো টেক্‌নিসিয়াম (গ্রীক ভাষায় Technetos—কৃত্রিম)।

বহু মৌলিক পদার্থ আবিষ্কৃত হয়েছিল তাদের যৌগিক থেকে, যাদের নাম বিজ্ঞানীদের কাছে ছিল পূর্বপরিচিত। তাই তাদের নামের সঙ্গে মিলিয়ে মৌলিক পদার্থগুলির নাম দেওয়া হয়েছে (যৌগিকের নাম বন্ধনীর মধ্যে)—

সোডিয়াম (সোডা), পটাশিয়াম (পটাশ), ক্যালসিয়াম (ক্যাল্‌ক্স), বেরিয়াম (বেরাইটা), বোরন (বোরাক্স), ক্যাড্‌মিয়াম (ক্যাড্‌মিয়া), লিথিয়াম (লিথিয়া), সিলিকন (সিলিকা), অ্যালুমিনিয়াম (অ্যালুমেন, অধুনা যাকে অ্যালাম বলে), বেরিলিয়াম (বেরিল, একটি মূল্যবান ফিকে সবুজ পাথর), ক্লোরিন (ক্লোর) এবং জিরকোনিয়াম (জিরকোন, একটি মূল্যবান লাল পাথর)।

একটি খনিজ পদার্থ খুব ভারী হওয়ায় তার নাম দেওয়া হলো টাঙস্টেন (সুইডিশ ভাষায় Tung—ভারী, Sten—পাথর)। এই পদার্থের মধ্যে এক নতুন মৌলের আবিষ্কার হয়েছিল, যা আমাদের কাছে এই খনিজ পদার্থের নামেই পরিচিত। রেডিয়াম তেজস্ক্রিয়তার মধ্যে

আবিষ্কৃত হয়েছিল রেডন নামক মৌলিক পদার্থের অস্তিত্ব।

১৮০৮ সালে ইংরেজ বিজ্ঞানী ডেভী ম্যাগ্‌নেসিয়া অ্যালবা (Magnesia Alba, অধুনা সোডিয়াম কার্বোনেট) থেকে এক ধাতব মৌল পৃথক করেন এবং তার নাম দেন ম্যাগ্‌নিয়াম; পরে ম্যাগ্‌নেসিয়াম নামে পরিচিত হয়। ম্যাগ্‌নেশিয়া নাইগ্রা (Magnesia Nigra, অধুনা পাইরোলুসাইট) নামক এক খনিজ পদার্থ কালক্রমে ম্যাঙ্গানিজ নামে পরিচিত হয়। এই খনিজ পদার্থ থেকে যে মৌলটি পৃথক করা হয়, তা ম্যাঙ্গানিজ নামেই অভিহিত হয়।

১৮৩৯ সালে সুইডেনের বিজ্ঞানী মোসাণ্ডার (Mosander) ল্যান্থানা থেকে সাদা এবং ধূসর বর্ণের ছুটি পদার্থ পৃথক করেন। ধূসর পদার্থটির নাম দিলেন ডিডিমিয়া (গ্রীক ভাষায় Didymos—যমজ)। পরে ঐ পদার্থ থেকে ছুটি মৌলের আবিষ্কার হয়—প্রাসিয়োডিমিয়াম এবং নিয়োডিমিয়াম। যৌগিকের রং সবুজ বলে নাম রাখা হয় প্রাসিয়োডিমিয়াম—গ্রীক ভাষায় Pras(e)ios—লীকের মত সবুজ। লীক (Leek) হলো পেঁয়াজজাতীয় এক প্রকার সব্জি। নতুন ধরণের ডিডমিয়া বলে নাম হলো নিয়োডিমিয়াম (গ্রীক ভাষায় Neo—নতুন)।

গ্রীক ভাষায় মলিবডোস শব্দের অর্থ হলো সীসা (Lead)। অষ্টাদশ শতাব্দীতে গ্র্যাফাইট বা গ্র্যাফাইট সদৃশ পদার্থকে (উদাহরণস্বরূপ অধুনা যাকে মলিবডিনাইট বলে) ঐ নামে অভিহিত করা হতো। যেহেতু নতুন মৌলটিকে মলিবডোসজাতীয় পদার্থ থেকে পৃথক করা হয়েছিল, সেহেতু নাম হলো তার মলিবডিনাম।

তামার (Copper) খনিজ ভেবে তাথেকে তামা পৃথক করবার চেষ্টায় ব্যর্থকাম হয়ে জার্মান খনিবিদ্‌দের ধারণা হলো, নিশ্চয়ই কোনও শয়তান এই খনিজ পদার্থকে (অধুনা নিকোলাইট) রঙীন করেছে তাঁদের প্রতারণা করবার জন্যে এবং এই পদার্থের নাম দিলেন Kupfer Nickel অর্থাৎ শয়তানের তাম্র (জার্মান ভাষায় Nickel—তুক্তকারী শক্তি)। পরে এই খনিজ পদার্থ থেকে যে মৌলিক পদার্থটি আবিষ্কৃত হয়, তার নাম দেওয়া হয় নিকেল। আরেকটি বিষাক্ত খনিজ পদার্থের অস্তিত্বের সন্ধান তাঁরা পেয়েছিলেন এবং এই পদার্থের নাম দেন কোবোল্ড (গ্রীক ভাষায় Kobalos—শঙ্কাকুল শক্তি অথবা শয়তান)। পরে এটি Kobalt নামে পরিচিত হয় এবং মৌলটিকে এরূপ খনিজ পদার্থ থেকে পৃথক করা হয়েছিল বলে নাম হয় কোবাল্ট (Cobalt)।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে স্পেন দেশের বিজ্ঞানীরা এক নতুন পদার্থের সন্ধান পান, যা তাঁদের কাছে রৌপ্যের এক বিশুদ্ধ রূপ বলে প্রতীয়মান হয়েছিল। কাজেই তার নাম দেওয়া হলো প্ল্যাটিনা (স্প্যানিশ ভাষায় Plata—রৌপ্য)।

আধুনিক মৌলিক পদার্থগুলির নামকরণের ধারা দেখে মনে হয়, বিজ্ঞানী অথবা দেশের নামেই ভবিষ্যৎ মৌলিক পদার্থগুলির নামকরণ করা হবে।

কয়লা ধৌতকরণ

রঘুনাথ দাস

কয়লা ধুলেও ময়লা যায় না—এই প্রবাদ বাক্যটির বহুল প্রচলন আছে। কিন্তু চুলচেরা বৈজ্ঞানিক বিচারে এর কোন মূল্য নেই। ময়লা না গেলেও কয়লা ধৌতকরণে যে সব উপাদান আমরা পৃথক করতে পারি, তা ভাবলে সত্যই অবাক হতে হয়। আপনারা অনেকেই হয়তো জানেন যে, খনি থেকে যে কয়লা উত্তোলিত হয়, তাকে বাছাই না করে শিল্পক্ষেত্রে ব্যবহারের উপযোগী করা যায় না। সাধারণভাবে কয়লার মধ্যে খনিজ পদার্থগুলির পরিমাণ বেশী থাকলে তার অপসারণ একান্ত প্রয়োজন। কেন না, খনিজ পদার্থগুলি কয়লার Caking property বিনষ্ট করে এবং ফলে তার Coking ধর্মও বহুলাংশে ব্যাহত হয়। এই ধরণের কয়লা তাই ব্যবহারের পূর্বে খনিজ পদার্থমুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। এজন্যেই কয়লা ধৌতকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

কয়লা ধৌতকরণের উদ্দেশ্য প্রধানতঃ তিনটি—(১) কয়লায় ভস্মের পরিমাণ কমানো। (২) খনিজ পদার্থের পরিমাণ হ্রাস করা। কেন না আগেই বলেছি যে, খনিজ পদার্থ কয়লার Caking property কমিয়ে দেয়। সাধারণভাবে Fusain এবং Durain এর জন্যে দায়ী। (৩) ধৌতকরণের ফলে কয়লার মধ্যে Vitrain এবং Clarain-এর পরিমাণ বাড়ে, ফলে Caking property-ও কিছুটা বৃদ্ধি পায়।

এখন দেখা গেছে যে, খনিজ পদার্থের পরিমাণ কয়লায় কমানো হলে এর অন্যান্য ধর্মগুলিও আপনা-আপনি পরিমার্জিত হয়। কয়লা ধৌতকরণে তাই খনিজ পদার্থের গুরুত্বই সবচেয়ে বেশী। কয়লার মধ্যে এই খনিজ পদার্থের উৎপত্তি এবং তাদের প্রকার ভেদ সম্বন্ধে কিছু বলে রাখা তাই অপ্রাসঙ্গিক হবে না। কয়লার মধ্যে প্রধানতঃ দু-রকমের খনিজ পদার্থ আছে—(১) সহজাত এবং (২) বহিঃস্থ। সহজাত খনিজ পদার্থগুলি কয়লার সঙ্গে রাসায়নিক ক্রিয়ায় যুক্ত এবং ধৌতকরণ প্রক্রিয়ায় এদের আলাদা করা সম্ভব নয়। সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ম্যাগ্নেসিয়াম, অ্যালুমিনিয়াম প্রভৃতি এই পর্যায়ে পড়ে। এদের পরিমাণ সমগ্র খনিজ পদার্থের শতকরা এক থেকে দেড় ভাগ মাত্র। এই খনিজগুলি উদ্ভিজ্জ পদার্থ থেকেই অপরিবর্তিত অবস্থায় রূপান্তরিত হয়। অপর পক্ষে বহিঃস্থ খনিজ পদার্থগুলি কয়লার মধ্যে খুব গুঁড়া অবস্থায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত থাকে। এগুলি উদ্ভিজ্জ পদার্থের কয়লায় রূপান্তরের সময়ে পার্শ্ববর্তী স্তর থেকে আসে। যদি উদ্ভিজ্জ পদার্থগুলি বেশী রকমে পরিবাহিত হয়ে কোন হ্রদ বা সমুদ্রের নীচে জমা হয়, তাহলে এথেকে যে কয়লা পাওয়া যায়, তার মধ্যে খনিজ পদার্থের পরিমাণ সবচেয়ে বেশী। কখনও কখনও খনি থেকে উত্তোলনের সময় কিছু কিছু খনিজ পদার্থ কয়লায় মিশে যায়। বিশেষ করে যন্ত্রচালিত খনিগুলিতে এই ধরণের মিশ্রণ হয় সবচেয়ে বেশী। বহিঃস্থ খনিজ পদার্থগুলিকে ধৌতকরণের মাধ্যমে আলদা করা সম্ভব। কিন্তু কয়লার মধ্যে যদি এগুলি সমভাবে ছড়িয়ে থাকে, তবে এই প্রক্রিয়া আদৌ ফলপ্রসূ হয় না।

কয়লা ধৌতকরণের প্রধান নীতি হলো—যে সব কয়লায় খনিজ পদার্থের পরিমাণ বেশী, তার আপেক্ষিক গুরুত্ব কম খনিজ পদার্থ সমন্বিত কয়লার চেয়ে বেশী। কাজেই যদি কোন মিশ্রিত কয়লা একটি তরল পদার্থে ডোবানো যায়, তবে কম

খনিজ পদার্থযুক্ত কয়লা উপরের দিকে ভাসমান থাকবে এবং ভারী কয়লা অর্থাৎ বেশী খনিজ পদার্থ সমন্বিত কয়লা নীচে জমা হবে। এই ভাবে একটি পূর্বনির্দিষ্ট উপযুক্ত আপেক্ষিক গুরুত্বের তরল পদার্থের সাহায্যে যে কোন কয়লা ভারী এবং হাল্‌কা—এই দুটি ভাগে ভাগ করা সম্ভব। উঁচু জাতের (High rank) কয়লার মধ্যে Vitrain-এর পরিমাণই সবচেয়ে বেশী এবং এর আপেক্ষিক গুরুত্ব ১'২২। কিন্তু সাধারণ কয়লার আপেক্ষিক গুরুত্ব ১'২৫ অথবা তারও বেশী। খনিজ পদার্থের উপস্থিতিই এর জন্যে দায়ী। সাধারণভাবে দেখা গেছে যে, কয়লায় ভস্মের পরিমাণ যত বাড়ে, তার আপেক্ষিক গুরুত্বও তত বৃদ্ধি পায়। প্রতি ১০% ভস্মের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্যে কয়লার আপেক্ষিক গুরুত্ব ০'১ বৃদ্ধি পায়।

কয়লা ধৌতকরণের জন্যে বেন্‌জিন (আ: গু: ০.৮৭), কার্বন টেট্রাক্লোরাইড (আ: গু: ১'৫৮), ব্রোমোফর্ম (আ: গু: ২'৯) এবং ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড দ্রবণ প্রভৃতি তরল অথবা এদের মিশ্রণ ব্যবহার করা হয়। তরল পদার্থগুলির মিশ্রণ এমনভাবে তৈরি করা হয়, যাতে এর আপেক্ষিক গুরুত্ব ইচ্ছামত পরিবর্তন করতে পারা যায়। এইবার পরীক্ষাগারে পরীক্ষা করে দেখা হয় যে, বিভিন্ন আপেক্ষিক গুরুত্বের তরল পদার্থের মধ্যে ঐ কয়লার কতটা পরিমাণ ভাসমান এবং কতটা নিমজ্জিত থাকে। এদের ভস্মের পরিমাণও নির্ণয় করা হয়। এখন একটি রেখচিত্রে (১নং চিত্র) ভস্মের পরিমাণ ও ভাসমান কয়লার পরিমাণ আঁকা হয়। এথেকে আমরা অনেকগুলি মূল্যবান সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি।

(১) কোন নির্দিষ্ট আপেক্ষিক গুরুত্বের তরল পদার্থে কত পরিমাণ কয়লা ভেসে থাকবে এবং তাতে ভস্মের পরিমাণ কত।

(২) শতকরা কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ ভস্মের জন্যে কতটা পরিমাণ কয়লা নিমজ্জিত অথবা ভাসমান অবস্থায় থাকে।
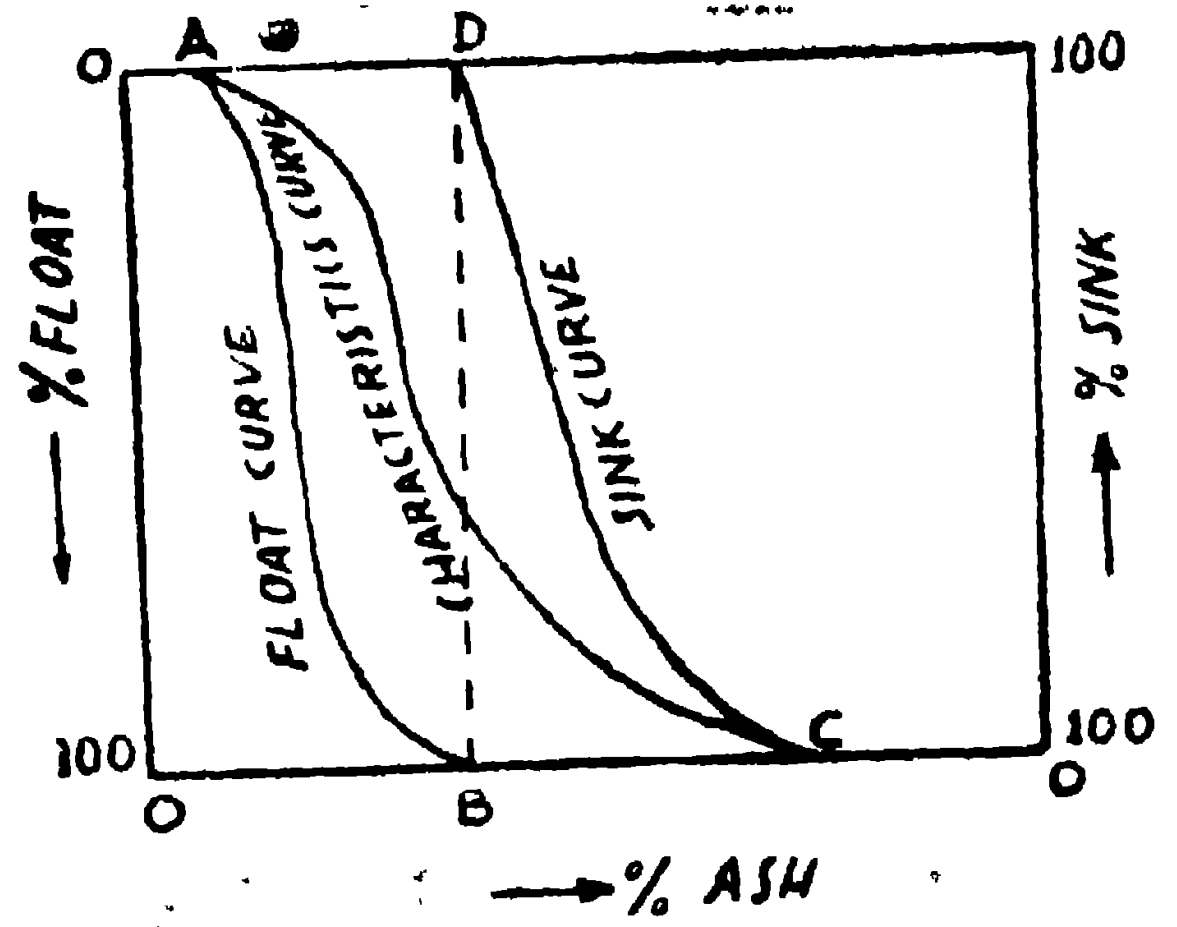
১নং চিত্র

(৩) কয়লা ধৌতকরণের পর একে আদৌ coking-এর কাজে লাগানো যাবে কিনা, অথবা উক্ত কয়লা ধৌতকরণে খনিজ পদার্থগুলির পরিমাণ হ্রাস করা যাবে কিনা? তাই কয়লা ধৌতকরণে প্রাপ্ত রেখাচিত্রটির একাধিক গুরুত্ব রয়েছে। বিশেষ করে অর্থনৈতিক দিক থেকে কয়লাটির ধৌতকরণে সাফল্য আনবে কিনা, তা সুষ্ঠুভাবে জানা যায়।

পরীক্ষাগারে ধৌতকরণের দুটি পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়।

(১) Instantaneons float and sink method

(২) Cumulative float and sink method

প্রথম পদ্ধতিতে চারটি পাত্রে যথাক্রমে ১'৪, ১'৫, ১'৫৫ এবং ১'৬ আপেক্ষিক গুরুত্বের তরল পদার্থ নেওয়া হয় (২নং চিত্র)। এবার প্রথম পাত্রে (আ: গু: ১'৪) ১০০ গ্রাম কয়লা ঢেলে ভাসমান ও নিমজ্জিত কয়লাগুলিকে আলাদা করে শুষ্ক করা হয় এবং ভস্মের পরিমাণ নির্ধারণ করা

হয়। তারপর নিমজ্জিত কয়লাটিকে দ্বিতীয় পাত্রে (আঃ গুঃ ১'৫) ফেলা হয়। এবারেও একই ভাবে ভাসমান ও নিমজ্জিত কয়লাকে আলাদা করা হয় এবং ভাসমান অংশের ভস্মের পরিমাণ দেখা হয়। এখন এই নিমজ্জিত কয়লা নিয়ে তৃতীয় পাত্রে (আঃ গুঃ ১'৫৫) ফেলা হয় এবং প্রতি বারেই ভাসমান অংশের ভস্মের শতকরা পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়।
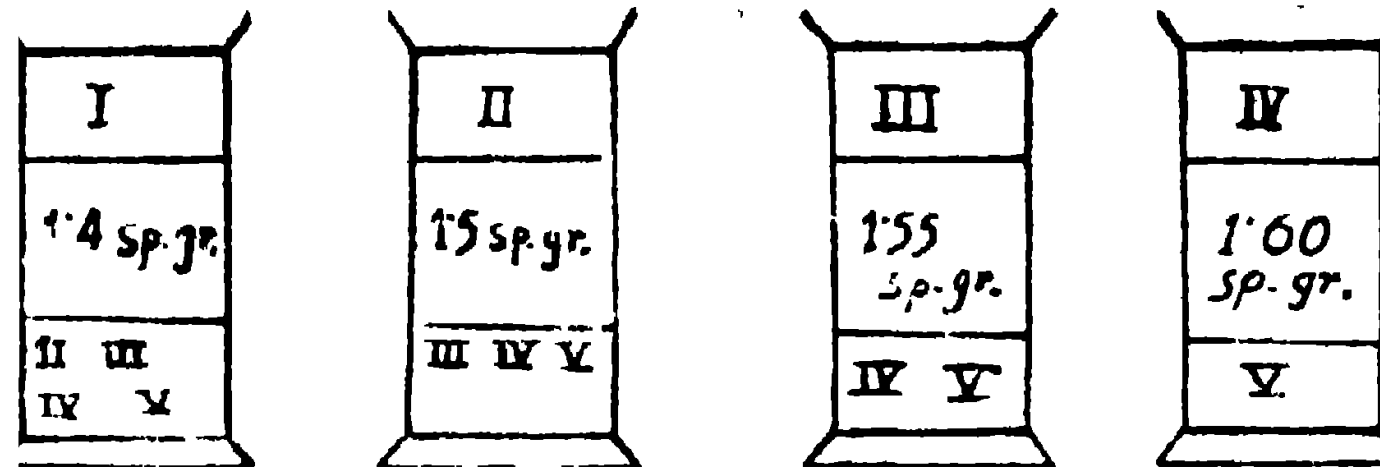
২নং চিত্র

এবার নিম্নে প্রদত্ত টেবল অনুযায়ী এর গণনা করা হয়।

Sp. gr.	Instantaneous Float (wt %)	Ash content of instantaneous float (%)	Cumulative Float (wt %)	Ash content of cumulative float (%)	Cumulative sink (wt %)	Ash content of cumulative sink (%)	Mid point of instantaneous ash
1·4	wf_1	af_1	Wf_1	Af_1	Ws_1	As_1	$O+\frac{Wf_1}{2}$
1·5	wf_2	af_2	Wf_2	Af_2	Ws_2	As_2	$Wf_1+\frac{Wf_2}{2}$
1·55	wf_3	af_3	Wf_3	Af_3	Ws_3	As_3	$Wf_2+\frac{Wf_3}{2}$
1·60	wf_4	af_4	Wf_4	Af_4	Ws_4	As_4	$Wf_3+\frac{Wf_4}{2}$
>1·60	wf_5	af_5	Wf_5	Af_5	Ws_5	As_5	—

$$Wf_n = wf_1+wf_2+\cdots\cdots+wf_n.$$

$$Af_n = \frac{af_1 \times wf_1 + \cdots\cdots + af_n \times wf_n.}{wf_1 + \cdots + wf_n}$$

$$Ws_n = 100 - Wf_n.$$

$$As_n = \frac{Wf_5 \times Af_5 - Wf_n \times Af_n.}{Ws_n}$$

এবার উপরের উপাত্তগুলির সাহায্যে রেখা-চিত্র (১) অঙ্কন করা হয়। এতে cumulative float vs. cumulative ash নিয়ে যে রেখা পাওয়া যায়, তাকে float curve বলে। অনুরূপভাবে cumulative sink vs. cumulative ash নিয়ে যা পাওয়া যায়, তার নাম sink

curve। সর্বশেষে characteristics curve আঁকা হয় mid-point vs. instantaneous ash নিয়ে। এই চিত্রে float curve-এর শীর্ষ-বিন্দু characteristics curve-এর শীর্ষবিন্দুর সঙ্গে সমবিন্দু (A); কারণ এই বিন্দুটি কয়লার সহজাত ভস্মের পরিমাণ নির্দেশ করে। অনুরূপ-ভাবে float curve-এর নিম্নবিন্দু (B) এবং sink curve-এর শীর্ষবিন্দু (D) একই পরিমাণ ভস্মের উপর অবস্থিত, কারণ (B) এবং (D) উভয়েই আসল কয়লার ভস্মের পরিমাণ নির্দেশ করে। আবার sink curve-এর নিম্নবিন্দু উভয়েই সম-বিন্দু (C), কেন না নিমজ্জিত কয়লার এটিই সম্ভাব্য সর্বোচ্চ ভস্মের পরিমাণ।

এখন দেখা যাক, characteristics curve থেকে আমরা কি করে বুঝি যে, কয়লাটির ধৌত-করণ সম্ভব কিনা, অথবা সম্ভব হলে অর্থনৈতিক দিক থেকে লাভজনক কিনা। যদি curveটি চিত্র (৩)-এর মত হয়, তবে দেখা যাচ্ছে যে, এর সব অংশেই ভস্মের পরিমাণ প্রায় সমান—অর্থাৎ এতে external mineral content খুবই কম। এই কয়লায় সহজাত এবং গড় ভস্মের পরিমাণ প্রায় সমান। তাই এই ধরণের কয়লা ধৌত-করণের কোন প্রয়োজন নেই।
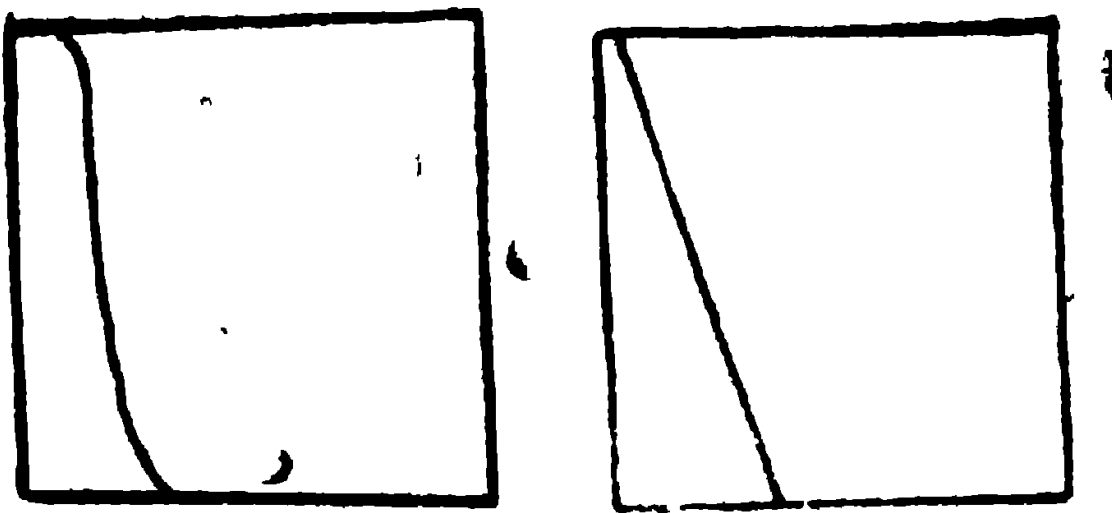
৩নং চিত্র

৪নং চিত্র

আবার Curveটি যদি চিত্র (৪)-এর মত হয়, তবে এই ধরণের কয়লা ধৌতকরণ কষ্টকর, কারণ বিভিন্ন আপেক্ষিক গুরুত্বের তরল পদার্থে প্রায় সমপরিমাণ কয়লা ভাসমান অবস্থায় থাকে। কিন্তু যদি curveটি চিত্র (৫)-এর মত হয়, তবে এই কয়লা ধৌতকরণের দিক থেকে আদর্শস্থানীয়। কেন না, curve-এর বাঁকা অংশটিতে ভস্মের পরিমাণ হঠাৎ বেড়ে যাওয়ায় ঐ নির্দিষ্ট আপেক্ষিক গুরুত্বের তরল পদার্থে clean coal এর সবটাই ভেসে ওঠে। বাকী অংশটির আপেক্ষিক গুরুত্ব তরল পদার্থটির আপেক্ষিক গুরুত্ব অপেক্ষা অনেক বেশী; অর্থাৎ এর ভস্মের পরিমাণ ইপ্সিত কয়লা অপেক্ষা বেশী। একে বলা হয় Reject।

তাই এই ধরণের কয়লার ধৌতকরণে clean coal এবং reject দুটিই সম্পূর্ণ পৃথক করা সহজ এবং একটি নির্দিষ্ট আপেক্ষিক গুরুত্বের তরল পদার্থে এরা পরস্পর ভাসমান ও নিমজ্জিত অবস্থায় থাকে। এই তরল পদার্থটিতে উৎপন্ন clean coal-এর পরিমাণ সর্বোচ্চ। যদি এই তরল পদার্থের পরিবর্তে অন্য কোন বেশী আপে-ক্ষিক গুরুত্বের তরল পদার্থ নিয়ে পরীক্ষা করা হয়, তবে কিছু reject coal-ও clean coal-এর সঙ্গে চলে আসতে পারে। ফলে Washability efficiency অনেক কমে যায়।

তাই এথেকে বোঝা যাচ্ছে যে, charac-teristics curve-টিতে যদি হঠাৎ কোন বাঁক থাকে অথবা এর আকৃতি যদি সমকোণের মত হয়, তবে এর ধৌতকরণ খুব সহজসাধ্য হয়। কিন্তু কোন কোন সময় দেখা যায় যে, কয়লাটির ধৌত-করণই যথেষ্ট নয়, এর অর্থনীতির দিকটিও বিবেচ্য। যেমন, চিত্র নং (৬) I-Curve-টি ধৌতকরণের দিক থেকে আদর্শ স্থানীয় হলেও এতে clean coal-এর পরিমাণ খুব কম এবং reject-এর পরি-মাণ অত্যন্ত বেশী। তাই এই কয়লা ব্যবহারিক দিক থেকে ধৌতকরণের অযোগ্য। কিন্তু curve-II সব দিক থেকেই গ্রহণযোগ্য। এতে reject-এর পরিমাণ অত্যন্ত কম এবং clean coal-এর পরিমাণ স্বভাবতঃই বেশী। আবার curve-টি সমকোণাকৃতির হওয়ায় ধৌতকরণ

খুবই সহজসাধ্য। তাই সবদিক থেকে বিচার করলে দেখা যাবে যে, curve-II-ই কয়লা ধৌতকরণের আদর্শ উদাহরণ।

ব্যবহারিক ক্ষেত্রে কোন কোন সময়ে দেখা যায় যে, কিছু পরিমাণ reject, clean coal-এর সঙ্গে চলে আসে এবং কিছু clean coal ও reject-এর সঙ্গে নষ্ট হয়। কতটা পরিমাণ মিশ্রণ হয়েছে, তা মাপবার জন্যে আমরা Effectiveness of washability কথাটি ব্যবহার করি, কখনও কখনও রেখাচিত্রের সাহায্যে এঁকে প্রকাশ করি, যার নাম Tromp error curve। ধৌতকরণের জন্যে কোন্ পদ্ধতি আমরা অনুসরণ করি, তার উপরই নির্ভর করে এর সার্থকতা। বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্যে Jigging, Laundering এবং Heavy medium separation-ই উল্লেখযোগ্য।

কাজেই কয়লা ধৌতকরণ শিল্পের একটা প্রধান অংশ মাত্রই নয়, এর সার্থক রূপায়ণের উপর নির্ভর করছে অন্যান্য শিল্পের সাফল্য ও নিরাপত্তা। ভাল জাতের কোক পেতে হলে কয়লা ধৌতকরণ অত্যাবশ্যক। ভাল কোক ব্যবহারে ব্লাষ্ট ফার্নেসের আয়ু বাড়ে, বিস্ফোরণের সম্ভাবনা হ্রাস পায় এবং সর্বোপরি কোকের পরিমাণ কম লাগে। তাই কয়লা ধৌতকরণ শিল্পক্ষেত্রে একটা বিরাট গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে।

৫নং চিত্র

I
II

৬নং চিত্র

কৃত্রিম উপগ্রহের কক্ষপথ

অশেষ দাস*

কোন একটি কৃত্রিম উপগ্রহ যে কক্ষপথে পৃথিবীর চতুর্দিকে আবর্তন করে, সেটি একটি জটিল ত্রিমাত্রিক পথ। এই পথের পূর্ণ ধারণা করা অসম্ভব। এই জটিল ত্রিমাত্রিক পথে ঘুরতে ঘুরতে একটি উপগ্রহ কত যে ঘটনার সম্মুখীন হয়, তার ধারণা করাও সম্ভব নয়। তবু গাণিতিক হিসাব অনুযায়ী ঘন্টার পর ঘন্টা কক্ষপথে ঘুরতে ঘুরতে

O
a(1-e)
A
a(1+e)
C
P
ক

OP = a
CP = a(1-e)
AC = a(1+e)

পরাবৃত্ত → v = 11·1 Km/sec.
অধিবৃত্ত → v = 11·0 Km/sec.
উপবৃত্ত → v = 10·9 Km/sec.

y = 235 Km,
r_0 = পৃথিবীর ব্যাসার্ধ,
y
r_0
খ
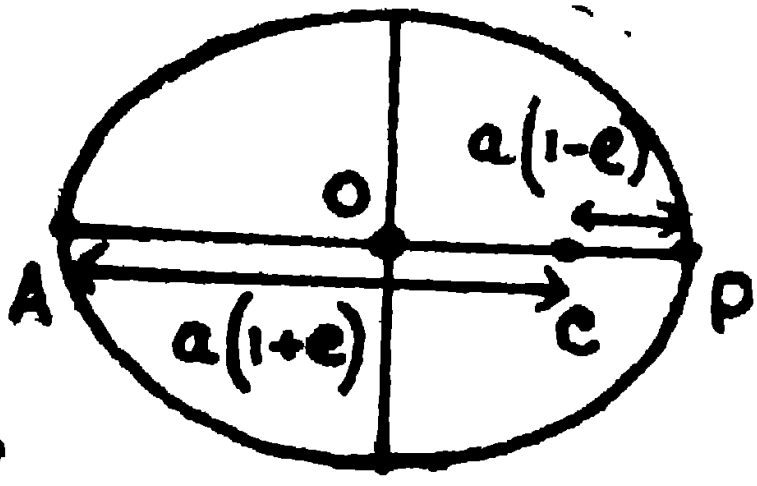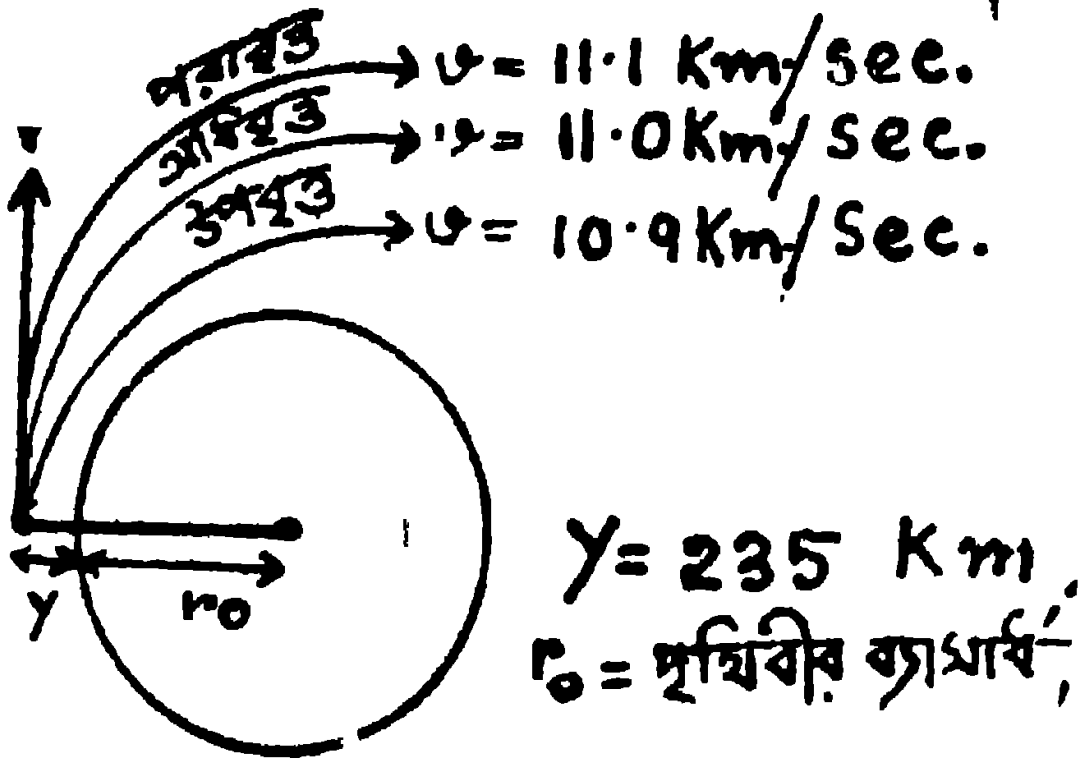
১ নং চিত্র

একটি উপগ্রহ আমাদের পৃথিবীর খবর, বায়ুমণ্ডলের খবর, মহাকাশের খবর নিয়মিত পাঠিয়ে যায়।

একটি উপবৃত্ত এঁকে উপগ্রহের কক্ষপথের মোটামুটি একটা ধারণা করা যেতে পারে। এই উপবৃত্তের একটি ফোকাসে থাকবে পৃথিবী। উপবৃত্তের আকার নির্দেশনের জন্যে আমাদের প্রয়োজন প্রধান অক্ষ (2a) এবং উৎকেন্দ্রতা (e)। চিত্রে (১নং ক) দেখা যাচ্ছে P-বিন্দুটি পৃথিবীর নিকটতম। যদি C-বিন্দুতে পৃথিবীর অবস্থান হয়, তবে P বিন্দুটিকে বলা হয় অনুভূ। পৃথিবী থেকে এর দূরত্ব a(1−e)। অনুভূতে আবহমণ্ডলের ঘনত্ব সবচেয়ে বেশী। সে জন্যে এখানে উপগ্রহের গতির বেশ তাৎপর্য আছে। A বিন্দুটিকে বলা বলা হয় অপভূ। পৃথিবী থেকে এর দূরত্ব a(1+e)। কক্ষে একটি উপগ্রহ কি অবস্থার মধ্য দিয়ে আবর্তিত হয়, তা জানবার আগে আমরা কক্ষপথ সংক্রান্ত আরও কয়েকটি প্রাথমিক প্রশ্নের সঙ্গে পরিচিত হবো।

আমাদের একটি মৌলিক প্রশ্ন হচ্ছে, পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি অতিক্রম করিয়ে একটি নির্দিষ্ট কক্ষে আবর্তন করাতে হলে উপগ্রহটিকে কি গতিবেগে উৎক্ষেপণ করা প্রয়োজন। শূন্য উচ্চতায় (Zero altitude) বৃত্তাকার কক্ষের জন্যে ন্যূনতম গতিবেগ হলো

$$v_1 = \sqrt{g_0 r_0} \quad \ldots \quad (1)$$

r_0 হলো পৃথিবীর ব্যাসার্ধ, g_0 হলো অভিকর্ষজ ত্বরণ, 'শূন্য উচ্চতায়' বলতে বুঝবো একেবারে পৃথিবীর পৃষ্ঠ বরাবর কক্ষকে। ব্যাপারটা নেহাৎই তত্ত্বগত। পৃথিবীর পৃষ্ঠ বরাবর কোন উপগ্রহ পাঠানো সম্ভব নয়। সেটা বায়ুমণ্ডল এবং পর্বতমালার উপস্থিতির জন্যে। হিসাব করলে দেখা যাবে, পৃথিবীর উপগ্রহের জন্যে v_1 =

*পদার্থবিদ্যা বিভাগ, বিশ্বভারতী, বোলপুর

7·91 km/sec, মঙ্গলের উপগ্রহের জন্য $v_1 = 3.58$ km/sec এবং চাঁদের বেলায় $v_1 = 1·68$ km/sec.। এই ন্যূনতম গতিবেগ v_1 বাড়াতে বাড়াতে এমন একটি গতিবেগ পাওয়া যাবে, যখন উপগ্রহটি মাধ্যাকর্ষণ শক্তি অতিক্রম করে উপবৃত্তাকার পথে পৃথিবীর চার পাশে ঘুরতে সুরু করে দেবে। এই নিষ্ক্রমণ গতিবেগ হলো—

$$v_2 = \sqrt{2}\, v_1 \quad \ldots \quad (2)$$

v_2-কে বাড়ালে কক্ষপথ উপবৃত্ত থেকে অধিবৃত্তে পরিবর্তিত হয়ে যাবে (১নং চিত্র খ)। আমরা যদি উপগ্রহটিকে একটি বিশেষ উচ্চতায় তুলে তাকে কক্ষপথে ঠেলে দিতে চাই, তবে উল্লিখিত সূত্র দুটিরই পরিবর্তন ঘটাতে হবে। ধরা যাক, এই উচ্চতা হলো r।

তখন বৃত্তাকার কক্ষের জন্যে ১নং সূত্রের জায়গায় পাব

$$v_1' = \frac{r_0}{r}\sqrt{g_0 r} \quad \cdots\cdots (3)$$

এবং উপবৃত্তাকার পথের জন্য ২নং সূত্রের জায়গায় পাব

$$v_2' = \frac{r_0}{r}\sqrt{2 g_0 r} \quad \cdots\cdots (4)$$

৩নং এবং ৪নং সূত্রে উল্লিখিত কক্ষগুলিকে বলা হয় ন্যূনতম শক্তির কক্ষ (Minimum energy orbit)। আকর্ষণীয় ব্যাপার হচ্ছে, USSR থেকে কোনদিনও ন্যূনতম শক্তি ব্যবহার করে চাঁদে পৌঁছনো যাবে না। তবে US থেকে কখনো পৌঁছনো যেতে পারে। এটা কক্ষবলবিদ্যার প্রাথমিক সূত্র থেকেই নির্ধারিত।**

** আসল কথা হচ্ছে, পৃথিবী থেকে উৎক্ষিপ্ত উপগ্রহের যে কক্ষপথটি সৃষ্টি হবে, সেই কক্ষটির অপকেন্দ্রটির (Apocentre) স্বাধীনতা একমাত্রিক (One degree of freedom)। ফলে উৎক্ষেপণ গতিবেগ বাড়িয়ে বা কমিয়ে অপকেন্দ্রটিকে একটি মাত্র সরলরেখাতেই সঞ্চালিত করা সম্ভব। এই সরলরেখাটি কক্ষের প্রধান অক্ষ BC (২নং চিত্র)। যেহেতু পৃথিবী নিজের অক্ষের উপর ঘুরছে, সেহেতু যথাযথ সময় নির্ধারণ করে উপগ্রহ উৎক্ষেপণ করলে অপকেন্দ্রটিকে একটি তলে সঞ্চালিত করা যায়। এজন্যে অবশ্য নিরক্ষবৃত্ত থেকে উপগ্রহ উৎক্ষেপণ করা প্রয়োজন। উৎক্ষেপণ স্থানের যথাযথ দ্রাঘিমা-লঘিমা নির্ধারণ করে অপকেন্দ্রটিকে শঙ্কু-তলের উপর সঞ্চালন করাও সম্ভব। এই ব্যাপারটার মানেই হচ্ছে অপকেন্দ্রের দ্বিমাত্রিক স্বাধীনতা প্রাপ্তি। ত্রিমাত্রিক স্বাধীনতা (Three degrees of freedom) থাকলে উপগ্রহটিকে মহাকাশের যে কোনও জায়গায় পাঠানো যেত। এই ত্রিমাত্রিক স্বাধীনতার জন্যে জ্বালানী খরচ করে আলাদা শক্তি ব্যবহার করা প্রয়োজন। যদি আলাদা শক্তি ব্যবহার না করে পূর্বোল্লিখিত

২নং চিত্র

কক্ষপথে উপগ্রহের যথাযথ অবস্থান বুঝতে হলে আমাদের দু-একটি জ্যোতির্তাত্ত্বিক সংজ্ঞার সঙ্গে পরিচিতি থাকা প্রয়োজন (৩নং চিত্র)। সেগুলি হলো—বিষুববৃত্তে কক্ষপথের নতি অর্থাৎ অবনমন কোণ (i), উদ্‌বিন্দু (N), উদ্‌বিন্দুর বিষুবাংশ (Ω)। উপগ্রহটির কক্ষপথ
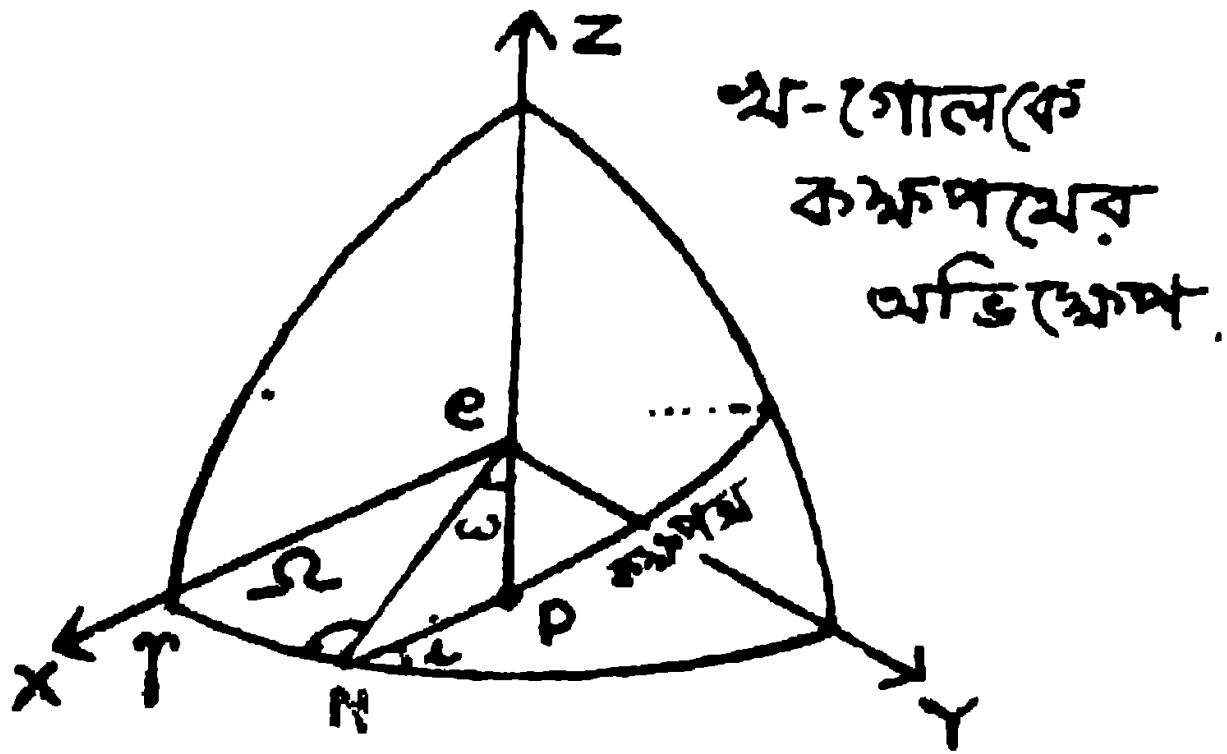
৩নং চিত্র

উত্তর থেকে দক্ষিণ ভূ-মণ্ডলে পার হবার সময় নিরক্ষবৃত্তকে যে বিন্দুতে ছেদ করে, সেই বিন্দুটিই উদ্‌বিন্দু নামে পরিচিত। এছাড়া একটি নির্দিষ্ট সময়ে কক্ষপথে উপগ্রহের অবস্থান বোঝবার জন্যে আরও কিছু তথ্য প্রয়োজন। তা হলো, t=0 সময়ে কক্ষপথে উপগ্রহের অবস্থান, কোন্ সময়ে উপগ্রহটি অনুভূতে থাকবে ইত্যাদি।

কৃত্রিম উপগ্রহের কক্ষপথ পর্যবেক্ষণ করে আমরা যে সব তথ্যাদি পাই, তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে—কি কি প্রাকৃতিক কারণ তাকে স্বাভাবিক কক্ষ থেকে বিচ্যুত করতে চাইছে। সম্ভবতঃ এর মধ্যে পৃথিবীর নিরক্ষীয় স্ফীতি এবং আবহাওয়ার ঘনত্বের প্রাধান্য সবচেয়ে বেশী। তারপরেই আসে সূর্যের বিকিরণ-চাপের সমস্যা। আন্তর্জাতিক ভূপদার্থ-বিজ্ঞান বছরে বিজ্ঞানীরা ভ্যানগার্ড প্রোজেক্টের সাহায্য নিয়েছিলেন। এই প্রোজেক্টের তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন স্থানে বেতার-কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছিল। এদের কাজ ছিল কৃত্রিম উপগ্রহ কর্তৃক প্রেরিত বেতার-তরঙ্গের সাহায্য নিয়ে তার গতি পর্যবেক্ষণ। যে সব উপগ্রহ বেতার-তরঙ্গ প্রেরণক্ষম নয়, তাদের পর্যবেক্ষণের জন্যে দিবালোক বা রেডার যন্ত্রের প্রয়োজন। দিবালোকে আধুনিক ক্যামেরা ও অন্যান্য সাজসরঞ্জামের সাহায্য নিয়ে কৃত্রিম উপগ্রহ পর্যবেক্ষণ খুব তাৎপর্যপূর্ণ। এভাবেই প্রকৃতপক্ষে কক্ষের সঠিক পর্যবেক্ষণ সম্ভব।

পৃথিবীর নিরক্ষীয় স্ফীতির জন্যে প্রধানতঃ Ω এবং ω-র পরিবর্তন ঘটে। আমরা যদি ধরে নিই যে, অক্ষের চতুর্দিকে পৃথিবী তার সৌসাদৃশ্য বজায় রেখেছে, তবে যে কোন একটি বিন্দুতে (r, θ) মহাকর্ষীয় বিভবকে এভাবে বর্ণনা করা যায়:—

$$U(r,\theta) = \frac{GM}{r}\left\{1 - J_2\left(\frac{R_0}{r}\right)^2 P_2 \, Cos\theta - J_3\left(\frac{R}{r}\right)^3 P_3\,(Cos\theta) - \;\ldots\right\}$$

r হচ্ছে পৃথিবী থেকে উল্লিখিত বিন্দুর দূরত্ব এবং θ হলো ভূকেন্দ্রীয় লঘিমা। G হচ্ছে মহাকর্ষীয় ধ্রুবক, M পৃথিবীর ভর। R_0 বিষুব বৃত্তের

ন্যূনতম শক্তির কক্ষ ব্যবহার করা হয়, তবে রাশিয়া থেকে কখনই চাঁদে পৌঁছনো যাবে না।

চাঁদের কক্ষতল পৃথিবীর বিষুবতলের সঙ্গে যে কোণ করে আছে, তা প্রতি ১৮.৬ বছরে ১৮.৫° থেকে ২৮.৫°-এর মধ্যে পরিবর্তিত হয়। ১৮.৬ বছরের মধ্যে কিছু সময় আমেরিকার কেপ কেনেডি থেকে (এটা অবশ্যই ভৌগোলিক কারণে) চাঁদে ন্যূনতম শক্তির কক্ষ ব্যবহার করে উপগ্রহ পাঠানো সম্ভব। এজন্যেই ১৯৬৯ খৃষ্টাব্দে প্রোজেক্ট অ্যাপোলো-র বাস্তব রূপের কথা ভাবা হয়েছিল। ঐ বছর চাঁদের কক্ষ এবং ভূ-বিষুবতলের মধ্যে ২৮.৫° কোণ সৃষ্টি হবার কথা। এই অবনমন কোণের ফলে ন্যূনতম শক্তির কক্ষ ব্যবহার করে চন্দ্রে যাওয়া সম্ভব।

ব্যাসার্ধ P_2, P_3 ...... ইত্যাদি লেজ্যাঁদর্ পলিনোমিয়াল (Ledgendre Polynomial) নামাঙ্কিত আঙ্কিক সংখ্যা।

উল্লিখিত সূত্রটির সাহায্য নিয়ে J_2, J_3... ইত্যাদি নির্ধারণ সম্ভব। এরা জোনাল হারমনিক নামে পরিচিত। পৃথিবীর আকার কমলা লেবুর মত—সেই আদি ধারণা বদ্‌লে গিয়ে দাঁড়িয়েছে—পৃথিবীর আকার ন্যাস্‌পাতির মত। J_3 নির্ধারণ করতে গিয়ে এটা জানা গেছে।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে Ω কমে যাবার অর্থ হচ্ছে উপগ্রহের কক্ষতলের রেট্রোগ্রেড প্রিসিশান
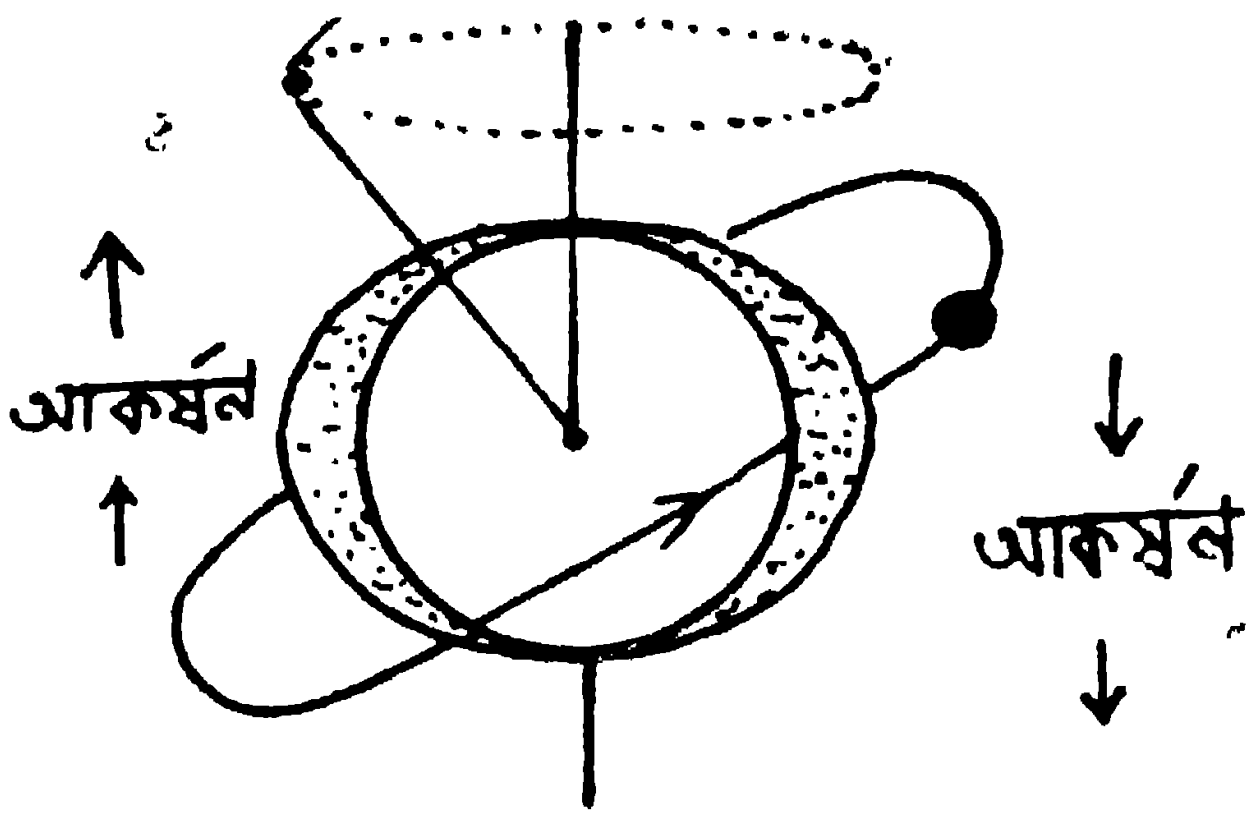
৪নং চিত্র

(Retrograde precession)। ৪নং ছবিতে দেখা যাচ্ছে বিষুব অঞ্চলের স্ফুরিত অংশের জন্যে (ফুটকি দেওয়া অংশ) কক্ষপথে উপগ্রহটি আকর্ষণ অনুভব করে। ফলে, এক কাপ্‌লের (Couple) সৃষ্টি হয়, যার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে উপগ্রহের ভরবেগও একই দিকে পরিবর্তিত হয়।

এজন্যে কক্ষতলের অনুবর্তন সুরু হয়ে যায়। চন্দ্রের কক্ষ পর্যবেক্ষণ করে আমরা পৃথিবীর নিরক্ষীয় স্ফীতির যে পরিমাপ পাই, তা হলো, ১/২৯৪, সে জায়গায় কৃত্রিম উপগ্রহের কক্ষপথ থেকে হিসাব করলে তা হয় ১/২৯৮। নিরক্ষবৃত্তের ব্যাস থেকে মেরুবৃত্তের ব্যাস বাদ দিয়ে তাকে নিরক্ষবৃত্তের ব্যাস দিয়ে ভাগ করলে যে সংখ্যাটি পাওয়া যায়, তাকেই নিরক্ষীয় স্ফীতির (Oblateness) মাপ বলে ধরা হয়।

গতিপথ পর্যবেক্ষণ করে উপগ্রহের উপর বাতাসের ঘনত্ব কি ভাবে কাজ করে, তা জানা সম্ভব। এভাবে আবহমণ্ডলের ঘনত্ব নিরূপক ম্যাপ আঁকা সম্ভব। এই রকম ম্যাপের সঙ্গে আবহতাত্ত্বিক গবেষণালব্ধ ম্যাপের যথেষ্ট পার্থক্য দেখা গেছে। সূর্যের সক্রিয়তার সঙ্গে সঙ্গে বাতাসের ঘনত্বও পরিবর্তিত হয়। সূর্য থেকে আগত রশ্মি আবহমণ্ডলের উচ্চস্তরে শোষিত হয়ে যায়। এই প্রক্রিয়ায় উদ্ভূত তাপ আবহমণ্ডলের সেই সব স্তরে ঘনত্বের যথেষ্ট হেরফের ঘটাতে থাকে। এমনও হতে পারে, পৃথিবীর যে দিকে দিন সে দিকে ৮০০ কি. মি. উচ্চতায় ঘনত্ব, যে দিকে রাত সেই উচ্চতায় ঘনত্বের প্রায় আটগুণ বেশী হতে পারে।

অনুভূ-তে বাতাসের ঘনত্ব সবচেয়ে বেশী হলেও যদি কক্ষপথের উৎকেন্দ্রতা $e > 0{\cdot}02$ হয়, তবে তাকে উপবৃত্তাকার বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। উপগ্রহের কৌণিক ভরবেগ অনুভূ পার হবার সঙ্গে সঙ্গে হ্রাস পায় এবং অর্ধেক আবর্তনের মধ্যেই অপভূর দূরত্ব কমে যায়। একই ঘটনার এই পুনরাবৃত্তির জন্যে অপভূ পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে এগুতে থাকে। কক্ষপথটি ক্রমশঃ বৃত্তাকার হতে থাকে এবং a ছোট হতে থাকে। কেপ্‌লারের সূত্র থেকে আমরা পাই, আবর্তনের সময় $T \propto a^{3/2}$। অতএব a-র সঙ্গে সঙ্গে T-ও ছোট হতে থাকে। উপবৃত্ত থেকে বৃত্তাকার হতে হতে উপগ্রহের কক্ষপথও পৃথিবীর দিকে এগিয়ে যায়।

কোন দেশের উপর স্থির উপগ্রহ সৃষ্টি করতে হলে সে দেশের বায়ুমণ্ডল সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। স্থির উপগ্রহ বলতে আমরা বুঝি—যে উপগ্রহের কক্ষপথের ঘূর্ণন-সংখ্যা অক্ষের উপর পৃথিবীর ঘূর্ণন-সংখ্যার সমান।

পৃথিবীব্যাপী যোগাযোগ রক্ষায় এই জাতীয় উপগ্রহের ভূমিকা অসামান্য।

সূর্যের বিকিরণ-চাপ উপগ্রহের কক্ষপথে জটিল সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। আমাদের কাছে এই চাপের অনুভূতি এতই কম যে, বোধগম্যই হয় না—কি ভাবে বিকিরণ মহাশূন্যে ভ্রমণকারী বস্তুর উপর কাজ করতে পারে। দশ লক্ষ ফ্ল্যাশলাইট যে চাপ সৃষ্টি করে, তা দিয়ে একটি
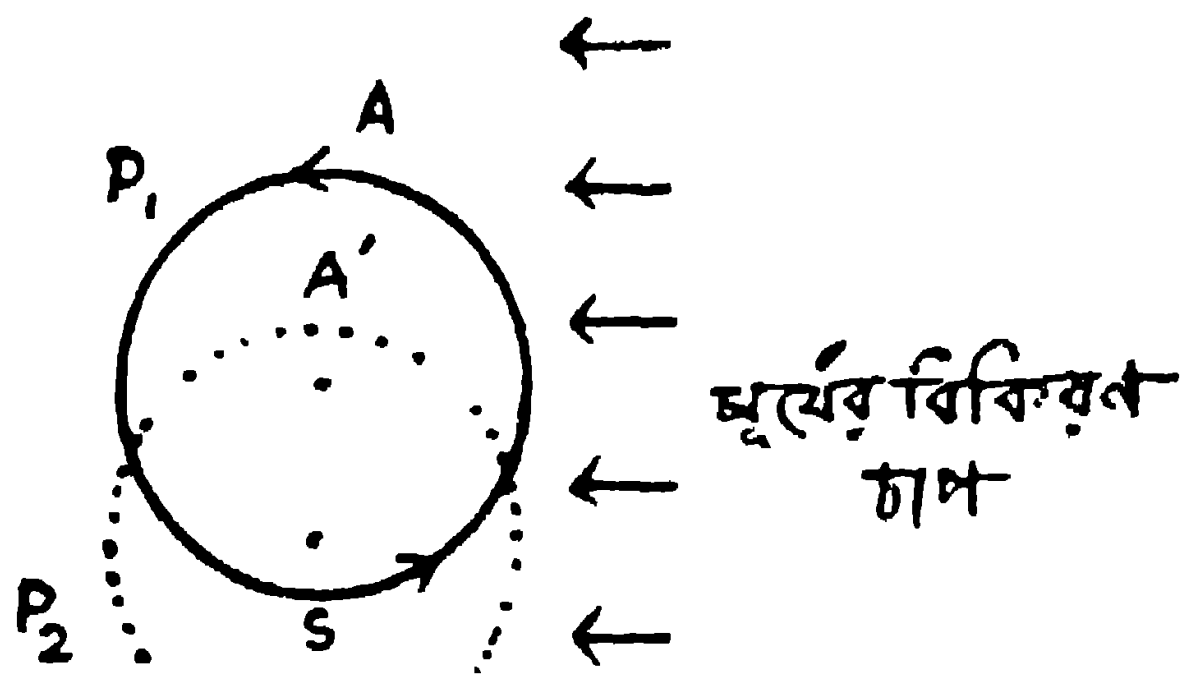
৫নং চিত্র

ডাক টিকিট তুলে ধরা সম্ভব। সূর্য একটি মহা-জ্যোতিষ্ক। পৃথিবীর উপর সূর্যের বিকিরণ-চাপ এক লক্ষ টনের মত।

উপগ্রহের বেলায় বিকিরণ-চাপের ব্যাপারটা অনেকটা বাতাসের অবরোধের মত। অতএব আমরা লিখতে পারি :—

$$\frac{\text{বিকিরণ-চাপজনিত শক্তি}}{\text{ড্র্যাগ (Drag)}} = F(h)$$

F(h) নির্ভর করছে উপগ্রহের উচ্চতার উপর। F(h)=1 হয় ৮০০ কি. মি. উচ্চতায়। তখন ড্র্যাগ= বিকিরণের চাপজনিত শক্তি। উপগ্রহের উচ্চতার সঙ্গে সঙ্গে বিকিরণের চাপ বৃদ্ধি পায়।

কিভাবে বিকিরণের চাপ কক্ষপথের পরিবর্তন ঘটায়, তা ৫নং ছবি থেকে বোঝা যায়। যে উপগ্রহটি P_1 কক্ষপথে ঘুরছে, S-বিন্দুটির মধ্য দিয়ে যাবার সময় বিপরীতমুখী সৌরবিকিরণের চাপে তার কৌণিক ভরবেগ যাবে কমে। ফলে A-র মধ্য দিয়ে না গিয়ে উপগ্রহটি যাবে A′-র মধ্য দিয়ে। তখন সৌরবিকিরণের জন্যে তার কৌণিক ভরবেগ যাবে বেড়ে। যে জন্যে S-র মধ্য দিয়ে না গিয়ে সে যাবে S′-র মধ্য দিয়ে। এভাবে কক্ষপথের স্থান পরিবর্তনের জন্যে অনুভূর দূরত্ব অবস্থান অনুযায়ী বাড়ে বা কমে।

এতক্ষণ আমরা উপগ্রহের উপর তিনটি প্রধান শক্তি কিভাবে কাজ করে, তার সঙ্গে সামান্য পরিচিত হলাম। এছাড়া অন্যান্য শক্তির প্রভাব অপেক্ষাকৃত কম। তার মধ্যে চাঁদ ও সূর্যের আকর্ষণ বিকিরণ-চাপের মত সমস্যার সৃষ্টি করে থাকে।

সঞ্চয়ন

পশুর গর্ভাধান শক্তি বাড়াবার উপায়

জীবজন্তুর গর্ভাধান শক্তি বা ফার্টিলিটি বাড়াবার কোন পথের সন্ধান বিজ্ঞানীরা কি দিতে পারেন? অদূর ভবিষ্যতেই তা সম্ভব হবে বলে তাঁরা মনে করেন।

আমেরিকার মিনিয়াপোলিসের মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল বিজ্ঞানী এই বিষয়ে গবেষণা করছেন। তাঁরা এক্ষেত্রে অনেকখানি এগিয়েও গেছেন। গর্ভাধান শক্তি বাড়াবার যে পথের সন্ধান তাঁরা পেয়েছেন, তাঁদের ধারণা ঐ পন্থায় কেবল পশুরই নয়, মানুষেরও গর্ভাধান শক্তি বাড়ানো যেতে পারে। তাছাড়া লিউকেমিয়া বা রক্তের ক্যান্সার রোগে যারা ভুগছেন, তাদের রোগ নিরাময়েও ঐ পন্থা সহায়ক হতে পারে।

ঐ সকল বিজ্ঞানী সম্প্রতি বলেছেন যে, তাঁরা বাছুরের শুক্রাণু থেকে বিশুদ্ধ আকারে বিষাক্ত প্রোটিন বের করতে পেরেছেন। এই বিষপূর্ণ প্রোটিন র‍্যাটেল সাপের বিষের মতই মারাত্মক। কিন্তু এই বিষই আবার গর্ভাধান শক্তি বাড়ানোর ব্যাপারে খুব সহায়ক হতে পারে। এই বিষয়টি নিয়ে সম্প্রতি পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অ্যালেন জে. হান্টারের কর্তৃত্বাধীনেই এই গবেষণা চালানো হচ্ছে। তিনি এই প্রসঙ্গে বলেছেন—কৃত্রিম উপায়ে যথেষ্ট পরিমাণে এই জিনিষটি উৎপাদন করা সম্ভব হলে এটি ষাড় অথবা অন্যান্য পশুর শুক্রাণুর সঙ্গে মেশানো যেতে পারে। প্রোটিনযুক্ত হবার ফলে ঐ শুক্রাণু গরুর জনন-অঙ্গে বেশ কিছুকাল থাকতে পারে। এর ফলে গর্ভাধানের সম্ভাবনাও বৃদ্ধি পেতে পারে।

মিঃ হান্টার বলেছেন যে, কটা রঙের বেশ কয়েকটি বাদুরের জননাঙ্গ থেকে নয় প্রকার প্রোটিন বিজ্ঞানীরা সংগ্রহ করেছেন এবং প্রত্যেক প্রকার প্রোটিন ইঁদুর বা খরগোসের উপর প্রয়োগ করা হয়েছে। এদের মধ্যে বি-এস-ভি নামে এক প্রকার প্রোটিন প্রয়োগের পর দেখা গেছে—যে সকল জন্তুর উপর এটি প্রয়োগ করা হয়েছে, তাদের প্রত্যেকটিরই মৃত্যু ঘটেছে।

ঐ সকল মৃত পশুর দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষার পর দেখা গেছে এদের যে সকল মসৃণ পেশী সাধারণতঃ সঙ্কুচিত থাকে—ঐ প্রোটিন প্রয়োগের ফলে সেগুলি শিথিল হয়ে পড়েছে। মিঃ হান্টার এই প্রসঙ্গে বলেছেন—এই তথ্যানুসন্ধানের ফলে জানা গেছে যে, ঐ প্রোটিন বাদুরের পক্ষে বিষাক্ত না হলেও স্ত্রীজাতীয় বাদুরের জরায়ুর মসৃণ পেশীর আচরণের উপর এর ক্রিয়া বিষের মত হয়ে থাকে।

কোন কোন জাতীয় বাদুরের সন্তানোৎপাদনের ব্যাপারটি ছিল রহস্যাবৃত। সেই তথ্যানুসন্ধানের ফলে এই রহস্যের আবরণ অনেকখানি উন্মোচিত হয়েছে এবং জানা গেছে যে, স্ত্রীজাতীয় বাদুরের পরিপক্ব ডিম্বকোষ উৎপন্ন হবার প্রায় সাত মাস পূর্বে গ্রীষ্মের শেষে অথবা শরতের প্রারম্ভে পুংজাতীয় বাদুরের জননকোষে শুক্রাণু উৎপন্ন হয়ে থাকে। শরৎকালে তাদের মিলন ঘটে, তারপর শীতকালটা তারা বিশ্রামে কাটায়। ঐ সময়ে স্ত্রীজাতীয় বাদুরের জনন-প্রণালীতে যে শুক্রাণু সঞ্চিত থাকে, বি-এস-ভি জাতীয় প্রোটিন তাকে সংরক্ষণ করে। তারপর বসন্তকালে যখন স্ত্রীজাতীয় বাদুরের জননকোষে পরিপক্ব ডিম্বকোষ উৎপন্ন হয়, তখন উৎপন্ন হয় শক্তিশালী

এন্‌জাইম। ঐ এন্‌জাইম নষ্ট করে দেয় ঐ বি-এস-ভি প্রোটিনকে এবং গর্ভাধান ঘটে থাকে।

মিঃ হান্টার এই প্রসঙ্গে আরও বলেছেন যে, শুক্রকোষসমূহ সাধারণতঃ পেশী-সঙ্কোচনের ফলে একটি অতি ক্ষুদ্র ছিদ্রের মধ্য দিয়ে জরায়ুতে প্রবেশ করে থাকে। এক্ষেত্রে জরায়ুর দু-দিকে দুটি বাহুর মত যে ফ্যালোপিয়ান টিউব রয়েছে, তাদেরই একটির মধ্যে ঐ শুক্রাণু প্রবেশ করে এবং ঐ টিউবের একেবারে শেষ প্রান্তে গর্ভাধান ঘটে। বি-এস-ভি প্রোটিন জরায়ুর পেশীকে শিথিল করে দেয় এবং শুক্রাণুকেও নিষ্ক্রিয় করে রাখে বলে ফ্যালোপিয়ান টিউবের মধ্যে এদের গতি হয় শ্লথ। তারপর স্ত্রীজাতীয় বাদুরের শ্বেত রক্তকণিকার আক্রমণ থেকেও বি-এস-ভি প্রোটিন শুক্রকোষকে রক্ষা করে থাকে, নতুবা কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ঐ সকল শুক্রকোষ সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যেত।

এই বিষয়ে গবেষণার ফলে আরও জানা গেছে যে, স্ত্রীজাতীয় জীবজন্তুদের রক্তের লিম্‌ফোসাইটিক শ্বেতকণিকা বি-এস-ভি নষ্ট করে দেয়। লিউকেমিয়া রোগ অতিরিক্ত শ্বেতকণিকা উৎপাদনের ফলে দেখা দেয়। বিজ্ঞানীদের ধারণা, ঐ রোগের চিকিৎসায় ভবিষ্যতে বি-এস-ভি হয়তো খুবই সহায়ক হবে। তবে তাঁরা বলছেন যে, এর গুণাগুণ সম্পর্কে বিশেষভাবে অবহিত হবার জন্যে এই জাতীয় প্রোটিন নিয়ে আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজন। রক্তের উপর বি এস ভি-র প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সম্পূর্ণ তথ্য এখনও সংগৃহীত হয় নি।

মানব-কল্যাণে লেসার রশ্মি

লাইট অ্যাম্‌প্লিফিকেশন বাই স্টিমুলেটেড এমিশন অব রেডিয়েশন—সংক্ষেপে লেসার রশ্মি দশ বছর আগেও ছিল গবেষণার বস্তু, বৈজ্ঞানিকদের বিস্ময়। সাধারণ যে বৈদ্যুতিক আলো বাল্ব থেকে বিকিরিত হয়, সেই আলোতে থাকে বহু মাপের তরঙ্গ। সেই নানা মাপের আলোর তরঙ্গ একটি এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। লেসার রশ্মির বেলায় তা হয় না। এই রশ্মির সুতীক্ষ্ণ ছটা অতি তীব্র এবং বহুদূর প্রসারী। তথ্য ও উপকরণ প্রণালীবদ্ধ করবার ব্যাপারে, শিল্পপণ্যের গুণাগুণ নিরূপণে, শল্যচিকিৎসা ও ভেষজ-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এবং ত্রিমাত্রিক প্রতিবিম্ব রচনায় এই রশ্মির প্রয়োগ দিনের পর দিন বেড়ে চলেছে। ১৯৬০ সালে আমেরিকার গবেষণাগারে লেসার রশ্মিকে বাস্তবে রূপদান করা হয়। তারপর থেকে সমগ্র বিশ্বে এই রশ্মিকে কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করবার জন্যে নানা রকমের যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ নির্মাণের প্রতিযোগিতা চলছে।

লেসার রশ্মির প্রয়োগ-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিস্ময় এনে দিয়েছে। অন্ধেরা এই রশ্মির সাহায্যে দৃষ্টি ফিরে পাচ্ছেন। এই প্রক্রিয়ায় একটি অতি ক্ষুদ্র পাত্ অন্ধজনের মস্তিষ্কে স্থাপন করা হয়। এতে বাইরের যে প্রতিক্রিয়া হয়, তা সুস্থ মস্তিষ্কে প্রতিবিম্ব রচনা করে। অতি ক্ষুদ্র লেসার ক্যামেরাটির জন্যে অন্ধজনের মস্তিষ্কে প্রমাণ মাপের ত্রিমাত্রিক প্রতিবিম্ব পড়ে। অন্ধজনেরা তাতে দেখতে পান।

রোগ-চিকিৎসার খুব ব্যাপক ক্ষেত্রে লেসার রশ্মির প্রয়োগ করা হচ্ছে। চোখের অপারেশনে বিচ্ছিন্ন অক্ষিপট বা রেটিনাকে পুনরায় লেসার রশ্মির সাহায্যে সংযোজন করা হচ্ছে। ক্যান্সার রোগগ্রস্ত ত্বকের অপারেশন এবং অন্যান্য রোগের রক্তপাত ও বেদনাহীন অপারেশন বর্তমানে এই রশ্মির সাহায্যে হচ্ছে।

সম্প্রতি দন্তরোগের চিকিৎসায়ও লেসার রশ্মি প্রয়োগ করা হচ্ছে। জনৈক দন্তচিকিৎসক ঐ

রশ্মি জনৈক রোগীর দাঁতে দু-বার প্রয়োগ করে দেখেছেন যে, এতে দাঁতের ক্ষয়-ক্ষতি প্রতিরোধ করবার শক্তি বৃদ্ধি পায়। এই রশ্মি প্রয়োগের ফলে দাঁতের উপরিভাগের এনামেলের গঠন-প্রণালীতে পরিবর্তন ঘটে।

বর্তমানে নানা দেশে লেসার রশ্মি প্রয়োগের নানাবিধ যন্ত্র নির্মিত হচ্ছে। ওয়াশিংটনের স্মিথসোনিয়ান মিউজিয়াম অব হিষ্ট্রী অ্যাণ্ড টেক্নোলজীতে এই সকল উপকরণের একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে। এর নামকরণ করা হয়েছে 'লেসার ১০' অর্থাৎ লেসার কারিগরি-বিজ্ঞানের প্রথম দশ বছর। জানুয়ারী, '৭০ মাসের শেষের দিকে এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করা হয়। মে, '৭০ মাস পর্যন্ত এটি খোলা থাকবে।

মানুষের কল্যাণসাধনে লেসার রশ্মি কতভাবে যে প্রয়োগ করা হচ্ছে, তা এই প্রদর্শনীতে দেখানো হচ্ছে। এই রশ্মির অন্যতম আবিষ্কারক ডক্টর এ. এল. স্কাওলো এই প্রসঙ্গে বলেছেন, প্রকৃতির নানাবিধ শক্তিকে কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করবার যে স্বপ্ন মানুষ দেখে এসেছে, তা আজ বাস্তবে পরিণত হয়েছে। স্যানফ্রান্সিসকো উপসাগরের তলায় সুড়ঙ্গ খনন এবং মেক্সিকো শহরের ভূগর্ভে পথ নির্মাণে লেসার রশ্মিকে যে কিভাবে কাজে লাগানো হয়েছিল, তা এক সাংবাদিক বৈঠকে তিনি বর্ণনা করেন। তিনি আরও বলেন যে, ভবিষ্যতে এই রশ্মি মানুষের কল্যাণসাধনের জন্যে বহুবিধ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হবে, তবে এখনই সে সম্পর্কে কিছু বলা সম্ভব নয়।

কীট-পতঙ্গনাশক নতুন রাসায়নিক

বৃটেনের একটি গবেষণা কেন্দ্রে বিভিন্ন শস্যের ক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্যে অবিরতভাবে রাসায়নিক যৌগিক পদার্থ উদ্ভাবিত ও পরীক্ষিত হয়ে চলছে। জলবায়ু, ভূ-প্রকৃতি ও জলের উৎসের বিভিন্নতার দিকে নজর রেখেই এটা করা হয়।

এখানে উদ্ভাবিত কয়েকটি রাসায়নিক পদার্থ এতই সফল হয়েছে যে, এগুলি ইউরোপ, আমেরিকা আফ্রিকা ও দূরপ্রাচ্যের দুই শতাধিক দেশে ব্যবহৃত হচ্ছে।

ইকোয়েডর-এর কলা, দক্ষিণ আফ্রিকার আঙুর, ঘানা ও নাইজেরিয়ার কোকো, সিংহলের চা ও মালয়ের রবার ইত্যাদি ফসল এই গবেষণা কেন্দ্রের কাজের দ্বারা উপকৃত হচ্ছে। এই কেন্দ্রটি হলো দক্ষিণ ইংল্যাণ্ডের সাসেক্স-এ অবস্থিত ইম্পিরিয়াল কেমিক্যাল টোব্যাকোর প্ল্যাণ্ট প্রোটেকশন সংস্থা।

বিভিন্ন জাতের গাছের উপর পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে রাসায়নিক দ্রব্যগুলিকে তারা কিরূপ প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে গ্রহণ করে। বিশেষভাবে পরীক্ষা করে দেখা হয়, রাসায়নিক দ্রব্যগুলির কীটনাশক ক্ষমতা গাছগুলির কোন রকম ক্ষতি করে কি না।

পিরিমোর নামে একটি কীটনাশক পাউডার উদ্ভাবিত হয়েছে, যেটি জলের সঙ্গে মিশিয়ে গাছের সবুজ পাতার উপর ছড়িয়ে দিলে পাতার উভয় পার্শ্বের সবুজ-পোকা ও কালো-পোকাগুলি মরে যায়, কিন্তু গাছের পক্ষে উপকারী কীটগুলির কোন ক্ষতি হয় না।

ফুলগাছে যখন ফুল ধরে, তখন এই পাউডারের ব্যবহার খুব কার্যকরী হয়। মাটিতে ছড়িয়ে দিলে শিকড়ের সাহায্যে এই রাসায়নিক দ্রব্য টেনে নেয় এবং এভাবে একবার ওষুধ ছড়ানোর প্রভাব কয়েক সপ্তাহ পর্যন্ত স্থায়ী হয়। এটি অতি

সাম্প্রতিক আবিষ্কার এবং এই সম্বন্ধে এখনও পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছে।

প্ল্যাণ্ট প্রোটেকশন সংস্থার উৎপন্ন রাসায়নিকের দুই-তৃতীয়াংশই বিদেশে ব্যবহারের জন্যে চলে যায়। কীটনাশক রাসায়নিক দ্রব্য ছাড়াও বীজ-শোধন ও আগাছানাশক রাসায়নিকও এখানে প্রস্তুত হয়েছে।

এশিয়া, আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার যে সকল অঞ্চলের জমি অর্ধ-উন্নত, সেই সব অঞ্চলই এই গবেষণা কেন্দ্রের কাজে ক্রমশঃ অধিক পরিমাণে উপকৃত হচ্ছে। এসব রাসায়নিক দ্রব্য যাতে আরও কার্যকরভাবে প্রয়োগ করা যায়, তার জন্যে রাসায়নিক দ্রব্য ছড়াবার সবচেয়ে ভাল যন্ত্র ব্যবহারের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

ক্যান্সারনাশক নতুন ওযুধ

একটি ব্যাক্টিরিয়া ও ফাঙ্গাস বিরোধী যৌগিক পদার্থে অপ্রত্যাশিতভাবে ক্যান্সারবিরোধী গুণের সন্ধান পাওয়া গেছে।

এই যৌগিক পদার্থটির নাম মাইকোফেনোলিক অ্যাসিড। ইম্পিরিয়াল কেমিক্যালস ইণ্ডাস্ট্রিজের (আই-সি-আই) ফারমাসিউটিক্যাল ডিভিশনের যে সব গবেষণা-কর্মী এই আবিষ্কার করেছেন, তাঁরা এটিকে একটি মূল্যবান জীবাণুনাশক বলে বর্ণনা করেছেন। মাইকোফেনোলিক অ্যাসিডের উৎস পেনিসিলিয়াম মণ্ড। ৭০ বছর আগেই এটি আবিষ্কৃত হয়েছিল।

ইঁদুরের টিউমারের উপর এই ওযুধ প্রয়োগ করে দেখা গেছে যে টিউমারের বৃদ্ধি বন্ধ হয়। একটি পরীক্ষায় এক বিশেষ ধরণের টিউমার এই ওযুধ প্রয়োগে সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয়েছে।

এই সব পরীক্ষায় মাইকোফেনোলিক অ্যাসিড প্রয়োগ করা হয়েছে মুখ দিয়ে বা ইঞ্জেকশন দিয়ে, কিন্তু দেখা গেছে ফলাফল একই রকম হয়। অল্প কয়েকটি পরীক্ষায় এক ধরণের লিউকোমিয়ায় এই ওযুধ বেশ কার্যকরী হতে দেখা গেছে।

এই ওযুধ ক্যান্সার আক্রান্ত কোষগুলির বিভাজন বন্ধ রাখে, অথচ স্বাভাবিক কোষগুলির কোন ক্ষতি করে না। মনে হয় নিউক্লিক অ্যাসিড তৈরির একটা পর্যায়ে এই ওযুধ বাধার সৃষ্টি করে।

গবেষক দল বলেন কতকগুলি কোষ এক বিশেষ ধরণের এন্‌জাইম তৈরি করে কোষ-বিভাজনের পথে প্রতিরোধের কাজ এড়িয়ে যেতে পারে। এই কারণে গবেষকেরা ওযুধটির সঙ্গে আরও এমন একটি পদার্থ ব্যবহার করতে চান, যাতে ঐ ধরণের কোন এন্‌জাইম তৈরির কাজ বন্ধ থাকবে।

ইঁদুরকে একই সঙ্গে দুটি ওযুধ খাইয়ে যে সব ক্যান্সারে শুধু অ্যাসিডে কাজ হয় না, সে সব ক্ষেত্রে চমকপ্রদ কাজ পাওয়া গেছে। ওযুধটি এখন মনুষ্যদেহে পরীক্ষা করা হচ্ছে, কিন্তু ফলাফল জানতে বেশ কিছু সময় লাগবে।

এই যা...
রকমের যন্ত্র
চলছে।

হিমায়ন-বিশুষ্কী পদ্ধতি

সত্যনারায়ণ মুখোপাধ্যায়*

প্রাণীদের জীবনধারণের জন্যে প্রধানতঃ প্রয়োজন খাদ্যের। এই খাদ্য যাতে সময়মত এবং উপযুক্ত পরিমাণে পাওয়া যায়, তার জন্যে প্রচুর খাদ্যোৎপাদন ও তার উপযুক্ত সংরক্ষণ-ব্যবস্থার প্রয়োজন। যে সব দেশে প্রয়োজনের তুলনায় খাদ্যের উৎপাদন বেশী, সেই সব দেশে অতিরিক্ত খাদ্য ভবিষ্যৎ প্রয়োজন অথবা অন্যান্য দেশে রপ্তানী করবার জন্যে উপযুক্ত সংরক্ষণ-পদ্ধতি উদ্ভাবনের চেষ্টা তত অধিক। আমাদের দেশে প্রয়োজনের চেয়ে খাদ্য উৎপাদনের পরিমাণ অনেক কম, কাজেই খাদ্য-সংরক্ষণ করবার পদ্ধতির উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় না। কিন্তু দেখা গেছে—আমাদের দেশেও কোন কোন স্থানে কয়েকটি খাদ্যদ্রব্য বছরের বিশেষ সময়ে এত অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয় যে, তা সেই স্থানের প্রয়োজন মিটিয়েও অনেক পরিমাণে উদ্বৃত্ত থাকে। কিন্তু এই উদ্বৃত্ত খাদ্য বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই উপযুক্ত সংরক্ষণ-পদ্ধতির অভাবে নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু যদি উপযুক্ত পদ্ধতিতে এই উদ্বৃত্ত খাদ্য সংরক্ষণ করে ঘাটতির স্থানে পাঠানো হয় অথবা ভবিষ্যতের জন্যে সঞ্চিত রাখা যায়, তবে সেই খাদ্যের সদ্ব্যবহার তো হয়ই, অধিকন্তু দেশের খাদ্য-সমস্যারও অনেকাংশে সমাধান হয়।

কেবল খাদ্যদ্রব্যই নয়, আরও অনেক পদার্থ আছে, উৎপাদনের পর উপযুক্ত সংরক্ষণ-ব্যবস্থার অভাবে যাদের প্রকৃত গুণ অনেকাংশে পরিবর্তিত হয়ে যায় এবং ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রকৃত কার্যক্ষমতা প্রকাশ পায় না। কাজেই উৎপাদন বৃদ্ধির দিকে যেমন লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন, তেমনি তার উপযুক্ত সংরক্ষণের ব্যবস্থাও করা দরকার।

খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য পদার্থ সংরক্ষণের প্রচলিত পদ্ধতির মধ্যে বিশুষ্কীকরণ একটি প্রচলিত পদ্ধতি। বিভিন্নভাবে খাদ্য বিশুষ্ক করে সংরক্ষণ করা যায়। কিন্তু আধুনিক কালে বিশুষ্কীকরণের একটি বিশেষ পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে, যাকে বলা হয় হিমায়ন-বিশুষ্কীকরণ পদ্ধতি (Freeze-drying process)। এই পদ্ধতির নীতি হলো পদার্থের অভ্যন্তরস্থ জলীয় পদার্থকে হিমায়ন পদ্ধতির দ্বারা বরফে পরিণত করে সেই বরফকে না গলিয়ে ঊর্ধ্বপাতন প্রণালীতে সরাসরি বাষ্পীভূত করে বাষ্পকে বিদূরিত করা। যে নীতির উপর নির্ভর করে এই বিশুষ্কীকরণ করা হয়, তার এরূপ ব্যাখ্যা দেওয়া যায়।

হিমায়ন-বিশুষ্কীকরণের নীতি—হিমায়ন-বিশুষ্কীকরণের নীতি যে নিয়মের উপর নির্ভরশীল, তাকে বলা হয় অবস্থাগত নিয়ম বা (Phase rule)। এই অবস্থাগত নিয়ম যে সমীকরণের দ্বারা প্রকাশিত হয়, তা হলো—$F=C-P+2$, যেখানে F অনির্ভরশীল পরিবর্তনীয় গুণকের সংখ্যা (Number of independent variables) প্রকাশ করে, যাকে রাসায়নিক পরিভাষায় বলা হয় Number of degrees of freedom, C উপস্থিত পদার্থ-সংখ্যা (Number of components) এবং P সাম্যাবস্থায় সেই পদার্থের কয়টি অবস্থা বর্তমান, তা প্রকাশ করে।

আমরা জানি যে, জল তিনটি অবস্থায় থাকতে পারে; যথা—কঠিন (বরফ), তরল (জল) ও

---

*বায়োকেমিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং ডিপার্টমেন্ট, হারকোর্ট বাটলার টেক্‌নোলজিক্যাল ইনষ্টিটিউট, কানপুর-২, ইউ. পি.

জলীয় বাষ্প (গ্যাসীয় অবস্থা)। ভৌত অবস্থার (যথা—চাপ ও উষ্ণতা) পরিবর্তন ঘটিয়ে জলকে সম্পূর্ণরূপে তরল, বাষ্প বা বরফে পরিণত করা যায়। যেমন—১৫০০ বায়ুমণ্ডলের চাপে জলের উষ্ণতা −২০°সে.-এ নামিয়ে জলকে সম্পূর্ণরূপে বরফে পরিণত করা যায় এবং তখন তার অন্য কোন অবস্থা অর্থাৎ তরল ও বাষ্পীয় অবস্থা বর্তমান থাকে না। তরল, কঠিন ও বাষ্প—এই তিনটি অবস্থার সমন্বয়ে জলের তিনটি দ্বি-অবস্থার সাম্য গঠন করা যায়, যথা—বরফ-জল সাম্যাবস্থা, জল-বাষ্প সাম্যাবস্থা এবং বরফ-বাষ্প সাম্যাবস্থা। কিন্তু বরফ, জল ও বাষ্প—এই তিনটি অবস্থার উপস্থিতিতে কেবল মাত্র একটিই ত্রি-অবস্থা সাম্য গঠন করা যায়।

উষ্ণতা ও চাপের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে জলের অবস্থার যে পরিবর্তন ঘটে, তা ১নং চিত্রে P-T-তে (Pressure-Temperature) প্রদর্শিত হয়েছে। কোন নির্দিষ্ট উষ্ণতা ও চাপে জল যে অবস্থায় থাকে, তা এই চিত্র থেকে জানা যায়। এই চিত্রে জলের দ্বি-অবস্থার সাম্য একটি রেখার দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে, যেমন —AO রেখা ও S-V-এর অর্থ হলো চাপ ও উষ্ণতার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই রেখা বরফ ও বাষ্পের সাম্যাবস্থা কি রকম হয়, তা নির্দেশ করে। সেরূপ OC রেখা ও S-L রেখা কেবল বরফ ও জলের সাম্যাবস্থা এবং OB রেখা ও L-V রেখা কেবল তরল ও বাষ্পের সাম্য প্রকাশ করে।

যখন C=1, P=1 অর্থাৎ যে সাম্যাবস্থায় একটি মাত্র পদার্থ কেবলমাত্র একটি অবস্থায়ই বর্তমান থাকে, তখন অবস্থাগত নিয়ম অনুযায়ী F=C−P+2=1−1+2=2, এর অর্থ হলো এই যে, এক্ষেত্রে পদার্থের অবস্থা প্রকাশ করবার জন্যে যে চাপ ও উষ্ণতায় সেটি বর্তমান, তা অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে। আবার যখন C=1, P=2 অর্থাৎ যে সাম্যাবস্থায় কোন পদার্থ তার দুটি অবস্থায় বর্তমান থাকে, তখন F=1−2+2=1, অর্থাৎ এক্ষেত্রে একটি মাত্র অনির্ভরশীল পরিবর্তনীয় গুণকের হয় চাপ, নয়তো উষ্ণতা উভয়ের পরিবর্তন ঘটানো বাঞ্ছনীয় নয়। কারণ সে ক্ষেত্রে পদার্থের সাম্যাবস্থার পরিবর্তন ঘটবে। যখন কোন সাম্যাবস্থায় একটি পদার্থের তিনটি অবস্থা এক সঙ্গে বিরাজ করে, তখন C=1, P=3, এবং F=1−3+2=০, এই

১নং চিত্র

অবস্থা কেবল একটি নির্দিষ্ট উষ্ণতা ও চাপে ঘটে থাকে।

উপরিউক্ত নীতির আলোচনা থেকে সহজেই বুঝা যায়, কিভাবে চাপ ও উষ্ণতার পরিবর্তন ঘটিয়ে জলকে এক অবস্থা থেকে সরাসরি অন্য অবস্থায় নিয়ে যাওয়া যায়। এই নীতির উপর নির্ভর করেই হিমায়ন-বিশুষ্কীকরণ করা হয়। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, হিমায়ন-বিশুষ্কীকরণে যে পদার্থকে বিশুষ্ক করতে হবে, তার জলীয় পদার্থকে প্রথমে হিমায়িত অর্থাৎ কঠিন বরফে পরিণত করবার পর সেই বরফকে ঊর্ধ্বপাতন পদ্ধতিতে বাষ্পীভূত করে বিদূরিত করা হয়; অর্থাৎ হিমায়ন-বিশুষ্কীরণ বরফ ও বাষ্পের সাম্যাবস্থায় নিষ্পন্ন করা হয়। কাজেই এক্ষেত্রে F—1−2+2= এই অবস্থাটি ১নং চিত্রে AO রেখার দ্বারা প্রদর্শিত হয়েছে। এই রেখাটিকে বলা যায় বরফের ঊর্ধ্বপাতন ছক। চিত্রে OA OB এবং OC রেখাগুলি O বিন্দুতে পরস্পরের সঙ্গেই মিলিত হয়েছে, অর্থাৎ O বিন্দুতে জলের তিনটি অবস্থাই বর্তমান থাকে। যে উষ্ণতা ও চাপে জলের এই অবস্থা ঘটে, তাকে বলা হয় জলের ত্রি-বিন্দু (Triple point)। ৩২° ফারেনহাইট ও ৪৭ মিঃ মিঃ চাপে জলের এই অবস্থা ঘটে। হিমায়ন-বিশুষ্কীকরণের জন্যে প্রয়োজন হলো বরফকে সরাসরি বাষ্পে পরিণত করা। ১নং চিত্র থেকে সহজেই বুঝা যাচ্ছে যে, এই ঊর্ধ্বপাতন ঘটাবার জন্যে সর্বোচ্চ যে চাপ ও উষ্ণতা ব্যবহার করা যায়, তা হলো ৪'৭ মিঃ মিঃ ও ৩২° ফাঃ। এর চেয়ে উচ্চতর মানে বরফ গলে তরল হয় এবং তখন বিশুষ্কীকরণের অনেক বিঘ্ন ঘটে। তাই বিশুষ্কীকরণে সব সময় চাপ ও উষ্ণতা যথাক্রমে ৪'৭ মিঃ ও ৩২° ফাঃ-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা উচিত।

হিমায়ন-বিশুষ্কীকরণের সর্ত—এই প্রণালীতে বিশুষ্কীকরণের আগে যে সর্তগুলি পালন করা একান্ত আবশ্যক, সেগুলি হলো যথাক্রমে—

(ক) যে পদার্থকে বিশুষ্ক করতে হবে, তাকে বিশুষ্কীকরণের সময় সর্বক্ষণ পুরাপুরিভাবে হিমায়িত অবস্থায় রাখতে হবে।

(খ) সর্বোত্তম বেগে বিশুষ্কীকরণের জন্যে ভ্যাকুয়াম হিমায়ন-বিশুষ্কীকরণ প্রকোষ্ঠে মোট চাপ হিমায়িত পদার্থের বরফের বাষ্প-চাপের প্রায় $\frac{1}{2}$—$\frac{1}{4}$ অংশ রাখতে হবে।

পদ্ধতি—যে দুটি ধাপে এই বিশুষ্কীকরণ-পদ্ধতি সম্পন্ন করা হয়, সেগুলি হলো যথাক্রমে—

(১) পদার্থের হিমায়ন।

(২) হিমায়িত পদার্থের বরফকে ঊর্ধ্বপাতন প্রণালীতে বাষ্পীভূত করে বাষ্প দূরীভূত করা।

প্রথম ধাপটি যে কোন প্রচলিত হিমায়ন যন্ত্রে (রেফ্রিজারেটর) সম্পন্ন করা যায়। তারপর দ্বিতীয় ধাপের জন্যে হিমায়িত পদার্থকে একটি ভ্যাকুয়াম প্রকোষ্ঠে নিয়ে বিশেষ প্রণালীতে তার মধ্যে তাপ সঞ্চালিত করে বরফকে ঊর্ধ্বপাতিত করা হয়। কিন্তু এই তাপ সঞ্চালনের বেগ এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করা উচিত, যাতে হিমায়িত পদার্থের বরফ গলে গিয়ে জলে পরিণত না হয়। কারণ তাহলে বরফ-বাষ্পের সাম্যাবস্থা নষ্ট হয়ে যাবে এবং তার ফলে ঊর্ধ্বপাতনের বিঘ্ন ঘটবে। সে জন্যে প্লেট তাপ পরিবর্তকে (Plate heat exchanger) জল পরিচালিত করে তাপ সঞ্চালিত করা হয়। Dielectric heating অথবা মাইক্রোওয়েভ শক্তি সঞ্চালন প্রণালীতেও তাপ সঞ্চালিত করে বিশুষ্কীকরণ করা যায়। মাইক্রোওয়েভ শক্তির দ্বারা বিশুষ্কীকরণ-প্রক্রিয়ায় বিশুষ্কীকরণে সময় অনেক কম লাগে।

বিশুষ্কীকরণের সময় ভ্যাকুয়াম প্রকোষ্ঠে যে বাষ্প উৎপন্ন হয়, তাকে যান্ত্রিক ভ্যাকুয়াম পাম্প ও ষ্টীম ইজেক্টরের সাহায্যে দূরীভূত করা হয়।

অনেক সময় বিশুষ্কীকরণের বেগ বর্ধিত

করবার জন্যে হিমায়িত পদার্থের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে ধাতব জালি রাখা হয়, যাতে তাপসঞ্চালন ভালভাবে ঘটতে পারে। এরূপ হিমায়ন-বিশুষ্কীকরণ প্রণালীর নাম ত্বরান্বিত হিমায়ন-বিশুষ্কীকরণ।

বর্তমানে পদার্থ ও বিশোষক পদার্থের মিশ্রণের ভিতর দিয়ে নিষ্ক্রিয় গ্যাস (যেমন হিলিয়াম) পরিচালিত করেও বিশুষ্কীকরণের বেগ ত্বরান্বিত করা হচ্ছে।

অন্যান্য পদ্ধতির তুলনায় এর সুবিধা—অন্যান্য বিশুষ্কীকরণ-পদ্ধতির তুলনায় এই পদ্ধতিতে নিম্নোক্ত সুবিধাগুলি পরিলক্ষিত হয়েছে।

(ক) এই পদ্ধতিতে প্রাপ্ত বিশুষ্ক পদার্থ সাধারণতঃ ছিদ্রবিশিষ্ট হয়। ফলে এর পুনরুদিকরণ খুব তাড়াতাড়ি ঘটে এবং সেগুলি টাটকা পদার্থের মত অবস্থায় ফিরে আসে। কিন্তু অন্যান্য পদ্ধতিতে বিশুষ্ক পদার্থের এই গুণ প্রায়ই দেখা যায় না।

(খ) হিমায়ন-বিশুষ্কীকরণ খুব নিম্ন উষ্ণতায় সম্পন্ন করা হয় বলে পদার্থের উদ্বায়ী অংশসমূহ দূরীভূত হয় না, ফলে তার খাদ্যমূল্য টাটকা পদার্থের মতই থাকে। সাধারণ বিশুষ্কীকরণ-প্রণালীতে বিশুষ্ক পদার্থের উদ্বায়ী অংশ উবে যাবার ফলে তার খাদ্যমূল্য কমে যায়।

(গ) এই প্রণালীতে পদার্থ সম্পূর্ণরূপে বিশুষ্ক না হওয়া পর্যন্ত সেগুলি হিমায়িত অবস্থায় থাকে বলে উৎপন্ন বিশুষ্ক পদার্থের আয়তনের সঙ্কোচন বা কোন রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে না। কিন্তু সাধারণ বিশুষ্কীকরণ-প্রণালীতে এটি অবশ্যই ঘটে থাকে।

(ঘ) প্রস্তুত বিশুষ্ক পদার্থকে হিমায়ক যন্ত্রে না রেখেও তাকে অনেক দিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায় এবং তাতে তার গুণের বিশেষ পরিবর্তন ঘটে না।

PC = চাপ নিয়ন্ত্রক TC = উষ্ণতা নিয়ন্ত্রক

২নং চিত্র

হিমায়ন-বিশুষ্কীকরণ পদ্ধতির ব্যবহার—বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি ব্যবহারের মধ্যে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

(১) খাদ্য-শিল্পে ব্যবহার—মাংস সংরক্ষণের কাজে এই পদ্ধতি খুবই প্রচলিত। মাংস ছাড়াও অনেক সব্জিজাতীয় পদার্থও এই পদ্ধতিতে বিশুষ্ক করে সংরক্ষণ করা হয়। বর্তমানে উন্নততর হিমায়ন-বিশুষ্কীকরণের পদ্ধতিতে যে ভাবে খাদ্যের

বিশুষ্কীকরণ করা হচ্ছে, তা ২নং চিত্রে প্রদর্শিত হয়েছে।

এই পদ্ধতিতে ১০ ভাগ ঠাণ্ডা বিশোষক পদার্থ ও ১ ভাগ খাদ্যের মিশ্রণকে চিত্রে প্রদর্শিত ব্যবস্থায় বিশুষ্কীকরণ প্রকোষ্ঠে রাখা হয়। প্রকোষ্ঠে ভ্যাকুয়াম সৃষ্টি করে তার মধ্য দিয়ে হিলিয়াম গ্যাস পরিচালিত করা হয়। প্রাথমিক অবস্থায় গ্যাসকে ১৫০ ডিগ্রী ফারেনহাইট উষ্ণতায় উষ্ণ করে তাপ পরিবর্তকে জলপ্রবাহের সাহায্যে তার উপযুক্ত উষ্ণতা বজায় রাখা হয়। ব্লোয়ার হয়। হিলিয়াম গ্যাসের উৎস থেকে নির্গত গ্যাসের গতিবেগ নিয়ন্ত্রণকারী ভাল্‌ভ্‌ ও ভ্যাকুয়াম পাম্পের সহায়তায় বিশুষ্কীকরণ-প্রকোষ্ঠে প্রয়োজনীয় চাপ বজায় রাখা হয়। ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর সি. ইওসন কিং এবং ডক্টর জে. পিটার ক্লার্ক প্রথম এই ধরণের হিমায়ন বিশুষ্কীকরণ যন্ত্রের প্রচলন করেন। এই ধরণের বিশুষ্কীকরণ যন্ত্রের নাম Wurcal dryer। এখানে হিলিয়াম গ্যাস খাদ্যের জলীয় বাষ্পকে বহন করে বিশোষককে নিয়ে যায় এবং বিশোষকের
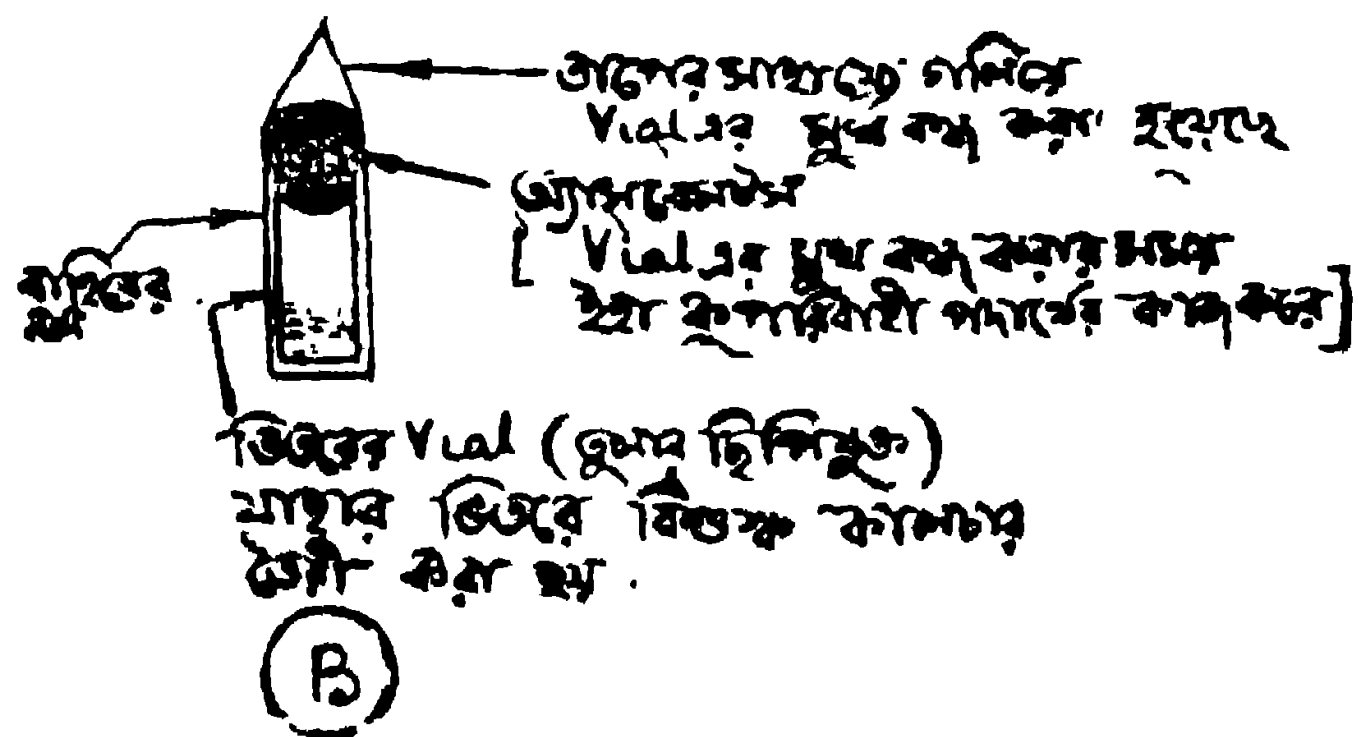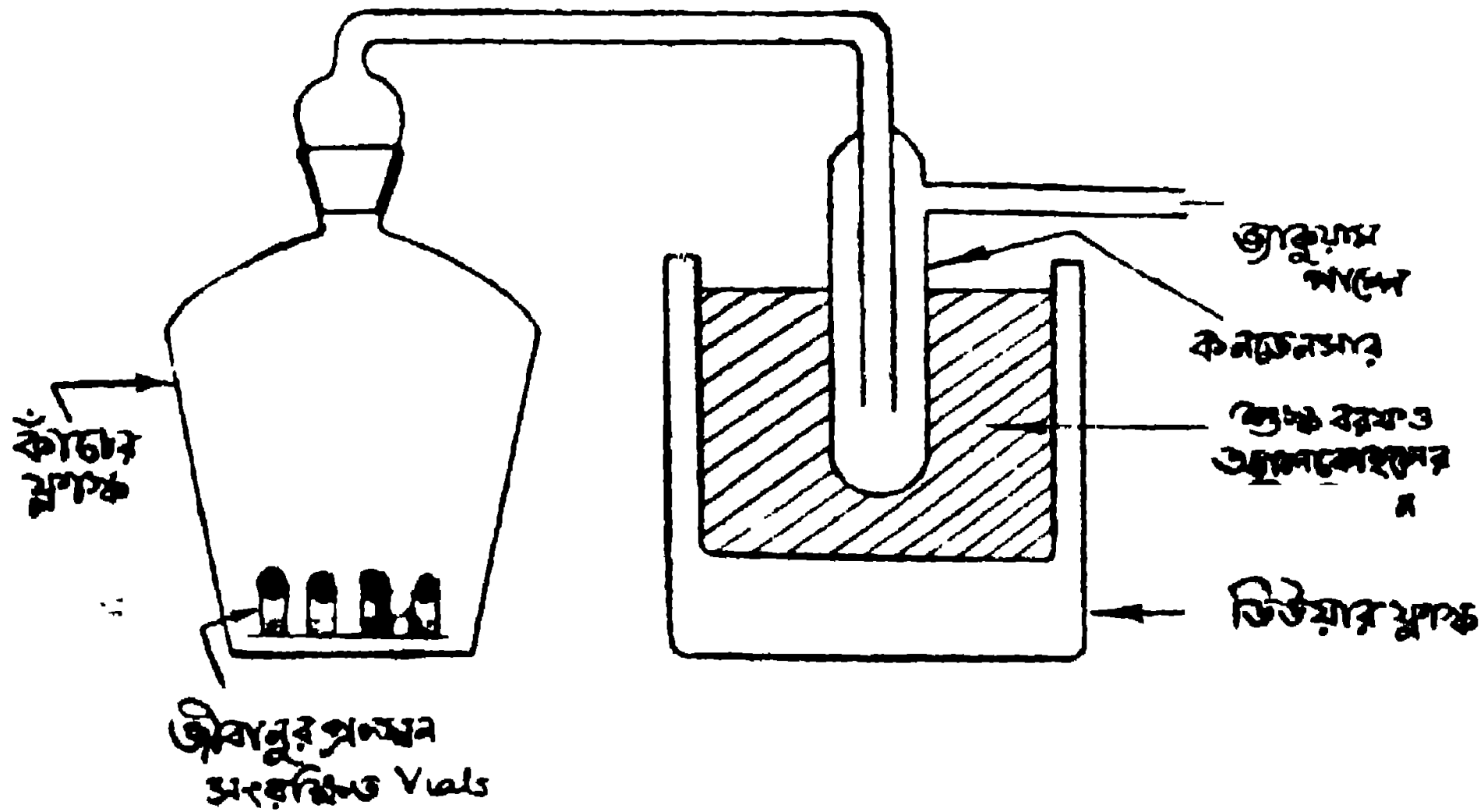
৩নং চিত্র

যন্ত্রের সাহায্যে হিলিয়াম গ্যাসকে তাপ-পরিবর্তকের মধ্য দিয়ে পরিচালিত করে পুনরায় বিশুষ্কীকরণ প্রকোষ্ঠে খাদ্যবস্তু ও বিশোষক পদার্থের মিশ্রণ স্তরের মধ্য দিয়ে নিয়ে যাওয়া তাপ বহন করে নিয়ে খাদ্যের উষ্ণতা বৃদ্ধি করে এবং জলীয় পদার্থকে বাষ্পীভূত করে দেয়।

অন্যান্য হিমায়ন-বিশুষ্কীকরণ যন্ত্রের তুলনায় এই যন্ত্রের সুবিধা হলো—

(ক) প্রচলিত তাপন প্রণালী ব্যবহার না করে এতে পরিচলন তাপন প্রণালী ব্যবহার করা হয় এবং এতে চাপ অনেক বেশী ব্যবহার করা হয় বলে বিশুষ্কীকরণের বেগ অতি দ্রুত ঘটে থাকে।

(খ) এতে তাপ-সঞ্চালন অন্যান্য যন্ত্রের তুলনায় অনেক উন্নততর।

(গ) এই যন্ত্রে তাপ-সঞ্চালন, যান্ত্রিক হিমায়ন ও ভ্যাকুয়াম সৃষ্টির জন্যে খরচ অন্যান্য যন্ত্রের তুলনায় কম। এই সকল সুবিধার জন্যে বর্তমানে এর প্রচলন ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

জীবাণুর কাল্‌চার সংরক্ষণে এর ব্যবহার—জীবাণুর বিশুদ্ধ কাল্‌চার সংরক্ষণের জন্যে এটি একটি উত্তম পদ্ধতি। এক্ষেত্রে এই পদ্ধতিকে বলা হয় Lyophilization। এই পদ্ধতিতে বিভিন্ন ধরণের জীবাণুকে বিশুষ্ক করে জীবিত ও অবিকৃত অবস্থায় প্রায় কুড়ি বছর পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়।

পদ্ধতি—প্রথমে জীবাণুর কোষগুলির একটি প্রলম্বন (Suspension) তৈরি করতে হয়। ঐ প্রলম্বনকে ছোট ছোট পুরু কাচের টেষ্টটিউবে রেখে টেষ্ট টিউবগুলিকে উচ্চ মাত্রার ভ্যাকুয়াম যন্ত্রের সঙ্গে যোগ করে প্রলম্বনকে অতি দ্রুত বিশুষ্ক করা হয়। যখন সেগুলি সম্পূর্ণরূপে বিশুষ্ক হয়ে যায় তখন ভ্যাকুয়াম অবস্থায় পরিবেশে রেখে উপযুক্ত ব্যবস্থার সাহায্যে টিউবগুলির মুখ গলিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়। এই ধরণের একটি ব্যবস্থা ৩নং চিত্রে প্রদর্শিত হয়েছে।

উক্ত ব্যবস্থাগুলি ছাড়াও হিমায়ন-বিশুষ্কীকরণ পদ্ধতি বর্তমানে ভেষজ, শিল্প ও জৈব রাসায়নিক গবেষণার ক্ষেত্রে প্রভূত পরিমাণে ব্যবহৃত হচ্ছে।

আমাদের দেশে উত্তর প্রদেশের টুণ্ডলাতে একটি ত্বরান্বিত হিমায়ন-বিশুষ্কীকরণের ফ্যাক্টরী চালু করা হয়েছে। এই কারখানায় অনেক দ্রব্য এই প্রণালীতে বিশুষ্ক করা হচ্ছে।

প্রোটিন ও তাহার সংশ্লেষণ

শ্রীদিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় *

প্রত্যেক জীবেরই প্রাণধারণের জন্ম প্রোটিন বিশেষভাবে প্রয়োজন। ইহা প্রত্যেক জীব-দেহের মূল ওজনের এক বিশেষ অংশ দখল করিয়া আছে। প্রত্যেক জীবকোষের গঠন ও কার্যের দিক দিয়া ইহা এক অতি প্রয়োজনীয় রাসায়নিক উপাদান। ক্রোমোজোমকে রাসায়নিক বিশ্লেষণ করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, ইহা তিন প্রকার উপাদানের দ্বারা গঠিত; যথা—প্রোটিন, ডি-এন-এ ও আর-এন-এ।** প্রোটিন হইতেছে নাই-ট্রোজেনযুক্ত পদার্থ, যাহা প্রায় প্রত্যেক জীব-কোষের মধ্যেই বর্তমান। তীব্র অজৈব অ্যাসিড অথবা এন্‌জাইমের দ্বারা হাইড্রোলিসিস করিলে ইহা বিভিন্ন প্রকার অ্যামিনো অ্যাসিডের একটি মিশ্রণ উৎপন্ন করে। সুতরাং প্রোটিনের মূল উপাদান হইতেছে অ্যামিনো অ্যাসিড। প্রোটিন-অণুকে বিশ্লেষণ করিলে সাধারণতঃ পঁচিশ প্রকার অ্যামিনো অ্যাসিড পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে কুড়িটি

** এই বিষয়ে "জ্ঞান ও বিজ্ঞান" পত্রিকার মার্চ-১৯৭০ সংখ্যায় 'নিউক্লিয়াস ও ডি. এন. এ.' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

* প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, বি. বি. কলেজ, আসানসোল

মানবদেহের প্রোটিনে বর্তমান। একটি অ্যামিনো অ্যাসিডের স্ট্যাকচ্যারাল ফরমুলা ১নং চিত্রের ন্যায়। ইহার এক প্রান্তে কার্বক্সিল COOH ও অপর প্রান্তে অ্যামিনো NH_2 গ্রুপ থাকে। শতাধিক

^+H_3N — C(=O) —

১নং চিত্র

অ্যামিনো অ্যাসিডের সাধারণ গঠন। R=বিভিন্ন অ্যামিনো অ্যাসিডের পার্থক্য ইহার উপর নির্ভর করে। ইহা সালফারযুক্ত, নাইট্রোজেনযুক্ত অথবা কেবল মাত্র হাইড্রোজেন হতে পারে (গ্লাইসিন)

বিভিন্ন অ্যামিনো অ্যাসিড উহাদের একটির কার্বক্সিল গ্রুপের সহিত অপরটির অ্যামিনো গ্রুপ C O ও N—H লিঙ্কেজের দ্বারা পরস্পর

(A) নিউট্র্যাল অ্যামিনো অ্যাসিড
(B) অ্যাসিডিক　,,　,,
(C) বেসিক　,,　,,

নিউট্র্যাল অ্যামিনো অ্যাসিডে একটি অ্যামিনো NH_2 ও একটি কার্বক্সিল COOH গ্রুপ থাকে।

অ্যাসিডিক অ্যামিনো অ্যাসিডে একটি অ্যামিনো NH_2 ও দুইটি কার্বক্সিল COOH গ্রুপ থাকে এবং বেসিক অ্যামিনো অ্যাসিডে দুইটি অ্যামিনো NH_2 ও একটি কার্বক্সিল COOH গ্রুপ থাকে।

নিম্নে মানবদেহের মধ্যে অবস্থিত ২০-টি অ্যামিনো অ্যাসিডের একটি তালিকা দেওয়া হইল।

(A) নিউট্র্যাল অ্যামিনো অ্যাসিড
(1) গ্লাইসিন
(2) অ্যালানিন
(3) ভেলিন
(4) সেরিন
(5) প্রোলিন
(6) সিস্ট
(7) লিউসিন

^+H_3N — C(R) — C(=O) — N(H) — C(R) — C(=O) — N(H) — C — C(=O) — O^-
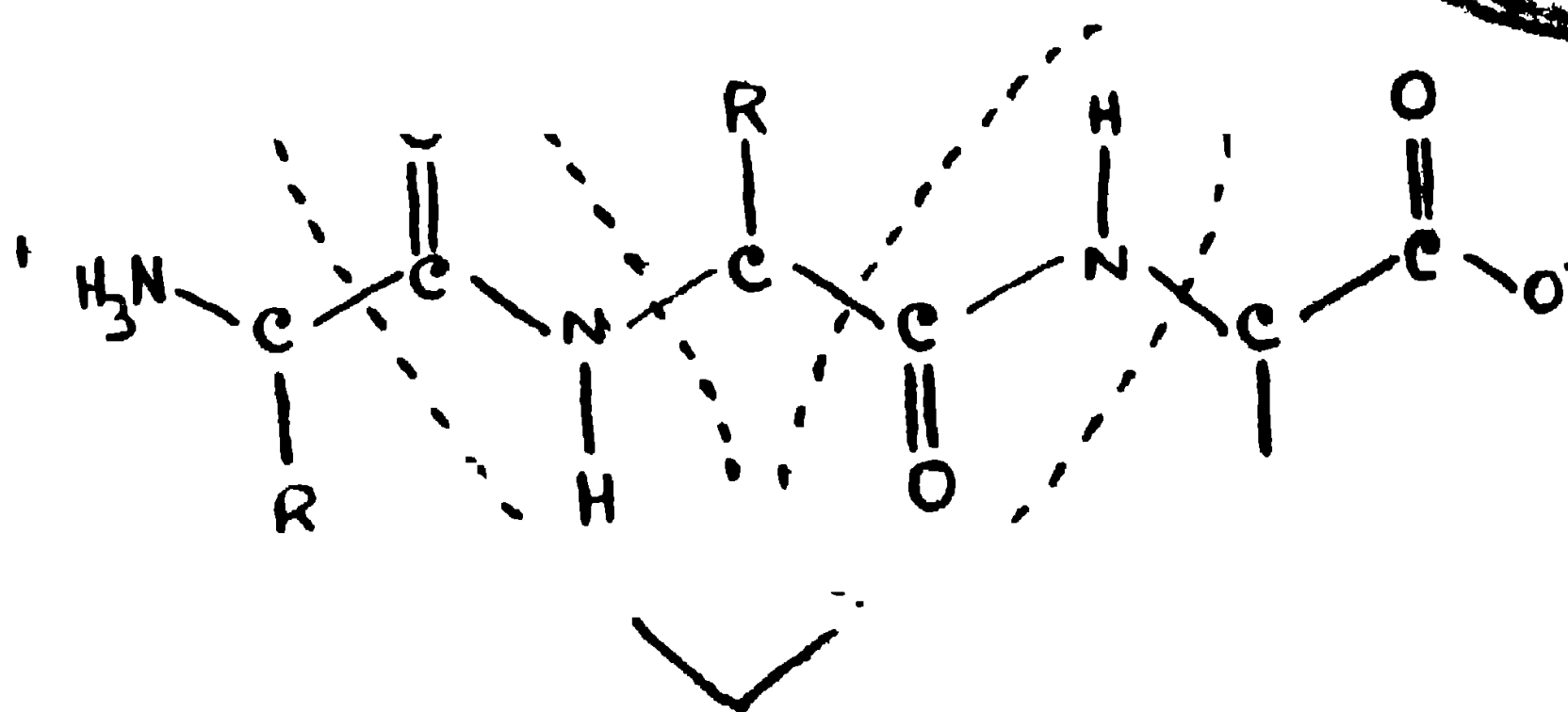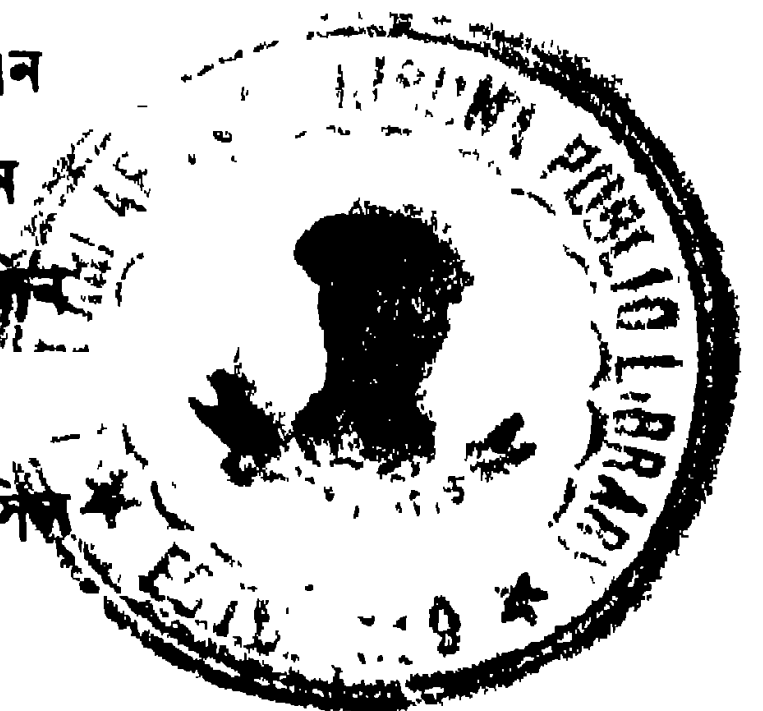
২নং পেপটিড বন্ধনী (C=O, N—H) চিত্র

সংযুক্ত হইয়া একটি প্রোটিন-অণু গঠন করে। এই লিঙ্কেজকে পেপটিড লিঙ্কেজ বা বণ্ড (Peptide linkage বা Bond) বলে (২নং চিত্র দ্রষ্টব্য)।

অ্যামিনো অ্যাসিডকে আমরা তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে পারি ; যথা—

(8) আইসোলিউসিন
(9) মেথিওনিন
(10) থ্রিওনিন
(11) ট্রিপটোফেন
(12) ফেনিল অ্যালানিন

(13) টাইরোসিন

(B) অ্যাসিডিক অ্যামিনো অ্যাসিড

(14) অ্যাসপারাজিন

(15) গ্লুটামিন

(16) অ্যাসপার্টিক অ্যাসিড

(17) গ্লুটামিক অ্যাসিড

(C) বেসিক অ্যামিনো অ্যাসিড

(18) আরজিনিন

(19) লাইসিন

(20) হিস্টিডিন

উপরিউক্ত অ্যামিনো অ্যাসিডের যে কোন একটির অভাব—শরীর বৃদ্ধির পক্ষে বাধার সৃষ্টি করে এবং প্রায়ই মৃত্যুর কারণ হয়।

বিভিন্ন অ্যামিনো অ্যাসিড পরস্পর পেপটিড বণ্ডের দ্বারা যুক্ত হইয়া অ্যামিনো অ্যাসিডের লম্বা শৃঙ্খল তৈরি করে—ইহাকে পলিপেপটিড শৃঙ্খল বলে। এই সকল পলিপেপটিড শৃঙ্খল-গুলিই পরস্পর সংযুক্ত হইয়া একটি প্রোটিন-অণু গঠন করে। একটি প্রোটিন-অণু একটি মাত্র পলি-পেপটিড শৃঙ্খল অথবা অসংখ্য পলিমারের দ্বারা গঠিত হইতে পারে। প্রোটিন-অণুর দুইটি প্রান্তের একটির অ্যামিনো অ্যাসিডে যে মুক্ত অ্যামিনো গ্রুপ থাকে, তাহাকে N টার্মিন্যাল বা প্রান্তীয় অ্যামিনো অ্যাসিড এবং অপর প্রান্তের অ্যামিনো অ্যাসিডে যে মুক্ত কার্বক্সিল গ্রুপ থাকে, তাহাকে C টার্মিন্যাল বা প্রান্তীয়

৩নং চিত্র ক

এ. টি. পি.-এর গঠন

৩নং চিত্র খ

অ্যামিনো অ্যাসিড অ্যাডেনিলেট

অ্যামিনো অ্যাসিড বলে। প্রোটিন-অণু সাধারণতঃ বেশ দীর্ঘ হয় এবং উহার আণবিক ওজন ২০,০০০ হইতে উর্ধ্বে। এই জন্তেই প্রোটিনকে দ্রবীভূত করিলে কলয়ড্যাল দ্রবণ গঠিত হয়।

প্রোটিন-সংশ্লেষণের প্রক্রিয়ার প্রস্তুতি নিউক্লিয়াস ও সাইটোপ্লাজমে চলিতে থাকে সাইটোপ্লাজমে মাইটোকনড্রিয়া হইতে অ্যাডিনোসিন ট্রাইফস্ফেট বা ATP নামে এক প্রকার এনজাইম নিঃসৃত হইয়া মুক্ত অ্যামিনো অ্যাসিড-গুলিকে সক্রিয় করিয়া দেয়। অ্যামিনো অ্যাসিড ও ATP-এর বিক্রিয়া অ্যামিনো অ্যাসিল আর-এন-এ সিন্থেটেজ নামক এনজাইমের সাহায্যে ত্বরান্বিত হইয়া অ্যামিনো অ্যাসিড অ্যাডেনিলেট গঠন করে। ATP ও অ্যামিনো অ্যাসিড অ্যাডিনিলেটের স্ট্রাকচার্যাল ফর্মুলা ৩নং চিত্রের ক ও খ-এর ন্যায়।

এখন নিউক্লিয়াসের মধ্যে অবস্থিত ডি-এন-এ অণু মাঝামাঝি লম্বালম্বিভাবে ভাঙিয়া ছুইটি একক স্ট্র্যাণ্ডে পরিণত হয় (৪নং চিত্র দ্রষ্টব্য)। নিউক্লিয়াসের মধ্যে অবস্থিত মুক্ত আর-এন-এ নিউক্লিটাইডগুলি এখন একটি একটি করিয়া ডি-এন-এর একটি স্ট্র্যাণ্ডের নিউক্লিওটাইডের বিন্যাস অনুযায়ী সজ্জিত হইয়া যায় ; যেমন—

```
—C—T—G—A—T—G—C—   একটি ডি-এন-এ স্ট্র্যাণ্ডের নিউক্লিওটাইড
  |  |  |  |
—G—A—C—U—A—          আর-এন-এ নিউক্লিওটাইড।
             ↑  C
                ↑  G
                   ↑
```
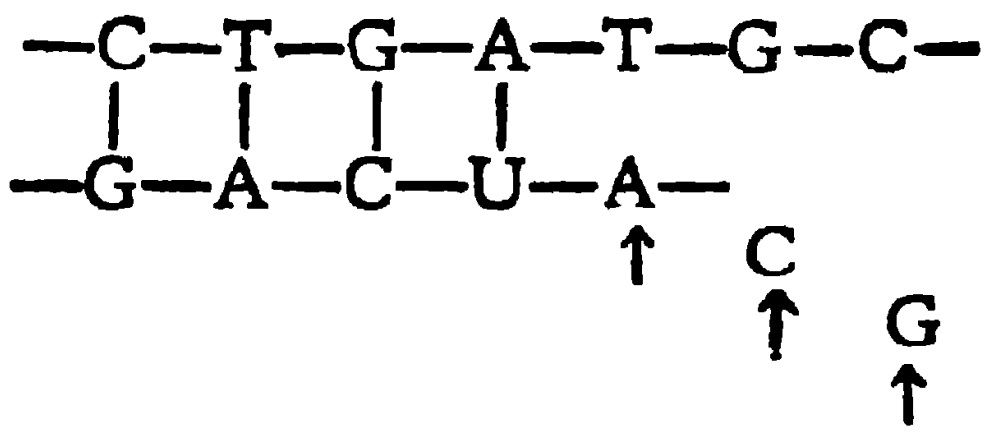
সুতরাং এইভাবে পুনরায় ডি-এন-এ-র ছাঁচে একটি নূতন আর-এন-এ স্ট্র্যাণ্ড তৈরি হয়। ইহাকে দূত বা মেসেঞ্জার আর-এন-এ বলে। ইহার পর দূত আর-এন-এ সাইটোপ্লাজমে আসিয়া এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের গায়ে সজ্জিত রাইবোজোমের সহিত লাগিয়া যায়।

ইতিমধ্যেই সাইটোপ্লাজমে যে অ্যামিনো অ্যাসিড অ্যাডেনিলেটগুলি তৈয়ারী হইয়া আছে, উহারা প্রত্যেকে একটি করিয়া বিশেষ ট্র্যান্সফার আর-এন-এ-র দ্বারা গৃহীত হয় এবং উহার সহিত লাগিয়া যায় (৪নং চিত্রের ন্যায়)। জীবদেহের প্রোটিনে সাধারণতঃ ২০টি অ্যামিনো অ্যাসিড থাকে, সুতরাং ২০টি ট্র্যান্সফার আর-এন-এ-ও বর্তমান। প্রত্যেকটি ট্র্যান্সফার আর-এন-এ-তে তিনটি করিয়া নিউক্লিওটাইড বেস থাকে।

এখন দূত বা মেসেঞ্জার আর-এন-এ-র প্রথম তিনটি কোডন বেসের নির্দেশ অনুযায়ী ঐ সকল তিনটি বেসযুক্ত ট্র্যান্সফার আর-এন-এ উহাদের অ্যামিনো অ্যাসিড লইয়া মেসেঞ্জার বা দূত আর-এন-এ-র উপর অনূদিত হইয়া যায়। এইরূপ দূত আর-এন-এ-র দ্বিতীয় কোডন বেসের নির্দেশ অনুযায়ী তিনটি বেসযুক্ত অপর ট্র্যান্সফার আর-এন-এ যুক্ত হইয়া পরিশেষে দূত আর-এন-এ পরিপূর্ণভাবে অনূদিত হইয়া গেলে একটি পূর্ণ প্রোটিন-অণু প্রস্তুত হয়। ইহার পর ট্র্যান্সফার আর-এন-এ-গুলি ছাড়িয়া যায় এবং নূতন অ্যামিনো অ্যাসিডের সহিত যুক্ত হইয়া একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি করে।

প্রোটিন সংশ্লেষণের সময়ে ডি-এন-এ কখনই নিউক্লিয়াসের বাহিরে আসে না। সমগ্র প্রক্রিয়াটিকে একটি সহজ উদাহরণের সাহায্যে উপলব্ধি করা যাইতে পারে।

একটি অট্টালিকা নির্মাণ করিতে হইলে প্রথমে

স্থপতিবিদ্যাবিদের নির্দেশে একটি পূর্ণ নক্সা তৈয়ারী হয়। অতঃপর এই আসল নক্সার (জিন বা ডি-এন-এ) একটি নকল নক্সা (মেসেঞ্জার বা দূত আর-এন-এ) তৈয়ারী করা হয় এবং ইহার কারিগর রাইবোজোমের নিকট প্রেরণ করা হয়। এক-একটি বিশেষ বিশেষ ডেলিভারী ট্রাকের সাহায্যে কারিগরদের নিকট আনা হয়। যেমন—একটি বিশেষ ট্রাকে কেবল মাত্র চুন, অপরটিতে সিমেন্ট—এইভাবে বিশেষ বিশেষ ট্রাকের (ট্রান্সফার আর-এন-এ) মাধ্যমে আনা হয়। অতঃপর
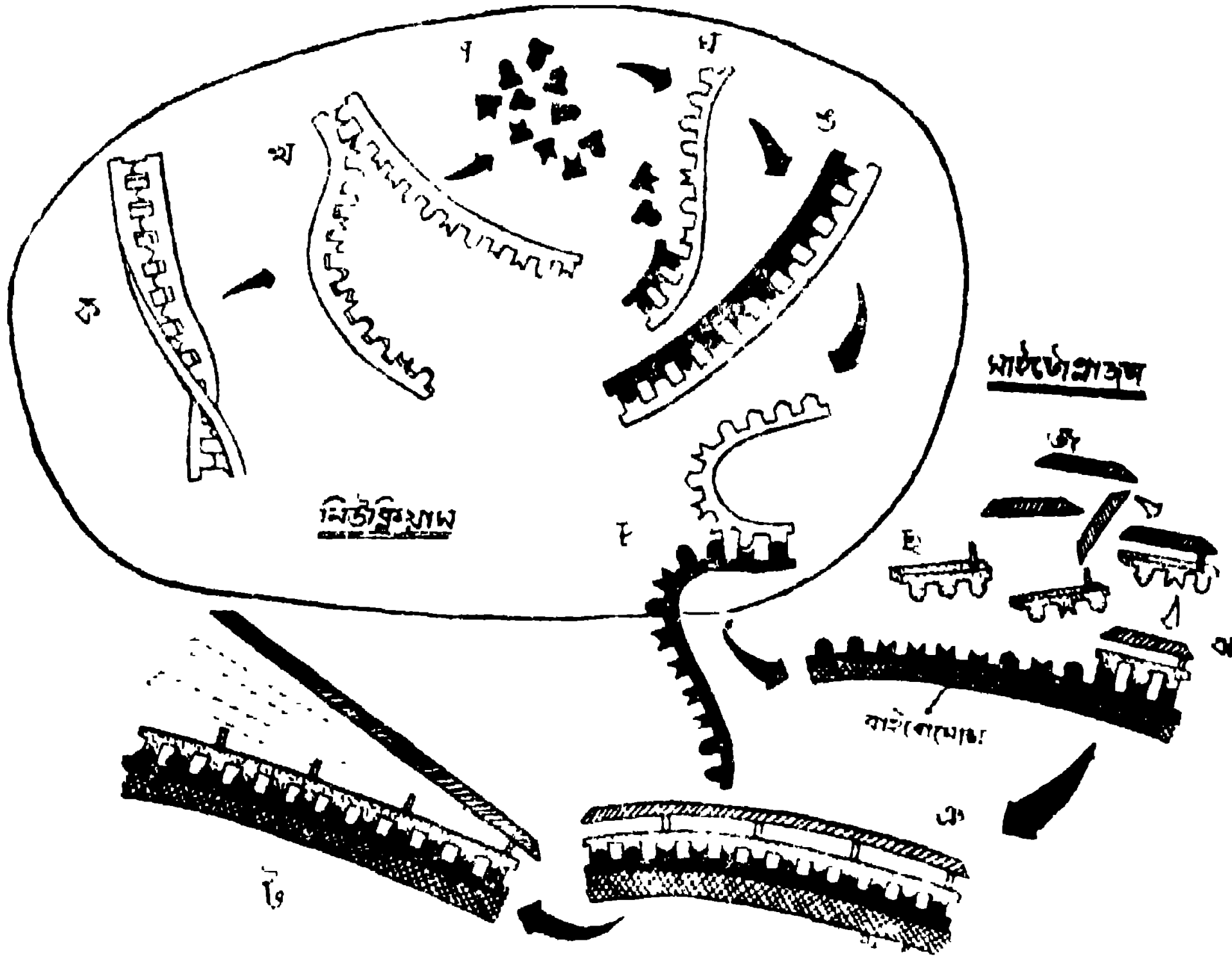
৪নং চিত্র

(ক) ডি-এন-এ অণু, (খ) ডি-এন-এ অণুর দুইটি বাহু পরস্পর হইতে মুক্ত হইতেছে, (গ) নিউক্লিয়াসের মধ্যে অবস্থিত মুক্ত আর-এন-এ নিউক্লিওটাইড, (ঘ) একটি ডি-এন-এ-মুক্ত বাহু বা স্ট্র্যাণ্ডের নিউক্লিওটাইডের বিন্যাস অনুযায়ী আর-এন-এ (RNA) নিউক্লিওটাইড সজ্জিত হইতেছে, (ঙ) একটি সম্পূর্ণ আর-এন-এ বাহু ডি-এন-এ-র ছাঁচে তৈয়ারী হইয়া গিয়াছে, (চ) সদ্যনির্মিত নূতন দূত আর-এন-এ (কালো রং) বাহু ডি-এন-এ হইতে ছাড়িয়া যাইতেছে এবং সাইটোপ্লাজমে রাইবোজোমের উপর লাগিয়া যাইতেছে, (ছ) তিনটি আর-এন-এ বেসযুক্ত ট্রান্সফার আর-এন-এ, (জ) মুক্ত অ্যামিনো অ্যাসিড, (ঝ) তিনটি বেসযুক্ত ট্রান্সফার আর-এন-এ-যুক্ত অ্যামিনো অ্যাসিড দূত আর-এন-এ-র (কালো রং) বিন্যাস অনুযায়ী যুক্ত হইতেছে, (ঞ) দূত আর-এন-এ-র উপর একটি সম্পূর্ণ প্রোটিন-অণু তৈয়ারী হইয়া গিয়াছে, (ট) পরিশেষে সদ্যনির্মিত প্রোটিন-অণু ছাড়িয়া যাইতেছে।

এখন কারিগরদের অট্টালিকা নির্মাণের জন্য নানা প্রকার উপাদান বা উপকরণের (অ্যামিনো অ্যাসিড) প্রয়োজন। যেমন—চুন, ইট, বালি, সুরকি, সিমেন্ট ইত্যাদি। প্রত্যেকটি উপকরণ ঐ নকল নক্সা (দূত বা মেসেঞ্জার আর-এন-এ) অনুযায়ী কারিগরদের (রাইবোজোম) সাহায্যে একটি পূর্ণ অট্টালিকা (প্রোটিন) প্রস্তুত হয়।

এন্‌জাইমের কথা

শ্রীসরোজাক্ষ নন্দ

এন্‌জাইম বা অনুঘটক হলো এমন কতকগুলি জিনিষ, যারা স্বয়ং রাসায়নিক ক্রিয়ায় প্রত্যক্ষ-ভাবে যোগদান করে না, অর্থাৎ রাসায়নিক ক্রিয়ায় এদের মোটেই ভাঙ্গাগড়া হয় না, কিন্তু এগুলির উপস্থিতিতে রাসায়নিক ক্রিয়া অতি দ্রুত সম্পন্ন হয়ে থাকে। আবার ক্ষেত্রবিশেষে যেখানে অনুঘটকহীন অবস্থায় প্রচণ্ড উষ্ণতার প্রয়োজন হয়, সেখানে অনুঘটকের উপস্থিতিতে অল্প উষ্ণতাতেই রাসায়নিক ক্রিয়াটি সুসম্পন্ন হতে পারে। ক্রিয়ার শেষে অনুঘটকটিকে সম্পূর্ণ অবিকৃত অবস্থায় পাওয়া যায় এবং সেগুলি আবার নূতন ভাবে ক্রিয়া করতে সক্ষম হয়। সাধারণ রাসায়নিক অনু-ঘটকদের মত এন্‌জাইমগুলিও জৈব রাসায়নিক অনুঘটক। এদের সাহায্যে জীবদেহের অভ্যন্তরে জৈব পদার্থসমূহের ধ্বংস ও পুনর্গঠন হয়ে থাকে। জীবকোষের মধ্যে এই সকল রাসায়নিক ক্রিয়া ঘটছে, তাই একে বলা হয় জৈব রাসায়নিক ক্রিয়া। এন্‌জাইমগুলি এই ক্রিয়ায় আদৌ লিপ্ত হয় না, কিন্তু তাকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করে।

জীবদেহ লক্ষ লক্ষ অতি ক্ষুদ্র কোষের দ্বারা গঠিত। একটি জীবকোষ একটি অতি ক্ষুদ্র রসায়নাগার। এই কোষগুলি নিয়ত পরিবর্তন-শীল। এর মধ্যে বহু পদার্থ ক্রমাগত ভাঙছে, আবার গড়ছে। আবার সম্পূর্ণ নূতন পদার্থও সৃষ্টি হচ্ছে। রেডিও আইসোটোপ ব্যবহার করে বিজ্ঞানী Schoenheimer দেখিয়েছেন যে, জীবদেহ গঠনকারী রাসায়নিক পদার্থগুলি অত্যন্ত পরিবর্তনশীল অবস্থায় আছে! এই সকল ভাঙন, গঠন ও পুনর্গঠনের ফলেই জীবের জীবনধারণ সম্ভব হচ্ছে।

জীবদেহের অভ্যন্তরে এত সব রাসায়নিক ভাঙ্গাগড়া হচ্ছে, কিন্তু আমরা তা মোটেই টের পাচ্ছি না। রসায়নাগারে এসব প্রকাণ্ড কাণ্ড করতে গেলে দারুণ চাপ, তাপ ও বিদ্যুতের ব্যবহার করতে হতো, কত জটিল যন্ত্রপাতি লাগাতো, কত বিস্ফোরণ ঘটতো। কিন্তু এসব ঘটছে যেন যাদুকাঠির স্পর্শে। এন্‌জাইমগুলিই হচ্ছে এই যাদুকাঠি।

এন্‌জাইমের কাজ সম্বন্ধে আমাদের পূর্ব-পুরুষেরা অবহিত ছিলেন। বিভিন্ন ধরণের শর্করার ফার্মেন্টেশন থেকে মদ উৎপাদনের পদ্ধতি অতি প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত। বৈদিক যুগে একে সোমরস এবং পৌরাণিক যুগে একে অমৃত, সুধা, মধু, মস্ত, সুরা, আসব প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হতো। কিন্তু এন্‌জাইমের স্বরূপ আবিষ্কৃত হয় মাত্র উনবিংশ শতাব্দীতে। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে Anselme Payen এবং Jean Francois Persoz নামে দু-জন বিজ্ঞানী প্রথম এন্‌জাইম ডায়াষ্টেজ পৃথক করেন এবং এন্‌-জাইমের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের আভাস দেন। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে পাস্তুর শর্করার ফার্মেন্টেশন সম্বন্ধে গবেষণা করতে গিয়ে দেখলেন যে, এর মূলে আছে ঈষ্ট নামক এক ধরণের অতি ক্ষুদ্র জীবকোষ। এন্‌জাইম কথাটি প্রথম ব্যবহার করেন বিজ্ঞানী Kuhne ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে, ঈষ্টের ফার্মেন্টেশনের ক্রিয়া বুঝাতে গিয়ে। এর পূর্বেই পেপ্‌সিন, ট্রিপ্‌সিন, এবং ডায়াষ্টেজ প্রভৃতি কয়েকটি জারক-পদার্থের পরিচয় জানা ছিল। Kuhne পেপ্‌সিন, ট্রিপ্‌সিন প্রভৃতির সঙ্গে ঈষ্টের জারক রসের সমধর্মিতা প্রচার করেন এবং এদের সাধারণ

নাম দেন এন্‌জাইম অর্থাৎ অনুঘটক। Berthelot, Duclaux এবং আরও বহু জীববিজ্ঞানী নূতন নূতন এন্‌জাইমের আবিষ্কারের ক্ষেত্রকে প্রসারিত করেছেন। এদের অনেকগুলি বিশুদ্ধ অবস্থায় কেলাসিত আকারে পৃথক করা হয়েছে। এইরূপ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য এন্‌জাইমের বিশুদ্ধ অবস্থায় পৃথকীকরণের ইতিহাস হলো—ইউরিয়েজ—১৯২৬ খৃ:, রিবোনিউক্লেজ—১৯৩৬ খৃ:, ডিঅক্সিরিবোনিউক্লেজ—১৯৩৮ এবং বিভিন্ন গোষ্ঠীর অ্যামাইলেজ—১৯৪৮-'৫১ খৃ:।

কিন্তু এই সব নামের অনেকের পিছনে 'এজ্' শব্দটা কেন? নামগুলির বিশেষ অর্থ আছে। এন্‌জাইমের নামকরণ হয়, এরা যে পদার্থের উপর কাজ করে, তার নামানুসারে। মনে রাখতে হবে যে, প্রত্যেকটি এন্‌জাইমের ক্রিয়া বিভিন্ন, অর্থাৎ একটি বিশেষ এন্‌জাইম একটি বিশেষ পদার্থের উপর ক্রিয়া করে। যে বস্তুর উপর ক্রিয়া করে, তাকে বলা হয় সাবষ্ট্রেট। মোটামুটি সাবষ্ট্রেটের নামের সঙ্গে ইংরেজীতে 'ase' (এজ্) প্রত্যয়টি যোগ করলে এন্‌জাইমের নাম পাওয়া যাবে। যেমন—একটা এন্‌জাইমের নাম দেওয়া হয়েছে অ্যালকোহল ডিহাইড্রোজিনেজ। এটা ইথাইল অ্যালকোহলের উপর ক্রিয়া করে এবং তাকে অ্যাসিট অ্যালডিহাইডে পরিণত করে। ইথাইল অ্যালকোহল থেকে দুটি হাইড্রোজেন পরমাণু সরিয়ে নিলেই হলো অ্যাসিট অ্যালডিহাইড। তাছাড়া মল্‌টেজ—মল্টোজ, অর্থাৎ মল্ট চিনির উপর এবং ল্যাকটেজ—ল্যাকটোজ অর্থাৎ দুধের চিনির উপর ক্রিয়া করে বলে এদের এরূপ নাম হয়েছে। কিন্তু পেপ্‌সিন ট্রিপ্‌সিন এই নামগুলি কেন হলো? এই ধরণের নামকরণের আগেই এই এন্‌জাইমগুলির নাম স্থির হয়ে গিয়েছিল, কাজেই তাদের নাম বদ্‌লানো হয় নি। পেপ্‌সিন নামটি ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে Theodore Schwann ব্যবহার করেন। এর দ্বারা তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন কিন্ডলীর রসের মধ্যে বর্তমান হজমের সহায়ক পদার্থটিকে। গ্রীক ভাষায় পেপ্‌সিস কথাটির অর্থ হজমক্রিয়া। এনজাইমগুলির বিশেষ ধরণের ক্রিয়ার উপর নির্ভর করে আর এক ধরণের দলগত নাম দেওয়া হয়েছে। যে সব এন্‌জাইম জারণক্রিয়া অর্থাৎ অক্সিজেন যোগ করতে সাহায্য করে, তাদের বলা হয় অক্সিডেজ; যারা প্রোটিন অণুকে ভাঙবার জন্যে সাহায্য করে, তাহাদের বলে প্রোটিওলিটিক এন্‌জাইম, যারা জীবকোষের নিউক্লিয়াস বা কেন্দ্রীনের মধ্যে বর্তমান নিউক্লিক অ্যাসিডগুলিকে ভেঙে দেয়, তাদের বলে নিউক্লীয়েজ। আবার কতকগুলি এন্‌জাইম এক পদার্থের কোন যৌগ মূলককে অন্য পদার্থের সঙ্গে জুড়ে দিতে পারে। এদের বলা হয় ট্র্যান্সফারেজ।

এন্‌জাইমগুলির কাজের হাজার হাজার উদাহরণ দেওয়া যায়, তবে দু-একটার বলা হচ্ছে। ঈষ্টের কথা আগেই বলেছি। এই গোষ্ঠীর আর একটি এককোষী ছত্রাকজাতীয় উদ্ভিদ হলো মাইকোডারমা অ্যাসিটি। এর মধ্যে থাকে অ্যালকোহল ডিহাইড্রোজিনেজ নামে এন্‌জাইম, যার কথা আগেই উল্লেখ করেছি। অতি ক্ষুদ্র এই ঈষ্টগুলি বায়ুর মধ্যে ভেসে বেড়ায়। অ্যালকোহলের মধ্যে প্রবেশ করলে এরা বংশবিস্তার করে এবং এদের এন্‌জাইমটি সক্রিয় হয়ে ওঠে। এর কাজ হচ্ছে অতি দ্রুত ইথাইল অ্যালকোহলকে অ্যাসিট অ্যালডিহাইডে পরিণত করা। রসায়নাগারে ঐ কাজটি করতে গেলে অক্সিজেন মিশ্রিত অ্যালকোহলকে লাল উত্তপ্ত তামা বা প্ল্যাটিনামের উপর দিয়ে চালিত করতে হবে, কিন্তু এতে অত্যধিক উত্তাপের প্রয়োজন, আর আয়োজনটা করতে হবে বিরাট গোছের। দেখা গেছে যে, এক অণু অ্যালকোহল ডিহাইড্রোজিনেজ সাধারণ উষ্ণতাতেই ৪০০০০ অ্যালকোহল অণুকে এক মিনিটে অ্যাসিট অ্যালডিহাইড

অণুতে পরিণত করতে পারে। এর চেয়েও দ্রুতগতিতে কাজ করতে পারে, এমন এন্‌জাইম অনেক আছে। এই ক্রিয়ার রাসায়নিক সমীকরণটি হলো :—

$$2CH_3 CH_2 OH + O_2 \rightarrow 2CH_3 CHO + 2H_2O$$

ইথাইল অ্যালকোহল (এন্‌জাইম) অ্যাসিট অ্যালডিহাইড জল

এই ক্রিয়াটি কিন্তু এই খানেই থামে না। এন্‌জাইমের ক্রিয়ায় জল অ্যাসিট অ্যালডিহাইড পরে অ্যাসিটিক অ্যাসিডে পরিণত হয়।

$$2CH_3 CHO + O_2 \rightarrow 2CH_3 COOH$$

অ্যাসিট অ্যালডিহাইড (এন্‌জাইম) অ্যাসিটিক অ্যাসিড

বাজারে যে ভিনিগার পাওয়া যায়, এটা সেই জিনিষ। পাত্‌লা মদ টকে গেলে এটা তৈরি হয়।

মদ তৈরি কেমন করে হয়? যে প্রক্রিয়ায় মদ তৈরি হয়, তাকে আমরা সাধারণভাবে শর্করার ফার্মেণ্টেশন বলতে পারি। বিভিন্ন ধরণের শর্করা-দ্রবণ বা শ্বেতসার-দ্রবণ বিভিন্ন ধরণের এন্‌জাইমের প্রভাবে ইথাইল অ্যালকোহলে পরিণত হয়। এরই নাম মদ। এই এন্‌জাইমগুলি থাকে ঈষ্টের মধ্যে। এই আণুবীক্ষণিক জীবগুলিও বাতাসে ভেসে বেড়ায়। শর্করা-দ্রবণের মধ্যে প্রবেশ করে এরা প্রচুর খাদ্য পেয়ে অতি দ্রুত বংশবিস্তার করে। তখন এদের এন্‌জাইমগুলি সক্রিয় হয়ে ওঠে। ঈষ্টের এন্‌জাইমগুলির নাম জাইমেজ, ইনভার্টেজ, ডায়াষ্টেজ ও মল্টেজ। আঙুরের রস থেকে পৃথিবীর সেরা মদ তৈরি হয়। আঙুরের রসে থাকে গ্লুকোজ বা আঙুর-শর্করা এবং ফ্রুক্টোজ বা ফল-শর্করা। এদের রাসায়নিক সঙ্কেত ($C_6H_{12}O_6$) এক হলেও আণবিক গঠনে পার্থক্য আছে। আঙুরের রসের বদলে গ্লুকোজ বা ফ্রুক্টোজ দ্রবণ নেওয়া যায়। এই দ্রবণে ১৫° সে. উষ্ণতায় ঈষ্ট যোগ করলে ঈষ্টের জাইমেজ এন্‌জাইম সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং গ্লুকোজ ও ফ্রুক্টোজের ফার্মেণ্টেশন ক্রিয়া সুরু হয়ে যায় এবং প্রবল বেগে বুদ্‌বুদ্‌ উঠতে থাকে। শর্করা দুটি ভেঙে ইথাইল অ্যালকোহল ও কার্বন ডায়োক্সাইড উৎপন্ন হয়। কার্বন ডায়োক্সাইড গ্যাস বুদ্‌বুদের আকারে নির্গত হয়ে যায়।

$$C_6H_{12}O^6 \rightarrow 2C_2H_5OH + 2C_2\uparrow$$
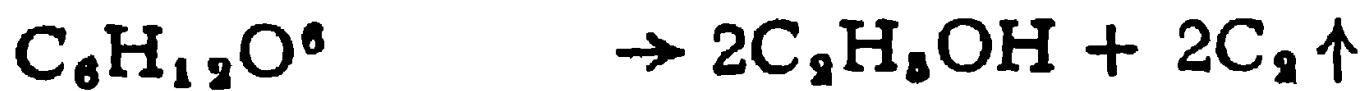
গ্লুকোজ (জাইমেজ) ইথাইল অ্যালকোহল কার্বন ডায়োক্সাইড

ইক্ষুরস থেকে মদ্য প্রস্তুত প্রক্রিয়াটিও অতি প্রাচীন। ইক্ষুরসে থাকে ইক্ষু-শর্করা ($C_{12}H_{22}O_{11}$)। ঈষ্টের ইনভার্টেজ এন্‌জাইমটি এর ফার্মেণ্টেশন ক্রিয়ার মূলে। ইক্ষুরস বা ইক্ষু-শর্করার দ্রবণে ২৬° সে. উষ্ণতায় ঈষ্ট যোগ করলে এই এন্‌জাইমের প্রভাবে ইক্ষু-শর্করার অণুর সঙ্গে জলের অণুর সংযোগ হয় এবং গ্লুকোজ ও ফ্রুক্টোজ উৎপন্ন হয়। এই দুটি শর্করা আবার জাইমেজের প্রভাবে ইথাইল অ্যালকোহলে পরিণত হয়। প্রক্রিয়াটিতে জলের অণুর সংযোগ হয় বলে একে আর্দ্র-বিশ্লেষণ বলা হয়। প্রক্রিয়াটিতে তাপ উৎপন্ন হয়, কিন্তু উষ্ণতাকে ৩৫°সে. এর মধ্যে নিয়ন্ত্রিত রাখতে হয় নতুবা এন্‌জাইমগুলি নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়।

$$C_{12}H_{22}O_{11} + H_2O \rightarrow C_6H_{12}O_6 + C_6H_{12}O_6 \mid C_6H_{12}O_6$$

ইক্ষু-শর্করা (ইনভার্টেজ) গ্লুকোজ ফ্রুক্টোজ (জাইমেজ)

$$\rightarrow 2C_6H_5OH + 2CO_2\uparrow$$
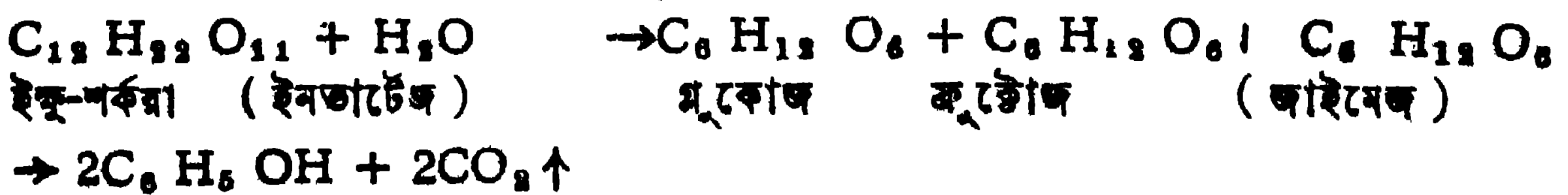
আশ্চর্যের বিষয়, এই প্রক্রিয়ার মধ্যে ছুটি পৃথক এন্‌জাইমের কাজ হয়, কিন্তু কেউ কারো কাজে বাধা দেয় না।

তাল ও খেজুর রস থেকে যে তাড়ি হয়, সে ক্ষেত্রে ঐ প্রক্রিয়াটি মূলতঃ ঈষ্টের পুর্বোক্ত ছুটি এন্‌জাইমের প্রভাবে ইক্ষু-শর্করার ফার্মেন্টেশন ছাড়া কিছুই নয়। কিন্তু সস্তা মদ আরও আছে। ধান, চাল, গম, ভাত প্রভৃতি পচিয়ে দেশী ধেনো বা পচাই মদ তৈরি হয়। বিশুদ্ধ শ্বেতসার থেকেও মদ তৈরি হয়। এরা সবই শ্বেতসারের ফার্মেন্টেশন ক্রিয়ার ফল। শ্বেতসারের বহু প্রকার ভেদ আছে। এদের সাধারণ রাসায়নিক সংকেত হলো $(C_9H_{10}O_5)n$; n একটি অনির্দিষ্ট সংখ্যা। এর মানের উপর শ্বেতসারের বিভিন্ন প্রকারভেদ নির্ভর করে। গম, আলু ও বার্লি প্রভৃতি পচালে তাকে বলা হয় মল্ট। ঈষ্টের ডায়াষ্টেজ এন্‌জাইম গম, বার্লি প্রভৃতির শ্বেতসারের উপর ক্রিয়া করে তাকে মল্‌টোজ বা মল্ট-শর্করায় পরিণত করে। এটি ইক্ষু-শর্করার সমগোত্রীয় এবং একই রাসায়নিক সংকেতযুক্ত, যদিও এর আণবিক গঠনে পার্থক্য আছে। মল্টের উষ্ণতাকে ৫০° সে.-এর মধ্যে নিয়ন্ত্রিত রাখা প্রয়োজন।

$$2(C_6H_{10}O_5)n + nH_20 \rightarrow n(C_{12}H_{22}O_{11})$$
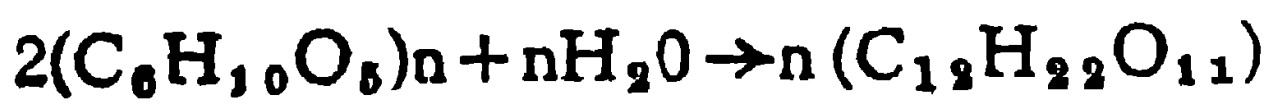
শ্বেতসার জল (ডায়াষ্টেজ) মল্টোজ

মল্টোজকে ফুটিয়ে ডায়াষ্টেজকে নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া হয় এবং ১৫° সে.-তে উষ্ণতা নামিয়ে এনে ঈষ্ট যোগ করা হয়। ঈষ্টের মল্টেজ এন্‌জাইম মল্টোজকে গ্লুকোজে পরিণত করে।

$$C_{12}H_{22}O_{11} + H_20 \rightarrow 2C_5H_{22}O_6$$

মল্টোজ জল (মল্টেজ) গ্লুকোজ

এর পর ঈষ্টের জাইমেজ গ্লুকোজকে অ্যালকোহলে পরিণত করে। এরূপ মদকে বিয়ার বলা হয়।

জীবদেহের ভিতরে কি এন্‌জাইমের কোন ক্রিয়া নেই? জীবদেহের ভিতরে যত কিছু ক্রিয়া, সবই এন্‌জাইমের প্রভাবে সাধিত হয়। এন্‌জাইমগুলি জীবকোষের সর্বত্র—এমন কি, তার কেন্দ্রীনের মধ্যেও আছে। দেহগঠন ও বিপাকের যাবতীয় কাজ এবং বংশানুক্রম—সবই নানা ধরণের এন্‌জাইমের প্রভাবে হচ্ছে। এন্‌জাইম যদি না থাকতো তবে কি হতো? প্রথমতঃ জীবের দৈহিক ক্রিয়াগুলি অত্যন্ত মন্থর হয়ে যেত। এর ফলে শরীরের মধ্যে সঞ্চিত দূষিত পদার্থগুলি নিষ্কাশিত হতে অনেক বিলম্ব হতো এবং বিষ-ক্রিয়ার ফলে অল্প সময়ের মধ্যেই জীবের মৃত্যু ঘটতো। আমাদের দেহের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হজম-ক্রিয়াটির উপর এন্‌জাইমের প্রভাব কিরূপ, সেটা দেখা যাক। খাদ্যদ্রব্যের শ্বেতসার ও শর্করা-জাতীয় উপাদানগুলি কয়েকটি পরিবর্তনের পর শেষ পর্যন্ত দ্রাক্ষা-শর্করায় পরিণত হচ্ছে। এতে সাহায্য করছে মুখের মধ্যে লালাগ্রন্থি নিঃসৃত টায়ালিন, অগ্ন্যাশয় নিঃসৃত অ্যামিলোপ্‌সিন এবং অন্ত্রনিঃসৃত ইনভার্টেজ, মল্টেজ এবং ল্যাক্‌টেজ প্রভৃতি এন্‌জাইম। বিভিন্ন প্রোটিনজাতীয় উপাদানগুলির উপর ক্রিয়া করছে পাকস্থলী ও অগ্ন্যাশয়নিঃসৃত পেপ্‌সিন ও ট্রিপ্‌সিন এন্‌জাইম ছুটি এবং এদের শেষ পর্যন্ত পেপ্‌টোন, টাইরোসিন ও লিউসিন-এ পরিণত করছে। তৈলজাতীয় উপাদানগুলি অগ্ন্যাশয়নিঃসৃত ট্রিপসিন-এর ক্রিয়ায় নানা ধরণের তৈল-অম্ল এবং গ্লিসারিন-এ পরিণত হচ্ছে। এভাবে জটিল অণুগুলি অপেক্ষাকৃত সরল অণুতে পরিণত হয়ে দেহের গ্রহণোপযোগী হচ্ছে এবং রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে যে উত্তাপ নির্গত হচ্ছে, তা দেহকে শক্তি যোগাচ্ছে।

দই মেখে ভাত খাওয়ার ব্যাপারটা হচ্ছে—দইটা আসলে টকে যাওয়া দুধ। দুধের মধ্যে ল্যাক্‌টো ব্যাসিলাস অ্যাসিডোফিলাস নামে জীবাণু প্রবেশ করে ল্যাক্‌টেজ নামে এন্‌জাইম নিঃসৃত করে। তার ফলে দুধের চিনি ল্যাক্-

টোজ ল্যাকটিক অ্যাসিডে পরিণত হয়। এখন অন্নের মধ্যেও ল্যাকটেজ উৎপন্ন হয়, যা শ্বেতসারজাতীয় খাদ্যকে ভেঙে দিতে পারে। তাতে দই মাখলে দেহের বাইরেই এই ভাঙন ক্রিয়াটা অনেকটা হয়ে যায়। ভাতগুলি শ্বেতসারজাতীয় খাদ্য। কাজেই খানিকটা হজমের কাজ বাইরেই হয়ে যায়।"

প্রত্যেক এন্‌জাইমের দুটি করে অংশ আছে, একটি প্রোটিন অংশ, যার নাম দেওয়া হয়েছে অ্যাপো-এন্‌জাইম। এর সঙ্গে যুক্ত থাকে অন্য একটি অংশ। এই দ্বিতীয় অংশটি কখনও দৃঢ়ভাবে কখনও বা আল্‌গাভাবে প্রথম অংশের সঙ্গে যুক্ত থাকে। দ্বিতীয় অংশটিকে বলে কো-এন্‌জাইম। প্রধানতঃ এই দ্বিতীয় অংশটির উপরই এন্‌জাইমের সক্রিয়তা নির্ভর করে। গবেষণার ফলে আরও জানা গেছে যে, এন্‌জাইমের অণুর তলটি মসৃণ নয়, এতে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গর্ত আছে। এন্‌জাইম ও সাবস্ট্রেট অর্থাৎ যে পদার্থের উপর এন্‌জাইম ক্রিয়া করে, সেগুলি যখন পাশাপাশি আসে, তখন নানা প্রকার রাসায়নিক বন্ধনের আকর্ষণে সাবস্ট্রেটটি এন্‌জাইমের দিকে আকৃষ্ট হয়। আগেই বলেছি যে, এন্‌জাইমের ক্রিয়া অত্যন্ত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অর্থাৎ একটা বিশেষ পদার্থের উপর একটা বিশেষ এন্‌জাইম কাজ করে। এর কারণও বোঝা গেছে। সাবস্ট্রেটের অণুর মধ্যে দুই বা ততোধিক অংশ থাকে, এরা অক্সিজেন বা অন্য কোন পরমাণুর মাধ্যমে পরস্পর যুক্ত থাকে। এন্‌জাইমের গর্তগুলি সাবস্ট্রেটের অংশগুলির স্থান সঙ্কুলানের এমনই উপযোগী যে, এদের অদল-বদল সম্ভব নয়। এখন আকর্ষণের ফলে সাবস্ট্রেটের অংশগুলি এন্‌জাইমের গর্তের মধ্যে চমৎকারভাবে প্রবিষ্ট হয়ে যায়। তারপর সাবস্ট্রেটের অংশগুলির মধ্যের বন্ধন ছিন্ন হয়ে যায়। তার ভগ্ন অংশগুলি গর্ত থেকে বেরিয়ে আসে এবং জারণ বা বিজারণ ক্রিয়ায় অংশগুলি নূতনভাবে গঠিত হয়ে পৃথক হয়ে যায়। এইভাবে জটিল অণুগুলি অপেক্ষাকৃত সরল অণুতে পরিণত হয়। অ্যাপো-এন্‌জাইম প্রোটিন-ধর্মী। এর মধ্যে আছে কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন। কো-এন্‌জাইমের মধ্যে আছে লোহা, ক্যালসিয়াম, ম্যাগ্‌নেসিয়াম প্রভৃতি ধাতু এবং জটিল খনিজ ও ভিটামিনজাতীয় জৈব পদার্থ।

এন্‌জাইমগুলি কি সব রকম অবস্থাতেই কাজ করতে পারে? মোটেই না। এদের ক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হতে হলে কতকগুলি অবস্থা ও সর্তের উপস্থিতি প্রয়োজন। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো—মাধ্যমের অম্লতা, ক্ষারত্ব এবং উষ্ণতা। এদের প্রত্যেকেরই একটি উপযুক্ত পরিমাণ আছে, যাতে এন্‌জাইমের ক্রিয়া সর্বাধিক পরিমাণে সম্পন্ন হতে পারে। আবার উপরিউক্ত অবস্থাগুলি খুব বেশী বা কম পরিমাণে থাকলে এন্‌জাইমগুলি নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। এন্‌জাইমগুলির প্রত্যেকের এক-একটি সঙ্কট উষ্ণতা আছে। দেখা গেছে যে, অধিকাংশ এন্‌জাইম ৫৬° সে.-এ ৩০ মিনিট উত্তপ্ত করলে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। অবশ্য কয়েকটি এন্‌জাইম ১০০° সে. পর্যন্ত উষ্ণতা সহ্য করতে পারে। এন্‌জাইমের ক্রিয়ার আরও কয়েকটি সর্ত আছে। এন্‌জাইম, সাবস্ট্রেট এবং উৎপন্ন বস্তুগুলির পরিমাণ এই সকল এন্‌জাইমের ক্রিয়ার উপর প্রভাব বিস্তার করে। এই বিষয়ে একটা মজার ব্যাপারও ঘটে—উপরিউক্ত অবস্থাগুলির পরিবর্তন হলে এন্‌জাইমগুলি বিপরীত ক্রিয়া সুরু করে দেয়। যেমন—ধরা যাক, অ্যালকোহল ডিহাইড্রোজিনেজ ইথাইল অ্যালকোহলকে অ্যাসিট অ্যালডিহাইডে পরিণত করতে পারে—একথা আগেই বলেছি। এখন যদি উৎপন্ন অ্যাসিট অ্যালডিহাইডের পরিমাণ অথবা মাধ্যমের অম্লতা, ক্ষারত্ব বা উষ্ণতা একটা নির্দিষ্ট মাত্রা ছাড়িয়ে

যায়, তবে বিপরীত দিকে ক্রিয়া আরম্ভ হয়ে যাবে; অর্থাৎ তখন অ্যাসিট অ্যালডিহাইড বিজারিত হয়ে ইথাইল অ্যালকোহল উৎপন্ন করবে। এন্‌জাইমগুলি সাম্যধর্মী অর্থাৎ উপাদান ও উৎপন্ন বস্তুর একটা সামঞ্জস্য বজায় রেখে চলতে চায়। এখন একটা প্রশ্ন হলো, এন্‌জাইমগুলির অধিকাংশই তো জীবদেহের অভ্যন্তরে কাজ করে, তবে কেমন করে জানা গেল—এরা ঠিক কি কি অবস্থায়, কি কি সর্তে কাজ করে?

এই প্রশ্নের উত্তর বিজ্ঞানীরা এখনও সঠিকভাবে দিতে পারেন নি। সত্য কথা বলতে গেলে এন্‌জাইমের ক্রিয়া সম্পর্কে আমাদের যে জ্ঞান লাভ হয়েছে, তার অধিকাংশই জীবকোষের বাইরে কৃত্রিম পরিবেশে পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাহায্যে। জীবকোষের মধ্যে ঠিক এক রকম পরিবেশে এবং একইভাবে এরা কার্যকরী হয় কিনা, তা এখনও জানা সম্ভব হয় নি। যতদূর জানা গেছে, তাতে বুঝা যায়—বাইরের কৃত্রিম পরিবেশে এরা যে ভাবে কাজ করে, জীবদেহের ভিতরে তার চেয়ে অনেকটা ভিন্ন ভাবে কাজ করে। আরও দেখা গেছে যে, ঈষ্ট প্রভৃতি সূক্ষ্ম জীবকোষ এন্‌জাইম নির্গত করে শর্করা প্রভৃতির উপর যে ভাবে কাজ করে, ঐ জীবকোষগুলির অবর্তমানে কেবল এন্‌জাইম প্রয়োগ করে ঠিক সেরূপ সুষ্ঠুভাবে কাজ হয় না। যাহোক, এন্‌জাইম জীবদেহের মধ্যে স্বাভাবিক পরিবেশে কিভাবে কাজ করে, সে সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করতে বিজ্ঞানীদের চেষ্টার অন্ত নেই। রেডিও-অ্যাকটিভ পরমাণু এই বিষয়ে তাঁদের জ্ঞানের ভাণ্ডার পূর্ণ করতে সাহায্য করছে।

আমাদের জীবনধারণের ব্যাপারে এন্‌জাইমের অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এই সম্বন্ধে অনেক কিছু জানা গেছে। হজম-ক্রিয়ার কথা আগেই বলা হয়েছে। আমাদের শ্বাসক্রিয়ায়ও এন্‌জাইমের দান কম নয়। অক্সিডেজ নামক একশ্রেণীর এন্‌জাইম ফুস্‌ফুসের ভিতর মধ্যে জারণ-ক্রিয়া সম্পন্ন করে, যার ফলে দূষিত পদার্থগুলি জারিত হয়ে কার্বন ডায়োক্সাইডে পরিণত হয় এবং নিঃশ্বাসরূপে বহির্গত হয়ে যায়। এর ফলে যথেষ্ট তাপ উৎপন্ন হয়ে দেহের স্বাভাবিক উষ্ণতা বজায় রাখে।

আমাদের শরীরের মধ্যেই এন্‌জাইমগুলির সৃষ্টি হয়ে থাকে। এদের একটি পূর্ববর্তী অবস্থাও থাকে, তাকে বলে জাইমোজেন, অর্থাৎ এন্‌জাইম উৎপাদক। পেপ্‌সিনের পূর্বাবস্থা পেপ্‌সিনোজেন, ট্রিপ্‌সিনের পূর্বাবস্থা ট্রিপ্‌সিনোজেন ইত্যাদি। রক্ত জমাট বাঁধবার ব্যাপারটা সাধারণ মনে হলেও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দেহের বাইরে এসে রক্ত যদি জমাট না বাঁধতো, তবে কেটে-ছিঁড়ে গেলে দেহের সব রক্ত বেরিয়ে গিয়ে কয়েক মিনিটের মধ্যেই মৃত্যু ডেকে আনতো, যা হিমোফিলিয়া রোগে দেখা যায়। রক্তের মধ্যে থ্রম্বিন নামে একটি এন্‌জাইম উৎপন্ন হয়। এর পূর্বাবস্থার নাম প্রোথ্রম্বিন। রক্তের যখন দেহের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে চলাচল হয়, তখন এটি নিষ্ক্রিয় থাকে। কিন্তু রক্ত যখন দেহ থেকে নির্গত হতে থাকে, তখন সঙ্গে সঙ্গেই প্রোথ্রম্বিন সক্রিয় হয়ে থ্রম্বিন উৎপন্ন করে। থ্রম্বিন বাতাসের সংস্পর্শে রক্তের ফাইব্রিনোজেনের উপর ক্রিয়া করে তাকে ফাইব্রিনে পরিণত করে। এগুলি সুতার মত পরস্পরের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়ে রক্তপাতের মুখটিকে বন্ধ করে দেয়।

দেহের রোগ-প্রতিরোধকে এন্‌জাইমের ভূমিকা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। ব্যাক্টিরিয়া প্রভৃতির আক্রমণে রক্তের মধ্যে এক ধরণের টক্সিন বা বিষের সৃষ্টি হয়। তখন কতকগুলি এন্‌জাইম সক্রিয় হয়ে তার অ্যান্টিটক্সিন বা প্রতিবিষের সৃষ্টি করে, যা উক্ত বিষের ক্রিয়া নষ্ট করে দিতে পারে। এভাবে ব্যাক্টিরিয়া প্রভৃতির বিরুদ্ধে দেহের প্রতিরোধ-শক্তি গড়ে ওঠে। অনেক রোগে এন্‌জাইমের ক্রিয়া

এত বেশী বৃদ্ধি পায় যে, তার ফলে উৎপন্ন প্রতিবিষ দেহকোষের পক্ষে ক্ষতিকর হতে পারে। তখন বাইরে থেকে বিপরীত এন্‌জাইম সিরাম প্রয়োগ করে এন্‌জাইমের ক্রিয়া সম্পূর্ণ বা আংশিক বন্ধ করে দেওয়া যেতে পারে। অনেক সময় দেহের মধ্যে বিপরীত এন্‌জাইম উৎপন্ন হয়ে মূল এন্‌জাইমের ক্রিয়া শিথিল করে দেয়। আবার যখন ব্যাক্টিরিয়া ও অন্যান্য জীবাণু পেনিসিলিন প্রভৃতি অ্যান্টিবায়োটিক্সের বিরুদ্ধে প্রতিরোধশক্তি গড়ে তোলে, তখন বিপরীত এন্‌জাইম সিরাম প্রয়োগ করে সুফল পাওয়া যেতে পারে।

রোগনির্ণয়েও এন্‌জাইমের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এক ধরণের ক্যান্সার রোগে অ্যাসিড ফস্‌ফেটেজ নামক এন্‌জাইমের বিশেষ বৃদ্ধি ঘটে। করোনারী থ্রম্বোসিস রোগে অক্‌জাল্যাসেটিক-গ্লুটামিক ট্র্যান্সামিনেজ নামক এন্‌জাইম বৃদ্ধি পায়। অগ্ন্যাশয়ের স্ফীতি রোগে অ্যামাইলেজ নামক এন্‌জাইমের বৃদ্ধি ঘটে। সুতরাং বিশেষ ধরণের এন্‌জাইমের বৃদ্ধি লক্ষ্য করে রোগনির্ণয়ের সুবিধা হতে পারে।

এন্‌জাইমের সংখ্যা কত? আর এসব এন্‌জাইম কি রসায়নাগারে কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে? প্রথম প্রশ্নটির সঠিক উত্তর দেওয়া এখনও সম্ভব হয় নি। এপর্যন্ত প্রায় এক লক্ষ এন্‌জাইমের সন্ধান পাওয়া গেছে। এখনও বহু এন্‌জাইমের পরিচয় আমাদের অজ্ঞাত।

কয়েক বছর আগেও রসায়নাগারে এন্‌জাইম উৎপাদন অসম্ভব মনে করা হতো, কিন্তু সম্প্রতি আমেরিকার রকফেলার বিশ্ববিদ্যালয় এবং কয়েকটি ঔষধ তৈরির কারখানা থেকে একটি চমকপ্রদ সংবাদ এসেছে। তাঁরা প্রত্যেকে রিবোনিউক্লেজ নামক এন্‌জাইমটি কৃত্রিম উপায়ে তৈরি করেছেন। দেহকোষের কেন্দ্রীনের মধ্যে রিবোনিউক্লিক অ্যাসিড বা সংক্ষেপে আর. এন. এ. নামক যে উপাদানটি আছে, তার উপর এটি ক্রিয়া করে হজম-ক্রিয়ায় সাহায্য করে। অবশ্য রিবোনিউক্লেজ অপেক্ষাকৃত একটি সরল গঠনের অণু। হয়তো অদূর ভবিষ্যতে মানুষ আরও বহু জটিল এন্‌জাইম কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্টি করতে সক্ষম হবে।

[এই প্রবন্ধের কতকগুলি তথ্য 'The Living Universe' নামক জীববিজ্ঞান বিষয়ক কোষগ্রন্থের প্রথম ও পঞ্চম খণ্ড থেকে সংগৃহীত হয়েছে। এর জন্যে আমি উক্ত গ্রন্থের প্রকাশকের নিকট কৃতজ্ঞ। লেঃ]

বিজ্ঞান-সংবাদ

প্রোটিনসমৃদ্ধ খাদ্য

সস্তা, সুস্বাদু, নরম এবং প্রোটিনসমৃদ্ধ পাউরুটি তৈরির চেষ্টা আমেরিকার সরকারী কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের বিজ্ঞানীরা বহুকাল থেকেই করছেন। পৃথিবীর যে সকল দেশ প্রোটিন খাদ্যের অভাবে ভুগছে, এই সকল পাউরুটি সেই অভাব পূরণে অনেকখানি সহায়ক হবে।

প্রথমতঃ সয়াবীন ও অন্যান্য প্রোটিনসমৃদ্ধ তৈলবীজের সঙ্গে আটা-ময়দা মিশিয়ে উন্নত ধরণের রুটি তৈরির চেষ্টা তাঁরা করেছিলেন। কিন্তু ঐ সকল পাউরুটি তৈরির পর দেখা গেল, তেমন সুস্বাদু ও নরম হয় না। তখন ক্যানসাস গবেষণা কেন্দ্রের ঐ সকল বিজ্ঞানীরা গম, ময়দা, ইষ্ট, মাছের গুঁড়া, সয়াবীন প্রভৃতি যে সকল উপাদান

দিয়ে ঐ রুটি তৈরি করা যেতে পারে, তাদের জৈব রাসায়নিক গুণাগুণ ও কার্যকারিতা নিয়ে বহুকাল ধরে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন এবং সয়াবীনমিশ্রিত ময়দার সঙ্গে গ্লাইকোলিপিড মিশিয়ে তাঁরা সাফল্য অর্জনে সক্ষম হন। গ্লাইকোলিপিড বা ফস্ফরাস বর্জিত স্নেহযুক্ত পদার্থে রুটি তৈরির সময়ে জলের সংস্পর্শে আসার ফলে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় তাথেকে স্নেহযুক্ত অ্যাসিড এবং শ্বেতসার বা কার্বোহাইড্রেট উৎপন্ন হয়। এই রুটি তৈরির সময়ে জানা গেছে—যে পরিমাণ আটা দিয়ে রুটি তৈরি করা হবে, তাতে তার শতকরা ১৬ ভাগ সয়াবীনের গুঁড়া মিশালে ঐ সকল রুটিতে অ্যামিনো অ্যাসিডের পরিমাণ তিন গুণ বৃদ্ধি পায়।

বর্তমানে যে প্রক্রিয়ায় এবং যে সকল যন্ত্রপাতির সাহায্যে পাউরুটি তৈরি হয়ে থাকে, ঐ সকল যন্ত্রপাতি ও ঐ প্রক্রিয়াতেই এই প্রোটিনসমৃদ্ধ রুটি তৈরি করা যাবে। তবে তাতে মাত্র গ্লাইকো-লিপিড প্রয়োগ করতে হবে।

সয়াবীনের দই

জাপানী বিজ্ঞানীরা এক নতুন ধরণের প্রোটিন-সমৃদ্ধ খাদ্য উৎপাদন করেছেন। এটি হচ্ছে সয়া-বীনের দই—জাপানী ভাষায় বলা হয় হাকেকো তোফু।

এই দই তৈরি করা সম্পর্কে টোকিওর ইউ-নিভার্সিটি অব এডুকেশনের ডাঃ টেউম্‌ জিরো ওবারা বলেছেন যে, প্রথমতঃ সয়াবীনের দুধকে গরম করতে হবে এবং এর তাপমাত্রা যখন ১৫৮ ডিগ্রী ফারেনহাইটে পৌঁছুবে, তখন তাতে ক্যাল-সিয়াম সালফেট প্রয়োগ করতে হবে। তারপর জমাবার জন্যে তাতে দিতে হবে পেপেইন নামে এক প্রকার এন্‌জাইম। দ্রুত ফল পাবার জন্যে পেপেইনের সঙ্গে প্রোনেস ও বাইওপ্রেস নামে এন্‌জাইম প্রয়োগ করা যেতে পারে। তারপর তাতে প্রয়োগ করতে হবে ল্যাক্‌টিক অ্যাসিড। জাপানী বিজ্ঞানীরা স্ট্রেপ্টোকক্কাস ক্রিমোরিজ এবং স্ট্রেপ্‌ট্রোকক্কাস ল্যাক্‌টিস প্রয়োগ করে আশানুরূপ ফল পেয়েছেন।

ভেষজের সাহায্যে ফল পাকানো ও তোলবার ব্যবস্থা

বহু রকম গাছের ফল যথাসময়ে তুলতে পারা যায় না এবং গাছ থেকে পাড়বার আগেই মাটিতে পরে বহু ফল নষ্ট হয়ে যায়। পাকবার পর ফলের বোঁটা নরম হয়ে যায় এবং অতি হাল্কা হাওয়াতেই ঝরে পড়ে। সম্প্রতি আমেরিকায় ঔষধ প্রয়োগ করে এই অপচয় নিবারণের ব্যবস্থা হয়েছে। আপেল গাছে ন্যাপ্‌থালিন অ্যাসিটিক অ্যাসিড প্রয়োগ করে এই বিষয়ে বিশেষ ফল পাওয়া গেছে—কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক লুই জে. এড্‌গারটন একথা জানিয়েছেন।

বিজ্ঞানীরা পাকা আপেলকে গাছে রাখবার জন্যে অ্যালার নামে আর একটি ভেষজ প্রয়োগ করেও বিশেষ ফল পেয়েছেন। তাড়াতাড়ি ফল পাকানো ও তোলবার জন্যে ইথরেল নামে এক প্রকার ঔষধ প্রয়োগ করা যেতে পারে বলে তাঁরা বলছেন। ফল পাকাবার জন্যে সাধারণতঃ ইথাই-লিন প্রয়োগ করা হয়ে থাকে।

এক্স-রের বিকল্প

নয়াদিল্লী থেকে ইউ. এন. আই. কর্তৃক প্রচারিত এক সংবাদে জানা যায়—পশ্চিম জার্মেনিতে একটি নতুন যন্ত্র তৈরি করা হয়েছে। ঐ যন্ত্রের সাহায্যে রঞ্জেন-রশ্মির প্রয়োগ ছাড়াই স্কিয়াগ্রাফ (দেহের অভ্যন্তরের আলোকচিত্র) করা চলবে। ঐ যন্ত্রে একটি অতিশব্দ-তরঙ্গের ট্র্যান্সমিটার ও রিসিভার যুক্ত করা আছে। ঐ ট্র্যান্সমিটার ও রিসিভারের সাহায্যে দেহের অভ্যন্তরের আলোকচিত্র গ্রহণ করা সম্ভব হবে। যন্ত্রটির নির্মাতারা দাবী করেছেন যে, বিভিন্ন জটিল স্ত্রী-রোগের ক্ষেত্রে, বিশেষতঃ চিকিৎসকেরা যেখানে তেজস্ক্রিয়তার পরিমাণ হ্রাস করতে চান—সেই সব ক্ষেত্রে এই যন্ত্রটি বিশেষ-ভাবে কাজে আসবে।

সমুদ্রের গভীরে উষ্ণ জলের উৎস-সন্ধানে

প্রশান্ত মহাসাগরের তলদেশের পর্বত বেষ্টিত ৬০০মাইল দীর্ঘ অববাহিকার মার্কিন সমুদ্র-বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর একটি রহস্য উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করছেন। চিরতুষারাবৃত দক্ষিণমেরু-অঞ্চল থেকে জলস্রোত যখন উত্তর দিকে প্রবাহিত হয়, তখন দেখা যায়—সেই হিমশীতল জল সমুদ্রের গভীরে বেশ গরম হয়ে উঠেছে। পৃথিবীর অভ্যন্তরের তাপশক্তি ভূস্তরের ভিতর দিয়ে কি ভাবে উপরের দিকে বিকিরিত হয়—সমুদ্রের জল কিভাবে গরম হয়ে ওঠে, সে সম্বন্ধে তথ্যানুশীলনের জন্যে মার্কিন সমুদ্র-বিজ্ঞানীরা এই স্থানটি বেছে নিয়েছেন।

হৃদ্‌রোগ চিকিৎসার জন্যে অভিনব পোষাক

হৃদ্‌রোগ চিকিৎসার জন্যে সম্প্রতি আমেরিকায় একটি অভিনব পোষাক উদ্ভাবিত হয়েছে। এই পোষাকের সাহায্যে রোগীর রক্তপ্রবাহ ও রক্তের চাপ নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে। আমেরিকার ইউনাইটেড এয়ার ক্র্যাফ্‌ট্ কর্পোরেশনের হ্যামিলটন স্ট্যাণ্ডার্ড ডিভিশন এই পোষাকটি নির্মাণ করেছেন। ইউ. এস. ন্যাশন্যাল ইনষ্টিটিউসন এই ধরণের একটি পোষাক নির্মাণের জন্যে যে গবেষণার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন, তা রূপায়ণের ফলেই এই পোষাকটি উদ্ভাবিত হয়েছে। বর্তমানে ইউ. এস-এর একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে এই পোষাকের গুণাগুণ পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। মহাকাশচারীদের পোষাক নির্মাণের বেলায় হ্যামিলটন স্ট্যাণ্ডার্ড ডিভিশন যে পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন, সেই পদ্ধতিতেই এটি নির্মিত হয়েছে।

পুস্তক-পরিচয়

চন্দ্র অভিযান—শঙ্কর চক্রবর্তী

অভ্যুদয় প্রকাশ-মন্দির, ৬ বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২ ; ১২৭ পৃঃ, মূল্য ছয় টাকা।

রাত্রির আকাশে পূর্ণিমার চাঁদকে দেখে কেউ কখনও ভাবে নি—সেখানে কোন দিন মানুষের পদক্ষেপ সম্ভব হবে। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান তাও সম্ভব করে তুলেছে। ১৯৫৭ সালের ৪ঠা অক্টোবর পৃথিবীর মানুষ বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে দেখলো, পৃথিবীর মানুষেরই কীর্তি স্পুট্‌নিক—মহাশূন্য অভিযানে মানুষের প্রথম সার্থক প্রচেষ্টা। এরপর মাত্র এক যুগের মধ্যেই সহস্রাধিক মহাকাশযান নানা অসম্ভবকে সম্ভব করে তুললো। সর্বশেষ পরিণতি—১৯৬৯ সালের ২০শে জুলাই চাঁদের মাটিতে মানুষের প্রথম পদার্পণ। চন্দ্র অভিযান পুস্তকটিতে ষোলটি পরিচ্ছেদের মধ্যে চন্দ্র অভিযান সংক্রান্ত আধুনিকতম সকল তত্ত্ব ও তথ্য অতি সুন্দর ও সহজ, সরল ভাষায় পরিবেশিত হয়েছে।

মহাকাশ অভিযানের বৈজ্ঞানিক গুরুত্ব সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা দিয়ে পুস্তকটির সুরু। মহাশূন্য ভ্রমণে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের ভূমিকার কথা বিবেচনা করে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বায়ুমণ্ডলের বর্ণনা খুবই যুক্তিসঙ্গত হয়েছে। এর পরেই আছে রকেটের কথা—মহাশূন্যে যাবার একমাত্র যান। পুস্তকটির এই অংশে রকেটের ইতিহাস, রকেটের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা, রকেটের জ্বালানী ইত্যাদি সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। রকেটের সাহায্যে কৃত্রিম উপগ্রহ স্থাপন ও সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলীর ব্যাখ্যা করা হয়েছে চতুর্থ পরিচ্ছেদে। পঞ্চম পরিচ্ছেদে লিপিবদ্ধ হয়েছে কৃত্রিম উপগ্রহের বৈজ্ঞানিক অবদান। এদের মধ্যে রয়েছে ভ্যান

অ্যালেন বিকিরণ বলয়, পৃথিবীর আকৃতি, চৌম্বক ক্ষেত্র, আবহাওয়া প্রভৃতি বিষয়ে গবেষণা-ক্ষেত্রে কৃত্রিম উপগ্রহের অবদানের কথা। পরের অধ্যায়ে পরিবেশিত হয়েছে বিভিন্ন মহাকাশযাত্রীদের মহাশূন্য ভ্রমণের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কাহিনী। চন্দ্রে অভিযান করতে হলে চন্দ্র সম্বন্ধে খুব ভাল করে জানা দরকার। তাই সপ্তম পরিচ্ছেদে আছে চাঁদের বর্ণনা। পরবর্তী পরিচ্ছেদগুলিতে চাঁদে অভিযান সংক্রান্ত নানা বৈজ্ঞানিক সমস্যা ও চন্দ্র-অভিযাত্রী বিভিন্ন মহাকাশযানের ধারাবাহিক বিবরণ দেওয়া হয়েছে। স্বভাবতঃই চন্দ্রপৃষ্ঠে মানুষের প্রথম বহনকারী রকেট অ্যাপোলো-১১ ও -১২ অভিযানের বিবরণ অপেক্ষাকৃত বিশদভাবে স্থান পেয়েছে। পরিশেষে চাঁদ মানুষের কোন উপকারে আসবে কিনা এবং চাঁদের পর অভিযান অন্য কোন্ দিকে নির্দিষ্ট হবে—এই দুই প্রশ্নের আলোচনার পর পুস্তকটি সমাপ্ত হয়েছে।

পুস্তকটি খুবই সময়োপযোগী হয়েছে সন্দেহ নেই। সকল শ্রেণীর পাঠকই এটি পাঠ করে বিশেষ উপকৃত হবেন। ছাপা ও বাঁধাই মনোরম। প্রচ্ছদ-পটসহ বেশ কয়েকটি আলোকচিত্র পুস্তকটিতে স্থান পেয়েছে। তবে রেখাচিত্রের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম। উৎসাহী পাঠকের জন্যে একটি পুস্তক-নির্দেশিকা (Pibliography) দেওয়া উচিত ছিল।

বিজ্ঞানের স্বরূপ—সতীশরঞ্জন খাস্তগীর

ভারবি, ১৩।১ বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২; ১৩৫ পৃঃ, মূল্য ছয় টাকা।

লেখক নিজে বিশিষ্ট বিজ্ঞানী এবং দীর্ঘকাল যাবৎ বিজ্ঞানের অধ্যাপনায় নিযুক্ত আছেন। তিনি বহুদিন থেকে বিভিন্ন পত্রিকায় বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ লিখে আসছেন। আলোচ্য পুস্তকটি এদের মধ্য থেকে নির্বাচিত এগারটি প্রবন্ধের সঙ্কলন। প্রবন্ধগুলির বিষয়বস্তু বিভিন্ন হলেও সমগুলিই প্রধানতঃ পদার্থবিদ্যা বিষয়ক। প্রথম প্রবন্ধের নামে পুস্তকের নামকরণ করা হয়েছে। অন্যান্য দশটি প্রবন্ধের নাম, যথাক্রমে—'বিজ্ঞানীর জগৎ', 'পরিমিত আপেক্ষিকতাবাদ', 'পৃথিবীর বয়স', 'বিশ্ব কি ক্রমবর্ধমান?', 'কয়েকটি ভারতীয় বাদ্যযন্ত্রের কথা', 'সাইক্লোট্রন যন্ত্র', 'বেতার প্রসঙ্গ', 'আয়নমণ্ডল সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক গবেষণা', 'দূরেক্ষণ' (টেলিভিশন) ও 'ভ্যান অ্যালেন বেষ্টনী'।

প্রথম দুটি প্রবন্ধের বিষয়বস্তু হচ্ছে পদার্থ-বিজ্ঞানের আধুনিক চিন্তাধারা। নিউটনের গতি-বিজ্ঞান থেকে সুরু করে জড় পদার্থের প্রাথমিক উপাদান অণু-পরমাণুর জগৎ, বিভিন্ন মৌলিক কণিকা, বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গ ও সংশ্লিষ্ট মতবাদ, শক্তিকণা বাদ ইত্যাদি বিষয় সম্বন্ধে পুস্তকটির এই অংশে আলোচনা করা হয়েছে। অন্যান্য প্রবন্ধগুলির বিষয়বস্তু নামকরণ থেকেই প্রতিভাত হবে।

বিজ্ঞানের এই সব জটিল বিষয়গুলি লেখক সাবলীল ভঙ্গীতে বিভিন্ন আলোকচিত্র ও রেখা-চিত্রের মাধ্যমে মনোজ্ঞভাবে পরিবেশন করেছেন। কয়েকটি প্রবন্ধ বেশ কিছু দিন আগে লিখিত হয়েছিল। লিখিত হবার পর বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ঐসব বিষয়ে নূতন নূতন আবিষ্কার হয়েছে। লেখক কোন কোন রচনায় যতটা সম্ভব নূতন তথ্য সংযোজন করেছেন। বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন পত্রিকায় লিখিত বলে বিষয়বস্তুর কিছু কিছু পুনরুক্তি হয়েছে। 'বিজ্ঞানের স্বরূপ' ও 'বিজ্ঞানীর জগৎ' প্রবন্ধ দুটিতে এই ত্রুটি লক্ষণীয়।

পুস্তকটির জন্যে নির্বাচিত প্রবন্ধগুলির অধিকাংশের বিষয়বস্তুই খুব জনপ্রিয়। পাঠকমাত্রেই এতে আকৃষ্ট হবেন এবং পুস্তকটি পাঠ করে লাভবান হবেন সন্দেহ নেই। ছাপা, বাঁধাই ও প্রচ্ছদপট মনোরম।

দীপঙ্কর বসু

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

মে — ১৯৭০

২৩শ বর্ষ — ৫ম সংখ্যা

সম্প্রতি দু-জন ডুবুরী পশ্চিম জার্মেনীর কন্সটান্স হ্রদের তলায় কয়েক দিন বসবাস করে সুস্থ শরীরে ফিরে এসেছেন। তাঁরা সেখানে একটি বিশেষ ধরণের গৃহে ছিলেন। হ্রদের তলায় ডুবুরীর পোষাক পরে তাঁরা দিব্যি ঘুরেফিরে দিন কাটিয়েছেন। এভাবে মানুষ হয়তো অদূর ভবিষ্যতে সমুদ্রের তলায় ডেরা বাঁধবে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির দরুণ জমির অভাব সেখানে নেই।

বিজ্ঞানী জর্জেস কুভিয়োর

ইদানীং পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান, ধর্ম ও সমাজব্যবস্থা বিষয়ে মনীষীদের জন্মের এক-শ', দু-শ', চার-শ' বা পাঁচ-শ' বছর পূর্তি উপলক্ষে বিশেষ আড়ম্বরের সঙ্গে জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপিত হচ্ছে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, আমরা বিস্মৃত হয়েছি অসীম প্রতিভাধর বিজ্ঞানী জর্জেস লিওপোল্ড কুভিয়োরের কথা, যিনি জন্মেছিলেন ১৭৬৯ সালে, সম্ভবতঃ তদানীন্তন ফ্রান্সে। কিন্তু তাঁর দ্বিশত জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে পৃথিবীর কোন প্রান্তেই উদ্যোগ লক্ষ্য করা যায় নি। অথচ একথা মানতেই হবে, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে সমগ্র ইউরোপে তাঁর মত বিদগ্ধ পণ্ডিতের সংখ্যা ছিল নিতান্তই নগণ্য। আর জীবাশ্মবিদ্যা বা ফসিলবিদ্যায় (Palaeontology) তাঁর প্রতিভা ছিল প্রশ্নাতীত। প্রসঙ্গতঃ বলা যায়, চার্লস ডারউইনের বিবর্তনবাদ মূলতঃ কুভিয়োরের গবেষণার উপর ভিত্তি করেই রচিত হয়েছে। অথচ সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা, কুভিয়োর স্বয়ং প্রাণিজগতে বিবর্তনের কথা স্বীকার করতেন না। তবু একথা অনস্বীকার্য যে, মানুষের বিবর্তনের দুর্বোধ্য অতীত ইতিহাসের চাবিকাঠি তিনিই প্রথম ধরিয়ে দিয়েছিলেন উত্তরসূরীদের হাতে।

কুভিয়োরের পিতা সুইট্‌জারল্যাণ্ডের সৈন্যদলে কাজ করতেন। স্বভাবতঃই তাঁকে মানুষ করবার দায়িত্ব এসে পড়ে মায়ের উপর। তিনি ছোটবেলা থেকেই কুভিয়োরকে বিভিন্ন বিষয়ে আগ্রহী করে তুলতে বিশেষ চেষ্টা করতেন। ফলে অচিরেই তিনি সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, সঙ্গীত, শিল্পকলা প্রভৃতি বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করেন। তবু অতি অল্পবয়স থেকেই বিজ্ঞান, বিশেষতঃ প্রাণিবিদ্যার প্রতি তাঁর আশ্চর্য এক প্রবণতা লক্ষ্য করা গিয়েছিল। প্রাণিবিদ্যার কোন পুস্তক সংগ্রহ করতে পারলে সেটিকে পড়ে শেষ না করা পর্যন্ত তর সইতো না। এই বিষয়ে তাঁর সবচেয়ে প্রিয় ছিল প্রাণি-জগতের উপর বাফনের লেখা বত্রিশ খণ্ডের একখানি গ্রন্থ। তিনি যেখানেই যেতেন, তাঁর সঙ্গে থাকতো পুস্তকটির কোন একখানি খণ্ড।

স্কুলের পাঠ শেষ করে বৃত্তি পেয়ে তিনি পড়তে যান ষ্টুটগার্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে। বছর চারেক বাদে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে নরম্যাণ্ডির এক অভিজাত পরিবারে গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হন। কুভিয়োরের জীবনে এই ঘটনাটির গুরুত্ব অপরিসীম, কারণ গৃহশিক্ষকতার সময় টুকু ছাড়া কুভিয়োরের বাদবাকী সময় কাটতো নরম্যাণ্ডির সমুদ্রের বালুকাবেলায় সামুদ্রিক প্রাণীর জীবাশ্মের সন্ধানে।

নরম্যাণ্ডির সেই অভিজাত পরিবারে একটি বিরাট গ্রন্থাগার ছিল। সেই গ্রন্থা-গারে প্রাণিবিদ্যার পুস্তক অধ্যয়ন করেই কেটে যেত তাঁর বিশ্রামের অবসর। অধ্যয়নই

শুধু নয়, তিনি পুস্তকের প্রতিটি লাইন দীর্ঘদিন ধরে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে স্মৃতি থেকে উদ্ধার করতে পারতেন। এর পর প্যারিসের ন্যাচার্যাল হিষ্ট্রী মিউজিয়ামের অ্যানাটমির অধ্যাপকের সহকারী হিসেবে নিযুক্ত হলেন ১৭৯৫ সালে। প্রাণিবিদ্যা বিষয়ে অগাধ পাণ্ডিত্য ও অপূর্ব অধ্যাপনার গুণে অল্পদিনের মধ্যেই মিউজিয়ামের পরিসরের বাইরেও তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়লো।

এক বছরের মধ্যেই ফরাসী বিজ্ঞান অ্যাকাডেমীতে তাঁর প্রথম গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা-পত্রটি গৃহীত হয়। বৈজ্ঞানিকদের অধিবেশনে তিনি বললেন, পৃথিবীর বিভিন্ন যুগের প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীরা আকৃতি ও প্রকৃতিতে পৃথক ছিল। সেই যুগের বিজ্ঞানীরা এই তত্ত্বের বিশেষ কোন তাৎপর্য খুঁজে না পেলেও তা সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত হয় নি। কিন্তু সে যুগের বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস ছিল একেবারেই বিপরীত। তাঁরা বলতেন, পৃথিবীর বিভিন্ন যুগের মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীদের আকৃতি, প্রকৃতি—এমন কি, জীবন-চর্যার দিক থেকে বিশেষ কোন পার্থক্য ছিল না। কিন্তু কুভিয়ের ঠাট্টাচ্ছলে বললেন, প্রাচীনতম প্রাণীরা যদি পৃথিবীতে এসে হাজির হয়, তবে সেই সব অদ্ভুত প্রাণীদের দেখে আমরা তাজ্জব বনে যাব।

কুভিয়ের তাঁর এই তত্ত্বটিকে প্রমাণ করবার জন্যে অমানুষিক পরিশ্রম করতে সুরু করলেন। তাঁর টেবিলে ছড়ানো থাকতো অসংখ্য প্রাণীর কঙ্কাল ও হাড়ের অংশ-সমূহ। দিনের পর দিন সেগুলি নিয়ে তার দিয়ে জুড়ে জুড়ে সম্ভব অসম্ভব প্রাণীর পরি-পূর্ণ কঙ্কাল তৈরি করতেন। এইভাবে তিনি এমন দুটি প্রাণীর কঙ্কাল তৈরি করলেন, যারা পৃথিবীর বুক থেকে বিদায় নিয়েছে প্রায় ৫ কোটি বছর আগে। এই প্রাণী দুটির নামকরণও তিনি করেন—অ্যানোপ্লেথেরিয়াম ও প্যালিওথেরিয়াম। এমনিভাবেই কুভি-য়েরের অক্লান্ত পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের ফলে গড়ে উঠলো বিজ্ঞানের নতুন একটি শাখা—যার নাম প্যালিওন্টোলজি বা ফসিলবিদ্যা। প্রাণিজগৎকে তিনি চারটি ভাগে ভাগ করলেন—মেরুদণ্ডী প্রাণী, মোলাস্ক (শামুক বা ঝিনুক জাতীয় প্রাণী), আর্টিকুলেট প্রাণী (পোকা-মাকড় বা কাঁকড়াজাতীয় প্রাণী) এবং রেডিয়েটেড প্রাণী (প্রবালজাতীয় প্রাণী)। যদিও আধুনিক কালে এই শ্রেণীবিভাগের প্রচুর পরিবর্তন ঘটেছে, তবু সে যুগের পরিপ্রেক্ষিতে এর যথেষ্ট মূল্য রয়েছে।

ইতিমধ্যে সমগ্র ফ্রান্সে একজন বিদগ্ধ প্রতিভাবান বিজ্ঞানী হিসেবে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়লো। ১৮০৮ সালে স্বয়ং নেপোলিয়ন কুভিয়েরকে ইম্পিরিয়াল বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিষদে নিযুক্ত করলেন। সদ্যবিজিত প্রদেশগুলির উচ্চতর শিক্ষার ভারও তাঁর উপরে অর্পিত হলো। পরবর্তী কালে তিনি ফরাসী অ্যাকাডেমীর সদস্য নির্বাচিত হন।

কিন্তু কুভিয়েরের বিজ্ঞান-সাধনায় কিছুটা আপাতবিরোধী দ্বন্দ্ব জড়িয়ে ছিল। পার্থিব মানুষের মতই কালের দ্রুত গতির সঙ্গে নিজেকে তিনি মানিয়ে নিতে পারছিলেন

না। পূর্বতন প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীর ফসিলের ব্যাপারে পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য জ্ঞাত হয়েও কিছুতেই এক প্রাণী থেকে আর এক প্রাণীর বিবর্তনের তত্ত্বকে তিনি স্বীকার করতে পারছিলেন না। তাঁর কাছে বানর ও মানুষের মধ্যে জন্মগত বা বিবর্তনগত কোন সম্পর্ক সম্পূর্ণ অসম্ভব বলেই মনে হতো এবং এই কারণেই হিলেয়্যার বা লামার্কের বিবর্তনবাদ (এটিকে পরে অবশ্য সম্পূর্ণ রূপদান করেন চার্লস ডারউইন) তত্ত্বকে স্বীকার করতে পারেন নি। কালের গতির সঙ্গে তাল রাখতে না পারলেও একথা স্বীকার করতেই হয়, চার্লস ডারউইনের তত্ত্ব কুভিয়েরের ফসিল সংক্রান্ত অনবদ্য গবেষণার ভিত্তির উপরেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

এই প্রসঙ্গে কুভিয়েরের চরিত্রের একটি মহৎ দিকের কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। জীবদ্দশায় বিবর্তনবাদের বিরোধিতা করলেও বিজ্ঞানের ব্যাপারে ভুল স্বীকার করতে তাঁর বিন্দুমাত্র দ্বিধা ছিল না। একবার তিনি এক বিতর্ক সভায় কনিষ্ঠ এক বিজ্ঞানীকে বলেছিলেন—প্রিয় বন্ধু, একথা স্বীকার করতে আমার লজ্জা নেই, আমি ভুল করেছিলাম। নিজের ভুল অকপটে স্বীকার করবার এমন ঔদার্য যে কোন যুগেই দুর্লভ।

তাই মনে হয়, চার্লস ডারউইনের সমসাময়িক কাল পর্যন্ত তিনি যদি জীবিত থাকতেন, তবে তিনি হয়তো আর একবার তাঁর ভুল স্বীকার করতেন। কিন্তু তা আর সম্ভব হয় নি। ১৮৩২ সালে তাঁর মৃত্যু হয়।

শ্রীদিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

সৌর পুষ্করিণী

কোটি কোটি বছর ধরে সূর্য তাপ ও আলো বিকিরণ করে আসছে। এই সূর্যরশ্মিই একদিন পৃথিবীর সুপ্তির অবসান ঘটিয়েছিল—এনেছিল প্রাণের স্পন্দন। উদ্ভিদ ও জীবজগৎ সূর্যের কাছে তাই একান্তভাবে ঋণী। প্রাচীন কালে মানুষ তাকে দেবতার আসনে বসিয়ে অর্ঘ্য নিবেদন করেছে। ক্রমে ক্রমে তারা বুঝতে শিখেছে, সূর্যকে দেবতার আসনে বসিয়ে রেখে কি লাভ—চেষ্টা করে চলেছে কিভাবে তার এই বিপুল রশ্মিচ্ছটাকে নিজেদের কাজে লাগানো যায়।

আবিষ্কৃত হয়েছে সৌর শক্তিচালিত পাম্প, লবণ তৈরির যন্ত্র, ফটো-ইলেকট্রিক সেল—আরও কত কি। এসব ছাড়াও বিজ্ঞানীদের আজ এক নতুন প্রচেষ্টা হলো, সৌর পুষ্করিণীর ব্যবস্থা করা। সূর্যরশ্মির তাপ ধরে রাখবার পক্ষে সবচেয়ে ভাল জিনিষ হচ্ছে জল। সমুদ্রের জলের উপরের স্তর সূর্যের তাপে ক্রমে গরম হয়ে ওঠে, কিন্তু কিছু নীচে জলটা থাকে ঠাণ্ডা। কয়েক জন ফরাসী ইঞ্জিনীয়ার পরীক্ষা করে দেখেন—বিষুবরেখার কাছাকাছি অঞ্চলে দিনের বেলায় সমুদ্রের জলের এই উষ্ণতার পার্থক্য হয় প্রায় ২০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড। এই উষ্ণতার পার্থক্যই হলো টারবাইন চালাবার মূল সূত্র। তবে টারবাইন চালাবার পক্ষে এই উষ্ণতার পার্থক্য খুবই সামান্য। একটা সাধারণ টারবাইনের জন্যে দরকার হয় ৩০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড বা তার চেয়েও বেশী উষ্ণতার পার্থক্য। বিজ্ঞানীদের

তাই চেষ্টা—কিভাবে এই উষ্ণতার পার্থক্য বাড়ানো যায়। কালো রং-করা অগভীর পাত্রে জল রেখেও পরীক্ষা করা হয়েছে, কিন্তু তাথেকেও বিশেষ লাভ হয় নি। অসুবিধাটা হচ্ছে—কেট্‌লিতে চায়ের জল গরম করবার সময় নীচের গরম জল হাল্‌কা হয়ে উপরে উঠে আসে আর উপরের ঠাণ্ডা জল নীচে নেমে যায়। এভাবে পরিচলন প্রক্রিয়ায় সমস্ত জলটাই গরম হয়ে ওঠে। এখানেও ঠিক তাই। সুতরাং এই পরিচলন প্রক্রিয়াকে বন্ধ করতে পারলেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায়, বিজ্ঞানী ডক্টর ব্লক এর একটা সহজ সমাধান বের করেন। ব্যাপারটা খুবই সাধারণ—পাত্রের নীচের জলের সঙ্গে নুন মিশিয়ে ঘনত্ব বাড়িয়ে দিতে হবে। নীচের জল ভারী হওয়ায় গরম হলেও কিছুতেই উপরে উঠতে চাইবে না, আর এভাবেই উপর ও নীচের জলের উষ্ণতার পার্থক্য বেড়ে যাবে। হাঙ্গারীর কোন এক নোনা জলের হ্রদে এই অদ্ভুত ব্যাপারটা লোকের চোখে পড়ে। হ্রদের গভীরে যতই যাওয়া যায় জলের উষ্ণতা ততই বেড়ে চলে। আমেরিকায় বৈজ্ঞানিকেরা এই ব্যাপারে আরও অনেকটা অগ্রসর হয়েছেন। তাঁরা একটা সৌর পুষ্করিণী তৈরি করেছেন ২৫ মিটার লম্বা ও ২৫ মিটার চওড়া এবং দেখা গেছে, এক মাসের মধ্যেই নীচের জলের তাপমাত্রা প্রায় ৯০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত উঠে গেছে। এরকম একটা বিরাট পুকুর তৈরি করতে পারলে তাথেকে পর্যাপ্ত পরিমাণ বিদ্যুৎশক্তি পাওয়া যেতে পারে। হিসাব করে দেখা গেছে, মাত্র এক বর্গ কিলোমিটার একটি সৌর পুষ্করিণী থেকে বছরে তিন কোটি কিলোওয়াট আওয়ার বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদন করা যেতে পারে। এতে কয়লা বা অন্য কোন জ্বালানীর খরচ কিছুই নেই। বর্তমানে বছরে মাথাপিছু বিদ্যুৎ-শক্তি খরচের পরিমাণ পশ্চিম বঙ্গে প্রায় ১৫০ কিলোওয়াট-আওয়ার। এই হিসাবে আমাদের গোটা ভারতবর্ষে বিদ্যুৎ-শক্তির যোগান দিতে হলে চাই ২০০০ বর্গ কিলোমিটার একটা পুকুর। ব্যাপারটা খুব সহজ নয়।

এই ব্যাপারে বিজ্ঞানীরা যে সব অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন, সেগুলি হলো—প্রথমতঃ, উপরকার জলকে না নাড়িয়ে নীচের জল থেকে তাপটুকু সংগ্রহ করে নিতে হবে। দ্বিতীয়তঃ, পুকুরের উপরকার বাতাসের প্রবাহ স্থির জলে যাতে কোন রকম আলোড়ন সৃষ্টি করতে না পারে, সেটাও দেখতে হবে। তাপ সংগ্রহ করবার জন্যে তাই চাই একটা তাপ-বিনিময় ব্যবস্থা। তাছাড়া পুকুরের চারদিক তাপ-নিরোধক পদার্থ দিয়ে মুড়ে দিতে হবে। এক বর্গ কিলোমিটার একটা সৌর পুষ্করিণী তৈরি করতে খরচ পড়বে প্রায় ২০ লক্ষ টাকা—তারপর টারবাইন, তাপ-বিনিময় ব্যবস্থা প্রভৃতি তো আছেই। কিন্তু এটাও দেখতে হবে, জ্বালানীর খরচ বলতে গেলে কিছুই নেই।

সৌরশক্তি সংগ্রহ করবার যে অসুবিধা একে উন্নত দেশগুলিতে জনপ্রিয় করছে না, সেটা হলো বেশ কিছু খোলা জমির প্রয়োজনীয়তা। তাছাড়া সূর্য বছরে সব ঋতুতে বা দিনে সব সময়ে সমানভাবে কিরণ দেয় না। সেটাও একটা সমস্যা। কিন্তু এমন একদিন আসবে, যে দিন পৃথিবীর সমস্ত কয়লা ও পেট্রোলিয়ামই নিঃশেষিত হয়ে যাবে, তখন সৌরশক্তিকে কাজে লাগাতেই হবে। তাই বিজ্ঞানীদের আজ অতন্দ্র সাধনা, কিভাবে সৌরশক্তিকে আরও সহজ উপায়ে মানুষের কাজে লাগানো যেতে পারে।

বিদ্যুৎকুমার নিয়োগী

মাকড়সার জাল

মাকড়সা সৃষ্টিকর্তার কাছে গিয়ে মানুষের পক্ষে নাকি সাক্ষী দিয়েছিল যে, মানুষের মত নিরীহ জীব আর নেই ; কারণ তার জালে কত শয়তান ধরা পড়ে, কিন্তু মানুষ কোন দিন ধরা পড়ে নি।

গল্পটা সত্য না হলেও মাকড়সা যে মানুষের পক্ষে কিছুটা উপকারী, তাতে সন্দেহ নেই। কয়েক শ্রেণীর মাকড়সা মাত্র জাল পেতে শিকার ধরে। অধিকাংশ মাকড়সাই ঘাড়ের উপর লাফিয়ে পড়ে শিকারকে কাবু করে ফেলে। এখানে জাল-বোনা মাকড়সার কথাই বলছি।
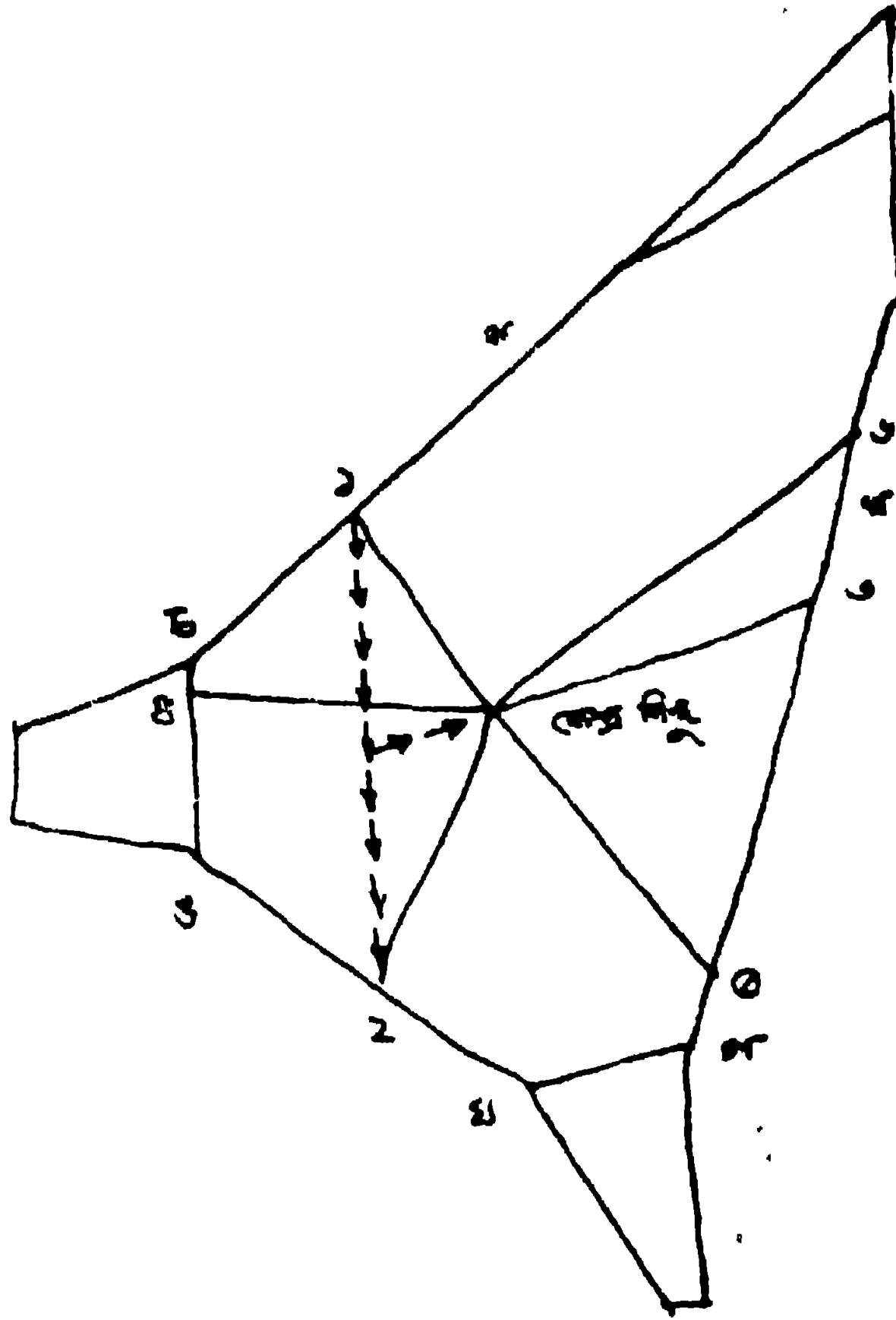
চিত্র ১—১, ২ এবং ৩ টানা দিয়ে নিয়েছে। এই টানাগুলিকে শক্ত করবার জন্যে ঙ চ এবং ঘ গ বাঁধন। তারপর ১ থেকে ২ পর্যন্ত সরল রেখা কল্পনা করে ওথেকে জালের কেন্দ্রবিন্দু স্থির করা হয়। এই কেন্দ্রবিন্দুর সঙ্গে এর পর ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬ টানা দেওয়া হয়।

মনোযোগ দিয়ে না দেখলে মাকড়সার জালকে মনে হবে, কতকগুলি সূতা এলোমেলোভাবে জড়িয়ে রেখেছে, এর মধ্যে বাহাদুরী কিছু নেই। ওদের জালের বুনানীতেও কৌশল কম নয়।

উপযুক্ত জায়গা বেছে নিয়ে মাকড়সা প্রথমে গোটা তিনেক টানা দিয়ে নেয়। তারপর

তাতে বাঁধন আঁটে, যাতে টানাগুলি বেশ টান হয়ে থাকে। এরপর কেন্দ্রবিন্দুটা ঠিক করে নিয়ে ঐ কেন্দ্রের সঙ্গে আবার কতকগুলি টানা জুড়ে দেয়। সর্বশেষে বৃত্তাকারে কতকগুলি স্তা ঘুরিয়ে নিয়ে তৈরি করে শিকার ধরবার জাল।

মাকড়সার জালের স্তা চট্‌চটে আঠার মত। জাল তৈরির পর সে ওৎ পেতে বসে থাকে। কোনও কীট-পতঙ্গ ঐ জালে এসে আট্‌কে গেলে সঙ্গে সঙ্গে সে টের
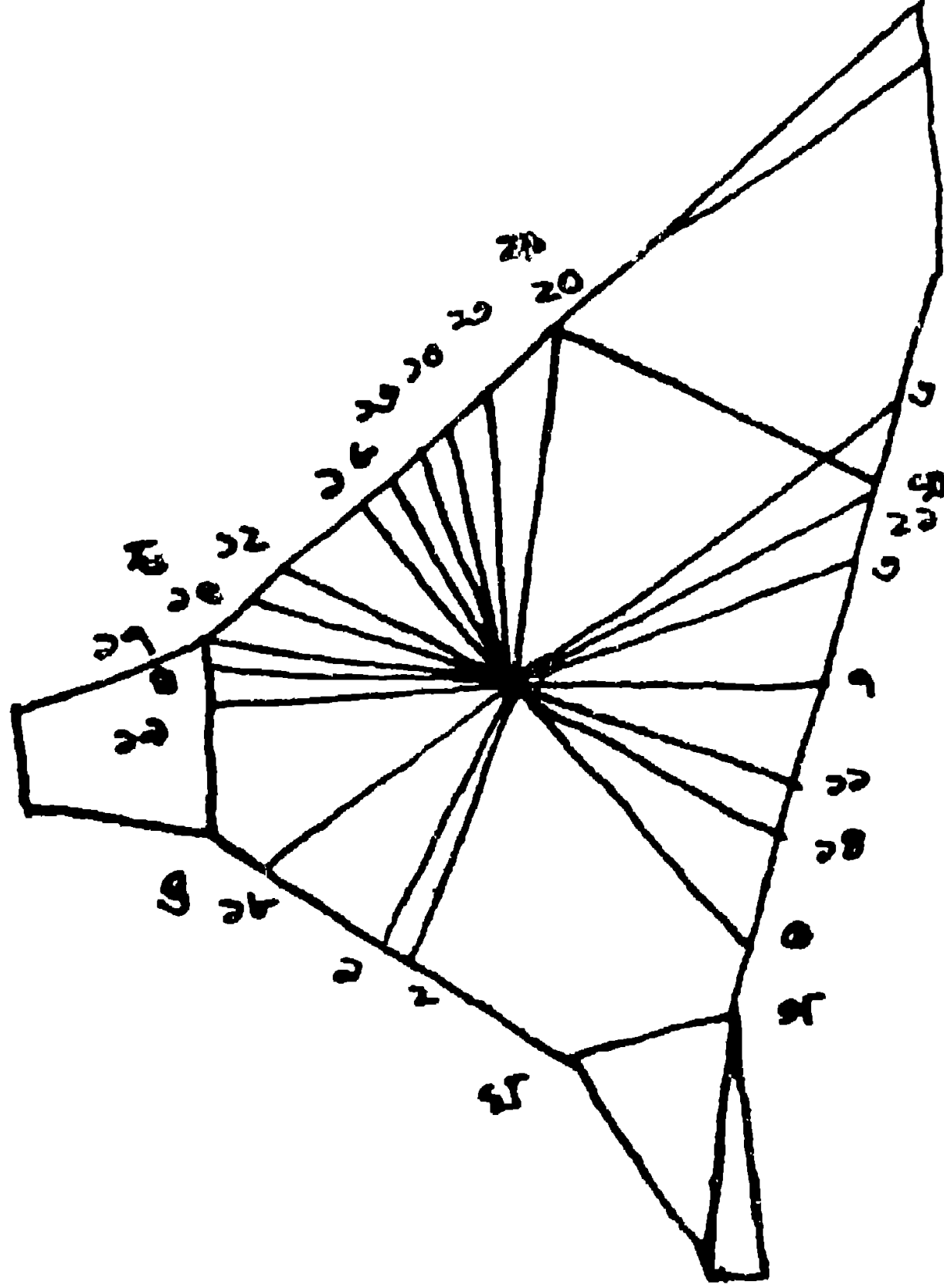
চিত্র ২—দ্বিতীয় চিত্রে দেখা যাবে, ঐ কেন্দ্রের সঙ্গে আরও ১৫টি টানা দিয়ে মোট ২১টি টানার সাহায্যে জালটাকে বেশ শক্ত করে নেওয়া হয়েছে।

পায় এবং তার সরু সরু চার জোড়া পা নিয়ে তড়িদ্‌গতিতে ছুটে এসে শিকারকে ধরে ফেলে। তারপর তাকে চিবিয়ে চিবিয়ে চুষে খেয়ে খোলসটা ফেলে দেয়। অনেক সময় অন্য মাকড়সা জালে পড়লে তাকেও এরা নিষ্কৃতি দেয় না।

মাকড়সা দল বেঁধে বাস করে না। তার পরিবার পরিজনেরও বালাই নেই। স্ত্রী-মাকড়সারাই জাল পাতে এবং বসে থাকে তার জালের ধারে শিকার ধরবার জন্যে।

অবশ্য মাকড়সা ছোট, বড়, মাঝারী অনেক রকমের আছে এবং তাদের জালও ভিন্ন ভিন্ন। যে সব মাকড়সা ঘরের কোণে জাল পাতে, তারা আকারে খুব ছোট, কিন্তু বনে-জঙ্গলে খুব উঁচুতে যে সব মাকড়সা বড় বড় জাল পাতে, তাদের আকার বেশ বড়, রং কালো বা নিষ্প্রভ কালচে এবং পিঠের উপর হল্‌দে রঙের দাগ।

আর এক রকমের মাকড়সা আছে, যারা তুলট কাগজের মত একটা নরম গোলাকার পেটিকার মধ্যে ডিম পেড়ে সেটাকে বুকের কাছে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। এই ডিম থেকে বাচ্চা বেরিয়ে এসে এলো-মেলো সুতার সঙ্গে ঝুলতে থাকে। তারপর তারা এদিক-ওদিকে ছড়িয়ে পড়ে। চাঁদের মা বুড়ীর চরকায় যে বাতিল সুতা আকাশ দিয়ে উড়ে আসে বলে ছেলে-বেলায় আমরা মনে করতাম, সেগুলি বাচ্চা মাকড়সার জাল—বাতাসে জড়ো হয়ে আকাশ-

চিত্র ৩—তৃতীয় চিত্রে এই টানার সংখ্যা আরও বাড়িয়ে ৪৪ পর্যন্ত করা হয়েছে। এরপর এই সব টানা আর বাঁধনের ভিতর বৃত্তাকারে সুতা ঘুরিয়ে নিয়ে জালটাকে আরও মজবুত করে মাকড়সার বসবার জায়গা করা হয়।
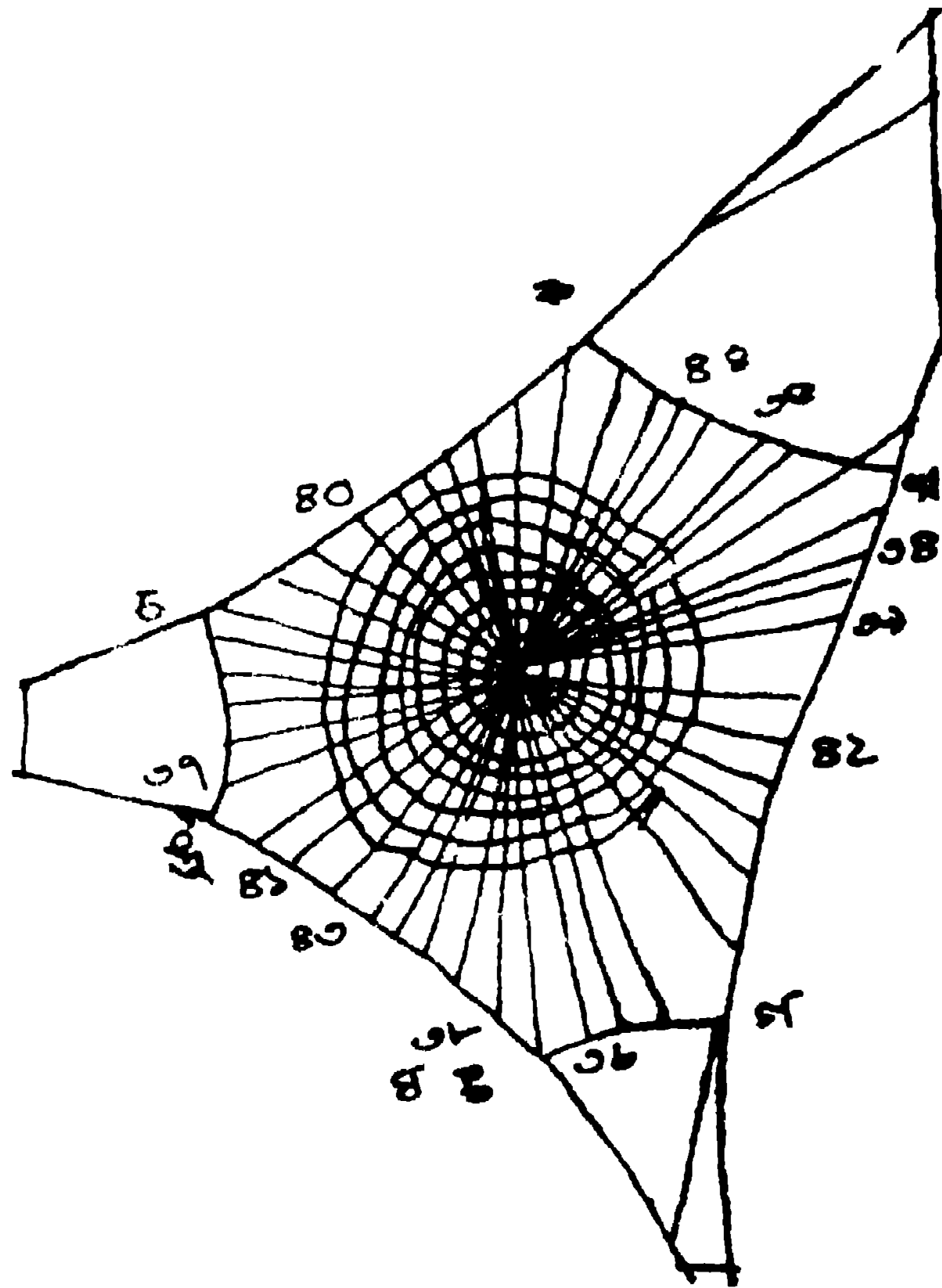
পথে উড়ে যায়। মাকড়সা মৃত কীট-পতঙ্গ খায় না। একটা মশা কি মাছিকে মেরে জালে ফেলে দিলে ওরা তা স্পর্শও করে না।

সুইজারল্যাণ্ডের ডক্টর পিটার উইট এমন একটা ওষুধ খুঁজছিলেন, যা মাকড়সার উপর প্রয়োগ করলে সে আরও বেশী সুতা ছাড়তে পারে। এজন্যে তিনি মাকড়সার উপর দু-একটা মাদক ওষুধ প্রয়োগ করে দেখলেন, তাতে সুতার উৎপাদন কিছুমাত্র বাড়ে না বরং তাতে তাদের বুদ্ধির মাত্রাটা কমে যায়। ফলে এলোমেলোভাবে তারা জাল বুনতে আরম্ভ করে।

নরীগোপাল চক্রবর্তী

প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন :—সাপে কামড়ালে মানুষ মারা যায় কেন ?

ত্রিবেণী গঙ্গোপাধ্যায়
দিল্লী

উত্তর :—সাপে কামড়ালেই যে মানুষ মারা যায়, তা নয়। কেন না, সব সাপই বিষধর নয়। আবার বিষধর সাপ মানুষের দেহে কামড় দিয়ে যদি নির্দিষ্ট পরিমাণ বিষ মানুষের রক্তে না ঢালতে পারে, তাহলেও মানুষ মারা যায় না। সুতরাং একমাত্র বিষধর সাপ দংশন করে নির্দিষ্ট পরিমাণ বিষ মানুষের রক্তে ঢাললে তার ক্রিয়ায় মানুষ মারা যায়।

বিষধর সাপের বিষদাঁতের পিছনেই থাকে বিষের থলি। বিষদাঁত ছুটি ফাঁপা। কামড় দেবার সময় বিষের থলিতে চাপ পড়ে, ফলে বিষদাঁতের ফাঁপা নলের মধ্য দিয়ে বিষ দষ্ট স্থানে ঢুকে মানুষের রক্তে মিশে যায়।

সাপের বিষ দেখতে অনেকটা ফিকে হল্‌দে রঙের গন্ধহীন আঠালো তরল পদার্থের মত। সাপের বিষকে বিশ্লিষ্ট করে বিজ্ঞানীরা আজ পর্যন্ত যা পেয়েছেন, তাথেকে মোটামুটিভাবে জানা যায় যে, এই বিষ প্রধানতঃ পেপ্‌টোন, ফাইব্রিন ও গ্লোবিউলিন নামক তিনটি উপাদানে তৈরি। সাপের দেহের মধ্যে যে সব প্রোটিন থাকে, তা পরিবর্তিত হয়ে এই বিষ তৈরি হয়। বিভিন্ন সাপের বিষে এই তিনটি উপাদানের পরিমাণ বিভিন্ন হয়ে থাকে। গ্লোবিউলিন স্নায়ুর উপর ক্রিয়া করে শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ করে দেয়। কাজেই সাপের কামড়ের ফলে মানুষের রক্তে নির্দিষ্ট পরিমাণ বিষ মিশলেই মৃত্যু অবধারিত।

সাপের বিষ রক্তের সঙ্গে না মিশলে কোন ক্ষতি হয় না। তাই সাপের বিষ খেলেও কিছু ক্ষতি হয় না বলে বিজ্ঞানীদের ধারণা। বিজ্ঞানীরা দেখেছেন যে, পেটের মধ্যে গিয়ে এই বিষ বিভিন্ন উপাদানে বিশ্লিষ্ট হয়ে পড়ে; ফলে বিষক্রিয়া নষ্ট হয়ে যায়। যদি পেটের মধ্যে বা পেটে যাবার পথে কোন ক্ষত থাকে, তবে সেই ক্ষতের মধ্য দিয়ে বিষ রক্তে মিশে প্রাণনাশের কারণ হতে পারে। শুধুমাত্র মানুষের ক্ষেত্রেই নয়, যে কোনও প্রাণীর ক্ষেত্রেও একই ভাবে এই বিষের ক্রিয়া হয়ে থাকে।

শ্যামসুন্দর দে*

*ইনষ্টিটিউট অব রেডিও ফিজিক্স অ্যাণ্ড ইলেকট্রনিক্স, বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাতা-৯

শোক-সংবাদ

ডক্টর জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়

বিশিষ্ট রসায়ন-বিজ্ঞানী এবং আচার্য প্রফুল্ল-চন্দ্রের প্রিয় 'জ্ঞানত্রয়'-এর অন্যতম ডক্টর জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় গত ৯ই এপ্রিল কলকাতায় তাঁর বাসভবনে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। মৃত্যুকালে তিনি তাঁর স্ত্রী, এক পুত্র ও এক কন্যা রেখে গেছেন।

১৮৯৭ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারী ফরিদপুর জেলার (অধুনা পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্গত) তিল্লীগ্রামে

ডক্টর জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়

সম্ভ্রান্ত রায় পরিবারে জ্ঞানেন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা পূর্ণচন্দ্র রায় ছিলেন বাংলা দেশে প্রথম শিল্পোদ্যোক্তাদের অন্যতম। জ্ঞানেন্দ্র-নাথের ছাত্রজীবন কৃতিত্বে সমুজ্জ্বল। ১৯১৯ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নশাস্ত্রে এম. এস-সি পরীক্ষায় তিনি শীর্ষস্থান অধিকার করেন এরপর সার আশুতোষের আহ্বানে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজে রসায়ন বিভাগে তিনি লেকচারারের পদে যোগদান করে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের তত্ত্বা-বধানে জৈব রসায়নে গবেষণা সুরু করেন। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের 'জ্ঞানত্রয়'-এর অপর দু-জন ডক্টর জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ এবং ডক্টর জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় উভয়েই ভৌত রসায়নে গবেষণা করে খ্যাতি অর্জন করেন। কিন্তু জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় একই পথে অগ্রসর না হয়ে জৈব রসায়নে গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেন।

১৯২৩ সালে ঘোষ ভ্রমণ বৃত্তি লাভ করে জ্ঞানেন্দ্রনাথ ইংল্যাণ্ডে গমন করেন এবং সেখানে নোবেল পুরস্কারবিজয়ী প্রখ্যাত জৈব রসায়ন-বিজ্ঞানী সার রবার্ট রবিনসনের অধীনে গবেষণা করেন। ১৯২৬ সালে সার রবিনসনের সঙ্গে যৌথভাবে তিনি একটি গবেষণা-পত্র প্রকাশ করেন, যা হচ্ছে যোজ্যতার আধুনিক ইলেকট্রনিক তত্ত্বের ভিত্তিস্বরূপ। ইংল্যাণ্ডে অবস্থানকালে জ্ঞানেন্দ্রনাথ ম্যাঞ্চেস্টার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি-এইচ. ডি এবং ডি. এস-সি ডিগ্রী লাভ করেন। ম্যাঞ্চেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি কিছুকাল অধ্যাপনা ও গবেষণা পরিচালনও করেছিলেন। অষ্ট্রিয়ার গ্রাজ্ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক প্রেগ্লের সঙ্গে মাইক্রোরসায়ন বিষয়েও তিনি গবেষণা করেন।

১৯২৮ সালে জ্ঞানেন্দ্রনাথ ভারতে ফিরে এসে লাহোর বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক পদে যোগদান করেন। এখানে তিনি জৈব রসায়ন বিষয়ে একটি উদীয়মান গবেষক গোষ্ঠী-গড়ে তোলেন। নোবেল পুরস্কারবিজয়ী ডক্টর হর-গোবিন্দ খোরানা ছিলেন এখানে তাঁর অন্যতম ছাত্র।

লাহোর বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘকাল অধ্যাপনার পর ডক্টর রায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারত সর-

কারের আমন্ত্রণে ড্রাগ্‌স্‌ ও ড্রেসিং দপ্তরের অধি-কর্তারূপে কাজ করেন। এই পদে অধিষ্ঠিত থাকাকালে তিনি পূর্ব রণাঙ্গনে সমরায়োজনে প্রয়োজনীয় প্রধান প্রধান ভেষজ ও রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুতের জন্যে সারা দেশে নতুন নতুন কেন্দ্র গড়ে তোলবার ব্যাপারে এক বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেন। তাঁর এই অবদানের স্বীকৃতিতে তৎকালীন ভারত সরকার তাঁকে সম্মাননায় ভূষিত করেন। এরপর তিনি ভারত সরকারের শিল্প ও সরবরাহ বিভাগের সহ-অধিকর্তার পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

১৯৫১ সালে ডক্টর রায় সরকারী কাজ ছেড়ে দিয়ে রাসায়নিক শিল্প প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হন। প্রথমে বোম্বাইয়ে টি. সি. এফ, জন উইথ এবং জেফরি ম্যানার্স ভেষজ প্রতিষ্ঠানে তিনি উপ-দেষ্টারূপে কাজ করেন। এরপর ১৯৫৮ সালে ক্যালকাটা কেমিক্যাল-এ প্রধান শিল্প ও গবেষণা-উপদেষ্টারূপে যোগদান করেন এবং ১৯৬৮ সালে এখান থেকেই অবসর গ্রহণ করেন। সরকারী কাজ ছেড়ে দেবার পরেও তিনি ভারত সরকার এবং পশ্চিম বঙ্গ সরকারের শিল্প উপদেষ্টা ছিলেন।

ডক্টর রায় ভারতে উপক্ষার সংশ্লেষণ গবেষণায় অন্যতম পথিকৃৎ এবং এসম্পর্কে তাঁর একটি কৃতিত্ব-পূর্ণ অবদান হচ্ছে বারবেরিন উপক্ষারের সংশ্লেষণ। তাঁর ১৮০টির বেশী মৌলিক গবেষণা নিবন্ধ ভারত, বৃটেন, আমেরিকা ও জার্মেনীর বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ১৯৩৯ সালে তিনি ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের রসায়ন শাখায় সভাপতিত্ব করেছিলেন এবং ১৯৪৮-৫০ সালে তিনি ভারতীয় রসায়ন সমিতির সভাপতি ছিলেন। রয়েল ইনস্টিটিউট অফ কেমিষ্ট্রির (ভারতীয় শাখা) তিনি সভাপতি এবং ভারতের ন্যাশন্যাল ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্সস-এর ফেলো ছিলেন। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় স্মারক বক্তৃতা, অধ্যাপক হেমেন্দ্রকুমার সেন স্মারক বক্তৃতা, ডক্টর জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ স্মারক বক্তৃতা ইত্যাদি নানা স্মারক বক্তৃতা তিনি প্রদান করেন। এছাড়া বিজ্ঞান পরিকল্পনা, প্রশাসন, সমাজব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর বহু প্রবন্ধ নানা পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। চিন্তাশীল লেখক হিসাবে তিনি বিদগ্ধ মহলে সুপরিচিত ছিলেন।

ডক্টর রায়ের ব্যক্তিগত সান্নিধ্যে এসে রসায়ন-শাস্ত্রে তাঁর গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় এবং রসায়নের জটিল সমস্যা সমাধানে তাঁর দূরদর্শী নির্দেশ পেয়ে মুগ্ধ হয়েছি। তাঁর প্রয়াণে ভারতের রসায়ন-ক্ষেত্রে একজন পুরোধার তিরোধান ঘটলো।

রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়

বিবিধ

অ্যাপোলো-১৩ এর অভিযান : বিপর্যয় ও নিরাপদ প্রত্যাবর্তন

অ্যাপোলো-১১ এবং অ্যাপোলো-১২ অভিযানে চন্দ্রপৃষ্ঠে মানুষের সাফল্যপূর্ণ অবতরণের পর এক বিস্তৃততর কর্মসূচী নিয়ে অ্যাপোলো-১৩ মহাকাশ-যান গত ১২ই এপ্রিল ভারতীয় সময় রাত্রি ১২টা ৪৩ মিনিটে কেপ কেনেডি থেকে উৎক্ষিপ্ত হয়েছিল। স্থির ছিল, মহাকাশচারীরা এবার ফ্রা-মারো পার্বত্য অঞ্চলে অবতরণ করে পূর্ববর্তী দুটি অভিযানের তুলনায় দীর্ঘতর সময়ে বিবিধ বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান কর্মসূচী সম্পাদন করবেন। কিন্তু ১৩ই এপ্রিল মহাকাশচারীরা যখন চন্দ্র

অভিমুখে তাঁদের পথের তিন-চতুর্থাংশ অতিক্রম করেছেন, পৃথিবী থেকে যখন তাঁরা ৩,২৮,০০০ কিলোমিটার দূরে, ঠিক তখনই আকস্মিকভাবে চন্দ্রের পার্বত্য অঞ্চলে অবতরণের অভিযান বাতিল করতে হয়।

মূলযানের মধ্যে মহাকাশচারীরা একটা বিকট শব্দ শুনে দেখতে পান, সংলগ্ন সার্ভিস মডিউলের দুটি জালানী কোষ (Fuel cell) বিদীর্ণ হয়ে গেছে। ফলে মহাকাশযানের বিদ্যুৎ-শক্তি ও জল সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়। মহাকাশচারীরা জানিয়েছিলেন, তাঁরা মহাকাশযানের বাইরে একটা কিছু দেখেছেন। সেটি সম্ভবতঃ একটি ছোট উল্কা। এই উল্কাই হয়তো জালানী কোষের ট্যাঙ্ক বিদীর্ণ করে দিয়েছে।

জালানী কোষে হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেনের রাসায়নিক ক্রিয়ায় বিদ্যুৎ-শক্তির সৃষ্টি হয়। এই বিক্রিয়ায় জল এবং তাপ একই সঙ্গে উৎপন্ন হয়ে থাকে। মহাকাশযানে এই জল মহাকাশচারীদের পানীয় হিসাবে ব্যবহৃত হয়। উৎপন্ন তাপের কিছু অংশ জালানী কোষে পুনরায় চালিত করা হয় এবং বাকী অংশ রেডিয়েটরের মাধ্যমে মহাকাশে ছেড়ে দেওয়া হয়।

সোয়াইগার্ট তখন ছিলেন মূল যানে এবং লোভেল ও হেস ছিলেন চন্দ্রযানে। পৃথিবী থেকে নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রের নির্দেশে সোয়াইগার্ট জালানী কোষের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেন এবং পৃথিবীতে পুনঃপ্রবেশের জন্যে ব্যবহার্য তিনটি রাসায়নিক ব্যাটারীর সংযোগ ছিন্ন করেন। তাঁর সহযাত্রীরা তখন সুড়ঙ্গ পথটি উন্মুক্ত করে দেন, যাতে তাঁর দিকে অক্সিজেনের প্রবাহ অক্ষুণ্ণ থাকে।

এরপর সোয়াইগার্ট ব্যাটারীগুলির সংযোগ ছিন্ন করে অন্ধকারে ভেসে চললেন। পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তনের জন্যে ব্যাটারীগুলির শক্তিসঞ্চয়ের প্রয়োজন হয়েছিল। ১৪ই এপ্রিল হিউস্টনে নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রের সঙ্গে আলোচনার পর মহাকাশচারীরা ৩০ সেকেণ্ডের জন্যে চন্দ্রযানের ইঞ্জিনে অগ্নি সংযোগ করেন, যাতে মহাকাশযান চন্দ্রের চারদিকে একবার ঘুরে এবং চন্দ্রের অভিকর্ষ অতিক্রম করে পৃথিবীর পথে রওনা দিতে পারে। অগ্নি সংযোগের কাজ পরিকল্পনামত নিখুঁত হয়েছিল। মাঝপথে মহাকাশচারীদের পথের একটি সংশোধন করতে হয়

মহাকাশচারীরা চন্দ্রযানে লাইফবোট পদ্ধতিতে পৃথিবীর পথে আসেন। মূল যানে প্রবেশ না করা পর্যন্ত তাঁরা এইভাবে মহাশূন্যে পাড়ি দেন। পৃথিবীর আবহমণ্ডলে পুনঃপ্রবেশের আগে চন্দ্রযানটি বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়। কারণ আবহমণ্ডলে পুনঃপ্রবেশের সময় যে প্রচণ্ড উত্তাপ সৃষ্টি হয়, তা সহ্য করবার উপযোগী তাপরোধক আবরণ শুধু মূল যানেই থাকে।

যন্ত্রপাতি ঠিকমত কাজ করায় নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রের পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৭ই এপ্রিল মহাকাশচারীরা প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে নিরাপদে অবতরণ করেন।

মহাকাশচারীদের নিরাপদে পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তনের সাহায্যকল্পে সোভিয়েট রাশিয়া, বৃটেন, পশ্চিম জার্মেনী প্রভৃতি দেশ এগিয়ে এসেছিলেন। অবশ্য সাহায্যের প্রয়োজন হয় নি। অ্যাপোলো-১৩ মহাকাশযানের বিপর্যয়ে সারা পৃথিবীর মানুষের মনে উৎকণ্ঠা জেগেছিল এবং সকলেই সর্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করেছিলেন—মহাকাশচারীদের পৃথিবীতে নিরাপদ প্রত্যাবর্তন। এই অভিযানের আসল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হলেও জীবন-মরণের চরম সঙ্কটকালে মহাকাশচারীরা যে অসাধারণ ধৈর্য, স্থৈর্য ও অসীম সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন এবং নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রের শত সহস্র বিজ্ঞানী ও কর্মী অবিচলিত থেকে যে কর্তব্য সম্পাদন করেছেন, তা সকলেরই প্রশংসা অর্জন করেছে। মূল যানের বিপর্যয়ের মধ্যেও চন্দ্রযানের যন্ত্রপাতি যেভাবে সাফল্যের সঙ্গে কাজ করেছে, তা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার যে পরম কৃতিত্বের পরিচায়ক, সে কথা নিঃসংশয়ে বলা চলে।

বিজ্ঞপ্তি

১৯৫৬ সালের সংবাদপত্র রেজিষ্ট্রেশন (কেন্দ্রীয়) রুলের ৮নং ফরম অনুযায়ী বিবৃতি :—

১। যে স্থান হইতে প্রকাশিত হয়, তাহার ঠিকানা—বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, পি-২৩, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

২। প্রকাশনের কাল—মাসিক

৩। মুদ্রাকরের নাম, জাতি ও ঠিকানা—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, ভারতীয়, পি-২৩, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

৪। প্রকাশকের নাম, জাতি ও ঠিকানা—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, ভারতীয়, পি-২৩, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

৫। সম্পাদকের নাম, জাতি ও ঠিকানা—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য, ভারতীয়, পি-২৩, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

৬। স্বত্বাধিকারীর নাম ও ঠিকানা—বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, (বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান বিষয়ক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান), পি-২৩, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

আমি, শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, ঘোষণা করিতেছি যে, উপরিউক্ত বিবরণসমূহ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

স্বাক্ষর—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস
প্রকাশক—'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' মাসিক পত্রিকা

তারিখ—২৯-৪-৭০

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস কর্তৃক পি-২৩, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬ হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ ৩৭।৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের দ্বাবিংশ প্রতিষ্ঠা-বার্ষিকী অনুষ্ঠানের সভাপতি অধ্যাপক প্রিয়দারঞ্জন রায় (বাম দিক হইতে), প্রধান অতিথি শ্রীযতীন্দ্রচন্দ্র সেনগুপ্ত, বিজ্ঞান পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু ও কর্মসচিব ডক্টর জয়ন্ত বসু।

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

ত্রয়োবিংশ বর্ষ জুন, ১৯৭০ সংখ্যা

দ্বাবিংশ বার্ষিক প্রতিষ্ঠা-দিবসের নিবেদন

বিজ্ঞানের জ্ঞান ও ভাবধারার উপরেই আধুনিক জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য ও উন্নতি নির্ভর করে। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী এবং শিল্পসমৃদ্ধিই বৈষয়িক জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের সহায়ক। বিজ্ঞানের তাৎপর্য ও ভাবধারা জনগণের মধ্যে ছড়াইয়া দিতে হইলে মাতৃভাষাই সর্বোৎকৃষ্ট এবং সর্বাধিক কার্যকরী মাধ্যম—এই কথা আজ সর্বত্র স্বীকৃত।

মাতৃভাষার মাধ্যমে জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞান প্রসারের উদ্দেশ্যে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং নানাবিধ জনশিক্ষামূলক কার্যে নিয়োজিত আছে—এই কথা সকলেই অবগত আছেন, তথাপি প্রতিষ্ঠা-দিবস উপলক্ষে প্রতি বৎসরই আমরা জনসাধারণকে এই কথা স্মরণ করাইয়া দেওয়া কর্তব্য মনে করি। কারণ বিজ্ঞান পরিষদের উদ্দেশ্য সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তুলিবার জন্য দেশের সর্বস্তরের জনগণের অধিকতর সহযোগিতা ও সহানুভূতির একান্ত প্রয়োজন।

গত ২২শে মে '৭০ বিজ্ঞান পরিষদের দ্বাবিংশ প্রতিষ্ঠা-বার্ষিকী পালিত হয়। সেই অনুষ্ঠানের বিবরণ এই সংখ্যায় প্রকাশিত হইল। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিজ্ঞান পরিষদের কর্মধারার যে প্রসার হইতেছে, তাঁহার পরিচয় পাওয়া যাইবে 'কর্মসচিবের নিবেদনে'। বিজ্ঞানের বিবিধ শাখা ও বিজ্ঞান সম্পর্কিত কয়েকটি বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের মনোজ্ঞ রচনা এই সংখ্যায় সন্নিবেশিত হইয়া ইহার সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়াছে।

আপনাদের সকলের শুভেচ্ছা ও সহযোগিতায় বিজ্ঞান পরিষদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা অধিকতর সাফল্য-মণ্ডিত হইয়া উঠুক—ইহাই আমাদের কামনা।

মৌলিক পদার্থের পর্যায় সূত্র

শ্রীপ্রিয়দারঞ্জন রায়

আজ থেকে এক শতাব্দী পূর্বে (১৮৬৯ সনে) বিজ্ঞানী মেণ্ডেলিফ (Mendeleeff) রসায়ন-বিজ্ঞানের একটি প্রধান মূল বিধি, মৌলিক পদার্থের পর্যায় সূত্র (The Periodic Law of the Chemical Elements) প্রবর্তন করেন। ১৯৬৯ সনে বিজ্ঞানীরা এর শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান পালন করেছেন। আমাদের দেশেও ঐ সনের ৩০শে ডিসেম্বর তারিখে খড়্গপুরে শিল্পবিদ্যায়তনে

ডি. আই. মেণ্ডেলিফ

(Indian Institute of Technology) ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অব সায়েন্সের উদ্যোগে ভারতীয় রসায়ন-বিজ্ঞানীরাও এই শতবার্ষিকী উপলক্ষে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করেছিলেন। ঐ সভায় পঠিত ইংরেজী প্রবন্ধটির অবলম্বনে বর্তমান রচনাটির সৃষ্টি। এই পর্যায় সূত্রটির উদ্ভাবনের পশ্চাতে বহু মনীষীর অবদান অবিদিত নয়। কিন্তু এর সামগ্রিক পরিণতি, পরিপূর্ণ গঠন এবং প্রামাণ্য তথ্যের উপর নির্ভর করে অনাগত অ[illegible]ক্রিয়ার সকল উক্তির সাহায্যে তার প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছিল বিজ্ঞানী মেণ্ডেলিফের অসাধারণ প্রতিভা, সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি, ব্যাপক অভিজ্ঞতা ও দূরদর্শিতার ফলে। এই পর্যায় সূত্রের সত্যতার উপর নির্ভর করে তিনি যেসব ভবিষ্যদুক্তি করেছিলেন, তার অনেকগুলি তাঁর আপন জীবদ্দশাতেই সফলতা লাভ করে বিজ্ঞানীদের গবেষণায়।

ঊনবিংশ শতকের প্রারম্ভে প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ডালটন (Dalton) মিশ্র গ্যাসীয় পদার্থের ধর্ম ও গ্যাসীয় পদার্থের জলে দ্রবণীয়তার পরীক্ষার ফলে, আধুনিক পরমাণুবাদের প্রচার করেন। রাসায়নিক সংযোগবিধির (Laws of Chemical Combination) সহজ ব্যাখ্যা এতে সম্ভব হলো। কিন্তু বহুকাল যাবৎ বিভিন্ন জাতীয় পরমাণুর ভর ও তার সম্বন্ধে কোন নির্দিষ্ট জ্ঞান বিজ্ঞানীদের ছিল না এবং ফলে পরমাণুর বাস্তব সত্তা সম্বন্ধেও বহু বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস ছিল শিথিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর ষষ্ঠ দশকের শেষ ভাগে পরমাণুসমূহের ভর ও তাদের মান যখন ষ্টাস (Stas) প্রমুখ বিজ্ঞানীদের পরীক্ষায় ও ক্যানিৎজারো (Cannizzaro) কর্তৃক অ্যাভোগাড্রো (Avogadro) প্রবর্তিত প্রকল্পের এবং ডুলং ও পেটিটের (Dulong and Petit) বিধির প্রয়োগফলে সঠিকভাবে নির্ধারিত হলো, ডালটনের

পরমাণুবাদের ভিত্তি তখন সুপ্রতিষ্ঠিত হলো এবং পরমাণুর ভৌত অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস সুদৃঢ় হলো। ১৮৬৯ সনে পর্যায় সূত্র ও পর্যায় সারণীর (Periodic Table) প্রবর্তনে পরমাণুবাদের গুরুত্ব নূতন আলোকে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল। কারণ পরমাণুবাদ ও পর্যায় সূত্রকে আশ্রয় করে রসায়ন-বিজ্ঞানের বিচিত্র সৌধ গড়ে উঠেছে।

যাবতীয় উল্লেখযোগ্য বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের মত পর্যায় সূত্রেরও স্বকীয় ইতিহাস আছে—অর্থাৎ এর উৎপত্তি, বিকাশ ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা। মেণ্ডেলিফের পূর্ববর্তী অনেক বিজ্ঞানী কতিপয় মৌল গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত মৌলিক পদার্থের পরমাণু ভার ও ধর্মের মধ্যে বিশিষ্ট সম্বন্ধের অস্তিত্ব প্রদর্শন করে বিবরণী প্রকাশ করেন। এই প্রসঙ্গে ডোবেরেইনারের ত্রয়িক গোষ্ঠী (Dobereiner's triads—1829), দ্য সাঁকোর্তোয়ার সর্পিল বাঁক (de Chancourtois' helix—1863), নিউল্যাণ্ডের অষ্টক (Newland's octaves—1865), এবং পেটেনকোফের (Pettenkofer—1850), গ্লাডষ্টোন (Gladstone—1853), অড্‌লিং (Odling—1857), ষ্ট্রেকার (Strecker—1859) প্রভৃতি বিজ্ঞানীদের গবেষণা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মেণ্ডেলিফের পর্যায় সূত্রের প্রবর্তনের অগ্রবর্তী পথপ্রদর্শক হিসাবে এঁদের গণ্য করা যেতে পারে। ১৮৮৯ সনে মেণ্ডেলিফ তাঁর ফ্যারাডে স্মারক ভাষণে নিজেই বলেছেন—'ষ্ট্রেকার, দ্য সাঁকোর্তোয়া এবং নিউল্যাণ্ড পর্যায়-সূত্রের সন্ধানে অগ্রসর হয়ে তার বীজের আবিষ্কারে সক্ষম হয়েছেন।' কিন্তু তাঁদের প্রচেষ্টা বিচ্ছিন্ন ও আংশিক ছিল এবং তাঁদের দৃষ্টি ছিল সঙ্কীর্ণ ও সীমাবদ্ধ। ফলে, সকল মৌলিক পদার্থকে সমীক্ষণ করে পর্যায় সূত্রের একটি সামগ্রিক রূপায়ণ তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয় নি। বহু আপাত বিচিত্র রকমের মৌলিক পদার্থের মধ্যে এক অন্তর্নিহিত ঐক্য ও অলঙ্ঘনীয় নিয়মের বাঁধনের আবিষ্কার হচ্ছে এক্ষেত্রে মেণ্ডেলিফের অসাধারণ প্রতিভা ও গভীর তীক্ষ্ণদৃষ্টির পরিচায়ক। তিনি এর নাম দেন পর্যায় সূত্র বা পর্যাবৃত্ত বিধি। এর ফলে আপাত অসংলগ্ন বিচিত্র বস্তুজগতে ধরা পড়েছে এক অপূর্ব শৃঙ্খলা এবং রসায়ন-বিজ্ঞানে গড়ে উঠেছে এক পরিপূর্ণ ব্যবস্থা ও সংহতি। রাসায়নিক মৌলগুলি যে প্রকৃতির রাজ্যে আকস্মিক তথ্য নয়—তারই প্রমাণ মেলে এই পর্যায় সূত্রে।

বহু পর্যবেক্ষণের ফলে মেণ্ডেলিফ সিদ্ধান্ত করলেন যে, বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের মধ্যে তাদের সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্যের সূচক হিসাবে একটি প্রকৃতিগত সার্বজনীন ধর্ম আছে এবং পদার্থের পারমাণবিক ভর হচ্ছে এই ধর্মের নিদর্শন। এই পারমাণবিক ভর বা ভার প্রত্যেক মৌলিক পদার্থের একটি স্বকীয়, সকল অবস্থাতে অপরিবর্তনীয় ধর্ম। এই সিদ্ধান্তকেই ভিত্তি করে মেণ্ডেলিফ তাঁর পর্যায় সূত্র বিধিবদ্ধ ও প্রচার করেন। তাঁর রচিত 'রসায়নের তত্ত্বকথায়' পর্যায় সূত্রের যে উক্তি আছে, তা এখানে উদ্ধৃত করা হলো।

'মৌলের ধর্ম এবং তাদের যৌগিকের আকার, প্রকার ও ধর্ম, পদার্থের পারমাণবিক ভারের উপর পর্যাবৃত্তভাবে নির্ভর করে বা ঐ ভারের পর্যাবৃত্ত অপেক্ষক।'

যাবতীয় জানা মৌলিক পদার্থকে মেণ্ডেলিফ তাদের পারমাণবিক ভারবৃদ্ধি অনুসারে শ্রেণীবদ্ধ করে সজ্জিত করেন—যাতে সমধর্মী মৌলিক পদার্থগুলি গোষ্ঠীবদ্ধভাবে একই স্তম্ভে স্থান পায়। এ-থেকে সৃষ্টি হয়েছে পর্যায় সারণী। দুই প্রকারের পর্যায় সারণী প্রচলিত—হ্রস্ব এবং দীর্ঘ। রসায়ন-বিজ্ঞানের যে কোন পাঠ্যপুস্তকে এ-সব পর্যায় সারণীর চিত্র ও বিবরণী আছে। এখানে তাদের বিস্তৃত আলোচনা অনাবশ্যক। তথাপি

এ-প্রসঙ্গে পর্যায় সারণীর প্রয়োগের কয়েকটি অপূর্ব ও অসাধারণ কীর্তিকাহিনীর বিবরণ দেওয়া অসঙ্গত হবে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখনীয়—মেণ্ডেলিফ কর্তৃক পর্যায় সারণীর কয়েকটি রিক্ত স্থানে অবস্থিতির উপযোগী অনাবিষ্কৃত মৌলের ধর্মাবলীর বিবরণ ও পরবর্তীকালে তাদের আবিষ্কার; যথা, ১৮৭৯ সনে নিলসন (Nilson) কর্তৃক স্ক্যান্ডিয়াম (Scandium) বা একাবোরনের (Eka-boron) আবিষ্কার; ১৮৭৫ সনে লেকক্ দ্ বোয়াবদ্রেঁা (Lecoq de Boisbaudran) কর্তৃক গ্যালিয়াম বা একালুমিনিয়াম (Gallium—Eka-aluminium) ধাতুর আবিষ্কার; ১৮৮৬ সনে ভিন্‌ক্লার (Winkler) কর্তৃক জারমেনিয়াম বা একাসিলিকন (Germanium—Eka-silicon) ধাতুর আবিষ্কার, ইণ্ডিয়াম (Indium) ধাতুর পারমাণবিক ভারের সংশোধন (১১৪·৮ এবং ৭৬·০ নয়); বেরিলিয়াম (Beryllium) ধাতুর পারমাণবিক ভারের সংশোধন (৯·০ এবং ১৩·৫ নয়) এবং ইউরেনিয়াম (Uranium) ধাতুর পারমাণবিক ভারের সংশোধন (২৩৮·০ এবং ১২০ নয়); কতিপয় নূতন মৌলের আবিষ্কার—বিশেষতঃ আরগন (Argon) গোষ্ঠীর বিরল গ্যাসসমূহ; মৌলের মধ্যে বহু অজ্ঞাত সম্বন্ধের অবগতি ইত্যাদি।

মেণ্ডেলিফের পর্যায় সারণী প্রকাশের কয়েক মাস পরে লোথার মায়ার (Lothar Meyer) ১৮৭০ সনে তাঁর উদ্ভাবিত পর্যায় সারণী ও মৌলের পারমাণবিক আয়তনের রেখাচিত্র প্রকাশ করেন। এই পর্যায় সারণীর সঙ্গে মেণ্ডেলিফের পর্যায় সারণীর নিকট সাদৃশ্য দেখা যায় ও তাঁর পারমাণবিক আয়তনের রেখাচিত্রে পর্যাবৃত্তির পরিস্ফুট দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

মেণ্ডেলিফের পর্যায় সারণীতে কতিপয় ত্রুটি-মূলক ও দুরূহ মৌলাবস্থান পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু বর্তমানে পরমাণুর গঠন ও বিসমভারের সমধর্মী পরমাণুর (Isotopes) আবিষ্কারের পর পর্যায় সারণীর এ-সব ত্রুটি ও জটিলতা দূরীভূত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায়—পটাসিয়ামের (Potassium—39·0) আগে আরগনের (Argon—40·3) অবস্থান, নিকেলের (Nickel—58·69) আগে কোবাল্টের (Cobalt—58·94) অবস্থান,

লোথার মায়ার

আয়োডিনের (Iodine—126·9) আগে টেলুরিয়ামের (Tellurium—127·6) অবস্থান। বিরল মৃৎ মৌলসমূহ (Rare earth elements) এবং মাধ্যমিক মৌলিক পদার্থসমূহের (Transition elements) অবস্থান। হাইড্রোজেন (Hydrogen) মৌলের অবস্থানও মেণ্ডেলিফের পর্যায় সারণীর একটি দুরূহ সমস্যা।

মৌলসমূহের মধ্যে পর্যাবৃত্ত-সম্বন্ধ-নির্দেশক পর্যায়সূত্রের আবিষ্কার ও প্রচারের ফলে, এই সূত্রের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা ও ভিত্তি সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন অস্বাভাবিক নয়। অভিব্যক্তির

প্রক্রিয়ায় বিচ্ছিন্নভাবে বিচিত্র রকমের মৌলের সৃষ্টির পশ্চাতে কোন একটি বিশেষ যোগসূত্রের প্রভাব এ-থেকে সহজে অনুমান করা যায়। যাবতীয় মৌল যে একই অন্তিম উপাদানে গঠিত, এ-তত্ত্বের সমর্থন মিলে পর্যায়সূত্রে। এই অন্তিম উপাদান ধারণা প্রাচীন যুগ থেকে চলতি আছে। গ্রীক দার্শনিক অ্যারিষ্টোটেলকে (Aristotle) এর প্রবর্তক বলা যায়। তিনি এই অন্তিম উপাদানের নাম দিয়েছিলেন হ্যুলে (hule or materia prima)। পুরাকালের জাদুকরী-রসায়ন কর্মীদের (Alchemists) মধ্যেও এ-ধারণা প্রবল ছিল। পরবর্তী কালে (১৮১৬ সনে) বিজ্ঞানী প্রাউটও (Prout) তাঁর উদ্ভাবিত প্রকল্পে এ-ধারণার প্রচার করেন। প্রাউটের মতে হাইড্রোজেন পরমাণুর ঘন সমাবেশে যাবতীয় মৌল পরমাণু গঠিত হয়েছে। কিন্তু যেহেতু বহু মৌলের পরমাণুর ভার হাইড্রোজেন পরমাণুর ভারের (H=1) পূর্ণ গুণক নয়, প্রাউটের প্রকল্প বাতিল হয়ে গেল। বিজ্ঞানী ক্রুক্সও (Crooks) ১৮৮৬ সনে তাঁর আবিষ্কৃত ক্যাথোড রশ্মিকে মৌলের অন্তিম উপাদান হিসাবে গণ্য করেন এবং তার নাম দিয়েছিলেন প্রোটাইল (Protyle)। অতি ক্ষীণ চাপের গ্যাসীয় পদার্থের মধ্যে বিদ্যুৎ প্রবাহ পরিচালিত করলে এই ক্যাথোড রশ্মির উৎপত্তি হয়। ক্রুক্স একে পদার্থের চতুর্থ অবস্থা বলেও বর্ণনা করেছেন। পরে বিজ্ঞানী জে, জে, টমসন (J. J. Thomson) এ-রশ্মিকে ইলেকট্রনের সমষ্টি বলে প্রমাণ করেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় মেণ্ডেলিফ স্বয়ং এই অন্তিম উপাদানের ধারণার সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন। কেন না মেণ্ডেলিফের জীবদ্দশায় এর কোন পরীক্ষামূলক প্রমাণ ছিল না। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে বিজ্ঞানী টমসন (Thomson), রাদারফোর্ড (Rutherford), মোজ্‌লে (Moseley), অ্যাষ্টন (Aston), বয়র (Bohr), সমারফেল্ড্ (Sommerfeld), ড ব্রগ্‌লি (de Broglie), শ্রোডিংগার (Schroedinger), হাইসেনবার্গ (Heisenberg), বর্ন্ (Born) প্রভৃতি বিজ্ঞানীদের অপূর্ব গবেষণার ফলে পদার্থ-বিজ্ঞানের যে বিস্ময়কর উন্নতি ঘটে, তাতে মৌল পরমাণুর গঠন ও অভিব্যক্তি সম্বন্ধে সাধারণের ধারণা ওলটপালট হয়ে গেছে। এর ফলে, পর্যায় সূত্রের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা বা ভাষ্য সহজ হয়েছে।

আধুনিক পরমাণুবাদের সিদ্ধান্ত মতে প্রত্যেক পরমাণুর একটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র হাঁ-ধর্মী তড়িতে আহিত কেন্দ্রবস্তু (Nucleus) থাকে। কেন্দ্রবস্তু প্রোটন ও নিউট্রনের ঘন সন্নিবেশে গঠিত (হাইড্রোজেন পরমাণু ব্যতিরেকে—যার কেন্দ্রবস্তু মাত্র একটি প্রোটনে গঠিত; গুরুভার (Heavy) হাইড্রোজেন পরমাণুর কিন্তু এরূপ কোন বিশেষত্ব নাই)। কেন্দ্রবস্তুটির চতুর্দিকে কেন্দ্রের তড়িৎ আধানের সমান সংখ্যক ইলেকট্রন (না-ধর্মী তড়িৎকণা) বিভিন্ন শক্তিমান (Quantized) ও বিভিন্ন আকারের স্তরে (Orbitals) প্রচণ্ড বেগে ঘোরাফেরা করে। স্তরের শক্তিসংখ্যার থেকে (Quantum number) ইলেকট্রনের শক্তি-বৈষম্যের পরিচয় মিলে। পরমাণুতে বর্তমান ইলেকট্রনের সংখ্যাকে পারমাণবিক সংখ্যা বলা হয় (Atomic number) বলা হয়। ১৯১৩ সনে বিজ্ঞানী মোজ্‌লে বিভিন্ন মৌল পরমাণুর পারমাণবিক সংখ্যা নির্ণয় করেন। পরমাণুর ভার থাকে কেন্দ্রবস্তুতে নিহিত, বহিঃস্থ ইলেকট্রনসমূহের ভার একপ্রকার নগণ্য। একটি ইলেকট্রনের ভার হচ্ছে একটি প্রোটন বা নিউট্রনের ভারের মোটামোটি ১৮৫০ ভাগের একভাগ মাত্র। পরমাণুর ভৌত, রাসায়নিক ও তৈজস (Spectral) ধর্মের জন্তে বহিঃস্থ ইলেকট্রনই একমাত্র দায়ী। কেন্দ্রবস্তুতে প্রোটনের সংখ্যা নির্দিষ্ট রেখে নিউট্রনের সংখ্যা কম বেশী হলে বিসম ভারের সমধর্মী বিভিন্ন পরমাণুর সৃষ্টি হয়। এদের এক-

TRANSITIONAL ELEMENTS (IIIA – IB)

IA	IIA	IIIA	IVA	VA	VIA	VIIA	VIII	VIII	VIII	IB	IIB	IIIB	IVB	VB	VIB	VIIB	INERT GASES
1.008 H 1																	4.003 He 2
6.940 Li 3	9.013 Be 4											10.82 B 5	12.010 C 6	14.008 N 7	16 O 8	19.00 F 9	20.183 Ne 10
22.997 Na 11	24.32 Mg 12											26.98 Al 13	28.09 Si 14	30.975 P 15	32.066 S 16	35.457 Cl 17	39.944 A 18
39.100 K 19	40.08 Ca 20	44.96 Sc 21	47.90 Ti 22	50.95 V 23	52.01 Cr 24	54.93 Mn 25	55.85 Fe 26	[illegible] Co 27	58.69 Ni 28	63.54 Cu 29	65.38 Zn 30	69.72 Ga 31	72.60 Ge 32	74.91 As 33	78.96 Se 34	79.916 Br 35	83.80 Kr 36
85.48 Rb 37	87.63 Sr 38	88.92 Y 39	91.22 Zr 40	92.91 Nb 41	95.95 Mo 42	(99) Tc 43	101.7 Ru 44	102.91 Rh 45	106.7 Pd 46	107.88 Ag 47	112.41 Cd 48	114.76 In 49	118.70 Sn 50	121.76 Sb 51	127.61 Te 52	126.91 I 53	131.3 Xe 54
132.91 Cs 55	137.36 Ba 56	138.92 La 57	178.6 Hf 72	180.88 Ta 73	183.92 W 74	186.31 Re 75	190.2 Os 76	193.1 Ir 77	195.23 Pt 78	197.2 Au 79	200.61 Hg 80	204.39 Tl 81	207.2 Pb 82	209.00 Bi 83	210 Po 84	(210) At 85	222 Rn 86
(223) Fr 87	226.05 Ra 88	227 Ac 89															

Series														
Lanthanide Series	140.13 Ce 58	140.92 Pr 59	144.27 Nd 60	(145) Pm 61	150.43 Sm 62	152.0 Eu 63	156.9 Gd 64	159.2 Tb 65	162.46 Dy 66	164.94 Ho 67	167.2 Er 68	169.4 Tm 69	173.04 Yb 70	174.99 Lu 71
Actinide Series	232.12 Th 90	231 Pa 91	238.07 U 92	(237) Np 93	(242) Pu 94	(243) Am 95	(243) Cm 96	(245) Bk 97	(246) Cf 98	99	100	101	102	103

পর্যায় সারণীর চিত্র

স্থানিক পরমাণু (Isotopes) বলা হয়। টমসন ও অ্যাস্টন প্রমুখ বিজ্ঞানীদের পরীক্ষায় এদের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া গেছে। এসব একস্থানিক পরমাণুসমূহের অবগতি এবং বিভিন্ন পরমাণুর কেন্দ্র-বস্তুর বহিপ্র্দেশে বিভিন্ন শক্তিমান স্তরে ইলেকট্রন সমাবেশের গঠন-বৈশিষ্ট্যের অভিজ্ঞতা থেকে পর্যায় সূত্রের এবং পর্যায় সারণীর সহজ ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। পরমাণু কেন্দ্রের বহির্দেশে ইলেকট্রন সমাবেশের এই গঠন-বৈশিষ্ট্যকে ভিত্তি করে টমসন ও বয়র যে পর্যায় সারণী গঠনের প্রস্তাব করেছেন, তাই এখন সর্বত্র গৃহীত ও প্রচলিত হয়েছে। এটি মেণ্ডেলিফের দীর্ঘাকার পর্যায় সারণীর অনুরূপ, অথচ এতে কোন প্রকার ত্রুটি বা অসঙ্গতি দেখা যায় না। মেণ্ডেলিফের পর্যায় সারণী ও টমসন-বয়রের পর্যায় সারণীর মধ্যে প্রভেদ হচ্ছে যে, প্রথমোক্ত সারণীর পারমাণবিক ভারের পরিবর্তে শেষোক্ত সারণীতে পারমাণবিক সংখ্যার (কেন্দ্রবস্তুর তড়িৎ আধান সংখ্যা বা কেন্দ্রের পরিবেশে ইলেকট্রনের সংখ্যা) বৃদ্ধি অনুসারে মৌলসমূহকে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে। কারণ, পারমাণবিক ভার থেকে পারমাণবিক সংখ্যা হচ্ছে মৌল পরমাণুর অধিকতর অপরিবর্তনীয় ও নির্ভরশীল ধর্ম। তাই রসায়ন-বিজ্ঞানের ভিত্তিমূলক এই ব্যাপক পর্যায় সূত্রের বর্তমান সংজ্ঞা হচ্ছে—'মৌলিক পদার্থের ধর্ম হচ্ছে তাদের পারমাণবিক সংখ্যার পর্যাবৃত্ত অপেক্ষক'। কেননা পারমাণবিক সংখ্যা মৌলিক পদার্থের একটি অব্যর্থ সাঙ্কেতিক পরিচয়। আধুনিক পর্যায় সারণীর চিত্র দ্রষ্টব্য (৩২৬ পৃঃ)।

পারমাণবিক সংখ্যানুসারে নিরূপিত আধুনিক পর্যায়সারণীতে আয়োডিনের (পা-সংখ্যা, ৫৪) আগে টেলুরিয়ামের (পা-সংখ্যা, ৫৩), নিকেলের (পা-সংখ্যা, ২৮) আগে কোবাল্টের (পা-সংখ্যা ২৭), পটাশিয়ামের (পা-সংখ্যা, ১৯) আগে আরগনের (পা-সংখ্যা, ১৮), এবং প্রটো-অ্যাক্টিনিয়ামের (Protoactinium পা-সংখ্যা, ৯১) আগে থোরিয়ামের (পা-সংখ্যা ৯০) অবস্থানে কোনপ্রকার অসঙ্গতি নেই। পারমাণবিক ভার অনুসারে গঠিত মেণ্ডেলিফের পর্যায় সারণীতে এদের অবস্থানের অসঙ্গতির কথা পূর্বে বলা হয়েছে। এ-সব মৌলের একাধিক বিভিন্ন ভারের সমধর্মী পরমাণুর অস্তিত্ব হেতু এ-অসঙ্গতি দেখা দেয়। পর্যায় সারণীতে মাধ্যমিক মৌলিক পদার্থ এবং বিরল মৃৎ মৌলসমূহের সংখ্যানুক্রমিক অবস্থানও আধুনিক পরমাণুবাদের সিদ্ধান্ত অনুসারে সহজে ও সঙ্গতভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। অভিব্যক্তি প্রক্রিয়ায় এদের পরমাণুর বেলায় যথাক্রমে ১৮ এবং ৩২ ইলেকট্রনে, পরিপূর্ণ কেন্দ্রবহিঃস্থ ইলেকট্রন কোষের সৃষ্টি হয়। অ্যাক্টিনাইড শ্রেণীর (Actinide series) মৌলের অভিব্যক্তি এবং পর্যায় সারণীতে তাদের অবস্থানের সঙ্গতির বেলাতেও আধুনিক ব্যবস্থায় কোন সমস্যা ওঠে না। অধিকন্তু, প্রবল হা-বিদ্যুৎধর্মী ক্ষারধাতু মৌলের অব্যবহিত পূর্বে নিষ্ক্রিয় গ্যাস মৌলের মধ্যবর্তিতায় প্রবল না-বিদ্যুৎধর্মী হ্যালোজেন পদার্থসমূহের পর্যায় সারণীতে অবস্থান, তাদের পরমাণুতে ইলেকট্রন সমাবেশের গঠন থেকে সহজেই বোঝা যায়।

১৯২৩ সনে কোষ্টার (Coster) ও হেভিসি (Hevesy) কর্তৃক হাফ্নিয়াম (Hafnium-72) ধাতুর এবং ১৯২৫ সনে নোডাক (Noddac), টাকে (Tacke) ও বার্গ (Barg) কর্তৃক রিয়্যাক্তানিজ বা রেনিয়াম (Rhenium-75)-এর আবিষ্কার এবং পর্যায় সারণীতে তাদের যথাযথ অবস্থানের মূলে ছিল পর্যায় সূত্রের প্রেরণা, এ-কথা বললে অত্যুক্তি হবে না।

মৌল পরমাণুসমূহের ঊর্ধ্বতম স্তরের ইলেকট্রন (Valency electrons—যোজনধর্মী ইলেকট্রন) সমাবেশের গঠনের উপর তাদের

ভৌত, রাসায়নিক ও আলোকবিকিরণ ধর্ম নির্ভর করে; ইলেকট্রন সমাবেশের এ-সব গঠন-বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন মৌলের পারমাণবিক সংখ্যার উপর পর্যাবৃত্তভাবে নির্ভর করে। এ-কারণে দেখা যায় যে, লোথার মায়ারের (Lothar Meyer) পারমাণবিক আয়তনের রেখাচিত্রের অনুরূপ রেখাচিত্র বিভিন্ন পরমাণুর অন্তবিধ বহু ভৌত ধর্মের বেলাতেও আঁকা যায়। দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখযোগ্য ধর্ম হচ্ছে—তাপ প্রয়োগে মৌলের প্রসারণ, তাপ ও তড়িৎ পরিবাহিতা, চৌম্বকধর্ম, গলনাঙ্ক, স্ফুটনাঙ্ক, প্রতিসরাঙ্ক (Refractive index), দানার গঠন, সঙ্কোচনীয়তা, কাঠিন্য, প্রসারণশীলতা (Malleability), গলনের ফলে আয়তনের পরিবর্তন, নিম্ন উষ্ণতায় পারমাণবিক তাপ, কঠিন অবস্থায় পারমাণবিক স্পন্দনসংখ্যা, ধাতব পদার্থের তড়িৎদ্বারের বিভব, ধাতব পদার্থের অতিবিভব, অক্সাইড ও ক্লোরাইডের সৃষ্টিতাপ, ক্লোরাইডের গলনাঙ্ক, লবণজাতীয় পদার্থের দ্রবের বর্ণ এবং সান্দ্রতা, আয়নের চলনশীলতা, যোজন সংখ্যা, বর্ণালীরেখার বিন্যাস, প্রকৃতিতে মৌলের পরিমাণের ভেদাভেদ ইত্যাদি।

বিভিন্ন মৌলের পরমাণুতে ইলেকট্রন সমাবেশের গঠন-বিন্যাস ও আধুনিক পর্যায় সারণীতে তাদের অবস্থান থেকে যাবতীয় মৌলকে চার শ্রেণীতে ভাগ করা যায়: (i) বিরল বা নিষ্ক্রিয় গ্যাসসমূহ, যাদের পরমাণুর উর্ধ্বতম কোষ আটটি ইলেকট্রনে ভর্তি থাকে (হিলিয়াম গ্যাস ব্যতীত—এর পরমাণুর বেলায় থাকে মাত্র দুটি ইলেকট্রন); (ii) মুখ্য মৌল, যাদের পরমাণুর উর্ধ্বতম স্তরে পর পর এক থেকে সাতটি ইলেকট্রন ভর্তি হতে পারে; (iii) মাধ্যমিক মৌল, যাদের আভ্যন্তরিক d-স্তর ক্রমশঃ ইলেকট্রনে ভর্তি হতে থাকে, (iv) অন্তর্নিহিত মাধ্যমিক মৌল, যাদের পরমাণু কেন্দ্রের ইলেকট্রন বেষ্টনীর গভীর প্রদেশের f-স্তর ক্রমশঃ ইলেকট্রনে ভর্তি হতে থাকে।

পর্যায় সারণীতে হাইড্রোজেনের অবস্থানে বিশেষত্ব আছে। হাইড্রোজেন পরমাণু অবস্থা বিশেষে ইলেকট্রন দাতা, ইলেকট্রন গ্রহীতা কিম্বা ইলেকট্রন অংশীদার হিসাবে অন্তবিধ পরমাণুর সঙ্গে রাসায়নিক সংযোগ সাধন করতে পারে। অর্থাৎ হাইড্রোজেন পরমাণু অবস্থাবিশেষে আয়নিক ও সমযোজক উভয় প্রকার যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি করতে পারে।

বিরল বা নিষ্ক্রিয় গ্যাস পরমাণুর (হিলিয়াম ব্যতীত) উর্ধ্বতম স্তরে ইলেকট্রনের বিন্যাস হচ্ছে $ns^2.np^6$; অর্থাৎ n-শক্তিসংখ্যক ইলেকট্রন কোষের অন্তর্গত s ও p স্তর যথাক্রমে দুই ও ছয় ইলেকট্রনে সম্পূর্ণ ভর্তি থাকে। ইলেকট্রন কোষ n এর সংখ্যা বিবেচ্য মৌলের পর্যায় সারণীতে অবস্থানের সারির সংখ্যার সঙ্গে অভিন্ন। এসব পরমাণুর উর্ধ্বতম ইলেকট্রন স্তর ইলেকট্রনে সম্পূর্ণ ভর্তি থাকবার দরুন এরা সাধারণতঃ সক্রিয় নয়। কিন্তু এ-জাতীয় গুরুভার মৌলের—ক্রিপ্টন, যিনন ও রেডন—পরমাণুগুলি অক্সিজেন ও ক্লোরিন পরমাণুর সঙ্গে সহজে রাসায়নিক সংযোগে মিলিত হয়ে বিবিধ যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি করতে পারে।

মুখ্য মৌলের উর্ধ্বতম বা যোজক ইলেকট্রন কোষে ইলেকট্রনের বিন্যাস তাদের পারমাণবিক সংখ্যানুযায়ী ns^1 থেকে $ns^2.np^6$ অবধি নির্দিষ্ট হতে পারে। পর্যায় সারণীর (I-VII)A স্তম্ভের (Group) ও (I-II)B স্তম্ভের অন্তর্গত যাবতীয় মৌল এ শ্রেণীর অন্তর্গত।

মাধ্যমিক মৌলসমূহের পরমাণুতে বহিঃপ্রদেশের ইলেকট্রন বিন্যাসের সঙ্কেত হচ্ছে, $(n-1)d^{1-9}.ns^2$। উর্ধ্বতম পরমাণুকোষ n-এর শক্তিসংখ্যা অনুযায়ী চার জাতীয় মাধ্যমিক

মৌলের অস্তিত্ব দেখা যায়, যাদের পরমাণুতে $3d$, $4d$, $5d$ এবং $6d$ স্তর ক্রমশঃ ইলেকট্রনে ভর্তি হয়ে উঠতে পারে। এ-চারজাতীয় মৌলের সৃষ্টি সুরু হয় স্ক্যানডিয়াম (21), ইট্রিয়াম (39), লনথেনাম (57), অ্যাক্টিনিয়াম (89) থেকে, এবং শেষ হয় যথাক্রমে নিকেল (28), প্যালেডিয়াম (46) ও প্ল্যাটিনাম (78) মৌলে। মাধ্যমিক মৌলের যৌগ পদার্থে পরস্পর বিশেষ সাদৃশ্য দেখা যায়। এরা সবাই ধাতুজাতীয়, এদের যোজন-সংখ্যা স্থির থাকে না এবং এরা রঙীন লবণের উৎপত্তি করে।

অন্তর্নিহিত মাধ্যমিক মৌলসমূহ মাধ্যমিক মৌল শ্রেণীর আদিভাগে নিজেরা একটি স্বতন্ত্র গোষ্ঠী সৃষ্টি করে। এদের পরমাণুর ইলেকট্রন বিন্যাস প্রকাশের সংকেত হচ্ছে—

$(n-2)f^{1-13}. (n-1)s^2. (n-1)p^6. (n-1)d^1. ns^2$. এদের প্রথম গোষ্ঠীর সুরু হয় সিরিয়াম (58) থেকে এবং শেষ হয় ইটারবিয়ামে (70); লনথেনাম (57) ও লিউটিসিয়ামকে (71) নিয়ে এদের সাধারণ নাম হচ্ছে লনথেনাইড্স বা বিরল মৃৎ। এ-জাতীয় মৌলের দ্বিতীয় গোষ্ঠীর সুরু হয় থোরিয়াম (90) থেকে এবং যাবতীয় ইউরেনিয়াম পরবর্তী মৌল (Transuranic element) হচ্ছে এর অন্তর্ভূত। এ-গোষ্ঠীর সাধারণ নাম হচ্ছে অ্যাক্টিনাইড্স।

মেণ্ডেলিফের পর্যায় সারণীর প্রকাশের পর থেকে সুরু করে অনেক রসায়ন-বিজ্ঞানী নূতন পর্যায় সারণীর নকশা প্রস্তাব করেছেন, যথা—দ্বিমাত্রিক, ত্রৈমাত্রিক, আয়তক্ষেত্রাকার, বৃত্তাকার, সর্পিল, চোঙাকার রেখাচিত্রের পর্যায় সারণী। কিন্তু এদের কোনটিই টমসন-বয়রের পর্যায় সারণীর চেয়ে কোন অংশে অধিক সুবিধাজনক নয়।

পর্যায় সূত্র ও পর্যায় সারণী মেণ্ডেলিফের নামের সঙ্গে চিরকালের জন্যে যুক্ত থাকবে রসায়ন-বিজ্ঞানের একটি প্রধান ভিত্তিরূপে ডাল্টনের পরমাণুবাদের সাহচর্যে—এ-কথা মানতে হবে। একথাও মানতে হবে যে, পদার্থের অন্তিম উপাদান সম্বন্ধে গবেষণার প্রবল প্রেরণা এসেছে পর্যায় সূত্র থেকে, যার ফলে আধুনিক পরমাণুবাদ গড়ে উঠেছে। বিজ্ঞানের ইতিহাসে ডাল্টনের ও মেণ্ডেলিফের নাম তাই রসায়নের প্রতিষ্ঠাতাদের অগ্রণী হিসেবে অমর হয়ে থাকবে।

টিস্যু কালচার

তারকমোহন দাস ও মনোজকুমার সাধু*

টিস্যু কালচার বিষয়ক গবেষণার ইতিহাস

টিস্যু কালচার কথাটির সঙ্গে আমাদের সকলেরই অল্পবিস্তর পরিচয় আছে। প্রাণী বা উদ্ভিদদেহ থেকে ক্ষুদ্র কিছু অংশ জীবিত অবস্থায় বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে কৃত্রিম খাদ্যের মাধ্যমে নির্বীজিত অবস্থায় পালনের নাম টিস্যু কালচার। টিস্যু কালচার বিষয়ক গবেষণার ইতিহাস তিনটি যুগে বিভক্ত। প্রথম যুগ হলো ১৮৩৯ সালের আগে পর্যন্ত, দ্বিতীয় যুগ ১৮৩৯-১৯০২ সাল এবং তৃতীয় যুগ বা আধুনিক যুগ ১৯০২ সাল থেকে আজ পর্যন্ত। জীবকোষ সম্বন্ধে মানুষের ধারণা বহু প্রাচীন। প্রকৃতপক্ষে খৃষ্টপূর্ব ৩২০-৩৬০ সালে থিওফ্রাস্টাস এবং অ্যারিস্টোটল বলেন যে, জীবদেহ রক্ত বা রস, মাংস, স্নায়ু, শিরা এবং অস্থির দ্বারা নির্মিত। অণুবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কৃত না হওয়া পর্যন্ত সাধারণ মানুষের—এমন কি, বৈজ্ঞানিকদের মধ্যেও উপরি-উক্ত ধারণাই প্রচলিত ছিল। ১৬৬৭ সালে রবার্ট হুক্ প্রাচীন ধরণের অণুবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে সর্বপ্রথম দেখান যে, গাছের ছাল ও পিথ-টিস্যু মৌমাছির চাকের মত অসংখ্য অতি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠের সমষ্টি তিনি ঐ প্রকোষ্ঠগুলির নাম দেন সেল বা কোষ। এই আবিষ্কারের প্রায় দেড়-শ' বছর পর কোষের মধ্যে নিউক্লিয়াস ও প্রোটোপ্লাজমের অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হয়। উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহ যে অসংখ্য কোষের সমষ্টি এবং প্রতিটি কোষের যে পৃথক সত্তা বিদ্যমান, তা সর্বপ্রথম মানুষের গোচরে আনেন শ্লাইডেন ও সোয়ান (১৮৩৯)। তথাপি ১৮১৮ সালের আগে পর্যন্ত টিস্যু কালচার সম্বন্ধে কোন উল্লেখযোগ্য গবেষণা হয় নি। ভোকৃনিং (১৮১৮, ১৮৮৪ ও ১৮৯২) উদ্ভিদের ছোট ছোট খণ্ড নিয়ে তাদের পোলারিটি (Polarity) সম্বন্ধে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। তিনি লক্ষ্য করেন যে, মাটি থেকে কাণ্ডের দূরবর্তী অংশে (Distal) সব সময় পাতা ও নিকটবর্তী (Proximal) অংশে মূল উদ্ভূত হয়। অনুরূপভাবে প্রাণী-দেহ থেকে টিস্যু নিয়েও গবেষণা সুরু হয়। রোক্স (১৮৮৫) মুরগীর বাচ্চার দেহ থেকে মেডুলারি প্লেট (Medullary plate) পৃথক করে লবণাক্ত জলে কয়েক দিন বাঁচিয়ে রাখেন। প্রাণী ও উদ্ভিদ-টিস্যু নিয়ে কয়েকজন বিজ্ঞানী কিছু কিছু গবেষণা করলেও জীবদেহ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় সর্বপ্রথম টিস্যু কালচার করেন হ্যাবেরল্যান্ট (১৯০২), তাই তাঁকে আধুনিক টিস্যু কালচারের পথিকৃৎ বলা যেতে পারে। হ্যাবেরল্যান্টের পরবর্তী বৈজ্ঞানিকেরা প্রধানতঃ শর্করাজাতীয় খাদ্য ও নানা রকম পুষ্টিকর লবণের মাধ্যমে বিচ্ছিন্ন টিস্যুগুলিকে কিছুকাল বাঁচিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন; কিন্তু গাছের শিকড়ের একটি ক্ষুদ্র অংশকে অনির্দিষ্ট কাল বাঁচিয়ে রাখবার সহজ উপায় আবিষ্কার করেন হোয়াইট (১৯৩৪)। ডক্টর হোয়াইট টোম্যাটো গাছের শিকড়ের একটি ক্ষুদ্র ডগা তরল খাদ্যের মাধ্যমে নির্বীজিত অবস্থায় কিছু-কাল যাবৎ প্রথমে পালন করেন। শিকড়টি বেশ বড় হবার পর শাখা-প্রশাখা বের হলে, তাথেকে কয়েকটি ডগা পুনরায় কেটে নিয়ে নূতন খাদ্যের মাধ্যমে স্থানান্তরিত করেন। এভাবে তিনি ধারাবাহিক কর্তনের সাহায্যে একই শিকড়ের নূতন নূতন ডগাগুলিকে ক্রমাগত ২১ বছর (১৪০২ বার স্থানান্তরিত করে) ধরে পালন করেছিলেন।

* কৃষি বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

টিস্যু কালচারের বহুমুখী উদ্দেশ্য

টিস্যু কালচারের গবেষণা আজ অনেক পরিণত, উদ্দেশ্য বহুমুখী ও তাৎপর্যপূর্ণ। এই গবেষণার অন্যতম সুবিধা হলো এই যে, সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে জীবকোষের যাবতীয় ক্রিয়াকলাপ সুষ্ঠুভাবে পর্যবেক্ষণ করা যায় এবং যেহেতু প্রতিটি জীবন্ত কোষই একটি গোটা উদ্ভিদ বা প্রাণীর প্রতিভূ, সেহেতু গবেষণালব্ধ অনেক তথ্যই গোটা প্রাণী বা উদ্ভিদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা চলে। জীবনের মূল সমস্যা ও শাশ্বত সত্যগুলি আরো গভীরভাবে অনুধাবনের জন্যে টিস্যু কালচার জীবন-রসায়ন, চিকিৎসা-বিজ্ঞান, প্রাণী ও উদ্ভিদ-বিজ্ঞানের গবেষণায় ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে; যেমন—১। কোষের খাদ্যোৎপাদন—বহিরাগত পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর একক কোষ বা কোষ-সমষ্টির নির্ভরশীলতার পরিমাণ ও প্রণালী, ২। জীবকোষের অভ্যন্তরস্থ সূক্ষ্ম কণিকাগুলির স্বরূপ ও তাদের রাসায়নিক ক্রিয়াকলাপ, ৩। কোষের বৃদ্ধি নানা ধরণের রাসায়নিক ক্রিয়াকলাপের উপর বিপাকক্রিয়াজাত পদার্থ ছাড়া অন্যান্য পদার্থ, যেমন—হরমোন ও ভিটামিনের প্রভাব, ৪। জীব কোষের বিভাজন, ক্রমবৃদ্ধি ও বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্রমবিকাশ, ৫। রোগাক্রান্ত কোষের বৃদ্ধি, পরিপাক ক্রিয়া এবং তার সঙ্গে সাধারণ রোগমুক্ত কোষের ব্যবহারের তফাৎ, ৬। ক্রোমো-সোমের সূক্ষ্ম গঠন ও জীবনের বৈশিষ্ট্য রক্ষায় তাদের জটিল ভূমিকা ইত্যাদি।

একক জীবকোষের ভূমিকা

গত দশকে জীবন-রসায়নের গবেষণায় একক জীবকোষ এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে। আজ পর্যন্ত আমরা সঠিকভাবে জানি না, কি ভাবে বিভিন্ন পরজীবী ও জীবাণু কোষের মধ্যে অনুপ্রবেশ করে, বৃদ্ধি পায়, কোষের স্বাভাবিক রাসায়নিক ক্রিয়াকলাপ ব্যাহত করে ও পরিশেষে কোষের মৃত্যু ডেকে আনে। একক কোষ নিয়ে গবেষণা হয়তো এক নূতন দিগন্তের সূচনা করবে, যার ফলে আমরা এমন এক উপায় আবিষ্কারে সক্ষম হবো যাতে রোগাক্রান্ত টিস্যুটির বৃদ্ধি তুলনা-মূলকভাবে হ্রাস পেলেও রোগমুক্ত কোষের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হবে না।

কোন' প্রক্রিয়ায় একটি নবপল্লব মুকুলিত (Flower initiation) হয় এবং কি কি কারণ এই রূপান্তরে সহায়তা করে, সে সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান এখনও সীমিত ও অসম্পূর্ণ। উদ্ভিদ-বিজ্ঞানের এই জটিল সমস্যার সমাধানে টিস্যু কালচারের ভূমিকা আজ সর্বজনস্বীকৃত।

টিস্যু কালচারের প্রয়োজনীয় উপকরণ

টিস্যু কালচার সম্পর্কে গবেষণার সাফল্য অনেকাংশে নির্ভর করে সঠিক পদ্ধতির সুষ্ঠু অনুসরণ ও গবেষণাগারের উপযুক্ত সুযোগ-সুবিধার উপর। গবেষণাগারে নিম্নলিখিত সুযোগ-সুবিধা থাকা একান্তই বাঞ্ছনীয়—(১) খাদ্যোপকরণ প্রস্তুত, নির্বীজন, সংরক্ষণ এবং যন্ত্রপাতি ও কাচনির্মিত দ্রব্যাদি পরিষ্কার ও ধৌত করবার জন্যে উপযুক্ত কক্ষ, (২) টিস্যু স্থানান্তরের কক্ষ, (৩) টিস্যু সংরক্ষণ কক্ষ ও (৪) টিস্যু পরীক্ষার কক্ষ। উপরিউক্ত কক্ষ-গুলির আয়তন খুব বড় হবার প্রয়োজন নেই, তবে কাজের যথাযথ সুযোগ-সুবিধা যাতে থাকে, সে দিকে নজর দিতে হবে। ৮´×১০´×৮´ আয়তন-বিশিষ্ট কক্ষই টিস্যু সংরক্ষণের পক্ষে সর্বোত্তম। কক্ষের দেয়াল মসৃণ হওয়া উচিত, যাতে ধূলা-বালি কম জমে। ঘরের মেঝে সহজে পরিষ্কার-যোগ্য হওয়া দরকার; যেমন—লিনোলিয়াম বা ঐ জাতীয় পদার্থের দ্বারা আচ্ছাদিত হওয়া উচিত। টিস্যু সংরক্ষণের কক্ষের মধ্যে গ্যাসের সংযোগ না থাকাই শ্রেয়—কেন না, অধিকাংশ টিস্যুর পক্ষেই সেটি ক্ষতিকারক। ঘরের মধ্যে লোকের অযথা চলাচলও বাঞ্ছনীয় নয়, কারণ তাতে জীবাণু

সংক্রমণের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা অতিরিক্ত সুবিধা বলে গণ্য হবে। পরীক্ষাগারের কক্ষগুলিতে আলো ও বায়ু চলাচলের উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকা একান্তই দরকার।

টিস্যু কালচার বিষয়ক গবেষণার জন্যে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য মনে রাখা খুবই প্রয়োজন, যেমন—হলো এই যে, কালচার মিডিয়া তাড়াতাড়ি বিশুষ্ক হবার সম্ভাবনা থাকে।

টিস্যু কালচার বিষয়ক গবেষণার জন্যে ব্যবহৃত অধিকাংশ দ্রব্যাদিই কাচনির্মিত। এগুলি সব সময় ব্যবহারের উপযোগী রাখবার জন্যে সুষ্ঠুভাবে ধৌত করা ও শুষ্ক রাখা উচিত। কাঁচনির্মিত

১নং চিত্র

একটি সজীব জীবকোষের ছবি। তামাক গাছের ক্যালাস কালচার (Callus culture) থেকে সংগৃহীত। ফেজ কনট্রাষ্ট মাইক্রোস্কোপে তোলা ছবি।

(ফটো—তারকমোহন দাস)।

পুরাপুরি নির্বীজিত অবস্থায় টিস্যু স্থাপন ও স্থানান্তর করা, বৃদ্ধির জন্যে উপযুক্ত খাদ্য সরবরাহ ও যথাযথ পরিবেশ সৃষ্টি করা ইত্যাদি। একমাত্র জীবন্ত টিস্যুই গবেষণার কাজে লাগে এবং পরে এজন্যে উদ্ভিদের ক্ষেত্রে সাধারণতঃ মূল বা কাণ্ডের অগ্রভাগ ও পিথ-টিস্যু ব্যবহৃত হয়। যে পাত্রে টিস্যু পালন করা হয়, তার মধ্যে বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা থাকা দরকার। সাধারণতঃ পাত্রের মুখ তুলার ছিপির দ্বারা বন্ধ রাখা হয়, তবে এর একটা অসুবিধা

দ্রব্যাদি পরিষ্কার করবার সবচেয়ে সহজ প্রণালী হলো—ক্রোমিক অ্যাসিডের মধ্যে ঐগুলিকে কমপক্ষে ৪ ঘণ্টা ডুবিয়ে রাখবার পর প্রথমে সাধারণ জলে ও পরে পাতিত জলে ধৌত করা হয়। এর পর ঐগুলি ওভেনের মধ্যে শুকিয়ে নিলেই ব্যবহারের উপযোগী হয়।

টিস্যু কালচারের গবেষণার আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনীয় বিষয় হলো, খাদ্যোৎপাদন ও অন্যান্য দ্রব্যাদির নির্বীজীকরণ (Sterilization)। এর

জন্যে সাধারণতঃ তিন ধরণের প্রণালী অনুসরণ করা হয়; যেমন—(১) শুষ্ক নির্বীজীকরণ—১৪০°—১৬০° সেঃ তাপমাত্রায় ৪ ঘণ্টা ধরে ওভেনের সাহায্যে করা হয় (ফ্লাস্ক, টিউব, পিপেট, ফিলটার ইত্যাদি), (২) আর্দ্র নির্বীজীকরণ—অটোক্লেভের সাহায্যে করা হয় (তাপে অপরিবর্তনীয় দ্রবণ, রবার, সেলোফেন, রবারের দস্তানা ইত্যাদি), (৩) তাপে সহজেই পরিবর্তনীয় দ্রবণের জন্যে আলট্রা-ফিল্‌ট্রেশন (Ultra-filtration) পদ্ধতির ব্যবহারই শ্রেয়। উপরিউক্ত পদ্ধতিগুলি ছাড়াও টিস্থ স্থানান্তরণ কক্ষ ও টিস্থ সংরক্ষণ কক্ষ নির্বীজীত করবার জন্যে অতিবেগুনী রশ্মি ব্যবহৃত হয়।

কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সাফল্যে টিস্থ কালচারের ভূমিকা

কৃত্রিম উপায়ে একক জীবকোষ থেকে পূর্ণাঙ্গ উদ্ভিদ সৃষ্টি—জননকোষ ছাড়াও উদ্ভিদের শরীরের যে কোন অংশ থেকে এক টুক্‌রা টিস্থ বিচ্ছিন্ন করে তাথেকে বিশেষ প্রক্রিয়ার সাহায্যে একটি সম্পূর্ণ গাছের জন্ম দেওয়া আজ সম্ভব হয়েছে, যার ফলে উদ্ভূত গাছটি জন্মদাতা গাছের সব বৈশিষ্ট্যই ধারণ করে। বর্তমান লেখকদ্বয় এই ধরণের গবেষণার কাজে নিযুক্ত রয়েছেন। এর জন্যে যে বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়, তা হলো—উদ্ভিদের কাণ্ডের পিথ-টিস্থ জীবাণুমুক্ত অবস্থায় বিচ্ছিন্ন করে কনিক্যাল ফ্লাস্কের মধ্যে অ্যাগার, চিনি, বিভিন্ন খনিজ লবণ, ভিটামিন ও হর্মোন ইত্যাদি নানারকম পুষ্টিকর খাদ্যের মাধ্যমে নির্দিষ্ট তাপমাত্রা ও আলোকে পালন করা হয়। ফ্লাস্কের মধ্যে টিস্থটি ক্রমশঃ বড় হতে থাকে, পরে তাথেকে কিছু অংশ কেটে নিয়ে তরল খাদ্যের মধ্যে স্থানান্তরিত করে যান্ত্রিক উপায়ে ধীরে ধীরে নাড়ানো হয়। তার ফলে উক্ত টিস্থ থেকে কিছু কিছু সজীব একক কোষ বিচ্ছিন্ন হয়ে বেরিয়ে আসে। তার পর বিশেষ ধরণের অতি সূক্ষ্ম পিপেটের সাহায্যে একবিন্দু তরল খাদ্যের সঙ্গে একটি মাত্র সজীব কোষ বিশেষ পদ্ধতিতে আলাদা করে একটি বিশেষ ধরণের মাইক্রোস্কোপ স্লাইডের উপর স্থানান্তরিত করা হয়। এই স্লাইডের উপর কোষটি বেশ স্বাভাবিকভাবেই

২নং চিত্র
একটি ক্যালাস টিস্থ। সূর্যমুখী গাছের পিথ-টিস্থ থেকে সংগৃহীত।

বড় হতে থাকে, বিভাজিত হয় এবং নূতন কোষের জন্ম দেয় এবং অবশেষে অতি ক্ষুদ্র ক্যালাস টিস্থতে রূপান্তরিত হয়। তখন ঐ টিস্থটি নির্বীজিত অবস্থায় কালচার টিউব বা কনিক্যাল ফ্লাস্কের মধ্যে পুনরায় স্থানান্তরিত করা হয়। ঐ টিউবের মধ্যে সুষম খাদ্যের মাধ্যমে টিস্থটি বড় হতে থাকে, ক্রমশঃ মূল ও কাণ্ড বের হয় এবং কালক্রমে একটি পূর্ণাঙ্গ গাছে পরিণত হয়। এইভাবে এক খণ্ড ছোট টিস্থ থেকে অসংখ্য গাছ সৃষ্টি করা সম্ভব।

পরাগরেণু থেকে পূর্ণাঙ্গ উদ্ভিদ সৃষ্টি—টিস্থ কালচারের সহায়তায় পরাগরেণু থেকে হ্যাপ্লয়েড্ (Haploid) গাছ সৃষ্টির ক্ষেত্রে অনেকেই উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করলেও ধান গাছের পরাগরেণু থেকে উদ্ভিদ সৃষ্টির কৃতিত্ব অবশ্য এক জন ভারতীয় মহিলার প্রাপ্য। ডক্টর শিপ্রা কৃত্রিম অবস্থায় পরাগরেণু পালন করে তাথেকে ক্যালাস টিস্থ এবং পরিশেষে পূর্ণাঙ্গ ধান গাছ সৃষ্টি করতে সক্ষম হন। উদ্ভিদ প্রজননের গবেষণায় হ্যাপ্লয়েড গাছের মূল্য ও অবদান অপরিমেয় এবং এই আবিষ্কারের সঙ্গে উন্নত ধরণের ধানের প্রজাতি প্রজননের একটি উল্লেখযোগ্য বাধা অতিক্রম করা সম্ভব হলো।
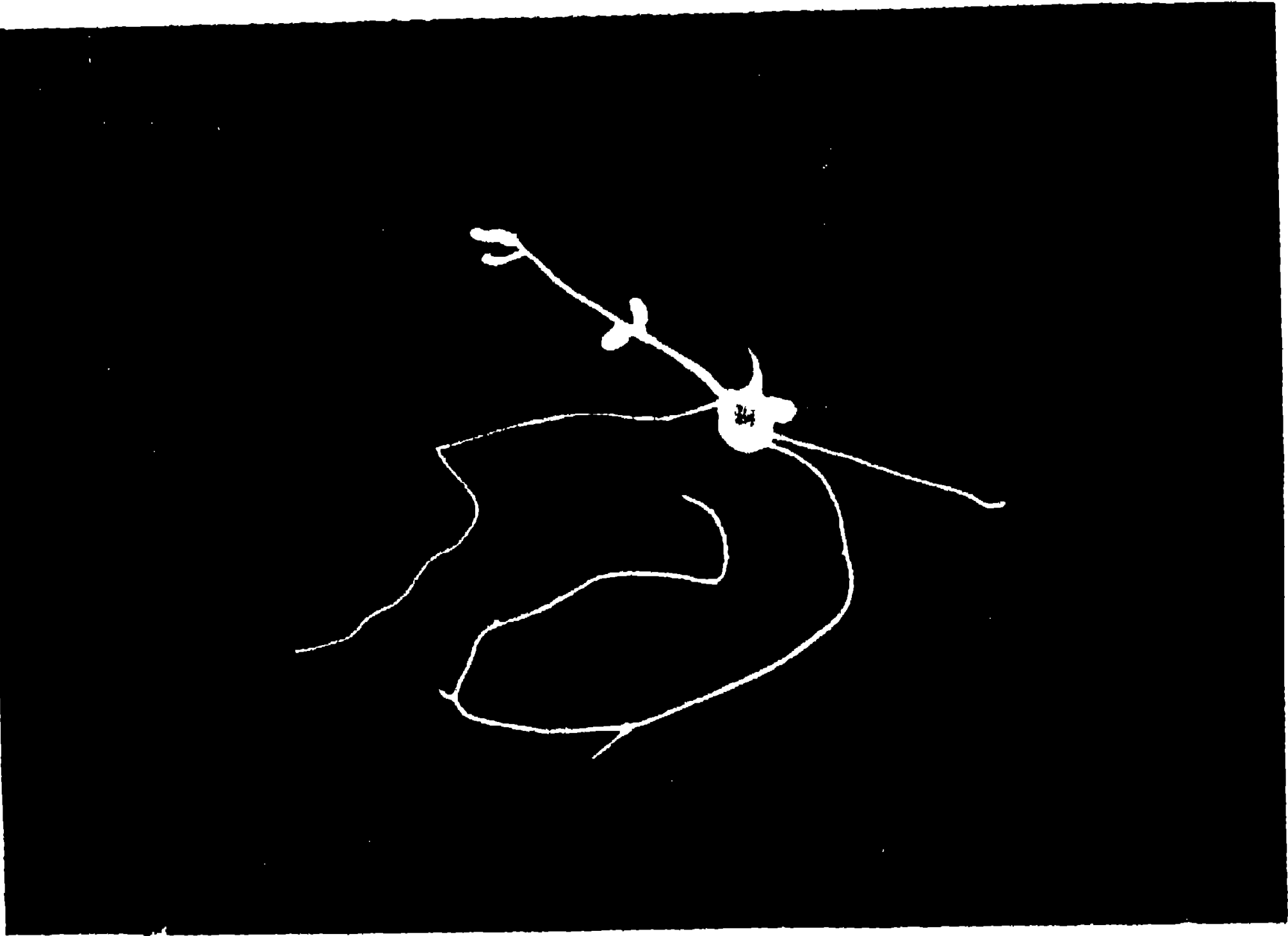
৩নং চিত্র
২নং চিত্রের ক্যালাস টিস্থ থেকে পূর্ণাঙ্গ সূর্যমুখী গাছের সৃষ্টি। কয়েকটি ছোট পাতাযুক্ত কাণ্ড ও তিনটি শিকড় দেখা যাচ্ছে।

নিউসেলাস টিস্থ থেকে পূর্ণাঙ্গ গাছ সৃষ্টি—সাধারণতঃ দু-ধরণের লেবুজাতীয় গাছ দেখা যায়—এক ভ্রূণবিশিষ্ট (Monoembryonic) এবং বহু ভ্রূণবিশিষ্ট (Polyembryonic)। এক ভ্রূণবিশিষ্ট বীজে একটিমাত্র ভ্রূণ থাকে, যা একটি পুরুষ ও একটি স্ত্রী জননকোষের মিলনের ফলে উদ্ভূত হয়। এই গাছের একটা অসুবিধা হলো এই যে, উদ্ভূত গাছটি কোন ক্ষেত্রেই জন্মদাতা গাছটির মত হয় না। দ্বিতীয়তঃ ভাইরাস রোগে

আক্রান্ত হয়। তাই এক্ষেত্রে বীজের দ্বারা গাছের সংখ্যা বৃদ্ধি কাম্য নয়। বহু ভ্রূণবিশিষ্ট গাছের বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, এর বীজের মধ্যে দু-ধরণের ভ্রূণ থাকে। একটি বর্ণসঙ্কর (Hybrid) ভ্রূণ ছাড়াও কতকগুলি ভ্রূণ নিউসেলাস (Nucellus) টিস্যু থেকে উদ্ভূত হয়। শেষোক্ত ভ্রূণজাত গাছ জন্মদাতা গাছের সব বৈশিষ্ট্যই ধারণ করে ও সর্বোপরি ভাইরাস রোগমুক্ত হয়। কিছুদিন পূর্বে ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সাইট্রাস রিসার্চ সেন্টারের গবেষকবৃন্দ কৃত্রিম উপায়ে নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে এক ভ্রূণবিশিষ্ট বীজের নিউসেলাস টিস্যু থেকে পূর্ণাঙ্গ গাছ সৃষ্টি করতে সক্ষম হন। এই পদ্ধতির আরও উন্নতিসাধনের সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসায়িক ও ব্যবহারিক হিসাবে এর মূল্যায়ন করা হবে।

ক্যান্সার—ক্যান্সার রোগ বিংশ শতাব্দীর এক বিরাট সমস্যা। শল্য-চিকিৎসা, বিকিরণ চিকিৎসা এবং রাসায়নিক চিকিৎসার সম্মিলিত আক্রমণেও অপরাজেয় এই ব্যাধি। এই ব্যাধিটির নিরাময় ও প্রতিরোধকল্পে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অসংখ্য বিজ্ঞানী অক্লান্তভাবে অনুসন্ধান করে চলেছেন। ক্যান্সার রোগাক্রান্ত জীব-কোষগুলির বিচিত্র গঠন ও অসম আকৃতি, ক্রোমোসোমের অস্বাভাবিকতা এবং সুনির্দিষ্ট ক্রোমোসোম সংখ্যার ব্যতিক্রম ইত্যাদি পরীক্ষার জন্যে একক কোষ নিয়ে আজ ব্যাপক গবেষণা সুরু হয়েছে, যার উপর ভিত্তি করে অদূর ভবিষ্যতে হয়তো এই রোগের সঠিক কারণ নির্ণয়ে আমরা সক্ষম হবো। একক কোষ ছাড়াও রোগাক্রান্ত টিস্যু নিয়েও বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা চলছে।

চিকিৎসা-বিজ্ঞান— চিকিৎসা-বিজ্ঞানে টিস্যু কালচারের গবেষণায় একটি চাঞ্চল্যকর সাফল্যের খবর কয়েক দিন আগে প্রকাশিত হয়েছে, যার ফলে দেহের অস্বাভাবিক গঠনজনিত বন্ধ্যা রমণীর সন্তান ধারণের সম্ভাবনা বাস্তবে রূপায়িত হতে পারে। ইংল্যাণ্ডের কয়েকজন চিকিৎসা-বিজ্ঞানী নারীর ডিম্বকোষ থেকে ডিম্বাণু বের করে এনে টেষ্ট-টিউবের মধ্যে কৃত্রিম অবস্থায় তাকে পুরুষের শুক্রাণুর দ্বারা নিষিক্ত করেন। এখন ঐ নিষিক্ত ডিম্বাণুটিকে নারীদেহের জরায়ুর মধ্যে স্থাপন করবার চেষ্টা চলছে।

টিস্যু কালচারের গবেষণার ইতিহাস, গুরুত্ব ও সাফল্যের বিস্তৃত বিবরণ এই ক্ষুদ্র নিবন্ধে দেওয়া সম্ভব নয়। একক কোষ ও কোষ সমষ্টি পালনের পদ্ধতিও আলোচনা করা গেল না। তবে উপরি-উক্ত আলোচনা থেকে এই কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, একক কোষ ও টিস্যু নিয়ে যে ব্যাপক গবেষণা চলছে, তা জীব-বিজ্ঞানের অনেক রহস্যের পূর্ণ উদ্‌ঘাটনে সাহায্য করবে এবং আবিষ্কৃত তথ্য মানুষের কল্যাণসাধনে নিয়োজিত হবে।

[ক্যালাস টিস্যু সম্পর্কিত গবেষণাটি এই প্রবন্ধের লেখকদ্বয় কর্তৃক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি কলেজের গবেষণাগারে অনুষ্ঠিত হচ্ছে।]

অতি ভারী মৌলিক পদার্থ

সূর্যেন্দুবিকাশ কর*

আধুনিক পদার্থ-বিজ্ঞানের মৌলিক গবেষণার ক্ষেত্রে অধুনা অতি ভারী মৌলিক পদার্থ (Super heavy element) আবিষ্কারের প্রচেষ্টা প্রাধান্য লাভ করেছে। মৌলিক পদার্থ সম্পর্কে আমরা এখন অনেক কিছুই জানি। হাইড্রোজেন যে সবচেয়ে হাল্কা মৌলিক পদার্থ, তাও অজানা নয়। এর পারমাণবিক সংখ্যা (Atomic number) হলো এক অর্থাৎ এই পরমাণুর কক্ষে রয়েছে একটি ইলেকট্রন; স্বভাবতঃই বিদ্যুৎ-নিরপেক্ষ (Neutral) হাইড্রোজেন পরমাণুর নিউক্লিয়াসে রয়েছে একটি প্রোটন। এই এক নম্বর মৌলিক পদার্থটির একটি স্থায়ী আইসোটোপ হলো ডয়টেরন, এর নিউক্লিয়াসে প্রোটনের সঙ্গে রয়েছে একটি নিউট্রন। আবার দুটি নিউট্রনযুক্ত হাইড্রোজেনের আর একটি অস্থায়ী (Unstable) আইসোটোপ হলো ট্রিটন (Trition)। মৌলিক পদার্থের স্থায়ী ও অস্থায়ী আইসোটোপগুলির কথা বাদ দিয়ে পারমাণবিক সংখ্যা দিয়ে পরপর ২, ৩, ৪ ইত্যাদি সংখ্যার আরো ভারী মৌলিক পদার্থগুলির কথা আমরা জানি। যদিও এই সংখ্যাগুলি ইলেকট্রন সংখ্যার পরিচায়ক, বাড়তি ইলেকট্রনের সঙ্গে পদার্থের নিউক্লিয়াসে সমসংখ্যক প্রোটনও রয়েছে, তাই আমরা ক্রমশঃ ভারী মৌলিক পদার্থ পাই। ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে ইউরেনিয়ামের অক্সাইড আবিষ্কৃত হয়েছিল। কিন্তু ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের আগে ইউরেনিয়ামের বিভাজন আবিষ্কৃত হয় নি। তাই এই ভারী মৌলিক পদার্থটির গুরুত্ব কারোরই নজরে পড়ে নি। ইউরেনিয়ামের পারমাণবিক সংখ্যা ৯২। ১ থেকে ৯২ এই সংখ্যার পরমাণুগুলি নিয়ে কিন্তু এর আগেও অনেক গবেষণা হয়েছে। এই গবেষণার অন্যতম সফল নিদর্শন হলো পর্যায় সারণী (Periodic table), ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে রাশিয়ার বিজ্ঞানী মেণ্ডেলিফ এই সারণীটি তৈরি করেন। গত বছর এই আবিষ্কারের শতবার্ষিকী অতিক্রান্ত হলো, কিন্তু আজও এর গুরুত্ব কমে নি বরং বেড়েই চলেছে। এই সারণী থেকে মৌলিক পদার্থের সাধারণ রাসায়নিক ধর্ম বিনা পরীক্ষাতেই বলে দেওয়া যায়। এমন কি, অনেক অনাবিষ্কৃত মৌলিক পদার্থের ধর্ম এই সারণীর সাহায্যে জেনে নেওয়া সম্ভব হয়েছিল এবং সেই জ্ঞানটুকু মৌলিক পদার্থটির আবিষ্কারে অনেক সাহায্য করেছে। অবশ্য ল্যান্থানাইড (Lanthanide) বা অ্যাক্টিনাইড (Actinide) জাতীয় পদার্থগুলি এই সারণীতে কিছুটা বেমানান, কারণ তাদের গঠন-প্রণালী একটু জটিল। তা সত্ত্বেও আরো ভারী মৌলিক পদার্থ যে এই সারণী মেনে চলবে, তা ধরে নেওয়া যায়। ১নং চিত্রে মোটামুটি পর্যায় সারণীটি দেখানো হয়েছে। অতি ভারী মৌলিক পদার্থ যত খুসী সংখ্যা বাড়িয়ে আমরা শুধু সারণীটিকে বাড়িয়ে দিলেও লাভ হবে না। তার জন্যে প্রয়োজন হবে এই সব ভারী মৌলিক পদার্থ পরীক্ষাগারে পাওয়ার ব্যবস্থা করা। তার আগে আমাদের জানতে হবে, অতি ভারী মৌলিক পদার্থ কি সত্যাই থাকতে পারে? যদি থাকে, তবে কি পদ্ধতিতে আমরা এদের পেতে পারি? এরা স্থায়ী, না অস্থায়ী?

---

*সাহা ইনষ্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স, কলিকাতা-৯

এই প্রশ্নগুলির উত্তর দেওয়ার আগে আর একটি প্রশ্ন উঠতে পারে। তা হলো, এই সব অতি ভারী মৌলিক পদার্থ কি আমাদের কোন প্রয়োজনে লাগবে? ধরা যাক, আমাদের পৃথিবীতে মৌলিক পদার্থ বলতে ১ থেকে ২৬ সংখ্যা, অর্থাৎ লোহা পর্যন্ত আছে। এর মধ্যে অক্সিজেন, কার্বন, নাইট্রোজেন, ফস্‌ফরাস, লোহা শক্তি? তাছাড়া এই ২৬টি মৌলিক পদার্থ নিয়ে কি বাকী অন্যান্যদের ধর্ম সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব হতো? ২৯ সংখ্যক মৌলিক পদার্থ তামা অথবা ৮০ সংখ্যক পারদের সম্পর্কে কিছুই জানা যেত না। প্রত্যেকটি মৌলিক পদার্থ যে সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে কত সাহায্য করেছে, তার ইয়ত্তা নেই। আবার পর্যায় সারণী যে

H 1																	He 2
Li 3	Be 4											B 5	C 6	N 7	O 8	F 9	Ne 10
Na 11	Mg 12											Al 13	Si 14	P 15	S 16	Cl 17	Ar 18
K 19	Ca 20	Sc 21	Ti 22	V 23	Cr 24	Mn 25	Fe 26	Co 27	Ni 28	Cu 29	Zn 30	Ga 31	Ge 32	As 33	Se 34	Br 35	Kr 36
Rb 37	Sr 38	Y 39	Zr 40	Nb 41	Mo 42	Tc 43	Ru 44	Rh 45	Pd 46	Ag 47	Cd 48	In 49	Sn 50	Sb 51	Te 52	I 53	Xe 54
Cs 55	Ba 56	La 57	Hf 72	Ta 73	W 74	Re 75	Os 76	Ir 77	Pt 78	Au 79	Hg 80	Tl 81	Pb 82	Bi 83	Po 84	At 85	Rn 86
Fr 87	Ra 88	Ac 89	(104)	(105)	(106)	(107)	(108)	(109)	(110)	(111)	(112)	(113)	(114)	(115)	(116)	(117)	(118)
(119)	(120)	(121)															

LANTHANIDES	Ce 58	Pr 59	Nd 60	Pm 61	Sm 62	Eu 63	Gd 64	Tb 65	Dy 66	Ho 67	Er 68	Tm 69	Yb 70	Lu 71

ACTINIDES Th Pa Np 93 Pu 95 96 Cm 97 Bk 98 99 Fm 100 Md 101 No 102 103

SUPER ACTINIDES (122) (123) (124) ... (153)

১নং চিত্র

পরিবর্তিত পর্যায় সারণী। ( ) যুক্ত সংখ্যাগুলি অতি ভারী মৌলিক পদার্থের পারমাণবিক সংখ্যা। রেয়ার আর্থ ল্যান্থানাইড ও অ্যাক্টিনাইড শ্রেণীর জটিল গঠন-বিন্যাসের জন্যে সারণীর বাইরে দেওয়া হলো। ৯৩-১০৪ সংখ্যক নিউক্লিয়াসগুলির অর্ধজীবনকাল খুব হ্রস্ব, তাই বিশেষ চতুষ্কোণের দ্বারা দেখানো হয়েছে।

সবই পড়ে। তাহলে আমাদের পৃথিবীতে জীব বা উদ্ভিদ-জগতের অস্তিত্ব বা বাঁচবার কোন অসুবিধা হতো না। কিন্তু যে জগতে রূপা (Silver) ও ব্রোমিন (Bromine) নেই, সেখানে কি আলোকচিত্র (Photography) সম্ভব হতো? না, পাওয়া যেত ইউরেনিয়ামজাত নিউক্লীয় মৌলিক পদার্থকে সুবিন্যস্ত করেছে, তার অবদানও অস্বীকার করা যায় না। ১নং চিত্রে বন্ধনী ( ) চিহ্নিত সংখ্যাগুলি অতি ভারী মৌলিক পদার্থের পারমাণবিক সংখ্যা। এদের বিন্যাস থেকে এই সব পরমাণুর রাসায়নিক ধর্ম আঁচ করা যেতে পারে। এদের আবিষ্কার যে সভ্যতাকে আরো

অগ্রগামী করতে পারবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ থেকে ইউরেনিয়ামের প্রয়োগ আরম্ভ হয়েছে নিউক্লীয় শক্তির উৎসরূপে। ক্রমশঃ আরো ভারী মৌলিক পদার্থ একটির পর একটি আবিষ্কৃত হয়েছে। নেপচুনিয়াম, প্লুটোনিয়াম, অ্যামেরিসিয়াম, কিউরিয়াম, বার্কেলিয়াম, ক্যালিফোর্নিয়াম, ফের্মিয়াম—এইগুলি আবিষ্কৃত হয়ে শেষোক্তটিতে শতসংখ্যা পূর্ণ হয়েছে। তার পরে বুঝি আরম্ভ হয়েছে একোত্তর শত সংখ্যক মেণ্ডেলিভিয়াম দিয়ে। পর্যায় সারণীর শতবার্ষিকী অতিক্রান্ত—মৌলিক পদার্থের সংখ্যাও শতক অতিক্রম করেছে। দ্বিতীয় শতক মেণ্ডেলিয়ামের সার্থক নামেই যাত্রা সুরু করেছে। ক্রমশঃ এর পরে আবিষ্কৃত হয়েছে নোবেলিয়াম, লরেন্সিয়াম, ক্রুচাটোভিয়াম। ১০৫ সংখ্যক মৌলিক পদার্থটি রাশিয়ায় আবিষ্কৃত হয়েছে মনে হয়, কিন্তু নামকরণ হয় নি।

ইউরেনিয়ামের পর এই সব মৌলিক পদার্থের আবিষ্কার সার্থক সন্দেহ নেই। কিন্তু ইউরেনিয়ামের অর্ধজীবনকাল দীর্ঘতর, অথচ এই সব আরও ভারী মৌলিক পদার্থের অর্ধজীবনকাল হ্রস্বতর হয়ে ক্রুচাটোভিয়াম-এর বেলায় সেকেণ্ডেরও কম দাঁড়ালো। তা হলে এইসব ক্ষীণজীবী আরো ভারী মৌলিক পদার্থ যে কি কাজে লাগবে, সাধারণের কাছে তা দুর্বোধ্য। কিই বা হবে আরো ভারী মৌলিক পদার্থ আবিষ্কারের জন্যে পণ্ডশ্রম করে? কিন্তু তাত্ত্বিক বিজ্ঞানীরা বলছেন অন্য কথা। তাঁদের মতে ১১৪ অথবা ১২৬ সংখ্যক পরমাণুর কাছাকাছি মৌলিক পদার্থগুলি ১৮৪টি নিউট্রন সহযোগে বেশ স্থায়ী হতে পারে। এর কারণ হলো, এই সংখ্যাগুলি প্রোটন বা নিউট্রনের বেলায় নিউক্লিয়াসে সম্পূর্ণ ভর্তি কোষের গঠন করে—যা থেকে স্থায়িত্ব আসে নিউক্লিয়াসটির। এখানে উদাহরণস্বরূপ—নিওন, আর্গন ইত্যাদি নিষ্ক্রিয় বায়বীয় মৌলিক পদার্থগুলির কথা বলা যায়। এদের বেলায় নির্দিষ্ট কোষগুলি সম্পূর্ণ সংখ্যক ইলেকট্রনে ভর্তি রয়েছে বলেই এরা নিষ্ক্রিয়। নিউক্লিয়াসের গঠন-বিন্যাসেও প্রোটন নিউট্রন দিয়ে সম্পূর্ণ ভর্তি কোষগুলি নিউক্লিয়াসকে যথেষ্ট স্থায়ী করে। উপরিউক্ত সংখ্যক প্রোটন ও নিউট্রন ভারী মৌলিক পদার্থের কোষ সম্পূর্ণ ভর্তি করতে সক্ষম। এই হলো তত্ত্ব-বিজ্ঞানের কথা। কিন্তু শুধু গণনা দিয়েই যে নিউক্লিয়াসকে সম্পূর্ণ রহস্যমুক্ত করা যায়, তা নয়। কারণ নিউক্লীয় বল (Nuclear force) সম্পর্কেই আমরা এখনও অনেক কিছু জানি না। প্রোটন নিউট্রন যে নিউক্লিয়াসে কিভাবে বাঁধা আছে বিরাট বন্ধন শক্তিতে, তা অনেক কিছুরই উপর নির্ভর করে। তার এক-আধটু তারতম্য হলেই মোটামুটি গণনায় যেখানে অর্ধজীবনকাল খুবই হ্রস্বতর দেখা যাচ্ছে, ফলতঃ সেখানে এই সময়টা অনেক অনেক বছর হতে পারে।

মোট কথা, অতি ভারী মৌলিক পদার্থের কেউ কেউ বেশী স্থায়ী হতে পারে। তাহলে আমাদের প্রকৃতিতে এদের অস্তিত্ব নেই কেন? হয়তো অস্তিত্ব আছে, কিন্তু তা এত ক্ষীণ যে, আমাদের পরীক্ষাগারে ধরা পড়বার মত নয়। বিজ্ঞানী ফাউলারের পরীক্ষায় জানা গেছে যে, নভোরশ্মিতে বেশ ভারী মৌলিক পদার্থ আছে, এমন কি ইউরেনিয়াম থেকে যথেষ্ট ভারী পরমাণুরও হদিশ একবার পাওয়া গেছে। প্রসঙ্গতঃ একথা উল্লেখ করা হলো বটে, কিন্তু এথেকে অতি ভারী মৌলিক পদার্থের অস্তিত্ব প্রমাণিত হলো বলা যায় না। তাহলে পরীক্ষাগারে এদের তৈরি করবার চেষ্টা করতে হয়।

ইউরেনিয়াম থেকে ভারী ১০০ সংখ্যক ফের্মিয়াম পর্যন্ত মৌলিক পদার্থগুলি উচ্চ মাত্রার নিউট্রন উৎস রিয়্যাক্টর থেকে পাওয়া যায়।

কিন্তু তার চেয়ে ভারী মৌলিক পদার্থ পাওয়া রিয়্যাক্টর থেকে সম্ভব নয়। সে জন্যে প্রয়োজন ভারী আয়ন-ত্বরণ যন্ত্র (Heavy ion accelerator)। কার্যতঃ কার্বন, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন নিওনের আয়ন এই রকম যন্ত্রে বেগবান অবস্থায় যথাক্রমে কি কিউরিয়াম, অ্যামেরিসিয়াম, প্লুটোনিয়াম ও ইউরেনিয়াম খণ্ডের উপর পড়ে যে নিউক্লীয় বিক্রিয়া ঘটায়, তাথেকে ১০২ সংখ্যক মৌলিক পদার্থ নোবেলিয়াম পাওয়া যায়। এই ধরণের বিক্রিয়া থেকে পরবর্তী ভারী মৌলিক পদার্থগুলিও পাওয়া গেছে। আরো ভারী মৌলিক পদার্থ পেতে হলে এই সব ত্বরণ-যন্ত্রের সাহায্যই যে নিতে হবে, সে সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু সমস্যা হলো, এই সব ত্বরণ-যন্ত্রে উচ্চ মাত্রায় ভারী আয়ন পাওয়া নিয়ে। একেই তো ত্বরণ-যন্ত্র বেশ জটিল ও ব্যয়বহুল। উচ্চ মাত্রায় অতি বেগবান প্রোটন আহরণ করাই ত্বরণ-যন্ত্রে বেশ সমস্যা—ভারী আয়নের বেলায় যে জটিলতা বাড়বে, সে সম্বন্ধে সন্দেহ নেই। এখন অবধি আর্গন পর্যন্ত ভারী আয়নের ত্বরণ-যন্ত্র আছে। অতি ভারী মৌলিক পদার্থ আবিষ্কারের তাগিদে আরো ভারী আয়ন ত্বরণ-যন্ত্রের নির্মাণ আবশ্যক হয়ে পড়েছে। রাশিয়া ও আমেরিকায় এই বিষয়ে চেষ্টাও হচ্ছে।

আরো ভারী মৌলিক পদার্থের জন্যে যে নিউক্লীয় বিক্রিয়ার কথা চিন্তা করা হচ্ছে, তার একটি হলো ভারী আয়ন বেগবান অবস্থায় অপর একটি অনুরূপ ভারী নিউক্লিয়াসে জুড়ে দিয়ে অতি ভারী মৌলিক পদার্থ সৃষ্টি করা। অপর একটি হলো ইউরেনিয়াম বা অনুরূপ ভারী আয়ন বেগবান অবস্থায় অনুরূপ নিউক্লিয়াসে মিলিত হয়ে যুক্ত নিউক্লিয়াসটির বিভাজনের (Fission) দ্বারা অতি ভারী মৌলিক পদার্থ সৃষ্টি হতে পারে। ১০৬ সংখ্যক মৌলিক পদার্থের জন্যে নিম্নলিখিত নিউক্লীয় বিক্রিয়ার কথা ভেবে দেখা যায়:

$${}_{100}Fm^{257} + {}_{6}C^{13} \rightarrow {}_{106}^{270}$$

$${}_{88}Ra^{226} + {}_{18}Ar^{40} \rightarrow {}_{106}^{266}$$

$${}_{78}Pt^{198} + {}_{28}Ni^{64} \rightarrow {}_{106}^{262}$$

$${}_{70}Yb^{176} + {}_{36}Kr^{86} \rightarrow {}_{106}^{262}$$

$${}_{52}Te^{130} + {}_{54}Xe^{136} \rightarrow {}_{106}^{266}$$
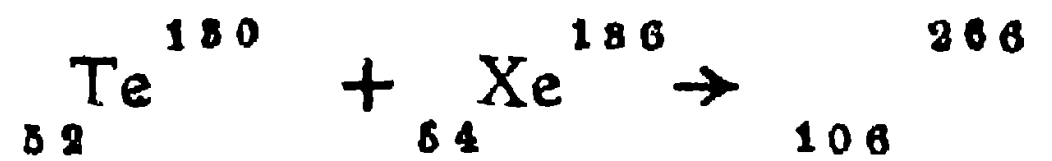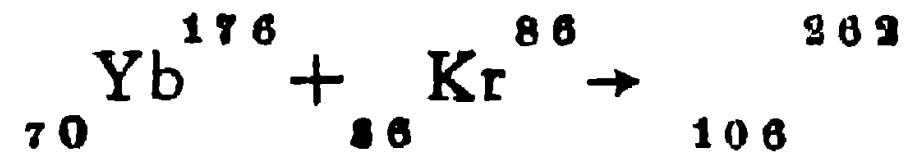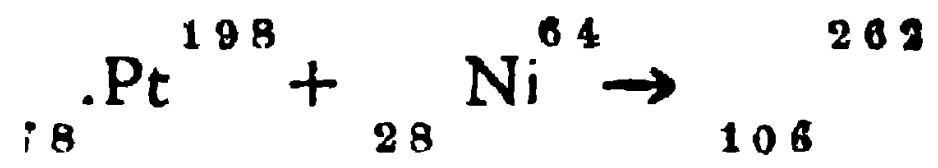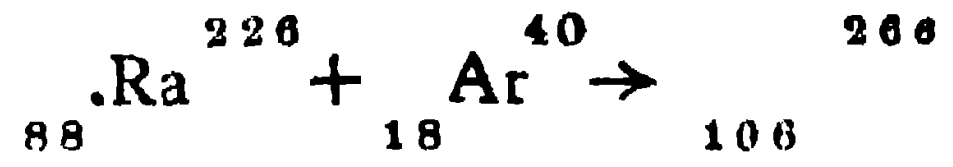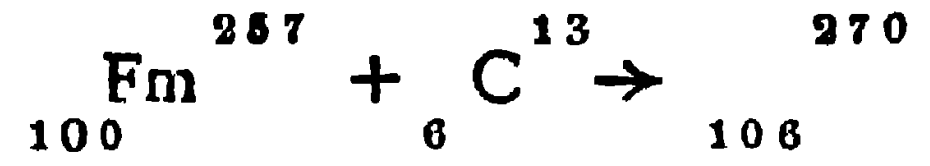
১০০ পারমাণবিক সংখ্যার ফের্মিয়াম, যার ভর-সংখ্যা ২৫৭, ৬ সংখ্যার কার্বন [ভর-সংখ্যা (Mass number) ১৩] বেগবান আয়ন-এর যোগে ১০৬ সংখ্যার মৌলিক পদার্থ, যার ভর-সংখ্যা ২৭০,-এর জন্ম দিতে পারে। পরবর্তী সমীকরণগুলিও এইভাবে সহজে বোঝা যায়।

১১৪ পারমাণবিক সংখ্যার মৌলিক পদার্থের জন্যে নিম্নলিখিত বিক্রিয়াগুলি নির্দিষ্ট করা হয়েছে—

1. ${}_{96}Cm^{248} + {}_{18}Ar^{40} \rightarrow {}_{114}^{284} + 4n$

2. ${}_{92}U^{238} + {}_{22}Ti^{50} \rightarrow {}_{114}^{284} + 4n$

3. ${}_{94}Pu^{244} + {}_{20}Ca^{48} \rightarrow {}_{114}^{290} + 2n$

4. $_{96}Cm^{248} + _{20}Ca^{48} \rightarrow _{114}^{290} + 2n + _{2}He^{4}$

5. $_{50}Sn^{124} + _{64}Gd^{160} \rightarrow _{114}^{284}$

6. $_{54}Xe^{136} + _{60}Nd^{150} \rightarrow _{114}^{286}$

7. $_{64}Gd^{160} + _{70}Yb^{176} \rightarrow _{114}^{298} + 20p + 18n$

8. $_{48}Cd^{116} + _{92}U^{238} \rightarrow _{114}^{298} + _{26}Fe^{56}$

9. $_{64}Gd^{160} + _{92}U^{238} \rightarrow _{114}^{298} + _{42}Mo^{98} + 2n$

10. $_{92}U^{238} + _{92}U^{238} \rightarrow _{114}^{298} + _{70}Yb^{174} + 4n$
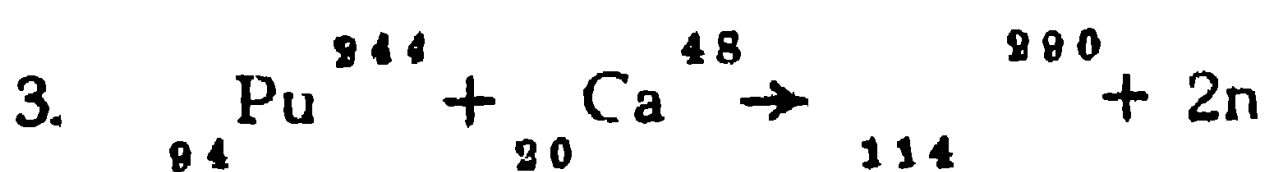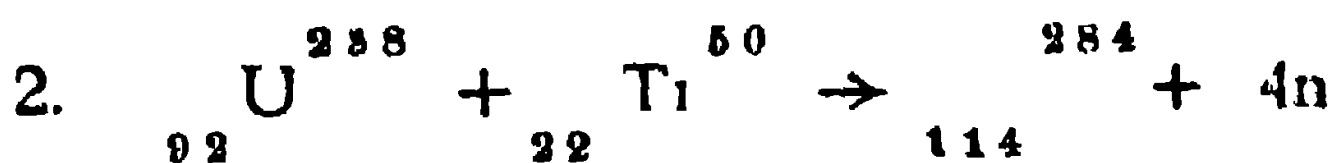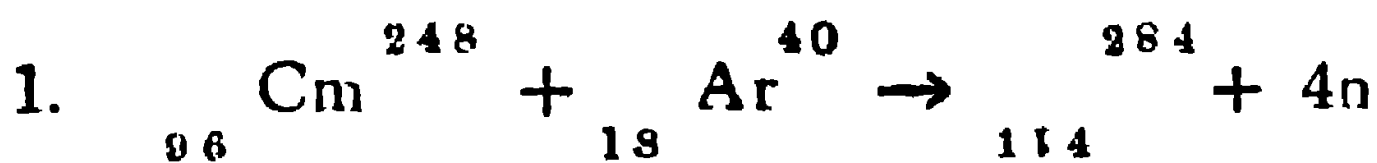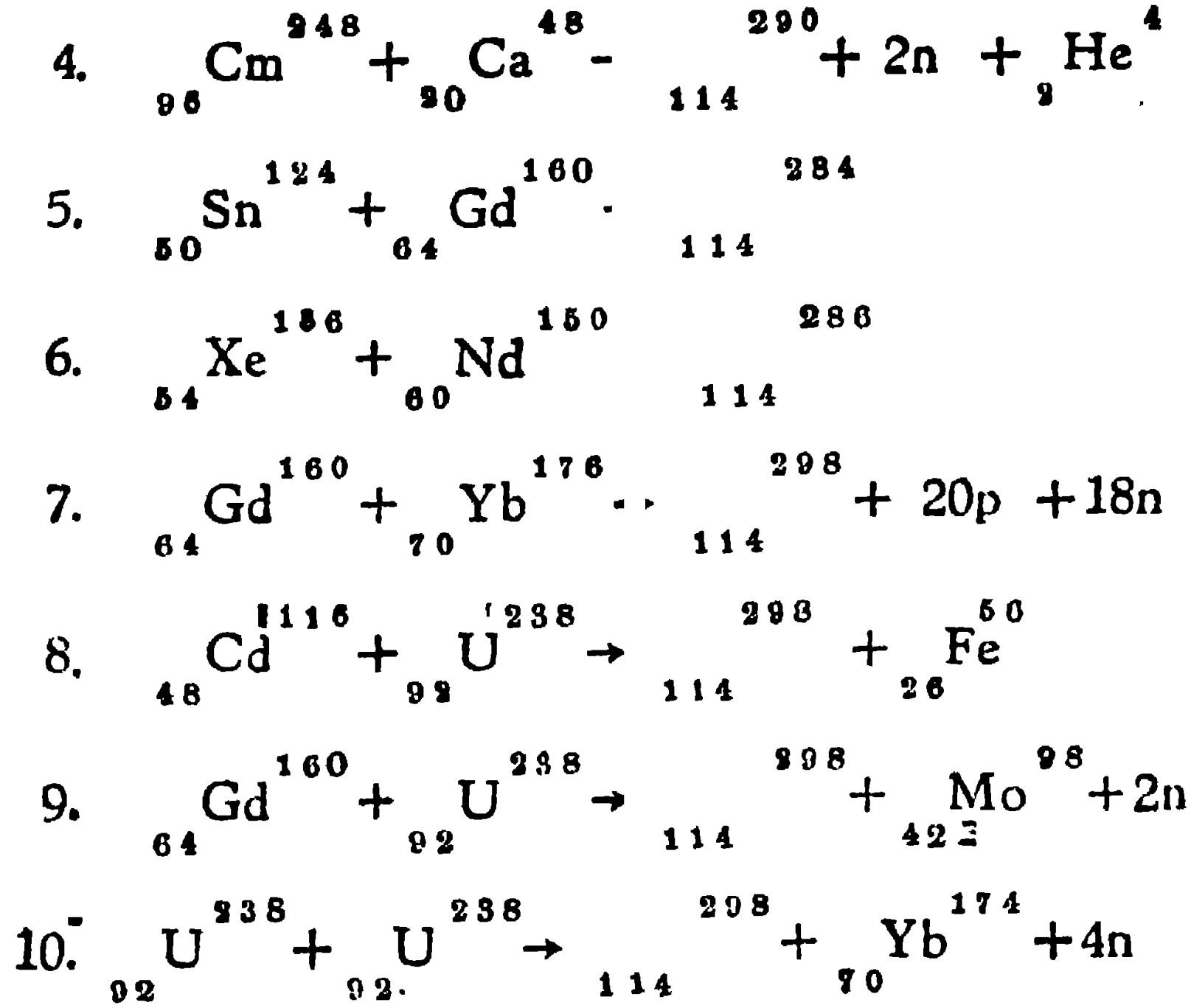
এই বিক্রিয়াগুলির জন্যে আর্গন থেকে ইউরেনিয়াম এই সব ভারী আয়ন ত্বরণের প্রয়োজন। অবশ্য এখানে উল্লেখিত হয় নি যে, এরকম আরো অনেক বিক্রিয়ার সাহায্য নেওয়া সম্ভব হবে। উপরিউক্ত তালিকার শেষের দুটি আসলে বিভাজন (Fission) বিক্রিয়া। এই বিক্রিয়া দিয়ে অতি ভারী মৌলিক পদার্থের সৃষ্টির বিশেষ সম্ভাবনা রয়েছে মনে করা হচ্ছে। অবশ্য এতেও খুব অল্প পরিমাণ মৌলিক পদার্থ পাওয়া যাবে এবং সে জন্যে ১০নং বিক্রিয়াটি ঘটাতে ইউরেনিয়াম আয়নের প্রতি নিউক্লিয়ন পিছু প্রায় ৮·২ মিলিয়ন ইলেকট্রন ভোল্ট শক্তিতে ত্বরণ করতে হবে।

তা যদি সম্ভব হয়, তবে নিম্নলিখিত বিক্রিয়ায় আরো ভারী মৌলিক পদার্থও পাওয়া যেতে পারে।

1. $_{36}Kr^{80} + _{90}Th^{230} \rightarrow _{126}^{310}$

$_{35}Br^{79} + _{91}Pa^{231} \rightarrow _{126}^{310}$

3. $_{20}Ca^{48} + _{98}Cf^{252} \rightarrow _{118}^{296} + 4n$
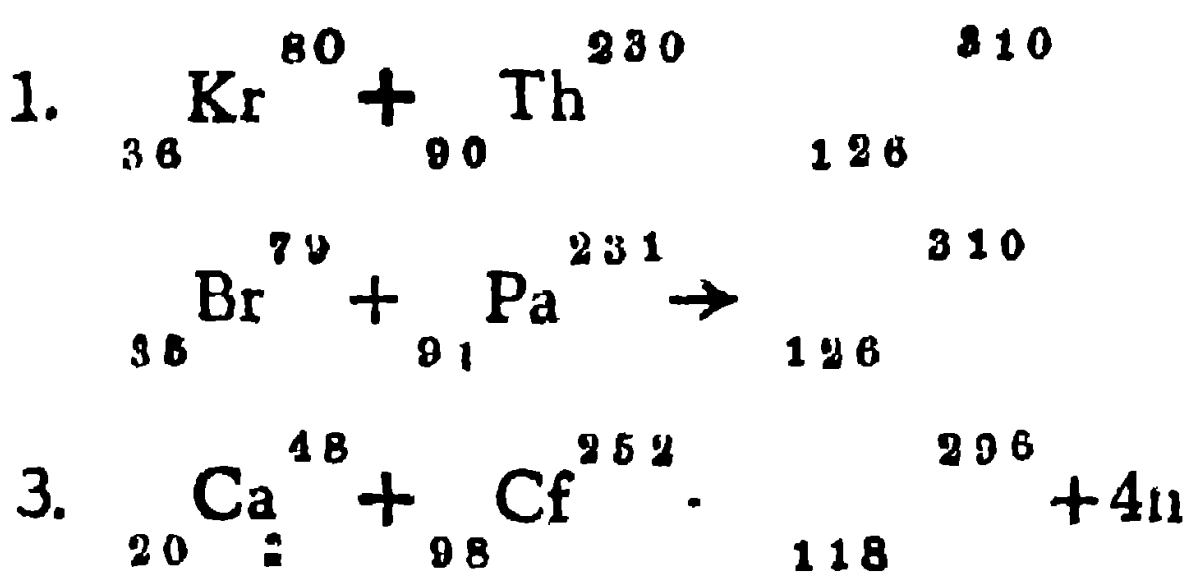
আরো অনেক বিক্রিয়ার কথা ভাবা যায়—কিন্তু কার্যতঃ এইসব বিক্রিয়া ঘটাতে হলে যে ভারী আয়ন ত্বরণ-যন্ত্রের প্রয়োজন, তার নির্মাণ যথেষ্ট ব্যয়বহুল। আশা করা যাচ্ছে, এই উদ্দেশ্যে নির্মীয়মাণ ভ্যান ডি গ্রাফ (Van de graaf) ও সাইক্লোট্রন (Cyclotron) সমস্ত সমস্যার সমাধান করে দেবে।

এখন আমরা আবার সেই আগের প্রশ্নে ফিরে আসতে পারি। অতি ভারী মৌলিক পদার্থ না হয় পাওয়া গেল—তার প্রয়োজনীয়তা কোথায়? আগেই বলেছি বর্তমান মৌলিক পদার্থগুলির মতই এরা সভ্যতাকে আরো এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে। তাছাড়া স্থায়ী অতি ভারী মৌলিক পদার্থ পাওয়া গেলে ইউরেনিয়াম থেকে আরো সহজ এবং সুবিধাজনক ভাবে তাথেকে নিউক্লীয় শক্তি (Nuclear energy) পাওয়া যাবে। এখন আমাদের ভাণ্ডারে রয়েছে অজস্র অস্থায়ী আইসোটোপ—অতি ভারী মৌলিক পদার্থগুলির সঙ্গে সেই আইসোটোপের ভাণ্ডারটিও আরো ফুলে ফেঁপে উঠবে। রসায়ন, চিকিৎসা, ধাতুবিজ্ঞান প্রভৃতি সব ক্ষেত্রেই তখন এদের প্রয়োগের ফলে সভ্যতার এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে।

প্রথম শত মৌলিক পদার্থের পর মেণ্ডেলিফের স্মরণে মেণ্ডেলেভিয়াম (Mendelevium) নাম দিয়ে যে দ্বিতীয় শত মৌলিক পদার্থের শুভযাত্রা সবে আরম্ভ হলো, তা জয়যুক্ত হোক—পর্যায় সারণী আবিষ্কারের শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আমরা এই কামনা করি।

বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনা

বাসন্তীদুলাল নাগচৌধুরী* ও জয়ন্ত বসু†

কোন দেশের উন্নয়নে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার গুরুত্ব এখন প্রায় সকলেই স্বীকার করেন। কিন্তু মাত্র ত্রিশ বা চল্লিশ বছর আগেও ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে এই পরিকল্পনাকে সুনজরে দেখা হতো না। সর্বপ্রথম সোভিয়েট ইউনিয়নে সমগ্র দেশের ভিত্তিতে সুবৃহৎ পরিকল্পনার রূপায়ণ সুরু হয়; পরে এর গুরুত্ব ক্রমে ক্রমে অন্যান্য দেশেও স্বীকৃতি লাভ করে। আমাদের দেশে স্বাধীনতার আগেই ত্রিশের দশকে পরিকল্পনা রচনা করবার জন্যে সচেষ্ট হন তদানীন্তন দেশীয় নেতৃবর্গ। ১৯৩৯ সালে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস একটি জাতীয় পরিকল্পনা সমিতি গঠন করেন। স্বাধীনতার পর তিনটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সমাপ্ত হয়ে এখন চতুর্থ পরিকল্পনার কাজ সুরু হয়েছে।

বর্তমান কালে যে কোন দেশের প্রগতি ও উন্নতির জন্যে বৈজ্ঞানিক গবেষণা একান্ত অপরিহার্য। [এই প্রবন্ধে বৈজ্ঞানিক গবেষণা বলতে গবেষণা ও উন্নয়ন (Research and Development, সংক্ষেপে R & D), উভয়কেই বোঝান হয়েছে] আবার এই গবেষণাকে সুসংবদ্ধ ও ফলপ্রসূ করবার জন্যে একে সামগ্রিক পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করা বাঞ্ছনীয়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৩৯ সালে ভারতে যখন প্রথম জাতীয় পরিকল্পনা সমিতি গঠিত হয়, তখনই শিক্ষা, কারিগরী বিদ্যা ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা সম্পর্কে বিশদভাবে পর্যালোচনা করবার জন্যে একটি বিশেষ গোষ্ঠী নিয়োজিত হয়েছিল।

গবেষণার উদ্দেশ্য

এখন দেখা যাক, বৈজ্ঞানিক গবেষণার উদ্দেশ্যগুলি কি। আমরা এদের নিম্নলিখিত ছ'টি ভাগে ভাগ করতে পারি—

১) প্রাকৃতিক সম্পদের উন্নয়ন ও যথোপযুক্ত ব্যবহার।

২) মানুষের সামর্থ্য ও নৈপুণ্যের বৃদ্ধিকরণ এবং তাদের যথাযোগ্য ব্যবহার।

৩) বিভিন্ন গঠনরীতি বা নির্মাণকৌশলের উন্নয়ন।

৪) উৎপাদন বৃদ্ধির জন্যে নূতন জ্ঞান সঞ্চয়।

৫) রোগ নিবারণ, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি সামাজিক কাজ।

৬) মানুষের কৌতূহল চরিতার্থ করবার জন্যে বিশুদ্ধ জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত করা।

শেষোক্ত বিষয়টিকে পরিকল্পনার ক্ষেত্রে গবেষণার অন্যতম উদ্দেশ্য হিসাবে অনেক দেশেই ধরা হয় না। তবে প্রখ্যাতনামা অধ্যাপক ব্ল্যাকেটের মতে এটিকে অবশ্যই গণ্য করা উচিত। এ বিষয়ে তাঁর অভিমতই মনে হয় গ্রহণীয়।

গবেষণা খাতে ব্যয়

আমাদের দেশে গবেষণার জন্যে প্রয়োজনীয় সম্পদ কেমনভাবে সংগ্রহ করা হয় এবং কিভাবে তা বণ্টন করা হয়ে থাকে, এইবার সেই বিষয়ে আলোচনা করা যাক। ভারতবর্ষে এই সম্পদের অধিকাংশই সরকারের পক্ষ থেকে দেওয়া হয়; শতকরা মাত্র ৫ ভাগের মত পাওয়া যায় বেসরকারী

*পরিকল্পনা কমিশন, 'যোজনা ভবন', নূতন দি-১

†সাহা ইনষ্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স, কলিকাতা-৯

সূত্রে। বলা বাহুল্য, এই সম্পদের যোগান দেওয়া সরকারের পক্ষে একটি ব্যয়স্বরূপ। কি কি খাতে সরকারের আয় ও ব্যয় হয়ে থাকে, প্রসঙ্গতঃ সেটা বলে রাখি। আয়ের উৎস: ১) ট্যাক্স, ২) সুদ, জীবনবীমার প্রিমিয়াম ইত্যাদি, ৩) বৈদেশিক সাহায্য, ৪) সরকারী উদ্যোগগুলির লাভের বাড়তি অংশ, ৫) ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত সঞ্চয় (যেমন—সেভিংস ব্যাঙ্কে সঞ্চয়) ৬) ঘাট্‌তি অর্থনীতি (Deficit financing) ৭) ঋণ বা খত (Bond), ৮) সরকারী লটারী। ব্যয়ের কারণ: ১) শাসনব্যবস্থা, ২) দেশরক্ষা, ৩) কৃষি ও সেচব্যবস্থা, ৪) শিল্প ও শক্তি, ৫) যোগাযোগ ও যানবাহন, ৬) ঋণ পরিশোধ করা বা ঋণের সুদ দেওয়া, ৭) স্বাস্থ্য ও শিক্ষা, ৮) বৈজ্ঞানিক গবেষণা ইত্যাদি। (শেষোক্ত দুটিকে সামাজিক কারণ বলা যেতে পারে)।

সুতরাং বোঝা যাচ্ছে যে, বৈজ্ঞানিক গবেষণা হচ্ছে সরকারী ব্যয়ের কারণের অনেকগুলির মধ্যে একটি। আমাদের দেশে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে গবেষণা খাতে ব্যয় মোট জাতীয় উৎপাদনের যথাক্রমে প্রায় ০.০৬%, ০.১৬% ও ০.২৬% ছিল। চতুর্থ পরিকল্পনা অনুযায়ী এই ভাগ আগামী কয়েক বছরে বেড়ে পরিকল্পনার শেষে প্রায় ০.৪% হবে। কিন্তু এটা তো ক্রমাগতই বেড়ে যেতে পারে না; তাহলে কোথায় গিয়ে এটা প্রায় স্থির হয়ে থাকবে? কিছুকাল আগে দিল্লীতে একটি সম্মেলনে বিশেষজ্ঞেরা সব দিক বিবেচনা করে অভিমত দেন যে, এশিয়ার দেশগুলিতে গবেষণা খাতে ব্যয় মোট জাতীয় উৎপাদনের শতকরা ১ ভাগ হলে একটা স্থিতাবস্থা আশা করা যায়। এই স্থিতাবস্থায় পৌঁছানোর অর্থ এটা নয় যে, জাতীয় উৎপাদনের পরিমাণও স্থিতাবস্থায় পৌঁছুবে; জাতীয় উৎপাদন বাড়বে, গবেষণা খাতে ব্যয়ও বাড়বে, কিন্তু এদের বাড়বার হার প্রায় একই হবে বলে এদের অনুপাতও মোটামুটি একই থেকে যাবে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, আমেরিকায় এই অনুপাত প্রায় ৩%, সোভিয়েট ইউনিয়ন ও বৃটেনে প্রায় ২.৫% এবং অন্যান্য উন্নত দেশগুলিতে ১% থেকে ২%-এর মধ্যে। কিন্তু সামরিক আয়োজনের জন্যে যে গবেষণা, তার ব্যয় বাদ দিলে সবচেয়ে উন্নত দেশেও ঐ অনুপাত ১%-এর কাছাকাছি।

যাহোক, এ তো গেল শতকরা হিসাবের কথা। তারতে গবেষণা খাতে বাৎসরিক ব্যয় প্রকৃত টাকার অঙ্কে কি রকম দাঁড়ায়? ১৯৬৯-৭০ সালে এই টাকার অঙ্ক ছিল আনুমানিক ১৩৪ কোটি টাকা; এর মধ্যে মাত্র প্রায় ৫ কোটি টাকা বেসরকারী সূত্র থেকে পাওয়া। ১৯৪৭-৪৮ ও ১৯৫৮-৫৯ সালে মোট গবেষণা খাতে ব্যয়ের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে প্রায় ২.৮ কোটি টাকা ও ২৫ কোটি টাকা। আশা করা যাচ্ছে, ১৯৭৪-৭৫ সালে গবেষণা খাতে বাৎসরিক ব্যয়ের পরিমাণ হবে ১৮০ থেকে ১৯০ কোটি টাকা। চতুর্থ পরিকল্পনা-কালে জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধির বাৎসরিক হার হবে প্রায় ৬.৫%-৭%।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, গবেষণা খাতে ব্যয় ক্রমশঃ বাড়ানো হবে কেন? এর কারণ হিসাবে আমরা চারটি বিষয়ের উল্লেখ করতে পারি—

১) পণ্য উৎপাদনের গঠনরীতি ও নির্মাণকৌশলের উন্নয়ন।

২) পণ্য উৎপাদনের জন্যে নূতন কৌশল উদ্ভাবন—অপেক্ষাকৃত স্বল্প ব্যয়ে যাতে উৎপাদন হতে পারে।

৩) যে সব পণ্য বিদেশ থেকে আমদানী করতে হয়, সেগুলি দেশে তৈরি করে আত্মনির্ভর হওয়া এবং বিদেশী মুদ্রার ব্যয় সংকোচ করা।

৪) বিজ্ঞানীদের মধ্যে যে বেকার সমস্যা রয়েছে ও হতে পারে, যথাসাধ্য তার সমাধান করা।

আমাদের দেশে বিজ্ঞানের জন্যে কোন সামগ্রিক ব্যয়বরাদ্দ গৃহীত হয় না। কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন যে বিজ্ঞান-প্রতিষ্ঠানগুলি আছে, তাদের ব্যয়বরাদ্দ লোকসভা কর্তৃক নির্দিষ্ট হয়। কোন রাজ্য সরকারের অধীন যে প্রতিষ্ঠানগুলি থাকে, তাদের ব্যয়বরাদ্দ গৃহীত হয় সেই রাজ্যের বিধানসভা কর্তৃক।

ভারতে বর্তমানে গবেষণা খাতে যে বাৎসরিক ১৩৪ কোটি টাকা ব্যয় হচ্ছে, তার শতকরা ৮০ ভাগেরও বেশী ৪টি সংস্থার মাধ্যমে ব্যয়িত হয়। এই সংস্থাগুলির নাম: ১) পারমাণবিক শক্তি বিভাগ (DAE), ২) বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পর্ষদ (CSIR), ৩) দেশরক্ষা বিভাগ এবং ৪) ভারতীয় কৃষি গবেষণা পর্ষদ (ICAR)। অবশিষ্ট অংশ বহু ভাগে বিভক্ত হয়; অংশীদারদের মধ্যে আছে রেলবিভাগ, যোগাযোগ বিভাগ, জরিপ বিভাগ, বিভিন্ন গবেষণাগার প্রভৃতি। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, সাম্প্রতিক কালে গবেষণা খাতে ব্যয় ভারতীয় কৃষি গবেষণা পর্ষদে সবচেয়ে দ্রুত হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৬১-৬২ সালে সেখানে ব্যয় হয়েছে ১·৭ কোটি

১নং চিত্র।
গবেষণা-প্রকল্পের মূল্যায়ন।

টাকা আর ১৯৬৮-৬৯ সালে ব্যয়ের পরিমাণ প্রায় ১২ কোটি টাকা।

পণ্যের মূল্যায়ন ও গবেষণা

কোন পণ্যের প্রকৃত মূল্য স্থির করবার জন্যে দু'রকম পদ্ধতি প্রচলিত আছে। এদের বলা হয় ম্যাক্রো-মডেল (Macro-model) বা বৃহৎ-মডেল পদ্ধতি ও মাইক্রো-মডেল (Micro-model) বা ক্ষুদ্র-মডেল পদ্ধতি। পণ্যের উৎপাদনের জন্যে যে বিভিন্ন কার্যের প্রয়োজন হয়, সেগুলির সামগ্রিক ভাবে মূল্যায়ন করে যে মডেল তৈরি করা হয়, তাকে বলে ম্যাক্রো-মডেল। আর বিভিন্ন কার্যের প্রত্যেকটিকে তার অন্তর্ভুক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধাপে বিশ্লেষণ করে সেই ধাপের প্রত্যেকটির যথাযথ মূল্যায়ন করে যে মডেল তৈরি করা হয়, তাকে বলে মাইক্রো-মডেল। কোন পণ্যের মূল্যে গবেষণার ভাগ কতটা, এটা জানবার পক্ষে সাধারণতঃ মাইক্রো-মডেলই শ্রেয়ঃ, কেন না, পণ্যের মূল্যে গবেষণার অবদান কতখানি, সেটা নির্ণয় করা যেতে পারে এবং পরে এগুলিকে যোগ করে সমগ্র পণ্যে গবেষণার অবদান স্থির করা সম্ভব। ভারতের পরিকল্পনা কমিশন এই ধরণের কিছু কিছু কাজ সুরু করেছেন।

গবেষণা পরিকল্পনা করবার বিভিন্ন দিক

গবেষণার কার্যসূচীকে অস্পষ্ট না রেখে পরিষ্কার নির্দিষ্ট লক্ষ্যের ভিত্তিতে রচনা করা উচিত।

কোন্ গবেষণার জন্যে প্রস্তুতি কি রকম আছে, জনসমর্থন কেমন পাওয়া যেতে পারে, ইত্যাদি বিচার করে তার সাফল্যের সম্ভাবনা নির্ণয় করতে হয়। ঐ গবেষণার জন্যে যে মূলধন নিয়োগ করা যেতে পারে, তা হলো (সাফল্যের সম্ভাবনা × গবেষণার ফল)-এর সমানুপাতিক।

যে কোন গবেষণা-প্রকল্প নির্দিষ্ট করবার সময় ঐ গবেষণার কয়েকটি উপযুক্ত ধাপে নিয়ন্ত্রণ করবার ব্যবস্থা রাখতে হয়। গবেষণার ধারা যদি ভুল পথে চালিত হয়, ঐ নিয়ন্ত্রণের ফলে তা সহজেই সংশোধন করে নেওয়া যায়।

গবেষণার জন্যে পরিকল্পনা তৈরি করবার সময় প্রথমেই দেশের অবস্থার কথা মনে রাখতে হবে। দেশের আশু প্রয়োজনের তুলনায় গবেষণা পিছিয়ে থাকলে তো চলবেই না, কিন্তু খুব বেশী এগিয়ে গেলেও হবে না। আদর্শ অবস্থা হবে যদি গবেষণা দেশের প্রয়োজনের চেয়ে সব সময়ই সামান্য কিছুটা এগিয়ে থাকে।

গবেষণার ক্ষেত্রে কোন্ প্রকল্পকে কেমন অগ্রাধিকার দেওয়া হবে, পরিকল্পনার সময় সেটা স্থির করা প্রয়োজন। কি ভাবে এটা করা যেতে পারে? এখানে তিনটি বিষয় প্রধানতঃ মনে রাখতে হবে—১) অর্থনৈতিক উৎপাদন-ক্ষমতা, ২) সামাজিক উপযোগিতা এবং ৩) বিজ্ঞান ও কারিগরীবিদ্যার ক্ষেত্রে গুরুত্ব। যদি এই তিনটি বিষয়ের পরিমাপকে যথাক্রমে অ, স ও ব বলি এবং ঐগুলির ভিত্তিতে কোন বৈজ্ঞানিক প্রকল্পকে প্রদর্শিত ১নং চিত্রে যথোপযুক্ত স্থানে নির্দিষ্ট করতে পারি, তাহলে সেই প্রকল্পের কেমন অগ্রাধিকার পাওয়া উচিত, সেটা মোটামুটি বুঝতে পারা যায়। যে সব প্রকল্পের স্থান কেন্দ্র ক-এর কাছাকাছি (যেমন ১, ২, ৩), সেগুলির অগ্রাধিকার সবচেয়ে বেশী, কারণ তাদের ক্ষেত্রে অ, স ও ব, সবগুলিই খুব বড়। একই কারণে চিত্রে ৪-এর অগ্রাধিকার ৫-এর চেয়ে বেশী।

গবেষণার সার্থক পরিকল্পনা রচনা করতে হলে নিম্নলিখিত সামাজিক দিকগুলিতে দৃষ্টি রাখতে হয়।

১) সামাজিক অসাম্য দূরীকরণ—যাতে সব যোগ্য লোকই গবেষণা করবার সুযোগ-সুবিধা পান।

২) উপযুক্ত দৃষ্টিভঙ্গীর সৃষ্টি—যাতে গবেষণা

যথাযোগ্য মর্যাদা পায় ও জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ-ভাবে সম্পর্কিত হয়।

৩) সামাজিক বাধানিষেধ, কুসংস্কার, বদভ্যাস ইত্যাদি বর্জন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, আমাদের দেশে বিজ্ঞানীদের মধ্যেও নানান বদভ্যাস রয়েছে। তার মধ্যে একটি হলো —যাকে এক ধরণের কূপমণ্ডুকতা বলা যায়— বিজ্ঞানের এক বিভাগে গবেষণার সঙ্গে অন্য বিভাগের গবেষকেরা বিশেষ কোন সম্পর্ক রাখেন না। অথচ এটা দেখা গেছে যে, কোন কোন গবেষণায় বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সংযোগ থাকলে কার্যকারিতা বহু গুণ বৃদ্ধি পায়। এই জন্যে চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সংযোগ, সহযোগিতা ও আদান-প্রদানের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে।

৪) বিজ্ঞানীদের মধ্যে বেকারত্বের দূরীকরণ।

বিজ্ঞানসংক্রান্ত নীতি

আজকের দিনে কোন্ দেশে গবেষণার ধারা কোন্ দিকে বইবে, সেটা নির্ভর করে মূলতঃ বিজ্ঞান সংক্রান্ত সরকারী নীতির উপর। এই নীতির দিকে লক্ষ্য রেখেই বিজ্ঞান বিষয়ক পরিকল্পনা রচনা করতে হয়। ঐ নীতি সংক্রান্ত প্রস্তাব ১৯৫৮ সালে ভারতীয় সরকার কর্তৃক গৃহীত হয়। ভারতে বিজ্ঞানের সর্বাঙ্গীন উন্নতি, দেশের জনগণের জীবনের মানোন্নয়নের জন্যে বিজ্ঞানের ব্যাপক প্রয়োগ এবং বিজ্ঞানীদের যথোপযুক্ত স্বীকৃতিদান—এগুলি ছিল ঐ নীতির মূল বক্তব্য। তবে একথা স্বীকার করতে হয় যে, নীতিটি বাস্তবে কেমন রূপায়িত হচ্ছে, তা পর্যালোচনা করবার জন্যে ব্যবস্থাদির অভাব ছিল। এটাও বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার যে, দেশের অবস্থা যেমন পাল্টাবে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যায় যেমন নতুন নতুন সংযোজন হবে, সেই অনুযায়ী মাঝে মাঝে ঐ নীতিরও পুনর্মূল্যায়ন ও সংশোধন প্রয়োজন। আমাদের দেশে বোধহয় দশ বছর অন্তর অন্তর এই কাজটা সার্থকভাবে করা যেতে পারে। ভারতে বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও বিজ্ঞানের প্রয়োগ সম্পর্কিত তথ্যাদি এখন সংগ্রহ করা হচ্ছে এবং সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে বর্তমান বিজ্ঞান-নীতিকে আরও বাস্তব-নিষ্ঠ ও সুনির্দিষ্ট করবার জন্যে প্রস্তুতি চলছে।

"সত্যের প্রতি যাহাদের পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা নাই, ধৈর্যের সহিত তাহারা সমস্ত দুঃখ বহন করিতে পারে না, দ্রুতবেগে খ্যাতিলাভ করিবার লালসায় তাহারা লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া যায়। এরূপ চঞ্চলতা যাহাদের আছে, সিদ্ধির পথ তাহাদের জন্য নহে। কিন্তু সত্যকে যাহারা যথার্থ চায়, উপকরণের অভাব তাহাদের পক্ষে প্রধান অভাব নহে। কারণ দেবী সরস্বতীর যে নির্মল শ্বেতপদ্ম তাহা সোণার পদ্ম নহে, তাহা হৃদয়-পদ্ম।"

—আচার্য জগদীশচন্দ্র

টেষ্ট-টিউব বেবী

রামনারায়ণ চক্রবর্তী *

মেয়েদের অনেক সময় বলতে শোনা যায় যে, তারা যেন শিশু-প্রস্তুতির কলবিশেষ। আজকাল পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র স্ত্রী ও পুরুষ সকল বিষয়ে সমান অধিকার পেয়েছেন এবং এমনই অবস্থা হয়েছে যে, মেয়েদের 'উইকার সেক্স' বা 'ফেয়ারার সেক্স' বলে পক্ষপাতিত্ব করা চলে না। মহাসমুদ্রের অ্যাঙ্গলার জাতীয় পুরুষ মাছ মাত্র চার ইঞ্চি লম্বা, কিন্তু স্ত্রী-মাছ তিন ফুট পর্যন্ত লম্বা হয় ও ওজনে হয় প্রায় দশ-পনেরো কিলোগ্র্যাম এবং স্ত্রী-মাছ পুরুষ মাছকে তার মাথায় নিয়ে আজীবন ঘুরে বেড়ায়। এছাড়া বলা যায় যে, সিংহ সিংহীর চেয়ে দেখতে সুন্দর এবং ময়ূর ময়ূরীর চেয়ে সুশ্রী। মেয়েদের উইকার সেক্স বা ফেয়ারার সেক্স না বলবার আরও অনেক কারণ বর্তমানে দেখানো যেতে পারে। মেয়ে ও পুরুষের সমান অধিকারের পরিপ্রেক্ষিতে ট্রামে-বাসে মেয়েদের সংরক্ষিত আসন দেখে ও মেয়েদের জন্যে সংরক্ষিত ট্রাম দেখে পুরুষদের ভ্রূকুটি করবার কারণ আছে কিনা বলতে পারি না। কিন্তু সন্তান প্রসবের ব্যাপারে মেয়েদের জীবন যে ভাবে বিপন্ন হয়ে পড়তে পারে, তাতে একথা বলা ঠিক হবে না যে, সৃষ্টির সময়ে স্ত্রী ও পুরুষদের সন্তান উৎপত্তির ব্যাপারে দুর্ভোগের সমান ভাগ দেওয়া হয়েছিল। সমাধিস্থানে অনেক মেয়েদের সমাধির উপর লেখা থেকে বুঝতে পারা যায় যে, সন্তান প্রসবের মহা দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে এঁদের প্রাণহানি ঘটেছে।

আরও একটা বিষয়ে বিশেষভাবে ভাববার আছে। পশুপাখীরা সাধারণভাবে সন্তান প্রসব করে। স্ত্রী-পশু যখন শৈশব অবস্থা থেকে প্রাপ্ত-বয়স্ক হয়, তখন তার ঋতু আরম্ভ হয়। কিছুকাল পরে তার গর্ভে সন্তান ধারণের ক্ষমতা জন্মে। মানুষেরও একদিন এই রকম অবস্থা ছিল। আমাদের দেশে পঞ্চাশ বছর আগের কথা ভাবলে দেখা যায়, মেয়েদের পনেরো-ষোল বছর বয়স থেকেই সন্তান হওয়া আরম্ভ হতো এবং তারপর নিয়মিতভাবে ছেলেমেয়ে হতো। বর্তমানে আমরা আরও অনেক সভ্য হয়েছি, তাই আজকাল শিক্ষিত সমাজে সাধারণতঃ পঁচিশ বছর বয়সের আগে মেয়েদের গর্ভাধান হয় না। প্রথম সন্তানের পর তারা কয়েক বছর অপেক্ষা করে দ্বিতীয় সন্তানের জন্যে প্রস্তুত হয়। নতুন মোটর ক্রয় করে তাকে না চালিয়ে কিছুকাল রেখে দেবার পর চালানো প্রথম দিকে বেশ কষ্টসাধ্য হতে পারে। আগে-কার দিনে মেয়েদের সন্তান প্রসব অনেক সহজ ও সরল ছিল। ত্রিশ বছর আগেও কলিকাতা সহরে সন্তান প্রসবে সাহায্যের জন্যে অশিক্ষিত বা অল্প শিক্ষিত ধাইয়ের প্রচলন ছিল। মাত্র দুই বা চার টাকায় এদের পাওয়া যেত। একথা ঠিক যে, সে যুগে শিশুমৃত্যুর হার ও প্রসবের সময়ে মায়েদের মৃত্যুর হার বেশী ছিল। কিন্তু তার প্রধান কারণ, সে যুগে ভাল ওষুধ ছিল না। বর্তমান যুগের সালফোনেমাইড ও অ্যান্টিবায়োটিক শ্রেণীর ওষুধগুলি এই মৃত্যুসংখ্যা হ্রাসের জন্যে বিশেষভাবে দায়ী। অন্যদিকে একথা মনে রাখতে হবে যে, সভ্যতার প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে অবস্থা-

---

* ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ এক্সপেরিমেণ্টাল মেডিসিন; যাদবপুর, কলিকাতা-৩২।

পর ও শিক্ষিত সমাজে সিজেরিয়ান শিশুর সংখ্যা অতি দ্রুত বেড়ে যাচ্ছে। হয়তো কিছুকাল পরে দেখা যাবে, মেয়েদের সন্তান প্রসব উদরের অস্ত্রোপচার ছাড়া সম্ভব নয়। উপর্যুপরি সিজেরিয়ানের অসুবিধা ও ভয়ে তখন হয়তো মেয়েরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে পরিমিত ক্ষুদ্র সংসারের জন্যে সর্বৈব চেষ্টা করবে। এই সকল দিক ভেবে দেখলে মনে হয়, মানব-সভ্যতার প্রগতির ফলে একদিন টেষ্ট-টিউব শিশুর বিশেষ প্রয়োজন হবে।

স্ত্রীর ঋতু আরম্ভের কিছুকাল পরে গর্ভে সন্তান ধারণের ক্ষমতা জন্মে। স্ত্রীর ডিম্বাধার বা ওভারিতে যে ডিম্বকোষ প্রস্তুত হয়, তা পরে ফেলোপিয়ান টিউবে প্রবেশ করে। এই সময়ে ঐ ডিম্বকোষে স্ত্রীর গুণাগুণ সমন্বিত তেইশটি ক্রোমোসোম থাকে। একে একটি অর্ধকোষ বললেও দোষ হবে না। স্ত্রী-পুরুষের মিলনের সময় এই ফেলোপিয়ান টিউবে পুরুষের স্পার্ম বা শুক্রকোষ প্রবেশ করে এবং ডিম্বকোষ ও শুক্রকোষের মিলনে এরা এক ভ্রূণে পরিণত হয়। পুরুষের শুক্রকোষে পুরুষের গুণাগুণ সমন্বিত তেইশটি ক্রোমোসোম থাকে। এই দুটি অর্ধকোষের সংযুক্তিতে ছেচল্লিশটি ক্রোমোসোমযুক্ত এককোষে মানবভ্রূণ প্রস্তুত হয়। পরে এই ভ্রূণ এককোষ ভেঙে অনুরূপ দুই কোষ হয় ও দুই কোষ ভেঙে চার কোষ হয়। এইভাবে কোষের সংখ্যা বর্ধিত হয়। ক্রমশঃ এই কোষগুলি যথাযথভাবে নিজেদের সাজিয়ে নিয়ে ব্লাষ্টোসিষ্টে পরিণত হয়। এই ব্লাষ্টোসিষ্ট বর্ধিত হবার সঙ্গে সঙ্গে এর কাঠামো আরও জটিল হতে থাকে এবং এর পরিপুষ্টির জন্যে জরায়ুর একধারে গর্ভফুল গঠিত হয়। বর্ধিত ভ্রূণ গর্ভফুলের সঙ্গে আম্বেলিক্যাল কর্ড বা গর্ভনাড়ীর দ্বারা সংযুক্ত হয়। এই গর্ভফুলের মধ্য দিয়ে মায়ের পরিপুষ্ট রক্ত এসে ভ্রূণের রক্তের সঙ্গে মিশে ভ্রূণকে পরিপুষ্ট করে ও ভ্রূণের অব্যবহার্য অংশ ভ্রূণের রক্ত থেকে মায়ের রক্তে চলে যায়। এভাবে ভ্রূণ তার পরিপুষ্টির জন্যে আহার্য পায়, শ্বাসক্রিয়া চালাতে পারে ও তার অপ্রয়োজনীয় বা ক্ষতিকারক জিনিষগুলি পরিত্যাগ করতে পারে।

সম্প্রতি বি. বি. সি-র টেলিভিশনে ডাঃ পেট্রিক ষ্টেপ্‌টো বলেছেন যে, এক মহিলার ওভারি বা ডিম্বাধারের সঙ্গে যুক্ত ফেলোপিয়ান টিউব থেকে তিনি ডিম্বকোষ বের করেছেন ও তার সঙ্গে ঐ মহিলার স্বামীর শুক্রকোষের মিলন ঘটিয়ে গবেষণাগারে কৃত্রিম অবস্থায় মানবভ্রূণ সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে। তাঁর ইচ্ছা, কয়েক দিন পরে ঐ 'টেষ্ট-টিউব ভ্রূণ' তিনি ঐ মহিলার গর্ভে অর্থাৎ জরায়ুতে বসিয়ে দেবেন। এই ঘটনার পর বিশ্বে টেষ্ট-টিউব শিশু সম্বন্ধে একটা আলোড়ন সুরু হয়ে গেছে। অবশ্য এভাবে যদি সন্তানের সৃষ্টি হয়, তবে তাকে যথাযথ টেষ্ট-টিউব শিশু বলা যাবে না; কেন না, এতে ভ্রূণকে শিশুতে পরিণত করতে স্ত্রীর জরায়ুর সাহায্য নেওয়া হচ্ছে। যে বন্ধ্যা স্ত্রীর ফেলোপিয়ান টিউবের ডিম্বাণুর সঙ্গে পুরুষের শুক্রাণুর যথাযথ সংমিশ্রণ ঘটিয়ে ভ্রূণ প্রস্তুতির ক্ষমতা নেই, তাঁর জরায়ুতে এভাবে শিশু উৎপাদন সম্ভব হতে পারে।

অনেক ক্ষেত্রে পুরুষের শুক্রাণু সঞ্চালনের যথাযথ ক্ষমতা থাকে না। এঁদের স্ত্রীরা বন্ধ্যা না হলেও গর্ভসঞ্চারে অকৃতকার্য হন। বেশ কিছু কাল আগে বিজ্ঞানীরা দেখিয়েছেন যে, এসব ক্ষেত্রে ঐ ধরণের পুরুষের শুক্রাণুর কৃত্রিম উপায়ে স্ত্রীর জরায়ুর ভিতর দিয়ে ফেলোপিয়ান টিউবস্থিত ডিম্বকোষের সঙ্গে মিলন ঘটালে ঐরূপ স্ত্রীর গর্ভসঞ্চার হতে পারে। এভাবে বিশ্বে এপর্যন্ত বহু শিশুর জন্ম হয়েছে। বর্তমানে এভাবে একটা মোরগ বা ষাঁড়ের শুক্রাণুর সাহায্যে মুরগী ও গাভীর গর্ভসঞ্চার করা হয়ে থাকে। একে টেষ্ট-টিউব শিশুর প্রথম পর্যায় বলা যেতে পারে।

টেষ্ট-টিউব শিশুর দ্বিতীয় পর্যায় হচ্ছে, যা ডাঃ ষ্টেপ্‌টো করতে চাইছেন।

টেষ্ট-টিউব শিশুর গবেষণার ব্যাপারে ইঁদুর বিশেষ কাজে লেগেছে। একটি স্ত্রী-ইঁদুরের এক সঙ্গে অনেকগুলি শিশু জন্মগ্রহণ করে। এতে গবেষণার কাজে সুবিধা হয়। তাছাড়া মানবভ্রূণের তুলনায় ইঁদুরের ভ্রূণ অনেক দ্রুত বর্ধিত হয়। ইঁদুরের ভ্রূণ জরায়ু থেকে বাইরে এনে গবেষণাগারের অবস্থায় বেশ কিছুটা বর্ধিত করা সম্ভব হয়েছে। রক্তের প্লাজ্‌মা ও কিছু ভ্রূণ ঘষে বা মেড়ে নিয়ে তার মধ্যে ইঁদুরের ভ্রূণ রেখে কেম্ব্রিজের ডাঃ নিউ ও ডাঃ ষ্টাইন তার বৃদ্ধি সম্বন্ধে পরীক্ষা করেন। পরে রক্তের প্লাজ্‌মার বদলে রক্তের সিরাম বা তরল অংশ ব্যবহার করেন এবং সিরাম যাতে শুকিয়ে না যায়, তার জন্যে ঢাকার ব্যবস্থা করেন। ক্রমশঃ তাঁরা দেখেন ঐ ঢাকার মধ্যে যথেষ্ট অক্সিজেন ও অল্প কিছুটা কার্বন-ডাই-অক্সাইড থাকলে ভ্রূণের বৃদ্ধির বিশেষ সুবিধা হয়। এভাবে তাঁরা দু-দিন পর্যন্ত ভ্রূণকে গবেষণাগারের অবস্থায় বর্ধিত হতে দেখেছেন এবং ঐ সময়ে ভ্রূণের মস্তিষ্ক, মেরুদণ্ড, চোখ, কান, কিড্‌নি প্রভৃতি হতে দেখা সম্ভব হয়েছে। ইঁদুরের জরায়ুতে এগুলি একই ভাবে হয়ে থাকে। ভ্রূণ এভাবে গবেষণাগারের অবস্থায় কিছুটা বর্ধিত হবার পর হঠাৎ অসুবিধার জন্যে রক্ত পরিচালনা বন্ধ হয়। এর পরও বেশ কিছুক্ষণ পর্যন্ত হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন যথেষ্ট জোরের সঙ্গে চলতে থাকে। পরে অবশ্য এই স্পন্দনও বন্ধ হয়ে যায়। পরীক্ষার ফলে ক্রমশঃ বোঝা যায় যে, ভ্রূণ কিছুটা বড় হবার পর তার আরও বেশী অক্সিজেনের প্রয়োজন হয়। মাতৃগর্ভে এমনই ব্যবস্থা আছে, যাতে ভ্রূণের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার অধিকতর অক্সিজেনের চাহিদা মেটানো সম্ভব। গবেষণাগারের অবস্থায় দেখা যায় যে, প্রথম দিকেই যদি অধিকতর অক্সিজেনের ব্যবস্থা করা হয়, তাহলে ভ্রূণের প্রভূত ক্ষতি—এমন কি, প্রাণহানিও হতে পারে। অবশ্য এভাবে ক্রমশঃ বেশী অক্সিজেনের ব্যবস্থা করেও ভ্রূণকে কয়েক দিনের বেশী গবেষণাগারের অবস্থায় বাঁচিয়ে রাখা শক্ত।

ইঁদুরের ভ্রূণের মত মানবভ্রূণ নিয়ে এত সূক্ষ্ম পরীক্ষা সম্ভব হয় নি। ভ্রূণের দেহের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার বিভিন্ন জটিল জিনিষের প্রয়োজনও বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই সব বিষয়ে সকল তথ্য এখনও বিশদভাবে জানা যায় নি। তাই জরায়ুর সাহায্য না নিয়ে কৃত্রিম উপায়ের ভ্রূণ থেকে বর্তমানে মানবশিশু উৎপাদন করা সম্ভব নয়। সম্প্রতি একটি প্রিমেচিওর বা অপূর্ণকালপ্রসূত মেষশাবককে গবেষণাগারে গর্ভফুলের পরিবর্তে কৃত্রিম যন্ত্রের সাহায্যে রক্ত সঞ্চালন করে অক্সিজেনের প্রয়োজন মেটানো ও তাকে পরিপুষ্ট করা সম্ভব হয়েছে। এভাবে গবেষণার ফলে মানুষ হয়তো সত্যই একদিন টেষ্ট-টিউব শিশু প্রস্তুত করবে।

টেষ্ট-টিউব শিশু প্রস্তুতির বিষয়ে যা অল্প-স্বল্প কাজ বর্তমানে হয়েছে, তা দেখে এখন থেকেই অনেকে নীতিগত প্রশ্ন তুলেছেন। আর্টিফিসিয়াল ইনসেমিনেশন বা কৃত্রিম শুক্রসঞ্চালনের কথা যখন প্রথম ওঠে, তখনও নীতির কথা উঠেছিল—আজ আর সে বিষয়ে কোন কথা শোনা যায় না। ডাঃ ষ্টেপ্‌টো বা তাঁর মত অন্যান্য গবেষকেরা যেভাবে বন্ধ্যা স্ত্রীর ফেলোপিয়ান টিউব থেকে ডিম্বকোষ বা ওভাম বাইরে এনে ঐ স্ত্রীর স্বামীর শুক্রকোষের মিলন ঘটিয়ে মানবভ্রূণ সৃষ্টি করে স্ত্রীর জরায়ুতে বসিয়ে দিয়ে শিশু উৎপাদনের চেষ্টা করছেন, তা সম্ভব হলে নীতিগত প্রশ্নের কথা ক্রমশঃ সকলে ভুলে যাবে। প্রকৃত নীতির প্রশ্ন তখনই উঠতে পারে যখন সত্য সত্যই গবেষণাগারে টেষ্ট-টিউব থেকে শিশু বেরিয়ে আসবে ও মায়ের জরায়ুতে বর্ধিত হবার প্রয়োজন হবে না। এরূপ হতে এখনও অনেক সময় লাগবে। ততদিনে নীতিরও আমূল পরিবর্তন হবে।

জংলী ফল-ফুল থেকে হাইব্রিড বা উন্নততর জাতের ফল-ফুল উৎপাদন করা হয়ে থাকে। জংলী আম আকারে ছোট, আঁঠি বড় ও মোটা এবং তেমন সুস্বাদুও নয়। বাগানের উন্নততর জাতের আম আকারে বড়, আঁঠি ছোট ও পাতলা এবং খেতেও সুস্বাদু। এভাবে মানব-শিশুর উন্নতিসাধন করা যায় কিনা, ভেবে দেখা উচিত। কিভাবে স্বামী-স্ত্রী কাজ করলে এবং কি ধরণের স্বামীর কি ধরণের স্ত্রী হলে উন্নততর মানবশিশু উৎপন্ন হতে পারে, সে বিষয়েও যথেষ্ট গবেষণা করবার আছে।

মানবভ্রূণ গবেষণাগারের অবস্থায় প্রস্তুত করে জরায়ুর মধ্যে বসিয়ে দেবার ব্যাপারে একটি বিষয়ে বিশেষভাবে নজর রাখতে হবে যে, ঐ সময়ে ভ্রূণের কোন ক্ষতি হতে পারে কিনা, যার ফলে শিশুর মধ্যে কিছু দোষ দেখা দিতে পারে। ফর্সেপ্‌সের সাহায্যে প্রসব করালে সময়ে সময়ে শিশুর মধ্যে ফর্সেপ্‌সের চাপজনিত কিছু দোষ দেখা যায়। ভ্রূণের হয়তো এই ধরণের ক্ষতি নাও হতে পারে। ভ্রূণ যখন এক কোষ অথবা অল্পসংখ্যক কোষযুক্ত থাকে, তখন বহির্জগতের অন্তরালে মায়ের জরায়ুর মধ্যে শান্তিতে বৃদ্ধি পায়। এই ধরণের ভ্রূণকে যদি গবেষণাগারের অবস্থায় রাখা যায়, তাহলে দৃশ্য ও অদৃশ্য আলোক রশ্মির কুপ্রভাবে তার জিনের ক্ষতিজনক পরিবর্তন হতে পারে না—একথা বলা শক্ত। ফেলোপিয়ান টিউব থেকে ডিম্বকোষ বাইরে আনবার সময়, ভ্রূণ প্রস্তুতির সময় এবং ভ্রূণকে জরায়ুতে বসিয়ে দেবার সময় এই বিষয়ে যথেষ্ট সতর্কতা-মূলক ব্যবস্থা থাকার প্রয়োজন। জেনেটিক কোড বা বংশগত গুণাগুণের সংকেত সম্বন্ধে লেখকের 'ডক্টর হরগোবিন্দ খোরানার নোবেল পুরস্কার লাভ ও প্রাণ-বিজ্ঞানের অগ্রগতি' প্রবন্ধে লিখিত হয়েছে (জ্ঞান ও বিজ্ঞান, দ্বাবিংশ বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা, জুন, ১৯৬৯, পৃষ্ঠা ৩২১-৩২৭)।

পরিশেষে টেষ্ট-টিউব শিশু সম্বন্ধে একটা ছোট গল্পের মাধ্যমে সাবধান বাণী প্রচার করা যেতে পারে। রাজপুত্তুর, মন্ত্রিপুত্তুর, কোটালপুত্তুর ও সওদাগর পুত্তুর বনে শিকার করতে গিয়ে সন্ধ্যায় পথ হারিয়ে এক গাছের উপর আশ্রয় নেয়। প্রথম প্রহরে রাজপুত্তুর জেগে থেকে সকলকে পাহারা দেবার সময় দেখে এক সন্ন্যাসী এসে গাছতলায় আগুন জ্বেলে এক মন্ত্র পড়েন ও বহু হাড় সেখানে কোথা থেকে এসে জড়ো হয়। দ্বিতীয় প্রহরে মন্ত্রীপুত্তুর পাহারা দেবার সময় দেখে যে, সন্ন্যাসী মন্ত্র পড়ে হাড়-গুলিকে যথাযথ ভাবে সাজানো নরকঙ্কালে পরিণত করেন। এভাবে কোটালপুত্তুর নরকঙ্কালকে নর-দেহে পরিণত করবার মন্ত্র শিখে নেয় এবং শেষ প্রহরে সওদাগর পুত্তুর প্রাণহীন দেহে প্রাণসঞ্চারের মন্ত্র শিখে নেয়। তারপর সন্ন্যাসী ঐ সৃষ্ট মানুষকে সঙ্গে নিয়ে চলে গেলে প্রভাতে সকলে গাছ থেকে নেমে মন্ত্রগুলি পরীক্ষা করে দেখতে চায়। এভাবে প্রথমে তিন জনের মন্ত্রের সাহায্যে নর-দেহের পরিবর্তে একটি বাঘের দেহ তৈরি হয়। ঐ তিনজনের আপত্তি সত্ত্বেও সৃষ্টির নেশায় পড়ে গিয়ে চতুর্থ বন্ধুটি তার মন্ত্র পড়ে বাঘের দেহে প্রাণসঞ্চার করে এবং বাঘ তখন হালুম করে সকলকে খেয়ে ফেলে।

ডি. ভি. সি-র তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্র ও তার সমস্যা

রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়*

বন্যা নিয়ন্ত্রণ, সেচ ও বিদ্যুৎ উৎপাদন—এই তিনটি মুখ্য উদ্দেশ্য নিয়ে প্রায় কুড়ি বছর আগে ১৯৪৮ সালের ৭ই জুলাই ডি ভি. সি. অর্থাৎ দামোদর ভ্যালী করপোরেশনের প্রতিষ্ঠা হয়। কুড়ি বছরে এই তিনটি প্রকল্পের মধ্যে যেটির কাজ আজ সবচেয়ে সন্তোষজনক বলে অনুভূত হচ্ছে, সেটি হলো বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্প। ডি. ভি. সি-র বিদ্যুৎ প্রকল্পই আজ এদেশের সবচেয়ে বড় বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্প। এদেশের মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনের শতকরা ১১ ভাগেরও বেশী বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় ডি. ভি. সি-র প্রকল্পে। ডি. ভি. সি. এখন বোকারো, দুর্গাপুর ও চন্দ্রপুরা তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্রে এবং মাইথন, পাঞ্চেৎ ও তিলাইয়া জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রে মোট ১০৬১ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারে।

ডি. ভি. সি-র এই বিদ্যুৎ প্রকল্পের মধ্যে দুর্গাপুর ও চন্দ্রপুরা তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্র দুটি দেখবার সুযোগ সম্প্রতি আমাদের হয়। তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্রের মধ্যে সর্বপ্রথম চালু হয় বোকারো কেন্দ্র ১৯৫৩ সালে এবং তারপর হয় দুর্গাপুর কেন্দ্র ১৯৬০ সালে। চন্দ্রপুরা তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রথম দুটি ইউনিট চালু হয় ১৯৬৪ ও ১৯৬৫ সালে। আর তৃতীয় ইউনিটটি চালু করেন ভারতের বর্তমান প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ১৯৬৮ সালের ৭ই জুলাই। বোকারো কেন্দ্রে প্রতিটি ইউনিটের উৎপাদন ক্ষমতা হচ্ছে ৫০ মেগওয়াট, দুর্গাপুরের প্রতিটি ইউনিটের ৭৫ মেগাওয়াট এবং চন্দ্রপুরার প্রতিটি ইউনিটের ১৪০ মেগাওয়াট। চন্দ্রপুরা কেন্দ্রটি হচ্ছে এদেশের সর্ববৃহৎ একক বিদ্যুৎ- উৎপাদন কেন্দ্র।

দুর্গাপুর প্রকল্প

দুর্গাপুরের তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্রে তিনটি ইউনিট আছে। তার মধ্যে বর্তমানে প্রথম ও তৃতীয় ইউনিট চালু আছে এবং দ্বিতীয় ইউনিটটির কাজ বন্ধ রয়েছে। দ্বিতীয় ইউনিট বন্ধ থাকবার কারণ হিসাবে কেন্দ্রের জেনারেল সুপারিন-টেনডেন্ট শ্রী এন. সি. বসুর কাছে জানা গেল—এই ইউনিটের স্যাফ্‌টের (যার সঙ্গে টারবাইন যুক্ত থাকে) একস্থানে সামান্য অংশ বেঁকে গেছে। এই ত্রুটি কেন্দ্রের ইঞ্জিনীয়াররা ধরতে পেরেছেন বলে দাবী করেন। কিন্তু যেহেতু এই ইউনিটটির যন্ত্রপাতি জার্মেনীর একটি শিল্প প্রতিষ্ঠান সরবরাহ করছেন, সেহেতু তাঁদের একজন বিশেষজ্ঞ এসে এই বিষয়ে সমর্থনসূচক অভিমত প্রকাশ করলে তবেই এই ত্রুটি সংশোধনের কাজে হাত দেওয়া যাবে। তাঁর অভিমতের অপেক্ষায় এই ইউনিটটি তাই এখন বন্ধ রয়েছে।

আমরা জানি, তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্রে কয়লার সাহায্যে বয়লারে জলীয় বাষ্প সৃষ্টি করা হয় এবং সেই বাষ্পের সাহায্যে টারবাইন চালিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়। তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্রে কয়লা হচ্ছে তাই একটা প্রধান সমস্যা। এখানে যে কয়লা ব্যবহৃত হয়, তা খনি থেকে তোলা কয়লার বড় টুকরা নয়। এখানে গুঁড়া কয়লা ব্যবহার করা হয় এবং তাও আগে থেকে ধৌতাগারে (ওয়াশারী) ধুয়ে নেবার পর। আমাদের দেশে কয়লার অদাহ্য ভস্ম বা ছাইয়ের অংশ খুব বেশী—শতকরা প্রায় ৩০-৪০ ভাগ। দহনের

* দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং, কলিকাতা-২৯

পর এই ভস্ম জলের সঙ্গে বাইরে নিক্ষেপ করা হয়। দুর্গাপুর কেন্দ্রের কাছে নদী থাকায় ভস্ম নদীর জলেই নিক্ষিপ্ত হয়।

চন্দ্রপুরা প্রকল্প

দুর্গাপুরের তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্রের মত চন্দ্রপুরা কেন্দ্রেও তিনটি ইউনিট আছে। দুর্গাপুরের তুলনায় এখানকার প্রতিটি ইউনিটের বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা অনেক বেশী। এখানে যে কয়লা ব্যবহার করা হয়, তা আসে নিকটবর্তী দুগ্‌ধা কয়লা ধোতাগার থেকে। দুগ্‌ধা কয়লার ছাইয়ের অংশ অনেক বেশী—শতকরা ৪০ ভাগ। দৈনন্দিন এখানে ১৪ টন ছাই উৎপন্ন হয়। এইভাবে ছাই একটা নির্দিষ্ট উচ্চতা পর্যন্ত জমা হবার পর জল সেই উচ্চতা ছাপিয়ে পরের ঢালু জমিতে জমা হতে থাকে। এই বিপুল পরিমাণ ছাই পরবর্তী কালে একটা সমস্যা হয়ে দেখা দিতে পারে—এই প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলুম প্রোজেক্ট ইঞ্জিনীয়ার শ্রীকবিরাজের কাছে। উত্তরে তিনি বললেন, দুর্গাপুরে দেখা গেছে এই সঞ্চিত ছাইয়ের উপর উদ্ভিদ জন্মাতে পারে।

চন্দ্রপুরা কেন্দ্রের আর একটি সমস্যা হচ্ছে জল। এই কেন্দ্রের কাছে কোন প্রাকৃতিক নদ-নদী নেই, কৃত্রিম উপায়ে এখানে একটি জলাধার সৃষ্টি করা হয়েছে। সেই জলাধারের জল বয়লারে
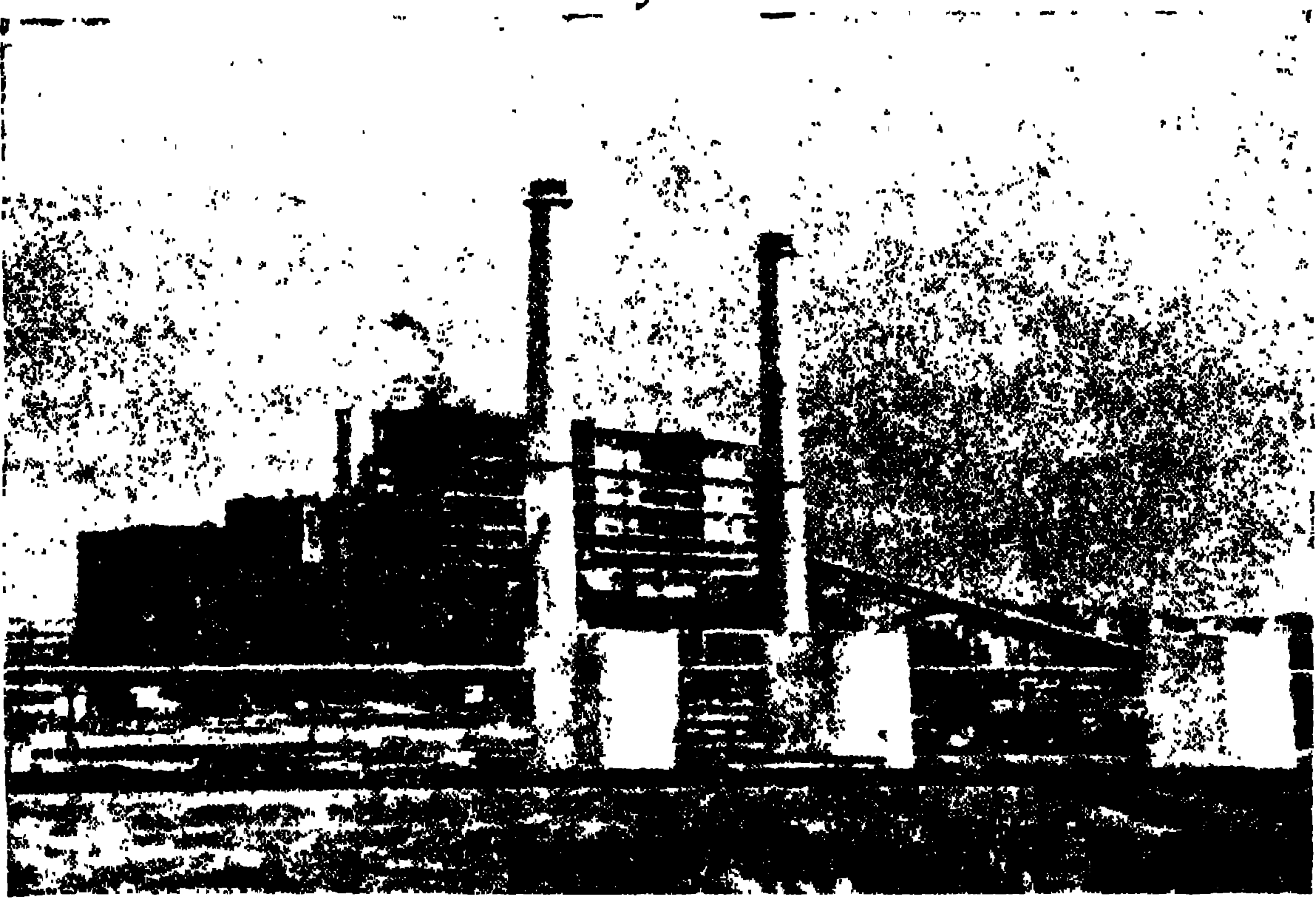
চন্দ্রপুরা তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্র।

এই বিপুল পরিমাণ ছাই কিভাবে জমা করা যায়, সেটা একটা সমস্যা। কেন্দ্র থেকে বেশ কিছু দূরে একটা স্থানে এই ছাই জমা করা হচ্ছে। সেখানে ঢালু জমিতে প্রথমে গর্ত করা হয় এবং সেই গর্তে জলবাহিত ছাই এসে জমা হয়। কিছুকাল পরে ছাইয়ের অংশ জলের নীচে অধঃক্ষিপ্ত হয় এবং জল উপরে থেকে যায়। বাষ্প সৃষ্টির কাজে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এখানে জলের পরিমাণ অপরিমিত নয়, তাই জলের মিতব্যয়িতার উপর বিশেষ দৃষ্টি দিতে হয়। যে বাষ্প টারবাইন চালাবার জন্যে ব্যবহৃত হয়, সেই উত্তপ্ত জলীয় বাষ্পকে ঠাণ্ডা করে জলরূপে আবার বয়লারে ব্যবহার করা হয়। এজন্যে উত্তপ্ত জলীয় বাষ্পকে ঠাণ্ডা করবার জন্যে এখানে

প্রথম জাতীয় ইলেকট্রনিক সম্মেলন এবং ইলেকট্রনিক শিল্পের অগ্রগতি

বিষ্ণুমাধব বন্দ্যোপাধ্যায়*

জাতীয় ইলেকট্রনিক্স সমিতির আহ্বানে বোম্বাইয়ের টাটা গবেষণাগারের হোমী ভাবা বক্তৃতা-কক্ষে বিগত ২৪শে থেকে ২৮শে মার্চ পর্যন্ত উপরিউক্ত সম্মেলনের নয়টি অধিবেশন হয়ে গেল। উদ্বোধনী ভাষণ দিলেন ডক্টর বাসন্তীদুলাল নাগ-চৌধুরী। সম্মেলনে যোগ দেন প্রায় তিন শত প্রতিনিধি। এঁদের মধ্যে ছিলেন প্রতিরক্ষা বিভাগের ইলেকট্রনিক যন্ত্র উৎপাদন ও গবেষণা কেন্দ্রগুলির প্রধান কর্মকর্তাগণ, জাতীয় গবেষণা-গারগুলির কয়েক জন অধিকর্তা, আমদানী শিল্প ও অন্যান্য সরকারী বিভাগের সচিববৃন্দ, আকাশবাণী, রেলপথ, ডাক, তার ও টেলিফোন বিভাগের বিশেষজ্ঞগণ। এ ছাড়া প্রতিনিধিরা এসেছিলেন পারমাণবিক সংস্থা, ভারত ইলেকট্রনিক্স ও নানা রেডিও শিল্প সংস্থাগুলি থেকে, মাত্র কয়েকজন এসেছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় ও শিল্প-শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে। প্রায় এক শত প্রবন্ধ পঠিত হয় ও প্রত্যেক অধিবেশনের শেষে বেশ খোলাখুলি আলোচনা হয়। অনেক সুন্দর কথা ও শক্ত কথাও শোনা গেল। আকর্ষণীয় বাদানুবাদ হলো, নানা তথ্যও পরিবেশিত হলো।

প্রারম্ভিক ভাষণ

সকলকে স্বাগত জানিয়ে, সমিতির সভাপতি ডক্টর বিক্রম সারাভাই বললেন, দেশে ইলেকট্রনিক্স শিল্পের দ্রুত উন্নতি এবং এই বিদ্যার অগ্রগতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকবার জন্যে সমিতিকে সরকার ১৯৬৬ সাল থেকেই প্রতিরক্ষার সরবরাহ দপ্তরের আওতায় এনেছেন। প্রথম ইলেকট্রনিক্স সমিতির তথ্যবহুল, বিজ্ঞ, সাহসিকতাপূর্ণ ও ভবিষ্যৎদর্শী ভাবা রিপোর্ট (Bhabha Report) সরকার কর্তৃক গৃহীত হবার চার বছর পরে এই সম্মেলন—যেখানে সবকিছুরই হিসাব নেওয়া হবে—উপযুক্ত সময়েই হচ্ছে। তিনি সংক্ষেপে জানালেন যে, আনন্দপরিবেশক যন্ত্রগুলির (যেমন—রেডিও, গ্র্যামোফোন ইত্যাদি) উৎপাদন আশাতিরিক্ত হয়েছে, কিন্তু রেডিও প্রেরক-যন্ত্র এবং প্রতিরক্ষা, রেলপথ, ডাক, তার ও টেলিফোন প্রভৃতির বিশেষ যন্ত্রগুলির ক্ষেত্রে উৎপাদন লক্ষ্য মাত্রার অনেক কম হয়েছে। মুখ্য কাঁচামাল (যেমন—ট্র্যানসিষ্টরের সিলিকন) উৎপাদনের উদ্ভাবনী গবেষণা যথেষ্ট অগ্রসর হয় নি। তিনি অনুযোগ করেন, প্রতিরক্ষা ও যোগাযোগ বিভাগের বিশেষ যন্ত্রগুলির উৎপাদনের ব্যয় বেশীই রয়ে গেছে। একচেটিয়া অধিকার থাকবার জন্যেই হয়তো ব্যয়-সংক্ষেপে আগ্রহ নেই। ভাবা রিপোর্টের উদ্ধৃতি দিয়ে (শিল্পে আত্মনির্ভরতার জন্যে প্রত্যেক কারখানায় যন্ত্রের উৎকর্ষ বিধানের উদ্দেশ্যে উদ্ভাবনী গবেষক ও গবেষণাগার অবশ্যই থাকবে, অন্যথায় কয়েক বছরের মধ্যেই উৎপন্ন যন্ত্রগুলি বিদেশে উৎপন্ন সমকালীন যন্ত্রের গুণপনার তুলনায় হীন হয়ে পড়তে বাধ্য)। তিনি বলেন যে, সামান্য কয়েকটি যন্ত্রের বেলাতেই এই উদ্ভাবকদের উপস্থিতি অনুভব করা যায়। এমন কি, অনেক যন্ত্রে, ভারতে উৎপন্ন যন্ত্রাংশ ব্যবহারে অনাগ্রহই লক্ষণীয়। সরকারের এখনই উচিত

* সাহা ইনষ্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স, কলিকাতা—৯

ভারতে উৎপন্ন যন্ত্রাংশ ব্যবহার করবার অলঙ্ঘনীয় নির্দেশ দেওয়া। দৃঢ়কণ্ঠেই তিনি বললেন, 'সরকারী ইলেকট্রনিক্স কমিটির সভাপতি হয়েও আমাকে স্বীকার করতে হচ্ছে যে, প্রধান বাধা আসছে প্রশাসক গোষ্ঠীর লঘু দৃষ্টিভঙ্গীর জন্তে। ঐ দৃষ্টিভঙ্গীতে উদ্ভাবনী উদ্যোগেরও আরম্ভ হয় তার নিয়মমাফিক স্বীকৃতিতে এবং শেষ হয় আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে লাইসেন্স দেওয়ায়!' তিনি জানালেন, 'উদ্ভাবনী নেতৃত্বকে প্রশাসনের অঙ্গীভূত বিষয় ভাবলে ভুল হবে এবং বিচক্ষণ ও কর্মে উৎসর্গীতপ্রাণ হলেও কোন প্রশাসকই এই নেতৃত্ব দিতে পারবেন না। এজন্তে শিল্প-বিজ্ঞানের নানা বিভাগে পরিপূর্ণ কারিগরী জ্ঞান ও দূরদর্শিতার প্রয়োজন, দীর্ঘদিন-ব্যাপী নিরলস সাধনায় অভ্যস্ত বিজ্ঞানীরই দরকার, তিন বা পাঁচ বছর পরে পরে যাঁরা নূতন বিভাগে হলেও উচ্চতর পদে বহাল হতে প্রয়াসী, তাঁরা অসংখ্য সূক্ষ্ম বিষয়ের গভীরে যেতেই চাইবেন না, যন্ত্রের উদ্ভাবকদলের নেতাকে যা অনিবার্যভাবেই করতে হবে।'

স্বতঃস্ফূর্ত বাগ্মিতায় এই 'সুন্দর' কথাটিও তিনি শোনালেন যে, ভারতীয়দের জীবনযাত্রার মান নিম্ন হলেও ভারত 'দরিদ্র দেশ' নয়। যাদের বিদ্যাচর্চায়, মৌলিক চিন্তায় যুগযুগব্যাপী ঐতিহ্য, বিজ্ঞানের জয়যাত্রার পথে, মানুষের সর্ব-বৃহৎ অভিযানে উন্নত দেশগুলির সঙ্গে সঙ্গে পা ফেলার দাবী তারা যে মানতে বাধ্য।

উপগ্রহ মারফৎ যোগাযোগ ও টেলিভিসনের সর্বাধুনিক উপায় গ্রহণে ভারত যে এগিয়ে চলেছে, তার আভাস দিয়ে তিনি আবাহনী বক্তৃতা শেষ করলেন।

উদ্বোধনী ভাষণ

ডক্টর নাগচৌধুরী তাঁর তথ্যবহুল, সারগর্ভ, সুচিন্তিত বক্তৃতার আরম্ভে ইটালীয় শ্লেষবাক্যের উদ্ধৃতি দেন—বাংলা করলে যা হয়—'খাই বেগুন-পোড়া পান্তাভাত, কথায় করি রাজা উজির মাত'। বললেন যে, বেচারা ইলেকট্রনিক্স কমিটিকে এত বেশী বড় বড় কথা শুনতে হয়েছে যে, সে কোন কিছু না করাই ভাল মনে করেছে। রেডিও উৎপাদন যে ভাবা নির্দেশিত সংখ্যার দ্বিগুণ হারে বাড়ছে, সে জন্তে কমিটি বা সরকার কৃতিত্বের দাবী করতে পারেন না—কেন না, তাঁরা এই বিষয়ে কোন চেষ্টাই করেন নি। তাঁদের বরং তলিয়ে দেখতে হবে যে, যে বিষয়ে তাঁরা উৎসাহ দিয়েছেন, কারখানা স্থাপন করেছেন বিদেশী সহযোগিতায়—যেমন প্রতিরক্ষা, যোগাযোগ ইত্যাদিতে ব্যবহৃত নানাবিধ জটিল যন্ত্র উৎপাদনে—সেগুলির উৎপাদন কেন লক্ষ্যমাত্রার কম হয়েছে? কেন কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে ১৯৭০ সালেও যন্ত্র কিনতে হচ্ছে? ডক্টর নাগচৌধুরী জানালেন, দেশের নানা সংস্থায় কম্পিউটার স্থাপনের একটা হুড়োহুড়ি পড়েছে। এলোমেলো-ভাবে এই যন্ত্র উদ্ভাবনের দ্বিতীয় বা তৃতীয় যুগের ছোট ছোট যন্ত্র কেনা হচ্ছে। আমরা আছি চতুর্থ যুগে। এই যন্ত্রগুলি কেবল যে গুণপনায় অনেক নিম্নস্তরের তাই নয়, এদের অংশবিশেষ অকেজো হলে তা পাওয়া দুরূহ ও ব্যয়সাপেক্ষ হবে। দেশের উচিত আগামী যুগের অন্ততঃ চারটি বড় যন্ত্র উপযুক্ত স্থানে স্থাপন করা। নিয়ামক সংস্থার মাধ্যমে, 'সাধারণে', অর্থের বিনিময়ে, নানা রকমের অসংখ্য হিসাব করায় ও রক্ষায় এগুলি ব্যবহার করতে পারবে।'

তিনি অনুযোগ করেন—লৌহ, বস্ত্র, রসায়ন ও ঔষধ উৎপাদন সংস্থাগুলিতে স্বয়ংক্রিয় ইলেকট্রনিক যন্ত্রের ব্যবহার নিতান্ত মন্দগতিতে বাড়ছে।

তিনি বলেন, গবেষণা ও যন্ত্র উদ্ভাবন কার্যে যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়া হয় নি। এই শিল্পে যন্ত্রের আয়ু সাধারণভাবে তিন থেকে পাঁচ বছর। তিন বছর পরে পরেই নূতন যুগের যন্ত্র উদ্ভাবিত

হয়, যা গুণগনায় পুরাতনকে সম্পূর্ণ অতিক্রম করে, আকারে হয় ছোট, যার পরিচালন ও রক্ষণ ব্যয় অল্প। এই অবস্থায় গবেষণা ও উদ্ভাবনে গড়িমসি ও ব্যয়সংক্ষেপ আত্মঘাতের নামান্তর। কত নূতন দিকে (TFD, Amorphous semi-conductors, electroluminiscent screens) যুগ পরিবর্তনের আভাস পাওয়া যাচ্ছে, অথচ দেশের সে বিষয়ে গবেষণার সূত্রপাত হয় নি।

তিন বা পাঁচ বছর আগে থেকেই কি কি আগামী যুগের যন্ত্র ও যন্ত্রসমষ্টি উদ্ভাবন করতে হবে, তার তালিকা করতে হবে। দেখতে হবে, দেশের কোথায় কারা এইগুলি উদ্ভাবনের ভার নিতে সক্ষম। এঁদের এই সমস্ত কাজে নিযুক্ত করতে যা যা দরকার তার ব্যবস্থা করতে হবে। অবস্থাবিশেষে একই কাজে একাধিক যোগ্য ব্যক্তি বা দলকে নিয়োগ করাই ঠিক। এখন এই ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় ও শিল্পশিক্ষা-সংস্থাগুলিকে যেমন বাদ দেওয়া হচ্ছে, সেটা করা উচিত হবে না। বিদেশী শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলির সহায়তায় কেবল কারখানা স্থাপন করে কখনই প্রাণবন্ত ইলেকট্রনিক শিল্পের প্রতিষ্ঠা হবে না। উদ্ভাবনে সহ-যোগী হতেই হবে, না হলে কোন শিল্পশিক্ষাই আত্মস্থ হবে না। এই বিষয়ে জাপানের প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করাই ঠিক। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে পরাধীন জাপান এই শিল্প আমদানীর জন্যে যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করেছে। কিন্তু শিল্পজ্ঞান আয়ত্ত করবার জন্যে, গবেষণা ও উদ্ভাবনে উৎসাহ দিতে ব্যয় করেছে তার চতুর্গুণ। আমরা বড় গলায় বলছি, আমরা 'কারিগরী জ্ঞান আমদানী করে সময় কিনছি'—আসলে আমরা কিছু কারখানা আমদানী করছি—কারিগরী জ্ঞান আমরা আয়ত্ত করতে পারছি কই। দেশীয় উদ্যোগে নূতন যুগের যন্ত্র বা যন্ত্রাংশ উৎপাদনের কারখানা যখন বসাতে পারবো, কেবল তখনই এই কথা সত্য হবে।

'এই সম্মেলনের ফলে যদি আমরা আমাদের লক্ষ্যগুলি পরিষ্কার ভাবে বুঝতে পারি এবং অতীত কার্যাবলীর যথার্থ মূল্যায়ন করতে পারি, তাহলে এগিয়ে চলবার বাড়তি বোঝা হাল্কা হবে' —এই বলে তিনি তাঁর ভাষণ শেষ করেন।

অধিবেশনে আলোচনার কয়েকটি দিক

ডক্টর নাগচৌধুরীর বক্তৃতার অব্যবহিত পরেই 'ভাবা রিপোর্টের পর শিল্পের অগ্রগতি' শিরোনামায় ডক্টর ভগবন্তম একটি তথ্যপূর্ণ বক্তৃতা দেন। পরের গুরুত্বপূর্ণ দুটি বক্তৃতা দেন প্রতিরক্ষার সরবরাহ বিভাগের সচিব শ্রী জি. এল. শেঠ। এই দুটি বক্তৃতায় শিল্পে আমদানী ও বিদেশী সহযোগিতা, বিদেশী অর্থ বিনিয়োগ সম্পর্কে সর-কারী চিন্তাধারা ও নীতি সম্পর্কে আলোচনা হয়। এই শিল্পের ইতিহাস আলোচনা করতে গিয়ে তিনি জানালেন, ১৯৪৮ সালে টেলিফোনের যন্ত্রপাতি উৎপাদনের জন্যে একটি বৃটিশ প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় স্থাপিত হয় Indian Telephone Industries; এর পরে ১৯৫৩ সালে রেডার, প্রতিরক্ষার নানাবিধ বার্তাপ্রেরক ও গ্রাহক-যন্ত্র, মাইন অনুসন্ধানী-যন্ত্র ইত্যাদি ও রেডিও ভাল্‌ভ উৎপাদনের জন্যে স্থাপিত হয় ভারত ইলেকট্রনিক্স।

'ভাবা রিপোর্ট ও তারপর' প্রথম অধিবেশনে বিধিমত আলোচিত হয়ে যাবার পরেও দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধিবেশনের আমন্ত্রিত বক্তা শ্রীশেঠ বক্তৃতার প্রথমার্ধের প্রায় প্রতিটি অনুচ্ছেদে এর থেকে উদ্ধৃতি দেন। বিদেশী সহযোগিতায় শিল্পোদ্যোগ করতে গিয়ে আমরা যেন না কেবলই পশ্চাদ্বর্তী যুগের যন্ত্র উৎপাদন করতে থাকি, এই দুর্ভাবনা ভাবা কমিটির চারজন বিজ্ঞানীকে কত চিন্তিত ও পীড়িত করেছিল, তার কিছু আভাস পাওয়া গেল। এঁরা দেশে গবেষণা ও শিল্প-জ্ঞানের উদ্ভাবনের চেষ্টায় যথোচিত উৎসাহ ও

রক্ষাকবচের ব্যবস্থার সুপারিশ করেন। একটি নূতন উদাহরণ ও তজ্জনিত সমস্যার আভাস দিই। 'দেশীয় গবেষণাগারে কোন বিষয়ে শিল্পজ্ঞান উদ্ভাবনের চেষ্টা ফলবতী হবার লক্ষণ দেখা গেলে, সে বিষয়ে বিদেশী শিল্পজ্ঞান আমদানীর সমস্ত প্রকল্প যেন বন্ধ রাখা হয়।' এখন ফেরাইট উৎপাদনে একটি গবেষণাগার সাফল্য লাভ করলেও উৎকর্ষের মানের ইতরবিশেষ ঘটছে। প্রতিরক্ষার যন্ত্র উৎপাদনের এক কারখানার প্রধান এই বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং কঠোর ভাবায় এই ব্যবস্থার নিন্দা করেন। গবেষণাগারের অধিকর্তা যথোচিত উত্তর দিয়ে নিয়ন্ত্রিতমান 'ফেরাইট' উৎপাদনের জন্যে আরও কিছু সময় প্রার্থনা করলে বিষম উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। প্রতিরক্ষার কারখানার কয়েক জন প্রধান নানা যুক্তি উপস্থাপিত করে বিদেশী সহযোগিতার লাইসেন্স অবিলম্বে মঞ্জুর করবার দাবী জানাতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত ডক্টর সারাভাইকে এই বিষয়ে আলোচনা বন্ধ করবার অনুরোধ করতে হয়।

দেশে আবিষ্কৃত শিল্পজ্ঞান উৎপাদনে প্রয়োগ করার অসুবিধাগুলি শেঠ মহাশয় বিশ্লেষণ করে (কয়েকজন শিল্পপতি ও কারখানার প্রধানও এই বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন) কেন বিদেশী সহযোগিতা ও মূলধন কাম্য তা ব্যাখ্যা করেন। রেডিও গ্রাহক-যন্ত্র ও কি কি যন্ত্রাংশ উৎপাদনে বিদেশী সহযোগীকে রয়্যালটি দেওয়া এখন নিষিদ্ধ, তিনি তারও একটি তালিকা পেশ করেন।

এঁর বক্তৃতায় জানা গেল, শ্রমের মূল্য অল্প বলে দক্ষিণ কোরিয়া, ফরমোসা, হংকং ও সিঙ্গাপুরে বিদেশী মূলধনে ও ব্যবস্থাপনায় নানা কারখানা স্থাপিত হয়েছে সস্তায় শিল্পজাত দ্রব্য উৎপাদনের জন্যে। বোঝা গেল এদেশেও এইরকম কারখানা স্থাপন করে বিদেশী মুদ্রা অর্জনের ইচ্ছা এঁদের হয়েছে।

ভাবা রিপোর্টের সুপারিশগুলি উপযুক্ত ক্ষেত্রে যে ভবিষ্যতে লজ্জিত হতে পারবে, তার ভরসা দিয়ে তিনি বক্তৃতা শেষ করেন।

বুধবারের শেষ অধিবেশনে 'গবেষণা ও উদ্ভাবন এবং এই শিল্পে তার সকল প্রয়োগের সমস্যাবলী' 'লোকবল (Manpower)' এবং 'গবেষণা ও উদ্ভাবনের পরিপ্রেক্ষিতে শিল্পজ্ঞান আমদানীর উপযোগিতা' সম্পর্কে বিশদ আলোচনা হয়। তিনটি প্রধান বক্তৃতার দুটিতেই পুনঃ পুনঃ ভাবা রিপোর্টের উদ্ধৃতি আসে। জানা গেল যে, কমিটি গবেষণাগার, বিশ্ববিদ্যালয় এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানে আঠারোটি শিল্পজ্ঞান উদ্ভাবনের গবেষণায় (১৯৬৯-'৭০ সালে) ৩৩ লক্ষ টাকা ব্যয় করেছেন। এই জাতীয় কার্যকলাপের সবগুলি ধরলে এখন বার্ষিক ব্যয় হচ্ছে ছয় কোটি এবং বিজ্ঞানী, পূর্তবিদ্ ও সাহায্যকারীর সংখ্যা পাঁচ হাজারের অধিক হবে না।

আরও জানা গেল যে, গবেষণাগারে শিল্পজ্ঞান উদ্ভাবনে যে ব্যয় হয়, সেই শিল্পজ্ঞানের প্রয়োগে কারখানায় উৎপাদন আরম্ভ করতে খরচ পড়ে তার দশ গুণ থেকে বিশ গুণ এবং শিল্পজাত দ্রব্যাদি বাজারে ছাড়তে ব্যয় হয় গবেষণার ব্যয়ের দ্বিগুণ। এই প্রসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখ্য এই যে, প্রত্যেকটি যন্ত্রের উদ্ভাবনে একটি নিম্নতম খরচ ও সময় লাগবেই—উদাহরণস্বরূপ রেডিও যোগাযোগ রক্ষার আধুনিক গ্রাহক-যন্ত্র উদ্ভাবনে বৃটেনে খরচ পড়েছে এক লক্ষ পাউণ্ড, সময় লেগেছে দুই বছর। এর কম ব্যয়ে বা সময়ে কিছুই হবে না—প্রকল্প বন্ধ করলে সমস্ত টাকাই ডুবে যাবে।

ইদানীং ভারতে উদ্ভাবনী প্রকল্পে সাফল্য লাভ হয়েছে দুটি ক্ষেত্রে। বলা যেতে পারে, অন্য প্রকল্পগুলিতে নিম্নতম মাত্রার চেষ্টা ও অর্থব্যয় এখনও হয় নি।

বৃহস্পতিবারের দুটি অধিবেশনের আলোচ্য বিষয় ছিল ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের ভূমিকা ও এই

শিল্পের প্রয়োজনীয় বিশেষ বিশেষ কাঁচা মাল সম্পর্কে। তথ্যপূর্ণ বক্তৃতা করেন শিবরামন (পরিষদ সচিব) ও ব্রহ্মপ্রকাশ। জানা গেল যে, ক্ষুদ্রায়তন শিল্প তাকেই বলা হয়, যার মূলধনী যন্ত্রপাতির মূল্য দশ লক্ষ টাকা পর্যন্ত। মূলধনী যন্ত্রপাতি যে সব প্রতিষ্ঠানের খুব কম (Unorganised unit) ভাবা কমিটি ও সরকার তাঁদের ধর্তব্য বলে জ্ঞান করেন না; নির্দেশও স্পষ্ট—এদের উৎসাহ দেবার কোন প্রয়োজন নেই।

শুক্রবারে আলোচিত হয় কম্পিউটার ও মাইক্রো-ইলেকট্রনিক্স। জানা গেল, ভারত ইলেক-ট্রনিক্স যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে উদ্ভাবিত ক্ষুদ্র-টেবিলে রাখবার উপযোগী হিসাব করবার যন্ত্র উৎপাদনে আগ্রহী।

শেষ অধিবেশনে ডক্টর সারাভাই উপগ্রহের মাধ্যমে টেলিভিসন প্রকল্প সম্পর্কে তথ্যপূর্ণ ও মনোজ্ঞ বক্তৃতা করেন।

উপসংহার

ভারত ইলেকট্রনিক্স যখন স্থাপিত হয়, বিদেশী সহযোগিতা তখন সহজলভ্য ছিল না। প্রথম দিকে এর উৎপাদন সামান্যই ছিল। ১৯৬৩ সালের পর আত্মনির্ভরতায় নূতন ও গভীরতর মূল্যবোধের প্রেরণায়—যখন ভাবা কমিটিকে এই শিল্পের উন্নতি বিধানের উপায় উদ্ভাবনে নিযুক্ত করা হয়—তখন থেকে এর দ্রুত সম্প্রসারণ ঘটে। ১৯৬৯ সালে এর উৎপাদনের মূল্য দাঁড়িয়েছে দশ কোটি টাকা। বিভিন্ন প্রকল্পে পৃথিবীর সমস্ত উন্নত দেশগুলির সহযোগিতায় এটা সম্ভব হয়েছে।

বিদেশী সহযোগিতা এখন সহজলভ্য, বিদেশী প্রতিষ্ঠানগুলি ভাবা রিপোর্টের রক্ষাকবচের সুপারিশগুলি এখন গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেন। পূর্বে সাধারণ রেডিও গ্রাহক-যন্ত্র উৎপাদনেও তাঁদের নির্দেশিত প্রতিষ্ঠানে উৎপন্ন যন্ত্রাংশ ব্যবহার আবশ্যিক ছিল। এখন ভারতে বহু রকম যন্ত্রাংশ উৎপন্ন হচ্ছে, অধিকাংশ যন্ত্রে সেগুলিই ব্যবহার হচ্ছে। ১৯৬৮-'৬৯ সালে উৎপন্ন রেডিওর সংখ্যা ২১ লক্ষ।

অতএব ভারতের অগ্রগতি অনস্বীকার্য, সচিব-গণ আহ্লাদিত, তাঁদের অনুসৃত নীতির ফলেই এটা ঘটেছে। ভাবা রিপোর্টের সুপারিশগুলি সম্যকভাবে পালিত না হওয়ার অনুযোগ, উদ্ভাবনে বিঘ্ন সৃষ্টির অভিযোগ তাঁরা প্রশাসকসুলভ দক্ষতায় দূরে নিক্ষেপ করছেন।

কিন্তু কি হয় নি? এক কথায় বলা যায়—কিছুই হয় নি। যা হয়েছে, হবেই বলে হয়েছে। যার জন্যে যত্ন করা হয়েছে—প্রতিরক্ষার জটিল যন্ত্রগুলি তাও উৎপন্ন হচ্ছে বৈকি! বিদেশী সহযোগিতায় আমরা তো তাও উৎপন্ন করছি। আরও জটিল ও গুণপনায় আরও উৎকৃষ্টগুলিও হবে, যদি আরও কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের সহ-যোগিতা গ্রহণ করা হয়। আমরা ভারতীয়েরা যে বড় বেশী পিছনে রয়েছি।

১৯৬৬ সালে প্রকাশিত ভাবা রিপোর্টে, বিদেশী যন্ত্র আমদানীর বদলে বিদেশী সহযোগিতায় আমরা যেন তাদের হাতের পুতুল হয়ে না পড়ি, এজন্যে যথেষ্ট ব্যাকুলতা ছিল। তাই বারংবার বলা হয়েছে, প্রত্যেক কারখানায় যেন উদ্ভাবক দল থাকে, এঁরা যেন যন্ত্রের উন্নতিবিধানের জন্যে সর্বদাই চেষ্টিত থাকেন, নূতন কারখানা আমরা যেন নিজেদের উদ্যোগেই স্থাপন করতে সমর্থ হই। মুখ্য কাঁচামাল উৎপাদনের চেষ্টা যেন উত্তরোত্তর জোরদার করা হয়। আসন্ন যুগের দিকে যেন আমাদের জাগ্রত দৃষ্টি থাকে। তা কি হচ্ছে? হলে তো নিয়ন্ত্রিতমান ফেরাইটের কারখানা স্থাপনের স্বপক্ষে এত উত্তেজনা হতো না। Frequency division multiplexing-এর বদলে Time division multiplexing এলো বলে—নিয়ন্ত্রিতমান ফেরাইটের প্রয়োজন যে ফুরিয়েছে, এই বোধ বিশেষজ্ঞ মহাশয়দের থাকতো।

উদ্ভাবনী গবেষণার ভাবা রিপোর্টে ১৯৬৯ সালে ১৪ কোটি টাকা খরচ হবে অনুমিত হয়েছিল, হয়েছে কুড়িয়ে বাড়িয়ে ছয় কোটি। সচিব মহাশয় আশ্চর্য হলেন, ডক্টর ভাবা কি করে লিখলেন ১৯৭৫ সালে এজন্যে খরচ হবে ৮৫ কোটি টাকা—যখন উৎপন্ন শিল্পজাত দ্রব্যের মূল্য হবে মাত্র ৩০০ কোটি টাকা (এখন অনুমিত হচ্ছে ৬০০ থেকে ৯০০ কোটি)। সচিব মহাশয়কে কি কেউ শোনায় নি—ফিলিপ্‌স্‌ কোম্পানী এজন্যে চার কোটি পাউণ্ড ব্যয় করছে, ইংল্যাণ্ডে ও ফ্রান্স করছে পাঁচ কোটি?

ডক্টর ভাবা আশা করেছিলেন, এই কঠিন কর্মে দেশের ১৫ হাজার বিজ্ঞানী ও পূর্তবিদ্ আত্মনিয়োগ করে সাফল্যের আনন্দে জীবন সার্থক করবেন। এঁদের সংখ্যা কুড়িয়ে বাড়িয়ে এখন হবে দু-হাজার। বিদেশী সহযোগিতায় পরের পর কারখানা স্থাপন করে গেলে এদের জীবন কি ব্যর্থ হবে না? বিদেশী মূলধনে ও ব্যবস্থাপনায় হংকং-এর মত বড় বড় কারখানা স্থাপন করে কিছু শ্রমিকের উদরান্নের—কদন্নের—ব্যবস্থা হবে। ইংরেজ তো জুট মিল স্থাপন করে অনেক আগেই তা করেছিল।

ভারতের শ্রেষ্ঠ সন্তানেরা জীবিকার জন্যে কি চিরকালই বিদেশে চলে যেতে থাকবে?

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের দ্বাবিংশ প্রতিষ্ঠা-বার্ষিকী

গত ২২শে মে রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীটে পরিষদ-ভবনে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের দ্বাবিংশ প্রতিষ্ঠা-বার্ষিকী বহু বিশিষ্ট বিজ্ঞানী, বিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রী ও বিজ্ঞানানুরাগীদের উপস্থিতিতে উদ্‌যাপিত হয়। অনুষ্ঠানের নির্ধারিত সভাপতি ভারত সরকারের পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য ডক্টর বাসন্তীদুলাল নাগচৌধুরী দিল্লীতে বিশেষ জরুরী কাজের দরুণ আসতে না পারায় তাঁর স্থলে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন প্রবীণ বিজ্ঞানী অধ্যাপক প্রিয়দারঞ্জন রায়। প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম বঙ্গ সরকারের শিক্ষাসচিব শ্রীযতীন্দ্র-চন্দ্র সেনগুপ্ত।

অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে কুমারী মঞ্জু ভট্টাচার্য উদ্বোধন সঙ্গীত পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠানের সভাপতি ও প্রধান অতিথিকে মাল্যদানের পর পরিষদের কর্মসচিব ডক্টর জয়ন্ত বসু তাঁর 'নিবেদনে পরিষদের বার্ষিক কার্যবিবরণী বিবৃত করেন। ('কর্মসচিবের নিবেদন' এই পত্রিকার বর্তমান সংখ্যায় স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশ করা হয়েছে।)

প্রধান অতিথির ভাষণে শিক্ষা সচিব শ্রীসেন-গুপ্ত বলেন: বর্তমান যুগ বিজ্ঞানের যুগ। বর্তমানে ব্যবহারিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের ভূমিকা আমরা অনুভব করি। একারণে প্রত্যেকেরই বিজ্ঞান বিষয়ে অন্ততঃ সাধারণ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। সেটা সম্ভব হতে পারে মাতৃ-ভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞানের প্রচার ও প্রসারের দ্বারা। এবিষয়ে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের ভূমিকা সত্যই প্রশংসনীয়। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষা প্রসারে রাজ্য সরকারের পরিকল্পনা আছে। বিজ্ঞান পরিষদের কাজে যথাসাধ্য সাহায্যের জন্য আমরা চেষ্টা করব।

পরিষদ সভাপতি অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু তাঁর ভাষণে বলেন: দেশ গঠনে অতি সাধারণ মানুষেরও ভূমিকা আছে, তাদের গড়ে তুলতে হবে। আমাদের দেশে শতকরা ৮০ জন নিরক্ষর হলেও আজ সাধারণ মানুষের মধ্যে বিজ্ঞান-চেতনা বেড়েছে। মাতৃভাষায় বিজ্ঞান প্রচার করে তাদের মনকে আরও শিক্ষিত করে তুলতে হবে। পশ্চিমী দেশ বিজ্ঞানে উন্নত বলে তাদের ভাষায় বিজ্ঞান না শিখলে হবে না—এ ধারণা ভুল। জাপান যে আজ এত উন্নতি করেছে তার একটি কারণ হলো, জাপানী ভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান শিক্ষা ও প্রচার। সাহিত্য বা দর্শনে আমাদের ভাষা এগিয়ে গেলেও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সে দাবী আমরা এখনও করতে পারি না। আরও দুঃখের বিষয়, উচ্চতর বিজ্ঞান-গ্রন্থ রচনার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার যে টাকা দেবেন বলেছিলেন, সে টাকা আমরা এখনও কাজে লাগাতে পারি নি, যদিও অন্য

প্রদেশ তা কাজে লাগিয়েছে। আগে সব কিছুর চর্চা হোক, তারপর বই লেখা হবে—একথা যাঁরা বলেন তাঁরা বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান প্রসারে আগ্রহী নন।

পরিশেষে দেশের তরুণ সমাজকে আহ্বান জানিয়ে অধ্যাপক বসু বলেন: শুধু অস্থির বিক্ষোভ নয়, দেশকে গড়ে তোলার উদ্যম নিয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা এগিয়ে আসুক। তাদের উপরই দেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে।

অমরেন্দ্রনাথ বসু স্মৃতি পাঠাগার উদ্বোধন করছেন অধ্যাপক প্রিয়দারঞ্জন রায়, পার্শ্বে দণ্ডায়মান পশ্চিম বঙ্গ সরকারের শিক্ষাসচিব শ্রীজে. সি. সেনগুপ্ত।

বাংলা ভাষার চেয়ে অনুন্নত ভাষাতেও অন্য দেশে বিজ্ঞান শিক্ষা হচ্ছে। এমন কোন দুর্জ্ঞেয় বিষয় নেই যা বাংলা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়—এ ধারণা আমরা বিজ্ঞান পরিষদের মাধ্যমে বাইশ বছরে সাধারণ মানুষের মনে গড়ে তুলতে পেরেছি। আজ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বাংলা ভাষায় যে বিজ্ঞান প্রচার করা হচ্ছে, তা বিশেষ আশাপ্রদ।

অনুষ্ঠানের সভাপতি অধ্যাপক প্রিয়দারঞ্জন রায় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলেন: আজ সর্বক্ষেত্রে জীবনের মূল্যবোধ উপেক্ষিত। দেশের এই পরিস্থিতিতে বিজ্ঞান প্রচার ও প্রসারের দায়িত্ব যাঁরা নিয়েছেন, তাঁদের দায়িত্ব বিরাট। বিজ্ঞানের দুটি দিক আছে—একটি দৈনন্দিন প্রয়োজনে, আর অপর দিক হলো মোহমুক্ত বিচারনিষ্ঠ মনের অনুশীলন।

বিজ্ঞানে আপ্তবাক্য ও গোঁড়ামির স্থান নেই। এই বৈজ্ঞানিক মনের বিকাশসাধন আজ একান্ত দরকার। আমাদের দেশের ছাত্র-ছাত্রীরা অন্য দেশের ছাত্র-ছাত্রীদের তুলনায় অপটু নয়, মাতৃভাষার মাধ্যমে উপযুক্ত বিজ্ঞান শিক্ষা পেলে তারাও পশ্চিমী ছাত্র-ছাত্রীদের সমকক্ষ হতে পারে।

উপসংহারে অধ্যাপক রায় 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকায় সমাজের সঙ্গে বিজ্ঞানের সম্পর্ক, দেশের উন্নতিকল্পে বিজ্ঞানের প্রয়োগ ইত্যাদি বিষয়ে সম্পাদকীয় থাকা উচিত বলে অভিমত প্রকাশ করেন।

অনুষ্ঠান শেষে অধ্যাপক মৃণালকুমার দাশগুপ্ত পরিষদের পক্ষ থেকে উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

অধ্যাপক প্রিয়দারঞ্জন রায় এইদিন পরিষদ ভবনে অমরেন্দ্রনাথ বসু স্মৃতি পাঠাগারের উদ্বোধন করেন। বেলেঘাটার চড়কডাঙ্গা রোডের বসু পরিবারের প্রদত্ত ১০,০০১ টাকা দানে এই পাঠাগার স্থাপিত হয়েছে। পরিষদের হাতে-কলমে বিভাগের শিক্ষার্থীরা শ্রীশ্যামসুন্দর দে-র পরিচালনায় তাদের নিজেদের তৈরী বৈজ্ঞানিক মডেলের কয়েকটি এইদিন সমবেত সকলকে প্রদর্শন করে।

আলোচনা-সভা

পরিষদের প্রতিষ্ঠা-বার্ষিকী উপলক্ষ্যে দ্বিতীয় দিন অর্থাৎ ২৩শে মে পরিষদ ভবনে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান-চর্চা সম্পর্কে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু।

আলোচনার সূচনা করে ডক্টর মহাদেব দত্ত বলেন: বিজ্ঞান শিক্ষার মাপকাঠি যে ইংরেজী ভাষা, এই ধারণার আজ পরিবর্তন দরকার। বিজ্ঞানে উন্নত দেশগুলি তাদের মাতৃভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষা দেন। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির অবদানে সমৃদ্ধ বাংলা ভাষা বিজ্ঞান শিক্ষাদানের নিশ্চয় যোগ্য। নিজে ভাল করে যা বোঝা যায়, তা নিশ্চয়ই মাতৃভাষায় প্রকাশ করা যায়। পৃথিবীর দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে বিদেশী ভাষায় গবেষণা-প্রবন্ধ প্রকাশ করা হয়। কিন্তু সামাজিক প্রয়োজনের জন্যে মাতৃভাষায় বিজ্ঞান-চর্চা অপরিহার্য। গবেষণার ক্ষেত্র বিস্তৃত, যেমন কৃষি প্রভৃতি বিষয়ের প্রচার সাধারণ মানুষের জন্যেও হওয়া দরকার। সহজে বোধগম্য ভাষায় প্রচারের দ্বারা জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞানচেতনা জাগবে।

তরুণ বিজ্ঞান-লেখক অধ্যাপক অরুণরতন ভট্টাচার্য বলেন: আজ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অতি দ্রুত উন্নতি হচ্ছে। সাধারণ মানুষের ভিতর বিজ্ঞান সম্পর্কে কৌতূহল আছে। কিন্তু চিত্তাকর্ষকভাবে বিজ্ঞানের কথা প্রকাশের অভাব রয়েছে। মানুষের মনে সাধারণ বৈজ্ঞানিক ধারণা জাগানোর জন্যে মাতৃভাষায় বিজ্ঞান-চর্চা অপরিহার্য। এক্ষেত্রে একটি সমস্যা হচ্ছে বৈজ্ঞানিক পরিভাষার স্বল্পতা। তবে পরিভাষার জন্যে বসে না থেকে কাজ করে যেতে হবে।

'দেশ' পত্রিকার 'বিশ্ববিজ্ঞান' বিভাগের পরিচালক শ্রীসমরজিৎ কর বলেন: বিজ্ঞান-চর্চার ক্ষেত্রে ভাষা অন্তরায় নয়। বিষয়ই হচ্ছে প্রধান। বিষয়টি বুঝলে মাতৃভাষায় ভালভাবে বলা যায়। আমাদের দেশের বিশিষ্ট বিজ্ঞানীরা সাধারণ পাঠকের জন্যে লেখনী ধরেন না। আর যাঁরা লেখেন, তাঁরা সাধারণ পাঠকের কথা চিন্তা করেন না। আমরা যারা সাধারণ পাঠকের জন্যে লিখি, তাঁদের পাঠকের চাহিদা অনুযায়ী লেখা উচিত। আমাদের দেশে বৈজ্ঞানিক উন্নতির কথা প্রচারের বিশেষ অভাব রয়েছে। সেদিকে আমাদের দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।

বিশিষ্ট বিজ্ঞান-লেখক অধ্যাপক মৃত্যুঞ্জয়প্রসাদ গুহ বলেন: জনসাধারণের কাছে বিজ্ঞান পৌঁছে দিতে হলে মাতৃভাষায় বিজ্ঞান-চর্চা দরকার। মাতৃভাষায় স্বতঃস্ফূর্ত প্রবন্ধের অভাব। বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় পরিভাষা প্রকাশের ভূমিকা বিজ্ঞান পরিষদের গ্রহণ করা উচিত। এর অভাবে ভাল প্রবন্ধ লেখার অসুবিধা হয়। বিভিন্ন শাখার কমিটি গঠন করে পরিভাষার তালিকা প্রস্তুত করা দরকার এবং সেগুলি 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকায় প্রকাশ করলে ভাল হয়।

ডক্টর দিবাকর মুখোপাধ্যায় বলেন: অন্য দেশ থেকে ধার করে দেশের উন্নতি হয় না। বিদেশী ভাষার চেয়ে মাতৃভাষাতেই বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু ছেলেরা ভালভাবে বুঝতে পারে। সাধারণ মিস্ত্রীদের জন্যে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানের বই লিখলে তারা বিশেষভাবে লাভবান হবে।

'সন্দেশ' পত্রিকার 'প্রকৃতি-পড়ুয়ার দপ্তর'-এর পরিচালক শ্রীজীবন সর্দার বলেন: ছোটদের

মধ্যে বিজ্ঞান প্রচারের বিশেষ দরকার এবং সেটা মাতৃভাষাতেই সম্ভব হতে পারে। বাংলায় বিজ্ঞান-লেখকদের উপযুক্ত পরিভাষা সৃষ্টি করে নেওয়া উচিত।

'অমৃতবাজার পত্রিকা'র বিজ্ঞান বিভাগের পরিচালক ডক্টর সনৎ বিশ্বাস বলেন; সাধারণের মধ্যে বিজ্ঞান প্রচারের জন্যে শুধু লিখলে চলবে না, সেই সঙ্গে ধারাবাহিক লোকরঞ্জক বক্তৃতা চলচ্চিত্র প্রদর্শন প্রভৃতিরও ব্যবস্থা করা দরকার। আমাদের দেশের বিজ্ঞানীরা সাধারণের জন্যে বিশেষ লেখেন না, কিন্তু তাঁদের লেখা দরকার। বিজ্ঞান সম্পর্কে এখন যাঁরা লেখেন, তাঁদের অনেকেই বিজ্ঞানের শিক্ষা লাভ করেন নি—এই প্রচেষ্টা ঠিক নয়। বিজ্ঞানের প্রবন্ধ প্রকাশে দেশের পত্র-পত্রিকাগুলিও বিমুখ। তাঁদের এই ঔদাসিন্যের পরিবর্তন হওয়া দরকার।

'বিজ্ঞানী' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীসুখরঞ্জন মৃধা বলেন: বিজ্ঞান সম্পর্কে সাধারণের মধ্যে কৌতূহল জাগাতে হলে বৈজ্ঞানিক রচনা চিত্তাকর্ষক হওয়া দরকার। ছোটদের মধ্যে বিজ্ঞান প্রচার করতে হলে গল্পচ্ছলে আলোচনা করা ভাল।

'গবেষণা' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীআশিস সিংহ বলেন: শুধু লোকরঞ্জক বিষয়ে নয়, মৌলিক গবেষণার কথা বাংলা ভাষায় প্রচার করা দরকার। গবেষণা বিষয় লিখতে গেলে পরিভাষা অন্তরায় হয়। তবে পরিভাষার জন্যে অপেক্ষা করলে চলবে না, পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে প্রচারের জন্যে রোমান হরফ গ্রহণ করা যায় কিনা সেটা ভাবা প্রয়োজন।

সভাপতির ভাষণে অধ্যাপক বসু বলেন: সাধারণ মানুষের মধ্যে বিজ্ঞান প্রচারে তরুণদেরই এগিয়ে আসতে হবে। তারা সহযোগিতা করলে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান প্রচারের কাজ ত্বরান্বিত হবে। গবেষণার বিষয়বস্তু বাংলা ভাষায় লেখা হলে ভালই, তবে দেখতে হবে এমনভাবে যেন লেখা হয়, যাতে সাধারণ মানুষও তার মূল কথা বুঝতে পারে। পরিভাষার জন্যে বসে না থেকে প্রয়োজন হলে বিদেশী শব্দ হজম করে বিজ্ঞানের কথা প্রচার করতে হবে। দেশের দ্রুত উন্নতি ও সাধারণ মানুষের কল্যাণ যদি আমরা মনেপ্রাণে কামনা করি, তা হলে মাতৃভাষার মাধ্যমে ঘরে ঘরে বিজ্ঞানের কথা পৌঁছে দিতে হবে। দেশের তরুণদের সে দায়িত্ব গ্রহণের জন্যে আমি আহ্বান জানাই।

পরিষদের কর্মসচিব ডক্টর জয়ন্ত বসু আলোচনায় অংশ গ্রহণকারী সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন: আমাদের দেশের সংবাদপত্র ও বেতারে বিজ্ঞান প্রচার আগের থেকে কিছুটা বাড়লেও উপযুক্ত গুরুত্ব এখনো আরোপ করা হচ্ছে না। কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞান প্রচারে তাঁদের সহযোগিতা বিশেষ প্রয়োজন। সাধারণের মধ্যে বিজ্ঞানের প্রচার ও বিজ্ঞান-শিক্ষার প্রসারে আমরা সকলের সাহায্য ও সহযোগিতা কামনা করি।

এই আলোচনা সভার ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনায় শ্রীরবীন বন্দ্যোপাধ্যায় বিশেষ অংশ গ্রহণ করেন।

চলচ্চিত্র প্রদর্শনী

তৃতীয় দিন অর্থাৎ ২৪শে মে পরিষদ-ভবনে ভারতের নৃতাত্ত্বিক সমীক্ষার সৌজন্যে 'কেদার-বদরী' এবং 'টোডা উপজাতি' সম্পর্কে দুটি চলচ্চিত্র প্রদর্শন করা হয়। মনোজ্ঞ ধারাবিবরণী দেন ঐ সমীক্ষার শ্রী এস. কে. চাটার্জী।

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের দ্বাবিংশ প্রতিষ্ঠা-বার্ষিকী উপলক্ষে কর্মসচিবের নিবেদন

মাননীয় সভাপতি অধ্যাপক প্রিয়দারঞ্জন রায় মহাশয়, শ্রদ্ধেয় প্রধান অতিথি শ্রীযতীন্দ্রচন্দ্র সেনগুপ্ত মহাশয়, উপস্থিত সভ্যবৃন্দ ও সমবেত ভদ্রমণ্ডলী, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের দ্বাবিংশ প্রতিষ্ঠা-বার্ষিকী অনুষ্ঠানে পরিষদের পক্ষ থেকে আমি আপনাদের স্বাগত অভ্যর্থনা জানাচ্ছি। আজকের এই সম্মেলনে যোগদান করে আপনারা পরিষদের দেশগঠনমূলক সাংস্কৃতিক প্রয়াসের প্রতি যে শুভেচ্ছা ও সহযোগিতা প্রদর্শন করেছেন, তার জন্যে আপনাদের জানাচ্ছি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ।

এই অনুষ্ঠানে অধ্যাপক প্রিয়দারঞ্জন রায়

মহাশয়কে সভাপতিরূপে পেয়ে আমরা অত্যন্ত গৌরব বোধ করছি। অধ্যাপক রায় একদিকে যেমন একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ বিজ্ঞানী, অন্যদিকে তেমনি বিজ্ঞানশিক্ষা ও লোকরঞ্জক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁর নাম সুবিদিত। পরিষদের বিবিধ কর্মপ্রচেষ্টার সঙ্গে তিনি বহুদিন থেকেই ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। তাঁর প্রবন্ধাদি পরিষদের মুখপত্র 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে'র সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করেছে। পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত তাঁর 'অতিকায় অণুর অভিনব কাহিনী' নামক পুস্তকে তিনি রসায়নের একটি আধুনিক বিষয়কে অত্যন্ত আকর্ষণীয়ভাবে চিত্রিত করেছেন। তিনি যে আমাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে আজকের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন, এজন্যে আমরা তাঁর নিকট কৃতজ্ঞ। আমরা আশা করি, পরিষদের আদর্শের বাস্তব রূপায়ণ কি ভাবে অধিকতর সার্থক করে তোলা যায়, সে বিষয়ে নির্দেশ দান করে তিনি আমাদের উৎসাহিত করবেন।

এই সম্মেলনে পশ্চিম বঙ্গ সরকারের শিক্ষাসচিব শ্রীযতীন্দ্রচন্দ্র সেনগুপ্ত মহাশয়কে প্রধান অতিথি-রূপে পেয়ে আমরা বিশেষ আনন্দিত ও উৎসাহিত হয়েছি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থ-বিজ্ঞানের প্রাক্তন ছাত্র শ্রীসেনগুপ্তের শিক্ষা ও বিশেষতঃ বিজ্ঞান-শিক্ষার প্রতি তাঁর আন্তরিক অনুরাগের পরিচয় আমরা বহু ক্ষেত্রে পেয়েছি। বিজ্ঞান পরিষদের প্রতি তাঁর যে সহমর্মিতা রয়েছে, তা আমাদের একটি মূল্যবান পাথেয়। পরিষদের কর্ম-প্রচেষ্টাকে কি ভাবে আরও ব্যাপক ও বিস্তৃত করে গড়ে তোলা যায়, সেই সম্পর্কে তাঁর সুচিন্তিত মতামত জানতে পারলে আমরা অনুগৃহীত হব।

আদর্শ ও উদ্দেশ্য

দেশের সামগ্রিক উন্নতির জন্যে জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞানের জ্ঞান ও ভাবধারার বিস্তার যে একান্ত আবশ্যক এবং একমাত্র মাতৃভাষার মাধ্যমেই যে তা সুষ্ঠুভাবে করা সম্ভব, এই উপলব্ধি থেকেই বহু খ্যাতনামা বিজ্ঞানী ও শিক্ষাবিদ্‌দের প্রচেষ্টায় এবং অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসুর সভাপতিত্বে ১৯৪৮ সালে বঙ্গীয় পরিষদের প্রতিষ্ঠা হয়। বাংলা ভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞানের প্রচার ও প্রসার সাধনই হলো বিজ্ঞান পরিষদের আদর্শ। এই আদর্শ পালনের জন্যে ঐ ভাষার বিজ্ঞানবিষয়ক সাময়িক পত্র-পত্রিকা প্রকাশ ও বৈজ্ঞানিক গ্রন্থাদি প্রণয়ন, বিজ্ঞানের গ্রন্থাগার, পাঠাগার, সংগ্রহশালা প্রভৃতি স্থাপন, বিজ্ঞান প্রদর্শনী, বিজ্ঞান-সম্মেলন এবং বিজ্ঞানবিষয়ক বক্তৃতা ও আলোচনার ব্যবস্থা প্রভৃতি বিবিধ কর্মপন্থা নির্ধারিত করা আছে। গত ২২ বছর যাবৎ পরিষদ এই কর্মপন্থা যথাসাধ্য অনুসরণ করবার কাজে ব্যাপৃত রয়েছে।

কার্যবিবরণী

আলোচ্য বছরে (১৯৬৯-'৭০) পরিষদের আদর্শানুযায়ী বিভিন্ন কাজে আমরা কতখানি সাফল্য লাভ করেছি ও কিরূপ প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়েছি, সে বিষয়ে পরিষদের বার্ষিক কার্যবিবরণী এখন আমি সংক্ষেপে বিবৃত করবো।

'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকা

পরিষদের প্রতিষ্ঠাকাল ১৯৪৮ সাল থেকেই পরিষদের পরিচালনায় 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' নামক পত্রিকাটি নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। বিজ্ঞানের নানাবিধ বিষয়ে প্রবন্ধ ও আলোচনা, বিজ্ঞান-সংবাদ, প্রশ্নোত্তর প্রভৃতি বিভিন্ন পর্যায়ে বিজ্ঞানের তত্ত্ব ও তথ্যাদি পত্রিকাটিতে নিয়মিত পরিবেশিত হচ্ছে। পত্রিকাটির বর্তমান প্রকাশ-সংখ্যা ২,২০০ কপি। নিছক বিজ্ঞানের একটি মাসিক পত্রিকার পক্ষে এই প্রকাশ-সংখ্যা নেহাৎ অকিঞ্চিৎ-কর নয়। গত জুলাই মাসে মানুষের চন্দ্রে পদার্পণের অবিস্মরণীয় ঘটনাটির স্মারক হিসাবে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার অগাষ্ট সংখ্যা 'চন্দ্র-অভিযান' সংখ্যারূপে প্রকাশিত হয় এবং বিজ্ঞান-শিক্ষার্থী ও বিজ্ঞানানুরাগী জনগণের বিশেষ সমাদর লাভ করে।

গত চার বছর যাবৎ 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার শারদীয় সংখ্যা বহু মূল্যবান প্রবন্ধ ও আকর্ষণীয় চিত্রের দ্বারা সুসমৃদ্ধ হয়ে নবকলেবরে প্রকাশিত হচ্ছে। এই সংখ্যার বৈশিষ্ট্য ও উপযোগিতা লক্ষ্য করে পশ্চিম বঙ্গ সরকারের শিক্ষা বিভাগ প্রতি বছর এর ১,৪০০ কপি ক্রয় করে বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ও গ্রন্থাগারে বিতরণের ব্যবস্থা করছেন। এই ব্যবস্থার জন্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা বিভাগের নিকট পরিষদ কৃতজ্ঞ। কেবল আর্থিক সাহায্যই নয়, পত্রিকাটির প্রচার ও প্রসারেও এরূপ সরকারী আনুকূল্য বিশেষ সহায়ক হয়েছে।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, পশ্চিম বঙ্গ সরকারের নিকট থেকে পত্রিকা প্রকাশের খাতে ১৯৪৮ সাল থেকে প্রতি বছর ৩,৬০০ টাকার অর্থ সাহায্য পরিষদ পেয়ে আসছে। গত ২২ বছরে প্রকাশনের বিভিন্ন স্তরে মূল্য বৃদ্ধির ফলে পত্রিকা প্রকাশনের ব্যয় বহুলাংশে বৃদ্ধি পেলেও সরকারী অনুদানের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় নি। আমরা একান্তভাবে আশা করি. পত্রিকাটির গুরুত্ব উপলব্ধি করে এর নিয়মিত প্রকাশ অব্যাহত রাখবার জন্যে এবং এর মানোন্নয়নের উদ্দেশ্যে পশ্চিম বঙ্গ সরকার অচিরেই অনুদানের পরিমাণ বাড়িয়ে পরিষদকে প্রতি বছর অন্তত ৭,২০০ টাকার অর্থ সাহায্য দেবার ব্যবস্থা করবেন।

বিজ্ঞান ও শিল্প পর্ষদ (CSIR) এবং শিক্ষাবিষয়ক গবেষণা ও শিক্ষণের জাতীয় সংস্থা (NCERT) আলোচ্য বছরে পরিষদকে পত্রিকাখাতে যথাক্রমে ৩,০০০ টাকা এবং ২,০০০ টাকা অনুদান দিয়েছেন। এই সহযোগিতার জন্যে ঐ দুটি সংস্থা পরিষদের বিশেষ ধন্যবাদার্হ।

উল্লিখিত সাহায্য সত্ত্বেও পত্রিকাটিকে আরও উন্নত করবার পথে আর্থিক অনটনই প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। বস্তুতঃ আর্থিক কারণে পত্রিকাটি নিয়মিত প্রকাশ করাই ক্রমশঃ দুঃসাধ্য হয়ে উঠছে। কারণ, একটি মাসিক পত্রিকা, বিশেষতঃ বিজ্ঞানবিষয়ক মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করা অত্যন্ত ব্যয়বহুল। বর্তমান বছরে পরিষদের বার্ষিক সভ্য-চাঁদা যেরূপ ১২ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ১৫ টাকা করা হয়েছে, অনুরূপভাবে পত্রিকার গ্রাহক-চাঁদাও বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং পত্রিকার প্রতি সংখ্যার মূল্য বৃদ্ধি করে এক টাকা পঁচিশ পয়সা করা হয়েছে। কিন্তু এই ব্যবস্থায় পত্রিকার আর্থিক সমস্যার আংশিক সমাধান হয়েছে মাত্র। সে জন্যে আপনাদের সকলের নিকট আমাদের আবেদন এই যে, পত্রিকার গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি, বিজ্ঞাপন সংগ্রহ, অনুদান প্রাপ্তি প্রভৃতি বিষয়ে আপনারা আমাদের যথাসাধ্য সাহায্য করুন। আপনাদের সক্রিয় সহযোগিতায় আমরা তাহলে পত্রিকাটিকে আরও শিক্ষাপ্রদ, আরও আকর্ষণীয় ও আরও জনপ্রিয় করে তুলতে পারবো।

বিজ্ঞানবিষয়ক পুস্তক প্রকাশ

লোকরঞ্জক পুস্তক :—বিজ্ঞানবিষয়ক লোকরঞ্জক পুস্তক প্রকাশ ও সেগুলি স্বল্পমূল্যে পাঠকগণকে পরিবেশন করা পরিষদের একটি উল্লেখযোগ্য কাজ। বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের উদ্দেশ্যে এই সব পুস্তক ব্যয়ানুপাতে অতি স্বল্পমূল্যে বিক্রয় করা হয়। এটা সম্ভব হয় প্রধানতঃ সরকারী অর্থানুকূল্যে। পরিষদ এযাবৎ বিজ্ঞানের মোট ২৯ খানি পুস্তক প্রকাশ করেছে।

আমরা আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, শ্রীননীমাধব চৌধুরী কর্তৃক রচিত ও পরিষদ কর্তৃক আলোচ্য বছরে প্রকাশিত 'ভারতবর্ষের অধিবাসীর পরিচয়' পুস্তকটি এই বছর পশ্চিম বঙ্গ সরকারের রবীন্দ্র পুরস্কার লাভ করেছে। এই পুস্তকটিতে ভারতবর্ষের বিভিন্ন জাতি ও মানবগোষ্ঠীর নৃতাত্ত্বিক ও ভৌগোলিক বিবরণাদি লিপিবদ্ধ হয়েছে। শ্রীজিতেন্দ্রকুমার গুহ কর্তৃক লিখিত

'মহাকাশ পরিচয়' নামক পুস্তকটিও পরিষদ এই বছর প্রকাশ করেছে। 'রাজশেখর বসু স্মৃতি' বক্তৃতায় অধ্যাপক সতীশরঞ্জন খাস্তগীর কর্তৃক প্রদত্ত 'মেঘ ও বিদ্যুৎ' বিষয়ে ভাষণটি পুস্তকের আকারে প্রকাশের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

পাঠ্যপুস্তক :—পশ্চিম বঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের নির্ধারিত পাঠ্যসূচী অনুসারে মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের নবম ও দশম শ্রেণীর জন্যে পরিষদ কর্তৃক প্রণীত 'বিজ্ঞান বিকাশ' নামক সাধারণ বিজ্ঞানের একটি পাঠ্যপুস্তক গত বছর থেকে প্রচলিত হয়েছে। বিদ্যালয়গুলিতে বিজ্ঞানশিক্ষার মান উন্নত করবার উদ্দেশ্যে এই পুস্তক রচনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। পুস্তকটি প্রকাশ করেছেন কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ প্রকাশক প্রতিষ্ঠান ম্যাকমিলান কোম্পানী। আনন্দের বিষয়, গত বছর জানুয়ারী থেকে অক্টোবর পর্যন্ত দশ মাসে পুস্তকটির প্রায় ১২ হাজার কপি বিক্রয় হয়েছে এবং বর্তমান বছরে এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। যদি আপনারা এই পুস্তকের ত্রুটি-বিচ্যুতি ও সাধারণভাবে এর মানোন্নয়নের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তাহলে আমরা অনুগৃহীত হব। বর্তমানে উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়-সমূহের নবম ও দশম শ্রেণীর জন্যে রসায়নের একটি পাঠ্যপুস্তক রচনার প্রচেষ্টা চলছে। প্রসঙ্গ-ক্রমে বলা যেতে পারে যে, বিজ্ঞানের পাঠ্যপুস্তক রচনার ব্যাপারে পরিষদ এর পূর্বেও ব্রতী হয়েছে।

গ্রন্থাগার ও পাঠাগার

বিজ্ঞানবিষয়ক বিভিন্ন পুস্তক ও পত্রিকাদি পাঠে জনসাধারণকে সুযোগ দানের উদ্দেশ্যে পরিষদ কর্তৃক একটি গ্রন্থাগার ও একটি পাঠাগার বহুদিন যাবৎ পরিচালিত হচ্ছে, তবে অর্থাভাব ও স্থানাভাবের জন্যে পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থাগার বা উপযুক্ত পাঠাগার স্থাপন করা সম্ভব হয় নি। গত বছর পরিষদের নিজস্ব ভবন নির্মিত হওয়ার পরেও অর্থাভাবের জন্যে আমরা এই বিষয়ে বিশেষ অগ্রসর হতে পারি নি। যাহোক, পরলোকগত ব্যারিষ্টার অমরেন্দ্রনাথ বসুর স্মৃতিরক্ষার্থে তাঁর পরিবারের পক্ষ থেকে সম্প্রতি পরিষদকে যে ১০,০০১ টাকা দান করা হয়েছে, তাতে পরিষদের পাঠাগারটি নবরূপে আত্মপ্রকাশ করবে। এই পাঠাগার আজ উদ্বোধন করবেন অধ্যাপক প্রিয়দারঞ্জন রায়। এই দানের জন্যে বসু-পরিবারকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

একথা আমরা সকলেই জানি যে, পাঠ্যপুস্তকের অভাবে অনেক দরিদ্র অথচ মেধাবী ছাত্রের উচ্চ শিক্ষা লাভে ব্যাঘাত ঘটে। বিজ্ঞানশিক্ষার ক্ষেত্রে এই অসুবিধা দূর করবার জন্যে পরিষদের গ্রন্থাগারে একটি পাঠ্যপুস্তকের বিভাগও খোলবার পরিকল্পনা করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, গ্রন্থাগার পরিচালনার জন্যে কলিকাতা পৌর সংস্থার শিক্ষা বিভাগের নিকট থেকে আমরা বার্ষিক ১,৫০০ টাকা হিসাবে অর্থসাহায্য পেয়ে থাকি, কিন্তু বহু আবেদন নিবেদন সত্ত্বেও পৌর সংস্থার নিকট থেকে গত পাঁচ বছরের সাহায্য এযাবৎ পাওয়া যায় নি।

বিজ্ঞানবিষয়ক বক্তৃতা, আলোচনা ও চলচ্চিত্র প্রদর্শন

গত ১৯শে ফেব্রুয়ারী পরিষদ ভবনে ডক্টর দীপক বসু 'মানুষের সফল চন্দ্রাভিযান' সম্পর্কে একটি লোকরঞ্জক বক্তৃতা প্রদান করেন। ঐ বক্তৃতার পর চন্দ্রাভিযান সম্পর্কিত 'অ্যাপোলো-১১' ও 'অ্যাপোলো-১২' নামক দুটি চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়। অতঃপর পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন ও এই বিষয়ে আমাদের দেশের কার্যসূচী সম্পর্কে একটি নাতিদীর্ঘ আলোচনা হয় এবং 'নিউ-ক্লিয়ার পাওয়ার ক্রম তারাপুর' নামক একটি চলচ্চিত্র দেখানো হয়। কলিকাতাস্থিত মার্কিন তথ্য কেন্দ্রের (U S I S) সৌজন্যে চলচ্চিত্রগুলি প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। পরিষদের পক্ষ থেকে গত জুলাই মাসে বেথুন কলেজে 'পদার্থের

চতুর্থ অবস্থা' ও গত অগাষ্ট মাসে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে 'মহাকাশ অভিযান' সম্পর্কে বক্তৃতা দেবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল।

পরিষদ কর্তৃক আয়োজিত নবম বার্ষিক 'রাজশেখর বসু স্মৃতি' বক্তৃতা এখানে অনুষ্ঠিত হবে আগামী জুন মাসে। কৃষিবিজ্ঞানবিষয়ক এই বক্তৃতাটি দেবেন কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডক্টর সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়। ১৯শে জুন সন্ধ্যা ৬টায় এই বক্তৃতা-সভায় উপস্থিত থাকবার জন্যে আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

আগামী কাল ২৩শে মে শনিবার সন্ধ্যা ৬টায় 'বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান-চর্চা' বিষয়ে পরিষদ ভবনে একটি আলোচনা-সভার আয়োজন করা হয়েছে। এই সভায় পৌরোহিত্য করবেন অধ্যাপক সত্যেন্দ্র নাথ বসু। ঐ আলোচনা সভায় আপনাদের সকলের উপস্থিতি কামনা করি।

হাতে-কলমে বিভাগ

পরিষদ ভবনে কিশোর-কিশোরীদের উপযোগী একটি হাতে-কলমে বিভাগ গত জানুয়ারী মাস থেকে খোলা হয়েছে। এই বিভাগে বিজ্ঞানের সহজ পরীক্ষা-নিরীক্ষা, বৈজ্ঞানিক মডেল তৈরি প্রভৃতি কাজের জন্যে সুযোগ-সুবিধা আছে। এই বিভাগের পক্ষ থেকে গত ফেব্রুয়ারী মাসে সোনারপুরের কামড়াবাদ উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে একটি মডেল প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়। বালিগঞ্জ বিজ্ঞান কলেজে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রসংসদ কর্তৃক সম্প্রতি অনুষ্ঠিত বিজ্ঞান প্রদর্শনীতে এই বিভাগের পক্ষ থেকে যোগদান করা হয়। পরিষদের কার্যকরী সমিতির অন্যতম সদস্য শ্রীশ্যামসুন্দর দে এই বিভাগটির পরিচালনায় বিশেষ সক্রিয় অংশ গ্রহণ করছেন।

পরিষদ ভবন নির্মাণ

গত বছর ফেব্রুয়ারী মাসে পরিষদ ভবনের ভূগর্ভ তল ও প্রথম তলের নির্মাণ-কার্য সমাপ্ত হয়েছে। পশ্চিম বঙ্গ সরকার, কুমার প্রমথনাথ রায় চ্যারিটেবল ট্রাষ্ট পরলোকগত অধ্যাপক নীরেন রায় এবং অন্যান্য শুভেচ্ছার্থীদের দানে এই নির্মাণ-কার্য সম্ভব হয়েছে। এযাবৎ যাঁরা পরিষদের গৃহনির্মাণের জন্যে দান করেছেন, তাঁদের সকলকে আমাদের কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই।

পরিষদের পরিকল্পিত গৃহের অনুমোদিত নক্সা অনুযায়ী দ্বিতল ও ত্রিতল নির্মাণের জন্যে প্রয়োজন হবে আরও প্রায় একলক্ষ টাকা। এই অর্থ যাতে অবিলম্বে সংগৃহীত হয়, তার জন্যে পরিষদের গৃহ-নির্মাণ তহবিলে মুক্ত হস্তে দান করবার জন্যে আপনাদের নিকট আমরা সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাচ্ছি।

উপসংহার

আধুনিক জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য ও উন্নতি বিজ্ঞানের জ্ঞান ও ভাবধারার উপর নির্ভর করে—বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী ও শিল্প-সমৃদ্ধিই জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের নিয়ামক। সে জন্যে জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞানের প্রচার ও প্রসারের আদর্শ নিয়েই বিজ্ঞান পরিষদ তার সাংস্কৃতিক কর্মপ্রচেষ্টাগুলি পরিচালিত করছে। দেশের ভবিষ্যৎ গঠনে পরিষদের মত জনশিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব ও কর্তব্য যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বলে আমরা মনে করি। আর সেই সঙ্গে আমরা নিশ্চিতভাবে এই বিশ্বাস রাখি যে, আপনাদের শুভেচ্ছা ও সহযোগিতায় পরিষদের ভবিষ্যৎ কর্মপ্রচেষ্টা আরও সুদৃঢ় ও ব্যাপক হয়ে উঠবে এবং পরিষদ অদূর ভবিষ্যতে একটি সুপ্রতিষ্ঠিত জাতীয় কল্যাণকর প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে।

আপনাদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য এইখানে শেষ করছি।

জয়ন্ত বসু
কর্মসচিব
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

কলিকাতা
২২শে মে, ১৯৭০

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ

ছোটবেলায় যে পোকা-মাকড়ের দেশে বাস করতাম, সেটাকে আজকাল বৃথাই খুঁজে বেড়াই। সেই চোখ দুটাই গেছে। আমরা থাকতাম আসামের পাহাড়ে, শিলং শহরে। চার দিকে আমাদের নিজেদের ফুলগাছ, ফলগাছ, তরিতরকারির ক্ষেত ছিল। কাঁটাতারের বেড়ার বাইরে ছোট পাহাড়ে নদী, তার পিছনে পাহাড়। চওড়া খানিকটা ন্যাড়া জায়গা পাহাড়ের পা থেকে মাথা অবধি উঠে ওদিক দিয়ে নেমে গেছে। তাকে ফায়ার লাইন বলে। এক দিকের বন থেকে অন্য দিকের বনে যাতে আগুন লাফিয়ে যেতে না পারে, তার জন্যেই এই ব্যবস্থা। ওখানকার তেলটুসটুসে সরল গাছের বনের দাবানল বড়ই ভয়ঙ্কর। মাইলের পর মাইল বন পুড়িয়ে খাক করে দিত।

ছোট্ট পাহাড়ে নদীর ওপারে সরকারের সংরক্ষিত বনে রাতে হুতুম প্যাঁচা ডাকতো, শেয়াল ডাকতো। বনের ধারের গাঁ থেকে কুকুর ডাকতো। ভোর না হতে হতেই মোরগ ডাকতো। আমাদের পোষা মুরগীগুলিও অমনি কঁক-কঁক কুঁকর-কুরু করে ডেকে উঠতো। আমরা বলতাম, 'ঐ শোন ডিম দিয়েছে।' বলেই যেমন তেমন করে জামা-কাপড় পরে ডিম খুঁজতে বেরুতাম।

আস্তাবলের গায়ে লাগা গুদাম ঘর—সেখানে ভাঙ্গা চেয়ার, টেবিল, টব, গামলার ডিপো। গদী থেকে নারকেলের ছোব্‌ড়া বেরিয়ে আছে, সেই হলো কালো মুরগীর পাড়বার একটা প্রিয় জায়গা। বড় বড় লাল্‌চে রঙের গরম ডিম। হাতে তুলে নিতে কি যে ভাল লাগতো!

সব দিন কিন্তু একই জায়গায় ও ডিম দিত না। ওর আরেকটা প্রিয় জায়গা

ছিল আস্তাবলের শুক্‌নো ঘাসের গাদা, সেখানেও খুঁজতে হতো। পাট্‌কিলে মুরগী ছাড়া আর সবাই নিজের ঘরে, নিজেদের বাসায় ডিম দিয়ে উঠতে চাইতো না। আমরা বড়দের কথামত প্রথম ডিমটাতে একটা পেনসিল দিয়ে তারিখ লিখে যার যার বাসায় রেখে দিতাম। প্রথম ডিমটা দেখতাম কেমন যেন সরু লম্বা গড়ণের হতো। তার পর যত ডিম দিত, সব তুলে নিতাম। অন্ততঃ একটা ডিম না থাকলে নাকি মুরগী-মায়েরা ঐ বাসায় আর ডিম দেয় না। ডিম থেকে অনেকবার বাচ্চা তোলবার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু দুঃখের বিষয়, হলদে তুলার পুঁটলির মত বাচ্চাগুলিকে হয় চিল, ভাম বা বন-বেড়ালে খেত, নয় তো সকালে দেখতাম শীতে মরে পা টান করে পড়ে আছে।

পাট্‌কিলে আসলে পাশের বাড়ীর মুরগী। কেন জানি রোজ আমাদের বাড়িতে এসে যেখানে-সেখানে ডিম দিয়ে যেত। শোবার ঘরের পাশে কাপড় ছাড়বার ঘরে ময়লা কাপড়ের টুক্‌রিটাকে বড়ই ভালবাসতো। আমরা ও বাড়িতে ডিম দিতে গেলে বুড়ি মেম হেসে বলতো—ওটা তোমাদের, তোমরা খেও।

যাই হোক, ছুটির দিনে ডিম তোলার পথেই আমরা গন্ধলেবুর গাছের মাকড়সা দেখতে যেতাম। বিকট মাকড়সা, গা'টা পানিফলের মত দেখতে, প্রায় ঐ রকম বড়ও, তবে কাঁটা নেই। সবুজের উপর কালো দাগ, মাথার কাছটা লাল। তার শক্ত আঠালো জাল দিয়ে লেবু গাছগুলির মাঝখানে যেন শূন্যে-ঝোলা বেড়া বুনতো। সে জাল এত মোটা যে, টেনে ছিঁড়তে হতো, ছুঁলে ভাঙ্গতো না। তাতে বড় বড় প্রজাপতি,—মথ, ড্রাগন-ফ্লাইকে আট্‌কে থাকতে দেখতাম, কষ্ট হতো। জাল ছিঁড়ে গেলেই মাকড়সা আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে তক্ষুনি চট্‌পট্‌ মেরামত করে নিত। সূর্য ওঠবার সময় মাকড়সার জালে শিশিরের ফোঁটা লেগে থাকতে দেখতাম। তাতে ভোরবেলার রোদ পড়ে ঝিক্‌মিক্‌ করতো—মনে হতো যেন হীরের মালা।

প্রজাপতির দেশ ছিল ওটা। এক ডানার প্রান্ত থেকে অন্য ডানার প্রান্ত পর্যন্ত দেড় বিঘৎ বড়ও অনেক দেখেছি। আর কি সব রং! ময়ূরের গলার মত নীল-সবুজ, তাতে ময়ূরের পেখমের মত চোখ আঁকা। ছোট ছোট নীল-লাল, হলদে-সবুজ, সাদা-কালো, কোনটা একরঙা, কোনটার রঙের কি বাহার। বড়, ছোট, মাঝারি—একেবারে আমাদের কড়ে আঙ্গুলের নখে বসতে পারে এত ছোট।

দেখে দেখে মন উঠতো না। ফুলে বসে মধু খেতো। একবার ধরেও ছিলাম একটাকে। সেটা এমন কাতরভাবে ঠ্যাং ছুঁড়তে লাগলে যে, দিদি বললো—ওরে, ছেড়ে দে। অমনি ছেড়ে দিলাম। দেখলাম ওর সবুজ ডানা থেকে আমার হাতে একটু সবুজ গুঁড়ার মত লেগে আছে। দাদা বলেছিল—গুঁড়া তুলে ফেললি? এবার ওর উড়তে কষ্ট হবে। খুব দুঃখ হয়েছিল—আর ধরি নি।

শোঁয়াপোকারও অন্ত ছিল না। কত রকম শোঁয়াপোকা দেখেছি, তার ঠিক নেই।

একটা লম্বা রেঁায়া, দুই ইঞ্চি বড়, মোটা লাল শেঁায়াপোকা। সরল গাছ থেকে নেমেই এমন পাঁই পাঁই ছুট লাগাতো যে, আমরা হাঁ করে চেয়ে থাকতাম, তাড়া করে ধরতে পারতাম না। অবশ্য দৌড়াবার কোন দরকারই ছিল না। ওকে ধরবার আমাদের এতটুকু ইচ্ছাও ছিল না—কারণ ছুঁলেই আঙ্গুলে রেঁায়া বিঁধে যেতো, বেজায় জ্বালা করতো, চুলকাতো। তখন মা খানিকটা পানে খাবার চুন লাগিয়ে দিতেন। চুনটা শুকোলেই সঙ্গে সঙ্গে শেঁায়াগুলিও উঠে আসতো।

আরেকটা লাল-মাথা, ভেলভেটের মত গা, কালো শেঁায়াপোকাকে ঘাসের মধ্যে চলে বেড়াতে দেখেছিলাম। তার গা বরাবর দু-পাশে দু-সারি সাদা দাগ, রাতে সেগুলি জোনাকির মত জ্বলতো। স্কুলের টিচার বলেছিলেন, ওগুলিকে গ্লো-ওয়ার্ম বলে। আজ পর্যন্ত রাতে দূর থেকে গড়ের মাঠের ধার দিয়ে আলো-জ্বলা ট্রাম যেতে দেখলেই আমার সেই গ্লো-ওয়ার্মের কথা মনে পড়ে। কিন্তু সবচেয়ে যেটাকে ভয় করতাম, সেটা হলো সরল গাছের এবড়োখেবড়ো গায়ে বসা চার-পাঁচ ইঞ্চি লম্বা ছাই রঙের শেঁায়াপোকা। এরা নড়াচড়া করতো খুব আস্তে। পিঠে দু-সারি গাঢ় মেটে রঙের দাগ। একটা কাঠি দিয়ে ছুঁলেই ফঁ্যাস করে একটা শব্দ করতো। আর শেঁায়াপোকার পিঠের মেটে দাগগুলি ঢাক্‌নির মত খুলে যেতো। প্রত্যেকটার মধ্যে দেখতাম দু-তিনটি করে লোম—লোমের ডগায় আঠার মত কি লেগে রয়েছে। আমাদের পাহাড়ী ধাইমারা বলতো—খবরদার ছুঁয়ো না। ছুঁলেই ঘা হবে, সে ঘা আর সারবে না।

একদিন স্কুলে গিয়ে শুনে অবাক হলাম যে, বিশ্রী শেঁায়াপোকাগুলিই নাকি পরে প্রজাপতি হয়ে যায়। প্রথমে গুটি বেঁধে না খেয়ে, না নড়ে তিন সপ্তাহ কাটায়। তার পর গুটি কেটে প্রজাপতি বেরোয়। আমরা শুনে অবাক। টিচার বললেন, একটা শেঁায়াপোকা ধরে বাক্সে রেখে দেখোই না। তবে বাক্সের গায়ে ছিদ্র করতে হবে বাতাস ঢোকবার জন্যে। আর যে গাছে শেঁায়াপোকা ছিল তার পাতা খেতে দিও।

রান্নাঘরের সামনে ছিল দু-সারি টোম্যাটো গাছ। ঐ গাছে বড় বড় সবুজ শেঁায়া-পোকা দেখা যেতো, তাদের গায়ে বিশেষ কোন রেঁায়া ছিল না, কিন্তু লেজের কাছে ছোট্ট ছোট্ট নীল, গোলাপী চোখ আঁকা ছিল। এদের একটাকে ধরে সাবানের বাক্সে ছিদ্র করে প্রচুর টোম্যাটো পাতা দিয়ে রাখা হলো। দিন যায়, সপ্তাহ যায়—গপ্‌গপ্‌ করে চোখের সামনে পাতা শেষ করতে লাগলো সে, বাক্স ভরে ময়লা করতে লাগলো। কিন্তু গুটি বাঁধবার নাম নেই।

স্কুলে ফিরিঙ্গী বন্ধু আইভি দেখালো তার শেঁায়াপোকা কেমন দিব্যি গুটি বেঁধে ফেলেছে। দুঃখের কথা জানালাম। সে বললো—আরে আমারটাও কি এমনি এমনি গুটি বেঁধেছে? খাওয়া বন্ধ করে দিলাম, তবে না গুটি বাঁধলো।

বাড়ী এসে আমিও বাক্স থেকে শোঁয়াপোকার খাদ্য সব বের করে দিলাম। মা দেখে অবাক। বললেন ওকি, মরে যাবে না? বন্ধুর কথা বললাম। মা বেজায় রেগে এসে বললেন ওতে ওর বুঝি কষ্ট হয় না? শোঁয়াপোকাটাকে নিয়ে গিয়ে ঝোপের মধ্যে ছেড়ে দিলেন। মনটা খারাপ হয়ে গেল।

তার পরেই ন্যাসপাতি গাছের পাতার মধ্যে কি সুন্দর সোনালী রঙের জালি-কাটা একটা গুটিপোকা পেলাম। জালির ফাঁক দিয়ে মূককীটটাকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। মহানন্দে বোঁটাসমেত ভেঙে নিয়ে বাক্সে রেখে দিলাম।

ও তো খায়দায় না, তবু একবার করে দেখতাম। যেমনকে তেমন—কোন পরিবর্তনই নেই। রেগেমেগে পাঁচ দিন বাক্স খুলি নি। তারপর একদিন সকালে খুলেই অবাক। একটা প্রকাণ্ড ফিকে সবুজ নক্সাকাটা মথ। দুঃখের বিষয়, বাক্সটা ওর পক্ষে বড্ড ছোট হয়েছিল। একটা ডানা খানিকটা কুঁকড়ে ছিল। আমি তাই দেখে কেঁদে আকুল।

মা বললেন, বাক্স সমেত রোদে রেখে দে, ডানা নিশ্চয় খুলে যাবে। স্কুলে যাবার আগে তাই করলাম। ন্যাসপাতি গাছের তলায় রোদে ওকে রেখে গেলাম। মাকে বললাম, ওকে দেখো কিন্তু। ফিরে এসে আর ওকে দেখতে পেলাম না। মা বললেন, নিশ্চয় উড়ে গেছে। দাদা বললো, কাকে খেয়েছে। প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ বলতে আরো কত কথাই মনে পড়ে।

লিলিগাছের পাতার নীচে মাঝে মাঝে এক টিপ ফেনা দেখতাম। ভেবে পেতাম না—ব্যাপারটা কি, দাদা বলতো—ওর মধ্যে নাকি ছোট একটা পোকা শত্রুদের কাছ থেকে লুকিয়ে থাকে, নিজের গা থেকে ফেনা বের করে।

একটা ছোট্ট শিং-এর খেলনা তাকের উপর থাকতো—ক্ষুদে একটা কুঁজোর মত দেখতে। এক দিন দেখি সেটার মুখ মাটি দিয়ে বন্ধ। ভারি কৌতূহল হলো। একটা কাঠি দিয়ে খুঁচিয়ে মাটিটুকু বের করে ফেলতেই টুপ করে একটা মৃত মাকড়সা বেরিয়ে পড়লো। তার পর আরেকটু মাটি। তার পর আরেকটা মাকড়সা। এমনি করে পাঁচটা মাকড়সা বের করলাম। ভেবে পাই না, ব্যাপার কি। এমন সময় দেখি একটা সুন্দর কাচপোকা আরেকটা মৃত মাকড়সাকে নিয়ে এসে চারদিকে উড়ে বেড়াচ্ছে—বোধ হয় ক্ষুদে কুঁজোটাকেই খুঁজছে। হয়তো পরে খাবে বলে জমিয়ে রেখেছিল। জোঁক, পিঁপড়ে, শামুক, গুগ্লী, মৌমাছি সাপ, ব্যাং, মেঠো-ইঁদুর, গিরগিটি, বহুরূপী, ঝিঁঝিঁপোকা ইত্যাদি হামেশাই দেখতাম। কিন্তু পাহাড়ে একটি জিনিষ কখনো দেখি নি—সেটি হলো আরশোলা।

লীলা মজুমদার

প্রকৃতি-পড়ুয়া

এই প্রবন্ধের শিরোনামের অর্থ কোন বাংলা অভিধানে খুঁজতে না যাওয়াই ভাল—কেন না, শব্দটির অর্থ সেখানে পাওয়া যাবে না। কিন্তু বাংলা দেশেই খুঁজলে এমন অনেক ছেলে-মেয়ের দেখা মিলবে, যারা পরিবেশ সম্বন্ধে সচেতন—মানে চোখ মেললেই চারপাশে যা কিছু দেখছে, তার রূপগুণের কারণ তারা খুঁজে দেখে আর বুঝতে চেষ্টা করে সেই সব শব্দের অর্থ—প্রকৃতি যার উৎস।

আমার বক্তব্য আর একটু খুলে বলি। আজকের মানুষ তার চারপাশে হাজারো রকম প্রাণীর দিকে যেন আগের চেয়ে আরো আগ্রহ নিয়ে চোখ ফিরিয়েছে। প্রকৃতিতে মানুষ, প্রাণী আর উদ্ভিদ যে একে অন্যের পরিপূরক—এখন আর কারো দ্বিধা নেই সে কথা মেনে নিতে। আপনাকে জানবার অফুরন্ত চেষ্টাই মানুষকে অন্যান্য প্রাণীদের হাব-ভাব নজর করতে শিখিয়েছে! কেমন করে বেঁচে আছি আর প্রতিকূল অবস্থায় কেমন করে আরো বেঁচে থাকতে হবে—এই জ্ঞান সঞ্চয় করছি, সবটা না হোক, অনেকটাই প্রকৃতি থেকে। জড় প্রাকৃতিক শক্তিকে বশ করে মানুষের সেবায় লাগাবার বিজ্ঞান বা বিদ্যা যদিও চমকপ্রদভাবে প্রভাবিত করেছে মানুষকে, তবুও জীববিদ্যার সঙ্গেই মানুষের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর।

অভিব্যক্তির স্রোত মানুষকে বাদ দিয়ে বইছে না। অতীতের যা জানা গেছে, তাই নিয়ে বসে নেই মানুষ, ভবিষ্যতের ভাবনা—মানুষের ভবিষ্যতের ভাবনা এই কারণে সমস্যার রূপ নিয়েছে যে, সম্পূর্ণ 'প্রাকৃতিক নির্বাচন' নির্ভরশীল নয় আর বোধ হয় মানুষের জীবন। মানুষ হিসাবে বেঁচে থাকবার জন্যেই মানুষকে সক্রিয় হতে হয়েছে। প্রকৃতির কাজ চলছে নীরবে।

প্রকৃতির রূপ, রস, বর্ণ, গন্ধকে মানুষের প্রয়োজনের উপযুক্ত করে তুলতে সক্রিয় হয়েছেন বিজ্ঞানীরা। যে চিন্তা তাদের মাথায় জারিত হচ্ছে, তার বিক্ষেপ কিছু কিশোরের ভিতরে লক্ষ্য রকলাম একদিন সমুদ্রতীরে ফ্রেজারগঞ্জে গিয়ে। কাছেই গঙ্গার মোহানা।

যেহেতু তারা সবাই জীববিদ্যার ছাত্র, হয়তো সেহেতুই শুধু সমুদ্র নয়, সমস্ত পরিবেশটাই তারা অন্য নজরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিল। স্কুলের পাঠ্যবই থেকে অনেক কিছুই তারা জেনে এসেছে, কিন্তু তাদের চোখের সামনে বর্তমান ছিল এমন অনেক কিছু, যার কার্য-কারণ সম্বন্ধ নিয়ে তারা ভাবনায় পড়েছিল। সমুদ্রতীরে ঝাউবনের পাশ দিয়ে যেতে যেতে তারা সাধারণ জ্ঞান থেকেই বলাবলি করে নিল, এই বন বালি আটকাবে, যে বালি সাগরের দিক থেকে এসে তীরের ক্ষেত-খামার ঢাকবে। কিন্তু সমস্যা খুব শীঘ্রই

দেখা দিল, যখন তারা বালিয়াড়ির মুখোমুখি গিয়ে পড়লো। কোন কোন বালিয়াড়ির চূড়া বনের মাথা ছাড়িয়ে উঠেছে। তাদের প্রশ্ন ছিল তখন—

১। বালিয়াড়ি কি করে গড়ে ওঠে ?

২। বালিয়াড়ি ঠেকাতে সবচেয়ে ভাল কি ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে ?

প্রথম প্রশ্নের উত্তর তারা আঁচ করে নিল, হাওয়া আর মোটা, মিহি, অতি মিহি বালিকণার চালাচালি দেখে। দ্বিতীয় প্রশ্নের আলোচনায় তারা সব ব্যবস্থাতেই অল্প-বিস্তর খুঁৎ বের করে মানুষকেই দায়ী করলো কিছুটা বালিয়াড়ি তৈরির জন্যে। তাদের ধারণা, সেই শক্ত পলিঢাকা সমুদ্রতীর থেকে পলি তুলে বাঁধের কাজে নেওয়ায় নীচের বা।ল উঠে এলো। রোদ ও বাতাসের প্রভাবে তার পর বালিয়াড়ি দেখা দিতে দেরী হলো না। ভূবিদ্যার ছাত্রদের কাছে এই প্রশ্নের আরো ভাল উত্তর পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু উপরের স্তরের মাটি দূর হবার ফলে যে সমস্যা দেখা দেয় কৃষিকর্মে, না জেনেও তারা সে ইঙ্গিত দিতে পেরেছিল। তাদের দ্বিতীয় প্রশ্নের দিকে আর একবার পাঠককে চোখ ফেরাতে বলছি। প্রকৃতি আর মানুষের সম্পর্কের আলোচনায় অনায়াসে বসা যেতে পারে ঐ প্রশ্নটি নিয়ে, তারা যদিও সেদিকটা ভেবে দেখে নি সেই মুহূর্তে। তারা সবাই বিজ্ঞানী হয়ে উঠবে না হয়তো, কিন্তু আজকে নেহাৎ সখের বশে পথ চলতে গিয়ে যে বিজ্ঞান-জিজ্ঞাসা তাদের মনকে নাড়া দিচ্ছে, তার সুরু আদি বিজ্ঞানীর মনে।

রাতের আকাশ, মেঘের রং, হাওয়ার গতি, নদীর স্রোত, বৃষ্টি তারপর মাটি আর সবশেষে পাকা ফসল তুলে ঘরে আনবার পিছনে বিজ্ঞানীদের কতই না ভাবনা। সে ভাবনা থেকে যে বিদ্যার জন্ম, তারই উত্তরাধিকারী আমরা। বিদ্যার উত্তরাধিকারী হয়ে দায়িত্ব রয়েছে সে সম্পত্তি উত্তরপুরুষের হাতে তুলে দেওয়া। আমি যখন ছোট, সবে গুটি থেকে প্রজাপতি ফোটা লক্ষ্য করি, তখন আমার মাষ্টারমশাই একথা বলে-ছিলেন। আমিও একদিন রূপনারাণের কূল ধরে হাঁটতে হাঁটতে আমার সাথী দশ-পনেরো বছরের কয়েকটি ছেলেকে ঐ কথা বলি। তাদের কান ছিল আমার কথা শোনায়, নজর ছিল দূরে নদীর বাঁকের দিকে।

নদীতে সে সময়ে ভাটা ছিল। নরম কাদামাটির ধার ধরে যেতে যেতে কাদার বুকে পাখীর পায়ের ছাপ দেখে তাদের পাখীর পরিচয় জানবার চেষ্টা লক্ষ্য করলাম। কাদার বুকে গভীর ছাপ রেখে গেছে কোনো পাখী দূরে দূরে পা ফেলে। নিশ্চয়ই তার ঠ্যাং লম্বা, ওজনেও সে কম যায় না। এই পাখীগুলি গেছে জলের ধার ধরে। কেন? শুকনো ডাঙ্গা থেকে কাদার বুকে ছোট ছোট ঘন ঘন নরম পায়ে ছাপ ফেলেছে যে পাখীগুলি, ছাপ দেখেই মনে হয়, মাঝে মাঝেই কাদার বুকে তারা ছুটাছুটি করেছে। যেখানেই থেমেছে, সেখানেই মাটির বুকে ঠোঁটের আঁচরের দাগ ওদের কারো নজর

এড়ায় নি। পাখী চেনবার এই ধাঁধার উত্তর আমার জানা ছিল, তাদের ছিল না। ঐটুকু সূত্র ধরে তারা পাখী দুটির আকার, আয়তন ও পায়ের গড়ন প্রায় ঠিক ঠিক ধরতে পেরেছিল। একটি যে বক, আমি বলায় তাদের সে নিয়ে আপত্তি করবার ছিল না। অন্যটি যে কাদাখোঁচা ছুটে গিয়ে পোকা ধরে খেয়েছে সুচলো ঠোঁট দিয়ে, না দেখা অবধি আমার কথায় বিশ্বাস করে নি। সব কিছু দেখবার পর তাদের প্রশ্ন হলো—পাখীগুলির ঐ রকম গড়ন বলেই নদীর ধারে ঐ ভাবে খাবার খুঁজে বেড়ায়, না আদি কাল থেকেই নদীর ধারে ঐ ভাবে খাবার খুঁজতে খুঁজতে তাদের আকৃতি অমন হয়ে গেছে। বিবর্তনবাদের ছাত্রদের এই সুযোগেই বলে রাখি, ছোটরা তাদে প্রশ্নের ঠিক উত্তর তখনই পেয়েছিল; কিন্তু বিপদে ফেলেছিল নদীর বাঁকের মুখে গিয়ে অচমকা নতুন ধরণের প্রশ্ন করে। প্রশ্নগুলি হলো—নদীর বাঁক কি করে তৈরি হয়—স্রোতের ধাক্কায়, না মাটির গুণে? পাহাড়ী নদীর ধাপে ধাপে নাবা আর বাঁক নিয়ে ফেরা কি একই কারণে হয়ে থাকে?

যেহেতু বাইরে ঘুরে দেখে শিখতে আমার ভাল লাগে, তাই নদীর বাঁকের রহস্য দেখাতে কয়েক জনকে নিয়ে পাহাড়ী এক নদীর উৎস দেখতে গেলাম। এবার আমার সাথীদের অবাক হবার পালা। দেখলো নরম আর শক্ত পাথরের বুকে খরস্রোতা নদীর কাজ। গভীর গিরিখাত আর চওড়া উপত্যকা নদীর স্রোতে কেমন করে তৈরি হয়, সেটুকু বুঝে নিতে তাদের অল্প সময় লেগেছিল। সমতলে গিয়ে সেই নদীর স্রোত কমে যায়; কিন্তু বাঁকের মুখে উত্তলের চেয়ে অবতলের দিকে স্রোত বেশী, তাদের কথা থেকে বোঝলাম, এটুকু তারা লক্ষ্য করেছিল। আমার সাথীদের কেউ কেউ তখনই বলে দিয়েছিল, উত্তলের দিকে চড়া পড়ে আগে আর খাত গভীর বলে অবতলের দিকে স্রোতও বেশী।

আমাদের আলোচনা শুধু নদী নিয়েই হয় নি, পাহাড় বেয়ে উঠতে উঠতে পরিবেশ বদ্‌লে যাওয়ায় প্রশ্ন শুনেছি তাদের। নীচের মত গাছপালা নেই কেন আর কিংবা যে পাখীগুলি এখন দেখছি, নীচে সমতলে সব সময় দেখি না কেন তাদের? চির, দেওদার ও ভূর্জ গাছে পাহাড় ঢাকা দেখে উচ্চতার হেরফেরে প্রাকৃতিক রূপ বদলের ধাঁধা পরিষ্কার হতে তাদের সময় বেশী লাগে নি। সেই পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে যে মানুষ অনায়াসে দিন গুজরান করে, শেষে তারাই হলো আমাদের আলোচনার বিষয়। উচ্চতায় বাতাসের চাপ ও উপাদানের গুণাগুণ বদ্‌লে যাওয়ায় তার প্রভাব স্পষ্ট হয়ে ওঠে প্রাণীদের দেহে—একথা পাঠ্যবই থেকে শিখে এসে চোখের সামনে দৃষ্টান্ত হাজির দেখে খুশীতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো তাদের মুখ। তার পর উৎস দেখে আমরা নাবতে থাকি। যে নদীর মোহনার কাছাকাছি সমুদ্রতীরের বালিয়াড়িতে আমি কয়েকটি কিশোরের প্রাকৃতিক কার্য-কারণ সম্বন্ধ নিয়ে আলোচনার কথা এই প্রবন্ধের সুরুতে বলেছি, সে নদীর উৎস দেখে এলাম। উদ্দেশ্য একই, প্রকৃতির কার্য-কারণ সম্পূর্ণ লক্ষ্য করা।

জীবনের সুরু থেকে শেষ অবধি সখগুলিকে কেউ পেশা করতে পারবে কিনা বলতে

পারি না, কিন্তু যে কেউ নিজের যে কোন বৃত্তির পাশাপাশি প্রকৃতিকে দেখবার সখটুকু রেখে পথ চলতে পারবেন। প্রকৃতি-পরিচয় বিষয়টি স্কুলের বইতে নীচু ক্লাশের ছেলে-মেয়েদের কাছে কিছুটা আকর্ষণীয় করে তোলা হয়েছে। কিন্তু একটি বই পড়েই সব জেনেছি বলে খুসী না হয়ে যদি কেউ ঘর থেকে বেরিয়ে মাঠে, বনে ঘুরে ঘুরে গাছ, মাছ, পাখী, পোকা, মাটি, মানুষ আর পশুদের আত্মীয়তা খুঁটিয়ে দেখতে সুরু করে, তবে তাকে কি বলে ডাকবেন? আমি বলি সে প্রকৃতি-পড়ুয়া।

এই শতাব্দীর সুরু থেকেই অস্তিত্ব রক্ষার মহাভাবনায় মানুষ ব্যস্ত হয়ে পড়েছে তখনই, যখন প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের পরিবর্তনশীল সম্পর্কটা নতুন করে ঘনিষ্ঠ করে তোলবার আন্দোলন সুরু হয়েছে। যদি বাঁচতে হয় মানুষ হিসাবে, তবে খাপ খাইয়ে নিতে হবে নতুন প্রাকৃতিক পরিস্থিতির সঙ্গে। নতুন পরিস্থিতির সঠিক মূল্যায়ন করবার দায়িত্ব জীব-বিজ্ঞানীদের। আর ব্যাপারটা একটু সহজ করে দেখবার ইচ্ছা যদি কারো থাকে, বৈজ্ঞানিক মন নিয়ে প্রকৃতির খবর নেবার উৎসাহে যদি কেউ আসে, সেই হবে প্রকৃতি পড়ুয়া। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের ভিতর এই উৎসাহ যেমন দেখেছি, তেমনটি আর কারোর মধ্যে দেখি নি।

পাখী চেনবার দিকে যদি তাদের মন ছুটে যায়, তবে আর কিছু চায় না। প্রতি বছর কখন কোন্ পাখী আসবে যাবে, দেখা দেবে তাদের ঘরের আশেপাশে, সে খবর অনেকেই আমাকে জানাতে ভোলে না। চাতকের আসবার সঙ্গে বর্ষা ঋতুর যোগাযোগ সত্য বলে তাদের ধারণা। ঠিকই, মৌসুমী ফুলের মত পাখীরও মরশুম আছে—প্রকৃতি-পড়ুয়া হলেই এই খবর তারা রাখে। পোকামাকড়ের রূপ বদ্‌লানো যত সহজে তাদের কৌতূহল জাগায়, ততটাই হয় গাছ থেকে খসে যাবার আগে পাতার রং ফেরা দেখে। বেড়াল ও কুকুরছানা আদর করবার সময় একটু যদি বলে দেওয়া যায়—দেহের গড়নের সঙ্গে হাবভাব, খাবার খোঁজবার কায়দার হেরফের হয়, তার পর বাকী সব পশুপাখীর খাবার-তালিকা শুনেই তারা বলে দিতে চেষ্টা করে, কেমন হবে তাদের দেহের গড়ন।

ছোটরা প্রায় সবাই প্রকৃতি-পড়ুয়া। তারা মানুষের সঙ্গে পশু-পাখী, গাছপালার আত্মীয়তা খুঁজে বেড়ায়। আমাদের কাজ—ঠিক সময়ে তাদের ঠিক উত্তর যুগিয়ে যাওয়া।

জীবন সর্দার

প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন :—১। ইট কি কি উপাদানে তৈরি হয়? ইট পোড়াবার সময় কি কি রাসায়নিক বিক্রিয়া হয়ে থাকে?

প্রফুল্ল চক্রবর্তী ও মৃদুল বক্সী
রাঁচী

প্রশ্ন :—২। প্লাজ্‌মার বৈশিষ্ট্য বলতে কি বোঝায়?

মলয়বিকাশ রায় ও শ্যামলী রায়
চট্টগ্রাম

উত্তর :—১। মাটিই হচ্ছে ইট তৈরির প্রধান উপাদান। এর সঙ্গে শতকরা ৫০ থেকে ৫৫ ভাগ বালি, প্রায় ২৫ ভাগ অ্যালুমিনা, কিছু পরিমাণ ম্যাগ্‌নেসিয়া, লোহার অক্সাইড ইত্যাদি থাকে। বালি এবং ম্যাগ্‌নেসিয়া সাধারণতঃ ইটের কাঁচা অবস্থা থেকে শুক্‌নো অবস্থায় যাবার সময় যে সঙ্কোচন্‌ হয়, তা রোধ করে। অ্যালুমিনা বিভিন্ন উপাদানকে এক করে বেঁধে রাখে। সেদিক দিয়ে এটাই হচ্ছে মাটির প্রধান উপাদান। এই অ্যালুমিনাই কাঁচা থেকে পোড়া ইটকে শক্ত করে। লোহার অক্সাইড ও ম্যাগ্‌নেসিয়া ইটের রঙের জন্যে দায়ী।

ইট পোড়াবার সময় প্রধানতঃ দুটি বিক্রিয়া হয়ে থাকে—জারণ ও ভিট্রিফিকেশন। কাঁচা ইটের পাঁজায় আগুন দেবার পর তাপমাত্রা ক্রমশঃ বাড়তে থাকে। প্রথমে ইটের মধ্যেকার জল ও রাসায়নিক বিক্রিয়ার জল বাষ্পীভূত হয়। তার জন্যে প্রায় ৫০০° সে. তাপমাত্রার প্রয়োজন হয়। এর পরেই সুরু হয় জারণক্রিয়া। প্রায় ৯৫০° সে. তাপমাত্রা পর্যন্ত এই ক্রিয়া চলে। এই ক্রিয়ায় মাটির বিভিন্ন উপাদানের সঙ্গে অক্সিজেন যুক্ত হয়। যেমন, $4FeO+O_2=2Fe_2O_3$, ভিট্রিফিকেশন ক্রিয়া সুরু হয় ৯৫০° সে.-এরও বেশী তাপমাত্রায়। এই ক্রিয়ায় মাটির কিছু অংশ গলে গিয়ে অন্য অংশের সঙ্গে যুক্ত হয়। ফলে ইট শক্ত এবং মজবুত হয়।

উত্তর :—২। প্লাজ্‌মার বৈশিষ্ট্য বলতে প্লাজ্‌মার মধ্যেকার বিভিন্ন ধর্মকে বোঝায়। ধনাত্মক ও ঋণাত্মক কণিকার সমাবেশকে প্লাজ্‌মা বলা হয়। অবশ্য সম্পূর্ণ আয়নিত না হলে এই সমাবেশে ধনাত্মক ও ঋণাত্মক কণিকার সঙ্গে নিরপেক্ষ কণিকাও থাকে। আমরা জানি যে, এই বিশেষ অবস্থাকে পদার্থের চতুর্থ অবস্থা বলা হয়, যা বাকী তিনটি অবস্থা—কঠিন, তরল এবং গ্যাসীয় থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।

প্লাজ্‌মা সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান আহরণ করতে হলে প্লাজ্‌মার বৈশিষ্ট্যের কথাই আসে, যা হলো প্লাজ্‌মার মধ্যেকার ইলেকট্রনের তাপ, ঘনত্ব ও তার বণ্টন, বেগ, আয়নের

তাপ, বেগ, ইলেকট্রন-ইলেকট্রন ঘর্ষণাঙ্ক, প্লাজ্মার মধ্যেকার তড়িৎ ক্ষেত্র, চৌম্বক ক্ষেত্র ইত্যাদি। এই সব বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন পদ্ধতিতে নিরূপিত হয়। তবে কোন একটি বিশেষ পদ্ধতি একটি বিশেষ প্রকার বৈশিষ্ট্য নিরূপণের উপযোগী মাত্র। একটি মাত্র পদ্ধতির দ্বারা সমস্ত বৈশিষ্ট্য নির্ভুলভাবে নিরূপণ করা সম্ভব নয়। সাধারণতঃ যে সমস্ত পদ্ধতিতে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করা হয়, তাদের মধ্যে ল্যাংমুর প্রোব, পরিবাহিতা প্রোব, মাইক্রোওয়েভ (ক্ষুদ্র বেতার-তরঙ্গ) প্রোব, মাইক্রোওয়েভ ইনটারফেরোমিটার, বর্ণবীক্ষণ যন্ত্র প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যেতে পারে।

শ্যামসুন্দর দে*

* ইনষ্টিটিউট অব রেডিও ফিজিক্স অ্যাণ্ড ইলেকট্রনিক্স, বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাতা-৯।

বিবিধ

বিজ্ঞানে রবীন্দ্র পুরস্কার

পশ্চিম বঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রদত্ত ১৯৬৯-'৭০ সালের বিজ্ঞানে রবীন্দ্র পুরস্কার পেয়েছে শ্রীননীমাধব চৌধুরী কর্তৃক রচিত এবং বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত 'ভারতবর্ষের অধিবাসীর পরিচয়' এবং শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস কর্তৃক রচিত এবং প্রকাশ ভবন কর্তৃক প্রকাশিত 'মানব-কল্যাণে রসায়ন' নামক পুস্তক দুটি।

'ভারতবর্ষের অধিবাসীর পরিচয়' নামক গ্রন্থে ভারতের বিভিন্ন জাতি ও মানবগোষ্ঠীর নৃতাত্ত্বিক ও ভৌগোলিক বিবরণ সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে এবং 'মানব-কল্যাণে রসায়ন' নামক গ্রন্থে রসায়নের বিভিন্ন তথ্য, তত্ত্ব ও শিল্পপ্রয়োগ সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

রবীন্দ্র পুরস্কারের আর্থিক মূল্য পাঁচ হাজার টাকা। এই পুরস্কারের অর্থ উভয় লেখককে সমানভাবে ভাগ করে দেওয়া হবে।

পরমাণু পৃথকীকরণ ও তার আলোকচিত্র গ্রহণ

শিকাগো থেকে রয়টার কর্তৃক প্রচারিত এক সংবাদে জানা যায়—বৃটেনে জাত এবং বর্তমানে আমেরিকার নাগরিক প্রোফেঃ আলবার্ট ভি. ক্রু গত ২০শে মে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা করেছেন যে, বিজ্ঞানের অন্যতম একটি চরম স্বপ্ন—একটি পরমাণুকে পৃথকীকরণ ও তার আলোকচিত্র গ্রহণ—তিনি বাস্তবে রূপায়িত করেছেন। প্রোফেঃ ক্রু বর্তমানে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের এন্‌রিকো ফের্মি ইনষ্টিটিউটের পদার্থ-বিজ্ঞান বিভাগে কর্মরত আছেন।

প্রোফেঃ ক্রু দু-মাস আগে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের দু-জন গ্র্যাজুয়েট ছাত্রের সহযোগিতায় একটি স্ক্যানিং ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে এই অসাধ্য সাধন করেছেন। প্রোফেঃ ক্রু নিজেই মাইক্রোস্কোপটির নক্সা করেছেন এবং যুক্তরাষ্ট্রের পারমাণবিক শক্তি কমিশনের অর্থানুকূল্যে তা প্রস্তুত হয়েছে।

প্রোফেঃ ক্রু সাংবাদিক সম্মেলনে ইউরেনিয়াম ও থোরিয়ামের মাত্র একটি করে পরমাণুর আলোকচিত্র দেখান। আলোকচিত্রে পরমাণু দুটিকে দশ লক্ষ গুণ বড় করা হয়েছে।

ছয় বছরের গবেষণায় এবং ৭৫০,০০০ ডলার (৫৬ লক্ষ ৩৪ হাজার টাকা) থেকে দশ লক্ষ ডলার (৭৫ লক্ষ টাকা) ব্যয়ে এই সাফল্য অর্জিত হয়েছে।

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

ত্রয়োবিংশ বর্ষ | জুলাই, 1970 | সপ্তম সংখ্যা

উদ্ভিদ-হর্মোন

শ্রীসরোজাক্ষ নন্দ

জীব-বিজ্ঞান ও চিকিৎসা-বিজ্ঞানের কল্যাণে হর্মোন কথাটি বর্তমানে সুপ্রচলিত হয়েছে, যদিও এর সম্বন্ধে সঠিক ধারণা অনেকেরই নেই। হর্মোন কথাটি গ্রীক borman শব্দটি থেকে নেওয়া হয়েছে, যার অর্থ—চালিত করা। প্রাণি-দেহে যে সকল নালীহীন বা অন্তঃস্রাবী গ্রন্থি আছে, তারা প্রয়োজনবোধে বিভিন্ন ধরণের জটিল জৈব রাসায়নিক পদার্থ নিঃসরণ করে এবং ঐ সকল পদার্থ রক্ত-প্রবাহের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে দূরবর্তী কোষ বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে প্রবাহিত হয় এবং সেখানে বিশেষ ধরণের কাজ করে। এই জৈব রাসায়নিক পদার্থগুলিকে হর্মোন নাম দেওয়া হয়েছে। দেহযন্ত্রের যে সকল অত্যা-বশ্যক ক্রিয়ার ফলে প্রাণীদের বৃদ্ধি পাওয়া, বংশ বৃদ্ধি করা প্রভৃতি অজস্র ধরণের কাজ সম্পন্ন হয়, তাদের একক ও পারস্পরিক সম্বন্ধ নিয়ন্ত্রিত ও সুসংহত করে ঐ সব হর্মোন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, প্রাণীরা হঠাৎ কোন রকম ভয় পেলে তাদের অ্যাড্রিন্যাল গ্রন্থি থেকে অ্যাড্রিন্যালিন হর্মোন রক্তের মধ্যে নিঃসৃত হয়, যার ফলে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া দ্রুততর হয়। পিটুইটারি গ্রন্থি গুলি থেকে বিভিন্ন প্রকারের পিটুইটারি হর্মোন নিঃসৃত হয়। তাদের মধ্যে কোনটি দেহের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করে, কোনটি পুরুষের বিশেষ বয়সে গোঁফ-দাড়ি গজাতে সাহায্য করে, কোনটি পুংজনন-কোষের বৃদ্ধি সাধন করে, কোনটি স্ত্রীডিম্বকোষকে পরিণত করে। প্যানক্রিয়াস্ গ্রন্থিতে উৎপন্ন ইন্সুলিন হর্মোন রক্তের মধ্যে শর্করার পরিমাণ

নিয়ন্ত্রণ করে। সম্মুখবর্তী পিটুইটারী গ্রন্থিকে আবার সর্বপ্রধান গ্রন্থি বলা হয়, কারণ এথেকে নিঃসৃত বিভিন্ন হর্মোন অন্যান্য অন্তঃস্রাবী গ্রন্থির হর্মোন নিঃসরণ নিয়ন্ত্রিত করে।

প্রাণিদেহের সুস্থ অবস্থায় হর্মোনের ক্রিয়াকে নানা বাদ্যযন্ত্রসমন্বিত অর্কেষ্ট্রার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। অর্কেষ্ট্রার প্রত্যেকটি বাদ্যযন্ত্র তার নিজের নির্দিষ্ট কাজটি যেমন সম্পন্ন করে, তেমনি অন্য প্রত্যেকটির সঙ্গে সঙ্গতিও রক্ষা করে। আবার সব যন্ত্রগুলিই এক প্রধান নির্দেশকের নির্দেশ মেনে চলে। এর ফলে পারস্পরিক সহযোগিতায় উপযুক্ত পরিমাণে হর্মোন নিঃসৃত করে এবং প্রত্যেকে একজন প্রধান নির্দেশকের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এর ফলে যে অপূর্ব জৈব ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, তারই পরিণতি হলো সুস্বাস্থ্য।

প্রাণিদেহের হর্মোনের মত উদ্ভিদদেহেও হর্মোন আছে কিনা, তা উদ্ভিদতত্ত্ববিদ্‌গণ বহুকাল স্থির করতে পারেন নি। প্রাণী ও উদ্ভিদদেহের গঠন, বৃদ্ধি এবং অন্যান্য কাজ কিসের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, সে সম্বন্ধে বিজ্ঞানীরা পূর্বে নানারূপ অদ্ভুত মত পোষণ করতেন। এক সময়ে তাঁরা ধারণা করেছিলেন যে, এক রহস্যময় প্রাণশক্তি এই সব ক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত করে, আবার কেউ কেউ জৈব বিদ্যুৎ-শক্তিকে এগুলির নির্ধারক বলে চিন্তা করতেন। কিন্তু পরবর্তী কালে বিজ্ঞানীদের বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে নির্দিষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, প্রাণী ও উদ্ভিদদেহের আভ্যন্তরীণ কার্যপদ্ধতি নির্ধারিত হয় কতকগুলি জৈব রাসায়নিক পদার্থের দ্বারা, যাদের নাম দেওয়া হয় হর্মোন। চার্লস ডারউইন 1880 খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর 'Power of Movement in Plant' নামক গ্রন্থে এরূপ ধারণা প্রকাশ করেন যে, উদ্ভিদের বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যে কতকগুলি রাসায়নিক পদার্থ উৎপন্ন হয়, যারা তার বৃদ্ধি ও সঞ্চালনে সাহায্য করে। ডারউইন এক জাতীয় ঘাসের অঙ্কুরোদ্গমের পরীক্ষা করেছিলেন। একটি শঙ্কুর মত আকৃতিবিশিষ্ট টিনের চোঙের মাথায় ছিদ্র দিয়ে অন্ধকারে রক্ষিত অঙ্কুরের কলিওপ্‌টাইলের মাথায় সূর্যালোক ফেলা হচ্ছিল (ভুট্টা, ধান, গম প্রভৃতি এক-বীজপত্রী বীজের ভ্রূণমুকুল একটি পাত্‌লা পর্দা দিয়ে ঢাকা থাকে। একেই কলিওপ্‌টাইল বলা হয়); কিন্তু দেখা গেল—যে বিন্দুতে আলোকপাত করা হচ্ছিল, তার কয়েক মিলিমিটার নীচের অংশ আলোকের দিকে সবচেয়ে বেশী বক্রতা লাভ করছে। এথেকে ডারউইন ধারণা করেন যে, কলিওপ্‌টাইলের ডগা থেকে নীচের দিকে তন্তুগুলির মধ্যে কোন ধরণের উত্তেজনা সঞ্চালিত হচ্ছে। ডারউইন এই উত্তেজনাকে রাসায়নিক পদার্থের দ্বারা উৎপন্ন বলে ধারণা করেছিলেন, কিন্তু এর স্বরূপ তিনি আবিষ্কার করতে পারেন নি।

1909 খৃষ্টাব্দে জার্মান বিজ্ঞানী ফিটিং যবদ্বীপে এক ধরণের অর্কিডের উপর পরীক্ষা চালিয়ে লক্ষ্য করেন যে, পরাগনিষেকের পরে ফুলের পাঁপড়িগুলির রং দ্রুত বিবর্ণ হয়ে আসে এবং গর্ভকোষের বৃদ্ধি হতে থাকে। ফিটিং কতকগুলি মৃত পরাগরেণুকে জলে মিশ্রিত করে সেগুলিকে সদ্যপ্রস্ফুটিত ফুলের গর্ভমুণ্ডের উপর ছড়িয়ে দেন। এতে স্বাভাবিক পরাগনিষেকের মতই ক্রিয়া হতে দেখা গেল। এক্ষেত্রে পরাগরেণুগুলি মৃত, সুতরাং কোন প্রাণশক্তির কল্পনা করা যায় না। এথেকে ফিটিং-এর ধারণা বদ্ধমূল হয় যে, পরাগনিষেকের মূলে আছে কোন অজানা রাসায়নিক পদার্থ।

ধানগাছের একটা অদ্ভুত রোগ বহুদিন ধরে চাষীরা লক্ষ্য করে আসছেন। কতকগুলি ধানের চারা অন্যদের অপেক্ষা অতি দ্রুত বাড়তে থাকে এবং হলদে ও বিবর্ণ হয়ে যায়, যেন তারা দীর্ঘ দিন সূর্যালোক থেকে বঞ্চিত আছে। অবশেষে গাছগুলি শুকিয়ে মরে যায়। জাপানী উদ্ভিদ-বিজ্ঞানীরা এরূপ রোগাক্রান্ত গাছ থেকে এক ধরণের পরজীবী ছত্রাকের সন্ধান পান, যাকে

তাঁরা এই রোগের কারণ বলে ব্যাখ্যা করেন। কিন্তু 1926 খৃষ্টাব্দে জাপানী বিজ্ঞানী কুরোসাওয়া দেখালেন যে, ঐ রোগের প্রত্যক্ষ কারণ ঐ ছত্রাক নয়, কিন্তু ঐ ছত্রাক-নিঃসৃত একটি জৈব রাসায়নিক পদার্থ। তিনি ঐ ছত্রাক রসায়নাগারে পোষণ করেন এবং তাথেকে কাথ প্রস্তুত করে তা নির্বীজিত অবস্থায় সাধারণ ধান গাছের উপর প্রয়োগ করে দেখেন যে, গাছগুলি পূর্ববর্ণিত রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। এক্ষেত্রে ছত্রাকগুলি মৃত ও নিষ্ক্রিয়, সুতরাং ঐ রোগের প্রত্যক্ষ কারণ ছত্রাক-নিঃসৃত কোন রাসায়নিক পদার্থ।

জাপানী বিজ্ঞানীরা এই নিয়ে প্রচুর গবেষণা করেন এবং অবশেষে 1938 খৃষ্টাব্দে জাপানী বিজ্ঞানী ইয়াবুতা এবং সুমিকি একটি নির্দিষ্ট রাসায়নিক পদার্থ পৃথক করতে সক্ষম হন, যা ধানগাছের পূর্বোক্ত রোগটি সৃষ্টি করতে পারে। যে ছত্রাক থেকে এই পদার্থটি নিষ্কাশন করা হলো তার নাম Gibberella fujikuroi এবং ঐ রাসায়নিক পদার্থটির নাম দেওয়া হলো Gibberellin।

1946 খৃষ্টাব্দে হাগেন-স্মিট এবং তাঁর সহকর্মীরা অপরিণত ভুট্টার বীজ থেকে একটি রাসায়নিক পদার্থ পৃথক করতে সক্ষম হন, তার নাম ইন্ডোল অ্যাসেটিক অ্যাসিড। এই পদার্থটি প্রয়োগ করে বিনা পরাগনিষেকে অর্কিড ফুল ও টোম্যাটোর পরাগনিষেকের কাজ হয়।

উদ্ভিদের বিভিন্ন অঙ্গ জল, আলোক, উত্তাপ ও মাধ্যাকর্ষণের উত্তেজনায় সাড়া দেয় ও সঞ্চালিত হয়। এই সঞ্চালন কখনও অনুকূল এবং কখনও প্রতিকূল হতে পারে। ব্যাপারটিকে সাধারণভাবে 'ট্রপিক মুভমেন্ট' বলা হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, বীজের অঙ্কুরোদ্গমের পরে কাণ্ডের অংশটি আলোর অভিমুখে প্রসারিত হয়, আবার মূল অংশটি আলোর বিপরীত দিকে অর্থাৎ মাটির ভিতরে অন্ধকারে প্রবেশ করে। এক্ষেত্রে উদ্ভিদের কাণ্ডাংশকে বলা হয় আলোকানুবর্তী এবং মূল অংশকে বলা হয় আলোক-প্রতিবর্তী।

'ট্রপিক মুভমেন্টে'র বিভিন্ন পরীক্ষা থেকে নানাবিধ উদ্ভিদ-হার্মোনের পরিচয় এবং তাদের ক্রিয়াসম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞানলাভ করা হয়েছে। 1880 খৃষ্টাব্দে ডারউইন কলিওপ্টাইলের উপর আলোর ক্রিয়া লক্ষ্য করে যে উত্তেজনা প্রবাহের কথা বলেন, তার স্বরূপ নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে বহুকাল ধরে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল। কেউ-কেউ বলেছিলেন যে, আলোক উদ্ভিদের কোষগুলিকে 'পোলারাইজ' করছে এবং তার ফলে এক কোষ থেকে অন্য কোষে উত্তেজনা প্রবাহিত হচ্ছে। কিন্তু এই মতবাদ পরীক্ষার দ্বারা সমর্থিত হয় নি। 1910 খৃষ্টাব্দে বয়সেন-জেনসেন পরীক্ষা করে দেখালেন যে, যদি অঙ্কুরের ডগাটিকে কেটে ফেলা হয় এবং এক বিন্দু জিলাটিন লাগিয়ে কলিওপ্টাইলের উপর বসিয়ে দেওয়া যায়, তাহলেও তার উপর আলোর ক্রিয়া স্বাভাবিকভাবেই হয়। এই পরীক্ষায় প্রমাণিত হলো যে, উত্তেজনার প্রবাহ কোষের 'পোলারাইজেশনে'র জন্যে হতে পারে না, কারণ এক্ষেত্রে ছিন্ন অংশ দুটির মধ্যে কোষের যোগাযোগ অবিচ্ছিন্ন নয়। সুতরাং ব্যাপারটা নিশ্চয়ই রাসায়নিক পদার্থের প্রবাহের জন্যে হয়েছে।

এর পর বিখ্যাত বিজ্ঞানী ওয়েন্ট কলিওপ্টাইলের বৃদ্ধির পরিমাণ নির্ণয়ের জন্যে একটি পরীক্ষা করেন। প্রথমে তিনি কলিওপ্টাইলের আবরণটি অঙ্কুরের ডগা থেকে বিচ্ছিন্ন করে অ্যাগার-জেলের একটি খণ্ডের উপর বসিয়ে দিলেন। এতে কলিওপ্টাইল থেকে কিছুটা রস অ্যাগার-জেলের মধ্যে লেগে গেল। এর পর কলিওপ্টাইলটি ফেলে দিয়ে অ্যাগার-জেলের খণ্ডটি অঙ্কুরের মাথার এক দিকে বসিয়ে দিলেন। দু-এক ঘন্টার মধ্যে দেখা গেল যে, যে ধারে অ্যাগার-জেল বসানো হয়েছে, তার

বিপরীত দিকে অঙ্কুরটির মাথা বেঁকে যাচ্ছে। এই বেঁকে যাওয়ার কারণ হলো, ঐ দিকের কোষের বৃদ্ধি অন্য দিক অপেক্ষা অনেক বেশী হচ্ছে। ওয়েন্ট আরো দেখলেন যে, যত বেশী সংখ্যক কলিওপ্‌টাইলের ডগা অ্যাগার-জেলের উপর রাখা যায়, অর্থাৎ যত বেশী কলিওপ্‌টাইলের রস অ্যাগার-জেলের মধ্যে আসে, ততই অঙ্কুরের বক্রতা বৃদ্ধি পায়, অর্থাৎ কোষের বৃদ্ধি হয়।

উপরের পরীক্ষাগুলি এবং এরূপ আরও বহু পরীক্ষা থেকে এখন নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হয়েছে যে, উদ্ভিদের দেহেও প্রাণিদেহের মত নানারূপ হর্মোনের সৃষ্টি হয়। এই হর্মোনগুলি নানারূপ জটিল গঠনের জৈব রাসায়নিক পদার্থ। এগুলি উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশে উৎপন্ন হয় এবং এক অংশ থেকে অন্য অংশে প্রবাহিত হয় এবং প্রাপক অংশটির বৃদ্ধি বা বিভিন্ন ধরণের পরিবর্তন সাধন করে। এগুলিই হলো উদ্ভিদের মৌলিক হর্মোন। কিন্তু বর্তমানে বিজ্ঞানীরা পরীক্ষাগারে এই সব হর্মোনের অনুরূপ গুণসম্পন্ন বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ সংশ্লেষণ করতে সক্ষম হয়েছেন। এদেরও উদ্ভিদ-হর্মোন বলা হয়। বর্তমানে এরূপ শতাধিক হর্মোনের আবিষ্কার হয়েছে এবং এদের বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে। এরূপ তিনটি প্রধান শ্রেণীর নাম হলো—অক্সিন, জিবারেলিন এবং কিনিন। এক এক শ্রেণীর মধ্যে বিভিন্ন রাসায়নিক গঠনের পদার্থ আছে, তবে তাদের সকলেরই কার্যপ্রণালী প্রায় একরূপ। অক্সিন শ্রেণীর হর্মোনগুলির মধ্যে বেনজোয়িক, ইনডোলিক, সিনামিক এবং ন্যাপটিল্যাসেটিক অ্যাসিডের নানা ধরণের যৌগ বর্তমান। অক্সিন শ্রেণীর হর্মোনকে বৃদ্ধি-উদ্বোধক হর্মোন বলা হয়। কারণ এদের প্রধান কাজ হলো, উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশের কোষ-বিভাজন ও বৃদ্ধিসাধন। সাধারণতঃ কাণ্ডের অগ্রভাগ, মূলের অগ্রভাগ, মুকুল ও পাতায় অক্সিনের সৃষ্টি হয়। অক্সিনগুলির আর একটি কাজ হলো পাতা, ফুল ও ফলের পতন নিবারণ করা।

জিবারেলিন শ্রেণীর হর্মোনগুলির অধিকাংশই জিবারেলা ছত্রাক থেকে পাওয়া গেছে। জিবারেলিক অ্যাসিড এদের মধ্যে অন্যতম হর্মোন। এদের বিশেষ কাজ হলো বামনাকৃতি বা সাধারণাকৃতির উদ্ভিদকে দীর্ঘতর উদ্ভিদে পরিণত করা। এছাড়া কয়েক শ্রেণীর উদ্ভিদের পুষ্পোদ্‌গম, ফলের সৃষ্টি এবং অঙ্কুরোদ্‌গমেও এরা সাহায্য করে।

কিনিন শ্রেণীর হর্মোনগুলির প্রধান কাজ, উদ্ভিদের মুকুলোদ্‌গম এবং কয়েক শ্রেণীর উদ্ভিদের অঙ্কুরোদ্‌গমে সাহায্য করা। এই তিন শ্রেণীর হর্মোন ছাড়া আরও নানা প্রকার হর্মোনের সন্ধান পাওয়া গেছে, কিন্তু তাদের রাসায়নিক গঠন জানা এখনও সম্ভব হয় নি।

এপর্যন্ত উদ্ভিদ-হর্মোনগুলির যে সব ক্রিয়ার কথা বলা হয়েছে, তা উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশের কোষ-বিভাজন বা বৃদ্ধি সংক্রান্ত। কিন্তু হর্মোনগুলির এর বিপরীত ধরণের একরূপ ক্রিয়াও আছে, যাকে বলা হয় ইনহিবিশন বা বাধন; অর্থাৎ এরা কোন কোন বৃদ্ধির বিরোধিতা করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, অক্সিন শ্রেণীর হর্মোন যেমন কাণ্ডের বৃদ্ধি করে, তেমনি তা মূলের বৃদ্ধি, মুকুলোদ্‌গম, ভ্রূণের বৃদ্ধি, বীজের অঙ্কুরোদ্‌গম এবং কয়েক শ্রেণীর উদ্ভিদের পুষ্পোদ্গম রোধ করে। প্রশ্ন উঠতে পারে যে, সব ঋতুতে বাধন-ক্রিয়ার প্রয়োজনীয়তা কি? এই সম্বন্ধে বলা যায় যে, সব ঋতুতে ও সব রকম আবহাওয়ায় সব রকম উদ্ভিদের সকল অংশের বৃদ্ধি বা বীজের অঙ্কুরোদ্গম হয় না। আবহাওয়া প্রতিকূল হলে উদ্ভিদ তার বৃদ্ধি বা বংশবিস্তার বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়। এটা তার আত্মরক্ষার একটা অঙ্গ। প্রতিকূল অবস্থায় বাধক হর্মোনগুলি সক্রিয় হয়ে বিভিন্ন অংশের বৃদ্ধি রোধ করে।

বিভিন্ন উদ্ভিদ-হর্মোনের আবিষ্কার এবং হর্মোনসমূহের ক্রিয়া সম্বন্ধে জ্ঞান কৃষি-জগতে যুগান্তর

আনয়নে সক্ষম হয়েছে। গবেষণার ফলে এমন হর্মোন সংশ্লেষণ করা সম্ভব হয়েছে, যাদের প্রয়োগে মূল্যবান ও প্রয়োজনীয় শস্যের কোন ক্ষতি না করে আগাছার বৃদ্ধি রোধ করা বা তাদের ধ্বংস করা যেতে পারে। বিশেষ ধরণের উদ্ভিদ-হর্মোন প্রয়োগ করে বিজ্ঞানীরা বিচিত্র ধরণের উদ্ভিদ ও ফল সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন। এছাড়া অনিষিক্ত গর্ভকোষ থেকে ফলের সৃষ্টি, টোম্যাটো, শশা, আপেল প্রভৃতি ফলের দ্রুত উৎপাদন, অকালে দামী ফুল ও ফলের উৎপাদন, বীজহীন ফলের সৃষ্টি এবং হিমঘর বা বীজাগারে রক্ষিত আলু ও অন্যান্য বীজের অঙ্কুরোদ্গম রোধ প্রভৃতিতে হর্মোনের দান কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিতে এক বিরাট সাফল্যের সূচনা করছে।

আগ্নেয়গিরি

সৌম্যানন্দ চট্টোপাধ্যায়*

পৃথিবীতে বন্যা, ঘূর্ণিবাত্যা, ভূমিকম্প, ধস্ ইত্যাদির মত আগ্নেয়গিরিও প্রকৃতির শক্তি প্রকাশের অন্যতম উৎস। ভূপৃষ্ঠের দুর্বল স্থানগুলির মধ্যে ছিদ্রপথে ভূগর্ভস্থ ধূম, ভস্ম, কর্দম, গলিত ধাতব পদার্থ প্রভৃতি প্রবল বেগে উৎক্ষিপ্ত হয়ে যে কোণাকৃতি পর্বতের উৎপত্তি হয়, তাকেই বলা হয় আগ্নেয়গিরি। যে গহ্বর দিয়ে ভস্ম, ধূম, গলিত ধাতব পদার্থ, শিলা প্রভৃতি বের হয়ে আসে তা Crater বা জ্বালামুখ নামে পরিচিত। এই জ্বালামুখের সঙ্গে নীচের Magma chamber-এর সংযোগকারী সুড়ঙ্গকে Vent বলা হয়। জ্বালামুখ থেকে নিক্ষিপ্ত গলিত পদার্থকে লাভা এবং লাভার উৎক্ষেপণকে অগ্ন্যুৎপাত বলে। আগ্নেয়গিরির অভ্যন্তরে যেখানে লাভা সঞ্চিত থাকে, তাকে Magma chamber বলা হয়। ম্যাগ্মা প্রধানতঃ অক্সিজেন, সিলিকন, অ্যালুমিনিয়াম, লোহা, ক্যালসিয়াম, ম্যাগ্নেসিয়াম, পটাসিয়াম, হাইড্রোজেন, অল্প পরিমাণে টিটানিয়াম, কার্বন, ফস্ফরাস এবং ক্লোরিন নিয়ে গঠিত।

অগ্ন্যুৎপাতের সময় যে গ্যাস বের হয়, তার মধ্যে Hydrogen sulphide (H_2S), SO_2, কার্বন ডায়োক্সাইড (CO_2), কার্বন মনোক্সাইড (CO), HCl, অক্সিজেন (O), হাইড্রোজেন (H), আরগন, ক্লোরিন (Cl) এবং ফ্লোরিন (F) প্রধান। এই সব গ্যাসের তাপমাত্রা প্রায় 100° সে.। বাষ্প যা বেরোয়, তার বেশীর ভাগই গ্যাসীয় পদার্থ।

তরল পদার্থের মধ্যে লাভাই প্রধান। লাভার গঠন ও ম্যাগ্মার গঠনে বিশেষ তারতম্য নেই, কেবল লাভার মধ্যে ম্যাগ্মার চেয়ে বাষ্প ও গ্যাসীয় পদার্থের পরিমাণ কম। সিলিকার পরিমাণ কম-বেশীর উপর লাভাকে অ্যাসিড ও বেসিক শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। লাভার রাসায়নিক প্রকৃতিই তার বাহ্যিক গঠন ও অগ্ন্যুৎপাত নির্ধারণ করে। বেসিক লাভা বেশী দূর গড়িয়ে যেতে পারে, কিন্তু অ্যাসিড লাভা আগ্নেয়গিরি থেকে বেশী দূরে যায় না।

অগ্ন্যুৎপাতের সময় গ্যাসের প্রচণ্ড চাপ ও বিস্ফোরণের ফলে জ্বালামুখ দিয়ে জ্বালামুখের কিছু অংশ এবং প্রচুর পরিমাণে লাভা বাইরে এসে জমাট বেঁধে যায়। মাকুর মত দেখতে 5-10 সেণ্টিমিটার দীর্ঘ আগ্নেয় বোমা উপরের দিকে উঠে

* ভূগোল বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

25-30 কিলোমিটার পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। এদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকারগুলিকে (1-3 সেঃ মিঃ দীর্ঘ) Lapilli বলে। এগুলি আগ্নেয়গিরির চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্মাকৃতির পদার্থ, ভস্ম, বালি, Feldspur, Leucite, Augite, Magnetite প্রভৃতিও নির্গত হয়ে থাকে।

ম্যাগ্‌মা পৃথিবীর ভিতর থেকে খুব কমই বেরিয়ে আসে। অনেক সময়েই ভূত্বকের গভীরে ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হয়ে জমাট বেঁধে বিভিন্ন রকমের আকৃতি ধারণ করে। এদের মধ্যে Batholith সহস্র বর্গ কিলোমিটার আয়তনবিশিষ্ট পাহাড়ের আকারে ভূত্বকের নীচে জমাট বাঁধে। এগুলি প্রধানতঃ অ্যাসিড শিলা Granite ও Granocliorites দিয়ে গঠিত।

Batholith-এর চেয়ে ক্ষুদ্রাকৃতির Lacolith-ই ভূত্বকের নিকটে স্তূপাকারে দেখা যায়। এর উপর দিকে উত্তল অংশ এবং ভূমি সমান হয়। এর দৈর্ঘ্য 100-200 কিলোমিটার পর্যন্ত দেখা যায়। ভঙ্গিল পর্বতের ভাঁজের উর্ধ্বভঙ্গে Lacolith থেকে ছোট Phacolith দেখা যায়, দেখতে Lacolithe-এর মত—অনেক সময় ম্যাগ্‌মা সঙ্কীর্ণ ফাটলের মধ্যে জমাট বাঁধে এবং তার মধ্যে অনুভূমিকভাবে অবস্থান করে। এগুলি Sil নামে পরিচিত। যখন লম্বভাবে অবস্থান করে, তখন জমাটবাঁধা কঠিন ম্যাগমাকে ডাইক বলা হয়। এই ধরণের ডাইককে পার্শ্ববর্তী কোমল শিলা ভেদ করে উঠতে দেখা যায়। ছোটনাগপুরের বিভিন্ন অঞ্চলে কয়লা খনির খাদে ডাইক অনেক সময় দুই কয়লা স্তরের মধ্যে দুস্তর বাধা সৃষ্টি করে কয়লা উত্তোলনে অসুবিধা ঘটায়। অনেক সময় বিভিন্ন শিলাস্তরের মধ্যে অনুভূমিকভাবে ম্যাগ্‌মা ঠাণ্ডা হয়ে জমাট বাঁধলে তাকে Interbedded instrusion বলে।

এখন প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে, আগ্নেয়গিরিগুলির অগ্ন্যুৎপাতের সঠিক কারণ কি? কারণ হিসাবে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি প্রণিধানযোগ্য।

আগ্নেয়গিরিগুলি ভূত্বকের অস্থিতিস্থাপক অংশে অবস্থিত ও মালার আকারে সজ্জিত। অগ্ন্যুৎপাতের সময় যে সব বিভিন্ন রকমের শিলা বাইরে বেরোয়, তার শতকরা 90 ভাগই ব্যাসাল্ট শিলা। ভূত্বকের প্রায় 36 মাইল গভীরে মহাদেশগুলির নীচে গভীর ও মহাসাগরগুলির নীচে অগভীর একটি ব্যাসাল্ট শিলাস্তর পৃথিবীর অভ্যন্তরে অবস্থিত। ভূত্বকের অভ্যন্তরে তাপমাত্রা বৃদ্ধি হয় প্রতি কিলোমিটারে 10° সেন্টিগ্রেড। অতএব 100 কিঃ মিঃ অভ্যন্তরে তাপমাত্রা 1,000° সেন্টিগ্রেড, কিন্তু অভ্যন্তর ভাগের 20 বা 30 কিলোমিটার নীচে উপরের শিলাস্তরের চাপ খুব বেশী না হওয়ায় শিলাস্তর কঠিন অবস্থায় আছে। পৃথিবীর ভিতরের stress-এর জন্যে পৃথিবীর ত্বকে ফাটলের সৃষ্টি হয়ে অভ্যন্তরের ব্যাসাল্ট শিলাস্তর পর্যন্ত নেমে যায় এবং শিলাস্তরের চাপ কোনও অজ্ঞাত কারণে কমে গেলে কিছু শিলা তরল অবস্থায় পৌঁছায় ও গ্যাস জমে ওঠে এবং উপরের আগ্নেয়গিরির মুখ দিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে। এই একটি মাত্র ফাটল ও আগ্নেয়গিরি থেকে অগ্ন্যুৎপাতকে কেন্দ্রীয় অগ্ন্যুৎপাত বলা হয়। অনেক সময় একটি মাত্র ফাটলের পরিবর্তে অসংখ্য ফাটলের মধ্য দিয়েও লাভা বেরিয়ে আসে, তখন তাকে Fissure eruption বলে। কেউ কেউ মনে করেন যে, স্থানীয়ভাবে সৃষ্ট ভূত্বকের নিকটের ম্যাগ্‌মা চেম্বারে সঞ্চিত লাভাই অগ্ন্যুৎপাতের সৃষ্টি করে। ব্যাথোলিথগুলিকে পৃথিবীর ভঙ্গিল পর্বতশ্রেণীর কাছেই দেখা যায়। ব্যাথোলিথের উত্তপ্ত তরল ম্যাগ্‌মা উপরে উঠলেই পার্শ্ববর্তী শিলায় সংস্পর্শে এসে তাদের তরল অবস্থায় পরিণত করে রাসায়নিক পরিবর্তন সাধন করে। ব্যাথোলিথের উপরের

বন্ধুর অংশকে cupolas বলে। তরল পদার্থ ও গ্যাসীয় পদার্থের পরিবাহী ধর্মের জন্যে অনেক সময় অত্যন্ত উত্তপ্ত লাভা cupolas-এর উপরে যেখানে ভূত্বক পাতলা, সেখানে জমা হয়। ফলে সেখানে ফাটল দেখা দিলে আগ্নেয়গিরির সৃষ্টি হয়ে থাকে। ব্যাথোলিথগুলি সম্পূর্ণ কঠিন ও ঠাণ্ডা হয়ে গেলে আগ্নেয়গিরিও নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে।

সূর্য থেকে পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছে বলে পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগ এখনও উত্তপ্ত অবস্থায় আছে। অভ্যন্তরে রাসায়নিক পরিবর্তন ও পৃথিবীর আবর্তনের জন্যে ঘর্ষণের ফলে উত্তাপের সৃষ্টি হয়। এছাড়া নবীন ভঙ্গিল পর্বতশ্রেণীর ভূতাত্ত্বিক গঠন সমুদ্রের গঠন অপেক্ষা ভিন্ন। ভঙ্গিল পর্বতশ্রেণীর নিম্নে সুগভীর sial স্তর যেখানে রয়েছে, সেখানে granite শিলাস্তরের গভীরতা 50 কিঃ মিঃ-এরও বেশী। অ্যাসিড শিলার মধ্যে তেজস্ক্রিয় খনিজের পরিমাণ অন্য আগ্নেয়শিলার চেয়ে বেশী বলে অ্যাসিড শিলা প্রায় 50×10^{-13} ক্যালরী / সেণ্টিমিটার পরিমাণ তাপ উৎপন্ন করে। বেসিক শিলা এর চেয়ে কিছু কম তাপ সৃষ্টি করে। এই তাপ বিকিরণের ফলে সিয়াল স্তর উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এবং গলিত অবস্থায় পৌঁছায়। এই তাপই ম্যাগ্‌মা চেম্বারের পদার্থগুলিকে অনেক সময় গলিত অবস্থায় পরিণত করে। গ্যাসই অগ্ন্যুৎপাতের অন্যতম প্রধান সহায়ক শক্তি। বাষ্পের মধ্যে 80—85% ভাগ থাকে এই গ্যাস। এই গ্যাসের অধিকাংশই ম্যাগ্‌মার মধ্যে জমা থাকলেও অনেকাংশ ভূগর্ভস্থ জলরাশি বা ভূত্বকের কয়েক সহস্র মাইল নীচে আগ্নেয়গিরির নীচেকার তরল শিলাস্তরে পৌঁছায় এবং তা অগ্ন্যুৎপাতের সহায়তা করে। যে সব আগ্নেয়গিরি সমুদ্রের নীচে বা খুব ধারে অবস্থিত, সেখানে অবশ্য সমুদ্রের জলই নীচে প্রবেশ করে।

অগ্ন্যুৎপাতের ফলে নানা আকৃতিবিশিষ্ট আগ্নেয়গিরির সৃষ্টি হয়। যে সব আগ্নেয়গিরির দুই দিকের ঢালই সমান, তাদের আকৃতিকে Composite cone বলে। এই সব আগ্নেয়গিরির দুই দিকের ঢাল ভূমির সঙ্গে 35° কোণ করে অবস্থিত। জাপানের ফুজিয়ামা আগ্নেয়গিরির ঢাল আরও কম, তাদের আকৃতিকে cinder cone বলে। ক্ষুদ্রাকৃতির আগ্নেয়গিরিকে spatter cone বলা হয়। অনেক সময় লাভা অত্যন্ত খাড়াভাবে স্তূপাকারে থাকে। তাকে গম্বুজাকৃতির আগ্নেয়গিরি বলে; যেমন—মাউণ্ট পিলি।

অনেক সময় আগ্নেয়গিরি থেকে লাভা, ঝামা ও ছাই বায়ুবাহিত হয়ে অবক্ষেপিত হয়ে যে সমভূমির সৃষ্টি করে, সেগুলি হলো লাভা সমভূমি। অগ্ন্যুৎপাতের গোড়ার দিকে ধুলা, বালি, ঘনীভূত বাষ্প ও বৃষ্টির সঙ্গে মিশে কাদার মত বেরিয়ে আসে এবং আগ্নেয়গিরির ঢালের নীচের দিকে সমভূমির সৃষ্টি করে। এমনও দেখা গেছে যে, লাভাস্রোত অসংখ্য ফাটল থেকে বেরিয়ে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে বিরাট লাভা-মালভূমির সৃষ্টি করেছে। দাক্ষিণাত্যের মালভূমির সৃষ্টি এভাবেই হয়েছে। এখানে প্রায় 100,000 কিউবিক মিটার লাভা উৎক্ষিপ্ত হয়েছিল।

পৃথিবীর আগ্নেয়গিরিগুলিকে তাদের অগ্ন্যুৎপাতের ধরণ অনুযায়ী শ্রেণীবিভাগ করা হয়। উনবিংশ শতকে আগ্নেয়গিরিগুলিকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হতো, যেমন—যে সব আগ্নেয়গিরি থেকে প্রায়ই অগ্ন্যুৎপাত ঘটে, সেগুলিকে জীবন্ত, যেগুলি থেকে মাঝে মাঝে অগ্ন্যুৎপাত ঘটে, সেগুলিকে সুপ্ত এবং যেসব আগ্নেয়গিরি থেকে অগ্ন্যুৎপাত ঘটে না, সেগুলিকে মৃত বলা হতো। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে (1908) Lacsix আগ্নেয়গিরিগুলিকে চারটি শ্রেণীতে ভাগ করেন। এগুলি হলো:

(1) Hawaian (2) Stromblian, (3) Vulcanian এবং (4) Pelean। হাওয়াইয়ান শ্রেণী হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে দেখা যায়। এই শ্রেণীর আগ্নেয়গিরি থেকে গ্যাস ধীরে ধীরে নির্গত হয় এবং বিস্ফোরক ধরণের অগ্ন্যুৎপাত কম হয়। ষ্ট্রম্বলীয় শ্রেণী সিসিলির কাছে ভূমধ্যসাগরে অবস্থিত এবং বিস্ফোরক ধরণের অগ্ন্যুৎপাত এক্ষেত্রে বেশী বলে একে ভূমধ্যসাগরের বাতিঘর বলা হয়ে থাকে। ভালকানীয় শ্রেণীর আগ্নেয়গিরি সিসিলির উত্তরে ভালকানো দ্বীপে দেখা যায়। বিস্ফোরক ধরণের অগ্ন্যুৎপাতের জোর এসব আগ্নেয়গিরিতে বেশী। এর লাভাও ষ্ট্রম্বলীয় শ্রেণীর লাভার চেয়ে বেশী ঘন ও আঠালো। পিলীয় শ্রেণী পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে দেখা যায়। এখানে অতি উত্তপ্ত গ্যাস, প্রদীপ্ত ভস্ম বহু উঁচুতে উঠে উজ্জ্বল মেঘের সৃষ্টি করে। এছাড়া Solfatric শ্রেণীর আগ্নেয়গিরি থেকে শুধুমাত্র গ্যাস নির্গত হয়। এই ধরণের আগ্নেয়গিরি ইটালীর নেপল্সে দেখা যায়। অনেক সময় সুপ্ত আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখের মধ্যে দ্বিতীয় জ্বালামুখের সৃষ্টি হয়, সেগুলি Somma নামে পরিচিত। ভিসুভিয়াস আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখে এই রকম দ্বিতীয় জ্বালামুখ দেখা যায়। এই শ্রেণীগুলি ছাড়া আইসল্যাণ্ড দ্বীপে বিরাট অঞ্চল জুড়ে অসংখ্য ফাটল থেকে লাভা নির্গত হয়ে কয়েক হাজার বর্গকিলোমিটার লাভার আচ্ছাদন গড়ে ওঠে। দাক্ষিণাত্যের মালভূমির কথা আগেই বলা হয়েছে।

সমস্ত পৃথিবীতে প্রায় 500 আগ্নেয়গিরি আছে। অধিকাংশ আগ্নেয়গিরি প্রশান্ত মহাসাগরের দুই ধারে অবস্থিত। এই আগ্নেয়গিরিগুলি প্রশান্ত মহাসাগরীয় আগ্নেয় মেখলা (Pacific ring of fire) নামে পরিচিত। প্রশান্ত মহাসাগরের পশ্চিম তীরে কামচাট্কা উপদ্বীপে, কিউরাইল দ্বীপপুঞ্জে, জাপান দ্বীপপুঞ্জে, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে, নিউগিনি, সলোমন, নিউহিব্রাইডিস ও নিউজিল্যাণ্ড দ্বীপপুঞ্জে এই বলয়ের একটি অংশ দেখা যায়। প্রশান্ত মহাসাগরের অপর তীরে দক্ষিণ আমেরিকার টিয়েরা-ডেল-ফুয়েগো দ্বীপ থেকে উত্তরে অ্যাণ্ডিজ পর্বতের মধ্য দিয়ে সিয়েরা নেভেডা ও রকি পর্বতের মালভূমির মধ্য দিয়ে অ্যালিউসিয়ান দ্বীপপুঞ্জ ও আলাস্কার মধ্যে বিস্তৃত আছে। এর শাখাটি অ্যালিউসিয়ান দ্বীপপুঞ্জের মধ্য দিয়ে অন্য শাখার সঙ্গে যুক্ত। হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের মোনা লোয়া ও কিলাউয়া আগ্নেয়গিরি, গ্যালাপেগোস দ্বীপপুঞ্জের আগ্নেয়গিরি, ইষ্টার ও জুয়ন ফার্ণেনডিস দ্বীপপুঞ্জের আগ্নেয়গিরি ও টঙ্গা, সামোয়া, কারমাডেক ও অন্যান্য দ্বীপেও আগ্নেয়গিরি আছে। এছাড়া আর একটি আগ্নেয়গিরিমণ্ডল আল্পস পর্বতমালা থেকেই ইটালীর অ্যাপেনাইন পর্বতের মধ্য দিয়ে ভূমধ্যসাগরে চলে গেছে। এখানে আছে ভিসুভিয়াস, এট্না, লিপারি দ্বীপপুঞ্জের আগ্নেয়গিরি, ঈজিয়ান সাগরের আগ্নেয়গিরি, ককেশাস অঞ্চলের এলবার্স, কাজবেক ও তুরস্কের আরারাট ইত্যাদি। মালয় উপদ্বীপ ও সুমাত্রায় 19টি, জাভায় 15টি, সুন্দা দ্বীপে 3টি এবং মালাক্কাস দ্বীপেও আগ্নেয়গিরি দেখা যায়। এই মণ্ডলটি প্রশান্ত মহাসাগরীয় মণ্ডলের সঙ্গে যুক্ত। আটলান্টিক মহাসাগরে আইসল্যাণ্ড দ্বীপে 25টি আগ্নেয়গিরির মধ্যে হেক্লা বিখ্যাত। জন সাইমেন দ্বীপের আগ্নেয়গিরি ও গ্রেটার এন্টিলিসের মাউন্ট পিলি বিখ্যাত। তাছাড়া ক্যানারী দ্বীপ, অজোর দ্বীপ, কেপ ভার্ড দ্বীপ, গিনি উপসাগর, সেন্ট হেলেনা দ্বীপ ও ত্রিস্টান ডা কুনহা ও আফ্রিকার প্রস্তর উপত্যকার আগ্নেয়গিরি দেখা যায়। আফ্রিকার মাউন্ট কিলিমাঞ্জারো একটি মৃত আগ্নেয়গিরি, ভারত মহাসাগরে কমোরো, মরিশাস, রিইউনিয়ান দ্বীপ ও ব্যারণ দ্বীপে আগ্নেয়-

গিরি আছে।' ব্যারন দ্বীপের আগ্নেয়গিরি মৃত এবং এটাই ভারতের একমাত্র আগ্নেয়গিরি।

আগ্নেয়গিরিগুলির ভৌগোলিক অবস্থান লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, এদের অধিকাংশই নবীন পর্বতশ্রেণীর কাছে বা এমন সব দ্বীপপুঞ্জের কাছে, যেগুলি আধুনিক ভঙ্গিল পর্বতের সন্নিকটে অবস্থিত। কিন্তু পৃথিবীর প্রাচীন শিলায় গঠিত মালভূমির উপরে আগ্নেয়গিরি দেখা যায় না বললেই হয়।

পৃথিবীর বিখ্যাত অগ্ন্যুৎপাতের মধ্যে ভিসুভিয়াসের অগ্ন্যুৎপাতে (79 খৃঃ) হারকিউলিয়াম ও পম্পিয়াই শহর ধ্বংস হয়। পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের ক্রাকাতোয়া আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ফলে (1883 খৃঃ) ক্রাকাতোয়া দ্বীপের দুই-তৃতীয়াংশ সমুদ্রে বিলীন হয়ে যায়। অনেক সময় পৃথিবীর বড় বড় ভূমিকম্পের ফলেই অগ্ন্যুৎপাতের সৃষ্টি হয়েছে।

আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ফলে চিরকালই মানুষের ক্ষতি সাধিত হয়েছে। বর্তমানে বিজ্ঞান এর মধ্য থেকেই সৃষ্টির উপাদান খুঁজে বের করে তাকে মানুষের সেবায় নিয়োজিত করছে।

ইটালীর টাস্কানীতে এই আভ্যন্তরীণ উত্তপ্ত বাষ্প থেকেই ইটালীর মোট উৎপাদিত বিদ্যুৎশক্তির শতকরা 6 ভাগ উৎপন্ন হচ্ছে। বোরিক অ্যাসিড, অ্যামোনিয়াম সালফেট, অ্যামোনিয়াম কার্বোনেট, অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড, বোরাক্স, কার্বন ডাইঅক্সাইড, অ্যামোনিয়াম কার্বোনেট, হিলিয়াম ইত্যাদি পদার্থও তৈরি হচ্ছে। এছাড়া ইটালীর বহু জায়গায় উষ্ণ প্রস্রবণ আগ্নেয়গিরির নিকটে থাকায় সেখান থেকে রোগাক্রান্ত লোকেরা উপযুক্ত আরামের সুযোগ পেয়ে থাকে।

ডিটারজেন্ট ও তার আধুনিক প্রয়োগ

সমীরকুমার রায়

মানুষ সভ্য হবার সঙ্গে সঙ্গেই পরিষ্কার এবং অপরিষ্কার সম্বন্ধে একটি সুস্পষ্ট ধারণা করতে শেখে। অপরিষ্কার বলতে বোঝানো হয়—কোন বস্তুর অবাঞ্ছিত স্থানে অবস্থান। টোম্যাটো-সস্ খাবার প্লেটেই মানায়, কিন্তু পোষাক-পরিচ্ছদে লেগে থাকাকে নিশ্চয়ই পরিচ্ছন্নতার পর্যায়ে ফেলা যায় না। অতএব টোম্যাটো-সসকে অবাঞ্ছিত স্থান থেকে মুক্ত করা প্রয়োজন। এই শিক্ষা থেকেই মলিনতা দূরীকরণের প্রেরণা আমরা পেয়েছি এবং তার সার্থক প্রয়াসের মধ্যেই পরিষ্করণ-ব্যবস্থার উৎপত্তি। মলিনতার প্রকারভেদে চার প্রকারের পরিষ্কার-প্রকরণ উদ্ভাবন করা হয়েছে; যেমন—(1) হাত দিয়ে ঝেড়ে ফেলা, (2) জলের সাহায্যে ধুয়ে ফেলা, (3) বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন রাসায়নিক দ্রব্যের সাহায্যে স্থানচ্যুত করা এবং (4) বিশেষ দ্রাবকের সাহায্যে দ্রবীভূত করা। আলোচ্য প্রবন্ধে এই তৃতীয় পর্যায়ের বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন পদার্থের বিষয়েই আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখবো। তৃতীয় পর্যায়ের মলিনতা হলো, যা শুধুমাত্র হাত দিয়ে ঝাড়লে বা জল দিয়ে ধুয়ে ফেললে অপসারিত হয় না। এর জন্যে প্রয়োজন—বিশেষ ধরণের পরিষ্কার করবার ক্ষমতাসম্পন্ন বস্তু। এই বিশেষ বস্তুটির আবিষ্কার হয়েছিল বহু প্রাচীন কালে এবং সেই সময় থেকেই এর ব্যাপক ব্যবহার প্রচলিত। সেই বস্তুটি হলো সাবান—প্রাকৃতিক ফ্যাটি অ্যাসিডের সোডিয়াম

ঘটিত একটি লবণ। সাবান প্রস্তুত-প্রণালীও সাধারণ। ফ্যাটি অ্যাসিডকে কস্টিক সোডা বা কস্টিক পটাসের দ্বারা saponify করলেই সাবান প্রস্তুত হয়; যেমন—

$$CH_3(CH_2)_{16}COOH + NaOH \rightarrow$$
(ষ্টিয়ারিক অ্যাসিড) (কস্টিক সোডা)

$$CH_3(CH_2)_{16}COONa + H_2O$$
(সাবান) (জল)
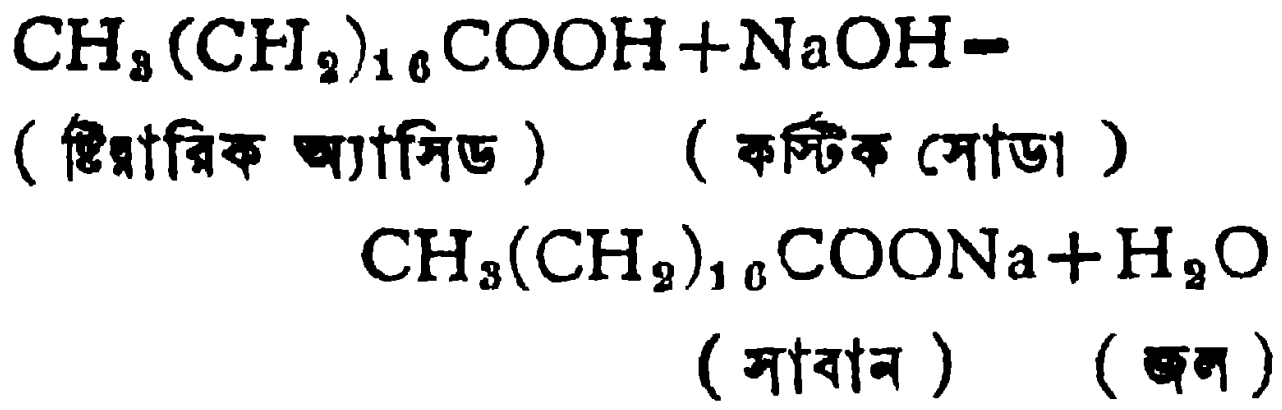
পরিষ্কার করবার এই বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী সাবান কি কারণে হলো, সে সম্বন্ধে তলিয়ে দেখলে দেখা যাবে, Electrolytic dissociation-এর ফলে সাবান জলে দ্রবীভূত হয়; অর্থাৎ নেগেটিভ চার্জযুক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড এবং পজিটিভ চার্জযুক্ত সোডিয়াম বন্ধনমুক্ত হয়। এই মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে জলের OH আয়ন সোডিয়ামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড উৎপন্ন করে এবং জলের H আয়নটি কার্বোক্সিল গ্রুপের সঙ্গে মিলে আবার ফ্যাটি অ্যাসিড $CH_3(CH_2)_{16}COOH$ উৎপন্ন করে। ফলস্বরূপ দেখা যাচ্ছে, জলের প্রতি সোডিয়ামের স্বাভাবিক আকর্ষণ থাকায় সহজেই জলে দ্রবীভূত হয়; কিন্তু হাইড্রোকার্বন অংশটি ঠিক সোডিয়ামের বিপরীত। জলের প্রতি এর কোন আকর্ষণ নেই—তাই জল থেকে বেরিয়ে আসতে চায়। বিজ্ঞানীরা এইরূপ আচরণকে hydrophilic বা water loving এবং hydrophobic বা water hating আখ্যা দিয়েছেন। এটাও ধ্রুব সত্য যে, এই বিপরীতধর্মী আচরণের মধ্যেই পরিষ্করণ-ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। কারণ hydrophilic অংশটি জলের মধ্যে hydrophobic অংশকে টানতে থাকে এবং hydrophobic অংশটি সর্বদাই এই টান থেকে মুক্ত হতে চেষ্টা করে। ফলে hydrophobic অংশ জলের উপরিভাগে জমা হয় এবং জলের উপরিভাগের স্বাভাবিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটায়; অর্থাৎ জলের তলটান (Surface tension) কমিয়ে দেয়। তলটান কমে যায় বলেই ওয়েটিং, ফোমিং এবং পরিষ্করণ সম্ভব হয়। এই প্রকার পদার্থকে Surface active agent বলা হয়। এই সম্বন্ধে আরও একটু বিশদভাবে দেখলে দেখা যায়, জলের মধ্যে water repellent নেগেটিভ আয়নগুলি নিজেরা দলবদ্ধ হয়ে একটা গোষ্ঠী গঠন করে Spherical colloid কণা হিসাবে জটলা পাকায়। এদের বলে Micelles। এতে 50 থেকে 100টা আয়ন থাকে। Micelles এমন ভাবে তৈরি হয় যে, hydrophobic অংশগুলি গোলকের কেন্দ্রে থাকে এবং hydrophilic অংশের সাহায্যে সমস্ত গোলকটি আবৃত থাকে। ময়লা সাধারণতঃ hydrophobic এবং সেই কারণে ডিটারজেন্টের লম্বা শৃঙ্খলের নেগেটিভ আয়নগুলি ময়লার সঙ্গে জোট বাঁধে। এইভাবে water hating parts অর্থাৎ ময়লাকে water loving আস্তরণের মাধ্যমে জলে দ্রবণীয় করে তোলে। সাবানের এই ধর্মই হলো Surface active agent-এর স্বাভাবিক ধর্ম।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার দ্বারা Surface active agent উদ্ভাবনের চেষ্টা সুরু হয়। 1913 সালের প্রথম দিকে একজন বেলজিয়ান রসায়নবিদ্ Reychler গবেষণাগারে কৃত্রিম উপায়ে ডিটারজেন্ট আবিষ্কার করেন। তাঁর আবিষ্কারের বিষয় তিনি একটি বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় প্রকাশ করেন। এই আবিষ্কারের অনুপ্রেরণা থেকে 1917 সালে Dr. Fritz Gunthar কোলটারের (Coal tar) উপজাত পদার্থ হিসাবে ডিটারজেন্ট সংশ্লেষণে সক্ষম হন। 1925 সালে 'Nekal' নামে এই ডিটারজেন্ট বাজারে প্রথম বের হয় এবং এর ব্যবহার প্রচলিত হয়। সংশ্লেষিত ডিটারজেন্টের সঙ্গে সাবানের মূলগত পার্থক্য আছে। এই নূতন দ্রব্যটি খর জলের ক্যালসিয়াম এবং

ম্যাগ্‌নেসিয়ামের সঙ্গে সাবানের মত কোন অ-দ্রাব্য লবণ প্রস্তুত করে না। ফলে খর জলে এর পরিষ্কার করবার ক্ষমতার কোন তারতম্য হয় না এবং অল্প মাত্রায় ডিটারজেণ্ট ব্যবহার করলেই বাঞ্ছিত ফল পাওয়া যায়। T. E. Larsen. (Journal of the American Water Works Association, April, 1949) ভাল ডিটারজেণ্টের কি কি বিশেষ গুণ থাকা প্রয়োজন, তা লিপিবদ্ধ করেছেন—(1) জলে সহজে দ্রবণীয়, (2) ডিটারজেণ্ট মিশ্রিত জলের দ্রবণটি কৈশিক (capillary) তন্তুর মধ্যে সহজে প্রবেশ করতে সক্ষম এবং (3) Emulsion প্রস্তুতের ক্ষমতা।

সংশ্লেষিত ডিটারজেণ্টের প্রস্তুত-প্রণালী সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ না দিয়ে অল্প কথায় বলতে পারা যায়—ফ্যাটি অ্যাসিড একটি অনুঘটকের সাহায্যে উচ্চ চাপ এবং উচ্চ তাপমাত্রায় হাইড্রোজেনের সঙ্গে বিক্রিয়া করে ফ্যাটি অ্যালকোহল উৎপন্ন করে।

$R-COO-H + 2H_2 =$

(ফ্যাটি অ্যাসিড) (হাইড্রোজেন)

$R-CH_2-OH + H_2O$
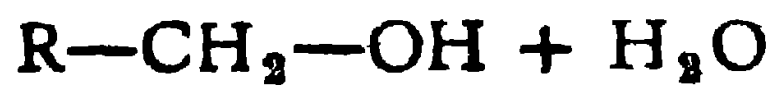
(ফ্যাটি অ্যালকোহল) (জল)

এবারে এই ফ্যাটি অ্যালকোহলের সঙ্গে সালফিউরিক অ্যাসিডের রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটানো হয়। ফলে ফ্যাটি অ্যালকোহল সালফেট উৎপন্ন করে।

$R-CH_2-OH+H_2SO_4 =$

(ফ্যাটি অ্যালকোহল) (সালফিউরিক অ্যাসিড)

$R-CH_2-OSO_2OH+H_2O$

(ফ্যাটি অ্যালকোহল সালফেট) (জল)

পরিশেষে ফ্যাটি অ্যালকোহল সালফেট কস্টিক সোডার সঙ্গে বিক্রিয়া করে ফ্যাটি অ্যালকোহল সালফেটের একটি সোডিয়ামঘটিত লবণ প্রস্তুত করে। এই লবণটিই হলো সংশ্লেষিত ডিটারজেণ্ট।

Dr. Fritz Gunthar-এর পর থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত বহু প্রকারের ডিটারজেণ্ট আবিষ্কৃত হয়েছে। Ionisation-এর প্রতি লক্ষ্য রেখে ডিটারজেণ্টগুলিকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম ভাগ—Anionic, যেমন—$CH_3(CH_2)_{11}OSO_3Na$; দ্বিতীয় ভাগ—Cationic, যেমন—$CH_3(CH_2)_{11}N(CH_3)_3Cl$ এবং তৃতীয় ভাগ—Nonionic, যেমন—$CH_3(CH_2)_{11}-O-CH_2-CH_2-O-CH_2-CH_2-OH$.

E. E. Dreger, G. I. Kein, G. D. Miles, L. Shedlovsky এবং J. Ross (Ind. Eng. Chem. 36, 610-617, 1944) কার্বনমালার দৈর্ঘ্যের সর্বোচ্চ সীমা এবং হাইড্রোফিলিক গোষ্ঠীর অবস্থান সম্পর্কে একটি তথ্য প্রকাশ করেন, যার ফলে কার্বনমালার দৈর্ঘ্য এবং হাইড্রোফিলিক গোষ্ঠীর অবস্থান দেখেই তার Wetting property এবং Foam stability নির্ণয় করা সহজ হবে। দেখা গেছে, হাইড্রোফিলিক গোষ্ঠী কার্বনমালার যত শেষের দিকে থাকবে, ততই তার পরিষ্করণের ক্ষমতা বাড়বে এবং যত দূরে অবস্থিতি হবে, ততই Wetting property বাড়বে।

পরিষ্কার করবার ক্ষমতা অর্থাৎ detergency আরও দুটি বিশেষ অবস্থার উপর নির্ভরশীল—তাপমাত্রা এবং pH (Hydrogen ion concentration)। আমরা অবগত আছি যে, উচ্চ তাপমাত্রায় সাবানের পরিষ্করণ-ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। সংশ্লেষিত ডিটারজেণ্টের বেলায়ও তাপের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। যে ডিটারজেণ্ট 12টি কার্বনের দ্বারা গঠিত, তারা স্বল্প তাপমাত্রায় ভাল কাজ করে ; কিন্তু 18টি কার্বনের দ্বারা গঠিত ডিটারজেণ্ট উচ্চ তাপমাত্রায় সক্রিয় হয়। তবে বেশীর ভাগ ডিটারজেণ্টকেই দেখা যায় 100° থেকে 140° ফাঃ-এর মধ্যে সক্রিয় থাকে। সাবানের উপর pH-এর প্রভাব আমরা জানি। pH কমতে থাকলে

অর্থাৎ অ্যাসিডের মাধ্যমে সাবান মোটেই সক্রিয় থাকে না, কারণ সাবানের desaponification ঘটে। কিন্তু pH বাড়তে থাকলে ক্ষারের মাধ্যমে সাবানের পরিষ্করণ-ক্ষমতা বজায় থাকে। দেখা গেছে সাবান pH 10·50 থেকে pH 11·0-এর মধ্যে সবচেয়ে কার্যকর হয়। সংশ্লেষিত ডিটারজেন্টের ক্ষেত্রে কিন্তু এত কড়াকড়ি নিয়ম নেই। pH 7·0-এর নীচেও এরা কার্যকর থাকে এবং ভরপুর ফেনা হতেও কোন অসুবিধা হয় না। তবে সাধারণতঃ 10·5 pH-এ ডিটারজেন্ট ব্যবহার করলে যে সবচেয়ে বেশী কার্যকর হয়, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

আধুনিক কালে Surface active agent-সমূহ যে শুধু মাত্র পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে, সে কথা মনে করলে ভুল হবে। এর প্রয়োগের দিক থেকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে ব্যাপক গবেষণা হয়েছে, তা আলোচ্য বিষয়-গুলি অনুধাবন করলেই উপলব্ধি করা যাবে। 1935 সালে Domagk প্রকাশ করেন যে, Alkyl benzyl dimethyl ammonium chloride-এর জীবাণু প্রতিরোধক ক্ষমতা আছে। তারপর থেকেই এই বিষয় নিয়ে নূতনভাবে গবেষণা সুরু হবার ফলে জীবাণু প্রতিরোধের ব্যাপারে একটি নূতন দিগন্তের আবরণ উন্মোচিত হয়। বিশদ পরীক্ষার ফলে আমরা জানতে পারি যে, ক্যাটায়নিক এবং অ্যানায়নিক—এই উভয় প্রকার যৌগই জীবাণু প্রতিরোধের ক্ষমতাসম্পন্ন, কিন্তু নন-আয়নিক যৌগসমূহের অধিকাংশ জীবাণুর উপর প্রতিরোধ-ক্ষমতা নেই। ক্যাটায়নিক যৌগ গ্র্যাম-পজিটিভ ও গ্র্যাম-নেগেটিভ উভয় প্রকার জীবাণুকেই প্রতিরোধ করতে সক্ষম। জীবাণু প্রতিরোধক ক্ষমতার উপরও pH-এর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ক্যাটায়নিক যৌগ-গুলির জীবাণু প্রতিরোধ-ক্ষমতা pH বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পায়। আবার অ্যানায়নিক যৌগের ক্ষেত্রে pH কমবার সঙ্গে সঙ্গে জীবাণু-প্রতিরোধক ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। Quisno এবং Foter (J. Bact. 1946, 52, 111) পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, Cetyl pyridinum chloride-এর জীবাণু-প্রতিরোধক ক্ষমতা pH 2·0 থেকে 10·0 পর্যন্ত অপরিবর্তনশীল থাকে। যাহোক, সংশ্লেষিত Surface active agent-সমূহ যে জীবাণুনাশক, সে বিষয়ে দ্বিমত নেই।

Fogelson এবং Shoch প্রমাণ করেন যে, gastric ও duodenal ক্ষতে Sodium alkyl sulphate ব্যবহার করলে সুফল পাওয়া যায়। মলমের মধ্যে 2% Sodium lauryl sulphate ব্যবহার করে পাকস্থলী এবং অন্ত্রের ভগন্দর এবং ক্ষতের উপশমে বিশেষ সুফল পাওয়া গেছে। কৃষিকার্যে Alhyl benzene sulphate (ABS) ব্যবহার করে যে সুফল পাওয়া গেছে, সে খবর আমরা 1954 সালে E. A. clark-এর গবেষণা থেকে জানতে পারি। তিনি দাবী করেন যে, ABS ব্যবহার করলে মাটিতে জল প্রবেশের এবং মাটির জলধারণ ক্ষমতা বাড়ে। এর ফলে মাটির উন্নতি ঘটে এবং গাছের বৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করে। যে সব মাটিতে হিউমাস কম থাকে, সেই সব মাটির হিউমাসের অভাব পূরণ করে। ফলে উদ্ভিদ তার পুষ্টিকর খাদ্যসমূহ শিকড়ের সাহায্যে গ্রহণ করতে সক্ষম হয়। আরও সম্ভবনাপূর্ণ সংবাদ হলো, অনুর্বর এবং ক্ষারধর্মী মাটি, যেখানে চাষ-আবাদ হয় না, সেই সব জমিতে ABS প্রয়োগ করলে জমি উর্বর হয় এবং সেখানে ফসল ফলানো সম্ভব হয়।

আমরা জানি, Froth flotation পদ্ধতির দ্বারা খনিজ পদার্থকে অপ্রয়োজনীয় পদার্থ থেকে পৃথক করা হয়। এই পদ্ধতিতে খনিজ মিশ্রিত পদার্থকে ভেঙ্গে গুঁড়া করা হয়। তারপর এই গুঁড়া Flotation cell-এর মধ্যে নিয়ে জল ও Flotation reagent মেশানো হয়।

এবারে একটি Agitator দিয়ে খুব বেশী আলোড়নের সৃষ্টি করে বায়ু প্রবাহিত করা হয়। ফলে প্রচুর ফেনায় ভরে যায় এবং সেই ফেনার সঙ্গে প্রয়োজনীয় খনিজ পদার্থ উপরে ভেসে ওঠে আর অবাঞ্ছিত পদার্থসমূহ নীচে পড়ে থাকে অথবা এর ঠিক উল্টো ব্যাপারও ঘটতে পারে। ভিন্ন ভিন্ন খনিজ পদার্থের পৃথকীকরণের জন্যে ভিন্ন ভিন্ন Surface active agent ব্যবহৃত হয়ে থাকে। Galena-কে পৃথক করতে হলে Alkyl xanthates ব্যবহার করা হয়, আবার Cassiterite সংগ্রহ করতে Sodium cetyl sulphate ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

Surface active agent-এর রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলাফল যদি অনুধাবন করা যায়, তাহলে তার সার্থক প্রয়োগ দেখা যাবে Twitchell প্রক্রিয়ার মধ্যে—যেখানে চর্বির অণুকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ভেঙে ফেলা হয়। এই পদ্ধতিতে চর্বিকে জল ও Anionic surface active agent-এর মাধ্যমে উচ্চ তাপমাত্রায় গরম করা হলে চর্বির hydrolysis ঘটে এবং Glycerol আর Free fatty acid উৎপন্ন করে। এখানে Surface active agent অনুঘটকের কাজ করে' এই রাসায়নিক বিক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে।

সীসা, ক্যাড্‌মিয়াম এবং পারদ ক্যাথোড যেখানে জৈব পদার্থের বিশেষ Electro-chemical reduction সংঘটিত করে, সেখানে Surface active agent বর্তমান থাকাতে তড়িৎ-প্রবাহের কার্যকর ক্ষমতার হ্রাসপ্রাপ্তি ঘটে। ক্যাটায়নিক যৌগগুলি ক্যাথোডের উপরিভাগে লেগে থাকার ফলে জৈব পদার্থসমূহের reduction-এ বাধা দেয় অর্থাৎ সেগুলি ঐ Surface active পদার্থের আস্তরণ ভেদ করে ক্যাথোডে পৌঁছুতে পারে না।

সংশ্লেষিত ডিটারজেণ্ট বা Synthetic surface active agent আবিষ্কৃত হবার পর থেকে আজ পর্যন্ত এর ব্যবহার বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। ধাতুবিদ্যা, ইলেক্ট্রোপ্লেটিং, খাদ্যদ্রব্য, প্রসাধন সামগ্রী এবং আরো অনেক শিল্পে Surface active পদার্থের ব্যবহার হচ্ছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশে এর উৎপাদনের পরিমাণ তেমন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায় নি এবং প্রয়োগবিস্তার দিক থেকেও তেমন প্রসার লাভ করে নি। যেহেতু এই পদার্থগুলি কৃষিকার্যে বিশেষ উপযোগী, সেহেতু আমাদের দেশে, যেখানে খাদ্যসমস্যা একটি অন্যতম প্রধান সমস্যা—জমির উর্বরতা ফিরিয়ে আনতে এবং প্রচুর শস্য ফলনের জন্যে একান্ত আবশ্যক। মাটির ক্ষয়প্রাপ্তি যেখানে ঘটেছে, সেখানে এই পদার্থগুলির কার্যকারিতা পরীক্ষার প্রয়োজন আছে। সর্বশেষে মানুষের শরীরে Surface active agent-এর প্রভাব কিরূপ, সে সম্বন্ধে সম্যক গবেষণা করলে আরও হয়তো বিচিত্র রহস্যের সন্ধান পাওয়া যাবে। কারণ Surface active agent এখনও অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার অপেক্ষা রাখে এবং ভবিষ্যতে আরো অনেক চমকপ্রদ ফলাফল হয়তো অপেক্ষা করে আছে।

প্রজাতির উদ্ভব

মৃদুলা মৌলিক*

প্রজাতি বলতে প্রাণী বা উদ্ভিদের এমন স্বাভাবিক গোষ্ঠীকে বোঝায়, যারা অপর প্রাণী বা উদ্ভিদের স্বাভাবিক গোষ্ঠী থেকে উৎপত্তিগত-ভাবে ভিন্ন, সংজননে স্বতন্ত্র। পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণী আছে, যারা প্রত্যেকেই প্রত্যেকের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। সৃষ্টির আদিকাল থেকে আজ পর্যন্ত অসংখ্য নতুন নতুন প্রজাতির সৃষ্টি হয়েছে এবং এর ফলে জীবের ক্রমবিকাশের ধারা বাহিত হচ্ছে। কিন্তু এদের উদ্ভব সম্বন্ধে কিছুদিন আগে পর্যন্তও আমাদের ধারণা অস্পষ্ট ছিল। বিগত দশকের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলি এই বিষয়ে সম্যক ধারণা এনে দিয়েছে। ক্রোমোজোম** এবং জিন*-এর উপর ভিত্তি করে বংশগতি পদ্ধতির বিষয় আলোচনা করলে আমরা প্রজাতির উদ্ভবের বিষয় ভালভাবে বুঝতে পারি।

অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকে এই সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক ধারণা ছিল কিছুটা আনুমানিক এবং প্রমাণসাপেক্ষ। বিজ্ঞানী জিন ব্যাপটিষ্ট লামার্কের (1744-1829) মতে, জীবদ্দশায় অর্জিত সমস্ত দৈহিক গুণাগুণ বংশপরম্পরায় উত্তর-পুরুষদের মধ্যে সঞ্চারিত হবার ফলে নতুন প্রজাতির সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন প্রজাতিরমধ্যে যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়, লামার্কের মতে ঐগুলি সাধারণতঃ প্রাকৃতিক প্রভাব বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ব্যবহার বা অব্যবহারের ফল। এই পার্থক্যের উৎপত্তি সম্বন্ধে ডারউইনের সম্যক (1809-1882) ধারণা ছিল না, কিন্তু তিনি এই পার্থক্য-গুলি লক্ষ্য করেছিলেন। তাঁর মতে, প্রাকৃতিক নির্বাচনে কতকগুলি পার্থক্য স্থিতিলাভ করে। পরবর্তী কালে অগাষ্ট ওয়েজম্যান (1834-1914) উক্ত মতবাদকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করেন।

কারণ যে কোন জীবের জীবদ্দশায় অর্জিত যাবতীয় গুণাগুণ তার উত্তর পুরুষেরা উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করে না। তাই চীনা মেয়েদের লোহার জুতা পরিয়ে পা ছোট করবার চেষ্টা করলেও পরবর্তী পুরুষে মেয়েদের পা জন্ম থেকেই ছোট হয় না। কাজেই উপরিউক্ত দুটি মতবাদের একটিও সম্পূর্ণ নির্ভুল নয়।

আজকের জিন-মতবাদ অনুসারে আমরা জানতে পারি যে, উত্তরাধিকার সূত্রে কোন ভিন্ন বা পরিবর্তিত গুণাগুণ পেতে হলে ক্রোমোজোম ও জিন্-এর মধ্যে পরিবর্তন আনা বাঞ্ছনীয়। তাই ক্রোমোজোমের সংখ্যা ও উপাদানের কোনও বিশেষ পরিবর্তন নতুন প্রজাতি গঠনে একান্ত প্রয়োজনীয়। ক্রোমোজোমের এই সংখ্যা বা উপাদানের পরিবর্তনকে মিউটেশন বা পরিব্যক্তি বলে। সাধারণতঃ প্রত্যেক প্রজাতিতেই ক্রোমো-জোমের সংখ্যা নির্দিষ্ট থাকে। কিন্তু কোন বিশেষ ভৌতিক বা রাসায়নিক কারণে এদের

** ক্রোমোজোম—জীবদেহের কোষের নিউ-ক্লিয়াসে বর্তমান—জটিল রাসায়নিক উপাদানে গঠিত। কোষ-বিভাজনে এগুলি অংশ গ্রহণ করে। প্রত্যেক প্রজাতিতে এদের সংখ্যা নির্দিষ্ট। অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিষ্ক্রিয় ও সক্রিয় জটিল রাসায়নিক অংশের দ্বারা ক্রোমোজোম তৈরি—প্রতিটি ক্ষুদ্র অংশকে জিন* (Gene) বলে।

* জাতীয় উদ্ভিদ সংরক্ষণাগার, ভারতীয় উদ্ভিদ-উদ্যান, হাওড়া-3

মোট সংখ্যা বেড়ে যায়। তখন এদের বলা হয় পলিপ্লয়েড অথবা ক্রোমোজোমের মধ্যে জিনের গঠনের কিছু তারতম্য ঘটতে পারে ঐ একই কারণে। তখন তাকে বলা হয় জিন-মিউটেশন, কিন্তু এর বহিঃপ্রকাশ খুবই কম। আবার বর্ণ-সঙ্কর (Hybrid) উৎপন্ন করবার সময় ক্রোমোজোমের মধ্যে জিনের সজ্জারীতিতে কিছুটা বৈচিত্র্য আসে, যার ফলে আমরা ভিন্ন গুণাগুণের বহিঃপ্রকাশ দেখতে পাই।

উপরিউক্ত তিনভাবে ক্রোমোজোমের মধ্যে পরিবর্তন ঘটলে সম্পূর্ণ ভিন্ন গুণাবলীর প্রকাশ হয়, যদি এই নতুন গুণাবলীবিশিষ্ট জীব বংশ-বিস্তারে সক্ষম হয়, তবেই নতুন প্রজাতি উৎপন্ন হতে পারে। তাই ক্রোমোজোমের পরিবর্তন যেমন একান্ত প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন প্রাকৃতিক নির্বাচনের।

উপরিউক্ত তিনটি উপায়ের মধ্যে ক্রোমোজোমের সংখ্যাবৃদ্ধিই প্রজাতি উদ্ভবে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে। বিজ্ঞানী মুণ্টজিং-এর মতে, পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক প্রজাতির উদ্ভব ক্রোমোজোমের সংখ্যাবৃদ্ধির সাহায্যেই হয়েছে। ক্রোমোজোমের সংখ্যাবৃদ্ধির বিশেষ প্রাধান্য থাকলেও বর্ণসঙ্কর উৎপত্তির ফলে নতুন প্রজাতির উদ্ভবও বিরল নয়।

জীবদেহের অভ্যন্তরে ঐ পার্থক্যগুলিই প্রজাতি উৎপত্তির সব কথা নয়, এর জন্যে অবস্থিতির পরিবর্তন বা বিচ্ছিন্নতা একান্ত প্রয়োজন। অবস্থিতির এই বিচ্ছিন্নতা বিভিন্ন কারণে হতে পারে; যেমন—ভৌগোলিক বাধা, ইকোলজিক্যাল বাধা প্রভৃতি। এই বাধার ফলে জীবের দেহকোষ বা জনন-কোষের ক্রোমোজোমের মধ্যে বিভিন্ন পরিবর্তন ঘটতে পারে। এভাবে একই গোষ্ঠীর কিছুটা পৃথক দুটি জীব যখন প্রাকৃতিক বাধা কাটিয়ে বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন করতে পারে, তখনই একটি সম্পূর্ণ আলাদা জীব-গোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়। এই জীব-গোষ্ঠী সংজননে সম্পূর্ণ আলাদা। এরা যদি বংশবিস্তারে সক্ষম হয়, তবেই এরা নতুন প্রজাতি হিসাবে পরিচিত হতে পারে। আমাদের অলক্ষ্যে কত শত পরিবর্তন হচ্ছে ক্রোমোজোমের মধ্যে, কিন্তু প্রাকৃতিক নির্বাচনে তাদের বেশীর ভাগই পরিত্যক্ত হয়। কাজেই জিন এবং ক্রোমোজোমের মধ্যে পরি-বর্তনের ফলে নতুন প্রাণী বা উদ্ভিদ সৃষ্টি হলেও এই পরিবর্তনের সাম্যের উপর নির্ভর করে এই নতুন জীবের বেঁচে থাকা, না থাকা।

বিভিন্ন ধরণের সূর্যরশ্মির প্রভাবে এবং তাপ-মাত্রার তারতম্যের ফলে বিচিত্র ধরণের প্রাণী ও উদ্ভিদ পৃথিবীর বুকে আমরা দেখতে পাই। ক্ষুদ্র সরল অ্যামিবা-গোষ্ঠীর জীব থেকে অতি জটিল গঠনসমন্বিত জীবের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ একই কারণে সম্ভব।

পৃথিবীর গভীরে

দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়*

পৃথিবীর কেন্দ্রের গভীরতা প্রায় 4000 মাইলের কাছাকাছি। তার অভ্যন্তরের সমস্ত রহস্য মানুষ এখনও উদ্ঘাটন করতে পারে নি। পৃথিবীর কেন্দ্রদেশের খবর জানবার কোন প্রত্যক্ষ উপায় নেই। পৃথিবীর কেন্দ্রদেশ পর্যন্ত নলকূপ বসাবার চিন্তা স্বপ্নবিলাস ছাড়া কিছুই নয়, কারণ পৃথিবীর গভীরতম তেলের (পেট্রোলিয়াম) কূপের গভীরতাও 5-6 মাইলের বেশী নয়। উপায়ান্তর না থাকায় ভূ-বিজ্ঞানীরা নানারকম অপ্রত্যক্ষ উপায়ে পৃথিবীর অভ্যন্তরের যে খবরাখবর সংগ্রহ করেছেন, তা নেহাৎই অপ্রতুল।

অনেক বিজ্ঞানী মনে করেন, গলিত অবস্থা থেকে ক্রমে ঠাণ্ডা হতে হতে পৃথিবী আজকের অবস্থায় এসে পৌঁচেছে। দুধের সরের মত পৃথিবীর উপরে সৃষ্টি হয়েছে এক পাতলা স্তর, যাকে বলা হয় ভূত্বক (Crust)। বিজ্ঞানীদের ধারণা, পৃথিবীর উপরের স্তর ঠাণ্ডা হয়ে এলেও অভ্যন্তর ভাগ কিন্তু অত্যন্ত উত্তপ্ত অবস্থায় রয়েছে—কয়লা বা সোনার খনিতে নামলে এই বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকে না। বিজ্ঞানীদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে ধারণা করা হয়েছে যে, সাধারণভাবে প্রতি 20 থেকে 100 মিটার গভীরতা বৃদ্ধির ফলে 1° সেন্টিগ্রেড উষ্ণতা বেড়ে যায়। কিন্তু শুধুমাত্র গভীরতা নয়, শিলাপ্রকৃতির উপরেও উষ্ণতাবৃদ্ধি নির্ভরশীল। যেমন শক্ত আগ্নেয় অথবা পরিবর্তিত শিলায় ক্ষেত্রে উষ্ণতাবৃদ্ধির হার পাললিক শিলার চেয়ে বেশী। আবার যেসব অঞ্চলে আগ্নেয়গিরি রয়েছে, সেখানে উষ্ণতাবৃদ্ধির হার তো বেশী হবেই। তাছাড়াও ভূত্বকে তেজস্ক্রিয় পদার্থ বেশী রয়েছে বলে ভূপৃষ্ঠে উষ্ণতাবৃদ্ধির মাত্রা ভূ-অভ্যন্তরের তুলনায় অনেক বেশী। সুতরাং স্পষ্টই বুঝতে পারা যায় যে, এই ধরণের পরোক্ষ প্রমাণ থেকে পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলের উষ্ণতার হিসেব নিতান্তই আনুমানিক হতে বাধ্য। পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলের তাপ কত? এই প্রশ্নের উত্তরে বিখ্যাত ভূ-বিজ্ঞানী গুটেনবার্গ বলেছেন, পৃথিবীর অন্তস্তলের (Core) উপরিভাগের তাপমাত্রা 1500° ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডের কাছাকাছি। অবশ্য গুটেনবার্গ, ড্যালি, আডাম্স্, জেফরী বা হোম্সের মতে এই তাপমাত্রা অনেক বেশী। এই মতের অমিল অত্যন্ত স্বাভাবিক, কারণ এই তাপমাত্রার পরিমাপ নিছক বৈজ্ঞানিক ধারণা ছাড়া কিছুই নয়। আর সেই কারণে এই সম্বন্ধে চুলচেরা গবেষণা আপাততঃ নিরর্থক।

গভীরতার সঙ্গে সঙ্গে শুধু তাপমাত্রাই নয়, চাপের পরিমাণও অনেকাংশে বৃদ্ধি পায়। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় দেখা গেছে, পৃথিবীপৃষ্ঠের এক মাইল নীচে চাপ প্রতি বর্গফুট জায়গায় প্রায় 450 টনের কাছাকাছি। এই গড় হিসেব থেকে কেন্দ্রে চাপের পরিমাণ স্থিরীকৃত হয়েছে, প্রতি বর্গফুটে প্রায় 20 লক্ষ টনের কাছাকাছি। তবে এই হিসেব যে নিতান্তই আনুমানিক, একথা বলাই বাহুল্য। কেন্দ্রের গভীরে তাপ ও চাপের প্রাবল্য থেকে স্বভাবতঃই অন্তস্তলের প্রকৃতি সম্বন্ধে কয়েকটি প্রশ্ন মনে উদিত হয়। তাপমাত্রা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যে কোন পদার্থেই আয়তনে বৃদ্ধি পায়, আবার অন্য দিকে চাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে পদার্থের আয়তন হ্রাস পায়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, পৃথি-

* ভারতের ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা।

বীর কেন্দ্রাঞ্চলে অতিরিক্ত চাপ ও তাপ—দুই বিরোধী শক্তি একই সঙ্গে কাজ করছে। ফলে পৃথিবীর অন্তস্তলের পদার্থ অকঠিন অথচ অতরল—এমন এক অবস্থায় বিরাজ করছে বলে বিজ্ঞানীরা মত পোষণ করেন।

পৃথিবীপৃষ্ঠে যে ধরণের শিলা দেখতে পাওয়া যায়, তার গড় আপেক্ষিক গুরুত্ব (Sp. gravity) প্রায় তিনের কাছাকাছি। অথচ সমগ্র পৃথিবীর আপেক্ষিক গুরুত্ব প্রায় সাড়ে পাঁচ। স্বভাবতঃই ভূ-বিজ্ঞানীরা মনে করছেন যে, ভূ-অভ্যন্তরে পদার্থের আপেক্ষিক গুরুত্ব নিশ্চয়ই আরো বেশী—হয়তো সাত বা আটের কাছাকাছি। কিন্তু শুধুমাত্র চাপের প্রভাবে পদার্থের ঘনত্বের এতখানি পরিবর্তন সম্ভব নয়। তাই বিজ্ঞানীদের ধারণা, পৃথিবীর অন্তস্তল নিশ্চয়ই কোন ভারী ধাতব পদার্থে গঠিত। মহাকাশের বুক থেকে ছুটে-আসা উল্কাপিণ্ড পরীক্ষা করে দেখা গেছে, সেগুলি সাধারণতঃ লোহা ও নিকেলজাতীয় পদার্থে তৈরি। একথা বলাই বাহুল্য, বেশীর ভাগ উল্কাপিণ্ডই সৌরজগতের মৃত বাসিন্দা। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের ঘর্ষণে বাইরের অংশটুকু জলেপুড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। পড়ে থাকে শুধু ভিতরের লোহা ও নিকেলের মিশ্র অংশটুকু। একই সৌরজগতের অংশ বলে উল্কাপিণ্ডের সঙ্গে পৃথিবীর মূলগত সাদৃশ্য থাকবে, এটাই স্বাভাবিক। পৃথিবীর অন্তস্তল লোহা ও নিকেলে তৈরী—বিজ্ঞানীদের এই অনুমানের সাহায্যে পৃথিবীর চৌম্বক শক্তিকে ব্যাখ্যা করা সহজতর হয়েছে।

পৃথিবীগর্ভের আকৃতি ও প্রকৃতির স্বরূপ উদ্ঘাটনে বিজ্ঞানীদের মূলতঃ নির্ভর করতে হয়েছে ভূকম্পনজনিত তরঙ্গের গতি-প্রকৃতির বিশ্লেষণের উপর, যদিও তরঙ্গের বিশ্লেষণের ব্যাপারে বিজ্ঞানীমহলে প্রচুর মতভেদ লক্ষ্য করা যায়। নিস্তরঙ্গ জলে ঢিল ছুড়লে যেমন জলের ঢেউ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে, তেমনিভাবেই ভূকম্পনজনিত তরঙ্গমালা উৎসস্থল থেকে পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। আর সেই সব তরঙ্গই ক্যামেরার ছবির মত সিস্‌মোগ্রাফ যন্ত্রে ধরা পড়ে। যন্ত্রে ধরা পড়েছে, পৃথিবীর বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়ে চলবার সময় মাঝে মাঝে তরঙ্গের গতিবেগের পরিবর্তন ঘটে। এই গতিবেগের তারতম্য থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন স্তরের প্রকৃতি ও গভীরতা নির্ণয় করা সম্ভব হয়েছে।

সাধারণভাবে তিন ধরণের ভূকম্পন তরঙ্গের কথা বলা হয়েছে। P বা প্রাথমিক তরঙ্গ, S বা গৌণ তরঙ্গ এবং L বা দীর্ঘ তরঙ্গ। এদের গতি ও প্রকৃতি পরস্পর থেকে আলাদা। যেমন P ও S তরঙ্গমালা কেবলমাত্র কঠিন পদার্থের মধ্য দিয়ে চলতে পারে, কিন্তু L তরঙ্গ কঠিন পদার্থের মধ্য দিয়ে চলতে অক্ষম। সুতরাং পৃথিবীর অভ্যন্তরের প্রকৃতি নির্ধারণে কেবলমাত্র P ও S তরঙ্গমালার বিশ্লেষণের উপরে নির্ভর করতে হয়েছে। সিস্‌মোগ্রাফ রেকর্ড থেকে দেখা গেছে, গভীরতার সঙ্গে সঙ্গে পূর্বোক্ত তরঙ্গ দুটির গতিবেগ ক্রমেই বেড়ে চলে। কিন্তু 60 থেকে 80 কিলোমিটার গভীরতায় তরঙ্গবেগ হ্রাস পায়। 160 কিলোমিটারের পর থেকে আবার গতিবেগ বাড়তে থাকে, যদিও 950 কিলোমিটার গভীরতায় কমে যায়। 950 কিলোমিটারের পর থেকে 2900 কিলোমিটার পর্যন্ত গতিবেগ আবার বাড়তে থাকে। কিন্তু 2900 কিলোমিটার গভীরে তরঙ্গমালার গতিবেগ হঠাৎ অত্যন্ত কমে যায়। ভূকম্পন তরঙ্গের গতিবেগের এরকম ওঠা-নামা দেখে স্পষ্টই বোঝা যায়, পৃথিবীর অভ্যন্তরে সব জায়গায় শিলার গঠন-প্রকৃতি এক রকম হতে পারে না। গতিবেগের তিনটি পর্যায় থেকে পৃথিবীরও তিনটি স্তরের কল্পনা করা হয়েছে। যেমন—সব চেয়ে উপরের স্তরের নাম ভূত্বক (গভীরতা 60 কিলোমিটার), মধ্যবর্তী স্তরের নাম ম্যাণ্টল (গভীরতা 2900 কিলোমিটার) ও সবচেয়ে

নীচের স্তরের নাম অন্তস্তল, যা পৃথিবীর কেন্দ্র পর্যন্ত প্রসারিত (চিত্র দ্রষ্টব্য)। অনেক বিজ্ঞানীর মতে অন্তস্তলের পদার্থ গলিত অবস্থায় রয়েছে, যদিও এই বিষয়ে কিছু কিছু বিজ্ঞানী সংশয়াচ্ছন্ন।
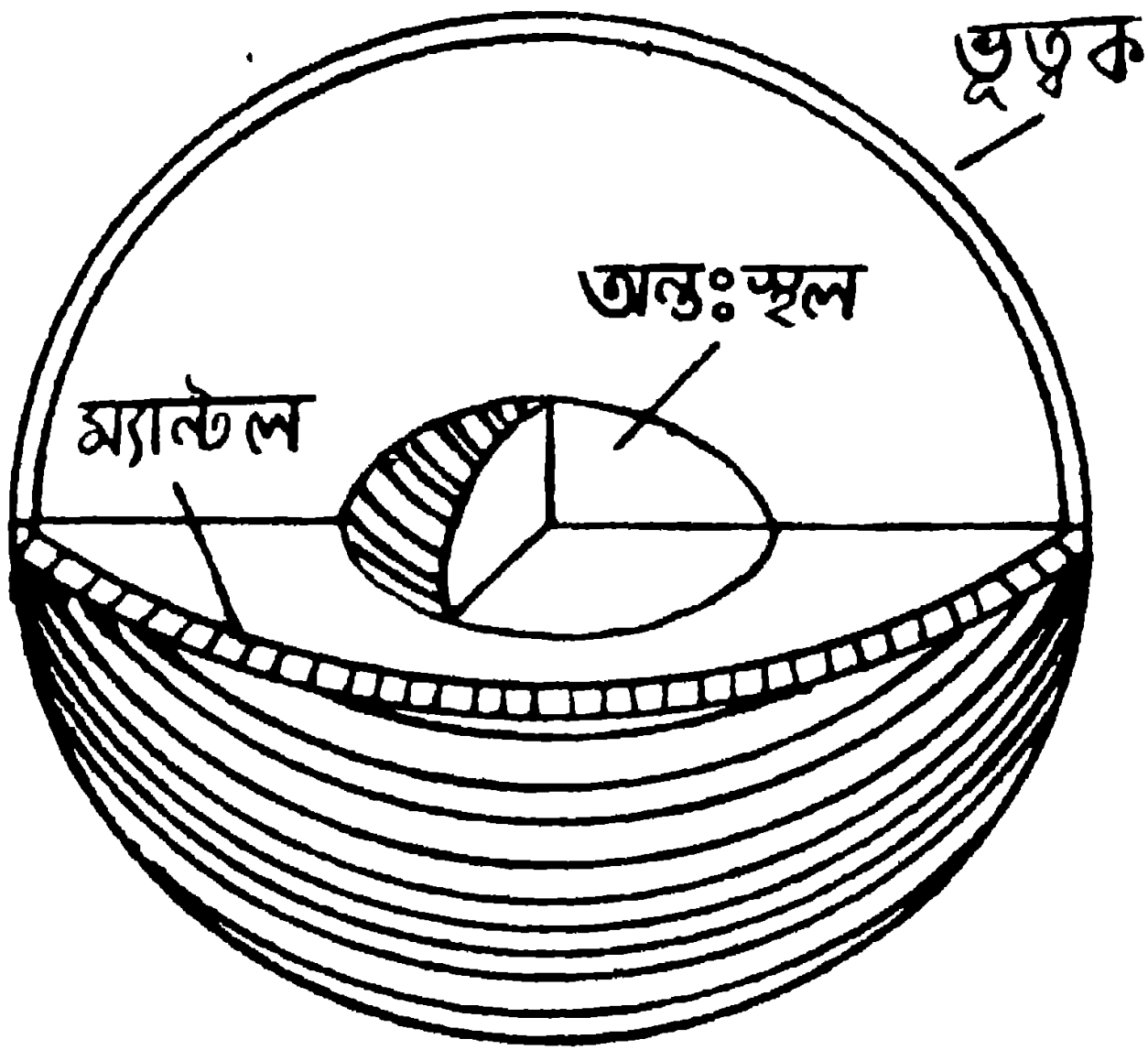
পৃথিবীর অন্তস্তল, ম্যান্টল ও ভূত্বক।

ভূত্বক ও ম্যান্টল এবং ম্যান্টল ও অন্তস্তলের মধ্যে দুটি বিরতি (Discontinuity) রেখা কল্পিত হয়েছে। প্রথমটি বিখ্যাত ভূ-বিজ্ঞানী মহরোভিসিকের নামে এবং দ্বিতীয়টি ভূ-বিজ্ঞানী গুটেনবার্গের নামে পরিচিত। তাছাড়া আরও কয়েকটি বিরতি রেখা রয়েছে। অবশ্য এগুলির গুরুত্ব অনেক কম।

একথা আগেই বলা হয়েছে যে, পৃথিবীকে শামুকের খোলার মত আবৃত করে যে কঠিন স্তরটি বিরাজ করছে, তার নাম ভূত্বক। গভীরতা প্রায় 60 কিলোমিটার। এই ভূত্বকের মধ্যে আবার দুটি ভাগ। উপরাংশে সিয়াল (Sial—সিলিকা ও অ্যালুমিনিয়ামসমৃদ্ধ পদার্থ) ও নিম্নাংশ সিমা (Sima—সিলিকা ও ম্যাগ্‌নেসিয়ামসমৃদ্ধ পদার্থ)। ভূত্বকে অক্সিজেন, সিলিকন, অ্যালুমিনিয়াম, পটাশিয়াম বা সোডিয়ামের পরিমাণ বেশী, যদিও লোহা ও ম্যাগ্‌নেশিয়ামের পরিমাণও কম নয়। ভ্যাণ্ডার গ্র্যাট, গুটেনবার্গ প্রমুখ ভূ-বিজ্ঞানীরা কিন্তু ভূত্বকের তিনটি ভাগ করেছেন, যেমন—সবচেয়ে উপরের স্তরে রয়েছে গ্র্যানিট জাতীয় পাথর—প্রায় 10 কিলোমিটার পুরু। এখানে একটি কথা বলা প্রয়োজন। সমুদ্রের তলদেশে কিন্তু গ্র্যানিট পাথর দেখতে পাওয়া যায় না। দ্বিতীয় স্তরটি প্রায় 20 কিলোমিটার পুরু—ব্যাসাল্ট ও অ্যামফিবোলাইট পাথরে তৈরী। আর সবচেয়ে নীচের স্তরে রয়েছে ডিউনাইট ও পেরিডোটাইটজাতীয় পাথর—প্রায় 30 কিলোমিটার পুরু। সাধারণভাবে ভূত্বকে আগ্নেয়-শিলার প্রাচুর্য দেখা যায়। ক্লার্কের মতে, ভূত্বকের প্রথম 1·6 কিলোমিটারে শতকরা প্রায় 95 ভাগ আগ্নেয়শিলা, বাকীটা পাললিক শিলা।

কোন কোন ভূবিদ্ কল্পনা করেছেন, পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে মাত্র 40 কিলোমিটার নীচেই রয়েছে গলিত লাভার স্তর। কিন্তু ভূ-পদার্থবিদেরা এই ধারণাকে অমূলক বলে অভিহিত করেছেন। কারণ সে রকম কোন গলিত লাভার স্তর থাকলে ভূকম্পন তরঙ্গের গতিবেগে তারতম্য ঘটতো। স্বাভাবিক কারণে অনেকে পাল্টা প্রশ্ন তুলেছেন, তবে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুচ্ছ্বাসের সময় গলিত লাভা আসে কোথা থেকে? উত্তরে ভূ-পদার্থবিদ্‌রা বলেছেন, 40 কিলোমিটার গভীরতায় শিলার উত্তাপ বেশী হলেও সেখানে কোন গলিত শিলাস্তর নেই। হয়তো কোন কারণে শিলাগর্ভে ফাটলের সৃষ্টি হলে চাপের পরিমাণ হ্রাস পায় এবং তারই ফলে ভূগর্ভের শিলা গলিত হয়ে লাভার সৃষ্টি করে।

ভূত্বকের নীচে রয়েছে ম্যান্টল—এটি 2900 কিলোমিটার গভীরতা পর্যন্ত বিস্তৃত। বিখ্যাত ভূ-রসায়নবিদ্ গোল্ডস্মিথের মতে, ম্যান্টলের দুটি ভাগ। উপরে এক্লোগাইট স্তর, নীচে অক্সাইড-সালফাইড স্তর। এই স্তর দুটিতে অক্সিজেন, সিলিকন, ম্যাগ্‌নেশিয়াম, ক্যালসিয়াম ও লোহা ছাড়া নিকেলযুক্ত পদার্থের সমাবেশ দেখা যায়। এই স্তরটির আপেক্ষিক গুরুত্ব আনুমানিক 4 থেকে 5।

পেঁয়াজের ভিতরের কোয়ার মত পৃথিবীরও

রয়েছে অন্তস্তল। এটি ম্যান্টল বা ভূত্বকের চেয়ে অনেক বেশী ভারী পদার্থে গঠিত। বিজ্ঞানীদের ধারণা, এটি মূলতঃ লোহা, নিকেল ইত্যাদি ভারী পদার্থে তৈরি। কিন্তু বিজ্ঞানী র‍্যাজের মতে, ম্যান্টলের সঙ্গে অন্তস্তলের পদার্থের বেশী অমিল নেই। একথা আগেই বলা হয়েছে যে, গভীরতার সঙ্গে সঙ্গে যেমন একদিকে তাপমাত্রা বেড়ে যায়, অন্যদিকে তেমনি চাপের পরিমাণও বেড়ে যায়। ফলে অন্তস্তলের অবস্থা অনেকটা ত্রিশঙ্কুর মত। অকঠিন অথচ অতরল এমনি এক অদ্ভুত অবস্থায় রয়েছে অন্তস্তলের পদার্থ। সম্প্রতি বিখ্যাত বিজ্ঞানী বুলেন ভূকম্পন-তরঙ্গের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে নতুন এক তত্ত্ব উপহার দিয়েছেন। তাঁর মতে, পৃথিবীর অন্তস্তলে লোহা-নিকেলের দুটি স্তর। 2900 কিলোমিটার থেকে 5000 কিলোমিটার পর্যন্ত তরল স্তর এবং তার নীচে কঠিন স্তর।

বিংশ শতাব্দীর পারমাণবিক যুগে মানুষ পাড়ি দিচ্ছে গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে। চন্দ্রলোক আজ মানুষের পদানত। নিখিল বিশ্বচরাচরের বিচিত্র রহস্য উন্মিলিত হচ্ছে মানুষের অদম্য জ্ঞানস্পৃহায়। বিজ্ঞানের এই আশ্চর্য প্রগতির যুগে নিজেদের পৃথিবী সম্বন্ধে অজ্ঞতা সত্যই বিস্ময়কর। এই প্রসঙ্গে একটি আপ্তবাক্য মনে পড়ছে—Nearest to the Church, farthest from the God.

চুলকুনি প্রসঙ্গে

সুধাংশুবল্লভ মণ্ডল

"যে জানা অত্যন্ত প্রয়োজন, সে বিষয়ে সংশয়াচ্ছন্ন থাকা মানবমনের পক্ষে এক অতি হতবুদ্ধিকর পরিস্থিতি। এই অনিশ্চয়তাকে দীর্ঘ কাল সে সমর্থন করতে পারে না; যেমন করেই হোক—অভ্রান্ত সত্য নয়" জেনেও এই অজ্ঞতাকে সে জয় করবেই। কারণ জ্ঞানের অভাবকে 'কিছুই নয়'—এই ভ্রান্ত বিশ্বাসের প্রলেপ দিয়ে আবৃত রেখে আত্মতুষ্ট থাকা মানবমনের ধর্ম নয়।"

—জে. জে. রুসো

কোন বর্ণাঢ্য, শব্দব্যঞ্জনাময় সংজ্ঞায় অলঙ্কৃত না করলেও নিত্যনৈমিত্তিক জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকেই চর্মরোগের বিশেষ এই লক্ষণটিকে অতি সহজেই চিনতে আমাদের ভুল হয় না। সুস্থ স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে অনেক সময়েই ব্যাহত করে এই বস্তুটি এবং এমনি অস্বস্তিকর করুণ অভিজ্ঞতা যাদের আছে, সংসারে তাদের সংখ্যাও নিতান্ত নগণ্য নয়। তাই অন্ততঃ সাধারণভাবে এই চুলকুনিকে চিনতে সচরাচর কোন চিকিৎসকের প্রয়োজনও হয় না।

এটা আসলে কোন রোগ নয় বরং একে কোন কোন চর্মরোগের বা অবস্থার অনুষঙ্গ বলাই সঙ্গত হবে। অনেক কারণেই এর প্রকাশ হতে পারে। খোস, পাঁচড়া, দাদ, কাউর, হাজা, লাইকেন, প্র্যানাস প্রভৃতি চর্মরোগের ক্ষেত্রে চুলকুনির উপস্থিতি প্রায় অবধারিতভাবেই লক্ষণীয়। আবার শরীরের অভ্যন্তরস্থ কোন কোন রোগের বহিঃপ্রকাশের হেতু, যেমন—ন্যাবা, বহুমূত্র, হজ্‌কীন রোগ, দীর্ঘমেয়াদী নেফ্রাইটিস প্রভৃতি অথবা বিষাক্ত কোন প্রাকৃতিক বা রাসায়নিক পদার্থের সংস্পর্শ বা কোন কীট-পতঙ্গাদির দংশন প্রভৃতি বহুবিধ কারণেই এর উদ্ভব হতে পারে। আবার আপাত গ্রহণের অযোগ্য কারণবিহীন অজ্ঞাত উৎস নিদারুণ এক চুলকুনি মাঝে

মাঝে আমাদের অতিষ্ঠ করে তোলে—এমন কি, স্থানকাল নির্বিশেষে শালীনতা রক্ষার চেষ্টাকেও ব্যর্থ করে দেয়, আপাত বিচারে যার কোন কারণই খুঁজে পাওয়া যায় না। এই চুলকুনির বিষয়েই এখানে আমরা আলোচনা করবো।

বস্তুতঃ চর্মরোগের বহুবিধ লক্ষণাদির মধ্যে যেগুলি প্রকাশবৈচিত্র্যে স্বতন্ত্র, তাদের মধ্যে চুলকুনি অন্যতম। প্রকৃতপক্ষে এই চুলকুনি রোগী ও চিকিৎসক উভয়ের কাছেই সমান অস্বস্তিকর ও সমস্যার বিষয়। ফরাসীরা তাই খুব সঙ্গত কারণে ও সার্থকভাবেই একে চিকিৎসক ও রোগী উভয়েরই betenoire (বিশেষ অপছন্দের বস্তু) সংজ্ঞায় চিহ্নিত করে থাকেন। কোন চর্মরোগকে এককভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে যে চেষ্টার প্রয়োজন হয়, একমাত্র চুলকুনির ক্ষেত্রে অনুধাবনযোগ্য, কার্যকরী চিকিৎসার সূচনায় বিলম্ব হলে অবশ্যই চিকিৎসকের প্রতি আর্ত রোগীর নির্ভরতাবোধ ও আস্থার অভাব দেখা দেবে। ফলে চিকিৎসায় সুফল লাভের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র সুদূরপ্রসারী বিরূপ প্রতিক্রিয়াই দেখা দেবে না, উপরন্তু চর্মক্ষেত্রে রোগের প্রসারও হবে ব্যাপক। তাই যত সত্বর সম্ভব এই চুলকুনির প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণাধীন করা যায়, ততই উভয়ের পক্ষে মঙ্গলজনক।

কিন্তু এই যে সমস্যাসঙ্কুল ব্যাধি বা রোগানুষঙ্গ—এর কারণই বা কি আর উৎসই বা কোথায়? নিদানশাস্ত্রের দুর্গমতা আর শারীরবিদ্যার জটিলতাকে যথাসাধ্য দূরে রেখে এর প্রকৃত স্বরূপ উদ্ঘাটনের চেষ্টা করা যাক। চিকিৎসক সমাজে যদিও অদ্যাবধি এর প্রকৃত কারণ বহুবিতর্কিত ও সুস্পষ্ট বোধগম্যের অতীত, তথাপি হার্ডি, উল্ফ ও গুডেল (1952), রডবের্ট (1953), রথম্যান (1954), শেলী ও আর্থার (1957), লুইস ও কিলে (1957), উল্‌ষ্টেনহল্ম (1959) প্রমুখ চিকিৎসা-বিজ্ঞানীদের গবেষণাভিত্তিক জ্ঞানের উপর নির্ভর করে মোটামুটি সর্বসম্মতভাবে স্বীকৃত হয়েছে যে, সম্ভবতঃ যন্ত্রণাপ্রবাহী কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত উত্তেজনাই প্রকারান্তরে এই চুলকুনির সূচনা করে। এই প্রসঙ্গে দুটি প্রস্তাবিত সূত্র এর কারণরূপে বর্ণিত হয়েছে। প্রথমতঃ, চর্মস্থিত আহত এপিডারম্যাল কোষসমূহের দ্বারা নিঃসৃত হিষ্টামিন বা হিষ্টামিনসদৃশ কোন রাসায়নিক পদার্থই সম্ভবতঃ একাধিক অ্যালার্জিঘটিত চর্মরোগের ক্ষেত্রে বিশেষতঃ আমবাত শ্রেণীভুক্ত চর্মরোগে চুলকানি সৃষ্টিকারী প্রান্তিক জৈব রাসায়নিক বাহকের কাজ করে। কিন্তু অন্ততঃ কিছু কিছু চুলকুনির ক্ষেত্রে এই সূত্রের ব্যবহারিক প্রযুক্তির ব্যর্থতা সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় সূত্রটি সর্বজনগ্রাহ্যরূপে সমাদৃত হয় নি। দ্বিতীয়তঃ, বিবিধ ও ব্যাপক ক্ষতিকর উত্তেজনার ফলে এপিডারম্যাল কোষসমূহ আহত হলে প্রোটিনেজ নামে একটি রাসায়নিক পদার্থ নিঃসৃত হয়। প্রোটিন ধ্বংসী বা আমিষজাতীয় বস্তুকে ধ্বংস করাই এর ধর্ম। এই রাসায়নিক পদার্থই পরিশেষে প্রান্তিক স্নায়বিক কলাকৌশলকে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত করে চুলকুনি সৃষ্টির ভূমিকায় অংশ গ্রহণ করে। চুলকুনির সংবেদন উত্তেজক হিসাবে এই প্রোটিনেজের সামর্থ্যের তথ্য অবশ্য বহু পূর্ব থেকেই প্রমাণিত ও বিদিত। তাছাড়াও ফেল্ডবার্গ ও শেরুড (1954) বিড়ালের উপর সার্থক নিরীক্ষা করে প্রমাণ করেছেন যে, কোন কোন সময়ে খোদ মস্তিষ্ককেন্দ্র থেকেও চুলকুনির উৎপত্তি হওয়া সম্ভব। হজকীন রোগ, ন্যাবা, বহুমূত্র, দীর্ঘমেয়াদী নেফ্রাইটিস প্রভৃতি রোগের ক্ষেত্রে, যেখানে চর্মের কোন প্রাথমিক ব্যাধি ও আনুষঙ্গিক পরিবর্তন ছাড়াই ব্যাপক চুলকুনি থাকে, তা সম্ভবতঃ এই মস্তিষ্ককেন্দ্র থেকেই উৎসৃষ্ট হয়।

মস্তিষ্কস্থিত সংবেদন কেন্দ্রের উত্তেজনা যে কোন প্রকার প্রান্ত-প্রবৃত্ত চুলকুনির তীব্রতাকে বহুলাংশে প্রভাবান্বিত করে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ

করা যেতে পারে যে, চর্মপ্রান্তভাগ থেকে চুলকুনির সংবেদন-প্রবাহী সমস্ত স্নায়ুতন্তুর মূল ও চরম গন্তব্য স্থল হলো মস্তিষ্কস্থিত থ্যালামাসের নির্ধারিত অংশবিশেষ। এই সব বিশেষ স্নায়ুতন্তুসমূহ এজন্যে কশেরুকার (Spinal cord) মধ্যে অবস্থিত সুনির্দিষ্ট, নির্ধারিত স্পাইনো-থ্যালামিক সড়কের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে সংবেদন সঙ্কেতগুলিকে যথাস্থানে সরবরাহ করে। এই বিশেষ অংশ বা কেন্দ্র পরিশেষে সেই সঙ্কেতগুলিকে যথাযথ অনুভূতিতে রূপান্তরিত করে। এই রূপান্তরিত সঙ্কেতই চুলকুনিরূপে অনুভূত হয়।

আবার প্রতিটি দীর্ঘমেয়াদী চুলকুনির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত রয়েছে ভাবোদ্দীপক প্রতিক্রিয়ার এক মৌলিক উপাদান। কারণ এই দীর্ঘমেয়াদী চুলকুনিজাত কতকগুলি বিশেষ

1নং চিত্র
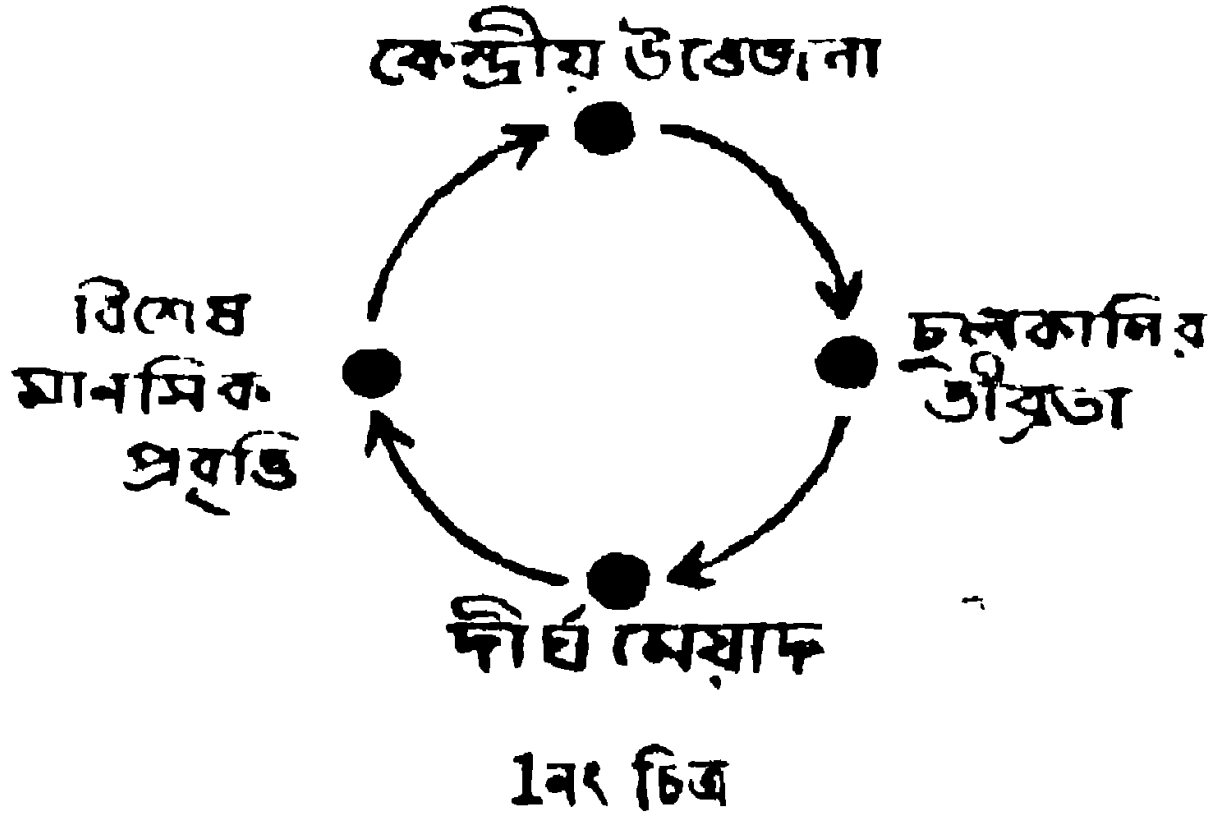
মানসিক প্রবৃত্তি, যেমন—অবসাদ, উদ্বেগ, উত্তেজনা ইত্যাদি মূলতঃ থ্যালামাসের বিশিষ্ট কেন্দ্রকে উত্তেজিত ও কার্যকর করে। কেন্দ্রীয় এই উত্তেজনাই আবার চুলকুনির সংবেদনের সহ্যশক্তির সীমারেখাকে নিম্নমুখী করে চুলকুনির বোধকে তীব্রতর করে। এমনিভাবেই সৃষ্টি হয় এক বিষাক্ত বৃত্তের; অর্থাৎ মানসিক প্রবৃত্তি থেকে কেন্দ্রীয় উত্তেজনা এবং তাথেকে চুলকুনির তীব্রতা। অর্থাৎ এই বৃত্তপথেই আবর্তিত হতে থাকে একই ঘটনাবলীর পুনরাবৃত্তি (1নং চিত্র দ্রষ্টব্য)।

2নং চিত্রে চর্মপ্রান্ত থেকে মস্তিষ্কেরঅগ্রগামী চুলকুনির সংবেদন-প্রবাহের সম্ভাব্য গতিপথকে চিত্রিত করা হয়েছে। চর্মপ্রান্তদেশের ক স্থানে সৃষ্ট সংবেদন-প্রবাহ স্নায়ুতন্তুর মাধ্যমে ক ক পথে কশেরুকার মধ্যে নির্দিষ্ট স্তরে বিপরীত প্রান্ত অতিক্রম করে খ স্থানে যায় এবং সেখান থেকে সোজা ঊর্ধ্বগামী হয়ে খ খ পথে স্পাইনো-থ্যালামিক সড়কে গ স্থানে থ্যালামাসে পৌঁছায় এবং পরিশেষে করটেক্সের নির্ধারিত ঘ স্থানে উপনীত হয়। এই ঘ স্থান থেকেই সংবেদন-প্রবাহ সঙ্কেতসমূহ রূপান্তরিত হয়ে চুলকুনিতে পরিণত হয়। কশেরুকাকে বিশেষ এক স্তরে আড়াআড়িভাবে খণ্ডিত করে তার অভ্যন্তরভাগ ঙ অংশে পৃথকভাবে দেখানো হয়েছে।

চিকিৎসালোচনা—বেতার যন্ত্র, দৈনিক সংবাদপত্র ও অন্যান্য পত্র-পত্রিকা প্রভৃতিতে নানা ধরণের বিভ্রান্তিকর বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে অথবা অযাচিত ও অবাঞ্ছিত উপদেশ প্রবণ আত্মীয়পরিজনের পরামর্শে প্ররোচিত হয়ে চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সূচনায় রোগীদের মধ্যে নিজে নিজেই চিকিৎসা করবার প্রবণতা বেশ প্রবলভাবেই দেখা যায়। বর্তমান শতাব্দীর অর্থনৈতিক অস্বচ্ছলতা অবশ্য এর জন্যে যথেষ্ট দায়ী। কিন্তু সে যাই হোক, এর পরিণামে রোগী ও রোগের যে করুণ ও শোচনীয় পরিণতি হয়, সে অবস্থার সঙ্গে চর্মবিশেষজ্ঞ চিকিৎসকমাত্রেরই সম্যক পরিচয় আছে। অনেক সময় আবার অনভিজ্ঞ ও হাতুড়ে চিকিৎসকের দ্বারাও এই একই পরিস্থিতির উদ্ভব হয়ে থাকে। এই প্রকার অবৈজ্ঞানিক চিকিৎসা ও সম্পূর্ণ অকার্যকর কিছু ওষুধের কার্যাকার্য নির্বিশেষে অবাধ ব্যবহার যে কত নিরর্থক ও নিরাময়ের পরিপন্থী, তা এই আলোচনা থেকে সহজেই অনুধাবন করা যাবে। যেহেতু এই ব্যাধি দীর্ঘমেয়াদী, সেহেতু এর নিরা-

ময়ের জন্তে সঠিক পদ্ধতিতে ত্বরিত এবং কার্যকর চিকিৎসার সূচনা যে অত্যাবশ্যক ও অপরিহার্য, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই।

সেবনযোগ্য যে সকল ওষুধ সাধারণতঃ ব্যবহার্য ও উপযোগী, তাদের মধ্যে সাইপ্রোহেপ্টাডিন হাইড্রোক্লোরাইড, ফেনিরামিন ও ক্লোরফেনিরামিন ম্যালিয়েট, প্রোমেথাজিন হাইড্রোক্লোরাইড, অ্যান্টাজোলিন হাইড্রোক্লোরাইড, ট্রাইপেলেন্নামিন হাইড্রোক্লোরাইড, ডাইমেথিনডিন ম্যালিয়েট ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সকল সেবনযোগ্য ওষুধাদি প্রয়োগের মাধ্যমে চুলকুনি প্রশমনের যে পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়, তার মূল উদ্দেশ্য সাধারণতঃ দুটি।

(1) চুলকুনি সৃষ্টিকারী প্রান্তিক কলাকৌশল অকার্যকর করে দেওয়া অথবা (2) চুলকুনির সংবেদন-সঙ্কেতগ্রাহক মস্তিষ্কস্থিত অনুভূতি-কেন্দ্রকে নিবৃত্ত করা।

অর্থাৎ 2 নং চিত্র লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, যথাক্রমে ক-স্থান অথবা ঘ-স্থানই এক্ষেত্রে আক্রমণের মূল লক্ষ্যস্থল। অতএব এই উদ্দেশ্য-প্রসূত ব্যাখ্যানুসারে মস্তিষ্ককেন্দ্রের উত্তেজনাবর্ধক ঔষধাদি (কেফিন বা অ্যামফেটামিন শ্রেণীভুক্ত) চুলকুনির বোধকে আরও বর্ধিত করে এবং উক্ত কেন্দ্রের নিবৃত্তিকারী ওষুধগুলি পক্ষান্তরে চুলকুনি প্রতিরোধে সহায়তা করে। সুতরাং কর্টেক্সের নিম্নস্থিত মস্তিষ্কাংশের উত্তেজনা

2নং চিত্র

লাঘবে উপযোগী ওষুধগুলিই এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কারণ চুলকুনির আবেগবাহী স্নায়ুতন্তুসমূহ এই অংশেই সংহত ও কেন্দ্রীভূত হয়ে পরে নির্দিষ্ট মস্তিষ্ককেন্দ্রে প্রবাহিত হয়। সে জন্যেই উপরিউক্ত ওষুধগুলি এককভাবে অথবা একাধিক সংমিশ্রণের সঙ্গে অন্যান্য কেন্দ্র নিবৃত্তিকারী ওষুধের একত্র ব্যবহার অপেক্ষাকৃত অধিক সুফল প্রদান করে। আলোচনাপ্রসূত দৃষ্টান্ত হিসাবে মরফিন বা ওপিয়েট শ্রেণীভুক্ত অন্যান্য ওষুধগুলির চুলকুনি প্রশমিত করা উচিত। কিন্তু কার্যতঃ কেন্দ্রকে নিবৃত্ত করা সত্ত্বেও চুলকুনি প্রশমিত না করে বরং ঠিক বিপরীত ঘটনা ঘটে। এই ঘটনা আপাত বিচারে অসঙ্গতিপূর্ণ মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে এর কারণ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এক্ষেত্রে উল্লেখিত ওষুধের দ্বারা কর্টেক্সের নিবৃত্তিই আসলে থ্যালামাসের কার্যকারিতা বর্ধিত করে এবং তার ফলে চুলকুনির সংবেদন বোধের সীমারেখা নিম্নগামী হওয়ায় চুলকুনি বর্ধিত আকারে অনুভূত হয়। সে জন্যেই এই বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। সুতরাং এই দৃষ্টান্ত থেকে এটাও স্পষ্ট হচ্ছে যে, চিকিৎসার বিষয়ে সুফল প্রত্যাশার ক্ষেত্রে এমনি ধরণের সূক্ষ্ম ব্যতিক্রমের কার্যকারণ সম্পর্কেও সবিশেষ জ্ঞান অত্যাবশ্যক। আলোচ্য পদ্ধতির ক্ষেত্রে প্রোমেথাজিন, ফেনীরামিন, ক্লোরফেনীরামিন প্রভৃতি ওষুধগুলির ব্যবহারে প্রত্যাশিত সুফল পাওয়া যায়।

আমবাতজাতীয় চর্মরোগের ক্ষেত্রে আহার্য চিকিৎসা-পদ্ধতিতে কোন ওষুধের চুলকুনি-প্রতিরোধ-ক্ষমতার মূল উৎস কিন্তু প্রধানতঃ প্রান্তদেশে নিঃসৃত হিষ্টামিন-প্রবাহ অবরোধের উপর প্রত্যক্ষভাবে নির্ভরশীল। এই হিষ্টামিন-বিরুদ্ধ ওষুধগুলি মুখ্যতঃ হায়ালইউরোনিডেজের কার্যকারিতাকে নিবৃত্ত করে। কাজেই সাইপ্রোহেপ্টাডিন, ডাইমেথিণ্ডিন, অ্যান্টাজোলিন প্রভৃতি হিষ্টামিন-বিরুদ্ধ ওষুধের ব্যবহারে সম্ভবতঃ হিষ্টামিন প্রতিরোধের চেয়ে বরং হায়ালইউরোনিডেজের সংহারকার্যই প্রবলতর হয়। ফলে কোন প্রদাহোত্তর চর্ম-প্রতিবেদন অতি সহজেই নিবৃত্ত হয়। সুতরাং চুলকুনি প্রশমনের ব্যাপারে উল্লেখিত হিষ্টামিন-বিরুদ্ধ ওষুধগুলির কার্যকারিতা খুব আশাপ্রদও নয় এবং এদের অবদানের মাননির্ধারণও অতঃপর বিচারসাপেক্ষ।

আবার কতকগুলি বিশেষ নির্বাচিত তীব্র চুলকুনিযুক্ত চর্মরোগের ক্ষেত্রে স্থানিক (Topical or local) ও প্রণালীবদ্ধ (Systemic) পদ্ধতিতে চিকিৎসা-জগতের আধুনিকতম হাতিয়ার কর্টিকোষ্টেরয়েডের ব্যবহারও আশাতিরিক্ত সুফলদায়ক। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে চুলকুনি প্রশমনের সার্থকতা মুখ্যতঃ প্রদাহ-অন্বিত চর্মের প্রতিবেদনের নিরাময়-পথে পরিবর্তনের উপর যথেষ্ট নির্ভরশীল। কাজেই এসব ক্ষেত্রে আলোচ্য পদ্ধতির দ্বারা ব্যবহৃত ষ্টেরয়েড যদি প্রদাহ-অন্বিত চর্মের প্রতিক্রিয়াকে লাঘব করতে সক্ষম না হয়, তাহলে চুলকুনির তীব্রতা হ্রাসের ক্ষেত্রেও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বা আশাপ্রদ পরিবর্তন সাধিত করতে পারে না।

অতএব এই আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট অনুধাবন করা যাবে যে, এই ব্যাধির সার্থক চিকিৎসার জন্যে প্রয়োজন—সঠিক রোগনির্ণয়, তার প্রকৃতিগত কারণ সম্পর্কিত যথাযথ জ্ঞান ও পরিশেষে যথোপযুক্ত ঔষধাদি প্রয়োগের যৌক্তিকতা এবং তাদের প্রয়োগের পর দেহাভ্যন্তরে ঘটিত ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে সবিশেষ জ্ঞান। কাজেই বিভ্রান্তিকর প্রচারের দ্বারা প্রতারিত হয়ে বা স্ব-প্রণোদিত হয়ে ব্যবহারের অযোগ্য, কখনও বা রীতিমত ক্ষতিকর আবার কখনও বা সুদূরপ্রসারী মারাত্মক প্রতিক্রিয়াশীল কতকগুলি মেকী ওষুধের অবাধ ব্যবহারে শুধুমাত্র আর্থিক অপচয়ই হয় না, উপরন্তু ভবিষ্যতে চিকিৎসার সহজসাধ্য পথও

দুর্গম হয়ে ওঠে। এই বিষয়ে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা যে অত্যাবশ্যক, তা বলাই বাহুল্য। বরং এসব ক্ষেত্রে চর্মরোগের বিষয়ে উপযুক্ত শিক্ষা-প্রাপ্ত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ ও সাহায্য গ্রহণ করা রোগ ও রোগী উভয়ের পক্ষেই বাঞ্ছনীয়।

গোখাদ্যের চাট্‌নি বা সাইলেজ

শ্রীমৃণালকান্তি ভৌমিক*

গবাদি পশুর উন্নয়নের কথা ভাবলে গোখাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির কথা ভাবতে হয়। মানুষের মতই গবাদি পশুর পুষ্টিকর খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা শুধু দুধ বা মাংস বৃদ্ধির জন্যে নয়, উন্নত ধরণের পশুপালন করতে গেলে এর প্রয়োজন আছে। ভারতবর্ষের সব দেশে সব ঋতুতে কাঁচা ঘাসের অভাব। কিন্তু এই অভাব বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করে যতদূর সম্ভব মেটানো যায়। গোখাদ্যের উপযুক্ত সংরক্ষিত কাঁচা ঘাসকে সাইলেজ (Silage) বলে। যে আধারে সাইলেজ তৈরি করা হয় তাকে বলা হয় সাইলো (Silo)। আমাদের দেশে সারা বছর প্রয়োজনমত গো-খাদ্য উৎপাদন করা সম্ভব হয় না; ফলে পশু-পালন খুবই কঠিন হয়ে পড়ে। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বিভিন্ন রকমের কাঁচা ঘাস উৎপাদন করে সংরক্ষণ করলে পুষ্টিকর সবুজ ঘাসের চাহিদা মেটানো সম্ভব। এই উপায়ে সংরক্ষিত কাঁচা সবুজ ঘাসে গোখাদ্যের খাদ্যগুণাবলী বজায় থাকে।

প্রচুর পরিমাণে ফলনশীল এবং শর্করাযুক্ত ঘাসেই সাইলেজ ভাল হয়। বাংলা দেশে প্রধানতঃ নেপিয়ার, জই (Oat), জোয়ার, ভুট্টা এবং শুঁটি জাতীয় ঘাস সাইলেজ তৈরির পক্ষে উপযোগী। শুঁটিজাতীয় ঘাসে প্রোটিনের ভাগ বেশী থাকায় একে জই, জোয়ার, ভুট্টা ইত্যাদির সঙ্গে মিশিয়ে সাইলেজ তৈরি করা উচিত। সাইলেজ তৈরির জন্যে ঘাসে উপযুক্ত রস থাকা দরকার। শুকনো ঘাসে খাদ্যের গুণাবলী পুরাপুরি না থাকায় তা সাইলেজ তৈরির পক্ষে অনুপযোগী। নিম্নে বিভিন্ন প্রকার ঘাস কতদিন পর কাটলে সাইলেজের উপযোগী হয়, তা বলা হলো।

ঘাসের নাম	কাটবার দিন	সাধারণ লক্ষণ
নেপিয়ার	60-65 ,,	ডাঁটাগুলি রসাল অবস্থায়
জই	65-75 "	দানায় দুধ প্রস্তুতির অবস্থায়
ভুট্টা	65-70 "	"
জোয়ার	80-90 "	ফুল আসবার সময়

সাইলো প্রস্তুত-প্রণালী—যেখানে জল জমবার সম্ভাবনা নেই এমন উঁচু জায়গায় 6-9 ফুট গর্ত করতে হবে। ইটের গাঁথুনী দিয়ে গর্ত পাকা করা দরকার। এর উদ্দেশ্য, গর্তের ভিতরে যাতে বাইরের জল ঢুকতে না পারে। এই গাঁথুনী মাটি থেকে অন্ততঃ $1\frac{1}{2}$-2 ফুট উঁচু করা দরকার। প্রস্থ, উচ্চতার সমান এবং দৈর্ঘ্য প্রস্থের প্রায় তিন গুণ হওয়া দরকার। এই ধরণের সাইলোকে পিট সাইলো বলে। এছাড়া অন্যান্য বিভিন্ন ধরণের সাইলোতে সাইলেজ তৈরি করা সম্ভব; যেমন—(1) খাকার সাইলো—এতে মাটির

*বেঙ্গল ভেটেরিনারী কলেজ, কলিকাতা-37

উপরে 6/7 ফুট পাকা গাঁথুনী করতে হয়, (2) ট্রেঞ্চ সাইলো—এতে মাটির নীচে লম্বা ধরণের গর্ত করতে হয়, (3) বুরুজ সাইলো (Tower silo) এগুলি কাঠ বা ইটের তৈরি।

ঘাসের সংরক্ষণ পদ্ধতি—ঘাসের ডাঁটাগুলি রসালো অবস্থায় কেটে 1-1½" ইঞ্চি আকারে নিতে হবে। এরপর ছোট ছোট আঁটি খুলে গর্তের মধ্যে এমনভাবে বিছিয়ে দিতে হবে, যাতে গোড়ার দিকটা উপরের দিকে থাকে। ঘাস ছোট না করেও সাইলেজ তৈরি করা যায়। কিন্তু তাতে সংরক্ষণ ভাল হয় না বলে সাইলেজের খাদ্যগুণাবলী নষ্ট হয়। ছোট করে ঘাস কাটলে বাতাসমুক্ত অবস্থায় খুব চাপে ঘাস রাখা যায়। এছাড়া এতে গবাদি পশুকে পরে আর কেটে খাওয়াতে হয় না এবং নষ্ট হবার সম্ভাবনাও কম থাকে। গর্ত ভর্তির পর ধারের দিকে ভালভাবে পা দিয়ে মাড়িয়ে দিতে হয়, এতে যতটা সম্ভব বাতাস বেরিয়ে যায়। কারণ ঘাসের ভিতর বেশী বাতাস থাকলে বিভিন্ন প্রকার ছত্রাকের আক্রমণে ঘাস নষ্ট হয়ে যায়। ঘাস স্তরে স্তরে বিছিয়ে গর্ত ভর্তি করবার পর কমপক্ষে 2-2½ ফুট উঁচু করে ঠেসে দিতে হয়। এরপর শুক্‌নো খড় 4 ইঞ্চি উঁচু করে বিছিয়ে দিয়ে এক ফুট কাঁদামাটি লেপে দিতে হয়। গর্তটি 4/5 দিনের মধ্যেই সবুজ ঘাসে ভর্তি করা উচিত। কয়েক দিন পরে চাপে ঘাস বসে গেলে মাটির ফাটল দেখা যায়। এই ফাটলগুলি কাদামাটি দিয়ে বন্ধ করে দিতে হয়, যাতে হাওয়া বা জল ঢুকতে না পারে। গর্তের উপর ছাউনি দেওয়া ভাল; কারণ তাহলে বৃষ্টির জলে সাইলেজ নষ্ট হতে পারে না। উৎকৃষ্ট ধরণের সাইলেজ দেখতে উজ্জ্বল সোনালী রঙের, নিকৃষ্ট ধরণের সাইলেজ গাঢ় খয়েরী রঙের ও ছাতাধরা। এই ধরণের সাইলেজ থেকে এক প্রকার দুর্গন্ধ নির্গত হয়। 70-80 দিনে ঘাস সাইলেজে পরিণত হয়। প্রয়োজন অনুসারে সাইলেজ গর্ত থেকে বের করে শুক্‌নো খড়কুটা দিয়ে ভাল করে ঢেকে দিতে হয়।

গর্ত ভর্তির পর জীবন্ত ঘাসের কোষগুলি এক সময়ে শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে আরম্ভ করে এবং খুব তাড়াতাড়ি অক্সিজেন নেয় ও কার্বন ডাইয়োক্সাইড পরিত্যাগ করে। পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে স্বাভাবিকভাবে সমস্ত অক্সিজেন বহির্ভূত হয় এবং এতে কোন ছত্রাক বৃদ্ধি পায় না। কারণ অক্সিজেন ছাড়া ছত্রাক বাড়তে পারে না। এই সময়ে অম্ল প্রস্তুতকারী ব্যাক্টিরিয়াগুলি (Acid forming bacteria) খুব অস্বাভাবিকভাবে সাইলেজে বৃদ্ধি পেতে থাকে। দু-দিন পরে প্রতি গ্র্যাম সাইলেজের রসে কয়েক বিলিয়ন ব্যাক্টিরিয়া জন্মায়। এই ব্যাক্টিরিয়াগুলি সাইলেজের শর্করাকে ভেঙ্গে প্রধানত: ল্যাকটিক অ্যাসিড, অ্যাসিটিক অ্যাসিড ও অ্যালকোহল তৈরি করে। এই অ্যাসিডগুলি খুবই প্রয়োজনীয়, যা অন্য কোন অবাঞ্ছনীয় ব্যাক্টিরিয়ার বৃদ্ধি ব্যাহত করে এবং এতে সাইলেজ পচা ও দুর্গন্ধমুক্ত হয়। যখন অতিরিক্ত অ্যাসিড তৈরি হয়, তখন fermentation বন্ধ হয় এবং পরে এসব প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়। বাতাস না ঢুকলেই সাইলেজের খাদ্যগুণাবলী অনেকদিন পর্যন্ত বর্তমান থাকে। যদি ঘাসে জলের পরিমাণ বেশী থাকে, তাহলে fermentation ঠিক মত হয় না। এতে ল্যাকটিক বা অ্যাসিটিক অ্যাসিডের পরিবর্তে বিউটারিক অ্যাসিড উৎপন্ন হয়, যা সাইলেজের খাদ্যগুণাবলী নষ্ট করে। এই সময়ে সাইলোতে 100° ফা. তাপ বর্তমান থাকে। ঘাসের প্রোটিনের ভাগ সাইলেজ তৈরির পদ্ধতিতে কিছু পরিমাণে নষ্ট হয়, অবশ্য অন্যান্য খাদ্যগুণাবলী ঠিকই থাকে।

সাইলেজের শ্রেণীবিভাগ—(1) সুমিষ্ট গাঢ় বেগুনী সাইলেজ দেখতে উজ্জ্বল গাঢ় বেগুনী রঙের

এবং সুমধুর গন্ধযুক্ত। ভুট্টার ঘাসকে 113° ফা. তাপে টাওয়ার সাইলোতে দিয়ে এই ধরণের সাইলেজ তৈরি করা হয়।

(2) অ্যাসিড হাল্কা বেগুনী সাইলেজ—প্রধানতঃ জই ঘাসকে পিট সাইলোতে দিয়ে তৈরি করা হয়। এই ধরণের সাইলেজ 80°-104° ফা. তাপে তৈরি হয়। অ্যাসিটিক অ্যাসিড বর্তমান থাকে বলে এতে সুমিষ্ট গন্ধ পাওয়া যায়।

(3) সবুজ শস্যের সাইলেজ—এই ধরণের সাইলেজ জই বা ভুট্টার ঘাস থেকে তৈরির উপযোগী। দানায় দুধ আসবার অবস্থায় ঘাস কেটে সাইলোতে সংরক্ষণ করা হয়। সবুজ রঙের এই সাইলেজের গন্ধ খুবই আকর্ষণীয়। এই ধরণের সাইলেজে অম্ল স্বাদ বর্তমান থাকে না। এই সাইলেজ সহজপাচ্য।

(4) টক সাইলেজ—দেখতে উজ্জ্বল বেগুনী রঙের। ঘাসের ডাঁটা রসালো অবস্থায় কেটে সংরক্ষণ করা হয়। বিউটারিক অ্যাসিড বর্তমান থাকে বলে এই সাইলেজ ঝাঁঝালো গন্ধযুক্ত।

(5) ছাতাধরা সাইলেজ—সাইলোতে বাতাস ঢুকলে সাইলেজ গেঁজে উঠতে পারে না। ফলে ছত্রাক জন্মে সাইলেজ নষ্ট হয়। সাইলোর উপরে বা কিনারায় এই ধরণের সাইলেজ উৎপন্ন হয়। এতে অ্যামোনিয়ার গন্ধ বর্তমান। এই ধরণের সাইলেজ গাভীকে খাওয়ালে উদরাময় হয়।

(6) এ. আই. ভি. সাইলেজ—প্রধানতঃ ফিনল্যাণ্ডে তৈরি করা হয়। সাইলোতে ঘাস সংরক্ষণ করবার সময় মৃদু সালফিউরিক বা হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড মিশিয়ে দিতে হয়। ফলে যে কোন প্রকার ব্যাক্টিরিয়া বা ছত্রাক বৃদ্ধি পেতে পারে না।

সাইলেজ অতি উপাদেয় খাদ্য। এর খাদ্যগুণ নির্ভর করে ঘাসের সংরক্ষণ পদ্ধতি এবং বিভিন্ন রকম ঘাসের গুণাবলীর উপর। উৎকৃষ্ট ধরণের সাইলেজে প্রচুর পরিমাণ ভিটামিন-এ ও ডি থাকে। সাইলেজ মৃদু বিরেচক। গবাদি পশু শীতকালে যখন Non-legume খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করে তখন এদের কোষ্ঠবদ্ধতা দেখা দেয়। এই সময়ে সাইলেজ বেশ উপকারী বিরেচক। সাইলেজের জৈব অম্ল (Organic acid) গবাদি পশুর ক্ষতি করে না। কারণ ঐ অম্ল পদার্থ পরিপাকের সময় পাকস্থলীতে তৈরি হয়। এরা শর্করার মতই এই জৈব অম্লকে খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করে। সাইলেজ ব্যবহারে দুধের উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব। তাছাড়া মাংসের উৎপাদন বৃদ্ধি কারক বলে বলদের খাদ্য হিসাবে সাইলেজ ব্যবহার করা হয়। পুষ্টিকর খাদ্য হিসাবে সাইলেজ সর্বদা বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে প্রস্তুত করা উচিত, নতুবা বদহজমের একটি বিশেষ কারণ হয়ে উঠতে পারে। দলানো পাকা ও ছাতাধরা সাইলেজ গবাদি পশুকে খেতে দেওয়া অনুচিত। নিম্নোক্ত পরিমাণে সাইলেজ বিভিন্ন গবাদি পশুর খাদ্যতালিকায় যোগ করা উচিত—

দুগ্ধবতী গাভী	দৈনিক	25-35	পাউণ্ড
হিপার (Heifer)	"	15-20	"
বলদ	"	30-50	"
ছাগল	"	2	"

সাইলেজের বৈশিষ্ট্য—1. অতি কম খরচে বছরের যে কোন ঋতুতে বিশেষতঃ শীত বা গ্রীষ্মে এটি একটি উচ্চ ধরণের রসালো খাদ্য। 2. আগাছা সমন্বিত শস্য, যাতে অতি নীচু মানের খড় তৈরি হয়, তাতেও সাইলেজ তৈরি করা সম্ভব। 3. বিভিন্ন আবহাওয়ায় যখন খড় প্রস্তুত করা অসম্ভব, তখন অতি সহজেই সাইলেজ তৈরি করা সম্ভব। 4. নির্দিষ্ট এলাকার শস্য অতি অল্প জায়গায় সাইলেজ হিসাবে সংরক্ষণ করা সম্ভব।

রিয়্যাক্টর

মনোরঞ্জন বিশ্বাস*

পারমাণবিক রিয়্যাক্টরের প্রসঙ্গে কিছুদিন আগে প্রচারিত একটি ছোট সংবাদে বলা হয়েছিল যে, তারাপুরের রিয়্যাক্টরটি Critical অবস্থায় এসে পৌঁচেছে এবং পুরাপুরি বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদনে আরও কিছু দিন সময় নেবে। সংবাদটি সাধারণ মানুষকে খুব একটা উৎসাহ যোগাতে পেরেছিল কিনা জানি না, তবে বিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদ্যাবিদ্, গবেষক এবং আরও অনেকের মনে যথেষ্ট আশার সঞ্চার করেছিল। সাধারণ লোক—এমন কি, সাধারণ বিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রীরাও জানতে চাইবেন—রিয়্যাক্টর যন্ত্র কি এবং Critical অবস্থায় কি তার পরিণতি ?

রিয়্যাক্টর শব্দটির সঙ্গে বিজ্ঞানীরা সবাই পরিচিত। বিশেষ ব্যবস্থায় কোন কক্ষে যদি বিক্রিয়া ঘটানো হয়ে থাকে, তবে সেই বিশেষ ব্যবস্থাসহ কক্ষটিকে রিয়্যাক্টর বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। যদি কোন রাসায়নিক বিক্রিয়া ঐ কক্ষে ঘটানো হয়, তবে সেটাকে রাসায়নিক রিয়্যাক্টর বলা হয়। আর যদি এমন কোন ব্যবস্থা করা হয়, যাতে পরমাণুকে ভেঙে চূর্ণ-বিচূর্ণ করা যায় এবং ভাঙনের ফলে উদ্ভূত তাপকে অন্ত কোন ভাবে রূপান্তরিত করে কাজে লাগানো সম্ভব হয়, তবে ঐ সম্পূর্ণ ব্যবস্থাকে পারমাণবিক রিয়্যাক্টর বা শুধু রিয়্যাক্টর বলা হয়। সাধারণ রাসায়নিক বিক্রিয়ার তুলনায় পরমাণু বিচূর্ণ করবার ব্যাপারটা খুবই জটিল এবং এতে কারিগরি বাধাবিপত্তিও অনেক বেশী। কাজেই পারমাণবিক রিয়্যাক্টর তৈরি করতে যেমন অভিজ্ঞ পদার্থ-বিজ্ঞানীর প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন অভিজ্ঞ ইঞ্জিনীয়ারেরও। এসব বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও আমাদের দেশে কিছুকাল আগে গবেষণার জন্যে তৈরি হয়েছে অপ্সরা নামক রিয়্যাক্টর। এটি ভাবা-পারমাণবিক গবেষণা কেন্দ্রে (BARC) অবস্থিত। আর সেদিন তৈরি হলো ব্যবসায়িক ভিত্তিতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্যে ভারতের প্রথম পারমাণবিক রিয়্যাক্টর। এর বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষমতা প্রায় 380 মেগাওয়াট। এর পরে রাণা প্রতাপ সাগর (রাজস্থান) ও কলপক্কমে (মাদ্রাজ) দ্বিতীয় ও তৃতীয় রিয়্যাক্টর তৈরির কাজ আরম্ভ হয়ে গেছে। কাজে কাজেই ভারত যে পারমাণবিক শক্তিতে বেশ এগিয়ে গেছে, এতে কোন সন্দেহ নেই।

এ তো গেল ভারতের রিয়্যাক্টরের কথা। এখন স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে যে, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পরমাণু থেকে কিভাবে এত প্রচণ্ড শক্তি উৎপন্ন হচ্ছে? খুব সহজ একটা হিসাবের সাহায্যে এই প্রচণ্ড শক্তি সম্বন্ধে মোটামুটি একটি ধারণা করা যেতে পারে। পরমাণু-কেন্দ্রীনের বিভাজন (Fission) সম্বন্ধে দু-একটা কথা বললেই এই সম্বন্ধে আমাদের ধারণা অনেক স্পষ্ট হয়ে যাবে। একটি ইউরেনিয়ামের (U-235) কেন্দ্রীনকে ধীরগতি নিউট্রনের দ্বারা আঘাত করলে U-235-এর কেন্দ্রীন দু-ভাগে (Ba^{141} এবং Kr^{92}) ভেঙে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে আসে তিনটি নিউট্রন। এই ভাঙনের ফলে যে শক্তি পাওয়া যায় (আইনষ্টাইনের ভর-শক্তি সূত্র থেকে যা গণিতের ভাষায় দাঁড়ায় $\Delta E = \Delta mc^2$), তার পরিমাণ প্রায় 200 মিলিয়ন ইলেকট্রন ভোল্ট অর্থাৎ $200 \times 1.6 \times$

*পদার্থ-বিজ্ঞান বিভাগ, নিউ আলিপুর কলেজ, কলিকাতা—53

10^{-6} বা $3{\cdot}2\times10^{-4}$ আর্গ। যদি এই শক্তিকে অ্যাভোগ্যাড্রোর সংখ্যা N-এর (Avogadro number) দ্বারা গুণ করা যায়, তবে এক গ্র্যাম পরমাণু থেকে প্রাপ্ত শক্তির পরিমাণ দাঁড়াবে প্রায় $1{\cdot}93\times10^{20}$ আর্গ। যদি এক কিলোগ্র্যাম বিশুদ্ধ U-235 নেওয়া যায়, তবে তাথেকে প্রাপ্ত শক্তির পরিমাণ দাঁড়াবে আরও অনেক বেশী প্রায় $8{\cdot}21\times10^{20}$ আর্গ অথবা প্রায় 2×10^{10} কিলোক্যালরী। এই তাপ, 20,000 টন টি. এন. টি. বিস্ফোরণের ফলে যে তাপের সৃষ্টি হয়, প্রায় তার সমান। শুধু তাই নয়, হিসাব করে দেখা গেছে যে, রিয়্যাক্টরের মধ্যে এক কিলোগ্র্যাম U-235-এর বিভাজন ঘটিয়ে যে বিদ্যুৎ-শক্তি পাওয়া যায়, তার পরিমাণ প্রায় 2500 টন কয়লা পোড়াবার ফলে উৎপন্ন বিদ্যুৎ-শক্তির সমতুল্য। যে চেম্বারের মধ্যে এত তাপ উৎপন্ন হচ্ছে, তার জন্যে কত সতর্কতা অবলম্বন প্রয়োজন, তা বোধ হয় কাউকে আর বেশী বোঝাবার প্রয়োজন নেই। এসব হলো তাপের কথা। যে U-235-কে ভেঙে এরূপ প্রচণ্ড তাপ পাওয়া যায়, সেটি আসলে কিন্তু সাধারণ পদার্থ নয়, সেটি তেজষ্ক্রিয় পদার্থ এবং তার নিজস্ব এমন কতকগুলি রশ্মি আছে, যা মানুষকে রোগগ্রস্ত বা পঙ্গু করে দেয়। এসব বিপদের কথা জেনে নিয়ে কাজ করা যে কত কঠিন, তা সহজেই অনুমান করা যায়।

রিয়্যাক্টরের Critical অবস্থার ব্যাপারটা বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। তাই বোধ হয় এই সংবাদটিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েই প্রচার করা হয়েছিল। একটি U-235 কেন্দ্রীনের বিভাজনের ফলে মুক্ত নিউট্রনের সাহায্যে যদি আর একটি পরমাণু-কেন্দ্রীনের বিভাজন ঘটানো সম্ভব হয়, তা হলে আমরা বলি রিয়্যাক্টরের মধ্যে এক স্বনির্ভরশীল শৃঙ্খল-প্রক্রিয়া (Self-sustaining chain reaction) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং রিয়্যাক্টরটিও Critical পর্যায়ে এসে পৌঁচেছে। আগেই বলা হয়েছে যে, কোন বিভাজনক্ষম পদার্থের (যেমন U-235) কেন্দ্রীনকে যদি নিউট্রনের সাহায্যে আঘাত করা হয়, তবে ঐ পদার্থের কেন্দ্রীন দু-ভাগে ভেঙে যায় এবং কিছু নতুন নিউট্রনেরও সৃষ্টি হয়। এই নতুন নিউট্রনই শৃঙ্খল-প্রক্রিয়া চালু রাখে এবং ধাপে ধাপে এই প্রক্রিয়াকে দীর্ঘস্থায়ী করে।

প্রাকৃতিক ইউরেনিয়ামে শতকরা প্রায় 99·3 ভাগ থাকে U^{238} আইসোটোপ, বাকী 0·7 ভাগ অন্য আইসোটোপ U^{235}। U^{238} আইসোটোপের কেন্দ্রীনকে নিউট্রনের দ্বারা আঘাত করে U^{235}-এর মত দু-ভাগ করা সহজ নয়। তাই যে সব নিউট্রন U^{238}-কে আঘাত করে, সেগুলিকে U^{238} শুষে নেয় এবং এরই ফলে U^{238}-এর কেন্দ্রীন পরিবর্তিত হয়ে নতুন কেন্দ্রীনের (Pu^{239}) সৃষ্টি হয়। এভাবে বা অন্য কোন ভাবে রিয়্যাক্টরের মধ্যে নিউট্রন নষ্ট হতে থাকলে বিক্রিয়া থেমে যেতে পারে। অপর পক্ষে, যদি সব নিউট্রন (একটা U^{235} কেন্দ্রীন ভাঙলে গড়ে 2·5টি নিউট্রন পাওয়া যায়) বিক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করে, তবে শৃঙ্খল-প্রক্রিয়ার হার ক্রমাগত এমন একটা পর্যায়ে এসে দাঁড়ায় যে, যখন তখন একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটাও অসম্ভব নয়। বিক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাওয়া বা বিক্রিয়ার ফলে বিস্ফোরণ ঘটা—কোনটাই প্রকৃতপক্ষে প্রত্যাশিত নয়। এসব অসুবিধা দূর করে এমন একটা অবস্থায় বিক্রিয়া চালানো প্রয়োজন, যখন একটা কেন্দ্রীন ভেঙে গিয়ে কেবলমাত্র অন্য একটাকেই ভাঙতে সাহায্য করে এবং রিয়্যাক্টরে এই বিশেষ অবস্থার নাম দেওয়া হয়েছে Critical অবস্থা। রিয়্যাক্টরের মধ্যে যখন একটি U^{235}-এর কেন্দ্রীন ভেঙে গড়ে একের চেয়ে কম নতুন কেন্দ্রীনকে ভাঙতে সাহায্য করে, তখনকার অবস্থাকে Sub-critical এবং যখন একাধিক নতুন কেন্দ্রীনকে ভাঙতে সাহায্য করে, তখন তাকে Supercritical অবস্থা বলা হয়। পারমাণবিক রিয়্যাক্টরে Sub-critical ও Super-

critical অবস্থা এড়াবার যথাযথ ব্যবস্থা সর্বদাই রাখা হয়, তা না হলে রিয়্যাক্টর চালু হবার পর নানা রকম বিপদের আশঙ্কা থাকে।

পারমাণবিক রিয়্যাক্টরের বিশেষ বিশেষ অংশ ও বৈশিষ্ট্যগুলি শৃঙ্খল-প্রক্রিয়ায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণভাবে প্রথমত: নিউট্রনের শক্তির কথাই ধরা যাক। উচ্চশক্তি থেকে সুরু করে নিম্নশক্তির থার্ম্যাল নিউট্রন এতে অংশ গ্রহণ করে বিভাজনে সহায়তা করে। দ্বিতীয়তঃ জ্বালানী। জ্বালানীর মধ্যে সাধারণতঃ রিয়্যাক্টরে যেটা ব্যবহার করা হয়, তা হলো সাধারণ ইউরেনিয়াম, যার মধ্যে U^{235} আইসোটোপটি শতকরা 0·72 ভাগ বর্তমান থাকে। এছাড়া যেগুলি U^{235} আইসোটোপে সমৃদ্ধ, সেই সব অংশও জ্বালানীর পক্ষে বিশেষভাবে উপযোগী। প্লুটোনিয়াম (Pu^{239}) এবং ইউরেনিয়ামের অপর একটি আইসোটোপ U^{233}-কেও জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। পারমাণবিক রিয়্যাক্টরে এছাড়া রাখা হয় বিশেষ বিশেষ পদার্থের মডারেটর, যেগুলির প্রধান কাজ হলো নিউট্রনের গতি নিয়ন্ত্রণ করা। গ্র্যাফাইট, সাধারণ জল, ভারী জল (D_2O) অথবা বেরিলিয়ামই এই সব মডারেটরের কাজ করে থাকে। রিয়্যাক্টরের চালু অবস্থায় প্রচণ্ড তাপের সৃষ্টি হয়—তাই একে ঠাণ্ডা রাখবার জন্যে বায়ু, CO_2 (কার্বন ডায়োক্সাইড), He (হিলিয়াম) অথবা সাধারণ জল ব্যবহার করা হয়ে থাকে। কোন রিয়্যাক্টর সমসত্ত্ব (Homogeneous), না অসমসত্ত্ব (Heterogeneous), তা সম্পূর্ণ নির্ভর করবে তার মধ্যে অবস্থিত জ্বালানী ও মডারেটরের উপর। সাধারণতঃ D_2O (ভারী জল) যদি মডারেটর হিসাবে কাজ করে, তবে রিয়্যাক্টরটি সমসত্ত্বই হয় এবং জ্বালানীকে এক্ষেত্রে দ্রবণ হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। তাছাড়া গ্র্যাফাইটকে যখন মডারেটর হিসাবে ব্যবহার করা হয়, তখন জ্বালানীকে কঠিন অবস্থায় রাখা হয় এবং এই ধরণের ব্যবস্থা যে সব রিয়্যাক্টরে বর্তমান থাকে, সেগুলিকে অসমসত্ত্ব রিয়্যাক্টর বলা হয়।

পৃথিবীতে U^{235}-এর পরিমাণ যাই থাকুক না কেন, আমাদের দেশে এর বেশ অভাব আছে। সে যাহোক বর্তমানে যে ভাবে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে পারমাণবিক শক্তির ব্যবহার বেড়ে যাচ্ছে, জনৈক সোভিয়েট বিশেষজ্ঞের মতে—এভাবে চলতে থাকলে আগামী পঞ্চাশ বছরের মধ্যে বিশ্বের বার্ষিক ইউরেনিয়ামের খরচ দাঁড়াবে প্রায় কুড়ি থেকে চল্লিশ মিলিয়ন টন। ইউরেনিয়ামের এই বিপুল পরিমাণের কথা ভেবেই বিজ্ঞানীরা নতুন নতুন জ্বালানীর বিষয় চিন্তা করছেন। এরই মধ্যে দুটি জ্বালানীর নাম (Pu^{239} এবং U^{233}) আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। U^{238}-কে নিউট্রনের সাহায্যে আঘাত করে বিভাজন ঘটানো সম্ভব নয়। শুধু তাই নয়, যে নিউট্রনের দ্বারা U^{238}-এর কেন্দ্রীনকে আঘাত করা হয়, U^{238} সেটিকে শুষে নিয়ে নিম্নলিখিত নিউক্লিয়ার রিয়্যাকশনের মধ্য দিয়ে একটা প্লুটোনিয়াম কেন্দ্রীনে রূপান্তরিত হয়—

$${}_{92}U^{238} + {}_{0}n^{1} \longrightarrow {}_{92}U^{239} + h\nu;$$

$${}_{92}U^{239} \longrightarrow {}_{93}Np^{239} + e^{-}$$

(T=23 মিনিট)

$${}_{93}Np^{239} \longrightarrow {}_{94}Pu^{239} + e^{-}$$

(T=2·3 দিন)

$${}_{94}Pu^{239} \longrightarrow {}_{92}U^{235} + {}_{2}He^{8}$$
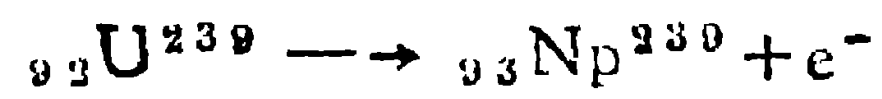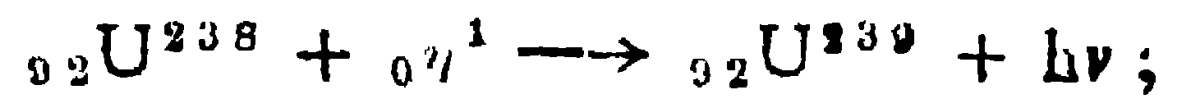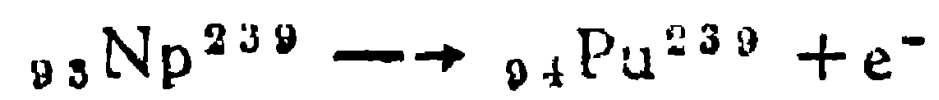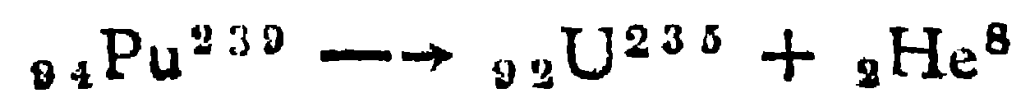
(T=25000 বছর)

1940 সালে McMillan এবং Abelson একটি নতুন মৌলিক পদার্থের সন্ধান পেলেন। যার পারমাণবিক সংখ্যা (Atomic number=Z) 93। এই নতুন মৌলিক পদার্থের নাম হলো নেপচুনিয়াম (Np)। U^{238}-কে নিউট্রনের দ্বারা আঘাত করে তাঁরা প্রথমে পেলেন ${}_{92}U^{239}$, যেটি পরবর্তী ধাপে বিটা রশ্মি ত্যাগ করে ${}_{93}Np^{239}$-এ

রূপান্তরিত হয়েছিল। এই রূপান্তরের জন্যে সময় লাগে প্রায় 23 মিনিট। তাঁরা আরও লক্ষ্য করেছিলেন যে, এই $_{93}Np^{239}$ পরবর্তী ধাপে পুনরায় বিটা রশ্মি ত্যাগ করে $_{94}Pu^{294}$-এ পরিবর্তিত হয় এবং এর জন্যে সময় নেয় পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশী—প্রায় 2·3 দিন। এই $_{94}Pu^{239}$ যদিও একটি আলফা কণিকা ত্যাগ করে $_{92}U^{235}$-এ রূপান্তরিত হয়, তবুও এর স্থায়িত্ব অনেক বেশী। রূপান্তরের সময় প্রায় পঁচিশ হাজার বছর। এই $_{94}Pu^{239}$-কে রাসায়নিক পদ্ধতিতে পৃথক করা সম্ভব এবং দ্রুত ও ধীর গতিসম্পন্ন নিউট্রনের দ্বারা একে ভাঙাও যেতে পারে। ঠিক এভাবেই Th^{232}-কে U^{233}-এ রূপান্তরিত করে নতুন জ্বালানীর সংখ্যা আরও একটি বৃদ্ধি করা হয়েছে।

এই দুই জ্বালানীর সন্ধান পাবার পর রিয়্যাক্টরের আর এক নবযুগ আরম্ভ হলো এবং জন্ম নিল Fast Breeder Reactor। Breeder শব্দের আভিধানিক অর্থ—যে জন্ম দান করে। আলোচ্য প্রবন্ধে আমরা পদার্থের যে ভোল পাল্টাবার কথা উল্লেখ করেছি, ব্রীডার রিয়্যাক্টরে তা অনায়াসেই করা সম্ভব। পরমাণুর বিভাজনে মুক্ত নিউট্রনগুলিকে মডারেটরের সাহায্যে মন্দীভূত করবার প্রয়োজন হয় না বলেই এই জাতীয় রিয়্যাক্টরকে ফাষ্ট ব্রীডার রিয়্যাক্টর বলা হয়। এই রিয়্যাক্টরের নাম থেকেই বোঝা যায় যে, এর মধ্যেই জ্বালানী তৈরি হচ্ছে। শুধু তাই নয়, অতিরিক্ত জ্বালানীও এখান থেকে কিছু সংগ্রহ করা যেতে পারে। সাধারণ রিয়্যাক্টরে যদিও কিছু Pu^{239} তৈরি হয়ে থাকে, তবুও এর রাসায়নিক পৃথকীকরণ বেশ জটিল। ব্রীডার রিয়্যাক্টরে অতিরিক্ত জ্বালানী তৈরির ব্যাপারটা ভারী চমৎকার। মনে করা যাক প্রতি বিভাজনে তিনটি নিউট্রন ছাড়া পাচ্ছে, যদিও এর গড় মান 2·5। এর মধ্যে একটি নিউট্রন শৃঙ্খল-প্রক্রিয়া চালু রাখতে খরচ হবে। দ্বিতীয়টি U^{238}-কে Pu^{239}-এ রূপান্তরিত করে জ্বালানীর খরচ যোগাবে। তৃতীয় নিউট্রনটি একইভাবে U^{238} থেকে অতিরিক্ত জ্বালানী Pu^{239} প্রস্তুত করবে। এথেকে সহজেই বোঝা যাচ্ছে যে, একটি U^{235}-এর পরমাণু খরচ হলেও দুটি Pu^{239} পরমাণু তৈরি হচ্ছে এবং এর ফলে একটি অতিরিক্ত জ্বালানী পরমাণু অনায়াসেই পাওয়া যাচ্ছে। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, দুটির বেশী নিউট্রন প্রাথমিক বিক্রিয়ায় তৈরি হলেই জ্বালানীর খরচ ছাড়াও অতিরিক্ত জ্বালানী রিয়্যাক্টরের মধ্যেই জমা হয়। এই অতিরিক্ত জ্বালানী অন্য রিয়্যাক্টরে ব্যবহার করাও সম্ভব। এর ফলে জ্বালানীর অভাব অনেকাংশে কমানোও সম্ভব।

আমাদের দেশে বস্তুতঃ U^{235}-এর বেশ অভাব আছে। এজন্যেই এখানে ব্রীডার রিয়্যাক্টরের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। এক খবরে প্রকাশ যে, আমাদের দেশে শীঘ্রই পরীক্ষামূলকভাবে একটি ফাষ্ট ব্রীডার রিয়্যাক্টর তৈরি হতে চলেছে। এই ব্যাপারে ফ্রান্সের পূর্ণ সহযোগিতাও পাওয়া যাবে। এটা তৈরি হলে আমাদের দেশে যে প্রচুর প্রাকৃতিক থোরিয়াম (Th^{232}) রয়েছে, তাকে U-^{233}-তে রূপান্তরিত করে জ্বালানীর কাজে ব্যবহার করা যাবে এবং ইউরেনিয়ামের স্বল্পতা আমাদের দেশের পরবর্তী পারমাণবিক কার্যসূচী বিঘ্নিত করতে পারবে না।

সাধারণ রিয়্যাক্টর অথবা ফাষ্ট ব্রীডার রিয়্যাক্টর, যেটার কথাই ধরা যাক না কেন, এদের প্রধান কাজ হলো বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদন করা। গবেষণাগারে অবশ্য শক্তি-উৎপাদন অপেক্ষা বিভিন্ন রেডিও আইসোটোপ তৈরি করাই রিয়্যাক্টরের প্রধান কাজ। ইতিমধ্যেই ভারতের ভাবা পারমাণবিক গবেষণা কেন্দ্রে (BARC) অনেক রেডিও আইসোটোপ তৈরি করা হচ্ছে

এবং দেশের চাহিদা মিটিয়েও বিদেশে পাঠানো হচ্ছে। এছাড়া কিছু উর্বর পদার্থকে বিভাজন-যোগ্য (Fissionable) পদার্থে পরিণত করাও রিয়্যাক্টরের কাজ। এজন্তে দিন দিন রিয়্যাক্টরের ভূমিকা বিজ্ঞানীদের নিকট খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। আশা করা যায়, বিজ্ঞানীরা এই নতুন হাতিয়ারের সাহায্যে অদূর ভবিষ্যতেই পারমাণবিক শক্তিকে আরও অনেক কল্যাণকর কাজে লাগিয়ে মানবসমাজকে কয়েক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যাবেন।

উদ্ভিদ ও ফস্‌ফরাস

শচীনন্দন বাগচী *

সোনা, রূপা, লোহা, তামা প্রভৃতি মৌলিক পদার্থের মধ্যে ফস্‌ফরাস একটি। ফস্‌ফরাস উদ্ভিদের ফল-ফুল ধারণ, শস্তের বীজ গঠন, শস্তের মান উন্নয়ন প্রভৃতির ক্ষেত্রে একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উপাদান। রোগ প্রতিরোধেও ফস্‌ফরাস উদ্ভিদকে সাহায্য করে থাকে। শুধু মাত্র উদ্ভিদেরই নয়, প্রাণিদেহেও হাড়, দাঁত প্রভৃতির গঠনে ফস্‌ফরাস অন্ততম প্রধান উপাদান। আমরা ফস্‌ফরাস পাই দুধ, ডিম প্রভৃতি থেকে প্রোটিনরূপে। আর উদ্ভিদ পায় মাটি থেকে ফস্‌ফেটরূপে। বিভিন্ন প্রকার ফস্‌ফেট সার ফস্‌ফরাসেরই নানা রকম যৌগ মাটির এই ফস্‌ফেট ও উদ্ভিদের সম্পর্কের বিষয়ে দু-চার কথা বলছি। ফস্‌ফেট সার সব মাটিতেই যে পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকে তা নয়, কোথাও কম, কোথাও বা বেশী। আমাদের দেশের মাটিতে ফস্‌ফেটের পরিমাণ কমই দেখা যায়। তবে মাটিতে ফস্‌ফেট বেশী থাকলেই যে তা উদ্ভিদের পক্ষে সহজপ্রাপ্য হবে, এমন কোন নিশ্চয়তা নেই। আবার জমিতে ফস্‌ফেট সার প্রয়োগ করলেই যে উদ্ভিদ তার সবটাই গ্রহণ করতে পারবে, তাও নয়। জমির মোট ফস্‌ফেটের খুব সামান্ত অংশই উদ্ভিদ গ্রহণ করতে পারে আর বাকীটা কতকগুলি বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় মাটি বন্ধন করে রাখে, যা উদ্ভিদের পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। মাটির এই বন্ধন করে-রাখা ফস্‌ফেটই কৃষি-বিজ্ঞানীদের কাছে এক বিরাট সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কারণ, অনেক মাটিতেই দেখা গেছে যে, প্রচুর পরিমাণ ফস্‌ফেট থাকা সত্ত্বেও উদ্ভিদ তা গ্রহণ করতে পারে না, যার ফলে উদ্ভিদের ফল-ফুল ধারণ করবার ক্ষমতাও হ্রাস পেতে থাকে। তাই কৃষি-বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে লাগলেন, কেমন করে মাটির এই ধরে-রাখা ফস্‌ফেটকে মুক্ত করে উদ্ভিদের পক্ষে সহজলভ্য করা যায়। ফলে আবিষ্কৃত হলো অনেক প্রকার পদ্ধতি।

মাটিতে ফস্‌ফেট থাকে প্রধানতঃ তিন প্রকারে—(1) মাটিতে জলীয় দ্রবণ হিসাবে, যার পরিমাণ খুবই সামান্ত, (2) জৈব পদার্থে, (3) অজৈব যৌগ ও বিভিন্ন প্রকার অজৈব পদার্থের দ্বারা শোষিত ফস্‌ফেটরূপে।

মাটিতে জলীয় দ্রবণ হিসাবে যে ফস্‌ফেট থাকে, একমাত্র সেটাই উদ্ভিদ তার মূলের দ্বারা গ্রহণ করে থাকে। ফস্‌ফেটের জলীয় দ্রবণ

* কৃষিবিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

আসে জৈব ও অজৈব দুই প্রকার উৎস থেকেই।

মাটিতে phytin, nucleic acid, phospholipids প্রভৃতি জৈব পদার্থগুলিই হচ্ছে জৈব ফসফরাসের উৎস। তবে অনেকে মনে করেন, এগুলিই একমাত্র উৎস নয়, আরো অনেক জৈব পদার্থ আছে, যা থেকে জৈব ফস্‌ফরাস পাওয়া যেতে পারে। মাটিতে অজৈব ফস্‌ফেট পাওয়া যায় প্রধানতঃ ক্যালসিয়াম, ম্যাগ্‌নেসিয়াম, লৌহ, অ্যালুমিনিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ প্রভৃতির বিভিন্ন প্রকার যৌগরূপে। এসব অজৈব ফস্‌ফেটগুলি মাটির বিভিন্ন রকম অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নানাভাবে উদ্ভিদকে ফস্‌ফরাস সরবরাহ করে থাকে। অম্লাত্মক মাটিতে লৌহ, অ্যালুমিনিয়াম ও ম্যাঙ্গানিজ বেশী পরিমাণে থাকে। তাই এই জাতীয় মাটিতে ফস্‌ফেট সার প্রয়োগ করলে লৌহ, অ্যালুমিনিয়াম ও ম্যাঙ্গানিজ বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় দ্রবণীয় ফস্‌ফেট সারকে অদ্রবণীয় ফস্‌ফেটে পরিণত করে, যার ফলে মাটিতে ফস্‌ফেট থাকা সত্ত্বেও অনেক সময়েই দেখা যায় যে, উদ্ভিদ তা গ্রহণ করতে পারে না।

এবার দেখা যাক, কি কি উপায়ে লৌহ প্রভৃতি ধাতব যৌগগুলি ফস্‌ফেটকে অদ্রবণীয় অর্থাৎ উদ্ভিদের পক্ষে অপ্রাপ্য পদার্থে পরিণত করে তোলে।

1. লৌহ, অ্যালুমিনিয়াম ও ম্যাঙ্গানিজের দ্বারা দ্রবণীয় ফস্‌ফেটের অদ্রবণীয় ফস্‌ফেটে অধঃক্ষেপণ।

$$Al^{+++} + 2H_2O + H_2PO_4 \rightleftharpoons Al(OH)_2H_2PO_4 + 2H^+$$

মাটিতে অ্যালুমিনিয়াম আয়ন — মাটিতে দ্রবণীয় ফস্‌ফেট — অদ্রবণীয় ফস্‌ফেট
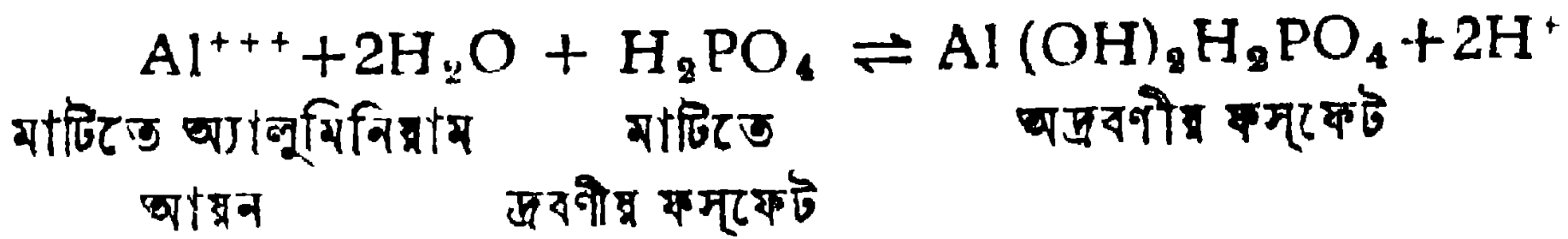
2. জৈব ফস্‌ফেটের অদ্রবণীয় ফস্‌ফেটে রূপান্তর:—জৈব ফস্‌ফেটযুক্ত পদার্থ phytin উদ্ভিদকে ফস্‌ফেট সরবরাহ করতে পারে। কিন্তু অম্লাত্মক মাটির লৌহ, অ্যালুমিনিয়াম প্রভৃতি phytin-কে দ্রবণীয় ফাইটেটে পরিণত করে থাকে।

3. লৌহ, অ্যালুমিনিয়াম ও ম্যাঙ্গানিজ প্রভৃতির hydrated oxide-এর দ্বারা ফস্‌ফেটের আবদ্ধীকরণ:—মাটির লৌহ, অ্যালুমিনিয়াম প্রভৃতির hydrated oxide, limonite, goethite ইত্যাদি দ্রবণীয় ফস্‌ফেটকে আবদ্ধ করে রাখতে পারে। তখন উদ্ভিদের পক্ষে কিছুতেই আর এই আবদ্ধ ফস্‌ফেট গ্রহণ করা সম্ভব হয় না।

4. মাটির montmorillnite, kaolonite, illite প্রভৃতি silicate mineralগুলির গঠন চওড়া পাত্‌লা প্লেটের মত। এরা ফস্‌ফেটকে নিজেদের প্লেটসদৃশ চাকৃতির গায়ে ion exchange, adsorption প্রভৃতি প্রক্রিয়ার দ্বারা ধরে রাখতে পারে।

এ তো গেল অম্লাত্মক মাটিতে ফস্‌ফেটের আবদ্ধীকরণ। ক্ষারীয় মাটিও অম্লাত্মক মাটির ন্যায় ফস্‌ফেটকে বন্ধন করে রাখে। ক্ষারীয় মাটিতে ক্যালসিয়াম, ম্যাগ্‌নেসিয়াম, সোডিয়াম ইত্যাদি ধাতুগুলি বেশী পরিমাণে থাকে। এদের মধ্যে সোডিয়ামের ফস্‌ফেট ধরে রাখবার কোন ক্ষমতা নেই; কিন্তু ক্যালসিয়াম, ম্যাগ্‌নেসিয়ামের অত্যধিক পরিমাণ ফস্‌ফেট বন্ধন করবার ক্ষমতা আছে। এই রকম মাটিতে ফস্‌ফেট প্রয়োগ করলে তা অদ্রবণীয় ক্যালসিয়াম-ম্যাগ্‌নেসিয়াম ফস্‌ফেটে রূপান্তরিত হয়। রূপান্তর ঘটে এই ভাবে—

$$Ca(HPO_4)_2 + 2Ca^{++} \rightleftharpoons Ca_3(PO_4)_2 + 4H^+$$

দ্রবণীয় ফস্‌ফেট — ক্যালসিয়াম আয়ন — অদ্রবণীয় ক্যালসিয়াম ফসফেট
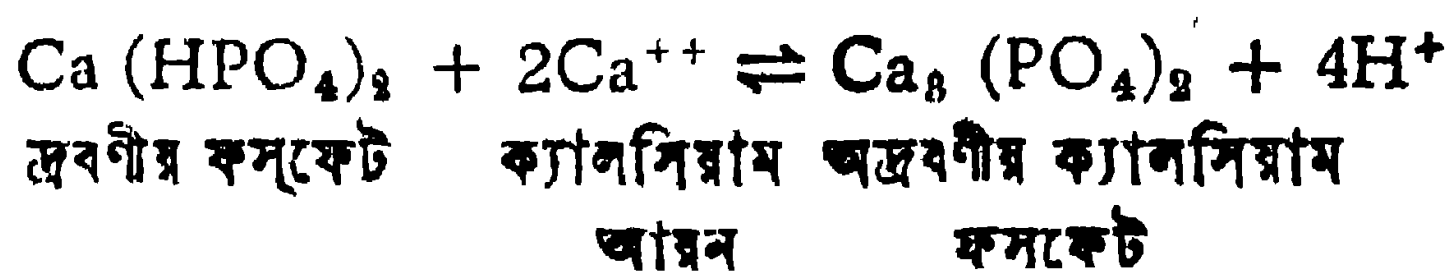
যদি অনেকদিন যাবৎ এই অদ্রবণীয় ক্যালসিয়াম ফস্‌ফেট মাটিতে থাকে, তাহলে সেগুলি অধিকতর অদ্রবণীয় পদার্থ oxy, hydroxy, carbonate, fluor প্রভৃতি apatite যৌগে পরিণত হয়। এসব apatite সেই সব মাটিতেই হয়, যে মাটিতে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম থাকে।

তাহলে দেখা গেল, অম্লাত্মক ও ক্ষারীয় দুই ধরণের মাটিই দ্রবণীয় ফস্‌ফেটকে অদ্রবণীয় ফস্‌ফেটে পরিবর্তিত করে থাকে। বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এই fixed, adsorbed, রূপান্তরিত অদ্রবণীয় ফস্‌ফেটকে দ্রবণীয় করে উদ্ভিদের পক্ষে সহজলভ্য করা যায়।

সাহায্যে মাটিতে আণুবীক্ষণিক জীবাণু অতি দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। এরা মাটির অদ্রবণীয় ফস্‌ফেটকে গ্রহণ করে নিজেদের দেহে আবদ্ধ করে। মাটিতে জৈব পদার্থ নিঃশেষিত হতে থাকলে এদের বংশবৃদ্ধি করবার ক্ষমতাও কমে যেতে থাকে। অবশেষে জৈব পদার্থের অভাবে এদের সংখ্যা লোপ পেয়ে যায়। এই সব মৃত জীবাণুর দেহের ফস্‌ফেট মাটিতে ফিরে আসে উদ্ভিদের কাছে সহজলভ্য হয়ে। তাছাড়া জৈব সার থেকে নানারকম জৈব অ্যাসিড, হিউমাস প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। এরা মাটির লৌহ, অ্যালুমিনিয়াম প্রভৃতির সঙ্গে বিক্রিয়া করে জটিল যৌগ উৎপন্ন
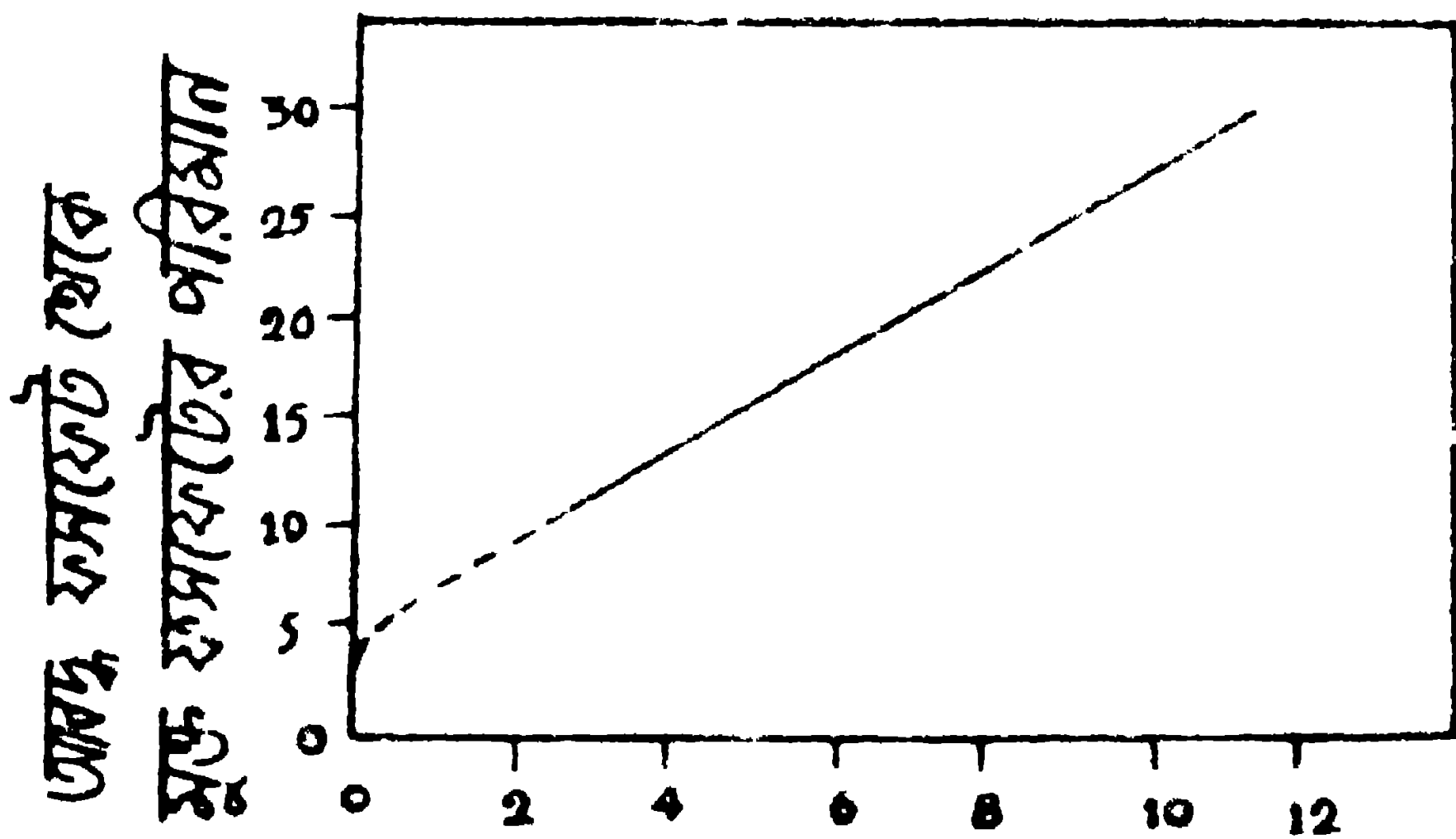
বেশীর ভাগ উদ্ভিদের পক্ষেই উপযুক্ত হচ্ছে neutral মাটি। খুব সামান্য অম্লাত্মক বা খুব সামান্য ক্ষারীয় মাটিতেও অধিকাংশ উদ্ভিদ বেশ ভাল জন্মায়।

এবার দেখা যাক, কিভাবে মাটির অদ্রবণীয় ফস্‌ফেটকে মুক্ত করে উদ্ভিদের পক্ষে সহজলভ্য করা যায়।

প্রথমতঃ, মাটিতে জৈব সার, যেমন— সবুজ সার, পাতা, গোবর ইত্যাদি পচা compost প্রয়োগের দ্বারা। এই জাতীয় সারে প্রচুর পরিমাণে জৈব পদার্থ থাকে। এই জৈব পদার্থের

করে থাকে। ফলে লৌহ, অ্যালুমিনিয়াম প্রভৃতি এই জটিল যৌগে আবদ্ধ হয়ে পড়ে এবং মাটির ফস্‌ফেটের সঙ্গে কোন রকম বিক্রিয়া করতে পারে না। তখন ফস্‌ফেটও মোটামুটি মুক্ত অবস্থায় থাকতে পারে। জৈব সার থেকে উৎপন্ন হিউমাসের ফস্‌ফেট মুক্ত করবার ক্ষমতা উপরের লেখচিত্রের দ্বারা দেখানো যেতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ অম্লাত্মক মাটিতে চুন প্রয়োগ করলে আবদ্ধ ফস্‌ফেট মুক্ত হয়ে উদ্ভিদের পক্ষে সহজলভ্য হয়।

$$2Al(OH)_2H_2PO_4 + CaO + H_2O = Ca(H_2PO_4)_2 + 2Al(OH)_3$$

অদ্রবণীয় ফস্‌ফেট চুন জল দ্রবণীয় ফস্‌ফেট

চুন প্রয়োগের দ্বারা অদ্রবণীয় ফস্‌ফেটের রূপান্তর—এই প্রসঙ্গে চুন প্রয়োগজনিত উপকারের কথা একটু বলা দরকার। কারণ এথেকে চাষীরা বুঝতে পারবেন, জমিতে চুন প্রয়োগ কেন করতে হয় এবং এর আসল সার্থকতা কোথায়। জমিতে নাইট্রোজেন সার, যেমন—অ্যামোনিয়াম সালফেট, অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট, ইউরিয়া ইত্যাদি ব্যবহার করলে মাটি ক্রমশঃ অম্লাত্মক হয়ে পড়ে। মাটির অম্লতা বাড়তে থাকলে তা অধিকাংশ উদ্ভিদের পক্ষেই অসহ্য হয়ে পড়ে। অধিকাংশ উদ্ভিদই এই সব মাটিতে বাঁচতে পারে না। তাছাড়া অম্লাত্মক মাটিতে লৌহ, অ্যালুমিনিয়াম প্রভৃতির ফস্‌ফেট বন্ধন-প্রক্রিয়া তো আছেই। ঠিক পরিমাণ চুন প্রয়োগের দ্বারা অম্লত্ব ও ফস্‌ফেট বন্ধন দুই-ই কমানো যায়। তাছাড়া চুন জমির মাটির গঠন উন্নত করে এবং micronutrient ঠিক পরিমাণে পেতে উদ্ভিদকে সাহায্য করে।

চুন প্রয়োগের পরিমাণ বিভিন্ন রকম নাইট্রোজেন সারের জন্যে বিভিন্ন পরিমাণে হয়; যেমন—জমিতে 100 কে.জি. অ্যামোনিয়াম সালফেট ব্যবহার করলে তার জন্যে জমিতে যে অম্লতা বৃদ্ধি পাবে, তাকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনবার জন্যে 110 কেজি চুনাপাথর জমিতে দিতে হবে। তবেই জমির অম্লতা ও ক্যালসিয়ামের পরিমাণ ঠিক আগের মত থাকবে। কতকগুলি বহুল প্রচলিত সারের ব্যবহারজনিত অম্লতা বৃদ্ধি রোধের জন্যে কি পরিমাণ সারের জন্যে কতটা চুন ব্যবহার করা উচিত, তার একটা হিসাব নীচে দেওয়া গেল।

	সারের নাম	সারের পরিমাণ	চুনের পরিমাণ
1.	শুষ্ক অ্যামোনিয়া (Anhydrous ammonia)	100 কেজি	148 কেজি চুনাপাথর
2.	অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড	100 „	128 „ „
3.	অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট	100 „	60 „ „
4.	অ্যামোনিয়াম সালফেট-নাইট্রেট	100 „	93 „ „
5.	অ্যামোনিয়াম সালফেট	100 „	110 „ „
6.	ইউরিয়া	100 „	80 „ „

সঞ্চয়ন

চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মহাকাশ-গবেষণার সুফল

মানুষ এবং নানা বৈজ্ঞানিক সরঞ্জাম পৃথিবী ছাড়িয়ে মহাকাশে পাঠানোই মহাকাশ-বিজ্ঞানের আসল উদ্দেশ্য। এই লক্ষ্য সাধন করতে গিয়ে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের পক্ষেও সহায়ক বহু নূতন তথ্য উদ্ভাবিত হয়েছে।

মহাকাশযাত্রায় শারীরবিজ্ঞান সম্পর্কে যে সকল তথ্য সংগৃহীত হয়েছে, কারিগরি-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে সকল নূতন আবিষ্কার হয়েছে—শরীরের যত্ন ও স্বাস্থ্যের উন্নতিবিধানে সেগুলি ক্রমেই অধিক পরিমাণে প্রয়োগ করা হচ্ছে।

1969 সালে জুলাই ও অগাষ্ট মাসে স্বয়ংক্রিয় মার্কিন মহাকাশযান মেরিনার-6 ও মেরিনার-7 মঙ্গলগ্রহের যে সব ছবি পৃথিবীতে পাঠিয়েছিল, সে সব ছবি এক বিশেষ পদ্ধতিতে তোলা হয়েছিল। বর্তমানে চিকিৎসার ক্ষেত্রে এক্স-রে ছবি তোলবার ব্যাপারে এই কম্পিউটার পদ্ধতিকে কাজে লাগানো হচ্ছে। এই পদ্ধতিতে ছবি তুললে অবান্তর খুঁটিনাটি বাদ দিয়ে মূল বিষয়ের অতি সুস্পষ্ট ছবি তোলা সম্ভব হয়ে থাকে।

মহাকাশচারীরা মাথায় যে টুপী পরে থাকেন, অক্সিজেন ব্যবহার সম্পর্কে সেই টুপী নিয়ে ক্যান্সাস বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিক্যাল সেন্টারের বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন। এই টুপী পরে অতি জোরে শ্বাস টানলেও শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যাপারে কোন কষ্ট হয় না। রেস্পিরো-মিটার যন্ত্রটির ইদানীং কালে খুবই উন্নতি হয়েছে এবং শারীরবৃত্তীয় শ্বাস-প্রশ্বাস সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধান ও গবেষণার ব্যাপারে নূতন দিগন্তের সন্ধান দিয়েছে।

আগেকার রেস্পিরোমিটার যন্ত্র যারা ব্যবহার করতেন, তাদের নাকে ক্লিপ এঁটে দেওয়া হতো এবং যে যন্ত্রটি লাগানো থাকতো, তা দিয়ে তারা মুখে শ্বাস-প্রশ্বাস নিতেন। কাজের সময় এটি যথাস্থানে থাকতো না, সরে যেত।

মহাকাশ-বিজ্ঞানের কল্যাণকর ভূমিকা রচনা করতে হয়েছে, ভেষজ-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এখনও তা হয় নি। চিকিৎসা-বিজ্ঞানের নানা সমস্যা সমাধানে মহাকাশসংক্রান্ত কার্যসূচী যাতে সহায়ক হতে পারে, সেই ভাবে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে ও কারিগরিবিদ্যাকেও রূপদান করা হয়েছে।

দেশে এবং বিদেশে মহাকাশ-বিজ্ঞান ও কারিগরি বিষয়ে যে সকল তথ্য উদ্ভাবিত হয়েছে, নূতন নূতন যে সব তথ্যাদির আবিষ্কার হয়েছে, সে সব সংগ্রহ করে তথ্যভাণ্ডারে মজুদ রাখা হয়। এই ভাণ্ডারে আড়াই লাখেরও বেশী বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি বিষয়ক প্রামাণিক তথ্যাদি মজুদ রয়েছে। তাছাড়া প্রতি বছর 75 হাজার রিপোর্ট ও প্রবন্ধ এখানে জমা হচ্ছে। এই সব তথ্য কম্পিউটার যন্ত্রের সাহায্যে কম্পিউ-টারের ফিতার সূচীভুক্ত হয় এবং চতুষ্কোণ মাইক্রোফিল্মের উপর মুদ্রণের পর বন্টনের ব্যবস্থা করা হয়।

কম্পিউটার যন্ত্রের সাহায্যে সূচীভুক্ত তথ্যাদির এই ভাণ্ডার থেকে যে সব আবিষ্কার ও উদ্ভাবন সংক্রান্ত তথ্যাদি চিকিৎসা-বিজ্ঞান এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে কাজে লাগাবার সম্ভাবনা আছে, সেগুলি সংগ্রহ করে আটটি আঞ্চলিক কেন্দ্রের মাধ্যমে বিজ্ঞানী-সমাজে পরিবেশন করা হয় এবং

সকল কাজ সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

নানা সূত্র থেকেই তথ্যাদি সংগৃহীত হয়ে থাকে। যেমন—জাতীয় বিমান-বিজ্ঞান ও মহাকাশ সংস্থার ক্যালিফোর্ণিয়ায় অবস্থিত এমজ গবেষণা কেন্দ্রের জনৈক বিজ্ঞানীর উপর মিটিওরাইট বা অতি ক্ষুদ্র উল্কাকণার অস্তিত্ব-সন্ধানী একটি সেন্সর নির্মাণের ভার দেওয়া হয়। তিনি অতি সূক্ষ্ম একটি যন্ত্র তৈরি করেন। এক সেন্টিমিটার উপর থেকে একটি নুনের কণা মাটিতে পড়লে যে সংঘাতের সৃষ্টি হয়, সেই সংঘাতের এক হাজার ভাগের এক ভাগও এই যন্ত্রের সাহায্যে পরিমাপ করা যায়।

এই সেন্সর নির্মাণের কিছুকাল পরে দু-জন জীববিজ্ঞানীর মধ্যে আলোচনাকালে তিনি উপস্থিত ছিলেন। ডিমের মধ্যে মুরগীর বাচ্চার হৃদ্‌স্পন্দন নিরূপণের বিষয়েই তাদের মধ্যে কথা হচ্ছিল; অর্থাৎ ডিমের খোসাটি না ভেঙে কিভাবে হৃদ্‌স্পন্দন নিরূপণ করা যেতে পারে, সেই সমস্যা নিয়েই তারা আলোচনা করছিলেন।

জাতীয় বিমান-বিজ্ঞান ও মহাকাশ সংস্থার ঐ বিজ্ঞানী এই সমস্যা সমাধানের পথ তাঁদের দেখিয়ে দিলেন। তাঁর নির্মিত এই সেন্সর যন্ত্রটির সামান্য অদলবদল করে নিলেই যে এই কাজ সম্পন্ন হতে পারে, তা জানিয়ে দিলেন।

বর্তমানে পার্কিনসন্স রোগে মাংসপেশীর সামান্য কম্পন রেকর্ড করবার জন্যে এই যন্ত্রটি ব্যবহার করা হচ্ছে। স্নায়ুর শল্যচিকিৎসায়ও এই যন্ত্রটি বিশেষ কাজে লাগবে বলে বিজ্ঞানীদের ধারণা।

মহাকাশ-বিজ্ঞানের সম্ভাবনা অনেক। চিকিৎসা-বিজ্ঞানের বহু ক্ষেত্রেই এর সুফল পাওয়া যাচ্ছে। এখানে মাত্র কয়েকটির কথা উল্লেখ করা হলো।

সামুদ্রিক সম্পদ সংগ্রহ

হাজার হাজার বছর ধরেই মানুষ সামুদ্রিক সম্পদ সংগ্রহ করে আসছে। কিন্তু কি পরিমাণ সম্পদ যে সমুদ্রে সঞ্চিত রয়েছে এবং তা আহরণের জন্যে বিজ্ঞান ও কারিগরিবিদ্যার কতখানি উন্নতি সাধন করা প্রয়োজন, সে বিষয়ে মানুষ মাত্র গত দশ বছরের মধ্যে বিশেষভাবে অবহিত হয়েছে।

আগামী ত্রিশ বছরের মধ্যে পৃথিবীর জনসংখ্যা বর্তমানে যা আছে, তার দ্বিগুণ হয়ে যাবে। পৃথিবীতে যে পরিমাণ জমি রয়েছে, সে দিন তাতে ফসল ফলিয়েই সেই বিপুল জনসংখ্যার খাদ্যের চাহিদা মেটানো যাবে না। শিল্পোৎপাদন দ্রুতগতিতে বেড়ে গেলেও কাঁচা মালের উপরও তখন টান পড়বে। সে দিন মানুষের দিকে তাকানো ছাড়া মানুষের অন্য কোন গতি থাকবে না। খাদ্য ও কাঁচামালের সন্ধান যে তখন সমুদ্রেই করতে হবে, সেটা অবধারিত।

তবে সমুদ্রগর্ভে প্রাকৃতিক সম্পদের সন্ধান অনেক কাল যাবৎ সুরু হয়ে গেছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে খুব উন্নতিও হয়েছে। বহু প্রকার ধাতব সম্পদই সমুদ্র থেকে সংগৃহীত হচ্ছে। কিন্তু ঐ সকল সম্পদের মোট মূল্যের শতকরা 90 ভাগই পাওয়া যাচ্ছে সমুদ্রগর্ভ থেকে আহরিত গ্যাস ও তৈলসম্পদ থেকে। বর্তমানে গ্যাস ও তৈলসম্পদ সমুদ্র থেকে প্রচুর পরিমাণে সংগৃহীত হচ্ছে এবং ম্যাগ্‌নেশিয়াম, দস্তা, তামা, রূপা, ইউরেনিয়াম, ব্রোমিন, ঝিনুক, হীরা, বালি প্রভৃতি সম্পদও যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যাচ্ছে।

পৃথিবীর বিভিন্ন মহাদেশের মাত্র তীর-

সংলগ্ন এলাকা থেকেই এই সব সম্পদ সংগৃহীত হয়েছে। তার জন্যে সমুদ্রের খুব গভীরেও যেতে হয় নি। সমুদ্রের মাত্র 656 ফুট অথবা 200 মিটার বা তারও কম নীচে গিয়ে মানুষ এই সব সম্পদ আহরণ করে। অন্তহীন বিশাল সমুদ্রের প্রায় সবটাই আজও এমনি পড়ে আছে, সেখানে সম্পদ সংগ্রহের কোন চেষ্টাই হয় নি।

তবে জলই সমুদ্রের সবচেয়ে মূল্যবান অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদ। পারমাণবিক শক্তির সাহায্যে সমুদ্রের লবণাক্ত জল লবণমুক্ত করে মানুষের বিভিন্ন কাজে ও চাষ-আবাদে ব্যবহারের চেষ্টা হচ্ছে। বর্তমানে সমুদ্রের জল লবণমুক্ত করবার 680টি কারখানা চালু অথবা নির্মীয়মান অবস্থায় রয়েছে।

আগামী দশ বছরে এই সব কারখানার সংখ্যা প্রতি বছরে শতকরা 25টি হারে বেড়ে যাবে। সমুদ্রের জল বর্তমানে লবণমুক্ত করতে খরচ খুবই বেশী পড়ে। ভবিষ্যতে কারিগরি-বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে এই খরচের মাত্রা অনেকখানি হ্রাস পাবে বলে বিজ্ঞানীদের ধারণা। পৃথিবীর বহু মরুঅঞ্চলকে এই জলের সাহায্যে শস্য-ফলনোপযোগী এবং বাসযোগ্য করে তোলা যেতে পারে। এছাড়া খাদ্যে প্রোটিনের অভাব পূরণেও সমুদ্র খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। সে দিন বিশেষ করে পৃথিবীর খাদ্যাভাবগ্রস্ত এলাকার খাদ্যপ্রাণ বা প্রোটিনের অভাব পূরণে সামুদ্রিক মৎস্য প্রভৃতি খুবই সহায়ক হবে। এই সকল খাদ্য খুবই সস্তা এবং প্রচুর পরিমাণে পাওয়াও যায়। তবে বর্তমানে সমুদ্রে যে পরিমাণ খাদ্য রয়েছে, মানুষ তার শতকরা মাত্র দুই ভাগ প্রতি বছর সমুদ্র থেকে আহরণ করছে। সমুদ্রে মাছের চাষ করবার যে পরিকল্পনা করা হয়েছে, তাতে মাছের উৎপাদন ভবিষ্যতে যথেষ্ট পরিমাণে বেড়ে যাবে।

তাছাড়া চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরা সমুদ্রে নানা রকম ভেষজের সন্ধানও করছেন। সামুদ্রিক স্টোন, মাছ একপ্রকার বিষ উদ্গীরণ করে থাকে। রক্তের চাপ হ্রাস পেলে এই বিষ ঔষধ হিসাবে ব্যবহার করা যায় কিনা, সে বিষয়ে দক্ষিণ ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হচ্ছে। দক্ষিণ মেরুঅঞ্চলে পেঙ্গুইন পাখীর অন্ত্র পরীক্ষা করে বিজ্ঞানীরা একটি নূতন ধরণের অ্যান্টিবায়োটিকেরও সন্ধান পেয়েছেন। এক্ষেত্রে সামান্য তথ্যানুসন্ধানই হয়েছে। বহু রকমের ভেষজ এবং সামুদ্রিক জীবজন্তুর বিষয় অনুসন্ধানের ফলে সমুদ্রগর্ভে অনেক কিছু প্রয়োজনীয় জিনিষ পাওয়া যাবে বলে বিজ্ঞানীদের ধারণা।

পৃথিবীর তিন ভাগের দু-ভাগই রয়েছে সমুদ্রের তলায়। এই বিশাল অংশে লুক্কায়িত সম্পদের সন্ধানের উদ্যোগ সুরু হয়েছে মাত্র। কাঁচামাল যখন স্থলভাগে তেমন পাওয়া যাবে না, তখন কলকারখানা চালু রাখবার জন্যে সেই কাঁচামালের সন্ধান নিতে হবে সমুদ্রে। যে সব কারখানা ঐ সব সামুদ্রিক কাঁচামাল ব্যবহার করে গড়ে উঠবে, তাদের বিপুলভাবে সম্প্রসারণের সুযোগ-সুবিধা রয়েছে।

সামুদ্রিক সম্পদের উন্নয়নে, কলকারখানায় তাদের প্রয়োগের ব্যাপারে বেসরকারী ক্ষেত্রের বিভিন্ন উদ্যোগ ও সংস্থার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকলেও দেশের সরকার, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি এই বিষয়ে উদ্যোগী হলেই তবে এই ক্ষেত্রে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে।

ধাতুনিষ্কাশনী কোক কয়লা

হরেন্দ্রনাথ রায়

কয়লার সহিত অল্পবিস্তর পরিচয় আমাদের সকলেরই আছে। সাধারণের কাছে কয়লা একটি অতি তুচ্ছ কালো রঙের কঠিন পদার্থ, যাহার ময়লা শত বার ধৌত করিলেও যায় না। কিন্তু বিজ্ঞানীদের কাছে এই বস্তুটি একটি মূল্যবান সম্পদ। এই বস্তুটিকে তাঁহারা যত কাজে লাগাইয়াছেন, লাগাইতেছেন এবং ভবিষ্যতেও লাগাইবেন—তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে—তা ফলিত বিজ্ঞানই হউক আর সাধারণ বিজ্ঞানই হউক—কয়লার দান অফুরন্ত।

ধাতুনিষ্কাশনের ক্ষেত্রে কয়লার ব্যবহার সাম্প্রতিক নয়—সুপ্রাচীন। ধাতুর অক্সাইডকে কয়লা সহযোগে বিজারিত করিয়া মূল ধাতুটিকে নিষ্কাশিত করা হয়। এই প্রথা যুগ যুগ ধরিয়া চলিয়া আসিতেছিল। তবে আধুনিক যুগে কাঁচা কয়লার পরিবর্তে এক বিশেষ ধরণের কোক কয়লা ব্যবহার করা হয়। কোক কয়লা কাঁচা কয়লারই রূপান্তর মাত্র। ইহাকে বলা হয় মেটালার্জিক্যাল কোক বা ধাতুনিষ্কাশনী কোক।

ধাতুনিষ্কাশনী কয়লা বিশুদ্ধ কয়লা নয়। খনি হইতে উত্তোলিত কাঁচা কয়লাকে আংশিক পোড়াইয়া রন্ধনকার্যের জন্য জ্বালানী কয়লা উৎপন্ন করা হয় আর কাঁচা কয়লাকে বায়ুনিরুদ্ধ কক্ষে 1000°—1200° ডিগ্রী তাপে অন্তর্ধূম পাতন করিয়া কোক কয়লা প্রস্তুত করা হয়। খনি হইতে উত্তোলিত কাঁচা কয়লার মধ্যে থাকে প্রায় 55—60 শতাংশ বিশুদ্ধ কয়লা বা কার্বন, 24—25 শতাংশ উদ্বায়ী পদার্থ (Volatile matter), যার মধ্যে থাকে কোল গ্যাস, আলকাত্‌রা, ফিনোল, ন্যাপ্‌থ্যালিন ইত্যাদি আর বাকীটা (প্রায় 16-18 শতাংশ) থাকে ছাই বা অদাহ্য অজৈব পদার্থ (Mineral matter)। কোক কয়লার মধ্যে উদ্বায়ী পদার্থ থাকে না বলিলেই চলে। ইহার মধ্যে থাকে প্রায় 75 ভাগ কার্বন আর কিছুটা জলীয় পদার্থ (3 ভাগের বেশী না হওয়াই বাঞ্ছনীয়); বাকীটা ছাই (প্রায় 20-22 শতাংশ)।

অন্তর্ধূম পাতনের দ্বারা কোক কয়লা উৎপন্ন করা যায় বটে, তবে সব কোক কয়লাকে মেটালার্জিক্যাল কোক হিসাবে ব্যবহার করা যায় না। মেটালার্জিক্যাল কোকের কতকগুলি বিশেষ গুণ থাকা দরকার নচেৎ ধাতুনিষ্কাশনে ইহা অচল হইয়া পড়ে। আমাদের দেশে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর কয়লার অভাব খুবই বেশী। মেটালার্জিক্যাল কোকের উপযোগী কয়লার অভাব আরও বেশী। মেটালার্জিক্যাল কোকের উৎকর্ষ নির্ভর করে কয়লার ছাই এবং আরও কয়েকটি বিষয়ের উপর। ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে, যেখানে কয়লার ছাইয়ের পরিমাণ 6½-7½ শতাংশ, আমাদের দেশে সেখানে 16-17 শতাংশ—এমন কি, আরও বেশী। ছাইয়ের এতটা আধিক্য মেটালার্জিক্যাল কোকের পক্ষে খুবই অসুবিধাজনক। ছাই ব্যতীত কয়লার মধ্যে আরও কয়েকটি পদার্থের আধিক্যও অবাঞ্ছনীয়—সালফার, ফস্‌ফরাস এবং লৌহ ইহাদের অন্যতম। কয়লায় সালফার এবং ফস্‌ফরাসের আধিক্য উৎকৃষ্ট লৌহ প্রস্তুতের পক্ষে অন্তরায়। লৌহের আধিক্য ছাইয়ের রংটিকে লালচে করে এবং উহার গলনাঙ্কের তাপমাত্রাও (Ash fusion temperature) কমাইয়া আনে। ইহা কোকের পক্ষে ক্ষতিকর।

মেটালার্জিক্যাল কোক প্রস্তুতের পক্ষে কোকিং বা কোকিং কোলের প্রয়োজন। কোকিং মানে সুদৃঢ়ভাবে জমাট বাঁধিবার ক্ষমতা। সকল কয়লার এই গুণ থাকে না। যে সকল কয়লার থাকে, তাহাদিগকে কোকিং কোল বলা হয়। কয়লাকে যদি ধীরে ধীরে উত্তপ্ত করা যায়, তাহা হইলে 340°-450° ডিগ্রীর মধ্যে কয়লা নমনীয় বা প্লাষ্টিক হইয়া পড়ে। এই তাপে কয়লা ধীরে ধীরে বিশ্লিষ্ট হইতে সুরু করে। তখন তাহার মধ্য হইতে গ্যাসীয় পদার্থ নির্গত হইতে থাকে। আরও অধিক তাপে 450°-550° ডিগ্রীতে এই বিশ্লেষণ ক্রিয়ার গতিবেগ আরও দ্রুত হয় এবং ঐ নমনীয় কয়লা জমাট বাঁধিয়া কঠিন কোকে পরিণত হয়। যে সকল কয়লার এই গুণ থাকে না, তাহাদিগকে নন-কোকিং কোল বলা হয়। নন-কোকিং কোল বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হইলেও মেটালার্জিক্যাল কোক প্রস্তুতের পক্ষে অনুপযোগী। নন-কোকিং কোলে উদ্বায়ী পদার্থ 17 শতাংশের কম হইয়া থাকে। কোকিং কোলে এই জিনিষটি 20-35 শতাংশ পর্যন্ত হইয়া থাকে।

মেটালার্জিক্যাল কোলের আর একটি বিশেষ ধর্ম হইতেছে, তাহার Swelling property। যে সকল কয়লা উত্তপ্ত করিলে আয়তনে বাড়ে না, সেই সব কয়লা মেটালার্জিক্যাল কোকের উপযোগী। উত্তাপের সহিত আয়তন বাড়িতে থাকিলে অর্থাৎ কয়লা আয়তনে স্ফীত হইতে থাকিলে, অন্তর্ধূম পাতনের সময় চুল্লীগুলির সমূহ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। সেই জন্য কয়লার আয়তন-স্ফীতির মান (Swelling index) পরীক্ষা করিয়া দেখা প্রয়োজন। এক গ্র্যাম কয়লাকে 72 মেস-এ চূর্ণ করিয়া একটা নির্দিষ্ট আয়তনের ক্রুসিবলের মধ্যে এমনভাবে উত্তপ্ত করিতে হয়, যাহাতে 2½ মিনিটে তাপমাত্রা 800° ডিগ্রীতে উঠে। তারপর তাহাকে ঠাণ্ডা করিয়া তাহার আয়তন কতকগুলি ষ্ট্যাণ্ডার্ড আয়তনের সহিত মিলাইয়া দেখিতে হয়। ষ্ট্যাণ্ডার্ডগুলি নম্বর করা থাকে। যে নম্বরের সহিত এই কয়লার আয়তনের মিল হয়, সেই নম্বরই তাহার Swelling index। সাধারণতঃ আয়তনের বিশেষ পরিবর্তন না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। ষ্ট্যাণ্ডার্ডের সহিত আয়তন না মিলিলে তাহা অনুপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হয়।

আমাদের দেশে দুইটি অঞ্চল—রাণীগঞ্জ এবং ঝরিয়া হইতে কয়লা আমদানী হয়। রাণীগঞ্জ অঞ্চলের কয়লা উচ্চ শ্রেণীর বটে, কিন্তু ধাতুনিষ্কাশনী কয়লার পর্যায়ে পড়ে না। ইহাতে ছাইয়ের পরিমাণ কম (13-16 শতাংশ)। ইহার ক্যালোরিফিক ভ্যালিউ বা তাপপরিবর্ধক ক্ষমতা বেশী এবং দাহ্য পদার্থ বা উদ্বায়ী পদার্থ বেশী। কিন্তু ইহা কোকিং কোল নয়। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, কোকিং কোল না হইলে মেটালার্জিক্যাল কোক প্রস্তুত করা সম্ভব নয়। রাণীগঞ্জ এলাকার কয়লার কেকিং ইনডেক্স (Caking index) এবং সোয়েলিং ইনডেক্স—কোনটিই মেটালার্জিক্যাল কোকের পক্ষে উপযোগী নয়।

ঝরিয়া অঞ্চল হইতে যে কয়লা পাওয়া যায়, তাহা কোকিং কোল, ইহার কেকিং ইনডেক্স এবং সোয়েলিং ইনডেক্স দুই-ই মেটালার্জিক্যাল কোক প্রস্তুতের পক্ষে উপযোগী। তবে এই অঞ্চলের কয়লায় ছাইয়ের পরিমাণ অত্যধিক—18-20 শতাংশ, ক্ষেত্রবিশেষে ইহারও বেশী হইয়া থাকে। এত অধিক ছাইযুক্ত কয়লা মেটালার্জিক্যাল কোক প্রস্তুতের পক্ষে উপযোগী নয়। তাই ঝরিয়া এবং রাণীগঞ্জের কয়লা নির্ধারিত অনুপাতে মিশ্রিত করিয়া এমন একটি মিশ্রণ প্রস্তুত করা হয়, যাহা হইতে ধাতুনিষ্কাশনী কোক উৎপন্ন করা সম্ভব। ইহার সহিত বরাকর অঞ্চলের কয়লাও সময় সময় মিশ্রিত করা হইয়া থাকে।

ঝরিয়া অঞ্চলের কয়লার সহিত রাণীগঞ্জের

কয়লা মিশ্রিত করা হয় বটে, তবে সরাসরি নয়। ঝরিয়ার কয়লাকেও বাছাই করা হয়। হাতে বাছাই করা হয় না, ভাসমান পদ্ধতি বা গ্র্যাভিটি সেপারেসনের দ্বারা বাছাই করা হয়। কয়লার ভিতর ছাইয়ের পরিমাণ অনুযায়ী কয়লা হাল্কা বা ভারী হইয়া থাকে। এমন একটি মাধ্যম প্রস্তুত করা হয়, যাহাতে ভারী কয়লাগুলি ডুবিয়া যায় এবং হাল্কা কয়লাগুলি ভাসিয়া উঠে। ওয়াসারিতে এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। আজকাল কয়লাখনি অঞ্চলে অনেকগুলি ওয়াসারি স্থাপন করা হইয়াছে। আবার কোন কোন ষ্টীল প্ল্যান্টেরও নিজস্ব ওয়াসারি আছে। এই সকল স্থানেই হাল্কা কয়লা ভারী কয়লা হইতে পৃথক করা হয়।

মাধ্যম প্রস্তুত করা হয় জলের সহিত 200-300 মেস-এর ম্যাগ্‌নেটাইট (Fe_3O_4) পাউডার মিশ্রিত করিয়া। জলের আপেক্ষিক গুরুত্ব 1·00, ম্যাগ্‌নেটাইটের প্রায় 5·00। দুইটিকে এমনভাবে মিশ্রিত করা হয়, যাহাতে মিশ্রণটির আপেক্ষিক গুরুত্ব দাঁড়ায় 1·40-1·60-এর মধ্যে। ম্যাগ্‌নেটাইটের পরিমাণ কমাইয়া বা বাড়াইয়া মিশ্রণটির আপেক্ষিক গুরুত্ব কমাইতে বা বাড়াইতে পারা যায়। ম্যাগ্‌নেটাইট চৌম্বকধর্মী হওয়ায় ম্যাগ্‌নেটাইট পাউডার ব্যবহার করা হয়। সুতরাং এই পাউডারকে চুম্বকের দ্বারা আকর্ষণ করিয়া পুনরুদ্ধার করা যায় এবং সেই চূর্ণকে আবার ব্যবহার করা যাইতে পারে। ম্যাগ্‌নেটাইট পাউডার ভারী। সেই জন্য তলায় থিতাইয়া পড়িবার সম্ভাবনা খুব বেশী। সেই কারণে বৈদ্যুতিক পাখার সাহায্যে মিশ্রণটিকে এমনভাবে আলোড়িত করা হয়, যাহাতে ম্যাগ্‌নেটাইটের মিহি গুঁড়া তলায় থিতাইয়া পড়িতে না পারে।

গ্র্যাভিটি সেপারেসন বা ভাসমান পদ্ধতিতে হাল্কা ও ভারী কয়লার পৃথকীকরণের কাজ সম্পন্ন করা হয় অতিকায় চোঙাকৃতির ড্রামের মধ্যে। এই ড্রামের মধ্যে জল ও ম্যাগ্‌নেটাইটের মিশ্রণটি রাখা হয় এবং টন টন কয়লা ইহার মধ্যে ঢালিয়া দেওয়া হয়। মাধ্যমের আপেক্ষিক গুরুত্ব 1·40, 1·45, 1·50—এই ভাবে আস্তে আস্তে বৃদ্ধি করা হয় এবং ভাসমান কয়লাগুলিকে ছাঁকিয়া তোলা হয়। এই ভাবে যে কয়লা পাওয়া যায়, তাহার পরিমাণ প্রায় 70-75%। এই সকল কয়লার মধ্যে ছাইয়ের পরিমাণ কম থাকে। যে কয়লাগুলি তলায় পড়িয়া যায়, তাহাদের মধ্যে ছাইয়ের পরিমাণ বেশী। সেগুলির দ্বারা মেটালার্জিক্যাল কোক প্রস্তুত হয় না। তবে সব কয়লাটাই পরিত্যক্ত হয় না। মাধ্যমের আপেক্ষিক গুরুত্ব 1·60, 1·65 পর্যন্ত বাড়াইয়া আরও কিছুটা কয়লা ছাঁকিয়া তোলা হয়। এই কয়লাগুলিকে মিড্‌লিং বলা হয়। অবশিষ্ট কয়লা পরিত্যক্ত হয়। মিডলিং-এ ছাইয়ের পরিমাণ প্রায় 30-35 শতাংশ। ইহাকে বিভিন্ন কাজে, যেমন—বৈদ্যুতিক থার্ম্যাল প্ল্যান্টে ব্যবহার করা হয়। পরিত্যক্ত কয়লা, যাহার মধ্যে ছাইয়ের পরিমাণ চল্লিশের উর্ধ্বে তাহার ব্যবহারিক চল নাই। তবে অসাধু ব্যবসায়ীদের কাছে পরিত্যক্ত বলিয়া কিছু নাই। তাহারা হয়তো এই কয়লাকেই অন্যান্য কয়লার সহিত মিশাইয়া আমাদের দৈনন্দিন কাজে যোগান দেয়। ফলে এক দিকে আমরা যেমন আর্থিক ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছি, অন্য দিকে তেমনি আমাদের দৈনন্দিন কয়লার খরচও বাড়িতেছে আর উনুনে ছাইয়ের পরিমাণও বাড়িতেছে।

এই ভাবে পৃথক-করা ঝরিয়ার হাল্কা কয়লার সহিত রাণীগঞ্জ এবং বরাকরের কয়লার সংমিশ্রণ বা ব্লেণ্ডিং করা হয়। রাণীগঞ্জ কয়লার মধ্যে ছাইয়ের পরিমাণ কম, সুতরাং তাহার গ্র্যাভিটি সেপারেসনের প্রয়োজন হয় না। কয়লাকে অন্তর্ধূম পাতন করিতে হইলে তাহাকে চূর্ণ করিতে হয়। সেই জন্য গ্রাইণ্ডিং মিলে সংমিশ্রণটিকে হাই ম্যাঙ্গানিজ হাতুড়ির সাহায্যে গুঁড়া করা হয়। চূর্ণীকৃত কয়লার আকার ⅛"-এর কম

হওয়া বাঞ্ছনীয়। কারণ বড় সাইজের কয়লার দ্বারা বেশ জমাট-বাঁধা কঠিন কোক প্রস্তুত হয় না। এই চূর্ণীকৃত কয়লার দ্বারা কোকচুল্লী বা ওভেনগুলিকে পূর্ণ করা বা চার্জ করা হয়। এক-একটা চুল্লীতে কয়লা ধরে প্রায় 20টন। এই রকম কম-বেশী 80টি চুল্লী পাশাপাশি অবস্থান করে। পাশাপাশি অবস্থিত 80টি চুল্লীকে বলে একটা ব্যাটারী। কোন কোন ষ্টীল প্ল্যাণ্টে 4টি, 5টি—এমন কি, আরও বেশী ব্যাটারী থাকে কোক উৎপাদনের জন্য। চুল্লীকে গুঁড়া কয়লার দ্বারা বোঝাই বা চার্জ করা হইতে কোক উৎপাদন পর্যন্ত সময় লাগে প্রায় 16 ঘণ্টা। চুল্লীগুলিকে গরম গ্যাসের সাহায্যে উত্তপ্ত করা হয়। দুই পাশ হইতে এমনভাবে উত্তপ্ত করা হয়, যাহাতে তাপ কয়লার স্তূপ ভেদ করিয়া অভ্যন্তর ভাগ পর্যন্ত প্রবেশ করিতে পারে। অন্তর্ধূম পাতনের সময় চুল্লীর দরজাগুলিকে এমন নিশ্ছিদ্রভাবে বন্ধ রাখা হয়, যাহাতে বাতাসের অনুপ্রবেশ ঘটিতে না পারে। চুল্লীগুলির বাহিরের তাপ বেশী, কিন্তু ভিতরের তাপ 1100°-1200° ডিগ্রী রাখা হয়।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, তাপ বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে কয়লা নমনীয় বা প্লাস্টিক অবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং উহা বিশ্লিষ্ট হইতে থাকে। সেই সঙ্গে কোল গ্যাস নির্গত হয়। এই কোল গ্যাসের সঙ্গে মিশ্রিত থাকে আলকাত্‌রা, অ্যামোনিয়া গ্যাস, ন্যাপ্‌থ্যালিন, ক্রিয়োজোট অয়েল, টলুইন, জাইলিন, বেঞ্জল প্রভৃতি রাসায়নিক পদার্থ। কোল গ্যাসকে ঠাণ্ডা করিয়া বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় এই সব মূল্যবান পদার্থগুলিকে পৃথক করা হয়। কয়লাকে অন্তর্ধূম পাতন করা হয় দুই রকম উদ্দেশ্যে। একটির মুখ্য উদ্দেশ্য হইল কোক কয়লা উৎপাদন করা। সে ক্ষেত্রে কোল গ্যাসটি গৌণ। ইহা তখন উপজাত পদার্থ বা বাই-প্রোডাক্ট।

ইস্পাত কারখানায় এই উদ্দেশ্য লইয়া কয়লার অন্তর্ধূম পাতন করা হয়। দ্বিতীয়টির মুখ্য উদ্দেশ্য হইল কোল গ্যাসের উৎপাদন। সেই ক্ষেত্রে কোক হইল গৌণ। যেমন দুর্গাপুরে বাংলা গভর্ণমেন্টের কোকওভেন প্রজেক্ট। এখানে কয়লার অন্তর্ধূম পাতনের দ্বারা কোল গ্যাস উৎপন্ন করা হয়। কোক কয়লা হয় উপজাত পদার্থ। ষ্টীল প্ল্যাণ্টে কোক এবং কোল গ্যাস উভয়েরই প্রয়োজন। কোকের প্রয়োজন ব্লাষ্ট ফার্ণেসে পিগ-লৌহ উৎপাদনে এবং ফাউণ্ড্রিতে আর কোল গ্যাসের প্রয়োজন হয় ওপেন হার্থ ফার্নেসে ইস্পাত গলাইবার কাজে। ইহা ছাড়াও এই গ্যাসের প্রয়োজন হয় শহরে আলো জ্বালাইবার কাজে, পারিবারিক রন্ধনের কাজে, লেবরেটরীতে বার্নার জ্বালাইবার কাজে। যে প্ল্যাণ্টে কোক উপজাত পদার্থ হিসাবে উৎপন্ন হয়, সেখানে কোককে বাজারে বিক্রয় করা ছাড়া অন্য পথ নাই।

অন্তর্ধূম পাতনের সময় যখন চুল্লী হইতে আর কোন গ্যাস নির্গত হয় না, তখনই বুঝিতে পারা যায়, কয়লা কোকে পরিণত হইয়াছে। ইহার পর চুল্লীর দরজা খুলিয়া কোক বাহির করিয়া লওয়া হয়। কোক বাহির করিবার প্রণালীটাও একটু বিচিত্র ধরণের। চুল্লীর সম্মুখে একখানা উন্মুক্ত ওয়াগন আনিয়া রাখা হয়। ইহার নাম Quenching car। পিছন দিক হইতে বৈদ্যুতিক হাতের সাহায্যে সেই বিশাল জ্বলন্ত অঙ্গারের স্তূপটিকে ধাক্কা দিয়া Quenching car-এর মধ্যে ফেলিয়া দেওয়া হয়। তার পর সেই জ্বলন্ত অঙ্গারকে ঝর্ণাধারার তলায় আনিয়া অগ্নি নির্বাপিত করা হয়। লক্ষ্য রাখা দরকার, যেন প্রয়োজনের অতিরিক্ত জল ব্যবহার না করা হয়। কোকের মধ্যে জলীয় বাষ্প 2-3 শতাংশের অতিরিক্ত না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। সেই ক্ষেত্রে ব্লাষ্ট ফার্ণেসে জটিলতার সৃষ্টি হয়।

ব্লাষ্ট ফার্ণেসে যে কোক ব্যবহার করা হয়, তাহার নির্দিষ্ট আকৃতি বা সাইজ আছে। $1\frac{1}{2}''$ হইতে 2" সাইজের কোক ব্যবহৃত হয়। বেশী

বড় বা বেশী ছোট আকারের কোক অসুবিধা-জনক। বড় বড় চাইকে ভাঙ্গিয়া সঠিক আকারে পরিণত করিতে গেলে কত কোক যে গুঁড়া হইয়া যায় এবং ফার্নেসে ব্যবহারের অনুপযোগী হয়, তাহা বলা যায় না। সেগুলি সস্তা দরে খোলা বাজারে বিক্রয় করা ছাড়া উপায় থাকে না। এক শত টন কয়লা হইতে কোক উৎপন্ন হয় 70-72 টন। খুব বেশী যদি হয় 74-75 টন; কারণ কয়লার মধ্যে বায়বীয় পদার্থই (আল-কাত্‌রা সমেত) থাকে 24-25শতাংশ।

কাজেই কোকের দাম স্বভাবতঃই বেশী। অতএব ইহার যতখানি সদ্ব্যবহার হয়, ততই ভাল। আজকাল সিন্টারিং প্ল্যান্টে কিছু কিছু কোককে কাজে লাগান হইতেছে। এক্ষেত্রে গুঁড়া কোকই উপযুক্ত।

ব্লাষ্ট ফার্নেসের জন্য নিয়োজিত কোকের আকার বা সাইজ ($1\frac{1}{2}''$-$2''$) ছাড়া আরও কয়েকটি গুণ থাকা প্রয়োজন। ব্লাষ্ট ফার্নেসে কোক, কঠিন লাল মাটি বা আয়রন ওর এবং চুনা পাথর বা লাইম ষ্টোনের সঙ্গে পাশাপাশি অব-স্থান করিয়া সুউচ্চ চুল্লীর মাথার উপর হইতে নীচের দিকে নামিতে থাকে। সুতরাং তাহাকে বিলক্ষণ উপরের চাপ এবং গড়াইয়া পড়িবার জন্য ঘর্ষণ-চাপ সহিতে হয়। সে ক্ষেত্রে কোক নরম প্রকৃতির হইলে অচল হইবে। উভয় প্রকার চাপের মধ্যে পড়িয়া কোক ভাঙ্গিয়া গুঁড়া গুঁড়া হইয়া পড়িবে এবং সেই সঙ্গে ফার্নেসের প্রক্রিয়াও শুরু হইয়া আসিবে। তাই কোক উৎপন্ন হইবার পর তাহার উপর কয়েকটি পরীক্ষা চালাইয়া তাহার উপযোগিতা হাতে-কলমে যাচাই করিয়া দেখা হয়। এই সব পরীক্ষার মধ্যে একটি হইল ড্রাম টেস্ট বা মাইকাম টেস্ট (Micam test)। ইহাকে এক প্রকার অ্যাব্রেসন টেষ্টও বলা চলে।

মাইকাম টেষ্ট করা হয় একটি বিদ্যুৎ-চালিত ড্রামের মধ্যে। ড্রামটি নির্দিষ্ট আকারের হওয়া চাই। তাহার আবর্তমান গতিবেগও নির্দিষ্ট হওয়া চাই (যেমন মিনিটে 100 বার)। ড্রামের মধ্যে 100 কিলোগ্র্যাম কোক বোঝাই করিয়া মুখ বন্ধ করিবার পর তাহাকে একটা নির্দিষ্ট সময় (পাঁচ মিনিট) পর্যন্ত বৈদ্যুতিক শক্তিতে একাদিক্রমে আব-র্তিত করা হয়। নির্দিষ্ট সময়ের পর ড্রামের আবর্তন থামাইয়া সব কোক বাহির করিয়া লওয়া হয়। তাহার পর $1\frac{1}{2}''$ ছাঁকনীর সাহায্যে ছাঁকা হয়। যদি 75 বা তদূর্ধ্ব ভাগ কোকের আকারে $1\frac{1}{2}''$ উপর থাকিয়া যায়, তাহা হইলে সেই কোক ফার্নেসের উপযোগী বলিয়া গণ্য হয়। 75 ভাগের কম হইলে কোক নরম বলিয়া বিবেচিত হয় এবং ফার্নেসের পক্ষে অনুপযুক্ত হয়। 75 শতাংশ হইল সর্বনিম্ন মান। ইহাকে নরম কোক বলা হয়। যে কোকের 80 শতাংশ $1\frac{1}{2}''$ বা তদূর্ধ্বে থাকে, তাহাকে মাঝারী প্রকৃতির কোক বলা হয়। আর যে কোকের 85 শতাংশ $1\frac{1}{2}''$ বা তদূর্ধ্বে থাকে তাহাকে কঠিন বা শক্ত কোক বলা হয়। ফার্নেসের পক্ষে মাঝারী প্রকৃতির কোকই সবিশেষ উপযোগী।

দ্বিতীয় পরীক্ষার নাম হইতেছে শ্যাটার টেষ্ট (Shatter test)। এই পরীক্ষা নির্দিষ্ট ওজনের কোককে 24 ফুট উচ্চ স্থান হইতে নীচে ফেলা হয়। অবশ্য 24 ফুট উচ্চ স্থান লেবরেটরীর মধ্যে পাওয়া সম্ভব নয় বলিয়া 6 ফুট উচ্চ স্থান হইতে চার বার নীচে ফেলিবার পর কোকগুলিকে $1\frac{1}{2}''$ ছাঁকনীর সাহায্যে চালা হয়। এই ক্ষেত্রে যদি 90 শতাংশের উপর কোক $1\frac{1}{2}''$ অথবা তদূর্ধ্বে হয়, তাহা হইলে কোক ফার্নেসের উপযোগী বলিয়া গণ্য হয়। উভয় পরীক্ষাতে শুধু $1\frac{1}{2}''$ বা তদূর্ধ্বের কোক ছাড়াই গুঁড়া কোক কতখানি উৎপন্ন হয়, তাহার পরিমাণও ছাঁকনীর সাহায্যে মাপিয়া দেখা হয়।

24 ফুট উচ্চ স্থান হইতে ফেলিবার কারণ হই-তেছে এই যে, ব্লাষ্ট ফার্নেসের মাথার উপর হইতে চার্জ যখন ভিতরে ঢালিয়া দেওয়া হয়, তখন সে মাল প্রায় 24 ফুট নীচে আসিয়া পড়ে। ফলে

কোকের গুঁড়া হইয়া যাইবার সম্ভাবনা অধিক। সেই জন্য স্যাটার টেষ্টটি 24 ফুট উচ্চ স্থান হইতে করা হয়।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, কোকের মধ্যে সালফার এবং ফস্ফরাসের আধিক্য অবাঞ্ছনীয়। কয়লা হইতেই এই দুইটি পদার্থ কোকে অনুপ্রবেশ করে। কোকের মধ্যে সালফার এবং ফস্ফরাস বেশী থাকিলে ব্লাষ্ট ফার্নেসে পিগ প্রস্তুত করিবার সময় পিগ লৌহ কোক হইতে ঐ দুইটি মৌলিক পদার্থ গ্রহণ করে। ফলে পিগের মধ্যে ঐ দুইটি পদার্থের পরিমাণ বেশী হইলে পিগের দ্বারা অ্যাসিড ইস্পাত প্রস্তুত করা সম্ভব হয় না। অ্যাসিড ইস্পাতে (যে ইস্পাত অ্যাসিড ফার্নেস হইতে প্রস্তুত হয় তাহাকে অ্যাসিড ইস্পাত বলে) ঐ দুইটি মৌলিক পদার্থের পরিমাণ খুব কম থাকে। কোকের মধ্যে জলীয় বাষ্পের আধিক্যও অবাঞ্ছনীয়। এই পদার্থটির পরিমাণ তিন শতাংশের বেশী না হওয়াই উচিত। চুল্লী হইতে নির্গত জ্বলন্ত কোকের আগুন যখন ঝর্ণার জলধারার সাহায্যে নির্বাপিত করা হয়, তখনই জলীয় বাষ্প উহার মধ্যে আট্কা পড়ে। ব্লাষ্ট ফার্নেসে কোক হইতে এই জলীয় বাষ্প নির্গত হইয়া ফার্নেসের তাপ শোষণ করিবার ফলে ফার্নেসের তাপ কমিয়া যায়। সুতরাং কোকের পরিমাণ বাড়াইয়া এই তাপের ভারসাম্য রক্ষা করিতে হয়। এই জন্য উৎপাদন খরচাও বাড়িয়া যায়। সেই জন্য কোয়েঞ্চিং কারে যখন জ্বলন্ত কোক ঠাণ্ডা করা হয়, তখন যাহাতে অল্প পরিমাণ জল ব্যবহার করা হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখা বিশেষ প্রয়োজন।

কোকের ছাই সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। কোকের ছাই যত কম হয়, ততই ভাল। ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে কয়লার ছাইয়ের পরিমাণ কম। কিন্তু আমাদের দেশে এই পরিমাণ খুব বেশী—16-18 শতাংশেরও বেশী। এই সকল কয়লা হইতে কোক প্রস্তুত হইলে প্রায় 24-25 শতাংশ বায়বীয় পদার্থ নিষ্কাশনের পর ছাইয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় 20-21 শতাংশে। কয়লার শ্রেণী অনুসারে সব সময় এই মান রাখাও দায়। সেই ক্ষেত্রে লৌহ প্রস্তুতে কোকের পরিমাণ লাগে বেশী। এক টন লৌহ উৎপাদনে লাল মাটির প্রয়োজন প্রায় 1·5 টন, কোকের প্রয়োজন প্রায় 0·8 টন। কিন্তু সময় সময় এই পরিমাণ গিয়া দাঁড়ায় এক টনে। সেই ক্ষেত্রে লৌহ উৎপাদনের খরচা অনেক বাড়িয়া যায়।

ছাইয়ের আর একটা প্রয়োজনীয় গুণ হইল তাহার গলনাঙ্ক (Ash fusion temperature)। এই গলনাঙ্ক যত উচ্চ তাপের হয়, ততই ভাল। ছাইয়ের মধ্যে প্রধানতঃ থাকে সিলিকা এবং অ্যালুমিনা (Al_2O_3), একটা অপরটার প্রায় দ্বিগুণ। ইহা ছাড়া থাকে কিছু ম্যাগ্নেসিয়া, কিছু লৌহ অক্সাইড। লৌহের অক্সাইড বেশী থাকিলে ছাইয়ের রং হয় লাল্চে এবং ইহার গলনাঙ্কও কম হয়। সেই ক্ষেত্রে ফার্নেসের তাপে ছাই যদি গলিয়া যায়, তাহা হইলে কোক ঝামার আকার ধারণ করে এবং লৌহ উৎপাদনে বিঘ্ন ঘটায়। সুতরাং ছাইয়ের গলনাঙ্ক বেশী হওয়াই বাঞ্ছনীয়, অন্ততঃ 1600° ডিগ্রীর কাছাকাছি হওয়াই ভাল।

বিজ্ঞান-সংবাদ

বৃহস্পতি গ্রহের সন্ধানে

মার্কিন মহাকাশ সংস্থা বৃহস্পতি গ্রহটির বিষয় অনুসন্ধানের জন্যে পরিকল্পনা প্রস্তুত করছে। ক্যালিফোর্ণিয়ার রেডণ্ডো বীচের টি আর. ডব্লিউ. ইনকরপোরেটেডের সঙ্গে সম্প্রতি এই সম্পর্কে এক চুক্তি হয়েছে। চুক্তি অনুসারে এই সংস্থাটি 1972-'73 সালে বৃহস্পতি গ্রহের অভিমুখে উৎক্ষেপণের জন্যে দুটি উন্নত ধরণের মহাকাশযান নির্মাণ করবে। এই মহাকাশযানে কোন আরোহী থাকবে না। এই মহাকাশযান দুটির নাম দেওয়া হয়েছে—পায়োনীয়ার-এফ ও পায়োনীয়ার-জি। এরাই বৃহস্পতির প্রথম ক্লোজআপ ছবি তুলবে। বৃহস্পতি সৌরজগতের বৃহত্তম গ্রহ। মঙ্গল ও বৃহস্পতির মধ্যে যে গ্রহাণুপুঞ্জ রয়েছে, সেগুলির পর্যবেক্ষণ এবং বৃহস্পতির পরিবেশ ও আবহমণ্ডলের সন্ধানও এই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত। এই পরিকল্পনার আর একটি উদ্দেশ্য হলো শনি, ইউরেনাস, নেপচুন ও প্লুটো প্রভৃতি দূরবর্তী গ্রহগুলিতে পৌঁছাবার জন্যে কৌশল উদ্ভাবন।

আখের ছোব্ড়া থেকে গৃহনির্মাণের উপাদান

বৃটেনে আখের ছোব্ড়াকে কাজে লাগাবার এক নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে। এর ফলে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে গৃহ-নির্মাণের উপাদান সস্তায় পাওয়া যাবে।

লণ্ডনের ফার্ম চার্লস রাইট ডেভেলপমেন্টস্ লিমিটেডের মিঃ সি. রাইট পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, আখের ছোব্ড়ার (Bagasse) সঙ্গে অল্প পরিমাণ Propionic acid মিশ্রিত করলে জৈব কণিকাগুলি (বা শ্রমিকদের মধ্যে ব্যাগাসোসিস রোগ সৃষ্টি করে ও সংরক্ষিত ব্যাগাসির ক্ষতিসাধন করে) একই রকম থেকে যায়।

মিঃ রাইট ব্যাগাসোসিস রোগ বরণ করে নিয়ে এই রোগের কারণ জৈব কণিকাগুলিকে আলাদা করতে সাহায্য করেন। ত্রিনিদাদে পরিচালিত পরবর্তী পরীক্ষায় ব্যাগাসির উপর প্রোপিয়োনিক অ্যাসিডের কাজ ধরা পড়ে। এই পরীক্ষা চালান মিঃ রাইট ও বি. পি. কেমিক্যালস্।

এই নতুন উপাদান সম্পর্কে বি. পি. কেমিক্যালস্ বলেন—পৃথিবীর অল্প-অগ্রসর দেশগুলিতে এই প্রথম একটি স্বল্প ব্যয়ের সর্বার্থসাধক গৃহ-নির্মাণের উপাদান পাওয়া যাবে।

তাঁরা আরও বলেন যে, এপর্যন্ত শিল্পে অতি অল্প পরিমাণে আখের ছোব্ড়া কাজে লাগানো হয়েছে (যেমন—ভারত, দক্ষিণ আমেরিকা, তাইওয়ান এবং যুক্তরাষ্ট্রে ফাইবার বোর্ড তৈরির কাঁচামাল হিসাবে)। কিন্তু এটি চিপ বোর্ড, হার্ড বোর্ড, গ্যালভানাইজ্ড রুফ, সফ্ট উড, কার্ডবোর্ড এবং থার্মোসেটিং প্লাষ্টিক প্রভৃতি তৈরির এক আশ্চর্য স্বল্পমূল্যের বিকল্প উপাদান হিসাবে গণ্য হবার যোগ্যতা রাখে।

ইঁদুরের বংশনাশের অভিনব পন্থা

বন্ধ্যাত্ব সৃষ্টি করে কীট-পতঙ্গ ধ্বংস করবার অভিনব পদ্ধতি আমেরিকা এবং পৃথিবীর অন্যান্য রাষ্ট্রে প্রয়োগ করা হচ্ছে। ফলভুক কীট-পতঙ্গের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি খুবই ফলপ্রসূ হয়েছে। ইঁদুর প্রভৃতি নির্মূল করবার জন্যেও বিভিন্ন দেশে এই অভিনব পদ্ধতি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে।

আমেরিকার মিশিগান রাজ্যের আপজন কোম্পানীর ডাঃ আর. জে. ডিকিনসন এবং নোয়েল ডিকোনর এই বিষয় নিয়ে গবেষণা করছেন। তাঁরা পুরুষ ইঁদুরকে ক্লোরো হাইড্রিনস নামে এক প্রকার রাসায়নিক দ্রব্য খাইয়ে দেখেছেন যে, এতে পুরুষ ইঁদুরগুলি চিরকালের জন্যে বন্ধ্যা হয়ে গেলেও তারা যৌন আবেগ হারায় না। তাদের সঙ্গে স্ত্রী-ইঁদুরের মিলনে মিথ্যা গর্ভসঞ্চারও হয়ে থাকে। ঐ সময়ে স্ত্রী-ইঁদুরেরা অন্য পুরুষ ইঁদুরদের কাছেও ঘেঁসতে দেয় না। এর ফলে নতুন ইঁদুরের সংখ্যা ক্রমেই কমে আসবে এবং এভাবেই এদের নির্মূল করা সম্ভব হবে।

এই রাসায়নিক উপাদানটি এখনও বাজারে ছাড়া হয় নি। কারণ এখনও এই বিষয়ে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা বাকী রয়েছে।

অতি শক্তিশালী ভিটামিন-ডি

যুক্তরাষ্ট্রের উইসকনসিন বিশ্ববিদ্যালয়ের জৈব রসায়ন-বিজ্ঞানীরা সুপার ভিটামিন-ডি নামে এক ধরণের অতি শক্তিশালী ভিটামিন আবিষ্কার করেছেন। এই সকল বিজ্ঞানীদের অন্যতম হেক্টর এফ. ডি. লিউকা বলেছেন, শিশুদের রিকেট রোগ এবং ঐ ধরণের অস্থি-সংক্রান্ত রোগ প্রতিরোধ ও নিরাময়ে সাধারণ ভিটামিন-ডি-এর তুলনায় সুপার ভিটামিন-ডি 40 গুণ বেশী কার্যকরী হয়ে থাকে। তিনি এই প্রসঙ্গে আরও বলেছেন যে, এই আবিষ্কারের ফলে পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ লোক, যারা অস্থিসংক্রান্ত রোগে ভুগছে, তারা খুবই উপকৃত হবে।

কারবাইন

প্রাকৃতিক সৃষ্টি নয় এবং এই গ্রহে পাওয়া যায় না, এমন এক জাতের উচ্চ আণবিক যৌগিক-পদার্থ (High Molecular Compound) সোভিয়েট বিজ্ঞান অ্যাকাডেমীর লেবরেটরীতে নির্মিত হয়েছে।

অঙ্গারের প্রাকৃতিক রূপ তিনটি—কয়লা, হীরক ও গ্র্যাফাইট। সাধারণ পেন্সিলের শীস আর হীরকের মত উজ্জ্বল পদার্থ একই অণু দিয়ে তৈরি। তবে তাদের গুণের পার্থক্য নির্ভর করে অণুর গঠনের উপর। এই গঠনের পরিবর্তন হলেই গ্র্যাফাইট হীরক হয়ে যায়। অত্যধিক উত্তাপ ও প্রচণ্ড চাপে এই গঠন বদ্‌লানো যায়।

তবে কয়লা, হীরা ও গ্র্যাফাইটের বাইরে অঙ্গারের রূপ আছে কি? এ. স্লাডকভের 1964 সালের এই প্রকল্পটি সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা গবেষণার দ্বারা সত্য বলে প্রমাণ করেছেন এবং বিজ্ঞানীরা তার নাম দিয়েছেন কারবাইন। বিজ্ঞানী ডি. কোরশাক, এ স্লাডকভ এবং ওয়াই. কুদ্রিয়াভসেভ এই পদার্থটি তৈরির কাজে লিপ্ত ছিলেন।

কারবাইন কালো গুঁড়ার মত পদার্থ। পৃথিবীতে এই পদার্থটি নেই, তবে অন্য কোন গ্রহে থাকা সম্ভব। গ্র্যাফাইট ও কারবাইন মিশিয়ে খুব শক্তিশালী ইস্পাত তৈরি সম্ভব হবে। বৈজ্ঞানিক গবেষণার দিক থেকেও এই অঙ্গারটি খুবই প্রয়োজনীয়। এই আবিষ্কারের ফলে বিজ্ঞানের এক নতুন শাখা উন্মুক্ত হয়েছে।

পুস্তক পরিচয়

প্রাচীন ভারতের গণিতচিন্তা : রমাতোষ সরকার

প্রকাশক র‍্যাডিক্যাল বুক ক্লাব, 6 কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা-12, দাম 4 টাকা।

সুপ্রাচীন কাল থেকে ভারতে গণিতচর্চা প্রচলিত। প্রাক্‌বৈদিক যুগে মহেঞ্জোদড়ো-হরপ্পার সুপ্রাচীন ভারতীয়েরা কেমন জীবনের সহজ ও সাধারণ প্রয়োজনের দাবিতে পাটিগণিত, জ্যামিতি, জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রাথমিক জ্ঞানার্জন করেছিলেন, বৈদিক যুগে তেমনি জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে গণিতশাস্ত্র এক বিশিষ্ট মর্যাদার আসন গ্রহণ করেছিল, আর বেদোত্তর যুগে গণিতশাস্ত্র সহ বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছিল। আলোচ্য গ্রন্থে এই তিনটি যুগ-পর্যায়ে প্রাচীন ভারতের গণিতচিন্তা সম্পর্কে লেখক নিপুণভাবে আলোচনা ও বিশ্লেষণ করেছেন। নিরপেক্ষ ও সত্যনিষ্ঠ মন নিয়ে তিনি সব কিছু বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর আলোচনায় 'সবই ব্যাদে আছে'—জাতীয় মনোভাব যেমন দেখা যায় নি, অপর দিকে তেমনি উগ্র ভারতবিদ্বেষী মনোভাবও নেই। একারণে সত্যসন্ধানী সাধকের কাছে তাঁর আলোচনার আকর্ষণ বিশেষভাবে অনুভূত হবে। লেখক গ্রন্থটি প্রতিটি যুগের সামাজিক, রাজনৈতিক অবস্থা পর্যালোচনা করবার সঙ্গে গণিতচর্চার কাহিনী এবং প্রধান প্রধান গণিতজ্ঞ ও গণিতগ্রন্থের পরিচয় মনোজ্ঞভাবে বিবৃত করেছেন। দশমিক স্থানীয় মান, অঙ্কপাতন পদ্ধতি ও শূন্য আবিষ্কারের কাহিনী, সূর্যসিদ্ধান্ত, লীলাবতী গ্রন্থের বিবরণ এবং আর্যভট্ট, ভাস্করাচার্য প্রভৃতি প্রাচীন ভারতীয় গণিতজ্ঞদের পরিচয় পাঠকমাত্রকেই আকৃষ্ট করবে।

লেখকের রচনাশৈলী মনোজ্ঞ, ভাষা সহজ ও সাবলীল। তিনি যে বহু পরিশ্রম ও গভীরভাবে চিন্তা করে আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন, তার পরিচয় এই গ্রন্থের সর্বাংশে পরিস্ফুট। কয়েকটি চিত্র থাকায় গ্রন্থের মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। ছাপা ও মুদ্রণ পরিস্ফুট প্রশংসনীয়। বইটি পাঠকমহলে সমাদৃত হবে বলেই আমরা মনে করি।

সমাজ ও কারিগর : শ্রীঅমূল্যধন দেব

প্রকাশক মনীষা গ্রন্থালয়, 4/3 বি বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-12। দাম 3 টাকা।

লেখক পেশায় একজন ইঞ্জিনীয়ার, নেশায় একজন লেখক। কর্মজীবনে বহু বছর কারিগরদের সাক্ষাৎ সংস্পর্শে এসে যে অভিজ্ঞা অর্জন করেছেন, তারই প্রতিফলন এই গ্রন্থে আছে। আমাদের কারিগরেরা তাঁদের স্বাধিকার অর্জন করবার জন্যে উপযুক্ত জ্ঞানের অধিকারী হোন, যাতে তাঁরা পরমুখাপেক্ষী না হয়ে নিজেরাই নিজের ভালমন্দ বুঝতে পারেন—এই উদ্দেশ্য নিয়ে লেখক আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারের বহু যুবক—যাঁরা কারিগরী বৃত্তি গ্রহণ করেছেন, এই বইটি পড়ে বিশেষ লাভবান হবেন। লেখকের ভাষা সাবলীল, বইটির ছাপা ভাল।

র. ব.

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

জুলাই — 1970

ত্রয়োবিংশ বর্ষ — সপ্তম সংখ্যা

শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের **Dr. Albert Crewe** তাঁর উদ্ভাবিত অতি শক্তিশালী ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে থোরিয়াম অণুর মধ্যে একক পরমাণুর আলোকচিত্র গ্রহণে সর্বপ্রথম সক্ষম হয়েছেন। চিত্রে ছোট সাদা ফুটকিগুলি হচ্ছে একক থোরিয়াম পরমাণু।

পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব

পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব প্রায় নয় কোটি তিরিশ লক্ষ মাইল বা পনেরো কোটি কিলোমিটারের মত। এই ধরণের ব্যবধান আমরা কল্পনায় ঠিকমত আনতে পারি না। কারণ এই দূরত্বটা এমনই প্রকাণ্ড যে, আমাদের সাধারণ চিন্তাধারায় ওটা অসীম বলেই মনে হয়। তবে কয়েকটা সাধারণ কাল্পনিক ঘটনা দিয়ে এই দূরত্বটা উপলব্ধি করা যেতে পারে ; যেমন—বর্তমানে একটি এরোপ্লেনের গতিবেগে ঘণ্টায় 500 মাইল বা 800 কি. মি.। এই গতিবেগে যদি কেউ পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে সূর্যের দিকে ছুটে যায়, তবে তার সূর্যপৃষ্ঠে পৌঁছুতে সময় লাগবে একুশ বছর। অথবা ঘণ্টায় 5000 মাইল বেগে ছুটে-চলা কোন রকেটে চড়ে যাদ ঐ পথ অতিক্রম করা হতো, তবে পৃথিবী থেকে সূর্যপৃষ্ঠে পৌঁছুতে সময় লাগতো দু-বছর দু-মাস—যেখানে ঐ রকেটে চড়ে চাঁদে যেতে সময় লাগবে মাত্র দু-দিন। কামানের মুখ থেকে একটা গোলা বেরোবার সময় যে গতি লাভ করে, সেই গতিতে ক্রমাগত ছুটে গেলে সূর্যে পৌঁছুতে তার সময় লাগবে নয় বছর। শব্দের গতিতে ছুটে গেলে পৃথিবী থেকে সূর্যে পৌঁছুতে সময় লাগবে চৌদ্দ বছর। তবে আলোক-তরঙ্গ বা বেতার-তরঙ্গের গতিবেগ সেকেণ্ডে 186000 মাইল বা 300000 কি. মি. হওয়ায় আলো বা বেতার-তরঙ্গের সূর্য থেকে পৃথিবীতে আসতে সময় লাগবে মাত্র আট মিনিট। আমেরিকান জ্যোতিবিদ চার্লস ইয়াং পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্বটা একটা চমৎকার ঘটনার সাহায্যে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। Helmholtz প্রমুখ বিজ্ঞানীরা পরীক্ষার সাহায্যে দেখিয়েছেন যে, দেহের কোন স্থানের অনুভূতির স্নায়ুতন্ত্র দিয়ে মস্তিষ্কের দিকে ছুটে চলবার বেগ হলো সেকেণ্ডে 100 ফুট বা দিনে 1637 মাইল। সুতরাং যদি কোন মানুষের এমন একটি বিরাট হাত থাকে, যেটি সূর্য পর্যন্ত পৌঁছুতে পারে, তবে সেই হাত সূর্যে ঠেকাবার সঙ্গে সঙ্গেই পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। এখন ওর দেহের স্নায়ুতন্ত্র দিয়ে ঐ পুড়ে-যাওয়া হাতের জ্বালা-যন্ত্রণা আসতে সময় লাগবে দেড়-শ' বছর। কাজেই তার আগেই লোকটির মৃত্যু ঘটলে ঐ যন্ত্রণা সে আর উপলব্ধিই করবে না।

পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব একটা মডেল থেকেও উপলব্ধি করা যেতে পারে। এই মডেলে যদি পৃথিবীটাকে ধরা যায় এক মিলিমিটার ব্যাসের একটি সর্ষের দানা, তবে সূর্যের ব্যাস হবে দশ সেন্টিমিটার ব্যাসের একটা গোলাকার বল। এই মডেলে সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব হবে দশ মিটারের মত ; অর্থাৎ একটা প্রকাণ্ড হল ঘরের এক কোণে থাকবে সূর্যস্বরূপ বলটি এবং ঘরের বিপরীত কোণে থাকবে পৃথিবীস্বরূপ সর্ষের দানাটি। মনে রাখতে হবে, এই মডেলে 1/4 মি. মি. ব্যাসের চাঁদ বসবে পৃথিবী অর্থাৎ সর্ষের দানা থেকে মাত্র তিন সেন্টিমিটার দূরে। আর একটা ঘটনা দিয়েও সূর্য থেকে

পৃথিবীর দূরত্ব উপলব্ধি করা যেতে পারে। যেমন কলিকাতা থেকে মোগলসরাই—এই চার-শ' মাইল দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট একটি মাকড়সার জালের সূক্ষ্মতম তন্তুর ওজন যদি 10 গ্র্যাম ধরা হয়, তবে পৃথিবী থেকে চাঁদ পর্যন্ত ঐ সূক্ষ্মতম তন্তুর ওজন হবে ছয় কিলোগ্র্যামের মত। আর পৃথিবী থেকে সূর্য পর্যন্ত বিস্তৃত ঐ তন্তুর ওজন হবে 2·3 টন। এথেকেই বোঝা যাচ্ছে, পৃথিবী সূর্যের খুব কাছে নেই। এখন উপরের এই উদাহরণগুলি থেকে সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব মোটামুটি আন্দাজ করা যায়। কিন্তু কথা হলো, এই প্রকাণ্ড দূরত্বটা বিজ্ঞানীরা উপলব্ধি করলেন কেমন করে? কিভাবে তাঁরা জানলেন, পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব নয় কোটি তিরিশ লক্ষ মাইল বা পনেরো কোটি কিলোমিটার?

পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব পরিমাপের যে বিভিন্ন পদ্ধতিগুলি অনুসরণ করা হয়, তার মধ্যে প্রথমটি হলো জরিপ পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে পৃথিবীপৃষ্ঠের উপর দুটি বিন্দু A

B S A
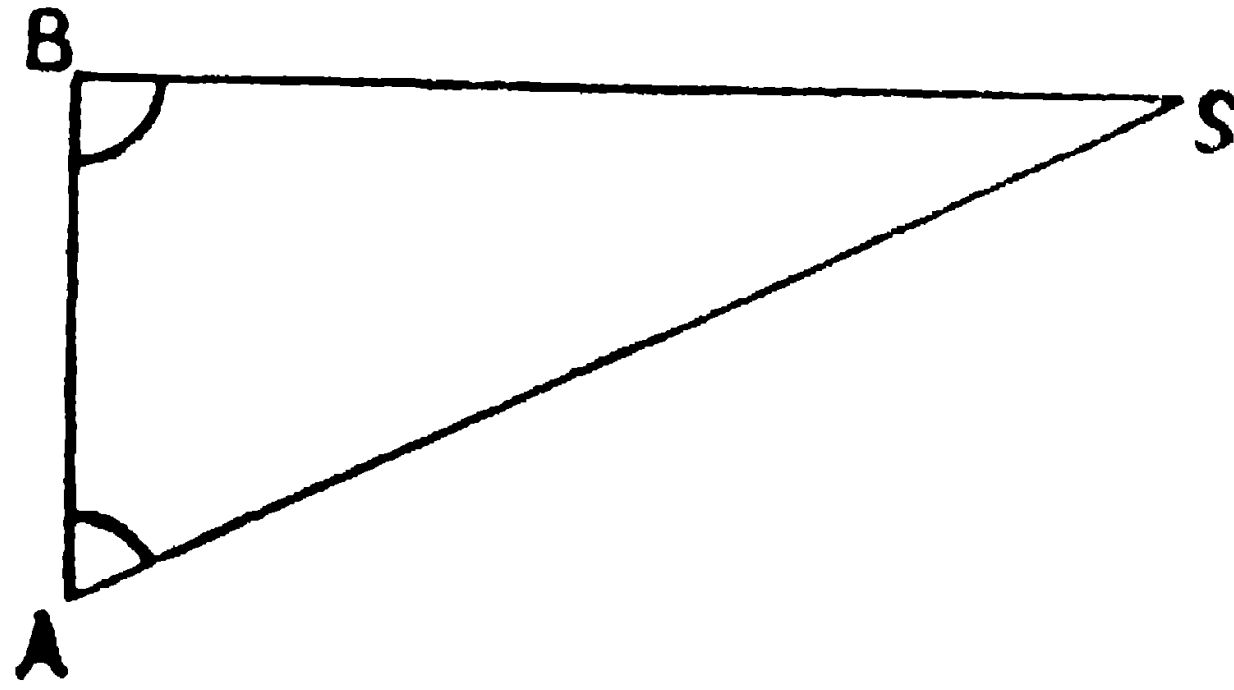
1নং চিত্র

এবং B স্থির করে AB ভূমিরেখা মনোনীত করা হয় (1নং চিত্র)। S বিন্দুতে সূর্যের অবস্থান হলে A কোণ এবং B কোণ পরিমাপ করে S কোণ নির্ণয় করা হয়। এখন যেহেতু AB ভূমিরেখার দূরত্ব জানা আছে, সেহেতু ত্রিকোণমিতির সাহায্যে SB এবং SA-এর দূরত্ব নির্ণয় করা হয়। এই পদ্ধতির নির্ভুলতা নির্ভর করে AB ভূমিরেখার দৈর্ঘ্যের উপর। AB রেখার দৈর্ঘ্য যত বেশী হবে, সূর্যের দূরত্ব তত নির্ভুলভাবে পরিমাপ করা যাবে। এখন পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব পরিমাপের ক্ষেত্রে যদি পৃথিবীর ব্যাস (12755·9 কি. মি.) ভূমিরেখা হিসাবে ধরা হয়, তবে S কোণের মান হবে মাত্র 17·6 সেকেণ্ড অর্থাৎ এক ডিগ্রীর প্রায় 1/210 ভাগ। এর অর্ধকোণকে সৌর-লম্বন (Solar parallax) বলে। একটি দ্বিগুণ সৌর-লম্বন সৃষ্টি হয় এক মিটার দূরে রাখা একটি চুলের দ্বারা। এত ছোট কোণ নির্ভুলভাবে পরিমাপ করা সম্ভব নয়। যদি পরিমাপে 0·1 সেকেণ্ড কোণের তারতম্য ঘটে, তবে সৌর দূরত্বের ক্ষেত্রে বহু লক্ষ মাইলের পার্থক্য ঘটবে। সুতরাং এই পদ্ধতিতে সূর্যের দূরত্ব সঠিকভাবে নির্ণয় করা কখনও সম্ভব নয়।

এই কারণে জ্যোতির্বিদেরা বিকল্প উপায়ে সূর্যের দূরত্ব পরিমাপ করে থাকেন। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান থেকে শুক্র গ্রহের সূর্যথালাটি অতিক্রম করবার সময় নির্ণয় করা হয়।

এটা সৌর-লম্বন নির্ধারণের সহায়তা করে। কিন্তু শুক্র গ্রহের সূর্যথালা অতিক্রম করা অর্থাৎ সূর্য, শুক্র ও পৃথিবীর এক সরলরেখায় আসা একটি দুর্লভ ঘটনা। শুক্র গ্রহের সূর্যথালা অতিক্রম করবার শেষ যুগ্ম বছর হলো 1874 এবং 1882 খৃষ্টাব্দ। এরপর এই ঘটনা ঘটবে 2004 খৃষ্টাব্দের 8ই জুন এবং 2012 খৃষ্টাব্দের 6ই জুন। এই সময়ের ব্যবধান থেকে বোঝা যায়, এই পদ্ধতিতে সূর্যের দূরত্ব খুব ঘন ঘন যাচাই করে দেখবার উপায় নেই।

পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব নির্ণয়ের আধুনিকতম সহজ উপায় হলো স্পেকট্রোস্কোপ-পদ্ধতি (Spectroscopic method)। 2নং চিত্রে S হলো সূর্য এবং পৃথিবীর কক্ষপথে
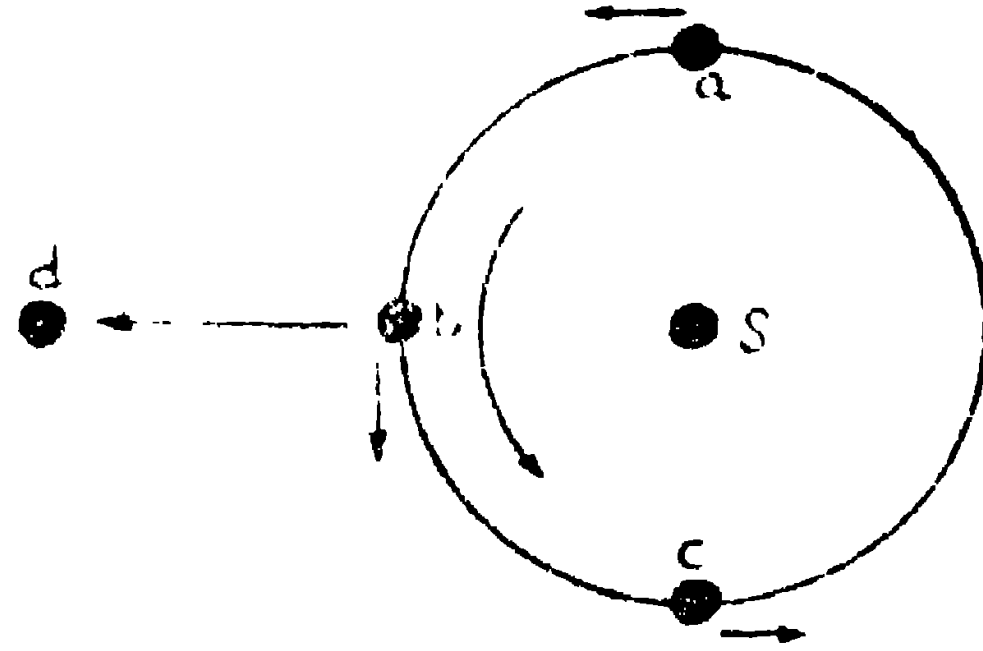
2নং চিত্র

a, b এবং c হলো পৃথিবীর তিনটি বিভিন্ন অবস্থান। d হলো দূরবর্তী একটি নক্ষত্রের অবস্থান। এখন স্পেকট্রোস্কোপ-পদ্ধতিতে কেবলমাত্র দৃষ্টিপথের রেখা বরাবর বেগের উপাংশ পরিমাপ করা যায়। পৃথিবী যখন b স্থানে থাকে, তখন নক্ষত্রের বেগ পরিমাপ করা হয়। লম্বভাবে ক্রিয়াশীল পৃথিবীর বেগ এই অবস্থায় নক্ষত্রের বেগের কোন তারতম্য ঘটায় না। কিন্তু পৃথিবী যখন a স্থানে অবস্থান করে, তখন নক্ষত্রের বেগ এবং পৃথিবীর বেগের অন্তর ফল এবং পৃথিবীর c অবস্থানে নক্ষত্রের বেগ এবং পৃথিবীর বেগের যোগফল পরিমাপ করা হয়। b অবস্থানে প্রাপ্ত নক্ষত্রের বেগ a অথবা c অবস্থানে প্রাপ্ত বেগের পার্থক্য থেকে পৃথিবীর বেগ নির্ণয় করা হয়। এই পদ্ধতিতে পাওয়া যায় কক্ষপথে পৃথিবীর ছুটে চলবার বেগ 29·7 কি. মি./সে.। এক বছরে যত সেকেণ্ড হয়, সেই সংখ্যা দিয়ে এই বেগ গুণ করে পৃথিবীর কক্ষপথের পরিসীমা নির্ণয় করা হয়। ঐ পরিসীমাকে $(2\times\frac{22}{7})$-এর দ্বারা ভাগ করে পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব নির্ভুলভাবে মাপা হয়। এই পদ্ধতিতে প্রাপ্ত পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্বের মান হলো $(1495\pm2)\times10^5$ কিলোমিটার।

গিরিজাচরণ ঘোষ*

* পদার্থবিদ্যা বিভাগ, বিদ্যাসাগর কলেজ, কলিকাতা-6

করাতের গুঁড়া থেকে কোক

অনেক জিনিষই আমরা কাজে লাগাই না বলে ফেলে দিই বা কাজ শেষে সেগুলির কোন দাম আছে বলে মনে করি না।

এভাবে অবহেলা করে ফেলে দেওয়া অতি তুচ্ছ নগণ্য জিনিষ থেকে কিভাবে সহজে ও অল্প খরচে প্রয়োজনীয় জিনিষ তৈরি করা যায়, তা নিয়ে পৃথিবীর সব দেশের বিজ্ঞানীরাই চেষ্টা করে চলেছেন। বেশ কয়েকটি প্রয়োজনীয় জিনিষও আমরা পেয়েছি এসব গবেষণার ফলে।

সম্প্রতি সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা এমনি এক তুচ্ছ জিনিষ—করাতের গুঁড়া (Saw dust) থেকে কোক তৈরি করে সকলকে অবাক করে দিয়েছেন। গোর্কীর সেন্ট্রাল রিসার্চ টিম্বার অ্যাণ্ড কেমিক্যাল ইনষ্টিটিউটে এই করাতের গুঁড়া থেকে কোক তৈরি করবার পরীক্ষাটি সফল হয়েছে।

সাধারণতঃ কোক তৈরি করা হয়, বায়ুবদ্ধ পাত্রে কয়লাকে অন্তর্ধূম পাতনের (Destructive distillation) দ্বারা। এই প্রক্রিয়ায় হাল্‌কা ও কালো রঙের যে কঠিন পদার্থ পাওয়া যায় তাকেই কোক বলে। কোক প্রধানতঃ ধাতুনিষ্কাশন ও রান্নার কাজে ব্যবহার করা হয়।

করাতের গুঁড়া কয়েকটি জৈব পদার্থের সঙ্গে মিশিয়ে মিশ্রণটিকে সেপারেসন, ড্রাইং ও মিক্সিং প্রভৃতি কয়েকটি সহজ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে 500-750 কে. জি প্রতি বর্গসেন্টিমিটার চাপে রেখে দিলে তাথেকে ছোট ছোট কোকের ব্লক তৈরি হয়। এই ব্লকগুলিকে বলে ব্রিকোয়েট (Briquette)। কাঠের বাতিলকরা তরল অংশ, রাসায়নিক কারখানার বাতিল তরল পদার্থ বা তৈল, শোধনাগারের শুক্‌নো বাতিলকরা জিনিষ জৈব পদার্থ হিসেবে রাশিয়ার বিজ্ঞানীরা ব্যবহার করেছেন।

এভাবে তৈরি করা কোকে কাঠকয়লা থেকে ঘনত্ব, রোধ ও প্রতি একক আয়তনে কার্বনের পরিমাণ বেশী আছে। কাঠের গুঁড়া ও কাঠের কারখানায় ফেলে দেওয়া জিনিষ ও কলকারখানায় বাতিল জিনিষ মিশিয়ে যে কোক তৈরি করা হয়, তার খরচ পড়ে খুবই কম, অথচ কাজের দিক থেকে তা খুবই উন্নত ধরণের।

এই প্রক্রিয়া চলবার সময় উপজাত পদার্থ হিসেবে রেজিন পাওয়া যায়। কাঠের কাজ ও অন্যান্য কাজেও এই রেজিন নামমাত্র খরচায় সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহার করা

গেছে। রেজিন হলো কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের একটি যৌগ। রাশিয়ার বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন—করাতের গুঁড়াও নগণ্য নয়, তাথেকে পাওয়া যায় কোক।

তোমাদেরও কোন জিনিষই অবহেলার চোখে দেখা উচিত নয়। কারণ বিজ্ঞানীরা এভাবেই ফেলে দেওয়া জিনিষ থেকে কাজের জিনিষ তৈরি করে চলেছেন।

শ্রীঅজয় গুপ্ত

শব্দের ব্যবহার

তোমরা হয়তো শব্দ সম্পর্কে অনেক কিছু পূর্বেই জেনেছ। শব্দের বিভিন্ন ধরণের ব্যবহার কেমন করে এবং কোথায় কোথায় হচ্ছে, এখানে সেই সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করবো। প্রথমেই শব্দের প্রতিফলনকে কি কাজে লাগাতে পারা যায়—সে সম্বন্ধে বলছি। তোমরা চোঙাকৃতি মেগাফোনের নাম শুনেছ এবং কেউ কেউ দেখেও থাকবে। এই মেগাফোনের সাহায্যে শব্দ খুব জোরে শোনা যায়। কিন্তু কেমন করে? বক্তা যখন যন্ত্রের ক্ষুদ্র মুখ দিয়ে কথা বলে, তখন শব্দ ঐ মেগাফোনের ভিতরকার গায়ে বারবার প্রতিফলিত হয়। ফলে তরঙ্গগুলি বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে না পড়ে একটি নির্দিষ্ট দিকে প্রবাহিত হয়। তাই নির্গত শব্দের মাত্রাও খুব জোরালো হয় এবং অনেক দূর পর্যন্ত বেশ পরিষ্কার শোনা যায়। প্রতিফলনের আরও অনেক ব্যবহার আছে। যেমন—শব্দের প্রতিধ্বনিকে কাজে লাগিয়ে সমুদ্রের গভীরতা নির্ণয় করা যায়। সমুদ্রের গভীরতা মাপবার জন্যে হাইড্রোফোন নামে শব্দগ্রাহী যন্ত্রকে জলের ভিতরে রাখা হয়। বিস্ফোরণের সাহায্যে শব্দ সৃষ্টি করে সেই শব্দকে সমুদ্রের তলদেশ থেকে প্রতিফলিত হয়ে আসতে দেওয়া হয়। হাইড্রোফোন ধ্বনি ও প্রতিধ্বনির মধ্যে সময়ের ব্যবধান স্বয়ংক্রিয় বৈদ্যুতিক যন্ত্রের সাহায্যে লিপিবদ্ধ করে। তারপর সমুদ্র-জলে শব্দের বেগ এবং সময়ের ব্যবধান হিসাব করে সমুদ্রের গভীরতা নির্ণয় করা হয়। সমুদ্র-বক্ষে জাহাজ থেকে চোরা পাহাড় বা হিমশৈলের দূরত্ব নির্ণয় করবার জন্যেও প্রতিধ্বনির সাহায্য নেওয়া হয়। এই প্রতিধ্বনি যদি শব্দ সৃষ্টি করবার 10 সেকেণ্ড পরে শোনা যায়, তবে বুঝতে হবে চোরা পাহাড় বা হিমশৈল জাহাজ থেকে এক মাইল দূর আছে; কেন না, শব্দ-তরঙ্গ 5 সেকেণ্ডে এক মাইল বিস্তার লাভ করে। এভাবে কামান-গর্জনের প্রতিধ্বনির অনুসরণ করে প্রথম মহাযুদ্ধে জার্মেনী ফ্রান্সের প্রভূত ক্ষতিসাধন করে।

মানুষ তার কণ্ঠনালীর সাহায্যে কেমন করে শব্দ সৃষ্টি করে এবং কান কেমন

করে শব্দ গ্রহণ করে, এস্থলে তার আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। মানুষের কণ্ঠস্বর তার শ্বাসনালীর উপরের দিকে ল্যারিংস নামে একটি বিশেষ অংশ থেকে উৎপত্তি হয়। এই ল্যারিংস একটি হাড়ের খাঁচাবিশেষ। এর মধ্যে রয়েছে ছুটি শক্ত ঝিল্লী, যাদের বলা হয় ভোক্যাল কর্ড। এই ভোক্যাল কর্ডের কম্পন থেকেই শব্দের উৎপত্তি হয়। শ্বাস-প্রশ্বাস যখন স্বাভাবিক থাকে, তখন কর্ড ছুটির মধ্যে অনেকটা ফাঁক থাকে। ফলে শ্বাসনলীর মধ্যে বায়ু চলাচলের সময় কোন শব্দ হয় না, তবে কথা বলবার সময় কর্ড ছুটি খুব কাছাকাছি চলে আসে এবং বায়ুর ধাক্কায় কাঁপতে থাকে। কথা বলবার সময় এই কম্পন থেকেই শব্দের সৃষ্টি হয়।

পৃথিবীর যাবতীয় শব্দ আমাদের কানে এসে প্রবেশ করছে আর আমরা শব্দময় জগতের বিচিত্র অনুভূতি উপলব্ধি করছি। কানের গঠন তিনটি ভাগে বিভক্ত :—(1) বহির্ভাগ—এই ভাগে আছে কানের বাইরের অংশ, যা আমরা সরাসরি দেখিতে পাই। (2) মধ্যভাগ—এই ভাগে আছে তিনটি ছোট ছোট হাড়, যথা—হ্যামার, এনভিল ও ষ্টিরাপ। (3) অন্তর্ভাগ—এই অংশে আছে কানের পর্দা, কক্লিয়া এবং শ্রবণস্নায়ু।

এখন দেখা যাক, কেমন করে আমাদের শব্দের অনুভূতি হয়। প্রথমে শব্দ-তরঙ্গ উৎস থেকে এসে কানের নালীপথে প্রবেশ করে। তারপর নালীপথ দিয়ে পর্দায় এসে আঘাত করে। এই সময়ে মধ্যভাগের তিনটি হাড় কাজ করতে থাকে। তারা শব্দ-তরঙ্গকে কক্লিয়াতে পৌঁছে দেয়। কক্লিয়ার তরল পদার্থ তরঙ্গকে শ্রবণস্নায়ুতে নিয়ে আসে এবং সেখান থেকে মস্তিষ্কে এসে পৌঁছায়। সমস্ত প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত দ্রুত গতিতে সম্পন্ন হয়। প্রসঙ্গতঃ বলা যায়, কান খারাপ হলে তার কম্পন-সংখ্যা অনুভূতির বিস্তার 20 থেকে 20,000 বারের অনেক কম হয়ে পড়ে। শুধু তাই নয়, শব্দের শক্তি যথেষ্ট না হলে তা শ্রুতিগোচর হয় না। সুতরাং শ্রবণশক্তির একটা সীমা আছে। এই কম্পাঙ্কের নীচে বা উপরের শব্দ আমাদের কানে এসে পৌছুলেও আমরা শুনতে পাই না। তোমরা নিশ্চয়ই জান—সেকেণ্ডে 20 কম্পাঙ্কের নীচের শব্দকে বলে Infrasonic শব্দ আর সেকেণ্ডে 20,000 কম্পাঙ্কের উপরের শব্দকে বলে Supersonic বা Ultrasonic শব্দ।

শব্দের আধুনিক ব্যবহারের কথা বলতে গিয়ে প্রথমেই মনে পড়ে ফনোগ্রাফের কথা। ফনোগ্রাফের আবিষ্কর্তা হলেন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক টমাস আলভা এডিসন। এডিসনের ফনোগ্রাফ ছিল একটি হাতলের দ্বারা চালিত পিনসমেত একটি সিলিণ্ডার। এরপর অবশ্য এডিসন আর এই বিষয়ে মনোযোগ দিতে পারেন নি। আরও উন্নত ধরণের যন্ত্র তৈরি করেন আলেকজাণ্ডার গ্র্যাহাম বেল। তাঁর যন্ত্রের নাম হলো গ্র্যামোফোন। এই যন্ত্রে তিনি হাতলের বদলে ঘড়ির কল ব্যবহার করেন। বেল ও তাঁর সহকর্মীরা পাতলা কাগজের সিলিণ্ডারের উপর মোমের পাতলা মিশ্রণ ব্যবহার করেছিলেন। এর পর এই যন্ত্রের আরও উন্নতিসাধন করেন একজন জার্মান বিজ্ঞানী

এমিল বারলিনার। তিনি তামার পাতে কণ্ঠস্বরের রেকর্ড গ্রহণ করা নিয়ে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। আজ আমরা যে ধরণের রেকর্ড বাজাই—তিনি অবশেষে সেই যন্ত্রের উদ্ভাবন করেন 1887 সালে এবং তার নামও রাখা হয় গ্রামোফোন। এরপর অবশ্য এই যন্ত্রের আরও উন্নতি সাধিত হয় এবং আজ বিদ্যুৎ-শক্তিতে চালিত গ্রামোফোন যন্ত্র, যাকে বলা হয় রেকর্ড প্লেয়ার, তার সাহায্যে আরও সুন্দর এবং বর্ধিত মাত্রায় রেকর্ডের কথা ও গান আমরা শুনি।

শব্দ ধরে রাখবার জন্যে নানারকম পদ্ধতি আছে। এটা নির্ভর করে, সেই শব্দকে কি কাজে লাগানো হচ্ছে, তার উপর। যদি গ্রামোফোন বা রেকর্ড প্লেয়ারে এই শব্দ শুনতে ইচ্ছা করি, তবে ডিস্ক রেকর্ডে সেই শব্দকে ধরে রাখতে হবে। এই ধরণের রেকর্ডিং-এ আছে মাইক্রোফোন, অ্যাম্প্লিফায়ার ও কাটার। কাটারে আছে কাটিং নিড্‌ল্ বা ষ্টাইলাস। শব্দ-তরঙ্গের সমান তালে এই ষ্টাইলাসটি কাঁপতে থাকে। ফলে একটি নরম মোমের চাক্‌তির উপর ভাঁজে ভাঁজে দাগ পড়ে। এটি হলো মূল রেকর্ড। এথেকে যে ছাঁচ তৈরি হয়, সেই ছাঁচকে কাজে লাগিয়ে thermoplastic চাক্‌তির উপর আধুনিক রেকর্ড সৃষ্টি হয়।

এই ডিস্ক রেকর্ড ছাড়াও বর্তমানে টেপ্ রেকর্ডার নামে একটি যন্ত্রের কথা তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছ। এই যন্ত্রটিতে আছে একটি ফিতা, যার উপর প্রকৃত রেকর্ডিং হয় আর বাকী অংশটুকু ডিস্ক রেকর্ডিংয়ের অনুরূপ। এই ফিতাটি চুম্বকের দ্বারা প্রভাবিত হয় এরূপ বস্তুর দ্বারা তৈরী। এর একটি দিক ফেরিক অক্সাইডের স্ফটিক দিয়ে আচ্ছাদিত থাকে। এই স্ফটিকগুলির প্রত্যেকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চুম্বকের কাজ করে এবং তাদের প্রত্যেকের উত্তর ও দক্ষিণ মেরু থাকে। এই স্ফটিকগুলির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, তারা তাদের চুম্বকত্বকে অনির্দিষ্ট কালের জন্যে ধরে রাখতে পারে। যখন রেকর্ড করা হয় তখন মাইক্রোফোন শব্দ-তরঙ্গকে বিদ্যুৎ-তরঙ্গে পরিণত করে এবং একটি ইতস্ততঃ পরিবর্তনশীল বিদ্যুৎ-প্রবাহের সৃষ্টি করে। অ্যাম্প্লিফায়ার সেই তরঙ্গকে শক্তিশালী করে এবং তারপর রেকর্ডিং হেডে তা প্রবাহিত হয়। এই রেকর্ডিং হেডের অনুরূপ আর একটি play-back head আছে, যার মধ্য দিয়ে টেপটি চালালে আমরা আবার সেই শব্দ লাউড স্পীকারে শুনতে পাই। উপরিউক্ত হেড দুটির মত আর একটি অংশ আছে, তাকে বলে ইরেজিং হেড। প্রকৃতপক্ষে রেকর্ডিংয়ের সময় ইরেজিং এবং রেকর্ডিং হেড একই সঙ্গে কাজ করে। মনে রাখা প্রয়োজন, ইরেজিং হেডের বিদ্যুৎ-প্রবাহ প্রতি সেকেণ্ডে 50,000 বার হওয়া বাঞ্ছনীয়। এজন্যে একটি বিশেষ অসিলেটরের ব্যবস্থা রাখা হয়। ডেনমার্কের ভানডেমার পলসন 1900 খৃষ্টাব্দে এটা আবিষ্কার করেন।

সবাক চলচ্চিত্রে যে শব্দ শুনতে পাই, তা অনেকটা ফনোগ্রাফ ও বেতারের যোগফল অ্যাম্প্লিফায়ারে বৈদ্যুতিক তরঙ্গের স্পন্দন একটি আলোকশিখাকে এপাশে ওপাশে নড়াতে

সাহায্য করে। শব্দ জোর হলে আলোর এই টিউবটি উজ্জ্বল হয়ে জ্বলবে এবং কম হলে এর উজ্জ্বলতা কমবে। এভাবে শব্দ প্রথমে বৈদ্যুতিক স্পন্দনে এবং পরে আলোক-স্পন্দনে পরিবর্তিত হয়। ফলে ফিল্মের উপর একটি রেখার সৃষ্টি হয়। এই রেখাটি সর্বত্র সমান ঘন হয় না। এটা নির্ভর করে শব্দ জোর বা আস্তে হবার উপর।

শব্দের ক্ষেত্রে আর একটি আধুনিক বাস্তব ব্যবহারকে বলে ষ্টিরিয়োফোনিক ব্যবস্থা। এর উদ্ভাবন হয় 1958 সালে। এর ফলে সমবেত মিউজিকে বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের সুর ঘরের বিভিন্ন অংশ থেকে আসছে বলে মনে হয়। প্রেক্ষাগৃহে দর্শকের মনে এই বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়—যেন সে ছবির ঘটনাস্থলেই রয়েছে। এই রেকর্ডে একই খাঁজের দুটি খাতে আলাদা দুটি রেকর্ডিং করা হয়—একটি তলায় আর একটি পাশে। ষ্টিরিয়ো-ফোনিক নিড্‌ল্ দুটি রেকর্ডিংকেই গ্রহণ করে স্পীকারে তা পুনরুৎপাদন করে।

আধুনিক প্রেক্ষাগৃহে এমনভাবে শব্দ নিয়ন্ত্রণের বন্দোবস্ত থাকে যেন বক্তা বা গায়কের কণ্ঠস্বর প্রতিধ্বনিত হয়ে শ্রোতার কানে না পৌঁছায়। শব্দ-বিজ্ঞানের এই শাখার পথিকৃৎ হলেন ইউ. এস. এ-র হার্ভাড বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ-বিজ্ঞানের অধ্যাপক ডাব্লিউ. সি. স্যাবাইন। বিশাল প্রেক্ষাগৃহে শব্দ নিয়ন্ত্রণের যদি কোন সুবন্দোবস্ত না থাকে, তবে প্রতিধ্বনির ফলে শ্রোতা কিছুই ভালভাবে বুঝতে পারে না, সবই গোলমালে পরিণত হয়। এই অসুবিধা দূর করবার উদ্দেশ্যে প্রেক্ষাগৃহের দেয়াল এবং ছাদ বিশেষ উপাদান দিয়ে তৈরি করা হয় ও জানলা, দেয়ালগুলি তাদিয়ে এমনভাবে আচ্ছাদিত থাকে যে, শব্দকে সহজে শুষে নিতে পারে। তাছাড়া চেয়ারের গদি ও শ্রোতাদের গায়ের পোষাকও শব্দ-তরঙ্গের শোষক হিসাবে অনেকটা কাজ দেয়। তবে প্রতিটি শ্রোতা যাতে নিজের আসনে বসে সুস্পষ্টভাবে শুনতে পায়, সে জন্যে আবার শব্দের যথাযথ প্রতিফলন হওয়াও প্রয়োজন। এজন্যে প্রেক্ষাগৃহের ছাদ একটু বাঁকানো ও উঁচু করা হয় এবং শব্দের সুষ্ঠু বণ্টনের জন্যে নানারকম বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা রাখা হয়। মাঝে মাঝে দেয়ালে নানা ধরণের প্রতিফলক লাগিয়েও শব্দের প্রতিফলনের বন্দোবস্ত করা হয়ে থাকে।

শব্দের ব্যবহারকে আরও উন্নত ও আধুনিক করবার জন্যে দেশ-বিদেশে এখন গবেষণা চলছে। সুতরাং এই বিষয়টি সম্পর্কে আরও বেশী তথ্য পরে জানা যাবে আশা করা যায়।

শ্রীবিশ্বনাথ বড়াল*

*পদার্থবিদ্যা বিভাগ, চন্দননগর কলেজ, চন্দননগর।

উদ্ভিদের দান

তোমরা জান যে, ভূগর্ভ থেকেই মানুষ নানারকম খনিজ পদার্থ আহরণ করে আনে। কোনও জায়গায় মাটির তলায় খনিজ পদার্থ সঞ্চিত আছে কিনা, তা নানারকম ভাবে পরীক্ষা করে দেখা হয়। এজন্যে নানারকম যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। আজকাল এরোপ্লেন বা হেলিকপ্টারের সাহায্যেও এরকম জরীপের কাজ করা হচ্ছে।

এত সব পরীক্ষার পরেও কিন্তু মানুষ কাজ আরম্ভ করে অনেক সময় হয়তো কিছুই পায় না। একটা উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটা বলা চলতে পারে। অনেকের বাড়ীতে নল-কূপ বসাবার কাজ সুরু করে হয়তো কয়েক শ' ফুট পাইপ বসিয়েও ভাল জল পাওয়া গেল না।

তেমনি মাটির নীচে শিলাস্তরের কোনও ভাঁজে খনিজ তেল আছে মনে করে ডেরিক বা কাঠামো বসিয়ে ড্রিলিং পদ্ধতিতে নলকূপ বসিয়েও অনেক সময় হয়তো কিছুই পাওয়া যায় না।

অবশ্য এই পদ্ধতি বাড়ীর জলের নলকূপ বসাবার তুলনায় অনেক খাটুনীর এবং এতে অনেক টাকাও লাগে। অনেক সময় তেল তোলবার জন্যে এই কাজেই 25-30 হাজার ফুট গভীর নলকূপ বসাবার দরকার হয়ে পড়ে আর তাতে 30-35 লক্ষ টাকা খরচও হয়ে যায়।

সে জন্যে বৈজ্ঞানিকেরা অনেকদিন থেকেই চিন্তা করছিলেন এমন কোনও উপায় বের করতে—যাতে খুব সহজেই তেল এবং অন্যান্য খনিজ পদার্থের সন্ধান করে এই সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে।

এই প্রসঙ্গে আমেরিকার রকওয়েল কর্পোরেশনের রকেটডাইন ডিভিশনের (ক্যানোগা পার্ক; ক্যালিফোর্নিয়া) বৈজ্ঞানিকদের প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করতে হয়। এখানকার বিজ্ঞানীরা উদ্ভিদ-জীবন এবং খনিজ পদার্থের আকরের মধ্যে সম্পর্ক রয়েছে বলে মনে করেছিলেন।

তাঁদের গবেষণার ফল থেকে তাঁরা এই আশা প্রকাশ করেছিলেন যে, এর ফলে ভূগর্ভস্থ খনিজ পদার্থের অবস্থান সঠিকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব হতে পারে।

এখানকার অন্যতম প্রধান কর্মকর্তা ডক্টর আর. জে. টমসন একবার এসম্বন্ধে বলেছিলেন যে, খনিজ পদার্থ উদ্ভিদের ক্ষেত্রে বাহ্যিক পরিবর্তন ঘটিয়ে থাকে; যেমন—পাতার রং হলুদ হয়ে যায়, বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায় বা অতিরিক্ত বৃদ্ধি হয়ে থাকে। কোনও কোন উদ্ভিদের মূল ভূপৃষ্ঠের 70 ফুট নীচু পর্যন্ত খনিজ পদার্থের অবস্থানের সন্ধান দিতে পারে।

তাছাড়াও দেখা গেছে যে, কয়েক রকম বিশেষ ধরণের উদ্ভিদের অবস্থানকে সূচক হিসাবে ব্যবহার করে ইউরেনিয়াম, দস্তা এবং সোনার আকরের সন্ধান পাওয়া সম্ভব।

ডক্টর টমসন এই প্রসঙ্গে আরও জানিয়েছিলেন যে, অনেক উদ্ভিদের কাণ্ডে এবং পত্রপুষ্পে বেশ কিছু পরিমাণে ইউরেনিয়াম, দস্তা ও তামা প্রভৃতি ভারী ধাতু থাকে। এই সব উদ্ভিদের কাণ্ড বা পত্রপুষ্প সেখানকার মাটিতে খনিজ পদার্থের অবস্থান সহজেই বের করতে সাহায্য করে। এই পদ্ধতি যে ড্রিলিং করে খনিজ পদার্থের অবস্থান নির্ণয় করার চেয়ে অনেক বেশী কার্যকর, একথা সবাই স্বীকার করে নিয়েছেন। এই পদ্ধতির সার্থক প্রয়োগের এক চাঞ্চল্যকর খবর পাওয়া গিয়েছিল সোভিয়েট রাশিয়ার উজবেকিস্তান আর তাজিকিস্তান থেকে।

সেখানকার বিজ্ঞানীরা মধ্য-এশিয়ার একটি স্বর্ণখনি অঞ্চলে পরীক্ষা চালিয়েছিলেন। ঐ পরীক্ষা থেকে তাঁরা দেখেছিলেন যে, ঐ অঞ্চলের উদ্ভিদের গড়ে প্রতি টন সবুজ অংশে তুই গ্র্যাম পরিমাণ সোনা থাকে। আবার কোনও কোন উদ্ভিদের প্রতি টন সবুজ অংশে এগারো গ্র্যাম সোনাও পাওয়া গেছে। বেশীর ভাগ সোনাই তাঁরা পেয়েছিলেন উদ্ভিদের পাতা থেকে।

উদ্ভিদের পাতা পরীক্ষা করে যদি সোনা পাওয়া যায়, তাহলে সহজেই বোঝা যাবে যে, সেখানে মাটির নীচে সোনার খনি আছে, কেন না, উদ্ভিদ মাটির তলা থেকে যে খনিজ পদার্থ আহরণ করে এনেছিল. তা তার দেহেই সঞ্চিত করে রেখে দিয়েছে।

শ্রীচুণীলাল রায়

দূরবীনের জন্মকথা

কাচ জিনিষটি যে মানুষ কবে কোথায় প্রথম তৈরি করেছিল, তার কোন সঠিক ইতিহাস আজ আর মানুষের দপ্তরে নেই। ওটি একটি বহু প্রাচীন আবিষ্কার, যা প্রায় মানুষের সঙ্গলাভ করে এসেছে তার সভ্যতার সুরু থেকে। ইতিহাসে এমন সংবাদ আছে যে, রোমের সম্রাট নিরো তাঁর অ্যাম্পিথিয়েটারে বসে এক খণ্ড সুবৃহৎ গোল কাচের ভিতর দিয়ে গ্ল্যাডিয়েটরদের খেলা দেখতেন, কারণ তিনি চোখে একটু কম দেখতেন। এটি ছিল নিশ্চয়ই ম্যাগ্নিফাইং গ্লাস বা আতস কাচ। নিরো ছিলেন যীশু খৃষ্টের সমসাময়িক।

চশমার উদ্ভাবন করেন ভিনিশীয়রা। ভিনিশ ইটালীর একটি শহর, যা ছিল এক সময় কাচের কাজের জন্যে প্রসিদ্ধ, তা প্রায় খৃষ্টীয় দশম-একাদশ শতাব্দীর কথা।

এই চশমার নাম ছিল তখন ভিনিশীয় কল বা Venician device, সেখান থেকেই তা ছড়িয়ে পড়ে সারা ইউরোপে।

সেটা খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী—হল্যাণ্ডের মিডলসবার্গ সহরে লিপারহেইম নামে এক চশমার কাচ প্রস্তুতকারী ছিলেন। একদিন তাঁর ছেলেরা খেলছিল বাবার তৈরী ফেলে-দেওয়া কিছু চশমার লেন্স নিয়ে। এমন সময়ে একটি ছেলে ছুটি লেন্স একটু আগে-পিছে করে চোখের সামনে ধরে তার ভিতর দিয়ে দেখতে গিয়ে দেখে—তাদের কারখানা থেকে বেশ কিছুটা দূরের গির্জার চূড়ার ওয়েদার-কক্‌টি যে কেবল উল্টোই দেখা যাচ্ছে তা নয়, সেটিকে বেশ বড়, পরিষ্কার এবং অনেক কাছেও দেখা যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি ছেলেরা তাদের বাবাকে এই ব্যাপারটা ডেকে দেখায়। দেখে তিনি আর একটু এগুলেন, অর্থাৎ একটি লেন্সকে একটি বোর্ডের গায়ে এঁটে আর একটি লেন্সকে আগু-পিছু করে এমন ব্যবস্থা করলেন, যাতে সবটাই খুব পরিষ্কার দেখতে পাওয়া যায়। এই ব্যবস্থায় লেন্স ছুটিকে তিনি ঠিক ফোকাস করতে সক্ষম হলেন। দূরবীন যন্ত্র উদ্ভাবনের মূলে এই হলো এক কাহিনী।

আর এক কাহিনী—জেম্‌স্‌ মিটিয়াস নামে এক ব্যক্তি, সেও ডাচ দেশীয়—এক দিন লেন্স নাড়াচাড়া করতে করতে একটি অবতল (Concave) ও একটি উত্তল (Convex) লেন্স একটু আগু-পিছু ধরে তার ভিতর দিয়ে দেখতে গিয়ে দেখলেন—দূরের বস্তুকে বেশ কাছে এবং পরিষ্কার ও বড় দেখা যাচ্ছে। কিন্তু এবার আর উল্টো নয়, সোজাই দেখা যাচ্ছে তাকে। এটি দ্বিতীয় কাহিনী।

আবার এও বলা হয় যে, জেনসন নামে এক ডাচ দেশীয় চশমার কাচ নির্মাণ-কারী ছুটি লেন্সকে একটি চোঙের এমুখে আর ওমুখে লাগিয়ে দেখতে গিয়ে অমনি দূরের বস্তুকে কাছে, বড় এবং পরিষ্কার দেখতে পান। তখন তিনি তাঁর এই যন্ত্র নিয়ে দেখান অরেঞ্জের রাজা মরিসকে। মরিস তখন যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন ফ্রান্সের সঙ্গে। তিনি নিজে ছিলেন একজন দক্ষ যোদ্ধা। তিনি উপলব্ধি করতে সক্ষম হন যুদ্ধে এই যন্ত্রের উপযোগিতা। তাই তিনি জেনসনকে ফরমাস করেন তাঁকে একটি বড় আর ভাল করে এই যন্ত্র তৈরি করে দিতে আর কথাটি সম্পূর্ণ গোপন রাখতে।

কিন্তু এমন একটি ব্যাপার কি কখনো গোপন থাকে! কয়েক দিনের মধ্যেই অনেক লোকই এই যন্ত্র তৈরি করে লোকের কাছে বেচতে লাগলো। তার ভিতরে পূর্বো-ল্লিখিত লিপারহেইমও একজন।

এই আবিষ্কারের সংবাদ লোকমুখে ফিরতে ফিরতে হাজির হলো ভিনিস নগরে প্রখ্যাত জ্যোতির্বিদ গ্যালিলিওর কাছে। এই বিষয়ে তিনি বলেছেন—

"মাস দশেক আগে আমার কাছে এমন এক সংবাদ পৌঁছায় যে, কে এক ডাচ ভদ্রলোক দূরের জিনিষ কাছে দেখবার একটি যন্ত্র নির্মাণ করেছেন। কেউ কেউ কথাটা

বিশ্বাস করেন, কেউ কেউ করেন না। কাজেই আমিও তখন খুব একটা দাম দিই নি। কিন্তু কিছুদিন বাদে ফ্রান্স থেকে আমার এক বন্ধুর চিঠিতে এই ব্যাপার সত্য বলে জানতে পারলাম। তখন আমি এই যন্ত্রটি কিভাবে তৈরি করতে হয়, তার খবর সংগ্রহ করতে থাকি নিজে একটি তৈরি করবো বলে। কিছুদিন বাদে আমি একটি সীসোর নলের দুদিকে দুটি লেন্স (অবতল ও উত্তল) সংযোগ করে একটি টেলিস্কোপ তৈরি করতে সক্ষম হই। এই যন্ত্র চোখে লাগিয়ে আমি সত্যই দূরের বস্তু কাছে এবং বড় আর পরিষ্কার দেখতে পাই। আমার প্রথম যন্ত্রে বস্তুকে তিন গুণ কাছে এবং নয় গুণ বড় দেখতে পেয়েছিলাম। তার পরেই আমি তেমনি আর একটা যন্ত্র তৈরি করি, যাতে দৃশ্য বস্তু ষাট গুণ বড় দেখায়। তারপর আরও একটি যন্ত্র নির্মাণে সক্ষম হই, যাতে বস্তুটিকে হাজার গুণ বড় দেখায় আর দেখা যায় প্রায় ত্রিশ গুণ কাছে।

আমার এই যন্ত্র তৈরির সংবাদ যখন ছড়িয়ে পড়লো, দেশের রাজা সিগ্‌নর আমাকে এই যন্ত্রটি দেখাবার জন্যে ডেকে পাঠালেন। আমি তা রাজাকে দেখাই। বহু লোক, বহু বৃদ্ধ ব্যক্তিও এই জিনিষে চোখ লাগিয়ে দেখবার জন্যে চার্চের ছাদে ওঠেন। তাঁদের আমি সমুদ্রে একটি জাহাজ দেখাই, যেটা খালি চোখে দেখতে আরও দু-ঘন্টা সময়ের প্রয়োজন হয়েছিল। আমার যন্ত্রের ক্ষমতা ছিল কোন বস্তুকে ত্রিশ গুণ কাছে দেখাবার।”

গ্যালিলিও ভিনিসের সেনেটকে এই একটি যন্ত্র উপহার দেন এবং তা তৈরি করবার পদ্ধতিও লিখে দেন সঙ্গে সঙ্গে। এই ব্যাপারের পর গ্যালিলিওর মাইনে বাড়িয়ে দেওয়া হয় তিন গুণ।

তারপর লোক এই মজা দেখবার জন্যে—(মানুষের কাছে তা একটা মজা বলেই মনে হয়েছিল তখন) প্রতিদিন অসংখ্য লোক আসতে লাগলো গ্যালিলিওর কাছে। এখন এই যন্ত্রকে তিনি লাগালেন আকাশ দেখবার কাজে, যেখানে ছিল তাঁর প্রধান আগ্রহ আর যা ছিল তাঁর প্রথম কাজ। প্রথমেই তাকালেন চাঁদের দিকে। এই প্রথম মানুষ টের পেল চাঁদে আছে পাহাড়-পর্বত-প্রান্তর। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি আকাশে অনেক নতুন তারা দেখতে সক্ষম হন। বৃহস্পতির চাঁদগুলিকেও চারদিকে তিনি দেখতে সক্ষম হয়েছিলেন। চাঁদগুলিকে বৃহস্পতির চারদিকে ঘুরতে দেখেই তিনি স্থির করেন যে, পৃথিবীর চাঁদও পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে। তারপর তিনি গ্রহগুলির ঘোরা-ফেরা দেখে স্থির করেন যে, পৃথিবীও একটি গ্রহ এবং এই সবগুলি গ্রহই ঘোরে সূর্যের চারদিকে।

এই দূরবীক্ষণ যন্ত্র উদ্ভাবিত হয়েছিল ঐ ডাচ দেশীয় লোকদের দ্বারাই। গ্যালিলিও তাকে প্রথম উন্নততর করে লাগান আকাশ দেখবার কাজে। তাই দূরবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কারের সম্মানটা তাঁকেই দেওয়া হয়। তিনি এই যন্ত্রের বহু উন্নতি সাধন করেন এবং তার প্রধান কাজে ব্যবহার করেন। কিন্তু এর আবিষ্কারকের মর্যাদা তাঁর প্রাপ্য নয়, ডাচ দেশের চশমার কাচ প্রস্তুতকারীদের সেই মর্যাদা প্রাপ্য।

বিনায়ক সেনগুপ্ত

পাই-এর উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস

বিজ্ঞানের ছাত্রদের কাছে পাই (π) বহুদিন থেকেই সুপরিচিত। অঙ্ক কষতে গেলে অনেক জায়গায়ই π-এর প্রয়োজন হয়। আগে π-এর সংজ্ঞাটা বলে দিই। π আর কিছুই নয়—কোন বৃত্তের পরিধি এবং ব্যাসের অনুপাতকে পাই-এর দ্বারা সূচিত করা হয়। অঙ্কের বিভিন্ন বিষয়কে একটু খুঁটিয়ে দেখলেই বোঝা যায়, পাই-এর গুরুত্ব কতখানি।

পাই এমনই একটা সংখ্যা, যার মান 3·1415926……। আশ্চর্যের বিষয়, দশমিকের পর ছয়টা সংখ্যা বসিয়েও π-এর মান সম্পূর্ণ হয় না, কারণ পাই একটা অমেয় (Incommensurable) রাশি। বহু দিন ধরে পাই-এর সঠিক মান সম্পর্কে জল্পনা-কল্পনা চলছিল গণিতজ্ঞ মহলে। 1761 সালে Lambert-ই প্রথম প্রমাণ করে দিলেন π-এর উপরিউক্ত মান। এর কিছুদিন পরে 1803 সালে Legendre দেখালেন—পাই-এর বর্গ অর্থাৎ π^2-ও একটা অমেয় রাশি। চেষ্টার অন্ত নেই বিজ্ঞানী মহলেও। বেশ কয়েক বছর কেটে গেল। এর পর 1882 সালে Lindemann প্রমাণ করে দেখালেন যে, পাই কখনও মূলদ সংখ্যার (Rational number) বীজ (Root) হতে পারে না।

এই পাই-এর আবিষ্কারক হলেন উইলিয়াম জোন্স। তিনিই প্রথম এই গ্রীক বর্ণ (Letter) পাই-এর প্রয়োগ করেন অঙ্কশাস্ত্রে। এ নিয়ে দ্বন্দ্বও চলেছিল কম নয়। Bernoulli আবার π-এর পরিবর্তে c ব্যবহার করেন। এরপর Euler কিন্তু p এবং c এই দুটিরই প্রয়োগ করলেন। Goldback আবার উইলিয়াম জোন্সের পক্ষ সমর্থন করেন। তিনি তাঁর ছাত্রদের π ব্যবহার করতে পরামর্শ দেন। শেষ পর্যন্ত দ্বন্দ্ব-কোলাহলের মধ্যে দিয়ে π-এরই জয় হলো। Euler-এর 'Book On Analysis' বইতে π-এরই ব্যবহার হয়। তারপর থেকে আমরা π ব্যবহার করে আসছি।

π-এর উৎপত্তি কি করে হয় আর কি করেই বা π-এর মান ঠিক করা হয়েছিল, এই বিষয়ে কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক। পাই-এর মান নির্ণয়ের জন্যে দুটি পদ্ধতি অনুসৃত হয়। ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত যে পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছিল, সেটা হচ্ছে জ্যামিতিক পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে একটা বৃত্তের ভিতরে এবং বাইরে একটা সুষম বহুভুজ (Regular polygon) এঁকে তার সীমা বের করা হয়। এই সীমা বের করবার সময় ধরে নেওয়া হয় যে, বৃত্তের পরিধি বৃত্তের ভিতরের ও বাইরের বহুভুজের সীমার মধ্যবর্তী। তবে এই পদ্ধতি একেবারে যথার্থ নয়। বর্তমানে অবশ্য এই পদ্ধতি অনুসৃত হয় না।

অঙ্কশাস্ত্রের বিবর্তনের ইতিহাস এক বিরাট মহাকাব্যের মতই। বিভিন্ন সময়ে পাই-এর বিভিন্ন মান ব্যবহৃত হয়েছে। মিশরের লোকেরা পাই-এর মান বের করেছিল

$\frac{256}{81}=3{\cdot}1605$। ব্যাবিলনীয়েরা আবার পাই-এর মান 3 ধরে হিসাব করতো। বিশিষ্ট অঙ্কশাস্ত্রবিদ্ ইউক্লিডের নাম সবার কাছেই পরিচিত। ইউক্লিড প্রমাণ করে দেখালেন যে, পাই-এর মান $\frac{22}{7}$-এর কম, কিন্তু $\frac{223}{71}$-এর বেশী অর্থাৎ 3·1408 এবং 3·1428-এর মধ্যেই পাই-এর মান বর্তমান। তিনি জ্যামিতিক পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন। 96 বাহুবিশিষ্ট একটা বহুভূজের (Polygon) সাহায্যে তিনি তাঁর মত ব্যক্ত করেন। ত্রিকোণমিতিতে আমরা দেখেছি $\tan\theta>\theta>\sin\theta$ যেখানে $\theta=\frac{\pi}{n}$। ইউক্লিডের পরে এলেন আর্কিমিডিস। পাই-এর মান বের করতে গিয়ে নানারকম বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হলেন তিনি। কারণ আর্কিমিডিস যে সময়ের লোক, আজকালকার মত তখন শ্লাইড রুল বা লগ্ টেবিলের আবিষ্কার হয় নি। তখন বড় বড় যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগ কষে কষে বের করতে হতো। আর্কিমিডিসের চেষ্টা চলেছিল বেশ কয়েক বছর ধরে। এরপর এলেন টলেমি। তাঁর মতে, পাই-এর মান $3^{\circ}8'30''$ (অর্থাৎ $3+\frac{8}{60}+\frac{30}{3600}=3{\cdot}1416$)। তখনকার ইঞ্জিনিয়ারেরা নিজেদের কাজের সুবিধার জন্যে পাই-এর মান 3·78 ধরে নিয়ে হিসাব করতেন।

যে সময়ের কথা বলছি, তখন ভারতবর্ষেও অঙ্কশাস্ত্রের উপর নানারকম গবেষণা চলছিল। বৌধায়ন, আর্যভট্ট, ব্রহ্মগুপ্ত, ভাস্কর প্রভৃতি ভারতীয় অঙ্কশাস্ত্রবিদ্দের নাম তখন বিভিন্ন দেশের লোকমুখে উচ্চারিত হতো। শুনে অবাক হতে হয়, তখনকার দিনে রোম, গ্রীস, ভারতবর্ষের মধ্যে যাতায়াতের অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও গণিতবিদ্দের পাক্ষিক বৈঠকের ব্যবস্থা ছিল। বৌধায়ন বললেন, পাই-এর মান $\frac{49}{16}$ আর আর্যভট্টের মতে 3·1416। আর্যভট্ট 384 বাহুবিশিষ্ট বহুভূজ নিয়ে তাঁর মতের সত্যাসত্য প্রমাণ করেন। তিনি একটা ফরমুলা বের করলেন। সেটি হলো $b^2=2-(4-a^2)^{\frac{1}{2}}$, যেখানে $a=$ বৃত্তস্থ সুষম বহুভূজের এক বাহুর দৈর্ঘ্য, $n=$ বহুভূজের বাহুসংখ্যা, $b=2n$ বাহুবিশিষ্ট ঐ একই বৃত্তস্থ বহুভূজের এক বাহুর দৈর্ঘ্য। আর্য্যভট্ট তাঁর গণিতপাদ বইতে সংস্কৃত শ্লোকের মাধ্যমে পাই-এর মান বিবৃত করেছেন। আবার Alkarishma তাঁর বীজগণিতের বইতে আর্যভট্ট প্রদত্ত পাই-এর মান অক্ষরে অক্ষরে অনুসরণ করেছেন। তিনি অবশ্য মাঝে মাঝে $\frac{754}{240}$ অনুপাতের সাহায্যেও পাই-এর মান বের করেছেন। ব্রহ্মগুপ্ত আবার বললেন $\pi=\sqrt{10}$। তিনি পাই-এর মান অবশ্য জ্যামিতিক পদ্ধতিতে বের করেছেন। তাঁর মতে, কখনও কখনও $\frac{754}{240}$-এর অনুপাত থেকে পাই-এর মান বের করা যেতে পারে। আরব দেশের গণিতজ্ঞেরা $\frac{22}{7}$, $\sqrt{10}$, $\frac{62832}{20000}$ থেকে পাই-এর মান নির্ণয় করেন। শুধু আরব কেন, পাই-এর মান নির্ণয়ের জন্যে চীনাদের অবদানও অসামান্য। পঞ্চম শতাব্দীতে Tsu. Chungh Chih প্রমাণ করেন যে, পাই-এর মান 3·1415926 এবং 3·1415927-এর মধ্যে থাকবে। তখনকার দিনে তাঁর সময়ে ছয় দশমিক স্থান পর্যন্ত এটাই ছিল বিশুদ্ধ মান। তিনি $\frac{355}{113}$ অনুপাত থেকে পাই-এর ছয় দশমিক স্থান পর্যন্ত

মান বের করেছেন। এটা নেহাৎই একটা হঠাৎ আবিষ্কার। পরে অবশ্য এটাই প্রমাণিত হয় যে, পাই-এর মান $\frac{377}{120}$ এবং [illegible]-এর মধ্যে। এর পর ত্রয়োদশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে পাই-এর মান বের করবার জন্যে বিভিন্ন পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়। কিন্তু পঞ্চম শতাব্দীর এই চীনা গণিতজ্ঞের মত আর কেউ ছয় দশমিক স্থান পর্যন্ত সঠিক মান বের করতে পারেন নি। প্রখ্যাত গণিতজ্ঞ ভিয়েটা 1579 সালে নয় দশমিক স্থান পর্যন্ত পাই এর মান বের করেন। তিনি 6×2^{16} বাহুবিশিষ্ট বহুভুজ এঁকে পাই-এর মান বের করেছিলেন। তখন থেকে গণিতজ্ঞ মহলে সাড়া পড়ে যায় পাই-এর আরও বেশী দশমিক পর্যন্ত মান বের করবার জন্যে। Romanus আবার 2^{30} বাহুবিশিষ্ট বহুভুজ এঁকে পনেরো দশমিক পর্যন্ত পাই-এর মান বের করেন। এর পর L. Van Ceulen বের করেন কুড়ি দশমিক পর্যন্ত। পাই-এর মান বের করবার পর তিনি এতই উল্লসিত হয়েছিলেন যে, মৃত্যুর কিছুদিন আগে তিনি নিজের ফটোর চারদিকে একটা বৃত্ত এঁকে পাই-এর মান লিখে রেখেছিলেন কুড়ি দশমিক পর্যন্ত। তাঁর মৃত্যুর পর বিভিন্ন স্মৃতিস্তম্ভেও পাই-এর মানটা খোদাই করে লিখে দিয়েছিল দেশবাসী। L Van Ceulen-এর পর Greinberger বের করলেন 39 দশমিক পর্যন্ত মান। তিনিই শেষ গণিতবিদ্, যিনি পাই-এর মান বের করবার জন্যে জ্যামিতিক পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন।

এখানেই শেষ নয়। 1656 সালের পর থেকে পাই-এর মান নির্ণয়ের জন্যে বিশেষ সহায়ক হয় Convergent Series। ত্রিকোণমিতিতে আমরা দেখেছি, $\theta = \tan\theta - \frac{\tan^3\theta}{3} + \frac{\tan^5\theta}{5} \cdots\cdots$ যেখানে θ-র মান $-\frac{\pi}{4}$ এবং $+\frac{\pi}{4}$-এর মধ্যে। এই Series এর সাহায্যে একাত্তর দশমিক পর্যন্ত পাই-এর যথার্থ মান বের করা যেতে পারে। কিছুদিন যেতে না যেতেই Machin আবার এক নতুন Series-এর সাহায্যে পাই-এর এ'শততম পর্যন্ত মান বের করেন। Machin-এর পর De Lagny বের করেন 127-তম পর্যন্ত মান। এরপর গণিতজ্ঞদের মধ্যে হিড়িক পড়ে যায় 127-এরও বেশী দশমিক স্থান পর্যন্ত মান বের করবার জন্যে। আশ্চর্যের বিষয়, 527 দশমিক পর্যন্ত 1853-টি মান নির্ণীত হয়েছে তখনকার দিনে। আজকাল অবশ্য কম্পিউটার আবিষ্কৃত হবার পর 527 কেন, আরও বেশী দশমিক পর্যন্ত পাই-এর মান বের করা যেতে পারে। চেষ্টার বিরাম নেই, আজও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের গণিতজ্ঞেরা পাই-এর আরও বেশী দশমিক পর্যন্ত সঠিক মান বের করবার জন্যে উঠেপড়ে লেগেছেন। তাঁদের প্রচেষ্টা সার্থক হলে বিভিন্ন হিসাব-নিকাশে বেশ কিছু সুবিধা হবে বলে আশা করা যায়।

হিল্লোল রায়

প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন :—1. বেলের মধ্যে সাধারণতঃ কি কি পদার্থ থাকে ?

গোপা বিশ্বাস
জলপাইগুড়ি
সুমিত্রা চক্রবর্তী
কলিকাতা—57

প্রশ্ন :—2. ছোটদের দাঁতকে 'দুধেদাঁত' বলা হয় কেন ?

দেবাশীষ পাত্র
ও
সঞ্জয় মহলানবীশ
শিকারপুর

উত্তর :—1. বেলের মধ্যে সাধারণতঃ কয়েকটি কুমারিনজাতীয় যৌগিক পদার্থ থাকে। এদের মধ্যে ম্যারমোলাসিন, অ্যাম্বেলিফেরন, মারমিন, অ্যালোইমেপরোটিন ইত্যাদিরই প্রাধান্য। দেখা যায় যে, কিছু যৌগিক পদার্থ কাঁচা অবস্থায় থাকে, পাকা অবস্থায় সেগুলি অন্য যৌগে রূপান্তরিত হয়ে যায়।

উত্তর :—2. জন্মাবার কিছুকাল পর থেকেই স্তন্যপায়ী প্রাণীদের ক্রমান্বয়ে দাঁত উঠতে আরম্ভ করে। এই সময় প্রত্যেক পাটিতে অল্পসংখ্যক দাঁত বের হয়, এদেরই বলা হয় দুধেদাঁত। কালক্রমে এই দাঁতগুলি ভেঙে যায় এবং এদের জায়গায় স্থায়ী দাঁত ওঠে। মানুষের বেলায় প্রায় ছয় মাস বয়সের পর থেকেই এই দুধেদাঁত গজায় আর সাত-আট বছর বয়স থেকে সেগুলি পড়তে আরম্ভ করে। দুধেদাঁত বলবার পিছনে কোন বিজ্ঞানসম্মত কারণ নেই। বয়সের প্রথম দিকের দাঁতগুলি অস্থায়ী হয় বলেই এদের দুধে দাঁত বলা হয়ে থাকে।

শ্যামসুন্দর দে*

---

* ইনষ্টিটিউট অব রেডিও ফিজিক্স অ্যাণ্ড ইলেকট্রনিক্স, বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাতা-9।

বিবিধ

নবম বার্ষিক 'রাজশেখর বসু স্মৃতি' বক্তৃতা

গত 19শে জুন সন্ধ্যা ছয় ঘটিকায় বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ ভবনের 'কুমার প্রমথনাথ রায় বক্তৃতা-কক্ষে' বিজ্ঞান পরিষদ কর্তৃক আয়োজিত নবম বার্ষিক 'রাজশেখর বসু স্মৃতি' বক্তৃতা প্রদান করেন কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়। বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল 'ভারতের কৃষি-সমস্যা'। ঐ সভায় সভাপতিত্ব করেন বিজ্ঞান পরিষদের সভাপতি জাতীয় অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু।

ডক্টর হরগোবিন্দ খোরানার নতুন কৃতিত্ব

গত 2রা জুন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উইস্‌কনসিন বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞানীদের একটি সেমিনারে নোবেল পুরস্কারবিজয়ী ডক্টর হরগোবিন্দ খোরানা (জন্মসূত্রে ভারতীয়, নাগরিকত্বে মার্কিন) কৃত্রিম উপায়ে জিন সংশ্লেষণের কথা ঘোষণা করেন। সম্পূর্ণরূপে জৈব রাসায়নিক পদার্থ থেকে তাঁরা এই জিন সৃষ্টি করেছেন। কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্ট এই জিন হচ্ছে ঈস্ট-কোষের অন্তর্গত জিনের প্রতিরূপ। ডক্টর খোরানার গবেষক দলের মধ্যে আছেন শ্রীঅশোককুমার ও শ্রীনব গুপ্ত নামে দু-জন তরুণ ভারতীয় গবেষক।

যে চারটি নিউক্লিয়োটাইড হচ্ছে জিনের মূল-ভিত্তি, সেই চারটি নিউক্লিয়োটাইড নিয়েই ডক্টর খোরানা ও তাঁর সহযোগীরা সংশ্লেষণ শুরু করেন। সম্পূর্ণ কৃত্রিম উপায়ে সরল জৈব রাসায়নিক পদার্থ থেকে এই নিউক্লিয়োটাইড সংশ্লেষণ করা যায়। তাঁরা প্রথমে এক প্যাঁচের একাধিক অংশে নিউক্লিয়োটাইডগুলিকে যথাযথ পরম্পরায় জুড়ে দেন এবং তারপর এই অংশগুলিকে জুড়ে 77টি নিউক্লিয়োটাইডসমন্বিত একটি সম্পূর্ণ ডবল প্যাঁচের জিন সংশ্লেষণ করেন।

জিন হচ্ছে বংশগতির মূলাধার এবং তারাই জীবনের সমস্ত প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

ডক্টর হরগোবিন্দ খোরানা

কাজেই কৃত্রিম উপায়ে এই প্রথম জিন সংশ্লেষণ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এই গবেষণা বংশগত ব্যাধি নিরাময়ে, উন্নত ধরণের মানুষ ও প্রাণী সৃষ্টিতে এবং শেষ

পর্যন্ত হয়তো কৃত্রিম উপায়ে জীবন সৃষ্টির পথ প্রশস্ত করতে পারে।

এই গবেষণার গুরুত্ব সম্পর্কে ডক্টর খোরানা বলেছেন—বহুমূত্র ও কয়েকটি মানসিক ব্যাধির চিকিৎসায় রোগাক্রান্ত ব্যক্তির টিস্যুতে স্বাভাবিক জিন সরবরাহ করে একদিন হয়তো এই সব ব্যাধি নিরাময় করা সম্ভবপর হতে পারে। একই উপায়ে ব্যক্তিবিশেষের অন্যান্য বৈশিষ্ট্যও পরিবর্তিত করা যেতে পারে। দূর ভবিষ্যতে এই গবেষণালব্ধ জ্ঞান পরিকল্পনা অনুযায়ী বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন মানুষ (যেমন খেলোয়াড় বা মনীষী) সৃষ্টির পক্ষে সহায়ক হতে পারে।

উইস্‌কনসিন গবেষণাগারে কৃত্রিম উপায়ে এই জিন সৃষ্টি ভাইরাসজনিত ব্যাধি ও ক্যান্সার প্রতিরোধের নতুন পথ খুলে দিতে পারে, বার্ধক্য প্রক্রিয়া এবং বিভিন্ন প্রকার জীবকোষ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গঠনের রহস্য উন্মোচিত করতে পারে। জিনের স্তরে বংশগত বৈকল্য সংশোধন করে জিনজনিত ব্যাধি নিরাময়ের কোন উপায় বর্তমানে চিকিৎসা-বিজ্ঞানে জানা নেই। এই নতুন গবেষণার দ্বারা শেষ পর্যন্ত গবেষণাগারে ইচ্ছানুযায়ী জিন সৃষ্টি সম্ভব হতে পারে। কিন্তু গবেষণাগারে ইচ্ছানুযায়ী জিন সৃষ্টি এবং রোগ নিরাময়ে তার ব্যবহার অচিরে সম্ভব হবে না, দূর ভবিষ্যতে তা সম্ভব হতে পারে।

তবে কৃত্রিম উপায়ে জীবন সৃষ্টির পথে এখনও বহু স্তর অতিক্রম করতে হবে। জিন সম্বন্ধে বর্তমানে যতটা জানা গেছে, তার চেয়ে জানবার বাকী অনেক বেশী। ডক্টর খোরানা ও তাঁর সহকর্মীরা 77টি নিউক্লিয়োটাইড জুড়ে ঈষ্ট-কোষের একটি অ্যালানাইন ট্র্যান্সফার আর. এন. এ. জিন সংশ্লেষণ করেছেন। কিন্তু মানুষের একটি মাত্র কোষের নিউক্লিয়াস এই ধরণের 6 শত কোটি নিউক্লিয়োটাইড জুড়ে গঠিত হয়। এথেকেই উপলব্ধি করা যায়, গবেষণাগারে মানুষের জিন সৃষ্টির আগে কত বিরাট জটিল পথ অতিক্রম করতে হবে।

জীবনের প্রথম সরল রূপ, যা মানুষ সৃষ্টি করতে পারবে, তা হবে সম্ভবতঃ ভাইরাস। কিন্তু মানুষের সৃষ্টি এই নতুন ভাইরাস নিয়ন্ত্রণে বর্তমান ভেষজগুলি কার্যকর হবে কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন।

বিজ্ঞপ্তি

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের কার্যকরী সমিতির 12-6-70 তারিখের অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবানুসারে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে' বর্তমান মাস হইতে বাংলা সংখ্যার পরিবর্তে ইংরেজী সংখ্যা ব্যবহৃত হইবে। লেখক-লেখিকাগণকে তাঁহাদের লিখিত প্রবন্ধে ইংরেজী সংখ্যা ব্যবহার করিবার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে। —স

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস কর্তৃক পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-6 হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ
37/7 বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

ত্রয়োবিংশ বর্ষ অগাষ্ট, 1970 অষ্টম সংখ্যা

খাদ্যসমস্যার ভয়াবহ রূপ

সুনীতকুমার মুখোপাধ্যায়*

আমরা অনেক দিন থেকেই জানি—ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ। এখনও এই দেশের শতকরা 70 ভাগ লোক চাষের কাজ করেন এবং দেশের উৎপাদন থেকে যে আয় হয়, তার প্রায় শতকরা 70 ভাগই চাষের জমি থেকে আসে। এর কিছু অংশ আসে পাট, চা, তুলা ও লাক্ষা থেকে। এই বিষয়ে ভুল নেই যে, কৃষিপণ্যই আমাদের প্রধান জাতীয় সম্পদ অথচ সেই প্রধান সম্পদেরই আমরা সদ্ব্যবহার করতে পারছি না। দেশে আজ চালের ঘাটতি দেখা যাচ্ছে—মাছ, মাংস, ডিম, দুধ দুর্মূল্য হয়ে উঠছে। আমেরিকার গম না পেলে দেশে দুর্ভিক্ষ রোধ করবার কোন উপায়ই আমরা খুঁজে পাচ্ছি না। কেন এই সঙ্কট?

বর্তমানের এই খাদ্যসমস্যা কেবল ভারতেই সীমাবদ্ধ নয়, সারা পৃথিবীতে এই সমস্যা গুরুত্বপূর্ণ আকার ধারণ করেছে। খাদ্যসমস্যা বৃদ্ধির প্রধান কারণ পৃথিবীর লোকসংখ্যা বৃদ্ধি। 1600 খৃষ্টাব্দে পৃথিবীর মোট জনসংখ্যা ছিল 50 কোটি—বর্তমানে প্রায় 350 কোটিতে দাঁড়িয়েছে। যে হারে লোকসংখ্যা এখনও বাড়ছে, তাথেকে অনুমান হয় 2000 খৃষ্টাব্দে বিশ্বের লোকসংখ্যা 600 কোটিতে দাঁড়াবে।

লোকসংখ্যা বৃদ্ধির হার এভাবে চলতে থাকলে এর পরে যা ঘটতে পারে, তা চিন্তা করাও ভয়াবহ। প্রকৃতির নিয়ম অনুযায়ী, যে পরিমাণ

*ফুড টেক্নোলজি অ্যাণ্ড বায়োকেমিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা-32

খাদ্য উৎপাদন করা সম্ভব হবে. সেই পরিমিত লোকসংখ্যাই পৃথিবীতে থাকতে পারবে। যদি খাদ্যের উৎপাদন যথেষ্ট না বাড়ে, তবে লোকসংখ্যা নিশ্চয়ই সীমিত হবে। কিন্তু কেমন করে তা ঘটবে, আমরা এখনও জানি না। হয়তো বা তা ঘটবে দুর্ভিক্ষ, মহামারী, বিশ্বযুদ্ধ বা পরিবার পরিকল্পনার মাধ্যমে।

জনসংখ্যা বৃদ্ধি সত্ত্বেও পৃথিবীর উন্নত দেশগুলিতে খাদ্যের উৎপাদন যথেষ্ট বেড়েছে। কিন্তু অনুন্নত দেশগুলির অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন হয় নি। 1নং তালিকায় দেখা যাচ্ছে যে, পৃথিবীর কিছু অংশে মাথাপিছু খাদ্য-উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে, কিন্তু এশিয়ার বৃহত্তম অংশে অবস্থার কোন পরিবর্তন ঘটে নি।

1নং তালিকা থেকে আরও দেখা যাচ্ছে যে, অনুন্নত দেশগুলিতে গত কয়েক বছরে মোট খাদ্য-উৎপাদন বৃদ্ধি পেলেও মাথাপিছু খাদ্য-উৎপাদনের কোন তারতম্য হয় নি। কারণ লোকসংখ্যা বৃদ্ধির হার সেখানে অনেক বেশী। এই কারণে এই সকল দেশগুলির খাদ্য তালিকায় পুষ্টিকর খাদ্যের পরিমাণও ক্রমশঃ কমে যাচ্ছে। 2নং তালিকা থেকে দেখা যাচ্ছে—বিশ্বের উন্নতিকামী দেশগুলি কেবলমাত্র শস্যজাতীয় খাদ্যের উপর কতটা নির্ভর করে আছে।

এদিকে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে পৃথিবীতে সবসমেত 3·29 কোটি একর জমি রয়েছে। তার মধ্যে মাত্র শতকরা 11 ভাগ চাষের উপযোগী, 19 ভাগ তৃণভূমি এবং শতকরা 70 ভাগ জমি চাষের অনুপযোগী এবং লোকসংখ্যা যত বাড়ছে, বসতির জন্যে ততই জমির প্রয়োজন হচ্ছে। তাছাড়া বিমান বন্দর, রাস্তা, কলকারখানা প্রভৃতি চাষের জমি দখল করছে। 3নং তালিকায় রয়েছে 1934 সাল থেকে 1961 সাল পর্যন্ত বিভিন্ন দেশে মাথাপিছু চাষের জমি কিভাবে কমেছে, তার হিসাব।

ভারতবর্ষে শতকরা 49 ভাগ জমিই চাষের উপযোগী। কিন্তু বর্তমানে এখানে চাষের উপযোগী আরও জমি পাবার সম্ভাবনা কম। হয়তো বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টায় একদিন মরুঅঞ্চলে চাষ করা সম্ভব হবে, হয়তো সাইবেরিয়ার শীতল অঞ্চলেও চাষের সম্ভাবনা দেখা দেবে। বিজ্ঞান যদি অল্প খরচে বৈদ্যুতিক শক্তি তৈরি করতে পারে, সমুদ্রের জল যদি অল্প খরচে লবণমুক্ত করা সম্ভব হয়, তখন পৃথিবীতে চাষের জমির পরিমাণ আরও বৃদ্ধি করা যাবে।

আমরা আরও জানি—সমুদ্রের মধ্যে বিপুল পরিমাণ খাদ্য সঞ্চিত রয়েছে। পৃথিবীর উপরিভাগের শতকরা 70 অংশ জল, মাত্র 30 অংশ স্থল। এই বিশাল জলভাগ অনুর্বর নয়। এখানে অসংখ্য গাছপালা ও প্রাণী রয়েছে। ছোট ছোট উদ্ভিদ, ফাইটোপ্লাঙ্কটনে (Phytoplankton) ভরা এই সমুদ্র। জমির সমস্ত গাছপালা আলোক-সংশ্লেষণ (Photosynthesis) প্রণালীর সাহায্যে বাতাসের প্রায় 30 ভাগ কার্বন ডায়োক্সাইড (CO_2) গ্রহণ করে অক্সিজেন (O_2) তৈরি করে। বাতাসের বাকী 70 ভাগ কার্বন ডায়োক্সাইড গ্রহণ করে আমাদের অক্সিজেন দিচ্ছে এসব ফাইটোপ্লাঙ্কটন। এই জাতীয় উদ্ভিদকে খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করছে নানা জাতীয় সামুদ্রিক মাছ ও অন্যান্য প্রাণী। যদি ধরা যায়—আমাদের দৈনিক মাথাপিছু 30 গ্রাম প্রাণীজ প্রোটিন প্রয়োজন, তবে সমুদ্রে যে পরিমাণ মাছ আছে, তাথেকে পৃথিবীর বর্তমান লোকসংখ্যার দশগুণ বেশী লোকের প্রোটিনের চাহিদা মেটানো সম্ভব। অথচ বর্তমানে পৃথিবীর জনসংখ্যার যা ক্যালোরি প্রয়োজন, তার মাত্র শতকরা এক ভাগ আসে সমুদ্র থেকে। তবু নিঃসন্দেহে বলা যায়—ভবিষ্যৎ মানুষের খাদ্যসমস্যার সমাধানে সমুদ্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করবে।

বিংশ শতাব্দীতে বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি যথেষ্ট হয়েছে। পারমাণবিক শক্তি মানুষের আয়ত্তে

1নং তালিকা

বিশ্বের খাদ্য উৎপাদনের তুলনামূলক বিবরণ (কমিউনিষ্ট দেশগুলি ছাড়া)*। (1957-59 সালের খাদ্য উৎপাদনের মান 100 ধরা হয়েছে)

	1956	1957	1958	1959	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967
বিশ্বের মোট খাদ্য উৎপাদন	96	96	102	103	106	108	111	114	118	118	124	128
উন্নত দেশগুলির উৎপাদন	96	96	102	102	106	107	110	112	116	117	126	128
উন্নতিকামী দেশগুলির উৎপাদন	96	96	101	103	108	110	112	118	121	120	120	130
বিশ্বের মাথাপিছু খাদ্য উৎপাদন	100	98	102	101	102	102	103	103	105	103	106	107
উন্নত দেশগুলির মাথাপিছু উৎপাদন	98	97	102	101	103	103	105	105	108	107	114	115
উন্নতিকামী দেশগুলির মাথাপিছু খাদ্য উৎপাদন	101	98	101	101	103	102	101	104	104	101	98	104
(1) ভারতবর্ষ	101	96	102	103	106	108	100	104	105	92	88	103
(2) পাকিস্থান	104	99	95	106	108	106	101	111	108	108	100	108
(3) এশিয়ার অন্যান্য দেশ	99	97	102	100	99	101	102	104	104	102	105	105
(4) আফ্রিকা	101	100	100	100	102	97	103	103	102	99	96	98
(5) দক্ষিণ আমেরিকা	101	100	101	99	99	100	101	103	103	107	102	105

(উন্নত দেশগুলির মধ্যে রয়েছে—আমেরিকা, ক্যানাডা, ইউরোপ, রাশিয়া, জাপান, দক্ষিণ আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ড)

(*Economic Research Service, World Food Situation—Prospects of World Grain Production, Consumption and Trade, U. S. Department of Agriculture, Washington, D. C., 1967.)

2নং তালিকা

1959-61 সালে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মাথাপিছু ক্যালোরির পরিমাণ ও সেই ক্যালোরি কত শতাংশ বিভিন্ন খাদ্য থেকে পাওয়া যাচ্ছে—তার হিসাব *

	মোট ক্যালোরি	ক্যালোরি শতাংশ										
		গম	চাল	ভুট্টা	অন্যান্য শস্য	মূলজাতীয় খাদ্য	ডাল ও বাদাম জাতীয় দ্রব্য	চিনি	ফল ও শব্জী	তেল ও ঘি	মাংস, মাছ ও ডিম	দুধ ও দুগ্ধ-জাত খাদ্য
আমেরিকা	3190	17·4	0·9	2·0	0·5	3·1	3·3	15·7	6·2	20·5	16·9	13·5
ক্যানাডা	3100	18·8	0·6	1·0	0·9	4·5	1·9	16·3	4·8	15·1	22·0	14.1
অষ্ট্রেলিয়া	3260	25·2	0·6	0·3	1·0	2·7	1·3	13·4	4·7	14·3	24·8	11·7
উত্তর ইউরোপ	3060	23·4	0·6	0.4	3·6	6·9	1·7	13·4	4·5	17·8	16·4	11·3
মধ্য ইউরোপ	3200	33·2	1·7	1·2	1·1	6·0	1·0	12·4	3·3	12·5	21·0	6·6
দক্ষিণ ইউরোপ	2720	40·1	2·4	2·5	1·3	6·0	4·4	7·6	7·4	15.6	6·9	5·8
পূর্ব ইউরোপ	3000	32·1	1·0	5·7	10·4	7·8	1·3	8·5	2·9	11·4	11·9	6·6
মধ্য আমেরিকা	2240	8·8	9·4	19.2	3·8	12·6	5·9	15·0	4·2	8·6	7·4	5·0
মেক্সিকো	2580	11·1	1·6	42·0	0·2	1·8	8·0	13·0	2·8	8·1	6·1	5·3
দক্ষিণ আমেরিকা	2260	16·9	5·9	13·8	2.2	15·5	3·9	15·9	3·9	7·5	9·0	5·5
ব্রাজিল	2710	8·6	14·5	11·0	0·2	20·9	8·9	15·4	2·3	5·9	8·4	3·9
দক্ষিণ আফ্রিকা	2670	14·0	1·1	39·1	2·5	1·1	1·7	14·0	2·4	5·3	12·4	6·4
পশ্চিম এশিয়া	2350	48·0	4·2	4·2	4·6	1·6	4·1	9·4	7·6	8·1	4·0	4·2
রাশিয়া	3040	35·7	0·8	0·4	16·5	9·9	1·4	9 8	1·9	8·9	8·1	6·6
উত্তর আফ্রিকা	2210	26·4	3·1	7·6	28·6	1·3	5·7	6·1	6·1	6·0	4·3	4·8
ভারতবর্ষ	2060	11·3	33·1	4·0	15·0	2·6	13·2	8·2	2 0	4·2	0·9	5·5
জাপান	2360	11·7	46·9	—	4·6	7 7	5·9	6·7	4·2	5·0	5·0	1·4
পূর্ব এশিয়া	2150	1·8	50·1	7·1	0·6	12·7	6·6	5·2	5·4	5·7	4·1	0·7
দক্ষিণ এশিয়া	2120	19·4	47·1	1·9	3·0	1·0	5·9	6·7	3·6	4·0	3·0	4·4
পশ্চিম ও মধ্যে আফ্রিকা	2460	1·2	5·7	10·0	17·2	45·3	6·5	1·5	1·0	9·0	2·0	0·6
পূর্ব আফ্রিকা	2390	2·3	8·4	34·1	21·8	12·4	6·5	4·3	0·8	3·4	3·6	2·4
কমিউনিষ্ট এশিয়া	1790	12·2	44·3	—	18·1	11·1	5·9	1·2	1·7	3·1	2·3	0·1

*(Economic Research Service, The World Food Budget 1970, U. S. Department of Agriculture, Washington, D. C., October 1964)

3নং তালিকা

মাথাপিছু চাষের জমি (একর হিসাবে), 1934 থেকে 1961 সাল পর্যন্ত*

	1934-38	1948-52	1957/58	1960-61	1934 থেকে কত কম
উত্তর আমেরিকা	1·73	1·53	1·24	1·19	31 শতাংশ
দক্ষিণ আমেরিকা	0·55	0·42	0·45	0·43	22 ,,
পশ্চিম ইউরোপ	0·39	0·35	0·34	0·33	15 ,,
পূর্ব ইউরোপ ও রাশিয়া	1·24	1·10	1·14	1·08	13 ,,
আফ্রিকা	0·59	0·56	0·52	0·53	10 ,,
এশিয়া	0·45	0·45	0·41	0·42	7 ,,
অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ড	1·45	1·15	1·13	1·31	10 ,,
বিশ্বের মোট হিসাব	0·66	0·60	0·56	0·55	15 ,,

(*Brown, L. R., Man, Land and Food : Foreign Agricultural Report No. 11., U. S. Department of Agriculture, Washington, D. C., 1963.)

এসেছে। চন্দ্র-অভিযানও সফল হয়েছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত অল্প খরচে সিন্থেটিক খাদ্য তৈরি করা সম্ভব হয় নি। এখনও আমরা আমাদের খাদ্য উৎপাদনের জন্যে মূলতঃ চাষের জমির উপর নির্ভর করে আছি।

মাথাপিছু জমি যতই কমছে, নিবিড় চাষের দ্বারা বিঘাপ্রতি ফলন বৃদ্ধির প্রয়োজন ততই বাড়ছে। অধিক ফলনশীল বীজ কৃষিপণ্যের উৎপাদন অনেক বাড়িয়েছে—বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে হয়তো আরও বাড়বে। কিন্তু কতদিনে সেই সুফল পাওয়া যাবে, তা জানা নেই। একই জমিতে একাধিক ফলন, সার, সেচের জল, পোকা-মাকড় মারবার ঔষধ, ট্র্যাক্টর ও চাষের অন্যান্য যন্ত্রপাতির ব্যবহারে ফলন বাড়ানো সম্ভব। তাই-ওয়ানের প্রায় সমস্ত জমিতেই বছরে দু-বার ফসল হয়। জাপানে শতকরা প্রায় 60 ভাগ জমিতে দু-বার ফসল ফলানো হয়। ভারতে মাত্র শতকরা 10 থেকে 15 ভাগ জমিতে বছরে দু-বার চাষ হয়। তাই ভারতে বাকী জমিতে দু-বার চাষ করে খাদ্য-উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব। রাসায়নিক সার প্রচলনের পর থেকে তার ব্যবহারও বেড়ে গেছে। ফলনও বাড়ছে ঠিকই।

কিন্তু যেখানে জমির উপর লোকসংখ্যার চাপ রয়েছে—সেখানে ফলন বাড়াবার সঙ্গে সঙ্গে চাষের খরচও বেড়ে যায়। সার, জল, যন্ত্রপাতি ইত্যাদির জন্যে মূলধনের প্রয়োজন। সেই মূলধন কোথায় পাওয়া যাবে—তাও চিন্তার বিষয়। কিন্তু তার পরেও দেখা যাচ্ছে, উৎপাদনের খরচ বেড়ে চলেছে। ভারতবর্ষে চাল উৎপাদন করতে যা খরচ পড়ে, জাপানে তার তিন গুণ খরচ পড়ে। 4নং তালিকায় দেখা যাবে 1959 সালে বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের চাল ও গমের উৎপাদন মূল্যের হিসাব।

4নং তালিকা

1959 সালে বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রে চাল ও গমের উৎপাদন মূল্য ও মাথাপিছু চাষের জমির পরিমাণ*

	কিলোগ্রাম প্রতি গমের মূল্য	মাথাপিছু চাষের জমির পরিমাণ
অস্ট্রেলিয়া	6·2 আমেরিকান সেন্ট	6·6 একর
ক্যানাডা	5·4 ,,	5·8 ,,
পশ্চিম জার্মেনী	10·1 ,,	0·4 ,,
ভারতবর্ষ	9·0 ,,	0·9 ,,
জাপান	10·2 ,,	0·2 ,,
পাকিস্তান	7·2 ,,	0·7 ,,
মিশর	7·7 ,,	0·3 ,,
ইংল্যাণ্ড	7·5 ,,	0·3 ,,
আমেরিকা	6·4 ,,	2·6 ,,
	ধানের মূল্য	
থাইল্যাণ্ড	4·5 ,,	1·1 ,,
ভারতবর্ষ	5·2 ,,	0·9 ,,
জাপান	17·7 ,,	0·2 ,,
সিংহল	12·1 ,,	0·4 ,,

* (Brown, L. R. etc.)

জাপানে মাথাপিছু জমির পরিমাণ এত কম যে, বিঘাপ্রতি ফলন বাড়ানো ভিন্ন খাদ্যসমস্যা সমাধানের অন্য সহজ পথ নেই।

1964 সালে শিকাগো শহরে আমেরিকান রাসায়নিক সংস্থার সভায় প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ Dr. Raymond Ewell বলেছিলেন—পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে বড় দুর্ভিক্ষ 1970 সাল থেকে 1980 সালের মধ্যে সারা এশিয়ার উপর ছড়িয়ে পড়বে এবং 1980 সালের পর আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকায় এই একই বিপদ দেখা দেবে। তিনি বলেছিলেন—পরিবার পরিকল্পনা ছাড়া এর হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার সহজ উপায় নেই। কিন্তু যতদিন না পরিবার পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা সমস্ত লোক উপলব্ধি করবেন ও তার সুফল পাওয়া যাবে, ততদিন পর্যন্ত সমাধানের একমাত্র পথ হচ্ছে—রাসায়নিক সারের ব্যবহার বৃদ্ধি করা। বর্তমানে বছরে যত রাসায়নিক সার ব্যবহার করা হচ্ছে, তার দশ গুণ সারের প্রয়োজন হবে 1980 সালে। এর ফলে অবস্থার কোন পরিবর্তন হবে না। 1964 সালে মাথাপিছু শস্য-উৎপাদন যা হচ্ছিলো, 1980 সালেও তাই হবে। তার কারণ, ইতিমধ্যে লোকসংখ্যা অনেক বেড়ে যাবে। 1980 সালের অবস্থায় পৌঁছুতে হলে ভারতবর্ষে প্রতি বছর একটি করে সিন্ধ্রীর মত সারের কারখানা তৈরি করা প্রয়োজন।

আরও তলিয়ে দেখলে আমাদের খাদ্যসমস্যার প্রকৃত রূপ প্রকাশ পাবে। জমি থেকে আমাদের খাদ্য দু-ভাবে আসে। প্রথমতঃ, জমিতে সরাসরি বা প্রত্যক্ষভাবে যা উৎপন্ন হয়; যেমন—নানাবিধ শস্য, ফলমূল, শাকসব্জি, তৈলবীজ ইত্যাদি। দ্বিতীয়তঃ, জমির ফসল রূপান্তরিত হয়ে পরোক্ষভাবে কিছু খাদ্যের উৎপাদন হয়। শস্য বা অন্যান্য ফসল প্রাণীদের খাইয়ে আমরা অনেক পুষ্টিকর রূপান্তরিত খাদ্য পাই; যেমন—মাংস, ডিম ও দুধ। কিন্তু মাংস, ডিম ও দুধ উৎপাদনে কিছু অসুবিধা আছে। শস্যজাতীয় খাদ্য রূপান্তরিত করে মাংস, ডিম বা দুধ উৎপাদন করলে তার পরিমাণ অনেক কমে যায়। প্রায় 800 ক্যালোরির সমান শস্যজাতীয় খাদ্য প্রাণীকে খাওয়ালে মাত্র 100 ক্যালোরির সমান খাদ্য মাংস, ডিম বা দুধ হিসাবে পাওয়া যায়। তাই ডিম, দুধ ও মাংস শস্যজাতীয় খাদ্য অপেক্ষা অনেক বেশী দামী।

অনেকের ধারণা, ভারতবর্ষে মাত্র শতকরা পাঁচ ভাগ কি দশ ভাগ খাদ্যের ঘাটতি আছে এবং সেটুকু চাল ও গম উৎপাদন করতে পারলেই এই দেশ খাদ্যে স্বাবলম্বী হবে। এই ধারণায় অনেক ভুল রয়েছে। ভারতবর্ষে চাষের জমি থেকে যে খাদ্য সরাসরি উৎপন্ন হয়, তাথেকে ভারতবাসী মাথাপিছু প্রায় 2500 ক্যালোরি পেতে পারেন। আর আমেরিকায় চাষের জমিতে প্রত্যক্ষভাবে যে খাদ্য উৎপাদন করা হয়, তাথেকে একজন আমেরিকান প্রতিদিন প্রায় 10000 ক্যালোরি পেতে পারেন। অথচ একটি সুস্থ, সবল, বয়স্ক লোকের দৈনিক মাত্র 2500 থেকে 3000 ক্যালোরির প্রয়োজন। আমেরিকার এই বাড়্‌তি ফসল পশুপালনে সাহায্য করছে। তার ফলে রূপান্তরিত খাদ্য ডিম, দুধ, মাংস যথেষ্ট পাওয়া যাচ্ছে। সেখানে উৎপন্ন ভুট্টা ও সয়াবীনের প্রায় শতকরা 80 ভাগই গরু, শূকর ও মুরগীদের খাওয়ানো হয়। যথেষ্ট পরিমাণে জমির ফসল বাড়্‌তি না হলে দুধ, ডিম বা মাংসের উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব নয়। গত মহাযুদ্ধে বাইরে থেকে খাদ্যশস্য আমদানীর অসুবিধার জন্যে ইংল্যাণ্ড তাদের দেশে পশুপালনের হার কমিয়ে দিয়েছিল। ফলে যে বাড়্‌তি জমির ফসল পাওয়া গেল, তা সেই দেশকে সাময়িক বিপদের হাত থেকে রক্ষা করেছিল। তাই দেখা যাচ্ছে—খাদ্য উৎপাদনে আমেরিকার সমকক্ষ হতে হলে ভারতবর্ষকে খাদ্যের উৎপাদন চতুর্গুণ বাড়াতে হবে।

এথেকে অনুমান করা যায়—ভারতবর্ষের খাদ্য-সমস্যা সামান্য নয়।

এই বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, বর্তমানে ভারতবর্ষে সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন—জমিতে যত প্রকারের ফসল হতে পারে, সব কিছুরই উৎপাদন বাড়াবার উপর গুরুত্ব দেওয়া। কিন্তু জমিতে সরাসরি অনেক রকমের উদ্ভিজ্জ খাদ্যের উৎপাদন হয়, যেমন—শস্য, ফলমূল, শাকসব্জি, আখ, তৈলবীজ ইত্যাদি। এর মধ্যে কোন্ খাদ্য উৎপাদনের উপর বেশী গুরুত্ব দেওয়া উচিত, সে বিষয়েও চিন্তা করা দরকার।

প্রথমে দেখা যাক—ভারতবর্ষে এখন কি উৎপন্ন হয়। এখানে বছরে প্রায় 9 কোটি টন শস্যজাতীয় খাদ্য, 2 কোটি টন তৈলবীজ, 2 কোটি টন শাকসব্জি, পৌনে এক কোটি টন ফল ও 8 কোটি টন আখ উৎপন্ন হয়। শাকসব্জি ও ফলমূলে শস্য ও তৈলবীজের তুলনায় প্রচুর জল থাকে। সেই হিসাবে শুষ্ক অবস্থায় এই সব্জির ওজন হবে আধ কোটিরও কম, আর এই ফলের মোট ওজন হবে মাত্র দশ লক্ষ টন। তাই শস্যজাতীয় খাদ্যের তুলনায় সব্জী ও ফলের উৎপাদন এদেশে অনেক কম।

অথচ যাঁরা ফল বা সব্জি চাষ করেন, তাঁরা জানেন অধিকাংশ ফল বা সব্জির বিঘাপ্রতি ফলন শস্যজাতীয় খাদ্যের ফলনের চেয়ে বেশী। নিম্নের তালিকায় কয়েকটি খাদ্যের তুলনামূলক উৎপাদনের হিসাব দেওয়া রয়েছে।

গম, কলা, পেঁপে ও মিষ্টি আলুর তুলনামূলক উৎপাদন*

	একর প্রতি উৎপাদন	একর প্রতি উৎপাদিত ক্যালোরির পরিমাণ
গম	0·34 টন	1,034,880
কলা	10·00 „	15,052,8000
পেঁপে	48·00 „	18,923,520
মিষ্টি আলু	3·00 „	5,500,000

* (J. Science Club, Dec.-Feb., 1966-67)

শাকসব্জি, ফলমূল ফলাতে পারলে একই জমি থেকে অধিক খাদ্য পাওয়া সম্ভব। তবু বর্তমানে এই দেশে সব্জি ও ফলের উৎপাদন খুবই কম। এখানে শাকসব্জির দামও শস্যজাতীয় খাদ্যের তুলনায় অধিকাংশ সময়েই বেশী থাকে। এই জাতীয় খাদ্যের উৎপাদন কম হবার প্রধান কারণ—এগুলি তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায় বা পচে যায়; শস্যজাতীয় খাদ্যের মত সাধারণভাবে ঘরে অনেক দিন রাখা যায় না।

খাদ্য সম্পর্কে অর্থনীতির নিয়ম এই যে—মানুষের পেট যখন ভরে যায়, তখন বাড়্তি খাবার বাজারে সস্তায় পাওয়া গেলেও তার কোন চাহিদা হবে না (Law of inflexible demand)। তাই বিশেষ বিশেষ ঋতুতে বাড়্তি সব্জি ও ফল শুধু যে নষ্ট হয় তাই নয়—সব্জি ও ফলের ফলন বাড়াতে চাষীরা উৎসাহ পান না। অথচ এই সাময়িক বাড়্তি ফল ও সব্জি সংরক্ষণ করে রাখতে পারলে বছরের অন্যান্য সময়ে তার সদ্ব্যবহার হতে পারে। সব্জি ও ফল সংরক্ষণের সহজ উপায় যখন অল্প খরচে করা সম্ভব হবে, তখন এই জাতীয় খাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করা নিশ্চয়ই সহজ হয়ে উঠবে।

কিন্তু এর পরেও সমস্যার স্থায়ী সমাধান হয়তো হবে না। কারণ লোকসংখ্যা যে হারে বাড়ছে, সে হারে খাদ্য উৎপাদন করা কঠিন হয়ে পড়বে। একথা প্রায় 180 বছর আগে বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ম্যালথাস বলেছিলেন।

তাই বিজ্ঞানীরা এমন খাদ্যের কথা ভাবছেন, যা অল্প দিনে খুব তাড়াতাড়ি উৎপাদন করা সম্ভব। কোন কোন ক্ষুদ্র জীবাণু ও গুল্মজাতীয় গাছকে খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করতে পারলে সেই দিক থেকে কিছু সুরাহা হতে পারে। তার কারণ, এরা গাছপালার তুলনায় অনেক দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পায়। 457 পৃষ্ঠার তালিকায় গাছপালা ও জীবজন্তুর তুলনামূলক বৃদ্ধির হার দেখানো হয়েছে।

জীব	দ্বিগুণিত হতে কোন্ জীবের কত সময় লাগে (Mass doubling time)
জীবাণু (Bacteria)	20-120 মিনিট
ছত্রাক ও শ্যাওলাজাতীয় উদ্ভিদ (Mold and Algae)	2-6 ঘণ্টা
ঘাস	1-2 সপ্তাহ
মুরগী	4-6 সপ্তাহ
শূকর	1-2 মাস
মানুষ	6 মাস

দেখা যাচ্ছে—ছত্রাক ও ক্ষুদ্র জীবাণু গাছপালা ও প্রাণীদের তুলনায় অনেক তাড়াতাড়ি বাড়তে পারে। সেই জন্যে Bacteria, Yeast, ছত্রাক বা শ্যাওলাজাতীয় উদ্ভিদকে খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করতে পারলে খাদ্য-উৎপাদন খুব তাড়াতাড়ি করা সম্ভব হয়ে উঠবে।

খাদ্যগুণের কথা চিন্তা করলে এই সব জীবাণু খাদ্য হিসাবে খারাপ নয়। বিশেষতঃ এতে প্রোটিনের পরিমাণ অনেক বেশী আছে। স্বাদের দিক থেকেও এদের খাদ্যোপযোগী করে তোলা হয়তো সম্ভব হবে। তাছাড়া এই সব জীবাণুর মধ্যে শর্করা, নানাপ্রকার ভিটামিন ও খনিজ পদার্থও আছে।

এই সব জীবাণু নানা প্রকার বস্তু থেকে আমাদের উপযোগী খাদ্য—শর্করা, প্রোটিন, ভিটামিন ইত্যাদি সংশ্লেষণ করতে পারে। পেট্রোলিয়ামের অপ্রয়োজনীয় অংশকে (কতকগুলি বিশেষ Hydrocarbons) খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করে কোন কোন জীবাণু বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। অ্যামোনিয়াম সালফেট, ইউরিয়া ইত্যাদি সহজ নাইট্রোজেনঘটিত রাসায়নিক পদার্থ থেকে এরা প্রোটিন তৈরি করতে পারে। ঠিক এমনিভাবেই গাছও আমাদের জন্যে খাদ্য তৈরি করে দেয়—বাতাসের কার্বন ডায়োক্সাইড, জল ও বাতাসের নাইট্রোজেন কিংবা জমির নাইট্রোজেনঘটিত যৌগিক পদার্থকে সংশ্লেষণ করে। তবে জীবাণুর ক্ষেত্রে সুবিধা এই যে, এদের বাড়বার ক্ষমতা অনেক বেশী। তাছাড়া এদের শরীরে প্রোটিনের পরিমাণও অনেক বেশী। পৃথিবীতে বর্তমানে প্রোটিনের অভাব যত বেশী, শর্করাজাতীয় খাদ্যের অভাব তত নয়।

তাই ক্ষুদ্রতম জীবাণুকে খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করবার পরিকল্পনা নতুন সম্ভাবনা নিয়ে ভবিষ্যতে মানুষের কাছে আসবে। এই বিষয়ে যথেষ্ট গবেষণা চলছে। মনে হয় আরও নতুন পথের সন্ধান আমরা পাব।

"যদি দেশটাকে বৈজ্ঞানিক করিতে হয়, আর তাহা না করিলেও বিজ্ঞান শিক্ষা প্রকৃষ্টরূপে ফলবতী হইবে না, তাহা হইলে বাঙ্গালা ভাষায় বিজ্ঞান শিখিতে হইবে। দুই চারিজন ইংরেজিতে বিজ্ঞান শিখিয়া কি করিবেন?...তাহাতে সমাজের ধাতু ফিরিবে কেন? সামাজিক 'আবহাওয়া' কেমন করিয়া বদলাইবে? কিন্তু দেশটাকে বৈজ্ঞানিক করিতে হইলে যাহাকে তাহাকে যেখানে সেখানে বিজ্ঞানের কথা শুনাইতে হইবে। কেহ ইচ্ছা করিয়া শুনুক আর নাই শুনুক, দশবার বলিলে দুইবার শুনিতেই হইবে। এইরূপ শুনিতে শুনিতেই জাতির ধাতু পরিবর্তিত হয়। ধাতু পরিবর্তিত হইলেই প্রয়োজনীয় শিক্ষার মূল সুদৃঢ়রূপে স্থাপিত হয়। অতএব বাঙ্গালাকে বৈজ্ঞানিক করিতে হইলে বাঙ্গালীকে বাঙ্গালা ভাষায় বিজ্ঞান শিখাইতে হইবে।"

—বঙ্গে বিজ্ঞান (বঙ্গদর্শন, কার্তিক, ১২৮৯)

লিউকেমিয়া

সমর চক্রবর্তী*

যে কোন সুস্থ, তথা স্বাভাবিক মানুষের দেহে রক্তকণিকা থাকে তিন ধরণের; যথা—লোহিত কণিকা, শ্বেত কণিকা ও প্লেট্‌লেটস। এই তিন ধরণের কোষ বা কণিকা রক্তরস অর্থাৎ প্লাজ্‌মার মধ্যে উপস্থিত থেকে রক্তের স্বাভাবিক কর্ম পরিচালনার সাহায্য করে। উৎপত্তি এবং আকৃতি অনুযায়ী শ্বেত কণিকাকে ভাগ করা হয় প্রধানতঃ তিন ভাগে; যথা—লিম্ফোসাইট, মনোসাইট ও গ্র্যানুলোসাইট। এদের প্রথম দুটি অর্থাৎ লিম্ফোসাইট ও মনোসাইটের উৎপত্তি দেহাভ্যন্তরস্থ লসিকা গ্রন্থি বা Lymph node থেকে; অন্যদিকে গ্র্যানুলোসাইট উৎপন্ন হয় দেহের বিভিন্ন অস্থি-র আভ্যন্তরীণ কোষসমূহ অর্থাৎ মেরুমজ্জা থেকে (চিত্র-1)। সাধারণভাবে লোহিত কণিকার কাজ হলো ফুস্‌ফুস থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করে দেহের বিভিন্ন কোষে বিতরণ করা এবং কোষের বর্জ্য পদার্থ কার্বন ডায়োক্সাইড বহন করে ফুস্‌ফুসের মাধ্যমে দেহের বাইরে বের করে দেওয়া। এক কথায় দেহের সমস্ত কোষতন্ত্রকে সক্ষম ও সতেজ রাখবার জন্যে লোহিত কণিকা অপরিহার্য। অন্য দিকে শ্বেত কণিকার প্রধান কাজ হলো, বিভিন্ন বহিঃশত্রুর (ভাইরাস, ব্যাকটিরিয়া ইত্যাদি) আক্রমণ থেকে দেহকে রক্ষা করা। অন্যান্য কাজের সঙ্গে রক্তক্ষরণ বন্ধ করা এবং রক্তবাহী নালীগুলিকে সুসংবদ্ধ, তথা সুদৃঢ় করে রাখাই হলো প্লেট্‌লেটের কাজ (চিত্র-1)।

স্বাভাবিক অবস্থায় মানবদেহে শ্বেত কণিকাসহ বিভিন্ন রক্ত-কোষ একটি নির্দিষ্ট মাত্রায় বিভাজিত হয় এবং রক্ত-সংবহনতন্ত্রে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যায় বর্তমান থাকে; যেমন—একটি পূর্ণবয়স্ক মানবদেহে শ্বেত কণিকার আনুপাতিক সংখ্যা স্বাভাবিক অবস্থায় 5000 থেকে 6000-এর মধ্যে। অন্য দিকে লিউকেমিয়ায় আক্রান্ত ব্যক্তির দেহে অস্বাভাবিক বৃদ্ধি এবং বিভাজনের ফলে শ্বেত কণিকার সংখ্যা বেড়ে গিয়ে দাঁড়ায় এক লক্ষ অথবা আরও বেশী। বলা বাহুল্য, রক্তের মধ্যে এই অতিরিক্ত শ্বেত কণিকা শুধু অপ্রয়োজনীয়ই নয়, ক্ষতিকারকও বটে। এই অসুস্থ শ্বেত কণিকা তার স্বাভাবিক কার্য পরিচালনায় অক্ষম এবং অনেকের মতে এরা বিভিন্ন রক্তকণিকা উৎপাদনকারী কোষগুলিকে (মেরুমজ্জা এবং লসিকা গ্রন্থি) আক্রমণ করে এবং লোহিত কণিকাসহ সমস্ত সুস্থ রক্তকণিকার উৎপাদন ভীষণভাবে ব্যাহত করে। এর ফল হয় সুদূরপ্রসারী; পুনরুৎপাদন না হবার ফলে রক্ত-সংবহনতন্ত্রে লোহিত কণিকার সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস পেতে থাকে এবং তার ফলে রোগীর দেহে রক্তাল্পতা দেখা দেয়; প্লেট্‌লেটের সংখ্যাল্পতার জন্যে মাড়ী, নাক, ঠোঁট প্রভৃতি অংশ থেকে সুরু হয় অনিয়মিত রক্তক্ষরণ। তাছাড়া উপস্থিত শ্বেত কণিকা তাদের স্বাভাবিক কার্য সম্পাদনে অক্ষম হয়ে পড়ায় দেহের রোগ-প্রতিরোধক ক্ষমতাও উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়ে যায়। একটি সাম্প্রতিক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, পৃথিবীর আশী থেকে নব্বই ভাগ লিউকেমিয়ায় আক্রান্ত রোগীর মৃত্যুর কারণই হলো অনিয়মিত রক্তক্ষরণ ও রোগ প্রতিরোধে অক্ষমতা।
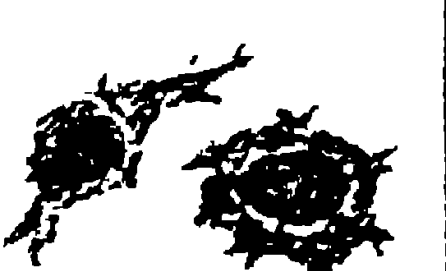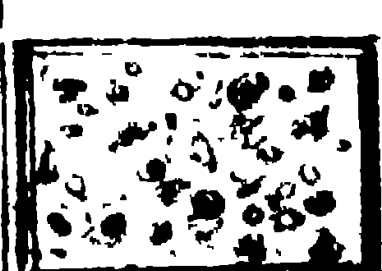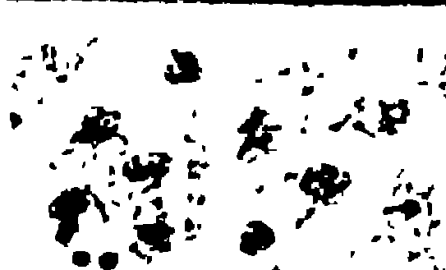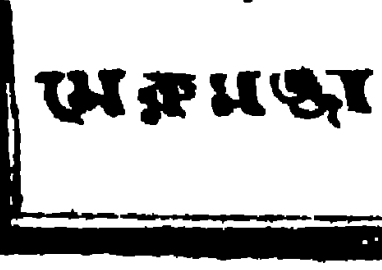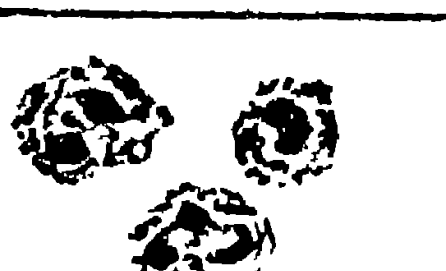
কোন্ ধরণের কোষ বিশেষভাবে আক্রান্ত হয়েছে অর্থাৎ কোন্ কোষগুলি বৃদ্ধি এবং বিভাজনে স্বাভাবিকতার মাত্রা লঙ্ঘন করেছে,

---

*কোষ-বিজ্ঞান গবেষণাগার, প্রাণিবিদ্যাবিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়।

তার উপর নির্ভর করে বলা যায়, লিউকেমিয়া সাধারণতঃ দুই ধরণের—লিম্ফোসাইটিক ও গ্র্যানুলোসাইটিক (চিত্র-2,3)। এর প্রথম ক্ষেত্রে অর্থাৎ লিম্ফোসাইটিক লিউকেমিয়াতে লিম্ফ নোড বা লসিকা গ্রন্থি থেকে উৎপন্ন লিম্ফোসাইট কোষসমূহের বৃদ্ধি এবং বিভাজন নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে অস্বাভাবিকতা। রোগের তীব্রতার উপর ভিত্তি করে উপরিউক্ত দুই ধরণের লিউকেমিয়াকে আবার ভাগ করা হয় প্রধানতঃ দুই ভাগে; যথা—সঙ্কটাপন্ন ও দীর্ঘস্থায়ী।

আশ্চর্যের বিষয়, এই লিউকেমিয়া—এত যার তীব্রতা, এত যার ব্যাপকতা—তার উৎপত্তির কারণ

উৎপত্তিস্থল	মাতৃকোষ	রক্ত কণিকা	মুখ্য কার্য
লসিকা গ্রন্থি	অপরিণত লিম্ফোসাইট	পরিণত লিম্ফোসাইট	অ্যান্টিবডি উৎপাদনে সাহায্য করে। সংখ্যাল্পতায় রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস পায়
	অপরিণত লোহিতকণিকা	পরিণত লোহিতকণিকা	বিভিন্ন কোষতন্ত্রে O_2 বিতরণ এবং কোষের বর্জ্য পদার্থ CO_2 অপসারণ। সংখ্যাল্পতায় রক্তশূন্যতা।
	মেগাক্যারিওসাইট	প্লেটলেটস	রক্তবহা নালীসমূহকে সুসংবদ্ধ ও দৃঢ় রাখা। সংখ্যাল্পতায় অনিয়মিত রক্তক্ষরণ।
মেরুমজ্জা	অপরিণত শ্বেতকণিকা	পরিণত শ্বেতকণিকা	বিভিন্ন বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেহকে রক্ষা করা। সংখ্যাল্পতায় রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস পায়

1নং চিত্র

যায়। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে অর্থাৎ গ্র্যানুলোসাইটিক লিউকেমিয়াতে মেরুমজ্জা থেকে উৎপন্ন কোষসমূহে দেখা দেয় বৃদ্ধি ও বিভাজনজনিত আকস্মিক কিন্তু আজও আমাদের কাছে অজ্ঞাত। বিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের এই অগ্রগতির দিনেও কোন বিজ্ঞানীই এর উৎপত্তির কারণ সম্বন্ধে স্থির

নিশ্চিত নন। এঁদের অনেকের মতে, Ionising radiation বা রণ্টগেন-রশ্মির প্রভাবই লিউকেমিয়া উৎপত্তির অন্যতম কারণ। তাঁরা বলেন যে, কোন ব্যক্তি এই রশ্মির দ্বারা প্রভাবিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই যে লিউকেমিয়ায় আক্রান্ত হবেন তা নয়, রণ্টগেন-রশ্মির প্রভাবজনিত এই পরিণাম পনেরো বছর পরেও অনুভূত হতে পারে। প্রতিপালিত অনেক প্রাণীর (যেমন—সাদা ইঁদুর ও কোন কোন পাখী) লিউকেমিয়ার জন্যে প্রত্যক্ষভাবে বিভিন্ন ভাইরাসই দায়ী।

লিউকেমিয়ার উৎপত্তি যেভাবেই হোক না কেন, এই বিষয়ে আজ কোন সন্দেহই নেই যে,লিউকেমিয়ায় আক্রান্ত কোষের প্রজননতন্ত্রে (Genetic machinery) এমন একটা পরিবর্তন আসে, যা শুধু
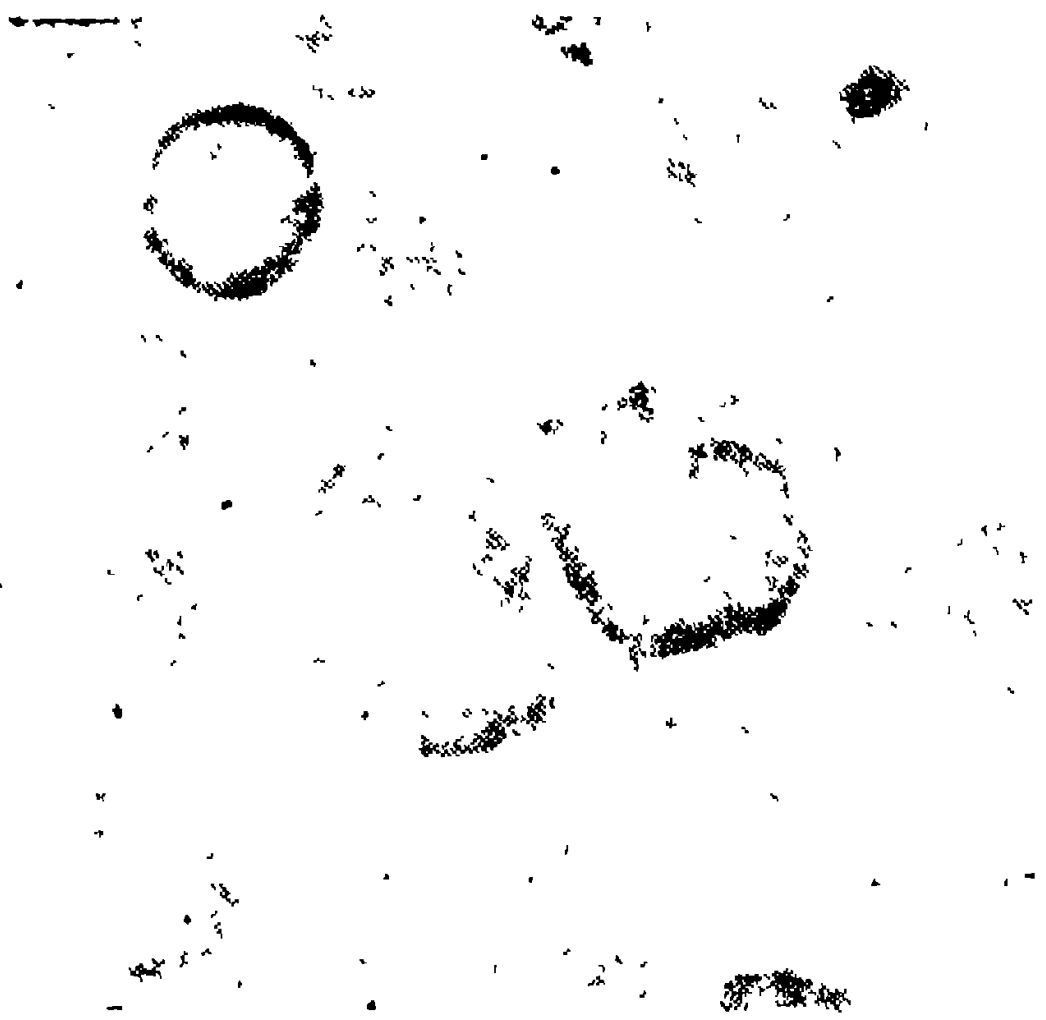
2নং চিত্র

3নং চিত্র

অন্য দিকে এই মতের বিরোধীরা বলেন, রণ্টগেন-রশ্মির প্রভাব লিউকেমিয়ার কোন যুক্তিগ্রাহ্য কারণই নয়; কারণ এমন অনেক লিউকেমিয়ার রোগী দেখা গেছে, যাঁরা পূর্বে কখনও রণ্টগেন-রশ্মির দ্বারা প্রভাবিত হন নি। এই বিষয়ে অন্য ধারণার প্রবক্তাদের মতে, ভাইরাসই লিউকেমিয়া উৎপত্তির অন্যতম কারণ। এই মতবাদ নস্যাৎকারীদের একটা মন্তব্যই ভাইরাস-প্রকল্প মিথ্যা প্রমাণের পক্ষে যথেষ্ট। তাঁরা বলেন, ভাইরাসজনিত যে কোন রোগই সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী সংক্রামক। বলা বাহুল্য, আজ পর্যন্ত এমন কোন নিদর্শন পাওয়া যায় নি, যা থেকে আমরা লিউকেমিয়া সম্পর্কে উপরিউক্ত মন্তব্য করতে পারি। তবে একথা ঠিক যে, মানুষের ক্ষেত্রে না হলেও গবেষণাগারে কোষের স্বাভাবিক কাজকর্মেই ব্যাঘাত ঘটায়—তা নয়, পারিপার্শ্বিক সমগোত্রীয় কোষসমূহের কর্মক্ষমতাও ভীষণভাবে ব্যাহত করে। যে কোন সুস্থ কোষের যাবতীয় কার্য নিয়ন্ত্রণ করে কোষমধ্যস্থিত DNA বা ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড। এই ডি-এন-এ-ই হলো জেনেটিক কোড-এর মূল কথা। বলা বাহুল্য, ডি-এন-এ-র আণবিক গঠনে যে কোন পরিবর্তনই প্রতিবিম্বিত হবে কোষের দৈনন্দিন কার্য পরিচালনায়। ঠিক একই কারণে লিউকেমিয়ায় আক্রান্ত প্রতিটি কোষের অভ্যন্তরস্থ ডি-এন-এ-র আণবিক গঠনের সামান্যতম পরিবর্তনই রোগীর বাস্তব জীবনে এনে দেয় বিরাট বিপর্যয়।

লিউকেমিয়ার উৎপত্তির কারণ সম্বন্ধে যথেষ্ট মতবিরোধ থাকা সত্ত্বেও একটি বিষয়ে আজ

বিজ্ঞানীরা একমত যে, রোগের প্রকৃতির সঙ্গে রোগীর বয়সের একটা নির্দিষ্ট সম্পর্ক বর্তমান। যেমন, লিম্ফোসাইটিকে লিউকেমিয়ায় প্রায় সব বয়সের লোক আক্রান্ত হলেও এর সঙ্কটাপন্ন অবস্থা বেশী দেখা যায় তিন থেকে পাঁচ বছরের শিশুদের মধ্যে, অথচ এই রোগ দীর্ঘস্থায়ী হয় সাধারণতঃ পঞ্চাশ থেকে সত্তর বছর বয়সের বৃদ্ধদের মধ্যে। অন্য দিকে গ্র্যানুলোসাইটিক লিউকেমিয়ার সঙ্কটাপন্ন অবস্থা অল্প বয়স্ক যুবকদের মধ্যে বেশী দেখা গেলেও এর দীর্ঘস্থায়ী অবস্থা সাধারণতঃ তিরিশ থেকে পঞ্চাশ বছর বয়স্ক প্রবীণদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানে জীবজগতের ক্রমবিবর্তন থেকে সুরু করে মানব দেহের হৃদয় পরিবর্তন পর্যন্ত সব কিছুর চাবিকাঠিই যখন বিজ্ঞানীদের হাতের মধ্যে, তখনও কিন্তু লিউকেমিয়ার উপযুক্ত প্রতিষেধক অনাবিষ্কৃত। অবশ্য এই বিষয়ে চেষ্টার ত্রুটি নেই, বিজ্ঞানীদের গবেষণারও অন্ত নেই। এই চেষ্টার ফলস্বরূপ আজ কিছু কিছু প্রতিষেধক আবিষ্কৃত হলেও সম্পূর্ণরূপে লিউকেমিয়া রোগ-মুক্তি আজও একান্তই নাটকীয় ঘটনা। তবে আংশিক আরোগ্য এবং রোগের বাহ্যিক লক্ষণসমূহ দূরীকরণের কাজে আধুনিক অনেক প্রতিষেধক বেশ ফলপ্রদ। যে সব রাসায়নিক পদার্থ প্রতিষেধকরূপে প্রচলিত, তার মধ্যে মেথোট্রিক্সেট, লিউকেরন, মারক্যাপটোপিউরিণ ভিন্‌ক্রিস্টিন ইত্যাদির নাম উল্লেখযোগ্য। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় দেখা গেছে—মেথোট্রিক্সেট সহ উপরিউক্ত প্রায় সমস্ত প্রতিষেধকই আক্রান্ত কোষের ডি-এন-এ সংশ্লেষণ বন্ধ করে কোষ-বিভাজন ব্যাহত করে।

মাত্র কিছুদিন আগে, 1969 সালের মাঝামাঝি লিউকেমিয়ার দুটি প্রতিষেধক চিকিৎসা-ক্ষেত্রে আলোড়ন এনেছে। এদের একটি হলো সাইটোসিন অ্যারাবিনোসাইড ও অপরটি এল-অ্যাসপ্যারাজাইনেজ। এদের প্রথমটির আবিষ্কর্তা ডাঃ গর্ডন জিউব্রডের মতে, সাইটোসিন অ্যারাবিনোসাইড সমসাময়িক অন্যান্য প্রতিষেধক অপেক্ষা অনেক বেশী কার্যকরী, বিশেষতঃ গ্র্যানুলোসাইটিক ও লিম্ফোসাইটিক লিউকেমিয়ায় আক্রান্ত রোগীর সঙ্কটাপন্ন অবস্থায়। ঐ একই বছরে হারভার্ড মেডিক্যাল স্কুলের অধ্যাপক ন্যাজার্স ও তাঁর সহকর্মীরা পরীক্ষাগারে দেখান যে, এল-অ্যাসপ্যারাজাইনেজ নামে ব্যাক্‌টিরিয়া ই. কোলাই-এর দেহনিঃসৃত একটি জারক রস বা এন্‌জাইম লিউকেমিয়ায় আক্রান্ত মানব-কোষের অব্যর্থ প্রতিষেধক। আবিষ্কর্তাদের মতে, সাইটোসিন অ্যারাবিনোসাইড ও এল-অ্যাসপ্যারাজাইনেজের অপর একটি বিশেষত্ব হলো, এরা নির্দিষ্টভাবে লিউকেমিয়ায় আক্রান্ত কোষসমূহের বিভাজনই ব্যাহত করে, পারিপার্শ্বিক সুস্থ কোষের উপর এদের প্রভাব উপেক্ষণীয় (সম্প্রতি কলকাতায় জাতীয় ক্যান্সার গবেষণা কেন্দ্রের দু-জন বিজ্ঞানীও তাঁদের নব আবিষ্কৃত প্রতিষেধক সম্বন্ধে অনুরূপ দাবী করেছেন)।

এখন প্রশ্ন হতে পারে—এত প্রতিষেধক থাকা সত্ত্বেও সম্পূর্ণরূপে লিউকেমিয়া রোগ-মুক্তি আজও সম্ভব নয় কেন? একথা আমরা জানি, মাত্র একটি লিউকেমিয়া আক্রান্ত কোষের উপস্থিতি একটি সুস্থ মানুষকে লিউকেমিয়া রোগাক্রান্ত করে তুলতে পারে। তাই লিউকেমিয়া আক্রান্ত রোগীকে সম্পূর্ণ আরোগ্য করে তুলতে হলে যাবতীয় অসুস্থ শ্বেত কণিকা নির্মূল করা আবশ্যক। দুর্ভাগ্যের বিষয়, আজ পর্যন্ত যে সব প্রতিষেধক আবিষ্কৃত হয়েছে, তার কোনটাই সম্পূর্ণরূপে লিউকেমিয়া কোষ-পরিবারকে নির্মূল করতে সক্ষম নয়। কারণ মানবদেহে এমন কতকগুলি অংশ আছে, যেগুলি সাধারণভাবে প্রায় সমস্ত প্রতিষেধকের কাছেই অভেদ্য; উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, মস্তিষ্ক ও সুষুম্না কাণ্ডের আবরণী, সুষুম্না কাণ্ডের অভ্যন্তরস্থ তরল

পদার্থ প্রভৃতি। দেখা গেছে, বেশ কিছু সংখ্যক লিউকেমিয়া কোষ দেহের এই সব নিরাপদ অংশে আশ্রয় নিয়ে সম্পূর্ণ ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পায়। তাছাড়া পারিপার্শ্বিক কোষতন্ত্রের উপর এদের ক্ষতিকর প্রভাবের জন্যে অনেক ক্ষেত্রেই প্রতিষেধকের পরিমাণ সীমিত রাখতে হয়।

অনেক অসুবিধা, অনেক ব্যর্থতা সত্ত্বেও এই অল্প সময়ের ব্যবধানে যে সাফল্য অর্জিত হয়েছে, তাথেকে গবেষণারত বিজ্ঞানীদের মনে, শত-সহস্র আশাবাদী মানুষের মনে এই ধারণাই জন্মেছে যে, সেই অনাগত মুহূর্ত হয়তো খুব দূরে নয়, যখন আমরা লিউকেমিয়া রোগাক্রান্ত রোগীকে তাদের রোগমুক্তি সম্পর্কে নিশ্চিত আশ্বাস দিতে পারবো।

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান-চর্চা—অতীত ও বর্তমান

শ্রীত্রিদিবরঞ্জন মিত্র

বাংলা দেশে আধুনিক বিজ্ঞান-চর্চার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এদেশে হাতে-কলমে আধুনিক বিজ্ঞান-চর্চা সুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা ভাষায়ও বিজ্ঞান-চর্চা সুরু হয়। তখন বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান পড়ানো এবং বিজ্ঞান সম্পর্কিত প্রবন্ধ প্রকাশ দুই-ই সম্ভব হয়েছিল। এর জন্যে বিশেষভাবে উৎসাহী ছিলেন রাজা রামমোহন রায়। তিনি তাঁর 'অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান' স্কুলে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান পড়াবার ব্যবস্থা করেছিলেন। তাছাড়া 'সম্বাদ কৌমুদী'তে স্বরচিত কয়েকটি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধও প্রকাশ করেছিলেন। শুধু তাই নয়, বিজ্ঞানের কিছু বইও রচনা করেছিলেন।

রামমোহন ছাড়া বাংলা ভাষায় বৈজ্ঞানিক বিষয় আলোচনা করতে দেখা যায় ইউরোপীয় মিশনারিদের। উইলিয়াম ইয়েটস্ 1825 খৃষ্টাব্দে বাংলা ভাষায় 'পদার্থবিদ্যা সার' এবং 1830 খৃষ্টাব্দে 'জ্যোতির্বিদ্যা' নামে বই প্রকাশ করেন। জন ম্যাক 1834 খৃষ্টাব্দে 'কিমিয়াবিদ্যা সার' নামে বাংলা ভাষায় প্রথম রসায়নের বই প্রকাশ করেন। এভাবে দেখা যায়, বাংলা দেশে বাংলা ভাষায় আধুনিক বিজ্ঞান-চর্চা সুরু হয়েছিল লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান-শিক্ষা সুরু হবার অনেক আগে। স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগে, যে চর্চা সুষ্ঠুভাবেই সুরু হয়েছিল তা ব্যাহত হলো কি কারণে? সঙ্গতভাবেই বলা যায়, এর প্রধান কারণ বিদেশী শাসন। যদিও সরকারীভাবে বলা হয়েছিল যে, ভারতবাসীকে ইংরেজী শিক্ষা দিতে হবে ইউরোপের জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্বন্ধে অবহিত করবার জন্যে; তথাপি ইংরেজী শিক্ষা চালু করবার ব্যাপারে তাঁদের মতবিরোধ দেখে বোঝা যায় যে, তাঁরা শাসনকার্যে সহায়তা লাভের জন্যেই ইংরেজী শিক্ষা চালু করেছিলেন। তাই ইংরেজী শিক্ষা যখন চালু হলো, তখন সামান্য ইংরেজী শিখলেই সাধারণ একটা কেরাণীর চাকরি জুটে যেত। ফলে অধিকাংশ বাঙালীই চাকরির আশায় ইংরেজী পড়তে সুরু করেন। উপরন্তু তৎকালীন শাসকগোষ্ঠীর বাংলা ভাষার প্রতি বিন্দুমাত্র সহানুভূতি না থাকায় প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রী ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে সমস্ত বিষয় পড়তে বাধ্য হতো। তাছাড়া তখনকার দিনের খ্যাতনামা বাঙালী বিজ্ঞানীদের মধ্যে কিছু সংখ্যক ছাড়া অধিকাংশই বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান-চর্চায় উৎসাহ দিলেও স্বচেষ্টায় কেউই বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান পড়াতে অগ্রণী হন নি। ভারতের বিভিন্ন জনহিতকর আন্দোলনে

এবং ভারতের সম্মান বিদেশে প্রতিষ্ঠার জন্যে প্রত্যক্ষভাবে তাঁরা যে রকম ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন, বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান পড়াবার ব্যাপারে সেই রকম কিছু করলে আজ হয়তো আমাদের এত ভাবতে হতো না। সুতরাং বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান-শিক্ষা ব্যাহত হবার দ্বিতীয় কারণ হিসাবে বলা যায়, এই ব্যাপারে বিজ্ঞান-শিক্ষকদের সক্রিয় চেষ্টার অভাব।

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান-শিক্ষাদানের আধুনিক যুগের উৎসাহীদের মধ্যে পুরোধা ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান-শিক্ষার উপকারিতা বুঝতে পেরে সারা জীবন ধরে এর জন্যে চেষ্টা করতে কসুর করেন নি। দুর্ভাগ্য, তিনি তাঁর প্রচেষ্টার বাস্তব রূপ দেখতে পান নি। এখানেও বলা যায়, সরকার ও বিজ্ঞান-শিক্ষক উভয়েই দায়ী। কিছু সংখ্যক শিক্ষকের মতে, বৈজ্ঞানিক শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ ও বাংলায় বিজ্ঞানের পাঠ্যপুস্তকের অভাব এর জন্যে দায়ী। আজও মাঝে মাঝে এই কথা শোনা যায়। রবীন্দ্রনাথ এর উত্তর দিয়েছেন 'শিক্ষার বাহন' নামক প্রবন্ধে। তবে বিভিন্ন অসুবিধা সত্ত্বেও বাংলা ভাষায় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রচনা কখনো বন্ধ হয় নি। এক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক ও সাহিত্যিক উভয়েরই দান অপরিসীম!

আজ ভারত স্বাধীন। সরকারও মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান পড়াবার ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহী। অনেক শব্দের পরিভাষাও হয়েছে। ফলে বাংলা ভাষায় বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক বিষয়ের নানা বই ও বিজ্ঞান সাময়িকী প্রকাশিত হচ্ছে। কিন্তু বাংলা পরিভাষার ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখা যায়, একটি বৈজ্ঞানিক শব্দের একাধিক প্রতিশব্দ সৃষ্টি হয়েছে। এর প্রধান কারণ বিভিন্ন লেখকের নিজের কাজের সুবিধার জন্যে ইচ্ছানুযায়ী বৈজ্ঞানিক শব্দের প্রতিশব্দ সৃষ্টির প্রয়াস। এঁরা কখনো খোঁজ করে দেখেন না যে, আগে কোন শব্দ সৃষ্টি হয়েছে কিনা। ফলে বাংলা ভাষার শব্দকোষের আকার বৃদ্ধি হলেও পরিভাষা হয়ে উঠেছে ভারাক্রান্ত। তাই এই প্রবন্ধে কয়েকটি প্রস্তাব করছি। এই প্রস্তাব অনুযায়ী বলা যায়, প্রথমেই দরকার সরকারী সাহায্যপুষ্ট একটি চিরস্থায়ী 'বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান-চর্চা সমিতি'র। সেই সমিতির মতানুযায়ী চলবে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান-চর্চা—কারণ কোন বেসরকারী প্রতিষ্ঠানকে সকলে নাও মানতে পারেন। ঐ সমিতি নিম্নলিখিতভাবে কাজ করলে বোধ হয় অনেক ভাল হবে।

(1) একই শব্দের যেন একাধিক পরিভাষা না হয়, তার ব্যবস্থা করা দরকার। বিভিন্ন বিজ্ঞানী যদি একটি শব্দের বদলে একাধিক প্রতিশব্দ ব্যবহার করেন, তবে বিজ্ঞানীমহলেই বিষয়বস্তু বোঝবার ব্যাপারে গোলযোগ দেখা দেবে—বিজ্ঞানীকে তখন গবেষণা ছেড়ে বিজ্ঞানের শব্দকোষ নিয়ে পড়ে থাকতে হবে। সুতরাং একটি শব্দের একটি প্রতিশব্দ প্রচলিত থাকলে কি সুবিধা হবে, তা আর কাউকে বুঝিয়ে বলবার দরকার আছে বলে মনে হয় না। এই কাজের জন্যে সমিতির উচিত প্রতিটি বৈজ্ঞানিক শব্দের যত রকম পরিভাষা পাওয়া যায়, তার তালিকা প্রস্তুত করা এবং তাদের মধ্যে যদি কোনটি গ্রহণযোগ্য হয় তাকে গ্রহণ করা, নয় তো নতুন শব্দের সৃষ্টি করা। এর জন্যে বিভিন্ন প্রগতিশীল দেশে কিভাবে পরিভাষা করা হয়, তা দেখবার প্রয়োজনীয়তা আছে। শুধু এই করলেই চলবে না, ভবিষ্যতে যাতে কোন রকম গোলযোগ না দেখা দেয়, তার জন্যে বিশেষ আইন প্রণয়ন এবং নিয়মিতভাবে নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে নতুন শব্দের পরিভাষা সৃষ্টি ও প্রকাশের ব্যবস্থা করবার প্রয়োজন। যতদিন পরিভাষা সৃষ্টি ও তা প্রকাশিত না হয়, ততদিন প্রবন্ধ ও পাঠ্যপুস্তক রচয়িতারা নতুন বৈজ্ঞানিক শব্দের কি রকম পরি-

ভাষা করবেন সমিতিকৃত আইনে তারও নির্দেশ থাকা চাই।

(2) বাংলা দেশের বিভিন্ন জেলার লোকের বিভিন্ন শব্দের উচ্চারণে তফাৎ দেখা যায়। ফলে বহু শব্দের বিভিন্ন বানানও লক্ষ্য করা যায়। এটা অভিজ্ঞ ব্যক্তির কাজে বিশেষ বাধা সৃষ্টি না করলেও যে নতুন বিজ্ঞান শিখতে আরম্ভ করবে, তার পক্ষে খুবই অসুবিধা হবে। সুতরাং পরিভাষার আইনের সঙ্গে বানানের আইনেরও দরকার আছে।

(3) বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানের অভিধান প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু তাছাড়াও প্রতিটি বৈজ্ঞানিক শব্দের ব্যাখ্যাসমন্বিত অভিধানের প্রয়োজন আছে। কারণ শব্দের ব্যাখ্যার সাহায্যে যে কোন পাঠক বিজ্ঞানের যে কোন শাখার বই অথবা প্রবন্ধ পড়ে বুঝতে পারবেন। প্রয়োজনমত বৈজ্ঞানিক শব্দ ব্যবহার না করেও কোন কিছু রচনা করা যাবে। এতে হয়তো রচনার আকার কিছু বড় হবে, কিন্তু সাধারণ মানুষকে বিজ্ঞান শিক্ষা দিতে বিশেষ সুবিধা হবে। ফলে এক শব্দের একাধিক প্রতিশব্দ থাকলেও কোন অসুবিধা হবে না।

(4) কোন্ ভাষায় কিশোর-কিশোরী এবং সাধারণ মানুষের জন্যে বিজ্ঞানের বই লেখা হবে, তা নির্ধারণ করা দরকার। আমরা কথা বলি চলিত ভাষায়, লিখি সাধু ও চলিত দুই ভাষাতেই। কিশোর-কিশোরী ও সাধারণ মানুষের কাছে চলিত ভাষা যত আপন, সাধু ভাষা ততটা নয়। সুতরাং আমার মনে হয় চলিত ভাষার মাধ্যমে সাধারণভাবে দৈনন্দিন জীবনে যা দেখতে পাওয়া যায়, তাথেকে উদাহরণ দিয়ে বই বা প্রবন্ধ লিখলে বিজ্ঞানে অজ্ঞ যে কোন ব্যক্তি অতি সহজে বিজ্ঞানের যে কোন বিষয় বুঝতে পারবে এবং প্রাত্যহিক জীবনে বৈজ্ঞানিক শিক্ষার অভিজ্ঞতা প্রয়োগ করতে পারবে।

সব শেষে একটি কথাই বলা যায়—সব কিছুই পরিপূর্ণতা লাভ করবে সেদিন, যেদিন বাঙ্গালী বিজ্ঞান-শিক্ষকেরা সর্বস্তরে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান পড়াতে সাগ্রহে এগিয়ে আসবেন। যত দিন তাঁরা ত্যাগ স্বীকার না করবেন, তত দিন বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান সাময়িকীতেই নিবদ্ধ থাকবে, উচ্চ শিক্ষার দরজা দিয়ে ঢুকতে পারবে না।

"বহু শতাব্দী পূর্ব্বে ভারতের জ্ঞান সার্ব্বভৌমিকরূপে প্রচারিত হইয়াছিল। এই দেশে নালন্দা এবং তক্ষশিলায় দেশ-দেশান্তর হইতে আগত শিক্ষার্থী সাদরে গৃহীত হইয়াছিল। যখনই আমাদের দিবার শক্তি জন্মিয়াছে, তখনই আমরা মহৎরূপে দান করিয়াছি। ক্ষুদ্রে কখনই আমাদের তৃপ্তি নাই। সর্ব্ব জীবনের স্পর্শে আমাদের জীবন প্রাণময়। যাহা সত্য, যাহা সুন্দর, তাহাই আমাদের আরাধ্য।"

—আচার্য জগদীশচন্দ্র

নিষ্ক্রিয় গ্যাসের আবিষ্কার

অরূপ রায়

ইনার্ট গ্যাস—বাংলায় বলা হয় নিষ্ক্রিয় গ্যাস। নামকরণ হইতেই বোঝা যায় যে, ইহারা রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অক্ষম অর্থাৎ নিষ্ক্রিয়। হিলিয়াম, নিয়ন, আরগন, ক্রিপটন, জেনন ও র‍্যাডন—এই ছয়টি গ্যাসকেই নিষ্ক্রিয় গ্যাস বলা হয়। ইহাদের সংকেত—যথাক্রমে He, Ne, A, Kr, Xe ও Rn। একমাত্র র‍্যাডন ছাড়া আর বাকী সব গ্যাসগুলিই বায়ুমণ্ডলে পাওয়া যায়, তবে খুবই সামান্য পরিমাণে। বায়ুমণ্ডলে ইহাদের আয়তন হিসাবে মোটামুটি আপেক্ষিক স্থিতি :

He – 0·00052, Ne – 0·0015, A = 0·9323, Kr – 0·0001 ও Xe = 0·000009.

পৃথিবীতে স্বল্প পরিমাণে উপস্থিতির জন্যই বিজ্ঞানীদের কাছে ইহারা বহুদিন অজ্ঞাত ছিল। প্রকৃতপক্ষে 1785 সালে ইংরেজ বিজ্ঞানী ক্যাভেণ্ডিস নিজের অজ্ঞাতসারেই একটি পরীক্ষার মাধ্যমে নিষ্ক্রিয় গ্যাসগুলি আবিষ্কারের সূত্রপাত ঘটান। সকল স্থানের বায়ুমণ্ডলের উপাদানসমূহ অভিন্ন কিনা দেখিবার জন্য তিনি একটি বিশেষ ধরণের পরীক্ষা-কার্য চালান। একটি আবদ্ধ কাঁচপাত্রের মধ্যে গাঢ় KOH দ্রবণের উপর অতিরিক্ত অক্সিজেন মিশ্রিত বায়ু লইয়া তাহার মধ্যে তিনি বৈদ্যুতিক স্ফুরণ ঘটান। ফলে নাইট্রোজেনের সহিত অক্সিজেনের বিক্রিয়ায় যে সকল নাইট্রোজেন অক্সাইড উৎপন্ন হয়, তাহারা KOH-দ্রবণে শোষিত হইয়া যায় এবং অতিরিক্ত অক্সিজেনকে তিনি পটাসিয়াম সালফাইড (K_2S) দ্রবণে শোষিত করান, কিন্তু তিনি লক্ষ্য করেন যে, কিছুটা গ্যাস অশোষিত অবস্থায় পড়িয়া থাকে। যাহার আয়তন ক্যাভেণ্ডিসের ভাষায়, "......not more than $\frac{1}{120}$th part of the whole." তিনি এই অশোষিত গ্যাসের স্বরূপ ও রহস্য উদ্‌ঘাটনে ব্যর্থ হন। ফলে তাঁহার পরীক্ষাটিও আর বেশী দূর অগ্রসর হয় নাই।

ক্যাভেণ্ডিসের পরীক্ষার এক শতাব্দীরও পরে 1892 সালে Lord Rayleigh দেখিতে পান যে, বায়ুমণ্ডল হইতে অন্যান্য গ্যাস অপসারণ করিয়া প্রাপ্ত এক লিটার নাইট্রোজেন গ্যাসের ওজন ও নাইট্রোজেন যৌগ হইতে প্রাপ্ত এক লিটার নাইট্রোজেন গ্যাসের ওজন যথাক্রমে 1·2576 gms. ও 1·2506 gms, অর্থাৎ বায়ুমণ্ডল হইতে প্রাপ্ত নাইট্রোজেন গ্যাস, রাসায়নিক উপায়ে প্রাপ্ত নাইট্রোজন গ্যাস হইতে 0·5% ভারী। তিনি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া যখন কোনও সদুত্তর দিতে পারিলেন না, তখন এই পর্যবেক্ষণের কথা তিনি Sir Willium Ramsay-কে জানান। লর্ড র‍্যালের পর্যবেক্ষণের উপর র‍্যামজে সিদ্ধান্ত করেন যে, বাতাসে কিছু অনাবিষ্কৃত ভারী গ্যাসের উপস্থিতির ফলেই নাইট্রোজেনের ঘনত্ব দুই রকম পাওয়া যাইতেছে।

র‍্যামজে ও র‍্যালে যখন এই বিষয়টির রহস্য উদ্‌ঘাটনে ব্যাপৃত ছিলেন, হঠাৎ তখন এক শতাব্দীরও বেশী পূর্বে সম্পাদিত ক্যাভেণ্ডিসের পরীক্ষাটির উপর তাঁহাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। অনেক রকম উন্নতি সাধন করিয়া পৃথক পদ্ধতিতে তাঁহারা পরীক্ষাটি আবার করিয়া দেখেন।

র‍্যালে আয়তন হিসাবে 9 ভাগ বাতাস ও 11 ভাগ অক্সিজেনের মিশ্রণ লইয়া 50 লিটারের একটি কাচের গ্লোবের মধ্যে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড (NaOH) দ্রবণের সান্নিধ্যে

প্ল্যাটিনাম তড়িৎ-দ্বারের সাহায্যে বৈদ্যুতিক স্ফুরণ ঘটান। উৎপন্ন NO_2 সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডে দ্রবীভূত হয় ও অতিরিক্ত অক্সিজেনকে তিনি অ্যালকালাইন পাইরোগ্যালেট দ্রবণে শোষিত করাইয়া অবশিষ্ট গ্যাসটিকে সংগ্রহ করেন।

র‍্যামজে উত্তপ্ত Cu-এর উপর দিয়া কিছু পরিমাণ বাতাস বার বার প্রবাহিত করাইয়া উহার অক্সিজেনকে সম্পূর্ণরূপে শোষিত করান ও নাইট্রোজেন গ্যাস অপসারণ করিবার জন্য উহাকে উত্তপ্ত Mg-এর উপর দিয়া পরিচালিত করেন। এই ভাবে অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন গ্যাস সম্পূর্ণরূপে অপসারণ করিবার পর শেষ পর্যন্ত তিনি যে অবশিষ্ট গ্যাস পান, তাহার ঘনত্ব দেখা যায় 19·94 (H = 1·0008) ও আয়তন পরীক্ষায় ব্যবহৃত বাতাসের আয়তনের $\frac{1}{80}$ ভাগ। তিনি এই গ্যাস ও ক্যাভেণ্ডিসের পরীক্ষা অনুযায়ী প্রাপ্ত গ্যাসের বর্ণালী বিশ্লেষণ করিয়া দেখেন যে, উহারা অভিন্ন ও যে কোন জানা মৌল বা যৌগের বর্ণালী হইতে ভিন্ন। 1894 সালে র‍্যালে ও র‍্যামজে গ্যাসটিকে মৌলিক বলিয়া প্রমাণ করেন। গ্যাসটি উত্তপ্ত ধাতু, পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট ($KMnO_4$), সোডিয়াম পারঅক্সাইড (Na_2O_2) প্রভৃতির সহিত তো নয়ই—অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, ক্লোরিন—এমন কি, ফ্লোরিনের সঙ্গেও বৈদ্যুতিক স্ফুরণের সাহায্যে মিলিত হয় না। তাঁহারা নিষ্ক্রিয়তার জন্য গ্যাসটির নাম দেন আর্গন (নিষ্ক্রিয়)।

1868 সালে সূর্যগ্রহণ চলিবার সময় Janseen সৌরবর্ণালী বিশ্লেষণের সময় সোডিয়ামের D-লাইন হইতে ভিন্ন জায়গায় একটি নূতন হলুদ লাইন পান। এই পর্যবেক্ষণ হইতে Frankland ও Lockyer সিদ্ধান্ত করেন যে, সূর্যে একটি নূতন মৌলিক পদার্থ বর্তমান। তাঁহারা মৌলিক পদার্থটির নাম দিলেন হিলিয়াম (গ্রীক Helios—সূর্য)। 1889 সালে Hillebrand ইউরেনিয়াম খনিজ ক্লেভাইট (Cleveite) লঘু সালফিউরিক অ্যাসিডের সহিত উত্তপ্ত করিয়া এক ধরণের গ্যাস পান, কিন্তু উহা যে কি গ্যাস, তাহা তিনি বুঝিতে পারেন নাই। 1894 সালে র‍্যামজে গ্যাসটিকে নাইট্রোজেন সন্দেহ করিয়া পরীক্ষা-কার্য চালান। তিনি গ্যাসটির সহিত অক্সিজেন মিশাইয়া বৈদ্যুতিক স্ফুরণের সাহায্যে উহার সহিত মিশ্রিত নাইট্রোজেনকে উহার অক্সাইডে পরিণত করিয়া গাঢ় KOH দ্রবণে শোষিত করান। এইরূপে অন্যান্য গ্যাসসমূহ সরাইয়া অবশিষ্ট গ্যাসটির বর্ণালী লইয়া দেখিলেন যে, ইহা জানসিনের প্রাপ্ত বর্ণালী হইতে অভিন্ন। এইরূপে তিনিই প্রথম পার্থিব পদার্থ হইতে হিলিয়াম গ্যাস সংগ্রহ করেন। 1895 সালে Kayser বায়ুমণ্ডলে গ্যাসটির অস্তিত্বের বিষয় প্রমাণ করেন।

র‍্যামজে 1896 সালে নবাবিষ্কৃত গ্যাস হিলিয়াম ও আর্গনকে পর্যায় সারণীতে একটি নূতন গ্রুপে স্থান দেন। তিনি তাহার নাম দেন জিরো গ্রুপ (Group O)। এই সময়ে তিনি সিদ্ধান্ত করেন যে, গ্রুপটিকে পূর্ণ করিতে কম করিয়া আরও একটি অনাবিষ্কৃত নিষ্ক্রিয় গ্যাস আছেই।

অবিশুদ্ধ তরল আর্গনকে আংশিক পাতন করিয়া র‍্যামজে ও Travers 1898 সালে আরও কয়েকটি মৌলিক নিষ্ক্রিয় গ্যাসের সন্ধান পান। তাঁহারা অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন দূর করিয়া বাতাস হইতে প্রাপ্ত অবশিষ্ট গ্যাসটিকে একটি বাল্বে অতিরিক্ত চাপে রাখিয়া তরল বায়ুর সাহায্যে—185° সে.-এ শীতল করেন। এই সময় বেশীর ভাগ গ্যাসই তরল হইয়া যায়। বাল্বটিকে তরল বায়ু হইতে সরাইয়া তরল অংশটিকে দ্রুত বাষ্পীভূত করিয়া গ্যাসীয় ও তরল দুইটি অংশে ভাগ করেন। প্রথমে এই গ্যাসীয় অংশটিকে তরল হাইড্রোজেনের সাহায্যে—240° ডিগ্রী সে.-এ শীতল করিলে ইহার কিছুটা অংশ কঠিন হইয়া

বায় ও বাকী অংশ গ্যাসীয় অবস্থাতেই অপরিবর্তিত থাকে। গ্যাসীয় অংশটি হিলিয়াম ও কঠিন অংশটি একটি নূতন নিষ্ক্রিয় মৌলিক পদার্থ—নাম নিয়ন (গ্রীক—নূতন)। ইহার পর তরল অংশকে (যাহার বেশীর ভাগই আর্গন) তাঁহারা আংশিক পাতন করেন। আংশিক পাতনের (Fractional distillation) ফলে প্রথমে আর্গন ও পরে যথাক্রমে ক্রিপ্‌টন (অজ্ঞাত) ও জেনন (আগন্তুক) নামক আরও দুইটি মৌলিক গ্যাস পান। এই গ্যাস দুইটিও নিষ্ক্রিয়। 120 টন তরল বায়ু হইতেও আর কোনও নিষ্ক্রিয় গ্যাসের সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

পরবর্তী কালে র‍্যাডন নামক নিষ্ক্রিয় গ্যাসটি তেজস্ক্রিয় বিকিরণ (Radioactive decay) উৎপাদক হিসাবে পাওয়া যায়। এই নিষ্ক্রিয় গ্যাসটির দুইটি আইসোটোপ—Actinon ও Thoron।

1907 সালে Cady ও Mc Farland-এর অনুসন্ধানের ফলে জানা গেল যে, ক্যান্‌সাসের বিশেষ কিছু অংশে প্রাপ্ত প্রাকৃতিক গ্যাসে আয়তন হিসাবে 1·84% হিলিয়াম বর্তমান। এই হইল নিষ্ক্রিয় গ্যাস আবিষ্কারের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

পদার্থের চতুর্থ অবস্থা

পার্থসারথি চক্রবর্তী*

সাধারণতঃ প্রকৃতিতে আমরা পদার্থের তিন প্রকার রূপ দেখতে পাই—কঠিন, তরল এবং গ্যাসীয়। জলের তিন রকম বিভিন্ন অবস্থার নাম বরফ, জল এবং জলীয় বাষ্প। কঠিন অবস্থায় পদার্থের ভিতরের অণুগুলির পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ খুব বেশী। উত্তাপের সংস্পর্শে এলে কঠিন পদার্থের অণুগুলি উত্তেজিত হয়ে ওঠে এবং উত্তাপ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অণুগুলির পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ কমতে থাকে। অধিক তাপমাত্রায় অণুগুলি আরও দ্রুত পরিভ্রমণ করে এবং স্ফুটনাঙ্কে অণুগুলির নিজেদের ভিতর আকর্ষণ খুব বেশী কমে যাওয়ার ফলে তারা গ্যাসীয় অবস্থায় রূপান্তরিত হয়।

গ্যাসকে 1000° থেকে 5000° সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত উত্তপ্ত করলে তা পরমাণুতে পরিণত হয়। প্রায় 10,000° সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় পরমাণুগুলি বৈদ্যুতিক আধানসম্পন্ন নিউক্লিয়াস এবং ইলেকট্রনে ভেঙ্গে পড়ে। এই সময় পরমাণুগুলির নিজেদের মধ্যে হুড়াহুড়ির ফলে তাদের বাইরের কক্ষের ইলেকট্রনগুলি সবেগে ছিট্‌কে বেরিয়ে আসে এবং গ্যাস আয়নিত হয়। এই অবস্থাকে প্লাজ্‌মা অথবা পদার্থের চতুর্থ অবস্থা বলা হয়।

সাধারণভাবে বলতে গেলে বলা যায়, প্লাজ্‌মা অতিমাত্রায় আয়নিত গ্যাস এবং এর নির্দিষ্ট আয়তনের ভিতর সমসংখ্যক ধনাত্মক আয়ন এবং মুক্ত ইলেকট্রন বর্তমান থাকে। প্লাজ্‌মার মধ্যে নিরপেক্ষ গ্যাস-অণু এবং পরমাণু থাকতে পারে আবার না-ও থাকতে পারে। পদার্থের গ্যাসীয় অবস্থার সঙ্গে এর কিছুটা সাদৃশ্য আছে। তবে গ্যাসের সঙ্গে এর সবচেয়ে বড় পার্থক্য এই যে, প্লাজ্‌মা খুব ভালভাবে বিদ্যুৎ পরিবহন এবং ধারণ করতে পারে। উপরন্তু এটি চৌম্বক এবং বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রে ক্রিয়া করে। প্লাজ্‌মার গতি-

*রসায়ন বিভাগ, কৃষ্ণনগর সরকারী কলেজ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

বিধিও অন্যান্য চার্জ্‌ড্‌ বা আহিত কণিকাগুলির থেকে স্বতন্ত্র।

প্লাজ্‌মার উৎপত্তিস্থান

সবচেয়ে মজার কথা এই যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের শতকরা 99·9 ভাগই রয়েছে প্লাজ্‌মা অবস্থায়। পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগ, আয়নোস্ফিয়ার, সূর্যের মধ্যভাগ (যেখানে উষ্ণতা প্রায় $10^{6°}$ কেলভিন), নক্ষত্রমণ্ডলী, নীহারিকা, নীহারিকার মধ্যবর্তী স্থান ইত্যাদির পদার্থসমূহ প্লাজ্‌মা অবস্থায় রয়েছে। রসায়নাগারে বিশেষ বিশেষ পদ্ধতির সাহায্যে ডিস্‌চার্জ-টিউবে প্লাজ্‌মা উৎপন্ন করা হয়।

প্লাজ্‌মার ইতিহাস এবং গুরুত্ব

প্লাজ্‌মা সম্পর্কিত পদার্থবিদ্যা সম্বন্ধে ভালভাবে গবেষণা চলে 1929 খৃষ্টাব্দে। বিজ্ঞানী আরভিং ল্যাংমুর এবং টংক্‌ ডিস্‌চার্জ টিউবে আয়নিত গ্যাসের সঞ্চালন লক্ষ্য করবার সময় দেখেন, সেটা অনেকটা প্লাজ্‌মা জেলীর মত। প্লাজ্‌মা জেলী থেকেই প্লাজ্‌মা নাম দেওয়া হয়েছে। উইলিয়াম ক্রুক্‌স্‌ও নিম্নচাপের ডিস্‌চার্জ-টিউবের বিভিন্ন ঘটনা দেখে মনে করেন, পদার্থের চতুর্থ অবস্থা সম্ভব। প্লাজ্‌মা অবস্থার গুরুত্ব দেখা দিল তখন, যখন প্লাজ্‌মা জেট, প্লাজ্‌মা টর্চ ইত্যাদির প্রচলন সুরু হলো। পরে উচ্চ গতিতে রকেট চালাবার জন্যে, মহাশূন্যে বেতার-বিদ্যুতের সাহায্যে কথাবার্তার জন্যে এবং উচ্চ তাপ সম্পর্কিত গবেষণার ক্ষেত্রে প্লাজ্‌মা অপরিহার্য হয়ে উঠলো। বর্তমানে পৃথিবীর বহু দেশে ফিউসন বিক্রিয়ার জন্যে প্লাজ্‌মার নির্মিত পাত্রের আবিষ্কারের চেষ্টা চলছে পুরাদমে। উত্তপ্ত প্লাজ্‌মা থেকে বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদন করা যায় কিনা, সে বিষয়েও বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীরা চিন্তা করছেন।

প্লাজ্‌মা উৎপাদন ও রক্ষণ

সাধারণতঃ দুটি উপায়ে প্লাজ্‌মা উৎপন্ন করা হয়ে থাকে। (এক)—পিন্‌চ ক্রিয়ার সহায্যে এবং (দুই)—উচ্চ শক্তিসম্পন্ন ডয়টেরিয়াম (হাইড্রোজেন আইসোটোপ, পারমাণবিক ওজন-2) অণুর স্রোতকে কার্বন আর্কের সাহায্যে ডয়টেরিয়াম পরমাণুতে পরিণত করে একটি চৌম্বক ক্ষেত্রে মিরর যন্ত্র, টরাস অথবা স্টিলারেটর যন্ত্রের দ্বারা ধরে রাখা প্লাজ্‌মার ভিতর দিয়ে উচ্চ চাপের বিদ্যুৎ-তরঙ্গ পাঠিয়ে সরাসরি ইলেকট্রনকে উত্তপ্ত করে এক কিলোইলেকট্রন ভোল্ট শক্তিতে রূপান্তরিত করা সম্ভব হয়েছে।

পিন্‌চ ক্রিয়া—সিলিণ্ডারের ভিতর পিষ্টনের সাহায্যে যেমন গ্যাসকে সঙ্কুচিত করা হয়, ঠিক সে রকম উপায়ে চুম্বক-প্রশমন প্রক্রিয়ার সাহায্যে Magnetic compression) প্লাজ্‌মা উৎপন্ন করা হয়। খুব শক্তিশালী কয়েক কোটি অ্যামপিয়ার একাভিমুখী বিদ্যুৎ একটি সিলিণ্ডারের ভিতরের পরিবাহী গ্যাসের মধ্য দিয়ে পাঠালে একটি চৌম্বক ক্ষেত্রের সৃষ্টি হয়। এই চৌম্বক ক্ষেত্রের এক দিক কমিয়ে এবং অন্য দিক বাড়িয়ে দিলে প্লাজ্‌মা খুব দ্রুত চলাফেরা করতে থাকে এবং সিলিণ্ডারের ভিতরের দিকের গ্যাসকে প্রশমিত করে। এই ঘটনাকেই টংক্‌ 1939 খৃষ্টাব্দে পিন্‌চ ক্রিয়া নামে অভিহিত করেন।

ফিউসনের বিষয় গবেষণার জন্যে সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো—ডয়টেরিয়াম অথবা ডয়টেরিয়াম ও ট্রিটিয়াম (হাইড্রোজেন আইসোটোপ, পারমাণবিক ওজন 3) মিশ্রণের সাহায্যে 100 কোটি ডিগ্রী পরম উষ্ণতাবিশিষ্ট অতি উত্তপ্ত বিশুদ্ধ প্লাজ্‌মা উৎপাদন করা। এই উত্তপ্ত প্লাজ্‌মাকে বিদ্যুৎ-শক্তিতে রূপান্তরিত করে ভবিষ্যতে বহু কল্যাণমূলক কাজ করবার প্রকল্প রয়েছে বিজ্ঞানীদের হাতে।

প্লাজ্‌মা-কণিকাগুলি উচ্চ উষ্ণতাসম্পন্ন হবার ফলে ($1·0^{8°}K$) ও অতিমাত্রায় উত্তেজিত অবস্থার জন্যে খুব শক্তিশালী (10^{4} e. v) হয়ে থাকে এবং পাত্রের গায়ে এদের আঘাত করবার

সম্ভাবনা থাকে। পাত্রের গায়ে প্লাজ্‌মা কণিকা-গুলির আঘাতের ফলে তাথেকে উদ্ভূত শক্তির বেশ কিছুটা অংশ কমে যাবে। শুধু তাই নয়, উত্তপ্ত প্লাজ্‌মার ভিতর ইলেকট্রন ও নিউক্লিয়াসগুলির ধাক্কাধাক্কির ফলে তাথেকে এক্স-রে বিচ্ছুরিত হয়। প্লাজ্‌মার উত্তেজিত ইলেকট্রনগুলি থেকেও সিনক্রোট্রোন রশ্মি নির্গত হয় এবং তার ফলে এথেকে প্রাপ্ত শক্তির কিছুটা অংশ বিনষ্ট হওয়াও বিচিত্র নয়। বর্তমানে ফিউসন বিক্রিয়ার জন্যে এমন একটি পাত্র নির্মাণের চেষ্টা চলছে, যার মধ্যে খুব কমসংখ্যক প্লাজ্‌মা-কণিকা পাত্রের গায়ের সঙ্গে ধাক্কা খেতে পারে এবং যেখানে অনেকক্ষণ ধরে ফিউসন-বিক্রিয়া চালনা সম্ভব হবে। সে জন্যে একটি বৈদ্যুতিক চুম্বক পাত্রের ভিতর প্লাজ্‌মাকে রক্ষণের চেষ্টা হচ্ছে এবং এই পাত্রের মধ্যে থাকলে প্লাজ্‌মা কণিকাগুলির পাত্রের গায়ে খুব বেশী ধাক্কা খাবার সম্ভাবনা থাকবে না। বাইরে থেকে চৌম্বক ক্ষেত্র সৃষ্টি করে ম্যাগ্‌-নেটিক মিররের সাহায্যে প্লাজ্‌মার স্থায়িত্ব বাড়ানো হয়। প্লাজ্‌মাকে উত্তপ্ত রাখা এবং রক্ষণের জন্যে আজকাল স্টিলারেটর পদ্ধতির প্রচলন খুব বেশী হচ্ছে।

অতি উত্তপ্ত প্লাজ্‌মার উষ্ণতা প্রায় $10^{6°}$ পর্যন্ত হতে পারে এবং নিউট্রন থার্মোমিটারের সাহায্যে তা মাপা যায়। বিজ্ঞানীরা প্লাজ্‌মা ব্যবহারের বিভিন্ন দিকের কথা এখন চিন্তা করছেন। আমরা সেই দিনের জন্যে অপেক্ষা করবো, যে দিন বিজ্ঞান প্লাজ্‌মাকে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের কাজে লাগিয়ে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করবে।

কৃষির কয়েকটি দিক

সত্যেন্দ্রনাথ গুপ্ত

পৃথিবীর প্রায় দুই-তৃতীয়াংশেরও বেশী লোক উপযুক্ত খাদ্য পায় না। সমগ্র লোকসংখ্যার প্রায় শতকরা 71 ভাগ লোক অনুন্নত অঞ্চলে বাস করে। তারা সমগ্র উৎপন্ন খাদ্যের মাত্র 42 ভাগ উৎপাদন করে এবং আয় করে আরও কম—মাত্র 21 ভাগ। লোকসংখ্যা দ্রুতগতিতে বাড়ছে সন্দেহ নেই, কিন্তু খাদ্যের পরিমাণ বাড়ানো কি সম্ভব নয়? যদি 1952-56 সালের মাথাপিছু গড় হিসাবে উৎপন্ন খাদ্যকে 100 ধরা যায়, তাহলে দেখা যাবে 1963 সালে ওটা বেড়ে দাঁড়িয়েছিল 109-তে এবং 1966 সালে 110-এ। এটা হলো পৃথিবীর গড় হিসাব, কিন্তু দেশে দেশে ব্যতিক্রম রয়েছে। পূর্ব ইউরোপ ও রাশিয়ায় যেমন বেড়ে গিয়ে 1966 সালে দাঁড়িয়েছিল 141, তেমনি অধিকতর খাদ্য উৎপাদনকারী দেশগুলিতে (যেমন পশ্চিম ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকায়) যথাক্রমে 120 ও 100-তেই দাঁড়িয়ে আছে। মেক্সিকো 1952 সালের 90 থেকে 1964 সালে তুলেছে 127, জাপান তুলেছে 99 থেকে 120-তে। ভারতবর্ষে 1960-61 সালে বেড়ে গিয়ে হয়েছিল 108, কিন্তু 1965 সালে আবার কমে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল 97-তে।

খাদ্যের উৎপাদন বাড়াতে কি কি জিনিষের প্রয়োজন এবং কতটাই বা এর সীমা? আলো, বাতাস, জল, সার ছাড়াও দরকার উন্নত ধরণের বীজ, রোগমুক্তির ব্যবস্থা এবং সর্বোপরি সব মিলিয়ে একটা সুষম প্রয়োগ-কৌশল। ফসলের জন্যে যে সূর্যের আলোর দরকার হয়, তার উপর

আমাদের হাত নেই; কাজেই সেটাই শেষ সীমা।

কৃষিযোগ্য ভূমিতে মোটামুটিভাবে প্রতি বর্গ-সেন্টিমিটারে 70 থেকে 210 কিলোক্যালোরির মত সূর্যকিরণ পড়ে। এক টন শুষ্ক জৈব পদার্থ উৎপাদনে প্রায় 100 ক্যালোরির মত সূর্যকিরণ দরকার হয়। এই হিসাবে দেখা গেছে, খুব ভাল-ভাবে ফসল উৎপাদনে যদি একর প্রতি 4 টন শুষ্ক জৈব পদার্থ পাওয়া যায়, তাহলেও যে পরিমাণ সূর্যের শক্তি আহরিত হয়, সেটা মাত্র ঐ স্থানে পতিত একদিনের সূর্যকিরণের সমান। যদিও সব দিক হিসাব করে দেখানো যায় যে, অন্ততঃ শত-করা 20 ভাগ সূর্যকিরণকে আমরা কাজে লাগাতে পারি, কিন্তু নীচের দৃষ্টান্ত থেকে বোঝা যাবে—কত সামান্য পরিমাণই মাত্র আধুনিক বিজ্ঞান ব্যবহার করতে পারছে। যে সংখ্যাগুলি নীচে দেওয়া গেল, সেগুলি উৎপন্ন ফসলে অন্তর্ভূত সূর্যকিরণ ও সেই স্থানে পতিত সমগ্র সূর্যকিরণের অনুপাতের দশ হাজার গুণ।

	ফ্রান্স	রাশিয়া	ইউ. এস. এ.	জাপান	ইউ. এ. আর.	ভারত	পাকিস্তান
শস্য	36	23	28	34	19	8	7
চাল	23	10	17	16	11	3	4

কাজেই দেখা যায় যে, প্রচুর পরিমাণ শক্তি আমাদের হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। কিভাবে এর সদ্ব্যবহার করা যায়, তা নির্ভর করছে ফসল উৎপাদনের অন্যান্য বিষয়গুলির উপর।

প্রথমেই আসে জলের কথা। উপযুক্ত পরি-মাণ জলসেচের ব্যবস্থা থাকলে যেমন আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে হয় না, তেমনি একই জমিতে একাধিকবার ফসলও উৎপাদন করা চলতে পারে। আমাদের দেশে বছরের বেশ কিছু সময় যেমন বৃষ্টি হয় না, তেমনি উপকূল অঞ্চল, আসাম ও বাংলা দেশ ছাড়া অন্যত্র অধিকাংশ স্থানেই বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভর করা চলতে পারে না। কাজেই কৃত্রিম জলসেচের ব্যবস্থা খুবই জরুরী। ভারতবর্ষের বার্ষিক গড় নদীর জল-প্রবাহের হিসাবে জলশক্তির পরিমাণ 1,356 মিলিয়ন একর ফুটের মত। এর মধ্যে প্রায় 450 মিঃ এঃ ফুঃ জলসেচের কাজে লাগানো যেতে পারে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রাক্কালে প্রায় 76 মিঃ এঃ ফুঃ (17%)-এর মত জলসেচের ব্যবস্থা ছিল। চতুর্থ পরিকল্পনার শেষে প্রায় 45%-এর মত নদীপ্রবাহ কাজে লাগানো যাবে বলে ধরা হয়েছে, অর্থাৎ অর্ধেকেরও বেশী নদীর জল কাজে লাগাতে পারা যাবে না 20 বছরেরও বেশী চেষ্টায়। এ তো গেল নদীপ্রবাহের কথা, এছাড়াও মৃত্তিকার মধ্যস্থিত প্রায় 300 মিঃ এঃ ফুঃ জলের অন্ততঃ 75 মিঃ এঃ ফুঃ জল সেচের কাজে ব্যবহৃত হতে পারে। তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে এর মধ্যে মাত্র 42 মিঃ এঃ ফুঃ জলের ব্যবস্থা করা গেছে। এসব হলো সেচ-পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত জলের পরি-মাণ। এর সবটাই কৃষিকার্যে ব্যবহার করা যাচ্ছে না। 1964-65 সাল পর্যন্ত কৃষিযোগ্য জমির শতকরা মাত্র 19 ভাগ সেচ-পরিকল্পনার আওতায় আনা গেছে, বাকী সবই রয়েছে প্রকৃতির দয়ার উপর। নতুন নতুন সেচ-প্রকল্প অপেক্ষা বর্তমান সেচ-ব্যবস্থার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে না পারাটাই এখন মারাত্মক সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে। সেচ-ব্যবস্থার অর্ধেকেরও বেশী জল কৃষিতে অব্যবহৃতই রয়ে গেছে।

জলের পরেই আসে সারের কথা। ভারত-বর্ষের অর্ধেকেরও বেশী জমিতেই (157 মিলিয়ন হেক্টার, সমগ্র দেশের প্রায় 52%) কৃষিকার্য হয়, যেখানে আমেরিকায় 20%, জাপানে 16%,

রাশিয়ার 10% এবং ক্যানাডায় মাত্র হয় 4%, অথচ উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ কত কম! নাইট্রোজেন, জৈব সার, ফস্‌ফরাস প্রভৃতির ঘাটতি এর একটি প্রধান কারণ। হিসাব করে দেখা গেছে কর্ষণযোগ্য সমস্ত জমি থেকে বছরে প্রায় 2·5 মিলিয়ন টনের মত নাইট্রোজেন ধুয়ে বেরিয়ে যায় অথচ 1966-67 সালে মাত্র 9 লক্ষ টন নাইট্রোজেনের ব্যবহার হয়েছে এবং চতুর্থ পরিকল্পনার শেষে 2 মিলিয়ন টনের মত নাইট্রোজেন সার উৎপাদন করবার পরিকল্পনা রয়েছে। 1970-71 সালে প্রায় 125 মিলিয়ন টনের মত খাদ্যশস্য উৎপাদনের জন্যে 2·4 মিঃ টন নাইট্রোজেন, 1 মিঃ টন ফস্‌ফরাস ও 7 লক্ষ টন পটাস সারের ব্যবহার লক্ষ্যমাত্রা হিসাবে রাখা হয়েছে। সব যদি ঠিকমত চলে, তাহলে এর বেশ কিছুটাই আমদানী করতে হবে। নাইট্রোজেন সারের জন্যে প্রধান কাঁচামাল ন্যাপ্‌থা উৎপাদনের মোটামুটি ব্যবস্থা হলেও ফস্‌ফেট ও কোন কোন ক্ষেত্রে নাইট্রোজেন সারের জন্যেও প্রয়োজনীয় ফস্‌ফেট খনিজ ও গন্ধকের দিক থেকে আমরা অনেকটাই পরমুখাপেক্ষী। গন্ধকের পরিবর্তে পাইরাইটের ব্যবহার ও ফস্‌ফেট খনিজের নতুন নতুন খনির খোঁজ চলছে। ইতিমধ্যে রাজস্থান ও উত্তর প্রদেশে কিছু খনিজ ফস্‌ফেটের খোঁজ পাওয়া গেছে। পটাসের প্রায় সবটাই আমদানী করতে হয়।

ভারতের জমির প্রায় সর্বত্রই নাট্রোজেন সারের অত্যন্ত প্রয়োজন, শতকরা প্রায় 85 ভাগ আরও ফস্‌ফরাস ও প্রায় 63 ভাগের দরকার অতিরিক্ত পটাস। এই যেখানে অবস্থা, সেখানে সারের ব্যবহার খুবই হতাশাব্যঞ্জক। সব মিলিয়ে বর্তমানে মাত্র 3·46 কেজির মত সার প্রতি হেক্টারে, যেখানে নেদারল্যাণ্ডে প্রায় 557 কেজি এবং পৃথিবীর গড় 27·45 কেজি (1964-65)। চতুর্থ পরিকল্পনার শেষেও যদি সবটাই ব্যবহার করা যায়, তবু হেক্টার প্রতি নাইট্রোজেন সারের পরিমাণ দাঁড়াবে মাত্র 14 কেজির মত, যেখানে তাইওয়ানে 150 কেজি ও জাপানে 120 কেজির মত ব্যবহৃত হয়। এখানেরই কোন কোন জমিতে পরীক্ষা করে দেখা গেছে, হেক্টার প্রতি 20 কেজি নাইট্রোজেন ব্যবহারে প্রায় 259 কেজি বেশী চাল ও 350 কেজি বেশী গম পাওয়া যায়। তার মানে টাকার হিসাবে প্রায় 1 টাকার নাইট্রোজেন সার চালের বেলায় 2·4 টাকা ও গমের বেলায় 2·6 টাকা বেশী লাভ দিয়েছে।

বেশী ফসলের জন্যে সারের সঙ্গে দরকার উন্নত জাতের বীজ। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রস্তুত সঙ্কর জাতের বীজ কৃষিতে বিপ্লব এনে দিয়েছে। এগুলির সার গ্রহণক্ষমতাও যেমন বেশী, তেমনি বিশেষ বিশেষ আবহাওয়া ও পরিবেশের উপযোগী করে তৈরি করাও সম্ভব। তবে প্রধান অসুবিধা—উপযুক্ত তত্ত্বাবধানে বীজ তৈরি করতে হবে, অত্যন্ত নিয়ম অনুসারে ফসলের একটা অংশ বীজ হিসাবে রেখে দেওয়া চলবে না। উন্নত ধরণের বীজ নিয়ে গবেষণা ও উৎপাদনের জন্যে 1960 সালে ন্যাশনাল সিড কর্পোরেশনের সৃষ্টি হয়েছে। এরা ইণ্ডিয়ান এগ্রিকালচারাল রিসার্চ ইনষ্টিটিউটের সহযোগিতায় ও আমেরিকার সাহায্যে অনেক নতুন জাতের সঙ্কর বীজ তৈরি করেছেন। গঙ্গা 101, 2 ও 3, রঞ্জিত, ডেকান, হিমালয় 123 প্রভৃতি ভুট্টার বীজ; সি. এস্ এইচ. 1 ও 2 জোয়ার; এইচ. বি. 1 বজরা; সোনারা 64, লারমা রোজো ও সরবতী সোনারা গম, এ. ডি. টি. 27, তাইচুং নেটিভ 1, তাইনান 3, আই. আর 7 ও 8 ধান; আসিরিয়া মিটুণ্ডে বাদাম; পুসা সাওয়ানি ঢেড়স এবং বোগেন্ডিল ছোলা ইত্যাদি বহু রকমের সঙ্কর বীজ নিয়ে গবেষণা চলছে। এছাড়াও এই কর্পোরেশন পুসা রুবি টোম্যাটো, পুসা পার্পল বেগুন, পুসা কাটকি ফুলকপি, পুসা লঙ্কা প্রভৃতি নতুন জাতের উচ্চ ফলনক্ষম সব্জির বীজও তৈরি করেছে। ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অফ এগ্রি-

কালচারাল রিসার্চ-এর তত্ত্বাবধানে উন্নত ধরণের আম, কলা, লেবু, আঙ্গুর, পেয়ারা, আনারস ও আপেলের বীজ উৎপাদনের কাজও চলছে। বেশী ফলন ছাড়াও ফসলে অন্যান্য গুণ আনবারও চেষ্টা চলছে অবিরাম। রন্ট্‌গেন রশ্মির প্রয়োগে অধিকতর প্রোটিনযুক্ত গমের বীজ তৈরি করা গেছে যেমন, তেমনি পারমাণবিক রশ্মির প্রয়োগেও উচ্চ ফলনশীল উন্নত গুণের ধান, গম, বার্লি, সয়াবীন, পীচ প্রভৃতির নতুন ধরণের বীজ উৎপাদন করা হয়েছে। উন্নত জাতের বীজের সুফল একটা উদাহরণ থেকেই বোঝা যাবে। উপযুক্ত সার প্রয়োগে তাইচুং নেটিভ 1 ধান হেক্টার প্রতি প্রায় 6,000 কেজি পাওয়া গেছে, যেখানে প্রচলিত জাতে পাওয়া যেত 700 থেকে 1000 কেজি মাত্র।

ভাল ফসলের জন্যে এর পরও রয়েছে গাছকে নীরোগ রাখবার ব্যবস্থা। নানারকম পোকামাকড়, ছত্রাক ও অপ্রয়োজনীয় ক্ষতিকারক গুল্ম ইত্যাদির হাত থেকে ফসল রক্ষার জন্যে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। ফসলের ক্ষতিকারক এই গুলিকে একত্রে বলা হয় পেষ্ট। এর বিরুদ্ধে তিন রকম প্রতিকারের ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে। প্রথমতঃ নিজের হাতে বা যান্ত্রিক পদ্ধতিতে ক্ষতিকারক গুল্মের অপসারণ, বীজ বপন ও ফসল রোপণের উপযুক্ত সময় নির্বাচন এবং একই জমিতে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন ধরণের ফসলের চাষ। দ্বিতীয় পদ্ধতি হলো বায়োলজিক্যাল প্রতিকার। এক রকম শত্রুর বিরুদ্ধে অন্য রকম জীবের ব্যবহার, নির্বীর্য পুরুষ প্রাণীর সৃষ্টি এবং ক্ষতিকারক পোকামাকড় ধ্বংসকারী ব্যাসিলাসের ব্যবহার। এসব ছাড়াও তৃতীয় পথ অর্থাৎ রাসায়নিক পেষ্টিসাইডের ব্যবহারই হয় সবচেয়ে বেশী। ক্লোরিনযুক্ত হাইড্রোকার্বন, ডি-ডি-টি, বি-এইচ-সি, নানারকম জৈব ফস্‌ফরাস, রাসায়নিক, ডাইফিনাইল, কার্বামেট ইত্যাদির বহুল প্রচলন হচ্ছে। ধানের পাতার পোকার জন্যে এনড্রিন, শিকড়ের রোগে অ্যালড্রিন এবং ধান ক্ষেতের আগাছা ধ্বংসের জন্যে প্রোপানিলের ব্যবহারে ভাল ফল পাওয়া যায়। অন্যান্য জিনিষের মত এই ব্যাপারেও আমরা বেশ পিছিয়ে রয়েছি। 1963 সালের হিসাবে যেখানে জাপানে হেক্টার প্রতি 10,790 গ্র্যাম কীটনাশক ব্যবহৃত হয়েছে, আমাদের দেশে হয়েছে সেখানে মাত্র 149 গ্র্যাম। আমাদের দেশে কীটনাশক তৈরিও হয় না খুব বেশী। 1965-66 সালে কীটনাশক দ্রব্যাদির আমদানীতে খরচ হয়েছে প্রায় 2 কোটি 60 লক্ষ টাকা।

যে যুগে ছোট-বড় প্রায় সব কাজেই যন্ত্রের ব্যবহার বেড়েই চলেছে, সেই যুগে জীর্ণ বলদে টানা হাল সত্যই করুণ নয় কি? বড় বড় কো-অপারেটিভ ফার্মিং না থাকায় একদিকে যেমন ট্র্যাক্টরের বহুল প্রচলন হচ্ছে না, তেমনি কৃষিজীবী শ্রমিকের বেশ কিছুটা অংশকে শিল্পে টেনে আনবার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে না পারলে ব্যাপক বেকারত্বের আশঙ্কায় এখনই পূর্ণ যন্ত্রীকরণের লক্ষ্য রাখাও সম্ভব নয়। কিন্তু ছোটখাটো যন্ত্রের, যেমন— পাম্পিং সেট, পাওয়ার টিলার, পাওয়ার স্প্রেয়ার ইত্যাদির ব্যাপক প্রচলন হতে পারে। এর জন্যে দরকার কৃষিতে আরও অর্থের বিনিয়োগ, ধারে কৃষকদের যন্ত্র সরবরাহের ব্যবস্থা ও সরলীকৃত ছোট যন্ত্রের সস্তায় উৎপাদন।

1960 সাল থেকে 17টি রাজ্যের প্রত্যেকটির একটি করে জেলায় উপযুক্ত সার, বীজ ইত্যাদির প্রয়োগে নিবিড় চাষ পদ্ধতির প্রচলন হয়। 1966-67 সালে ফলস্বরূপ পূর্বের তুলনায় প্রায় ছয় গুণ বেশী ফসল পাওয়া গেছে। এখন আরও বেশী জেলা (130টি) নিয়ে এই পদ্ধতির প্রয়োগ করা হচ্ছে।

এখানে পৃথিবীর কয়েকটি দেশের সঙ্গে মোটামুটিভাবে আমাদের দেশের শস্য উৎপাদনের একটি তুলনামূলক হিসাব দেওয়া গেল (1964 সাল)।

দেশের নাম	মাথাপিছু কর্ষণযোগ্য জমি, (1/100 হেক্টার)	হেক্টার প্রতি সারের ব্যবহার কেজি	হেক্টার প্রতি কীটনাশক কেজি	হেক্টার প্রতি প্রধান শস্য উৎপাদন কেজি
জাপান	6	304·39	10·79	5,480
ইউরোপ	14 (ইউ. কে.)	119·94	1·47	3,430
ইউ. এস. এ.	96	43·68	1.49	2,600
আফ্রিকা	69 (দক্ষিণ-আফ্রিকা)	21·18	0·127	1,210
ভারত	35	4·43	0·149	820

(1 হেক্টার — 10,000 বর্গমিটার — 2·47 একর)

আধুনিক বিজ্ঞান মরুভূমিকেও শস্যশ্যামল করবার চেষ্টা করছে। পৃথিবীর সমস্ত জমির প্রায় তিন ভাগের এক ভাগই হয় শুষ্ক অথবা আধা শুষ্ক। বালুকাময় মরুভূমির মোট আয়তন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিগুণেরও বেশী। ভারতের পশ্চিম ভাগেও বেশ কিছুটা অংশ মরুভূমিকবলিত। সমুদ্রের লবণাক্ত জলের সাহায্যে বালুকাময় মরুভূমিতে ফসল ফলাবার চেষ্টা চলছে। এই ধরণের জমিতে সমুদ্রজল ব্যবহারের সম্ভাব্যতার কারণ হলো—এই জলের ক্ষতিকারক লবণগুলি সাধারণ মাটির মত বালিকণায় জমতে পারে না, ফলে জলটা নেমে যেতে পারে এবং বালিকণাগুলির মধ্যস্থিত জায়গায় বায়ু চলাচলের অসুবিধাও হয় না। গাছের পক্ষে ক্ষতিকারক সোডিয়াম ক্লোরাইড ও ম্যাগ্‌নেসিয়াম ক্লোরাইড সহজেই জলের সঙ্গে নেমে যায়, কিন্তু অপেক্ষাকৃত কম দ্রবণীয় কিছু কিছু লবণ বালিতে থেকে গিয়ে গাছের কিছু সুবিধাও করে দেয়। রস আহরণকারী শিকড়ের তুলনায় বালিকণার মধ্যস্থিত ফাঁকগুলির ব্যাস দশ গুণেরও বেশী, ফলে বায়ু চলাচলও ভালভাবেই হয়। উপরন্তু রাত্রিবেলায় উপরের তাপ কমে গেলে বালুকারাশির নীচের জল বাষ্পীভূত হয়ে উপরে শিকড়ের উপর জমে গিয়ে গাছের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ভাল জলের অভাবও মেটায়। ইস্রায়েলের বিজ্ঞানীরা নেগেভ মরুভূমিতে এই ব্যাপারে কিছু সাফল্যলাভও করেছেন। আমাদের দেশে ভবনগরে অবস্থিত সেণ্ট্রাল সল্ট অ্যাণ্ড মেরিন কেমিক্যাল রিসার্চ ইনষ্টিটিউশন অব ইণ্ডিয়াতেও এই বিষয়ে কিছু কাজ চলছে। সেখানে ভারত মহাসাগরের জল ব্যবহার করে কিছু তৈলবীজ এবং গমও ফলানো হয়েছে।

সব কিছু মিলিয়ে এটা দেখা যাচ্ছে—খাদ্যের ব্যবস্থা আমাদের হাতের মধ্যেই; সুষ্ঠু প্রয়োগবিদ্যাই এনে দিতে পারে আমাদের সমৃদ্ধি।

সঞ্চয়ন

পরমাণু-শক্তির কল্যাণময় ভবিষ্যৎ

পারমাণবিক প্রযুক্তিবিদ্যা বা নিউক্লিয়ার টেক্‌নোলোজীর ক্ষেত্রে গত 27 বছরের মধ্যে প্রভূত উন্নতি হয়েছে। ঐ সময়ে পরমাণু নিয়ে বহু রকমের গবেষণা হয়েছে, নানা ক্ষেত্রে পরমাণু-শক্তি প্রয়োগ করে বিজ্ঞানীরা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। পরমাণু-শক্তির সাহায্যে মানুষের জীবনকে সমৃদ্ধতর করবার ও কল্যাণ সাধনের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের বর্তমানে কোন সন্দেহই নেই।

1942 সালের ডিসেম্বর মাসে শিকাগো সহরে প্রথম যে দিন পরমাণু ভাঙ্গা হয় এবং পরমাণুতে নিহিত অসীম শক্তির সন্ধান পাওয়া যায়—সে দিনই এই ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল। আজ এই শক্তির সাহায্যে মানুষের যে কত রকমের কল্যাণ সাধিত হচ্ছে, এই শক্তি জ্ঞানের সীমানাকে যে কতদূর প্রসারিত করছে, তা বিশ্বাস করাই কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

1951 সালে রসায়নশাস্ত্রে নোবেল পুরস্কার-প্রাপ্ত বিজ্ঞানী এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পারমাণবিক শক্তি কমিশনের চেয়ারম্যান ডক্টর গ্লেন টি. সীবর্গ সম্প্রতি বলেছেন যে, গত 27 বছরে পরমাণু-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অনেক উন্নতি হয়েছে এবং তাতে সমগ্র মানবজাতির জন্যে, মানুষের কল্যাণ সাধনের জন্যে এক মহান ভবিষ্যতের বুনিয়াদ রচিত হয়েছে। আজ অস্পষ্টভাবে হলেও তার আভাস পাওয়া যাচ্ছে।

পরমাণু-শক্তিকে শিল্প ও চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই অধিকতর পরিমাণে প্রয়োগ করা হচ্ছে। অন্যান্য ক্ষেত্রেও এর প্রয়োগ করা হচ্ছে। তবে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্যেই এই শক্তিকে সবচেয়ে বেশী কাজে লাগানো হচ্ছে। পারমাণবিক চুল্লী বা রিয়্যাক্টরের সাহায্যেই পরমাণু-শক্তি থেকে বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদন করা হয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে ধরণের রিয়্যাক্টর তৈরি করেছে, সেই ধরণের পারমাণবিক চুল্লী বর্তমানে জাপান, সুইজারল্যাণ্ড, জার্মেনী, স্পেন, ইটালী ও সুইডেনে ব্যবহৃত হচ্ছে। এই সকল রিয়্যাক্টর চালু করবার জন্যে যে পারমাণবিক ইন্ধনের প্রয়োজন হয়ে থাকে, তা ঐ সকল রাষ্ট্রকে আমেরিকাই জুগিয়ে থাকে।

এতকাল কয়লা, তেল ও গ্যাসকে বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদনে ইন্ধন হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। এই সব ইন্ধনের স্থলে পরমাণু-শক্তিকে ইন্ধন হিসাবে ব্যবহার করলে খরচ যে খুব বেশী পড়ে, তা নয়। যেখানে প্রচুর কয়লা ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে, সে সকল অঞ্চল সম্বন্ধেও এই কথা খাটে।

পরমাণু-শক্তির সাহায্যে রিয়্যাক্টরের মাধ্যমে বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদনের অনেকগুলি সুযোগ-সুবিধা আছে। ঐ সকল কারখানা খুব পরিচ্ছন্ন রাখা যায়, তাছাড়া সেখানে কোন রকম আওয়াজ হয় না। পারমাণবিক ইন্ধন আকারে খুবই ছোট এবং দীর্ঘস্থায়ী হয়ে থাকে। এর অপচয়ও অতি সামান্যই হয়ে থাকে এবং যথাস্থানে এদের সরিয়ে নিয়ে আসাও তেমন কঠিন কাজ নয়। ফলে পারমাণবিক শক্তিচালিত বিদ্যুৎ-শক্তির কারখানার পরিবেশকে ছিমছাম রাখা যায়।

কয়লা, তৈল প্রভৃতি জ্বালিয়ে বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদন করবার সময় প্রচুর পরিমাণে ধোঁয়ার সৃষ্টি হয়, অপচয়ের পরিমাণও প্রচুর হয়ে থাকে। কয়লা জমা রাখবার জন্যে প্রচুর স্থান এবং

পরিবহনের জন্যে গাড়ীর প্রয়োজন হয়ে থাকে। কয়লার ধোঁয়া আবহাওয়াকে খুবই অস্বাস্থ্যকর করে তোলে। এই সকল সমস্যা পরমাণু-শক্তির সাহায্যে বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদনে দেখা দেয় না। বিশিষ্ট পরমাণু-বিজ্ঞানীদের অভিমত—ভবিষ্যতে পরমাণু থেকে বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদনের খরচ অনেক কমানো যাবে।

ভবিষ্যতে পরমাণু থেকে বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদনের জেনারেটরে যে ইন্ধন ব্যবহার করা হবে, তা সংগৃহীত হবে সমুদ্র থেকে। রিয়্যাক্টরে ভারী হাইড্রোজেন ব্যবহার করে অসম্ভব রকমের সস্তায় বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদন করা হবে।

গবেষণাগারের পরীক্ষা এবং তাত্ত্বিক পর্যালোচনায় প্রমাণিত হয়েছে—যে ইন্ধনটি রয়েছে সমুদ্রের জলে, তা ব্যবহার করে ফিউশন বা সংযোজন প্রক্রিয়ায় বিপুল শক্তি উৎপাদন করা হবে। দুই পরমাণুর মিলনের মাধ্যমে শক্তি উৎপাদনই এর মূল কথা। ফিশন-পদ্ধতিতে পরমাণু ভেঙে শক্তি উৎপাদন করা হয়।

সংযোজন প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্পর্কে এখনও বহু রকমের কঠিন কারিগরী সমস্যা রয়েছে। বর্তমানে আমেরিকায় এই সকল সমস্যা সমাধানের চেষ্টা হচ্ছে এবং এই বিষয়ে বিজ্ঞানীরা অনেকখানি অগ্রসরও হয়েছেন।

এই ব্যাপারে পূর্ণ সাফল্য অর্জিত হলে অফুরন্ত বিদ্যুৎ-শক্তির সন্ধান পাওয়া যাবে। মানুষ তা কাজে লাগিয়ে সমুদ্রের জলকে লবণমুক্ত করে যেমন কৃষিকার্যে ব্যবহার করতে পারবে, তেমনই বিদ্যুৎ-শক্তির সাহায্যে সমুদ্রগর্ভ থেকেও নানা রকম সম্পদ আহরণ করা মানুষের পক্ষে সম্ভব হবে। সে দিন মানুষের অন্নবস্ত্রের সমস্যার সমাধানের ফলে পৃথিবীতে স্থায়ী ও প্রকৃত শান্তির পথও রচিত হবে।

মানুষের বিবর্তন-পথের নূতন নিশানা

বিবর্তনবাদ অনুসারে বানরসদৃশ কোন প্রাণী থেকেই মানুষের অভিব্যক্তি ঘটেছে। তবে এরা কখন যে বিবর্তনের পথে বংশানুক্রমের ধারায় মানুষরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে, বিজ্ঞানীরা বহুকাল থেকেই তা জানবার চেষ্টা করছেন। লক্ষ লক্ষ বছর পূর্বেকার বিস্মৃত যুগের কঙ্কালের সন্ধানে নৃতত্ত্ব-বিজ্ঞানীরা দেশ-দেশান্তরে গিয়েছেন, কিন্তু এতকাল এই প্রশ্নের উত্তর মেলে নি।

সম্প্রতি দু-জন বিজ্ঞানী অধুনালুপ্ত এক-প্রকার জীবের দুটি চোয়ালের জীবাশ্ম বা ফসিলের সন্ধান পেয়েছেন। চোয়াল দুটি পাওয়া গেছে ইথিওপিয়ার রুডলফ্ হ্রদের উত্তর দিকে এক স্রোতস্বিনীতে। 1969 সালে শিকাগো বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ডক্টর পি. ক্লার্ক হাওয়েলের নেতৃত্বাধীনে আফ্রিকার পূর্বাঞ্চলে তথ্যানুসন্ধানী এক অভিযানের ফলেই এই নিদর্শন পাওয়া গেছে।

আমেরিকার ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানী ডক্টর এলুইন এল. সাইমন্‌স্ এবং ডক্টর ডেভিড আর. পিলবিন এই দুটি জীবাশ্ম পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করে এই সিদ্ধান্তে এসে পৌঁচেছেন যে, এই চোয়াল দুটি এক প্রকার স্তন্যপায়ী দ্বিপদ জীবের। এরা আশী লক্ষ থেকে দেড় কোটি বছর পূর্বে এশিয়া ও আফ্রিকায় বিচরণ করতো। বিবর্তনের বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্যে কোন্‌টিতে যে এই সকল জীবকে ফেলা হবে, অর্থাৎ ঐ জীবটি দেখতে মানুষের মত না বানরের মত ছিল—এই সম্বন্ধে তাঁরা এখনও কোন স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পারেন নি।

তবে ডক্টর সাইমন্‌স্‌ এই সম্পর্কে বলেছেন যে, গঠন-প্রণালীর দিক থেকে এই জীবটিই প্রাচীনতম মানুষের পূর্বপুরুষ। এর নামকরণ করা হয়েছে রামাপিথেকাস। অস্ট্রোপিথেকাসজাতীয় জীব থেকেই মানুষের আবির্ভাব ঘটেছে এবং এদের সঙ্গেই রয়েছে মানুষের নিকটতম সম্পর্ক। রামাপিথেকাস এদেরই পূর্বপুরুষ।

ডক্টর সাইমন্‌স্‌ এই প্রসঙ্গে আরও বলেছেন—যে দুটি নিদর্শন আমরা সনাক্ত করেছি, তাদের সঙ্গে অস্ট্রোপিথেকাসজাতীয় জীবের বহু ক্রিয়ামূলক সাদৃশ্য রয়েছে, যাতে মনে হয় রামাপিথেকাসজাতীয় জীবের সঙ্গে বানরগোষ্ঠীর নিকট সম্পর্ক না থাকবার সম্ভাবনাই বেশী।

1920 সালের শেষের দিকে এবং 1930 সালের প্রথম দিকে ভারতের ভূগর্ভ থেকে চোয়ালের হাড়ের যে সকল জীবাশ্ম উদ্ধার করা হয়েছিল, সে সকল জীবাশ্ম নিয়ে ডক্টর সাইমন্‌স্‌ ও ডক্টর পিলবিন গবেষণা করেছিলেন। এই সকল নিদর্শন বৃটিশ মিউজিয়াম এবং কলিকাতার মিউজিয়ামে একজাতীয় অধুনালুপ্ত বানরের চোয়ালের জীবাশ্ম বলে প্রদর্শিত হয়েছে। এই শ্রেণী নির্ধারণ এবং এদের কোন অধুনালুপ্ত বানরের চোয়াল বলে অভিহিত করা ঠিক হয় নি বলে তাঁরা মন্তব্য করেছেন। নৃতত্ত্ব-বিজ্ঞানীরা মানুষের পূর্বপুরুষ কোন জীবের চোয়াল দেখে সেই জীবটির খাদ্যের বিবরণ দিতে পারেন। তাদের তথ্যানুসন্ধানে দাঁত খুবই সহায়ক হয়ে থাকে।

ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের দু-জন বিজ্ঞানী ঐ জীবাশ্মের চোয়ালের দাঁতের পর্যালোচনা ও পরীক্ষা করে বলেছেন—এটি যে বানরজাতীয় কোন জীবের নয় তার প্রমাণ—এতে অংশতঃ আবৃত কোন বৃহৎ শ্বদন্ত নেই। কিন্তু যে কোন বানরজাতীয় জীবের চোয়ালে এই জাতীয় দাঁত থাকবেই। এই দাঁত না থাকবার জন্যে রামাপিথেকাসজাতীয় জীবেরা কোন জিনিষ বেশ চিবিয়ে খেতে পারতো। কিন্তু বানরজাতীয় জীবেরা শ্বদন্তের জন্যে তা পারে না। তারা উপর ও নীচের দাঁতের মধ্যে কোন জিনিষ ফেলে চেপে নিয়ে গিলে ফেলে। তারা চোয়াল পাশেরদিকে ঘোরাতে পারে না।

ডক্টর সাইমন্‌স্‌ এই প্রসঙ্গে বলেছেন, নীচের এবং উপরের—উভয় অংশের চোয়ালের গঠন-প্রণালী দেখে মনে হয়, এই দুটি মানবজাতীয় জীবেরই চোয়াল। কারণ খাদ্যবস্তু চিবানোর ব্যাপারে এদের সঙ্গে মানুষের বহু রকমের সাদৃশ্য দেখা যাচ্ছে।

তাঁরা বলেছেন- যে, বানরের মাড়ির দাঁতের মধ্যে দ্বিতীয় ও তৃতীয়টি একই সঙ্গে ওঠে। কিন্তু মানুষের বেলায় ঐ সকল পেষক দন্ত একটির পর একটি বিভিন্ন সময়ে ওঠে। রামাপিথেকাসের চোয়ালের হাড় পরীক্ষা করে দেখা গেছে, ঐ সকল পেষক দন্তের পিছনের দিকে ক্ষয় খুব কম হয়েছে—মানুষের বেলায়ও তাই হয়ে থাকে।

এতে আরও বোঝা যাচ্ছে যে, মনুষ্যজাতীয় পরবর্তী জীবের মত রামাপিথেকাসজাতীয় জীবের জীবনের বেশীর ভাগ সময় শৈশব ও কৈশোর অবস্থার মধ্যে অতিবাহিত হয়েছে।

পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাব এবং তার সৃষ্টির পথের সন্ধান আজও সুস্পষ্টভাবে পাওয়া যায় নি। তবে প্রাক্‌মানব যুগ সম্পর্কে যে সন্দেহ ছিল, তা এই আবিষ্কারটি অনেকখানি নিরসন করছে।

ভূ-বিজ্ঞানের দিক থেকে অতীতের লক্ষ লক্ষ বছরের প্রাচীন এই কয়টি নিদর্শন কয়েকটি মুহূর্তের প্রতীক মাত্র। এই পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছে সাড়ে চার-শ' কোটি বছর পূর্বে। আর মানুষের প্রাচীনতম পূর্বপুরুষের আবির্ভাবের প্রায় 300 কোটি বছর আগে জীবনের আবির্ভাব ঘটেছে।

আবহাওয়া সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধান

ভাবতে আশ্চর্য লাগে, মাত্র এক-শ' বছরের কিছুটা আগে 1850 ও 1860 সালে আবহাওয়াবিজ্ঞান সম্পর্কে মানুষ কতটুকুই বা জানতো! তখন অনেকে আবহাওয়া নিয়ে আলোচনাও করতো। কিন্তু তারা এই বিষয়ে প্রায় কিছুই করে নি—এমন কি, বোঝবারও চেষ্টা করে নি। সে দিন প্রকৃতিতে ঝড়, জল যা কিছু ঘটেছে, তাকে সাধারণ ঘটনা বলেই তারা মেনে নিয়েছে। তবে আবহবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানীরা ঐ সময়েই প্রথম স্থির করেন যে, তাপমাত্রা, আবহমণ্ডলের চাপ ও বাতাসের গতির ক্ষেত্রে যা ঘটছে, যে উঠানামা চলছে—তার একটা হিসাব রাখতে হবে—একটা মানচিত্র রচনা করতে হবে। কারণ এগুলির মধ্যে যে একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে, বিজ্ঞানীরা তা বিশেষভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন। এই তথ্যানুসন্ধানের ফলেই ভীষণ ঝড়ো আবহাওয়ার রূপ ও তার গতি-প্রকৃতিও সে দিন তাঁরা জানতে পেরেছিলেন।

দিনের পর দিন আবহাওয়ার গতি-প্রকৃতির যে পরিবর্তন হয়ে থাকে, মানুষ তা লক্ষ্য করে এসেছে। এই পরিবর্তনের উৎস যে পৃথিবী থেকে অনেক দূরে রয়েছে, তাও এর ফলে সে জানতে পেরেছে। কিছুটা রয়েছে আকাশের উপরের দিকে, আর কিছুটা রয়েছে তার অনেক উর্ধ্বে।

পৃথিবীর উপরে রয়েছে অন্তহীন বাতাসের সমুদ্র। এই বাতাসের গতি-প্রকৃতির দ্বারাই যে আবহাওয়ার গতি-প্রকৃতি নির্ধারিত হয়ে থাকে—এই কথা আজ আর কারো অজানা নেই। সারা পৃথিবীব্যাপী এই বাতাসের গতি-প্রকৃতি খুবই জটিল। নানা দেশের বিজ্ঞানীরা প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করে গত এক-শ' বছরের মধ্যে ক্রমে ক্রমে এই কথা উপলব্ধি করেছেন, সম্পূর্ণরূপে জানতে পেরেছেন। বিগত এক-শ' বছরের বিশ্বব্যাপী আবহাওয়ার প্যাটার্ন বা প্রকৃতি ও রূপ বিশ্লেষণ করে কোন একটি স্থানের আবহাওয়ার পূর্বাভাস যে জ্ঞাপন করা যেতে পারে, তাও বিজ্ঞানীরা এই তথ্যানুসন্ধানের ফলে জানতে পেরেছেন।

আবহবিজ্ঞানের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, এই পৃথিবীর একটা বিরাট এলাকা জুড়ে আবহমণ্ডলের বিভিন্ন উচ্চতায় বিভিন্ন স্থানের তাপ, চাপ ও বাতাসের গতির মাত্রার হিসাব একই সময়ে নেওয়া যায় নি এবং সেই সকল তথ্য বিশ্লেষণ করে আবহাওয়া সম্পর্কে ব্যাপক মানচিত্র রচনার জন্যে যথাশীঘ্র কোন দপ্তরে পাঠানোও সে দিন সম্ভব হয় নি।

সাম্প্রতিক কালে সেই অসম্ভবকে সম্ভব করেছে পৃথিবী প্রদক্ষিণরত আবহাওয়া সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধানী কৃত্রিম উপগ্রহসমূহ। নানা প্রকার সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি সমন্বিত এই সকল স্বয়ংক্রিয় উপগ্রহ বিভিন্ন উচ্চতায় বাতাসের চাপ, গতি ও তাপমাত্রার নিখুঁত হিসাব একই সময়ে পৃথিবীতে সরবরাহ করে যাচ্ছে, আর পাঠিয়ে যাচ্ছে সমগ্র পৃথিবীর সকল স্থানের মেঘের গঠন বা প্যাটার্নের চিত্রাবলী।

আবহবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বার্তার দ্রুত আদান-প্রদানের বিষয়টিও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমে টেলিগ্রাফই ছিল দ্রুত বার্তা প্রেরণের প্রধান বাহন। তার পরে উদ্ভাবিত হয়েছে বেতার বা রেডিও। এটি বার্তা আদান-প্রদানের উন্নততর ব্যবস্থা। যেখানে টেলিগ্রাফের তার বা সমুদ্রগর্ভ দিয়ে বিদ্যুদ্বাহী তার স্থাপন করা সম্ভব হয় নি, সেখানে এবং দূর সমুদ্রে কোন জাহাজে বার্তার আদান-প্রদান রেডিওর মাধ্যমে হয়ে থাকে। বেতারের মাধ্যমেই আজ আবহাওয়া সম্পর্কে যেমন তথ্যাদি সংগৃহীত হচ্ছে, তেমনি কৃত্রিম

উপগ্রহসমূহও টেলিভিশনের মাধ্যমে মেঘের চিত্রাবলী পৃথিবীতে পাঠিয়ে যাচ্ছে।

বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আবহাওয়া সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধানের দিগন্ত আজ বহুদূর পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছে। বিজ্ঞানীরা এখন কেবলমাত্র এই পৃথিবীতে বসেই তথ্যানুসন্ধান করেন না, বর্তমানে তাঁরা পৃথিবীর কিছুটা উপরে বিমান ও বেলুন পাঠিয়ে এবং তারও উর্ধ্বে মহাকাশযানের সাহায্যে আবহাওয়া সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে থাকেন। আবহবিজ্ঞানের আওতায় এখন বিজ্ঞানের নানা বিভাগ, যেমন—পদার্থবিদ্যা, রসায়নশাস্ত্র, ভূতত্ত্ব, যোগাযোগ, পরিবহন প্রভৃতি বিষয়গুলিও পড়ে। এছাড়া জীবতত্ত্ব এবং কৃষির পক্ষে আবহাওয়া ও জলবায়ুর গুরুত্ব যে কতখানি, এই বিষয়ে গবেষণার ফলে তা বিশেষভাবে জানা গেছে। শীত, গ্রীষ্ম অর্থাৎ ঠাণ্ডা, গরম এবং আর্দ্রতায় সূর্যের নানা রকমের তাপে মানুষ এবং পশুর স্বাস্থ্য প্রভাবিত হয়ে থাকে। তারপর ঘূর্ণিবাত্যা, শিলাবৃষ্টি এবং প্রচণ্ড ঝড়ঝঞ্ঝায় মানুষের ধনসম্পত্তি ও ফসলের বিপুল ক্ষতি হয়ে থাকে—এমন কি, জীবনহানিও ঘটে। এই অশান্ত আবহাওয়ার পূর্বাভাস পেলে মানুষ এই সকল দুর্বিপাক থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে। এই পূর্বাভাস জ্ঞাপনের ক্ষেত্রে আজ মানুষ অনেকখানি এগিয়ে গেছে।

অনেক দেশে আবহাওয়ার পূর্বাভাস নিয়মিতভাবে প্রথমেই চাষীদের দেওয়া হয়। ফসল কখন রোপণ করতে হবে, কখন রোপণ করলে বেশ ভাল বর্ষা এবং ফসল তোলবার সময়ে বেশ ভাল রোদ পাওয়া যাবে, তা প্রায় সকল দেশের চাষীরাই নিজ নিজ দেশের প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করে অনেক কাল থেকেই মোটামুটিভাবে জেনে আসছেন। তবে আবহাওয়া সম্পর্কে সঠিক পূর্বাভাস পেলে ফসল রোপণ ও ফসল তোলবার পক্ষে খুবই সহায়ক হয়ে থাকে।

সাম্প্রতিক কালের শিল্পযুগের মানুষেরা আবহাওয়া সংক্রান্ত কয়েকটি সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন। আবহবিজ্ঞানীরাও এই সকল বিষয় সম্পর্কে সচেতন। তবে এই সকল সমস্যা সমাধানের প্রতি তাঁদের বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে; যেমন—শিল্প প্রসারণের ফলে কলকারখানা থেকে নির্গত ধোঁয়া আকাশ আচ্ছন্ন করে ফেলে এবং বড় বড় সহরে এই ধোঁয়া ও কুয়াসা মিলে সৃষ্টি হয় ধোঁয়াসার। মহাকাশের নির্দিষ্ট স্থানের কিছুটা নীচে বিশেষ অঞ্চলে এই ধোঁয়াসা সীমাবদ্ধ থাকে। এই ধোঁয়াসার পূর্বাভাস দেওয়া আবহবিজ্ঞানীদের একটা মস্ত বড় কাজ। এছাড়া বাতাস বা আবহাওয়া দূষিত হবার প্রতিক্রিয়া সম্পর্কেও আবহবিজ্ঞানীদের অধিকতর সচেতন হওয়া প্রয়োজন।

তারপর আবহাওয়ায় কার্বন ডায়োক্সাইড কি এই পরিমাণে বেড়ে যাচ্ছে যে, তাতে পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়ে যেতে পারে? অথবা যে সকল বস্তুকণা আবহাওয়াকে দূষিত করে ও আবহাওয়ায় ভেসে থাকে, সেগুলির উপর সূর্যকিরণ পড়ে প্রতিফলিত হয়—এই প্রতিফলনের ফলে পৃথিবী কি শীতল হবে? বাতাসের ক্ষুদ্র বস্তুকণা মেঘের গঠনে কি সাহায্য করে? এই সকল প্রশ্নের উত্তর আবহবিজ্ঞানীদের দিতে হবে।

আবহবিজ্ঞানীদের সীমানা আজ মাত্র আবহাওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। আবহাওয়ার সঙ্গে সমুদ্র অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ, মেরুঅঞ্চলের চিরতুষারাবৃত স্থানের সঙ্গে এবং মহাদেশসমূহের পাহাড়-পর্বত, মরুভূমি ও প্রান্তরের সঙ্গেও তার নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। তাই আজ আবহবিজ্ঞানীদের তথ্যানুসন্ধনের ক্ষেত্র সমগ্র বিশ্বেই প্রসারিত।

আবহাওয়া দূষিতকরণ সংক্রান্ত বিষয়ের প্রতিই মাত্র মানুষের দৃষ্টি আজ আবদ্ধ নয়, আব-

হাওয়ার পরিবর্তন কিভাবে করা যেতে পারে, তারও চেষ্টা আজ হচ্ছে। বর্তমানে বিশেষ অবস্থায় তুষার ও বৃষ্টিপাতের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটানো যেতে পারে। কালক্রমে হয়তো এমন দিন আসবে, যখন ঝড়কেও ঠেকিয়ে রাখা যাবে অথবা তার গতি ফিরিয়ে দেওয়া যাবে।

সিমেণ্ট-বালির নৌকা

এই সম্বন্ধে ক্লার ক্লিমেন্টস লিখেছেন—একেবারে গোড়ার দিকে বৃটেনের নৌশক্তির খ্যাতির মূলে ছিল তার ওক-নির্মীত কাঠের জাহাজগুলি। তারপর বৃটেনই প্রথম লৌহ-নির্মিত জাহাজের সূচনা করলো—যার ফলে আজকের বিরাট ইস্পাতের তৈরি জলযানগুলি দেখা যাচ্ছে। এবার নরফোকের (দক্ষিণ ইংল্যাণ্ড) ওরক্যাসহামের একটি বৃটিশ ফার্মে নৌকা নির্মাণের আর একটি নতুন উপাদান উদ্ভাবিত হয়েছে।

এই নতুন উপাদানটির নাম দেওয়া হয়েছে সীক্রিট (Seacrete)। এর মধ্যে থাকে প্রধানতঃ বালি ও উচ্চ মানের সিমেণ্ট। প্রায় 10 বছর আগে এটি উদ্ভাবিত হয় এবং বর্তমানে এই উপাদানে তৈরি 200-এরও বেশী জলযান 19টি দেশে ব্যবহৃত হচ্ছে। সীক্রিটের সাহায্যে জাহাজের খোল তৈরি হচ্ছে 10টি দেশে এবং আরও অনেক অনুমতি-পত্রের আবেদন নিয়ে আলোচনা চলছে।

চিরাচরিত উপাদানে তৈরি জাহাজের খোল-গুলির চেয়ে সীক্রিটের খোলগুলির সুবিধা অনেক-বেশী। বড় রকমের সংঘর্ষেও এর সামান্যই ক্ষতি হয়। এর আগুন বা চাপ সহ্য করবার শক্তি অসাধারণ। একে রক্ষণাবেক্ষণ করাও সহজ। মেরামতির কাজ সঙ্গে সঙ্গে করা চলে এবং কাঠের তৈরি জাহাজের খোলের মেরামতের এক-দশমাংশ সময় লাগে।

অন্যান্য উপাদানে তৈরি একই মাপের জাহাজের তুলনায় সীক্রিটে তৈরি জাহাজে জায়গা বেশী পাওয়া যায়। সীক্রিটের নৌকা বা জাহাজ তৈরি করতে হলে বিশেষ কাঠামোর (প্রত্যেকটার জন্যে আলাদা) প্রয়োজন হয় না বলে তুলনামূলকভাবে এই পদ্ধতিতে ব্যয় অনেক কম।

সীক্রিট জলীয় বাষ্প টানে না, সে জন্যে দুর্গন্ধ হবার আশঙ্কা নেই। এই উপাদান বিদ্যুৎ-প্রতিরোধীও বটে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বহু সংস্থা (যার মধ্যে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বা এফ-এ-ও রয়েছে) সীক্রিটের দ্বারা মাছ-ধরা নৌকা তৈরির পরিকল্পনা অনুমোদন করেছেন।

শুধু মাছ-ধরবার কাজে নয়, সীক্রিটে তৈরি জলযান নাইজেরিয়ায় পুলিশ প্রহরী নৌকা, ফেরি নৌকা, গায়নায় টাগবোট, সৌদি আরবে জলবাহী নৌকা এবং পৃথিবীর বহু দেশে বন্দর লঞ্চ হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। বার্জ, বয়া ও অন্যান্য বন্দর-সরঞ্জাম তৈরির কাজেও সীক্রিটের চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সীক্রিট জাহাজ-নির্মাতা ফার্মের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ ডোনাল্ড হ্যাগেনব্যাক গত বছর অক্টোবরে ভারত সফর করেন এবং সম্ভাব্য সীক্রিট ব্যবহারকারীদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন। তিনি বলেন—এটাই স্বাভাবিক যে, উন্নয়নশীল দেশগুলি নিজেদের প্রয়োজনমত জিনিষ সৃষ্টি করে নেবে। সীক্রিট তৈরি করবার মত কাঁচামাল সর্বত্রই পাওয়া যায় এবং শ্রমিকদের শিখিয়ে নেওয়াও কঠিন কাজ নয়। ভারতে এই ধরণের নৌকা তৈরির বিরাট সম্ভাবনা রয়েছে বলে তাঁর ধারণা।

ভারতীয় প্রাইমেট

শ্রীহরিমোহন কুণ্ডু*

প্রাইমেট হলো স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মধ্যে একটি শ্রেণী, মানুষও যার অন্তর্গত। সুতরাং এই শ্রেণীর মধ্যে যে সব জন্তু অন্তর্ভুক্ত, তারা শারীরিক ও মানসিক দিক থেকেও মানুষের খুবই কাছকাছি। কাজেই মানুষের বিবর্তনের ইতিহাস জানতে হলে এদের ইতিহাস জানাও প্রয়োজন।

পৃথিবীতে যে সব প্রাইমেট বর্তমানে জীবিত আছে, তাদের মধ্যে গরিলা এবং শিপাঞ্জি মানুষের সবচেয়ে নিকটাত্মীয়। এরা আফ্রিকার অধিবাসী। তার পরেই আসে ওরাং ওটাং; এরা সুমাত্রা ও বোর্নিওর অধিবাসী।

ভারতবর্ষে যে সব প্রাইমেট বাস করে, তাদের মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যায়।

(ক) লেজহীন মর্কট (Ape),

(খ) লেজবিশিষ্ট বানর (Monkey),

(গ) নিশাচর বৃহচ্চক্ষু বানর (Loris)

লেজহীন মর্কট

এদের সাধারণ নাম গিবন। এরা Hylobates গণভুক্ত। এদের ছয়টি বিভিন্ন প্রজাতি (Species) আছে—যারা সাধারণভাবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বাসিন্দা। হাইলোবেটস-এর কেবল দুটি Species ভারতবর্ষে দেখা যায়। তার মধ্যে Hylobates hoolock অতি পরিচিত।

আসাম, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি গ্রীষ্মপ্রধান বনাঞ্চলে, যেখানে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়, সেখানে এরা বাস করে। গভীর জঙ্গলের মধ্যে গাছের ডালে লতাপাতায় আচ্ছাদিত ঝোপের ভিতর থাকতে এরা ভালবাসে। তবে খাবার সময় বহু উঁচু গাছের ডালের উপর উঠে যায় আবার মাটিতে নেমে ঝর্ণার জল পান করে। এরা দিবাচর প্রাণী। এদের খাবার হলো বনজ ফল, পাতা ও ফুল। মাঝে মাঝে পাখীর ডিম এবং বাচ্চা
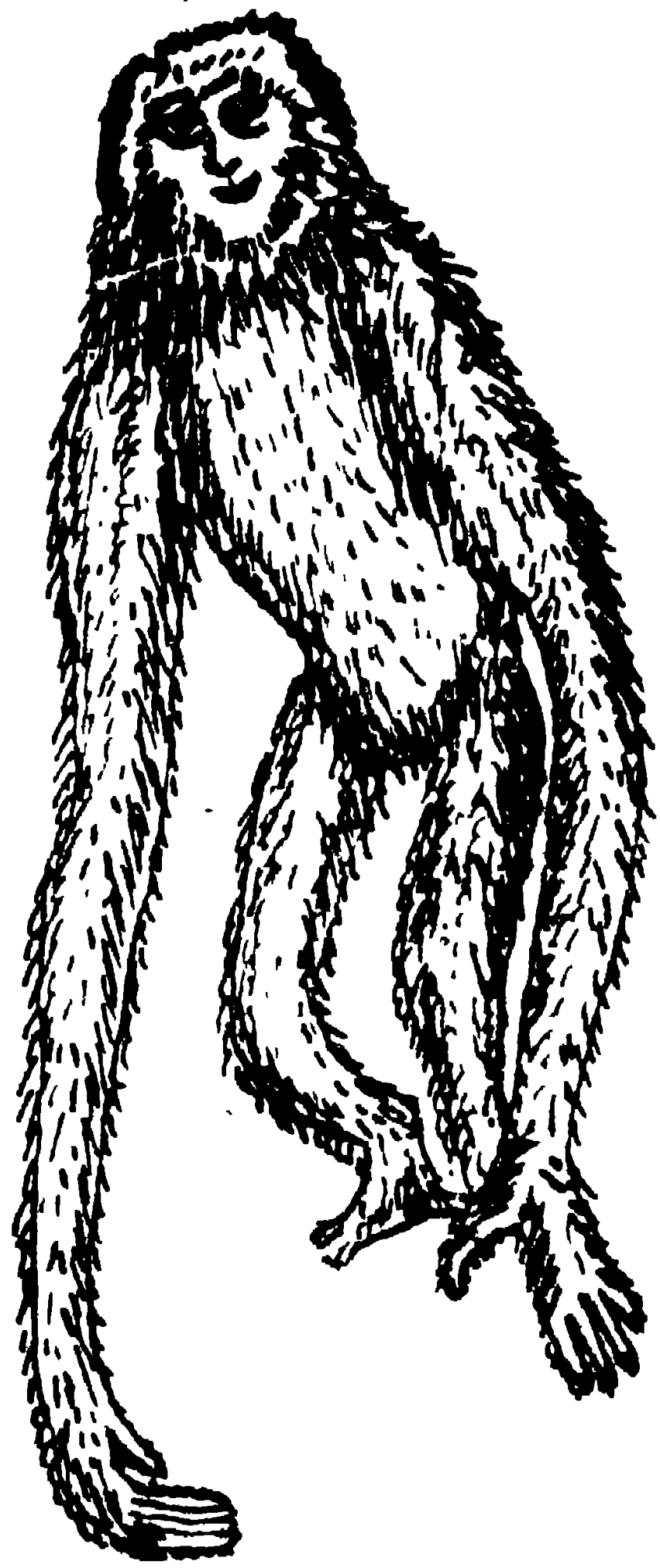
1নং চিত্র
গিবন

*প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, বাঁকুড়া সম্মিলনী কলেজ, বাঁকুড়া

পাখীও খেয়ে থাকে। এরা আদিম যুগের মানুষের মতই কখনও স্থায়ীভাবে ঘর বাঁধে না।

লেজহীন এই মর্কটগুলি দেখতে প্রায় মানুষের মতই লম্বা, এদের সারা শরীর ঘন ঝাঁকড়া লোমে আবৃত। জন্মের সময় দেহের রং হয় ধূসর, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেহের রং হয়ে যায় কালো। যৌবনে স্ত্রী হাইলোবেটসের রং থাকে পিঙ্গল বর্ণের, কিন্তু পুরুষের রং কালোই থেকে যায়, কেবল চোখের পাতাগুলি সাদা ঘন লোমে ঢাকা থাকে। মানুষের মতই এদের মোট 32টি দাঁত। বাহু দুটি পায়ের তুলনায় অনেক লম্বা। কখনও কখনও হাতে-পায়ে আবার কখনও মানুষের মত দু-পায়ে ভর দিয়ে সোজা হয়ে চলাফেরা করে। রাতের বেলায় গাছের ডালে ঘন পত্র-গুচ্ছের মধ্যে ঘুমায়।

বনের মধ্যে এরা ছোট ছোট দল বেঁধে ঘুরে বেড়ায়। এক-একটি দল হলো এক-একটি পরিবার, যার মধ্যে থাকে একটি পুরুষ, একটি স্ত্রী এবং তাদের তিন-চারটি বাচ্চা। বাচ্চারা পরিণত বয়স্ক হলে নিজেদের সঙ্গী খুঁজে নিয়ে বাপ-মায়ের কাছ থেকে দূরে চলে যায়। এক একটি পরিবার জঙ্গলের মধ্যে 250 থেকে 300 একর জায়গা জুড়ে বিচরণ করে এবং তারই মধ্যে উৎপন্ন ফল, ফুল ইত্যাদি খাবার খায়। এই সীমানার মধ্যে অন্য কোন পরিবার ঢুকে পড়লে ওদের মধ্যে ঝগড়া বেধে যায়।

সাবালকত্ব প্রাপ্তির পর স্ত্রী ও পুরুষের মিলনের কোন নির্দিষ্ট সময় সীমা থাকে না। ঋতুকালে (Menstrual cycle) এবং গর্ভবতী অবস্থায়ও স্ত্রী ও পুরুষের মিলন হয়। স্ত্রী-গিবনের নিয়মিত ঋতুকালের ব্যবধান 20 থেকে 33 দিন এবং 2 থেকে 4 দিন তা স্থায়ী হয়। স্ত্রী-গিবন 220 দিন গর্ভধারণের পর মানুষের মতই* একটি বাচ্চার জন্ম দেয়। বাচ্চারা জন্মের পর মায়ের কোলে-পিঠেই পালিত হয়। বাচ্চা প্রায় 2 বছর স্তন্যপান করে এবং 7-8 বছর বয়সে সাবালকত্ব প্রাপ্ত হয়। এদের আয়ুষ্কাল 30 থেকে 32 বছর।

লেজবিশিষ্ট বানর

ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রকমের বানর দেখা যায়। উত্তরে হিমালয় থেকে দক্ষিণে সমুদ্র এবং পূর্বে আসাম থেকে পশ্চিমে পাঞ্জাব পর্যন্ত শহরে, গ্রামে, পাহাড়ে, জঙ্গলে সর্বত্রই বানর সুপরিচিত। গাছের ফল, পাতা, আলু, ধান, গম এবং ছোট ছোট পোকামাকড়ও খাদ্য হিসাবে এরা গ্রহণ করে থাকে। এরা দিবাচর প্রাণী (2নং চিত্র)।

দেহের উচ্চতা বিভিন্ন জাতের বানরের বিভিন্ন রকমের। এদের হাত-পা দেহের তুলনায় বেশী লম্বা, দেহ নানা রঙের লোমে আবৃত। এদেরও দাঁত মোট 32টি। সাধারণভাবে লম্বা লেজটি গুটিয়ে অথবা উপরের দিকে তুলে হাত ও পায়ে ভর দিয়ে এরা চলাফেরা করে—কখনও আবার দু-পায়ে ভর দিয়েও দাঁড়ায়। এরা এক-এক দলে সংখ্যায় অনেকগুলি করে থাকে। কিন্তু তাদের মধ্যে সাবালক পুরুষ বানর থাকে মাত্র একটি। পুরুষ বানর দলের মধ্যে শৃঙ্খলা বজায় রাখে এবং দলের নেতৃত্ব করে। স্ত্রী-বানরের কাজ বংশবৃদ্ধি ও সন্তান পালন করা।

ভারতবর্ষে যে বানর হনুমান নামে পরিচিত, তারা এক সঙ্গে তিন থেকে এক-শ' কুড়িটি পর্যন্ত দল বেঁধে বাস করে। একটি দলে সাধারণতঃ যে পুরুষ থাকে, তাকে বলা হয় বীর হনুমান বা দল-পতি। বাকী সবাই স্ত্রী-বানর অথবা বাচ্চা। অন্য কোন পুরুষ সেই দলে প্রবেশ করলে উভয়ের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ বেঁধে যায় এবং যে জয়লাভ করে,

সেই দলপতি হয়। আবার কোন কোন সময় পারস্পরিক বোঝাপড়ার মধ্য দিয়ে একটি দলে একাধিক পুরুষও কর্তৃত্ব করে থাকে। স্ত্রী-বানরের মধ্যে যে দলপতিকে বেশী সঙ্গ দান করে, কারণ, স্ত্রী-বানরেরা স্বভাবতঃই বাচ্চা ভালবাসে। তারপর তারা মায়ের কাছে বাচ্চাকে ফিরিয়ে দেয় এবং মা তার বুকের দুধ দিয়ে বাচ্চাকে পালন করে। কিন্তু সাধারণতঃ দু-বছরের মধ্যে
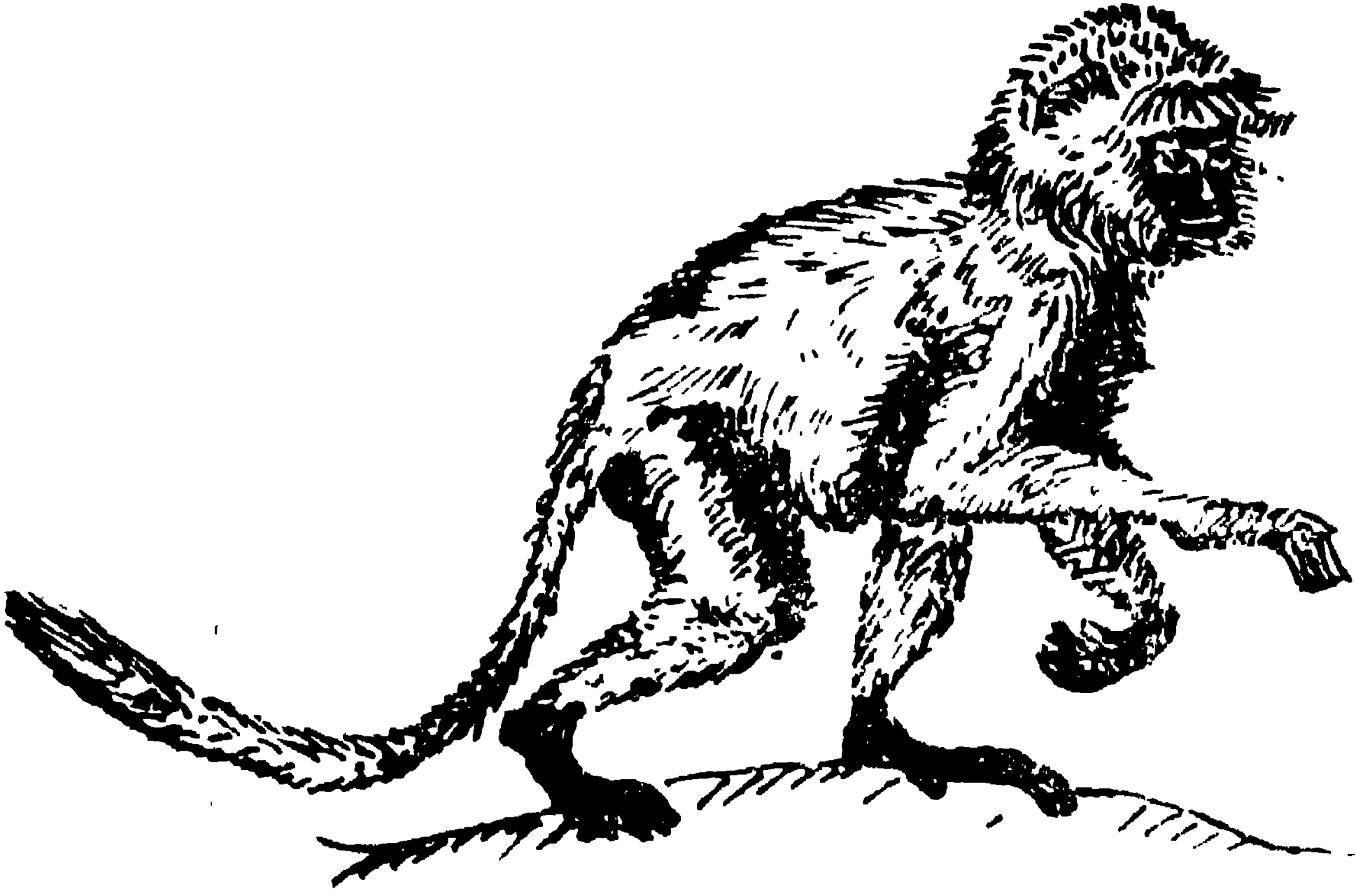
2নং চিত্র
বানর

সে কিছুটা রাণীর মত কর্তৃত্বে আসীন হয়। কিন্তু সন্তান প্রসব করলেই দলপতির বিরাগ-ভাজন হয়ে অন্ততঃ কিছুকালের জন্যে অবহেলিত অবস্থায় দূরে সরে যেতে বাধ্য হয়।

স্ত্রী-হনুমানের ঋতুকাল ত্রিশ দিন অন্তর হয়ে থাকে এবং দুই থেকে তিন দিন স্থায়ী হয়। এরা গর্ভবতী হবার 168 দিন পরে বাচ্চা প্রসব করে। বাচ্চা প্রসবের সময় প্রসূতি যখন বেদনা অনুভব করে তখন তিন থেকে আটটি বানর তাকে ধাত্রীর কাজের জন্যে ঘিরে ধরে। প্রসবের সঙ্গে সঙ্গে তারা মায়ের কাছ থেকে বাচ্চাটিকে সরিয়ে নেয় এবং দু-এক দিন ধাত্রী-বানরেরা এই বাচ্চাকে যত্ন করে— মায়ের কোলে যদি অন্য সন্তান আসে, তখন মা বাচ্চাকে জোর করে দূরে সরিয়ে দেয়। মা যদি পুরুষ বাচ্চা প্রসব করে, তবে তার ভয়ের সীমা থাকে না। দলপতি তার ভাবী প্রতিদ্বন্দ্বী ভেবে পুরুষ শিশুটিকে সুবিধা পেলেই হত্যা করতে ইতস্ততঃ করে না। কোনক্রমে রক্ষা পেলে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নিজের বীরত্ব দেখিয়ে সে দলপতির মন জয় করে এবং দলের মধ্যে নিজের স্থায়ী আসন প্রতিষ্ঠা করে নেয়।

ভারতবর্ষে যে সব বানর দেখা যায়, এখানে তাদের নাম, প্রাপ্তিস্থান এবং অন্যান্য পরিচিতি দেওয়া হলো।

নাম	প্রাপ্তিস্থান	দেহের রং	মুখ	লেজ
1. Macaca radiata ম্যাকাকা রেডিয়েটা (Bonnet monkey)	গোদাবরী নদী ও সাতারা পর্বতের দক্ষিণাঞ্চল।	ধূসর পিঙ্গলাভ, পেটের তলা ফিকে।	হাল্কা গোলাপী অথবা লাল্চে কপালে ছোট ছোট লোম।	দেহের দৈর্ঘ্য থেকে বড়, নরম লোমে আবৃত।
2. Macaca silenus ম্যাকাকা সাইলিনাস। (Lion tailed monkey)	পশ্চিমঘাট পর্বতমালা হইতে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত	কালো	কালো	দেহের দৈর্ঘ্যে অর্ধেক অথবা ⅔ ভাগ। শেষ ভাগে গুচ্ছ লোম থাকে।
3. Macaca mullata ম্যাকাকা মুলেটা। (Rhesus monkey)	সমগ্র উত্তরভারত	পিঙ্গলবর্ণের, পেটের তলা ফিকে।	লাল্চে	দেহের দৈর্ঘ্যের প্রায় অর্ধেক, প্রচুর লোম থাকে।
4. Macaca assamensis. ম্যাকাকা অ্যাসামেনসিস (Assamese monkey)	আসাম, সুন্দরবন, মিশমি ও নাগা পার্বত্যাঞ্চল	হলুদ বর্ণ থেকে গাঢ় পিঙ্গল বর্ণের	মুখের পাশ লাল্চে, চোখের তলা কালো।	দেহের দৈর্ঘ্যের তুলনায় অর্ধেক থেকে ⅔ ভাগ।
5. Macaca speciosa ম্যাকাকা স্পিসিওসা (Stump tailed monkey)	আসাম	কাল্চে	লাল্চে কপাল কোঁচকানো	লেজ দীর্ঘ, লেজে অল্প লোম।
6. Presbytis entellus (Semnopithecus entellus) প্রেসবিটিস এন্টেলিস (Hanuman monkey)	ভারতের সর্বত্র	ধূসর, কাল্চে অথবা পিঙ্গল	মুখ খুবই কালো	লেজ দেহের দৈর্ঘ্যের চেয়ে বড়

এই প্রজাতিগুলি ছাড়া স্থানীয়ভাবে প্রতিটি জাতির অনেক উপ-প্রজাতিও ভারতে পাওয়া যায়।

নিশাচর বৃহচ্চক্ষু লোরিস

ভারতে দু-জাতের লোরিস দেখা যায় অর্থাৎ শ্লেণ্ডার লরিস (Loris tardigradus) এবং শ্লো লোরিস (Nycticebus coucang)। প্রথমোক্ত জন্তুটি দক্ষিণ ভারতের বাসিন্দা এবং দ্বিতীয়টি আসাম ও ব্রহ্মদেশে দেখা যায়।

এরা সাধারণতঃ গাছের ফল, কীট-পতঙ্গ, ছোট ছোট গিরগিটি ও পাখী খেয়ে জীবন-

ধারণ করে। রাত্রিবেলা ছাড়া এরা বের হয় না, জঙ্গলের মধ্যে অনেক উঁচু গাছের ডালে, ঝোপের মধ্যে অথবা কোটরের মধ্যে থাকে।

3নং চিত্র
লোরিস

দেহ পিঙ্গল বর্ণের লোমে আবৃত, হাত ও পায়ের দৈর্ঘ্য প্রায় সমান, কান বড় এবং গোলাকার। চোখের আকৃতি দেখে মনে হয় যেন চশমা পরে আছে। স্লেণ্ডার লোরিসের লেজ নেই, স্লো লোরিসের লেজ খুব ছোট এবং লোমে ঢাকা।

এরা সাধারণতঃ একাকী ঘুরে বেড়ায়। দলবদ্ধ অবস্থায় এদের দেখা যায় না। এদের একটি বিশেষত্ব হলো এই যে, চলবার সময় এরা ঘন ঘন মূত্রত্যাগ করে। বোধ হয় ঐ প্রস্রাবের গন্ধ ইচ্ছামত তাদের যে কোন অঞ্চলে বিচরণের সময় নির্ধারিত স্থান নির্ণয়ে সহায়তা করে। এরা সাধারণতঃ 160 দিন গর্ভধারণের পর একটি অথবা কখনও কখনও দুটি বাচ্চা প্রসব করে। দু-সপ্তাহের মধ্যেই বাচ্চা স্বাধীনভাবে ঘোরাফেরা করতে পারে। তিন থেকে ছয় মাস পর্যন্ত এরা মায়ের স্তন্যপান করে। প্রকৃতপক্ষে এরা অন্য সব প্রাইমেট অপেক্ষা একটু নিম্নস্তরের।

ধূমকেতুর কথা

রতনমোহন খাঁ*

অসীম নীল আকাশের বুকে ছোট-বড় অগণিত জোতিষ্কসমূহের মধ্যে সময়ে সময়ে দেখা যায়, দু-একটি আগুনের গোলা একদিক থেকে অন্য দিকে গিয়ে অসীম আকাশে হারিয়ে যায় চিরদিনের মত। এগুলিকে বলা হয় উল্কাপিণ্ড। আবার কখনও কখনও বিশাল পুচ্ছসমন্বিত জোতিষ্কের আবির্ভাব ঘটে আকাশের বুকে। এদেরই নাম ধূমকেতু। আদি ও মধ্যযুগে ধূমকেতুর উদয়ে মানুষ ভয়ে বিহ্বল হয়ে পড়তো। তাদের ধারণা ছিল—দুর্ভিক্ষ, মহামারী, যুদ্ধ প্রভৃতি অশুভের সূচক এই ধূমকেতু। বর্তমান প্রবন্ধে এই ধূমকেতু সম্বন্ধেই মোটামুটি আলোচনা করবো।

ধূমকেতু অতি দ্রুতগতিবিশিষ্ট উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। ধূমকেতু সাধারণতঃ তিনটি অংশে গঠিত—(1) উজ্জ্বল অগ্রভাগ বা নিউক্লিয়াস (Nucleus), (2) উজ্জ্বল অগ্রভাগের চারপাশে ধূমায়িত আবরণ বা কমা (Comma), (3) শুভ্র উজ্জ্বল দীর্ঘ পুচ্ছ।

কতকগুলি বিশাল ধূমকেতু মহাবিশ্বের অপূর্ব সৌন্দর্যসম্ভার। হাজার হাজার মাইল ব্যাসবিশিষ্ট উজ্জ্বল গোলকের অগ্রভাগ থেকে ছড়িয়ে পড়ে যেন অসংখ্য আগুনের ফোয়ারা আর পিছনে থাকে কয়েক হাজার মাইল দীর্ঘ উজ্জ্বল পুচ্ছ। এই

* সিটি কলেজ, কলিকাতা—9

বিশাল বস্তু সূর্যের দিকে যতই অগ্রসর হতে থাকে, পুচ্ছের সৌন্দর্য যেন ততই নানা ভঙ্গিমায় প্রকাশ পেতে থাকে।

বিজ্ঞানীদের মতে ধূমকেতু খুবই হাল্কা, এদের ঘনাঙ্ক পৃথিবীর ঘনাঙ্কের প্রায় $\frac{1}{10000000}$ ভাগ। আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে, বিশেষ করে বর্ণালী বিশ্লেষণের ফলে ধূমকেতুর মধ্যে CO, CH_2, CH, CN, NH_2, OH, NH, C_2, N_2 প্রভৃতির অস্তিত্বের কথা জানা গেছে। সূর্যরশ্মি প্রতিফলিত হবার ফলে ধূমকেতু উজ্জ্বল রঙে সুশোভিত হয়ে ওঠে। ধূমকেতু মূলতঃ সূর্যকিরণে আলোকিত হলেও এর অগ্রভাগের নিজস্ব আলো বিকিরণের ক্ষমতা আছে। অগ্রভাগ বা নিউক্লিয়াসের ব্যাস 100 মাইল থেকে 50000 মাইল পর্যন্ত হতে পারে। ধূমকেতুর অগ্রভাগ উজ্জ্বল নক্ষত্রের মত দেখায়। অগ্রভাগের চারপাশে ধূমায়িত আবরণ বা কমা একটি বিরাট গোলকের মত। এই গোলকের ব্যাস 18000 মাইল থেকে 1150000 মাইল পর্যন্ত হতে পারে। মহাকাশের বুকে ধূমকেতুর অগ্রভাগটি প্রথম দেখা দেয় একখণ্ড আবছা মেঘের মত। কোন ধূমকেতু সূর্য থেকে 250,000,000 মাইল দূরে থাকলে অনেক সময় দূরপাল্লার দূরবীক্ষণ যন্ত্রেও ধরা পড়ে না। ধূমকেতু সূর্যের যত কাছাকাছি আসতে থাকে, ততই তার অগ্রভাগ উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হতে থাকে আর স্ফীতকায় পুচ্ছের আবির্ভাব ঘটে। ধূমায়িত অংশ হচ্ছে অগ্রভাগের আবরণের মত। অগ্রভাগকে মাঝে মাঝে পুরাতন আবরণ পরিত্যাগ করতে দেখা যায়। Donati-র ধূমকেতুকে কয়েক দিনের মধ্যে সাতবার আবরণ পরিত্যাগ করতে দেখা গিয়েছিল। Tebbutl-এর ধূমকেতু দু-সপ্তাহে একবার আবরণ পরিত্যাগ করে। Morehouse-এর ধূমকেতুর ধূমায়িত আবরণ ও পুচ্ছ পরিবর্তনের কথা সুবিদিত।

দীর্ঘ পুচ্ছই ধূমকেতুর বিশেষ আকর্ষণ। Maxwell, Lebedeff, Nichols, ও Hull প্রভৃতি বিজ্ঞানীদের মতে, আলোক-তরঙ্গের চাপের ফলেই এই হাজার হাজার মাইল দীর্ঘ পুচ্ছের সৃষ্টি হয়। পুচ্ছের বিশিষ্ট ভঙ্গিমা পরিবর্তন সূর্য থেকে এর অবস্থানের দূরত্বের উপর নির্ভর করে। সূর্য থেকে বহু দূরে অবস্থিত ধূমকেতুর কোন পুচ্ছ দেখা যায় না। ধূমকেতু যতই সূর্যের দিকে অগ্রসর হতে থাকে, উজ্জ্বল অগ্রভাগের আকৃতি ততই ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হয় আর পুচ্ছটি দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়। অনুসূর (Perihelion) বিন্দুটি (সূর্যের নিকটতম বিন্দু) অতিক্রম করবার পরেই অগ্রভাগের আকার আবার বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং পুচ্ছটি ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়। ধূমকেতুর অগ্রভাগটি থাকে সূর্যের দিকে আর পুচ্ছটি থাকে সূর্যের বিপরীত দিকে। আমরা জানি, আলোক-তরঙ্গের চাপ বস্তুর বহির্ভাগের ক্ষেত্রফলের উপর আর মাধ্যাকর্ষণজনিত চাপ বস্তুর আয়তনের উপর নির্ভর করে। তাই স্বল্প ব্যাসার্ধের ক্ষেত্রে আলোক তরঙ্গের চাপ মাধ্যাকর্ষণজনিত চাপ অপেক্ষা বেশী। এই সকল কারণ পর্যালোচনা করে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, সূর্যরশ্মির চাপে সূক্ষ্মকণাগুলি অগ্রভাগ থেকে বিতাড়িত হয়ে পুচ্ছের সৃষ্টি করে। মাঝে মাঝে এই চাপ এত প্রবল হয় যে, পুচ্ছটি অগ্রভাগ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মহাবিশ্বে বিলীন হয়ে যায়। সূর্যরশ্মির প্রতিফলন ও প্রতিসরণের ফলে ধূমকেতুর পুচ্ছ কখনও কখনও নানা রঙে রঞ্জিত অবস্থাতেও দেখা যায়। 1861 খৃষ্টাব্দে প্রায় 24,000,000 মাইল দীর্ঘ 1000 মাইল বিস্তৃত বিশাল পুচ্ছধারী ধূমকেতু জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের চোখে পড়ে। একাধিক পুচ্ছবিশিষ্ট ধূমকেতুও দেখা যায়। 1744 খৃষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে ছয় পুচ্ছবিশিষ্ট একটি ধূমকেতু দেখা গিয়েছিল। 1903 খৃষ্টাব্দে Borelly নয় পুচ্ছবিশিষ্ট একটি ধূমকেতুর সন্ধান পান। 1861

খৃষ্টাব্দে 23 রঙে রঞ্জিত চার পুচ্ছবিশিষ্ট ধূমকেতু জ্যোতির্বিদ্‌গণের বিস্ময় উৎপাদন করেছিল। 1823 খৃষ্টাব্দের ধূমকেতুর দুই পুচ্ছের মধ্যে কৌণিক ব্যবধান ছিল 160°।

ধূমকেতুর কক্ষপথ সাধারণতঃ তিন রকমের; যথা—অধিবৃত্ত (Parabola), উপবৃত্ত (Ellipse) ও পরাবৃত্ত (Hyperbola)। আমাদের পৃথিবীর মত কতকগুলি ধূমকেতু সূর্য পরিক্রমা করে। আজ বিজ্ঞানের বিস্ময়কর উন্নতি সাধিত হলেও মহাবিশ্বের অসংখ্য জ্যোতিষ্ক সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান খুবই সীমিত।

মানমন্দিরের বিবরণী ও নানাবিধ বৈজ্ঞানিক তথ্য থেকে যতদূর জানা যায়, শতকরা 75টি ধূমকেতুরই পরিক্রমার পথ অধিবৃত্ত। অনেকের মতে, সব ধূমকেতুরই কক্ষপথ উপবৃত্ত, তবে এই পরিক্রমার পথ এত বড় (উৎকেন্দ্রিকতা বা Eccentricity প্রায় 1-এর নিকটবর্তী হবার জন্যে) যে, কয়েক হাজার বছর লাগে সূর্যকে একবার ঘুরে আসতে। তাই কোন ধূমকেতু একবার দেখা দিয়েই চিরকালের মত অদৃশ্য হয়ে যায় ক্ষীণজীবী মানুষের কাছ থেকে। সাধারণতঃ এক-শ' বছরে এক থেকে কুড়িটি ধূমকেতু দেখা যায়। একজন মানুষ তার জীবনে মোটামুটি এক ডজন ধূমকেতু দেখতে পারে।

দিনের বেলায় ধূমকেতু প্রথম দেখেন আফ্রিকার তিনজন রেলের কুলি। এই ঘটনাটি ঘটে 1910 খৃষ্টাব্দে। আজ পর্যন্ত প্রায় 50টি পর্যায়ক্রমিক (Periodic) ধূমকেতু দেখা গেছে, যাদের পর্যায়কাল 300 বছরের কম।

Halley-র ধূমকেতুর আবর্তনকাল 76 বছর। 1910 খৃষ্টাব্দে Halley-র ধূমকেতুটি দেখা গিয়েছিল এবং আবার 1986 খৃষ্টাব্দের প্রথম দিকে এই ধূমকেতুকে দেখতে পাবার সম্ভাবনা আছে। 1811 খৃষ্টাব্দের ধূমকেতুর আবর্তনকাল প্রায় 3000 বছর আর 1864 খৃষ্টাব্দে ধূমকেতুর আবর্তনকাল প্রায় 2,000,000 বছর। কতকগুলি ধূমকেতুর সূর্যের চারদিক পরিক্রমার পথ প্রায় একই ধরণের। এই ধূমকেতুগুলিকে একই গোষ্ঠীভুক্ত বলে ধরা হয়। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, একটি ধূমকেতু থেকেই এদের উৎপত্তি হয়েছে।

সূর্যের চারদিক পরিক্রমা করলেও ধূমকেতুগুলিকে সৌরমণ্ডলের মধ্যে গণ্য করা হয় না। সৌরমণ্ডলের সবকিছু নিয়ম এরা মেনে চলে না। তাই এরা গ্রহ-সূর্যের মধ্যে অপাংক্তেয়। জ্যোতির্বিদ্‌দের বহুদিনের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায়, ধূমকেতুগুলি একই পথে ভ্রমণ করে না। গ্রহগুলির মধ্যে এরূপ পরিক্রমার পথ পরিবর্তন প্রায় দেখা যায় না। বেশীর ভাগ ধূমকেতুকেই সৌরমণ্ডলের পরিপ্রেক্ষিতে বিপরীত দিকে ঘুরতে দেখা যায়। Halley-র ও আরও কয়েকটি ধূমকেতুর গতি এর ব্যতিক্রম। ধূমকেতুর অগ্রভাগ ও পুচ্ছ প্রথমে সূর্যরশ্মি শোষণ করে পরে তা বিকিরণ করে। সূর্যরশ্মি এদের উপর প্রতিফলিত ও প্রতিসরিত হয় এবং অগ্রভাগের নিজস্ব আলো বিকিরণের ক্ষমতা আছে; কিন্তু গ্রহগুলির নিজস্ব আলো বিকিরণের ক্ষমতা নেই। সূর্যের আলোকেই এরা আলোকিত এবং সূর্যরশ্মি এদের থেকে প্রতিফলিত হয়। তবে গ্রহগুলির মত ধূমকেতুরও গতিবেগ বৃদ্ধি পায়—যতই সূর্যের নিকটবর্তী হতে থাকে; আর হ্রাস পায়—যতই সূর্য থেকে দূরত্ব বাড়তে থাকে।

ধূমকেতুর উৎপত্তি সম্বন্ধে বিজ্ঞানীরা একমত নন। একদলের মতে, সৌরমণ্ডল সৃষ্টি হবার সময় কিছু অংশ বেরিয়ে গিয়ে ধূমকেতুর সৃষ্টি হয়েছে আর একদলের মতে, সূর্য বা গ্রহের বিস্ফোরণের ফলে এদের সৃষ্টি হয়েছে। আবার অনেকে বলেন—সূর্যের আকর্ষণে সুদূর নীহারিকা থেকে কিছু অংশ ছিট্‌কে আসবার ফলে ধূমকেতুর উৎপত্তি হয়েছে।

পুরাকালের অশুভ ইঙ্গিতবাহী ধূমকেতু

দুর্ভিক্ষ, মহামারী সৃষ্টি করতে না পারলেও পৃথিবীর উপর প্রলয়ঙ্কর ভূমিকম্প ইত্যাদি সৃষ্টিতে প্রভাব বিস্তার করতে পারে। সময় সময় দু-একটি ধূমকেতু তাদের বিশাল কলেবর নিয়ে পৃথিবী বা সূর্যপৃষ্ঠের খুব নিকটে চলে আসে। 1680 খৃষ্টাব্দের ধূমকেতুর সূর্যপৃষ্ঠ থেকে দূরত্ব ছিল মাত্র 147,000 মাইল। 1882 খৃষ্টাব্দে একটি ধূমকেতু পৃথিবী ও সূর্যের মধ্যে এসে পড়ে। 1921 খৃষ্টাব্দে ধূমকেতুর কবল থেকে আমাদের এই পৃথিবী অল্পের জন্যে বেঁচে যায়। 1910 খৃষ্টাব্দে পৃথিবী ধূমকেতুর পুচ্ছের মধ্য দিয়ে যাবার সময় আকাশের বুকে অপরূপ আলোকছটা দেখে জ্যোতির্বিদ্‌গণ বিস্মিত হয়ে যান। অনেকের ধারণা ধূমকেতুর পৃথিবীর অতি সান্নিধ্যেরই ফলেই বৃহৎ উল্কা-গহ্বরের সৃষ্টি হয়েছে।

ধূমকেতুর নাম তার আবিষ্কারকের নামানুসারেই রাখা হয়। কোন ধূমকেতু দেখা মাত্র তার গতিপথ, আকৃতি প্রভৃতি সম্বন্ধে বিশেষ-বিবরণ Harvard College Observatory-তে জানিয়ে দিলে সেটি যদি কোন নূতন ধূমকেতু হয়, তাহলে সংবাদদাতার নামেই তা পরিচিত হবে।

চাঁদের পাথর

শ্রীঅলোককুমার সেন

1969 সালের 21শে জুলাই অ্যাপোলো-11 মহাকাশযানের দুই আরোহী আর্মষ্ট্রং ও অলড্রিন পদার্পণ করেন চাঁদের Sea of tranquility নামক অঞ্চলে। চাঁদের বুকে কয়েক ঘন্টা কাটিয়ে তাঁরা ফিরে এলেন পৃথিবীতে, সঙ্গে করে আনেন চাঁদের পাথর। আমেরিকাসহ পৃথিবীর আটটি দেশের এক-শ' পঞ্চাশ জন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী চাঁদের পাথর নিয়ে নানা প্রকার গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান। আমেরিকার গবেষকেরা গত 15ই সেপ্টেম্বর তাঁদের গবেষণার ফলাফল প্রথম প্রকাশ করেন। অন্যান্য দেশের বিজ্ঞানীরাও তাঁদের মতামত প্রকাশ করেছেন। বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য হলো চাঁদের পাথর বিশ্লেষণে প্রাপ্ত তথ্যাদি সম্পর্কে আলোচনা। অবশ্য এই আলোচনার আগে বলা দরকার যে, কিভাবে তাঁরা পরীক্ষা চালিয়েছেন।

অ্যাপোলো-11-এর মহাকাশচারীরা যে সকল শিলাখণ্ড নিয়ে আসেন, সেগুলিকে রাখা হয় টেক্সাসের হিউস্টনের নিকটবর্তী মহাকাশ অভিযান কেন্দ্রে। মার্কিন বিশেষজ্ঞেরা চার বছরের চেষ্টায় ও 80 লক্ষ ডলার বা 6 কোটি টাকা খরচ করে বিশেষ একটি গবেষণাগার তৈরি করেছেন। এখানেই চান্দ্রশিলার রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয়—জানা যায় তার ইতিহাস। শিলাগুলি যাতে পার্থিব বস্তুর সংস্পর্শে না আসতে পারে, তার জন্যে বিজ্ঞানীদের সতর্ক দৃষ্টি ছিল। কারণ পৃথিবীর আবহাওয়া বা পার্থিব পদার্থের সংস্পর্শে এলে প্রস্তরখণ্ডের গঠন-প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটতে পারে; তাছাড়া চান্দ্রশিলা থেকে সংক্রামক বীজাণু পৃথিবীর বাতাসে ছড়িয়ে পড়তে পারে।

প্রশান্ত মহাসাগরে অবতরণের পর ক্যাপ্‌সুল ও অভিযাত্রীদের সংগৃহীত প্রস্তরখণ্ডসহ আধারগুলিকে উদ্ধারকারী জাহাজের সাহায্যে সরাসরি হিউস্টনে নিয়ে আসবার পর তাদের বহিরাবরণ অতিবেগুনী রশ্মি ও

বিভিন্ন অ্যাসিডের সাহায্যে বীজাণুমুক্ত করা হয়। তারপর সেগুলিকে ধোয়া হয় বীজাণুমুক্ত জলে এবং বিশুদ্ধ নাইট্রোজেন গ্যাসের সাহায্যে শুকিয়ে নেবার পর আধারগুলিকে বায়ুশূন্য প্রকোষ্ঠে রাখা হয়। পরীক্ষার উদ্দেশ্যে বিজ্ঞানীরা প্রকোষ্ঠের ছোট ছোট জানালার মধ্য দিয়ে নিরাপত্তামূলক দস্তানা পরিহিত হাত ঢুকিয়ে শিলাখণ্ডগুলিকে বের করে আনেন।

প্রথমে প্রস্তরখণ্ডের শ্রেণীবিন্যাস, নির্গত তেজস্ক্রিয় রশ্মি ও গ্যাসের পরিমাণ নির্ধারণ করে সূক্ষ্ম তুলাদণ্ডে সেগুলির ওজন নেবার পর বিশেষভাবে স্থাপিত ছুটি ক্যামেরায় তাদের আলোকচিত্র গ্রহণ করা হয়।

দ্বিতীয় পর্যায়ে সুরু হয় পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যবেক্ষণ। এই গবেষণার জন্যে বিশেষজ্ঞেরা কোন কোন শিলাখণ্ডকে রাসায়নিক পদার্থের সাহায্যে গলিয়ে ফেলেন বা উত্তপ্ত করে প্রথমে তরল ও পরে গ্যাসে পরিণত করেন আবার ঠাণ্ডায় আরো জমিয়ে ফেলেন।

তৃতীয় পর্বে অনুষ্ঠিত হয় আরো কঠিন পদ্ধতিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা। এই পর্যায়ে বিজ্ঞানীরা তেজস্ক্রিয়-নির্গমন পদ্ধতির সাহায্যে চান্দ্রশিলার বয়স নির্ণয় করেন এবং সেগুলির উপাদান নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা চালান।

এই সকল গবেষণার ফলে জানা গেল চান্দ্রশিলার ইতিহাস। চান্দ্রশিলার বিশ্লেষণে যে সমস্ত তথ্যাদি পাওয়া গেছে, তার মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য হলো—পৃথিবীতে পাওয়া যায় না এমন সব পদার্থে চাঁদের দেহ গঠিত। অবশ্য এই বিষয়ে এখনো কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় নি। কিন্তু বিজ্ঞানীরা এই ব্যাপারে একমত হয়েছেন যে, চাঁদের গঠন ও উপাদানের সঙ্গে পৃথিবীর গঠনে যথেষ্ট বৈসাদৃশ্য বিদ্যমান।

আরও জানা গেছে যে, চাঁদের ধূলাবালির অর্ধেকটাই কাচ দিয়ে তৈরী। এই কাচ অবশ্য পৃথিবীতে প্রাপ্ত কাচের মত নয়। এগুলি হলো খুব ছোট ছোট চক্‌চকে গোলাকার কণিকার সমষ্টি। আর্মষ্ট্রং ও অলড্রিন যে সব আলোকচিত্র তুলে এনেছেন, তা দেখে মনে হয় যে, তাঁরা বেগুনী রঙের কাচের আবরণের উপর দিয়ে হেঁটে বেড়িয়েছেন। নব আবিষ্কৃত তথ্যাদি যদি নির্ভুল হয়, তাহলে বলা যায় যে, চাঁদের জন্মের প্রথম দেড়-শ' কোটি বছর চন্দ্রপৃষ্ঠের উপর উল্কার আঘাত ও আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ ঘটেছে, কিন্তু গত তিন-শ' কোটি বছরে চন্দ্রপৃষ্ঠে অপেক্ষাকৃত কম বিস্ফোরণ ঘটে। কিন্তু পৃথিবীপৃষ্ঠের অবস্থা তা নয়। পরীক্ষার ফলে দেখা গেছে—কয়েক কোটি বছর আগে ভূপৃষ্ঠ যে রকম সক্রিয় ছিল, আজও সেই রকম সক্রিয় আছে। এর ফলে সৃষ্টি হয়েছে পাহাড়-পর্বত এবং মহাদেশগুলি ক্রমেই দূরে সরে গেছে আর আগ্নেয়গিরিগুলি অগ্ন্যুদ্‌গীরণ করে চলছে। পক্ষান্তরে চাঁদের পৃষ্ঠদেশ ক্রমশঃ নিষ্ক্রিয় হয়ে যাচ্ছে বলে অনুমান করা হচ্ছে।

চাঁদের মৃত্তিকায় কাচের অস্বাভাবিক উপস্থিতি, শিলার তেজস্ক্রিয়তা এবং চাঁদের অবশিষ্টাংশের তুলনায় চান্দ্রশিলার ঘনত্ব বেশী—এই তিনটি তথ্য পর্যবেক্ষণ করে নিউইয়র্কের কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর পল গাষ্ট বলেছেন—চাঁদের বিবর্তনের ইতিহাস পৃথিবী থেকে সম্পূর্ণ পৃথক।

এবার চান্দ্রশিলার উপাদান সম্পর্কে যে সব তথ্য পাওয়া গেছে, তা নিয়ে আলোচনা করা যাক। দেখা গেছে যে, প্রায় প্রত্যেকটি পাথর একই জাতীয় পদার্থের সমন্বয়ে গঠিত। পৃথিবীতে দুষ্প্রাপ্য পদার্থসমূহ চাঁদে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গেছে, যেমন—ক্রোমিয়াম, টাইটেনিয়াম ও জিরকোনিয়াম। চাঁদের আগ্নেয়শিলায় শতকরা বারো ভাগ টাইটেনিয়াম অক্সাইড পাওয়া গেছে, কিন্তু পৃথিবীর আগ্নেয়শিলায় এই যৌগিক পদার্থের উপস্থিতি এক-শ' ভাগে পাঁচ ভাগ মাত্র। চাঁদের

পাথরে প্রাপ্ত ক্রোমিয়ামের পরিমাণ পৃথিবীতে প্রাপ্ত ক্রোমিয়ামের দশ গুণ বেশী।

আবার এখানে যে সকল মৌলিক পদার্থ যথেষ্ট পাওয়া যায়, চাঁদে সেগুলি দুষ্প্রাপ্য। সীসা, সোডিয়াম, পটাশিয়াম ও বিস্মাথের মত স্বল্প গলনাঙ্কের পদার্থ চাঁদে প্রায় নেই বললেই চলে। এই বিস্ময়কর তথ্যের যথাযথ ব্যাখ্যা এখনো জানা যায় নি। তবে বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, চাঁদের শিলার গঠন পৃথিবীর শিলার গঠন থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হওয়ায় অথবা যে পদ্ধতিতে তরল পদার্থের সৃষ্টি হয়, তা অনুরূপ পার্থিব প্রক্রিয়া থেকে পৃথক হওয়ায় এই উপাদানগত বিভিন্নতার সৃষ্টি হয়েছে।

গত 5ই জানুয়ারী দু-জন বিশিষ্ট জাপানী বিজ্ঞানী হিউস্টনে অবস্থিত মহাকাশ-গবেষণা কেন্দ্রে তাঁদের গবেষণার চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ করেছেন। এঁদের একজন হলেন টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ববিদ্ ডক্টর ইকুয়ো কুশিরো আর অপর জন ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূ-পদার্থ-বিজ্ঞানী ডক্টর টাকেশী নাগাতা। এঁরা চান্দ্রশিলায় অ্যাপাটাইট ও ট্রলাইট নামক দু-রকমের দুষ্প্রাপ্য খনিজ পদার্থের সন্ধান পেয়েছেন। ডক্টর কুশিরো বলেন যে, মার্কিন মহাকাশ সংস্থা চান্দ্রশিলার বিশ্লেষণে বারোটি খনিজ পদার্থের অবস্থিতি প্রমাণিত করেছেন, কিন্তু এঁরা অ্যাপাটাইট বা ট্রলাইটের উপস্থিতি সম্পর্কে কিছু বলেন নি। ট্রলাইট শুধুমাত্র উল্কাপিণ্ডেই পাওয়া যায়, কিন্তু পৃথিবীতে এর অস্তিত্ব নেই।

ডক্টর নাগাতা চৌম্বক শক্তি বিষয়ক গবেষক দলের প্রধান। তাঁর মতে চান্দ্রশিলার মধ্যে চৌম্বক শক্তির অস্তিত্ব আছে। এই বিজ্ঞানীদ্বয়ের ধারণা—চাঁদের সৃষ্টি হয়েছে চার-শ' পঞ্চাশ কোটি বছর আগে। তাঁরা আরো বলেন যে, চাঁদের উৎস হলো গলিত লাভা, পরে তা শক্ত হয়ে জমাট বাঁধে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, অ্যাপেলো-11-এর মহাকাশচারীরা চাঁদের বুকে অনেক আগ্নেয়শিলা দেখতে পান। বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, এক সময় পাথরগুলি ছিল কতকটা তরল অবস্থায়, সংঘর্ষের ফলে উদ্ভূত তাপে তা গলিত অবস্থায় পরিণত হয়। অবশ্য কেউ কেউ বলেন যে, এগুলি অগ্ন্যুৎপাতের ফলেই উৎক্ষিপ্ত হয়েছিল।

এবার চাঁদের ভূমিকম্প সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা যাক। এই ভূমিকম্পের বিষয় যথাযথভাবে নিরূপণ করবার জন্যে মহাকাশচারীরা চাঁদের বুকে সিস্‌মোগ্রাফ রেখে আসেন।

এই যন্ত্র কর্তৃক প্রেরিত চন্দ্রকম্পনের বিশ্লেষণের ভার পড়েছিল নিউইয়র্ক সহরের কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ল্যামণ্ট ভূবিদ্যা মানমন্দিরের ডক্টর গ্যারি লাথাম ও ডক্টর মরিস ইউইং-এর উপর। এঁরা প্রাথমিক বিশ্লেষণের পর বলেন যে, চন্দ্রপৃষ্ঠের কম্পন পৃথিবীপৃষ্ঠের কম্পনের অনুরূপ। কিন্তু পরে আরো পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরে তাঁরা প্রমাণ করেন যে, পৃথিবীপৃষ্ঠের কম্পনের সঙ্গে চন্দ্রপৃষ্ঠের পার্থক্য বিদ্যমান। ডক্টর ইউই বলেন—সিস্‌মোগ্রাফ যন্ত্রে ইলেকট্রনিক শব্দের ফলেই প্রথম সঙ্কেতগুলি ভূকম্পনের অনুরূপ মনে হয়েছিল। ডক্টর লাথাম বলেন—পরবর্তী সঙ্কেতগুলি থেকে প্রমাণিত হয় যে, ভূত্বকের নিম্নভাগের অবস্থা চাঁদের অভ্যন্তর ভাগের মত নয়। চন্দ্রের অভ্যন্তর ভাগের কম্পন অনেক বিক্ষিপ্ত ও ক্ষীণ। তিনি আরও বলেন যে, হয়তো চন্দ্রদেহে কম্পনের কোন বড় উৎস নেই অথবা চন্দ্রদেহ বিভিন্ন জাতীয় পদার্থে তৈরি, তাই কম্পনের কিয়দংশ শোষণ করে নেয়। এই কারণে এখনো পর্যন্ত সিস্‌মোগ্রাফ কোন ভয়ঙ্কর কম্পনের সঙ্কেত পাঠায় নি। তিনি অনুমান করেন যে, আদিম যুগে চন্দ্রপৃষ্ঠে উল্কার আঘাতেই বড় বড় ফাটলের উৎপত্তি হয়েছে। বিভিন্ন জাতীয় পদার্থের অবস্থিতি এই কথাই প্রমাণ করে যে, চাঁদের অভ্যন্তর ভাগ কখনও সম্পূর্ণ গলিত অবস্থায় ছিল না। অবশ্য স্তরবিহীন শীতল চাঁদের তত্ত্বটি অনুমান মাত্র। আরও গবেষণা

ও পরীক্ষার সাহায্যে যদি প্রমাণ করা যায় যে, চাঁদের দেহে প্রকৃত কার্টল রয়েছে, তাহলে গ্রহ-বিজ্ঞানের ইতিহাসে এটা হবে এক নতুন আবিষ্কার।

চান্দ্রশিলা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে চাঁদে জীবনের কোন সন্ধান এখনো পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। প্রথম পর্যায়ের পরীক্ষার ফলে চাঁদ থেকে সংগৃহীত প্রস্তরখণ্ডগুলিতে বিষাক্ত দ্রব্য, সংক্রামক জীবাণু বা জীবনের কোন মূল উপাদান পাওয়া যায় নি। তবে হিউস্টনের চান্দ্র-গবেষণাগারের কৃষিক্ষেত্রে ও চিড়িয়াখানায় এখনো পরীক্ষা চলেছে। পার্থিব বস্তুর উপর চান্দ্রশিলার কোন সূক্ষ্ম প্রতিক্রিয়া হয় কি না, সে সম্পর্কে গবেষণা শেষ করতে বেশ কয়েক বছর সময় লাগবে। সম্প্রতি একটি সংবাদে বলা হয় যে, গবেষণাগারে চান্দ্র-মৃত্তিকা মেশানো মাটিতে উদ্ভিদ বেশ তাড়াতাড়ি বেড়ে উঠছে। এসম্পর্কে নাসার জনৈক মুখপাত্র বলেন—গবেষণাগারের গাছপালার দৈনন্দিন বৃদ্ধির রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, চান্দ্রমৃত্তিকা মেশানো মাটিতে চারাগাছগুলি অন্যদের তুলনায় বেশী বড় ও সবুজ হয়েছে। চান্দ্রমৃত্তিকায় পালিত চারাগাছসহ প্রায় চার হাজার গাছ পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায় যে, এদের প্রত্যেকটি প্রায় সমান-ভাবে বাড়ছে। এখানে বলা প্রয়োজন যে, কোন চারাই পৃথিবীর সাধারণ মাটি বা শুধু চান্দ্রমৃত্তিকায় রোপণ করা হয় নি। মুখপাত্রটি আরও বলেন যে, চান্দ্রমৃত্তিকার সংস্পর্শ পার্থিব বস্তু ও প্রাণীর উপর কোন উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। চন্দ্রের উপকরণের সাহায্যে যে সকল প্রাণীর উপর পরীক্ষা করা হয়েছে, তার মধ্যে আছে দু-শ'টি ইঁদুর, ত্রিশটি জাপানী কাঠবিড়াল, মাছি, আরশোলা, মাছ, ঝিনুক ও চিংড়ি। এই গবেষণার প্রথম পর্যায়ের কাজ শেষ হয়েছে। জীব-বিজ্ঞানীরা আশা করেন যে, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ের পর্যবেক্ষণ শেষ হলে আরও নতুন তথ্য পাওয়া যাবে।

চন্দ্রপৃষ্ঠে জীবনের অবস্থিতির বিষয় অনুসন্ধানের পর বিজ্ঞানীরা চান্দ্রশিলার বয়স নিরূপণে সচেষ্ট হন। অ্যাপোলো 11-এর যাত্রীরা যে সব প্রস্তর এনেছেন, সেগুলির বয়স তিন-শ' কোটি বছর থেকে সাড়ে চার-শ' কোটি বছর। সবচেয়ে প্রাচীন উপলখণ্ডের বয়স চার-শ' কোটি বছর। তেজনি-র্গমন পদ্ধতির সাহায্যে এদের বয়স নিরূপণ করা হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, আজ পর্যন্ত পৃথিবীর যে সর্বপ্রাচীন পাথর আবিষ্কৃত হয়েছে, তার বয়স তিন-শ' ত্রিশ কোটি বছর। এজাতীয় শিলা ভূপৃষ্ঠের বেশ নিম্নে অবস্থিত।

চাঁদের পাথর চাঁদের সৃষ্টি-রহস্যের আবরণ উন্মোচনে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। পৃথিবীর শৈশব কালে তার দেহের এক অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে চাঁদের সৃষ্টি হয়—এই মতবাদের যাথার্থ্য সম্বন্ধে এখন নানাবিধ প্রশ্ন উঠছে। কেউ কেউ বলছেন যে, চাঁদ ও পৃথিবী একই সময় একই রকম পদার্থ থেকে সৃষ্টি হয়েছিল। আবার কয়েকজন জ্যোতি-র্বিজ্ঞানী মনে করেন যে, চাঁদ মহাকাশের কোন স্থানে জন্ম লাভ করে ও পরে পৃথিবীর মাধ্যা-কর্ষণের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে তার উপগ্রহে পরিণত হয়। চাঁদ ও পৃথিবীতে প্রাপ্ত পদার্থের মধ্যে লক্ষণীয় পার্থক্য পর্যবেক্ষণ করেই বিজ্ঞানীরা উপরিউক্ত মতবাদ প্রকাশ করেছেন।

চাঁদের গঠন সম্বন্ধে যা জানা গেছে, এখন সে বিষয়ে কিছু আলোচনা করছি। বিজ্ঞানীদের সিদ্ধান্ত অনুসারে বলা যায় যে, তার উপরের ত্বকের নীচের অংশ একটা বিরাট ভঙ্গুর বলের মত। এই গোলাকৃতি অংশটি খণ্ড খণ্ড শিলার সমষ্টি। চাঁদের মারিয়া বা শুষ্ক সাগর অঞ্চলে খণ্ডিত পাথর-গুলির সংহত রূপ দেখা যায়। এই কারণে চন্দ্র পরিক্রমায় মহাকাশযানের উপর চাঁদের অভিকর্ষ সব জায়গায় সমান নয়। চন্দ্রপৃষ্ঠ গঠিত হয়েছে

উল্কাপিণ্ডের সংঘর্ষ, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত বা প্রচণ্ড প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে, তাই তার দেহের অধিকাংশই হলো আগ্নেয়শিলা। এই শিলার উপরিভাগ অমসৃণ কাচের মত, মনে হয় ছোট ছোট কণিকার সঙ্গে অবিরাম ঘর্ষণের ফলে এই আকার ধারণ করেছে।

চান্দ্রশিলা আমাদের যে সব নতুন তথ্য জানিয়েছে, তাদের কি আমরা কোন কাজে লাগাতে পারি? এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন টেনেসির ওকরীজের জাতীয় বীক্ষণাগারের অধ্যক্ষ ডক্টর ম্যাক ডাফি। তিনি বলেন—চাঁদে পদার্পণের আগে তার সম্বন্ধে গবেষণা চালানো হতো আল্ফা কণিকার বিকিরণ-পদ্ধতির দ্বারা, কিন্তু এখন অনেক সহজভাবে সে সম্বন্ধে তথ্যাদি সংগৃহীত হচ্ছে। চাঁদের শিলার রং বেগুনী কেন? ম্যাক্ ডাফির মতে, কোটি কোটি বছর ধরে চাঁদের বুকে অবাধে তেজ-বিকিরণ হওয়ায় বেগুনী পাথরের সৃষ্টি হয়েছে। কেন না, এই প্রক্রিয়ায় রঙের ভিত্তিমূল তৈরি হয়। শিলার দ্বারা শোষিত তেজ-রশ্মির উচ্চশক্তি যখন ইলেকট্রনকে তার স্বাভাবিক অবস্থা থেকে বিচ্যুত করে, তখন এই সব রঙীণ ভিত্তি গড়ে উঠে।

চাঁদের পাথর জৈব অণুর দ্বারা দূষিত নয়। তাই এগুলি থেকে অতীত জৈব জীবনের অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। চাঁদের বায়ু-শূন্যতার সাহায্যে কোন গ্যাসের দূষিত অংশ দূর করা সম্ভব। তাছাড়া চাঁদের বুকে সহজেই বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যাবে। তাই আশা করা যায় যে, আগামী দশকের মধ্যে চাঁদ হবে একটি সুন্দর গবেষণাগার, যেখান থেকে বিশ্বের সৃষ্টি-রহস্যের উপর আলোকপাত করা সম্ভব হবে—জানা যাবে জীবনের উৎস আর সন্ধান করা হবে নানা তথ্যের।

পরিশেষে চান্দ্রশিলা সম্পর্কে ভারতীয় বিজ্ঞানী-দের গবেষণার ফলাফলের কথা বলছি। আমেরিকার এক-শ' জন বিজ্ঞানী ব্যতীত অন্যান্য দেশের যে ছত্রিশ জন বিজ্ঞানী চান্দ্রশিলা বিশ্লেষণের জন্যে মনোনীত হন, তাঁদের মধ্যে চারজন ভারতীয়। এঁরা হলেন যথাক্রমে ডক্টর কে. গোপালন, যুক্তরাষ্ট্রের মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর ভি. রামমূর্তি, স্যানডিয়েগোর ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর জেমস্ আরনল্ডের সহকারী ডক্টর দেবেন্দ্রলাল ও ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর ডি. পি. খারকার।

ডক্টর কে. গোপালন একজন ভূ-পদার্থ-বিদ্যাবিদ্। তিনি ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ভূ-পদার্থবিদ্যা ও গ্রহ-পদার্থবিদ্যা সংস্থায় 1966 সাল থেকে গবেষণা করছেন। এবছর খড়্গপুরে অনুষ্ঠিত ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশনে তিনি জানান যে, চাঁদ থেকে প্রাপ্ত উপলখণ্ডগুলির গঠন পৃথিবীতে প্রাপ্ত উপলখণ্ডগুলির গঠন থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। তাঁর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত হলো—চাঁদে পাওয়া পাথর পৃথিবীতে পাওয়া পাথরের চেয়ে পুরনো হতে পারে। এই সিদ্ধান্ত চাঁদের সৃষ্টি-রহস্যের উপর নতুন আলোকপাত করতে সাহায্য করবে। অন্যান্য ভারতীয় বিজ্ঞানীদের গবেষণার বিষয়বস্তু হলো, শিলাখণ্ডের প্রাকৃতিক ধর্মের বিশ্লেষণ। তাঁদের গবেষণার ফলাফল টেক্সাসে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক সম্মেলনে প্রকাশিত হয়েছে। তবে এখন পর্যন্ত তাঁদের অনুসন্ধান সম্পর্কে বিস্তৃত তথ্য পাওয়া যায় নি।

অ্যাপোলো-11-র সার্থক চন্দ্র অবতরণের পর গত বছর নভেম্বর মাসে অ্যাপোলো-12-র দুই অভিযাত্রী কনরাড ও বীন আবার চাঁদের বুকে নামেন। তাঁরাও সঙ্গে এনেছেন চাঁদের পাথর। বিজ্ঞানীদের ধারণা, এই শিলাগুলির বিশদ পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর চাঁদ, পৃথিবী ও সৌরজগৎ সম্পর্কে নতুন অনেক তথ্য আবিষ্কৃত হবে। শীঘ্রই বিশ্বের নানা দেশে চান্দ্রশিলা নিয়ে গবেষণা সুরু হবে। সুতরাং চাঁদ সম্পর্কে অধিকতর জ্ঞান লাভের জন্যে আমাদের আরও অপেক্ষা করতে হবে।

নিদ্রার স্নায়ু-রাসায়নিক তত্ত্ব

সুভাষচন্দ্র বসাক ও জগৎজীবন ঘোষ*

নিদ্রা কেন ও কিভাবে আসে—এই সম্পর্কে মানুষের কৌতূহল আজকের নয়, গত দশ বছরে অনেক বিজ্ঞানীই নিদ্রার রহস্য উদ্‌ঘাটনের চেষ্টায় এগিয়ে এসেছেন। তাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল হিসাবে জীবনের এই রহস্যাবৃত অংশ সম্বন্ধে অনেক নতুন তথ্য আমাদের জ্ঞানগম্য হয়েছে। নিদ্রার স্বরূপ ও প্রকৃতি সম্পর্কে অনেক প্রাচীন ও ভ্রান্ত ধারণার অবসান হয়েছে। সুতরাং নিদ্রার স্বরূপ কি এবং কেনই বা তার আবির্ভাব ঘটে, সে সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা যাক।

নিদ্রার সংজ্ঞা ও লক্ষণ

এক কথায় নিদ্রার সঠিক কোন সংজ্ঞা জানা নেই। মোটামুটি ভাবে বলতে গেলে নিদ্রা প্রাণীদের জীবনের এমন একটি অবস্থা, যখন প্রাণীদের সঙ্গে পারিপার্শ্বিক অবস্থার সক্রিয় যোগাযোগ হ্রাস পায় এবং এই অবস্থা থেকে প্রাণীকে স্বল্পায়াসেই জাগ্রতাবস্থায় ফিরিয়ে আনা যায়। নিদ্রার সময় শরীরের অনেক পেশীর কার্যকারিতা হ্রাস পায় বা লুপ্ত হয়ে যায়—প্রাণীদের চলাফেরার কোন প্রবণতা থাকে না। শুধুমাত্র স্বপ্নের সময় অনিয়মিতভাবে স্বরযন্ত্র ও মুখমণ্ডলের পেশীসমূহ সক্রিয় হয়ে ওঠে। দেহের প্রতিটি পেশীর কর্মক্ষমতা হ্রাসই নিদ্রার বৈশিষ্ট্য—এই ধারণা কিন্তু ভুল বরং কোন কোন পেশী নিদ্রার সময় অনেক বেশী সক্রিয় হয়ে ওঠে। বিভিন্ন প্রাণীর দেহ নিদ্রার সময় বিশেষভাবে বাঁকা অবস্থায় থাকে; যেমন—পাখীরা দাঁড়ের উপর বিশেষ ভঙ্গীতে বসে ঘুমায়, বাদুড় ঘুমের সময় পায়ের নখের সাহায্যে গাছের ডাল আঁকড়ে ধরে ঝুলে থাকে। ঘুমের সময় প্রাণীদের চোখের পাতা বিশেষভাবে বন্ধ থাকে এবং বাইরে থেকে বল প্রয়োগে খোলবার চেষ্টা করলে আরও বেশী সঙ্কোচন লক্ষ্য করা যায়। জাগ্রতাবস্থায় যে সব দুর্বল উত্তেজনায় প্রাণীরা সাড়া দিতে পারে, নিদ্রার সময় সেগুলির কার্যকারিতা হ্রাস পায় অথবা একেবারেই লুপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু উপযুক্ত উত্তেজনার দ্বারা অতি সহজেই ঘুমন্ত প্রাণীকে জাগ্রতাবস্থায় নিয়ে আসা সম্ভব। এটা নিদ্রার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। অসাড়তা (Anaesthesia) বা কোমা (Coma) বাহ্যতঃ নিদ্রার অনুরূপ অবস্থা হলেও এসব অবস্থা থেকে প্রাণীকে জাগ্রত করবার জন্যে প্রয়োজনীয় ন্যূনতম উত্তেজনার মান অনেক বেশী। তাছাড়া অসাড়তা বা কোমা থেকে জাগাবার পর প্রাণীর শারীরিক বা মানসিক অবস্থা এবং নিদ্রা থেকে জাগাবার পরের অনুরূপ অবস্থার মধ্যে তফাৎ অনেক। নিদ্রা থেকে জাগাবার পর মানুষ সাধারণতঃ জাগ্রতাবস্থায়ই থাকে। অপর পক্ষে, বাইরে থেকে প্রযুক্ত উত্তেজনার কার্যকাল শেষ হলেই অসাড়তা বা কোমা থেকে জাগ্রত প্রাণীর পূর্বাবস্থায় ফিরে যাবার জোর প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।

নিদ্রা কতটা গাঢ়—সেটা জানবারও কোন সুষ্ঠু উপায় নেই। নিদ্রার যে অবস্থা থেকে জাগাতে যত শক্তিশালী উত্তেজনার প্রয়োজন হয়, সেই অবস্থাকে তত গাঢ় বলা হয়। কিন্তু উত্তেজকের কার্যকারিতা, তার গুণ এবং পরিমাণ উভয়ের উপরই সমানভাবে নির্ভরশীল। পরিচিত বেশী শক্তিশালী উত্তেজকের চেয়ে অপরিচিত দুর্বল উত্তেজনায় প্রাণী অনেক প্রবলভাবে সাড়া দেয়। কোন কোন

* জৈব রসায়ন বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

ক্ষেত্রে আবার বিশেষ বিশেষ উত্তেজনায় প্রাণীরা সর্বাধিক সাড়া দেয়। সামান্য শব্দেই কুকুরের গাঢ় নিদ্রা ভেঙে যায়। মায়েদের ঘুম ভাঙাবার জন্যে অন্য শক্তিশালী শব্দের চেয়ে শিশুর সামান্য কান্নাই যথেষ্ট। ঘুমন্ত বিড়ালের নাকের কাছে এক টুকরা মাংস ধরলেই তৎক্ষণাৎ সে লাফিয়ে ওঠে।

মানুষের নিদ্রিতাবস্থায় যে সব বৈশিষ্ট্যগুলি মনুষ্যেতর প্রাণীদের বিশ্রামের অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায়, সেই সব অবস্থাকে আমরা নিদ্রা আখ্যা দিয়ে থাকি। কিন্তু অন্যান্য অনেক জৈব প্রক্রিয়ার মত নিদ্রার কারণ ও প্রকৃতি বিভিন্ন প্রাণীতে বিভিন্ন হওয়া কিছু আশ্চর্য নয়। তাছাড়া উপরিউক্ত বৈশিষ্ট্যগুলির সাহায্যে জাগ্রতাবস্থা, জাগ্রত বিশ্রামাবস্থা, তন্দ্রা, হাল্কা ঘুম এবং গাঢ় ঘুম ইত্যাদি বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ সম্ভব নয়। Electro-encephalogram বা E. E. G-এর মাধ্যমে উপরিউক্ত অবস্থাগুলিকে অংশতঃ পৃথক করা সম্ভব হয়েছে। এই সব বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন ই. ই. জি. তরঙ্গ পাওয়া যায়। জাগ্রতাবস্থায় সর্বদাই আল্‌ফা-তরঙ্গ পাওয়া যায়, তন্দ্রার সময় ই. ই. জি-তে মাঝে মাঝে আল্‌ফা-তরঙ্গের বিলুপ্তি পরিলক্ষিত হয়। গাঢ় নিদ্রার সময় ডেল্টা-তরঙ্গের ই. ই. জি পাওয়া যায়। বর্তমানে নিদ্রার লক্ষণ হিসাবে বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য এবং ই. ই. জি.—এই দুই পদ্ধতিকেই সমানভাবে কাজে লাগানো হয়েছে।

নিদ্রা নিষ্ক্রিয়, না সক্রিয় অবস্থা?

আগে অনেক বিজ্ঞানীর ধারণা ছিল যে, নিদ্রা একটি নিষ্ক্রিয় অবস্থা। বিজ্ঞানী ব্রেমারের মতে, জেগে থাকতে না পারলেই নিদ্রা আসে। জাগ্রত অবস্থায় ধীরে ধীরে যে স্নায়বিক ক্লান্তি আসে, তার ফলে পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে প্রাণীদের যোগাযোগ হ্রাস পায়। এই হ্রাসই যদি নিদ্রার একমাত্র কারণ হয়, তবে নিদ্রা নিশ্চয়ই নিষ্ক্রিয় অবস্থা। কিন্তু গত দশকে বিজ্ঞানীরা মস্তিষ্কে এমন একাধিক অংশ খুঁজে পেয়েছেন, যেগুলি সক্রিয়ভাবে জাগ্রত অবস্থা থেকে প্রাণীকে নিদ্রাগ্রস্ত করে দিতে পারে। তড়িৎ-প্রবাহের সাহায্যে বা রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় মস্তিষ্কের একাধিক অংশকে উত্তেজিত করলে নিদ্রা আসে। এছাড়া মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশকে কেটে ক্ষতিগ্রস্ত করলেও নিদ্রার পরিমাণ কমে যায়। এই সব পরীক্ষা থেকে বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, স্বাভাবিক নিদ্রার জন্যে মস্তিষ্কের একাধিক অংশের মধ্যে সক্রিয় যোগাযোগ প্রয়োজন। কাজেই বর্তমানে অনেক জীব-বিজ্ঞানীই মনে করেন যে, নিদ্রা একটি সক্রিয় অবস্থা।

নিদ্রা এক, না একাধিক অবস্থা?

ঘুমন্ত প্রাণীর অবিরাম ই. ই. জি. নিতে গিয়ে জানা গেছে যে, স্তন্যপায়ী প্রাণীদের নিদ্রা অন্ততঃ একটিমাত্র অবস্থা নয়। এই সব প্রাণীদের ঘুমন্ত মস্তিষ্ক পর পর দুটি অবস্থার মধ্য দিয়ে যায়।

প্রথম অবস্থাকে বলা হয় ধীর-তরঙ্গের নিদ্রা। এই অবস্থায় ই. ই. জি-তে যে তরঙ্গ পাওয়া যায়, তা জাগ্রতাবস্থার তরঙ্গ থেকে আলাদা এবং ধীর। এই অবস্থায় প্রাণীর হাবভাব নিদ্রার অনুরূপ থাকে এবং চোখ বন্ধ থাকে। কিছুক্ষণ এই অবস্থা চলবার পর সম্পূর্ণ অন্য এক অবস্থার আবির্ভাব ঘটে। এই অবস্থাকে বলা হয় স্বপ্নকালীন নিদ্রা বা প্যারা-ডক্সিক্যাল নিদ্রা। এই অবস্থায়ই আমরা স্বপ্ন দেখি। জাগ্রতাবস্থার অনুরূপ ই. ই. জি, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অনিয়মিত সঞ্চালন এই অবস্থার বৈশিষ্ট্য। স্বপ্নের নিদ্রার আবার দুটি অবস্থা—1. টোনিক (Tonic) ও 2. ফেজিক (Phasic)। প্রথম অবস্থায় মস্তিষ্কের ই. ই. জি-তে দ্রুত তরঙ্গ দেখা যায় এবং ঘাড়ের পেশীর কোন কার্যকারিতা থাকে না। কিছুক্ষণ এই অবস্থা চলবার পর ই. ই. জি-তে বিশেষ ধরণের এক প্রকার ধীর তরঙ্গের আবির্ভাব ঘটে এবং জাগ্রতাবস্থা থেকে ভিন্ন এক বিশেষ

ধরণে চোখ দ্রুত নড়তে থাকে। এই সংখ্যা হলো মিনিটে 50 থেকে 60 বার। নিদ্রার এই অবস্থা থেকে জাগ্রত হবার পর সকলেই বলে—সে স্বপ্ন দেখছিল। কিন্তু আমরা অনেকেই বলি—আমরা মাঝে মাঝে স্বপ্ন দেখি। আসলে আমরা রোজই রাতে কয়েক বার করে স্বপ্ন দেখি এবং পরবর্তী ধীর-তরঙ্গের নিদ্রার সময় তা ভুলে যাই। মাঝে মাঝে দু-একটা স্বপ্নের কথাই মাত্র মনে থাকে। চোখ নড়বার গতি ও প্রকৃতির সঙ্গে স্বপ্নের কি সম্বন্ধ, তা জানা নেই। তবে অনেকেই মনে করেন, স্বপ্নের সময় পরিদৃশ্যমান বস্তুর সংখ্যা যত বেশী হয় বা স্বপ্নের দৃশ্য যত উত্তেজনাপূর্ণ হয়, চোখ পড়বার গতিও তত বেশী হয়। সুস্থ ও সবল প্রাণীর ক্ষেত্রে কিছুক্ষণ ধীর-তরঙ্গের নিদ্রা চলবার পর স্বপ্নের নিদ্রার আবির্ভাব ঘটে। নিদ্রার প্রথমেই কখনও প্যারাডক্সিক্যাল নিদ্রা হয় না। মনুষ্যেতর প্রাণীদের মধ্যেও স্বপ্নের নিদ্রার প্রকৃতি মানুষের নিদ্রার অনুরূপই হয়ে থাকে। মাছ ও সরীসৃপের ক্ষেত্রে শুধু ধীর-তরঙ্গের নিদ্রাই হয়ে থাকে। পাখীদেরও স্বপ্নের নিদ্রা আছে, যদিও তার স্থায়িত্ব অতি সামান্য। অপর পক্ষে অপোসাম থেকে আরম্ভ করে মানুস পর্যন্ত যাবতীয় স্তন্যপায়ী প্রাণীতেই স্বপ্নকালীন নিদ্রার অস্তিত্ব নির্ভুলভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

আরও লক্ষণীয় এই যে, যে সকল প্রাণীর কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের গঠন জন্মের সময় অসম্পূর্ণ থাকে (যেমন— ইঁদুর, বিড়াল, খরগোস ইত্যাদি), তাদের ক্ষেত্রে নবজাতকের ধীর-তরঙ্গের নিদ্রা হয় না, জাগ্রতাবস্থার পরেই স্বপ্নকালীন নিদ্রা আসে। কিন্তু যেসব প্রাণীর মস্তিষ্কের গঠন জন্মের আগেই সম্পূর্ণ হয়ে যায়, তাদের ক্ষেত্রে প্রথম থেকেই দুই প্রকার নিদ্রা দেখতে পাওয়া যায়।

নিদ্রা আবির্ভাবের কারণ

অনেকেই মনে করেন যে; ক্লান্তিই নিদ্রার একমাত্র কারণ। শারীরিক দিক থেকে ক্লান্তি এমন একটা অবস্থা, যখন কর্মক্ষমতা হ্রাস পায়, বাইরের উত্তেজনায় সাড়া দেবার ক্ষমতাও কমে যায়। আর মানসিক দিক থেকে ক্লান্তি হলো এমন একটা অস্বস্তিকর অবস্থা, যখন তা শেষ পর্যন্ত আমাদের কাজের মধ্যে সাময়িক ছেদ এনে দেয়। ক্লান্তির উৎস সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা এক-মত নন। তবে অনেকেই মনে করেন যে, জাগ্রতাবস্থায় নানাপ্রকার রাসায়নিক পদার্থ অধিক মাত্রায় কোষে জমে যায় এবং তার ফলেই প্রাণীরা ক্লান্ত হয়ে পড়ে।

Legendre পরীক্ষামূলকভাবে ক্লান্ত কুকুরের মস্তিষ্ক থেকে 5 সি. সি. তরল পদার্থ বের করে সুস্থ ও সবল অন্য একটি কুকুরের মস্তকে ইন্‌জেকশন করে দেন। কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল, সতেজ কুকুরটি ঝিমুতে ঝিমুতে ঘুমিয়ে পড়লো। তিনি আরও দেখালেন যে, ক্লান্ত হবার ফলে সুস্থ কুকুরের মস্তিষ্ক-কোষের যে প্রকার আকৃতিগত পরিবর্তন ঘটে, এই তরল ইন্‌জেকশন দেবার ফলে সুস্থ কুকুরের মস্তিষ্ক-কোষেও অনুরূপ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এসব পরীক্ষা থেকে Legendre এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, জেগে থাকবার সময় মস্তিষ্কে এমন কোন পদার্থ তৈরি হয়, যার জন্যে ক্লান্তি ও নিদ্রা আসে। তিনি এই পদার্থটির নাম দিয়েছেন হিপনোজেন (Hypnogen)। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার এই যে, উপরিউক্ত ইন্‌জেকশন দেবার ফলে মস্তিষ্কে তরলের চাপ বেড়ে যায় এবং শুধুমাত্র এই কারণেই ক্লান্তি আসা সম্ভব।

Kroll বিড়াল ও খরগোসের মস্তিষ্কে এমন একটি দ্রবণীয় পদার্থের সন্ধান পেয়েছেন, যা সকল প্রাণীদের মধ্যে নিদ্রা এনে দিতে সক্ষম। অপর পক্ষে, বিজ্ঞানী Monier ক্লান্ত প্রাণীর রক্ত থেকে এমন একপ্রকার রস পৃথক করতে সক্ষম হয়েছেন, যা সুস্থ ও জাগ্রত প্রাণীকে ঘুমোতে বাধ্য করে।

উপরিউক্ত পরীক্ষাগুলি থেকে বলা যেতে পারে যে, ক্লান্ত প্রাণীর মস্তিষ্কে ও রক্তে এক বা একাধিক পদার্থ জমে যায়, যা নিদ্রার জন্যে দায়ী। সঙ্গে সঙ্গে যে প্রশ্নটি মনে আসে, সেটি হলো, Kroll-এর পাওয়া হিপনোজেন ও Monier-এর পাওয়া হিপনোজেন—এই দুটি কি একই পদার্থ? এই প্রশ্নের কোন সদুত্তর জানা নেই।

কোন কোন বিজ্ঞানীর মতে, নিদ্রা ও জাগ্রতাবস্থার স্থিতি ও প্রকৃতি প্রাণীর আভ্যন্তরীণ ছন্দের দ্বারা পরিচালিত হয়। লক্ষ্য করা গেছে, দিন-রাত্রির 24 ঘন্টায় এক বিশেষ ঘুম আসে এবং এই সময়েরই এক বিশেষ অংশে নিদ্রা সর্বাধিক গাঢ় হয়। অবশ্য এক্ষেত্রে বলা যেতে পারে যে, বাইরের আলোর তীব্রতা, কলরব, তাপমাত্রা ইত্যাদি বিভিন্ন কারণের জন্যে এটা হতে পারে। এই কারণগুলি নিঃসন্দেহেই নিদ্রাকে যথেষ্ট প্রভাবিত করে। কিন্তু কোন উপায়ে এগুলিকে সরিয়ে দিলেও দেখা যায় যে, প্রাণীদের নিদ্রা-জাগরণ চক্র একটি ছন্দের তালে তালে চলে। বিজ্ঞানী Mills একটি সুন্দর পরীক্ষা করেছেন। তিনি একটি লোককে 105 দিন নির্জন কক্ষে রেখে দেন। প্রথম প্রথম দেখা গেল, লোকটি পূর্বেকার অভ্যাস অনুযায়ী আগের মত সময়েই ঘুমিয়ে পড়ছে, কিন্তু ধীরে ধীরে এই সময়ের পরিবর্তন হতে থাকে। Mills লক্ষ্য করেন যে, নিদ্রার মোট সময়ের পরিবর্তন করতে গেলে সব সময়েই কিছুটা সময়ের প্রয়োজন হয় এবং তাড়াতাড়ি পরিবর্তনের চেষ্টা করলে এই পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে লোকটি বেশ অসুবিধা বোধ করে।

এই আভ্যন্তরীণ ছন্দ কিভাবে পরিচালিত হয়, সে সম্পর্কে মতভেদ আছে। অনেকে মনে করেন যে, আভ্যন্তরীণ ছন্দের ক্রিয়ার ফলে এক বা একাধিক রাসায়নিক পদার্থের উৎপাদন পর্যায়ক্রমে কমে বা বাড়ে। এই কারণেই থ্যালামাসের নিদ্রা-নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রের উপর হিপনোজেনের প্রভাব পর্যায়ক্রমে কমে ও বাড়ে। এটা নিছক বিজ্ঞানীদের ধারণামাত্র, কোন পরীক্ষালব্ধ সত্য নয়। তবে উপরিউক্ত মতের সাহায্যে আমরা ব্যাখ্যা করতে পারি—কেন অনেক দিন অনিদ্রার পরেও যে সময়ে ঘুমানো অভ্যাস নয়, সে সময়ে সচরাচর ঘুম আসে না। আবার সুস্থ মানুষকেও ঘুমাবার সময়ে জেগে থাকতে হলে প্রবলতম ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করতে হয়।

পরিবেশবাদী বিজ্ঞানী প্যাভ্‌লভের মতে, নিদ্রা হলো সংঘটিত প্রতিবর্তিতার ফল (Conditioned reflex)। তিনি প্রধানতঃ কুকুর নিয়ে পরীক্ষা চালিয়ে দেখিয়েছিলেন যে, একটি কুকুরকে খাবার দেবার সময় যদি বেশ কিছুদিন এক সঙ্গে ঘন্টা বাজানো চালিয়ে যাওয়া যায়, তবে কুকুরটি খাবার দেওয়া ও ঘন্টা বাজাবার ঘটনা দুটির সঙ্গে এমনভাবে অভ্যস্ত হয়ে যায় যে, পরে খাবার না দিয়ে শুধু ঘন্টা বাজালেই কুকুরের জিভ্ দিয়ে লালা নির্গত হতে থাকে। এটাই হলো সংঘটিত প্রতিবর্তিতা। বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে কোন প্রাণীকে এভাবে অভ্যস্ত করতে বেশ কিছুদিন সময় লাগে। প্যাভ্‌লভের মতে, নিদ্রার পূর্বে আমরা যে শয়নকক্ষে যাই, নিদ্রার কথা চিন্তা করি—এই সব ঘটনার সঙ্গে নিদ্রার একটি নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। কিন্তু নবজাতকের নিদ্রার ক্ষেত্রে এরূপ কোন সংযোগ লক্ষ্য করা যায় না। সুতরাং প্যাভ্‌লভের মতবাদ নিদ্রাকে পুরাপুরি ব্যাখ্যা করতে পারে না।

ধীর-তরঙ্গের নিদ্রা ও স্বপ্নকালীন নিদ্রার কারণ কি এক?

নিদ্রা দুই প্রকার ও নিদ্রার কারণ হিপনোজেন—এই তথ্য জানবার পরেই যে প্রশ্নটা

স্বভাবতঃই মনে আসে, সেটা হলো দুই প্রকার নিদ্রার জন্যে কি একই হিপনোজেন দায়ী? সুতরাং হিপনোজেন সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যাক। বিভিন্ন পরীক্ষায় এমন সব তথ্য পাওয়া গেছে, যা থেকে মনে করা যেতে পারে যে, মস্তিষ্কের অ্যামিনজাতীয় পদার্থের (Biogenic amines) সঙ্গে হিপনোজেনের নিবিড় সম্পর্ক আছে। এই ধরণের প্রধান তিনটি অ্যামিন হলো—Serotonin, Noradrenalin এবং Dopamine। বিড়ালের মস্তিষ্কে সরাসরি সেরো-টোনিন ইন্‌জেকশন দিলে ধীর-তরঙ্গের নিদ্রা বেড়ে যায়। বিড়ালকে Reserpine ইনজেকশন দিলে 12 ঘণ্টার জন্যে ধীর-তরঙ্গের নিদ্রা এবং 24 ঘণ্টার জন্যে স্বপ্নের নিদ্রা বন্ধ হয়ে যায়। এই অবস্থায় প্রাণীকে Serotonin ইন্‌-জেকশন দিলে কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় না; কারণ এই পদার্থটি রক্ত ও মস্তিষ্কের মধ্যবর্তী বাধা অতিক্রমে অক্ষম। কিন্তু 5-hyd-roxy tryptophan ইন্‌জেকশন দিলে পদার্থটি সহজেই মস্তিষ্কে গিয়ে সেরোটোনিনে রূপান্তরিত হয় এবং ধীর-তরঙ্গের নিদ্রার পুনরাবৃত্তি ঘটে। অপর পক্ষে, ডোপা ইন্‌জেকশন দিলে স্বপ্নের নিদ্রার আবির্ভাব হয়। ডোপা মস্তিষ্কে গিয়ে ডোপামিনে রূপান্তরিত হয়। এই পরীক্ষা থেকে মনে হয় যে, ধীর-তরঙ্গের নিদ্রার কারণ সেরোটোনিন এবং স্বপ্নের নিদ্রার কারণ হলো ডোপামিন।

Nialamide, Iproniazid ইত্যাদি ওষুধ-গুলি মস্তিষ্কের এমন কয়েকটি রাসায়নিক বিক্রিয়া বন্ধ করে দেয়, যেগুলি অ্যামিনজাতীয় পদার্থগুলিকে ভেঙ্গে ফেলে। ফলে উপরিউক্ত ওষুধগুলি ইন্‌জেকশন দিলে মস্তিষ্কে অ্যামিনের পরিমাণ বেড়ে যায়। এতে ধীর-তরঙ্গের নিদ্রার কোন ক্ষতি হয় না, কিন্তু স্বপ্নের নিদ্রা ব্যাহত হয়। সুতরাং বলা যেতে পারে যে, মস্তিষ্কের অ্যামিনজাতীয় পদার্থগুলি রাসায়নিক বিক্রিয়ায় ভেঙ্গে যাবার সময় এমন সব পদার্থ তৈরি করে, যাদের সঙ্গে স্বপ্নের নিদ্রার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে।

প্রাণীকে প্যারাক্লোরোফিনাইল-অ্যালানিন (p-chlorophenylalanine) ইন্‌জেকশন দিলে নিদ্রা একেবারে লুপ্ত হয়। দেখা গেছে যে, এই ওষুধের কাজ হলো মস্তিষ্কের সেরোটোনিন তৈরি একেবারে বন্ধ করে দেওয়া। এই অবস্থায় 5-hydroxy tryptophan ইনজেকশন দিলে উভয় প্রকার নিদ্রাই ফিরে আসে। শেষোক্ত ওষুধটি মস্তিষ্কে গিয়ে সেরোটোনিনে রূপান্তরিত হয়। সুতরাং বলা যেতে পারে যে, ধীর-তরঙ্গের-নিদ্রার একমাত্র কারণ সেরোটোনিন হলেও স্বপ্নকালীন নিদ্রার কারণ একাধিক। ডোপামিনজাতীয় পদার্থ ছাড়াও সেরোটোনিন থেকে উদ্ভূত এক বা একাধিক রাসায়নিক পদার্থ এই বিশেষ ধরণের নিদ্রার জন্যে দায়ী। তবে সেরোটোনিন থেকে উদ্ভূত পদার্থগুলির স্বরূপ এখনও অনাবিষ্কৃত।

নিদ্রার প্রকৃত স্বরূপ ও প্রয়োজনীয়তা

নিদ্রার প্রকৃতি এবং শরীরের উপর প্রভাব সম্পর্কে অনেক মতপার্থক্য আছে। জাগ্রতাবস্থার মত নিদ্রা প্রাণীদের অন্য এক অবস্থা, যখন দেহের বিভিন্ন অংশের ক্রিয়া বিভিন্নভাবে চলতে থাকে। হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন, শরীরের তাপমাত্রা ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণের জন্যে শরীরের বিশেষ বিশেষ অংশের প্রয়োজন হয়, কিন্তু নিদ্রার বেলায় সমস্ত প্রাণীটিই ঘুমায়। নিদ্রার ক্লান্তি দূর করবার ক্ষমতা সম্পর্কে সন্দেহ করবার অবকাশ নেই, কিন্তু জীব-কোষ কিভাবে একাজ সমাধা করে, তা আজও অজানা রয়ে গেছে।

বর্তমানে অনেকেই মনে করেন যে, মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষের রাসায়নিক ক্রিয়ার উপর গ্লায়া কোষের (Glial cell) প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব বর্তমান।

Hyden ও Lange দেখিয়েছেন যে, নিদ্রার সময় স্নায়ুকোষের সাক্সিনোক্সিডেজ (Succinoxidase) নামক এন্‌জাইমটির কার্যক্ষমতা জাগ্রতবস্থার তুলনায় তিন গুণ বেশী। অপর পক্ষে গ্লায়া কোষের বেলায় ঠিক বিপরীত অবস্থা পরিলক্ষিত হয়। অবশ্য স্নায়ুকোষ ও গ্লায়া কোষের পারস্পরিক সম্পর্কের সঙ্গে নিদ্রা ও জাগরণের সঠিক কি সম্পর্ক, তা জানা নেই।

প্রাণীকে দীর্ঘ সময় ঘুমাতে না দিলে শারীরিক ও মানসিক অবস্থার প্রভূত পরিবর্তন হয়। শুধু মাত্র স্বপ্নের নিদ্রা বন্ধ করে দিলেও মানসিক অবস্থা, তথা ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন হয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, নিদ্রা—এমন কি, স্বপ্নও স্বাভাবিক স্বাস্থ্যের জন্যে অপরিহার্য।

অনেকে মনে করেন যে, নিদ্রা যত গাঢ় হয়, তার ক্লান্তি দূর করবার ক্ষমতাও তত বেশী হয়ে থাকে। কিন্তু এমন লোকও আছে, যারা অনেকক্ষণ গাঢ় নিদ্রার পরেও স্বস্তি বোধ করে না। আবার ইতিহাসখ্যাত নেপোলিয়ান নাকি 5 মিনিট ঘুমিয়েই স্বাভাবিকভাবে কাজ করে যেতে পারতেন। এসব থেকে শুধু এটুকুই বলা যেতে পারে যে, নিদ্রার প্রকৃত রহস্য থেকে বিজ্ঞান বা বিজ্ঞানী এখনও অনেক দূরে।

নিদ্রা ও আগামী দিনের মানুষ

নিদ্রার রহস্যভেদ শুধু তত্ত্বগত দিক থেকেই এক বিরাট আবিষ্কার নয়, এর ব্যবহারিক দিকটাও উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন মানসিক ব্যাধিতে নিদ্রার প্রকৃতি ও পরিমাণের যথেষ্ট পরিবর্তন হয়। বহু মানসিক ব্যাধির বাহ্যিক লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ার অনেক আগেই নিদ্রার বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। সুতরাং নিদ্রার প্রকৃত স্বরূপ জানা গেলে এই সব মানসিক ব্যাধিকে আমরা আরও ভালভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে পারবো বলে আশা করা যায়। আমরা জীবনের এক অতি মূল্যবান অংশ নিদ্রায় কাটাই। শারীরিক বা মানসিক অবস্থার কোন পরিবর্তন না করে নিদ্রার সময়কে কমিয়ে আনা নিশ্চয়ই আগামী দিনের বিজ্ঞানীদের অন্যতম কাজ হবে।

নিদ্রা ও নিদ্রা-নিয়ন্ত্রণকারী মস্তিষ্কের রহস্যভেদ আধুনিক বিজ্ঞানীর সামনে এক মোহময় লক্ষ্য। এর জন্যে প্রয়োজন, বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখার সম্মিলিত প্রচেষ্টা। তাই খ্যাতনামা বিজ্ঞানী Walter Rosenblith-এর ভাষায় বলতে গেলে—মানুষের মস্তিষ্ক আজ পর্যন্ত যতগুলি বিজ্ঞানের সৃষ্টি করেছে, আজ তারা সকলে সেই মস্তিষ্কের রহস্য উদ্‌ঘাটনের জন্যে এগিয়ে আসুক।

"......বিজ্ঞান যাহাতে দেশের সর্বসাধারণের নিকট সুগম হয় সে উপায় অবলম্বন করিতে হইলে একেবারে মাতৃভাষায় বিজ্ঞানচর্চার গোড়াপত্তন করিয়া দিতে হয়।......যাহারা বিজ্ঞানের মর্যাদা বোঝে না তাহারা বিজ্ঞানের জন্ত টাকা দিবে, এমন অলৌকিক সম্ভাবনার পথ চাহিয়া বসিয়া থাকা নিষ্ফল। আপাততঃ মাতৃভাষার সাহায্যে সমস্ত বাংলা দেশকে বিজ্ঞানচর্চায় দীক্ষিত করা আবশ্যক। তাহা হইলেই বিজ্ঞান সভা সার্থক হইবে।"

—রবীন্দ্রনাথ

পুস্তক পরিচয়

প্রাথমিক ভৌত রসায়ন—শ্রীপ্রিয়নাথ কুণ্ডু, এম. এস্-সি প্রণীত। পৃঃ 741 ; চিত্র সংখ্যা-128 ; সারণী সংখ্যা—89 ; প্রকাশক—মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড ; 10 বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-12। মূল্য-15 টাকা।

বইখানি স্নাতক শ্রেণীর পাস ও অনার্সের পাঠ্য হিসাবে লিখিত। বিষয়বস্তুর নির্বাচন, বিন্যাস, উপস্থাপন এবং আলোচনা গ্রন্থকারের রসায়ন-বিজ্ঞানের অধ্যাপনায় সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতার পরিচায়ক। প্রত্যেক অধ্যায়ের গোড়ায় ঐ অধ্যায়ে ব্যবহৃত যাবতীয় বাংলা পারিভাষিক শব্দাবলী ও তাদের আন্তর্জাতিক ইংরেজী সংজ্ঞার সন্নিবেশ এই গ্রন্থের একটি বিশেষ সহায়ক অঙ্গ। এসব বাংলা পারিভাষিক শব্দাবলীর সংগ্রহ, নির্বাচন ও উদ্ভাবনে গ্রন্থকার তাঁর গভীর অনুসন্ধিৎসা প্রবৃত্তি ও বিচার-বুদ্ধির নিদর্শন দিয়েছেন, সন্দেহ নেই। কিন্তু এ-কথাও অস্বীকার করা চলে না যে, বহু উদ্ভাবিত পারিভাষিক বাংলা শব্দের যথাযথ অর্থবোধের তাগিদে ও ব্যবহারের সুবিধার জন্যে সংশোধন ও সংস্কৃতির আবশ্যক হতে পারে। বাংলায় বিজ্ঞানের পরিভাষার সৃষ্টি ও ব্যবহারের প্রথম চেষ্টায় এটা কিছুই অস্বাভাবিক নয়। কালক্রমে এসব পরি-ভাষা বহু সুলেখকের সহযোগিতায় পরিশুদ্ধ হয়ে সর্বসম্মতি অনুসারে গৃহীত হবে। এটাই সকল দেশে বিজ্ঞানের অগ্রগতির অভিজ্ঞতার ইতিহাস।

অবশেষে, আন্তর্জাতিক ইংরেজী পরিভাষা গোড়া থেকেই যাতে শিক্ষার্থীদের আয়ত্ত হয়, এই সম্পর্কে বিজ্ঞানের সকল অধ্যাপক ও পুস্তক-প্রণেতার সজাগ থাকা উচিত। উচ্চাঙ্গের বিজ্ঞান-চর্চা ও বৈজ্ঞানিক গবেষণার পক্ষে এই বিষয়ে সম্যক সতর্কতা অপরিহার্য। বর্তমান গ্রন্থখানিতে এর কোন ত্রুটি ঘটে নি। এটি এর একটি সন্তোষজনক বিভব বলতে হবে।

কলেজ-পাঠ্য হিসাবে পুস্তকখানির সমুচিত সমাদর বাঞ্ছনীয়।

শ্রীপ্রিয়দারঞ্জন রায়।

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

অগাষ্ট — 1970

ত্রয়োবিংশ বর্ষ — অষ্টম সংখ্যা

মোটর গাড়ীর প্রথম উদ্ভাবক কার্ল বেন্‌ৎজের স্মরণে কার্লসরুহের (প. জার্মেনী) ট্রাফিক মিউজিয়ামে 1886 সালে বেন্‌ৎজের কারখানায় তৈরী প্রথম মোটর গাড়ীর মডেল। গাড়ীটির সর্বোচ্চ গতি ছিল ঘণ্টায় 15 কিলোমিটার। বেন্‌ৎজের সমসাময়িক মোটর গাড়ী নির্মাতা হচ্ছেন ডেমলার। পরে এঁরা দু-জন একটি যৌথ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছিলেন — যার গাড়ী, ট্রাক ও বাস আজ পৃথিবীর সর্বত্র চলছে

সুপার ট্যাঙ্কার

সভ্যতা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ বুঝতে শিখেছিল, কেবলমাত্র দৈহিক শক্তিকে মূলধন করে সব কাজ আর করে ওঠা সম্ভব হচ্ছে না। প্রয়োজনই উদ্ভাবনের উৎস। এথেকে শুরু হয় যন্ত্রের আবিষ্কার। যন্ত্র চালাবার জন্যে যে শক্তির প্রয়োজন, প্রথম যুগে তার চাহিদা মিটতো কেবলমাত্র কয়লা থেকে। কয়লার পর এলো জ্বালানী তেল। সভ্যতার আধুনিকতম শক্তির উৎস পারমাণবিক শক্তি; যদিও এখন পর্যন্ত এই শক্তিকে ব্যাপকভাবে কাজে লাগানো সম্ভব হয়ে ওঠে নি। হিসেব করলে দেখা যাবে, পৃথিবীর মোট শক্তি উৎপাদনের ক্ষেত্রে জ্বালানী তেল একটা বড় অংশ জুড়ে রয়েছে। জ্বালানী তেল সব দেশেরই প্রয়োজন। কিন্তু উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিশেষ করে নাম করা যেতে পারে মাত্র কয়েকটি দেশের—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট রাশিয়া এবং কয়েকটি আরব রাষ্ট্রের। চাহিদা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে এক দেশে থেকে অন্য দেশে তেল নিয়ে যাবার ব্যবস্থারও অনেক উন্নতি হয়েছে। কলকাতার কাছেই বজবজ এবং হলদিয়াতে তেলের জাহাজ ভিড়াবার জন্যে অয়েল জেটি রয়েছে।

অনেক কম খরচ হয় বলে সমুদ্রপথকেই এই ব্যাপারে বেছে নেওয়া হয়েছে। এক বারে বেশী তেল নিয়ে যেতে পারলে খরচ অনেক কম হয়। সেই কারণে তেলবাহী জাহাজগুলির আয়তন বাড়ানো হয়েছে এবং হচ্ছে। এই সব বিরাট বিরাট তেলের জাহাজগুলিকে বলে সুপার ট্যাঙ্কার। দু-লক্ষ টনেরও বেশী বহনক্ষমতাযুক্ত জাহাজও এই কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে।

জাহাজে তেল পরিবহনের সময় অনেক বিপদের সম্ভাবনা থাকে। সবগুলির কথা এক সঙ্গে আলোচনা করা সম্ভব নয়। এর মধ্যে প্রধানতঃ যেটি সারা বিশ্বের তেল ব্যবসায়ীদের ভাবিয়ে তুলছে, তা হচ্ছে জাহাজ ডুবি অথবা অন্য কারণে জাহাজ থেকে উপ্‌চে পড়া তেলে সমুদ্রের জল দূষিত হওয়ার দরুণ যে ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হয়, তার মোকাবিলা করবার উপায় উদ্ভাবন। তেল জলে ভেসে ভেসে সমুদ্রের উপকূলের শহরগুলিতে পৌঁছুলে সেখানে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের সৃষ্টি হয়। অনেক সময় এমনও দেখা যায় যে, সমুদ্রের বিরাট এলাকা জুড়ে উপ্‌ছে পড়া তেলে আগুন লেগে গেছে।

অনেক সময় তেলের জাহাজ ডুবির সন্তোষজনক কারণও খুঁজে পাওয়া যায় না। দু-লক্ষ সাত হাজার টনের তেলবাহী জাহাজ মারপেসার (Marpessa) প্রথম যাত্রাতেই তেল নামিয়ে ফেরবার সময় পশ্চিম আফ্রিকার উপকূল থেকে আশী মাইল দূরে 1969 সালের 15ই ডিসেম্বর ডুবে যায়। জাহাজে তেল ভর্তি থাকলে এই জাহাজ ডুবির ফলাফল আরও ভয়াবহ হতে পারতো। তাই ক্ষতির পরিমাণ কেবল জাহাজের কয়েক কোটি টাকা দামের উপর দিয়েই গেল। ডিসেম্বর মাসে আফ্রিকার উপকূলে পর পর যে তিনটি

সুপার ট্যাঙ্কার ডুবে যায়, এটিই তার প্রথম। এর কয়েক দিনের মধ্যেই, 29শে ডিসেম্বর দু-লক্ষ পাঁচ হাজার টনের জাহাজ ম্যাকট্রা (Mactra) মোজাম্বিক চ্যানেলে ডুবে যায়। পরদিনই লাইবেরিয়ার উপকূলের কাছে এক লক্ষ দশ হাজার টনের নরওয়ের জাহাজ কং-হাকনের (Kong-haakon) বিস্ফোরণ রহস্যজনক।

ডুবে যাবার আগে সুপার ট্যাঙ্কার মারপেসা রটারডামে তেল খালাস করে ফিরে যাচ্ছিল। তা সত্ত্বেও এই ভয়াবহ দুর্ঘটনা তেল-ব্যবসায়ীদের মধ্যে একটা ভীতির সৃষ্টি করেছে। তাঁরা এখন গভীর ভাবে চিন্তা করছেন, কেমন করে এই ধরণের দুর্ঘটনা এড়ানো যায়, যাতে তেলের অপচয় রোধ করা যাবে আর সেই সঙ্গে সমুদ্রের জলে তেল ছড়িয়ে পড়ে যে দূষিত আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়, তাও বন্ধ হবে।

1967 সালের টরি ক্যানিয়নের ঘটনার পর থেকে সবাই নড়েচড়ে বসেছেন। এই জাহাজ ডুবিতে তিন কোটি গ্যালন তেল সমুদ্রের জলে ভাসতে ভাসতে ফ্রান্স ও বৃটেনের এক-শ' মাইল তটরেখাকে বিষাক্ত করে তোলে। জাহাজের মালিকদের ক্ষতি-পূরণ বাবদ এই দুটি দেশকে সাড়ে পাঁচ কোটি টাকা দিতে হয়েছে। এর উপর তৈল ও জাহাজের দাম সমেত আরও বেশ কয়েক কোটি টাকা ক্ষতি তো আছেই।

এই ঘটনার পর, কয়েক দিন আগে আমেরিকার একজন বিশেষজ্ঞ বলেছেন—টরি ক্যানিয়নের দুর্ঘটনার পর তিন বছর কেটে গেল, কিন্তু পৃথিবীর কোন দেশই এই ধরণের ঘটনা এড়াবার কোন উপায় বাৎলাতে পারলেন না।

হিসেব করে দেখা গেছে, বছরে প্রায় 1000 কোটি টন তেল জাহাজে সমুদ্র পাড়ি দেয়। এর মধ্যে শতকরা দশ ভাগ—প্রায় দশ কোটি টন তেল জাহাজ-ডুবি বা অন্যান্য কারণে সমুদ্রের জলে পড়ে গিয়ে নষ্ট হয়। জাহাজ যত বড় হবে, প্রতিটি দুর্ঘটনায় তেলের ক্ষতিও সেই পরিমাণ বাড়বে।

আমেরিকান ব্যুরো অফ শিপিং-এর প্রকাশিত তথ্য থেকে জানা যায় যে, বর্তমানে এক লক্ষ টনের উপর বহনক্ষমতাযুক্ত তেলের জাহাজের সংখ্যা 180টি। 1968 সালে এই সংখ্যা ছিল মোটে 55টি। বর্তমানে তৈরি হচ্ছে, এমন সুপার ট্যাঙ্কারের সংখ্যা 310। এর মধ্যে বেশ কিছু জাহাজ আছে, যাদের বহনক্ষমতা দু-লক্ষ—এমন কি, তিন লক্ষ টনেরও উপরে।

বিশেষজ্ঞেরা আশঙ্কা করছেন—তেলের জাহাজের আয়তন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তেল থেকে সমুদ্রের জল এবং সমুদ্রের উপকূলের আবহাওয়া দূষিত হবার সম্ভাবনা বাড়বে। তাই ভবিষ্যতে এই পরিস্থিতির হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে বিজ্ঞানীদের সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। বিদেশে এই বিষয়ে নানা রকমের গবেষণা চলছে। মানুষের অন্যান্য সমস্যার মত এরও একদিন নিশ্চয়ই সমাধান হবে।

দীপ্তিময় দে

উল্কা-গহ্বর

রাত্রির অন্ধকারে খসে-পড়া যে সব তারা মুহূর্তের জন্যে আকাশের গায়ে আলোর রেখা এঁকে দিয়ে যায়, আজ সবাই তাদের পরিচয় জানে; অর্থাৎ ওগুলি তারা নয়—উল্কা। উল্কাপাতে অমঙ্গলের আশঙ্কায় অনেকেই আতঙ্কিত হয়ে ওঠে। অবশ্য সময়ে সময়ে উল্কাপাত ভয়াবহ ধ্বংসের কারণও হয়ে থাকে। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচার করলে দেখা যায় যে, এই উল্কাই পৃথিবীর বাইরের মহাশূন্যের একমাত্র আগন্তুক, জ্যোতির্পদার্থ-বিজ্ঞানীরা যাদের পরীক্ষাগারে বিশ্লেষণ করে মহাশূন্যের জ্যোতিষ্কাদি সম্বন্ধে অনেক কথা জানতে পারেন।

প্রচণ্ডবেগে ধাবমান উল্কাপিণ্ডের গতি পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল অতি সামান্যই প্রতিরোধ করতে পারে। বিরাট দেহ নিয়ে যখন উল্কাপিণ্ড বিপুল বেগে পৃথিবীর বুকে আছড়ে পড়ে, তখন পৃথিবী নিজেই একটা সুদৃঢ় ব্রেকের মত কাজ করে। মুহূর্তের মধ্যেই উল্কাপিণ্ডের এই বিপুল গতিশক্তি পৃথিবীর বুকে ক্ষত সৃষ্টি করে সেখানে কেন্দ্রীভূত হয়ে তাপশক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। এই প্রচণ্ড তাপশক্তি অংশতঃ বা সমগ্র উল্কা-পিণ্ডের দেহ এবং তার চতুর্দিকের সবকিছুকে বাষ্পীভূত করে ফেলে। এই বিস্ফোরণের প্রচণ্ডতা এমন এক কম্পন-তরঙ্গের সৃষ্টি করে, যার ফলে ভূপৃষ্ঠের শিলাস্তর চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে অনেকখানি জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে এবং উল্কা-গহ্বরের সৃষ্টি করে।

যেখানে উল্কা-গহ্বরের সৃষ্টি হয়, সেখানে অনুসন্ধানের ফলে দেখা গেছে—মূল গহ্বরের চেয়ে বহুগুণ বেশী গভীরতা পর্যন্ত শিলাস্তর বিপর্যস্ত ও বিক্ষিপ্ত হয়েছে এবং উল্কার সংঘর্ষ-বিন্দুর বহু নীচের শিলাস্তরে ভগ্ন-শঙ্কু এবং কোয়েসাইট প্রভৃতি দেখা গেছে।

1947 সালের 12ই ফেব্রুয়ারী পৃথিবীর বুকে মোট প্রায় 150 টন ওজনের উল্কা-বর্ষণ হয়েছিল, যার বড় বড় খণ্ডগুলি Sikhote-Alin পর্বতমালার শিলাপৃষ্ঠে প্রায় 110টি উল্কা-গহ্বরের সৃষ্টি করে।

বৃহৎ আকৃতির উল্কার ধ্বংস-শক্তি এতই প্রচণ্ড যে, হয়তো তা বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরকের সাহায্যে করা যেতে পারে। উল্কার সংঘর্ষই উল্কা-গহ্বরের সৃষ্টি করে। কাজেই যখন এর আঘাতের প্রচণ্ডতা কম, তখন ভূপৃষ্ঠে ছোট গর্তের সৃষ্টি হয়। গহ্বরের আকার নির্ভর করে উল্কার আসন্ন গতিপথের কৌণিক অবস্থান, উল্কা-বর্ষণের প্রকৃতি আর পিণ্ডটির মূল আকৃতি ও আয়তনের উপর। এমনও হতে পারে যে, মূল উল্কাটি খণ্ডাংশের বহুগুণ বড় বা এর আবিষ্কারের বিলম্ব সত্ত্বেও পূর্বে একই আকারের ছিল। আবার প্রচণ্ড গতিবেগসম্পন্ন উল্কাপিণ্ড বিপুল বিস্ফোরণের স্বাক্ষর রেখে যায় উল্কা-গহ্বরের সৃষ্টি

করে। চেহারায় গহ্বরগুলি খনি বা বোমার বিস্ফোরণে সৃষ্ট গহ্বরগুলির চেয়ে পৃথক। সাধারণতঃ বিস্ফোরণের ফলে উদ্ভূত গহ্বরের চেয়ে উল্কা-গহ্বর অনেক বড়। হাইড্রোজেন বোমার ধ্বংসাত্মক শক্তির পরিমাপে উল্কা-গহ্বর সৃষ্টির শক্তির প্রচণ্ডতা নির্ণয় করা যেতে পারে।

অ্যারিজোনার নিকটবর্তী ফোয়েনিক্সের উল্কা-গহ্বরের সৃষ্টি হয়েছিল বিরাট আকৃতির একটি উল্কাপাতের ফলে, যার নাম Conon Diablo। তাছাড়া একে ব্যারিংয়ের গহ্বর বা অ্যারিজোনার বৃহৎ উল্কা-গহ্বর নামেও অভিহিত করা হয়। বিজ্ঞানীদের ধারণা, কনন ডায়াব্লোর বয়স প্রায় 5000 বছর। এর আসল গভীরতা প্রায় সাত-শ' ফুট ছিল এবং বিস্তৃতি ছিল প্রায় তিন-চতুর্থাংশ মাইল। মুহূর্তের মধ্যে এরূপ একটি বিরাট গহ্বর সৃষ্টি করবার জন্যে প্রয়োজন কয়েক হাজার মেগাটন বিস্ফোরকের; অর্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্যবহৃত এমন কোন বোমার কথা জানা নেই, যা এই উল্কা-গহ্বরের মত বিরাট গহ্বর সৃষ্টি করতে সক্ষম!

উত্তর আমেরিকায় এই রকমের অনেক গহ্বর উল্কাপাতের ফলে সৃষ্টি হয়েছে। এর মধ্যে কিছু কিছু প্রাচীন গহ্বর এমনভাবে প্রচ্ছন্ন আছে যে, ভূপৃষ্ঠের উপর থেকে তার অস্তিত্ব নির্ধারণ করা সহজ ব্যাপার নয়। কিন্তু বিমান থেকে গৃহীত আলোকচিত্রে এগুলি ধরা পড়ে। এথেকে মনে হয়, এখনও অনেক 'ফসিল গহ্বর' আবিষ্কৃত ও চিহ্নিত হবার অপেক্ষা রাখে।

আজ পর্যন্ত যত বিস্ফোরণ ঘটেছে, তার মধ্যে বৃহত্তম চিহ্ন আর আবিষ্কৃত ফসিল-গহ্বরগুলির মধ্যে সর্ববৃহৎ উল্কা-গহ্বরটি রয়েছে জোহানেসবার্গের কাছে দক্ষিণ আফ্রিকার ভ্রেদেফোর্ট শহরে। প্রায় এক-শ' চল্লিশ মাইল ব্যাসবিশিষ্ট এলাকায় ভূপৃষ্ঠের পাথরের স্তর নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, বিরাট ওলট-পালট হয়েছে স্তরগুলিতে। প্রায় তিরিশ মাইল চওড়া আগ্নেয়শিলাস্তরের গ্র্যানিট পাথরের অংশ নিক্ষিপ্ত হয়েছে উপরের দিকে—এই উল্কা-গহ্বরের কেন্দ্রস্থলে। আমাদের জানা শিলাস্তরের ধারণা থেকে বোঝা যায় যে, মূল গহ্বরটি নিশ্চয়ই ছিল প্রায় দশ মাইল গভীর। বর্তমানে এটি যে স্তরীভূত শিলাস্তরে অংশতঃ ঢাকা পড়েছে, তা বিশ্লেষণ থেকেই বোঝা যায়। কম পক্ষে এই উল্কা-গহ্বরের বয়স পঞ্চাশ কোটি বছর। হাইড্রোজেন বোমার ধ্বংসাত্মক শক্তির তুলনা দিয়েও এর শক্তির পরিমাপ করা যায় না। কারণ, এরূপ বিরাট ধ্বংস ঘটাতে পারে 15 লক্ষ মেগাটন বিস্ফোরকের শক্তি—একথা বললেও অত্যুক্তি হবে না।

পৃথিবীকে ঠিক কত সংখ্যক বড় বড় উল্কাপিণ্ড আঘাত করে, তা নির্ণয় করা নিঃসন্দেহে কঠিন ব্যাপার। অধিকাংশ উল্কাই ভূপৃষ্ঠের বৃহত্তর অংশ—সাগর বা মহাসাগরে এসে পড়ে বলে চিহ্ন রাখতে পারে না। তাছাড়া যে স্থানে এখনও মানুষের পদক্ষেপ হয়

নি, সে সব জায়গাতেও নিশ্চয়ই অনেক উল্কাপাত হয়েছে। উল্কাপাতের এই আকস্মিক প্রকৃতির জন্যেই কেউ কেউ মনে করেন কোন বড় শহর বৃহৎ উল্কাপাতের লক্ষ্য হতে পারে। কিন্তু সঠিক মূল্যায়ন একথাইবলে যে, এই ধরণের বিধ্বংসী উল্কাপাতের সংখ্যা থেকে দেখা যায় যে, এরূপ বিপদের সম্ভাবনা অনেক দূরবর্তী—হয়তো প্রতি আড়াই লক্ষ বছরে একবার ঘটতে পারে। সাধারণতঃ পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় 14 মাইল বেগে উল্কাপিণ্ড আঘাত করে এবং মাত্র শতকরা 10 ভাগ উল্কাপিণ্ড ভূপৃষ্ঠে এসে পৌঁছায়।

কিন্তু আমরা আজও উল্কাপিণ্ডের প্রকৃতির বিষয় সম্পূর্ণরূপে জানতে পারি নি। উল্কা-বিশেষজ্ঞেরা বলেন—পৃথিবীর বর্তমান আকার ধারণে এবং প্রাগৈতিহাসিক জীব নিশ্চিহ্ন হবার পিছনে উল্কাপাতের হয়তো বিশেষ কোন ভূমিকা আছে। উদাহরণ-স্বরূপ ভ্রেদেফোর্টের উল্কা-গহ্বরের কথাই ধরা যেতে পারে। এটা যদি স্থলভাগে গহ্বরের সৃষ্টি না করে কোনও মহাসাগরে পতিত হতো, তবে এর ধ্বংসকারী শক্তির পরিমাণ আরও অধিক হতে পারতো। এই উল্কাপাত যদি আটলান্টিক মহাসাগরের মধ্যভাগে ঘটতো, তবে সৃষ্টি হতো কুড়ি হাজার ফুট উঁচু বৃত্তাকার এক জোয়ারের তরঙ্গ, যা প্রচণ্ড শক্তিতে ছড়িয়ে পড়ে ইউরোপ, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা এবং আফ্রিকার বিরাট অংশে আনতো এক ভয়াবহ বিধ্বংসী প্লাবন।

সৌম্যেন্দ্রনাথ গুহ

এ. এম. ও পি. এম.

এ. এম. ও পি. এম. কথা দুটি তোমরা প্রায়ই শুনে থাক এবং নিজেরাও বলে থাক—Eight A.M. বা Nine-thirty P.M. অর্থাৎ দিন বারোটার আগের বেলা আটটা বা দিন বারোটার পরের রাত্রি সাড়ে-নয়টা। কিন্তু কখনো ভেবে দেখেছ কি—ঐ কথা-দুটির অর্থ কি? প্রথমেই দেখা যাক—কথা দুটিই বা কি? A.M. আর P.M. তো ওর সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। কথা দুটি হলো Anti-Maridian অর্থাৎ মেরিডিয়ানের আগে আর Post-Maridian অর্থাৎ মেরিডিয়ানের পরে বা মেরিডিয়ান-অতিক্রান্ত।

আমাদের দিন হচ্ছে 24 ঘণ্টায়, অর্থাৎ দিন ও রাত্রি মিলে একটি সম্পূর্ণ দিন। এই কাল বিভাগটি করেছিলেন আমাদের সুদূরতম পূর্বপুরুষেরা আর তখনই তা বৃহত্তর পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছিল। কে বা কোন্ জাতি বা কোন্ দেশ, কবে, কোথায় প্রথম এই কাল-বিভাগটির প্রচলন করেছিল, আজ আর তার কোন হদিশ মেলে না, কিন্তু একথা জানা যায় যে, প্রাচীন মিশরীয়েরাও এই কাল-বিভাগই পালন করতো।

এখন দিনের এই চব্বিশ ঘণ্টার আরম্ভটা হবে কোথা থেকে? বর্তমানে আমরা এটা জানি রাত্রি 12টা থেকে, কারণ সেখান থেকেই আমাদের তারিখ পাল্টায়। এই হিসাবটা আমাদের দিয়েছে ইউরোপের মানুষ অর্থাৎ ইংরেজরা। আমাদের দেশের মানুষ এবং গণৎকারেরা দিনের হিসাব করতেন উষাকাল থেকে দিনের আরম্ভ ধরে নিয়ে।

রাত্রি 12টা যেই শেষ হয়ে গেল, তারিখটি পাল্টে গেল—আরম্ভ হলো আর একটা দিন; অর্থাৎ শেষ হলো রাত্রি 12টা থেকে রাত্রি 12 টার একটা দিন, একটা সম্পূর্ণ দিন আর দুটি রাত্রির অর্ধেক করে। বর্তমানে আমাদের না হয় ঘড়ি আছে, রাত্রি 12টা আমরা টের পাই—কিন্তু সেই সুদূর প্রাচীন কালেও ওই হিসাবটি তখনকার মানুষেরা করেছিলেন। তাঁরা করেছিলেন কেমন করে? ঘড়ি তো মাত্র পাঁচ-শ' বছরের ব্যাপার। তাঁরা রাত্রি দেখেও করেন নি, ঘড়ি দেখেও করেন নি—তাঁরা করেছিলেন সূর্যের গতিবিধি দেখে। কিন্তু রাত্রিতে সূর্য কোথায়?

রাত্রি দেখে তাঁরা করেন নি, তাঁরা করেছিলেন দিন দেখেই। সকালবেলায় সূর্য ওঠে, ক্রমে সূর্য ধীরে ধীরে উপরে উঠতে থাকে। এক সময় সূর্য ঠিক মাথার উপরে উঠে আসে, তারপরে চলে যায় পশ্চিম দিকে। এই যে পূব থেকে পশ্চিমে চলে যাওয়া—এটাই হলো আসল কথা। পৃথিবীর যেখানেই দাঁড়িয়ে থাকো না কেন, সূর্য মাথার উপরে উঠে পূব থেকে পশ্চিমে সরে যাবেই। সূর্য যখন ঠিক মাথার উপর উঠে এলো, তখন হলো বেলা 12টা। এই বেলা 12টা হলো দিনের অর্ধেক। তারপর সেখান থেকে হিসাব করলেই রাত 12টা পাওয়া যায়, যা হলো কিনা দিনের শেষ। বর্তমান কালের কলের ঘড়ি তখনকার দিনের মানুষদের ছিল না—এটা ঠিক, কিন্তু তাঁদেরও ছিল ঘণ্টা মাপবার নানা রকম কায়দা। প্রয়োজনের তাগিদেই ঘড়ির উদ্ভব হয়েছে।

পৃথিবীর সমস্ত অংশকেই জ্ঞানী মানুষরা ভাগ করেছেন কতকগুলি রেখা দিয়ে। বিষুব রেখার সঙ্গে সমান্তরাল রেখাগুলিকে বলা হয় Latitude, আর রেখাগুলি উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত বিস্তৃত, সেগুলি হলো Longitude। এই Longitude-গুলিকে সূর্য কেবলই কেটে কেটে যাচ্ছে। Longitude-এর সমান্তরাল এই কাল্পনিক যে কোন রেখাকেই বলা হয় মেরিডিয়ান। তাই সূর্য যখন এই রেখার পূবদিকে থাকে, তখন তাকে বলা হয় Anti-Maridian বা এ. এম, আর পশ্চিম দিকে গেলেই বলা হয় Post-Maridian বা পি. এম.।

তাহলে বেলা 12টাকে কি বলা হবে—A. M.? 12 A. M.? না, ঠিক বেলা 12টা পূবেও নয় পশ্চিমেও নয়, ওটা ঠিক মাথার উপর। ওকে বলা হয় noon বা দুপুর 12টা। তেমনি রাত 12টাকে বলা হয় midnight বা রাত 12টা। না বললেও চলতো, 12 night-ই যথেষ্ট হতো, কিন্তু প্রকাশভঙ্গীটি চলে এসেছে এবং

চালু হয়ে গেছে। দিন বারোটার পর এক সেকেণ্ড হয়ে গেলেই সেটা পি. এম. আবার তেমনি রাত বারোটার পর এক সেকেণ্ড হয়ে গেলেই সেটা এ. এম. এবং নতুন আর একটা দিন।

সূর্য মাথার উপরে থাকে একটা রেখাতেই। ধরা যাক, কলকাতা শহর। কলকাতার উপরে ঐ রেখা ধরে উত্তর ও দক্ষিণে আগাগোড়া সবই ওই বেলা 12টা থাকবে। কিন্তু বোম্বাইতে তখন হবে সাড়ে এগারোটা, যেহেতু বোম্বাই কলকাতা থেকে হাজার মাইল পশ্চিমে—সেখানে noon আসতে আধ ঘণ্টা দেরী হবে। কলকাতার সময় আর বোম্বাইয়ের সময়ে হবে তফাৎ। এমনি তফাৎ সর্বদাই হচ্ছে সারা পৃথিবীর সময়ে।

এর পরও আবার আছে Local time বা স্থানীয় সময় ও Standard time বা সাধারণ সময়। সেটা এই রকম—কলকাতার আছে একটা স্থানীয় সময়, আর বোম্বাইয়ের আছে একটা স্থানীয় সময়। এই দুটিতে আছে আধ ঘণ্টার মত তফাৎ। এখন কোন লোক যদি কলকাতা থেকে রেলগাড়ীতে বোম্বাইয়ের পথে রওনা দেয় আর সে গাড়ী যদি ঘণ্টায় চল্লিশ মাইল করে চলে, তাহলে সে গাড়ী প্রতি এক-শ' মাইলে আড়াই মিনিট করে এগিয়ে যাবে। অথচ গাড়ীর চলবার কোন একটা ষ্টেশনে নামবার আবার সেখান থেকে ছাড়বার একটা নির্দিষ্ট সময় আছে, যেটা দেওয়া থাকে Time-table বা সময় নির্দেশিকা বইয়ে। সেই বই দেখে আর কলকাতার সময়-ওয়ালা ঘড়ি দেখে কেউ যদি স্থান এবং সময় বিচার করতে যায়, তাহলে তার সবই গোলমাল হয়ে যাবে। সেই জন্যে রেলওয়ে, জাহাজ, প্লেন—এসবের কাজে ব্যবহার করা হয় একটা সাধারণ সময়। এটা নেওয়া হয় এক একটা দেশ ধরে, তার মাঝখানের কোন একটা জায়গার সময় নিয়ে। ভারতবর্ষের সেই standard বা সাধারণ সময় হচ্ছে এলাহাবাদের সময়ের সঙ্গে মেলানো।

বিনায়ক সেনগুপ্ত

শব্দ-সঞ্চয়

গ্রামোফোনের সাহায্যে বহুদিন আগেকার শিল্পী ও বক্তাদের কণ্ঠে গান, আবৃত্তি ও বক্তৃতা শোনা আজও অনেক লোকের কাছে বিস্ময়ের বস্তু। সামান্য একটা কাঠের বাক্স থেকে একটা সরু সূচের সাহায্যে কি করে যে গান বা সুরের সৃষ্টি হয়—অনেকের কাছেই সেটা কৌতূহলের বিষয়। কিন্তু এই কৌতূহল মেটাতে গেলে শব্দ-তরঙ্গ জিনিষটা যে কি, সেটা আগে বোঝা দরকার। আমি কথা বললাম, আর আমার সামনে আর একজন সে কথা শুনলো—এর অর্থ এই নয় যে, আমার কথাগুলি ছাপার অক্ষরের মত দল বেঁধে শ্রোতার কানে গিয়ে প্রবেশ করলো। আসলে যে কোন শব্দ সৃষ্টির সময় চারপাশের বায়ুস্তর বিশেষভাবে কম্পিত হয়ে শব্দ-তরঙ্গের সৃষ্টি করে। আর সেই শব্দ-তরঙ্গ যখন শ্রোতার কানের মধ্যে গিয়ে আঘাত করে, তখনই শ্রোতা সেই শব্দ শুনতে পায়।

এই ব্যাপার থেকে স্থির করা হলো যে, আমরা যদি মুখের বদলে কোন যন্ত্রের সাহায্যে ঠিক এইভাবে শব্দ-তরঙ্গের সৃষ্টি করতে পারি, তাহলে সেটা ঠিক মানুষের কণ্ঠস্বরের মতই শোনা যাবে। গ্রামোফোন ঠিক এই ধরণেরই এক প্রকার যন্ত্র, যে কোন নির্দিষ্ট শব্দ, রেকর্ড নামে এক বিশেষ ধরণের জিনিষের উপর সঞ্চয় করে রেখে তাথেকেই পরে এই যন্ত্রের সাহায্যে সেই শব্দের পুনরুৎপাদন করা হয়। কিভাবে সেই সঞ্চিত শব্দকে পুনরায় উৎপাদন করা হয়, সে সম্বন্ধে পরে আলোচনা করছি।

এই গ্রামোফোন বা ফনোগ্রাফ যন্ত্রটির আবিষ্কারক হলেন জগদ্বিখ্যাত বিজ্ঞানী টমাস আলভা এডিসন। 1877 সালে এই বিজ্ঞানী গ্রাহাম বেলের আবিষ্কৃত টেলিফোন দেখে ভাবলেন—মানুষের কণ্ঠস্বর থেকে উৎপন্ন শব্দ-তরঙ্গের সাহায্যে যদি একটি সরু সূচকে কাঁপিয়ে সেই শব্দের অনুলিপি কোন ধাতুখণ্ডে গ্রহণ করা যায়, তাহলে সেই অনুলিপি থেকে আবার কম্পন জাগিয়ে আগেকার নেওয়া সেই শব্দের পুনরাবৃত্তি করা কি সম্ভব নয়? এডিসনের এই কল্পনা একদিন বাস্তবে রূপায়িত হলো।

এডিসন তাঁর মিস্ত্রি ক্রুয়েসীকে ডেকে একটা নক্সা দিলেন, তাতে ছিল একটা সিলিণ্ডারের উপর পাত্‌লা টিনের একটা চাদর বসানো। মিস্ত্রীকে তিনি বললেন—এই চাদরের সংস্পর্শে রাখা একটা সরু সূচকে স্প্রিং দিয়ে সামনে রাখা পাত্‌লা ডায়াফ্রামের সঙ্গে জুড়ে দিতে হবে। তাঁর মত বিচক্ষণ মিস্ত্রীর পক্ষে এটা তৈরি করতে মোটেই বেশী সময় লাগলো না। ক্রুয়েসীর কৌতূহলের জবাবে এডিসন বললেন—এই যন্ত্রের সাহায্যে আমি মানুষের কথা ধরে রাখবো এবং তার পুনরাবৃত্তি করবো। টিনের চাদর যথাস্থানে রেখে, ডায়াফ্রামের সামনে দাঁড়িয়ে এডিসন খুব জোরে চীৎকার করে তাঁর

প্রিয় কবিতা আবৃত্তি করলেন—Mary had a little lamb…ইত্যাদি। তারপর সেই যন্ত্রের সাহায্যেই কবিতাটির পুনরাবৃত্তি করে সেই ঘরের সকলকে তাঁর নিজের কণ্ঠস্বর শোনালেন। সকলে বিস্ময়ে হতবাক—এমন কি, এডিসন নিজেও। মানুষের কণ্ঠস্বরকে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে সঞ্চয় করে তার পুনরাবৃত্তি করবার এই প্রথম প্রচেষ্টার সাফল্যে সকলের মধ্যে ধন্য ধন্য পড়ে গেল। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে এডিসনের কাছে প্রসংশাপত্র আসতে লাগলো। বিজ্ঞানের এই নবতম আবিষ্কারকে সারা পৃথিবীর লোক সাদরে গ্রহণ করলো। এই হলো প্রথম শব্দ-সঞ্চয়ের ছোট্ট কাহিনী।

এখন প্রশ্ন জাগতে পারে—শব্দকে এভাবে সঞ্চয় করা হলো কিভাবে? এডিসনের আবিষ্কৃত পদ্ধতির অবশ্য এখন অনেক উন্নতি ও পরিবর্তন হয়েছে। তবে শব্দ-সঞ্চয়ের মূল যান্ত্রিক পদ্ধতি অবশ্য সকল ক্ষেত্রেই এক। এডিসন যে যন্ত্রের সাহায্যে শব্দকে প্রথম ধরে রাখেন, তার মূল তত্ত্ব হলো—সেই যন্ত্রের পাত্‌লা টিনের চাদরের গায়ে একটা সরু সূচের প্রান্তভাগ ঠেকিয়ে রাখা ছিল। এই সূচটির অপর প্রান্ত আবার একটা স্প্রিং-এর সাহায্যে একটা ডায়াফ্রামের সঙ্গে লাগানো। এই ডায়াফ্রামের সামনে কোন কিছু আবৃত্তি করলে স্বভাবতঃই বায়ুস্তর কম্পিত হয়। বায়ুর এই কম্পনের ফলে ঠিক অনুরূপভাবেই ডায়াফ্রামটিও কম্পিত হয়। ডায়াফ্রামের এই কম্পন, তার সঙ্গে সংলগ্ন সরু সূচটিকেও কাঁপিয়ে তুলে। সেই সময়ে টিনের চাদরে মোড়া সিলিণ্ডারটিকে আস্তে আস্তে ঘোরানো হতে থাকে। সূচের অগ্রভাগের এই কম্পন ঘূর্ণায়মান টিনের চাদরের উপর খুব সরু সরু রেখার সৃষ্টি করে। অবশ্য এই রেখাগুলির গভীরতা খুবই কম—এক ইঞ্চির হাজার ভাগের এক ভাগের মত। যাহোক ঘূর্ণায়মান টিনের চাদরের উপর এই রেখার আকৃতি কিন্তু সম্পূর্ণ নির্ভর করে সূচটির কম্পনের উপর, যেটা আবার নির্ভর করে ডায়াফ্রামের কম্পনের উপর। সুতরাং স্পষ্টতঃই বোঝা যাচ্ছে যে, ডায়াফ্রামের সামনে কি ধরণের শব্দের উৎপত্তি হলো, তার উপর নির্ভর করছে টিনের চাদরের উপর রেখার আকৃতি। এখন টিনের চাদরের এই রেখাগুলির উপর দিয়ে ঐ সূচটিকে আবার যদি ঠিকভাবে চালিয়ে নেওয়া হয়, তাহলে ডায়াফ্রামটি আগের মতই কাঁপতে থাকবে। ফলে তার সামনেকার বাতাসও কাঁপবে এবং শব্দের পুনরুৎপত্তি হবে। এক্ষেত্রে যেহেতু সূচটি টিনের উপর তার নিজেরই করা রেখার উপর দিয়ে যাচ্ছে, সেহেতু শব্দ সঞ্চয়ের সময় ডায়াফ্রামটি যেমনভাবে কেঁপেছিল, পুনরাবৃত্তির সময়ে সেটা ঠিক একইভাবে কাঁপবে অর্থাৎ এবারও ঠিক একই ধরণের শব্দের উৎপত্তি হবে। এডিসনের পরীক্ষার ক্ষেত্রে তাঁর সেই টিনের চাদরের উপর ধরে রাখা শব্দকে আমরা রেকর্ড বলতে পারি। এই ব্যবস্থার নানা অসুবিধার জন্যে এর পরে টিনের চাদরের পরিবর্তে মোমের সিলিণ্ডার ব্যবহার করা হয়। এই হলো শব্দ-সঞ্চয়ের মোটামুটি পদ্ধতি। আজকাল আমরা যে সব

গ্রামোফোনের রেকর্ড দেখতে পাই, সেগুলি অবশ্য এই পদ্ধতিরই আরো উন্নত ব্যবস্থা। আজকাল মোমের উপর প্রথমে রেকর্ড তোলা হয় এবং মোমের রেকর্ড থেকে পিতল বা ব্রঞ্জের ছাঁচ তুলে নেওয়া হয়। আমরা যে সব রেকর্ড ব্যবহার করি, সেগুলি এই ছাঁচ থেকে এরকম শক্ত গন্ধক মিশ্রিত রাবার ও অন্যান্য পদার্থের সাহায্যে তৈরি করা হয়।

এইভাবে শব্দকে সঞ্চয় করে রাখবার পদ্ধতি ছাড়াও আধুনিক যুগে আরো এক রকম উন্নত পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে। টেপ রেকর্ডারের নাম আজকাল সবাই জানে। এই যন্ত্রটিকেও শব্দ সঞ্চয় করে রাখবার জন্যে এবং তাথেকে সেই শব্দের পুনরাবৃত্তির জন্যে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। আসলে এই যন্ত্রটি শব্দকে সঞ্চয় করে রাখবার এক প্রকার বৈদ্যুতিক-চৌম্বক পদ্ধতি মাত্র। চুম্বক এবং বিদ্যুতের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে এই যন্ত্রের সাহায্যে শব্দকে সঞ্চয় করে রেখে তাথেকে যতবার ইচ্ছা শব্দের পুনরাবৃত্তি করা চলে। এই পদ্ধতির যান্ত্রিক কৌশল অবশ্য কিছুটা জটিল, তবে এই পদ্ধতির সবচেয়ে সুবিধা হলো—শব্দ সঞ্চয় করবার পরমুহূর্তেই সেই শব্দের পুনরাবৃত্তি করা এর দ্বারা সম্ভব। আধুনিক যুগে পৃথিবীর প্রায় সমস্ত বেতার কেন্দ্রেই এই যন্ত্রের ব্যাপক প্রচলন হয়েছে।

সমীরকুমার ঘোষ *

---

* পদার্থবিদ্যা বিভাগ, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন।

প্রশ্ন ও উত্তর

1. অ্যান্টিবায়োটিক্স কি?

বারীন দাস,
নিমতা

উঃ—1. অ্যান্টিবায়োটিক্স বলতে সাধারণতঃ জীবাণুনাশক পদার্থকেই বোঝায়। বিভিন্ন প্রকার রোগের প্রতিষেধক হিসাবেই এদের ব্যবহার। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীবদেহ থেকে নিঃসৃত বিপাকীয় পদার্থ অনেক সময় অন্যান্য ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীবের সক্রিয়তাকে বাধা দেয়। এই জাতীয় পদার্থকে অ্যান্টিবায়োটিক্স বলা হয়। অ্যান্টিবায়োটিক্স প্রধানতঃ ব্যাকৃটিরিয়া, অ্যাকৃটিনোমাইসেটিস ছত্রাক ইত্যাদি থেকে পাওয়া যায়। অ্যান্টিবায়োটিক্সের বেশীর ভাগই জৈব সংশ্লেষণে প্রস্তুত করা হয়। চিকিৎসা-বিজ্ঞানে রোগ-প্রতিষেধকরূপে যে সব অ্যান্টিবায়োটিক্স ব্যবহার করা হয়, তাদের মধ্যে পেনিসিলিন, স্ট্রেপ্টোমাইসিন, ওরিওমাইসিন, টেরামাইসিন, ক্লোরোমাইসেটিন প্রভৃতির নাম খুবই পরিচিত। বিভিন্ন প্রকার রোগ-জীবাণুর উপর এদের ক্রিয়াও বিভিন্ন। ছোটখাটো রোগ

থেকে আরম্ভ করে সকল প্রকার রোগের চিকিৎসাতেই আজ অ্যান্টিবায়োটিক্স ব্যবহার করা হয়। টাইফয়েড, ম্যালেরিয়া, কলেরা, টি. বি. প্রভৃতি সংক্রামক রোগ অ্যান্টিবায়োটিক্সের সাহায্যে চিকিৎসকেরা আয়ত্তের মধ্যে এনেছেন। রোগের বিভিন্ন অবস্থা বজায় থাকা সত্ত্বেও অ্যান্টিবায়োটিক্সের ক্রিয়া হ্রাস পায় না। সাধারণ ওষুধের তুলনায় এটাই হচ্ছে অ্যান্টিবায়োটিক্সের প্রধান ধর্ম।

অ্যান্টিবায়োটিক্স প্রয়োগের ফলে রোগীর দেহে অনেক সময় কম-বেশী বিষক্রিয়া দেখা দেয়। কোন কোন ক্ষেত্রে অবশ্য এদের উপকারিতা এতই বেশী যে, বিষক্রিয়ার প্রভাব সেখানে খুবই কম। এই বিষক্রিয়া দূর করবার জন্যে বিজ্ঞানীরা খুবই সচেষ্ট। পরিপূরক হিসাবে বিভিন্ন অ্যান্টিবায়োটিক্সের বেলায় বিভিন্ন রকমের বিষক্রিয়া নিবারক ওষুধও বেরিয়েছে, যেমন—পেনিসিলিনের ক্ষেত্রে এন্‌জাইম পেনিসিলিনেজ ব্যবহার করা হয়।

রোগের প্রতিষেধক হিসাবে অ্যান্টিবায়োটিক্স নির্বাচন করাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এর ভুল প্রয়োগে অনেক উপসর্গ দেখা দেয়। উন্নত চিকিৎসাশাস্ত্রে অ্যান্টিবায়োটিক্সের ব্যবহার অপরিহার্য। এগুলি খুব দ্রুতভাবে রোগ-প্রতিষেধকের কাজ করে। অ্যান্টিবায়োটিক্স নিয়ে এখন বহু গবেষণা চলছে এবং আশা করা যায়, ভবিষ্যতে যাবতীয় রোগের প্রতিরোধক হিসাবে অ্যান্টিবায়োটিক্স প্রস্তুত করা সম্ভব হবে।

শ্যামসুন্দর দে*

---

* ইনষ্টিটিউট অব রেডিও ফিজিক্স অ্যাণ্ড ইলেকট্রনিক্স, বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাতা-9।

বিবিধ

পরমাণু প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে ভারতের অগ্রগতি

নয়াদিল্লী থেকে 20শে জুলাই পি. টি. আই. এবং ইউ. এন. আই. কর্তৃক প্রচারিত সংবাদে জানা যায়—বৃহদাকারের পরমাণু-বিদ্যুৎ চুল্লী নির্মাণ এবং পরমাণু-জ্বালানীর ক্ষেত্রে আত্মনির্ভরতার এক বৃহৎ কর্মসূচী নিয়ে ভারতবর্ষ '70 দশকের দিকে এগিয়ে চলছে। মাদ্রাজের কাছে কালাপাক্কামে সম্পূর্ণ ভারতীয় প্রচেষ্টায় প্রথম পরমাণু-বিদ্যুৎ কারখানা গড়ে উঠছে এবং হায়দরাবাদে পরমাণু-চুল্লীর জ্বালানী তৈরির আয়োজন সুরু হয়েছে।

ভারতীয় পরমাণু-শক্তি কমিশনের চেয়ারম্যান ডক্টর বিক্রম সরাভাই সাংবাদিকদের বলেছেন—আমরা 'ইউরেনিয়াম-থোরিয়াম বৃত্ত' সম্পূর্ণ করতে চাই, অর্থাৎ অন্যের উপর কিছুমাত্র নির্ভর না করে দেশে যে বিপুল পরিমাণ থোরিয়াম রয়েছে, তার উপরেই আমাদের পরমাণু-কর্মসূচী গড়ে তুলতে হবে।

ডক্টর সরাভাই পরিষ্কারভাবে বলেন, পরমাণু-প্রযুক্তিবিদ্যায় ভারত কারও পিছনে পড়ে থাকবে না। পরমাণু-বিজ্ঞানীরা বলেন, পরমাণু-বিজ্ঞান ও পরমাণু-প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে গত 25 বছরে ভারতের যে বিস্ময়কর অগ্রগতি ঘটেছে, তার সঙ্গে তাল রেখে ভারত পরমাণু-প্রয়োগবিদ্যার ক্ষেত্রে এমন এক কঠিন পরীক্ষায় নেমেছে, যা এযাবৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট রাশিয়াও পারে নি। পৃথিবীর মাত্র তিনটি দেশ এই নতুন প্রয়োগবিদ্যা সম্পর্কে ওয়াকেবহাল, কিন্তু তারা তাদের এই পদ্ধতিটিকে গোপন রেখেছে। পরমাণু-চুল্লীতে ব্যবহারের জন্যে প্রাকৃতিক ইউরেনিয়াম থেকে ইউরেনিয়াম-235 আলাদা করবার জন্যে ভারতে একটি গ্যাস সেন্ট্রিফিউজ প্ল্যান্ট তৈরি করবার প্রস্তুতি চলছে।

পরমাণু-বোমা বা পরমাণু-বিদ্যুৎ, যা-ই উৎপাদন করা হোক না কেন, ইউরেনিয়াম-235-এর উপযোগিতাই বেশী।

পৃথিবীর প্রথম সেনট্রিফিউজ কারখানাটি বৃটেন, পশ্চিম জার্মেনী ও হল্যাণ্ড যুক্তভাবে গোপনে তৈরি করেছে। ভারতের পরমাণু-শক্তি কমিশনের চেয়ারম্যান ডক্টর বিক্রম সরাভাই বলেছেন—ভারতের বিপুল সংখ্যক বিজ্ঞানী ও ইঞ্জিনীয়ার এই বৃহৎ কর্মকাণ্ডে নিযুক্ত রয়েছেন। পরমাণু-বিজ্ঞানের সর্বাধুনিক ও সর্বাপেক্ষা জটিল পরিকল্পনা নিয়ে তাঁরা এগিয়ে যাচ্ছেন।

ভারতবর্ষ যদি কোন সময়ে পরমাণু-বোমা তৈরি করতে ইচ্ছুক হয়, তবে এই পরিকল্পিত কারখানা হাতের কাছেই থাকবে। নিখাদ ইউরেনিয়াম-235-এর জন্যে তাকে অপরের মুখাপেক্ষী হতে হবে না। স্বল্প ব্যয়ে পরমাণু-বিদ্যুৎ উৎপাদন করাও তখন সম্ভব হবে।

ব্যয় হ্রাসের কথা চিন্তা করেই ভারতবর্ষ সেন্ট্রিফিউজ কারখানা স্থাপনে উদ্যোগী হয়েছে। এখান থেকে যে নিখাদ ইউরেনিয়াম তৈরি হবে, তা পরমাণু-বিদ্যুৎ চুল্লীর ব্যয়ও অনেকটা কমিয়ে দেবে।

তারাপুরের প্রথম পরমাণু-চুল্লীর জন্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে নিখাদ ইউরেনিয়াম আমদানী করতে হয়েছিল, কিন্তু রাজস্থানে রাণা প্রতাপ সাগর বা তামিলনাড়ুর কালাপাক্কামে প্রাকৃতিক ইউরেনিয়াম ব্যবহারের পরিকল্পনা রয়েছে।

ভারতের কেরল উপকূলে বিপুল পরিমাণ থোরিয়াম রয়েছে, তা পরমাণু-চুল্লীতে জ্বালানী হিসাবে ব্যবহারের জন্যে ফাস্ট ব্রীডার প্ল্যান্ট তৈরি করা হচ্ছে।

পরমাণু-চুল্লীতে নিউট্রন কণিকার সাহায্যে ইউরেনিয়াম-235 কণিকার প্রোটন-ইলেকট্রনের বন্ধন ছিন্ন হবার ফলে বেরিয়ে আসে প্রচণ্ড তাপ। পরমাণু-চুল্লীতে ইউরেনিয়াম-238 থেকে প্লুটোনিয়াম-239 পাওয়া যাবে। প্লুটোনিয়াম-239 বিভাজনযোগ্য তেজস্ক্রিয় পদার্থ।

1974 সালে ভারতের প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপণের সম্ভাবনা

নয়া দিল্লী থেকে ইউ. এন. আই কর্তৃক প্রচারিত সংবাদে প্রকাশ—ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থার চেয়ারম্যান ডক্টর বিক্রম সরাভাই সাংবাদিকদের বলেছেন যে, 1974 সালের মাঝামাঝি ভারতের নিজস্ব চেষ্টায় তৈরি ত্রিশ কিলোগ্রাম ওজনের কৃত্রিম উপগ্রহ মহাকাশে উৎক্ষেপণের সম্ভাবনা আছে।

চার শত কিলোমিটার উঁচুতে প্রায় বৃত্তাকার কক্ষপথে সেটি পৃথিবী প্রদক্ষিণ করা সুরু করবে। হায়দরাবাদের শ্রীহরিকোটা রকেট ঘাঁটি থেকে এই কৃত্রিম উপগ্রহ মহাকাশের দিকে উৎক্ষিপ্ত হবে।

1980 সাল নাগাদ ভারতের এক হাজার কিলোগ্রাম ওজনের কৃত্রিম উপগ্রহ মহাকাশে

উৎক্ষিপ্ত হবে—মহাকাশে 40 হাজার কিলোমিটার ঊর্ধ্বে এই উপগ্রহটি বিষুবরেখার উপর দিয়ে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করতে থাকবে।

একটি ক্ষুদ্র কৃত্রিম উপগ্রহ দিয়ে ভারতের মহাকাশ পরিক্রমার সূচনা হচ্ছে। ত্রিবান্দ্রমের কাছে মহাকাশ-গবেষণা ও প্রযুক্তিবিদ্যা-কেন্দ্রের ভারতীয় বিজ্ঞানীরা এই উপগ্রহের নক্‌শা তৈরি করেছেন।

দেশব্যাপী টেলিভিশন প্রচারের জন্যে ভারত যখন তার নিজস্ব যোগাযোগ ব্যবস্থায় মহাকাশে উপগ্রহ পাঠাবে, তখন সে আন্তর্মহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র নির্মাণের পদ্ধতিও আয়ত্ত করতে পারবে বলে মনে হয়।

1974 সালে যে কৃত্রিম উপগ্রহটি মহাকাশে পাঠানো হবে, সেটিকে বয়ে নিয়ে যাবে চার পর্যায়ের 20 টন ওজনের একটি রকেট। এতে কঠিন জ্বালানী ব্যবহৃত হবে। এই ধরণের রকেট উৎক্ষেপণের অভিজ্ঞতা অর্জন করবার পর শ্রীহরিকোটা থেকে শক্তিশালী দূরপাল্লার রকেট আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের উপর দিয়ে ভারত মহাসাগরে অস্ট্রেলিয়ার দুই হাজার কিলোমিটার দূরে ছুঁড়ে দেবার চেষ্টা করা হবে।

এসব রকেট ও কৃত্রিম উপগ্রহের গতিবিধির উপর লক্ষ্য রাখবার জন্যে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে শক্তিশালী রেডার স্থাপন করা হবে। থুম্বা থেকে আবহাওয়া রকেট উৎক্ষেপণ করে ভারতীয় ইঞ্জিনীয়ার ও বিজ্ঞানীরা রকেট প্রযুক্তিবিদ্যা আয়ত্ত করেছেন।

কৃত্রিম উপগ্রহবাহী রকেট ব্যবহারের উপযোগী কঠিন জ্বালানী তৈরির একটি বিরাট কারখানা শ্রীহরিকোটার কাছেই গড়ে তোলা হচ্ছে। রকেট ও কৃত্রিম উপগ্রহের গতিবিধির উপর নজর রাখবার উপযোগী অতি শক্তিশালী রেডার নির্মাণ কারখানা স্থাপনের পরিকল্পনাও রয়েছে।

পিব্‌কো এবং স্ল্যাগ উল

কিছুকাল আগে দুর্গাপুরের কাছে পিব্‌কো নামে একটি অভিনব শিল্প প্রতিষ্ঠান দেখবার সুযোগ আমাদের হয়েছিল। এই কারখানায় ভারতের মধ্যে প্রথম স্ল্যাগ উল প্রস্তুত হচ্ছে। আমরা জানি, লোহা বা তামা নিষ্কাশন করবার সময় প্রচুর পরিমাণ স্ল্যাগ বা ধাতুমল নির্গত হয়। এই ধাতুমল থেকে যে পশমতুল্য বস্তু প্রস্তুত হয়, তাই হচ্ছে স্ল্যাগ উল।

এই পিব্‌কো কারখানার প্রায় সমস্ত যন্ত্রপাতিই তৈরি করেছেন এদেশের যন্ত্রকুশলীরা। যন্ত্রপাতি তৈরির কাঁচামালও সংগৃহীত হয়েছে এদেশে। স্বনিয়ন্ত্রিত পদ্ধতিতে এখানকার সমস্ত কাজ চলে। প্রয়োজনীয় স্ল্যাগ পাওয়া যায় দুর্গাপুর ইস্পাত প্রকল্প থেকে। স্ল্যাগ উল তৈরির জন্যে এর সঙ্গে মেশানো হয় ফ্লুরোস্পার, চুন, কোক এবং অন্যান্য কয়েকটি সামগ্রী। চুল্লীর মধ্যে এই সমস্ত সামগ্রী প্রায় 600° ফারেনহাইট তাপমাত্রায় গরম করা হয়। তারপর সূক্ষ্ম সুতার মত সামগ্রী একটি কনভেয়ারের সাহায্যে আর একটি চুল্লীতে প্রবিষ্ট করানো হয়। এখানে সেই সুতার সঙ্গে মেশানো হয় রেজিন। চুল্লীর অপর প্রান্ত থেকে মাপমত কেটে স্ল্যাগ উলের গালিচা বেরিয়ে আসে। এই গালিচা দেখতে অনেকটা ডানলোপিলো রবারের প্যাডের মত, বেশ নরম ও হাল্কা।

আগে লোহা ও তামার কারখানার ধাতুমল রাস্তা তৈরির কাজে ও সিমেন্টের কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহৃত হতো। পিব্‌কো কারখানায় তার একটা নতুন উপযোগিতার ক্ষেত্র উন্মুক্ত হয়েছে। শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, শব্দরোধক ঘরবাড়ী ও বরফ তৈরির কারখানায় আজ স্ল্যাগ উলের যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। এছাড়া চুল্লী বা বিভিন্ন ধরণের বার্নারের প্রলেপ তৈরির কাজে হাত দিয়েছে পিব্‌কো। এই প্রলেপ উচ্চ তাপ প্রতি-

রোধে সাহায্য করবে। 1969 সালের সেপ্টেম্বরে এই কারখানাটি চালু হয়েছে। প্রাথমিক খরচের জন্যে যে অর্থ ব্যয় হয়েছে, তার মধ্যে 40 লক্ষ টাকা পাওয়া গেছে মার্কিন পি-এল 480-র অন্তর্ভুক্ত একটি তহবিল থেকে।

ঝরিয়া রজ্জু-পথের 25 বছর

কয়লা খনির আগুন নেবানোর কাজে বালির একান্ত প্রয়োজন। ঝরিয়া কয়লাখনি অঞ্চলে এই বালি সরবরাহ করা হয়ে থাকে রজ্জু-পথের মাধ্যমে। ঝরিয়া থেকে প্রায় 13 মাইল দূরে সাঁওতালডিহি অঞ্চলে দামোদর নদ থেকে ড্রেজারের সাহায্যে এই বালি সংগৃহীত হয়। প্রথমে নদীর গহ্বর থেকে সংগৃহীত বালি শুকিয়ে নেওয়া হয় এবং পরে বিশেষ এক ধরণের বাক্সের মত লোহার আধারে শুকনো বালি রজ্জুপথ দিয়ে ঝরিয়ায় নিয়ে যাওয়া হয়। মোট 1200টি আধার সমানে এই বালি বহনের কাজ করে যাচ্ছে এবং এদের প্রত্যেকটির গতিবেগ মিনিটে 600 ফুট। এক একটি বাক্সের বহনক্ষমতা তিন টনের মত। ভারতের কোল বোর্ড এবং মার্কিন সরকারের যুগ্ম প্রচেষ্টায় 25 বছর আগে 1945 সালে এই পথটি স্থাপিত হয়। এই প্রকল্পে মার্কিন সরকার ঋণস্বরূপ দিয়েছেন 5 কোটি 78 লক্ষ টাকা। এই রজ্জু-পথ স্থাপিত হবার ফলে ঝরিয়া অঞ্চলে কয়লার উৎপাদন বছরে প্রায় দেড় কোটি টনের মত বেড়ে গেছে।

বিজ্ঞপ্তি

সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর '70 মাসের 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' একত্রে শারদীয় সংখ্যারূপে সেপ্টেম্বর মাসের (1970) চতুর্থ সপ্তাহে প্রকাশিত হবে। সুতরাং শারদীয় 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' অক্টোবর মাসের (1970) প্রথম সপ্তাহে সভ্য ও গ্রাহকদের নিকট প্রেরিত হবে।

—স—

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস কর্তৃক পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-6 হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ 37/7 বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত

লেসার-পেন্সিল

ছবিতে পেন্সিলটির মুখ দিয়ে যে সূক্ষ্ম ও জোরালো লেসার-রশ্মির ধারা নির্গত হচ্ছে, তাই দিয়ে লেখবার কাজ করা হয়। ঐ ধারাটি প্রবাহিত হয়ে আসছে একটি বিশেষ ধরণের নমনীয় রজ্জুর মধ্য দিয়ে। লেসার থেকে নিঃসরিত আলোক-রশ্মির একটি সরু গুচ্ছ প্রবেশ করছে রজ্জুটির অপর প্রান্তে।

আলোকবাহী রজ্জুটি অনেকগুলি সূক্ষ্ম তন্তু দিয়ে গঠিত। রবার বা পলিথিনের পাইপের মধ্য দিয়ে যেমন জল প্রবাহিত হতে পারে, সেই রকম ঐ সব তন্তুর মাধ্যমে আলো এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নির্দিষ্ট পথে চালিত হতে পারে।

এক ধরণের বস্তুর বৈশিষ্ট্য হলো, তার উপর জোরালো আলো ফেললে আলোকিত অংশটি চিহ্নিত হয়ে যায়; এই ধরণের বস্তুর উপর লেসার-পেন্সিল দিয়ে লেখা হয়। সাধারণ পেন্সিলের লেখার মত এই লেখাকেও মুছে ফেলা যেতে পারে। কম্পিউটারের স্মৃতির মত যে সব যন্ত্রাংশে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সঞ্চিত করে রাখা প্রয়োজন, সে সব ক্ষেত্রে অদূর ভবিষ্যতে লেসার-পেন্সিলের প্রভূত প্রয়োগ হবে বলে বিজ্ঞানীরা আশা করছেন।

শারদীয়

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

ত্রয়োবিংশ বর্ষ সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, 1970 নবম-দশম সংখ্যা

নিবেদন

অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিভিন্ন রকমের গুরুতর সমস্যার সম্মুখীন হইবার ফলে আমাদের দেশের জনসাধারণ আজ বিপর্যস্ত ও বিভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। খাদ্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি, ক্রমবর্ধমান বেকারীত্ব এবং সর্বোপরি নিরাপত্তার অভাব আজ দেশের জনগণকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলিয়াছে। ইহার সুষ্ঠু সমাধান তো দূরের কথা, সঙ্কটের তীব্রতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধির দিকেই চলিয়াছে। ইহার ফলে জনসাধারণ একদিকে যেমন অর্থনৈতিক দুর্দশার চরম সীমায় উপনীত হইয়াছে, অপর দিকে তেমনই আবার শিল্প, বিজ্ঞান, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অগ্রগতিও ব্যাহত হইতেছে। জনসাধারণকে বিজ্ঞান-চেতনায় উদ্বুদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে প্রায় তেইশ বৎসর পূর্বে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বর্তমানে দেশের সঙ্কটজনক পরিস্থিতির ফলে এই সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানটিও আজ গুরুতর আর্থিক সঙ্কটের সম্মুখীন হইয়াছে। তথাপি 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে'র বিগত শারদীয় সংখ্যাগুলি জনসাধারণ কর্তৃক সাদরে গৃহীত হইবার ফলে অর্থকৃচ্ছ্রতা সত্ত্বেও এবারও আমরা গুরুতর আর্থিক দায়িত্বের ঝুঁকি লইয়া সরকার ও জনসাধারণের সাহায্য ও সহানুভূতি লাভের ভরসা করিয়াই সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর সংখ্যা দুইটিকে একত্রে শারদীয় সংখ্যারূপে প্রকাশ করিতে অগ্রসর হইয়াছি।

এই সংখ্যাটিতে বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের দ্বারা সরল ভাষায় লিখিত কতকগুলি রচনা সন্নিবেশিত হইয়াছে। অনুসন্ধিৎসু পাঠক-পাঠিকারা এইগুলি পাঠ করিয়া তাঁহাদের কৌতূহল মিটাইতে সক্ষম হইবেন বলিয়াই আশা করি। এতদ্ব্যতীত বৈজ্ঞানিক বিষয়ের প্রতি ছাত্র-ছাত্রীদের অধিকতর আকৃষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তরে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক বিষয়ের সংক্ষিপ্ত আলোচনা, ধাঁধা প্রভৃতি নানা বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে।

অন্যান্য বারের মত এই বারের শারদীয় সংখ্যাটিও সকলের নিকট সমাদর লাভ করিলে আমাদের শ্রম সার্থক বলিয়া মনে করিব।

উত্তম আবহাওয়ায় ভূপৃষ্ঠের উপর বৈদ্যুতিক পরিস্থিতি

সতীশরঞ্জন খাস্তগীর*

সূচনা

বিনামেঘে বজ্র বা বিদ্যুৎপাত হয় না। কিন্তু আকাশে যখন মেঘের কোনও ঘনঘটা থাকে না, অর্থাৎ ভূপৃষ্ঠের উপর আবহাওয়া যখন বেশ শান্ত ও স্থির থাকে, তখনও যে ভূপৃষ্ঠের উপর বৈদ্যুতিক বলের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়, বহু বছর আগেই বিজ্ঞানীরা তা জানতেন। ইং 1752 সনে ফরাসী বিজ্ঞানী Lemonnier সর্বপ্রথম উত্তম আবহাওয়ায় ভূপৃষ্ঠের উপর বৈদ্যুতিক বলের সন্ধান পেয়েছিলেন। নানাবিধ পরীক্ষার ফলে একথা আজ সর্বজনস্বীকৃত যে, উত্তম আবহাওয়ায় ভূপৃষ্ঠের উপর এক ঊর্ধ্বাধঃ বৈদ্যুতিক বল কাজ করে থাকে। একেই পজিটিভ বা ধনবাচক বৈদ্যুতিক বল বলা হয়। উত্তম আবহাওয়ায় এই ধনবাচক বৈদ্যুতিক বল বর্তমান থাকার অর্থ এই যে, এই অবস্থায় বায়ুমণ্ডলের উচ্চস্তরে কিছু পরিমাণ ধন-বিদ্যুৎ সঞ্চিত থাকে এবং একই পরিমাণ ঋণ-বিদ্যুৎ ভূপৃষ্ঠে আবিষ্ট থাকে। এই ধনবাচক ঊর্ধ্বাধঃ বৈদ্যুতিক বলের প্রভাবে বায়ুমণ্ডলে যদি কোনও ধন-বিদ্যুতের কণা থাকে, তবে তা উপর থেকে নীচে নেমে আসে, আবার বায়ুমণ্ডলে যদি কোনও ঋণ-বিদ্যুতের কণা থাকে, তবে তা নীচ থেকে উপরে উঠে যায়।

ভূপৃষ্ঠের উপর বৈদ্যুতিক বলের পরিমাণ

ভাল আবহাওয়ায় ভূপৃষ্ঠের উপর ঊর্ধ্বাধঃ বৈদ্যুতিক বলের পরিমাপ নানাভাবে করা যায়। এই সব বিভিন্ন পরীক্ষাবিধির বিবরণ ও আলোচনা এখানে সম্ভব নয়—শুধু পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে এই বৈদ্যুতিক বলের পরিমাণ যা নির্ণীত হয়েছে, তারই কিছু কিছু এখানে উল্লেখ করা যাবে। ইংল্যাণ্ডের কিউ মানমন্দিরে ভূপৃষ্ঠের উপর ঊর্ধ্বাধঃ বলের গড়পড়তা পরিমাণ প্রতি মিটারে 317 ভোল্ট। সুইট্জারল্যাণ্ডের ডাভোস-এর উপর ঊর্ধ্বাধঃ বৈদ্যুতিক বলের গড়পড়তা পরিমাণ প্রতি মিটারে 64 ভোল্ট। সমুদ্রের উপর ঊর্ধ্বাধঃ বৈদ্যুতিক বলের পরিমাণ গড়ে 126 ভোল্ট। সমুদ্রের উপর যে কোনও ভৌগোলিক অবস্থানে ঊর্ধ্বাধঃ বৈদ্যুতিক বলের পরিমাণ প্রায় সমানই দেখা যায়। উত্তম আবহাওয়ায় সমগ্র পৃথিবীর পৃষ্ঠে এই বৈদ্যুতিক বলের পরিমাণ প্রতি মিটারে প্রায় 120 ভোল্ট।

ঊর্ধ্বাধঃ বৈদ্যুতিক বলের দৈনিক, বার্ষিক ও অন্যান্য পরিবর্তন

ভাল আবহাওয়ায় ভূপৃষ্ঠে স্থলভূমির উপর ঊর্ধ্বাধঃ বৈদ্যুতিক বল দিন-রাত্রি মিলে 24 ঘণ্টায় কিভাবে পরিবর্তিত হয়, তা 1 নং চিত্রে প্রদর্শিত হলো। কিউ মানমন্দিরে দুটি পর্বের (1898-1915 এবং 1916-1928) গ্রীষ্মকালে নির্ণীত এই বৈদ্যুতিক বলের দৈনিক পরিবর্তন এই চিত্রে দেখানো হয়েছে। চিত্রে স্পষ্টই দেখা যায় যে, সকাল ও রাত্রি আটটা-ন'টায় ঊর্ধ্বাধঃ বৈদ্যুতিক বল সবচেয়ে বেশী, আর বেলা দুটা-তিনটায় ও ভোর রাত্রে ঐ একই সময়ে ঊর্ধ্বাধঃ বৈদ্যুতিক বল সবচেয়ে কম। 1921-1928 এই ক'বছরের গ্রীষ্মকালে প্রতি ঘনমিটার বাতাসে কয়লার গুঁড়া, ধোঁয়া, ধুলা-বালি প্রভৃতির জন্যে বায়ুমণ্ডলে

*বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন।

অবিশুদ্ধতার গড়পড়তা পরিমাণ দিনে-রাত্রে কিভাবে বাড়ে ও কমে, ইংরেজ বিজ্ঞানী Whipple তা নির্ধারণ করেছিলেন। অবিশুদ্ধতার এই দৈনিক পরিবর্তনের সঙ্গে ভূপৃষ্ঠের উপর উর্ধ্বাধঃ বৈদ্যুতিক বলের দৈনিক পরিবর্তনের আশ্চর্য সাদৃশ্য দেখা যায়। সকাল আটটা-ন'টায় প্রাতরাশের সময় যখন রান্নাঘরে উনুন ধরানো হয়, তখন ধোঁয়া ও কয়লার গুঁড়ার জন্যে বায়ুমণ্ডলে অবিশুদ্ধতার পরিমাণ বেশী হবারই কথা। পূর্বে পরিলক্ষিত হয়েছে। সুতরাং বলা যেতে পারে, বায়ুমণ্ডলে অবিশুদ্ধতার সঙ্গে ভূপৃষ্ঠের উপর উর্ধ্বাধঃ বৈদ্যুতিক বলের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। 2নং চিত্রে সামোয়া নামক স্থানে Sapsford (1937) কর্তৃক নির্ণীত উর্ধ্বাধঃ বৈদ্যুতিক বলের যে দৈনিক পরিবর্তন প্রদর্শিত হয়েছে, তাও কিউ মানমন্দিরে নির্ণীত উর্ধ্বাধঃ বৈদ্যুতিক বলের দৈনিক পরিবর্তনের অনুরূপ। সামোয়ার অধিবাসীদের মধ্যে প্রতি রবিবার সকালে প্রাতরাশের
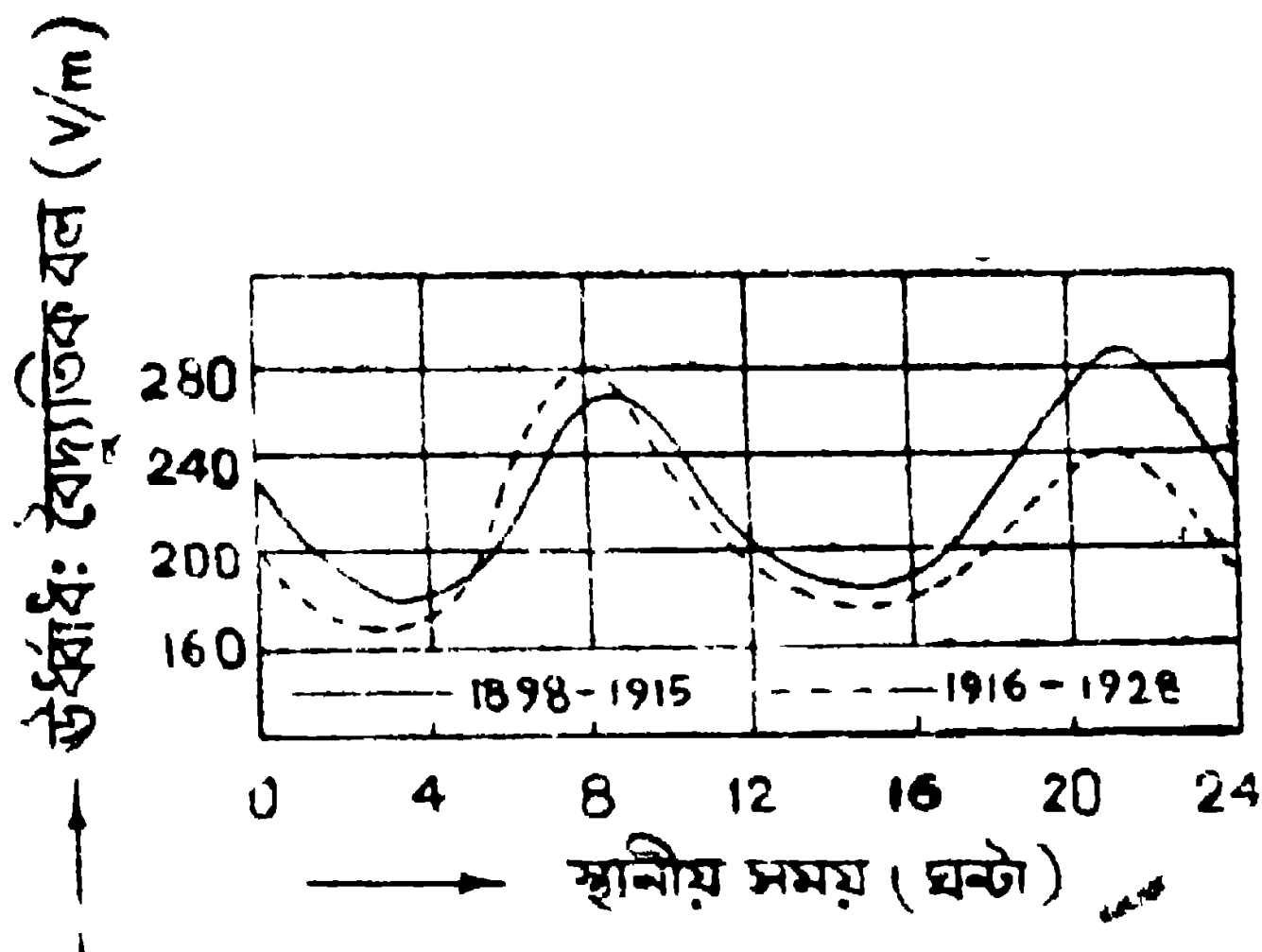
1নং চিত্র

কিউ (Kew) মানমন্দিরে নির্ণীত ভূপৃষ্ঠের উপর উর্ধ্বাধঃ বৈদ্যুতিক বলের দৈনিক পরিবর্তন।

......1898—1915 ......1916—1928

আবার রাত্রি আটটা-ন'টায় রাত্রির আহারের সময় এই একই কারণে বাতাসে অবিশুদ্ধতার পরিমাণ অধিক হবারই সম্ভাবনা। 1 নং চিত্রে আরও একটি বিশেষত্ব লক্ষ্য করবার বিষয়। অনেকেই জানেন গ্রেট বৃটেনে গ্রীষ্মকালে সব ঘড়ির কাঁটা দিনের আলো বেশী পাবার জন্যে এক ঘন্টা এগিয়ে দেওয়া হয়। 1916 সন থেকে এভাবে ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে দেবার ব্যবস্থা প্রচলিত হয়। 1 নং চিত্রে দেখা যাবে, উর্ধ্বাধঃ বৈদ্যুতিক বলের সর্বাধিক পরিমাণ 1916-'28 পর্বে (1898-1915 পর্বের তুলনায়) সকালে ও রাত্রে এক ঘন্টা সময় বিশেষ ঘটা করে আগুন জ্বালাবার প্রথা আছে। এই কারণেই ক-চিহ্নিত গ্রাফে 40টি রবিবারে ভূপৃষ্ঠের উপর উর্ধ্বাধঃ বৈদ্যুতিক বলের পরিমাণ সকাল আটটা-ন'টায় রাত্রের তুলনায় তিন গুণেরও বেশী দেখা যায়। খ-চিহ্নিত গ্রাফে রবিবার থেকে শনিবার পর্যন্ত 264 দিনের উর্ধ্বাধঃ বৈদ্যুতিক বলের গড়পড়তা পরিমাণ সকাল আটটা-ন'টায় অপেক্ষাকৃত অনেক কম।

বায়ুর অবিশুদ্ধতার সঙ্গে ভূপৃষ্ঠের উপর উর্ধ্বাধঃ বৈদ্যুতিক বলের সম্পর্ক কি, তা পরে আলোচিত হবে। উত্তম আবহাওয়ায় ভূপৃষ্ঠের উপর উর্ধ্বাধঃ

বলের দৈনিক পরিবর্তনের তাৎপর্য কি, তার তাত্ত্বিক ব্যাখ্যাও পরে দেওয়া হবে।

স্থানীয় সময়ের পরিবর্তে যদি Greenwich Mean Time (G.M.T.) অর্থাৎ গ্রীনউইচের গড়পড়তা সময়ের সঙ্গে ভূপৃষ্ঠের উপর উর্ধ্বাধঃ বৈদ্যুতিক বলের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়, তবে যে কোনও দেশে স্থলভূমি বা সমুদ্রের উপর কিভাবে বাড়ে ও কমে, 1929 সনে Whipple তা দেখিয়েছিলেন। বৈদ্যুতিক ঝড়ের সংখ্যা গ্রীনউইচের গড়পড়তা সময়ের সঙ্গে যেভাবে পরিবর্তিত হয়, সেই পরিবর্তনের সঙ্গে সমুদ্রের উপর উর্ধ্বাধঃ বৈদ্যুতিক বলের দৈনিক পরিবর্তনের মিল দেখা যায়। 3নং চিত্রে লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, সমুদ্রের উপর উর্ধ্বাধঃ বৈদ্যুতিক বল 04
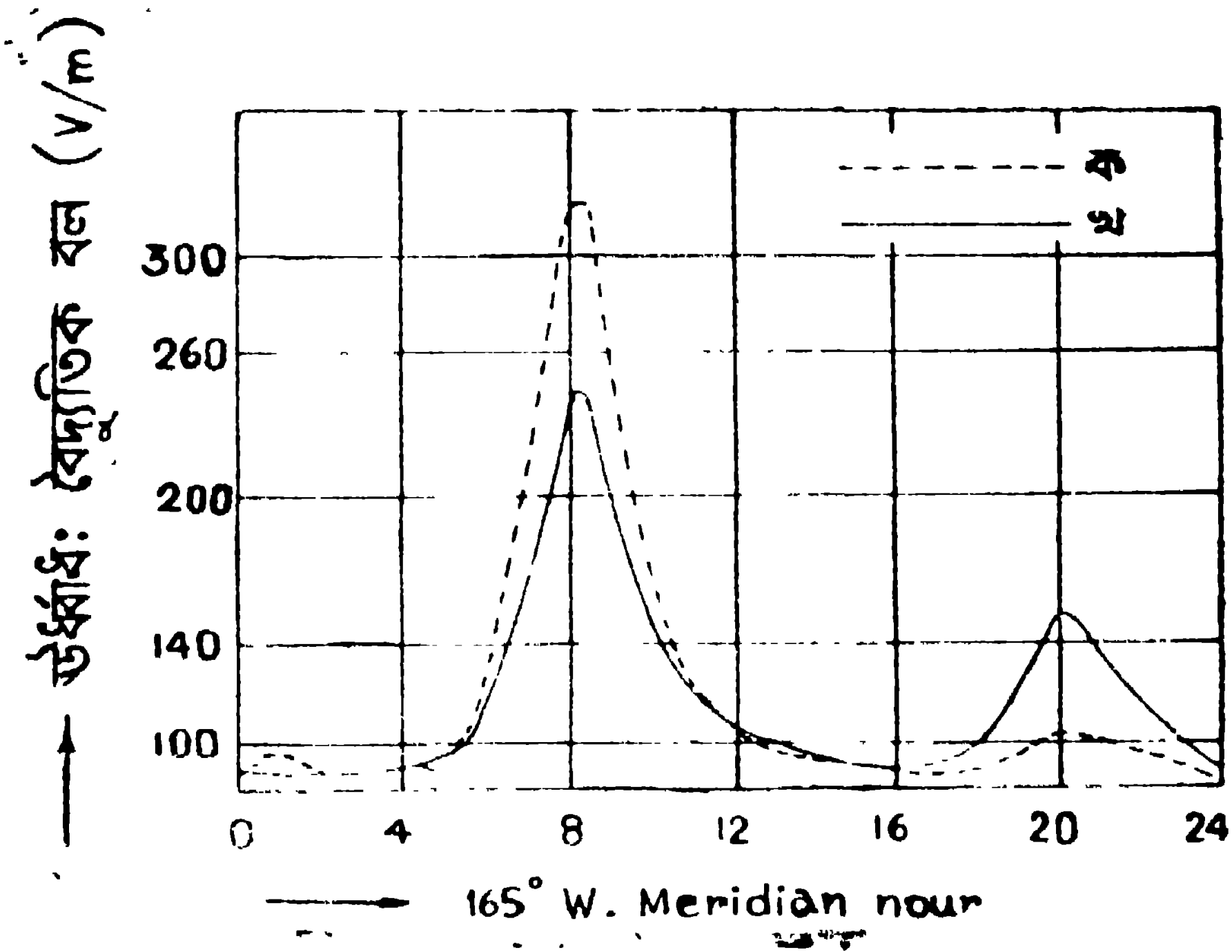
2নং চিত্র

সামোয়া নামক স্থানে Sapsford (1937) কর্তৃক নির্ণীত ভূপৃষ্ঠের উপর উর্ধ্বাধঃ বৈদ্যুতিক বলের দৈনিক পরিবর্তন। ক···40টি রবিবারের গড়পড়তা মূল্যায়ন, খ—রবিবার থেকে পরের শনিবার 264 দিনের গড়পড়তা মূল্যায়ন।
এখানে বলা প্রয়োজন যে, সামোয়ার অধিবাসীদের মধ্যে প্রতি রবিবার সকালে প্রাতরাশের সময় বিশেষ ঘটা করে আগুন জ্বালবার প্রথা আছে।

উর্ধ্বাধঃ বৈদ্যুতিক বল মোটামুটি একই ভাবে পর্যায়ক্রমে বাড়ে ও কমে। 3নং চিত্রে গ্রীনউইচের গড়পড়তা সময়ের সঙ্গে সমুদ্রের উপর উর্ধ্বাধঃ বৈদ্যুতিক বলের পরিবর্তন প্রদর্শিত হলো। গ্রীনউইচের গড়পড়তা সময়ের সঙ্গে সমগ্র পৃথিবীপৃষ্ঠে বৈদ্যুতিক ঝড়ের সংখ্যা GMT-ঘণ্টায় সবচেয়ে কম এবং প্রায় 20 GMT-ঘণ্টায় সবচেয়ে বেশী থাকে। পৃথিবীপৃষ্ঠে অত্যধিক বাজ ও বিদ্যুতের তিনটি অঞ্চল দেখা যায়; যথা—(1) ওলন্দাজ অধিকৃত ইস্ট ইণ্ডিজ (Dutch East Indies), (2) দক্ষিণ আফ্রিকা ও (3) দক্ষিণ আমেরিকা। সাধারণতঃ পৃথিবীর সর্বত্রই বিকাল

চারটায় (স্থানীয় সময়) বিজলি-ঝড়ের সংখ্যা সর্বাপেক্ষা বেশী দেখা যায়। স্থানীয় সময় চার ঘটিকা এই তিন অঞ্চলে 04 থেকে প্রায় 20 GMT-ঘণ্টার মধ্যেই পড়ে। সুতরাং 04 GMT-ঘণ্টা থেকে ভূপৃষ্ঠের উপর ঊর্ধ্বাধঃ বল বাড়তে থাকবে এবং প্রায় 20 GMT-ঘণ্টায় তা সবচেয়ে বেশী হবে।

3নং চিত্র

GMT—ঘণ্টার সঙ্গে সমুদ্রের উপর ঊর্ধ্বাধঃ বৈদ্যুতিক বলের পরিবর্তন।

উত্তম আবহাওয়ায় ভূপৃষ্ঠের উপর ঊর্ধ্বাধঃ বৈদ্যুতিক বল উত্তর ও দক্ষিণ উভয় গোলার্ধেই শীতকালে সবচেয়ে বেশী ও গ্রীষ্মকালে সবচেয়ে কম দেখা যায়। দক্ষিণ মেরু-অঞ্চলে এর ব্যতিক্রম লক্ষিত হয়। ঐ অঞ্চলে ঊর্ধ্বাধঃ বৈদ্যুতিক বল শীতকালে সবচেয়ে কম ও গ্রীষ্মকালে সবচেয়ে বেশী।

বায়ুমণ্ডলের বিদ্যুৎ-পরিবাহিতা

বাতাসের বিদ্যুৎ-পরিবাহিতা 1887 সনে বিজ্ঞানী Linns সর্বপ্রথম প্রমাণ করেন। 1899 সনে Elster ও Geitel এবং তার এক বছর পরেই বিখ্যাত পদার্থবিদ্ C. T. R. Wilson স্বাধীনভাবে দেখিয়েছিলেন যে, যাকে ধনাত্মক ও ঋণাত্মক আয়ন বলা হয়, এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিদ্যুৎসম্পন্ন কণাই বিদ্যুতের বাহকরূপে বায়ুমণ্ডলে বিদ্যুৎ-পরিবাহিতার সৃষ্টি করে। কি শক্তির প্রয়োগে ভূপৃষ্ঠের উপর বায়ুমণ্ডলের অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন আয়নিত হয়—এই বিষয়ের আলোচনায় ভূগর্ভস্থিত তেজস্ক্রিয় পদার্থের কথা কিছু বলতে হয়। তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে যে ধনাত্মক আল্‌ফা-কণা নির্গত হয়—তা হিলিয়াম পরমাণুর কোষ বলে প্রমাণিত হয়েছে। পৃথিবীর শিলামণ্ডল ভেদ করে ভূগর্ভের তেজস্ক্রিয় পদার্থগুলি থেকে আল্‌ফা কণাগুলি ভূপৃষ্ঠের উপর আসতে না আসতেই প্রায় নিঃশেষ হয়ে যায়। দেখা গেছে, আল্‌ফা-কণা ভূতলের কাছাকাছি কয়েক সেন্টিমিটার ঊর্ধ্ব পর্যন্ত বায়ুমণ্ডলকে আয়নিত করতে পারে মাত্র। ভূগর্ভের তেজস্ক্রিয় পদার্থগুলি থেকে বিটা-কণা (বা দ্রুতগামী ইলেকট্রন) এবং গামা-রশ্মি বায়ুমণ্ডলের উপাদানগুলিকে ভূতল থেকে প্রায় দুই কিলোমিটার ঊর্ধ্ব পর্যন্ত আয়নিত করে থাকে।

বায়ুমণ্ডলের অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরে যে সব

আয়ন দেখা যায়—তাদের আয়তন খুবই ছোট, কিন্তু ভূপৃষ্ঠের উপর উর্ধ্বাধঃ বৈদ্যুতিক বলের প্রভাবে এদের গতিবেগ অপেক্ষাকৃত অধিক। এদের 'ক্ষুদ্র' ও 'দ্রুত' আয়ন বলা হয়। এক সেন্টিমিটারে এক ভোল্ট বিভবে এদের গতিবেগ সেকেণ্ডে প্রায় দেড় সেন্টিমিটার। বায়ুমণ্ডলের নিম্নস্তরে কখনও কখনও আগুনে পোড়া বস্তুর ধোঁয়া, কয়লার গুঁড়া, ধূলা-বালি ও জলকণা ভাসমান থাকে। বায়ুমণ্ডল যখন আয়নিত হয়, তখন বিদ্যুৎসম্পন্ন 'ক্ষুদ্র' ও 'দ্রুত' আয়নগুলি বিদ্যুৎবিহীন এই সব অপেক্ষাকৃত বড় বড় বস্তুকণার সঙ্গে সংযুক্ত হয়। ফলে 'বৃহৎ' ও 'মন্থর' আয়নের সৃষ্টি হয়। প্রতি সেন্টিমিটারে এক ভোল্ট বিভবে এদের গতিবেগ 0·003-0·005 সেন্টিমিটার। পর্যবেক্ষণের ফলে জানা গেছে যে, ভূপৃষ্ঠে স্থলভূমির উপরিস্থিত বায়ুমণ্ডলে 'বৃহৎ' ও 'মন্থর' আয়ন, 'ক্ষুদ্র' ও 'দ্রুত' আয়নের তুলনায় অনেক গুণ বেশী। এর কারণ এই যে, ভূপৃষ্ঠে স্থলভূমির উপর আগুনে পোড়া বস্তুর ধোঁয়া, কয়লার গুঁড়া, ধূলা-বালি ইত্যাদি স্বভাবতঃই সমুদ্রের উপরের তুলনায় অনেক বেশী হয়ে থাকে। 'বৃহৎ' ও 'মন্থর' এবং 'ক্ষুদ্র' ও 'দ্রুত' আয়ন ছাড়াও বায়ুমণ্ডলে মধ্যম শ্রেণীর আয়নের সন্ধানও পাওয়া গেছে। এদের গতিবেগ এক সেন্টিমিটারে এক ভোল্ট প্রয়োগে 0·1—0·01 সেন্টিমিটার। বিভিন্ন গতিবেগসম্পন্ন আয়নের শ্রেণীবিভাগও আজ সম্ভব হয়েছে।

এখানে বলা প্রয়োজন—যেখানেই 'ক্ষুদ্র' ও 'দ্রুত' আয়নের আধিক্য দেখা যায়, সেখানেই আয়নের দ্রুত গতিবেগের জন্যে বিদ্যুৎ-পরিবাহিতা হয় বেশী, আর যেখানেই 'বৃহৎ' ও 'মন্থর' আয়নের প্রাচুর্য, সেখানেই আয়নের মন্থর গতির জন্যে বিদ্যুৎ-পরিবাহিতা হয় কম। বায়ুমণ্ডলের বিদ্যুৎ-পরিবাহিতা যদি বেশী হয়, তবে ভূপৃষ্ঠের উপর উর্ধ্বাধঃ বৈদ্যুতিক বল কমে যায়; আবার বিদ্যুৎ-পরিবাহিতা খুব কম হলে উর্ধ্বাধঃ বৈদ্যুতিক বল বৃদ্ধি পায়। পরে এই বিষয়টি আলোচিত হবে।

বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন উচ্চতায় ভূপৃষ্ঠের উপর উর্ধ্বাধঃ বৈদ্যুতিক বল ও বিদ্যুৎ-পরিবাহিতা একই সঙ্গে পরিমাপ করে দেখা গেছে যে, বায়ুমণ্ডলের যত উর্ধ্বে ওঠা যায়, ততই বিদ্যুৎ-পরিবাহিতা যায় বেড়ে এবং সেই অনুপাতে ভূপৃষ্ঠের উপর উর্ধ্বাধঃ বৈদ্যুতিক বলও যায় কমে। নীচের তালিকায় ভূপৃষ্ঠের উপর বিভিন্ন উচ্চতায় উর্ধ্বাধঃ বৈদ্যুতিক বল ও বিদ্যুৎ-পরিবাহিতার পরিমাণ জার্মান বিজ্ঞানী Wigand-এর 1925 সনের পরীক্ষার ফল থেকে আংশিকভাবে উদ্ধৃত করা গেল।

উচ্চতা (metre)	উর্ধ্বাধঃ বৈদ্যুতিক বল (volts/cm)	বিদ্যুৎ-পরিবাহিতা (e. s. u.)
0	136	$1·1 \times 10^{-4}$
2500	72	$4·3 \times 10^{-4}$
4400	18	$8·2 \times 10^{-4}$
6500	8·8	$12·6 \times 10^{-4}$

তালিকা থেকে স্পষ্টই দেখা যায়, বায়ুমণ্ডলের বিদ্যুৎ-পরিবাহিতা উচ্চতার সঙ্গে বৃদ্ধি পায় এবং উত্তম আবহাওয়ায় ভূপৃষ্ঠের উপর উর্ধ্বাধঃ বৈদ্যুতিক বলও সেই সঙ্গে অনেক কম হয়। বলা বাহুল্য, যদি ভূগর্ভস্থিত তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে নির্গত কণা ও বিকিরণ বায়ুমণ্ডলের আয়নিত অবস্থার একমাত্র কারণ হতো, তবে উচ্চতার সঙ্গে বায়ুমণ্ডলের বিদ্যুৎ-পরিবাহিতা ক্রমশঃ হ্রাস পেত, সন্দেহ নেই। কিন্তু উপরের তালিকায় দেখা যায় যে, বায়ুমণ্ডলের বিদ্যুৎ-পরিবাহিতা উচ্চতার সঙ্গে ক্রমশঃই বৃদ্ধি পায়। এই বৃদ্ধির কারণ মহাজাগতিক রশ্মি (Cosmic rays)। একথা আজ নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে যে, পৃথিবীর বাইরে নানা দিক থেকে মহাজাগতিক রশ্মি পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে এবং এই ভেদনশীল রশ্মির প্রভাবে বায়ুমণ্ডল আয়নিত অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

ইংল্যাণ্ডের বিজ্ঞানী Chalmers-এর সিদ্ধান্ত অনুসারে আনুমানিক 50 কিলোমিটার উর্ধ্বে বিদ্যুৎ-পরিবাহিতা এত অধিক যে, সেখানকার বায়ুস্তরকে সম-বিভবসম্পন্ন (Equipotential) বলা যেতে পারে। এই সম-বিভবসম্পন্ন স্তরটির নাম দেওয়া হয়েছে—তড়িৎমণ্ডল (Electrosphere)। এই স্তরটির বৈদ্যুতিক বিভব প্রায় 3×10^5 ভোল্ট। যাকে আমরা আয়নমণ্ডল (Ionosphere) বলি—তা তড়িৎমণ্ডল থেকে আরও উর্ধ্বে অবস্থিত। 80 থেকে 350 কিলোমিটার উর্ধ্ব পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরে এই মণ্ডলটি বিস্তৃত। এখানে বলা দরকার যে, ভূপৃষ্ঠের উপর উর্ধ্বাধঃ বৈদ্যুতিক বল আয়নমণ্ডলের উপর নির্ভর করে না। আয়নমণ্ডলের অনেক নীচে যে তড়িৎমণ্ডলের কথা উল্লেখ করা হলো—তার বৈদ্যুতিক বিভব এবং ভূতলের সন্নিকটস্থ বায়ুমণ্ডলের বিদ্যুৎ-পরিবাহিতাই ভূপৃষ্ঠের উপর অপেক্ষাকৃত নিম্ন বায়ুস্তরে উর্ধ্বাধঃ বৈদ্যুতিক বলকে নিয়ন্ত্রিত করে।

ভূতলের সন্নিহিত অঞ্চলে উর্ধ্বাধঃ বৈদ্যুতিক বলের তাত্ত্বিক মূল্যায়ন

পৃথিবীর বৈদ্যুতিক বিভব শূন্য ধরা হয়। তারই পরিপ্রেক্ষিতে তড়িৎমণ্ডলের বৈদ্যুতিক বিভব যদি V ভোল্ট হয় এবং ভূতলের এক বর্গমিটার প্রস্থচ্ছেদের উপর তড়িৎমণ্ডল পর্যন্ত উর্ধ্বাধঃ বায়ুস্তম্ভের রোধ যদি হয় R ওম্ (Ohm), তবে তড়িৎমণ্ডল ও ভূতলের মধ্যে প্রতি বর্গমিটার প্রস্থচ্ছেদে বিদ্যুৎ-প্রবাহ হবে—

$$i = \frac{V}{R} \text{ ampere} \cdots\cdots (1)$$

এবার ভূতলের সন্নিকটস্থ বায়ুমণ্ডলের কথা ধরা যাক। ভূতল থেকে এক মিটার উর্ধ্ব পর্যন্ত এক বর্গমিটার প্রস্থচ্ছেদের বায়ুস্তম্ভের রোধ যদি হয় r ওম্, তাহলে ভূতল থেকে এক মিটার উর্ধ্ব পর্যন্ত বায়ুস্তম্ভে উর্ধ্বাধঃ বৈদ্যুতিক বল হবে—

$$E = i\,r \text{ ভোল্ট/মিটার} \cdots\cdots (2)$$

সুতরাং 1নং সূত্র থেকে আমরা পাই—

$$E = \frac{Vr}{R} \text{ ভোল্ট/মিটার} \cdots\cdots (3)$$

এক মিটার উর্ধ্ব পর্যন্ত এক বর্গমিটার প্রস্থচ্ছেদের বায়ুস্তম্ভের রোধ (r) এবং এই নিম্ন অঞ্চলের বিদ্যুৎ-পরিবাহিতা (λ)—এই দু'য়ের পারস্পরিক সম্বন্ধ নিম্নলিখিত সংজ্ঞা থেকে পাওয়া যায়, যথা—

$$\lambda = \frac{1}{r} \cdots\cdots\cdots\cdots (4)$$

3 ও 4 নং সূত্রের সাহায্যে ভূতলের সন্নিহিত অঞ্চলে উর্ধ্বাধঃ বৈদ্যুতিক বল নিম্নলিখিতভাবে লেখা যেতে পারে—

$$E = \frac{V}{R\lambda} \text{ ভোল্ট/মিটার} \cdots\cdots (5)$$

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, উত্তম আবহাওয়ায় V ও R-এর প্রত্যেকটির পরিমাণ মোটামুটিভাবে সমান ধরা যেতে পারে। সুতরাং যখনই ভূতলের সন্নিকটস্থ বায়ুস্তরের বিদ্যুৎ-পরিবাহিতা (λ) বাড়ে বা কমে, 5নং সূত্র অনুসারে ভূতলের সন্নিহিত অঞ্চলে উর্ধ্বাধঃ বৈদ্যুতিক বল কমে বা বাড়ে।

1নং চিত্রে কিউ মানমন্দিরে নির্ণীত উত্তম আবহাওয়ায় ভূপৃষ্ঠে স্থলভূমির উপর বৈদ্যুতিক বলের দৈনিক পরিবর্তন প্রদর্শিত হয়েছে। চিত্রে দেখা যায় যে, সকাল ও রাত্রি আটটা-ন'টায় এই বৈদ্যুতিক বল সর্বাপেক্ষা বেশী এবং বেলা দুটা-তিনটায় ও ভোর রাত্রে ঐ একই সময়ে উর্ধ্বাধঃ বৈদ্যুতিক বল সর্বাপেক্ষা কম হয়। কেন এমন হয়, তার ব্যাখ্যা 5নং সূত্র থেকে সহজেই পাওয়া যায়।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, সকাল ও রাত্রি আটটা-ন'টায় রান্নাঘরের ধোঁয়া, কয়লার গুঁড়া প্রভৃতি বেশী থাকে বলে এই সময়ে নিম্ন বায়ুস্তরে 'বৃহৎ' ও 'মন্থর' আয়নের সংখ্যা হয় অপেক্ষাকৃত

অধিক। আবার অপরাহ্নে ও শেষ রাত্রে বায়ুমণ্ডলে অবিশুদ্ধতার পরিমাণ কম থাকায় সেই সময়ে ‘ক্ষুদ্র’ ও ‘দ্রুত’ আয়ন-সংখ্যা অপেক্ষাকৃত বেশী দেখা যায়। একথাও পূর্বে বলা হয়েছে যে, যেখানেই ‘দ্রুত’ আয়নের আধিক্য, সেখানেই আয়নের দ্রুতগতির জন্যে বায়ুমণ্ডলের বিদ্যুৎ-পরিবাহিতা হয় বেশী। আবার যখনই ‘মন্থর’ আয়নের প্রাচুর্য, তখনই আয়নের মন্থর গতির জন্যে বায়ুমণ্ডলের বিদ্যুৎ-পরিবাহিতা হয় কম। কাজে কাজেই প্রাতরাশ ও রাত্রির আহারের সময়, যখন বায়ুমণ্ডলে ধোঁয়া, কয়লার গুঁড়া প্রভৃতি বেশী এবং ‘মন্থর’ আয়নের সংখ্যাই অধিক হবার সম্ভাবনা, তখন বায়ুমণ্ডলের বিদ্যুৎ-পরিবাহিতা হ্রাস পায়। ফলে 5নং সূত্র অনুসারে প্রাতরাশ ও রাত্রির আহারের সময়ে উর্ধ্বাধঃ বৈদ্যুতিক বলের বৃদ্ধি লক্ষিত হয়। আবার অপরাহ্নে ও শেষ রাত্রে বায়ুমণ্ডলে ‘দ্রুত’ আয়নের আধিক্য থাকায়, বায়ুমণ্ডলের বিদ্যুৎ-পরিবাহিতা হয় বেশী। সুতরাং 5নং সূত্র অনুযায়ী অপরাহ্নে ও শেষরাত্রে উর্ধ্বাধঃ বৈদ্যুতিক বলের হ্রাস দেখা যায়।

উত্তম আবহাওয়ায় বায়ুমণ্ডলের উপর থেকে ভূতলে বিদ্যুৎ-প্রবাহ এবং উর্ধ্বাধঃ বৈদ্যুতিক বলের প্রণষ্টির সম্ভাবনা

উত্তম আবহাওয়ায় উর্ধ্বাধঃ বৈদ্যুতিক বলের প্রভাবে বায়ুমণ্ডলের ধনাত্মক আয়নগুলি উপর থেকে নীচে ভূতলের দিকে নেমে আসে এবং ঋণাত্মক আয়নগুলি ভূতল থেকে উপরের দিকে উঠতে থাকে। এই আয়ন-চলাচলের ফলে বায়ুমণ্ডলের উপর থেকে নীচে ভূতলের দিকে বৈদ্যুতিক কারেন্ট বা বিদ্যুৎ-প্রবাহের সৃষ্টি হয়। পরীক্ষার ফলে জানা গেছে যে, এই বিদ্যুতের পরিমাণ এক সেন্টিমিটার চৌকোয় প্রায় 3×10^{-16} অ্যাম্পিয়ার। পৃথিবীর ব্যাসার্ধ প্রায় 6×10^{3} কি. মি.; সুতরাং সমগ্রভাবে ভূতলে বিদ্যুৎ-প্রবাহের পরিমাণ প্রায় 1500 অ্যাম্পিয়ার। এখানে বলা দরকার যে, জলবিন্দু, শিলা প্রভৃতির অধঃক্ষেপের ফলে বিদ্যুৎ-প্রবাহের পরিমাণ প্রায় 300 অ্যাম্পিয়ার। এই অতিরিক্ত বিদ্যুৎ-প্রবাহ যদি যোগ করা যায়, তবে সমগ্র ভূপৃষ্ঠে বিদ্যুৎ-প্রবাহের মোট পরিমাণ 1800 অ্যাম্পিয়ার। এই পরিমাণ বিদ্যুৎ-প্রবাহ ভূপৃষ্ঠে এসে পৌঁছুবার অনতিকাল পরেই বায়ুমণ্ডলের উচ্চস্তরে সঞ্চিত ধন-বিদ্যুৎ ও সমগ্র ভূতলে একই পরিমাণের ঋণ-বিদ্যুৎ বিনষ্ট হয়ে যাবার কথা; অর্থাৎ খুব অল্প সময়ের মধ্যেই উর্ধ্বাধঃ বৈদ্যুতিক বলের বিলুপ্তি হবার সম্ভাবনা। মোটামুটি পাঁচ মিনিটের মধ্যে ভূপৃষ্ঠের উপর উর্ধ্বাধঃ বৈদ্যুতিক বলের যে অবসান হবে, তা সহজেই হিসাব করা যায়। কিন্তু আমরা জানি, উত্তম আবহাওয়ায় ভূপৃষ্ঠের উপর উর্ধ্বাধঃ বৈদ্যুতিক বলের বিলোপ লক্ষিত হয় না। এর কারণ কি—এবার তারই সংক্ষিপ্ত আলোচনা করে প্রবন্ধটি শেষ করবো।

উত্তম আবহাওয়ায় ভূপৃষ্ঠের উপর উর্ধ্বাধঃ বৈদ্যুতিক বলের সংরক্ষণ

1925 সনে Brookes-এর গণনা অনুসারে সমগ্র পৃথিবীতে বজ্র ও বিদ্যুৎসহ ঝড়ের সংখ্যা চব্বিশ ঘন্টায় প্রায় 44,000। যদি ধরা যায়, একরকম প্রতিটি বৈদ্যুতিক ঝড় গড়পড়তা এক ঘন্টা ধরে চলে, তবে যে কোনও মুহূর্তে পৃথিবীর সর্বত্র বৈদ্যুতিক ঝড়ের সংখ্যা হবে মোটামুটি আঠারো শত। এখন যদি মনে করা যায় যে, এক-একটি বিদ্যুৎ ঝলকে 20 কুলম্ব্ (Coulomb) ঋণ-বিদ্যুতের ক্ষরণ হয় এবং যদি ধরা যায় যে, এক মিনিটে তিনটি ঝলক দেখা যায়, তবে পৃথিবীর পৃষ্ঠে ঋণ-বিদ্যুতের প্রবাহ হবে $\frac{1800\times20\times3}{60}$ অর্থাৎ 1800 অ্যাম্পিয়ার। সুতরাং বলা যেতে

পারে যে, পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে বিদ্যুৎপাতের ফলে প্রায় 1800 অ্যাম্পিয়ারের ঋণ-বিদ্যুতের প্রবাহ সমগ্রভাবে পৃথিবীপৃষ্ঠে নেমে আসে। সমগ্র ভূপৃষ্ঠে এই পরিমাণ ঋণ-বিদ্যুৎপাতের জন্যেই, পৃথিবীর যে সকল স্থানে উত্তম আবহাওয়া দেখা যায়, সেই সকল স্থানে উর্ধ্বাধঃ বৈদ্যুতিক বল মোটামুটিভাবে সংরক্ষিত হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বিদ্যুৎপাতের ফলে যদি সমগ্রভাবে ভূতলে ঋণ-বিদ্যুতের সমাবেশ না হতো, তবে যে সকল স্থানে উত্তম আবহাওয়া, সেই সকল স্থানে উর্ধ্বাধঃ বৈদ্যুতিক বল বায়ুমণ্ডলের উচ্চ স্তর থেকে ভূতলে বিদ্যুৎ-প্রবাহের ফলে যে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই নিঃশেষিত হয়ে যেত, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

"সর্ব্বদা শুনিতে পাওয়া যায় যে, আমাদের দেশে যথোচিত উপকরণবিশিষ্ট পরীক্ষাগারের অভাবে অনুসন্ধান অসম্ভব। এই কথা যদিও অনেক পরিমাণে সত্য, কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ সত্য নহে। যদি ইহাই সত্য হইত তাহা হইলে অন্য দেশে, যেখানে পরীক্ষাগার নির্ম্মাণে কোটি মুদ্রা ব্যয়িত হইয়াছে, সেই স্থান হইতে প্রতিদিন নূতন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইত। কিন্তু সেরূপ সংবাদ শুনা যাইতেছে না। আমাদের অনেক অসুবিধা আছে, অনেক প্রতিবন্ধক আছে সত্য, কিন্তু পরের ঐশ্বর্য্যে আমাদের ঈর্ষা করিয়া কি লাভ? অবসাদ ঘুচাও। দুর্ব্বলতা পরিত্যাগ কর। মনে কর আমরা যে অবস্থাতে পড়ি না কেন, সেই আমাদের প্রকৃষ্ট অবস্থা। ভারতই আমাদের কর্ম্মভূমি, এখানেই আমাদের কর্ত্তব্য সমাধা করিতে হইবে। যে পৌরুষ হারাইয়াছে, সে-ই বৃথা পরিতাপ করে।

পরীক্ষাসাধনে পরীক্ষাগারের অভাব ব্যতীত আরও বিঘ্ন আছে। আমরা অনেক সময় ভুলিয়া যাই যে, প্রকৃত পরীক্ষাগার আমাদের অন্তরে। সেই অন্তরতম দেশেই অনেক পরীক্ষা পরীক্ষিত হইতেছে। অন্তরদৃষ্টিকে উজ্জ্বল রাখিতে সাধনার প্রয়োজন হয়। তাহা অল্পেই ম্লান হইয়া যায়। নিরাসক্ত একাগ্রতা যেখানে নাই, সেখানে বাহিরের আয়োজনও কোন কাজে লাগে না। কেবলই বাহিরের দিকে যাহাদের মন ছুটিয়া যায়, সত্যকে লাভ করিবার চেয়ে দশজনের কাছে প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য যাহারা লালায়িত হইয়া উঠে, তাহারা সত্যের দর্শন পায় না। সত্যের প্রতি যাহাদের পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা নাই, ধৈর্য্যের সহিত তাহারা সমস্ত দুঃখ বহন করিতে পারে না; দ্রুতবেগে খ্যাতিলাভ করিবার লালসায় তাহারা লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া যায়। এইরূপ চঞ্চলতা যাহাদের আছে, সিদ্ধির পথ তাহাদের জন্য নহে। কিন্তু সত্যকে যাহারা যথার্থ চায়, উপকরণের অভাব তাহাদের পক্ষে প্রধান অভাব নহে। কারণ দেবী সরস্বতীর যে নির্ম্মল শ্বেতপদ্ম, তাহা সোনার পদ্ম নহে, তাহা হৃদয়-পদ্ম।"

আচার্য জগদীশচন্দ্র

প্লাজ্‌মা ও বিপরীত জগৎ

সূর্যেন্দুবিকাশ কর*

সাধারণ ও বিপরীত পদার্থ

পৃথিবীর পদার্থসমূহের মোটামুটি গঠন-বিন্যাস আমাদের অজানা নয়। অণু, পরমাণু, নিউক্লিয়াস কিভাবে গড়ে উঠেছে, আবার কোটি কোটি আলোক-বছর পরিধিবিশিষ্ট বিশ্ব-ছায়াপথ (Meta-galaxy), যা বহু ছায়াপথের সমবায়ে গঠিত এবং আমাদের ছায়াপথ, ছোট-বড় নক্ষত্র, গ্রহ-উপগ্রহ সবই পৃথিবীর পদার্থ দিয়ে গড়া—এই হলো বিজ্ঞানীদের ধারণা। এই ধারণা নিয়েই সৃষ্টিতত্ত্বের বনিয়াদ গড়ে উঠেছে—বিশ্ব-রহস্যের সমাধান করবার চেষ্টা চলেছে। সোজাসুজি এই সব চিন্তা-ভাবনায় বিপরীত পদার্থকণা (Anti-matter) পজিট্রন, বিপরীত প্রোটন (Anti-proton), বিপরীত নিউট্রন (Anti-neutron) উড়ে এসে জুড়ে বসলো—ফলে সবই তো নতুন করে ভাবতে হচ্ছে। অবশ্য এগুলির আবিষ্কার হবার পর পদার্থ-বিজ্ঞানে প্রতিসাম্যের প্রত্যাশিত নিয়মটি দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হলো। ধন ও ঋণ আধানের মধ্যে যখন প্রতিসাম্য রয়েছে, তখন ঋণ আধানের শুধু হাল্কা ইলেকট্রন অথবা ধন আধানের শুধু ভারী প্রোটন হবে কেন? পজিট্রন ও বিপরীত প্রোটন পদার্থ-জগতের এই অসাম্য দূর করলো। প্রতিসাম্যের খাতিরে তাহলে বিপরীত পদার্থও তো থাকা উচিত! Goldhaber-এর বিপরীত ডয়টেরন আবিষ্কারের পর এই ধারণা দৃঢ়তর হয়েছে। বিপরীত প্রোটন ও বিপরীত নিউট্রনের সমবায়ে তৈরি হয়েছে বিপরীত ডয়টেরন। এগুলি সবই আবিষ্কৃত হয়েছে আমাদের পৃথিবীতে, যেখানে সব কিছুই সাধারণ পদার্থ (Koinomatter) দিয়ে গড়া। আমাদের পদার্থ-জগতে স্বভাবতঃই এই সব বিপরীত পদার্থ অস্থায়ী আগন্তুক। সাধারণ পদার্থের বিন্দুমাত্র সংঘাতে এই সব বিপরীত পদার্থকণা মিলিয়ে গিয়ে শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। নানা কলাকৌশলের মাধ্যমে এদের কিছুটা পরিচয় পাওয়া গেছে। আর একটু এগিয়ে আমরা ভাবতে আরম্ভ করেছি—বিপরীত প্রোটন ও পজিট্রনের সমবায়ে বিপরীত হাইড্রোজেন পরমাণু—এমন কি, বিপরীত নিউট্রন সহযোগে আরো ভারী ভারী সব বিপরীত মৌলিক পদার্থ তৈরি হতে পারে। এখনই তৈরি করা সম্ভব না হলেও প্রতিসাম্যের খাতিরে এই রকম বিপরীত পদার্থের সৃষ্টি সম্ভব। এরকম বিপরীত পদার্থের বিপরীত জগৎ (Anti-world) বিশ্বের কোথাও থাকতে পারে। আমাদের বর্তমান বিজ্ঞানের কলাকৌশলে তা ধরা পড়বার কোন সম্ভাবনা আছে কি? ধরা যাক, নক্ষত্র-জগতের অর্ধেক বাসিন্দাই বিপরীত পদার্থে তৈরী। অনেক নক্ষত্রই চুম্বকধর্মী—ফলে সেই সব নক্ষত্রের বর্ণালীরেখা জিম্যান-ক্রিয়ায় (Zeeman effect) ফলে বিভক্ত হয়। এখন কোন নক্ষত্রের জিম্যান বর্ণালীর দিক নির্ণয় করে নক্ষত্রটি বিপরীত পদার্থ দিয়ে গড়া হলে তার দক্ষিণ মেরু পৃথিবীর দিকে থাকবে, বলা যেতে পারে। কারণ এই বর্ণালী ইলেকট্রন ও পজিট্রনের বেলায় হবে পরস্পর বিপরীতমুখী। কিন্তু কোন্ নক্ষত্র পৃথিবীর দিকে তার উত্তর মেরু অথবা দক্ষিণ মেরু প্রসারিত করে রেখেছে, তা মাপবার কোন উপায় নেই। যদি নক্ষত্র-জগতের মধ্যবর্তী মহাকাশ শূন্য হয়, তবু সাধারণ ও বিপরীত নক্ষত্রের

* সাহা ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স, কলিকাতা—9

আলোতে কোন পার্থক্যই আমরা দেখতে পাব না।

ফলে বিপুল বিশ্বজগতের কিছুটা যে বিপরীত জগৎ হবে না, একথা আমরা হলফ করে বলতে পারি না। অবশ্য আমাদের পৃথিবী যে সাধারণ পদার্থ দিয়ে গড়া, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই; কেবল অল্পমাত্রায় আমরা কিছু এই সব অপার্থিব বিপরীত পদার্থ তৈরি করেছি মাত্র। তাছাড়া আরও কিছু কিছু বিপরীত মৌলিক কণার সন্ধানও আমরা পেয়েছি। না—চাঁদেও বিপরীত পদার্থ নেই, তার প্রমাণ তো চন্দ্র-অভিযাত্রীরা হাতে হাতে দিয়েছেন। সূর্যও সাধারণ পদার্থ দিয়ে গড়া। তা না হলে সূর্য থেকে বিচ্ছুরিত প্লাজ্‌মা থেকে আমরা যে অরোরা বোরিয়ালিস দেখতে পাই, তার জ্যোতি আরও হাজার গুণ বেড়ে যেত —বিপরীত প্লাজ্‌মা ও পার্থিব বস্তুর সংঘাতে। এই সৌর প্লাজ্‌মা বুধ, শুক্র, মঙ্গল প্রভৃতি গ্রহেও পৌঁছয়। সেখানে কোন অঘটন ঘটে না—তা-থেকে সূর্য যে বিপরীত পদার্থ দিয়ে গড়া নয়, তা প্রমাণিত হয়। আর যে সূর্য থেকে গ্রহগুলির সৃষ্টি হয়েছে—সেই গ্রহগুলিও যে বিপরীত জগৎ নয়, তা সহজেই ধরা যায়।

এখন পর্যন্ত যে সব উল্কাপিণ্ড পাওয়া গেছে, তার কোনটাই বিপরীত জগতের টুক্‌রা নয়। ফলে বিপরীত জগতের সম্ভাবনার প্রসঙ্গ মনে হবে রূপকথার মত। তবে Libby অনুমান করেছিলেন, 1908 সালে সাইবেরিয়ায় যে উল্কাটি পড়েছিল, সেটি বোধ হয় বিপরীত পদার্থের টুক্‌রা। এই অনুমান যেমন বতিল করা হয় নি, তেমনি প্রমাণিতও হয় নি। ফলে বিপরীত জগৎ যবনিকার অন্তরালেই রয়ে গেছে। তবু বিজ্ঞানীরা প্রতিসাম্যের পরিপ্রেক্ষিতে বিপরীত জগতের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখছেন। সাধারণ জগৎ ও বিপরীত জগৎ মুখোমুখি থাকতে হলে তার সীমারেখা অথবা প্রান্তিক জগৎ কি রকম হবে, তা ভেবে দেখছেন।

ধরা যাক—নক্ষত্র-জগতের মধ্যবর্তী স্থান শূন্য নয়, সেখানে ছড়িয়ে আছে প্লাজ্‌মা অর্থাৎ প্রোটন ও ইলেকট্রনের মুক্ত অঞ্চল। প্লাজ্‌মা হলো পদার্থের বায়ব, তরল ও কঠিন—এই তিন অবস্থার বাইরে তার চতুর্থ অবস্থা। সাধারণ জগতের প্রান্তে যেমন সাধারণ প্লাজ্‌মা (Koino-plasma) থাকবে, তেমনি বিপরীত জগতের কাছাকাছি জায়গায়ও থাকবে বিপরীত প্লাজ্‌মা (Anti-plasma)। এতে মুক্ত বিপরীত প্রোটন ও পজিট্রনের মেলা। তাহলে সাধারণ জগৎ ও বিপরীত জগতের মধ্যবর্তী স্থানে সাধারণ প্লাজ্‌মা ও বিপরীত প্লাজ্‌মার সংঘাতে কি অবস্থার সৃষ্টি হবে? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বিপরীত জগতের অস্তিত্ব সম্পর্কে উজ্জ্বল সম্ভাবনার আভাস দিয়েছেন Alfven ও Klein প্রমুখ বিজ্ঞানীরা।

মহাকাশ ও প্লাজ্‌মা

সম্পূর্ণ আয়নিত পদার্থ, যাতে ইলেকট্রন-প্রোটনের সমষ্টি ছাড়া নিরপেক্ষ পদার্থ থাকে না—কিছুটা ঐ রকম পদার্থ থাকলে তাকে আংশিক প্লাজ্‌মা বলে। কোন বায়বীয় পদার্থ উত্তপ্ত হলে আয়নিত হয় উত্তাপ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে—কোন কোন অবস্থায় 5000°—10,000° ডিঃ সেন্টিগ্রেড তাপ-মাত্রায় আবার কখনো আরো বেশী তাপমাত্রায় সম্পূর্ণ আয়নিত বায়বীয় প্লাজ্‌মার রূপ নেয়। আয়ননের সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য আয়ন ও ইলেকট্রনের পুনর্মিলনের সম্ভাবনা থাকে। প্লাজ্‌মার সাম্যাবস্থা হলো তখন, যখন আয়নন ও পুনর্মিলনের মাত্রা সমান সমান দাঁড়ায়।

বিশ্বজগতে নক্ষত্রগুলির তাপমাত্রা যথেষ্ট, তাই সম্পূর্ণ না হলেও নক্ষত্রপৃষ্ঠ আংশিক প্লাজ্‌মা সন্দেহ নেই। তাদের অভ্যন্তর ভাগ অবশ্যই পূর্ণাঙ্গ প্লাজ্‌মা, কারণ সেখানে তাপমাত্রা আরো বেশী। ছায়াপথে মধ্যবর্তী শূন্য স্থানগুলিও

কিন্তু আংশিক প্লাজ্‌মার ভর্তি, অবশ্য ঘনত্ব নক্ষত্র-দেহ থেকে অনেক কম—এক ঘনমিটারে প্রায় একটি পরমাণু। এই হাল্কা ঘনত্বের প্লাজ্‌মা, যা মহাকাশকে আবৃত করে রেখেছে, বিপরীত জগতের চাবিকাঠি কিন্তু তাতেই রয়েছে—বিজ্ঞানীরা তাই মনে করেন। মহাকাশে ব্যাপ্ত রয়েছে অতি ক্ষীণ চৌম্বক ক্ষেত্র। তার পরিমাণ 10^{-5} বা 10^{-6} গউসের মত অর্থাৎ পৃথিবীর নিজস্ব চৌম্বক ক্ষেত্রের এক হাজার ভাগের এক ভাগ মাত্র। কিন্তু এই ক্ষীণ চৌম্বক ক্ষেত্রই মহাকাশের হাল্কা প্লাজ্‌মার ধর্ম অর্থাৎ তার গতিবিধি বহুলাংশে নিয়ন্ত্রণ করে। প্লাজ্‌মা হলো আহিত কণিকার সমষ্টি. চুম্বকীয় শক্তিতে এই কণিকাগুলি কুণ্ডলী পাকিয়ে চলে। এই কুণ্ডলীর পরিধি যেমন ইলেকট্রন আর প্রোটনের বেলায় তফাৎ—আবার কণার শক্তির উপরও নির্ভরশীল—চুম্বকীয় শক্তির উপরও বটে। আবার প্রোটন ও ইলেকট্রনের ক্ষেত্রে এই গতিবিধির দিকও বিপরীত-মুখী। মহাকাশে সর্বত্রই যে সমান চৌম্বক ক্ষেত্র থাকতে পারে, তাও সম্ভব নয়। ফলে এই কুণ্ডলীর পরিধি কখনো বিস্তৃততর আবার কখনো সঙ্কীর্ণ হওয়াই সম্ভব। আবার বিভিন্ন চৌম্বক ক্ষেত্রগুলির দিকও বিরাট মহাকাশে একমুখী না হয়ে বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে থাকবার সম্ভাবনাই বেশী। ফলে কোন প্লাজ্‌মা-কণাই মহাকাশে চৌম্বক বলরেখার সমান্তরাল নয়—তাই তাদের কুণ্ডলী পাকিয়েই চলতে হবে। সোজাসুজি না গিয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে চলবার ফলে একটি নক্ষত্রদেহ থেকে আর একটি নক্ষত্রদেহে কোন কণিকার স্থানান্তর সম্ভব নয়। অবশ্য কণিকার শক্তি যদি খুব বেশী হয়, যার ফলে মহাকাশে তার কুণ্ডলীর ব্যাস নক্ষত্র দুটির দূরত্ব থেকেও বেশী, তবেই এই স্থানান্তর সম্ভব। কিন্তু সেই শক্তির (প্রায় 10^{14} ইলেকট্রন ভোল্ট) কণিকা থাকবার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। কোন বৃহদাকারের মহাকাশযান মহাকাশের এই ক্ষীণ চৌম্বক ক্ষেত্র ও হাল্কা প্লাজ্‌মার কোন অনুভূতিই পেতে পারে না, অথচ এই দুইয়ে মিলে আন্তর্নাক্ষত্রিক কণা চলাচলের পক্ষে এক দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর সৃষ্টি করে রেখেছে। এক ছায়াপথ থেকে অন্য ছায়াপথের বেলায়ও ঠিক একই নিয়ম খাটে।

বিপরীত প্লাজ্‌মা ও উভপ্লাজ্‌মা

এখন দেখা যাক, দুটি নক্ষত্রের বেলায় কি ঘটে? ধরা যাক, একটি নক্ষত্র সাধারণ ও আর একটি নক্ষত্র বিপরীত পদার্থ দিয়ে গঠিত। ফলে সাধারণ নক্ষত্রের চারদিকে থাকবে সাধারণ প্লাজ্‌মা আর বিপরীত নক্ষত্রের চারদিকে থাকবে বিপরীত প্লাজ্‌মা অর্থাৎ মুক্ত বিপরীত প্রোটন ও পজিট্রন। ক্রমশঃ এই সাধারণ ও বিপরীত প্লাজ্‌মার ঘনত্ব ক্রমশঃ দূরত্ব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কমে আসবে। তার পর এক জায়গায় নিশ্চয়ই সাধারণ ও বিপরীত প্লাজ্‌মা মিলে যাবে। কিন্তু মিলবে কি করে? প্রোটন ও বিপরীত প্রোটন মিললেই তো তাদের ধ্বংস অনিবার্য। তার ফলে হবে কতকগুলি মেসনের সৃষ্টি, যাদের পরিণতি হলো গামা-রশ্মি, নিউট্রিনো আর ইলেকট্রন-পজিট্রনে। প্লাজ্‌মার নিজস্ব ইলেকট্রন, পজিট্রনও তো রয়েছে! যাহোক, সাধারণ ও বিপরীত প্লাজ্‌মা অর্থাৎ যেখানে সাধারণ ও বিপরীত পদার্থের মিলনস্থল—বিজ্ঞানীরা তার নাম দিয়েছেন উভ-প্লাজ্‌মা (Ambiplasma)। এই উভপ্লাজ্‌মাই হলো সাধারণ জগৎ ও বিপরীত জগতের সেতুবন্ধ। সে প্রসঙ্গে আসবার আগে উনবিংশ শতাব্দীতে Leidenfrost নামে একজন জার্মান বিজ্ঞানীর একটি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারের কথা বলা প্রয়োজন। আবিষ্কারের বিষয়টি জানবার আগে অবশ্য একটি সাধারণ পরীক্ষা রান্নাঘরেই করা যেতে পারে। একটি গরম ধাতুপাত্র নিয়ে তাতে এক ফোঁটা জল রাখুন। প্রায় 100° সেঃ তাপমাত্রার উর্ধ্বে এই বিন্দুটি সঙ্গে সঙ্গে হিস্‌হিস্ শব্দ করে উবে যাবে। আরো একটু তাপমাত্রা বাড়ালে দেখা যাবে,

জলবিন্দুটি উবে যাবার সঙ্গে সঙ্গে যেন একটু বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যাচ্ছে। এখন যদি কয়েক শত ডিগ্রীতে তুলে ঐ লাল্‌চে পাত্রটির উপর জল-বিন্দু ফেলা যায়, তাহলে দেখা যাবে বিন্দুটি সঙ্গে সঙ্গে উবে যাচ্ছে না। পাঁচ মিনিটের উপরও এই বিন্দুটিকে টিকিয়ে রাখা যেতে পারবে—যদিও তা একটু এদিক-ওদিক আলোড়িত হবে মাত্র। ক্রমশঃ বিন্দুটির আয়তন কমতে কমতে এক সময় উবে যাবে। অবশ্য হঠাৎ যদি পাত্রটির তাপমাত্রা কমিয়ে ফেলা যায়, তাহলে বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গেই বিন্দুটির বিলুপ্তি ঘটবে। লীডেনফ্রস্টের আবিষ্কার হলো এই জলবিন্দুর উবে যাওয়া নিয়ে। তাঁর মতে, বিন্দুটি উবে যাবার আগে একটি বাষ্পের স্তর পাত্র ও বিন্দুটির মধ্যে একটি অপরিবাহী স্তরের সৃষ্টি করে। ফলে পাত্রের তাপ বিন্দুটির উপর ধীরে ধীরে সঞ্চালিত হয়। পাত্রের উচ্চ তাপমাত্রা অনুযায়ী আরো পুরু বাষ্পস্তরই শুধু জলবিন্দুর উবে যাওয়া বিলম্বিত করতে পারে। 100° সেঃ তাপমাত্রার সামান্য উর্ধ্বে এই বাষ্পস্তর এতই পাত্‌লা যে, খুব তাড়াতাড়ি তাপ সঞ্চালিত হয়ে জলবিন্দুটি তাড়াতাড়ি উবে যায়।

ঠিক একই রকম ব্যাপার ঘটতে পারে সাধারণ ও বিপরীত প্লাজ্‌মার বেলায়। এদের মিলনস্থলে লিডেনফ্রস্ট-স্তরের অনুরূপ একটি স্তর সাধারণ ও বিপরীত পদার্থের বিলুপ্তিকে বিলম্বিত করবে। প্রথম দিকে এই বিলোপজনিত শক্তিই সীমান্ত স্তরগুলিকে অতি উচ্চ মাত্রায় উত্তপ্ত করে তুলবে। তখন সাধারণ ও বিপরীত প্লাজ্‌মার বিলোপ সাধন আরো বিলম্বিত হবে। ক্রমশঃ একটি স্থায়ী লিডেন-ফ্রস্ট-স্তর সাধারণ ও বিপরীত প্লাজ্‌মার প্রান্তরেখায় একটি বাধার প্রাচীর তৈরি করে এদের মিলন, তথা বিলুপ্তিকে আটকে রাখবে। হিসাবে দেখা যায় যে, এরকম স্তরের বিস্তৃতি হবে $\frac{1}{1000}$ আলোক-বছর।

লিডেনফ্রস্ট-স্তর ও বেতার-তরঙ্গ

এখন উত্তপ্লাজ্‌মার কথায় আসা যাক। উভপ্লাজ্‌মাতেই তো লিডেনফ্রস্ট-স্তরের অস্তিত্ব। আগেই বলা হয়েছে—বিপরীত প্রোটন ও প্রোটন থেকে শেষ পর্যন্ত ইলেকট্রন-পজিট্রন তৈরি হয়। গামা বা নিউট্রিনো চৌম্বক ক্ষেত্রের বাধা না মেনে মহাকাশে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু যে ইলেকট্রন-পজিট্রন থেকে যায়, তাদের শক্তি প্রায় 10^{12} ডিঃ তাপমাত্রার সমকক্ষ। এত তাপমাত্রায় কোন বায়বীয় বা প্লাজ্‌মা উত্তেজিত হলে তার চাপ বেড়ে যায় ও প্রসারিত হয়ে পড়ে। এখন উভ-প্লাজ্‌মার সাধারণ ও বিপরীত প্লাজ্‌মার প্রাথমিক বিলোপজনিত শক্তিতে উত্তপ্ত প্লাজ্‌মার প্রসারণের ফলে একে অপরকে বিকর্ষণ করে। ফলে এরা আর পরস্পরের সংস্পর্শে আসতে পারে না। উভপ্লাজ্‌মায় এই ভাবে তৈরি হয় একটি বাধার স্তর, যাকে আমরা লিডেনফ্রস্ট-আবিষ্কৃত অপরিবাহী বাষ্পস্তরের সঙ্গে তুলনা করতে পারি।

উভপ্লাজ্‌মা যে শুধু গামা ও নিউট্রিনোর উৎস, তা নয়, কিছুটা শক্তি হ্রস্ব বেতার-তরঙ্গের আকারেও সেখানে সৃষ্ট হবে। সাধারণ ও বিপরীত জগতের সীমারেখার অস্তিত্ব ধরতে হলে আমাদের এই বেতার-তরঙ্গের সাহায্য নিতে হবে। তার কারণ, নিউট্রিনোর কোন যন্ত্রে ধরা পড়বার কথা নয়। আবার গামা-রশ্মি ধরবার চেয়ে এই সব বেতার-তরঙ্গ ধরবার সুবিধা বেশী। ফলে সাধারণ ও বিপরীত জগতের মধ্যবর্তী এই বিচিত্র স্তরটির বেতার-তরঙ্গ যন্ত্রের সাহায্যে ধরা পড়লে তবেই বিপরীত জগতের অস্তিত্ব আমরা খুঁজে পাব। অনেক বেতার-নক্ষত্র (Radio star) ধরা পড়েছে, যারা এই সব বেতার-তরঙ্গ অনবরত পাঠিয়ে চলেছে। দুই বিপরীত জগতের প্রান্তদেশ যে এরকম একটি বেতার-নক্ষত্র নয়, তাই-ই বা কে বলতে পারে? বিপরীত জগতের অস্তিত্ব আজও আমাদের অজানা—পদার্থের চতুর্থ অবস্থা প্লাজ্‌মাই বুঝি এই জগতের চাবিকাঠি লুকিয়ে রেখেছে। কে জানে—হয়তো ভবিষ্যতে এর সমাধান খুঁজে পাওয়া যাবে।

বাংলা দেশে মাছের চাষ

শ্রীখগেন্দ্রনাথ দাস

সে আজ অনেক দিনের কথা—কয়েক জন বিত্তশালী ব্যক্তি বাংলা দেশে জমিদারীর ব্যবস্থা গ্রহণ করিলেন এবং বিভিন্ন স্থান হইতে মনোমত ব্যক্তিদের আহ্বান করিয়া তাঁহাদের জমিতে স্থাপন করিলেন। এই সকল প্রজার সুখ-সুবিধার প্রতি জমিদারদের বিশেষ লক্ষ্য ছিল। তাঁহারা প্রজাদের ধর্মানুষ্ঠানের জন্য মন্দির ও মসজিদ প্রতিষ্ঠা, পথ চলিবার জন্য প্রশস্ত রাস্তা নির্মাণ করিতে ছোট-বড় অনেক পুষ্করিণী, ডোবা ও জলাশয়ের সৃষ্টি হয়। বর্ষাকালে নদীর জল বৃদ্ধি পাইলে ছোট নদী বা নালা দিয়া জল এই সকল পুষ্করিণীতে প্রবেশ করিত এবং সঙ্গে সঙ্গে মাছের চারাও আসিয়া বড় হইতে থাকিত। ইহার ফলে প্রজাদের পরে অনেক লাভ হইত। সেই জন্য অনেক স্থানে বর্ষার পূর্বে মাছের লোভে পুকুরের পাড় কাটিয়া জল

1নং চিত্র
নাগারী ট্যাঙ্কের দৃশ্য। সম্মুখে হাপায় চারা মাছ।

নির্মাণ ও পানীয় জল সরবরাহের জন্য স্থানে স্থানে পুষ্করিণী খনন করিয়া জনহিতকর কার্য করিতেন। ক্রমে বসতি বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে পুষ্করিণীর সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এতদ্ব্যতীত নীচু জমি ভরাট করিবার জন্য ও পল্লীকে বন্যার কবল হইতে রক্ষা করিবার প্রয়োজনে বাঁধ আসিবার পথ তৈয়ার করা হইত। নদীবহুল পূর্ববঙ্গে (পূর্ব পাকিস্তানে) কোন কোন স্থানে এইরূপ ব্যবস্থা এখনও প্রচলিত আছে।

মাছ খাওয়া বা মাছের চাষ করা পূর্বে সমাজের নিম্ন শ্রেণীর লোকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে স্বীকৃত হইল যে,

আমাদের খাদ্যের একটা প্রধান উপাদান প্রোটিন মাছের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে রহিয়াছে এবং যখন চিকিৎসকগণ রোগীদের পথ্য হিসাবে মাছ খাওয়া সুপারিশ করিলেন, তখন লোক দলে দলে মাছ খাইতে ও মাছের চাষ করিতে লাগিল। ক্রমে মাছের চাষ বিশেষ লাভজনক শিল্প বলিয়া প্রমাণিত হইলে অভিজাত সম্প্রদায়েরও অনেকে মৎস্য-চাষে প্রবৃত্ত হন। মৎস্য-চাষ ও মৎস্য-ব্যবসায় তখন আর অসম্মানজনক শিল্প বলিয়া বিবেচিত হইত না। পরে বিজ্ঞানের সহায়তায় শহর প্রতিষ্ঠিত হইবার পর জমিদার ও বিত্তশালী ব্যক্তিরা পল্লীগ্রাম ত্যাগ করিলে এবং পানীয় জলের জন্য পল্লীগ্রামে টিউব ওয়েল স্থাপিত হইলে পুষ্করিণী ও অন্যান্য জলাশয়গুলি যত্ন ও সংস্কারের অভাবে ব্যবহারের অযোগ্য হইয়া পড়ে। এখনও অনেক পুষ্করিণী ও জলাশয় অনাবাদী হইয়া পড়িয়া আছে। পুষ্করিণী ও অন্যান্য জলাশয়গুলি অনাবাদী থাকিবার প্রধান কারণ —(1) মৎস্য-চাষের বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞানের অভাব, (2) সংস্কারের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের অভাব এবং (3) যৌথ অধিকারীদের পরস্পরের মধ্যে মতানৈক্য। উপযুক্ত মৎস্য-বীজের অভাবও অনেক সময় লাভজনক মৎস্য-চাষের অন্তরায় হইয়া থাকে।

2নং চিত্র

রেলগাড়ীতে খোলা হাঁড়ির মধ্যে করিয়া চারা মাছের চালান।

আমরা অনেক রকম মিঠাজলের মাছ খাইয়া থাকি, তাহাদের সবগুলিই লাভজনক মাছের চাষের উপযোগী নয়। যে মাছ তাড়াতাড়ি বাড়ে, দেখিতে সুশ্রী ও খাইতে সুস্বাদু, যে সকল মাছ মৎস্যভুক নয় এবং মৎস্য-শিকারীদের পক্ষে আনন্দদায়ক, সেই সকল মাছের চাষই লাভজনক। রুই, কাৎলা, মৃগেল ও কালবোস প্রভৃতি মাছ এই সকল গুণের অধিকারী। কিন্তু কুর্চি বাটা, খড়্কে বাটা, ভাঙন বাটা, সরল পুঁটি, মৌরলা প্রভৃতি পুকুরের মাছ অনেকের কাছে লোভনীয় হইলেও সেগুলি ব্যবসায়ের পক্ষে তেমন লাভজনক নয়। কই, মাগুর, শোল, শাল প্রভৃতি মাছ অনেকের

প্রিয় হইলেও ইহারা মৎসভুক মাছ বলিয়া ব্যবসায়ের উপযোগী নয়। এই সকল মাছের দুই রকমের শ্বাসযন্ত্র থাকিবার ফলে ইহারা জলের বাহিরে অনেকক্ষণ বাঁচিয়া থাকিতে পারে। এইগুলি জাওলা মাছ নামে পরিচিত। ইহারা বিস্তীর্ণ অগভীর জলাভূমি ও বিল এলাকায় বিচরণ করে। ইহাদের পুকুরে রাখিয়া পালন করিলে বর্ষার সময় মাটির উপর দিয়া এক পুকুর হইতে অন্য পুকুরে চলিয়া যাইতে পারে। ইলিশ মাছও অনেকের প্রিয় খাদ্য, কিন্তু আসলে ইহারা অগভীর সমুদ্রের মাছ। বর্ষাকালে ডিম ছাড়িবার সময় মিঠাজলের নদীতে প্রবেশ করিবার কালে এবং সমুদ্রে ফিরিয়া যাইবার পথেও কতকগুলি মাছ জালে ধরা পড়ে। ইলিশ মাছ খুবই স্পর্শকাতর, জল হইতে তুলিলেই ইহারা মরিয়া যায়। ইলিশের চারা সতর্কভাবে আনিয়া পুষ্করিণীতে রাখিলেও অধিকাংশই মরিয়া যায় এবং অবশিষ্টগুলি বড় হইলেও খাইতে তেমন সুস্বাদু হয় না।

রুই, কাৎলা মৃগেল ও কালবোস মাছকে ইংরেজীতে বলা হয় Indian major carp, বাংলায় আমরা পোনামাছ বলিয়া থাকি। কিন্তু কয়েক বৎসর হইল পোনামাছের মত দেখিতে Common carp নামে এক প্রকার বিদেশী মাছকে বাংলা দেশে আনা হইয়াছে। এই মাছগুলি বাংলার জলাশয়গুলিতে স্থিতিলাভ করিয়াছে এবং কলিকাতার বাজারে আমেরিকান রুই নামে বিক্রীত হইতেছে। আসলে ইহারা মালয় দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসী। এই মাছগুলির বিশেষত্ব হইল—ইহারা বদ্ধ পুষ্করিণীতেও বৎসরে দুই-তিন বার ডিম ছাড়ে। ডিম হইতে বাচ্চা বাহির হইবার পর পুষ্করিণীতে সামান্য জলজ উদ্ভিদের প্রয়োজন হয়। আমরা এই মাছকে কার্পিও বলিব। কারণ ইহার আসল নাম Cyprinus carpio—আমেরিকান রুই নামটি গৌরবাত্মক। ঐরূপ Tilapia নামে আফ্রিকার একজাতীয় মাছকে কলিকাতার বাজারে আমেরিকান কই বলিয়া আখ্যা দেওয়া হয়। এমন একদিন ছিল, যখন যাহা কিছু ভাল তাহার নামকরণ গৌরবে 'বিলাতি' শব্দ যোগে করা

3নং চিত্র
প্লেনে চারা পোনার টিন বোঝাই।

হইত, যথা—বিলাতি আমড়া, বিলাতি বেগুন ইত্যাদি—যদিও ঐ আমড়া ও বেগুন বিলাত হইতে আমদানী করা নয়।

ভারতীয় পোনামাছ বদ্ধ জলাশয়ে ডিম ছাড়ে না। স্ত্রী-মাছ পূর্ণ পরিপক্ব হইবার পর বর্ষাকালে উপযুক্ত নদীর অগভীর কিনারায় ডিম ছাড়ে এবং পূর্ণ পরিপক্ব পুরুষ সেখানে গিয়া ডিমগুলিকে নিষিক্ত করে। নিষিক্ত ডিমের মধ্যে মৎস্য-ভ্রূণ বড় হইয়া কতকটা মাছের আকার ধারণ স্থানে আশ্রয় না পাইলে লোনা খাড়ির জলের সংস্পর্শে আসিয়া মরিয়া যায়।

আর এক উপায়ে পোনামাছের ডিমপোনা পাওয়া যায়। মেদিনীপুর ও বাঁকুড়া জেলায় বড় বড় ঘেরা পুষ্করিণী (যেগুলিকে বাঁধ বলা হয়) মৎস্য প্রজননের প্রসিদ্ধ স্থান। ঐ বাঁধগুলিকে অর্দ্ধকৃত্রিম উপায়ে নদীর পরিবেশে পরিণত করা হয় এবং পরিপক্ব স্ত্রী-মাছকে ডিম ছাড়িতে ও পুরুষ মাছকে ডিম নিষিক্ত করিতে উত্তেজিত করা হয়। পরে

4নং চিত্র

টিনে অক্সিজেন দিয়া চারামাছ বোঝাই করা হইতেছে।

করে এবং ডিম হইতে বাহির হইয়া আসে। এইগুলিকে ডিমপোনা (Spawn) বলা হয়। ইহারা উদরের থলিতে সঞ্চিত খাদ্য (Yolk) গ্রহণ করিয়া তিন দিন পর্যন্ত বাঁচিয়া থাকিতে পারে। ডিমপোনা বন্যার স্রোতে নীচের দিকে আসিয়া ডিমধরা বেহুন্দী জালে (Spawn collecting or shooting net) ধরা পড়ে। ডিমপোনা দৈর্ঘ্যে প্রায় 4·6 মি মিঃ হইতে 6·2 মি মিঃ হইয়া থাকে এবং ডিমপোনার বাজারে আসে। ডিমপোনা জালে ধরা না পড়িলে বা নদীর মধ্যে নিরাপদ নিষিক্ত ডিমকে আপাতে (Hatchery) রাখিয়া ডিমপোনা পাইতে হয়।

আর এক কৃত্রিম উপায়ে পোনামাছের ডিম পাওয়া যায়। ইহার নাম প্রয়োচিত প্রজনন (Induced breeding)। ইহাতে পরিপক্ব পোনামাছকে পিটুইটারি গ্ল্যাণ্ডের রস ইঞ্জেকশন করিয়া স্ত্রী-মাছকে ডিম ছাড়িতে ও পুরুষ মাছকে ডিম নিষিক্ত করিতে বাধ্য করা হয়। শেষোক্ত উপায়টি সম্পূর্ণ কার্যকরী করিতে পারিলে বাংলা দেশের মৎস্য-চাষের জন্য প্রয়োজনীয় মৎস্য-বীজের

কোন অভাব থাকিবে না। এই ব্যাপারে এখনও গবেষণা চলিতেছে।

পোনামাছের ডিমপোনা লইয়া মাছের চাষ করিতে তিন রকম পুকুরের প্রয়োজন হয়; যথা—নার্শারি ট্যাঙ্ক (Nursery tank), রিয়ারিং ট্যাঙ্ক (Rearing tank) এবং ষ্টকিং ট্যাঙ্ক (Stocking tank)। তৈয়ারী নার্শারিতে ডিমপোনা দিয়া চারাপোনা (Fry) উৎপাদন করিতে হয়। রিয়ারিং ট্যাঙ্কে চারাপোনা দিয়া চালাপোনা (Fingerling) এবং ষ্টকিং ট্যাঙ্কে চালাপোনা দিয়া বিক্রয়োপযোগী বড় মাছ উৎপাদন করিতে হয়। এই সকল পুষ্করিণীকে সম্যকভাবে কার্যকরী করিবার জন্ত পুষ্করিণীতে উপযুক্ত সার প্রয়োগ করিলে প্রয়োজনীয় মৎস্য-খাদ্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। পুষ্করিণীগুলিকে, বিশেষতঃ নার্শারি ও রিয়ারিং ট্যাঙ্কগুলিকে কয়েক বৎসর অন্তর শুষ্ক করিয়া দিলে তাহাদের উৎপাদন-ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

মৎস্য-চাষের সাফল্য নির্ভর করে পুষ্করিণীর যোগ্যতা বিবেচনা করিয়া তাহার জন্ত উপযুক্ত মৎস্য-বীজ সংগ্রহ করা। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়

5নং চিত্র
কাত্‌লা মাছ (Catla catla)

6নং চিত্র
রুই মাছ (Labeo rohita)

যে, গভীর পুষ্করিণী যাহার পাড়গুলি বেশ খাড়াই, কিনারায় কম গভীর বিচরণ ক্ষেত্রের অভাব, এরূপ পুষ্করিণী সাধারণতঃ রুই মাছের পক্ষেই উপযুক্ত, কিন্তু ইহাতে কাত্‌লার চারাপোনা দিলে খুব বেশী ভাল ফল পাওয়া যায় না। মৎস্য-বীজ পরিবহনের ব্যর্থতাও অনেক সময় মৎস্য-চাষের উৎসাহ ক্ষুণ্ণ করিয়া দেয়। অনেক জায়গায় খোলা হাঁড়িতে করিয়া মাছের চারা সরবরাহ করা হয় এবং হাঁড়ির সঙ্গে লোক থাকিবার প্রয়োজন হয়, কিন্তু দূরের পথে লইয়া যাইবার সময় অনেক মাছের চারা মরিয়া যায়। এখন মৎস্য-পরিবহনের এক অভিনব উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে, যাহাতে মৎস্য-বীজ বদ্ধ অবস্থায় কম পক্ষে 40 ঘণ্টার পথও জীবন্ত অবস্থায় পৌঁছান সম্ভব। এই ব্যবস্থায় আর একটি সুবিধা এই যে, টিনের বাক্সের মধ্যে অ্যালকাথিন ব্যাগের ভিতর জল, মাছ ও অক্সিজেন দিয়া সম্পূর্ণরূপে বদ্ধ করিবার পর পার্শেলের মত (কোন লোকের উপস্থিতি ছাড়াই) এক সঙ্গে অনেকগুলি টিন রেল বা প্লেনযোগে চালান দেওয়া যায়। বলা বাহুল্য জীবন্ত মৎস্য-বীজ চালান দিবার ব্যাপারে এই ব্যবস্থা আজ সারা দেশে অনুসৃত হইতেছে।

7নং চিত্র
মৃগেল মাছ (Cirrhina mrigala)

তিন প্রকারে মৎস্য-চাষ হইতে পারে ; যথা—(1) ব্যক্তিগত মৎস্য-চাষ (Private Fish-farming), (2) সমবায় পদ্ধতিতে মৎস্য-চাষ (Co-operative Fish-farming) ও (3) রাষ্ট্রীয় পদ্ধতিতে মৎস্য-চাষ (State Fish-farming)। নিজস্ব পদ্ধতিতে কোন কোন মৎস্য-চাষী সীমাবদ্ধ সঙ্গতি ও চিরাচরিত জ্ঞানের সাহায্যে মাছের চাষ করিয়া থাকে। চাষীরা সহজে কোন নূতন জিনিষ গ্রহণ করিতে চায় না, তবে সর্বদা একাগ্রতার সহিত ফিসারির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া লাভবান হয়। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ সরকারের সহিত যোগাযোগ রাখিয়া আধুনিক পদ্ধতিতে মাছের চাষ করিতে চায়। তাহারা অবশেষে ফিসারির উন্নতি সাধন করিয়া লাভবান হয়।

সমবায় পদ্ধতিতে একদল মৎস্য-চাষী সরকারের সমবায় বিভাগের পরিচালনায় মৎস্য-চাষ করিয়া থাকে। এই সমবায় সমিতি সরকারের অর্থসাহায্য ও উপদেশ পাইয়া বিশেষ লাভবান হইতে পারে। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে, সমিতির দক্ষ সভ্যেরা সমবায় পদ্ধতির স্বার্থত্যাগ ও নিষ্ঠা ভুলিয়া সরকারী অফিসারের স্থান দখল করিয়া বসে এবং ফিসারির কাজে উত্তরোত্তর

উন্নতির পরিবর্তে অবনতি ঘটাইতে থাকে। সমবায় সমিতির সভ্যদের একাগ্রতা ও নিষ্ঠার সাহায্যে মৎস্য-চাষের উন্নতি হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

রাষ্ট্রীয় পদ্ধতিতে মৎস্য-চাষের বিজ্ঞানসম্মত আধুনিক জ্ঞান এবং সরকারী বিভাগের আর্থিক ব্যবস্থার অভাব নাই; তথাপি লক্ষ্য করা যায় যে, ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টা আশানুরূপ ফলপ্রসূ হয় না এবং অন্যান্য প্রচেষ্টার তুলনায় অত্যন্ত কম লাভজনক হইয়া থাকে। ইহার ফলে কোন কোন ক্ষেত্রে কর্মীদের মনে হতাশার সৃষ্টি হয়। তবে লক্ষ্য করা গিয়াছে যে, স্বল্পকালীন রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টা অনেক সময় লাভজনক ও বিশেষ উৎসাহব্যঞ্জক হইয়াছে। সেগুলি মৎস্য-চাষীদের আদর্শ হিসাবে মৎস্য-চাষে অনুপ্রেরণা দেয়।

উপরিউক্ত বিষয়গুলি বিবেচনা করিয়া মনে হয়—হাজার হাজার পুষ্করিণী ও জলাশয়ের মধ্যে যেগুলি আজও অনাবাদী পড়িয়া রহিয়াছে, সেগুলিকে রাষ্ট্রীয় পদ্ধতিতে মৎস্য-চাষোপযোগী করিয়া উপযুক্ত সমবায় সমিতি বা নিজস্ব মালিকানার দ্বারা কার্যকরী করিবার জন্য উৎসাহ দিলে পশ্চিম বঙ্গের মৎস্য-শিল্পের উন্নতি হইবে ও মৎস্যোৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে।

পশ্চিম বঙ্গে মোট 15 লক্ষ একর বদ্ধ জলাশয়ের মধ্যে প্রায় 10 লক্ষ একরে মাছের চাষ করা হয়। তাহার মধ্যে আছে হাজার হাজার নার্শারি ট্যাঙ্ক, যেগুলি মাছের চাষে চারাপোনা তৈয়ারি করিয়া সাহায্য করিলেও খাদ্যোপযোগী মাছের কোন সংস্থান করে না, আর সেই রকম হাজার হাজার বাঁধও আছে, যাহা হইতে বর্ষার সময় কোটি কোটি ডিমপোনা সরবরাহ হয়, কিন্তু তাহা হইতে বৎসরে এক কেজি মাছও খাইবার জন্য পাওয়া যায় না। 1963 সালের গুপ্ত কমিশনের বিবরণীতে দেখা যায় যে, বাংলা দেশে বৎসরে মোট 51 লক্ষ মণ খাদ্যোপযোগী মাছ পাওয়া গিয়াছে। তাহার মধ্যে আছে অন্য প্রদেশ হইতে আমদানী করা প্রায় 18 লক্ষ মণ আর বাংলা দেশে বদ্ধ জলাশয়ে উৎপন্ন প্রায় 24.5 লক্ষ মণ মাছ। এই মাছ বাংলার চাহিদার তুলনায় পর্যাপ্ত নয়। গত লোকগণনার হিসাবে বাংলার লোক-
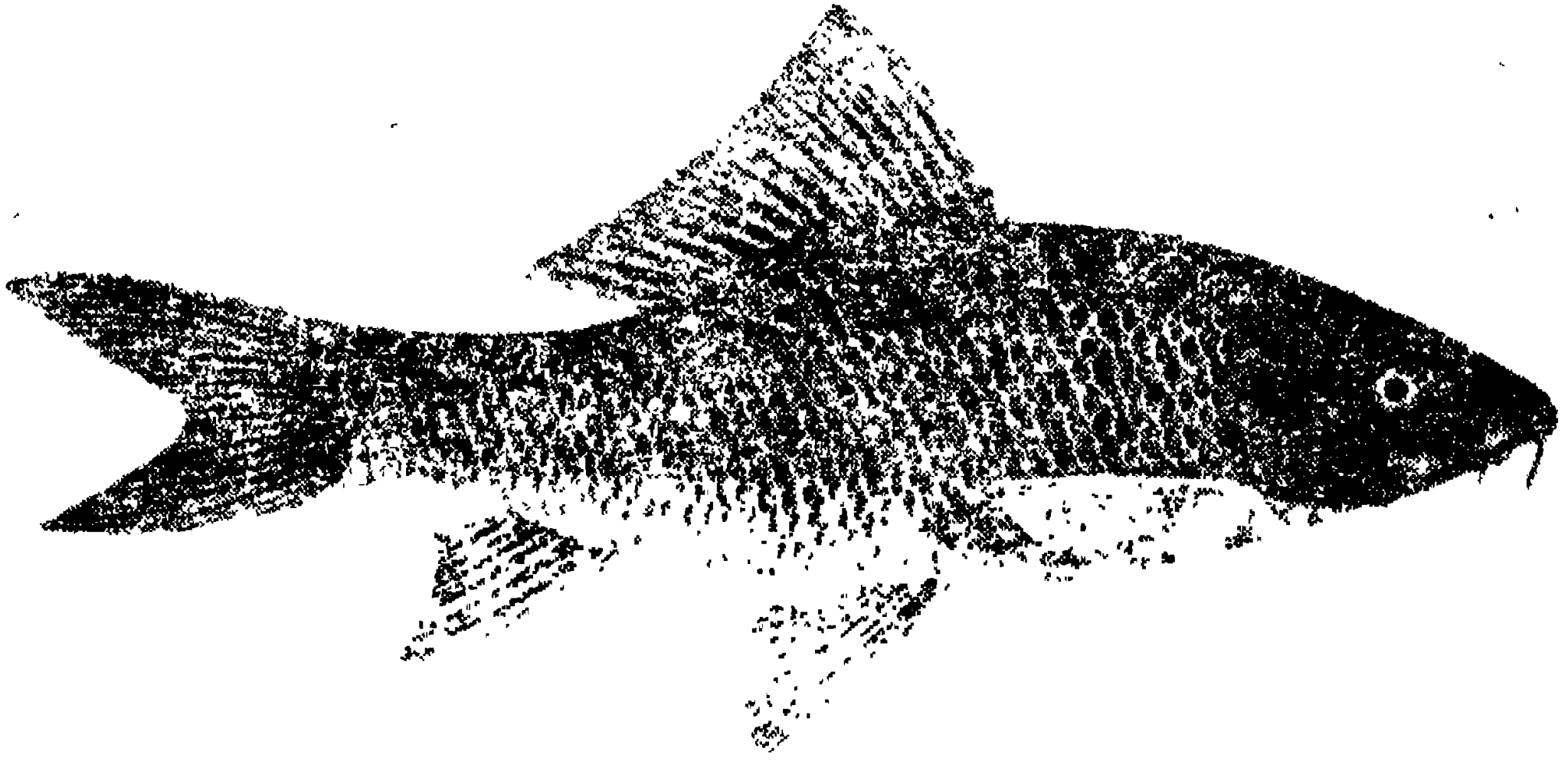
8নং চিত্র
কালবোস মাছ (Labeo calbasu)

সংখ্যা প্রায় 370 লক্ষ, তাহার মধ্যে মৎস্যভোজীর সংখ্যা 303 লক্ষ ধরা যাইতে পারে। প্রত্যেকটি মানুষকে দৈনিক দুই আউন্স করিয়া খাইবার জন্য মৎস্য সরবরাহ করিতে বৎসরে প্রায় 166 লক্ষ মণ মাছের প্রয়োজন। এই হিসাবে বাংলা দেশে মাছের অভাব দেখা যায় প্রায় 115 লক্ষ মণের। এই বিরাট অঙ্কের অভাব আংশিক দূর করিতে আমরা ভারতের অন্য প্রদেশ হইতে এবং সমুদ্রের উন্মুক্ত পরিবেশ হইতে মৎস্য সংগ্রহ করিতে উদ্যোগী হইয়াছি। এতদ্ব্যতীত বাংলা দেশে যে পাঁচ লক্ষ একর বদ্ধ জলাশয় পরিত্যক্ত অবস্থায় এখনও পড়িয়া আছে, সেগুলিকে সংস্কার করিয়া মৎস্য-চাষের জন্য উৎসাহ দান করিলে বাংলা দেশে মৎস্যের অভাব দূর হইতে পারে।
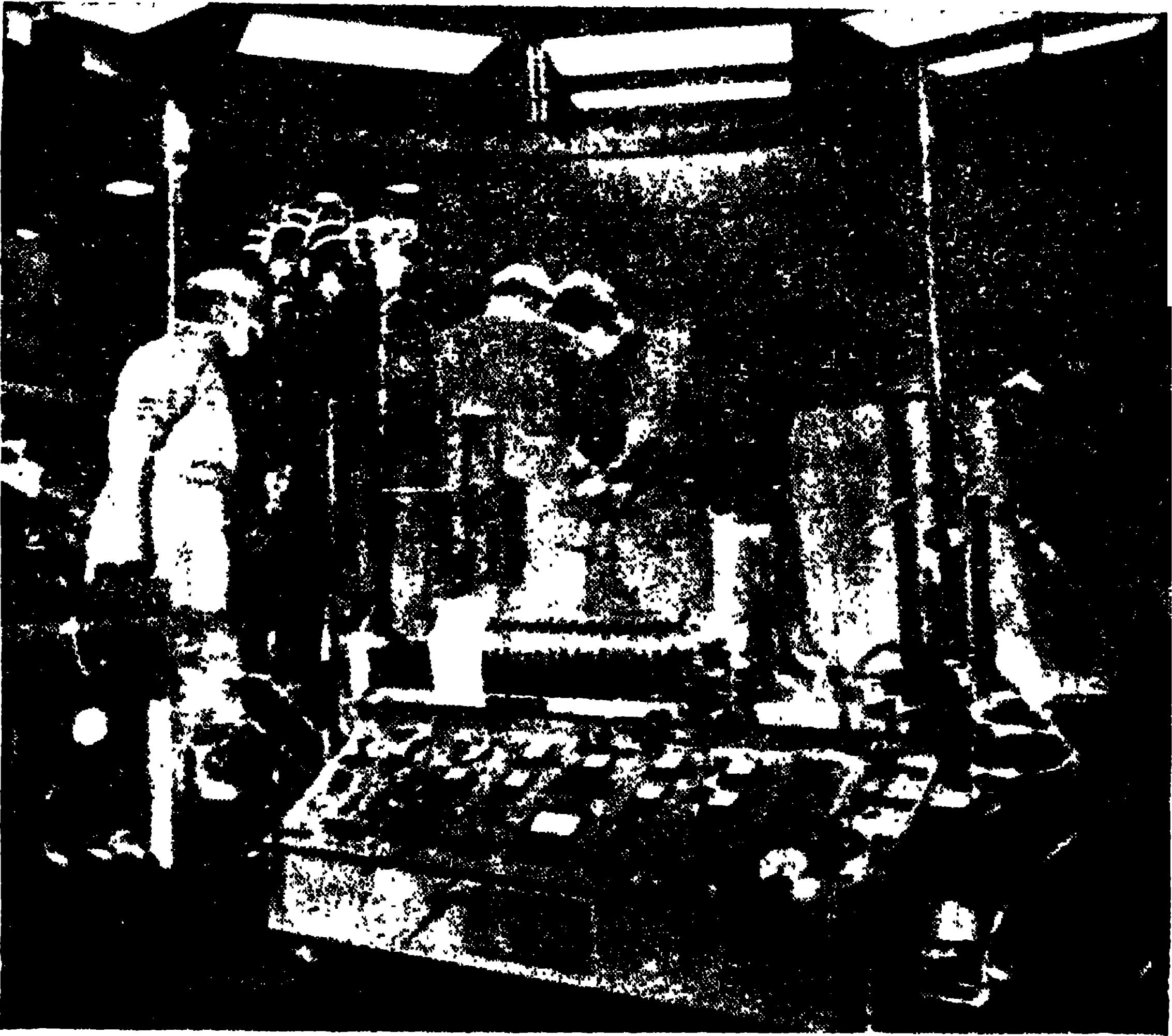
হার্ট-লাং মেসিন

কোন রোগীর হৃৎপিণ্ডে অস্ত্রোপচার করবার সময় রক্ত-সঞ্চালন ও রক্তে অক্সিজেন সরবরাহ অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্যে এই হার্ট-লাং মেসিনটি (সম্মুখে দেখা যাচ্ছে) ব্যবহার করা হয়। স্বাভাবিক অবস্থায় হৃৎপিণ্ড ও ফুস্‌ফুস যে কাজ করে—এই যন্ত্রটিও অস্ত্রোপচারের সময় ঠিক একই কাজ করে। এই যন্ত্র উদ্ভাবিত হবার ফলে হৃৎপিণ্ডে যে ধরণের অস্ত্রোপচার করা পূর্বে অসম্ভব ছিল, এখন তা অনায়াসেই করা যাচ্ছে। এর ফলে অনেক রোগীর জীবন রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে।

ভূমিকম্প কেন ?

দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়*

30শে মে, 1970। পেরুর রাজধানী লিমার প্রধান টেলিগ্রাফ কেন্দ্রে খবর বেজে চলছে—টরে টক্কা··· টরে টক্কা···। আমার পায়ের তলার মাটি কাঁপছে··· আমার হাত থরথর করে কাঁপছে ··· সবকিছু ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল··· বাঁচাও ·· বাঁচাও···। এর পরেই নাটকীয়ভাবে টেলিগ্রাফের লাইন মৃত মানুষের মত নীরব-নিথর হয়ে গেল। লিমার অপারেটর প্রাণপণ চেষ্টা করেও ইয়ুঙ্গে শহরের লাইনকে আর সজীব করে তুলতে পারলো না। কপালের বিন্দু বিন্দু ঘাম মুছে অপারেটর বললো—দি লাইন ইজ ডেড। শুধুমাত্র টেলিগ্রাফের লাইন নয়, সমস্ত পশ্চিম পেরু জুড়ে তখন মৃত্যুর বিভীষিকা। সেই ভয়ঙ্কর ভূমিকম্পে অ্যাণ্ডিজ পর্বতমালার বুকে গড়ে ওঠা দুটি ঝলমলে শহর—হুয়ারাজ ও কারাজ পৃথিবীর মানচিত্র থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। তাছাড়া চিমবোটে ও ট্রুজিল্লো শহর দুটিও ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। অন্যান্য শহর ও গ্রামের ক্ষতিও নগণ্য নয়। বেসরকারীভাবে রয়টারের মারফৎ যেসব খবর পৌঁচেছে, তাতে জানা যায়, পেরুর এই প্রলয়ঙ্কর ভূমিকম্পে নিহতের সংখ্যা পঞ্চাশ হাজারের কম নয়।

পৃথিবীর বুকে প্রকৃতির এই নির্মম, নিষ্ঠুর খেলা আজ নতুন নয়। ভূমিকম্পের এই ধ্বংস-লীলায় পৃথিবীর বুকে ঘনিয়ে এসেছে সর্বনাশের করাল ছায়া, বিলুপ্তি ঘটেছে শান্ত, স্নিগ্ধ জনপদের। ভীত, সন্ত্রস্ত মানুষ ধনপ্রাণ হারিয়েছে নির্বিচারে, তবু প্রকৃতির লোলুপ রসনার তৃপ্তি ঘটে নি। বেশী দিনের কথা নয়, 1967 সালের 11ই ডিসেম্বর। শীতের সকালে তখনো সবাই গভীর নিদ্রায় মগ্ন। এমন সময় হঠাৎ খেয়ালী প্রকৃতির প্রচণ্ড তাণ্ডবে থরথর করে কাঁপতে লাগলো পশ্চিম মহারাষ্ট্রের এক বিরাট অঞ্চল। সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হলো কয়নানগর (চিত্র নং 1)। শুধু তাই নয়, আশেপাশের অন্যান্য অঞ্চল—সাতারা, সাংলি, কোলাপুর ও রত্নগিরি জেলার কম করেও হাজারটি গ্রামের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা সম্পূর্ণ অচল হয়ে পড়লো। আড়াই লক্ষের বেশী নরনারী গৃহহীন হয়ে আশ্রয় নিল উন্মুক্ত প্রান্তরে। মৃতের সংখ্যা প্রায় দু-শ'-এর কাছাকাছি এবং আহতের সংখ্যাও কম নয়—প্রায় আড়াই হাজারের মত। অন্যান্য ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ নেহাৎ কম উল্লেখযোগ্য নয়। হেলতা-ঘাকের কাছে কয়নার উপর কারাড-চিপলান রাস্তার ব্রীজের তিনটি খিলান ভেঙ্গে চুরমার। অবশ্য কয়না-বাঁধ ও স্পিলওয়ে গেট অদ্ভুতভাবে এই তীব্র কম্পন সহ্য করেছিল। কিন্তু বাঁধের উপরের হয়েষ্ট টাওয়ার, স্পিলওয়ে ব্রীজ এবং কন্ট্রোল রুমটি খুবই ক্ষতিগ্রস্ত। ভূমিকম্পের এই তাণ্ডব শুধু পশ্চিম মহারাষ্ট্রের উপরেই আঘাত হানে নি, ফাটল ধরিয়েছে ভূতাত্ত্বিকদের চির-কালের বিশ্বাসের ভিতে। প্রমাণ করেছে, দাক্ষিণাত্যের মালভূমি অঞ্চলকে যতখানি অনড় বলে মনে করা হতো, ততখানি অনড় সে নয়।

পূর্ব ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায়, ভারতের বুকে কয়না ভূমিকম্পই প্রথম নয়। এর আগেও ভারতের মাটিতে ভূমিকম্পের পদধ্বনি শোনা গেছে। 1897 সালের 12ই জুন প্রচণ্ড ভূকম্পনের সৃষ্টি হলো উত্তর-পূর্ব ভারতের আসাম রাজ্যে। শিলং শহরের চারপাশে প্রায় দেড় লক্ষ বর্গমাইল

---

*ভারতীয় ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা

এলাকা জুড়ে এই প্রবল ভূমিকম্পে অসংখ্য প্রাণ-হানি ও অপূরণীয় ধনসম্পত্তির ক্ষতি হয়েছিল। এর পর আসাম নয়, ভূমিকম্পের রোষ পড়ে বিহারের উপর। 1934 সালের 15ই জানুয়ারী, বেলা প্রায় তিনটা। এমনি সময়ে হঠাৎ বিহারের উত্তরাংশ ও নেপালের দক্ষিণ ভাগ এক প্রবল ভূকম্পনে কেঁপে উঠলো। এই ভূমিকম্পে মতিহারী, কাঠমাণ্ডু ও মুঙ্গের জেলায় অবর্ণনীয় ক্ষতি হয়। বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে বিরাট বিরাট ফাটলের সৃষ্টি হয় এবং সেই সব ফাটল থেকে উপ্‌চে-পড়া জল বন্যার জলের মত সমস্ত অঞ্চলটিকে প্লাবিত করে ফেলে। কম করেও সেবার প্রায় বারো হাজার মানুষ ভূমিকম্পের করাল গ্রাসে প্রাণ হারায়। বিশেষজ্ঞ-দের ধারণা, পলিমাটির নীচে শক্ত পাথরের বিচ্যুতি ঘটবার ফলেই এই ভূমিকম্পের উৎপত্তি হয়েছিল। বিহারের এই ভয়াবহ ভূমিকম্পের পর বছর দেড়েকও কাটলো না। 1935 সালের 31শে মে। নিকষ কালো অন্ধকারের বুক চিরে বেলুচিস্থানের কোয়েটা ও কালাট শহর ভূমিকম্পের প্রচণ্ড তাণ্ডবে কেঁপে উঠলো। মৃত্যুপথযাত্রীদের আর্ত চিৎকারে অন্ধকার রাত্রির আকাশ-বাতাস মথিত হয়ে উঠলো। মৃতের সংখ্যা বিশ হাজার ছাড়িয়ে গেল। এর পর বছর পনেরো নির্বিঘ্নেই কাটলো—অন্ততঃ ভারতবর্ষে, কিন্তু ধরিত্রী আবার খেয়ালী হয়ে উঠলো। 1950 সালের 15ই অগাষ্ট আসাম-চীন সীমান্তে আর এক প্রবল ভূকম্পনে রিমা নগরীর আশেপাশে এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল বিরাট ধ্বংসস্তূপে পরিণত হলো। ধন-প্রাণের যে অপূরণীয় ক্ষতি হলো, তা ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন। ইদানীং কালের 1964 সালের 15ই এপ্রিল, কলকাতায় মৃদু ভূকম্পনের কথা অনেকের নিশ্চয়ই মনে আছে। বিশেষজ্ঞদের ধারণা, এই মৃদু ভূকম্পনই যদি আরও মিনিট কয়েক স্থায়ী হতো, তবে হয়তো সমগ্র কলকাতা নগরী একটি বিরাট শবাগারে পরিণত হতো।

1নং চিত্র

মানুষ যুগ যুগ ধরে প্রকৃতির এই নিষ্ঠুর

খেয়ালকে দেবতার অভিশাপ বলেই মনে করে এসেছে। কিন্তু সভ্যতার উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ বুঝতে শিখেছে, প্রাকৃতিক দুর্যোগের সঙ্গে দেবতার রোষের কোন সম্পর্ক নেই—আসলে এর মূলে রয়েছে কতকগুলি প্রাকৃতিক শক্তির কার্য-কারণের সম্পর্ক।

মনীষী অ্যারিষ্টটল (384-322 খৃঃ পূঃ) বিশ্বাস করতেন, ভূপৃষ্ঠের তলদেশে সঞ্চিত গ্যাস মুক্তির প্রয়াসে শিলাস্তরের নীচে ক্রমাগত আঘাত করে ভূকম্পনের সৃষ্টি করে। আরেক গ্রীক মনীষী লুক্রেটিয়াস বললেন, ভূগর্ভস্থ গুহাকন্দর যখন কোন কারণে ভেঙ্গে পড়ে, তখনই ভূস্তরের বুকে জেগে ওঠে কম্পন, সৃষ্টি হয় ভূমিকম্পের। বিগত কয়েক শতাব্দী ধরে বিভিন্ন ভূবিজ্ঞানীর নিরলস সাধনায় মানুষ জানতে পেরেছে প্রকৃতির এই দুর্জ্ঞেয় রহস্যের প্রকৃত কারণ, বুঝতে পেরেছে পৃথিবীর বুক ক্ষণে ক্ষণে কেন যেন অজানা আশঙ্কায় কেঁপে ওঠে। যে সকল বিজ্ঞানীর নিরলস সাধনায় ভূমিকম্পের গতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে মানুষ ওয়াকেবহাল হয়েছে, তাঁদের মধ্যে ম্যালে, মিল্‌নে, রীড, ইমানুরা এবং ওমরীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সাধারণভাবে তিনটি প্রধান কারণে পৃথিবীর বুকে ভূমিকম্পের উৎপত্তি হয়; যথা—(1) ভূপৃষ্ঠ-জনিত, (2) আগ্নেয়গিরিজনিত এবং (3) শিলা-চ্যুতিজনিত।

(1) ভূপৃষ্ঠজনিত কারণ: পাহাড়ী অঞ্চলে ধস্ নামবার ফলে ভূমিকম্পের সৃষ্টি হতে পারে। একটি তথ্য থেকে জানা যায়, 1911 সালে তুর্কীস্থানের ভূমিকম্পে পামীর উপত্যকা অঞ্চলে 50,000 কোটি টন ওজনের বিশাল ধস্ (Land slide) পর্বতশীর্ষ থেকে নেমে এসেছিল। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই বিরাট ধস্ নামবার ফলেই এই ভূমিকম্প হয়েছিল। যদিও প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ওল্ডহাম তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে বলেছেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভূকম্পনের ফলেই পাহাড়ী জায়গায় সর্ব-নাশা দূতের মত বিরাটকায় ধস্ নামতে সুরু করে। কিন্তু ধস্ আগে, না ভূমিকম্প আগে? এই প্রশ্নের সদুত্তর পাওয়া দুষ্কর। এছাড়াও নানা কারণে মহাদেশের উপকূল ভাগে সমুদ্র-তরঙ্গের আঘাতে ভূমিকম্পের সৃষ্টি হতে পারে। ভারতের পূর্ব উপকূলে সমুদ্র-তরঙ্গের আঘাতে যে ভূকম্পনের সৃষ্টি হয়, তা ক্ষীণবল হলেও কলকাতার আলিপুরের আবহ অফিসের যন্ত্রে প্রায়ই ধরা পড়ে।

(2) আগ্নেয়গিরিজনিত কারণ—বৈজ্ঞানিক তথ্য থেকে জানা যায়, অনেক সময় বিস্ফোরণ ও গলিত লাভা উৎক্ষিপ্ত হবার ফলে ভূমিকম্পের সৃষ্টি হতে পারে। ভূগর্ভ থেকে গলিত লাভা যখন বেরিয়ে আসবার জন্যে প্রচণ্ড শক্তিতে আগ্নেয়গিরির অভ্যন্তরে ভূস্তরে আঘাত করতে থাকে, সেই প্রচণ্ড সংঘর্ষে তখন ভূমিকম্পের সৃষ্টি হয়। 1888 সালের সুমাত্রায় ক্রাকাতোয়ায় আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণে ও গলিত লাভা নির্গমনের সঙ্গে সঙ্গে ভূমিকম্পের সৃষ্টি হয়েছিল। একই বছরে জাপানের বন্দরসানে আগ্নেয়গিরির গলিত লাভাস্রোত নির্গত হবার সঙ্গে সঙ্গে ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছিল।

(3) শিলাচ্যুতিজনিত কারণ—আধুনিক ভূ-বিজ্ঞানীদের মতানুসারে ভূগর্ভের অভ্যন্তরে শিলাচ্যুতিকেই ভূমিকম্পের মূল কারণ বলে মনে করা হয়। 1906 সালের সানফ্রানসিস্কো ভূমি-কম্প ও সান অ্যাণ্ড্রিয়াস শিলাচ্যুতির (Fault) কার্যকারণ সম্বন্ধে সুদীর্ঘকাল গবেষণা করে অধ্যাপক এইচ. এফ. রীড ভূমিকম্পের কারণ সম্বন্ধে একটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের উপস্থাপনা করেন। এই স্থিতিস্থাপক প্রতিঘাত তত্ত্বের (Elastic Rebound Theory) সাহায্যেই তিনি ভূমিকম্প ও শিলাচ্যুতির মধ্যে কার্যকারণ সম্বন্ধ বিশ্লেষণ করেন। সম্ভাবিত শিলাচ্যুত তলের দু-পাশে

নানা কারণে ক্রমশঃ টান পড়তে থাকে। ফলে শিলাস্তরটি বাঁকতে বাঁকতে এমন একটি পর্যায়ে পৌঁছে যায়, যখন শিলাস্তরটির পক্ষে আর শক্ত ও স্থির অবস্থায় থাকা সম্ভব হয় না। স্থিতিস্থাপকতার সীমা অতিক্রম করলেই শিলাস্তরের আচম্কা বিচ্যুতি ঘটে (চিত্র নং 2—ক, খ)। মনে হয়, কে যেন প্রচণ্ড শক্তিতে শিলাস্তর দুটিকে পরস্পর থেকে আলাদা করে দিয়েছে। এই বিরাট শিলাচ্যুতির ফলে কাঁপতে থাকে সমগ্র শিলাস্তর এবং উৎপত্তি হয় ভূমিকম্পের। শিলার চ্যুতি-বিচ্যুতি ভঙ্গ পর্বতমালার মধ্যে প্রচণ্ড শক্তির ভূমিকম্পের আধিক্য এসব অঞ্চলেই সবচেয়ে বেশী। 1897 সালের আসামের ভূমিকম্পে চিদ্রুং শিলাচ্যুতির ফলে একটি ভূস্তর প্রায় 35 ফুট নীচে নেমে গিয়েছিল। পেরুর সাম্প্রতিক ভূমিকম্পের কারণও অন্য কিছু নয়। বিশেষজ্ঞদের ধারণা, শিলাচ্যুতির ফলেই এই ভূমিকম্পের উৎপত্তি ঘটেছিল।

গত দেড়-শ’-দু-শ’ বছরের ভূমিকম্পের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, বেশীর ভাগ ভূমিকম্পের উৎপত্তি বিশেষ কয়েকটি পর্বতমালার অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ। এর মধ্যে প্রধানতম প্রশান্ত মহাসাগরীয় পরিমণ্ডল, যা প্রশান্ত মহাসাগরকে চারদিক থেকে মেখলার মত বেষ্টন করে আছে। অন্যটি ভূমধ্যসাগরীয় পরিমণ্ডল, যার পরিধি পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ থেকে সুরু করে হিমালয় ও এশিয়া মাইনর হয়ে আল্পস পর্বতশ্রেণী পর্যন্ত পৌঁচেছে। পৃথিবীর প্রায় নব্বই শতাংশ ভূমিকম্পই এই দুটি অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

অথচ এই বিচারে দাক্ষিণাত্যের মালভূমি অঞ্চল উল্লিখিত ভূমিকম্প-প্রধান অঞ্চলের বাইরে। এতকাল ধরে ভূতত্ত্ববিদ্‌দের ধারণা ছিল যে, দাক্ষিণাত্যের মালভূমি অঞ্চল ভূতাত্ত্বিক দিক থেকে অনড়। তবে কেন কয়নানগরের এই ভূমিকম্প? এই প্রশ্নের ভিতর ঢুকতে গেলে কয়নানগর অঞ্চলের পূর্ব ইতিহাস আলোচনা প্রয়োজন।

2নং চিত্র (ক)

2নং চিত্র (খ)

1962 সালে মহারাষ্ট্রের কয়না বাঁধের জলাধার ভর্তি হবার সুরু থেকেই কখনো কখনো মৃদু ভূকম্পন অনুভূত হতে থাকে। কিন্তু পরের বছর বর্ষাকালে বাঁধের জল আরো বৃদ্ধি পেলে ভূকম্পনের তীব্রতা ও সংখ্যার বৃদ্ধি লক্ষ্য করে কর্তৃপক্ষ কয়নানগর জলবিদ্যুৎ-কেন্দ্রের ভবিষ্যৎ ভেবে চিন্তিত হয়ে পড়েন।

কারণ এই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকেই মহারাষ্ট্রের শতকরা 40 ভাগ বিদ্যুৎ-শক্তি সরবরাহ করা হয়। এর পর ভূকম্পনের কারণ অনুসন্ধানের ভার পড়ে কেন্দ্রীয় জল ও বিদ্যুৎ গবেষণা দপ্তরের উপর। এই দপ্তরের অভিমত, আমেরিকার বোল্ডার ড্যামের মত কয়নানগর জলাধারের চাপে কম্পনের সৃষ্টি হচ্ছে। কিন্তু তেমন ভয়ের কিছু নেই, বছর কয়েকের মধ্যে

ভূস্তরকে ভারসাম্য ফিরে এলেই এই কম্পন থেমে যাবে।

কিন্তু ভূ-বিজ্ঞানীদের ধারণাকে নস্যাৎ করে 1967 সালের 13ই সেপ্টেম্বর কয়নানগর কেঁপে উঠলো। বেশ খানিকটা দূরের শহর পুণাতেও ভূমিকম্পের কাঁপুনি বোঝা গেল। কম্পন-কেন্দ্রের গভীরতা নির্ণীত হলো 6 থেকে 10 কিলোমিটারের মত। এই ভূমিকম্পের ফলে কয়নানগরের কিছু বাড়ী বিধ্বস্ত হলো, বেশ কিছু অধিবাসী আহত হলো। অপ্রত্যাশিত এই ভূকম্পনে বিশেষজ্ঞেরা কিছুটা বিস্মিত হলেও এবার কিন্তু বললেন—এই শেষ, এর পর ভবিষ্যতে জোরালো কোন ভূমিকম্পের সম্ভাবনা নেই। অথচ তারপর তিন মাসও কাটলো না—11ই ডিসেম্বর বিজ্ঞানীদের সব ভবিষ্যদ্বাণীকে মিথ্যা প্রমাণ করে কয়নানগর ও আশেপাশের অঞ্চলগুলি প্রচণ্ড ভূমিকম্পে কেঁপে উঠলো—একথা আগেই বলা হয়েছে। কয়নার এই ভূমিকম্পে কিন্তু বড় রকমের কোন ভূতাত্ত্বিক পরিবর্তন দেখা যায় নি। তীব্র ভূকম্পনের পরে সাধারণতঃ ভূমিস্খলন, ভূমির অধোগমন, ফাটলের সৃষ্টি, জলপীঠের পরিবর্তন ইত্যাদি দেখা যায়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, কয়নায় বড় রকমের কোন ভূতাত্ত্বিক পরিবর্তন চোখে পড়ে নি। যদিও স্থানে স্থানে বিক্ষিপ্তভাবে ব্যাসাল্ট পাথর গ্রন্থি ধরে ভেঙে পড়েছে এবং কেবলমাত্র কয়না বাঁধের কাছে নানেল থেকে দক্ষিণের ভার্ণা উপত্যকা পর্যন্ত উত্তর-দক্ষিণে প্রসারিত মাটির উপর প্রায় পাঁচ কিলোমিটার লম্বা কয়েকটি ফাটল দেখা গেছে এবং কঙ্কণ এলাকার প্রস্রবণগুলির তাপমাত্রা কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে।

কয়না ভূমিকম্পের তথ্যাদি পর্যালোচনা করে বিজ্ঞানীরা বলেছেন, এই ভূমিকম্পের উপকেন্দ্র কয়না বাঁধ থেকে 5 কিলোমিটার দক্ষিণে। কিন্তু আরেক দল বিজ্ঞানীর মতে, কয়না ভূমিকম্পের উপকেন্দ্র কয়না বাঁধের কিছু উত্তরে।

কয়না ভূমিকম্পের তীব্রতার পরিমাপ ও কেন্দ্রের গভীরতা নির্ণয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে বেশ মতভেদ রয়েছে। সাধারণভাবে তীব্রতার পরিমাপ রিচটার স্কেলে 6·5 থেকে 7·5 এবং কম্পন-কেন্দ্রের গভীরতা 16 কিঃ মিঃ থেকে 30 কিঃ মিঃ পর্যন্ত যন্ত্রে ধরা পড়েছে। অধ্যাপক সন্তোষ কুমার রায় বলেছেন, এই ভূকম্পনের পরিমাপ 7·5 এবং বহুদূর পর্যন্ত কম্পনের বিস্তৃতি ভূকম্পন-কেন্দ্রের গভীরতারই ইঙ্গিত প্রদান করে।

কিন্তু ভূমিকম্পের কেন্দ্র গভীরে হলে ভূপৃষ্ঠে ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ খুব বেশী হয় না—এই কারণে অনেক ভূ-বিজ্ঞানীর মতে, কয়না ভূমিকম্পের কেন্দ্র অগভীরে। কিন্তু অগভীর কেন্দ্র সত্ত্বেও এই ভূমিকম্প যে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল, তার কারণ হিসাবে তিনটি বিষয় দেখানো হয়েছে। প্রথমতঃ, Lg তরঙ্গ ভূস্তরের উপরের স্তর (Sial) নিয়ে বহুদূর পর্যন্ত চলে গেছে। দ্বিতীয়তঃ, খুব কম সময়ের ব্যবধানে পরস্পর দুটি কম্পন—প্রথমটির কেন্দ্র অগভীরে থাকায় বিধ্বস্ত এলাকায় ক্ষয়-ক্ষতি প্রচণ্ড হয়েছে এবং দ্বিতীয়টির কেন্দ্র গভীরে হওয়ায় বহু দূর পর্যন্ত কম্পন অনুভূত হয়েছিল। তৃতীয়তঃ, যে চ্যুতির জন্যে এই ভূমিকম্পের সৃষ্টি, তা 15-20 কিঃ মিঃ থেকে 25-30 কিঃ মিঃ গভীরতা পর্যন্ত প্রসারিত ছিল।

ভূকম্পবিদ্‌দের মতপার্থক্য থেকে বলা চলে—কম্পনের সঠিক কারণ নির্ণয়ের জন্যে অনেক তথ্যই এখনো অজানার অন্ধকারে। অথচ কয়না বাঁধ অঞ্চলকে সম্ভাব্য ভূমিকম্প থেকে বাঁচাতে হলে ভূমিকম্পের সঠিক কারণ নির্ণয় করা প্রয়োজন। বিভিন্ন ভূতত্ত্ববিদ্‌দের মতবাদগুলি সংক্ষেপে এই রকম—

(1) বাঁধের জলাধারে সংরক্ষিত জলের প্রচণ্ড চাপে ভিত্তিপ্রস্তরের কম্পন।

(2) জলাধার থেকে চোঁয়ানো জলে ট্র্যাপের মধ্যবর্তী চুনাপাথরের দ্রবীভবন। উপরে বর্ণিত কারণ দুটি সম্পর্কে সাম্প্রতিক কালে অধিকাংশ বিজ্ঞানীই গভীরভাবে সন্দিহান।

(3) শিলাচ্যুতির ফলে ভূকম্পন।

কয়নানগরের ভূমিকম্পে প্রচুর পরিমাণে শক্তির মুক্তি এবং কেন্দ্রের গভীরতা থেকে অনেকের অনুমান, কোন বড় রকমের চ্যুতির জন্যেই কয়নার মাটি এত জোরে কেঁপে উঠেছিল। খুব সম্ভব এই ভূমিকম্পে কোন পুরনো চ্যুতিরেখা অথবা নতুন কোন ফাটল বরাবর আন্দোলনের ফলে সৃষ্টি হয়েছে। পশ্চিম মহারাষ্ট্রে এই রকম তিনটি চ্যুতিরেখার অবস্থিতি সম্বন্ধে অনেকে অনুমান করেন, যদিও এদের উপস্থিতি ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষায় পুরাপুরি প্রমাণিত হয় নি।

(4) ভূপৃষ্ঠের গভীরে গলিত শিলার (ম্যাগ্মা) অবস্থা পরিবর্তনে উৎপন্ন শক্তির ফলে কম্পন। দাক্ষিণাত্যের মালভূমি অঞ্চলে টার্শিয়ারী যুগের লাভা-প্রবাহের (Deccan trap) অস্তিত্ব থেকে বর্তমান যুগের লাভা-প্রবাহের কথা চিন্তা করা হয়েছে, যদিও এর সমর্থনে বিশেষ কোন জোরালো যুক্তি পাওয়া যায় নি।

যাহোক, কয়না ভূমিকম্প যে কারণেই ঘটে থাকুক না কেন, দাক্ষিণাত্যের মালভূমি যে মৃতের মত নিথর, অনড় নয়, একথা নতুন করে প্রমাণিত হয়েছে।

"বঙ্গ জননীকে উচ্চ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত দেখিবার ইচ্ছা সকলেরই আছে; কিন্তু তাহার উপায় উদ্ভাবন সম্বন্ধে স্বয়ং কষ্ট স্বীকার না করিয়া পরস্পরকে কেবলমাত্র তাড়না করিলে কোন ফল পাইব না, একথা বাহুল্য। এই উদ্দেশ্যে প্রধানতঃ বঙ্গসন্তানদের বিবিধ ক্ষেত্রে কৃতিত্ব ও তাহাদের আত্মসম্মান-বোধ জাগরণ আবশ্যক; কিন্তু একথা অনেক সময় ভুলিয়া যাই। কর্ম্মক্ষেত্রে অপরে কি পথ অবলম্বন করিবে তাহা লইয়াই কেবল আলোচনা করি। কেহ কেহ দুঃখ করিয়াছেন যে, বঙ্গের দুই একটি কৃতী-সন্তান তুচ্ছ যশের মায়াতে প্রকৃষ্ট পথ ত্যাগ করিয়াছেন।...... যদি (তাঁহাদের আবিষ্কৃত) এই তত্ত্ব কেবল বাঙ্গলা ভাষায় প্রকাশিত হইত তাহা হইলে বিদেশীরা অমূল্য সত্যের আকর্ষণে এদেশে আসিয়া বাঙ্গলা ভাষা শিখিতে বাধ্য হইত এবং প্রাচ্যের নিকট প্রতীচ্য মস্তক অবনত করিত।

ইংরেজী ভাষায় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশ সম্বন্ধে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, আমার যাহা কিছু আবিষ্কার সম্প্রতি বিদেশে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে, তাহা সর্ব্বাগ্রে মাতৃভাষায় প্রকাশিত হইয়াছিল এবং তাহার প্রমাণার্থ পরীক্ষা এদেশে সাধারণ-সমক্ষে প্রদর্শিত হইয়াছিল। কিন্তু আমার একান্ত দুর্ভাগ্যবশতঃ এদেশের সুধীশ্রেষ্ঠ-দিগের নিকট তাহা বহুদিন প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে সমর্থ হয় নাই। আমাদের স্বদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ও বিদেশের হল-মার্কা না দেখিতে পাইলে কোন সত্যের মূল্য সম্বন্ধে একান্ত সন্দিহান হইয়া থাকেন। বাঙ্গলা দেশে আবিষ্কৃত, বাঙ্গলা ভাষায় লিখিত তত্ত্বগুলি যখন বাঙ্গলার পণ্ডিতদিগের নিকট উপেক্ষিত হইয়াছিল তখন বিদেশী ডুবুরিগণ এদেশে আসিয়া যে নদীগর্ভে পরিত্যক্ত আবর্জ্জনার মধ্যে রত্ন উদ্ধার করিতে প্রয়াসী হইবেন, ইহা দুরাশা মাত্র।"

আচার্য জগদীশচন্দ্র

অক্ষয়কুমার দত্ত ও বাংলায় বিজ্ঞান-চর্চা

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

গড়া পথ দিয়ে হাঁটা, আর পথ গড়ে হাঁটা এক জিনিষ নয়। পথ গড়ে নিয়ে যাঁরা হাঁটেন, তাঁরা হাঁটবার শ্রমটুকু তো বটেই, গড়বার ক্লেশটুকুও স্বীকার করতে বাধ্য হন। অক্ষয়কুমার দত্ত এই দ্বিতীয় দলের পথিক। তিনি গড়তে গড়তে পথ চলেছেন। চলতে চলতে পথ করেছেন।

অক্ষয়কুমার সম্পর্কে এই দ্বিমুখী কৃতিত্বের প্রশ্ন উঠতো না, যদি দেখতাম বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চায় আত্মনিয়োগ করবার সময় সাহিত্য-রচনার উল্লেখযোগ্য কোন আদর্শকে তিনি সামনে পেয়েছেন। রচনাদর্শ সাধারণ বাংলা গদ্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে যা-ও বা তিনি পেয়েছিলেন, বিজ্ঞানের প্রবন্ধের বেলায় তাও পান নি। কারণ, তাঁর পূর্বসূরী বিজ্ঞান-লেখকদের প্রায় সকলেই লিখেছেন কৃত্রিম ও আড়ষ্ট ভাষায়।

অবশ্য অস্বীকার করা চলে না যে, এরূপ লেখার সঙ্গত কিছু কারণ আছে। অক্ষয়কুমারের পূর্বসূরী বিজ্ঞান-লেখকদের অধিকাংশই ছিলেন ইউরোপীয়। তাঁরা পাশ্চাত্য বিজ্ঞানকে প্রাচ্য বাঙলার উপযোগী করে পরিবেশন করতে পারেন নি—বিজ্ঞানের ভাষাকে খাপ খাওয়াতে পারেন নি বাংলা ভাষার সঙ্গে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, উইলিয়াম কেরীর ছেলে ফেলিক্স্ কেরী 'বিদ্যাহারাবলী' (1820) নামে যে অস্থি ও শারীরবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থটি লিখেছিলেন অথবা শ্রীরামপুর কলেজের অধ্যাপক জন ম্যাক্ লিখেছিলেন 'কিমিয়াবিদ্যার সার' (1834) নামক যে রসায়ন বিজ্ঞানটি, বাংলা ভাষার প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে তাদের কোনটিই ঠিক খাপ খায় নি; অর্থাৎ বাঙ্গালীয়ানার চেয়ে সাহেবীয়ানাই প্রকট হয়ে উঠেছে সে সব গ্রন্থে।

এইখানে রামমোহন রায় ও রাধাকান্ত দেবের কথা এবং বিশেষ করে প্রথমোক্ত মনীষীর কথা উঠতে পারে। কেন না, বাংলায় পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের প্রসারে তাঁর অবদান কোন মতেই উপেক্ষণীয় নয়। 1823 খৃষ্টাব্দের শেষের দিকে গভর্ণর জেনারেল লর্ড আমহার্স্টের কাছে লেখা এক চিঠিতে রামমোহন অনুরোধ জানিয়েছিলেন এদেশে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান-চর্চার প্রসারের জন্যে। তাছাড়া নিজেও তিনি কয়েকটি বিজ্ঞানগ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থগুলি হলো ইংরেজী ও বাংলায় রচিত ভূগোল—জ্যাগ্রাফী, জ্যোতির্বিদ্যা বা খগোল এবং একটি জ্যামিতি।

উল্লিখিত তিনটি গ্রন্থই দীর্ঘকাল যাবৎ পাওয়া যায় না। এমন কি, রামমোহনের জীবনীকার নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় আজ থেকে প্রায় 90 বছর আগে প্রকাশিত 'মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিতে'র প্রথম সংস্করণে (1287) পর্যন্ত এদের সম্পর্কে একই কথা বলেছেন। অতএব, যেহেতু রামমোহনের ওই গ্রন্থগুলির কোনটিই আমরা দেখি নি, সেহেতু ওদের ভাষা সম্পর্কে আজ কোন মন্তব্য করবার উপায় নেই। আজ এটুকুই শুধু বলা যায় যে, রামমোহনের বিজ্ঞানগ্রন্থগুলি কোনটিই তাঁর সমসাময়িক জনসমাজে উল্লেখযোগ্য কোন সমাদর লাভ করে নি। কেন না, সমাদর লাভ করলে সে যুগের অন্যান্য বিজ্ঞানগ্রন্থের মধ্যে হয় এদের সশ্রদ্ধ উল্লেখ থাকতো, নয় তো খুঁজে পাওয়া যেত সে যুগের রিপোর্ট, ক্যাটালগ বা সংগ্রহশালায়। রাধাকান্ত দেবের

বিজ্ঞানালোচনা আমরা অবশ্য দেখেছি। তাঁর শিশুপাঠ্য রচনা বাঙ্গালা শিক্ষাগ্রন্থের (1821) ভূগোল এবং গণিত-বিষয়ক প্রসঙ্গগুলিকে একেবারেই প্রাথমিক প্রকৃতির মনে হয়েছে আমাদের। তাই সব দিক মিলিয়ে বিচার করলে আজ বলা যায়, অক্ষয়কুমারের পূর্ববর্তী বাংলা বিজ্ঞান-সাহিত্যের বেশীর ভাগই হয় দুর্বোধ্য ও কৃত্রিম, না হয় অজ্ঞাত ও অবহেলিত অথবা একেবারেই অপরিণত।

হয়তো বা ভুল বললাম, বিজ্ঞানসাহিত্য বলা বোধ হয় ঠিক হলো না। বিজ্ঞাননির্ভর পাঠ্যপুস্তক বা বিজ্ঞানগন্ধী টুকিটাকি রচনা বললেই এদের পরিচয়টা সঠিক হয়।

বিজ্ঞান-বিষয়ক বাংলা ভাষাকে সাহিত্যের পর্যায়ে প্রথম উন্নীত করলেন অক্ষয়কুমার দত্ত। ভাষার কৃত্রিমতা দূর করে সর্বজনবোধ্য বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ তিনিই প্রথম লিখলেন। তাঁর রচনারীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য ভাষার প্রসাদগুণ। যথাসম্ভব সহজ ও সরল ভাষায় বিজ্ঞানের বিষয় লিপিবদ্ধ করেছেন তিনি। সাধারণ পাঠক—এমন কি, সুকুমারমতি কিশোর-কিশোরীরাও যাতে তাঁর লেখা বুঝতে পারে, সেদিকে বরাবরই তিনি লক্ষ্য রেখেছেন। অবশ্য সন্দেহ নেই যে, সাময়িক-পত্র সম্পাদনার অভিজ্ঞতা এই ব্যাপারে তাঁকে সাহায্য করেছিল অনেকখানি।

তিনি বিদ্যাদর্শন পত্রিকার (প্রথম প্রকাশ—জুন, 1842) অন্যতম পরিচালক ছিলেন। তাছাড়া এই পত্রিকায় প্রকাশিত অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ তাঁরই রচনা বলে মনে হয়। বিদ্যাদর্শনের প্রবন্ধগুলির বৈশিষ্ট্য প্রকাশরীতির স্বচ্ছতায় ও যথাযথ তথ্য সমাবেশে। এতে রচনা টেক্‌নিক্যাল হয়ে ওঠে নি কোথাও—বিজ্ঞানে অনভিজ্ঞ পাঠকদের কাছেও রচনা জটিল বা দুর্বোধ্য হয় নি।

ধারাবাহিকভাবে উচ্চাঙ্গের সুদীর্ঘ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হতে বিদ্যাদর্শনেই প্রথম দেখা গেল। কিন্তু খুব স্বল্পজীবী হবার ফলে এই পত্রিকা বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান-চর্চার ক্ষেত্রে স্মরণীয় কোন আদর্শ স্থাপন করে যেতে পারে নি। এই আদর্শ স্থাপনের কৃতিত্ব দাবী করতে পারে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা এবং তার কর্ণধার অক্ষয়কুমার দত্ত। দীর্ঘ বারো বছর (1843-1855) অক্ষয়কুমার এই পত্রিকাটির সম্পাদনা করেছিলেন এবং বিজ্ঞান-বিষয়ক উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ নিয়মিতভাবে এতে প্রকাশ করে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের কল্যাণসাধন করেছিলেন।

দিগ্‌দর্শন, সমাচার দর্পণ ইত্যাদি পূর্ববর্তী পত্র-পত্রিকাগুলির বিজ্ঞান-বিষয়ক আলোচনার সঙ্গে তত্ত্ববোধিনীর বিজ্ঞান-প্রসঙ্গগুলির কোন তুলনাই চলে না—কেন না, ঐ সব পত্র-পত্রিকার বিজ্ঞানালোচনার অধিকাংশই ছিল বিজ্ঞান-সংবাদ, আর না হয় বিজ্ঞান-প্রস্তাব। তাছাড়া ঐগুলির ভাষা ছিল কৃত্রিম।

ভাষার কৃত্রিমতা দূর করে পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞান-প্রবন্ধ রচনার সূচনা হয়েছিল বিদ্যাদর্শনে। আর বিদ্যাদর্শনে যার সূচনা হয়েছিল, তারই পরিণতি দেখা গেল তত্ত্ববোধিনীতে। তত্ত্ববোধিনীর প্রবন্ধগুলি প্রাঞ্জল, সুলিখিত ও সারগর্ভ। বিজ্ঞানের বিচিত্র দিক নিয়ে বহু মনোজ্ঞ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ এতে প্রকাশিত হয়েছিল। তাছাড়া এই পত্রিকায় দীর্ঘদিন ধরে ধারাবাহিকভাবে এক-একটি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হবার ফলে বিজ্ঞানসাহিত্যের প্রতি জনসাধারণের আগ্রহও আগের তুলনায় অনেক বেড়ে গিয়েছিল।

1855 খৃষ্টাব্দে অক্ষয়কুমার তত্ত্ববোধিনীর সম্পাদনা ত্যাগ করলে এই পত্রিকার জনপ্রিয়তা অনেকখানি হ্রাস পেল। অক্ষয়কুমারের বিজ্ঞানালোচনার অধিকাংশই আগে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হতো, তারপর প্রকাশিত হতো গ্রন্থাকারে।

তবে তাঁর প্রথম বিজ্ঞানগ্রন্থ ভূগোল প্রকাশিত হয় এই পত্রিকাটির জন্মের বছর দুয়েক আগে 1841 খৃষ্টাব্দে। তত্ত্ববোধিনী সভার অনুমতিক্রমে গ্রন্থটি ছাপা হয়েছিল। এর বিষয়বস্তু বিভিন্ন ইংরেজী গ্রন্থ ও গেজেটিয়ার থেকে সংগৃহীত। পৃথিবীর রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল নিয়ে সামগ্রিক আলোচনার প্রয়াস এতে আছে। তবে এর প্রধান ত্রুটি, অল্প জায়গায় অধিক তথ্যের সমাবেশ।

অক্ষয়কুমার দত্তের 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' (প্রথম ভাগ—প্রথম প্রকাশ পৌষ, 1773 শক; দ্বিতীয় ভাগ—প্রথম প্রকাশ মাঘ, 1774 শক) নামক গ্রন্থের স্থানে স্থানে মূল্যবান বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি রয়েছে। ধর্ম, বিজ্ঞান ও দর্শনে লেখকের পাণ্ডিত্যের পরিচয় এই গ্রন্থের প্রায় সর্বত্রই সুস্পষ্ট। ব্রাহ্মধর্মকে আশ্রয় করলে শরীর, বুদ্ধি ও ধর্মভাবের কিভাবে উৎকর্ষ সাধিত হতে পারে, এই গ্রন্থে অক্ষয়কুমার তা বোঝাতে চেয়েছিলেন। তবে ধর্মবিশ্বাসেরই শুধু নয়, বিজ্ঞানবুদ্ধিরও উল্লেখযোগ্য স্থান আছে এই গ্রন্থে। 1770 শকাব্দের মাঘ সংখ্যা থেকে এই গ্রন্থটি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। জর্জ কুম্ব-এর 'Constitution of Man' নামক গ্রন্থ অবলম্বনে এটি লেখা। তবে কুম্ব-এর গ্রন্থটির আক্ষরিক অনুবাদ করেন নি অক্ষয়কুমার, ভাবানুবাদ করেছেন এবং অনুবাদের সময় তিনি লক্ষ্য রেখেছেন, এদেশীয় জনসাধারণের রুচি ও প্রয়োজনের দিকে। 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' সে যুগের বাংলা দেশে যথেষ্ট সাড়া জাগিয়েছিল। তাছাড়া 'চারুপাঠ' 1ম, 2য় ও 3য় ভাগ (প্রথম প্রকাশ যথাক্রমে 1775, 1776 ও 1781 শক) সমাদৃত হয়েছিল সেকালের ছেলেমেয়েদের মধ্যে।

চারুপাঠ-এর প্রায় সব রচনাই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এর বিষয়বস্তু বিভিন্ন ইংরেজী গ্রন্থ থেকে সংকলিত। এতে প্রাণী ও উদ্ভিদবিজ্ঞান থেকে সুরু করে ভূগোল, পদার্থবিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান ইত্যাদি বিচিত্র প্রসঙ্গ নিয়ে রচনা আছে। তবে প্রাণিবিজ্ঞান বিষয়ক রচনারই প্রাধান্য।

চারুপাঠে অক্ষয়কুমার তথ্যের উপর ততটা জোর দেন নি, যতটা জোর দিয়েছেন রচনাকে মনোরম ও হৃদয়গ্রাহী করে তোলবার দিকে। তথ্যের দিক থেকে চারুপাঠের অধিকাংশ রচনাই দুর্বল, সন্দেহ নেই; কিন্তু সরল ভাষা ও স্বচ্ছ প্রকাশভঙ্গী রচনাগুলিকে গল্পের মত সুখপাঠ্য করেছে। অক্ষয়কুমারের অপর একটি বিজ্ঞানগ্রন্থ পদার্থবিদ্যা (1856) বাংলায় সুপরিকল্পিতভাবে লেখা প্রথম পদার্থবিজ্ঞান।

বাংলায় পদার্থবিদ্যা নাম দিয়ে এর আগেও গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল বটে। ইয়েটস্-এর 'পদার্থবিদ্যাসার' (1824) এবং পূর্ণচন্দ্র মিত্রের 'পদার্থবিদ্যাসার' (1847) অনেককেই কৌতূহলী করেছিল। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ পদার্থবিজ্ঞান এদের একটিও নয়। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগ —জ্যোতির্বিদ্যা, ভূ ও ভূগোলবিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা ইত্যাদি অনেক কিছুই এদের মধ্যে আছে। তাছাড়া, পরিভাষার ব্যবহারেও এদের মধ্যে সুনির্দিষ্ট কোন রীতি অনুসৃত হয় নি।

পদার্থবিদ্যায় অক্ষয়কুমার ইংরেজী বৈজ্ঞানিক শব্দগুলির বাংলা নাম ব্যবহার করেছেন, অর্থাৎ পরিভাষা সৃষ্টি করেছেন তিনি। অনেক ক্ষেত্রেই তাঁকে নতুন শব্দ গ্রহণ করতে হয়েছে। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, অক্ষয়কুমারের পরবর্তী বিজ্ঞানলেখকদের অনেকেই পরিভাষার ব্যবহারে তাঁকে অনুকরণ করেছিলেন; যেমন—Inertia-র বাংলা অক্ষয়কুমার লিখলেন জড়ত্ব। পরবর্তী পদার্থবিজ্ঞানলেখক মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, যোগেশচন্দ্র রায় ও সূর্যকুমার অধিকারীও Inertia অর্থে এই জড়ত্ব শব্দটিই ব্যবহার করেছেন।

এইভাবে অক্ষয়কুমার 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' ও 'চারুপাঠে'র মধ্য দিয়ে এক দিকে যেমন বাংলা বিজ্ঞানসাহিত্যকে সরস ও জনপ্রিয় করে তুললেন, অপর দিকে তেমনি ভূগোল ও পদার্থবিদ্যার পথ দেখালেন প্রাঞ্জল, সুপরিকল্পিত ও তথ্যনিষ্ঠ বিজ্ঞানগ্রন্থ রচনায়।

কালক্রমে বাংলা ভাষায় অনেক উচ্চাঙ্গের বিজ্ঞানগ্রন্থ হয়তো রচিত হবে, কিন্তু বাংলায় বিজ্ঞান-চর্চার অন্যতম পথিকৃৎ অক্ষয়কুমার দত্তের নাম মুছে যাবে না কোন দিনই।

"একাদশ বা দ্বাদশবর্ষীয় বালকদিগের গলাধঃকরণের জন্য যে সকল বিজ্ঞানপাঠ প্রচারিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা প্রকৃত প্রস্তাবে দেশের ইষ্ট কি অনিষ্ট সাধিত হইতেছে তাহা সঠিক বলা যায় না। আসল কথা এই, আমাদের দেশ হইতে প্রকৃত জ্ঞানস্পৃহা চলিয়া গিয়াছে। জ্ঞানের প্রতি একটা আন্তরিক টান না থাকিলে কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ের ২।৩টি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ায় বিশেষ ফললাভ হয় না। এই জ্ঞানস্পৃহার অভাবেই যদিও বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গীভূত বিদ্যালয়সমূহে বহুকাল হইতে বিজ্ঞান অধ্যাপনার ব্যবস্থা হইয়াছে, তথাপি বিজ্ঞানের প্রতি আন্তরিক অনুরাগসম্পন্ন ব্যুৎপন্ন ছাত্র আদৌ দেখিতে পাওয়া যায় না। কেন না ঘোড়াকে জলাশয়ের নিকটে আনিলে কি হইবে? উহার যে তৃষ্ণা নাই। একজামিন পাশই যেখানকার ছাত্রজীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য, সেখানকার যুবকগণের দ্বারা অধীত বৈজ্ঞানিক বিদ্যার শাখা-প্রশাখাদির উন্নতি হইবে এরূপ প্রত্যাশা করা নিতান্তই বৃথা। সেই সকল মৃতকল্প, স্বাস্থ্যবিহীন যুবকগণের যত্নে জাতীয় ভাষার উন্নতি-বিধান, কিম্বা যে কোনও প্রকার দুরূহ ও অধ্যবসায়মূলক কার্য্যের সাফল্য সম্পাদনের আশা নিতান্তই সুদূর পরাহত। বস্তুতঃ একজামিন পাশ করিবার নিমিত্ত এরূপ হাস্যোদ্দীপক উন্মত্ততা পৃথিবীর অন্য কুত্রাপি দেখা যায় না। পাশ করিয়া সরস্বতীর নিকট চির-বিদায় গ্রহণ—শিক্ষিতের এরূপ জঘন্য প্রবৃত্তি আর কোন দেশেই নাই। আমরা এদেশে যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ করিয়া জ্ঞানী ও গুণী হইয়াছি বলিয়া আত্মাদরে স্ফীত হই, অপরাপর দেশে সেই সময়েই প্রকৃত জ্ঞানচর্চ্চার কাল আরম্ভ হয়; কারণ সে সকল দেশের লোকের জ্ঞানের প্রতি যথার্থ অনুরাগ আছে, তাঁহারা একথা সম্যক উপলব্ধি করিয়াছেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার হইতে বাহির হইয়াই জ্ঞান-সমুদ্র মন্থনের প্রশস্ত সময়। আমরা দ্বারকেই গৃহ বলিয়া মনে করিয়াছি, সুতরাং জ্ঞান-মন্দিরের দ্বারেই অবস্থান করি, অভ্যন্তরস্থ রত্নরাজি দৃষ্টিগোচর না করিয়াই ক্ষুণ্ণমনে প্রত্যাবর্ত্তন করি।"

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র

বিজ্ঞানের ভাষা

লীলা মজুমদার

ভাবের সঙ্গে ভাষার নিগূঢ় সম্বন্ধ। কি বলা হবে, তার উপরেই নির্ভর করছে, কিভাবে বলা হবে। দুইয়ের মধ্যে কিন্তু বক্তব্যই শ্রেয়ঃ। বিশেষ করে বিজ্ঞানের বিষয়ে একথা আরো বেশী করে খাটে।

বিজ্ঞানের হলো তথ্য এবং নির্ভুল তথ্য নিয়ে কারবার। এমন কি, একবার যে তথ্যকে বৈজ্ঞানিক সত্য বলে মেনে নেওয়া হয়েছে, পরবর্তী গবেষণায় যদি তার মধ্যে ভুল বা খুঁৎ বেরোয়, বৈজ্ঞানিকেরা তৎক্ষণাৎ তাকে হয় বর্জন করেন, নয় তো নব আবিষ্কৃত তত্ত্বের সঙ্গে মিলিয়ে নেন। বিজ্ঞান-জগতে কখনো শেষ কথা বলা যায় না।

বিজ্ঞানের ভাষাকেও তাই এর-ই উপযুক্ত হতে হয়। সব ভাষার মতই এরও একমাত্র উদ্দেশ্য সত্যকে প্রকাশ করা, তবে অন্যান্য বিষয় থেকে এর একটুখানি তফাৎ আছে। বৈজ্ঞানিক সত্যের ধর্ম অনেকটা গণিতের ধর্মের মত। একটি তথ্য প্রতিষ্ঠিত হলে তাকে ভিত্তি করে পর পর ক্রমাগত নতুন নতুন তথ্য প্রতিষ্ঠা করা হয়, একই সঙ্গে পাশাপাশি অনেকগুলি চিন্তাকে বসিয়ে তার কাজ হয় না। অবশ্য তার মানে এই নয় যে, নানান বৈজ্ঞানিক তথ্যের পরস্পরের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নেই, বরং ঠিক তার উল্টো। মৌলিক তথ্যগুলি সব ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। তফাৎ এইখানে যে, সাহিত্যের ক্ষেত্রে পাশাপাশি সাজানো তথ্য বা তত্ত্বের মধ্যে যদি ভুল বেরোয়, তাহলে অনায়াসে শুধু সেই ভ্রান্ত অংশটুকু উৎপাটন করা যায়, অন্য অংশগুলির তাতে হয়তো কোন ক্ষতিই হয় না।

এই সব কথা মনে রেখে বিশেষ যত্ন করে বিজ্ঞানের ভাষা চয়ন করতে হয়। রস জমানো তার উদ্দেশ্য নয়, প্রসাদ গুণের তার কাছে গুরুত্ব নেই। সবচেয়ে সহজ ভাবে, সবচেয়ে স্পষ্ট করে বৈজ্ঞানিক তথ্য পরিবেষণ করতে হয়, যাতে কোন ভুল বোঝবার সম্ভাবনা না থাকে এবং কখনো একটি ছেড়ে দুটি মানে করা না যায়।

বিজ্ঞানের লেখক নিজেকে সর্বদা রচনার বাইরে রাখবেন, কারণ বৈজ্ঞানিক সত্য সর্বকালের সর্বজনের এবং নৈর্ব্যক্তিক। একমাত্র বৈজ্ঞানিকের কোন ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বিস্তারিত ভাবে বলবার সময় বা বৈজ্ঞানিক গবেষণাদির বর্ণনা দেবার সময় লেখকের ব্যক্তিগত মন্তব্যের অত্যন্ত বেশী করেই মূল্য থাকে। কিন্তু সে মন্তব্যও নির্ভর করে তাঁর আবিষ্কৃত সত্যগুলির উপর, ব্যক্তিগত সখ-সাধ বা পছন্দ-অপছন্দের উপরে নয়। এমন কি, অপরীক্ষিত আন্দাজ বা হাইপোথিসিসগুলিকেও যুক্তি দিয়ে দাঁড় করাতে হয়। সেখানেও কল্পনার উদ্দাম ঘোড়ার লাগাম ছেড়ে দিলে চলে না। নব-রসের স্থান নেই বৈজ্ঞানিক রচনায়। অভ্রান্ত দৃষ্টি নিয়ে বৈজ্ঞানিকেরা মানস সরোবরের নীল জল পর্যবেক্ষণ করেন, ঠিক তাই দিয়েই তাঁরা মৃতদেহের ক্রমাবনতিও দেখেন—সমান যত্ন, সমান শ্রদ্ধা নিয়ে। আবেগ বলে কিছুরই স্থান নেই। কারণ আবেগ বিচার-বুদ্ধিকে ধূমাচ্ছন্ন করে দেয়। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাই ভাষাকেও হতে হয় শান্ত, সংযত ও স্ফটিকের মত স্বচ্ছ।

বৈজ্ঞানিক তথ্যকে সর্বকালের ও সর্বজনের বলে বর্ণিত করা হয়েছে, কোন বিশেষ দেশে সে আবদ্ধ থাকতে পারে না। যে কোন বৈজ্ঞানিক সত্য প্রতিষ্ঠিত হবার অনেক আগে থেকেই হয়তো দেশ-বিদেশের গবেষণাগারে তাই নিয়ে

অনুসন্ধান চলতে থাকে আর একবার প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে তো কথাই নেই—অমনি সেই সূত্রটি ধরে জ্ঞানের নব নব দিগন্ত প্রসারিত হতে থাকে। কাজেই মনে হয় বৈজ্ঞানিক শব্দগুলি, অর্থাৎ Scientific terms সব দেশবাসীর কাছে যত সহজবোধ্য হয়, ততই মঙ্গল। বৈজ্ঞানিক সত্য অন্বেষণের কাজে ভাষা যদি বাধার সৃষ্টি করে, তাহলে অনেক সময় ও শ্রম বৃথা নষ্ট করতে হয়। একই অর্থে একই শব্দ যদি সব দেশে প্রচলিত হয়, তাহলেই সবচেয়ে সুবিধা হয়।

এই নিয়ে সম্ভবতঃ বৈজ্ঞানিক আর ভাষাবিদেরা একমত হবেন না। দেশাভিমান বলে একটা জিনিষ আছে। তারই বশ হয়ে ভাষাবিদেরা এরোপ্লেনকে বলেন আকাশযান এবং লেসার-এর প্রতিশব্দ নিয়ে মুস্কিলে পড়েন। কোথায় আবিষ্কৃত হলো, কে আবিষ্কার করলো তাই নিয়ে নব-আবিষ্কৃত তথ্যের নামকরণ হতে পারে, কিন্তু দুনিয়ায় সব বিজ্ঞানীরা সেই নামটি মেনে নিলে নিজেদেরই সুবিধা হবে।

নতুন আবিষ্কার ছাড়াও বৈজ্ঞানিক রচনার আরেকটা বড় দিক আছে। সেটি হলো পুরনো তথ্য আর ব্যক্তিগত নানান ছোটখাটো অভিজ্ঞতার প্রচার। আজকাল ছোটদের সাধারণ জ্ঞান দেবার জন্যে কত যে বৈজ্ঞানিক বই লেখা হচ্ছে তার ইয়ত্তা নেই। সে সব বইয়ে কি রকম ভাষা ব্যবহার করা হবে, তা নিয়েই হলো মুস্কিল। নীরস পাঠ্যপুস্তকের মত হলেও চলবে না, আবার নিছক পরীদের গল্প ফাঁদলেও হবে না। সখ করে কেউ নীরস পাঠ্যপুস্তক পড়বে না; আবার পরীদের গল্পের মত করে বিজ্ঞান শেখাতে গেলে তার কতখানি নিছক কল্পনা আর কতখানিকে বৈজ্ঞানিক সত্য বলে গ্রহণ করা যেতে পারে, তাই নিয়ে সাধারণ পাঠকের লাগে ধাঁধা।

মনে হয় বৈজ্ঞানিক রচনাতে কোন রকম সৌখীন ভেজাল না দেওয়াই উচিত। সত্যকে আকর্ষণীয় করে তোলবার জন্যে তার গায়ে রাংতা জড়াবার দরকার করে না। বৈজ্ঞানিক লেখাতে কোন কৃত্রিম বা নকল জিনিষ থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। অন্য বৈজ্ঞানিক তথ্যের সঙ্গে তুলনা ছাড়া কোন উপমা, অলঙ্কারও বেমানান। আবার তেমনি নীরস ব্যাখ্যা হলেও তার উদ্দেশ্য বিফল হবে, কারণ কেউ পড়বে না।

জন-বিজ্ঞান বা Popular science-এর জন্যে কি রকম ভাষা সবচেয়ে ভাল হয়, তার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় জগতের অনেক বিখ্যাত ভ্রমণকারী, ভূতত্ত্ববিদ্, প্রাণিতত্ত্ববিদ্ ও গবেষকদের লেখা সত্যকার অভিজ্ঞতার বই থেকে। তার মধ্যেও অবশ্য ভাল-মন্দ আছে। কেউ কেউ পদে পদে ব্যক্তিগত মন্তব্য বা ছোটখাটো বক্তৃতা না করে পারেন না। বিজ্ঞানের দিক থেকে সে সব বাতিল। কিন্তু কেউ কেউ আছেন, যেমন স্বেন হেডিন বা অরেল-ষ্টাইন, যাঁরা পৃথিবীর নানান দুর্গম অজ্ঞাত জায়গায় নতুন নতুন তথ্য আবিষ্কারের জন্যে প্রাণ হাতে করে দীর্ঘ দিন ধরে ভ্রমণ করেছেন। তাঁরা সেখানে যেভাবে গিয়ে যা-যা যেমন-যেমন দেখেছেন, তাই দেখে যা কিছু বুঝেছেন, ঠিক সেভাবেই লিখে গেছেন। এই হলো বৈজ্ঞানিকের আসল পন্থা।

এর আলাদা এক রকম রস। সত্যের অবিকল প্রতিচ্ছবির নিজের একটা বিশুদ্ধ সৌন্দর্য আছে, তার একটা প্রচণ্ড শক্তি থাকে। তাকে যথাযথ ভাবে প্রকাশ করবার উপযুক্ত ভাষাকেও নিরাভরণ ও নির্ভীক হতে হয়। রচনা যদি ছোটদের জন্যে হয়ে থাকে, তবে ভাষা খুব সহজ ও সরল হবে; কিন্তু খোকামি বা ন্যাকামি থাকবে না। এই বিষয়ে এক রকম পবিত্রতা রক্ষা করে চলতে হয়।

বাগান করতে ওস্তাদ বলে জাপানীরা খ্যাত। শুনেছি তাঁরা যা কিছুকে অনাবশ্যক ও অবান্তর বলে মনে করেন, অমনি সেটাকে কাঁচি দিয়ে নির্মমভাবে ছেঁটে ফেলেন। শেষ পর্যন্ত বাকী থাকে

কয়েকটি অপূর্ব ভঙ্গীর ডালপালা, কয়েকটি অপূর্ব সুন্দর পাতার গুচ্ছি আর দু-একটি নিখুঁৎ ফুল। এদের মধ্যে একটিকেও ছিঁড়ে ফেললে বাগানটি ন্যাড়া দেখাবে, কারণ তারা সকলেই অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, কাকেও বাদ দিলে চলে না। সমস্তটি পরিচ্ছন্ন, প্রকট ও সপ্রকাশ।

বিজ্ঞানের ভাষাকেও ঐরকম হতে হয়—অবান্তর একটি কথাও থাকবে না। যা নইলে নিতান্তই চলে না, শুধু সেটুকুই নিজের মহিমায় প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে বিরাজ করবে। সমস্তটি হবে পরিচ্ছন্ন, একবার পড়লেই মানে বোঝা যাবে, কোন কিছু প্রচ্ছন্ন থাকবে না।

"গত কয় বৎসর বাঙলা ভাষায় যে সকল বিজ্ঞান বিষয়ক পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার প্রায় সমস্তগুলিই পাঠ্যপুস্তক শ্রেণীভুক্ত। দুই একখানি মাত্র সাধারণ পাঠোপযোগী। ইহা আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, আমাদের বর্তমান সাহিত্য হইতে বিজ্ঞান স্থানচ্যুত হইয়াছে। বিজ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ভারতবর্ষ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া ইউরোপ খণ্ডে ও এশিয়ার পূর্ব্ব প্রান্তে আশ্রয় লইয়াছেন। বাস্তবিক ৬০।৭০ বৎসর পূর্ব্বেও বাঙলা সাহিত্যের এ প্রকার দুর্গতি হয় নাই। বাঙলা সাময়িক পত্রিকায় তখন বিজ্ঞান স্বীয় স্থান অধিকার করিয়াছিল। অক্ষয়কুমার "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়" পদার্থবিদ্যা বিষয়ক যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছিলেন, রাজেন্দ্রলাল 'বিবিধার্থ সংগ্রহে' ভূতত্ত্ব, প্রাণিবিদ্যা ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বিষয়ক যে সকল প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহা বাঙলা সাহিত্যের অস্থিমজ্জাগত হইয়া থাকিবে। বাঙলা সাহিত্যে বিজ্ঞানের যাহা কিছু সমাবেশ হইয়াছে তজ্জন্য এই দুই মহাত্মার নিকট আমরা চিরঋণী থাকিব। ইঁহাদের কিছু পূর্ব্বে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 'Lord Hardinge' এর আনুকূল্যে 'Encyclopaedia Bengalensis' অথবা "বিদ্যাকল্পদ্রুম" আখ্যা দিয়া, কয়েক খণ্ড পুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশ করেন। ইহাতে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও দর্শনতত্ত্ব সকল প্রকাশিত হইত। রাজেন্দ্রলাল ও কৃষ্ণমোহন উভয়েই অশেষশাস্ত্রবিৎ ও নানা ভাষাভিজ্ঞ ছিলেন। যদিও তাঁহাদের রচনা অক্ষয়কুমারের রচনার ন্যায় প্রচলিত সাহিত্যের (Classics) মধ্যে গণ্য হইবে না, তথাপি তাঁহারা বঙ্গসাহিত্যের অভিনব পথ-প্রদর্শক বলিয়া চিরকাল মান্য হইবেন। কিন্তু ইঁহাদের পূর্ব্বেও বাঙলা সাহিত্যের উন্নতি ও প্রসারের জন্য বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধ হইয়াছিল। শ্রীরামপুরের মিশনারীগণকে বর্তমান বাঙলা গদ্য সাহিত্যের জন্মদাতা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; তাঁহারাই আবার বাঙলা ভাষায় বিজ্ঞান প্রচারেরও প্রথম প্রবর্তক। আমাদের জাতীয় অভিমান আঘাতপ্রাপ্ত হয় বলিয়া একথা আমাদের ভুলিয়া যাইলে, 'খৃষ্টানী বাঙলা' বলিয়া তাঁহাদের কৃতকার্য্যকে উড়াইয়া দিলে চলিবে না। ঐতিহাসিক ন্যায়ের ও সত্যের তুলাদণ্ড হস্তে করিয়া যাহার যে সম্মান প্রাপ্য, তাহাকে তাহা প্রদান করিবেন।"

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র

বিদ্যাসাগরের গ্রন্থাগার

রাসবিহারী রায়

দামী দামী বই। বর্ণাঢ্য মলাট। সোনার জলে নাম লেখা এবং মূল্যবান আধারে রক্ষিত। কিন্তু তাহলে কি হয়, যার বই তার পড়ার কোন স্পৃহা নেই, বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডার থেকে সে রসাস্বাদন করে না। দামী আসবাবপত্রের যা মূল্য তার কাছে বইয়েরও তাই মূল্য, এর বেশী কিছু নয়। বই সাজিয়ে রাখে গৃহের শোভাবর্ধন করতে, আভিজাত্যের প্রমাণ দিতে। রবীন্দ্রনাথ এই শ্রেণীর বিত্তবান গ্রন্থ-সংগ্রাহকদের প্রতি কটাক্ষপাত করেছেন কয়েকটি অনবদ্য ছত্রে :

পাষাণ-গাঁথা প্রাসাদ পরে
আছেন ভাগ্যবন্ত,
মেহাগিনির মঞ্চ জুড়ি
পঞ্চ হাজার গ্রন্থ ;
সোনার জলে দাগ পড়ে না
খোলে না কেউ পাতা ;
অ-স্বাদিত মধু যেমন
যুথী অনাঘ্রাতা।

কিন্তু যাঁরা ভাগ্যবন্ত নয়, যাঁদের অর্থকৌলিন্য নেই, তারাও তো বই সংগ্রহ করে মূল্যবান গ্রন্থাগার গড়ে তোলেন। এঁদের আর্থিক সঙ্গতি সীমিত, কিন্তু অধ্যয়নস্পৃহা ও জ্ঞানতৃষ্ণা অসাধারণ, এঁরা জ্ঞানতপস্বী বলেই গ্রন্থপ্রেমিক। তিল তিল করে এঁরা তিলোত্তমার সৃষ্টি করেন, সঞ্চয় করেন অমূল্য ভাণ্ডার। অ্যারিস্টটল থেকে আশুতোষ এই শ্রেণীর গ্রন্থপ্রেমিক মনীষী। আমাদের দেশে যেসব মনীষী তাঁদের ব্যক্তিগত চেষ্টায় ও অর্থে নিজস্ব গ্রন্থাগার গড়ে তোলেন, তাঁদের মধ্যে পুণ্যশ্লোক বিদ্যাসাগর অগ্রগণ্য। গ্রন্থ সংগ্রহ ও সংরক্ষণে যেমন ছিল তাঁর সযত্ন প্রয়াস, জ্ঞান আহরণেও ছিল তাঁর তেমনি গভীর অনুরাগ।

বিদ্যাসাগর দীর্ঘদিন ভাড়ার বাড়িতে বাস করেন। বাড়ি পরিবর্তনের সময় তাঁকে অনেক অসুবিধা ভোগ করতে হয়। তাঁর মূল্যবান বইগুলির ক্ষতি হয়। তাছাড়া ভাড়ার বাড়িতে ইচ্ছামত বইগুলি সাজিয়েগুছিয়ে পড়াশোনার আদর্শ পরিবেশও সৃষ্টি করা সম্ভব ছিল না। তাই তিনি পরিণত বয়সে কলিকাতায় নিজস্ব বাড়ি তৈরির ইচ্ছা করেন। পিতৃভক্ত সন্তান পিতা ঠাকুরদাসের অনুমতি নিয়ে বাদুড়বাগানে একটি বাড়ি তৈরি করান। গ্রন্থপ্রেমিক মনীষীর ইচ্ছা পূর্ণ হয়। বাদুড়বাগানের বাড়িতে 1283 সালের শীতকালে সপরিবারে তিনি প্রবেশ করেন। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এই প্রসঙ্গে বলেছেন, "তিনি 1283 সালের শেষভাগে বাদুড়বাগানে স্বকৃত নতুন বাটীতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া নিজের পরম প্রিয় পুস্তকালয়টি সুন্দর করিয়া সাজাইয়া মনের দীর্ঘকালস্থায়ী দুঃখ দূর করিলেন। পুষ্পোদ্যান পরিশোভিত নির্জন ক্ষুদ্র বাটীতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিশেষ আনন্দ এই ছিল যে, একাকী বসিয়া লেখাপড়া করিবার বিস্তর অবসর পাইতেন এবং দিবারাত্রি কোন না কোন একখানি পুস্তক লইয়া জ্ঞানচর্চ্চা বা শাস্ত্রপাঠ করিতে ভালবাসিতেন।"

বিদ্যাসাগর ছিলেন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত, সংস্কৃত শাস্ত্র ও সাহিত্যে তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল অসাধারণ। বহু অর্থ ব্যয় করে তিনি সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের বহু গ্রন্থ ও হস্তলিখিত পুঁথি সংগ্রহ করেন। শুধু সংগ্রহ নয়, সযত্নে রক্ষাও করেন। চণ্ডীচরণ এই সংগ্রহ সম্বন্ধে লিখেছেন, "সংস্কৃত

শাস্ত্র ও সাহিত্য গ্রন্থ তাঁহার পুস্তকালয়ে যেরূপ সংগৃহীত ও যত্নে রক্ষিত সেরূপ আর কোথাও হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না।”

ইংরেজী সাহিত্যের প্রতিও বিদ্যাসাগরের বিলক্ষণ অনুরাগ ছিল। তিনি নিজের চেষ্টায় ইংরেজী ভালভাবেই শিখেছিলেন, তাঁর সরকারী ও ব্যক্তিগত চিঠিপত্রে ইংরেজী জ্ঞানের পরিচয় সুস্পষ্ট। বিখ্যাত ইংরেজ গ্রন্থকারদের বহু প্রকার বই তার গ্রন্থাগারের জন্যে তিনি সংগ্রহ করেন। বিদ্যাসাগর ‘বিবলিওফাইল’ ছিলেন না, সংগ্রহ করার আনন্দের জন্যেই বই সংগ্রহ করতেন না। তাঁর আলমারীতে বই কীটদষ্ট বা ধূলিধূসরিত হতো না, অবহেলায় হৃতসৌন্দর্য হতো না। তার কারণ তিনি সবসময়েই বইয়ের যত্ন নিতেন এবং সবচেয়ে বড় কথা, তিনি যে বই ক্রয় করতেন, তা পাঠ করতেন। এই প্রসঙ্গে চণ্ডীচরণ লিখেছেন, “যে কোন বিষয়ে যখনই কেহ কোন কথা বলিয়াছেন, তাহার উত্তরে তৎক্ষণাৎ কোন সুপ্রবীণ লেখকের অভিমত উল্লেখ করিয়া তদীয় গ্রন্থ হইতে তাঁহাকে তাহা দেখাইয়া দিতে দেখিয়াছি—স্কট, সেক্সপিয়ার, মিল্টন, হাক্সলি, টিণ্ডেল, মিল, স্পেন্সার প্রভৃতি ইংরেজ কবি, উপন্যাসকার, বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিক পণ্ডিতগণের গ্রন্থগত বিষয়ের উল্লেখ করিতে দেখিয়াছি।”

সংস্কৃত ও ইংরেজী ছাড়া বাংলা, হিন্দী এমন কি, ফ্রেঞ্চ ও জার্মান ভাষার বইও তাঁর লাইব্রেরিতে রক্ষিত ছিল। বিদ্যাসাগরের সময় গ্রন্থের ডিউই প্রবর্তিত শ্রেণীবিন্যাস ছিল না, কিন্তু তিনি নিজেই গ্রন্থগুলি সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন প্রভৃতি শ্রেণীতে বিভক্ত করে লাইব্রেরীতে সাজিয়ে রাখতেন। শুধু সাজানো গোছানো নয়, সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক ছিল বইগুলির বাঁধাই-সৌকর্য। এর জন্যে তাঁকে কি পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে হতো, তা অনুমান করাও দুঃসাধ্য। প্রায় সমস্ত বই-ই সুন্দর ও সুচারুরূপে বাঁধাই করা হতো। অনেক গ্রন্থই ইংল্যাণ্ড ও জার্মেনী থেকে বাঁধাই হয়ে আসতো। এতে গ্রন্থের অঙ্গ-সৌষ্ঠব মনোরম হতো। শশিভূষণ বসু বলেন—“বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন, বিলাতে পুস্তক-বিক্রেতাদের নিকট এইরূপ বলা আছে যে, নূতন ভাল পুস্তক বাহির হইলে তাহারা একরূপ বাঁধাই করিয়া আমার এখানে পাঠাইবেন। দেখিলাম আরভিঙের স্কেচবুক এই সামান্য দরের পুস্তকখানিও অন্যান্য দামী পুস্তকের মত বাঁধান হইয়াছে। বইখানি কিনিতে যে খরচ পড়িয়াছে তাহা অপেক্ষা বাঁধাইয়ের মূল্য অধিক।” বই-বাঁধানোর এই সখ বিদ্যাসাগরের গ্রন্থপ্রীতিরই স্বাক্ষর বহন করে।

প্রথমে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার উপর বিদ্যাসাগরের কোন আস্থাই ছিল না, কিন্তু পরে এই চিকিৎসা-পদ্ধতির প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হন। হোমিওপ্যাথিক পুস্তক পাঠ করে—এমন কি, সুকিয়া স্ট্রীটের প্রসিদ্ধ ডাক্তার চন্দ্রমোহন ঘোষের কাছে কিছুকাল অ্যানাটমি শিক্ষা করে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় মনোনিবেশ করেন। এই প্রসঙ্গে বিহারীলাল সরকার বলেন—“‘এই সময় তিনি বহু সংখ্যক হোমিওপ্যাথিক পুস্তক ক্রয় করিয়াছিলেন। এই সব পুস্তক তাঁহার লাইব্রেরীতে আছে। এই লাইব্রেরীতে হোমিওপ্যাথিক পুস্তক ব্যতিত প্রায় লক্ষাধিক টাকার অন্য পুস্তক আছে।” বিদ্যাসাগরের সহোদর শম্ভুচন্দ্র বলেছেন—“বিদ্যা-সাগর মহাশয় প্রতি বৎসর থ্যাকার কোম্পানীর দ্বারা অর্ডার দিয়া বিলাত হইতে অনেক টাকার হোমিওপ্যাথিক পুস্তক আনাইয়া প্রচারের জন্য অনেককে বিনামূল্যে বিতরণ করেন। খৃঃ 1877 সাল হইতে প্রতি বৎসর প্রায় দুই শত টাকার ঔষধ ও পুস্তক বিতরণ করিতেন।......হোমিও-প্যাথিক পুস্তক বিদ্যাসাগর মহাশয়ের লাইব্রেরীতে যেরূপ দৃষ্ট হয় এরূপ অপরের পুস্তকালয়ে দৃষ্ট হয় না।”

বিদ্যাসাগরের এই বহু-প্রশংসিত গ্রন্থাগারটির সম্বন্ধে বেশ কয়েকটি কাহিনী প্রচলিত আছে। এই সব কাহিনীতে বিদ্যানুরাগী গ্রন্থপ্রেমিক বিদ্যাসাগরের পরিচয় পাওয়া যায়।

এক সম্রান্ত ব্যক্তি একদিন বিদ্যাসাগরের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। তাঁর মূল্যবান গ্রন্থসংগ্রহটি দেখে বললেন, এত অর্থ ব্যয় করে বইগুলি বাঁধিয়েছেন কেন? টাকাগুলি তো বাজে খরচ হয়ে গেছে। বিদ্যাসাগর বিস্মিত হলেন। প্রশ্ন করলেন—কেন, এতে কি দোষ হয়েছে? ভদ্রলোক সহজভাবেই বললেন, যে টাকা খরচ করে বই বাঁধিয়েছেন, সেই টাকায় তো অনেকের উপকার করতে পারতেন।

বিদ্যাসাগর তখনই ভদ্রলোকের কথার কোন উত্তর দিলেন না। এ কথা সে কথার পর জিজ্ঞেস করলেন, আপনার শাল জোড়াটা তো বেশ চমৎকার দেখছি। কত টাকায় কিনেছেন?

ভদ্রলোক উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন, শালের গুণ বর্ণনায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠলেন। শালজোড়াটা যে পাঁচ-শ' টাকায় কিনেছেন, তাও সগর্বে জানালেন।

এবার বিদ্যাসাগরের উত্তর দেবার পালা। তিনি বললেন, সে কি মশায় এত টাকা খরচ করে শাল কিনলেন? পাঁচ সিকার একটা মোটা কম্বলেই তো বেশ শীত কাটে। ঐ টাকায় তো অনেকের উপকার হতো। আমি তো মোটা চাদর গায়ে দিয়েই থাকি।

ভদ্রলোক বিদ্যাসাগরের ইঙ্গিতটা বুঝতে পারলেন। সঙ্গে সঙ্গে ত্রুটি স্বীকার করে নিলেন।

লাইব্রেরী থাকলেই বন্ধুবান্ধবেরা পড়বার জন্যে বই নিয়ে যাবে—পড়া হলেই ফেরৎ দিয়ে যাবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে। এটাই স্বাভাবিক রীতি। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় বই আর ফেরৎ আসে না। এমনি করেই ব্যক্তিগত সংগ্রহের অনেক মূল্যবান বই-ই হস্তান্তরিত হয়ে যায়। এই প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগরের একটি তিক্ত অভিজ্ঞতার কাহিনী বলা যাক।

বিদ্যাসাগরের এক বন্ধু একদিন তাঁর গ্রন্থাগার থেকে একটা মূল্যবান গ্রন্থ নিয়ে যান, অবশ্য শীঘ্রই ফেরৎ দেবেন এই কথা বলে। কিন্তু বেশ কিছু দিন যাবার পর বিদ্যাসাগর বইটার কথা তাঁকে স্মরণ করিয়ে দেন—বইটা ফেরৎ দিতে অনুরোধ করেন। বইটার কথা শোনামাত্র ভদ্রলোক সহজভাবেই উত্তর দেন, সে কি কথা ও বইটা তো ফেরৎ দিয়ে গেছি।

বিদ্যাসাগর অবাক হলেন। তাঁর একটা মূল্যবান বই হাতছাড়া হয়ে গেল। বইঅন্ত প্রাণ বিদ্যাসাগর ব্যথিত হলেন।

বিদ্যাসাগর ভাগ্যবান, তাই বইখানা তিনি ফিরে পেলেন। কিন্তু কেমন করে বইটা পেলেন, সেও এক কাহিনী।

বিদ্যাসাগরের বিশেষ পরিচিত এক পুরাতন পুস্তক বিক্রেতা একদিন তাঁর বাড়ীতে উপস্থিত। হাতে একটা দামী বাঁধানো বই। বিক্রি করতে এসেছে সে বিদ্যাসাগরের কাছে।

বইখানা দেখামাত্র বিদ্যাসাগর চমকে উঠলেন, বললেন আরে এই বইতো আমার, কোথায় পেলে তুমি? প্রশ্নের উত্তরে পুস্তক বিক্রেতা যা বললো, তা হলো এই—যে বন্ধু তাঁর কাছ থেকে বইটা পড়তে নিয়ে গিয়েছিল সেই ওকে পুরাতন বইয়ের দামে বিক্রি করে দিয়েছিল।

বন্ধুর এই হীন ব্যবহারে বিদ্যাসাগর স্তম্ভিত হলেন। সেই মুহূর্তেই বইটা তার কাছ থেকে কিনে নিলেন।

বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর কিছুকাল পরে তাঁর এই প্রাণাধিক প্রিয় বহুমূল্য গ্রন্থাগারটি লালগোলার রাজার নিকট বন্ধক দেওয়া হয়। 1914 সালে এই বিদ্যানুরাগী রাজা বন্ধকী স্বত্বটি রেজেষ্ট্রি করে গ্রন্থাগারটিকে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে দান করেন।

এই গ্রন্থাগারে রক্ষিত বাংলা, সংস্কৃত ও হিন্দী পুস্তকের মুদ্রিত তালিকায় পাঁচ শতেরও অধিক গ্রন্থ আছে। বলা বাহুল্য এই সংগ্রহটিতে সমাজ, সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, ভূগোল ধর্ম, ভাষা, কৃষি, ভ্রমণ কাহিনী, জাতিতত্ত্ব প্রভৃতি বহু বিষয়ের বই তো আছেই—এমন কি, কয়েকটি অতি ক্ষুদ্র পুস্তিকাও স্থান লাভ করেছে। যেমন—জেঞ্জেস পাইলট কোম্পানীর অনুষ্ঠান পত্র, পৃ. 31, তামাকের উপর মাশুল হওয়া বিহিত কিনা (1862), পৃ. 17, স্কুল বুক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত ধারাপাত 1862, পৃ. 19 এবং গোবীজ প্রয়োগ 1857, পৃ 29। ক্ষুদ্র পুস্তিকাগুলিও বিদ্যাসাগরের কাছে গ্রন্থাগারে রক্ষণযোগ্য ছিল। সংস্কৃত ও হিন্দী গ্রন্থ সংগ্রহে বহু মূল্যবান গ্রন্থ আছে, তাদের মধ্যে অনেকগুলি দুষ্প্রাপ্য ও দুর্লভ। কোলব্রুক সম্পাদিত অমর কোষ (1808) এবং গোল্ডস্টুকারকৃত সংস্কৃত সাহিত্যে পানিনির স্থান (বার্লিন সংস্করণ) গ্রন্থ দুটির নাম দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে। বিদ্যাসাগর সংগ্রহের অন্যান্য গ্রন্থের তালিকা আজও মুদ্রিত হয় নি।

"দেশের এই মনকে মানুষ করা কোনমতেই পরের ভাষায় সম্ভবপর নহে। আমরা লাভ করিব, কিন্তু সে লাভ আমাদের ভাষাকে পূর্ণ করিবে না; আমরা চিন্তা করিব, কিন্তু সে চিন্তার বাহিরে আমাদের ভাষা পড়িয়া থাকিবে; আমাদের মন বাড়িয়া চলিবে, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ভাষা বাড়িতে থাকিবে না—সমস্ত শিক্ষাকে অকৃতার্থ করিবার এমন উপায় আর কি হইতে পারে!

তার ফল হইয়াছে, উচ্চ অঙ্গের শিক্ষা যদি-বা আমরা পাই, উচ্চ-অঙ্গের চিন্তা আমরা করি না। কারণ, চিন্তার স্বাভাবিক বাহন আমাদের ভাষা। বিদ্যালয়ের বাহিরে আসিয়া পোশাকী ভাষাটা আমরা ছাড়িয়া ফেলি, সেই সঙ্গে তার পকেটে যা-কিছু সঞ্চয় থাকে তা আলনায় ঝোলানো থাকে; তার পরে আমাদের চিরদিনের আটপৌরে ভাষায় আমরা গল্প করি, গুজব করি, রাজা-উজির মারি, তর্জমা করি, চুরি করি এবং খবরের কাগজে অশ্রাব্য কাপুরুষতার বিস্তার করিয়া থাকি। এসত্ত্বেও আমাদের দেশে বাংলার সাহিত্যের উন্নতি হইতেছে না এমন কথা বলি না, কিন্তু এই সাহিত্যে উপবাসের লক্ষণ যথেষ্ট দেখিতে পাই।

সকলেই জানেন, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাঁচে তৈরি। ঐ বিদ্যালয়টি পরীক্ষায় পাশ করা ডিগ্রীধারীদের নামের উপর মার্কা মারিবার একটা বড়গোছের শিলমোহর। মানুষকে তৈরি করা নয়, মানুষকে চিহ্নিত করা তার কাজ। মানুষকে হাটের মাল করিয়া তার বাজার-দর দাগিয়া দিয়া ব্যবসাদারির সহায়তা সে করিয়াছে।"

—রবীন্দ্রনাথ

প্রজনন নিয়ন্ত্রণ

অরুণকুমার রায়চৌধুরী*

'জন্ম নিয়ন্ত্রণ' কথাটির মত 'প্রজনন নিয়ন্ত্রণ' কথাটি শুনতে আমরা এখনও অভ্যস্ত হই নি। জন্ম নিয়ন্ত্রণের পরবর্তী ধাপ হচ্ছে প্রজনন নিয়ন্ত্রণ। জন্ম নিয়ন্ত্রণের প্রচলিত পদ্ধতি অবলম্বন করে পরিবারের সন্তান-সংখ্যা সীমিত রাখা সম্ভব, কিন্তু সন্তানের লিঙ্গ বা বংশগত বৈশিষ্ট্যকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। পরিবারের ভাবী সন্তানটি পুত্র না কন্যা হবে, ফর্সা না কালো হবে, লম্বা না বেঁটে হবে, তা কোন দম্পতির ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না। সন্তানের লিঙ্গ ও বংশগত বৈশিষ্ট্যের ইচ্ছামত পরিবর্তন বা পরিচালন করাকে প্রজনন নিয়ন্ত্রণ বলে।

বর্তমান জনবিস্ফোরণের যুগে সমাজে অবাঞ্ছিত সন্তানের বৃদ্ধি কেউই প্রত্যাশা করেন না, কিন্তু বাঞ্ছিত সন্তানের বৃদ্ধি সকলেই কামনা করেন। কিন্তু সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের সন্তানোৎপাদন ক্ষমতার তারতম্যে শ্রেণীগত সন্তানের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। ধনী, শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির সাহায্যে পরিবারের সন্তান-সংখ্যা যেমন নিয়ন্ত্রিত করেন, দরিদ্র, অশিক্ষিত ও অবুদ্ধিমান ব্যক্তিরা তেমন করেন না। ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সমাজে অবাঞ্ছিত সন্তানের সংখ্যা বৃদ্ধি হবার সম্ভাবনা থাকে। যুদ্ধ, মহামারী অথবা দুর্ভিক্ষে যদি জনসংখ্যা হ্রাস না পায়, তাহলে ভবিষ্যৎ পৃথিবীতে বসবাস করবার জন্যে প্রতিটি ব্যক্তিকে সন্তান উৎপাদন করবার পূর্বে তার প্রজনন মূল্যায়ন করা হবে কি না, তা কে বলতে পারে!

প্রজনন-বিজ্ঞানের লব্ধ জ্ঞানের সাহায্যে গাছ-পালা ও পশু-পক্ষীর প্রজনন উন্নতি করা যদি সমীচীন বলে গণ্য করা হয়, তাহলে এই বিজ্ঞানের সাহায্যে মানব জাতিকে উন্নত করা অসমীচীন বলে গণ্য করা যুক্তিযুক্ত হবে না। প্রজনন-বিজ্ঞানীদের, মতে বাঞ্ছিত সন্তানের সংখ্যা বৃদ্ধি ও অবাঞ্ছিত সন্তানের সংখ্যা হ্রাস করাই হবে ভবিষ্যৎ মানব জাতির প্রজনন উন্নতির সহায়ক। অর্থাৎ সমাজে যদি সুস্থ ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা বেশী সংখ্যক এবং বিকলাঙ্গ, বিকৃতমস্তিষ্ক ও বংশগত রোগগ্রস্ত ব্যক্তিরা কম সংখ্যক সন্তান উৎপাদন করেন, তাহলে কালক্রমে মানব জাতির প্রজনন-চিত্র পরিবর্তিত হতে পারে। কিন্তু মানুষের বংশগত ব্যাধি ও অপ্রীতিকর বৈশিষ্ট্যকে চিরতরে বিলুপ্ত করা সময়সাপেক্ষ। সুতরাং সুস্থ ও বুদ্ধিমান সন্তান যদি বেশী সংখ্যায় বৃদ্ধি করা যায়, তাহলে উন্নত জাতের মানুষ সৃষ্টি করবার কাজ দ্রুততরভাবে সম্পন্ন হবে।

কৃত্রিম শুক্র-সঞ্চালনের (Artificial insemination) সাহায্যে মানব জাতিকে উন্নত করবার পরিকল্পনা অনেকে করে থাকেন। সমাজে যাঁরা শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক দিক দিয়ে উন্নত, তাঁদের স্পার্ম নারীদেহে অনুপ্রবেশ করিয়ে প্রয়োজনীয় গুণসম্পন্ন সন্তানের সৃষ্টি করা যেতে পারে। অনির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত স্পার্ম সংরক্ষণ করা সম্ভব হলে, যে কোন পুরুষ তার মৃত্যুর পরেও যেমন ভাবী সন্তানের জনক হতে পারবেন, তেমন যে কোন নারী পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের শ্রেষ্ঠ পুরুষের স্পার্ম ব্যবহার করে শ্রেষ্ঠ কস্‌মোপলিটান পরিবার গঠন করতে পারবেন। তবে এই পরিকল্পনা বাস্তবে

* বসু বিজ্ঞান মন্দির, 93/1, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-9

রূপায়িত করতে বহু সামাজিক, ধর্মীয় ও আইনগত বাধার সম্মুখীন হতে হবে, একথা নিশ্চিতভাবে বলা যেতে পারে।

সম্প্রতি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর আর. জি. এডওয়ার্ডস ও তাঁর সহকর্মীরা স্ত্রীলোকের ডিম্বাশয় থেকে ডিম্বাণু বের করে নিয়ে সেটিকে টেস্ট-টিউবে পুরুষের শুক্রাণুর সাহায্যে নিষিক্ত করে মানব-ভ্রূণ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন। এই ভ্রূণ যে কোন স্ত্রীলোকের জরায়ুতে প্রতিস্থাপন করে সন্তানের জন্ম ঘটানো যেতে পারে। নারীদেহের বাইরে ভ্রূণ উৎপাদনের পদ্ধতি যখন উন্নতি লাভ করবে, তখন নির্বাচিত শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর মিলন ঘটিয়ে সন্তানের লিঙ্গ, আকৃতি, প্রকৃতি ও বুদ্ধিবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, এই পদ্ধতির সাহায্যে নানাবিধ বংশগত ব্যাধির আবির্ভাব রোধ করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ তাঁরা উল্লেখ করেছেন যে, বংশগত হিমোফিলিয়া (রক্ত জমাট না বাঁধবার রোগ) রোগগ্রস্ত পুরুষের সব কন্যা হিমোফিলিয়া রোগের প্রচ্ছন্ন বাহক হয়ে জন্মগ্রহণ করে এবং তাদের অর্ধেক সংখ্যক পুত্রসন্তানের ঐ রোগে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু বাহক স্ত্রীলোকেরা যদি পুং-ভ্রূণকে গর্ভে ধারণ না করেন, তাহলে তারা রোগাক্রান্ত পুত্রসন্তানের মাতা হবার আশঙ্কা থেকে মুক্ত থাকতে পারবেন। বিজ্ঞানের ফিটোলজি শাখার উন্নতি হলে ভ্রূণের জন্মগত বিকৃতি বা রোগের বীজকে নিরূপণ করা সহজ হবে। ভ্রূণের কোষে মানুষের স্বাভাবিক ক্রোমোসোম সংখ্যা 46টির পরিবর্তে যদি 47টি দেখা যায়, তাহলে সেই ভ্রূণ থেকে জড়বুদ্ধি সন্তানের ভূমিষ্ঠ হবার সম্ভাবনা থাকে। এরূপ ক্ষেত্রে ভ্রূণের কোয়ালিটি কন্ট্রোল করা অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাঁড়াবে। কোন ভ্রূণে ক্রোমোসোম বিশৃঙ্খলার অস্তিত্ব যদি ধরা পড়ে, তাহলে তাকে পৃথিবীতে আসবার ছাড়পত্র দেওয়া হবে না।

টেস্ট-টিউব মানব সন্তান সমাজে সমাদৃত হলে যে কোন দম্পতি যেমন ইচ্ছামত পুত্র বা কন্যা সন্তান লাভ করবেন, অনেক বন্ধ্যা নারীও তেমনি অপত্য লাভের সুযোগ পাবেন। সন্তানের প্রকৃত মাতা না হলেও অনেক স্ত্রীলোক গর্ভধারিণী মাতা হবার গৌরব অর্জন করবেন। নার্শারি দোকান থেকে বিভিন্ন জাতের ফুলের বীজ কেনবার মত অদূর ভবিষ্যতে যে কোন স্ত্রীলোক দু-চার দিন বয়সের বিভিন্ন গুণের লেবেল-আঁটা মানব-ভ্রূণ কিনে নিজের ইচ্ছানুযায়ী মানবশিশু উৎপাদন করতে সক্ষম হবেন। তখন হয়তো খবরের কাগজে 'Own your own flat'-এর ন্যায় 'Own your own child'-এর বিজ্ঞাপন দেখা যাবে। অনুমান করা যেতে পারে, তখন হয়তো দেশের প্রজননতত্ত্ববিদ্‌দের একটি বোর্ড গঠন করা হবে, তাদের কাছে প্রতি পরিবারের বংশলতিকা থাকবে এবং তারই ভিত্তিতে পুরুষের শুক্রাণু ও স্ত্রীলোকের ডিম্বাণু নির্বাচন করে মানব-ভ্রূণ সৃষ্টি করা হবে। এইভাবে প্রজনন নিয়ন্ত্রিত হলে মানবজাতির পরিণাম শুভ হবে কি অশুভ হবে, তা বলা শক্ত। নোবেল পুরস্কার বিজয়ী স্যার সি. ভি. রামন মন্তব্য করেছেন যে, যে ক্ষেত্রে লক্ষ লক্ষ অবাঞ্ছিত শিশুর জন্মরোধ করা সমস্যা, সে ক্ষেত্রে টেস্ট-টিউবে কৃত্রিম প্রাণ সৃষ্টি করা দায়িত্বহীনতার পরিচায়ক।

ডক্টর হরগোবিন্দ খোরানার কৃত্রিম ডি-এন-এ আবিষ্কারের পর থেকে প্রজনন নিয়ন্ত্রণের এক নতুন দ্বার খুলে গেছে। এটা আজ বৈজ্ঞানিকভাবে স্বীকৃত যে, মানুষের যাবতীয় বংশগত বৈশিষ্ট্যের মূল তার কোষের কেন্দ্রে ডি-এন-এ (ডিঅক্সিরিবো নিউক্লিক অ্যাসিড) নামক জৈব-রাসায়নিক পদার্থে নিহিত থাকে এবং তা পিতা-মাতা থেকে বংশপরম্পরায় সন্তান-সন্ততির মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে থাকে। চার প্রকার নিউক্লিওটাইডের ক্রমিক সজ্জায় শিকলের মত গড়ে ওঠে

ডি-এন-এ-র একটি অতিকায় অণু। এর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশকে জিন বলে এবং তারাই বিভিন্ন বংশগত বৈশিষ্ট্যকে নিয়ন্ত্রিত করে। ডি-এন-এ অণুর ত্রুটি-বিচ্যুতিতে নানাবিধ বংশগত ব্যাধি ও অপ্রীতিকর বৈশিষ্ট্যের আবির্ভাব ঘটে। সুতরাং এই অতিকায় অণুর বিভিন্ন অংশের সঙ্গে বিভিন্ন বংশগত বৈশিষ্ট্যের পারস্পরিক সম্বন্ধটা যখন পরিষ্কারভাবে জানা যাবে, তখন ভাইরাসের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় কৃত্রিম ডি-এন-এ মানুষের শরীরে ঢুকিয়ে তার ত্রুটিপূর্ণ ডি-এন-এ-র অংশবিশেষকে সংশোধন করে বংশগত বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন করা সম্ভব হবে। ডি-এন-এ অণুর অংশবিশেষের পরিবর্তন করাকে জেনেটিক সার্জারি এবং সামগ্রিকভাবে নিউক্লিওটাইডের সজ্জাক্রমের রদবদল করাকে জেনেটিক ইঞ্জিনীয়ারিং বলে। এই পদ্ধতির উন্নতি ঘটলে মানুষের বংশগত ব্যাধির মূলকে চিরতরে উৎপাটন করা ছাড়া ও অর্ডারমাফিক বংশগত বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করা সম্ভব হবে।

যৌন-প্রক্রিয়া ব্যতিরেকে কাটিং বা কলম তৈরি করে একটা গাছ থেকে যেমন অনুরূপ অনেক গাছ সৃষ্টি করা যায়, তেমনি অদূর ভবিষ্যতে মানুষের দেহকোষের নিউক্লিয়াস অন্য কোষে প্রতিস্থাপন করে একই ধরণের অসংখ্য মানুষ সৃষ্টি করা যাবে বলে অনেকে আশা করেন। এই পদ্ধতিকে ক্লোনিং বলে। গবেষণাগারে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, ব্যাঙাচির দেহকোষ থেকে নিউক্লিয়াস বের করে নিয়ে নিউক্লিয়াসবিহীন আর একটি ব্যাঙাচির কোষে যদি প্রতিস্থাপন করা যায়, তাহলে কোষের বিভাজন সুরু হতে থাকে এবং কালক্রমে এক নতুন ব্যাঙাচির দেহ ধারণ করে। এই নতুন ব্যাঙাচি গঠনে, প্রকৃতিতে ও অনুভূতিতে প্রথম ব্যাঙাচির দ্বিতীয় সংস্করণ বলা যেতে পারে। এই ক্লোনিং পদ্ধতি যখন উন্নতি লাভ করবে, তখন মানুষের দেহকোষের মধ্যস্থিত নিউক্লিয়াস একটি ডিম্বকোষে বসিয়ে এবং সেটিকে স্ত্রীলোকের জরায়ুতে প্রতিস্থাপন করে যে সন্তান সৃষ্টি করা হবে, তার আকৃতি, প্রকৃতি প্রভৃতি প্রথমোক্ত ব্যক্তির অনুরূপ হবে। এভাবে যে অসংখ্য যমজ সন্তানের সৃষ্টি হবে, তাদের চেহারা একে অন্যের অবিকল অনুরূপ হবে।

যাঁরা অসংখ্য যমজ সন্তান সৃষ্টি করবার কথা চিন্তা করেন, তাঁরা বলেন যে, ডি-এন-এ অণুর নিউক্লিওটাইডের সজ্জাক্রমকে ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রণ করা অপেক্ষা ক্লোনিং পদ্ধতিতে সহজে ও দ্রুতভাবে বাঞ্ছিত সন্তান উৎপাদন করা সম্ভব। তাছাড়া তাঁরা বলেন যে, জগতে প্রতিভাবান ব্যক্তিদের সংখ্যা বিরল। হাজার হাজার জিনের এক বিশেষ সম্মেলনের ফলে প্রতিভাবান ব্যক্তিদের আবির্ভাব ঘটে। যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁদের জিন সমষ্টির সমন্বয় না জানা যাচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃতির উপর নির্ভর না করে ক্লোনিং পদ্ধতির সাহায্যে অনুরূপ প্রতিভাবানদের সংখ্যা সহজে বৃদ্ধি করা যেতে পারে। তখন হয়তো হাজার নিউটন, আইনষ্টাইন, সেক্সপীয়ার, রবীন্দ্রনাথ, মোজার্ট, বিঠোফেন সৃষ্টি করা অসম্ভব হবে না। তখন কোন দেশে ব্রেন ড্রেনের সমস্যা আর থাকবে না। খোরানা, চন্দ্রশেখর ও নারলিকারের জন্যে আমাদের আর আফশোষ করতে হবে না। কিন্তু দেবতা গড়তে গিয়ে অসংখ্য দানব যে সৃষ্টি করা হবে না, তার নিশ্চয়তা কে দেবে?

মানবজাতির উন্নতিতে কোন্ বৈশিষ্ট্যগুলি বাঞ্ছিত এবং কোন্‌গুলি অবাঞ্ছিত, তা বিতর্কিত। যে বৈশিষ্ট্য আজ বাঞ্ছিত বলে স্বীকৃত, আগামীকাল তা বাঞ্ছিত বলে গণ্য নাও হতে পারে। তাছাড়া মানুষের বাঞ্ছিত বৈশিষ্ট্য (যেমন—বুদ্ধিবৃত্তি) কতটা বংশগত এবং কতটা পরিবেশগত প্রভাবের উপর নির্ভর করে, সে সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ আছে। বংশানুক্রম ও পরিবেশের সমষ্টিগত প্রভাবে মানব-বৈশিষ্ট্য গঠিত হয়। শুধু যদি বংশানুক্রমকে উন্নত করে পরিবেশের কোন পরিবর্তন না করা হয়, তাহলে মানবজাতি উন্নতির পথে অগ্রসর হবে কি না সন্দেহ। তবে ভবিষ্যৎ সমাজে, মানুষ যে বৈশিষ্ট্যকে বেশী মর্যাদা দেবে, প্রজনন নিয়ন্ত্রণ করে সেই বৈশিষ্ট্যের বেশী সংখ্যক সন্তান সৃষ্টি করা হবে। সুতরাং এটা আশা করা বোধ হয় খুব বাড়াবাড়ি হবে না যে, অদূর ভবিষ্যতে মানুষ নিজেই নিজের বিবর্তনধারাকে নিয়ন্ত্রণ করবে।

ভারতের কন্দ ও খাদ্য হিসাবে তাদের ব্যবহার

বলাইচাঁদ কুণ্ডু *

ক্রমাগত লোকসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে খাদ্য-সমস্যার যে ভয়াবহ রূপ দেখা যাচ্ছে, তাতে সকলেই বিশেষ উদ্বিগ্ন হচ্ছেন। ধান, গম, ভুট্টা প্রভৃতি শস্যের অধিকতর ফলনের জন্যে যে চেষ্টা চলছে, তা অনেকটা সফল হয়েছে। কিন্তু লোকসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে মাথাপিছু খাদ্যশস্যের পরিমাণ প্রায় আগের মতই রয়ে গেছে, অর্থাৎ শস্যের উৎপাদন কিছু বৃদ্ধি হলেও সাধারণ লোকের খাদ্যাভাব পূরণ হচ্ছে না। খাদ্যের জন্যে সাধারণতঃ আমরা ধান, গম, ভুট্টা প্রভৃতি শস্যের উপর নির্ভর করি। কিন্তু বন্যা, খরা ও কীট-পতঙ্গের আক্রমণের ফলে শস্যহানি হলে দুর্ভিক্ষ বা সেই রকম অবস্থার উদ্ভব হয়। সেই সময় দরিদ্র জনগণ মহার্ঘতা, তথা অপ্রতুলতার জন্যে এই সব শস্যের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করতে পারে না। দেখা গেছে, তখন তারা সহজলভ্য কন্দমূলজাতীয় খাদ্যের উপর অনেকাংশে নির্ভর করে।

'চলন্তিকা'য় কন্দ শব্দের অর্থ: কলাকার উদ্ভিদমূল, tuber, (যথা—আলু, কচু)। আলু, কচু ব্যতীত আরো অনেক প্রকার কন্দ আছে, যেমন —লাল আলু, শিমুল আলু, ওল ইত্যাদি এবং এগুলি সবই মূল নয়, কতকগুলি যেমন—আলু, কচু, ওল, আদা, শটী প্রভৃতি কাণ্ডের পরিবর্তিত আকার বিশেষ। কিন্তু লাল আলু, শিমুল আলু, শাঁখ আলু প্রভৃতি মূলেরই রূপান্তর। খাদ্য সঞ্চিত হবার ফলে স্ফীতাকার মৃত্তিকানিম্নস্থ মূল বা কাণ্ডকে বাংলা ভাষায় কন্দ বলা হয়।

ভারতের গ্রামাঞ্চলে এই সব কন্দজাতীয় অনেক প্রকার ফসল স্বতঃই উৎপন্ন হয়ে থাকে। অবশ্য কোন কোন জায়গায় কোন কোন জাতীয় ফসলের সামান্য চাষ করা হয়। তবে খাদ্যজাতীয় শস্য বা বহু ব্যবহৃত আলুর মত এদের ব্যাপক চাষ কোথাও হয় না। দেশের বর্তমান অবস্থায়, বিশেষতঃ ভবিষ্যৎ খাদ্যাভাবের দিকে লক্ষ্য রেখে এই সব কন্দজাতীয় ফসলের চাষের প্রসার ও তাদের উৎকর্ষ সাধনের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া একান্ত আবশ্যক।

ইদানীং পৃথিবীর উন্নতিকামী দেশসমূহে বিভিন্ন জাতের কন্দ সম্বন্ধে যথেষ্ট আগ্রহ দেখা যাচ্ছে। 1967 সালে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের ট্রিনিডাড সহরে এই সম্বন্ধে এক আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেখানে ভারতীয় কন্দ সম্বন্ধে প্রবন্ধ প্রেরণের জন্যে অনুরুদ্ধ হয়ে লেখক ভারতের বিভিন্ন স্থানে যে সব কন্দজাতীয় ফসল জন্মায়, সেগুলি পর্যবেক্ষণ করে অনেক তথ্য লিপিবদ্ধ করেছিলেন (Edible rhizomatous and tuberous crops of India (other than potato)—Proceedings International Symposium on Tropical Root Crops. Trinidad, 1967)। দেখা গেছে যে, সেখানে প্রচলিত অধিকাংশ কন্দ আমাদের দেশজ কন্দের তুলনায় পৃথক।

দক্ষিণ আমেরিকা, উত্তর আমেরিকা, মালয় প্রভৃতি দেশ থেকে বহুদিন আগে এই সব কন্দ এদেশে আনা হয়েছিল এবং সেগুলি এখন এদেশে সর্বত্র স্বতঃই উৎপন্ন হচ্ছে বা কোন কোন স্থানে চাষও হচ্ছে।

---

* বসু বিজ্ঞান মন্দির, 93/1, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-9

'ভারতের খাদ্য-সমস্যার সমাধান সম্বন্ধে কয়েকটি কথা' শীর্ষক প্রবন্ধে (জ্ঞান ও বিজ্ঞান, April, 1969) লেখক তিন প্রকার কন্দমূলের উপযোগিতার বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেছিলেন। বর্তমান প্রবন্ধে এই জাতীয় কতকগুলি ফসলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হলো। অবশ্য আলু, বীট, শালগম, গাজর ও মূলা প্রভৃতি যেগুলি সাধারণতঃ খুবই পরিচিত, তা এই তালিকায় নেই। কন্দজাতীয় ফসলগুলি পতিত বা অপেক্ষাকৃত নিম্নশ্রেণীর জমিতে অথবা অন্যান্য প্রধান ফসলের সঙ্গে একই জমিতে চাষ করা যেতে পারে।

ক্যাসাভা অথবা ট্যাপিওকা বা শিমুল আলু (Manihot esculenta Crantz)—এটি ভারাণ্ডা জাতীয় দক্ষিণ আমেরিকার এক প্রকার ঝোপ-জাতীয় গাছ। এর মূলগুলি গুচ্ছাকারে থাকে এবং লাল আলুর মত লম্বা ও মোটা হয়। এদের পাতা অনেকটা শিমুল গাছের পাতার মত বলে অনেক জায়গায় একে শিমুল আলু বলা হয়। বহুদিন আগে পর্তুগীজদের দ্বারা এটা ব্রেজিল থেকে দক্ষিণ ভারতে আনীত হয়েছিল। ভারতবর্ষে এই আলু প্রধানতঃ কেরালা ও মাদ্রাজ প্রদেশে প্রায় 500,000 একর জমিতে চাষ হয়। আলু ছাড়া অন্যান্য কন্দজাতীয় ফসলের মধ্যে গুরুত্ব হিসাবে এর স্থান দ্বিতীয়, লাল আলু প্রথম।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় যখন বর্মাদেশ থেকে চাউলের আমদানী বন্ধ হয়ে যায়, তখন খাদ্য হিসাবে ক্যাসাভার গুরুত্ব খুবই বৃদ্ধি পায় এবং মাদ্রাজ ও কেরালা ব্যতীত অন্যান্য দেশেও এর চাষের চেষ্টা হয়। সেই সময় দুর্ভিক্ষে যখন বাংলা দেশের সহস্র সহস্র লোক অন্নাভাবে মৃত্যুবরণ করছিল, তখন কেরালায় খাদ্যের অবস্থা অধিকতর শোচনীয় হলেও ক্যাসাভার জন্যে খাদ্যাভাবে সেখানে মৃত্যুর সংখ্যা খুবই কম হয়েছিল।

এই আলুতে Hydrocyanic acid আছে। এজন্যে খাবার পূর্বে জলে ভাল করে ধুয়ে নিতে হয়। এতে প্রোটিনের অংশ খুবই কম। এজন্যে কেরালা প্রদেশে, যেখানে প্রচুর সামুদ্রিক মাছ পাওয়া যায়, সেখানকার দরিদ্র লোকেরা শুষ্ক মাছের সঙ্গে এগুলি খেয়ে থাকেন। এতে তাঁদের খাদ্যমূল্যের সমতা রক্ষিত হয়। বর্তমানে অধিক প্রোটিনযুক্ত শিমুল আলু উৎপাদনের চেষ্টা চলছে।

মহীশূরে অবস্থিত কেন্দ্রীয় খাদ্য গবেষণাগারে কয়েক বছর ধরে চেষ্টা করে 60 ভাগ ক্যাসাভা চূর্ণ, 15 ভাগ চীনাবাদামের খৈল চূর্ণ ও 25 ভাগ গমজাত সুজি মিশিয়ে এক প্রকার পুষ্টিকর খাদ্য (ট্যাপিওকা ম্যাকারোনি) তৈরি করা হয়েছে। এই খাদ্য প্রকৃতিজাত চাউল অপেক্ষা অধিকতর পুষ্টিকর এবং এতে অধিক পরিমাণে ক্যালসিয়াম ও ভিটামিন আছে।

ধান বা গম যে সব জমিতে চাষ করা যাবে না, সেই সব অনুর্বর জমিতে অবিমিশ্র ফসল হিসাবে অথবা কলা বা লাল আলুর সঙ্গে একই জমিতে শিমুল আলুর চাষ করা যেতে পারে। ব্রেজিলে উচ্চ জমির ধানের সঙ্গে একই জমিতে এর চাষ হয়। ধান কেটে নেবার কিছুদিন পরে আলুগুলি তোলা হয়। এই আলুর ফলন সাধারণতঃ বেশ ভালই হয়। সাধারণতঃ একর-প্রতি 3 থেকে 12 টন পর্যন্ত মূল পাওয়া যায়। কেরালায় কোন কোন স্থানে 20-22 টন পর্যন্ত মূল উৎপন্ন হয়।

লাল আলু (Ipomoea batatus)—আলু ব্যতীত অন্যান্য কন্দসমূহের মধ্যে লাল আলুই প্রধান। এটা কলমি শাকের মত এক প্রকার লতানে গাছ। এর প্রধান কাণ্ডের নিম্নভাগে মাটির নীচে যে সব শিকড় উৎপন্ন হয়, তাদের অধিকাংশ লম্বাকৃতির কন্দমূলরূপে গুচ্ছাকারে থাকে। লতানে কাণ্ডের গাঁট থেকে যে সব অস্থানিক মূল বের হয়, সেগুলিও স্ফীত হয়ে কন্দাকৃতি

ধারণ করে। ভারতে প্রায় চার লক্ষ একর জমিতে লাল আলুর চাষ হয় এবং 13 লক্ষ টন আলু উৎপাদিত হয়। পশ্চিম বঙ্গে মাত্র 6000 একর জমিতে এই আলুর চাষ হয়।

পর্তুগীজেরা দক্ষিণ আমেরিকা থেকে লাল আলু নিয়ে এসে এদেশে চাষের প্রবর্তন করে। সাধারণতঃ দুটি বিভিন্ন জাতের আলুর চাষ হয়—একটির ছাল লাল, অন্যটির ছাল সাদা। এই উভয় জাতীয় আলুর ভিতরের শাঁস সাদা। কিছুকাল আগে যুক্তরাষ্ট্র থেকে এক প্রকার উন্নত জাতের লাল আলু এনে এদেশে কোথাও কোথাও চাষ করা হচ্ছে। এগুলির ছাল হাল্কা বাদামী বা হলদে রঙের এবং শাঁস হলদে বা কমলা রঙের। সিদ্ধ করলে বা আগুনে সেঁকা হলে এই জাতীয় আলুর শাঁস গাজরের রঙের মত হয়। এগুলি খেতেও খুব সুস্বাদু।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় যখন দেশে নিদারুণ খাদ্যাভাব হয়, তখন অবহেলিত লাল আলুর উপর সরকারের দৃষ্টি পড়ে। কয়েকটি প্রগতিশীল দেশ থেকে অধিকতর ফলনশীল আলুর আমদানী করে এদেশের জলহাওয়ার উপযোগী করবার ব্যবস্থা হয়। খাদ্য হিসাবে লাল আলু যথেষ্ট পুষ্টিকর।

লাল আলু কাঁচা কিম্বা সিদ্ধ করে, ভেজে বা আগুনে সেঁকে খাওয়া যায়। রান্না করলে এর মিষ্টত্বও অনেক বেড়ে যায়। এতে যথেষ্ট প্রোটিন ও ভিটামিন থাকে। লাল আলুর শাঁস শুকিয়ে গুঁড়া করে তা ময়দা বা আটার সঙ্গে মিশিয়ে চাপাটি বা রুটি তৈরি করা যায় এবং বিভিন্ন মিষ্টদ্রব্য প্রস্তুত করতেও তা ব্যবহার করা যেতে পারে।

চীন, জাপান ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে খাদ্য হিসাবে লাল আলুর প্রচলন যথেষ্ট আছে। আমাদের মত দরিদ্র দেশে লাল আলুর প্রচলন অনেক বেশী হওয়া আবশ্যক।

খাম আলু বা চুপড়ি আলু (Dioscorea spp)—এটা এক প্রকার একবীজপত্রী লতানে গাছ। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে গ্রামাঞ্চলে বা বনে-জঙ্গলে জন্মায়। বহু জাতীয় খাম আলু আছে, তার মধ্যে 7-8টি প্রজাতি খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে, তবে তিনটি প্রজাতির প্রচলন খুবই বেশী। এদের মধ্যে মূলের আয়তন ও আকৃতিগত পার্থক্য আছে। কোন কোন প্রজাতিতে একটি মাত্র বড় গোলাকার মূল হয়, আবার কোন কোন প্রজাতিতে লাল আলুর মত লম্বাকৃতির অনেকগুলি গুচ্ছাকার মূল থাকে। যেখানে একটি মাত্র কন্দ জন্মে, সে ক্ষেত্রে কখনো কখনো এক-একটি কন্দ 15-20 কিলোগ্র্যাম ওজনেরও হয়ে থাকে। উঁচু জমিতে আদা, বেগুন, লাল আলু ও ভুট্টার সঙ্গে খাম আলুর চাষ করা যেতে পারে। 7-8 মাসের মধ্যে কন্দগুলি পরিণত অবস্থায় উপনীত হয়।

খাম আলুর স্বাদ অনেকটা গোল আলুর মত এবং এগুলি খুবই পুষ্টিকর। এদের একটা বিশেষ স্বাদ আছে, এজন্যে অনেকে সব্জী বা তরকারী হিসাবে এগুলি খুব পছন্দ করেন।

ভারতের বিভিন্ন পার্বত্য অঞ্চল ও দণ্ডকারণ্যের আদিম অধিবাসীরা খাদ্যশস্যের অজন্মার সময় বনে-জঙ্গলে উৎপন্ন খাম আলুর উপর খুবই নির্ভর করে।

খাদ্য ব্যতীত কোন কোন জাতের খাম আলু নানাবিধ প্রয়োজনীয় ওষুধের কাঁচামাল হিসাবে আজকাল প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হচ্ছে।

আর্টিচোক (Helianthus tuberosus) - এটা সূর্যমুখীফুলজাতীয় উত্তর আমেরিকার এক প্রকার গাছ। মাটির নীচে কাণ্ডের তলদেশে আলুর মত এদের অনেকগুলি কন্দ হয়। ভারতবর্ষে পাহাড়ী অঞ্চলে এদের চাষ হয়। যেখানে অন্য কিছু জন্মানো যায় না, সেখানে আর্টিচোক সহজে জন্মানো যেতে পারে। কন্দগুলি অনেকটা আলুর

মত। তবে এদের চোখগুলি খুব বড় বড়। কাঁচা অথবা সিদ্ধ করে বা ভেজে এই কন্দ খাওয়া যায়।

খাদ্যমূল্য হিসাবে আর্টিচোক আলুর মত উপকারী। যদিও পাহাড়ী অঞ্চলে এরা জন্মায়, তথাপি চেষ্টা করলে সমতল ভূমিতে এদের জন্মানো যেতে পারে। জমি ভালভাবে তৈরি করে ঠিক আলুর মত একটি পুরা আর্টিচোক অথবা 2-1টি চোখবিশিষ্ট টুকরা পাহাড়ী অঞ্চলে ফেব্রুয়ারী থেকে এপ্রিল মাসের মধ্যে বা সমতল ভূমিতে আরো কিছু পরে লাগাতে হয়। গোড়ার দিকে সেচের ব্যবস্থা একান্ত আবশ্যক। চার থেকে সাত মাসের মধ্যে কন্দগুলি পরিণতি লাভ করে এবং একর প্রতি পাঁচ থেকে দশ টন ফলন হয়।

কচু (Colocasia esculentus)—এরা Araceae গোত্রের Colocasia জাতের অন্তর্গত এক প্রকার একবীজপত্রী উদ্ভিদ। Colocasia জাতের 13-14টি প্রজাতি আছে। ভারতে কিন্তু মাত্র 5-6টি পাওয়া যায়। এদের মধ্যে C. esculentus-এর চাষ ভারতের প্রায় সর্বত্রই অল্প পরিমাণে হয়। এর আবার নানাবিধ রকমফের (Variety) আছে। কন্দগুলির আকৃতি নানা প্রকারের হয়ে থাকে। পাতার আকৃতিতেও কিছু কিছু পার্থক্য থাকে। সাধারণতঃ কন্দের আকার বা স্বাদের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এদের নানাবিধ প্রচলিত নাম হয়েছে; যেমন—মুকী কচু, ঘট কচু, জোট কচু, জল কচু, মাখন কচু, সর কচু, শোলা কচু ইত্যাদি। এই সব কচুর পাতাও সজী হিসাবে যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়।

খাদ্য হিসাবে কচু আলুর মত ব্যবহৃত হতে পারে। আলু অপেক্ষা এগুলি অধিকতর পুষ্টিকর, কারণ এতে প্রোটিনের অংশ অনেক বেশী থাকে। তাছাড়া এতে ক্যালসিয়াম ও ফস্ফরাস যথেষ্ট পরিমাণে থাকে। তরকারী ছাড়া এগুলি সেঁকে বা অল্প পুড়িয়ে চাটনী সহযোগে খেতে খুবই মুখরোচক। পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ ও বিহারের লোকেরা এভাবে এগুলি খুব খেয়ে থাকে। অন্য অনেক প্রকার খাদ্য তৈরি করাও সম্ভব। লেখক যুক্তরাষ্ট্রের হাওয়াই দ্বীপের আদিম অধিবাসীগণ কর্তৃক বিভিন্ন প্রকার কচু থেকে নানাবিধ মুখরোচক খাদ্য প্রস্তুত করতে দেখেছেন। একটু রকমফের করে সেই সব খাদ্য আমাদের দেশের লোকের স্বাদোপযোগী করা যেতে পারে।

মানকচু (Alocasia spp)—এরা কচুজাতীয় এবং Alocasia জাতের অন্তর্গত একবীজপত্রী উদ্ভিদ। এশিয়া মহাদেশে প্রায় 60 রকমের Alocasia-এর প্রজাতি পাওয়া যায়। এদের মধ্যে A. cucullata Schott, A. indica (Roxb) Schott এবং A. macrorrhiza Schott—এই তিনটি প্রজাতির চাষ সাধারণতঃ হয়ে থাকে। এদের কন্দগুলি লম্বাটে ও খাড়া হয়ে থাকে—এক-একটির ওজন 1 কিলো থেকে 10 কিলো বা ততোধিক হয়ে থাকে। কচুগুলি দেখতে প্রায় এক রকম এবং বিভিন্ন প্রজাতীয় হলেও সবগুলিকেই মানকচু বলা হয়। এদের মধ্যে আবার A. indica-র চাষ সবচেয়ে বেশী হয়। এদের কন্দগুলি 30 থেকে 60 সেন্টিমিটার বা কখনও আরও বেশী লম্বা হয় এবং ব্যাস 10 থেকে 20 সেন্টিমিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে। ভারতের অনেক অংশে, বিশেষতঃ আসাম ও বাংলা দেশে এর চাষ অল্প পরিমাণে হয়।

সাধারণতঃ সজী বা তরকারী হিসাবে এগুলি ব্যবহৃত হলেও এথেকে বিশুদ্ধ শ্বেতসার তৈরি হতে পারে। মানকচুর ময়দা হাল্কা ও পুষ্টিকর এবং রোগীর পথ্য হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে।

40-50 বছর আগে আমরা গ্রামাঞ্চলে প্রত্যেক গৃহস্থের বাটীর আঙ্গিনায় কোন না

কোন প্রকারের মানকচু লাগাতে দেখেছি। পাঁচ বছর আগে বর্তমান পর্যবেক্ষণের (Survey) সময় সেই সব গ্রামে গিয়ে মানকচুর গাছ আর তেমন দেখতে পাই নি। অথচ পুষ্টিকর তরকারী হিসাবে মানকচু এখনও সমানভাবেই আদৃত। এই গাছ লাগানও খুব সহজ।

মাখনকচু (Xanthosoma sagittifolium)—এই প্রকার কচু কোন কোন স্থানে দেখতে পাওয়া যায়। এর উৎপত্তি স্থল দক্ষিণ আমেরিকার উষ্ণ অঞ্চলসমূহে। ফিলিপাইন ও মালয়ে এদের চাষ হয়। এই কচু অনেকটা মানকচুর মত, তবে এতে আদৌ ছিবড়া থাকে না। এজন্যে সিদ্ধ করলে খুব মোলায়েম ও খেতে খুব সুস্বাদু হয়।

ওল—ওল কচুর মত Araceae গোত্রের Amorphophallus জাতের এক প্রকার উদ্ভিদ। Amorphophallus জাতের প্রায় 90টি প্রজাতি আছে, তার মধ্যে 14টি ভারতে পাওয়া যায়। এগুলি এখানে-ওখানে, বনে-জঙ্গলে জন্মে এবং সবগুলির প্রায় একই রকমের কন্দ হয়। এর মধ্যে Amorphophallus campulatus blume—এই প্রজাতিটির কন্দ খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। বাকীগুলিকে বুনো ওল বলা হয়। এগুলি বিষাক্ত ও অখাদ্য। ওল সাধারণতঃ অর্ধগোলাকার হয়, তবে কখনো কখনো কিছুটা লম্বাকৃতিরও হয়ে থাকে। এদের ওজন এক থেকে দুই কিলো পর্যন্ত হয়। বোম্বাই, পুনা প্রভৃতি অঞ্চলে 4 থেকে 20 কিলোগ্রাম ওজনের ওল দেখতে পাওয়া যায়।

ওলের চাষ খুব সহজেই হয়। হাল্কা জমিতে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে একবার ওল লাগালে আর বিশেষ কোন যত্নের আবশ্যক হয় না। 10 থেকে 12 মাসের মধ্যে সেগুলি পরিণত অবস্থায় উপনীত হয়। কলকাতার কাছে সাঁতরাগাছি ও নিকটবর্তী অঞ্চল এবং বসিরহাটের চাষীরা ভাল জাতের ওল চাষ করে যথেষ্ট লাভবান হয়ে থাকে।

ওলের একটি বিশেষ স্বাদ আছে। সে জন্যে ওলসিদ্ধ অনেকেরই খুব প্রিয়। আলুর মত তরকারী বা চাটনী করেও ওল খাওয়া যায়।

শাঁখ আলু (Pachyrhizus erosus)—শাঁখ আলু এক প্রকার শীম জাতীয় লতানে গাছ। এর আদি নিবাস মেক্সিকো ও মধ্য আমেরিকার অন্যান্য উষ্ণপ্রধান দেশে। ভারতের অনেক অঞ্চলেই সুস্বাদু কন্দমূলের জন্যে শাঁখ আলুর চাষ কিছু কিছু হয়। কবে থেকে শাঁখ আলুর চাষ আমাদের দেশে হচ্ছে, তা ঠিক জানা নেই। তবে অনেক দিন থেকে যে এর ব্যবহার আমাদের দেশে হচ্ছে, তার প্রমাণ এই যে—প্রাচীনপন্থী নিষ্ঠাবতী হিন্দু মহিলারা পূজা-পার্বণে সাধারণতঃ তথাকথিত বিলাতী জিনিষ বর্জন করলেও শাঁখ আলু বিভিন্ন পূজায় ব্যবহার করেন।

কন্দমূলগুলির রং সাদা, আকৃতি গোল বা লম্বাটে ধরণের। এক-একটির ওজন সাধারণতঃ 200 গ্র্যাম থেকে এক কিলোগ্র্যাম পর্যন্ত হয়ে থাকে। ডায়মণ্ডহারবারের নিকটবর্তী হটুগঞ্জের হাটে আমি অনেক দিন আগে খুব বড় শাঁখ আলু (40×20 সেন্টিমিটার) দেখেছিলাম—এক-একটির ওজন 5 থেকে 10 কিলোগ্র্যাম পর্যন্ত ছিল। তারপর বহু জায়গায় ঘুরেও এত বড় শাঁখ আলু আর কখনও দেখি নি।

সাধারণতঃ দোআঁশ হাল্কা জমিতে বীজ থেকে শাঁখ আলুর চাষ হয়। একরপ্রতি 18-20 কিলো বীজ লাগে। জুন-জুলাই মাসে মাটি ভালভাবে তৈরি করে 30-40 সেন্টিমিটার পর পর সারিতে বীজ লাগাতে হয়। দুই সারির মধ্যে ব্যবধান 60-70 সেন্টিমিটার থাকা দরকার। 6-7 মাসের মধ্যে আলুগুলি

পরিণত অবস্থায় উপনীত হয়। ভাল আলুর ফলনের জন্যে মধ্যে মধ্যে গাছের ডালপালা ছেঁটে দিতে হয়। একরপ্রতি ফলনের পরিমাণ 3000 থেকে 4000 কিলোগ্রাম। ইন্দোনেশিয়া ও ফিলিপাইন দ্বীপে ফলন অনেক বেশী—প্রতি হেক্টরে প্রায় 90-95 টন পাওয়া যায়।

শাঁখ আলু কাঁচা খাওয়া যায় এবং অত্যন্ত সুস্বাদু ও স্নিগ্ধকর। এতে শ্বেতসার, বিভিন্ন শর্করা, প্রোটিন, তৈল, নানাবিধ খনিজ পদার্থ ও নানাপ্রকার ভিটামিন যথেষ্ট পরিমাণে থাকে। এজন্যে খাদ্য হিসাবে এটি খুবই পুষ্টিকর; অথচ দুঃখের বিষয় এই যে, আমাদের দেশে এই সুস্বাদু কন্দমূলের সমধিক সমাদর কখনও হয় নি।

কেশুর (Scirpus keysoor)—এটি মুথা জাতীয় উদ্ভিদ। সাধারণতঃ ভিজা জমিতে বা জলের ধারে এগুলি জন্মায়। প্রত্যেকটি কাণ্ডের নিম্নে মাটির নীচে 1 থেকে 3 সেণ্টিমিটার পরিমাণ অনেকগুলি ছোট ছোট কন্দ জন্মায়। কেশুর খেতে খুবই সুস্বাদু। ভারতে অনেক জায়গায় অল্পবিস্তর কেশুর পাওয়া যায়; তবে উত্তর ভারতের গাঙ্গেয় উপত্যকায় এর কিছু কিছু চাষ হয়। কলকাতায় হগ মার্কেটে অল্প সময়ের জন্যে এর কিছু চালান আসে এবং তখন বেশ ভাল দামে রসিকজনের নিকট তা বিক্রীত হয়।

ইলিওক্যারিস (Eliocharis dulcis Trin.)—ইলিওক্যারিস কেশুরের মত মুথা জাতীয় একপ্রকার পত্রহীন উদ্ভিদ। সাধারণতঃ জলা জমিতে বা জলের ধারে জন্মায়। এদের কাণ্ডের নীচে একটি কন্দ থাকে এবং তাথেকে অনেকগুলি ছোট ছোট কন্দ (1 থেকে 1·5 সেণ্টিমিটার ব্যাসের) জন্মায়। ভারতের বহু স্থানে এই কেশুর স্বতঃই জন্মায়—চাষ একেবারে হয় না বললেই হয়। চীন, জাপান ও মালয়ে এর প্রভূত চাষ হয়। চীনদেশে এক প্রকার ইলিওক্যারিসের চাষ হয়—যাদের কন্দ 4 সেণ্টিমিটার পর্যন্ত হয় ও হেক্টর প্রতি প্রায় 7 টন ফলন পাওয়া যায়।

এই কন্দ কাঁচা খাওয়া যায়, খেতে খুবই সুস্বাদু। এদের শাঁস সাদা রঙের এবং এতে যথেষ্ট পরিমাণে চিনি ও প্রোটিন থাকে। স্যালাড বা তরকারীতেও এর ব্যবহার প্রচলিত আছে। কলকাতার বাজারে কখনো কখনো এর চালান আসে।

উল্লিখিত কন্দগুলি ব্যতীত শ্বেতসারের জন্যে আরও কয়েক প্রকার কন্দের প্রভূত পরিমাণে চাষ হয়; যেমন—শটী (Curceema zedsaria)—হলুদ জাতীয় এক প্রকার গাছ। শটী রোগীর পথ্য হিসাবে বহুল ব্যবহৃত হয়। Maranta arundinacea ও Curceema angustifolia নামক গাছের কন্দ (Rhizome) থেকে অ্যারোরুট প্রস্তুত হয়। Canna edulis—এটি দক্ষিণ আমেরিকা থেকে আনীত ক্যাণ্ ফুলজাতীয় গাছ। এর রাইজোম থেকেও আর এক প্রকার অ্যারোরুট প্রস্তুত হয়। সকল প্রকার অ্যারোরুটই শিশুর ও রোগীর খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

খাদ্য-সমস্যা ও রসায়ন

শ্রীপ্রিয়দারঞ্জন রায়

সভ্যতার ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে জনসংখ্যা এবং খাদ্যের চাহিদা ক্রমশঃ বেড়ে উঠেছে। খাদ্যোৎ-পত্তির পরিমাণ ও জনসংখ্যার বৃদ্ধি—এই দুয়ের মধ্যে হয়েছে প্রতিযোগিতার সৃষ্টি। বর্তমানে পৃথিবীতে লোকসংখ্যা হচ্ছে প্রায় 355 কোটি (1969 সালের গণনা মতে)। পৃথিবীর বার্ষিক খাদ্যশস্য ও বিবিধ আমিষ খাদ্যোৎপত্তির পরিমাণ এই বিপুল লোকসংখ্যার জীবনধারণের পক্ষে মোটেই পর্যাপ্ত নয়। হিসাবে দেখা যায়, গত 30-40 বছরে খাদ্যোৎপত্তির পরিমাণ বেড়েছে মাত্র শতকরা 13-14, কিন্তু লোকসংখ্যা বেড়েছে প্রায় শতকরা 40। খাদ্য থেকে মানুষ যে শক্তি পায়, তাকে বিজ্ঞানীরা—তাপশক্তির এককের (ক্যালোরি) সাহায্যে প্রকাশ করেন। একটি সুস্থ মধ্যবয়স্ক ব্যক্তির যে পরিমাণ দৈনিক খাদ্যের প্রয়োজন, তাপশক্তির এককে তার পরিমাণ হয় 2800 ক্যালোরি। বর্তমানে পৃথিবীর অধিকাংশ লোকের ($\frac{2}{3}$ ভাগ) এই পরিমাণ খাদ্য জোটে না। অবশ্য খুব অল্প কয়েকটি দেশে (যেমন—আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, হল্যাণ্ড, ডেন-মার্ক, ক্যানাডা ও অষ্ট্রেলিয়া) খাদ্যোৎপত্তির প্রাচুর্য দেখা যায়। মোটামুটি বলা যায়, পৃথিবীর তিন ভাগের এক ভাগ অধিবাসী ক্ষুধার্ত অবস্থায় প্রতি রাত্রে ঘুমাতে যায়। বর্তমানে যে হারে পৃথিবীর লোকসংখ্যা বেড়ে চলেছে, তাতে আর 30-40 বছর পরে তা যাবে দ্বিগুণ হয়ে অর্থাৎ প্রায় 700 কোটি হবে। খাদ্যোৎপত্তির পরিমাণ এর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় বাড়িয়ে তুলতে না পারলে মানুষের জীবন সঙ্কটাপন্ন হয়ে উঠবে। দুর্ভিক্ষে অনশনে ও অর্ধাশনে লোকক্ষয় হবে অনিবার্য ও ভয়াবহ। বিজ্ঞানীরা, বিশেষতঃ রসায়ন-বিজ্ঞানীরা এই সমস্যার সমাধানে তৎপর হয়ে উঠেছেন। প্রচুর পরিমাণে খাদ্যোৎপত্তির যে সব বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টা চলেছে, সংক্ষেপে তারই আলোচনা হচ্ছে বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

গোড়াতেই বলা যায়, মানুষের সকল খাদ্যের মূল উৎপত্তিস্থান হলো উদ্ভিদ-রাজ্য। সকল প্রকার আমিষ খাদ্যেরও মূলে আছে উদ্ভিদ। উদ্ভিদের সঙ্গে জীবের এই প্রাণের বাঁধন সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য। সুতরাং প্রচুর পরিমাণে খাদ্যোৎপত্তি করতে হলে মানুষকে উদ্ভিদ-রাষ্ট্রের উন্নতি ও বিস্তার বাড়িয়ে তুলতে হবে, অথবা খাদ্যের জন্যে উদ্ভিদের উপর একান্ত নির্ভরতা থেকে আপনাকে মুক্ত করতে হবে। এই উভয় জাতীয় প্রচেষ্টায় বিজ্ঞানীরা তাঁদের উদ্ভাবনী শক্তির প্রয়োগে মনোনিবেশ করেছেন।

প্রথমতঃ রসায়ন বিজ্ঞানের সাহায্যে উদ্ভিদ-রাজ্য থেকে মানুষের খাদ্যোৎপত্তির পরিমাণ কি উপায়ে বাড়ানো হচ্ছে, তারই আলোচনা করা হবে। উদ্ভিদ ও জীবদেহ গঠিত হয়েছে অন্ততঃ 26টি রাসায়নিক মৌলিক পদার্থের সংযোগে। এদের মধ্যে যেগুলির অধিক পরিমাণে অস্তিত্ব দেখা যায়, তাদের নাম হলো: কার্বন, অক্সিজেন, নাইট্রো-জেন, ক্যালসিয়াম, ফস্‌ফরাস, পটাসিয়াম, সালফার, সোডিয়াম, ক্লোরিন, ম্যাগ্নেসিয়াম এবং আয়রন। বাকীগুলি থাকে সূচ্যগ্র পরিমাণে। ইংরেজীতে এই কারণে এদের বলা হয় Trace element (সন্ধানমাত্রিক মৌল)। ম্যাঙ্গানিজ, কপার, আয়োডিন, ফ্লুরিন, কোবাল্ট, জিঙ্ক, বোরন, মলিবডিনাম, ভেনেডিয়াম, অ্যালুমিনিয়াম ও

বেরিয়াম হলো এর উদাহরণ। জীব ও উদ্ভিদ দেহে এদের অস্তিত্বের মাত্রা অতি সামান্য বা নগণ্য হলেও দেহের স্বাস্থ্য ও বৃদ্ধির জন্যে এদের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। জীব ও উদ্ভিদ-জীবনের উপর এদের প্রচণ্ড প্রভাব দেখা যায়।

জমিতে অতি সামান্য মাত্রা (50 লক্ষ ভাগের 1 ভাগ) বোরনের অভাব ঘটলে ঐ জমিতে উৎপন্ন বিনের (শিমজাতীয় উদ্ভিদ) চারা গাছ শুকিয়ে মরে যায়। কোন জমিতে যদি নিকেলের পরিমাণ 40 হাজার ভাগের 1 ভাগেরও কম হয়, সে জমিতে কমলালেবুর গাছ বেড়ে উঠতে পারে না। জমিতে খুব অল্প পরিমাণে ম্যাঙ্গানিজের অস্তিত্বে ঐ জমিতে উৎপন্ন টমেটোতে ভিটামিন. সি-এর পরিমাণ বেড়ে যায়। পরীক্ষায় দেখা গেছে যে, খাদ্যশস্য উৎপাদন করবার জমিতে বায়ু থেকে নাইট্রোজেন সংগ্রাহী জীবাণুর বৃদ্ধির জন্যে অতি অল্প মাত্রায় মলিবডিনামের প্রয়োজন হয়।

অধিকাংশ উদ্ভিদই তাদের খাদ্যের উপাদান সংগ্রহ করে বায়ু, জল ও জমির লবণজাতীয় পদার্থ বা সার থেকে। কিন্তু একই জমিতে বছরের পর বছর খাদ্যশস্য উৎপাদনের ফলে জমিতে নাইট্রোজেন, ফস্ফরাস ও পটাসিয়াম-ঘটিত উদ্ভিদখাদ্যের অভাব ঘটে। এর প্রতিকার-কল্পে জমিতে সার প্রয়োগের ব্যবস্থা হয়েছে। উদ্ভিদের খাদ্যদ্রব্য জলে দ্রবীভূত অবস্থায় পাতার ভিতর দিয়ে, বিশেষতঃ মূলের সূক্ষ্ম তন্তুর সাহায্যে অভিস্রবণ (Osmosis) প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদদেহে প্রবেশ লাভ করে। সভ্যতার আদিযুগ থেকে মানুষ তার খাদ্যশস্যের উৎপাদন বাড়াবার জন্যে জমিতে সার প্রয়োগের প্রথা অবলম্বন করে আসছে। বহুকাল যাবৎ এবং এখনো কিয়ৎ পরিমাণে নানাবিধ পরিত্যক্ত জৈব পদার্থ সার হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। কিন্তু এক শতাব্দীর কিছু বেশী হলো বিখ্যাত জার্মান রসায়নবিদ্ লিবিগ জলে দ্রবণীয় নাইট্রোজেন, পটাসিয়াম ও ফস্ফরাসঘটিত অজৈব পদার্থসমূহের চাষের জমিতে সার হিসাবে ব্যবহারের বিশেষ উপযোগিতা বহু পরীক্ষার ফলে প্রথম প্রমাণ করেন। সেই থেকে এসব অজৈব সারের ব্যবহার ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে। চাষের জমি থেকে বছরে লক্ষ লক্ষ টন নাইট্রোজেন-ঘটিত পদার্থ খাদ্যশস্যের ফসল উৎপাদনের জন্যে ব্যয়িত হয়। এর প্রায় অর্ধেক পরিমাণ নাইট্রোজেন প্রাকৃতিক বিধানে এবং জৈব সার ব্যবহারের ফলে পুনরায় জমিতে ফিরে আসে। বাকী অর্ধেক নাইট্রোজেনের অভাব মিটে অজৈব নাইট্রোজেন-ঘটিত সারের প্রয়োগে। দক্ষিণ আমেরিকায় চিলি রাষ্ট্রের আন্দিজ পর্বত ও প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যবর্তী প্রদেশে সোডিয়াম নাইট্রেটের (নাইট্রোজেনঘটিত একটি অজৈব লবণজাতীয় পদার্থ) একটি বিরাট স্তর আছে। একে কেলিসে (Caliche) বলা হয়। উদ্ভিদের সার হিসাবে ব্যবহারের জন্যে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে, ইয়োরোপের বহু রাষ্ট্রে এবং অন্যত্র বছর বছর প্রচুর পরিমাণে এর রপ্তানী হয়। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় যখন জার্মান রাষ্ট্রে এর রপ্তানী বন্ধ করা হয়, জার্মান সম্রাট জার্মান বিজ্ঞানী হাবেরকে (Haber) রাসায়নিক সংশ্লেষণ-প্রক্রিয়ায় নাইট্রোজেনঘটিত উদ্ভিদখাদ্য বা সার প্রস্তুতের উপায় উদ্ভাবনের জন্যে আহ্বান করেন। নাইট্রোজেন ও হাইড্রোজেন গ্যাস তাপ ও চাপের প্রভাবে পরস্পরের রাসায়নিক সংযোগে অ্যামোনিয়া গ্যাসে পরিণত হয়, এই তথ্য অজানা ছিল না। এই দুটি মৌলিক পদার্থ যে কোন দেশে অপর্যাপ্ত পরিমাণে তৈরি করা যেতে পারে। বায়ুতে অফুরন্ত নাইট্রোজেন এবং জলে আছে অফুরন্ত হাইড্রোজেন। বায়ু থেকে নাইট্রোজেন ও জল থেকে হাইড্রোজেন তৈরি করা খুবই সহজ। এ উভয়ের রাসায়নিক সংযোগে হয় অ্যামোনিয়া গ্যাসের সৃষ্টি। পরের পৃষ্ঠায় সমীকরণের সাহায্যে এই সংযোগবিধি দেখানো গেল।

$$N_2+3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$$
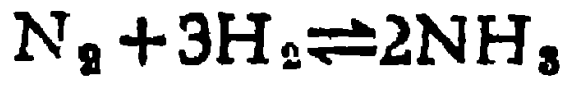
কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে সাধারণতঃ শতকরা দু-ভাগের বেশী অ্যামোনিয়া এতে প্রস্তুত করা যায় না। কেন না, যে উষ্ণতায় এই সংযোগ ঘটে, সে উষ্ণতাতেই আবার অ্যামোনিয়া গ্যাস ভেঙে নাইট্রোজেন ও হাইড্রোজেন গ্যাসে পরিণত হয়। ফলে নাইট্রোজেন, হাইড্রোজেন ও অ্যামোনিয়ার অণুর মধ্যে একটি সাম্যাবস্থার সৃষ্টি হয়। বিজ্ঞানী হাবের এই সমস্যার সমাধানে সিদ্ধিলাভ করেন। একটি নির্দিষ্ট উষ্ণতায় ও নির্দিষ্ট চাপে নাইট্রোজেন ও হাইড্রোজেন গ্যাসের মিশ্রণকে তিনি একটি বিশিষ্ট সহায়ক পদার্থের (আয়রন—Iron) উপর পরিচালিত করে এবং তাদের রাসায়নিক সংযোগে উৎপন্ন অ্যামোনিয়া গ্যাসকে অনতিবিলম্বে গ্যাস মিশ্রণ থেকে অপসারিত করে শতকরা ত্রিশ ভাগ অ্যামোনিয়া গ্যাস প্রস্তুত করতে সক্ষম হন। অ্যামোনিয়া সংশ্লেষণের এই বিধি রসায়ন-বিজ্ঞানে হাবেরের পদ্ধতি নামে খ্যাতি লাভ করেছে। সালফিউরিক অ্যাসিডের সংযোগে অ্যামোনিয়া অ্যামোনিয়াম সালফেট নামক লবণজাতীয় পদার্থে পরিণত হয়। অ্যামোনিয়াম সালফেট একটি উত্তম নাইট্রোজেন-ঘটিত উদ্ভিদখাদ্য বা সার। আমাদের দেশে সিন্দ্রিতে (বিহার অঞ্চলে) এই পদ্ধতিতে অ্যামোনিয়াম সালফেট তৈরি হচ্ছে। রাসায়নিক সংশ্লেষণে নাইট্রোজেনঘটিত অজৈব উদ্ভিদখাদ্যের উৎপাদন খাদ্যসমস্যা সমাধানে রসায়নের একটি বিশিষ্ট অবদান বলা যায়।

উপযুক্ত পরিমাণে উপযোগী সার প্রয়োগে জমির উৎপাদিকা শক্তি বহু গুণ বেড়ে যায়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে দেখা গেছে যে, সার প্রয়োগে একই জমি থেকে উৎপন্ন খাদ্যশস্যের পরিমাণ প্রায় 30% (শতকরা 30 ভাগ) বেশী হয়। অবশ্য এই প্রকার সুফল পেতে হলে বীজবপন ও অঙ্কুরোদ্গম থেকে সুরু করে পাকা ফসল সংগ্রহ ও সঞ্চয় অবধি উদ্ভিদ এবং তাথেকে উৎপন্ন শস্যকে সকল প্রকার বহিঃশত্রুর আক্রমণ, অপচয় ও বিনষ্টি থেকে রক্ষা করবার উপায় অবলম্বন করা প্রয়োজন হয়। মানুষের মত উদ্ভিদ-জীবনেরও বহু শত্রু আছে। উদ্ভিদদেহে নানাবিধ রোগোৎপাদক জীবাণু, পরভৃৎ, অসংখ্য কীট-পতঙ্গ, পোকা-মাকড় ইত্যাদি উদ্ভিদ রাজ্যের সঙ্গে অহরহ সংগ্রাম পরিচালনায় নিযুক্ত রয়েছে। ইঁদুর, কাঠবিড়ালী, পাখী, পশুও এদের সঙ্গে যোগ দিতে ক্রটি করে না। এর ফলে বহুল পরিমাণে উৎপন্ন শস্য বিনষ্ট হয়। এক্ষেত্রেও রসায়ন হয়েছে মানুষের পক্ষে মুস্কিল আসান। কীট-পতঙ্গাদির আক্রমণ থেকে উদ্ভিদদের সংরক্ষণের জন্যে রসায়ন-বিজ্ঞানীরা বহু শক্তিশালী জৈব সংশ্লেষিত পদার্থ আবিষ্কার করেছেন। এদের মধ্যে সবচেয়ে অধিক শক্তিশালী কীটনাশক পদার্থ হচ্ছে D-D-T। এর রাসায়নিক নাম হলো ডাইক্লোরো ডাইফিনাইল ট্রাইক্লোরো ইথেন। গত কয়েকবছরব্যাপী কৃষিকার্যের জন্যে পৃথিবীর সর্বত্র এই কীটনাশক পদার্থটির ব্যবহার অবাধে প্রচলিত ছিল। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র থেকে বছরে কোটি কোটি টন D-D-T-এর রপ্তানী হয়েছে ইয়োরোপ, আফ্রিকা ও এশিয়ার বিভিন্ন রাষ্ট্রে। কিন্তু দীর্ঘ অভিজ্ঞতার ফলে সম্প্রতি দেখা গেছে যে, পুনঃ পুনঃ D-D-T-এর ব্যবহারে জমির উর্বরতা শক্তি নষ্ট হয়ে যায়। পরিণামে উদ্ভিদ, পাখী, পশু—এমন কি, মানুষের জীবনের পক্ষেও এর ব্যবহার নিরাপদ নয়। তাই বিজ্ঞানীরা এখন অধিক নিরাপদ ও সুদীর্ঘ কাল ব্যবহারেও সমান হিতকর কীট-পতঙ্গ নিবারক পদার্থের উদ্ভাবনের চেষ্টায় আছেন। রসায়নের আর একটি উল্লেখযোগ্য অবদান হচ্ছে আগাছা বিনাশক পদার্থ। জমিতে আগাছা উঠে অনেক সময় খাদ্যোৎপাদক উদ্ভিদসমূহকে বিনষ্ট করে বা তাদের অঙ্কুরিত হতে দেয় না। এর প্রতিকার

করেছেন রসায়ন-বিজ্ঞানীরা ডাইক্লোরো-ফিনক্সি অ্যাসিটিক অ্যাসিডের আবিষ্কারে। এর বাজার নাম হলো 2·4-D। এই পদার্থটি উদ্ভিদের পক্ষে হরমোনের কাজ করে। অতি অল্প মাত্রায় ব্যবহার করলে এতে উদ্ভিদের খুব তাড়াতাড়ি বৃদ্ধি হয়। অধিক মাত্রায় ব্যবহারে আবার উদ্ভিদের অনাহারে মৃত্যু ঘটে। কিন্তু খাদ্যশস্যবাহী উদ্ভিদের উপর এর কোন ক্রিয়া দেখা যায় না। এর সোডিয়ামঘটিত লবণকে জলে গুলে জমির উপর পিচকারী দিয়ে সূক্ষ্ম ধারায় ছড়িয়ে দেওয়া হয়। এই পদার্থটিরই একটি নিকট আত্মীয় ট্রাইক্লোরো ফিনক্সি অ্যাসিটিক অ্যাসিড (বাজার নাম 2·4·5-T)। এর ব্যবহারে বিনা পরিশ্রমে খাদ্যশস্য সংগ্রহ করা চলে। গাছ থেকে কাটবার, ছাটবার বা ঝাড়বার দরকার হয় না। অ্যামসেট বা অ্যামোনিয়াম সালফামেট আর একটি আগাছানাশক পদার্থের আবিষ্কার ও বহুল ব্যবহার এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

খাদ্যশস্যোৎপাদনের অন্তবিধ সমস্যা সমাধানে রসায়ন-বিজ্ঞানীরা সচেতন আছেন। হাজার হাজার জীবাণু, ভাইরাস এবং ছত্রাক বা পরভৃতের (Fungus) আক্রমণে উৎপন্ন ব্যাধি ইত্যাদির সঙ্গে সংগ্রাম করে উদ্ভিদকে বেঁচে থাকতে হয়। ক্লোরেনিল ও থ্যালিমাইড জাতীয় বিবিধ ছত্রাক-নাশক (Fungicide) পদার্থের আবিষ্কার ও ব্যবহারে উদ্ভিদের সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে বিজ্ঞানীরা হার মানেন নি।

খাদ্যশস্য সংগ্রহ করার পর সঞ্চয় করলেও তার শত্রুর অভাব ঘটে না। এই অবস্থাতেও কীট-পতঙ্গাদি, ইঁদুর ও কাঠবিড়ালী থেকে অপচয় নিবারণের আবশ্যক হয়। এখানেও রসায়ন-বিজ্ঞানীরা যথাযোগ্য প্রতিবিধানের ব্যবস্থা করতে ত্রুটি করেন নি। সঞ্চিত খাদ্যশস্য নিরাপদে সংরক্ষণ করবার উদ্দেশ্যে বহুবিধ ধূপক (Fumigants) পদার্থের প্রচলন হয়েছে। খাদ্য-শস্যের গুদামঘরে এসব ধূপক পদার্থের বাষ্পের পরিচালনা করে তাথেকে কীট-পতঙ্গ, ইঁদুর, কাঠবিড়ালী প্রভৃতি সকল অপচয়কারী জীবকে বিতাড়িত করা হয়। কার্বন টেট্রাক্লোরাইড, মিথাইল ব্রোমাইড, ইথিলিন ডাইব্রোমাইড সাধারণতঃ এই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়।

কৃষিকর্মের ক্ষেত্রে রসায়নের একটি অভিনব অবদান সম্প্রতি দেখা দিয়েছে। এতে কৃষকের অনেক পরিশ্রম ও ব্যয়ের লাঘব করা সম্ভব হয়েছে। ফসল সংগ্রহের অব্যবহিত পূর্বে জমিতে কোন কোন বিশিষ্ট রাসায়নিক পদার্থ ছড়িয়ে দিলে 3/4 দিনের মধ্যে ঐ জমিতে উৎপন্ন সকল গাছ থেকে তাদের পাতাগুলি আপনাআপনি ঝরে পড়ে। ফলে, ফসল সংগ্রহে অনেক ব্যয়, শ্রম ও সময়ের সংক্ষেপ ঘটে। ক্যালসিয়াম সায়ানে-মাইড (Calcium cyanamide) এবং ম্যাগ্-নেসিয়াম ক্লোরাইড হলো এই জাতীয় পদার্থের দৃষ্টান্ত। এদের পত্রনাশক (Defoliator) বলা হয়। নাইট্রোজেনঘটিত একটি মূল্যবান সার হিসাবে ক্যালসিয়াম সায়ানেমাইডের ব্যবহার কৃষি-বিজ্ঞানের একটি পুরাতন সুপরিচিত তথ্য।

কৃষির ক্ষেত্রে খাদ্যশস্যোৎপাদনের উদ্দেশ্যে রসায়ন-বিজ্ঞানের উপরে বর্ণিত বিবিধ অবদানের সুবিধা গ্রহণ করে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান কৃষকেরা তার 15/16 বছরের অগ্রবর্তী অনুন্নত প্রাচীন-পন্থাবলম্বী কৃষিকর্মীদের চেয়ে দশ গুণ বেশী কাজ ও দ্বিগুণ ফসল উৎপাদনে সক্ষম হয়েছে।

যেসব পশুর মাংস খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়, তাদের স্বাস্থ্য সংরক্ষণের এবং পুষ্টির জন্যেও রসায়নের অবদান নগণ্য নয়। স্বাভাবিক ও সংশ্লিষ্ট রাসায়নিক পদার্থের (যথা—অ্যামিনো অ্যাসিড, ভিটামিন, অ্যান্টিবায়োটিক ইত্যাদি) সংমিশ্রণে পশুর খাদ্যকে অধিকতর পুষ্টিকর করবার ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে। পশুচিকিৎসার সুব্যবস্থাতেও নবাবিষ্কৃত বহু সংশ্লিষ্ট রাসায়নিক

পদার্থের, বিশেষতঃ অনেক অ্যান্টিবায়োটিকের বহুল প্রয়োগ দেখা দিয়েছে।

আমরা দেখেছি, মানুষের সকল প্রকার খাদ্য আসে উদ্ভিদ বা প্রাণী-রাজ্য থেকে। এসব খাদ্যকে মোটামুটি তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়।

(1) কার্বোহাইড্রেট: চাল, গম, আলু ইত্যাদি শ্বেতসারবহুল খাদ্য। এদের মধ্যে অল্প পরিমাণ অন্য দুই শ্রেণীর পদার্থও বর্তমান থাকে। শর্করা হচ্ছে একটি পুরাপুরি কার্বোহাইড্রেটের দৃষ্টান্ত।

(2) আমিষ: মাংস, মাছ, ডিম, ডাল, বাদাম ইত্যাদি প্রোটিনবহুল খাদ্য। মাংস, মাছ ও ডিমে অল্প বিস্তর স্নেহ পদার্থ, ডালে অনেক শ্বেতসার এবং বাদামে বিস্তর স্নেহ পদার্থ বর্তমান থাকে।

(3) স্নেহ: তেল, ঘি, মাখন, চর্বি ইত্যাদি। দুধে তিন জাতীয় পদার্থই প্রায় সমান ভাগে বর্তমান। এই কারণে দুধকে আদর্শ খাদ্য হিসাবে গণ্য করা হয়। যাবতীয় খাদ্যে অতি অল্প পরিমাণ লবণজাতীয় পদার্থ ও বিভিন্ন খাদ্যপ্রাণ বা ভিটামিন থাকে। দেহের স্বাস্থ্যরক্ষায় এদেরও বিশেষ প্রয়োজন আছে।

রসায়ন-বিজ্ঞানের জ্ঞান প্রয়োগে জমির উর্বরতা শক্তির বৃদ্ধি এবং ফসলের পরিমাণ যে অভূতপূর্বভাবে বাড়ানো যায়, উপরে তারই আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু এতে খাদ্যসমস্যার সমাধানের যে কোন সম্ভাবনা নেই, একথাও গোড়ায় বলা হয়েছে। কারণ পৃথিবীতে চাষের জমির পরিমাণ এবং তার উৎপাদিকা শক্তি হচ্ছে সীমাবদ্ধ; অথচ এর তুলনায় পৃথিবীর লোকসংখ্যা বৃদ্ধির কোন সীমানা নির্দেশ করা চলে না। তাই বর্তমানে বিজ্ঞানীরা রাসায়নিক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় কৃত্রিম খাদ্য প্রস্তুতের গবেষণা সুরু করেছেন। এছাড়া খাদ্যের পরিমাণ বৃদ্ধির অন্যবিধ উপায় উদ্ভাবনেরও পরীক্ষা চলছে।

মানুষের প্রয়োজনীয় তিন জাতীয় খাদ্যের মধ্যে পরিমাণে কার্বোহাইড্রেট খাদ্যের চাহিদা সবচেয়ে বেশী। কারণ, আমাদের শরীরের তাপ রক্ষা হয় প্রধানতঃ এই জাতীয় খাদ্যে। তাই মানুষের দৈনিক ভোজনের প্রধান উপকরণ হচ্ছে ভাত কিম্বা রুটি। এই দুটি শ্বেতসারবহুল খাদ্য। রাসায়নিক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় কার্বোহাইড্রেট তৈরির প্রচেষ্টা হয়েছে দুই প্রকারে। এক হলো উদ্ভিদদেহে স্বাভাবিক উপায়ে শ্বেতসার সৃষ্টির পন্থার অনুকরণ করে। জানা আছে যে, উদ্ভিদদেহে অঙ্গারাম্ল বা কার্বন ডায়োক্সাইড গ্যাসের সঙ্গে জলের অণুর সংযোগ ঘটে সূর্যালোকে গাছের পাতার সবুজ রংঙের (ক্লোরোফিল) সংস্পর্শে। এই কারণে এই প্রক্রিয়ার নাম হয়েছে আলোকসংশ্লেষণ (Photosynthesis)। গাছের সবুজ পাতায় পাতায় যখন সূর্যরশ্মি পড়ে, তা থেকেই আসে এই সংযোজনক্রিয়ার শক্তি। পাতার সবুজ রং বা ক্লোরোফিল দেয় এর প্রেরণা—তাই একে অনুঘটক (Catalyst) বলা হয়। এই অবস্থায় অঙ্গারাম্ল গ্যাস ও জল মিলে সৃষ্টি করে ফরম্যালডিহাইড নামক পদার্থ। পরে ফরম্যালডিহাইডের অণুগুলি বহুগুণিত হয়ে সৃষ্টি করে শর্করা ও শ্বেতসারের অণু। পরীক্ষায় দেখা গেছে যে, প্রাণীর মত উদ্ভিদদেহেও দিনরাত অহরহ নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস প্রক্রিয়া চলতে থাকে। গাছের সবুজ পাতার তলদেশে উদ্ভিদকোষের ফাঁকে ফাঁকে খুব সরু সরু বহু গর্ত বা ছিদ্র থাকে। এরাই হলো উদ্ভিদদেহে বায়ু চলাচলের পথ। বায়ুর সঙ্গে এই পথে উদ্ভিদের সবুজ পাতায় অঙ্গারাম্ল গ্যাস প্রবেশ করে। মাটি থেকে শিকড়ের সাহায্যে জল এবং বিবিধ লবণ-জাতীয় পদার্থ এসে পাতায় হাজির হয়। এখানে উদ্ভিদকোষের সবুজ রং বা ক্লোরোফিলের সংস্পর্শে সূর্যকিরণের সাহায্যে ঘটে বায়ুর অঙ্গারাম্ল ও

মাটি থেকে সংগৃহীত জলের সঙ্গে রাসায়নিক সংযোজন। এর ফলে প্রথমে সৃষ্টি হয় ফরম্যালডিহাইড এবং অম্লজান বা অক্সিজেন গ্যাস বেরিয়ে যায়: $CO_2+H_2O-CH_2O+O_2$

ফরম্যালডিহাইড

পরে ফরম্যালডিহাইড থেকে শর্করা এবং শর্করা থেকে অবশেষে শ্বেতসার (Starch) ও সেলুলোজের (Cellulose) সৃষ্টি হয়:

$$6CH_2O \rightarrow C_6(H_2O)_6$$

দ্রাক্ষা-শর্করা (গ্লুকোজ)

$$2C_6(H_2O)_6 \rightarrow C_{12}(H_2O)_{11}+H_2O$$

ইক্ষু-শর্করা

$$nC_6(H_2O)_6 \rightarrow (C_6H_{10}O_5)_1+nH_2O$$
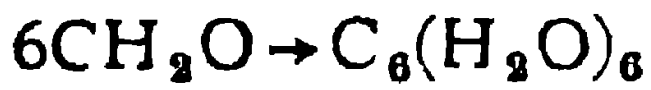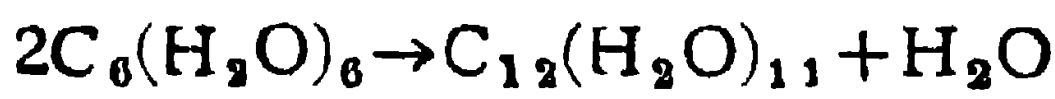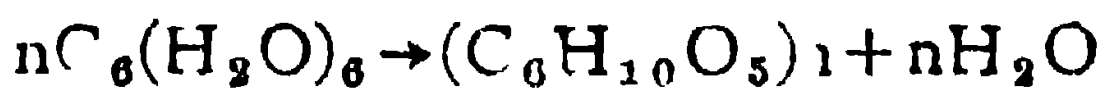
শ্বেতসার ও সেলুলোজ

গাছের বীজের আঁশ (যেমন তুলা) এবং কাঠ সেলুলোজেরই প্রকারভেদ মাত্র। এই স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার অনুকরণে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের রাসায়নিক পরীক্ষাগারে বিজ্ঞানীরা প্রথমে ফরম্যালডিহাইড তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন।

সরাসরি অঙ্গার বা অঙ্গারাম্ল এবং জল থেকে বিবিধ রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ফরম্যালডিহাইড প্রস্তুত করা যায়। এভাবে বহুল পরিমাণ কৃত্রিম শর্করা ও শ্বেতসার প্রস্তুতের সম্ভাবনা আছে। কারণ, এক্ষেত্রে তাপ ও চাপের তারতম্যে এবং নানাবিধ যন্ত্রপাতির সাহায্যে সংযোজন প্রক্রিয়ার গতিবেগ বাড়াবার সম্ভাবনা আছে। ফরম্যালডিহাইড এবং ক্ষারের মধ্যে বিক্রিয়ার ফলে শর্করার উৎপত্তির প্রথম নিদর্শন পান 1861 খৃঃ অব্দে রসায়নবিদ্ বাটলেরভ। 1890 খৃঃ অব্দে এই পন্থা অবলম্বন করে প্রখ্যাত জার্মান বিজ্ঞানী এমিল ফিশার ফরম্যালডিহাইড থেকে দ্রাক্ষা-শর্করার পুরাপুরি সংশ্লেষণ করেন।

অঙ্গার এবং জল থেকে সুরু করে বর্তমানে বহুল পরিমাণে ফরম্যালডিহাইডের সৃষ্টি হচ্ছে রাসায়নিক সংশ্লেষণে। ফিশারের পদ্ধতি মতে ফরম্যালডিহাইড থেকে গ্লুকোজ বা দ্রাক্ষা-শর্করা তৈরিও এখন মানুষের আয়ত্তের মধ্যে। পরীক্ষায় দেখা গেছে যে, এক-একটি শ্বেতসারের অণুতে বিশটি করে গ্লুকোজের অণু সরাসরি শিকলের মত পরস্পরের সঙ্গে জুড়ে থাকে। অম্লজলে সিদ্ধ করলে শ্বেতসারের অণু আবার গ্লুকোজের অণুতে ভেঙে যায়। এর বিপরীত প্রক্রিয়ার অনুষ্ঠান করতে পারলেই গ্লুকোজ থেকে শ্বেতসার প্রস্তুতের পদ্ধতি আবিষ্কার হবে। এভাবে বহুগুণিত হবার প্রণালীর দৃষ্টান্ত রসায়নের ইতিহাসে এখন অভাব নেই। কৃত্রিম রবার, কৃত্রিম রেশম এবং বিচিত্র রকমের প্লাষ্টিক সামগ্রী এখন এভাবেই প্রস্তুত হচ্ছে। যদিও অদ্যাবধি শর্করা থেকে কৃত্রিম উপায়ে শ্বেতসারের উৎপত্তি হয় নি, তথাপি ভবিষ্যতে কৃত্রিম উপায়ে বহুল পরিমাণ শ্বেতসার প্রস্তুতির সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে। আসল সমস্যা হচ্ছে শ্বেতসারের সংশ্লেষণ পদ্ধতির আবিষ্কার নয়, সমস্যা তার প্রস্তুতি পদ্ধতিকে ব্যয়সাধ্য করে পরিচালিত করা—অর্থাৎ ব্যবসায়ে লাভ-লোকসানের হিসাব-নিকাশ। ফরম্যালডিহাইড প্রস্তুতের উপকরণ অঙ্গার এবং জল, উভয়ের কোন অভাব নেই। তাপশক্তি এবং মজুরিতেই খরচ বেড়ে যায়। বিজ্ঞানীদের মতে, অদূর ভবিষ্যতে সূর্যরশ্মি এবং পরমাণুকেন্দ্র থেকে অল্প মূল্যে অপর্যাপ্ত তাপশক্তি উৎপাদনের ব্যবস্থা পাকাপাকি হয়ে যাবে। তখন কৃত্রিম শর্করা এবং শ্বেতসার প্রস্তুতির পথে সকল বাধা ঘুচে যাবে। সম্প্রতি মাটির তলায় খনির অভ্যন্তরের কয়লা থেকে কার্বন মনোক্সাইড তৈরি করবার কৌশল আবিষ্কৃত হয়েছে। এতে মজুরি দিয়ে খনি থেকে কয়লা তোলবার আবশ্যক হয় না। কার্বন মনোক্সাইড ও জলের হাইড্রোজেন থেকে ফরম্যালডিহাইড সংশ্লেষণ হবে তাতে সস্তা:
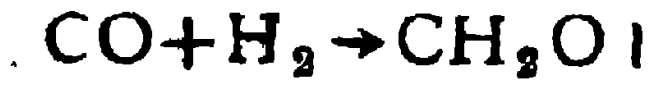
$CO + H_2 \rightarrow CH_2O$ ।
ফরম্যালডিহাইড

এভাবেও উপরে বর্ণিত আলোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার অনুকরণে সস্তায় ও সহজে ফরম্যালডিহাইড প্রস্তুতের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে।

প্রোটিন বা আমিষ খাদ্য মানুষের দেহের আর একটি প্রয়োজনীয় মূল্যবান উপকরণ। প্রোটিন মাত্রেই হচ্ছে একটি জটিল রাসায়নিক পদার্থ। নানাবিধ অ্যামিনো অ্যাসিডের বহু অণু পরস্পর শিকলের মত জুড়ে এক-একটি প্রোটিনের অণুর সৃষ্টি করে। অনেকগুলি সাপের মাথা এবং লেজে পরস্পর জুড়ে দিলে যে ছবি হয়, প্রোটিনের অণুগুলিরও আকার হয় তারই অনুরূপ। রসায়নবিদেরা সংশ্লেষণ-প্রক্রিয়ায় এপর্যন্ত কোন প্রোটিন পদার্থের সৃষ্টি করতে সক্ষম হন নি। সেলুলোজ যেমন উদ্ভিদদেহের প্রধান ভিত্তি, প্রোটিন হচ্ছে তেমনি প্রাণীর দেহকোষের প্রধান উপকরণ। সেলুলোজের মত প্রোটিনমাত্রেই অতিকায় অণু গঠিত পদার্থ। হাজার হাজার বিভিন্ন প্রোটিন মিলে প্রাণীর দেহকোষ গঠন করে। রসায়নের ক্ষেত্রে প্রোটিনের সংশ্লেষণ একটি খুব দুরূহ সমস্যা। কাজেই সহসা মাছ, মাংস, ডিম ইত্যাদির পরিবর্তে যে কোন কৃত্রিম প্রোটিন প্রচলিত হবে, তার সম্ভাবনা নেই। তবে কখনো যে হবে না, একথাও বলা যায় না। কারণ, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে বিজ্ঞানী উডওয়ার্ড কিছুকাল আগে রেশম ও মাথার চুলে যে প্রোটিন আছে, তার সংশ্লেষণ করে এই বিষয়ে আশার বাণী দিয়েছেন।

কিন্তু প্রচুর পরিমাণে ও সহজে প্রোটিনখাদ্যের অভাব দূরীকরণের অন্যবিধ উপায় রয়েছে। এতে জীবাণুর সাহায্যের প্রয়োজন হয়। এক সময়ে মানুষ বনের পশুকে পোষ মানিয়ে তার কাজ হাসিল করেছে। এখন তার চেষ্টা হচ্ছে জীবাণুকে পোষ মানাবার। এতে তার জীবনযাত্রার উপযোগী বহু সামগ্রী প্রস্তুতের সুবিধা আশাতীতভাবে বেড়ে গেছে। এসব পোষ মানানো জীবাণুকে দিয়ে মানুষ বহুকাল যাবৎ বানিয়ে আসছে তার খাবার জন্যে দই, পনির ও সুরা। ঈষ্ট (Yeast) হচ্ছে এই প্রকারের এক জীবাণু। সুরা প্রস্তুতে এর ব্যবহার হয়। ঈষ্ট হচ্ছে প্রোটিনবহুল জীবাণু। এদের প্রজনন-শক্তি অসাধারণ। পরিত্যক্ত বা উপজাত পদার্থের পরিবেশে এরা প্রবল হারে বহুগুণ বেড়ে যায়। এসব পদার্থ থেকেই আসে এদের খাদ্য। গত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইংল্যাণ্ড ও অন্য দেশে খাদ্য হিসাবে এর প্রচলন হয়েছিল।

প্রোটিন খাদ্যের আর একটি অফুরন্ত ভাণ্ডার হচ্ছে প্ল্যাঙ্কটন। এটিও এক প্রকার জীবাণু। সমুদ্রের জলে এসব জীবাণু ভেসে বেড়ায়। সকল প্রকার সামুদ্রিক মাছের—এমন কি, তিমির মত মহাকায় সামুদ্রিক জন্তুগুলিরও প্ল্যাঙ্কটন হচ্ছে একটি বিশেষ খাদ্য। প্ল্যাঙ্কটন থেকেও বহু উপাদেয় খাদ্যসামগ্রী প্রস্তুত করা যায়। বর্তমানে থাইল্যাণ্ডে বছরে 5000 টন করে প্ল্যাঙ্কটন সংগ্রহ হয়। জাপানে এবং ইস্রায়েলে খাদ্য হিসাবে ব্যবহারের জন্যে প্ল্যাঙ্কটন সংগ্রহের পরীক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে।

প্রোটিনবহুল খাদ্যোৎপাদনের একটি মূল্যবান ও সার্থক উপায় হলো শ্যাওলাজাতীয় (Algae) এক প্রকার জীবাণুর চাষ; এর নাম হলো ক্লোরেলা (Chlorella)। এই জাতীয় জীবাণুর প্রবলভাবে বংশবৃদ্ধি করবার ক্ষমতা আছে। 24 ঘণ্টার মধ্যে এদের সংখ্যা সাত গুণ বেড়ে যায়। এর চাষের জন্যে প্রয়োজন শুধু জল, অঙ্গারাম্ল ও অ্যামোনিয়াঘটিত লবণজাতীয় পদার্থ। পাড়াগাঁয়ের অনেক পুকুরের জলে সবুজ রঙের যে শ্যাওলা পড়ে, সেগুলি সব ক্লোরেলা। বর্তমানে প্রচুর পরিমাণে ও কম খরচে অনেক দেশে ক্লোরেলার চাষের ব্যবস্থা চলছে, বিশেষ করে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে। পরিবেশের তারতম্যে প্রোটিন এবং

স্নেহ উভয় জাতীয় পদার্থে ক্লোরেলার চাষে যে ফসল হয়, তাতে শতকরা প্রায় 85 ভাগ স্নেহ পদার্থ থাকে। অতএব ক্লোরেলার চাষ থেকে অবস্থাবিশেষে মানুষের খাদ্যের দুটি প্রধান উপাদান প্রোটিন এবং স্নেহ অনায়াসে ও অল্প ব্যয়ে সংগ্রহ করবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। ক্লোরেলা জীবাণুর চাষের জন্যে বেশী জায়গা-জমির দরকার করে না, শুধু খানিকটা জলাজমিতেই কাজ চলে। ক্লোরেলা থেকে নানারকম উপাদেয় খাদ্যসামগ্রী তৈরি করা যায়।

প্রোটিন খাদ্যের অভাব মেটাবার আর একটি উপায় হচ্ছে অ্যামিনো অ্যাসিডের ব্যবহার। আগেই বলা হয়েছে যে, অ্যামিনো অ্যাসিডের এই অণু পরস্পর জুড়ে সৃষ্টি করে প্রোটিনের অণু। কিন্তু মানবদেহের পাকস্থলীতে এসব প্রোটিন ভেঙে তাথেকে পুনরায় অ্যামিনো অ্যাসিড বেরিয়ে আসে। এসব অ্যামিনো অ্যাসিড থেকে আবার আমাদের দেহাভ্যন্তরে সৃষ্টি হয় দেহের পুষ্টির উপযোগী অন্যবিধ প্রোটিন। সুতরাং প্রোটিনের বদলে অ্যামিনো অ্যাসিড ব্যবহার করা যায়। প্রোটিনের অতিকায় অণুর তুলনায় অ্যামিনো অ্যাসিডের অণু অনেক ছোট, সহজে এদের সংশ্লেষণ হয়। দাম এবং পুষ্টির দিক থেকে প্রোটিন এবং অ্যামিনো অ্যাসিড ব্যবহারের মধ্যে বিশেষ কোন তফাৎ নেই। প্রোটিনবহুল মাছ, মাংস, ডিম বা ডালের বদলে অল্প পরিমাণ অ্যামিনো অ্যাসিড ব্যবহার করলেই দেহের প্রয়োজন মিটে যায়। কিন্তু চর্বণের আস্বাদ হয়তো মিলবে না। খাদ্য হিসাবে অ্যামিনো অ্যাসিডের ব্যবহার প্রচলিত হলে মানব-সভ্যতার একটি দুরন্ত কলঙ্ক কসাইখানা বিলোপ হয়ে যাবে। বর্বরের মত সভ্য মানুষকে আর মরা জীবজন্তু খেয়ে বাঁচতে হবে না।

মানুষের বাকী প্রধান খাদ্য হচ্ছে স্নেহজাতীয় পদার্থ। ঘি, মাখন, তেল, চর্বি ইত্যাদি এর দৃষ্টান্ত। এরা সব গ্লিসারিন ও স্নেহাম্লের সংযোগ-ঘটিত সরল সহজ রাসায়নিক পদার্থ। বাজারে মাখনের বদলে যে অলিওমার্গেরিন বিক্রী হয়, তা হচ্ছে একটি আংশিক কৃত্রিম পদার্থ। গ্লিসারিনের সংশ্লেষণ এখন রসায়নবিদ্‌দের অজানা নয়। প্যারাফিন ও অক্সিজেনের সংযোগে স্নেহাম্ল সৃষ্টির পরীক্ষাতেও ভাল ফল পাওয়া গেছে। এতে ভবিষ্যতে স্নেহ তৈরির কারখানা প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা বেড়ে উঠেছে। বাজারে যে ভেজিটেবল ঘি বা বনস্পতি বিক্রি হয়, সেগুলি অনেকটা অলিওমার্গেরিনের মত আংশিক কৃত্রিম পদার্থ। খাদ্য হিসাবে অনুপযোগী নানাবিধ তেলের সঙ্গে হাইড্রোজেন গ্যাসের রাসায়নিক সংযোগে এদের সৃষ্টি হয়। এরূপ প্রক্রিয়ায় অনুঘটক হিসাবে নিকেল ধাতুর ব্যবহার হয়।

শর্করা, শ্বেতসার, প্রোটিন এবং স্নেহ পদার্থের সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া যেদিন সহজ, সুলভ ও পাকাপাকি হবে, উদ্ভিদের দাসত্ব থেকে মানুষের মুক্তির উপায় মিলবে সেদিন। চাষের জমি তখন বেশীর ভাগ পরিণত হবে বাসের ভূমিতে। সেদিন আসবে মানব-সভ্যতার সবচেয়ে বড় এবং সার্থক বিপ্লবের বাণী বহন করে। মানুষের সমাজে জীবন-সংগ্রামের উগ্রতা শান্ত হয়ে যাবে। কিন্তু এসব কৃত্রিম খাদ্য মানুষের স্বাস্থ্যরক্ষার কতটা উপযোগী—এরূপ প্রশ্ন অপ্রাসঙ্গিক নয়। আগেই বলা হয়েছে যে, কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন ও স্নেহরূপে তিন জাতীয় বনিয়াদী খাদ্য ব্যাতিরেকেও স্বাস্থ্য রক্ষার জন্যে চাই বিবিধ লবণ জাতীয় পদার্থ এবং ধাতব পদার্থ। কৃত্রিম খাদ্যে হবে এদের সম্পূর্ণ অভাব। উত্তরে বলা যায়, এসব পদার্থ কৃত্রিম খাদ্যে আবশ্যক মত মিশিয়ে দেওয়া যেতে পারে। তা সত্ত্বেও রূপ, রস, গন্ধ বিবর্জিত কৃত্রিম খাদ্যে মানুষের শারীরিক প্রক্রিয়াদির কোন ব্যতিক্রম ঘটবে কিনা, তার অন্তঃস্রাবী গ্রন্থিসমূহের কোন

বৈষম্য ঘটবে কিনা, এসব গুরুতর প্রশ্নের কোন সঠিক উত্তর দেওয়া বর্তমানে সম্ভব নয়। কিন্তু মানুষের মনের এবং অনুভূতির রাজ্যে এতে যে এক বিপর্যয় ঘটতে পারে, তার আশঙ্কা করা হয়তো অসঙ্গত নয়। মানুষের দেহ একটি যন্ত্র হলেও তার বিশেষত্ব আছে। এই যন্ত্রটি হচ্ছে সজীব; মনের সঙ্গে রয়েছে এর অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ। মনের স্বাস্থ্যের উপর নির্ভর করে বহুলাংশে দেহের স্বাস্থ্য। মনের স্বাস্থ্য নষ্ট হলে সবল দেহ নিয়েও মানুষ অকর্মণ্য হয়, সমাজে তাদের সংখ্যা যায় তাতে বেড়ে এবং সমাজ হয় ছিন্নভিন্ন। প্রকৃতির রাজ্যে জড়, উদ্ভিদ ও প্রাণীতে মিলে পরস্পরের সহযোগিতায় সৃষ্টি করেছে বৈচিত্র্যের মধ্যে এক বিরাট ঐক্য। জড়ের মধ্যে যে প্রাণের স্পন্দন সুপ্ত আছে, খাদ্যরূপে উদ্ভিদদেহে প্রবেশ করে তার বিকাশ ঘটে। উদ্ভিদ থেকে পুনরায় খাদ্যরূপে প্রাণী এবং মানুষের দেহে হয় তার পুরাপুরি জাগরণ। পরিশেষে মানুষে এর পরিণতি ঘটে বুদ্ধি এবং চেতনায়। প্রকৃতির এই বৈচিত্র্যের শৃঙ্খল থেকে উদ্ভিদকে বাদ দিতে গেলে প্রকৃতির অন্তর্নিহিত ঐক্য যাবে ছিন্ন হয়ে। ফলে প্রাকৃতিক অভিব্যক্তির ঊর্ধ্বপথের একটি সোপান যাবে ভেঙে। এতে মানুষের কল্যাণের পথ পরিণামে রুদ্ধ হয়ে যেতে পারে।

"বাঙলার এমন দীনহীন কাঙ্গাল, হতভাগ্য কে আছ ভাই, যে আজ বিধাতার মঙ্গলময় আহ্বানে আহুত হইয়া মাতৃভূমির ও মাতৃভাষার আরতির জন্য নৈবেদ্যোপচার লইয়া সমুপস্থিত না হইবে? ধনি! তুমি তোমার অর্থ লইয়া, বলি! তুমি তোমার বল লইয়া, বিদ্বান! তুমি তোমার অর্জ্জিত বিদ্যা লইয়া, সকলে সমবেত হও!

আজ আমরা যুগসন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান। সমস্ত ভারত আজ আমাদিগের দিকে সোৎসাহনেত্রে চাহিয়া রহিয়াছেন, স্বর্গ হইতে পিতৃপুরুষ আমাদের কার্য্যাবলী লক্ষ্য করিতেছেন। আজ আমরা জাতীয় জীবনে এমন এক স্তরে দণ্ডায়মান, যেখানে আমাদের সম্মুখে দুইটি মাত্র পথ, একটি অনন্ত অমরত্বের, অপরটি অনন্ত অকীর্ত্তির, মধ্যপথে আর কিছু নাই। আজ যদি আমরা তুচ্ছ আয়াসে মজিয়া ভবিষ্যৎ প্রেরিত এই মহাভাব উপেক্ষা করি, ভবিষ্যৎ বংশাবলী আমাদিগকে বিশ্বাসঘাতক উপাধিতে কলঙ্কিত করিবে, ভারতাকাশের উদীয়মান রবি উষার উন্মেষেই হায়, আবার অস্তমিত হইবে।"

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র

কলকাতায় ভূগর্ভ রেল : একটি সমীক্ষা

সাধনচন্দ্র দত্ত*

কলকাতায় যাত্রী-পরিবহনের সমস্যা দিনের পর দিন যেভাবে বেড়ে চলেছে, তার সুষ্ঠু সমাধানের জন্যে চাই উন্নতমানের পরিবহন-পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনাকে দ্রুত এবং অধিক সংখ্যক যাত্রী বহনের উপযোগী করে তুলতে হবে। ভূগর্ভ রেলপথ স্থাপনের সাহায্যে যদি এই সমস্যার সুরাহা করা যায়, তবে কলকাতার মত জনবহুল শহরের অর্থনৈতিক জীবনযাত্রায় ও উন্নয়নমূলক কাজে তাই হবে একমাত্র যুগান্তকারী ঘটনা। শহরতলীর ক্রমবর্ধমান যাত্রীদের মহানগরীর কেন্দ্র-স্থলে পৌঁছে দেওয়াই প্রস্তাবিত ভূগর্ভ-রেলপথের উদ্দেশ্য। পৃথিবীর বহু দেশই যানবাহনক্লিষ্ট শহরের দ্রুত যাত্রীবহনের সমস্যার সমাধান ভূগর্ভযান করেছে।

পরিবহন-সমস্যার সঙ্গে বৃহত্তর কলকাতার শহরের উন্নয়নকর্ম একটি অন্বয় সূত্রে বাঁধা। জন-সংখ্যার অস্বাভাবিক প্রাবল্যে, যানবাহনের ক্লিষ্টতা, ফুটপাতের বাসিন্দা ও পথচারী অসংখ্য মানুষের চাপে কলকাতার পথেঘাটে যেন সব-সময়ই অন্তহীন অবরোধ সৃষ্টি হয়ে চলছে। তার উপর আছে বর্ষা। স্বল্প বর্ষণেই অধিকাংশ জরুরী পথঘাট এবং মুখ্য শিল্পাঞ্চলগুলি জলমগ্ন হয়ে পড়ে। সুষ্ঠু ড্রেনেজ ব্যবস্থার অভাবে জল নিষ্কাশনেরও তেমন সুবিধা নেই, অধিকাংশ আবার অকেজো। ফলে জীবনযাত্রা হয় ব্যাহত। শহরের উন্নয়নমূলক কাজে সুচিন্তিত পরিকল্পনার অভাবেই যে নাগরিক জীবনযাত্রার এই দুর্বিপাক, তা সহজেই অনুমেয়। তাছাড়া এত বড় প্রাণচঞ্চল মেট্রোপলিটান শহরের দুই বৃহত্তম প্রান্তের মধ্যে পারাপারের একমাত্র সেতু হাওড়া ব্রীজ। দিনে 5,10,000 লোকের নিত্য যাতায়াত এর উপর নির্ভর করে। তাছাড়া আছে রকমারি গাড়ী-ঘোড়ার জোয়ার। ফলতঃ প্রাণচঞ্চল মানুষের কর্মের সূত্রে পড়ে ভাটা। সুষ্ঠু পরিবহন-ব্যবস্থা ও যাতায়াতের উপযোগী বিকল্প সাবওয়ে ব্যবস্থার প্রবর্তন ছাড়া জনসংখ্যার এই অস্বাভাবিক চাপ ও যানবাহনের ভিড় কমানো সম্ভব নয়। ভূগর্ভ রেলপথ স্থাপনের মাধ্যমে দ্রুত যাত্রীবহনের পরিকল্পনাকে যদি সুষ্ঠু রূপ দেওয়া যায়, তবে শহর কলকাতার সরকারী পরিবহন-ব্যবস্থারও জটিলতা কিছু কমবে। শহরে যাত্রীর ভিড় কমবে, বৃহত্তর কলকাতার সমৃদ্ধি ও শিল্প-সংস্কৃতির উন্নতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে। গত কয়েক বছরের পরিসংখ্যান থেকে দেখা গেছে যে, সর-কারী পরিবহন-ব্যবস্থার অধীন যে কয়টি ট্রাম ও বাস আছে, বৃহত্তর শহরের অগণিত মানুষের পক্ষে তা মোটেই পর্যাপ্ত নয়। পৃথিবীর অন্যান্য সমৃদ্ধ শহরের মত ভূগর্ভস্থ রেলপথ ছাড়া এ-যুগের সর্বাপেক্ষা জনবহুল শহর কলকাতায় যাত্রীর ভীড় কমানো এবং যান-বাহনের চাহিদা পূরণ করা যে কোনক্রমেই সম্ভব নয়, সে বিষয়ে প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তিই একমত হবেন। তার ফলে দ্রুত যাত্রীবহনের কাজ যেমন ত্বরান্বিত হবে, অন্যদিকে তেমনই প্রায় শতকরা পঞ্চাশ-ভাগ বাঙালী বেকার ইঞ্জিনিয়ারের কর্মসংস্থানের সুযোগ ঘটবে বলে আশা করা যায়।

ভূগর্ভ রেলের জন্যে উত্তর-দক্ষিণে ও পূর্ব-পশ্চিমে দুটি রেলপথের প্রয়োজন হবে। উত্তর-দক্ষিণে

*কুলজিয়ান কর্পোরেশন (ইঃ) লি.
কলিকাতা—16

দমদম থেকে বেহালা পর্যন্ত 13 মাইল ভূগর্ভ রেলপথ পাইকপাড়া, শ্যামবাজার, চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ, এসপ্লানেড, ময়দান, আশুতোষ-শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোড, রসা রোড, বীরেন শাসমল রোড, টালিগঞ্জ ট্রাম ডিপো ও বেহালা পর্যন্ত যাবে। পূর্ব-পশ্চিমে সাড়ে তিন মাইল ভূগর্ভ রেলপথ শিয়ালদহ স্টেশন থেকে বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট বরাবর ব্র্যাবোর্ণ রোডের মোড় পর্যন্ত অথবা আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার, গণেশ অ্যাভেনিউ, ডালহৌসি স্কোয়ার, ব্র্যাবোর্ণ রোড, তারপর হুগলী নদীর তলা দিয়ে হাওড়া স্টেশন পর্যন্ত যাবে। এই দুটি ভূগর্ভ রেলপথের মোট দৈর্ঘ্য দাঁড়াবে সাড়ে 16 মাইল। যাত্রীসাধারণের চাপ, অন্যান্য যান-বাহনের সুবিধা ইত্যাদি বিবেচনা করে স্টেশনগুলির স্থান নির্বাচন করা হবে। এই রেলপথে স্বয়ংক্রিয় ট্রেন চলবে 120 থেকে 150 সেকেণ্ডে একখানি করে; অর্থাৎ ঘন্টায় আপ-ডাউনে প্রায় 400,000 জন যাত্রী চলাচল করতে পারবেন।

এখন প্রশ্ন, কলকাতার মাটি ভূগর্ভ রেলপথের উপযুক্ত কিনা? এই বিষয়ে অনেকেরই ভ্রান্ত ধারণা আছে যে, কলকাতার মাটি এই পরিকল্পনার পক্ষে অনুপযুক্ত। আবার যদিও প্রয়োজনের পক্ষে ও নন্দনকলার পরিপ্রেক্ষিতে ভূগর্ভ রেলপথ স্থাপনার কথা তাঁরা স্বীকার করেন, তথাপি তার বিপর্যয়ের কথাও তাঁদের বলতে শোনা যায়। কিন্তু এই সব ধারণা নিতান্তই অজ্ঞতাপ্রসূত। একথা বেশ জোর দিয়েই বলা যায় যে, কলকাতার মাটি ভূগর্ভ রেলপথ স্থাপনের পক্ষে যথেষ্ট উপযুক্ত। আমেরিকার ফিলাডেলফিয়া শহরে মাত্র দু-তিন ফুট মাটি খুঁড়লেই জল বেরিয়ে পড়ে, তবু সেখানে ভূগর্ভ রেল চলছে। কলকাতার মাটি সে তুলনায় অযোগ্য হবে কেন? তাই যদি হবে, তবে কলকাতা বহুতলা বাড়ীগুলির ভার সহ্য করছে কেমন করে? কাজেই ভূগর্ভ রেল কলকাতা শহরে না হবার কোন যুক্তি নেই। তবে কলকাতার মাটিতে ভূগর্ভ রেলকে বেশী নীচে নামানো যাবে না, মাত্র কুড়ি ফুট গভীরে রাখতে হবে। প্রশস্ত রাস্তাগুলির মাটির নীচ দিয়ে রেলপথ তৈরি করা যাবে, তাতে রাস্তার পাশের বাড়ীগুলির কোন ক্ষতি হবে না—ক্ষতি হয়তো কিছুটা হবে ভূগর্ভস্থ ড্রেনের। তবে ড্রেন ভূগর্ভস্থ রেলের সুড়ঙ্গের দু-পাশে সরিয়ে আনা যায়। কলকাতায় ড্রেনের যা অবস্থা, তাতে নতুন ড্রেনও করা দরকার। তাতে লাভ বই লোকসান নেই। 'কাট অ্যাণ্ড ফিল' প্রথায় মাটি কেটে নীচ থেকে সিমেন্টের কাজ আরম্ভ করা যাবে বলে রেলপথের জন্যে সাবওয়ে তৈরি করতে খরচও তেমন বেশী পড়বে না। এর জন্যে স্বল্প ব্যয়ে প্রয়োজনীয় উন্নত কারিগরী সুবিধা পাওয়া খুবই সম্ভব। সুড়ঙ্গ নির্মাণের জন্যে ব্যয় সাধারণতঃ বেশী পড়ে এবং প্রস্তাবিত সাত মাইল ভূগর্ভ রেলপথের জন্যে মাত্র অল্প এলাকাতেই তা তৈরির দরকার হবে।

চার বছরের মধ্যেই প্রথম পর্যায়ের কাজ শেষ হবে। আপাততঃ শিয়ালদহ থেকে ডালহৌসি, ডালহৌসি থেকে কালীঘাট পর্যন্ত রেলপথ স্থাপন সম্ভব। এতে মোট ব্যয় হবে 60 কোটি টাকার মত। কলকাতার যাত্রী-পরিবহনের নিদারুণ সমস্যায় এই খাতে ব্যয়ের হিসাব যুক্তিসাপেক্ষ। লক্ষ লক্ষ নগরবাসী এতে উপকৃত হবেন। তাছাড়া খরচের টাকা কালক্রমে টিকিট বিক্রীর টাকা থেকে নিশ্চয়ই উঠে আসবে। বৃহত্তর শহরের সার্বিক উন্নয়নমূলক কাজকর্মের সার্থক রূপায়ণ এই পথেই সম্ভব।

ভারতের কৃষি-সমস্যা

শ্রীসুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়*

ভারতের জনসংখ্যার প্রায় 80% প্রত্যক্ষভাবে কৃষিজীবী, পরোক্ষভাবে আরও 10%-এর জীবিকা নির্ভর করে কৃষির উপর। এই 80 শতাংশই সমগ্র ভারতের খাদ্যোৎপাদন করে। জনসংখ্যার অনুপাতে প্রয়োজনমত খাদ্যোৎপাদন হয় না। ঘাটতি পূরণের জন্যে বর্মা, থাইল্যাণ্ড এবং বর্তমানে আমেরিকা থেকে খাদ্যদ্রব্য আমদানী করবার প্রয়োজন হচ্ছে। খাদ্য সম্পর্কে পরমুখাপেক্ষিতা অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক দিক থেকে হানিজন-ক তো বটেই, নীতিগতভাবেও বর্জনীয়।

কৃষি কেবলমাত্র খাদ্যই উৎপাদন করে না, শিল্প-বাণিজ্যের মূল বস্তুও উৎপাদন করে। খাদ্যোৎপাদনকে এগিয়ে নিতে যদি অধিকতর জমি খাদ্যশস্যের জন্যে ব্যবহার করি, তাহলে শিল্প-বাণিজ্যও সেই অনুপাতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক ভারসাম্য ব্যাহত হবে। অতএব দেখা যাচ্ছে যে, কৃষি-সমস্যা সমগ্র দেশেরই সমস্যা।

শস্যোৎপাদন নির্ভর করে নানাবিধ সুযোগ-সুবিধা ও প্রয়োজনীয় উপাদানের উপর। এদের মধ্যে জমির পরিমাণ ও গুণাগুণ, জলসেচ, বীজ, সার, কীটনাশক-দ্রব্য, কর্ষণের যন্ত্রাদি এবং সর্বশেষ মানুষ কৃষক বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

শস্যক্ষেত্রের বিস্তৃতির সুযোগ ভারতবর্ষে কেন, অন্যত্রও ক্রমশঃ সীমিত হয়ে আসছে। বস্তুতঃ বিজ্ঞানীরা শস্যোৎপাদনের ক্ষেত্র হিসাবে ক্রমশঃ মাটি ছেড়ে জল এবং সমুদ্রতলের কথা ভাবতে আরম্ভ করেছেন। আমাদের দেশে অনাবাদী সমস্ত জমি কৃষিযোগ্য করলেও বর্তমান উৎপাদনের হার যদি না বৃদ্ধি করা যায়, তাহলে কোনমতেই খাদ্যের চাহিদা মেটাতে পারবো না। অতএব প্রতি একরের উৎপাদনের হার বাড়ানোই একমাত্র পথ।

উন্নত জাতের বীজ ও তৎসহ প্রয়োজনীয় সার ও জলের সাহায্যে উৎপাদন 2/3 গুণ বৃদ্ধি করা খুবই সহজ। কিন্তু সমস্যা হলো, উপযুক্ত পরিমাণ উন্নত জাতের বীজ সংগ্রহ করা এবং সার ও কীটঘ্ন ঔষধাদির ব্যবস্থা করা। এই সঙ্গে চাই যথেষ্ট পরিমাণ সেচের জল।

রবিখন্দে একমাত্র গম ব্যতীত অন্য সব শস্যের বেলায় অপেক্ষাকৃত অল্প জমিতে চাষের কারণ, অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় জলের অভাব। গমের বেলায় লক্ষ্যের তুলনায় প্রকৃত আয়তন অধিকতর। এর মূলে রয়েছে উন্নত জাতের বীজের উপযুক্ত ব্যবহার। প্রধানতঃ পাঞ্জাব এই অভূত-পূর্ব সাফল্যের কৃতিত্ব পেতে পারে।

চতুর্থ প্রকল্পে উন্নত জাতের বীজ ব্যবহারের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হবে। কারণ, দেখা গেছে যে, যদি খাদ্যোৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভ করতে হয়, তাহলে উন্নত জাতের বীজ, আনুষঙ্গিক সার, জল ইত্যাদির ব্যবহার অনিবার্য।

সেচের জল যথেষ্ট পাওয়া গেলে একাধিক ফলনের পদ্ধতিও প্রসারিত করা সম্ভব হবে। বস্তুতঃ 1973-'74 সালে এই প্রকল্প অনুসারে মোট 400 লক্ষ একর জমি চাষ করা সম্ভব হবে। বর্তমানে (1968-'69) মাত্র 150 লক্ষ একর জমি এই পদ্ধতিতে চাষ করা হচ্ছে।

সার, যন্ত্রাদি (ট্রাক্টর, পাম্প ইত্যাদি), কীটঘ্ন

*কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী, নদীয়া

ঔষধাদি কৃষি-উন্নয়নের অন্যতম উপাদান। গত 8/9 বছরে এদের ব্যবহার প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই সমস্ত উপাদান বৃদ্ধি সত্ত্বেও উৎপন্ন খাদ্যশস্যের পরিমাণ বেড়েছে মাত্র 11·3%। জন-প্রতি দৈনিক খাদ্যের পরিমাণ কিন্তু কমেছে।

জল

কৃষি-উন্নয়নে যে বস্তুটির সর্বপ্রথম প্রয়োজন—সেটি হলো জল। এত সহজলভ্য অথচ এত মূল্যবান আর কোন কিছু আছে কিনা সন্দেহ।

জলসেচের সুযোগ পর্যাপ্ত থাকলে শস্যোৎ-পাদন কত পরিমাণ বাড়ানো যায়, তা পাঞ্জাবের দৃষ্টান্ত থেকে বোঝা যায়। পাঞ্জাবে জলসেচের পরিমাণ 59% (নেট জলসেচভুক্ত জমি/নেট চাষভুক্ত জমি × 100), যেখানে সর্বভারতীয় পরিমাণ মাত্র 20%। এজন্যে সেখানে একাধিকবার চাষের পরিমাণ সর্বভারতীয় পরিমাণের দ্বিগুণেরও বেশী, অর্থাৎ 33%। কেবল জলসেচের ব্যবস্থার দ্বারাই লুধিয়ানাতে জমির উৎপাদন-ক্ষমতা চতুর্গুণ বাড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হয়েছে।

সৌভাগ্যের বিষয়, আমাদের কৃষির উপযোগী জলের যে পরিমাণ মজুদ আছে (জলের উপরি ভাগে 13,600 লক্ষ একর ফুট এবং জমির নীচে 1650 লক্ষ একর ফুট), তাকে উত্তমরূপে ব্যবহার করলে আগামী 20 বছরে শস্যোৎপাদন ক্রমবর্ধমান হারে 4% বাড়িয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, অধিক মাত্রায় জল ব্যবহারের সঙ্গে যে কয়েকটি অসুবিধা রয়েছে, সেগুলির প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। তার মধ্যে জল-নিষ্কাশন ও লবণাক্ত জলের আক্রমণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। জলের প্রকৃত পরিমাণ নির্ধারণকল্পে এবং ব্যবহারের ফল সম্পর্কে যথেষ্ট গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে।

জলসেচের সঙ্গে সঙ্গে চাষের পদ্ধতির উন্নয়ন, উন্নত জাতের বীজ, সার ও কীটঘ্ন দ্রব্যাদির ব্যবহারের দ্বারা নির্দিষ্ট কতকগুলি জায়গায় কৃষি-সম্পদ এত অধিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে যে, জন-সাধারণের মধ্যে অভূতপূর্ব সাড়া পড়ে গেছে।

জল সম্পর্কে আরও একটু সতর্কতার কথা উল্লেখ করা উচিত। কৃষি-সমৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি অনিবার্য। তার জন্যেও জলের চাহিদা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাবে নিঃসন্দেহে। অতএব যে জলসম্পদ রয়েছে, তাকে উপযুক্তভাবে ব্যবহার করা যেমন দরকার হবে, তেমনি জলের নতুন উৎসের কথাও চিন্তা করতে হবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে সমুদ্রজলকে লবণমুক্ত করে ব্যবহারের চেষ্টা অন্যান্য দেশে চলছে।

রাসায়নিক সার

প্রতি একরে উৎপাদন বাড়াতে হলে সার ব্যবহার অনিবার্য। বিশেষ করে উন্নত জাতের বীজ ব্যবহার করতে গেলে এবং একাধিক ফলন প্রকল্প সাফল্যমণ্ডিত করতে হলে সার, জল ও কীটঘ্ন ঔষধাদি ক্রমশঃ বর্ধিত হারে প্রয়োগ করতে হবে। যথেষ্ট পরিমাণ সার আমাদের দেশে তৈরি হচ্ছে না। বর্তমান চাহিদা মেটাতেই আমদানির প্রয়োজন হয়। এই সমস্যার সমাধান হলো অধিক সংখ্যক সার-উৎপাদন কারখানা তৈরি করা। কিন্তু যেটুকু সার প্রস্তুত হচ্ছে এবং বর্তমানে যা আমদানী হচ্ছে, তার সমস্তই যদি বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে প্রয়োগে করা যায়, তাহলে অধিকতর সুফল লাভের সম্ভাবনা আছে। সারের দুটি ব্যবহারিক দিক রয়েছে—পরিমাণ ও উৎকর্ষ। পরিমাণ নির্ধারণ করা হয় পরীক্ষালব্ধ তথ্যের উপর নির্ভর করে। প্রায়শঃ মৃত্তিকাস্থিত উদ্ভিদ-খাদ্য কি পরিমাণ রয়েছে, তার হিসাব না করেই সর্বত্র একই ভাবে সার প্রয়োগ করা হয়। এতে দেখা গেছে যে, প্রয়ো-জনাতিরিক্ত সার ব্যবহার করে মূল্যবান সারের অপচয় ঘটেছে। অতএব মৃত্তিকা বিশ্লেষণ করে

প্রথমেই জানা দরকার, কি পরিমাণ উদ্ভিদ-খাদ্য তাতে মজুদ আছে এবং তার মধ্যে কতখানি গ্রহণ-যোগ্য অবস্থায় পাওয়া যাচ্ছে। এই তথ্যের উপর ভিত্তি করে সারের পরিমাণ নির্ধারণ করলে অপচয় এড়ানো যায়। দুঃখের বিষয় সার প্রয়োগের ব্যাপারে এখনও মৃত্তিকা বিশ্লেষণের প্রতি যথেষ্ট দৃষ্টি দেওয়া হচ্ছে না।

সারের উৎকর্ষ সম্পর্কে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। কোন্ রাসায়নিক পদার্থ সার হিসাবে অধিকতর কার্যকরী হবে, তা বিশেষভাবে নির্ভর করে শস্যের প্রকৃতির উপর এবং কোন কোন ক্ষেত্রে মৃত্তিকার গুণাগুণের উপর। উদ্ভিদ নাইট্রেট হিসাবেই নাইট্রোজেনকে সহজতর উপায়ে গ্রহণ করতে পারে, কিন্তু নাইট্রেট সহজদ্রাব্য বলে মাটি থেকে দ্রুত নিষ্কাশিত হয়ে যায়। তুলনায় অ্যামোনিয়াম আয়ন হিসাবে ব্যবহার করলে মৃত্তি-কায় সাময়িকভাবে আবদ্ধ অবস্থায় থাকতে পারে, কিন্তু সাধারণতঃ অ্যামোনিয়া নাইট্রেটে রূপান্তরিত না হলে কার্যকরী হয় না। অন্য দিকে দেখা গেছে যে, নাইট্রোজেন ফস্ফরাস সহযোগে অধিকতর কার্যকরী। এজন্যে অ্যামোনিয়াম ফস্ফেট এবং নাইট্রো-ফস্ফেটের ব্যবহার ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেয়েছে। সিন্ধ্রী সার কারখানার বিজ্ঞানীরা গত পাঁচ বছরে কয়েক হাজার পরীক্ষায় দ্বারা এই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, নাইট্রো-ফস্ফেটই অধিকতর ফলদায়ী, অথচ অপেক্ষাকৃত স্বল্পব্যয়-সাপেক্ষ। এরূপ পরীক্ষালব্ধ নতুন নতুন তথ্যের সাহায্যে সার প্রয়োগের সার্থকতা পূর্ণমাত্রায় উপলব্ধি করা বাঞ্ছনীয়।

গত ষোল বছরে নাইট্রোজেন, ফস্ফরাস ও পটাশের ব্যবহার বেড়েছে যথাক্রমে 11 গুণ, 70 গুণ এবং 50 গুণ। কিন্তু আমরা বরাবর প্রায়অর্ধেক পরিমাণ নাইট্রোজেন এবং এক-তৃতীয়াংশ ফস্-ফরাস আমদানী করে আসছি। নিজস্ব কোন ভাল উৎস না থাকবার জন্যে সমস্ত পটাশই আম-দানী করতে হচ্ছে। অতএব বহুমূল্য বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে যে সার পাই, তার ব্যবহার সতর্কতার সঙ্গে করতে হবে। অভ্রজাতীয় খনিজ পদার্থ থেকে (বিশেষভাবে অপচিত অংশ থেকে) সহজলভ্য উপায়ে পটাশ আহরণ করতে পারলে পটাশের সমস্যার কিছুটা সমাধান হতে পারে। পরীক্ষার সাহায্যে দেখা গেছে যে, অভ্র থেকে প্রত্যক্ষভাবেই উদ্ভিদাদি পটাশ গ্রহণ করতে পারে। এদিকে মৃত্তিকা-বিজ্ঞানীদের মনোযোগ দেওয়া উচিত।

উন্নত জাতের বীজ

বিজ্ঞানের নতুন নতুন পদ্ধতি অনুসরণ করে অধিক ফলনশীল, আলোকসংবেদনহীন, অপেক্ষা-কৃত স্বল্পমেয়াদী অভুশায়ী ও খর্বকায় শস্য-উদ্ভিদের উদ্ভব অল্প সময়ে সম্ভব হয়েছে। বহু গবেষণাগারে নতুন জাতের শস্যবীজ উৎপন্ন করবার কাজ দ্রুত-গতিতে অগ্রসর হচ্ছে।

ইণ্ডিকা শ্রেণীর ধান্যের মধ্যে তাইওয়ানে প্রথম এক চীনা বিজ্ঞানী খর্বকায়, স্বল্পমেয়াদী, অভুশায়ী এবং আলোকসংবেদনহীন একটি মিউট্যাণ্ট (Mutant) আবিষ্কার করেন। এটির নাম দেওয়া হয় ডি-জি-বুগেন। এথেকেই 1956 সালে জন্ম হয় টি-এন-1-এর। টি-এন-1-এর সঙ্গে 'পেতা'র মিলনে উৎপন্ন আই-আর-8-কে বলা হয় অত্যাশ্চর্য ধান্যবীজ। আই-আর-8 খর্বকায় এবং ঋজুপত্রী হবার ফলে আলোর সাহায্যে কার্বোহাইড্রেট জাতীয় দ্রব্য সংশ্লেষণ করতে যেমন সক্ষম, তেমনি অধিকমাত্রায় সার প্রয়োগে ফলন বৃদ্ধি করতেও অদ্বিতীয়।

স্থানীয় দীর্ঘকায় ধান্যের সঙ্গে আই-আর-8-এর মিলনে কটকে ধান্য গবেষণা কেন্দ্রে কয়েকটি নতুন জাতের বীজ সৃষ্টি করা হয়েছে। তার মধ্যে জয়া, পদ্মা, হংসা ও অন্নপূর্ণা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কোন কোন ক্ষেত্রে জয়া আই-

আর-8-এর তুলনায় 5-10% অধিকতর ফলন দেয় এবং হ্রস্বতর। বর্তমান বছরে 'করুণা' নামে একটি নতুন জাতের ধান্যবীজ মুক্ত করা হবে।

নতুন জাতের বীজের একটি প্রধান সমস্যা হলো, এরা মোটা দানার ধান দেয় এবং খেতে সুস্বাদু নয়। মিহি দানার অথচ অধিক ফলনশীল বীজের চাহিদা মেটাবার জন্যে 'বসুমতী'র সঙ্গে মিলনে জাত বি-সি-5 এবং বি-সি-6 নামক দুটি বীজ মুক্ত করা হবে। এই দুটিই দিল্লীর কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের পরীক্ষার ফল। অনুরূপ মিহি দানার ধান্যবীজ আই-আর-20 এবং আই-আর-22 আন্তর্জাতিক ধান্য গবেষণা প্রতিষ্ঠানের অবদান। ক্রমশঃ এই প্রকার সঙ্কর জাতীয় বীজ সৃষ্টির প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হচ্ছে এবং সর্বভারতীয় প্রকল্প হিসাবে অধিকতর উপযুক্ত ও খর্বতর সঙ্কর বীজের অনুসন্ধান ও অনুশীলন চলছে।

নতুন জাতের খর্বকায় ধান্যের একটি প্রধান অসুবিধা হলো, রোগ প্রতিরোধের অক্ষমতা। কিন্তু বিজ্ঞানীরা এই অসুবিধা দূরীকরণে বদ্ধপরিকর। সমস্যা যতই কঠিন হচ্ছে, বিজ্ঞানীরাও সংগ্রামী মনোবৃত্তি নিয়ে ততোধিক উৎসাহের সঙ্গে গবেষণায় ব্রতী হচ্ছেন নতুন নতুন প্রতিষেধক আবিষ্কারের জন্যে।

কীট, ছত্রাক, ইঁদুর, ভাইরাস ইত্যাদির আক্রমণে প্রায় 10-30% খাদ্যশস্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সময়োপযোগী রাসায়নিক দ্রব্যাদি ব্যবহার করলে এই ক্ষতির পরিমাণ হ্রাস করা খুবই সহজ। হিসাব করে দেখা গেছে যে, কীটনাশক রাসায়নিক পদার্থের দ্বারা ধান্যে 9·4%, গমে 2·4%, জোয়ারে 12·1%, তুলায় 40·3%, ইক্ষুতে 8·8% এবং আলুতে 10·8% শস্য বৃদ্ধি করা হয়েছে।

সাধারণতঃ রোগের আক্রমণের পরেই প্রতিষেধক রাসায়নিক দ্রব্যাদি ব্যবহার করা হয়। যদি সময়মত ব্যবহার করা যায়, তাহলে রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব। কিন্তু বহু ক্ষেত্রে সময়মত ঔষধাদি পেতে এবং সেগুলিকে ভালভাবে শস্যে ছড়িয়ে দেবার বাস্তব এবং অনিচ্ছাকৃত অন্তরায় আছে। অতএব অন্যান্য পদ্ধতি সম্পর্কে গবেষণা চলছে; যথা—বপনের পূর্বে বীজগুলিকে রোগমুক্ত করা অথবা বীজগুলিকে প্রতিষেধক দ্রবণে কিছু সময় ভিজিয়ে রাখা। এই পদ্ধতি অবলম্বনে আশানুরূপ ফললাভ হয়েছে। অধিক মূল্যে আমদানী করা ঔষধের ব্যবহার অনেক দিন চলতে পারে না। সুতরাং স্বল্পমূল্যের ঔষধাদির সন্ধানে আমাদের রসায়নবিদ্‌গণের লিপ্ত হওয়া দরকার।

অল্পার্দ্র কৃষি-ব্যবস্থা

বারিপাতের উপর ভিত্তি করে সাধারণতঃ পূর্ণ আর্দ্র, অল্পার্দ্র, মৃদু আর্দ্র ও অনার্দ্র—এই চারভাগে ভূমি বিভাগ করা হয়। রাজস্থান, গুজরাট রাজ্যের মধ্যাংশ, সৌরাষ্ট্র এবং মহারাষ্ট্র ও মহীশূরের কতকাংশ অল্পার্দ্র ভাগে পড়ে। এখানকার জলের উৎস কেবলমাত্র বৃষ্টি। এই এলাকায় কোন দৃঢ় কৃষি-ব্যবস্থা সম্ভব নয়। কিন্তু পরবর্তী মৃদু আর্দ্র এলাকায় বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে চাষের ব্যবস্থা সম্ভব। চতুর্থ প্রকল্পে মৃদু আর্দ্র এলাকায় বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে চাষের ব্যবস্থা হচ্ছে। মৃত্তিকা ও জল সংরক্ষণের সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে। জল সংরক্ষণের জন্যে পলিথিন, কাগজ অথবা অ্যালুমিনিয়াম পাতায় ঢেকে দেওয়া সম্পর্কে গবেষণা হয়েছে এবং বাস্তব ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা হয়েছে। যে সব বীজ দ্রুত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং আলোকসংবেদনহীন, সঙ্কর প্রজনন পদ্ধতিতে সেই ধরণের বীজের উদ্ভব হয়েছে। এই সব অল্পার্দ্র স্থানে রেড়ি, অড়হর ও জোয়ার সাফল্যের সঙ্গে চাষ করা হয়েছে। তৈল এবং তুলাবীজও অল্পার্দ্র এলাকায় চাষ করা হয়। সুতরাং নতুন

জাতের বীজ নিয়ে এদের চাষ এবং ফলন বৃদ্ধি করা ফলদায়ী হবে। সার মাটিতে না দিয়ে পাতায় ছড়িয়ে দিলে একই ফল পাওয়া যায়, অথচ জলের প্রয়োজন হয় কম। সুতরাং অনার্দ্র এলাকায় এই পদ্ধতিতে সার ব্যবহার বাঞ্ছনীয়।

খাদ্যে প্রোটিন

খাদ্যশস্যের পরিমাণগত প্রয়োজনীয়তাই আমাদের সমগ্র দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। কিন্তু এই প্রসঙ্গে খাদ্যের গুণাগুণ নিয়ে আলোচনা খুব কমই হয়েছে। আমরা জানি যে, খাদ্যে উপযুক্ত প্রোটিনের অভাব অত্যন্ত ব্যাপক, বিশেষ করে দরিদ্র কৃষক ও মজুরদের খাদ্যে। প্রোটিনের অভাবে কেবল যে দেহবৃদ্ধি বাধা পায় তাই নয়, দেহের রোগ প্রতিরোধ-ক্ষমতাও হ্রাস প্রাপ্ত হয়। কিন্তু প্রোটিন খাদ্য সাধারণতঃ মহার্ঘ বলে অনেকেই যথেষ্ট প্রোটিন গ্রহণ করতে পারে না। অতএব অল্পব্যয়ে খাদ্যে উপযুক্ত পরিমাণ প্রোটিন পরিবেশন একটি গুরুতর সমস্যা। এই সমস্যার সমাধানে সয়াবিন অনেকখানি সাহায্য করতে পারে বলে মনে হয়। সয়াবিনে প্রায় 40% প্রোটিন এবং 20% তৈলজাতীয় পদার্থ আছে। সেই তুলনায় গমে মাত্র 13% এবং ধানে 7·5% প্রোটিন রয়েছে।

ভারতের সর্বত্র নানা জাতের সয়াবিন নিয়ে পরীক্ষা চলছে—কোন্ জাতের বীজ কোন্ মাটিতে এবং আবহাওয়ায় সর্বাধিক ফলনশীল। অতএব যদি উপযুক্ত জাতের বীজ ব্যবহার করে ধান ও গম চাষের সঙ্গে সয়াবিনকেও কৃষি-কাঠামোর মধ্যে সন্নিবিষ্ট করা যায়, তাহলে উচ্চ প্রোটিন-যুক্ত খাদ্যের অভাব মেটানো যায়। সয়াবিনের দুধ, ছানা ইত্যাদি মোটামুটি উত্তম খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে। গবেষণার দ্বারা সয়াবিনের প্রকৃতিজ এবং অনভ্যস্ত গন্ধ বিলোপ করা সম্ভব হয়েছে। অতএব সাধারণ খাদ্যবস্তুর মধ্যে সয়াবিনের আসন পেতে কোন বাধা নেই। এজন্যে সম্প্রতি পশ্চিম বঙ্গ রাজ্য সরকার সয়াবিন চাষের উন্নতির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছেন।

অন্যান্য কয়েকটি চিন্তনীয় বিষয়

আমাদের কৃষি-প্রকল্পে ক্রমশঃ উন্নত জাতের বীজ ব্যবহার, একাধিক বার শস্যোৎপাদন, সেচ, কীটঘ্ন ও ঔষধাদির প্রয়োগ বৃদ্ধি পেতে থাকবে। খাদ্য-উৎপাদনের পরিমাণ এতে বাড়বে বটে, কিন্তু তার সঙ্গে কৃষি-ব্যবস্থায়ও অনেক পরিবর্তন আনতে হবে। উপরিউক্ত সমস্ত উন্নতিমূলক প্রকল্পে সময়ানুবর্তিতা একটি প্রধান চিন্তনীয় বিষয়। ঠিক সময়ে কর্ষণ, বপন, সেচ, সার ও রাসায়নিক দ্রব্যাদির প্রয়োগ এবং শস্য আহরণ না করতে পারলে সমগ্র প্রকল্প বিঘ্নিত হতে বাধ্য। এজন্যে যথেষ্ট লোকবল না থাকাই সম্ভব। অতএব যান্ত্রিক সাহায্যের প্রশ্ন স্বভাবতঃই এসে পড়ে। ভারী যন্ত্র আমাদের কাজের পক্ষে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অকেজো। কিন্তু ছোট যন্ত্র ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা অনেকেই উপলব্ধি করেন। কতখানি যান্ত্রিক সাহায্য কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য এবং সেগুলি আমাদের আর্থিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক পটভূমিকায় কতখানি সাফল্যমণ্ডিত হবে, তা বলা যায় না। এই বিষয়ে আমাদের অনুসন্ধানের অবকাশ রয়েছে।

কৃষিজাত দ্রব্যের আহরণ, গুদামে রাখা এবং রক্ষণাবেক্ষণ বর্তমানে খুবই অবহেলিত। এর জন্যে ক্ষতির পরিমাণ আশঙ্কাসূচক। খাদ্যবস্তু সংরক্ষণ বর্তমানে একটি বিশেষ বিজ্ঞানে পরিণত হয়েছে। আমাদের দেশে এই নিয়ে যথেষ্ট গবেষণা হয় নি।

আমাদের সকল প্রকল্পে যে সব উপাদানগুলির প্রয়োজন হয়, তার মধ্যে প্রধান ও অন্যতম হলো সেই মানুষগুলি, যারা প্রকল্পগুলিকে সাফল্যের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে। অথচ

এই মানুষদের সম্পর্কে এবং তাদের উপযুক্তভাবে প্রস্তুত করবার কথা আমরা ভাবি নি—যে রকম ভাবে ভাবা উচিত ছিল প্রকল্প আরম্ভের কয়েক বছর আগেই। এদের শিক্ষা এবং মানুষ হিসাবে বাঁচবার সুযোগ-সুবিধা দান সর্বাগ্রে কর্তব্য।

ক্ষুদ্র কৃষকদের অসুবিধা অনেক। দেখা দরকার এরা যাতে উন্নত কৃষি-পদ্ধতি গ্রহণ করতে পারে। তাহলেই এদের দুর্দশা দূর হবে। ভাগীদার চাষীর অবস্থা আরও শোচনীয়; অর্থাৎ যারা দেশের সকলের মুখে অন্ন তুলে দিচ্ছে, তাদের নিজের অন্ন নেই। এই অসম্ভব ও অসহনীয় অবস্থাই দেশে ও সমাজে নানাবিধ জটিলতার সৃষ্টি করেছে এবং চতুর তথাকথিত রাষ্ট্রনেতাগণ তাদের এই দুরবস্থার সুযোগ নিচ্ছেন। ভূমিসংস্কারের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হলেও নানা কারণে তাতে বাধা আসছে। জোর করে বলা দরকার যে, এই বিষয়ে যদি কোন সুনির্দিষ্ট পন্থা আমরা অবলম্বন না করি, তাহলে নবলব্ধ কৃষি-বিজ্ঞান ও কৃষি-কৌশল কোন কাজেই লাগবে না। এটিই তাহলে প্রকৃত সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে।*

[*নবম বার্ষিক 'রাজশেখর বসু স্মৃতি'বক্তৃতার সারাংশ]

"বস্তুতঃ, বিজ্ঞানের পদ্ধতি যে কি, তাহা আমরা জানি না ও জানা আবশ্যক বোধ করি না, মস্তিষ্কে কতকগুলা মশলা পুরিতে পারি, কিন্তু তাহা সাজাইয়া গোছাইয়া যথাবিন্যস্ত করিবার ক্ষমতা রাখি না। সমগ্রটা একবারে নিরীক্ষণ করিতে না পারিয়া কেবল এক প্রদেশই দেখিতে থাকি ও তাহা হইতে লম্বা চৌড়া সিদ্ধান্তের আবিষ্কার করি। খাইতে পারি, কিন্তু হজম করিবার শক্তি নাই। প্রাকৃতিক নিয়মের অন্বেষণ করিতে গেলে আগে প্রাকৃতিক ঘটনাগুলি তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিয়া চোখের সমক্ষে দাঁড় করাইতে হয় ও পরে সহস্র উপায়ে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া, ছেদ করিয়া, জোড়া লাগাইয়া, ভাঙ্গিয়া গড়িয়া, বিপুল পরিশ্রম ও অধ্যবসায় সহকারে পরস্পরের সম্বন্ধ নিরূপণ করিতে হয়, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। আমরা এক লম্ফে সাগর পার হইতে চাই, সেতুবন্ধনের অপেক্ষা করিতে পারি না। ডিম হইতে বাহিরিবা মাত্র উড়িতে চাই, পক্ষোদ্ভবের দেরী সহে না। উদ্যমও নাই, অধ্যবসায়ও নাই; ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করিয়া বহির্জগতে প্রেরণ করিবার দরকার বোধ করি না; কেবল চকিতের মত দৃষ্টিপাত করিয়া, পরে ধ্যানযোগে বিশাল বিশ্বের কার্য্যপ্রণালীর সামঞ্জস্য করিতে চেষ্টা করি। পাদরি সাহেব জাতিভেদের নিন্দা করিলেই আমরা পৈতা ছিঁড়িয়া ফেলি; আবার রিস্‌লি সাহেব নাক মাপিয়া জাতিভেদের মূল আবিষ্কার করিয়াছেন শুনিলেই কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া নেত্র বিস্ফারিত করিয়া থাকি। এমন স্নায়ুহীন পেশীহীন জীব কি আর আছে? ইংরাজী শিক্ষায় আমার শতধা উন্নতি হইয়াছে; কিন্তু বৈজ্ঞানিকতা জন্মিয়াছে স্বীকার করিতে পারি না। দেশী হউক আর বিলাতী হউক, গুরুবাক্য যতদিন আমরা দ্বিধাহীন চিত্তে গ্রহণ করিব, ততদিন আমাদের বৈজ্ঞানিকতার উৎপত্তির সম্ভাবনা নাই।"

রামেন্দ্রসুন্দর

বিজ্ঞান-চিন্তা-পদ্ধতির সার্বজনীনতা

শ্রীমহাদেব দত্ত

মানুষের সমাজের প্রগতিতে বিজ্ঞানের নানা প্রয়োগ হয়েছে, হচ্ছে এবং হবে। বিজ্ঞানের নিত্যনতুন চমকপ্রদ আবিষ্কার মানুষের মনকে সাড়া দেয়, বিস্মিত করে, করে বিজ্ঞান সম্বন্ধে উৎসুক। সভ্য সমাজে মানুষ নানা দিক থেকে বিজ্ঞানের আবিষ্কারের উপর নির্ভর করে। তাঁর প্রতিদিনের জীবনে নানা আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে বিজ্ঞান নানা সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করেছে, করছে ও করবে। এসব আবিষ্কার, সুযোগ-সুবিধার সম্যক ব্যবহার করতে গেলে চাই বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচিতি। এর জন্যে গড়ে উঠেছে লোক-বিজ্ঞান।

লোক-বিজ্ঞানের একটা প্রধান উদ্দেশ্য বিজ্ঞানের চমকপ্রদ আবিষ্কারের, মানুষের ব্যবহারের উপযোগী নানা আবিষ্কারের সঙ্গে জনসাধারণকে সহজভাবে যতদূর সম্ভব পরিচয় করিয়ে দেওয়া ঐ সব আবিষ্কারের বিস্তারিত তথ্য দিয়ে। লোক-বিজ্ঞানের এদিকটা তথ্যমূলক। ওদেশে লোক-বিজ্ঞানের এদিকটা যথেষ্ট প্রসার লাভ করেছে, এদেশেও প্রসার ভালই হয়েছে।

নানা চমকপ্রদ আবিষ্কার, মানুষের ব্যবহারের উপযোগী জিনিষপত্র আবিষ্কার ছাড়াও বিজ্ঞানের আর একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিক আছে। সেটা হচ্ছে বিজ্ঞানের নানা মূলগত তত্ত্ব। বিজ্ঞানের প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে নতুন নতুন তত্ত্ব গ্রথিত হয়। এসব তত্ত্ব যেমন একদিকে বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কারের সাহায্য করছে, দৃশ্য জগৎকে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় পাওয়া নানা তথ্যকে ভালভাবে বুঝতে সাহায্য করছে, অপরদিকে তেমনি বিজ্ঞানের গণ্ডী ছাড়িয়ে শিল্প, দর্শন, সাহিত্য প্রভৃতি মানুষের জ্ঞানের অপর শাখা-গুলির উপর প্রভাব বিস্তার করছে। শিক্ষিত-জনসাধারণের সবাই না হলেও একটা বড় অংশ এসব তত্ত্ব সম্বন্ধে মোটামুটি আগ্রহী। কাজেই এসব তত্ত্বের মূল কথা, এদের বিবরণ সরল ও সহজ ভাষায় আলোচনার অনেক চেষ্টা হয়েছে। লোক-বিজ্ঞানের এই উদ্দেশ্যও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। ওদেশে ও মোটামুটি এদেশেও লোক-বিজ্ঞানের এদিকটা অবহেলিত নয়।

নানা চমকপ্রদ ও দরকারী আবিষ্কারের ও নানা মৌলিক তত্ত্ব গ্রন্থনের অতিরিক্ত বিজ্ঞানের আর একটা বিশেষ প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ দিক আছে, সেটা বিজ্ঞান-চিন্তা, এর ধরণ-ধারণ, এর রীতি-প্রকৃতি। প্রত্যেক আবিষ্কার, প্রত্যেক মূলগত তত্ত্বের গ্রন্থনার মূলে এ রয়েছে। কিন্তু মজার ব্যাপার, এই বিষয়ে অনেক বিজ্ঞানীই সচেতন নন। ওদেশে মাত্র কয়েকজন মনীষীই এই সম্বন্ধে সচেতনভাবে আলোচনা করেছেন। ওদেশে লোক-বিজ্ঞানে এই বিষয়ে আলোচনা বিরল। আর এদেশে এই বিষয়ে কোনও আলোচনা হয়েছে কিনা, জানা নেই। অবশ্য দেশনেতাদের বক্তৃতায় শোনা যায় নানা সমস্যার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করে সমাধান করার, বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার সাহায্যে দেশের, সমাজের কুসংস্কার দূর করে নতুন সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর কথা। ব্যক্তিগত সাধারণ কথাবার্তায়ও বৈজ্ঞানিক চিন্তা, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর কথা প্রায়ই বলা হয়। এই বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী কি? বৈজ্ঞানিক চিন্তার নিজস্ব রূপ, বৈশিষ্ট্য ও ধরণ-ধারণ প্রভৃতি

সম্বন্ধে আলোচনা করে সুস্পষ্ট ধারণা করবার বিশেষ চেষ্টা হয় নি। অবশ্য এই বিষয়ে আলোচনা একটা বিরাট ব্যাপার।

এখানে বিজ্ঞানের সমস্যা সমাধানে বৈজ্ঞানিক চিন্তার ধরণ নিয়ে আলোচনার চেষ্টা করা হবে, যাতে অধিক লোকের পক্ষে এই আলোচনা সহজে বোধগম্য হয়। এজন্যে যে সব সহজ সমস্যার সমাধান মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অবশ্য পাঠ্য হিসাবে পড়ানো হয়, সে সব থেকে উদাহরণ নিয়ে সমস্যা সমাধানে বৈজ্ঞানিক চিন্তার ধরণ বোঝাবার চেষ্টা করা যাবে। পরে বিজ্ঞানের বাইরের কয়েকটি সহজ সমস্যার সমাধান কিভাবে একই ধরণে চিন্তা করে করা যায় আলোচনা করে দেখানো হবে, যাতে এই ধরণের চিন্তার সার্বজনীন উপযোগিতা বোঝা যায়। বর্তমানে এখানে বিজ্ঞান-চিন্তার ধরণ-ধারণের, রীতি-প্রকৃতির সামগ্রিক আলোচনার চেষ্টা করে এই প্রবন্ধকে জটিল করা হবে না, যথা-সম্ভব সহজবোধ্য রাখা হবে। যদি এই বিষয়ে আগ্রহ সৃষ্টি হয়, তবে পরে এই বিষয়ে নানা প্রবন্ধে আলোচনা করা যেতে পারে।

সমস্যা সমাধানে বৈজ্ঞানিক চিন্তার ধরণ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা করবার জন্যে সাধারণ পরিচিত মাধ্যমিক জ্যামিতি (যা গণিতে ইউক্লিডীয় জ্যামিতি নামে পরিচিত) থেকে আলোচনা সুরু করা যাক। জ্যামিতিতে কয়েকটি মূল বস্তুর (যাদের সংজ্ঞা দেওয়া হয় না, ধরে নেওয়া হয় পরিচয় জানা আছে) মূলগত ধর্ম বা নিজেদের মধ্যে সম্বন্ধের নিয়ম (স্বতঃসিদ্ধ নামে সাধারণতঃ পরিচিত) উল্লেখ করে অপরাপর বস্তুর বা সম্বন্ধের সংজ্ঞা দেবার পর নানা সমস্যার সমাধান করা হয়। জ্যামিতির সমস্যাগুলিকে সাধারণতঃ দু-ভাগে ভাগ করা হয়—সম্পাদ্য ও উপপাদ্য। সম্পাদ্যে কোনও না কোনও চিত্র বা চিত্রাংশ অঙ্কন করা হয়, অর্থাৎ কোন কাজ সম্পাদন করা হয়। উপপাদ্যে জ্যামিতির বস্তুর অংশগুলির বা কতক-গুলি বস্তুর সম্বন্ধ বা তাদের ধর্ম যথার্থ বলে প্রতিপন্ন করতে হয়, যদিও সম্পাদ্য ও উপপাদ্যের উদ্দেশ্য ভিন্ন। তবু আলোচনার মূল ধাপগুলি ও চিন্তনের ধরণ একই রকমের, পার্থক্য কেবল বিভিন্ন অংশের গুরুত্বের তারতম্যে। সম্পাদ্যে সর্বাধিক গুরুত্ব অঙ্কনে, প্রমাণে মাত্র যাচাই করা হয়, যা করবার লক্ষ্য ছিল তা সুসম্পন্ন হয়েছে কিনা। উপপাদ্যে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয় প্রমাণে, অঙ্কন প্রমাণের সহায়ক মাত্র।

সম্পাদ্য ও উপপাদ্য উভয়েরই চারটি প্রধান ভাগ সাধারণ বইতে দেখা যায়; যথা—সাধারণ নির্বচন, বিশেষ নির্বচন, অঙ্কন ও প্রমাণ। সাধারণ নির্বচনে সমস্যার মূল কথাটি সংক্ষেপে সাধারণ-ভাবে বলা হয়। বিশেষ নির্বচনে সমস্যাটি লেখ-র সাহায্যে বিভিন্ন অংশের বিভিন্ন নাম সবিস্তারে বিশ্লেষণ করে বোঝা বা বোঝানো হয়। সবাই জানেন, সাধারণ নির্বচনে আবার দুই ভাগ থাকে, যথা—স্বীকার ও সিদ্ধান্তের বিষয়। স্বীকারে যে সব জ্যামিতিক বস্তু বা তাদের অংশগুলি নেওয়া হয় ও তাদের মধ্যে যে সব সম্পর্ক, তা সব সুস্পষ্টভাবে বলা হয়। সিদ্ধান্ত কি, প্রতিপাদ্য বিষয় বা কি সম্পন্ন করতে হবে, সঠিকভাবে তার নির্দেশ দেওয়া হয়। বিশেষ নির্বচনে ও সাধারণ নির্বচনে উক্ত স্বীকার ও সিদ্ধান্ত লেখ ও নামের সাহায্যে পরিস্ফুট করে তোলা হয়। সমস্যা সমাধানে কোন সর্ত দেওয়া থাকলে তাও সাধারণ নির্বচনে সাধারণভাবে ও বিশেষ নির্বচনে সবিস্তারে সুস্পষ্ট করে বলা হয়। সাধারণ নির্বচনের সমস্যা সংক্ষিপ্ত বিবরণাদি বিশেষ নির্বচনে ভালভাবে বোঝা বা বোঝাবার চেষ্টা করা হয়; অর্থাৎ এই দুটি নির্বচনের সাহায্যে বিবেচনাধীন সমস্যাটি সঠিকভাবে বোঝা হয়। সমস্যা ঠিকভাবে বোঝা

গেলে তবেই সমস্যা সমাধানের কথা ওঠে। সমস্যা কি, ঠিকমত না জানলে কি সমাধান করা হবে? জ্যামিতিতে সমস্যার প্রকৃত সমাধান করা হয় অঙ্কন ও প্রমাণের সাহায্যে। বিশেষ নির্বচনের পরে আসে অঙ্কন। এতে সম্পাদ্যের সমস্যার উদ্দিষ্ট সমাধানের জন্যে দরকারমত নানা রেখাংশ, বৃত্তাংশ প্রভৃতি লেখ অঙ্কন করে সিদ্ধান্তে উক্ত কাজটি সুসম্পন্ন করা হয়, আর উপপাদ্যে সিদ্ধান্ত উক্ত বিষয়টি প্রমাণের সহায়ক দরকারমত লেখ অঙ্কন করা হয়। প্রমাণে যুক্তির দ্বারা সম্পাদ্যে যা করণীয় ছিল, তা সুসম্পন্ন হয়েছে কিনা যাচাই করে দেখে নেওয়া হয়, আর উপপাদ্যে মূল প্রতিপাদ্য বিষয়টি প্রতিপন্ন করা হয়। প্রায়ই দেখা যায়, একটি উপপাদ্য প্রমাণ করতে গিয়ে যুক্তির ভিন্ন ভিন্ন রূপে একাধিক সংশ্লিষ্ট বিষয় সহজেই প্রমাণিত বা প্রায় প্রমাণিত হয়েছে আর সম্পাদ্যে অঙ্কন-পদ্ধতিতে আরও কয়েকটি জ্যামিতিক বিষয় অঙ্কিত, প্রায় অঙ্কিত হয়েছে। অনুসিদ্ধান্ত প্রভৃতির আলোচনায় সংশ্লিষ্ট ফলাফলগুলি সম্বন্ধে সজাগ ও সতর্ক হয়ে সম্পাদ্যের অঙ্কন রীতি ও উপপাদ্যের প্রমাণ-পদ্ধতির তাৎপর্য ও উপযোগিতা সম্যকরূপে আয়ত্ত করতে হয়। এই আলোচনা অপর সমস্যা সমাধানে বিশেষ সহায়ক হয়।

যে কোন সমস্যা সমাধানের পদ্ধতিতেই এই চারটি প্রধান ধাপ আছে। আবার বাস্তব জগতের সমস্যাগুলিও দুই ধরণের, কতকগুলিতে কিছু না কিছু কাজ করাই প্রধান উদ্দেশ্য। এই সমস্যাগুলিকে ক্রিয়ামূলক সমস্যা, অন্যগুলিতে কোন একটি বিষয়ের যাথার্থ্যতা সম্বন্ধে বিচার করা, এগুলিকে বিচারমূলক সমস্যা বলে। ক্রিয়ামূলক সমস্যা সম্পাদ্যের ও বিচারমূলক সমস্যা উপপাদ্যের মত। অবশ্য বাস্তব জীবনের বেশীর ভাগ সমস্যা বিশেষ জটিল, এগুলি অনেকগুলি সমস্যা থেকে উদ্ভূত। কাজেই এসব সমস্যা অংশতঃ ক্রিয়ামূলক, অংশতঃ বিচারমূলক। আগেই বলা হয়েছে, প্রত্যেক সমস্যা সমাধানের চেষ্টার আগে এই সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা করতে হয়। এদিকটা জ্যামিতির সাধারণ ও বিশেষ নির্বচনের মত। সমস্যা ঠিকমত ধারণা করতে পারলে তখন সমাধানের কথা ওঠে। আর সম্পাদ্যের মতই ক্রিয়ামূলক সমস্যা দরকারমত কর্মের অনুষ্ঠান করে সম্পাদন করতে হবে আর উদ্দিষ্ট কাজ সম্পন্ন হয়ে গেলে দেখে নেওয়া উচিত, প্রকৃতই উদ্দিষ্ট কাজটি করা হয়েছে কিনা। একটি অতি সাধারণ উদাহরণ দেওয়া যাক। আগামী পূজার সময় অনেকেই স্বাস্থ্যকর, ইতিহাস-প্রসিদ্ধ বা শিল্পপ্রধান শহরে ঘুরে আসতে ইচ্ছুক। ধরা যাক, দশজনের একদল ঐ সময় পুরী যেতে চান। এটিকে একটি ক্রিয়ামূলক সমস্যা হিসাবে দেখলে সাধারন নির্বচন হবে 'আগামী পূজার সময় পুরী যাওয়া'। এর বিশেষ নির্বচনের স্বীকার হবে, কলিকাতায় দশজনের একদল কলিকাতায় আছেন, আগামী অক্টোবর মাসে 6ই থেকে 10ই পর্যন্ত পূজা হবে, ঐ দশজনের পুরী যাওয়া প্রভৃতির জন্যে আর্থিক ও শারীরিক সামর্থ্য আছে; সিদ্ধান্ত হবে কলিকাতা থেকে 499 কিঃ মিঃ দূরে অবস্থিত পুরী যাওয়া। সম্পাদ্যের অঙ্কন যেমন করা হয়, এখানে টিকিট কেটে সময়মত ষ্টেশন বা বিমান বন্দরে গিয়ে ট্রেন বা বিমানে চেপে বা সময়মত মোটরে (ব্যবস্থা করা সম্ভব হলে) চেপে রওনা। পুরীতে জগন্নাথের মন্দির, সমুদ্র প্রভৃতি পুরীর বিশেষ নিদর্শন দেখে কৃতনিশ্চয় হওয়া সম্পাদ্যের প্রমাণের সামিল। দেশের খাদ্য-সমস্যাও একটি ক্রিয়ামূলক সমস্যা। সাধারণ নির্বচন হবে 'দেশের বা দেশের খাদ্য ঘাটতি অঞ্চলের খাদ্যাভাব দূর করা'। বিশেষ নির্বচন হবে, দেশের বা খাদ্য-ঘাটতি অঞ্চলের খাদ্যাভাবের পরিমাণ, কি ধরণের খাদ্য কত পরিমাণে দরকার, তা সঠিকভাবে নির্ণয় করা। ঐ পরিমাণ ঐ ধরণের খাদ্য কোথা কোথা থেকে কি কি ভাবে সংগ্রহ

করা যেতে পারে, তা সঠিক নিরূপণ করা। সিদ্ধান্ত হবে, যে যে স্থানে ঐ খাদ্য পাওয়া যাচ্ছে, তা সংগ্রহ করে দেশের ঘাটতি অঞ্চলে এনে সুনিয়ন্ত্রিতভাবে বণ্টন করা। পরে সিদ্ধান্ত মত কাজ করা সম্পাদ্যে অঙ্কনের সামিল ও পরে তথ্যাদি নিয়ে খাদ্য ঠিক মত অভাবীদের কাছে পৌঁছুলো কিনা দেখা সম্পাদ্যে প্রমাণের সামিল। অবশ্য খাদ্যসমস্যা বাস্তবে একটি বিশেষ জটিল সমস্যা। খাদ্য ঘাটতি অঞ্চল ঠিকমত নিরূপণ, প্রয়োজনীয় খাদ্যের ধরণ ও পরিমাণ নির্ণয়, খাদ্যের প্রাপ্তিস্থান নির্ণয়, খাদ্য-সংগ্রহ, তা যথাস্থানে আনয়ন ও ঠিকমত বণ্টন—প্রত্যেকটিই এক-একটি বিরাট সমস্যা। কিন্তু সমস্যা সমাধানের পদ্ধতিতে মূল ধাপগুলি একই ধরণের। শহরের পরিবহন সমস্যাও এভাবে আলোচনা করা যায়।

এবার বিচারমূলক সমস্যার একটি উদাহরণ আলোচনা করা যাক। ধরা যাক, এক শহরের যদুবাবু একদিন রাতে খুন হয়েছেন। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ যদুবাবুর প্রতিবেশী রামবাবুকে খুনের দায়ে অভিযুক্ত করেছেন। রামবাবুর অভিন্নহৃদয় সুহৃদ শ্যামবাবুর ধারণা, রামবাবু নিরপরাধ ও তিনি তা প্রতিপন্ন করতে সচেষ্ট হলেন। এই সমস্যার সাধারণ নির্বচন হবে 'রামবাবু যদুবাবুর খুনের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে সম্পর্কশূন্য' (কাজেই নিরপরাধ)। সমস্যার বিশেষ নির্বচনের সামিল হবে যদুবাবুর খুন সম্বন্ধে সঠিক বিবরণ, খুনের সময় রামবাবুর অন্যত্র অন্য কাজে ব্যস্ত থাকার বিবরণ। প্রমাণ করতে হবে—রামবাবু যদুবাবুর খুনের ব্যাপারে সম্পূর্ণ সম্পর্কশূন্য। খুনের সঠিক বিস্তারিত বিবরণ, রামবাবুর খুনের সময়ের গতিবিধি সম্বন্ধে ও যদুবাবুর সঙ্গে রামবাবুর সম্পর্ক সম্বন্ধে তথ্যাদি প্রমাণসহ সংগ্রহ করা প্রমাণের সহায়ক অঙ্কনের মত। ঐসব তথ্যাদি ও বিবরণের উপর নির্ভর করে যে সওয়াল করা হয়, তা উপপাদ্যের প্রমাণের সঙ্গে তুলনীয়। অপরাপর বিচারমূলক সমস্যা সমাধানের পদ্ধতিও একই ভাবে আলোচনা করা যায়। জ্যামিতির চিন্তার এই ধরণ সার্বজনীন। মনে হয়, এজন্যে গ্রীক দার্শনিক প্লেটো জ্যামিতি অবশ্যপাঠ্য মনে করতেন ও যিনি জ্যামিতি পড়েন নি, তাঁকে প্লেটো শিক্ষামন্দিরে প্রবেশের অধিকার দেন নি।

দুর্ভাগ্যবশতঃ জ্যামিতি বা বিজ্ঞানের অপরাপর শাখার সমস্যা নিয়ে বিদ্যালয়ে বা পরে মহাবিদ্যালয়ে যখন আলোচনা করা হয়, তখন মনের উপরে উক্ত ধরণ সম্বন্ধে ছাত্রদের দৃষ্টি আকর্ষণের কোন চেষ্টাই হয় না। এজন্যে শিক্ষা সমাপ্তি হলেও শিক্ষিতদের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অভ্যাস হয় না ও শিক্ষাগত যোগ্যতার জন্যে উচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত হয়েও সমস্যা সমাধানে জটিলতা সৃষ্টি করা হয় প্রকৃত বিশ্লেষণের অভাবে। এর বহু উদাহরণ বাস্তব জীবনে দেখা যায়। সাম্প্রতিক একটিমাত্র ঘটনা এখানে উল্লেখ করা গেল। বর্তমানে শিক্ষাজগতে নানারূপ বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে নিত্য কাজ চালু রাখা কঠিন হয়েছে। কিভাবে অবস্থার উন্নতি করা যায়, সে সম্বন্ধে প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ, শিক্ষক, শিক্ষানুরাগী সবাই চিন্তা করছেন। কিছুদিন আগে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে দুটি বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সমর্থকদের মধ্যে ঘন ঘন সংঘর্ষ হওয়ায় প্রায়ই ক্লাশ বন্ধ রাখতে হয়। শেষ পর্যন্ত এই সংঘর্ষে দুটি ছাত্র নিষ্ঠুরভাবে নিহত হয়। তখন ক্লাশ বন্ধ করে শান্তি রক্ষার জন্যে বিশ্ব-বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে অন্য প্রদেশাগত পুলিশবাহিনী মোতায়েন করা হয়। কিছুদিন পরে ওখানে এক জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হয় ও ঐ পুলিশবাহিনী সরিয়ে নেওয়া হয়। বহিরাগতদের প্রকাশ্য আক্রমণ থেকে অন্য প্রদেশের পুলিশবাহিনী মোতায়নের সার্থকতা আছে। কিন্তু যে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যেই বিভেদ ও সংঘর্ষ, যেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যের ছাত্রেরাই অশান্তির

মূল, সেখানে স্থানীয় ভাষায় অনভিজ্ঞ বহিরাগত পুলিশবাহিনীর পক্ষে দুষ্কৃতকারীদের বের করে শাস্তি দেওয়া ও শান্তি স্থাপন করা সম্ভব নয়, তাদের ক্রিয়াকলাপ জটিলতাই বৃদ্ধি করবে। এখানে প্রকৃত সমস্যা ঠিক বোঝাই হয় নি।

এই প্রবন্ধে বৈজ্ঞানিক চিন্তার ধরণ-ধারণ, রীতি-নীতি প্রভৃতির খুব সূক্ষ্ম দিকটা সংক্ষেপে আলোচনা করা গেল। এসবের সূক্ষ্ম গভীর দিক নিয়ে অনেক আলোচনা করা যায়। এই বিষয়ে দৃষ্টি আকৃষ্ট হলে এই আলোচনা সার্থক হবে ও পরে অন্য আলোচনার অবতারণা করা যেতে পারে।

লেসার রশ্মির কার্যকারিতা

লেসার রশ্মি যে কত জোরালো হয়, এই ছবি থেকে তা বোঝা যাচ্ছে। ছবিতে দেখা যাচ্ছে অত্যন্ত জোরালো লেসার রশ্মি এক সেকেণ্ডের হাজার ভাগের এক ভাগেরও কম সময়ে অত্যন্ত কঠিন ট্যাণ্টালাম ধাতুর পাত্ ভেদ করে একটি ছিদ্র উৎপন্ন করেছে। ট্যাণ্টালাম ধাতুর স্ফুটনাঙ্ক 5,500 ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড।

থ্রম্বোসিস

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র কর

আধুনিক কালে যে সমস্ত রোগের অভিশাপ মানুষের আয়ুবৃদ্ধির পথ রোধ করে অথবা সুস্থ জীবনযাত্রায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করে তাকে পঙ্গু ও অকর্মণ্য করে করে দেয়, তার মধ্যে অন্যতম প্রধান হলো থ্রম্বোসিস, বিশেষতঃ করোনারী (Coronary) থ্রম্বোসিস। পাশ্চাত্য দেশগুলিতে ও আমেরিকায় এই ব্যাধিটিকে মানুষের পরম শত্রু হিসাবে গণ্য করা হয়। ভারতে সঠিক মৃত্যুহার কত তা বলা কঠিন, কারণ এদেশে জনসাধারণের মধ্যে এই রোগের প্রকোপ সম্বন্ধে স্বাস্থ্যসমীক্ষায় লিখে রাখবার ব্যবস্থার প্রচলন নেই। সুখের বিষয় এই যে, থ্রম্বোসিস-প্রাদুর্ভূত দেশগুলির মত ভারতের চিকিৎসকেরা এই মারাত্মক ব্যাধি সম্পর্কে অবহেলা না করে সচেতন হয়ে উঠেছেন। এই রোগজনিত মৃত্যুহার সবচেয়ে বেশী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, আর জাপানে সবচেয়ে কম। নারীদের অপেক্ষা পুরুষেরাই বেশী সংখ্যায় এই ব্যাধির শিকার হয়ে থাকে। আরো জানা যায় যে, বৃদ্ধ ও মধ্যবয়স্কদের মধ্যেই ব্যাধিটি সীমাবদ্ধ।

রোগের প্রবণতা

সংবাদপত্র পাঠে দেখা যায় যে, গণ্যমান্য ব্যক্তিরা ইদানীং কালে প্রায়ই হৃদ্‌রোগ বা করোনারী থম্বোসিসের কবলে পড়ে মৃত্যুবরণ করেছেন। সংক্ষেপে বলা যায় যে, সমগ্র বিশ্বে উচ্চ পর্যায়ের জনগণের মধ্যে এই ব্যাধির প্রাদুর্ভাব হচ্ছে। যাঁরা অতিমাত্রায় চিন্তাশীল, বুদ্ধিজীবী ও চিন্তানায়ক, তাঁরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দৈহিক পরিশ্রম নিতান্তই কম করেন (মানসিক পরিশ্রমের তুলনায়)। তাঁদেরই এই ব্যাধি হবার সম্ভাবনা বেশী। এক সমীক্ষা অনুসারে জানা যায় যে, সমাজে উচ্চস্তরের ব্যক্তিরা (যেমন—অধ্যাপক, চিকিৎসক, শিক্ষাবিদ্, প্রতিরক্ষার পদস্থ কর্মচারী, ইঞ্জিনিয়ার, সরকারী শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ) শতকরা 8·1% এই রোগের আক্রমণে মারা যান। শিল্পে স্বল্প বেতনের শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে এর হার শতকরা 3·2%। আর মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেদের (যেমন—কেরাণী, ছাত্র ইত্যাদি) এই ব্যাধিটিও হয়ে থাকে উপরের দুটি অঙ্কের মাঝামাঝি হারে শতকরা 6·2%।

অ্যাথিরোস্ক্লেরোসিস

করোনারী হৃদ্‌রোগ, করোনারী ধমনীর ব্যাধি এবং ইসকামিক (Ischaemic) হৃদ্‌রোগ—এই কয়টি আখ্যাই সমার্থবোধক। করোনারী হৃদ্‌রোগ বোঝাতে চিকিৎসাশাস্ত্রে অ্যাথিরোস্ক্লেরোসিস (Atherosclerosis) শব্দটি প্রায়ই প্রযুক্ত হয়। লক্ষণীয় বিষয় হলো এই যে, অ্যাথিরোস্ক্লেরোসিসই করোনারী হৃদ্‌রোগে শতকরা 95% মৃত্যুহারের জন্যে দায়ী।

তিন ধরণের অ্যাথিরোস্ক্লেরোসিস

অ্যাথিরোস্ক্লেরোসিস বা অ্যাথিরোমা (Atheroma) রোগে দেহের কোন অতি প্রয়োজনীয় অংশে, বিশেষতঃ হৃদ্‌যন্ত্র, মস্তিষ্ক কিংবা বৃক্কে (Kidney) রক্ত সরবরাহ বন্ধ বা কম হয়ে জীবকে মৃত্যুর পথে ঠেলে নিয়ে যায়। এই অনুসারে অ্যাথিরোস্ক্লেরোসিস হয়ে থাকে করোনারী, সেরিব্রাল ও রেনাল ধরণের।

তবে এগুলির মধ্যে অ্যাথিরোস্ক্লেরোসিস রোগাক্রান্ত হবার অতি সাধারণ দেহাংশ হলো—রক্তবাহীনালীগুলির করোনারী কাঠামোয়। হৃদ্‌যন্ত্রে বাম নিলয় (Ventricle) থেকে উদ্ভূত মহাধমনী (Aorta) এবং মস্তিষ্কের ধমনীগুলিও সচরাচর এই ব্যাধির প্রকোপে পড়ে। মাঝারি আকারের ধমনীসমূহের এই রোগে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা কম। এখানে বলে রাখা ভাল যে, করোনারী ধমনীর দুটি প্রধান ব্যাধি—এন্‌জাইনা পেক্টোরিস এবং করোনারী অবরোধ (Occlusion) বা থ্রম্বোসিস এবং দুটিই অ্যাথিরোস্ক্লেরোসিসের দরুণ হয়। কিন্তু করোনারী অবরোধ বা থ্রম্বোসিসের ফলে হৃদ্‌যন্ত্রের পেশীজাতীয় পদার্থের চ্যুতি বা ভাঙ্গন (Myocardial infraction) এবং অ্যাথিরোস্ক্লেরোসিসের কোন সাদৃশ্য নেই।

রোগটির নামকরণ ও বিবরণ

অ্যাথিরোস্ক্লেরোসিস শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন Lobstien—1835 খৃষ্টাব্দে। এটা হলো ধমনীগুলির সাধারণ রোগ, সরল কথায় ধমনীর গাত্র পুরু হয়ে আঁটসাট হয়ে পড়ে। ধমনীসমূহের অন্তর্ভাগে (Intima) রক্ত থেকে কোলেষ্টেরেল (Cholesterol) অনুপ্রবেশ করে। রক্তবাহীনালীগুলিতে এদের উপস্থিতির ফলে আঠালো পদার্থের সৃষ্টি হয়। লিপিডগুলি অর্থাৎ মুখ্যতঃ কোলেস্টেরলের এস্টারসমূহ জমা হতে হতে আঁশের মত ফলকের (Plaques) সঞ্চার হয়—এটাই হলো অ্যাথিরোস্ক্লেরোসিসের গোড়ার অবস্থা (গ্রীক Athere শব্দের অর্থ ফেনজাতীয় জিনিষ বা পরিজ)। বস্তুতঃ রক্তবাহীনালীর অন্তর্ভাগে সঞ্চিত হয়ে থাকে নরম হলদে ফেনের মত জিনিষ, যার ফলে তাথেকে রোগটির নামকরণ হয়েছে। করোনারী কিংবা মস্তিষ্কের ছোট ছোট ধমনীগুলিতে ক্ষতের (Lesion) সৃষ্টি হয়ে থাকে এভাবে এবং জায়গা-বিশেষে ভিতর ও বাইরের গা থেকে হলদে রঙের ছোট পিণ্ড দেখা যায়।

উক্ত পিণ্ডগুলি ধমনীর ছিদ্রকে (Lumen) ভীষণভাবে সঙ্কীর্ণ করে অথবা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দেয়। এভাবেই করোনারী ধমনীর পথে ক্রমশঃ বাধার সূত্রপাত হয়। রোগটি আর একটু অগ্রগতি লাভ করে তখনই, যখন ক্রমে ভিতরের পদার্থগুলি রক্তের পুষ্টি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং অবরোধ বা বিঘ্ন সৃষ্টিকারী পদার্থটি ফুলে ওঠে আর অস্বাভাবিক ধরণের লিপোপ্রোটিন জটিল পদার্থে রক্তবাহীনালীগুলি ভরপুর হয়ে ভারাক্রান্ত হয়ে থাকে। এমনিভাবে জমে থাকে আঁশের মত আস্তরণ বা ফলক। উপরে যে পিণ্ডের কথা উল্লেখ করা হলো, তা নগণ্য হলেও করোনারী ধমনীর মত ক্ষুদ্রতর রক্তবাহীনালীর পথে ভীষণভাবে অনধিকার প্রবেশ করে, মহাধমনীর মত বড় রকমের আধারে কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। শেষ পর্যন্ত এসে দুষ্ট ক্ষতে পরিণত হয় বা এর মধ্যে রক্তক্ষরণ সুরু হয়ে পাকাপাকিভাবে করোনারী থ্রম্বোসিসের ভিত্তি গড়ে তোলে। জলের নলে যেমন ময়লা জমে থাকলে জল-সরবরাহ হ্রাস পায়, এক্ষেত্রেও অনুরূপভাবে রক্তসঞ্চালন ব্যাহত হয়।

গর্ভধারণক্ষম নারীদেহে অ্যাথিরোমা কম হয়, তবে বহুমূত্র বা অন্যান্য কয়েকটি রোগগ্রস্ত হলে স্বতন্ত্র কথা। বলা বাহুল্য; বহুমূত্র রোগীদের মধ্যে এই রোগ ব্যাপক। বহুমূত্র রোগমুক্তদের চেয়ে বহুমূত্র রোগাক্রান্ত রোগীদের এই রোগে মৃত্যুহার প্রায় দ্বিগুণ সংখ্যক এবং তা সব বয়সে হয়ে থাকে। এই অতিরিক্ত মৃত্যুহারের কারণ হলো বৃক্কসম্পর্কিত ও অন্যান্য জটিলতা, দেহের উক্ত অঞ্চলগুলি অ্যাথিরোমাযুক্ত ফলক বা আস্তরণে পূর্ণ হয়ে থাকে।

এই ব্যাধি সম্পর্কে কোলেস্টেরলের ভূমিকা—পরীক্ষার দ্বারা প্রতিপন্ন হয়েছে যে, করোনারী থ্রম্বোসিসে কোলেস্টেরল এবং তার সীমা একটা

প্রয়োজনীয় ভূমিকা নেয়, সুতরাং প্রচুর পরিমাণে কোলেস্টেরলযুক্ত খাদ্যদ্রব্য যত্ন সহকারে বিবেচনা করে গ্রহণ করা কর্তব্য।

স্টেরল ও তার রাসায়নিক গঠনভঙ্গিমা

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, প্রত্যেক তেল বা চর্বিতে কিছু না কিছু পরিমাণে স্টেরল থাকে। স্টেরলগুলি হলো উচ্চ গলনবিন্দুর অসম্পৃক্ত মাধ্যমিক অ্যালকোহলবর্গ। উদ্ভিজ্জ তেল ও চর্বিতে যে স্টেরল আছে, তা হলো ফাইটোস্টেরল (গলনবিন্দু 132°-141° সেন্টি. রম্বিক কেলাস)। প্রাণিজ তেল ও চর্বির মধ্যে থাকে কোলেস্টেরল (গলনবিন্দু 148.5° থেকে 150.8° সেন্টি. সুচের আকারের দানা)। কোলেস্টেরল ও ফাইটোস্টেরল—এগুলি হলো আইসোমার (Isomer) এবং উভয়ের রাসায়নিক সাঙ্কেতিক সূত্র $C_{27}H_{45}OH$, তবে গলনবিন্দু যে পৃথক, তা আগেই বলা হয়েছে।

ডাঃ কাৎজের প্রামাণ্য উক্তি—'পুষ্টি ও অ্যাথিরোস্ক্লেরোসিস' বিষয়ক বিখ্যাত গ্রন্থে Dr. Louis P. Katz লিখেছেন—

সাধারণ পরীক্ষাসমূহ অ্যাথিরোস্ক্লেরোসিসের পৌষ্টিক মেটাবলিক কোলেস্টেরললিপিড-লিপোপ্রোটিন তত্ত্বের ভিত্তিমূল নীতিকে সুদৃঢ় করে অর্থাৎ বেশী ও চর্বিবেশী কোলেস্টেরল গ্রহণ হলো হাইপার-কোলেস্টেরলিমিয়া ও অ্যাথিরোজেনেসিস সংঘটনের চূড়ান্ত পৌষ্টিক বিপথ। পুনরায় জোর গলায় বলা প্রয়োজন যে, আহার্যের উপর আমরা মূল ভূমিকা আরোপ করে থাকি, কিন্তু একমাত্র ভূমিকা নয়। আমরা কোন রকমেই এটা বুঝিয়ে থাকি না যে, অ্যাথিরোস্ক্লেরোসিস একটা পুরাপুরি আহার্যজনিত ব্যাধি।

হঠাৎ মনের উপর ধকল এসে পড়া বা স্নায়বিক বৈকল্য (সুদীর্ঘ মানসিক ভাবপ্রবণতাময় অতিমাত্রায় উদ্বেগ), সুরাপানের ফলে, বসে থাকবার অভ্যাসে, অতিভোজনে, পারিপার্শ্বিক কারণে, আবহাওয়ার চরম পরিণতিতেও থ্রম্বোসিস হয়ে থাকে। অ্যাথিরোস্ক্লেরোসিসের বিশিষ্ট লক্ষণগুলির মধ্যে অন্যতম প্রধান হলো ধমনীগাত্রে চুন জমা হওয়া।

কি ধরণের তেল ও চর্বি দেহের পক্ষে প্রয়োজন

আর একটি লক্ষণীয় বিষয় এই যে, এতাবৎ মনে করা হতো যে, চর্বিজাতীয় জিনিষ অতিমাত্রায় খাওয়ার কুপরিণাম থ্রম্বোসিস। কিন্তু এখন এই মতবাদ আর ঠিক বলে কেমন করে ধরা যায়? একটু তলিয়ে দেখলেই তা বোঝা যাবে। সুইডেন ও ডেনমার্কের অধিবাসীরা অত্যধিক পরিমাণে তেল ও চর্বি ভক্ষণ করে অথচ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসীদের চেয়ে খুব কম হারে হৃদ্‌রোগগ্রস্ত হয়ে থাকে। সুতরাং প্রকাশ পাচ্ছে যে, গৃহীত চর্বির পরিমাণের চেয়ে তার ধরণটা বেশী কার্যকরী ও ফলদায়ক অর্থাৎ তার আভ্যন্তরীণ গঠন-প্রণালীর উপর রোগটি হওয়া বা না-হওয়া নির্ভর করে। সুইডেন ও ডেনমার্কের অধিবাসীরা যে তেল ও চর্বি আহার করে, সেগুলি হলো প্রকৃতিজাত তেল, বিশেষ করে মাছের তেল (দেশ দুটি সমুদ্রকূলে অবস্থিত হওয়ায় অত্যন্ত বেশী পরিমাণে মাছ পাওয়া যায়)। মাছের তেলের বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, তার ভিতর রয়েছে যথেষ্ট পরিমাণে অসম্পৃক্ত মেদাম্ল বা ফ্যাটি অ্যাসিড। এই সব দেখে চিকিৎসকগণ থ্রম্বোসিসজাতীয় ব্যাধির আক্রমণের হাত থেকে নিষ্কৃতির সাধারণ উপায় নির্ধারণ করেছেন —কম মাত্রার সম্পৃক্ত মেদাম্লসমন্বিত তেল ও চর্বি ভক্ষণ অর্থাৎ প্রকারান্তরে প্রচুর অসম্পৃক্ত মেদাম্লসমন্বিত তেল ও চর্বির আস্বাদন। কিন্তু এই বিষয়েও রসায়নশাস্ত্রজ্ঞের সঙ্গে চিকিৎসকদের মতদ্বৈধ রয়েছে।

ব্যাধির উপসর্গ

ঠিক কোন্ যুগে এই ব্যাধি মানবসমাজে প্রথম দেখা দিয়েছিল, তা জানা নেই। তবে মিশরের বিত্তশালী লোকেদের মমিতে নাকি অ্যাথিরোস্ক্লেরোসিসের লক্ষণ পাওয়া গেছে। করোনারী থ্রম্বোসিস যে যান্ত্রিক সভ্যতার ফলে উদ্বেগময় জীবনধারণের দরুণ দ্রুত হারে বেড়ে যাচ্ছে, বিশেষজ্ঞদের তা মনে করবার অনেক কারণ আছে। করোনারী থ্রম্বোসিস আক্রমণের উপসর্গ সব ক্ষেত্রে এক রকমের বা অনুরূপ হতে দেখা যায় না। তবে সব ক্ষেত্রেই বুকে যন্ত্রণা, সময়ে সময়ে রোগী যন্ত্রণার সঠিক জায়গা বলতে পারে না। মনে হয় যেন বুকের সামনের অংশের সর্বত্র যন্ত্রণা। এই যন্ত্রণা কখনো চাপা, মোচড়ানো বা আঁকড়ানো অথবা জ্বলুনির মত। সচরাচর রোগটি খাওয়া-দাওয়ার পর সুরু হয়। এর ফলে আক্রান্ত ব্যক্তি মনে করে, পরিপাকের ব্যাপারে বুঝি বুকে ব্যথা হচ্ছে। কিন্তু মূলে তা নয়—রোগটি হঠাৎ আক্রমণ করছে।

ব্যাধির প্রতিকার

অসুখটির প্রতিকারক হিসাবে অনেক রকমের ওষধ আজকাল পাওয়া যাচ্ছে। সে সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ ভেষজ-বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়। তবে একেবারে অমোঘ ওষুধ কিছু আছে বলে বিশেষজ্ঞেরা মনে করেন না। করোনারী ধমনীর ব্যাধিতে বিভিন্ন উপায়ে রক্তে কোলেস্টেরল কমিয়ে আনলেই যে চেহারার কোন পরিবর্তন বা রোগের উন্নতি হয়, এমন মনে হয় না। একবার যখন হৃদ্‌যন্ত্রে চ্যুতি বা ভাঙন ধরে, তখন থেকে টিকে থাকবার সময় এবং রক্তে কোলেস্টেরল সীমার মধ্যে কোন সম্পর্কই দেখা যায় না। রক্তে কোলেস্টেরলের পরিমাণ এবং তার জমাট বাঁধার সঙ্গে কোন নিকট সম্বন্ধ নেই। সুতরাং এই বিষয়ে এখনও সুদীর্ঘ গবেষণার প্রয়োজন।

"......পাঠ্যাবস্থায় বাঙালী ছাত্র যাহা শিখে, সেই সময়ের মধ্যে তাহার দশ গুণ শিখা উচিত, 'সিলেবাসে' (Syllabus) নাই—পরীক্ষায় কাজে লাগিবে না; অতএব পড়িব না—এই একটা ভয়ানক ব্যাধি। জ্ঞানার্জ্জন হউক বা না হউক, শুধু পাশ করিতে পারিলেই হইল। আর মুখস্থ, কণ্ঠস্থ করিয়া পাশ করিবার বিস্তৃত আয়োজনে ব্যাপকভাবে বুদ্ধির বিকাশ হইবার অবসর হয় না। কার্য্যক্ষেত্রে পাশ করা বুদ্ধি প্রায়ই 'অকেজো' হইয়া দাঁড়ায়।"

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র

শনিগ্রহ

সোমদত্তা সিংহ

সৌরজগতের ষষ্ঠ গ্রহ শনির উৎপত্তি সম্বন্ধে আমাদের পৌরাণিক সাহিত্যে ও ইউরোপীয় সাহিত্যে নানা ধরণের কাহিনী প্রচলিত আছে। পদ্মপুরাণ অনুযায়ী শনি বিভাবসু বা সূর্য ও ছায়ার পুত্র। পুরাণ অনুযায়ী শনি ক্রূরদৃষ্টিসম্পন্ন এবং খঞ্জ। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ পাঠে জানা যায় যে, শনি শিশুকাল থেকেই কৃষ্ণভক্ত ছিলেন ও সর্বদা তপোনিরত থাকতেন। একবার তপস্যাকালে তিনি তাঁর পত্নীর একটি অনুরোধ রাখতে সক্ষম না হওয়ায় তাঁর পত্নী তাঁকে এই বলে অভিশাপ দেন যে, তিনি যেদিকে দৃষ্টিপাত করবেন তাই বিনষ্ট হবে। পত্নীর এই শাপে শনি ক্রূরলোচন হন এবং এই দৃষ্টিপাতের ফলে পার্বতীপুত্র গণেশের মস্তক ছিন্ন হলে পার্বতীর শাপে শনি খঞ্জ হন। প্রাচীন ও আধুনিক রোমানরা শনিকে গ্রীসদেশীয় পৌরাণিক দেবতা Cronus বলে অভিহিত করেন। গ্রীসদেশের পুরাণ অনুযায়ী ক্রোনাস আকাশ (Uranus) ও পৃথিবীর (Goea) সন্তানদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ। পৃথিবীর এই সন্তানদের Titan বলা হতো। ক্রোনাস তাঁর মাতার অনুরোধে পিতাকে হত্যা করেন এবং অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে পিতৃ-রাজ্য শাসন করতে থাকেন। তাঁর প্রজাগণ দেবতাদের মত স্বাধীনতা ভোগ করতেন। শনির পুত্রেরা দশ বছর ধরে ভীষণ যুদ্ধ করে ক্রোনাসকে পরাজিত করেন। রোমের ক্যাপিটাল পর্বতের পাদদেশে একটি মন্দির আছে, তাতে শনি বা Saturn-এর প্রতিমূর্তি আছে। প্রতি বছর এখানে Saturnalia নামে একটি উৎসব হয়। ইটালিতে প্রাপ্ত বৃত্তান্ত অনুযায়ী শনি বা Saturn এক সময় ইটালীর রাজা ছিলেন ; তাই তাঁর শাসিত ভূমণ্ডলকে Saturnia বলে। শনিকে বলা হয় "Lord of Saturday"। শনির নাম অনুসারেই সপ্তাহের ষষ্ঠ দিনটি চিহ্নিত হয়েছে।

আমাদের সৌরজগতের নয়টি গ্রহের মধ্যে প্রথম ছয়টিকে (অর্থাৎ Uranus, Neptune ও Pluto বাদে) খালি চোখে দেখা যায় বলে প্রাচীনেরাও এদের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। পর-বর্তীকালে অপর তিনটি গ্রহ এবং বহু গ্রহাণুপুঞ্জ আবিষ্কৃত হয়েছে। সবগুলির মধ্যে বৃহস্পতি আকারে সবচেয়ে বড় এবং তার পরেই শনি গ্রহের স্থান। জ্যোতির্বিজ্ঞানের একক অনুযায়ী শনি সূর্য থেকে 9·5 একক অন্তরে অবস্থান করে। এর গতি খুব মন্দ—29·5 বছরে একবার সূর্য প্রদক্ষিণ করে এবং এক বছর পর গ্রহটিকে আকাশে 12° পুবদিকে সরে যেতে দেখা যায়। এক-একটি রাশি অতিক্রম করতে এর আড়াই বছর সময় লাগে। শনিকে খালি চোখে একটি ক্ষুদ্র উজ্জ্বল তারার মত মনে হয়। কিন্তু শনি আকারে পৃথিবীর 800 গুণ এবং এর ব্যাস 113000 কিলোমিটার। আকারে বৃহৎ হলেও শনির ভর কিন্তু মোটেই বেশী নয়। পৃথিবীর ঘনত্ব যেখানে 5·5gm/c·c, এই গ্রহের ঘনত্ব সেখানে মাত্র 0·7gm/c.c. অর্থাৎ একটি বিশাল সমুদ্রে শনিকে ফেলে দিলে তা ভাসতে থাকবে। এথেকে প্রমাণিত হয় যে, শনি অত্যন্ত লঘু পদার্থের দ্বারা গঠিত। শনির নিজ অক্ষে আব-র্তনকাল বিষুবরেখায় 10 ঘণ্টা 13 মিনিট ও মধ্য অক্ষরেখায় 10 ঘণ্টা 40 মিনিট, অর্থাৎ শনিগ্রহের একদিন আমাদের মাত্র সোয়া দশ ঘণ্টা। এত দ্রুত ঘূর্ণনের জন্যে এই গ্রহের উত্তর

ও দক্ষিণ মেরু বেশ চাপা। সেই কারণে এর নিরক্ষীয় ব্যাস মেরুদেশীয় ব্যাস অপেক্ষা শতকরা দশ ভাগ বেশী।

শনিগ্রহটি ঘন মেঘপুঞ্জে আবৃত এবং এর আলোকচিত্র নিলে এর গায়ে ফিতার মত কতকগুলি সদাচঞ্চল কালো দাগ দেখা যায়। দাগগুলি মাঝে মাঝে বিলীন হয়ে যায়। শনির আলোক বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে, এর বায়ুমণ্ডলে হাইড্রোজেন, মিথেন ও হিলিয়াম গ্যাসে অ্যামোনিয়ার ক্রষ্ট্যাল প্রলম্বিত অবস্থায় রয়েছে। শনির বায়ুমণ্ডল 16000 মাইল গভীর বলে মনে করা হয়। তবে এই বায়ুমণ্ডলের গ্যাসগুলি বেশ নিয়মিতভাবে শনির বিষুবরেখার সমান্তরালে অবস্থান করে। শনিগ্রহে মিথেন গ্যাসের মাত্রা বেশী। বৃহস্পতির তুলনায় শনির গায়ে কলঙ্ক বা ঝলক (Eruption) প্রভৃতি কম দেখা যায়। বৃহস্পতির বিখ্যাত Red spot-এর মত শনির কোন কলঙ্ক নেই। শনির বিষুবরেখা ও মধ্য অক্ষরেখায় আবর্তন বেগের পার্থক্য থাকবার জন্যে একটি নিরক্ষীয় প্রবাহ আছে, যার গতি পূর্বদিকে ও বেগ সেকেণ্ডে 400 মিটার।

সূর্য থেকে বহুদূরে অবস্থিত বলে এই গ্রহের উপরিতলের তাপমাত্রাও খুব কম। অবলোহিত রশ্মির পরিমাপ অনুযায়ী শনিপৃষ্ঠের তাপমাত্রা প্রায় $-120^{\circ}C$। শনির এই শীতলতার জন্যেই তার বায়ুমণ্ডলের অধিকাংশ অ্যামোনিয়া গ্যাস তরল অথবা কঠিন অবস্থায় গ্রহপৃষ্ঠে বর্তমান। বায়ুমণ্ডলের সমস্ত জল জমে বরফ হয়ে শিলাময় শনিপৃষ্ঠকে প্রায় 6000 মাইল পুরু একটি আবরণে ঢেকে রেখেছে। এই আবরণের নীচে শনির দেহপিণ্ড 28000 মাইলের বেশী গভীর বলে মনে হয় না। শনির বায়ুমণ্ডল এত বিশাল যে, তার প্রায় অর্ধেক ভরই বায়ুমণ্ডলের দ্বারা সৃষ্ট। কিন্তু শনি সূর্য থেকে যে পরিমাণ শক্তি পায়, তাতে তার তাপমাত্রা আরও কম হওয়া উচিত ছিল। তাই মনে করা হয় যে, শনির অভ্যন্তরে নিশ্চয় এমন কোন বস্তু আছে, যা তাপমাত্রার বৃদ্ধি ঘটায়। তাত্ত্বিক গবেষণার ফলে জানা গেছে যে, শনির রাসায়নিক উপাদান ও আভ্যন্তরীণ কাঠামো অনেকটা বৃহস্পতির মত অর্থাৎ এর বেশীর ভাগ অংশই হাইড্রোজেন, হিলিয়াম প্রভৃতির দ্বারা গঠিত।

শনির নয়টি উপগ্রহ আছে এবং 1966 সালে আর একটি অর্থাৎ দশম উপগ্রহের সন্ধান পাওয়া গেছে। এই শেষোক্ত উপগ্রহটির কক্ষপথ শনির সবচেয়ে নিকটে ও এর আকারও খুব ছোট। শনির এই উপগ্রহগুলির গতিপথের ব্যাস গ্রহের ব্যাসের 4·1 থেকে 220 গুণ বেশী। সেই জন্যে এরা শনির বিখ্যাত বলয়শ্রেণীর বাইরে অবস্থিত। শনির এই উপগ্রহগুলির সঙ্গে বৃহস্পতির উপগ্রহগুলির অনেক ক্ষেত্রে সাদৃশ্য থাকলেও শনির উপগ্রহগুলি অনেক বড়। এই নয়টি উপগ্রহের নাম যথাক্রমে Mimas, Encleladus, Tethys, Dione, Rhea, Titan, Hyperion, Iapetus এবং Phoebe। এদের মধ্যে Titan-এর ভর সর্বাধিক এবং সমগ্র সৌরজগতে এটিই দ্বিতীয় বৃহত্তম উপগ্রহ। তাছাড়া এটিই একমাত্র উপগ্রহ, যার নিজস্ব বায়ুমণ্ডল আছে। Titan-এর বায়ুমণ্ডলে বিষাক্ত মিথেন গ্যাস আছে।

শনিগ্রহ সম্বন্ধে কৌতূহলের মূল কেন্দ্র হলো তার বলয়শ্রেণী এবং অপরূপ সৌন্দর্য। দূরবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে দেখলে গ্রহটির ঈষৎ হেমকান্তি এবং তার ঠিক মধ্যস্থল বেষ্টন করে আলোকমণ্ডিত বলয়শ্রেণীর শোভা আকাশের একটি অপূর্ব সৌন্দর্য। তিনটি বলয় শনির বিষুবরেখার সমতলে থেকে গ্রহটিকে প্রদক্ষিণ করছে। এদের ব্যাস 135000 থেকে 270000 কিলোমিটার পর্যন্ত। এই বলয়শ্রেণীর ভর মূল গ্রহের ভরের 1/27000 ভাগ এবং Titan-এর ভরের 1/5 ভাগ। যদিও এই বলয় শ্রেণীর বিস্তৃতি অনেক বেশী, তথাপি এর বেধ সেই

তুলনায় খুবই কম—মাত্র 16 কিলোমিটার। আকাশে গ্রহের বিভিন্ন অবস্থানে বলয়ের উপরিতল কিংবা নিম্নতল মাত্র দেখা যায়। যখন বলয়ের পার্শ্বদেশ পৃথিবীর দিকে থাকে, তখন তাকে একটি সরলরেখা বলে মনে হয় এবং একটি কমলালেবুকে শলাকার দ্বারা বিদ্ধ করলে যেমন দেখায়, শনিগ্রহ ও বলয়শ্রেণীকেও সেই রকম দেখায়। বলয়ের সমতল আমাদের ঠিক দৃষ্টিরেখায় থাকলে কয়েক দিনের জন্যে বলয়টি অদৃশ্য হয়ে যায়। বলয়ের বেধ কম বলেই এরকম দেখায়। বহির্বলয়, মধ্যবলয় এবং অন্তর্বলয়কে যথাক্রমে A, B এবং C বলে অভিহিত করা হয়। অন্তর্বলয়টি শনিপৃষ্ঠ থেকে 7000 মাইল উচ্চে অবস্থিত। এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, বলয়গুলির মধ্যে শূন্য স্থান আছে। মধ্যবলয় থেকে বেশী সূর্যালোক প্রতিফলিত হওয়ায় তাকে সব সময়ই প্রায় শনিগ্রহের মত উজ্জ্বল দেখায়; তাই একে 'উজ্জ্বল বলয়' বলা হয়। অন্য বলয়গুলি এত উজ্জ্বল নয়।

জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, এই বলয়গুলি অসংখ্য ছোট ছোট (কয়েক সেন্টিমিটার মাপের) বিচ্ছিন্ন উল্কাপিণ্ড ও ধূলিকণার মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদার্থের সাহায্যে গঠিত। প্রত্যেকটি অংশ এক-একটি ছোট ছোট স্বাধীন উপগ্রহের মত শনিকে প্রদক্ষিণ করছে। বলবিজ্ঞানের নিয়মানুযায়ী শনির এত নিকটে কোন অবিচ্ছিন্ন পদার্থের চাকৃতি থাকতে পারে না। এর বিভিন্ন অংশে মহাকর্ষীয় বল বিভিন্ন পরিমাণে ক্রিয়া করবার ফলে চাকৃতিটি ফেটে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হয়ে পড়াই স্বাভাবিক। শনির বলয় যে খণ্ড খণ্ড উল্কাজাতীয় পদার্থের দ্বারা গঠিত তার প্রমাণ এই যে, অন্তর্বলয়ের মধ্য দিয়ে মাঝে মাঝে শনির পৃষ্ঠদেশ দেখা যায়। বলয় থেকে প্রতিফলিত সূর্যালোক পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, এই বলয়ের ভিতরের দিকের পদার্থসমূহ সেকেণ্ডে 12 মাইল ও বাইরের দিকের পদার্থসমূহ সেকেণ্ডে 10 মাইল বেগে ঘুরছে। এই বলয়শ্রেণীগুলির কোন কোন স্থান শনির বড় উপগ্রহগুলির (উদাহরণস্বরূপ Mimas) মহাকর্ষীয় আকর্ষণের ফলে বিচ্ছিন্ন হয়ে অবলুপ্ত হয়ে গেছে। বৃহস্পতি তার নিকটবর্তী সূর্যপ্রদক্ষিণকারী গ্রহাণুপুঞ্জগুলির উপর অনুরূপ প্রভাব বিস্তার করবার ফলে গ্রহাণুপুঞ্জের মধ্যে ফাঁকের সৃষ্টি হয়েছে—এদের 'Kirkwood gap' বলা হয়। শনির এই বলয়শ্রেণীর উৎপত্তি সম্বন্ধে কোন সর্বজনগ্রাহ্য মত এখনও প্রতিষ্ঠিত হয় নি। অন্য কোন গ্রহে কিন্তু এই ধরণের কোন বলয় নেই। অনুমান করা হয় যে, কোন উপগ্রহ শনির খুব কাছে এসে পড়বার দরুণ তার আকর্ষণ-বল সহ্য করতে না পেরে খণ্ড খণ্ড অংশে বিভক্ত হয়ে বলয়ের সৃষ্টি করেছে। শনির নয়টি উপগ্রহ বলয়শ্রেণী থেকে বহু দূরে অবস্থিত। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই মনে হয় যে, সুদূর অতীতে শনির নিকটস্থিত একটি উপগ্রহ খুব কাছে চলে আসায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। সেই একটি উপগ্রহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোটি অংশে বিভক্ত হয়ে প্রায় একই সমতলে বিভিন্ন দূরত্বে থেকে শনিকে প্রদক্ষিণ করছে। এদের দ্বারা সূর্যালোক প্রতিফলিত হয় আর সুদূর পৃথিবী থেকে সেই প্রতিফলিত আলো দেখে এই ভগ্ন উপগ্রহের বিচ্ছিন্ন অংশগুলিকে আমরা বলয় বলে মনে করি। আবার কেউ কেউ বলেন যে, ঐ উপগ্রহের ধ্বংস শনির আর একটি উপগ্রহের দ্বারা ঘটেছে। এই মতবাদে তিনটি বিভিন্ন বলয় সৃষ্টির কারণের কিছু আভাস পাওয়া যায়।

শনিগ্রহটি যদিও বেশ উজ্জ্বল, তবু নানা কারণবশতঃ বৃহস্পতির তুলনায় এটি কিছুটা নিষ্প্রভ। পৃথিবী থেকে শনির যে ঔজ্জ্বল্যের পরিবর্তন দেখা যায়, তার কারণগুলির মধ্যে অন্যতম হলো বলয়শ্রেণীর কোণের পরিবর্তন। তাছাড়া পৃথিবী ও শনির মধ্যবর্তী দূরত্ব ও উভয়ের গতির পরিবর্তনও ঔজ্জ্বল্যের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটবার অন্যতম কারণ।

বৃহস্পতির সঙ্গে শনির অনেক সাদৃশ্য থাকলেও শনি থেকে বেতার-ঝলক বৃহস্পতির তুলনায় খুব কমই পাওয়া যায়। তবে শনি থেকে মাঝে মাঝে দুর্বল বেতার-ঝলক যে আসে, তা সম্প্রতি প্রমাণিত হয়েছে। এই বেতার-ঝলকের স্বল্পতার কারণ হিসাবে নানাবিধ মত প্রকাশ করা হয়েছে। কেউ কেউ বলেন, শনির হয়তো কোন চৌম্বক বলয় নেই, যা গ্রহটির কাছে তড়িৎসম্পন্ন কণা-গুলিকে ধরে রেখে বিকিরণ-বলয়ের সৃষ্টি করতে পারে। আবার কারো কারো মতে, পৃথিবী এবং বৃহস্পতির বিকিরণ-বলয়ে বন্দী তড়িৎকণিকাগুলি যদি সূর্য থেকে তার সৌর প্রবাহের (Solar wind) সাহায্যে আসে, তাহলে শনি থেকে বেতার-তরঙ্গ নির্গমনের অভাব একমাত্র এই কারণেই হতে পারে যে, সৌর প্রবাহ এই বিরাট দূরত্ব অতিক্রম করে এই গ্রহে পৌঁছুতে পারে না। আরও একটি মতবাদ এই যে, হয়তো শনির বলয়-গুলি তার বিকিরণ-বলয় তৈরি হবার পথে বাধার সৃষ্টি করে।

শনিগ্রহ ক্রমবিকাশের নিম্নস্তরে অবস্থিত; অর্থাৎ ক্রমবিকাশের পথে আরও লক্ষ লক্ষ বছর চলবার পর শনির পৃথিবীর অবস্থায় পৌঁছুবার সম্ভাবনা আছে বলা যেতে পারে। ফলে শনিতে জীবনের অস্তিত্ব থাকবার সম্ভাবনা খুব কম। বিরাট বায়ুমণ্ডলের চাপ ও বিষাক্ত মিথেন গ্যাসের উপস্থিতি জীবের প্রাণধারণের পক্ষে প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি করেছে। কিন্তু বিজ্ঞানীদের মতে, এই অবস্থাতেও একটি জিনিষ থাকতে পারে, তা হলো জীবের ক্ষুদ্রতম অণু (Micro-organism)। এমন জীবাণু আছে, যা অত্যধিক উত্তাপ ও শৈত্যের মধ্যে বেঁচে থাকতে পারে এবং ধাতু আত্মসাৎ করে প্রাণধারণ করে। এদের বৃদ্ধি পাবার ক্ষমতাও অদ্ভুত এবং এদের জন্যেই বিষাক্ত বস্তুর সৃষ্টি হয়। সম্ভবতঃ শনিতে যে অ্যামোনিয়া ও মিথেন রয়েছে, তার সঙ্গে এই গ্রহের জীবাণুরও সম্বন্ধ আছে। অবশ্য এই বিষয়ে সঠিক এখনও কিছুই বলা যায় না।

শনিগ্রহ সম্বন্ধে ব্যাপক অনুসন্ধান ও গবেষণা হওয়া এখন অত্যন্ত প্রয়োজন। এখন পর্যন্ত যেটুকু জানা গেছে, তার ফলে নানা রকম কৌতূহলোদ্দীপক প্রশ্নের উদ্ভব হয়েছে, যার উত্তর পেতে হলে প্রচুর সূক্ষ্ম পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও তাত্ত্বিক গবেষণার প্রয়োজন। কিছু পরীক্ষা শক্তিশালী দূরবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে করা সম্ভব হলেও এমন কিছু বিশেষ তথ্য আছে, যা জানতে হলে কৃত্রিম উপ-গ্রহ থেকে প্রক্ষিপ্ত মহাকাশ-সন্ধানী যন্ত্রবাহী বিশেষ যানের (Space probe) সাহায্যে পরীক্ষা চালানো অবশ্যই প্রয়োজন। মহাকাশ-সন্ধানী বিশেষ যান লক্ষ্যস্থলে গিয়ে সংগৃহীত তথ্য পৃথিবীতে পাঠাতে বেশ কয়েক বছর সময় নেবে। কাজেই এভাবে শনিগ্রহ সম্বন্ধে সূক্ষ্ম অনুসন্ধান খুব আশাব্যঞ্জক নয়। তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশ সম্পর্কিত গবেষণা সংস্থা NASA (National Aeronautics and Space Administration) তাদের 1972-'73 সালের কর্ম-সূচীতে যে মহাকাশ যাত্রার উদ্যোগ করছেন, তার নাম তাঁরা দিয়েছেন 'Grand tour'। এবারে তাঁরা মঙ্গলগ্রহের পরিক্রমণ পথ ছাড়িয়ে দূরবর্তী গ্রহ ও গ্রহাণুপুঞ্জের দেশে বিচরণ করবার জন্যে আরোহী-বিহীন মহাকাশযান 'Pioneer' তৈরির কাজে হাত দিচ্ছেন। এই যান গ্রহাণুবলয় ভেদ করে বৃহস্পতির কাছে যাবে। এই মহাকাশযান কর্তৃক সংগৃহীত তথ্যের উপর ভিত্তি করে বর্তমান দশকের শেষের দিকে শনি প্রভৃতি গ্রহের দিকে মহাকাশযান পাঠাবার ব্যবস্থা করা হবে। এই সব পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে আন্তর্গ্রহমণ্ডলীয় বিজ্ঞান সম্বন্ধে আমরা আরও অনেক নতুন নতুন তথ্য জানতে পারবো।

ক্রোমোজোম ও মানুষের রোগ

শ্রীঅসিতবরণ দাস-চৌধুরী*

ক্রোমোজোম শব্দটির সঙ্গে অনেকেই হয়তো পরিচিত। ক্রোমোজম জীবকোষের নিউক্লিয়াসে থাকে। ক্রোমোজোম (Chromo=colour, রং; Soma=body, বস্তু) নিউক্লিয়াসের সেই বস্তু, যাহার উপর কোন বিশেষ রং প্রয়োগ করিলে তাহা সেই রং গ্রহণ করিয়া অণুবীক্ষণ যন্ত্রে আমাদের চোখে রঙীন সূতার মত পরিস্ফুট হইয়া ওঠে। কি উদ্ভিদ, কি প্রাণী—উভয়ের দেহে প্রতিটি কোষে ক্রোমোজোম থাকে। একই শ্রেণীর উদ্ভিদের কিংবা একই জাতের প্রাণীর কোষে নির্দিষ্ট সমান সংখ্যক ক্রোমোজোম থাকিবে। এই ক্রোমোজোমের মধ্যে আমাদের বংশানুগতির এক-একটি একক জীন (Gene) রেখাকারে সাজানো অবস্থায় থাকে। বর্তমান প্রবন্ধে ক্রোমোজোমের সহিত মানুষের রোগের কি সম্পর্ক, সেই বিষয়ে আলোচনা করিব। কিন্তু এই সম্পর্ক পরিষ্কারভাবে বুঝিতে হইলে মানুষের ক্রোমোজোম সম্বন্ধে একটু বিস্তারিত বর্ণনা আবশ্যক। জে. আরনল্ড নামে একজন জার্মান বিজ্ঞানী 1879 সালে মানুষের টিউমারের কোষে সর্বপ্রথম ক্রোমোজোম লক্ষ্য করেন। তাহার পর দীর্ঘ অর্ধশতাব্দীকাল যাবৎ মানুষের দেহকোষে ক্রোমোজোমের সঠিক সংখ্যা লইয়া বিজ্ঞানীদের মধ্যে নানা মতবিরোধ চলিতে থাকে। অবশেষে 1956 সালে জে. এইচ. তিজো এবং এ. লিভান নামে দুই জন সুইডিশ বিজ্ঞানী মানুষের ভ্রূণস্থিত ফুস্‌ফুসের ফাইব্রোব্লাষ্ট টিসুর উৎপাদন হইতে প্রমাণ করিলেন যে, মানুষের দেহকোষে ক্রোমোজোমের সংখ্যা 46। এই 46টি ক্রোমোজোমের মধ্যে 22 জোড়া অটোজোম (Autosome) ও 1 জোড়া সেক্স-ক্রোমোজোম (Sex-chromosome)। অটোজোম দেহকোষের সেই ক্রোমোজোমগুলি, যেগুলি আমাদের দৈহিক, মানসিক ও শারীরিক

বাহু — ক্রোমাটিড — সেনট্রোমিয়ার
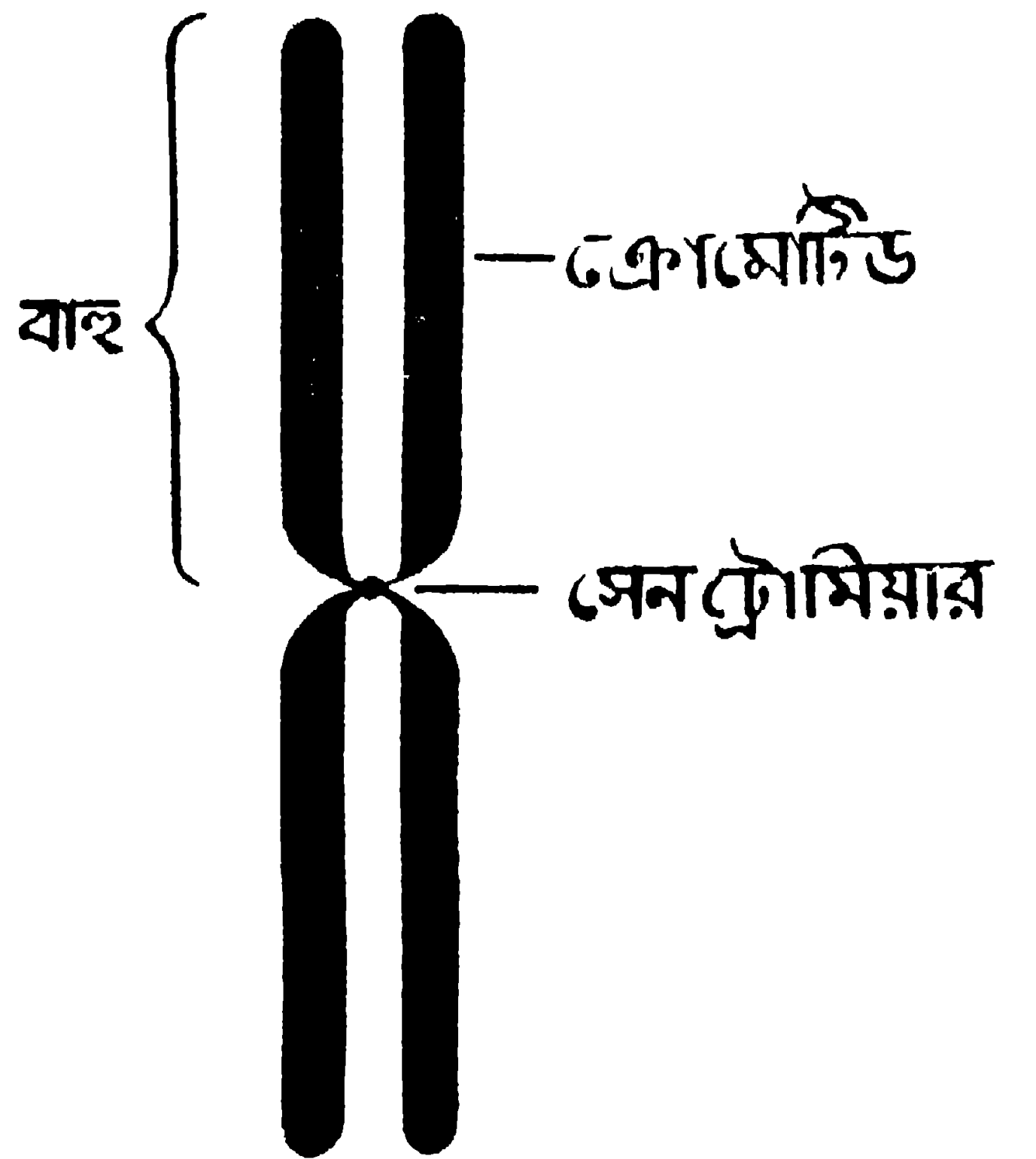
1নং চিত্র। ক্রোমোজোম

বিকাশের জন্য দায়ী। আর সেক্স-ক্রোমোজোমগুলি আমাদের লিঙ্গের বিকাশের জন্য দায়ী। মানুষের দেহ-কোষের সেক্স-ক্রোমোজোম দুইটি যথাক্রমে X এবং Y। নারী ও পুরুষের সেক্স-ক্রোমোজোমের গঠন যথাক্রমে XX এবং XY। আজ বিশ্বের সকল বিজ্ঞানী মানুষের দেহকোষে তিজো ও লিভানের আবিষ্কৃত ক্রোমোজোম সংখ্যাকে সঠিক বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন, যদিও দুই-একজন চীনা

*নৃতত্ত্ব বিভাগ, বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাতা—19

ও জাপানী বিজ্ঞানী ভিন্ন মত পোষণ করেন। পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, ক্রোমোজোমকে অণুবীক্ষণ যন্ত্রে সূতার মত দেখায়, কিন্তু কোষ বিভাজনের মেটাফেজ স্টেজে ক্রোমোজোমকে 1 নং চিত্রের মত দেখা যায়। প্রত্যেক ক্রোমোজমে দুইটি করিয়া ক্রোম্যাটিড থাকে এবং এই দুইটি ক্রোম্যাটিড যে বিন্দুতে জোড়া লাগিয়া থাকে, তাহাকে সেন্ট্রোমিয়ার বলা হয়। সেন্ট্রোমিয়ারের দুই দিকের অংশ দুইটিকে ক্রোমোজোমের দুইটি বাহু বলা হয়। এই সেন্ট্রোমিয়ারের অবস্থানভেদে ক্রোমোজোমের মধ্যখানে, একটু দূরে এবং শেষের দিকে থাকিলে ক্রোমোজোমকে যথাক্রমে মেটাসেনট্রিক, সাবমেটাসেনট্রিক এবং অ্যাক্রোসেনট্রিক বলা হয়। বিভিন্ন মতাবলম্বী হিউম্যান সাইটো-জেনেটিষ্টগণ (অর্থাৎ যে সব বিজ্ঞানী মানুষের দেহকোষ ও ক্রোমোজম ইত্যাদি লইয়া গবেষণা করেন) যাহাতে একমত হইয়া মানুষের ক্রোমোজোম সম্বন্ধে গবেষণার কাজে উন্নতিসাধন করিতে পারেন, তাহার জন্য 1960 সালে ডেনভারে, 1963 সালে লণ্ডনে এবং 1966 সালে শিকাগোতে বিশ্বসভা বসে (এই সম্বন্ধে 2নং চিত্র দ্রষ্টব্য)। গবেষণার সুবিধার জন্য ও ক্রোমোজোমের বিভিন্ন গুণাবলী লক্ষ্য করিয়া মানুষের ক্রোমোজোমকে নিম্নলিখিত বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে—

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 X
13 14 15
16 17 18 19 20 21 22 Y
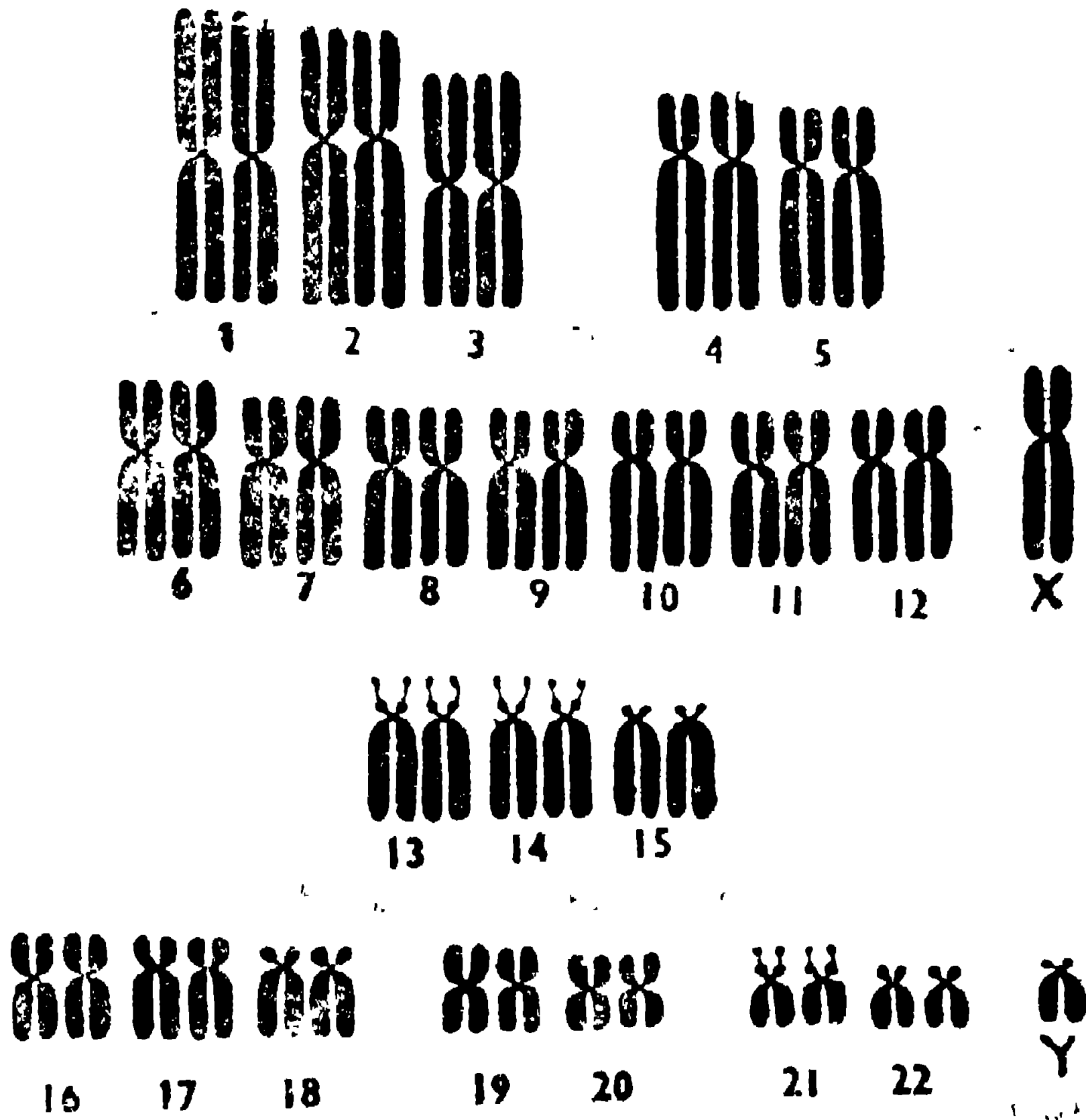
2নং চিত্র

মানুষের ক্রোমোজোম (ডেনভার কংগ্রেসের মতানুসারে)

গ্রুপ	ক্রোমোজোমের আকার ও সেন্ট্রোমিয়ারের অবস্থান	ইডিয়োগ্রাম নম্বর	প্রতি গ্রুপের সংখ্যা	
			পুরুষ	নারী
I, A	সবচেয়ে বড়, মেটাসেনট্রিক	1—3	6	6
II, B	বড়, সাবমেটাসেনট্রিক	4—5	4	4
III, C	মধ্যম, সাবমেটাসেনট্রিক	6—12X	15	16
IV, D	মধ্যম, অ্যাক্রোসেনট্রিক	13—15	6	6
V, E	ছোট, মেটা ও সাবমেটাসেনট্রিক	16—18	6	6
VI, F	সবচেয়ে ছোট, মেটাসেনট্রিক	19—20	4	4
VII, G	সবচেয়ে ছোট, অ্যাক্রোসেনট্রিক	21—22Y	5	4
			46	

মানুষের ক্রোমোজোমের বিশ্লেষণ

প্রবন্ধের মূল আলোচনার পূর্বে আরও দুইটি বিষয় উল্লেখ করিবার প্রয়োজন আছে। মানুষের দেহকোষের নিউক্লিয়াস পরীক্ষা করিয়া ইহা কোন্ লিঙ্গের তাহা বলা যায়। প্রকৃত নারীর দেহকোষের শতকরা 30 হইতে 60 ভাগ নিউক্লিয়াসে সেক্স-ক্রোম্যাটিন নামে একটি বস্তু থাকিবে. সেই ক্ষেত্রে প্রকৃত পুরুষের দেহকোষের নিউক্লিয়াসে কখনও সেক্স-ক্রোম্যাটিন থাকিবে না। সেই জন্য প্রকৃত নারী ও পুরুষকে যথাক্রমে সেক্স-ক্রোম্যাটিন পজিটিভ ও সেক্স-ক্রোম্যাটিন নেগেটিভ বলা হয়। প্রবন্ধে সিনড্রোম (Syndrome) শব্দটির উল্লেখ আছে। কতকগুলি বৈলক্ষণ্য আমাদের দেহে এক সঙ্গে প্রকাশ পাইয়া যে রোগের সৃষ্টি করে, তাহাকে সিনড্রোম বলা হয়।

মঙ্গোলিজম—1959 সালে ফরাসী বিজ্ঞানী জে. লুঁজা মঙ্গোলিজম এই সিনড্রোমটি আবিষ্কার করেন। ক্রোমোজোমের সংখ্যার ব্যতিক্রমে মানুষের দেহে যে নানারকমের বৈলক্ষণ্যের সৃষ্টি হইতে পারে, এই ধারণা পূর্বে অনেক বিজ্ঞানীদের মধ্যে ছিল। কিন্তু মানুষের ক্রোমোজোমের সাধারণ নির্দিষ্ট সংখ্যা আবিষ্কৃত হইবার পর জে. লুঁজা-ই সর্বপ্রথম মঙ্গোলিজম-সিনড্রোমের দ্বারা ইহা সপ্রমাণে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। লুঁজা দেখাইলেন যে, মানুষের দেহের কোষে 21 নম্বর ক্রোমোজোমের এক জোড়ার পরিবর্তে যদি তিনটি ক্রোমোজোম থাকে, তবে দেহে একসঙ্গে কতকগুলি বৈলক্ষণ্যের উৎপত্তি হয়। সুতরাং মঙ্গোলিজম-সিনড্রোমে আক্রান্ত রোগীর দেহকোষে ক্রোমোজোমের সংখ্যা হইবে 47, কারণ VII অথবা G গ্রুপের 21 নম্বর দুইটি ক্রোমোজোমের সহিত একটি অতিরিক্ত খুব ছোট অ্যাক্রোসেনট্রিক ক্রোমোজোম থাকিবে। মঙ্গোলিজম-সিনড্রোমে আক্রান্ত রোগীর দেহে সাধারণতঃ কতকগুলি বৈলক্ষণ্য দেখা যায়; যথা—এই রোগী দৈহিক ও মানসিক দিক দিয়া পশ্চাদপদ হয়, বুদ্ধিও খুব কম হয়। চোখের উপরের পাতার উপরে একটি ভাঁজ থাকে। খর্বকায় দেহ, চ্যাপ্টা হাত-পা, ছোট নাক, হাতে অথবা পায়ে অতিরিক্ত আঙ্গুল, ছোট ছোট হাত ও পায়ের আঙ্গুল, শুষ্ক ত্বক, হৃৎপিণ্ডের রোগ ইত্যাদি বৈলক্ষণ্যগুলির অন্যতম। উভয় লিঙ্গই মঙ্গোলিজমে আক্রান্ত হইতে পারে। তবে শতকরা প্রায় ষাট-শতাংশই দশ বৎসর অতিক্রম করিবার পূর্বেই মরিয়া যায়। ককেশীয় জাতির মধ্যে প্রতি ছয় শত বা সাত শত জন্মের মধ্যে একটি মঙ্গোলিজম-সিনড্রোমে আক্রান্ত শিশুর জন্ম হয়। পূর্বে বলি-

য়াছি, ক্রোমোজোমের নির্দিষ্ট সংখ্যার ব্যতিক্রমেই এই মঙ্গোলিজম-সিনড্রোমের উৎপত্তি; কিন্তু কেন এবং কি করিয়া এই ক্রোমোজোমের সংখ্যার ব্যতিক্রম ঘটে, ইহা বিজ্ঞানীদের নিকট এক বিরাট সমস্যা। আজ অনেক বিজ্ঞানীই এই মত পোষণ করেন যে, শুক্রকোষ অথবা ডিম্ব-কোষের বিভাগের সময় ক্রোমোজোমগুলি (এই ক্ষেত্রে 21 নম্বর অটোজম) ঠিকমত বিযুক্তি-করণ (Disjunction) হইয়া দুইটি নূতন কোষে যাইতে না পারিলে যুক্তিকরণ (Non-disjunction) অবস্থায় থাকে এবং সেই জন্য ক্রোমোজোমের নির্দিষ্ট সংখ্যার ব্যতিক্রম ঘটে, যাহার ফলে এই সিনড্রোমের উৎপত্তি হয়। অনেক বিজ্ঞানী প্রমাণ করিয়াছেন যে, অতিরিক্ত বয়সের মায়ের গর্ভজাত সন্তানের দেহেই এই সিনড্রোমের সংখ্যাধিক্য ঘটে।

ক্লাইনেফেলটার-সিনড্রোম—1959 সালে পি. এ. জেকব এবং জে. এ. ষ্ট্রং নামে দুইজন বৃটিশ বিজ্ঞানী এই সিনড্রোমটি আবিষ্কার করেন। এই সিনড্রোমে আক্রান্ত রোগীর দেহকোষের সেক্স-ক্রোমোজোম গঠনে সাধারণ পুরুষ অথবা নারীর ক্রোমোজোমের নির্দিষ্ট সংখ্যা যথাক্রমে XY অথবা XX না থাকিয়া XXY থাকে। সুতরাং এই রোগীর দেহকোষের ক্রোমোজোমের সংখ্যা হইবে 47, কারণ III অথবা C গ্রুপের একটি X ক্রোমোজোমের মত আর একটি অতিরিক্ত মধ্যম আকারের সাবমেটাসেনটিক ক্রোমোজোম থাকিবে। এই সিনড্রোমে আক্রান্ত রোগী বাহিরের দিক হইতে সাধারণতঃ পুরুষ বলিয়াই মনে হইবে, কিন্তু সেক্স-ক্রোমোজোমের গঠনের জন্য বিবিধ নারীর গুণ লক্ষণীয়। এই রোগী ক্রোম্যাটিন পজিটিভ হয়। মানসিক রোগ, বন্ধ্যাত্ব, দৃশ্যমান স্তনযুগল, বেশী পরিমাণ গোনাডোট্রোফিন নিষ্কাশন, দৈহিক পরিমাপের বিসদৃশ অনুপাত, বিশেষতঃ লম্বা পা ইত্যাদি বৈলক্ষণ্যগুলির অন্যতম। ককেশীয় জাতির মধ্যে প্রতি চার শত বালকের মধ্যে একটি ক্লাইনেফেলটার রোগী জন্মগ্রহণ করে। এই ক্ষেত্রে সেক্স-ক্রোমোজোমে ননডিজাংশনের ফলে সেক্স-ক্রোমোজোমে সংখ্যার ব্যতিক্রম ঘটে।

টার্নার-সিনড্রোম—এইচ. এইচ. টার্নার নামে একজন বৃটিশ বিজ্ঞানী 1938 সালে এই সিনড্রোমটি আবিষ্কার করেন। তিনি এই সিনড্রোমের কতকগুলি বৈলক্ষণ্যের কথা উল্লেখ করেন; যথা—শিশুসুলভ বৈশিষ্ট্য, খর্বকায় দেহ, কাঁপানো গলদেশ এবং কিউবিটাস ভালগাস। 1959 সালে আর একজন বিজ্ঞানী ই. বি. ফোর্ড গোনাডাল ডিসজেনেসিস (Gonadal dysgenesis) এই সিনড্রোমের অন্যতম বৈশিষ্ট্য বলিয়া ঘোষণা করেন। টার্নার-সিনড্রোম রোগীর ক্রোমোজোম সংখ্যা 45। সেক্স-ক্রোমোজোমের গঠন XO অর্থাৎ শুধু একটি X ক্রোমোজোম আর একটি সেক্স-ক্রোমোজোম নাই। শতকরা আশী ভাগ টার্নার-সিনড্রোমে আক্রান্ত রোগীর ক্রোম্যাটিন নেগেটিভ হয়। বাহিরের দিক হইতে এই রোগীকে নারী বলিয়াই মনে হয়। অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের মধ্যে বৈসাদৃশ্য—কান, স্তনহীন বক্ষ, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই বন্ধ্যাত্ব ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। ককেশীয় জাতির মধ্যে প্রতি 10,000 জন্মের মধ্যে একটি টার্নার-সিনড্রোমে আক্রান্ত শিশু জন্মগ্রহণ করে। এই ক্ষেত্রেও শুক্রকোষ অথবা ডিম্বকোষের বিভাগের সময় সেক্স-ক্রোমোজোমের ননডিজাংশনের ফলেই এই বৈসাদৃশ্যের সেক্স-ক্রোমোজোম সংখ্যার উৎপত্তি হয়।

পূর্বেই ক্রোমোজোমের সাধারণ নির্দিষ্ট সংখ্যার ব্যতিক্রমে অটোজোমের একটি এবং সেক্স-ক্রোমোজোমের দুইটি সিনড্রোমের বিষয় সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। সাধারণ সংখ্যার ব্যতিক্রমের জন্য অটোজোম ও সেক্স-ক্রোমোজোমের আরও অনেক আবিষ্কৃত সিনড্রোম আছে, কিন্তু সেইগুলি আলোচনা হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে।

তাহার উপরে ক্রোমোজোমের আকৃতির হের-ফেরের জন্য যে সকল সিনড্রোমের সৃষ্টি হয়, তাহা সম্পূর্ণভাবে প্রবন্ধের আলোচনার বহির্ভূত রহিয়াছে। আজ এই বিংশ শতাব্দীতে হিউম্যান সাইটোজেনেটিসিষ্টগণ মানুষের বংশানুগতিক রোগ-সংক্রান্ত যে সকল রোগের রহস্য উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন, তাহা চিকিৎসা-বিজ্ঞানীদের নিকট এক অমূল্য সম্পদ এবং প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞানের এই দুই শাখার সহযোগিতায় গড়িয়া উঠিয়াছে ক্লিনিক্যাল সাইটোজেনেটিক্স। এইখানে এই কথা উল্লেখ-যোগ্য যে, উপরিউক্ত সিনড্রোমে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা আমাদের মধ্যে খুব কম হইলেও এবং এই সকল রোগের কতকগুলি কারণ আমরা উদ্‌ঘাটন করিতে পারিলেও ইহাদের চিকিৎসার সাহায্যে নিয়ামন্ত্র করিয়া তোলা এখনও পর্যন্ত আমাদের সাধ্যের বাহিরে রহিয়া গিয়াছে।
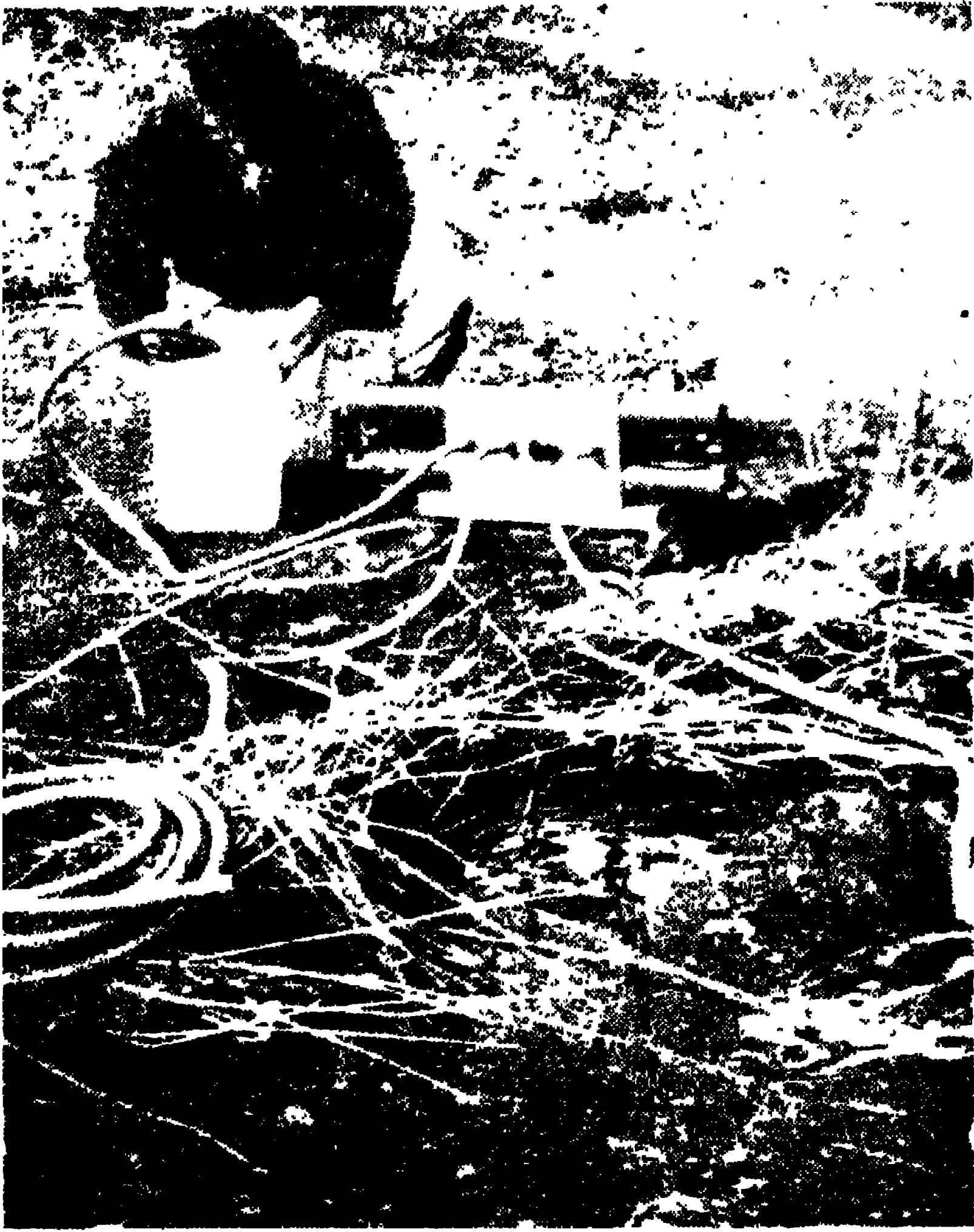
জল লবণমুক্ত করবার যন্ত্র

ক্যালিফোর্ণিয়ার স্যান ডিয়াগোর গাল্‌ফ্ জেনারেল অ্যাটোমিক কর্তৃক লবণাক্ত জল সুপেয় করবার জন্যে সহজ বহনযোগ্য স্বল্পমূল্যের এই যন্ত্রট উদ্ভাবিত হয়েছে। যন্ত্রটির ওজন মাত্র 25 কিলোগ্রাম। যন্ত্রটিকে চালিয়ে দিনে প্রায় 400 লিটার পরিমাণ লবণমুক্ত পরিষ্কার জল পাওয়া যায়। বিপরীত অভিস্রবণ পদ্ধতিতে জল থেকে অবাঞ্ছিত ময়লা নিষ্কাশিত হয়। সৈন্যবাহিনী, অভিযাত্রী দল এবং ভ্রমণকারীরা এই যন্ত্রটি সহজেই ব্যবহার করতে পারবে।

রেডার ও বৃষ্টিপাতের পরিমাপ

শ্যামসুন্দর দে*

রেডার কথাটার সঙ্গে আমরা আজ খুবই পরিচিত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় প্রয়োজনের তাগিদে ইংল্যাণ্ডে রেডারের আবিষ্কার হয়। অবশ্য প্রযুক্তি-বিজ্ঞানে 'প্রয়োজনের তাগিদে আবিষ্কার' কথাটা খুবই সত্য। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মেনী যখন ইংল্যাণ্ডের উপর অবিরাম বোমা বর্ষণ সুরু করে, ঠিক তখনই আত্মরক্ষার তাগিদে ইংল্যাণ্ডের বিজ্ঞানীরা শত্রুপক্ষ জার্মানদের বোমারু বিমানগুলিকে আগে থেকে সনাক্ত করবার উপায় উদ্ভাবনে সচেষ্ট হন। কেন না, তাঁরা ভাবলেন যদি বোমাবর্ষণের আগে শত্রুপক্ষের বিমান সনাক্ত করা যায়, তাহলে সময়মত আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করা যাবে এবং প্রয়োজনমত আক্রমণও করা যাবে। প্রয়োজনের ফলেই রেডার আবিষ্কৃত হয়—যার দ্বারা ঐ সনাক্তকরণ সম্ভব। Radio Angle Detection And Ranging—ইংরেজির এই শব্দগুলির আদ্যাক্ষর নিয়েই যন্ত্রটির নাম হয়েছে রেডার (Radar); অর্থাৎ রেডার হচ্ছে এমন একটি যন্ত্র, যার সাহায্যে কোন বস্তুর অবস্থান ও দূরত্ব—বেতার যন্ত্রের মাধ্যমে নির্ণয় করা যায়।

যুদ্ধের সময় গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন মেটানো ছাড়াও রেডার যন্ত্র আবিষ্কৃত হবার পরের কয়েক বছরের মধ্যেই একে বিজ্ঞানীরা বেতার-জ্যোতির্বিদ্যা থেকে সুরু করে দৈনন্দিন প্রয়োজনেও নানাভাবে কাজে লাগাতে সক্ষম হন। নিরাপত্তার জন্যে বিমানে রেডারের ব্যবহার আজ অপরিহার্য। আবহাওয়াবিদ্‌দের কাছে রেডার অতি প্রয়োজনীয় যন্ত্র। আবহাওয়াবিদ্‌গণ আবহাওয়ার পূর্বাভাস, বৃষ্টিপাতের পরিমাপ ইত্যাদি নির্ধারণ করে রেডিও, খবরের কাগজ প্রভৃতির মাধ্যমে আমাদের নিকট পরিবেশন করেন। আলোচ্য প্রবন্ধে রেডার যন্ত্র এবং এর সাহায্যে কিভাবে বৃষ্টিপাতের পরিমাপ করা হয়, সে সম্বন্ধে আলোচনা করবো। প্রথমে রেডার যন্ত্রের কার্যপ্রণালী সম্পর্কে কিছু বলা যাক।

রেডার যন্ত্রে তিনটি অংশ থাকে—প্রেরক, গ্রাহক এবং অ্যাণ্টিনা। 1নং চিত্রে সোজাভাবে
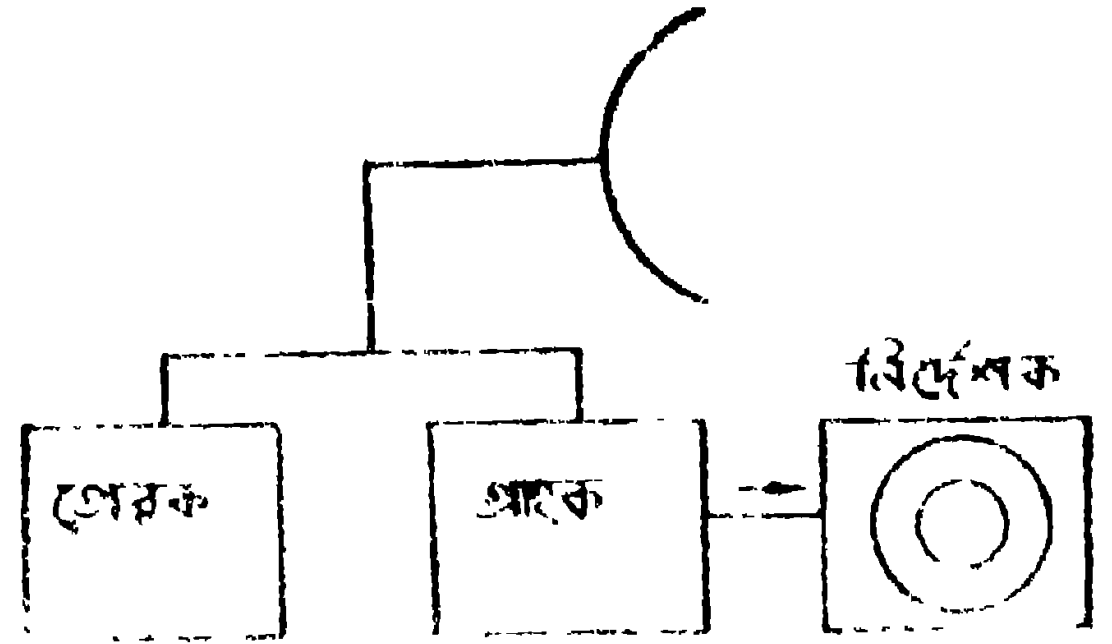
1নং চিত্র

তা দেখানো হয়েছে। গ্রাহক-যন্ত্রের সঙ্গে একটি পর্দা বা নির্দেশক-যন্ত্র যুক্ত থাকে।

প্রেরক-যন্ত্র থেকে উচ্চ কম্পনাঙ্ক বা হ্রস্বতরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের বিচ্ছিন্ন বা সবিরাম বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গ (Electro-magnetic pulse) অ্যাণ্টিনার মারফৎ ছাড়া হয়। ম্যাগ্‌নেট্রন, ক্লিষ্ট্রন ইত্যাদি বিশেষ ধরণের ভাল্‌ব এই প্রেরক-যন্ত্রে ব্যবহৃত হয়। অ্যাণ্টিনার সঙ্গে একটি অর্ধবৃত্তাকার প্রতিফলক লাগানো থাকে, যা বিক্ষিপ্ত বেতার-তরঙ্গকে এক জায়গায় সংহত করে' সমান্তরাল রশ্মির আকারে প্রতিফলিত করে। প্রতিফলকটিকে ইচ্ছামত বিভিন্ন

---

*ইনষ্টিটিউট অব রেডিও ফিজিক্স অ্যাণ্ড ইলেকট্রনিক্স, বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাতা-9

দিকে ঘোরানো যায়। গ্রাহক-যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত নির্দেশক হিসাবে ক্যাথোড-রে টিউব ব্যবহৃত হয়। একই অ্যান্টিনার মারফৎ বেতার-তরঙ্গ প্রেরণ ও গ্রহণ —উভয় কাজই করা হয়। বিচ্ছিন্ন বেতার-তরঙ্গ ব্যবহারের জন্যে এই সুফল পাওয়া যায়; অর্থাৎ তরঙ্গগুচ্ছ পাঠাবার পর মাঝখানে কিছু সময়ের জন্যে প্রেরক-যন্ত্র নিষ্ক্রিয় থাকে এবং এই অবসরে অ্যান্টিনা গ্রাহক-যন্ত্রের কাজ করে। এছাড়াও বিচ্ছিন্ন বা সবিরাম তরঙ্গের শক্তি অবিচ্ছিন্ন বা অবিরাম তরঙ্গ-প্রবাহের শক্তির চেয়ে অনেক বেশী হয় এবং এতে যান্ত্রিক জটিলতাও কমানো সম্ভব।

অন্ধকারে টর্চের আলো কোন বস্তু থেকে প্রতিফলিত হয়ে আমাদের চোখে পড়বার পর আমরা যেমন বস্তুটির চেহারা, দূরত্ব ইত্যাদির হদিশ পাই, ঠিক একইভাবে রেডারের প্রেরক-যন্ত্র থেকে বেতার-তরঙ্গ গিয়ে দূর বস্তু থেকে প্রতিফলিত হয়ে গ্রাহক-যন্ত্রে যখন ফিরে আসে, তখন ঐ বস্তুর দূরত্ব এবং অবস্থান জানতে পারি। প্রেরক-যন্ত্র, বেতার-তরঙ্গ এবং গ্রাহক-যন্ত্রকে যথাক্রমে টর্চ, টর্চের আলো এবং চোখের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। অবশ্য টর্চের কার্যকরী দূরত্ব খুবই সীমিত। অন্যদিকে রেডারের অদৃশ্য বেতার-তরঙ্গ মেঘে ঢাকা অন্ধকার আকাশের মধ্য দিয়েও কার্যকরী।

পাশাপাশি দুটি বস্তুর অবস্থান আলাদা করে নির্ণয় করতে হলে রেডারে ব্যবহৃত বেতার-তরঙ্গ হ্রস্ব হওয়া বাঞ্ছনীয়। অ্যান্টিনার আকার বাড়িয়েও তা করা সম্ভব, তবে অ্যান্টিনার আকার যথেচ্ছা বড় করলে একে বিভিন্ন দিকে ঘোরাতে যান্ত্রিক অসুবিধা দেখা দেবে। তাই তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যকেই কমানো হয়ে থাকে। তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য বড় রাখলে তা আবার বায়ুমণ্ডলে বেশী পরিমাণে শোষিত হবারও সম্ভাবনা আছে। তাই কয়েক সেন্টিমিটার পর্যন্ত দৈর্ঘ্যের বেতার-তরঙ্গ রেডারে ব্যবহার করা হয়। রেডার কতদূর পর্যন্ত কার্যক্ষম হবে, তা নির্ভর করে প্রেরক-যন্ত্রের শক্তি, গ্রাহক-যন্ত্রের সুবেদী মাত্রা, মাধ্যমে শোষণ এবং তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের উপর। মেঘ বা বৃষ্টি রেডারের কাজে ক্ষতি করে না বটে, তবে বায়ুমণ্ডলের আর্দ্রতার পরিবর্তনের সঙ্গে প্রেরিত তরঙ্গের গতি পরিবর্তিত হয়। বায়ুমণ্ডলের চাপও সব জায়গায় সমান নয়। তাই বিভিন্ন চাপযুক্ত বায়ুমণ্ডল দিয়ে বেতার-তরঙ্গ যাবার সময় প্রতিসরিত হয়ে সামান্য বেঁকে যায়।

বেতার-তরঙ্গ লক্ষ্যবস্তু থেকে প্রতিফলিত হয়ে গ্রাহক-যন্ত্রে ফিরে আসলে তাকে বিবর্ধিত করে ক্যাথোড-রে টিউবে ফেলা হয়। এখন দেখা যাক, কিভাবে এই পর্দায় লক্ষ্যবস্তু সনাক্ত হয়। যান্ত্রিক ব্যবস্থার দিকে লক্ষ্য করলেই এর উত্তর মেলে। ক্যাথোড-রে টিউবে প্রতিফলক পাতে বিশেষভাবে আরোপিত তড়িৎ-বিভবের সাহায্যে ইলেকট্রন-প্রবাহকে পর্দার বাঁ-দিক থেকে ডান দিকে দ্রুত পরিচালিত করবার ব্যবস্থা থাকে। ইলেকট্রন
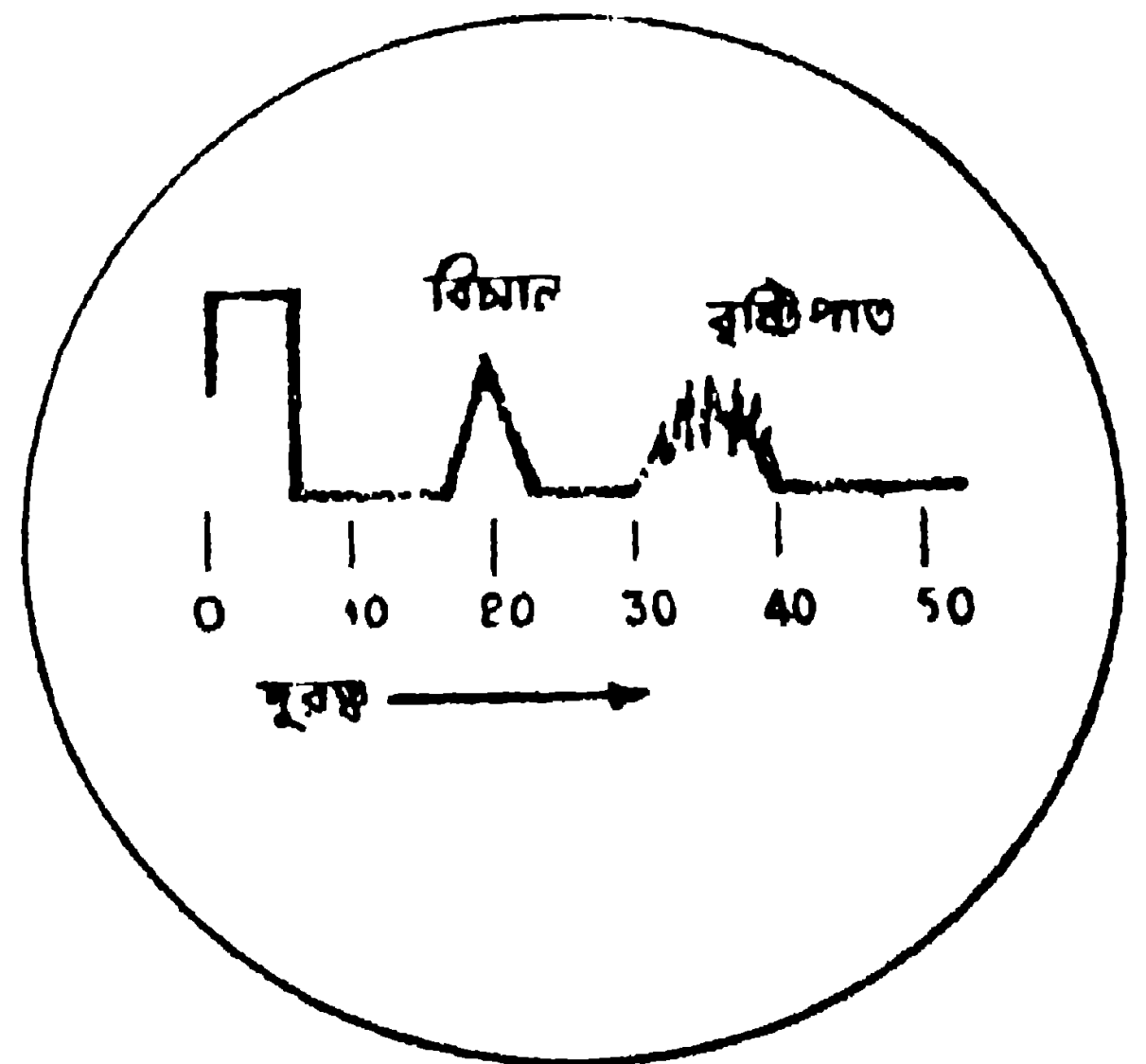
2নং চিত্র

প্রবাহের সময় পর্দার উপর একটা প্রলেপের সৃষ্টি হয়। এই প্রলেপ রেডার থেকে প্রেরিত

বেতার-তরঙ্গের গতিপথের নির্দেশ দেবার কাজ করে; অর্থাৎ রেডার থেকে প্রেরিত বেতার-তরঙ্গের গতিবেগের সঙ্গে ক্যাথোড-রে টিউবের ইলেকট্রন-প্রবাহের গতিবেগের একটা সম্পর্ক থাকে। প্রেরক-যন্ত্র থেকে বেতার-তরঙ্গ ছাড়বার সঙ্গে সঙ্গে পর্দায় ইলেকট্রন-প্রবাহও বাঁ-দিক থেকে যাত্রা সুরু করে দেয়। বেতার-তরঙ্গ কোন বস্তু থেকে বাধা পেয়ে রেডারের গ্রাহক-যন্ত্রে ফিরলে ক্যাথোড-রে টিউবের ইলেকট্রন-প্রবাহের গতিপথ সামান্য পরিবর্তিত হয়। ক্যাথোড-রে টিউবের পর্দাটি দূরত্বজ্ঞাপক সংখ্যার দ্বারা চিহ্নিত থাকে। কাজেই পর্দায় ইলেকট্রন-প্রবাহের জায়গা থেকে সুরু করে প্রবাহের গতিপথের পরিবর্তনের জায়গা পর্যন্ত দূরত্বটুকু সোজাসুজি মাপা যেতে পারে। এই দূরত্বই নির্দিষ্ট বাধার দূরত্ব। এইভাবে রেডারের সাহায্যে দূরের বস্তুর অবস্থানের নির্দেশ পাওয়া যায়। 2 নং চিত্রে রেডারের পর্দায় ইলেকট্রন-প্রবাহের গতিপথের চেহারা এবং বস্তু থেকে বেতার-তরঙ্গ প্রতিহত হয়ে গ্রাহক-যন্ত্রে ফিরে আসবার ফলে ইলেকট্রন-প্রবাহের গতিপথের পরিবর্তিত চেহারা দেখানো হয়েছে।

কোন কোন রেডারে অ্যান্টিনা থেকে প্রেরিত বেতার-তরঙ্গকে বৃত্তাকার পথে ঘোরানো হয়। এই প্রকার রেডারের পর্দায় কেন্দ্র থেকে সুরু করে পরিসীমার দিকে ইলেকট্রন-প্রবাহ হয় এবং ঘড়ির কাঁটার মত বৃত্তাকার পথে ঘোরে। এই ধরণের রেডারে বিস্তৃত এলাকার চিত্র পাওয়া যায়। 3নং চিত্রে এই জাতীয় রেডারের পর্দাকে দেখানো হয়েছে। চিত্রে একটি বিমান ও মেঘের অবস্থান দেখানো হয়েছে। এই জাতীয় রেডারে একই সঙ্গে বস্তুর অবস্থান ও কৌণিক দূরত্ব—দুই-ই মেলে। পর্দায় বিমানটি ঐ সময় 20 মাইল দূরে 45° কোণ করে আছে। মেঘের অবস্থান, আবহাওয়ার পূর্বাভাস, বৃষ্টি-পাতের পরিমাপ প্রভৃতি কাজে এই জাতীয় রেডার খুবই কাজে লাগে।

শুধুমাত্র বিচ্ছিন্ন তরঙ্গের রেডারই যে হয় তা নয়, অবিরাম বা অবিচ্ছিন্ন তরঙ্গের রেডারও হতে পারে। তবে এর বেলায় প্রেরক ও গ্রাহক-যন্ত্রের জন্যে দুটি আলাদা অ্যান্টিনা লাগবে—যা কার্যক্ষম করা খুবই অসুবিধাজনক। কয়েকটি
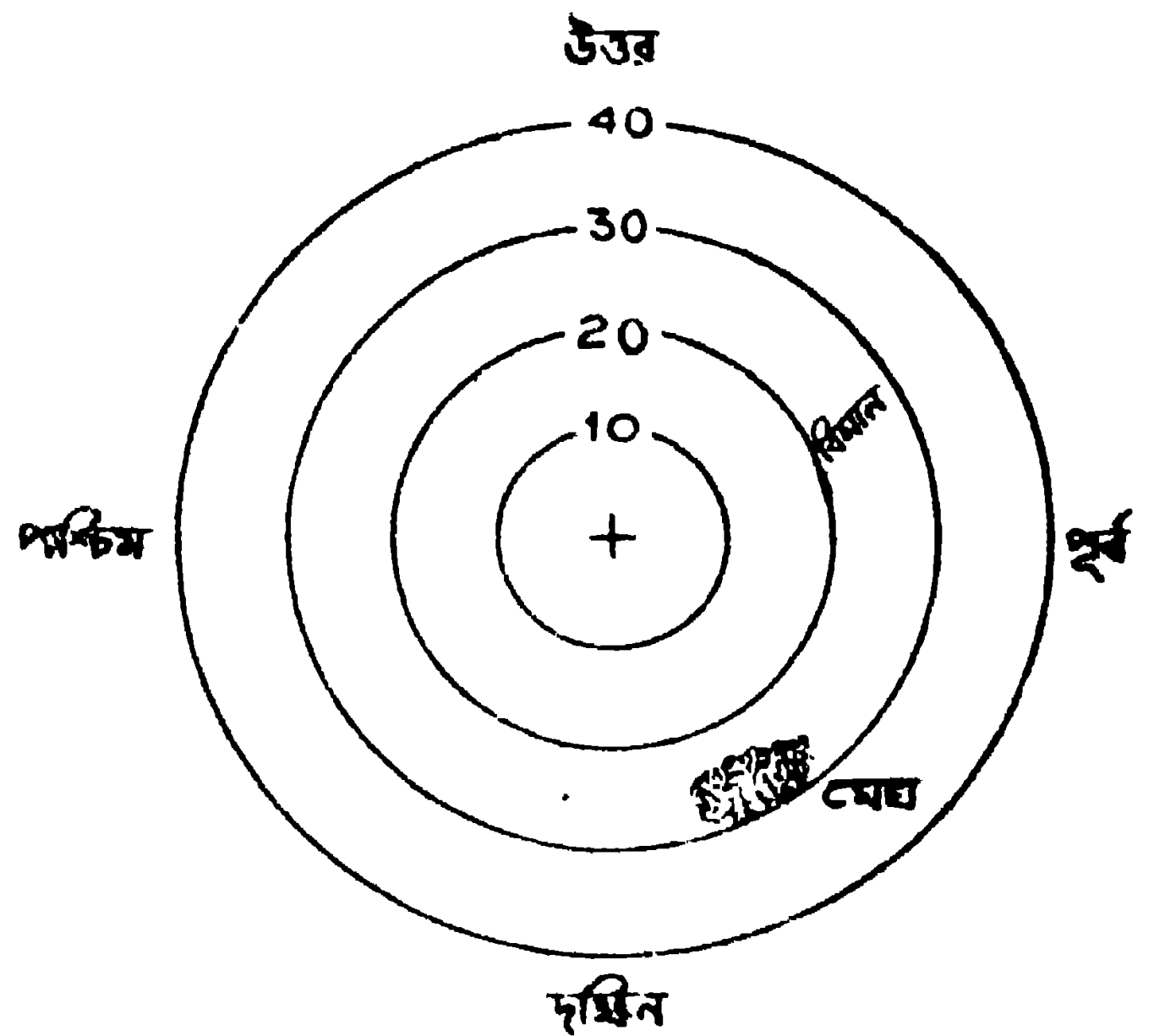
3নং চিত্র

বিশেষ ক্ষেত্রেই এই জাতীয় রেডার ব্যবহৃত হয়। অবিরাম তরঙ্গের রেডারের প্রেরক-যন্ত্র থেকে তরঙ্গ-প্রবাহ কোন গতিশীল বস্তু থেকে বাধা পেয়ে যখন গ্রাহক-যন্ত্রে ক্রমাগত ফিরে আসে, তখন বিজ্ঞানী ডপ্‌লারের সূত্র অনুযায়ী ঐ তরঙ্গের কম্পনাঙ্কের কিছু পরিবর্তন ঘটে। এই পরিবর্তনের মাত্রা নির্ভর করে তরঙ্গ এবং গতিশীল বস্তুর পারস্পরিক গতিবেগের উপর। কম্পনাঙ্কের পরিবর্তন মেপে বস্তুর গতিবেগ এবং তরঙ্গের যাতায়াতের সময়ের ব্যবধান থেকে বস্তুর দূরত্ব জানা যেতে পারে।

রেডারের প্রয়োগে কিভাবে বৃষ্টিপাতের পরিমাপ করা হয়, তা নিয়ে এখন আলোচনা করা যাক।

পৃথিবীর কয়েকটি উন্নত দেশ ছাড়া এখনও অনেক দেশেই—এমন কি, আমাদের ভারতবর্ষেও ফাঁকা জায়গায় কোন নির্দিষ্ট আকারের পাত্রে বৃষ্টির জল সংগ্রহ করে বৃষ্টিপাতের পরিমাপ ঘোষণা করা হয়। এই ব্যবস্থা যে খুবই সীমিত, তা খুব সহজেই বোঝা যায়। কেন না, অসময়ের বৃষ্টিই মোটামুটি ব্যাপকভাবে হয়ে থাকে এবং তখনই এই ব্যবস্থা মোটামুট কার্যকরী হয়। কিন্তু বর্ষাকালে যে বৃষ্টিপাত হয়, তা বেশীর ভাগ সময়েই ব্যাপকভাবে হয় না অর্থাৎ বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন সময়ে বৃষ্টিপাত বেশী হয়ে থাকে। হয়তো দেখা গেল, সহরের এক প্রান্তে প্রবল বৃষ্টি অথচ অন্য প্রান্তে রোদ। এই অবস্থায় এই পদ্ধতির সাহায্যে নির্ভুলভাবে বৃষ্টিপাতের পরিমাপ করা যায় না, নির্ভুলভাবে পরিমাপ করতে গেলে কিছু দূর অন্তর অন্তর জল সংগ্রহ করে তাদের গড় হিসাবকে ধরতে হবে, যা কার্যক্ষম করাও সম্ভব নয়। তাছাড়া এই পদ্ধতিতে বৃষ্টিপাতের হার জানা সম্ভব নয়, কেবলমাত্র মোট সময়ের বৃষ্টিপাতেরই পরিমাপ করা যেতে পারে। বৃষ্টিপাতের হার জানবার যে দু-একটি পদ্ধতি আমাদের জানা আছে, তাও খুব নির্ভরযোগ্য নয়। পাত্রে জল সংগ্রহ করে বৃষ্টিপাতের পরিমাপ করবার পদ্ধতিকে সূক্ষ্মভাবে বিচার করলে বলতে হয় যে, এভাবে কেবলমাত্র পাত্রের মুখের ক্ষেত্রের উপরে বৃষ্টিপাতের পরিমাপই করা হয়ে থাকে—বিস্তীর্ণ জায়গার পরিমাপের বেলায় এই পদ্ধতি গ্রহণ করা যায় না। এই অবস্থায় রেডারের সাহায্যেই আমরা নিখুঁতভাবে বিস্তীর্ণ অঞ্চল বা সীমিত অঞ্চলের বৃষ্টিপাতের হার ও পরিমাপ পেতে পারি।

রেডার যন্ত্র থেকে বেতার-তরঙ্গ জলকণার দিকে পাঠালে, তা জলকণা থেকে বাধা পেয়ে ফিরে আসে। এই ফিরে-আসা তরঙ্গের শক্তির মান পর্যাপ্ত পরিমাপ হতে হবে, তবেই গ্রাহক-যন্ত্রে তা ধরা যাবে। ছোট বস্তুকণা বা জলকণা থেকে বাধা পেয়ে যে শক্তি গ্রাহক-যন্ত্রে ফিরে আসে, তা বিজ্ঞানী র‍্যালে কর্তৃক আবিষ্কৃত আলোক-বিচ্ছুরণের নিয়ম মেনে চলে। এই সূত্র অনুযায়ী নির্দিষ্ট তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের বেতার-তরঙ্গ থেকে বিচ্ছুরিত শক্তি জলকণার প্রস্থচ্ছেদের ষষ্ঠ ঘাতের সঙ্গে সমানুপাতিক হয়। র‍্যালের সূত্র থেকে আরও জানা যায় যে, বিচ্ছুরিত শক্তি ব্যবহৃত তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের চতুর্থ ঘাতের সঙ্গে সমানুপাতিক। কাজেই জলকণার প্রস্থচ্ছেদ যদি নির্দিষ্ট থাকে, তবে ছোট তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের বেতার-তরঙ্গের মাধ্যমে ভাল শক্তি গ্রাহক-যন্ত্রে পাওয়া যেতে পারে। বস্তুতপক্ষে রেডার দিয়ে খুব ছোট জলকণা দেখতে হলে প্রেরক-যন্ত্রে খুব ছোট তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের তরঙ্গ ব্যবহার করতে হয়। খুব ছোট তরঙ্গ আবার মেঘ ও বায়ুমণ্ডলের দ্বারা বেশী শোষিত হয়। জলকণার প্রস্থচ্ছেদও এক থাকে না। এই সব অসুবিধা দূর করবার জন্যে রেডারে কয়েকটি বিভিন্ন তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের বেতার-তরঙ্গ, সাধারণতঃ 1, 3, 5, 10 এবং 20 সেণ্টিমিটারের তরঙ্গ রেডারে ব্যবহার করা হয়।

ছোট একটি জলের ফোঁটা থেকে যতটা শক্তি ফিরে আসে, সাধারণতঃ তা রেডারে পরিমাপ-যোগ্য নাও হতে পারে। যেমন—দেখা গেছে যে, 10 কিলোমিটার দূরে অবস্থিত 0·1 সেণ্টিমিটার ব্যাসের একটি জলের ফোঁটা থেকে একটি 10 সেণ্টিমিটার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট রেডারে মাত্র প্রায় 6×10^{-20} ওয়াট শক্তি ফিরে আসে। অথচ অন্যদিকে 10^{-13} ওয়াটের কম শক্তি হলে গ্রাহক-যন্ত্র তা ধরতে পারে না। তাহলে রেডারে জল-কণাকে কিভাবে পাওয়া যায়? এখন—কোন এক জায়গায় তো মাত্র এক ফোঁটা জল থাকে না! প্রতি ঘনমিটারে প্রায় 100 থেকে 1000টি পর্যন্ত জলকণা থাকে। রেডার থেকে প্রেরিত রশ্মি-গুচ্ছের আয়তনের মধ্যে এক সঙ্গে অনেক জল-কণাই পড়ে। এদের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়ে গড়

বিচ্ছুরিত শক্তির মান গ্রাহক-যন্ত্রে মাপবার পক্ষে যথেষ্ট হয়। কোন নির্দিষ্ট দূরত্বে অবস্থিত জলকণা থেকে কতটা শক্তি আসবে, তা নিম্নোক্ত সমীকরণ থেকে পাওয়া যেতে পারে।

$$P = \frac{A \times N \times D^6}{r^2} \cdots\cdots(1)$$

এখানে P=পাওয়া গড় শক্তি, D=জলকণাসমূহের গড় ব্যাস, A=ধ্রুবক, r=জলকণাসমূহের দূরত্ব এবং N=একক আয়তনের মধ্যে জলকণা-সমূহের গড় সংখ্যা। সাধারণতঃ জলকণাগুলির গড় ব্যাসের চেয়ে বড় তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট রেডারের বেলায় এই সমীকরণ প্রযোজ্য। বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাহায্যে কণার গড় ব্যাসের (D) সঙ্গে বৃষ্টিপাতের পরিমাপের (R) একটা সম্পর্ক স্থাপন করেছেন। যার সাহায্যে আমরা পাই—

$$N \times D^6 = 200 \times R^{1.6} \cdots\cdots (2)$$

(1) নং সমীকরণে (2) নং প্রয়োগ করলে

$$P = \frac{200 \times A \times R^{1.6}}{r^2} \cdots\cdots (3)$$

পাওয়া যায়। জলকণার দূরত্ব এবং ধ্রুবকের মান জানা থাকলে (3) নং সমীকরণ থেকে ঐ দূরত্বে বৃষ্টিপাতের পরিমাপ করা সম্ভব। পরিমাপের সময় রেডারের অ্যান্টিনাকে এমনভাবে রাখা হয়, যাতে সমতলভূমির খুব নিকটেই বৃষ্টিপাতের পরিমাপ করা যায়। অভিকর্ষের ক্রিয়ায় এবং ঘূর্ণীবাত্যার প্রভাবে জলকণা অনবরতই স্থান পরিবর্তন করে। আবার উঁচু থেকে নীচে পতনের সময় জলকণা নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক ধাক্কায় ভেঙে ছোট হয়ে যায়, আবার কখনও একাধিক কণা এক সঙ্গে জুড়ে গিয়ে বড় হয়ে যায়। এই সব কারণে রেডারের সাহায্যে খুব উঁচু থেকে জলকণা মাপলে সমতলভূমি পর্যন্ত সে পরিমাপ ঠিক নাও থাকতে পারে। বিজ্ঞানী অষ্টিন এবং তাঁর সহকর্মীরা একই দূরত্বে অবস্থিত জলকণা-গুলির একই সঙ্গে রেডারের সাহায্যে এবং পুরনো পদ্ধতিতে (পাত্রের মধ্যে জল সংগ্রহ করে) দেখে (3) নং সমীকরণের যাথার্থ্যতা প্রমাণ করেন। কাজে-কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, রেডারের অ্যান্টিনাকে বিভিন্ন দিকে ঘুরিয়ে (3) নং সমীকরণের সাহায্যে সুন্দরভাবে বহু দূর পর্যন্ত বৃষ্টিপাতের পরিমাপ করা সম্ভব। এমন কি, কোন নির্দিষ্ট এলাকায় বৃষ্টিপাতের হার এবং বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণও রেডারের মাধ্যমে পাওয়া যায়, যার প্রয়োজন যথেষ্ট। বিজ্ঞানীরা রেডারের মাধ্যমে অন্যভাবেও বৃষ্টিপাতের পরিমাপ করেছেন, তবে এখানে বর্ণিত পদ্ধতিতেই ভাল ফল পাওয়া গেছে।

গত কয়েক বছরে রেডারের বহুল ব্যবহার আজ হাজার হাজার বিজ্ঞানীকে রেডারের প্রযুক্তিবিদ্যায় আকর্ষণ করেছে এবং ভবিষ্যতেও করবে। আধুনিক সভ্যতার কল্যাণে রেডারের অবদান বহুমুখী। মানুষ নিজের জীবনকে সুখ-সমৃদ্ধিতে ভরিয়ে তোলবার জন্যে বিজ্ঞানকে যে কিভাবে প্রয়োগ করছে, রেডার তার একটি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

সংশ্লেষণের মাধ্যমে জিনের ভাষা বিশ্লেষণ—
খোরানার যুগান্তকারী আবিষ্কার

দেবব্রত নাগ ও জগৎজীবন ঘোষ*

জীবনের ভাষা

জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য গতি অনবরত তিনটি ভাষায় ব্যক্ত হচ্ছে। প্রথমটি হলো—প্রজনন-বিস্তার ভাষা। এই ভাষার রহস্য খুঁজে পাওয়া গেল প্রায় পঞ্চাশ বছরের গবেষণা থেকে। জানা গেল, বংশজাত ধর্ম লিপিবদ্ধ হয়ে আছে জীবকোষে অবস্থিত একটি বিশেষ সরল মানচিত্রে।

দ্বিতীয়টি হলো—প্রোটিনের ভাষা, যার মূলে আছে প্রায় ২০টি অ্যামিনো অ্যাসিডের ক্রম-পর্যায়। বিভিন্ন ক্রমপর্যায়ে অ্যামিনো অ্যাসিড-গুলি থাকবার দরুণ বহু হাজার রকম বিভিন্ন আকৃতি ও প্রকৃতিগত প্রোটিনের সৃষ্টি হয়েছে।

আর তৃতীয়টি হলো—নিউক্লিক অ্যাসিডের ভাষা, যার মূলে আছে মাত্র চারটি নিউক্লিয়োটাইড। পিউরিন অথবা পিরিমিডিনের সঙ্গে যুক্ত রিবোস কিংবা ডি-অক্সিরিবোস প্রভৃতি জৈব পদার্থ এবং ফস্‌ফরিক অ্যাসিডের যৌগগুলিকে নিউক্লিয়োটাইড বলা হয়।

ইদানীং তিনটি ভাষার মধ্যে এমন একটি নিগূঢ় সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে, যা জীব-জগতের বহু সমস্যা সমাধান করবে। এই বিষয়ে আমরা নিশ্চিত।

জিনের রাসায়নিক পরিচয় ডি. এন. এ.

আজ থেকে প্রায় এক-শ' বছর আগে অর্থাৎ 1866 সাল নাগাদ—মেণ্ডেলের মতে জিন হলো বংশানুক্রমের মূলাধার, যদিও জিনের রাসায়নিক পরিচয় পাওয়া গেল 1940-'44 সালে। 1869 সালে সুইস বিজ্ঞানী Friedrich Miescher প্রথম জীবকোষের নিউক্লিয়াস বা কেন্দ্রস্থল থেকে নিউক্লিন নামক একটি পদার্থ পেয়েছিলেন, পরবর্তী কালে এর নামকরণ করা হয়েছিল নিউ-ক্লিক অ্যাসিড। এর বহু বছর পরে নিউক্লিক অ্যাসিডের গুরুত্ব জানা গেছে। O. Avery এবং তাঁর দুই সহকর্মী C. Macleod এবং M. McCarty (1940-'45) দেখলেন যে, নিউমোকক্কাস নামক ব্যাক্টিরিয়া দুই রকমের হয়ে থাকে। কতকগুলি মসৃণ প্রকৃতির এবং কতকগুলি অমসৃণ প্রকৃতির। মসৃণ নিউমোকক্কাস-গুলি নিউমোনিয়া রোগের কারণ, কিন্তু অমসৃণ-গুলি নয়। যদি ইঁদুরের দেহে জীবিত অমসৃণ নিউমোকক্কাসের সঙ্গে মৃত মসৃণ নিউমোকক্কাস মিশিয়ে প্রয়োগ করা যায়, তবে ইঁদুরের রক্তে জীবিত মসৃণ নিউমোকক্কাস পাওয়া যায়; অর্থাৎ মসৃণ নিউমোকক্কাসের কোন বিশেষ বৈশিষ্ট্য মৃত অবস্থাতেও অমসৃণ নিউমোকক্কাসকে মসৃণে পরিণত করতে পারে। এবার মৃত মসৃণ নিউমোকক্কাসের ডি. এন. এ. জীবিত অমসৃণ নিউমোকক্কাসের সঙ্গে মিশিয়ে প্রয়োগ করে দেখা গেল যে, অমসৃণগুলি মসৃণে পরিণত হয়েছে। কেবল তাই নয়, এরপর মসৃণ ধর্মটির স্থায়িত্বও প্রমাণিত হলো। এই পরীক্ষা থেকে প্রমাণিত হলো যে, জিন—যা হলো বংশানুক্রমের মূলাধার, তার রাসায়নিক পরিচয় ডি-অক্সিরিবোনিউক্লিক অ্যাসিড বা সংক্ষেপে ডি. এন. এ.। ডি. এন. এ. সম্পর্কে কৌতূহল তখন আরও অনেক গুণ বেড়ে গেছে।

*প্রাণরসায়ন বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

ডি. এন. এ. এবং প্রোটিনের সম্পর্ক

একদিকে ডি. এন. এ.-র গঠন-প্রকৃতি এবং অন্যদিকে ডি. এন. এ. এবং প্রোটিনের পারস্পরিক সম্পর্ক বিশেষভাবে পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছিল। ইতিমধ্যে Beadle এবং Tatum দেখালেন যে, জিন এবং জৈব অনুঘটকের মধ্যে একটা সম্পর্ক আছে। জিনে কোন রকম ত্রুটি দেখা দিলে জৈব অনুঘটকটি হয়তো তৈরি নাও হতে পারে কিংবা অকেজো প্রোটিন অণু তৈরি হয়ে থাকে। সমস্ত জৈব অনুঘটকই প্রোটিন। তাই জিনের রাসায়নিক পরিচয় ডি. এন. এ. জানবার সঙ্গে সঙ্গে প্রোটিন সংশ্লেষণে ডি. এন. এ.-র ভূমিকাও প্রমাণিত হলো।

ডি. এন. এ.-র গঠন-প্রকৃতি

1953 সালে ডি. এন. এ.-র গঠন-প্রকৃতির পরিচয় দিলেন বৈজ্ঞানিক Watson এবং Crick। তাঁদের মতে, ডি. এন. এ. হলো দ্বি-তন্ত্রী (Double stranded)। এর এক-একটি তন্ত্রী তৈরি হয়েছে চারটি বিভিন্ন নিউক্লিয়োটাইডের বিভিন্ন ক্রমপর্যায়ে। নিউক্লিয়োটাইডগুলি হলো অ্যাডেনিন নিউক্লিয়োটাইড গুয়ানিন নিউক্লিয়োটাইড, থাইমিন নিউক্লিয়োটাইড এবং সাইটোসিন নিউক্লিয়োটাইড। এক-একটি নিউক্লিয়োটাইডে থাকে অ্যাডেনিন, গুয়ানিন, থাইমিন এবং সাইটোসিন—এই চারটি জৈব পদার্থের যে কোন একটি শর্করাজাতীয় পদার্থ, যেমন—ডি-অক্সিরিবোস এবং অজৈব ফস্ফরিক অ্যাসিড। এদের মধ্যে অ্যাডেনিন (A) এবং গুয়ানিন (G) পিউরিন শ্রেণীভুক্ত জৈব পদার্থ আর সাইটোসিন (C) এবং থাইমিন (T) পিরিমিডিন শ্রেণীভুক্ত জৈব পদার্থ। মজার কথা এই যে, কেবল মাত্র A-এর সঙ্গে T এবং G-এর সঙ্গে C দুর্বল হাইড্রোজেন বন্ধনীর (Hydrogen bonding) সাহায্যে যুক্ত হতে পারে। তাই দ্বি-তন্ত্রী ডি. এন. এ.-র একটি তন্ত্রীতে যখন A থাকে, অন্যটিতে থাকে তখন T, তেমনি G হলো C-এর পূরক। এভাবে ডি এন. এ.-র একটি তন্ত্রী অপরটির পরিপূরক হয়ে থাকে। Watson এবং Crick-এর মতে, দ্বি-তন্ত্রী ডি. এন. এ.-র এক-একটি তন্ত্রী সমান্তরালভাবে থেকে মোচড় দেওয়া লোহার সিঁড়ির মত ধাপে ধাপে দৈর্ঘ্যে বেড়ে গেছে। এক-একটি তন্ত্রী অপরটির সঙ্গে বহু সংখ্যক AT এবং GC-এর হাইড্রোজেন বন্ধনীর সাহায্যে যুক্ত থাকে। পরবর্তী বহু রাসায়নিক, প্রাণরাসায়নিক এবং ভৌত পরীক্ষা থেকে Watson এবং Crick উল্লিখিত ডি. এন. এ.-র গঠন-প্রকৃতি প্রমাণিত হয়েছে। ডি. এন. এ.-র এই একটিমাত্র গঠন-প্রকৃতি, কোষ বিভাজন, বংশজাত ধর্ম, বংশজাত ধর্মের সংমিশ্রণ, বংশজাত ধর্মের স্থায়ী পরিবর্তন (Mutation) এবং তার প্রকাশ প্রভৃতি জীববিদ্যার বহু মৌলিক প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে। কেবল তাই নয়, বংশানুক্রমের মূলাধার জিন যে স্বাতন্ত্র্য (Specificity) এবং অনুলিপি (Replicability) বজায় রেখে চলে, তা Watson এবং Crick উল্লিখিত ডি. এন. এ.-র গঠন-প্রকৃতির দ্বারাই পুরাপুরি ব্যাখ্যা করা সম্ভব (1নং চিত্র)

1956 সালে বৈজ্ঞানিক Kornberg ডি. এন. এ. পলিমারেজ জৈব অনুঘটকটি আবিষ্কার করেন এবং প্রাণরাসায়নিক পরীক্ষার সাহায্যে দেখান যে, ডি. এন. এ. নিজেই নিজেকে সৃষ্টি করতে পারে।

আর. এন. এ.-র পরিচয়

এতক্ষণ ডি. এন. এ.-র কথা বলা হলো। আর এক রকম নিউক্লিক অ্যাসিড আছে, তার নাম রিবোনিউক্লিক অ্যাসিড বা সংক্ষেপে আর. এন. এ.। ডি. এন. এ. এবং আর. এন. এ.-র মধ্যে পার্থক্য শুধু ডি. এন. এ.-র ডি-অক্সিরিবোস এবং

থাইমিন-এর জায়গায় আর. এন. এ.-তে যথাক্রমে রিবোস এবং ইউরাসিল থাকে। আর. এন. এ-র গঠন-প্রকৃতি যতটা জানা গেছে তা হলো, আর এন. এ. কোথাও দ্বি-তন্ত্রী আবার কোথাও এক-তন্ত্রী। আর. এন. এ. প্রধানতঃ তিন রকমের।
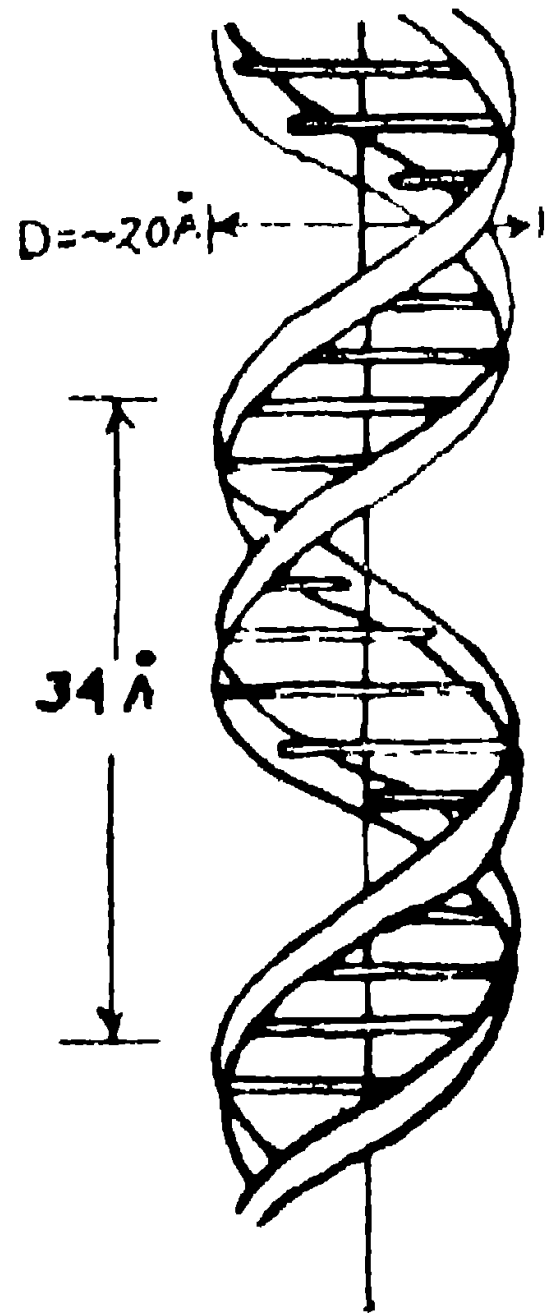
1নং চিত্র
ডি. এন. এ.-র গঠন।

1960 সালে বৈজ্ঞানিক Jacob এবং Monod এক রকমের ডি. এন. এ. সদৃশ ক্ষণস্থায়ী আর. এন. এ. আবিষ্কার করেন। এর নাম বার্তাবহ আর. এন. এ. (messenger—RNA) বা সংক্ষেপে m-R. N. A.। আর এক রকম আর. এন. এ. আছে, যা কোষের রিবোসোম নামক যন্ত্রের সঙ্গে বেশীর ভাগ যুক্ত থাকে। তাছাড়া কতকগুলি আর. এন. এ. অ্যামিনো অ্যাসিড বহন করে। এদের বলা হয় পরিবাহক আর. এন. এ. (transfer-R. N. A)। জীবকোষে প্রত্যেকটি অ্যামিনো অ্যাসিডের জন্যে ভিন্ন ভিন্ন পরিবাহক আর. এন. এ. আছে। এগুলি আকৃতিতে ছোট এবং গঠন-প্রকৃতি অনেকটা লবঙ্গ পাতার (Clover leaf) মত। 2নং চিত্রে ফিনাইল অ্যালানিন পরিবাহক আর. এন. এ-টির গঠন-প্রকৃতি দেখানো গেল।

জিনের ভাষা বিশ্লেষণ

আণবিক জীববিদ্যার প্রভূত উন্নতি হওয়া সত্ত্বেও কিন্তু ডি. এন. এ. এবং আর. এন. এ.-র ভাষা পড়বার ক্ষমতা এখনও আমরা অর্জন করি নি। এখানে বলে রাখা প্রয়োজন, ডি. এন. এ. কিংবা আর. এন. এ.-র ভাষা নিউক্লিয়োটাইড ক্রমপর্যায়ের উপর নির্ভর করে। আর প্রোটিনের ভাষা নির্ভর করে অ্যামিনো অ্যাসিডের ক্রমপর্যায়ের উপর। বৈজ্ঞানিক Sanger-এর পদ্ধতিতে আজকাল প্রোটিনে অ্যামিনো অ্যাসিডের ক্রমপর্যায় জানা সহজ হয়ে গেছে, কিন্তু নিউক্লিক অ্যাসিডে নিউক্লিয়োটাইডের ক্রমপর্যায় নির্ধারণের তেমন কোন প্রণালী এখনও সাফল্য লাভ করে নি।

জীবকোষ থেকে যে ডি. এন. এ. পাওয়া যায়, তার দৈর্ঘ্য সম্পর্কে প্রথমে খানিকটা ধারণা করে নিলে হয়তো নিউক্লিয়োটাইডের ক্রমপর্যায় নির্ধারণ যে এক জটিল ব্যাপার, তা অনুমান করা সহজ হবে। একজন প্রাপ্তবয়স্ক লোকের দেহ রক্তকোষ, পেশীকোস, স্নায়ুকোষ, চর্মকোষ ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকৃতির প্রায় 10^{13}টি কোষ দিয়ে গঠিত। প্রতিটি কোষের কেন্দ্রস্থলে আছে 46টি ক্রোমোজোম। আর এক-একটি ক্রোমোজোমে ডি. এন. এ. এমন জটিল প্যাঁচ খেয়ে আছে যে, একটি মানুষের জীবকোষ থেকে যতটা ডি. এন. এ. উদ্ধার করা যায়, তা লম্বালম্বিভাবে সাজালে দৈর্ঘ্যে দাঁড়ায় প্রায় 2 গজ অর্থাৎ 6 ফুট। এই 6 ফুট ডি. এন. এ.-তে আছে বহু হাজার নিউক্লিয়োটাইড। এবার ধারণা করা যাক, 10^{13}টি কোষের ডি. এন. এ. গুলিকে যদি পাশাপাশি রাখা যেত, তবে কি হতো? দৈর্ঘ্য দাঁড়াতো 6×10^{13} ফুট অর্থাৎ 11×10^{9}

মাইলেরও বেশী। তার মানে চাঁদ ও পৃথিবীর মধ্যে যে দূরত্ব (প্রায় 24×10^4 মাইল), তা 20 হাজার বারেরও বেশী যাওয়া-আসা করা যেত।

সুতরাং এটা অনুমেয় যে, জীবকোষের ডি. এন. এ.-র সমান দৈর্ঘ্যের একটি কৃত্রিম ডি. এন. এ., যার মধ্যে বহু হাজার নিউক্লিয়োটাইড এন. এ.-পলিমারেজ দ্বি-তন্ত্রী ডি. এন. এ.-র কেবল মাত্র একটি তন্ত্রীর ভাষাই প্রতিলিপি এবং অনুবাদ করতে আর. এন. এ-কে সহয়তা করে। কিন্তু ইদানীং জানা গেছে, আর. এন. এ.-পলিমারেজ যখন যে তন্ত্রীর যে স্থানে যুক্ত হয়, সেখান থেকেই একটি নির্দিষ্ট গতিপথে ডি. এন. এ.-র ভাষা প্রতিলিপি এবং অনুবাদ করতে আর. এন. এ.-কে
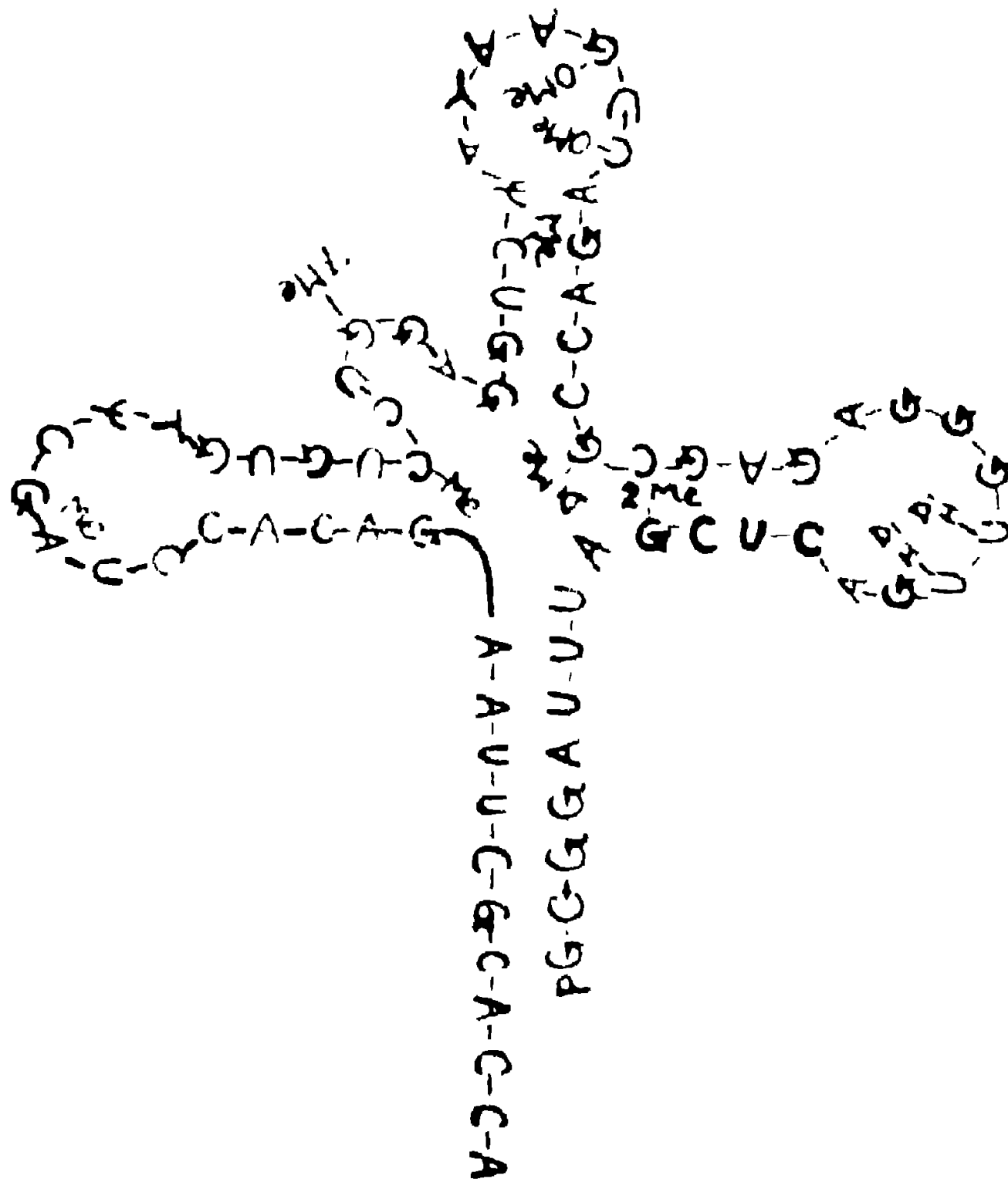
2নং চিত্র

ফিনাইল অ্যালানিন-পরিবাহক আর. এন. এ.-র গঠন।

আছে, তা সংশ্লেষণ করা আধুনিক রসায়নের মাপকাঠিতে ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। অথচ আশ্চর্যের কথা এই যে, ডি. এন. এ.-তে অবস্থিত নিউক্লিয়োটাইডের ক্রমপর্যায় অর্থাৎ ডি. এন. এ.-র দুর্ভেদ্য ভাষা যে বর্ণমালায় সজ্জিত, তা সহজেই প্রতিলিপিকরণ এবং অনুবাদন করতে পারে একমাত্র আর. এন. এ.। এই কাজে আর. এন. এ.-কে সহায়তা করে আর. এন. এ.-পলিমারেজ নামক একটি জৈব অনুঘটক। আগে ধারণা ছিল, আর. সহায়তা করে।

খুবই আশার কথা এই যে, মাত্র 77টি নিউক্লিয়োটাইড সমন্বিত অ্যালানিন পরিবাহক-আর. এন. এ. ইতিমধ্যে পাওয়া গেছে। এমন কি, বৈজ্ঞানিক ডক্টর হোলি (1965) ঐ আর. এন. এ.-টির গঠন-প্রকৃতি ও নিউক্লিয়োটাইডের ক্রমপর্যায় নির্ধারণ করেছেন। অ্যালানিন-পরিবাহক আর. এন. এ. কেবলমাত্র অ্যালানিন নামক অ্যামিনো অ্যাসিড পরিবহন করতে পারে। এর গঠন-প্রকৃতি

অনেকটা লবঙ্গ পাতার মত। যদিও মাত্র 77টি নিউক্লিয়োটাইড সমন্বিত অ্যালানিন-পরিবাহক আর. এন. এ.-তে নিউক্লিয়োটাইডের ক্রমপর্যায় জানা সম্ভব হয়েছে, কিন্তু আরও বৃহৎ দৈর্ঘ্যের নিউক্লিক অ্যাসিডে নিউক্লিয়োটাইডের ক্রমপর্যায় নির্ধারণ করা এক অতি দুরূহ ব্যাপার। এর কারণ হলো, প্রচলিত বিকারকগুলি (Reagents) নিউক্লিক অ্যাসিডকে এলোপাথারি ভেঙ্গে দেয়। ফলে পর পর নিউক্লিয়োটাইডের ক্রমপর্যায় নির্ধারণ করা যায় না। তাই বলা যায়, খোরানার নিউক্লিক অ্যাসিড-সংশ্লেষণ পদ্ধতিটি নিউক্লিক অ্যাসিডে নিউক্লিয়োটাইডের ক্রমপর্যায় বিশ্লেষণের প্রকৃত উপায়। কেবল তাই নয়, জিন-এর কতটুকু অংশ কোন্ বিশেষ প্রোটিন সংশ্লেষণে অংশগ্রহণ করে, তার কার্য-কারণ সম্পর্কের পরিচায়ক।

খোরানার পদ্ধতিতে নিউক্লিক অ্যাসিড সংশ্লেষণ

অ্যালানিন-পরিবাহক আর. এন. এ.-র পরিচয় খোরানার কাজকে অনেকটা এগিয়ে দিল। অ্যালানিন-পরিবাহক আর. এন. এ.-র মূলে যে জিনটি অংশগ্রহণ করতে পারে, তার নিউক্লিয়োটাইড ক্রমপর্যায় খোরানা কাগজে-কলমে লিখলেন। উদ্দেশ্য হলো, এমন একটি জিন সংশ্লেষণ করা, যা অ্যালানিন-পরিবাহক আর. এন. এ. তৈরি করতে পারে। কেবল তাই নয়, সংশ্লেষিত অ্যালানিন-পরিবাহক আর. এন. এ. প্রাণরাসায়নিক প্রোটিন সংশ্লেষণে অংশগ্রহণ করে কিনা, তাও পরীক্ষা করে দেখা।

খোরানার নিউক্লিক অ্যাসিড সংশ্লেষণ-পদ্ধতির ক্রমবিকাশ তিনটি প্রধান ধাপে আলোচ্য।

প্রথম: (1952-1962)—কয়েকটি নিউক্লিয়োটাইড সমন্বিত পলিনিউক্লিয়োটাইড এবং ছোট ছোট দ্বি-তন্ত্রী নিউক্লিক অ্যাসিড সংশ্লেষণের উন্নত রাসায়নিক পদ্ধতির উদ্ভাবন।

দ্বিতীয়: (1962-1967)—বিভিন্ন প্রচলিত পদ্ধতির সাহায্যে জিনের ক্ষুদ্রতম দৈর্ঘ্য, যা কোন নির্দিষ্ট প্রোটিন কিংবা আর. এন. এ. সংশ্লেষণ করতে পারে, তা নির্ধারণ করা। আর. এন. এ.-র নিউক্লিয়োটাইড ক্রমপর্যায় অবলম্বন করে যে জিনটি আর. এন. এ. সংশ্লেষণ করতে পারে, তার নিউক্লিয়োটাইড ক্রমপর্যায় নির্ধারণ করা।

তৃতীয়: (1967 থেকে সুরু)—প্রথমে ছোট ছোট দ্বি-তন্ত্রী ডি. এন. এ. সংশ্লেষণ এবং পরে ঐগুলি বিশেষ প্রণালীতে জুড়ে একটি লম্বা ডি এন. এ. তৈরি করা, যা স্বাভাবিক প্রাণরাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করে আর. এন. এ. কিংবা প্রোটিন তৈরি করতে পারবে।

পলিনিউক্লিয়োটাইডে থাকে বহুসংখ্যক নিউক্লিয়োটাইড। সুতরাং ধাপে ধাপে বহুসংখ্যক নিউক্লিয়োটাইড জুড়ে পলিনিউক্লিয়োটাইড তৈরি হতে পারে। এখানে বলা প্রয়োজন, পিউরিন অথবা পিরামিডিনের সঙ্গে রিবোস কিংবা ডি-অক্সিরিবোস যুক্ত থাকলে নিউক্লিয়োসাইড তৈরি হয়। দু-একটি নিউক্লিয়োসাইড, নিউক্লিয়োটাইড এবং পলিনিউক্লিয়োটাইডের পরিচয় দেওয়া গেল (3নং চিত্র)।

সংশ্লেষণ-পদ্ধতি

একটু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, নিউক্লিয়োসাইডে কতকগুলি মুক্ত হাইড্রক্সিল বা $-OH$ মূলক এবং অ্যামিনো বা $-NH_2$ মূলক আছে। নিউক্লিক অ্যাসিড সংশ্লেষণে এই মূলকগুলির গুরুত্ব খুবই বেশী। মূলকগুলি নানাভাবে দুটি নিউক্লিয়োসাইডকে ফস্ফরিক অ্যাসিডের মাধ্যমে যুক্ত হতে বাধা দেয়। সে জন্যে মূলকগুলিকে বিভিন্ন আক্রমণাত্মক বিকারক থেকে রক্ষা করা

হয়ে থাকে। যে সব প্রচলিত রক্ষক-বিকারক (Protecting agent) —OH, $—NH_2$ এবং ফস্‌ফেট ($PO_4 - 3$) মূলককে রক্ষা করবার জন্যে ব্যবহৃত হয়, সেগুলি হলো বেঞ্জয়িল ক্লোরাইড, অ্যানিসোয়িল ক্লোরাইড, পেরামিথোক্সিফিনাইল, ট্রাইটিল ক্লোরাইড ইত্যাদি। রক্ষক-বিকারকগুলি সংযোজক বিকারক (Condensing agent)। উল্লেখযোগ্য যে, সংযোজক বিকারকগুলি হলো ডাইসাইক্লোহেক্সাইলকার্বোডাই-ইমাইড বা সংক্ষেপে ডি. সি. সি. অ্যারোমেটিক সালফোনিক অ্যাসিড ক্লোরাইড প্রভৃতি।

রক্ষক-বিকারক, সংযোজক-বিকারক ইত্যাদি
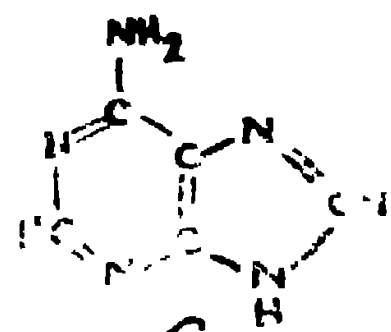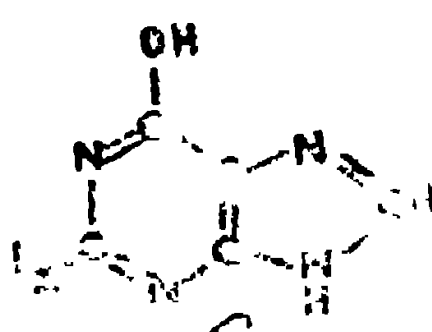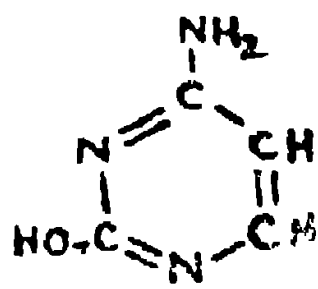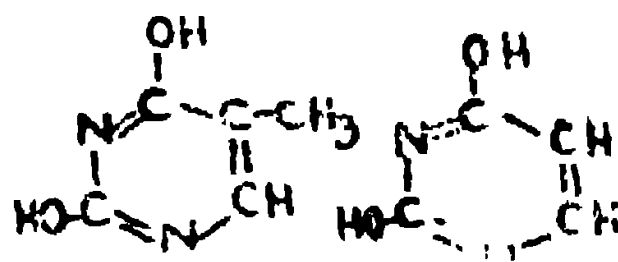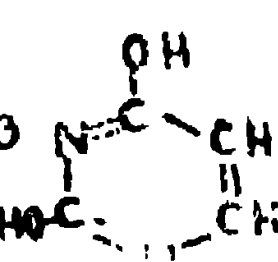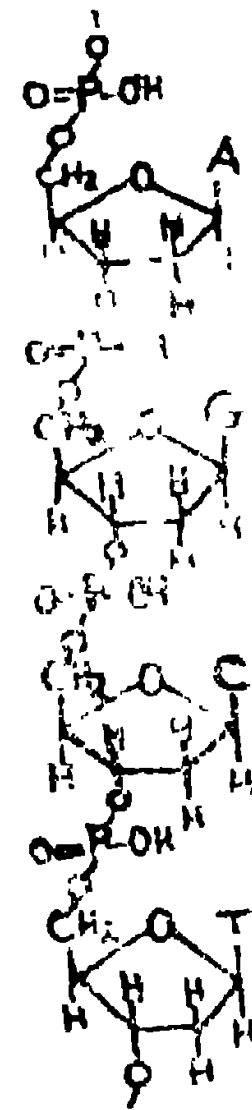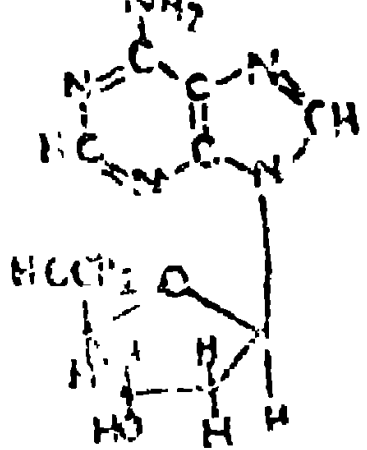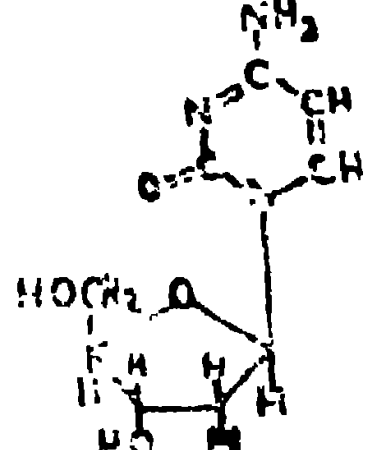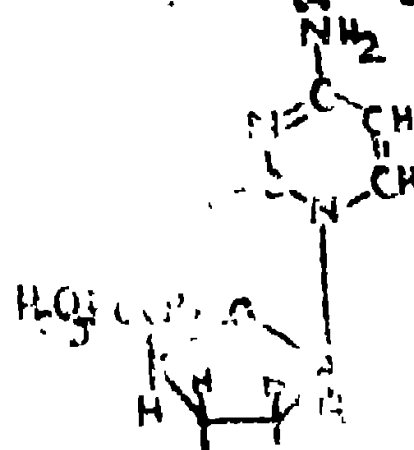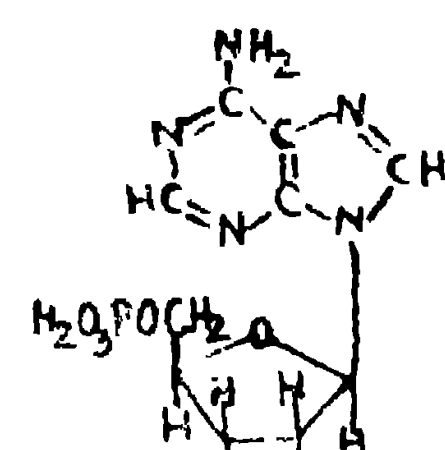
3নং চিত্র

ব্যবহার করবার সুবিধা হলো, পলিনিউক্লিয়োটাইড তৈরি হয়ে গেলে রক্ষক-বিকারকগুলিকে সহজেই সংশ্লেষিত অণু থেকে বিচ্ছিন্ন করে নেওয়া যায়।

কতকগুলি বিকারক আবার নিউক্লিয়োটাইডগুলির মধ্যেকার ফস্‌ফেট সেতু-বন্ধনী তৈরিতে অংশগ্রহণ করে। এদের বলা হয় ফস্‌ফেট সেতু ব্যবহার করে নিম্নলিখিত ধাপে খোরানা ডি. এন. এ. সংশ্লেষণ করেছেন।

মূল উপাদান

1 রক্ষক-বিকারকের সাহায্যে বিভিন্ন —OH এবং $—NH_2$ মূলকগুলি রক্ষা করা।

(2) সংযোজক-বিকারকের সাহায্যে নিউক্লিয়োটাইডগুলির মধ্যে সংযোগ সাধন এবং ধাপে ধাপে ছোট পলিনিউক্লিয়োটাইড প্রস্তুতি (5-20টি নিউক্লিয়োটাইড সমন্বিত)।

(3) উন্নত আধুনিক প্রণালীতে বিশুদ্ধ পলিনিউক্লিয়োটাইড স্বতন্ত্রীকরণ।

প্রণালীতে ছোট ছোট দ্বি-তন্ত্রী পলিনিউক্লিয়োটাইডের সংযোজন।

ক্ষুদ্রতম দৈর্ঘ্যের সক্রিয় জিন বা ডি. এন. এ.

এখানে বলে রাখা প্রয়োজন যে, রাসায়নিক প্রণালীতে কেবলমাত্র কয়েকটি নিউক্লিয়োটাইড

খোরানার পদ্ধতিতে ডি. এন. এ. সংশ্লেষণ

নিউক্লিয়োটাইড
① রক্ষক-বিকারক
② সংযোজক-বিকারক
কয়েকটি ওলিগোনিউক্লিয়োটাইড (5-20টি নিউক্লিয়োটাইড সম্মিলিত)
লাইগেজ অনুঘটক
ডি.এন.এ পলিমারেজ

4নং চিত্র
সংশ্লেষিত ডি. এন. এ

(4) পলিনিউক্লিয়োটাইড থেকে রক্ষক-বিকারক বিচ্ছিন্ন করা।
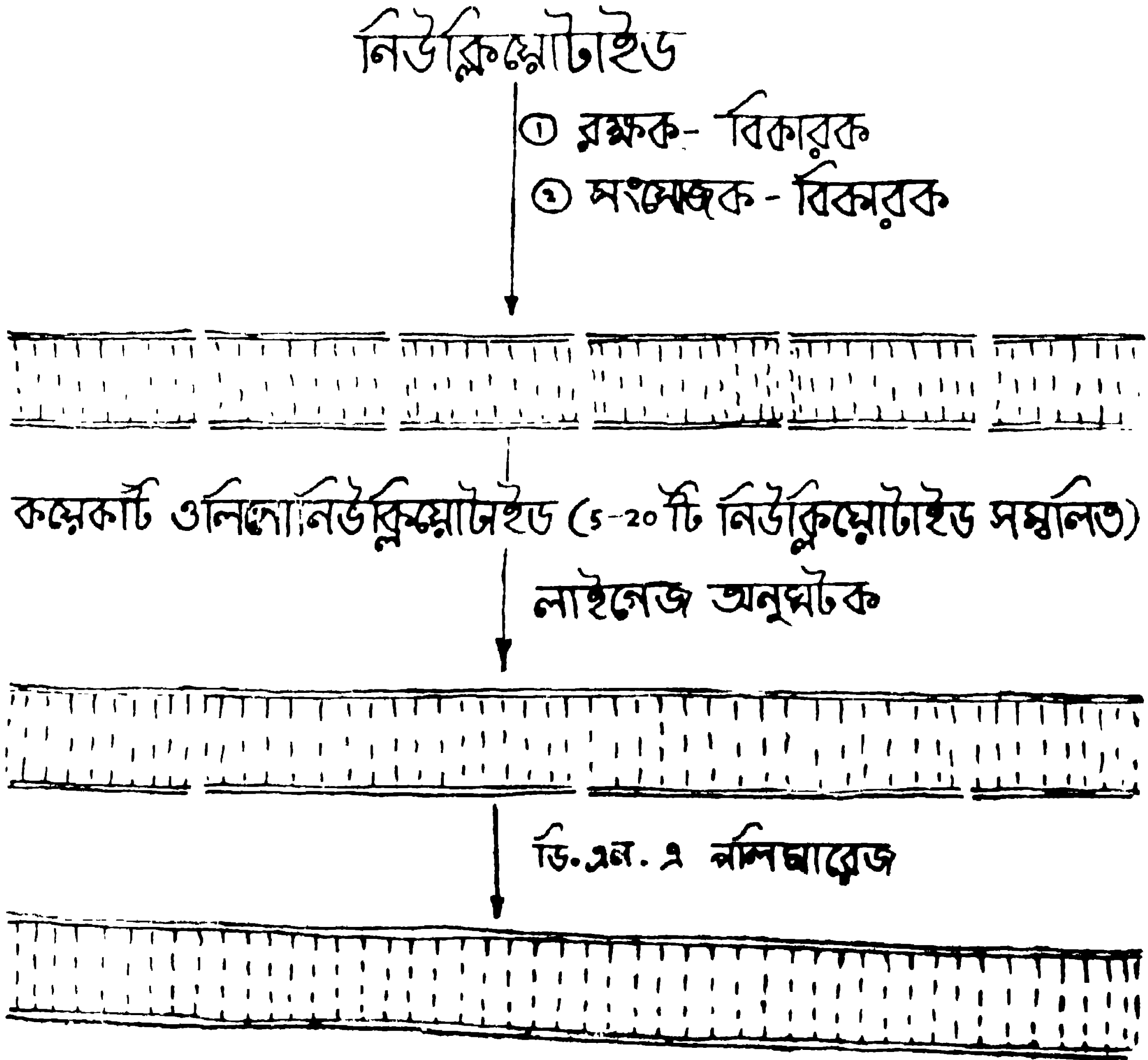
(5) রাসায়নিক এবং প্রাণরাসায়নিক

সমন্বিত পলিনিউক্লিয়োটাইড তৈরি করা সম্ভব। এগুলিকে ওলিগোনিউক্লিয়োটাইড (Oligonucleotide) বলা হয়। ওলিগোনিউক্লিয়োটাইড-

গুলিকে রাসায়নিক এবং প্রাণরাসায়নিক প্রণালীতে জুড়ে পলিনিউক্লিয়োটাইড তৈরি করা হয়। একাজে লাইগেজ নামক একটি জৈব অনুঘটক ব্যবহার করা হয়। দ্বি-তন্ত্রী ডি. এন. এ. তৈরি হয়ে গেলে তার পরিপূরক এক-তন্ত্রীগুলির অনেক জায়গা থাকে ভাঙা। সেগুলিকে জোড়বার জন্যে E. coli থেকে পাওয়া ডি. এন. এ. পলিমারেজ নামক জৈব অনুঘটকটি ব্যবহৃত হয় (4নং চিত্র)।

নিউক্লিক অ্যাসিড সংশ্লেষণের বাস্তব রূপ

নিউক্লিক আসিড সংশ্লেষণই সব শেষ নয়। দেখতে হবে, নিউক্লিক অ্যাসিডের কোন্ ক্ষুদ্রতম দৈর্ঘ্য জীবকোষের কোন্ একটি বিশেষ ঘটনাকে রূপ দিতে সক্ষম। এটি যাচাই করে দেখতে হলে জিন থেকে প্রোটিন সংশ্লেষণের বিভিন্ন ধাপগুলি পরীক্ষা করে দেখতে হবে। জিন অথবা ডি. এন. এ. এবং এবং প্রোটিনের পারস্পরিক সম্পর্ক ইতিমধ্যে একরকম প্রায় জানা হয়ে গিয়েছিল।

জিন বা ডি. এন. এ. ——প্রতিলিপিকরণ——→ আর. এন. এ. ——অনুবাদন——→ প্রোটিন
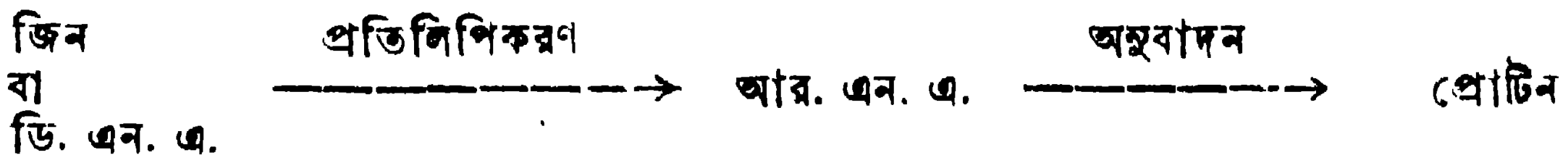
জিন-সংশ্লেষণের পদ্ধতি আবিষ্কারের আগে বৈজ্ঞানিকেরা নানা উপায়ে জিনের ক্ষুদ্রতম অংশ, যা কোন একটি বিশেষ প্রাণরাসায়নিক ঘটনার সঙ্গে জড়িত, তা জানবার চেষ্টা করেছিলেন। দু-একজন খানিকটা সফলতা অর্জন করলেও এই কাজ শ্রমসাপেক্ষ—এমন কি, কোন নির্দিষ্ট পথের নির্দেশও নেই। খোরানার পদ্ধতিটিতে পথের নির্দেশ তো আছেই—এমন কি, সফলতা লাভের আশাও অনেক গুণ বেশী। মাত্র 77টি নিউক্লিয়োটাইড সমন্বিত পূর্বনির্ধারিত নিউক্লিয়োটাইডের ক্রমপর্যায় জানা অ্যালানিন-পরিবাহক আর. এন. এ.-কে যে জিনটি সংশ্লেষণ করতে পারে, তার সম্ভাব্য নিউক্লিয়োটাইড ক্রমপর্যায় প্রথমে ডক্টর খোরানা কাগজে লিখলেন। এরপর 5-20টি নিউক্লিয়োটাইডের দৈর্ঘ্যের সমান 15টি দ্বি-তন্ত্রী ডি. এন. এ. তৈরি করলেন। তারপর জৈব অনুঘটক ব্যবহার করে তিনটি পৃথক লম্বা ডি. এন. এ. তৈরি করলেন। তিনটি লম্বা ডি. এন. এ.-কে জুড়ে 77টি নিউক্লিয়োটাইড সমন্বিত একটি দ্বি-তন্ত্রী ডি. এন. এ. তৈরি করলেন। এই ভাবে ক্ষুদ্রতম দৈর্ঘ্যের ডি. এন. এ., যা অ্যালানিন-পরিবাহক আর. এন. এ. তৈরি করতে পারে, তা পরীক্ষা-নলে সংশ্লেষণ করলেন। এবার পরীক্ষা-নলে 77টি নিউক্লিয়োটাইড সমন্বিত ডি. এন. এ.-টি ব্যবহার করে এবং অন্যান্য যা যা প্রয়োজন, তা দিয়ে অ্যালানিন-পরিবাহক আর. এন. এ.-টিও তৈরি করলেন। সংশ্লেষিত আর. এন. এ.-টি সক্রিয় কিনা, এবার তা পরীক্ষা করবার পালা। C^{14}-চিহ্নিত অ্যালানিন, সংশ্লেষিত পরিবাহক আর. এন. এ. এবং বিক্রিয়ার অন্যান্য ন্যূনতম প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি থাকলে দেখা গেল, সংশ্লেষিত পরিবাহক আর. এন. এ.-টি C^{14}-অ্যালানিনকে প্রোটিনে জুড়ে দিতে পারে। এই পরীক্ষা প্রত্যক্ষভাবে—

ডি. এন. এ. ——প্রতিলিপিকরণ——→ আর. এন. এ. ——অনুবাদন——→ প্রোটিন
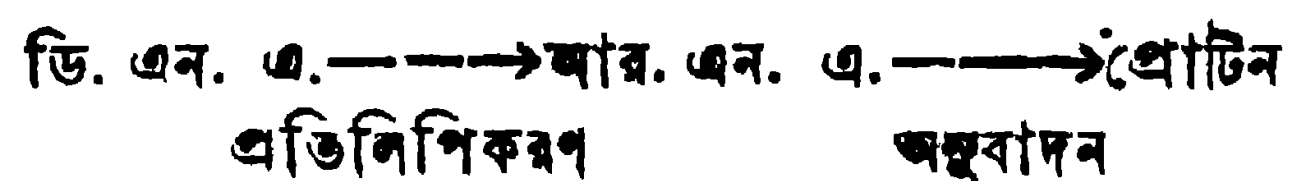
ঘটনাটির বিভিন্ন ধাপগুলি প্রমাণ করলো। খোরানার অ্যালানিন-পরিবাহক আর. এন. এ.-টি কতটুকু সক্রিয়, তা আরও ভালভাবে পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে এমন একটি জীবাণুতে, যার মধ্যে অ্যালানিন-পরিবাহক আর. এন. এ.-টি অনুপস্থিত। এই ধরণের কাজ জীবকোষে সংশ্লেষিত জিনের সক্রিয়তা প্রমাণ করতে সক্ষম হবে।

তাৎপর্য

নিউক্লিক অ্যাসিড সংশ্লেষণের তাৎপর্য বহুমুখী। সুদূরপ্রসারী কল্পনায় না যেতে আমাদের বাস্তব পরিকল্পনাটি প্রথম তৈরি করতে হবে। মনে হয়, আধুনিক আণবিক প্রজনন প্রয়োগ-বিদ্যার উন্নতি সাধন করে বহু বংশজাত ত্রুটি সংশোধন করতে বিজ্ঞানীসমাজ এখন বেশ উৎসাহী। ইতিমধ্যে অনেকেই ডায়াবেটিস নামক ভয়ঙ্কর রোগের স্থায়ী প্রতিবিধান করবার জন্যে চিন্তা ও চেষ্টা করছেন। যকৃৎ থেকে স্বাভাবিক-ভাবে ইনসুলিন নামক উত্তেজক রসটি সংশ্লেষিত না হলে কিংবা স্বাভাবিকভাবে নিঃসৃত না হলে ডায়াবেটিস হয়ে থাকে। আশার কথা এই যে, ইনসুলিনের গঠন-প্রকৃতি এবং এর অ্যামিনো অ্যাসিডের ক্রমপর্যায় বৈজ্ঞানিক Sanger বহুদিন আগেই নির্ধারণ করেছিলেন। এখন বাকী শুধু এমন একটি ক্ষুদ্রতম দৈর্ঘ্যের জিন তৈরি করা, যা ইনসুলিন তৈরি করতে পারে। পশ্চাৎ অপসরণ পদ্ধতি (Extrapolation method) অবলম্বন করে প্রথমে ইনসুলিনে অ্যামিনো অ্যাসিডের ক্রমপর্যায় থেকে আর. এন. এ.-র সম্ভাব্য নিউক্লিয়োটাইড ক্রমপর্যায় নির্ধারণ করা এবং পরে ডি. এন. এ.-তে অবস্থিত সম্ভাব্য নিউ-ক্লিয়োটাইডের ক্রমপর্যায় স্থির করা—এর পর খোরানার পদ্ধতিতে ধাপে ধাপে ডি. এন. এ.-টি তৈরি করা। এখানেই সফলতা সম্পূর্ণ নয়। সংশ্লেষিত ডি. এন. এ.-টি সাধারণ জীবকোষে কতটা সক্রিয়, তাও পরীক্ষা করে দেখতে হবে। এই ক্ষেত্রে কোন রকম ভুলত্রুটি থাকলে হয়তো আরও দুরারোগ্য ব্যাধির সম্মুখীন হতে হবে। সে জন্যে ডায়াবেটিস, ক্যান্সার প্রভৃতি জটিল ব্যাধিগুলির মোকাবেলা করবার আগে আমাদের আরও বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যেতে হবে। বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এগিয়ে গেলে নিকট ভবিষ্যতে বহু দুরারোগ্য ব্যাধির নির্মূল সাধনে খোরানার 'জিন-সংশ্লেষণ' হবে একটি যুগান্তকারী আবিষ্কার।

পুস্তক-পরিচয়

কোয়ান্টাম বলবিদ্যা—ভি. রিড্‌নিক প্রণীত। প্রকাশক—মণীষা গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা। ইংরেজী সংস্করণের অনুবাদ করেছেন শ্রীশঙ্কর চক্রবর্তী, শ্রীসুমিত চক্রবর্তী, শ্রীসনৎ বসু ও ডক্টর জয়ন্ত বসু। ভূমিকা লিখেছেন জাতীয় অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু। পাণ্ডুলিপি সম্পাদনা করেছেন অধ্যাপক অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র ও ডক্টর জয়ন্ত বসু। পৃষ্ঠা-323 ; মূল্য 6·00 টাকা।

বাংলাভাষী পাঠকের সম্মুখে নব্য পদার্থ-বিজ্ঞানের সামগ্রিক রূপ, চমকপ্রদ আবিষ্কার এবং বিভিন্ন তত্ত্ব ও তথ্যকে উপস্থাপিত করবার মত উল্লেখযোগ্য পুস্তকের একান্তই অভাব। এই বিষয়ে বাংলা ভাষায় মৌলিক পুস্তক রচনা নিঃসন্দেহে কাম্য, তবে তার অভাবে অন্য ভাষায় রচিত প্রামাণ্য পুস্তকের অনুবাদও সমভাবে প্রশংসনীয় প্রচেষ্টা। এই পুস্তকের প্রকাশ সে জন্যে অকুণ্ঠ সাধুবাদ পাবার যোগ্য।

1900 সালের 17ই ডিসেম্বর ম্যাক্স প্লাঙ্ক বস্তুর তাপীয় বিকিরণের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে কোয়ান্টাম তত্ত্বের প্রস্তাবনা করেছিলেন। প্রকৃত পক্ষে সে দিন থেকে নব্য পদার্থ-বিজ্ঞানের আবির্ভাব হলো, ক্লাসিক্যাল পদার্থ-বিজ্ঞান চিন্তার অপূর্ণতা ধরা পড়লো। বিংশ শতাব্দীর সূচনাতে যে নব্য পদার্থ-বিজ্ঞানের শুভ আবির্ভাব, তা স্বল্পকালের মধ্যে বিস্ময়কর দ্রুতগতিতে বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখাকে ছাড়িয়ে গেল। বস্তুতঃ বিজ্ঞানের অন্যান্য সমস্ত শাখাই পদার্থ-বিজ্ঞানের এই অগ্রগতিতে প্রভাবিত হয়ে পুষ্টিলাভ করেছে এবং মানবসমাজের চিন্তাধারাকেও গভীরভাবে আচ্ছন্ন করেছে।

নব্য পদার্থ-বিজ্ঞানের সামগ্রিক রূপ—প্লাঙ্কের কোয়ান্টাম তত্ত্ব থেকে প্রাথমিক বস্তুকণা সম্পর্কিত অতি আধুনিক ধারণা কোয়ার্ক পর্যন্ত—এই পুস্তকে খুবই সরল এবং চিত্তাকর্ষকভাবে বর্ণিত হয়েছে। পুস্তকটিতে মোট ছয়টি অধ্যায় আছে। প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে ক্লাসিক্যাল পদার্থবিদ্যার সীমাবদ্ধতা এবং কোয়ান্টাম তত্ত্বের আবির্ভাব বিবৃত হয়েছে। তপ্ত বস্তুর উত্তাপ বিকিরণের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা এবং তেজস্ক্রিয়তা ও রঞ্জেন রশ্মির আবিষ্কার ক্লাসিক্যাল পদার্থবিদ্যার মূল ভিত্তিকে প্রচণ্ড ধাক্কা দিয়েছিল। আইনষ্টাইনের ফোটো-ইলেকট্রিক প্রক্রিয়া প্লাঙ্কের তত্ত্বকে আরো সুপ্রতিষ্ঠিত করলো।

1912 সালে নীল বোর হাইড্রোজেন-বর্ণালীর তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা প্রদান করেন। 1924 সালে লুই দ্য ব্রগ্‌লি জড় তরঙ্গের অস্তিত্ব সম্পর্কে অনুমান করেন। এর কয়েক বছর পরে ডেভিসন ও জারমার এবং তার্তাকভ্‌স্কি কেলাসের দ্বারা ইলেকট্রনের অবচ্যুতি (Diffraction) পরীক্ষা করেন; এতে ইলেকট্রনের তরঙ্গ-ধর্ম প্রমাণিত হয়। পুস্তকের তৃতীয় অধ্যায়ে এসব বিষয় চমৎকারভাবে বর্ণিত হয়েছে। 1927 সালে ভার্ণার হাইসেনবার্গ এবং অ্যারভিন শ্রোয়েডিঙ্গার আধুনিক কোয়ান্টাম বলবিদ্যার সূত্রপাত করেন। ক্লাসিক্যাল বলবিদ্যার বক্তব্য নিশ্চয়তামূলক, তাতে সম্ভাব্যতার কোন স্থান নেই। কোয়ান্টাম বলবিদ্যার বক্তব্য সকল সময়ের সম্ভাব্যতার মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। এই কোয়ান্টাম বলবিদ্যার সাহায্যে ইলেকট্রন বা অন্যান্য কণার স্থৈতিক বাধা (Potential barrier) অতিক্রমণের ঘটনা সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে পরমাণু, অণু ও কেলাসের ধর্ম ব্যাখ্যায় কোয়ান্টাম বলবিদ্যার প্রয়োগ বিবৃত হয়েছে। পরমাণুর মিলনে অণু গঠনে বিনিময়ী মিথ-ক্রিয়ার (Exchange interaction) ভূমিকার বর্ণনা চিত্তাকর্ষক। রেখাচিত্রের সাহায্যে ইলেক-ট্রন মেঘের ব্যাখ্যাও খুব সুন্দর।

কোয়ান্টাম বলবিদ্যার প্রয়োগ শুধু পারমাণবিক ক্রিয়াতেই সীমাবদ্ধ থাকে নি, পরমাণু-কেন্দ্রকের আভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রেও এর সার্থক প্রয়োগ ঘটেছে। পুস্তকের পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়ে পরমাণু-কেন্দ্রকের আভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়া, মৌল কণার সৃষ্টি ও পারস্পরিক প্রক্রিয়ার আধুনিক তথ্যাবলী সন্নিবেশিত হয়েছে। কেন্দ্রকে নিউট্রন ও প্রোটনের একত্র অবস্থানের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে বিজ্ঞানী টাম এবং উকাওয়া কেন্দ্রকের নিউট্রন ও প্রোটনের মধ্যে তীব্র বিনিময়াত্মক আকর্ষণী বলের অনুমান করেন। উকাওয়া অন্য কোন মৌলিক কণা (পরে যার নাম দেওয়া হয়েছে মেসন) বিনিময়ের ফলে এই বলের সৃষ্টি হয় বলে প্রস্তাব করেন। 1947 সালে পাওয়েল সেই অভীপ্সিত পাই-মেসন আবিষ্কার করেন। মৌল কণার পারস্পরিক ক্রিয়াসঞ্জাত বলসমূহের মধ্যে কেন্দ্রকীয় বলই সর্বাধিক জোরালো—অবশ্য এর বিস্তার খুবই কম।

পুস্তকটির শেষ অংশে কেন্দ্রকের বিভিন্ন মডেল, কেন্দ্রক বিভাজন প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা এবং মৌল কণার বিপরীত কণার অস্তিত্ব, মৌলকণার অনুনাদ প্রভৃতি সুন্দর ও প্রাঞ্জলভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। মৌল বিন্যাসে ত্রিতয়, অষ্টতয় প্রভৃতির অনুমান ও সেই সঙ্গে কোয়ার্ক ইত্যাদিরও যথেষ্ট ভালভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বস্তুতপক্ষে পুস্তকে সন্নিবেশিত বহুল তথ্যের পরিচয় এই স্বল্প পরিসরে দেওয়া দুঃসাধ্য। মৌল কণাসমূহের একটি তালিকা প্রদত্ত হওয়াতে পুস্তকের উপযোগিতা বৃদ্ধি পেয়েছে। পুস্তকটিতে ব্যবহৃত পরিভাষা ও সেগুলির ইংরেজী প্রতিশব্দের একটি তালিকা পুস্তকটির শেষে সংযোজিত হয়েছে। তালিকাটি প্রস্তুত করেছেন ডক্টর জয়ন্ত বসু। বাংলা ভাষায় রচিত প্রতিটি বিজ্ঞানবিষয়ক পুস্তকে এরূপ তালিকা প্রদত্ত হলে তা পরিভাষা-সমস্যার সমাধানে বহুলাংশে সহায়ক হবে।

এই তথ্যবহুল ও জনপ্রিয় পুস্তকের অনুবাদে কিছু ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়েছে। এই প্রকার অনুবাদ পুস্তকের বহুল প্রচার সর্বথা কাম্য এবং বাংলা ভাষায় এইরূপ একটি প্রচেষ্টা প্রথম বলেই ত্রুটিগুলি সম্পর্কে অধিকতর সচেতন হওয়া প্রয়োজন। কয়েক ক্ষেত্রে অনুবাদ আক্ষরিক অর্থেই ইংরেজীর অনুগামী হয়েছে। ফলে স্থানে স্থানে ভাষা কিছুটা দুর্বোধ্য হয়েছে। এই ধরণের অনুবাদ গ্রন্থের ভাষা সহজ ও সাবলীল করবার জন্যে অনুবাদ কোন কোন ক্ষেত্রে বিষয়বস্তুর ভাব অনুসারে হওয়াই বাঞ্ছনীয়। ইংরেজী এবং বাংলার বাচনভঙ্গী তো একরকম নয়!

একথা নিশ্চয়ই ঠিক যে, গ্রন্থটির উপযোগিতার কথা চিন্তা করলে ত্রুটি-বিচ্যুতি খুবই নগণ্য মনে হয়। সর্বস্তরের শিক্ষিত বাংলাভাষী পাঠকই এই গ্রন্থ পাঠে আধুনিক বিজ্ঞান-জগতের সঙ্গে পরিচিত হবেন। বস্তুতপক্ষে এইরূপ একটি গ্রন্থ প্রকাশ করে অনুবাদক এবং প্রকাশক আধুনিক বিজ্ঞান-জগতের দ্বার সবার কাছে উন্মোচিত করেছেন—এই জন্যে বাংলাভাষী জনসাধারণ তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে।

ব্রহ্মানন্দ দাশগুপ্ত*

*সাহা ইনষ্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স, কলিকাতা-9

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

সেপ্টেম্বর-অক্টোবর — 1970

ত্রয়োবিংশ বর্ষ — নবম-দশম সংখ্যা

বসন্ত সমাগমে অ্যারিজোনার মরুভূমির বিস্তীর্ণ বালুকারাশির মধ্যে বিরাট আকৃতির ক্যাকটাস গাছে (সিজ বা মনসাজাতীয় গাছ) ফুল ফুটেছে।

কৃত্তিকা যার নাম

শুধু চোখে দেখা।

সন্ধ্যার নির্মল আকাশে যখন তারা ফোটে এক, দুই, তিন—তখনও মহাকাশ এমন কিছু নয়, কিন্তু তারপর এক সময়ে যখন অন্ধকার জমাট বেঁধে ঘন হয়ে আসে, তখন দিনের আলোর গভীরে লুকিয়ে থাকা অসংখ্য তারকার মেলায় মহাকাশ অপরূপ দর্শন হয়ে ওঠে।

ঊর্ধ্বাকাশ—যেদিকে তাকানো যায়, তারা আর তারা। তার কোনটি উজ্জ্বল—সহজে দৃষ্টি আকর্ষণ করে, কোনটি ম্রিয়মাণ—চেষ্টায় যার অস্তিত্ব ধরা পড়ে, কোনটি একক—মহাকাশে সে নিঃসঙ্গ, কোনটি যুগ্ম—দূরবীনে যা লক্ষ্য করবার মত। তারকাগুলির বর্ণবৈচিত্র্যও আছে। কোনটির বর্ণ হলুদ—আকাশের অধিকাংশ তারকাই তাই, কোনটি রক্তিম—সেগুলি অতীব সুন্দর, সন্দেহ নেই।

আকাশে যত উজ্জ্বল এবং দর্শনীয় তারা, প্রাচীন কালের মহাকাশ অনুসন্ধানীরা সেই সব তারাগুলি নিয়ে বিভিন্ন রূপ কল্পনা করেছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে কাহিনীর ভাবনা। সে ভাবনার পরিচয় পাই—রামায়ণ, মহাভারত, পৌরাণিক বিভিন্ন কাহিনী ও উপাখ্যানে।

শীতের আকাশে সন্ধ্যাবেলায় যদি সরাসরি মাথার উপরে চোখ তুলে তাকানো যায়, তাহলে উজ্জ্বল ও অনুজ্জ্বল তারকায় মেশা একটি তারকাগুচ্ছ সকলেরই নজরে আসবে, অনেকটা মুড়ির ঠোঙ্গার মত আকৃতি—নাম তার কৃত্তিকা। মণ্ডলটিতে কয়টি তারা আছে? সহজ দৃষ্টিতে ছয়; কিন্তু দৃষ্টি যদি একটু তীক্ষ্ণ করা যায়, তাহলে মণ্ডলটিতে আর একটি তারাও নজরে আসতে পারে। সব জড়িয়ে তখন সেখানে সাতটি তারা। বাংলায় এই মণ্ডলটির একটি আটপৌরে নাম আছে। সেটি হলো সাত-ভেয়ে বা সাত ভাই চম্পা। ইংরেজীতে এটির নাম Pleiades। এটির অবস্থান পাঁচ-শ' আলোক-বর্ষ দূরে।

এই কৃত্তিকাকে নিয়ে বাংলায় আর একটি তারামণ্ডল আছে—সেটি বৃষ রাশি, ইংরেজী নাম Taurus। সেকালের জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা মণ্ডলটির বিভিন্ন তারা নিয়ে একটি বৃষের মূর্তি কল্পনা করেছিলেন বলেই মণ্ডলটির এই নাম। বৃষ রাশিতে রীতিমত উজ্জ্বল একটি তারা আছে। মহাকাশে সর্বোজ্জ্বল তারাগুলির মধ্যে এটি চতুর্দশ। তারাটির নাম রোহিণী।

মহাকাশের তারা বা তারামণ্ডল নিয়ে ভারতীয় পুরাণের যে সব আখ্যান বা উপাখ্যান মনকে চমৎকৃত করে, সে রকম একটি উপাখ্যান হলো কৃত্তিকামণ্ডলের তারাগুলিকে নিয়ে। কাহিনীটি বিচিত্র সন্দেহ নেই।

কৃত্তিকা নক্ষত্রকে নিয়ে কাহিনীটি বলতে গেলে মহাকাশের আর একটি তারা-মণ্ডলের কথা না বললে উপায় নেই। এটির নাম সপ্তর্ষিমণ্ডল। মহাকাশে কৃত্তিকামণ্ডলে কিছুটা উত্তর-পূর্বে এটির অবস্থান। অনেকটা স্থান জুড়ে উজ্জ্বল তারা নিয়ে মণ্ডলটির অন্তহীন সৌন্দর্য লক্ষ্য করবার মত। মণ্ডলটির নাম থেকেই বোঝা যায় যে, মণ্ডলটিতে আছে সাতটি তারা, সেই সাতটি ঋষির নামাঙ্কিত। মণ্ডলটির পূর্ব প্রান্তে আছে মরীচি, তারপর বশিষ্ঠ, অঙ্গিরা, অত্রি। অত্রির দক্ষিণে পুলস্ত্য, পুলস্ত্যের পশ্চিমে পুলহ ও পুলহের উত্তরে ক্রতু।
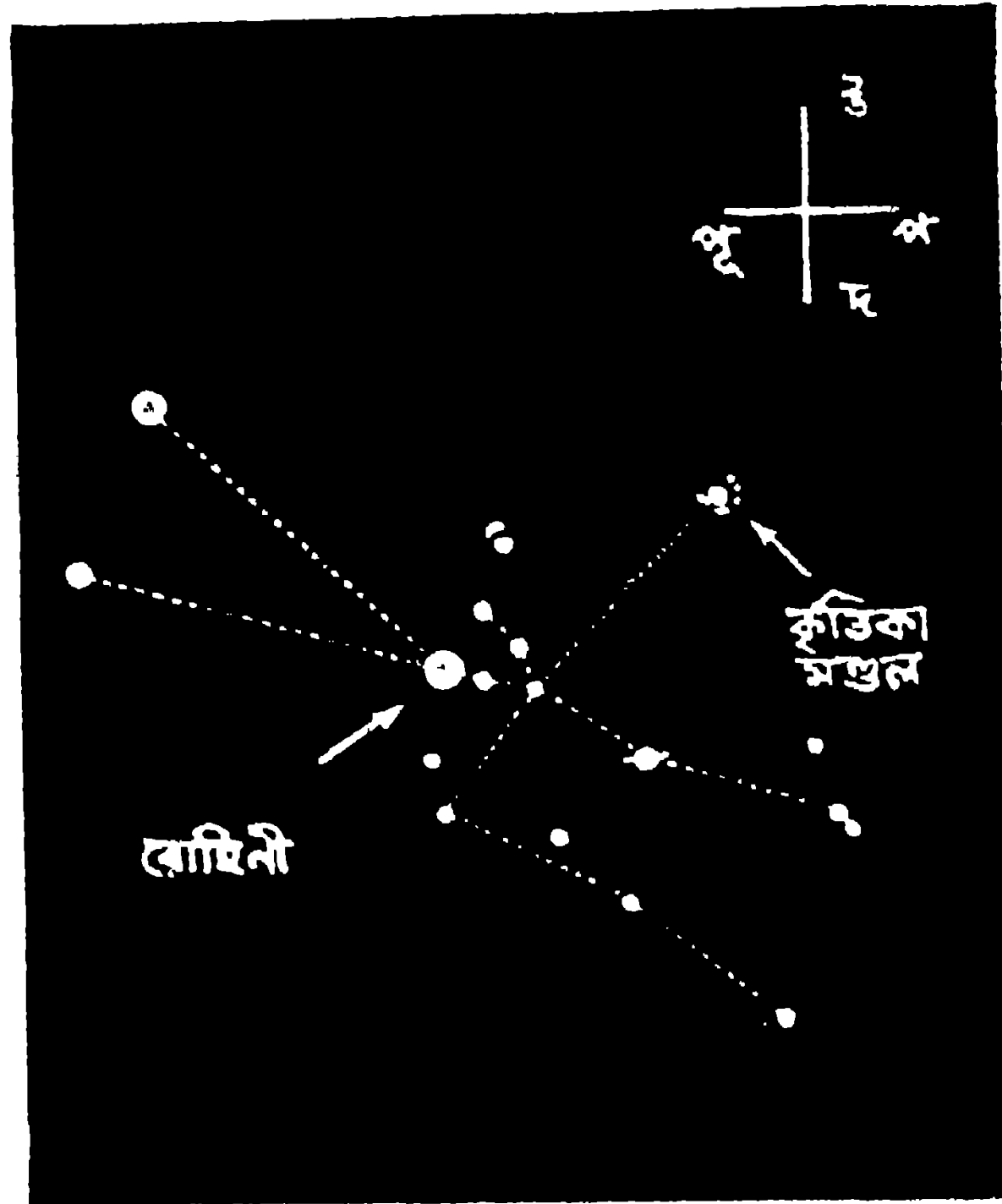
বৃষ রাশি

ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানে এই সপ্তর্ষিমণ্ডলটির বিশেষ গুরুত্ব আছে। এর পশ্চিম প্রান্তের দুটি তারা পুলহ ও ক্রতুকে যোগ করে উত্তর দিকে বর্ধিত করলে আমরা ধ্রুবতারাটিতে পৌছুবো। এই ধ্রুবতারাটি উত্তর দিক-নির্দেশ করে এবং প্রাচীন কালে সকলের কাছে ঐ তারাটিই ছিল দিক-নির্দেশক। তারাটি বিশেষ উজ্জ্বল নয়। পাছে ভুল হয়, এই কারণে সপ্তর্ষিমণ্ডলের পুলহ ও ক্রতুকে অবলম্বন করেই ধ্রুবতারাকে চিনবার পদ্ধতি প্রচলিত ছিল।

যাই হোক, সপ্তর্ষিমণ্ডলে যে সাতজন ঋষি আছেন, তাঁদের স্ত্রীদের কথায় আসা যাক। সপ্তর্ষির স্ত্রীদের নাম অনসূয়া, ক্ষমা, প্রীতি, অরুন্ধতী, শিবা এবং লজ্জা। এর মধ্যে অরুন্ধতী বশিষ্ঠের স্ত্রী। সপ্তর্ষিমণ্ডলের বশিষ্ঠের খুব কাছেই একটি অনুজ্জ্বল

তারা আছে, সেটিই বশিষ্ঠ-পত্নী অরুন্ধতী হিসাবে নির্দিষ্ট। অন্যান্য ঋষিদের কাছে কোন তারা নেই। ফলে সপ্তর্ষির অন্য ছয় ঋষির সঙ্গে তাঁদের পত্নীরা যুক্ত হন নি। তাহলে তাঁরা কোথায়? পৌরাণিকেরা তাঁদের কৃত্তিকামণ্ডলে প্রত্যক্ষযোগ্য ছয়টি তারায় নির্দিষ্ট রাখলেন। কিন্তু সে শুধু মুখের কথায় নয়। বক্তব্যকে কাহিনীযুক্ত করে তাঁরা তা নতুন ভাবে পরিবেশন করলেন।
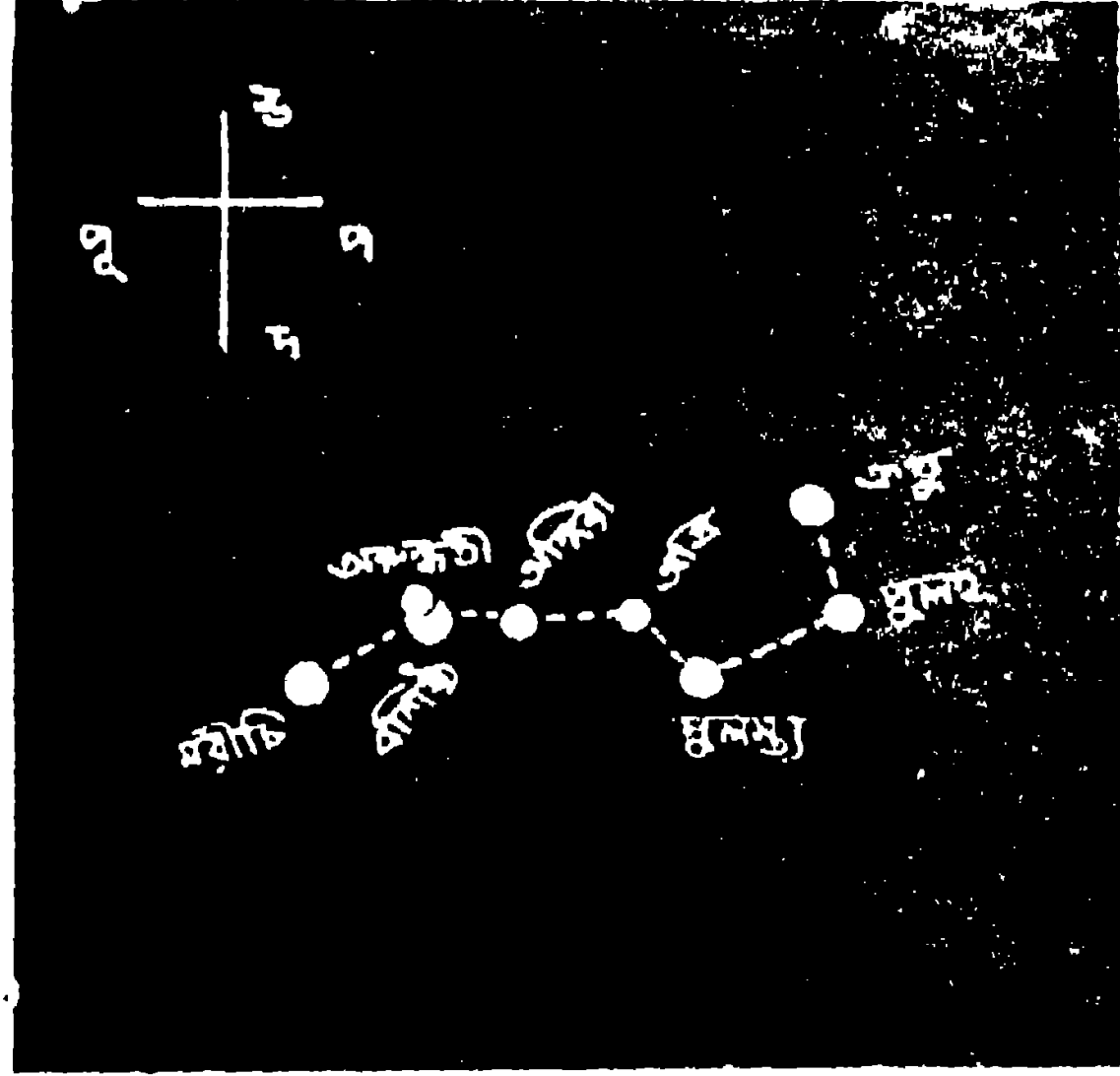
সপ্তর্ষিমণ্ডল

শাস্ত্রে আছে, অগ্নিদেব নিঃসঙ্গ—পরিবার-পরিজন কেউ নেই। হঠাৎ একদিন সপ্তর্ষির সাত পত্নীকে দেখে অগ্নিদেবের তাঁদের দাসী করবার বাসনা হলো। সেই মত প্রস্তাব—কিন্তু রাজী হলেন না ঋষি-পত্নীরা। সে বড় ভয়ানক অপমান। তখন লজ্জায় প্রাণত্যাগের জন্যে গভীর জঙ্গলে বসে অগ্নিদেব ধ্যান করতে লাগলেন।

দক্ষের কন্যা স্বাহা দেবী অগ্নিদেবের এই অবস্থা দেখে দয়াপরবশ হয়ে অঙ্গিরার স্ত্রী শিবার রূপ ধারণ করে অগ্নিদেবের কাছে এলেন। খুসী হলেন অগ্নিদেব, শিবাকে বিবাহ করলেন।

দিন কাটতে লাগলো। কিন্তু সপ্তর্ষির অন্যান্য স্ত্রীদের দাসী করবার ঝোঁক তাঁর গেল না। স্বাহা কি করেন। একে অঙ্গিরার স্ত্রী শিবার রূপ ধারণ করে তিনি অন্যায় করেছেন, আবার অন্য ঋষি-পত্নীদের রূপ ধারণ করতে তাঁর আগ্রহ হলো না। স্বাহা মনের দুঃখে পাখী হয়ে উড়ে গিয়ে এক পাহাড়ের চূড়ায় বাসা বাঁধলেন।

কিন্তু অগ্নিদেবকে ছেড়ে স্বাহার বেশী দিন থাকা হলো না। স্বাহা নেই, অগ্নিদেব অস্থির—দিশাহারা। সেই অবস্থা দেখে ফিরে এলেন স্বাহা। ছয় ঋষি-পত্নীর রূপ ধারণ করে তিনি অগ্নিদেবের মনস্তুষ্টি করতে লাগলেন। কিন্তু বশিষ্ঠ-পত্নী অরুন্ধতীর রূপ

তিনি গ্রহণ করতে পারলেন না। বশিষ্ঠ যেমন মহাজ্ঞানী ও তপস্বী ছিলেন, অরুন্ধতীও ছিলেন ঠিক সেই রকম মহাবিদুষী ও তাপসী। ফলে অরুন্ধতীর রূপ ধারণ করতে তিনি সাহস পেলেন না।

সময় এগিয়ে চললো। স্বাহা একটি পুত্রের মা হলেন। অদ্ভুত দেখতে ছেলেটি। ছেলেটিকে কিন্তু তিনি অগ্নিদেবের কাছে রাখলেন না। যে পাহাড়ে স্বাহা পাখী হয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন, সেই পাহাড়ের একটি গুহায় ছেলেটি বড় হতে লাগলো।

এদিকে মহা হুলুস্থুল। সপ্তর্ষির ছয় ঋষি শুনতে পেলেন যে, তাঁদের স্ত্রীরা অগ্নিদেবের দাসীপনা করছেন। রুষ্ট হলেন ঋষিরা। আর রক্ষা নেই। তাঁরা স্ত্রীদের ভৎর্সনা করলেন আর সেই সঙ্গে বহিষ্কার।

অসহায় ঋষি-পত্নীরা নিরাশ্রয় হয়ে স্বাহার পুত্র স্কন্দের কাছে এসে সব বললেন। স্কন্দ বললো, চিন্তার কি আছে? ঐ উদার মহাকাশ আপনাদের আশ্রয়স্থল। আপনারা সমবেতভাবে ওখানে আশ্রয় নিন।

উদার মহাকাশ ভারতীয় পুরাণের বিবিধ আখ্যান-উপাখ্যানের অনেক অবলম্বনেরই আশ্রয়স্থল। কিন্তু আজ আমাদের অবহেলায় সেগুলির মহাকাশে তারা ছাড়া অন্য কোন পরিচয় নেই।

[মহাকাশে তারকাচিত্র লক্ষ্য করবার সময়ে মনে রেখ, তারকাচিত্রকে নিম্নাভিমুখী করে মাথার উপরে ধরে উত্তর-দক্ষিণ, পূর্ব-পশ্চিমকে সঠিকভাবে মিলিয়ে নিতে হবে।]

অরূপরতন ভট্টাচার্য

জানবার কথা

তোমরা মাঝে মাঝে সংবাদপত্রে বিভিন্ন দেশের প্রচণ্ড ঝড়ের খবর পড়ে থাকবে। কিন্তু পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা প্রচণ্ড ঝড়ের খবর জান কি? বিজ্ঞানীদের মতে—1934 সালের এপ্রিল মাসে আমেরিকায় প্রবাহিত ঝড়ই নাকি সবচেয়ে প্রচণ্ড হয়েছিল। সেই সময় বাতাসের গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় 231 মাইল। বিজ্ঞানীরা আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনের পর্বতশীর্ষে এই ঝড় সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ করেন।

* * * *

তোমাদের যদি প্রশ্ন করা হয়—পৃথিবীর মধ্যে সর্বোচ্চ পর্বত কোন্‌টি? সবাই একবাক্যে বলবে—হিমালয় (এর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ মাউণ্ট এভারেষ্টের সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে উচ্চতা হলো 29.028 ফুট)। কিন্তু জেনে রাখ—হাওয়াইয়ের মউনাকেয়া নামক পর্বতের উচ্চতা হচ্ছে 30,785 ফুট। এর মধ্যে 17,000 ফুট অবশ্য সমুদ্রের নীচে অবস্থিত।

চিকিৎসায় ইলেকট্রনিক্স

চিকিৎসা বলতে সাধারণতঃ যা আমাদের মনে আসে, তা হলো শিশিভর্তি মিক্সচার বা ওষুধের বড়ি, যন্ত্রপাতির মধ্যে ষ্টেথিস্কোপ বা ইঞ্জেকশনের সিরিঞ্জ। আর ইলেকট্রনিক্স বলতে আমরা বুঝি রেডিও, টেলিভিসন, কম্পিউটার ইত্যাদি—যাতে ইলেকট্রনিক ভাল্‌ব', ট্রানজিষ্টর বা ঐ জাতীয় সব উপাদান ব্যবহার করা হয়। তাহলে চিকিৎসার সঙ্গে ইলেকট্রনিক্সের সম্পর্ক কোথায়?

চিকিৎসার ক্ষেত্রে ইলেকট্রনিক্সের একটা ব্যবহারের কথা অবশ্য আমরা অনেক দিন থেকেই জানি। দেহের কোন ভিতরের অংশের—যেমন, কোন হাড় বা ফুস্‌ফুসের ছবি তোলবার জন্যে যখন র‍্যাণ্টগেন রশ্মি প্রয়োগ করা হয়, তখন সেই রশ্মি উৎপাদনের জন্যে ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতির সাহায্য নেওয়া হয়ে থাকে। তবে প্রধানতঃ যে কারণে সম্প্রতি চিকিৎসায় ইলেকট্রনিক্সের প্রভূত প্রয়োগ হচ্ছে, তার মূলে রয়েছে মরা ব্যাং নিয়ে এক ধরণের মজার পরীক্ষা।

গ্যালভানির পরীক্ষা ও জৈব বিদ্যুৎ

সে প্রায় দু-শ' বছর আগেকার কথা। ইতালির লুইজি গ্যালভানি এক মেঘলা দিনে একটি সদ্যমৃত ব্যাঙের দেহ ব্যবচ্ছেদ করে তাই নিয়ে এক অদ্ভুত পরীক্ষা দেখিয়ে তাঁর বন্ধুবান্ধবদের একেবারে অবাক করে দিয়েছিলেন। বজ্রপাত থেকে তাঁর বাড়িকে রক্ষা করবার জন্যে বাড়ির ছাদে যে লৌহদণ্ড খাড়া করা ছিল, তাতে একটা তার বেঁধে তিনি সেই তারের অন্য প্রান্তে বাঁধলেন মরা ব্যাংটির মাথার দিকে; আর একটি তার ব্যাঙের এক পায়ে বেঁধে সেই তারের অপর প্রান্ত রাখলেন তাঁর বাড়ির কুয়ার জলের ভিতর। এরপর যখনই কাছাকাছি বজ্রপাত হচ্ছিল, তখন দেখা যাচ্ছিল—ব্যাঙের দেহটি সজোরে নড়েচড়ে উঠছে। অনেকেই একে ভৌতিক কাণ্ড বলে মনে করলেন। কিন্তু গ্যালভানি আসল ব্যাপারটা বুঝেছিলেন। বজ্রপাতের সময় বিদ্যুতের একটা অংশ ছাদের লোহদণ্ডে ধরা পড়ছিল এবং তখন ব্যাঙের দেহের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎপ্রবাহ চালিত হচ্ছিল। মরা ব্যাঙকে নাচানো যে বিদ্যুতেরই কারসাজি, তা গ্যালভানি আন্দাজ করেছিলেন।

গ্যালভানি এই ধরণের আরও পরীক্ষা করেছিলেন। তাঁর পরীক্ষা থেকে জানা যায় যে, বিদ্যুতের ক্রিয়ায় দেহের পেশী ও স্নায়ুতে গতির সঞ্চার হয়। তাই যদি হয়, তাহলে জীবন্ত প্রাণীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চালনার মূলেও কি বিদ্যুৎ রয়েছে? ক্রমে জানা গেল, ধারণাটা ঠিকই—প্রাণীর বোধশক্তির কেন্দ্র যে মস্তিষ্ক, সেখানে সব

খবর জানিয়ে দেওয়া এবং সেখান থেকে দেহের বিভিন্ন অংশে কাজ করবার আদেশ পৌঁছে দেবার ব্যাপারে বিদ্যুৎপ্রবাহই দূতের কাজ করে। দেহের প্রত্যেকটি পেশী বা স্নায়ু হাজার হাজার জীবকোষের সমন্বয়ে গঠিত। প্রতিটি কোষের চারধারে একটি অত্যন্ত পাত্‌লা ঝিল্লীর (Membrane) আবরণ থাকে। দেহের মধ্যে নানারকম রাসায়নিক প্রক্রিয়া ও সেই সঙ্গে ঐ ঝিল্লীর বিশেষ ধর্মের ফলে ঝিল্লীর ভিতরে ও বাইরের অংশের মধ্যে বৈদ্যুতিক বিভব-বৈষম্যের উৎপত্তি হয়। এই বিভব-বৈষম্য থেকে কিভাবে বিদ্যুৎপ্রবাহের সৃষ্টি হয় এবং সেই বিদ্যুৎপ্রবাহ কেমন ভাবে দেহের মধ্যে কাজ করে, একটি উদাহরণ দিলে তা বোঝা যাবে। ধরা যাক, শ্যামের পায়ে রাম একটা চিমটি কাটলো। শ্যামের পায়ের ঐ অংশের স্নায়ুকোষগুলির ভিতর ও বাইরের মধ্যে যে বিভব-বৈষম্য, তার তখন পরিবর্তন ঘটলো এবং সে জন্যে বিদ্যুৎপ্রবাহ উৎপন্ন হলো। অতঃপর ঐ সব কোষের পার্শ্ববর্তী কোষগুলিরও ভিতর ও বাইরের বিভব-বৈষম্যের পরিবর্তন হয়ে সেগুলির মধ্য দিয়েও বিদ্যুৎপ্রবাহ চালিত হলো। এইভাবে বিদ্যুৎপ্রবাহ শেষ পর্যন্ত মস্তিষ্কে গিয়ে পৌঁছুলো এবং তখনই কেবল চিমটির অনুভূতি শ্যামের বোধগম্য হলো। অতঃপর শ্যামের মস্তিষ্ক যদি মনে করে যে, তার ডান হাত দিয়ে পায়ে একটু হাত বুলিয়ে নিলে ভাল হয়, তাহলে বিদ্যুৎপ্রবাহ মারফৎ মস্তিষ্কের আদেশ গিয়ে পৌঁছুবে ডান হাতের এমন সব স্নায়ুতে, যাদের সক্রিয়তায় ডান হাতটি পায়ে হাত বুলোতে থাকবে।

জৈব বিদ্যুৎ ও রোগ-নির্ণয়

প্রাণিদেহে নিরন্তর হৃৎস্পন্দন হচ্ছে। এর ফলে বিদ্যুৎপ্রবাহ চলাচলের মাধ্যমে দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে অনবরত বিদ্যুৎতরঙ্গের সৃষ্টি হয়। কোন লোকের হাতের কব্জি বা পায়ের গোড়ালিতে ছোট ছোট ধাতব পাত্‌ রাখলে সেগুলি তড়িদ্দ্বার হিসাবে কাজ করে এবং তাদের সাহায্যে ঐ বিদ্যুৎতরঙ্গ অনুযায়ী সঙ্কেত পাওয়া যায়। যে যন্ত্রে এই সঙ্কেত লিপিবদ্ধ করা হয়, তার নাম ইলেকট্রোকার্ডিয়োগ্রাফ (Electrocardiograph)। তড়িদ্দ্বার থেকে পাওয়া সঙ্কেত ঐ যন্ত্রে ইলেকট্রনিক অ্যাম্প্লিফায়ারের সাহায্যে পরিবর্ধিত করে সেই পরিবর্ধিত সঙ্কেতের দ্বারা একটি বিশেষ কলমের গতি নিয়ন্ত্রিত করা হয়। আবার যন্ত্রটির এক বিশেষ ব্যবস্থায়—একটি কাগজের বাণ্ডিল থেকে ক্রমাগতই কাগজ বেরিয়ে এসে ঐ কলমের মুখের ঠিক তলা দিয়ে সমান গতিতে সরে যেতে থাকে। এই ব্যবস্থায় ঐ কাগজের উপর যে রেখাচিত্র অঙ্কিত হতে থাকে, তা কলমের গতির উপর নির্ভর করে। আবার ঐ কলমের গতি নির্ভর করে বৈদ্যুতিক সঙ্কেতের উপর—যে সঙ্কেত উৎপন্ন হয়েছে হৃৎস্পন্দনজনিত বিদ্যুৎতরঙ্গ অনুযায়ী। সুতরাং রেখাচিত্রটি ঐ তরঙ্গের প্রকৃতি নির্দেশ করে। এই চিত্রকে বলা হয় ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রাম

(Electrocardiogram)—সংক্ষেপে ECG বা EKG। হৃৎপিণ্ড সুস্থ থাকলে ECG-এর প্রকৃতি একটি নির্দিষ্ট ধরণের হয়। কোন হৃদ্‌রোগ থাকলে ECG-এর প্রকৃতি পরিবর্তিত হয়ে যায়। ECG দেখে চিকিৎসক বুঝতে পারেন, হৃৎপিণ্ডের কোন রোগ আছে কি না। কোন রোগ থাকলে ECG পরীক্ষা করে চিকিৎসক বহু ক্ষেত্রেই রোগটি নির্ণয় করতে পারেন।

আমাদের মস্তিষ্কের বিদ্যুৎতরঙ্গ লিপিবদ্ধ করবার জন্যে যে যন্ত্র ব্যবহার করা হয়, তার নাম ইলেকট্রোএনসেফালোগ্রাফ (Electroencephalograph)। এই যন্ত্র থেকে যে রেখাচিত্র পাওয়া যায়, তাকে বলা হয় ইলেকট্রোএনসেফালোগ্রাম (Electroencephalogram)—সংক্ষেপে EEG। স্নায়বিক রোগ নির্ধারণে EEG-এর বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। আমাদের পেশী, চোখ বা চোখের রেটিনায় বিদ্যুৎতরঙ্গ লিপিবদ্ধ করবার জন্যেও পৃথক পৃথক যন্ত্র নির্মিত হয়েছে।

অস্ত্রোপচারের ক্ষেত্রে ইলেকট্রনিক্স

আমাদের দেহের ভিতরের বিদ্যুৎতরঙ্গ ইত্যাদি পরীক্ষা করে দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অবস্থা বুঝতে পারা যায়। যখন কোন গুরুতর অস্ত্রচিকিৎসা চলতে থাকে, তখন দেহের আভ্যন্তরীণ অবস্থা চিকিৎসকের সব সময়েই জানা দরকার। এই ব্যাপারে ইলেকট্রনিক্স তাঁকে যথেষ্ট সাহায্য করে। এর একটি চমকপ্রদ দৃষ্টান্তের কথা বলি। হৃৎপিণ্ড উন্মুক্ত করে যখন অস্ত্রোপচার করা হয়, তখন রোগীর দেহের অবস্থা ক্রমাগত নির্ধারণ করবার জন্যে উন্নত চিকিৎসা-পদ্ধতিতে যে যন্ত্র ব্যবহার করা হচ্ছে, তাতে রোগীর হৃৎপিণ্ডের গতি, রক্তের চাপ প্রভৃতি চব্বিশটি বিভিন্ন বিষয় একই সঙ্গে নির্ণয় করা হতে থাকে। টেপ-রেকর্ডারে যে টেপ বা ফিতা ব্যবহার করা হয়, সেই রকম ফিতায় ঐ সব তথ্য সঞ্চিত হতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে সংখ্যার মাধ্যমে কতকগুলি বোর্ডের উপর সেগুলি প্রদর্শিত হয়। চিকিৎসক ঐ বোর্ডগুলির দিকে একবার তাকিয়েই রোগীর দেহের আভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্যক জানতে পারেন। প্রতি আধ সেকেণ্ড অন্তর অন্তর বোর্ডের সংখ্যাগুলি পাল্টে যেতে থাকে। ফলে রোগীর অবস্থার যদি কোন পরিবর্তন হয়, তা প্রায় তখনই চিকিৎসকের নজরে পড়ে। এছাড়া রোগীর হৃৎস্পন্দনের শব্দ পরিবর্ধিত করে চিকিৎসককে শোনাবার ব্যবস্থা থাকে। কোন সময় যদি ঐ শব্দ অস্বাভাবিক বলে চিকিৎসকের মনে হয়, তিনি পাঁচ মিনিট আগেকার শব্দের সঙ্গে তখনই তা তুলনা করে দেখতে পারেন। যে ফিতার উপর ঐ শব্দের সঙ্কেত ধরা থাকছে, সেটির পাঁচ মিনিট আগেকার অংশ আবার বাজালেই পাঁচ মিনিট আগের শব্দ তিনি এখন ফের শুনতে পাবেন। অস্ত্রোপচারের বিভিন্ন পর্যায়ে রোগীর অবস্থা কেমন থাকছে এবং সেই

অনুযায়ী চিকিৎসার কোন হেরফের করতে হবে কি না, চিকিৎসক এইভাবে যন্ত্রের সাহায্যে তা বুঝতে পারেন। কঠিন অস্ত্রোপচারের সময় চিকিৎসকের সহকারী হিসাবে ঐ যন্ত্রের গুরুত্ব তাই অপরিসীম।

হৃৎপিণ্ডের উপর অস্ত্রোপচারের ক্ষেত্রে অনেক সময় স্বাভাবিক হৃৎপিণ্ড ও ফুস্‌ফুসকে অচল করে তার পরিবর্তে 'হার্ট-লাং' যন্ত্র (533 পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) নামে একটি অত্যাশ্চর্য যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। অস্ত্রোপচার চলবার সময় এই যন্ত্রটি দেহের বাইরে থেকেই হৃৎপিণ্ড ও ফুস্‌ফুসের কাজ সঠিকভাবে করে যায়। এই যন্ত্রের জন্মে যে নিখুঁত নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা দরকার, তা সম্ভব হয়েছে ইলেকট্রনিক্সের যথাযথ প্রয়োগে।

বিবিধ

কোন রোগীর হৃৎপিণ্ডের অবস্থা খুবই আশঙ্কাজনক হলে ক্রমাগত সেই অবস্থা নির্ধারণ করবার জন্মে ইলেকট্রনিক যন্ত্রের সাহায্যে স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা থাকে। যদি অবস্থা গুরুতর হয়, তাহলে তা তৎক্ষণাৎ চিকিৎসককে জানাবার জন্মে যান্ত্রিক ব্যবস্থাতেই একটি ঘণ্টা বাজতে থাকে বা একটি আলো জ্বলে ওঠে।

হৃদ্‌রোগের ফলে যদি কোন রোগীর হৃৎপিণ্ডের স্বাভাবিক স্পন্দন ব্যাহত হতে থাকে, তবে সেটা তার দেহের পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকারক। এরকম রোগীর জন্মে ক্ষুদ্র হৃৎস্পন্দন-সহায়ক যন্ত্র (পৃঃ 619) নির্মিত হয়েছে। সামান্য অস্ত্রোপচার করে এই ইলেকট্রনিক যন্ত্রটিকে বক্ষচর্মের নীচে বসিয়ে তার দিয়ে একে হৃৎপিণ্ডের সঙ্গে সংযুক্ত করে রাখা হয়। ব্যাটারী-চালিত এই যন্ত্রটি বৈদ্যুতিক শক্তি দিয়ে হৃৎপিণ্ডকে তার স্বাভাবিক স্পন্দন বজায় রাখতে সাহায্য করে। এই রকম যন্ত্রের ব্যবহার এখন প্রতি বছর কয়েক হাজার করে বাড়ছে।

যাঁরা কানে কম শোনেন, তাঁদের জন্মে এমন ইলেকট্রনিক যন্ত্র প্রস্তুত হয়েছে, যা আকারে ক্ষুদ্র হলেও শব্দকে যথেষ্ট পরিবর্ধিত করে তাঁদের শুনতে সাহায্য করে। যাঁদের কোন অঙ্গহানির ফলে কৃত্রিম অঙ্গ ব্যবহার করতে হয়, তাঁদের ঐ অঙ্গের সঞ্চালন নিয়ন্ত্রিত হয় ইলেকট্রনিক ব্যবস্থায়।

দেহের মধ্যে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গহ্বর আছে, তাদের কোনটির মধ্যে কোন ভাঙচুর ঘটেছে কি না বা ফোড়াজাতীয় কোন কিছুর উৎপত্তি হয়েছে কি না—দেহের বাইরে থেকেই এই সব নির্ণয় করবার জন্মে আজকাল শব্দোত্তর (Ultrasonic) তরঙ্গ ব্যবহার করা হয়। বিশেষতঃ মাথার মধ্যে ফোড়া হলে তা নির্ধারণ করবার পক্ষে এই তরঙ্গ অত্যন্ত উপযোগী। শব্দোত্তর তরঙ্গের প্রকৃতি সাধারণ শব্দ-তরঙ্গের মত, তবে এর কম্পনাঙ্ক অপেক্ষাকৃত বেশী। এই তরঙ্গ আমাদের দেহের মধ্যে সহজেই প্রবেশ

করতে পারে। শব্দোত্তর তরঙ্গের উৎপত্তি ও প্রয়োগের মূলে রয়েছে ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি।

ঐ যে মাথার মধ্যে ফোড়ার কথা বলা হলো, ওটা দেহের পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক হতে পারে। বর্তমানে ওর চিকিৎসা অপেক্ষাকৃত সহজ হয়েছে লেসার নামক

হৃৎস্পন্দন-সহায়ক যন্ত্র

এই ক্ষুদ্র ইলেকট্রনিক যন্ত্রটিকে রোগীর বক্ষচর্মের নীচে বসিয়ে তার দিয়ে একে হৃৎপিণ্ডের সঙ্গে সংযুক্ত করে রাখা হয়। বর্তমানে কেবল আমেরিকাতেই প্রায় 12,000 লোক এই যন্ত্র ব্যবহার করেন।

এক ধরণের যন্ত্রের সহায়তায়। লেসার থেকে যে শক্তিশালী আলোকরশ্মি পাওয়া যায়, তাকে মাথার মধ্যে পাঠিয়ে ফোড়া নষ্ট করে ফেলা সম্ভব হচ্ছে। তাছাড়া লেসার-রশ্মি প্রয়োগে চোখের রেটিনার ছিন্ন স্নায়ু জোড়া দেবার মত সূক্ষ্ম কাজও এখন করতে পারা যাচ্ছে।

রোগ নির্ণয়ের জন্যে নানারকম যন্ত্রপাতির কথা আগেই আলোচনা করা হয়েছে। ইলেকট্রনিক কম্পিউটার নামে যে যন্ত্র আছে, তা আবার অন্যভাবে চিকিৎসককে

রোগ নির্ণয়ে সাহায্য করে। কোন্ রোগে কি কি উপসর্গ দেখা দেয়, সেই বিষয়ে যত তথ্য জানা আছে, তা সব কম্পিউটারে সঞ্চিত করা থাকে। কোন রোগীর ক্ষেত্রে উপসর্গগুলি দেখে কম্পিউটারকে জানালে কম্পিউটার সেগুলিকে বিভিন্ন রোগের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে মিলিয়ে অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে সঠিক রোগটি নির্ণয় করে জানিয়ে দেয়। কোন কোন ক্ষেত্রে রোগ নির্ণয়ের জন্যে বহু বইপত্র ঘেঁটে চিকিৎসককে যে সময় ব্যয় করতে হয়, কম্পিউটারের সাহায্য পেলে তার আর দরকার হয় না।

কোন রোগীকে প্রয়োজনমত অচেতন করবার জন্যে ক্লোরোফর্ম ব্যবহারের কথা তোমরা বোধ হয় শুনেছ। এখন কিন্তু রোগীর মস্তিষ্কের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎপ্রবাহ পাঠিয়েও তাকে অচেতন করবার ব্যবস্থা হয়েছে। এতে রোগীর কোন রকম কষ্ট হয় না। ঐ বিদ্যুৎপ্রবাহ বন্ধ করে দিলেই আবার রোগীর চেতনা ফিরে আসে। যে যন্ত্রের সাহায্যে ঐ বিদ্যুৎপ্রবাহ পাঠানো হয়, তার নাম ইলেকট্রোঅ্যানাসথেসিয়া (Electroanaesthesia)। এই যন্ত্র আমাদের দেশেও বর্তমানে প্রস্তুত হচ্ছে।

বস্তুতঃ চিকিৎসার ক্ষেত্রে ইলেকট্রনিক্সের ব্যবহার এত বেড়ে গেছে যে, নানারকম ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি ছাড়া কোন আধুনিক হাসপাতালের কথা এখন প্রায় ভাবাই যায় না।

জয়ন্ত বসু*

---

*সাহা ইনষ্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স, কলিকাতা-9

নাইলনের জাল

নাইলন, টেরিলিন, ডেক্রনের নাম আজ সকলের মুখে। আমাদের নিত্য পরিধেয় জামা-প্যাণ্ট থেকে সুরু করে নানারকম সৌখিন দ্রব্যও আজকাল প্রস্তুত হচ্ছে এগুলি থেকে। তোমরা শুনলে অবাক হবে, সম্প্রতি নাইলন থেকে মাছ ধরবার সুতা ও জাল তৈরি হচ্ছে। অবশ্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে পাশ্চাত্য দেশে নাইলনকে মাছ ধরবার জাল তৈরির কাজে অল্পবিস্তর লাগানো হয়েছে।

এই নাইলন হচ্ছে পলিঅ্যামাইড গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত এক রকম রাসায়নিক তন্তু। প্রথমে এই তন্তুর নাম ছিল 'পলিমার 66'। এত প্রয়োজনীয় নাইলন কিন্তু হঠাৎ একদিনে আবিষ্কৃত হয় নি। এই নাইলন আবিষ্কারের কাজে যৌথভাবে অগ্রসর হয়েছিলেন আমেরিকা এবং যুক্তরাজ্যের বিজ্ঞানীরা। আমেরিকার অন্তর্গত New York থেকে NY এবং যুক্তরাজ্যের London-এর Lon মিলিয়ে NYLON শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে। বর্তমানে সৌখিন দ্রব্যের প্রস্তুতি ছাড়াও মাছ ধরবার জন্যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নাইলন তন্তুকে কাজে লাগানো হচ্ছে।

পরীক্ষা করে দেখা গেছে, মাছ ধরবার জন্যে যে সব সুতা ব্যবহৃত হয়, তার মধ্যে নাইলনের সুতাই সবচেয়ে শক্ত। শুধু তাই নয়, নাইলনের সুতাকে টানলে স্প্রিংয়ের মত লম্বায় বেড়ে যায় আর আয়তনেও কমে যায়। তাছাড়া নাইলনের সুতা ওজনেও খুব হাল্কা। তাই এই সুতা থেকে তৈরী জাল মাছ ধরবার ব্যাপারে খুবই উপযোগী। নাইলন সুতার ধারণশক্তি খুব বেশী, তবে এই ধারণশক্তি ঘনত্ব প্রতি 6 থেকে 7 গ্র্যামের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। নাইলনের সুতা নানারকম ধকল সহ্য করতেও সক্ষম। সমুদ্রের প্রচণ্ড স্রোত, তরঙ্গবিক্ষুব্ধ সমুদ্রের জলের মধ্যে মাছের লড়াই সহ্য করবার ক্ষমতাও আছে এই সুতার। উচ্চ প্রসারণ ক্ষমতার দরুণই নাইলনের সুতা এত গুণের অধিকারী। অথচ সাধারণ সুতাকে অল্প একটু টানলেই লম্বা হওয়া তো দূরের কথা, ছিঁড়ে যাবে। আবার অন্যান্য সুতার তুলনায় নাইলনের সুতা খুবই মসৃণ।

আগেই বলেছি, নাইলনের সুতা অন্যান্য সুতার চেয়ে অনেক হাল্কা, কারণ এর আপেক্ষিক গুরুত্ব 1·14। ফলে নাইলনের তৈরী বড় বড় জাল বয়ে নিয়ে যেতে জেলেদের কোন কষ্টই হয় না। অথচ সাধারণ সুতা দিয়ে ঐ আকারের জাল তৈরি হলে জালের আয়তন যেমন বড় হবে, তেমনি ভারীও হবে খুব। তবে নাইলনের জালের অসুবিধা হলো—এই জাল খুব আস্তে আস্তে জলে ডোবে আর জালটাকে জলে ছুড়ে দেবার পর নির্দিষ্ট জায়গায় সঠিকভাবে নাও পড়তে পারে। ফলে মাছ ধরায় দেরী হয়। তেমনি আবার সুবিধাও আছে। অন্যান্য সুতার চেয়ে নাইলন কম জল শোষণ করে। ফলে জালকে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় টেনে নিতে কম পরিশ্রম হয় ও জাল খুব তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায়।

নাইলনের সুতা অশেষ গুণের অধিকারী। এই সুতা খুব মসৃণ আর আকারেও বেশ সরু। তাই নাইলনের জাল দিয়ে মাছ ধরবার খুব সুবিধা, কারণ মাছ সহজে এই জালকে দেখতে পায় না। আর মসৃণতার জন্যে জালের কোথাও গেরো পড়লে একটু টান দিলেই খুলে যায়। নাইলনের তৈরী জাল খুব দীর্ঘস্থায়ী, অযত্নে বেশ বেশ কিছুদিন ফেলে রাখলেও সহজে নষ্ট হয় না। অথচ সাধারণ সুতার জাল সামান্য অযত্নেই অকেজো হয়ে পড়ে। নাইলনের জালের গায়ে কোন প্রলেপ দেবার প্রয়োজন হয় না। তীব্র সূর্যের আলোয় কিছুক্ষণ ফেলে রাখলেই নাইলনের জাল শুকিয়ে যায়। তবে বেশীক্ষণ রাখলে জাল নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

আমাদের দেশে মাছ ধরবার জন্যে নাইলনের জাল তৈরি করবার প্রচেষ্টা প্রাথমিক স্তরে সীমাবদ্ধ। বর্তমানে Central Institute of Fisheries Technology (C.I.F.T.) এই জালকে আরও উন্নত করে তোলবার জন্যে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন। আজকাল নাইলনকে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় কাজেও লাগানো হচ্ছে।

শ্রীহিল্লোল রায়

সৌরজগতে প্রাণের সন্ধানে

500 বছর আগেও বাসভূমি পৃথিবী সম্পর্কে মানুষের ধারণা পরিষ্কার ছিল না। প্রথমতঃ, পৃথিবীটা গোল বটে, তবে থালার মত না বলের মত? 230 খৃষ্টপূর্বাব্দে গ্রীক দার্শনিক অ্যারিষ্টারকাস পৃথিবী সূর্যের চারধারে ঘুরছে বললেও উল্টো ধারণাটাই চালু ছিল। কারণ সাধারণভাবে সূর্য, চন্দ্র নিয়ে সমস্ত আকাশটাই যেন পৃথিবীর চারধারে ঘুরছে বলে মনে হয়। তেমনি পৃথিবীর বাইরে মহাকাশ, তথা মহাবিশ্ব কত দূর বিস্তৃত, সে সম্পর্কেও ধারণা পরিষ্কার ছিল না।

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রায় সুরু থেকে গ্যালিলিও (1610 খৃষ্টাব্দে) যখন প্রথম স্বনির্মিত দূরবীন বা টেলিস্কোপ দিয়ে চাঁদকে দেখে বুঝতে পারলেন যে, চাঁদ যেন আসলে আর একটা ছোট পৃথিবী এবং বৃহস্পতি গ্রহের আবার চারটি চাঁদ আবিষ্কার করলেন। তখন থেকে আজ পর্যন্ত বিশাল মহাবিশ্ব এবং তার মধ্যে সৌরজগৎ ও পৃথিবী সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান বহু দূর এগিয়ে গেছে।

মহাবিশ্ব ও সৌরজগৎ

সূর্যের চারধারে উপবৃত্তাকারে ঘুরছে নয়টি গ্রহ—সূর্য থেকে যথাক্রমে বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, (এগুলি অপেক্ষাকৃত ছোট গ্রহ), তারপর বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস ও নেপচুন (এগুলি বেশ বড় আকারের গ্রহ) এবং সব শেষে প্লুটো—এটা আকারে আবার পৃথিবীর মত।

সূর্য আসলে একটি মাঝারি আকারের নক্ষত্রের মত। সূর্যের চেয়ে বড় এবং ছোট, নানা রকমের প্রায় দেড়-শ' কোটি নক্ষত্র নিয়ে একটি বিরাট তারকাজগৎ বা গ্যালাক্সি—একটি দ্বীপপুঞ্জের মত, যেটি নিজের চারধারে নিজে ঘুরছে।

আমাদের তারকাজগতের মত এই রকমের অগুণ্তি তারকাজগৎ ছড়িয়ে আছে, যাদের নিয়ে মহাবিশ্ব।

এই বিশাল মহাবিশ্ব সসীম কি অসীম, তা নিয়ে অবশ্য তর্কের মীমাংসা হয় নি। তবে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতায় অসীম বা অনন্ত বলতে বাধা নেই। তোমরা জান বোধ হয়, মহাকাশের দূরত্ব আলোর গতিবেগ দিয়ে মাপা হয়।

আলো দৌড়য় প্রতি সেকেণ্ডে 1,86,000 মাইল—সর্বাপেক্ষা দ্রুতগামী বস্তু, এত গতিবেগ আর কারোর নেই। আলো এক বছরে চলে যায় প্রায় 6×10^{12} মাইল বা ছয়ের পিঠে বারোটা শূন্য দিলে যে অঙ্কটা হয়, তত মাইল। একে বলা হয় এক আলোক-বছর।

মহাবিশ্বে আমরা 400 কোটি আলোক-বছর দূরেও নক্ষত্রমণ্ডলীর সন্ধান পেয়েছি; তার তুলনায় সূর্য থেকে পৃথিবীতে আলো আসতে সময় লাগে মাত্র 9 মিনিট (বা দূরত্ব 9 আলোক-মিনিট), সূর্য থেকে প্লুটোর দূরত্ব মাত্র 5 আলোক-ঘণ্টা। তাহলে 400 কোটি বছরের তুলনায় 5 ঘণ্টা যতটুকু মাত্র সময়, সমগ্র মহাবিশ্বের তুলনায় আমাদের সৌরজগৎ মাত্র ততটুকু।

প্রাণের বলয়

এখন প্রশ্ন উঠেছে, বিশেষ করে আজ যখন আমরা মহাকাশে সবে যাত্রা সুরু করেছি—এই বিশাল মহাবিশ্বে প্রাণ কি একমাত্র আমাদের এই ছোট্ট গ্রহ পৃথিবীতেই সৃষ্টি হয়েছে? প্রশ্নটির জবাব বৈজ্ঞানিক যুক্তি দিয়ে বিচার করা যেতে পারে।

প্রথমে দেখা যাক, প্রাণ সৃষ্টি কি করে সম্ভব? প্রাণ সৃষ্টির মূলে রয়েছে কার্বন
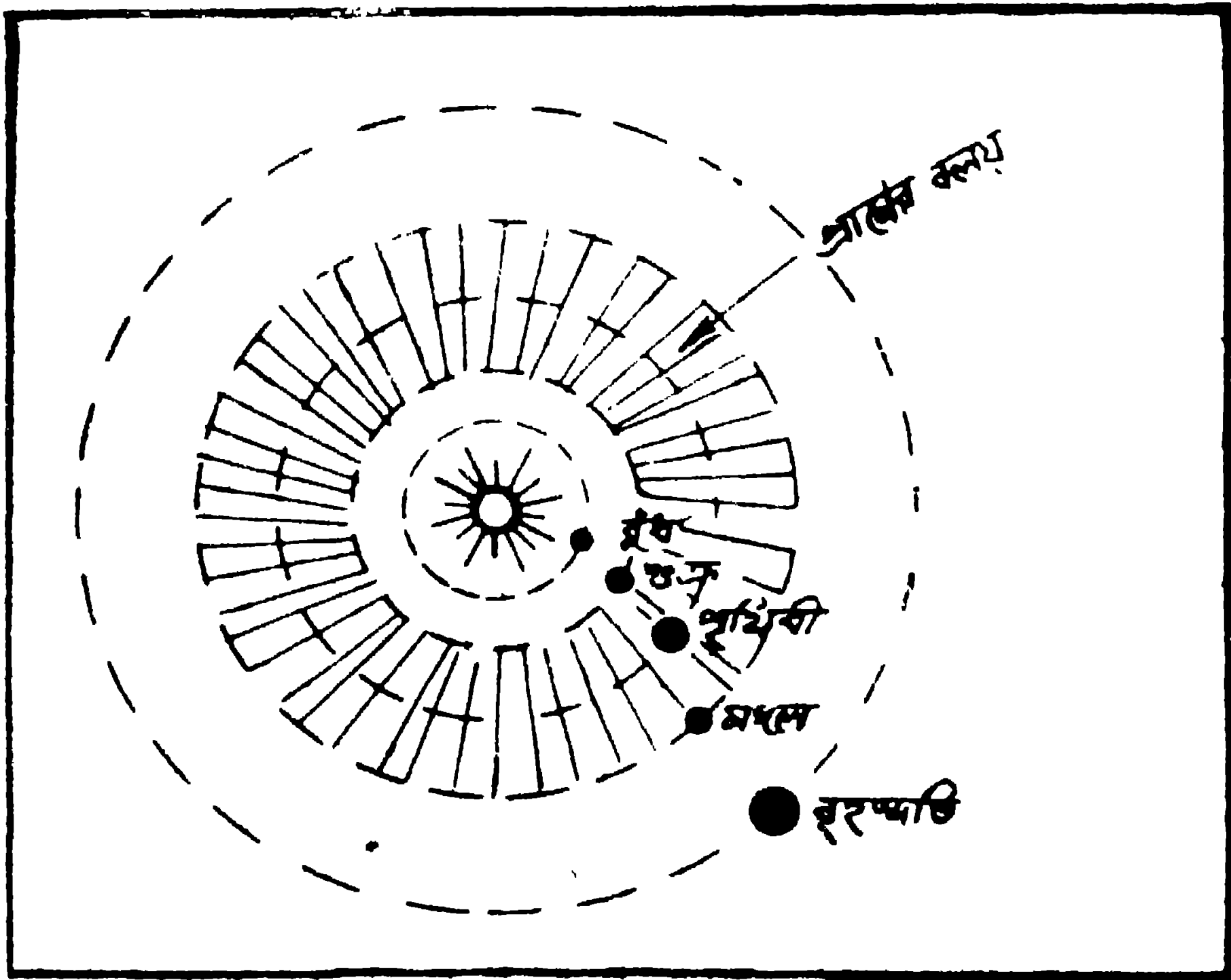
প্রাণের বলয়

সূর্য থেকে গ্রহগুলির গড় দূরত্ব: বুধ—3½ কোটি মাইল, শুক্র—6½ কোটি মাইল, পৃথিবী—9 কোটি 30 লক্ষ মাইল, মঙ্গল—14 কোটি মাইল, বৃহস্পতি—48 কোটি মাইল।

পদার্থের (Element) অন্যান্য পদার্থের সঙ্গে জোট বাঁধবার প্রায় অফুরন্ত ক্ষমতা। আর এই জোট বাঁধবার জন্যে প্রয়োজন একটা সমপরিমাণের তাপমাত্রা—খুব বেশী গরম বা ঠাণ্ডা, কোনটাই প্রাণসৃষ্টির পক্ষে অনুকূল নয়।

আচ্ছা, আমাদের সৌরজগতে তাপের উৎস নিশ্চয়ই সূর্য। তাহলে সূর্য থেকে কত

খানি দূরত্বে থাকলে কতটুকু তাপ পাওয়া যাবে, যাতে কার্বন পদার্থের জোট বেঁধে প্রাণসৃষ্টি সম্ভব, সেটা আমরা সহজেই হিসাব করতে পারি।

সূর্য থেকে সবচেয়ে কাছের গ্রহ বুধ রয়েছে 3½ কোটি মাইল দূরে (সব গড়-পড়তা হিসাব এখানে দেওয়া হচ্ছে)। খুবই গরম প্রাণসৃষ্টির পক্ষে। তারপর রয়েছে শুক্র 6½ কোটি মাইল দূরে, পৃথিবী 9 কোটি 30 লক্ষ আর মঙ্গল 14 কোটি মাইল দূরে। সূর্যের 6½ কোটি থেকে 14 কোটি মাইল দূরত্বে এই অঞ্চলটিই প্রাণসৃষ্টির পক্ষে উপযুক্ত তাপমাত্রা পেয়ে থাকে। এই এলাকাটিকে তাহলে আমরা সৌরজগতের 'প্রাণের বলয়' বা 'লাইফ বেল্ট' বলতে পারি। মঙ্গলের পরে 48 কোটি মাইলে বৃহস্পতি—খুবই ঠাণ্ডা, তার পরে পরে শনি, ইউরেনাস, নেপচুন ও প্লুটোর দূরত্বও অনেক বেশী এবং দারুণ ঠাণ্ডাও বটে।

পৃথিবীর দুই প্রতিবেশী

তাহলে আমরা দেখলুম 'প্রাণের বলয়' এলাকার এক প্রান্তে, সূর্য থেকে 6½ কোটি মাইল দূরে রয়েছে শুক্র, অন্য প্রান্তে 14 কোটি মাইল দূরে রয়েছে মঙ্গল; আর এই এলাকার একেবারে প্রায় মধ্যে বা কেন্দ্রে, সূর্য থেকে 9 কোটি 30 লক্ষ মাইল দূরে রয়েছে পৃথিবী। প্রাণের সৃষ্টি ও তার লীলার জন্যে পৃথিবী যে বিশেষ যোগ্যতম স্থানে রয়েছে, সেটা তাহলে বোঝা গেল।

এখন দেখা যাক, পৃথিবীর একদিকে শুক্র অন্যদিকে মঙ্গলে প্রাণসৃষ্টি হয়েছে কিনা?

শুক্র: এতদিন একটা চালু ধারণা ছিল যে, শুক্রে হয়তো প্রাণের প্রত্যূষ বা নাট্যলীলার সবে সুরু হয়েছে। কারণ, শুক্রগ্রহকে ঘিরে রয়েছে ঘন পুঞ্জ পুঞ্জ কার্বন ডাই-অক্সাইড ভর্তি মেঘ। এখন পৃথিবীতেও প্রাণের প্রত্যূষে অক্সিজেন মুক্ত অবস্থায় ছিল না, ছিল কার্বন ডাই-অক্সাইড। উদ্ভিদজাতীয় প্রাণ, তথা গাছপালা, অরণ্যানী যেমন যেমন গড়ে উঠেছে, তেমনি তারা কার্বন ডাই-অক্সাইডকে সূর্যালোকের সাহায্যে শুষে নিয়ে অক্সিজেন রূপে ফেরৎ দিয়েছে। প্রক্রিয়াটির নাম দেওয়া হয়েছে আলোক-সংশ্লেষণ (Photosynthesis)।

পৃথিবীর আকাশে বা বায়ুমণ্ডলে আজ যে শতকরা 21 ভাগ অক্সিজেন রয়েছে, সেটা তার জন্মের সুরু থেকেই ছিল না, পরে এসেছে—যেমন যেমন উদ্ভিদজাতীয় প্রাণের বিকাশ হয়েছে।

আবার এটাও ঠিক যে, আমরা পৃথিবীর 300 কোটির বেশী মানুষ যে পরিমাণ অক্সিজেন প্রশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করে নিঃশ্বাসের সঙ্গে কার্বন ডাই-অক্সাইডরূপে পরিত্যাগ করি, তাতে কিছুদিনের মধ্যে নিশ্চয়ই পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল আর অক্সিজেন না থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইডে ভর্তি হয়ে যাওয়া উচিত ছিল। হচ্ছে না, কারণ আমাদের

নিঃশ্বাসের সঙ্গে নির্গত কার্বন ডাই-অক্সাইডকে উদ্ভিদেরা গ্রহণ করে আবার অক্সিজেনরূপে ফেরৎ দিচ্ছে।

কাজেই শুক্রগ্রহের আকাশ বা বায়ুমণ্ডলে পুঞ্জ পুঞ্জ কার্বন ডাই-অক্সাইড ভর্তি মেঘ দেখে সেখানে প্রাণের নাট্যলীলায় প্রথম অঙ্ক সবে সুরু হয়েছে—এরকম ধারণা করা কিছু অযৌক্তিক ছিল না। মনে হয়েছিল যে, ঐ ঘন কার্বন ডাই-অক্সাইড মেঘের (যাকে ভেদ করে আমাদের টেলিস্কোপের দৃষ্টি চলে না) তলায় রয়েছে ঘন বাষ্পাকুল অরণ্যানী, হয়তো বা প্রাণের ক্রমবিবর্তনের সিঁড়ির আর এক ধাপ উপরে পৃথিবীর জুরাসিক যুগের অতিকায় প্রাণীরও উদ্ভব ইতিমধ্যেই হয়েছে।

মঙ্গল: মঙ্গলের আকাশ বেশ পরিষ্কার, অক্সিজেন নেই, তার জমির চেহারা লাল; বোঝা গেছে, মঙ্গলের জমিটা যেন মরচে-পড়া লাল (ফেরাস অক্সাইড)। আসলে মঙ্গলের আকাশ বা বায়ুমণ্ডলের অক্সিজেনকে শুষে নিয়েছে মঙ্গলের জমি, তাতেই মরচে-পড়া লাল রঙের চেহারা। প্রসঙ্গতঃ, মঙ্গলকে খালি চোখে দেখলেও মনে হবে যেন একটি মাঝারী আকারের লাল 'তারকা'র মত; অবশ্যই 'তারকা' নয়, গ্রহ—কারণ মঙ্গলের নিজের কোন আলো নিশ্চয়ই নেই।

যাই হোক, মরচে-পড়া গ্রহ মানে বুড়ো গ্রহ, অর্থাৎ মঙ্গলের প্রাণের নাট্যলীলায় পঞ্চম বা শেষ অঙ্ক আজ অভিনীত হচ্ছে। এটা আরো বোঝা যায়, যখন টেলিস্কোপে দেখি, মঙ্গলের গ্রীষ্মকালে তার মেরুপ্রদেশের বরফে ঢাকা সাদা টুপি আস্তে আস্তে মিলিয়ে যায় বা গলে যায় এবং একটা ধূসর রং মঙ্গলের বিষুবরেখার অঞ্চলকে ছেয়ে ফেলে।

অবশ্য এক সময়ে মঙ্গলের মেরুপ্রদেশ থেকে বিষুবরেখা অবধি দাগ টানা হয়েছে দেখে প্রথমে ইতালিয়ান সিয়াপেরেলি, পরে প্রফেসর লাওয়েল টমাস ভেবেছিলেন যে, ওগুলি বিরাট খালের দাগ। সিয়াপেরেলি 'খাল' বলতে বুঝিয়েছিলেন প্রকৃতির হাতে-গড়া খাল। লাওয়েল টমাস বলতে চেয়েছিলেন, না ওগুলি কৃত্রিম। মঙ্গলে জলের একান্ত অভাব বলে তার বুদ্ধিমান প্রাণীরা বিরাট খাল খনন করে মেরুপ্রদেশ থেকে বিষুবরেখা অবধি সারা মঙ্গলগ্রহের গোলক জুড়ে খাল খনন করে রেখেছে। আজকে অবশ্য এই চিত্তাকর্ষক মতটি বাতিল।

তথাপি মঙ্গলের গ্রীষ্মে তার বিষুবরেখাতে ধূসর রঙের বিস্তার দেখে সেখানে উদ্ভিদ রয়েছে, এটা আজ প্রায় প্রমাণিত হয়েছে।

গত দশ বছর আগেও পৃথিবীর এই দুই প্রতিবেশী সম্পর্কে চিত্রটি ছিল বেশ সুসংবদ্ধ। পৃথিবীতে প্রাণের মধ্যাহ্ন; তার একদিকে (সূর্যের দিকে) শুক্রে প্রাণের প্রত্যুষ, অন্যদিকে মঙ্গলে প্রাণের রাত্রি।

কিন্তু এখন মানুষের তৈরি স্বয়ংক্রিয় মহাকাশ যানগুলি শুক্রে পৌঁছে খবর পাঠিয়েছে, সেখানকার তাপমাত্রা প্রাণসৃষ্টির পক্ষে অত্যন্ত বেশী, 400° ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড

বা আরো বেশী। অতএব শুক্রে এখনও প্রাণের যবনিকার উত্তোলন হয় নি, এটাই বলতে হবে। তেমনি মঙ্গলের বায়ুমণ্ডলে মনে হচ্ছে ছিটেফোঁটাও নাইট্রোজেন নেই। তাহলে অবশ্য সেখানে কোনদিনই প্রাণসৃষ্টি হয় নি, এটাই বলতে হয়।

অবশ্যই এই দুয়েরই আবার পাল্টা নানা রকমের যুক্তি আছে, যার বিশদ আলোচনা করা এখানে সম্ভব নয়।

নক্ষত্রলোকের গ্রহান্তরে

একমাত্র পৃথিবীতেই কি তাহলে প্রাণসৃষ্টি হয়ে প্রাণের পূর্ণ বিকাশ হয়েছে? আমাদের সৌরজগতে হয়তো তাই, কিন্তু এই বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে, মহাকাশের প্রায় অনন্ত কোটি নক্ষত্রের মধ্যে অন্ততঃ কয়েক কোটি নক্ষত্রের (বা সূর্যের) চারধারে আমাদের মত 'সৌরজগৎ' বিরাজ করছে এবং তাহলে সেই কয়েক কোটি সৌরজগতে অন্ততঃ কয়েক লক্ষ 'পৃথিবীর' ধরণের গ্রহ পাওয়া যাবে। পৃথিবীর ধরণের বলতে আমরা বোঝাচ্ছি সেই সমস্ত গ্রহগুলিকে, যারা তাদের নিজ নিজ সূর্য (বা নক্ষত্র) থেকে ঠিক ততখানি দূরত্বে আছে, যাতে তারা তাদের 'প্রাণের বলয়ের' একেবারে মধ্যবর্তী অঞ্চলে রয়েছে। আর পৃথিবীর ধরণের গ্রহ থাকলে সেখানে প্রাণসৃষ্টি হয়েছে এবং ক্রমবিবর্তনের ধাপে ধাপে হয়তো পৃথিবীর মানুষের চেয়েও উন্নততর প্রাণীর সৃষ্টি ইতিমধ্যে হয়ে গেছে।

সমগ্র পৃথিবীর বয়স যেখানে সাড়ে চার-শ' কোটি বছর, প্রাণের জন্ম সেখানে দশ কোটি বছর অতীতে, আর মানুষের জন্ম তো মাত্র লাখ দশেক বছর আগে। তার মধ্যে আবার তার সভ্যতার বয়স খুব বেশী হলেও দশ হাজারের বেশী নয়। কাজেই পৃথিবীর মানুষের চেয়েও উন্নততর, তথা প্রাচীনতর সভ্য প্রাণী মহাকাশের অন্য নক্ষত্রের অন্য গ্রহে থাকা মোটেই বিচিত্র নয়। অবশ্য তাদের অস্তিত্বের কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমাদের হাতে নেই, তবে যুক্তির দিক থেকে আমাদের সেটা মেনে নিতে হচ্ছে। হয়তো একদিন প্রত্যক্ষ যোগাযোগও তাদের সঙ্গে আমাদের হবে।

দিলীপ বসু

ধাঁধা

1। যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগ ইত্যাদি বিভিন্ন চিহ্নের (Operators) সাহায্যে 3 সংখ্যাটিকে মাত্র তিনবার ব্যবহার করে কি ভাবে 0, 1, 2,……...10 পর্যন্ত প্রকাশ করা যায়? (উদাহরণ : $1=3^{\circ}\times3^{\circ}\times3^{\circ}$)।

2। এক বৃদ্ধের চার পুত্র। বৃদ্ধের মৃত্যুর পর অন্যান্য সমস্ত সম্পত্তিই বেশ নির্বিঘ্নে ভাগাভাগি হয়ে গেল, কিন্তু যত বিবাদ বাঁধলো, এক টুকরা জমি নিয়ে। জমিটার আকার এমনই যে, সমান চার ভাগে ভাগ করতে সকলেই বেশ হিমসিম খেয়ে গেল।
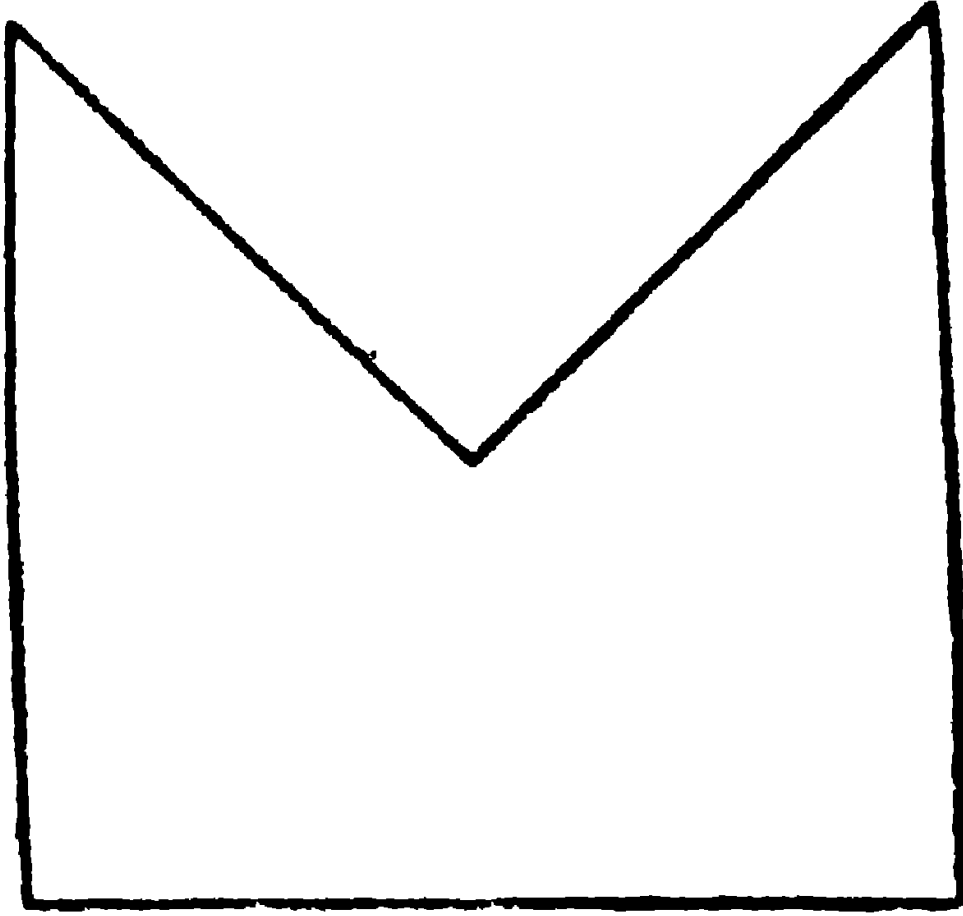
চেষ্টা করে দেখ না। সেই জমিটিকে (চিত্রে দ্রষ্টব্য) সমান চারভাগে ভাগ করে দিয়ে এই বিবাদের অবসান ঘটাতে পার কি না।

3। পরেশবাবু ব্যাঙ্কে গেলেন চেক ভাঙ্গাতে। ব্যাঙ্কের ক্যাসিয়ার বাবু বরাবরই একটু অন্যমনস্ক প্রকৃতির। তিনি ভুলবশতঃ পরেশবাবুর চেকটিতে টাকার অঙ্কটাকে পয়সা ও পয়সার অঙ্কটাকে টাকা হিসাবে ধরে গণ্ডগোল করে ফেললেন। আর সেই মত টাকাও দিয়ে ফেললেন পরেশবাবুকে। ফেরার পথে পরেশবাবু সেই টাকা থেকে শুধুমাত্র 20 পয়সা দিয়ে একটা খবরের কাগজ কিনলেন। বাড়ী ফিরে পরেশবাবু টাকা-পয়সা গুণে দেখেন যে, চেকে যে পরিমাণ অঙ্ক ছিল, ঠিক তার দ্বিগুণ অঙ্ক তাঁর কাছে রয়েছে।

চেকে প্রকৃত কি পরিমাণ অঙ্ক ছিল?

4। একটি নিরেট গোল কাঠের বলের মাঝখান থেকে ছয় ইঞ্চি লম্বা চোঙ্গাকৃতি (Cylindrical) একটি অংশ কেটে বের করে নেওয়া হলো। বলের অবশিষ্ট অংশের আয়তন কত হবে? আপাতদৃষ্টিতে যদিও তোমাদের মনে হতে পারে যে, প্রশ্নটি অসম্পূর্ণ বা প্রয়োজনীয় সব তথ্য দেওয়া নেই, তবুও এর সমাধান করা সম্ভব। চেষ্টা করে দেখ না! (উত্তর 629 পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)।

সমীরকুমার ঘোষ*

* পদার্থবিদ্যা বিভাগ, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন

মজার যন্ত্র

সাধারণ বিজ্ঞান-বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে আজকাল দর্শকদের নতুন নতুন জিনিষ দেখানো হচ্ছে বিজ্ঞান প্রদর্শনীর অন্যতম অঙ্গ। বর্তমানে ট্র্যানজিষ্টরের বহুল ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন বর্তনীর সাহায্যে অনেক চমকপ্রদ জিনিষ তৈরির প্রাচুর্য বেড়েই চলেছে। বিজ্ঞান প্রদর্শনীগুলিতে ট্র্যানজিষ্টরকে কাজে লাগিয়ে চোর-ধরা, কালো-ফরসার মান বিচার, প্রতিবেদন শক্তি পরীক্ষা ইত্যাদি বহু যন্ত্রের মডেল তৈরি করে দেখানো হয়। এই রকম একটা যন্ত্র সম্পর্কে এখানে আলোচনা করবো।

মাছ-ধরা যন্ত্র

বাঁশির সুরের প্রভাবে বিষধর সাপকে বশে এনে সাপুড়েদের খেলা দেখানোর সঙ্গে আমরা পরিচিত। তাছাড়াও রাখালদের বাঁশি বাজিয়ে গরুকে পোষ মানাবার উদাহরণ দেখে স্বভাবতঃই মনে হয় যে, জীব-জগতের উপর সুরের প্রভাব যথেষ্ট কার্যকরী। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, বিশেষ ধরণের শস্যের উদ্ভিদের উপর দিয়ে বিশেষ কম্পনাঙ্কের শব্দপ্রবাহ চালিত হলে শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। জলচর প্রাণীরাও পোকামাকড়ের শব্দে আকৃষ্ট হয়ে থাকে এবং এই শব্দ-সঙ্কেতকেই জলচর প্রাণীরা আহার সংগ্রহ বা প্রয়োজন অনুযায়ী আত্মরক্ষার কাজে লাগায়। কাজে
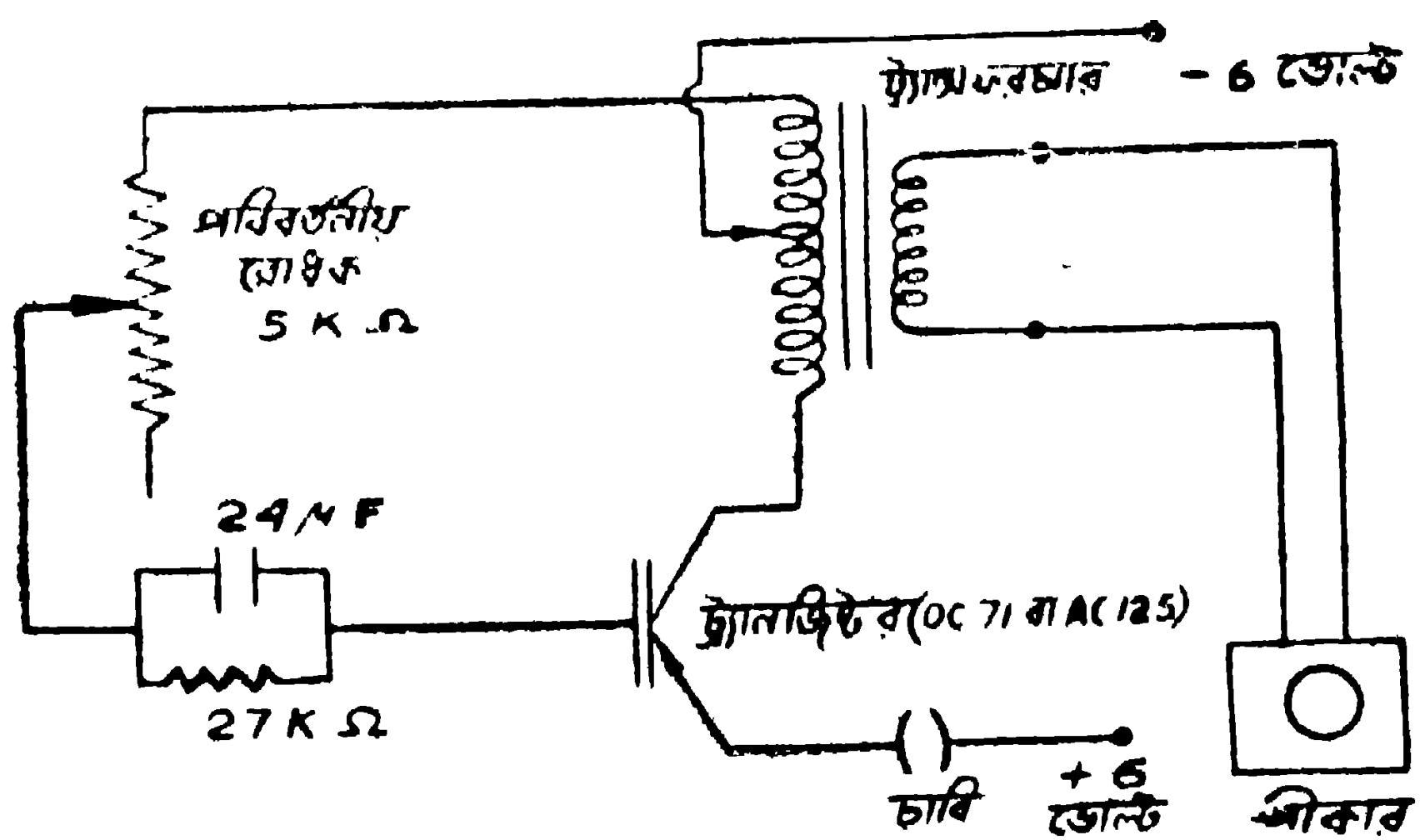
কাজেই বোঝা যাচ্ছে যে, মাছের ক্ষেত্রেও বিভিন্ন কম্পনাঙ্কের শ্রুতিগোচর শব্দ আছে, যার দ্বারা তারাও আকৃষ্ট হয়। সাধারণ ট্র্যানজিষ্টরকে বৈদ্যুতিক বর্তনীতে কাজে

লাগিয়ে আমরা এই জাতীয় ঘটনা প্রত্যক্ষ করতে পারি, হয়তো উপযুক্ত যন্ত্রপাতির সাহায্যে প্রকৃত মাছ ধরবার কাজেও প্রয়োগ করতে পারি।

যন্ত্রটি আসলে একটা সাধারণ শ্রুতিগোচর আন্দোলক (Audio Oscillator)। চিত্রে বর্তনীটি বিশদভাবে দেখানো হয়েছে। কণ্ডেন্সার, কুণ্ডলী, রোধক, তড়িৎ-কোষ ও একটা ট্র্যানজিষ্টরের (OC 71 বা AC 125) সাহায্যে এই শ্রুতিগোচর কম্পন সৃষ্টি করা যেতে পারে। চিত্রে প্রদর্শিত পরিবর্তনীয় রোধকের সাহায্যে কম্পন-সংখ্যা কমানো বা বাড়ানো যেতে পারে। এই কম্পন ট্র্যান্সফরমারের মধ্য দিয়ে পরিচালিত হয়ে স্পীকারে শ্রুতিগোচর শব্দ উৎপন্ন করে। এইবার এই যন্ত্রের সাহায্যে মজা উপভোগ করবার জন্যে একটি বড় পাত্রের মধ্যে স্বচ্ছ জলে বিভিন্ন প্রকার মাছ রেখে যদি স্পীকারটিকে পলিথিন কাগজে মুড়ে (যাতে জলে ভিজে না যায়) ঐ পাত্রে ডুবিয়ে রাখা হয়, তাহলে আন্দোলকের কম্পনাঙ্ক পরিবর্তন করলে দেখা যাবে যে, কোন বিশেষ কম্পনাঙ্কের দ্বারা কিছু মাছ আকৃষ্ট হচ্ছে। আবার কম্পনাঙ্কের পরিবর্তন করলে তারা দূরে চলে যাবে এবং অন্য জাতীয় মাছ শব্দের উৎসের দিকে আকৃষ্ট হবে। এথেকে বোঝা যায়, উৎস থেকে নির্গত বিভিন্ন কম্পনাঙ্কের শব্দ বিভিন্ন জাতের মাছকে আকর্ষণ করে। এই ব্যাপারটা খুব সহজেই পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে।

মহুয়া বিশ্বাস

ধাঁধার উত্তর

1। $0=3\times(3-3)$, $1=3^\circ\times3^\circ\times3^\circ$; $2=3-\frac{3}{3}$

$3=\frac{3\times3}{3}$ বা $3^\circ+3^\circ+3^\circ$; $4=3+\frac{3}{3}$; $5=3+3^\circ+3^\circ$

$6=3+\frac{3}{3^\circ}$; $7=3+3+3^\circ$; $8=3\times3-3^\circ$

$9=3+3+3$; $10=3\times3+3^\circ$।

2। জমিটি ভাগ করতে হবে (ক) চিত্র অনুযায়ী। (খ) চিত্র দেখলে জমি ভাগ করবার কৌশলটা বুঝতে পারবে।
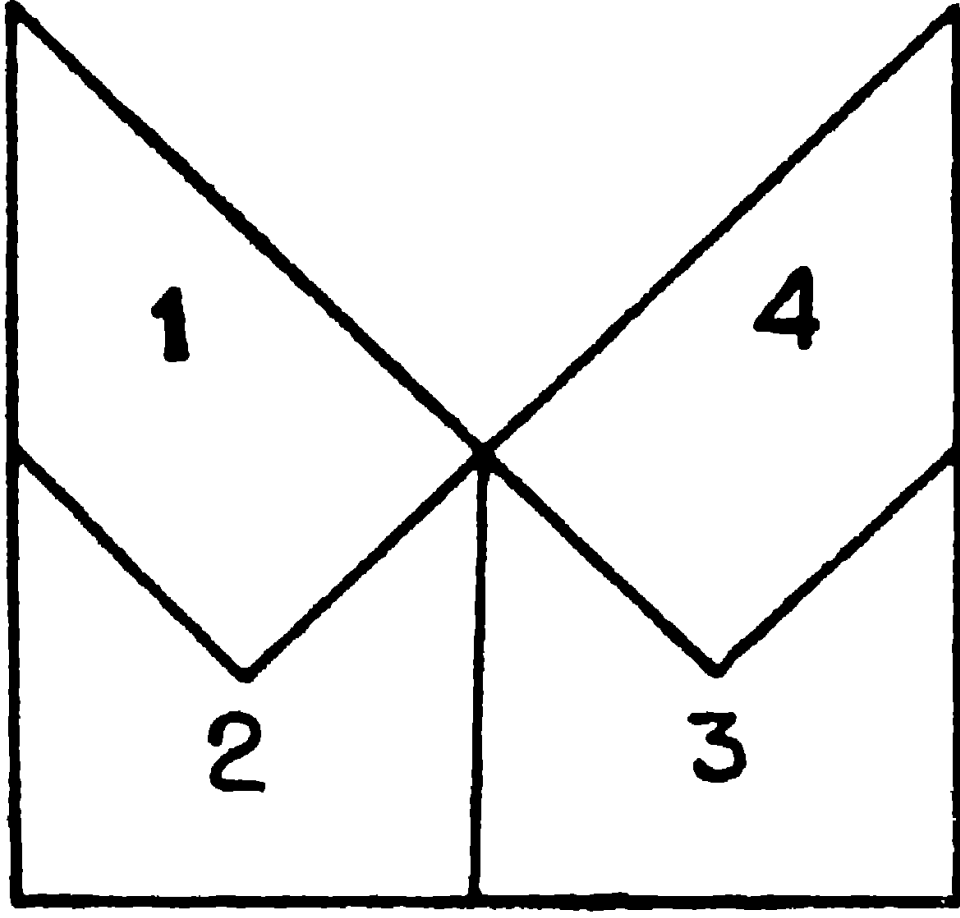
ক
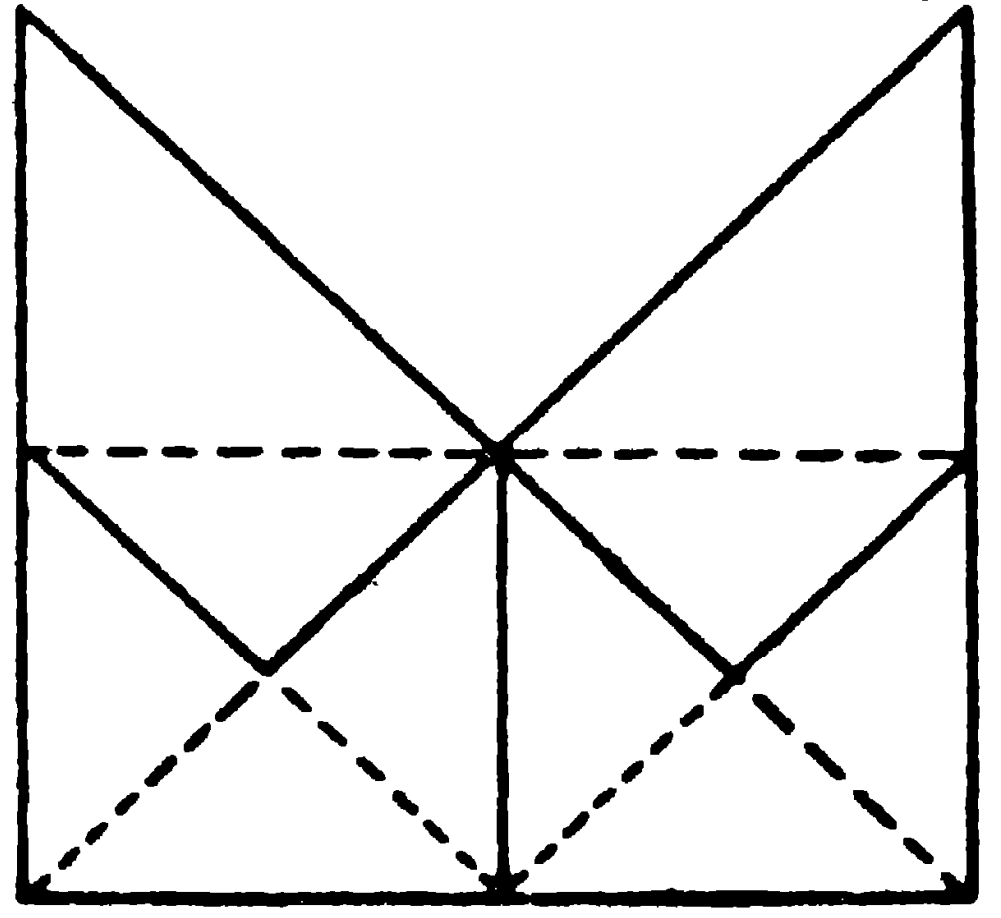
খ

3। চেকে প্রকৃত অঙ্কের পরিমাণ ছিল 26 টাকা 53 পয়সা। হিসাব করে দেখলেই এই অঙ্কটি বের করতে পারা যায়।

4। নীচের চিত্র অনুযায়ী চোঙ্গাকৃতি অংশের আয়তন $6\pi r^2 = 6\pi R^2 - 54\pi$। টুপির আকৃতির দুটি অংশের আয়তন $\frac{2\pi h}{6}(3r^2+h^2) = \frac{\pi}{3}(R-3)[3(R^2-9) + (R-3)^2] = \frac{4}{3}\pi R^3 - 6\pi R^2 + 18\pi$। সুতরাং চোঙ্গাকৃতি অংশ ও টুপির আকৃতির দুটি অংশের মোট আয়তন $\frac{4}{3}\pi R^3 - 36\pi$। বলের আয়তন $\frac{4}{3}\pi R^3$ থেকে এই আয়তন বাদ দিলে বলের অবশিষ্ট অংশের আয়তন হবে 36π, যেটা ধ্রুবক; অর্থাৎ এই অংশের আয়তন বলের আকার বা চোঙ্গার ব্যাসের উপর নির্ভর করবে না।
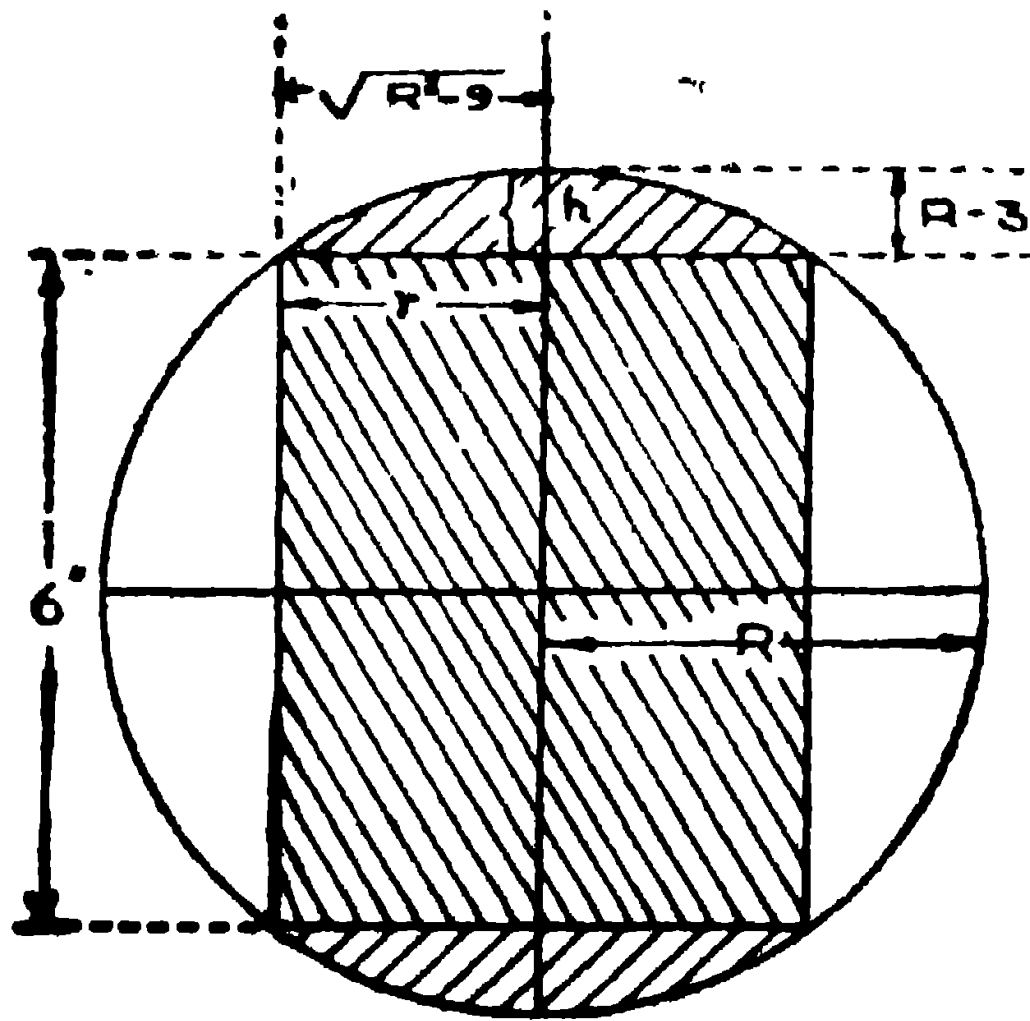
প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন 1. কৃত্রিম উপায়ে মৌলিক পদার্থের রূপান্তর ঘটে কি ভাবে ?

রেবা রায়, হাসনাবাদ।

প্রশ্ন 2. আকাশ কেন নীল দেখায় এবং সমুদ্রের জলই বা নীল দেখায় কেন ?

অভিজিৎ ভট্টাচার্য, ত্রিপুরা

উঃ 1. বস্তুজগতের মূলে রয়েছে পরমাণু। এই পরমাণুর কেন্দ্রে আছে কেন্দ্রীন, যার মধ্যে ধনাত্মক তড়িৎধর্মী প্রোটন ও তড়িৎ-নিরপেক্ষ নিউট্রন কণিকা অবস্থান করে। কেন্দ্রীনের বাইরে চারদিকে প্রোটনের সমান সংখ্যক কিন্তু বিপরীত অর্থাৎ ঋণাত্মক তড়িৎধর্মী ইলেকট্রন কণিকা বিভিন্ন কক্ষপথে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পরমাণুর প্রোটনের বা ইলেকট্রনের সংখ্যা পরমাণুর পারমাণবিক সংখ্যা নির্ধারণ করে। নিউট্রন ও প্রোটনের সম্মিলিত সংখ্যা হচ্ছে পরমাণুর ভর সংখ্যা।

যে কোন পরমাণুর বৈশিষ্ট্য নির্ধারিত হয় তার পারমাণবিক সংখ্যা দিয়ে। উদাহরণস্বরূপ নাইট্রোজেন ও অক্সিজেনের কথাই ধরা যাক। অক্সিজেন ও নাইট্রোজেনের পারমাণবিক সংখ্যা যথাক্রমে 8 ও 7। এখন বোঝা যাচ্ছে যে, যদি কোন উপায়ে নাইট্রোজেনের পারমাণবিক সংখ্যা 8 করা যায়, তাহলেই আমরা অক্সিজেন পরমাণু পেতে পারি। হিলিয়াম পরমাণুর কেন্দ্রে রয়েছে দুটি নিউট্রন ও দুটি প্রোটন এবং বাইরের কক্ষপথে আছে দুটি ইলেকট্রন। তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে আল্ফা কণিকা নির্গত হয়। এই আল্ফা কণিকা আর কিছুই নয়—হিলিয়াম কেন্দ্রীন অর্থাৎ একটা হিলিয়াম পরমাণু, যার বাইরের দুটি ইলেক্ট্রন খসিয়ে নেওয়া হয়েছে। রাদারফোর্ড প্রচণ্ড শক্তিবিশিষ্ট এই আল্ফা কণিকার সাহায্যে নাইট্রোজেন পরমাণুকে আঘাত করে অক্সিজেন পরমাণুতে পরিণত করতে সক্ষম হন। এই প্রক্রিয়ায় একটি প্রোটন কণিকা নির্গত হয়। প্রক্রিয়াটি সমীকরণের সাহায্যে নীচে দেখানো হলো :

$$ {}_7N^{14} + {}_2He^4 = {}_8O^{17} + {}_1H^1 $$

নাইট্রোজেন আল্ফা কণিকা অক্সিজেন প্রোটন কণিকা
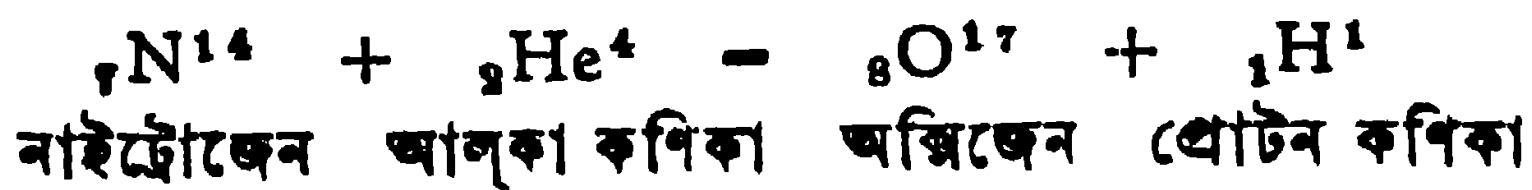
এইভাবে কৃত্রিম উপায়ে আল্ফা কণিকার সাহায্যে বোরন, সোডিয়াম, অ্যালুমিনিয়াম প্রভৃতির রূপান্তর ঘটানো সম্ভব হয়েছে। ক্রমান্বয়ে বিজ্ঞানীদের অক্লান্ত গবেষণায় আবিষ্কার হলো আরও অনেক কণিকা (প্রোটন, নিউট্রন, ডয়টেরিয়াম, গামা-রশ্মি

ইত্যাদি), যেগুলির দ্বারা পরমাণুকে আঘাত করে মৌলিক পদার্থের রূপান্তর ঘটানো সম্ভব বলে প্রমাণিত হয়েছে। তবে এই রূপান্তর ঘটাবার ক্ষেত্রে নিউট্রনের অবদানই সবচেয়ে বেশী—কেন না, নিউট্রন তড়িৎ-নিরপেক্ষ কণিকা বলে পরমাণু কেন্দ্রীনের দ্বারা আকর্ষিত বা বিকর্ষিত হয় না—যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নিউট্রন সহজেই কেন্দ্রীনকে আঘাত করতে পারে। এই নিউট্রন কণিকার সাহায্যেই সাধারণ ইউরেনিয়ামকে আঘাত করে প্রাকৃতিক অস্তিত্ববিহীন নতুন নতুন মৌলিক পদার্থ আবিষ্কৃত হয়েছে। এই সমস্ত কণিকার আঘাতে পারমাণবিক বিক্রিয়া ঘটিয়ে পারমাণবিক সংখ্যার পরিবর্তন ঘটানো আজ মোটামুটিভাবে মানুষের আয়ত্তাধীন। তবে এই কৃত্রিম উপায়ে মৌলিক পদার্থের পরিবর্তন ঘটানোর ব্যাপারটা খুবই ব্যয়সাপেক্ষ।

উঃ 2. সূর্য থেকে আগত আলোকরশ্মি পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের ধূলাবালি, জলকণা ইত্যাদির দ্বারা বিচ্ছুরিত হয়ে আকাশে নীল রঙের সৃষ্টি করে। ঘনসন্নিবিষ্ট ধূলাবালি, জলকণা—এমন কি, বিভিন্ন প্রকার অণু-পরমাণুর দ্বারা আলোক বিচ্ছুরিত হবার ফলে এর তীব্রতা হ্রাস পায়। বিজ্ঞানী র‍্যালের তত্ত্ব অনুযায়ী এই প্রক্রিয়ার একটা ব্যাখ্যা মেলে। এই তত্ত্ব অনুসারে বিচ্ছুরণের হার আপতিত আলোকের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের চতুর্থ ঘাতের সঙ্গে ব্যস্তানুপাতিক।

কাজেই সূর্য থেকে আগত দৃশ্য আলোক-বর্ণালীর বেগুনী ও নীল অংশের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য অপেক্ষাকৃত ছোট হওয়ায় বেগুনী ও নীল আলো হলুদে এবং লাল আলোর তুলনায় বেশী বিচ্ছুরিত হয়। বেগুনী আলোর তীব্রতা নীল আলোর তুলনায় কম, তাই তীব্রতর নীল আলোকের বিচ্ছুরণে উদ্ভাসিত আকাশকেই আমরা নীল দেখি।

একইভাবে সমুদ্রের জলকণা ও সমুদ্রের জলে দ্রবীভূত বিভিন্ন বস্তুকণা আপতিত আলোককে বিচ্ছুরিত করবার ফলে সমুদ্র নীল দেখায়।

শ্যামসুন্দর দে*

* ইনষ্টিটিউট অব রেডিও ফিজিক্স অ্যাণ্ড ইলেকট্রনিক্স, বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাতা-9।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস কর্তৃক পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-6 হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ 37/7 বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

ত্রয়োবিংশ বর্ষ | নভেম্বর, 1970 | একাদশ সংখ্যা

মাধ্যাকর্ষণ-তরঙ্গ

গগনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়*

সম্প্রতি বহু আবিষ্কার বিজ্ঞান-জগৎকে নাড়া দিয়েছে। চন্দ্রাভিযান বা পরমাণু বিস্ফোরণের মত তাদের সব কয়টি সাধারণের গোচরীভূত না হলেও বা সাধারণের মনে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি না করলেও এই আবিষ্কারগুলির মধ্যে এমন অনেক বস্তু আছে, যা বিজ্ঞানে বহু আকাঙ্খিত অথবা বিজ্ঞানের মূল প্রশ্নে কিছু না কিছু আলোকপাত করেছে। এই রকম একটি আবিষ্কারের নাম দেওয়া যায় মাধ্যাকর্ষণ-তরঙ্গ (Gravitational waves)। বিস্তৃত আলোচনার আগে সংক্ষেপে বিষয়টির আভাস দেওয়া যেতে পারে।

মাধ্যাকর্ষণের কথা কারও অবিদিত নয়—সব বস্তুই অন্য সব বস্তুকে আকর্ষণ করে—সূর্য-পৃথিবী-গ্রহাদি ভারী বস্তুর ক্ষেত্রে এই আকর্ষণ বিশেষভাবে প্রকট হয়ে ওঠে। সুতরাং চলমান বস্তুর মাধ্যাকর্ষণের ক্ষেত্র যে পরিবর্তনশীল হবে, এটা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু এই পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আর কোনও আলোড়নের সৃষ্টি হবে কি? প্রশ্নটি বোঝাবার জন্যে একটি উপমা নেওয়া যাক। সমুদ্রের এক স্থানে একটি জাহাজ দাঁড়িয়ে থাকলে সে স্থানের কিছু জল স্বস্থানচ্যুত হয়। জাহাজটি চলতে আরম্ভ করলে জলের স্থানচ্যুতির ক্ষেত্র পরিবর্তিত হয়, অর্থাৎ এক স্থানের জল স্বস্থানে ফিরে আসে ও অন্য স্থানের জল স্থানচ্যুত হয়। কিন্তু এটা ভিন্ন অন্য একটা জিনিষও হয়—সমুদ্রের বুকে আলোড়নও

*ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব টেক্নোলজি, খড়্গপুর

সৃষ্টি হয়—সেখানে তরঙ্গ ওঠে। মাধ্যাকর্ষণের ক্ষেত্রেও ঠিক সেই প্রশ্ন—কোনও ভারী বস্তু এক স্থান থেকে অন্যত্র নীত হলে পূর্বস্থানের কাছে মাধ্যাকর্ষণ কমে যায় ও নতুন স্থানে মাধ্যাকর্ষণ বাড়ে। কিন্তু তাছাড়াও ঐ সমুদ্রের তরঙ্গের মত আর কিছু ঘটে কি? উপরিউক্ত উপমা আশ্রয় করে আরও একটা কথা বলে নেওয়া যায়—একটি চৌবাচ্চায় একটি বড় বল অর্ধনিমজ্জিত অবস্থায় ঘুরলে জলের উপর তরঙ্গের সৃষ্টি হয়। অনুরূপ প্রশ্ন মাধ্যাকর্ষণের ক্ষেত্রেও তোলা যায়—ঘূর্ণায়মান ভারী বস্তুর কাছে মাধ্যাকর্ষণঘটিত কোনও আলোড়ন ওঠে কি? নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্বে এরূপ কোনও আলোড়নের অস্তিত্ব ছিল না, কিন্তু আইনষ্টাইনের তত্ত্বে দেখা গেল যে, ঘূর্ণায়মান দণ্ড থেকে তরঙ্গের উদ্ভব হবে। 1916 সালে আইনষ্টাইন এই বিষয়ে গবেষণা করেন। পরে বিখ্যাত বিজ্ঞানী সার আর্থার এডিংটনও ঐ বিষয়ে গবেষণা করেন। আইনষ্টাইনের তত্ত্বের সুরুতেই যাঁরা আপেক্ষিকতা তত্ত্বে উৎসাহী ছিলেন, এডিংটন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। পরে আরও অনেক বিজ্ঞানী এই সম্বন্ধে তত্ত্বীয় আলোচনা করেছেন। পরীক্ষায় কিন্তু এতদিন এই তরঙ্গ ধরা পড়ে নি এবং মনে করবার যথেষ্ট কারণ ছিল যে, পরীক্ষায় এই তরঙ্গ ধরা অতি দুরূহ। তবু বৈদ্যুতিক তরঙ্গ ও আকর্ষণের উপমার কথা চিন্তা করে অনেক বিজ্ঞানীই মাধ্যাকর্ষণ-তরঙ্গে বিশ্বাস করতেন। আজ এই দুরূহ পরীক্ষা সফল হতে চলেছে। এর কিছু বর্ণনা দেওয়াই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য, কিন্তু তার আগে বেশ একটু ভূমিকার প্রয়োজন।

আইনষ্টানের আপেক্ষিকতা তত্ত্ব দুই ভাগে বিভক্ত—বিশেষ আপেক্ষিকতা তত্ত্ব (Special theory of relativity) ও সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্ব (General theory of relativity)। পরস্পরের কাছ থেকে অপরিবর্তিত বেগে অপস্রিয়মান বস্তুদ্বয়ের একের দৃষ্টিতে অপরের দৈর্ঘ্য ও সময়ের মানের পরিবর্তন বিশেষ আপেক্ষিকতা তত্ত্বের মূল কথা। এরই ফলে বেশ একটু দুরূহ গণিত ও যুক্তি দিয়ে বোঝা যায় যে, গতিবেগ বাড়বার সঙ্গে সকল বস্তুই বেশী ভারী হয়ে ওঠে—সঠিকভাবে বললে তার ভর (Mass) বেড়ে যায়। দ্রুতবেগে ধাবিত ইলেকট্রন-প্রোটনাদির ভর কত বাড়ে, তা খুব ভাল করে মাপা যায় এবং এই ভাবে বিশেষ আপেক্ষিকতা তত্ত্ব প্রতিনিয়তই পরীক্ষায় প্রমাণিত হচ্ছে। এই তত্ত্বটি সম্বন্ধে পদার্থ-বিজ্ঞানীরা এত নিঃসন্দেহ হয়েছেন যে, কণাতম তত্ত্বের (Quantum mechanics) সমস্ত সূত্রই বিশেষ আপেক্ষিকতা তত্ত্বের কষ্টিপাথরে যাচাই না করলে তাঁরা নিশ্চিন্ত হন না। কণাতম তত্ত্ব পদার্থ-বিজ্ঞানীদের কাছে আজ অতি মূল্যবান তত্ত্ব। সুতরাং কণাতম তত্ত্ব যে বিষয়টিকে এত গুরুত্ব দিয়েছে, তা পদার্থ-বিজ্ঞানীদের কাছে যে একান্ত প্রয়োজন, তা বলাই বাহুল্য।

এবার সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্বের কথায় আসা যাক। সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্ব সম্বন্ধে পদার্থ-বিজ্ঞানীদের মনোভাব অন্য রকম। এত সর্বাঙ্গসুন্দর তত্ত্ব পদার্থবিদ্যায় যে আর নেই, এই কথা স্বীকার করলেও এবং যে চিন্তাপ্রণালী অবলম্বন করে বিজ্ঞান-জগতের পূজনীয় আইনষ্টাইন এই তত্ত্বে উপনীত হয়েছেন, তার প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাবান হলেও বিজ্ঞানীরা বলেন যে, দৈনন্দিন পদার্থবিদ্যার আলোচনায় আদৌ এই তত্ত্বের দেখা পাওয়া যায় না। পদার্থবিদ্যার তোরণে তোরণে বিশেষ আপেক্ষিকতা তত্ত্বকে দেখা যায়, কিন্তু সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্বকে দেখা যায় না। এর কারণ, সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্বের বক্তব্য কি, সেটা একটু আলোচনা করলেই বোঝা যাবে—মাধ্যাকর্ষণ-তরঙ্গের পরীক্ষার গুরুত্বও সেই সঙ্গে বোঝা যাবে।

বিশেষ আপেক্ষিকতা তত্ত্বে পরস্পরের দৃষ্টিতে অসম বেগে ধাবিত বস্তুনিচয়ের আলোচনায়

প্রায় অক্ষম। যেখানে ভারী বস্তু বর্তমান ও তার টানে তার দৃষ্টিতে অসম বেগে অন্যান্য বস্তু তার দিকে এগিয়ে আসছে, সেখানে বিশেষ আপেক্ষিকতা তত্ত্ব প্রযোজ্য নয়—সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্ব প্রযোজ্য। সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্বের চিন্তাধারা আরও গভীর। এই চিন্তাধারা অনুসরণ করে বুঝতে পারা যায় যে, ভারী বস্তুর কাছে 'স্থান ও কাল বক্রতা প্রাপ্ত হয়'। কথাটার অর্থ একটু বিশদ করবার চেষ্টা না করে উপায় নেই। আমাদের সাধারণ মাপজোখ যে ভাবে চলে, বক্রতাপ্রাপ্ত দেশে তা চলে না—মাপজোখের এই নিয়ম বদ্‌লানোটাই দৃশ্যমান সত্য, বক্রতাটা একটা নাম মাত্র—এই নামের পিছনে একটা উপমা লুকিয়ে আছে, এই ভাবে বুঝলেই বোধ হয় বোঝবার সবচেয়ে সুবিধা। উপমাটাই বলা যেতে পারে। সমতল ভূমিতে অঙ্কিত কোনও ব্যাসবিশিষ্ট বৃত্তের অন্তস্থিত ক্ষেত্রফল একটি বর্তুলের উপর অঙ্কিত সেই একই ব্যাসের অন্তস্থ ক্ষেত্রফলের বেশী হবে। ক্ষেত্রফলটি কত কম হলো, তার পরিমাণ থেকে বর্তুলটির ব্যাস অর্থাৎ তার বক্রতা বোঝা যায়। আইনষ্টাইনের তত্ত্ব অনুসারে ভারী বস্তুর নিকটস্থ দেশে ঐ রকম মাপজোখের নিয়ম পরিবর্তিত হবে, যথা—একটি বর্তুলের অন্তস্থ আয়তন ভারী বস্তুর কাছে যা হবে, দূরে তা হবে না। এ হলো শুধু স্থান বা দেশের বক্রতার কথা। 'স্থান-কালের বক্রতা'র অর্থ অনুরূপভাবে এই যে, স্থান-কালের বক্রতা হেতুই ভারী বস্তুর কাছে ছোট বস্তু আর তার দৃষ্টিতে সরলরেখায় সমবেগে ধাবিত হয় না।

বহুদিন পর্যন্ত তত্ত্বটি পরীক্ষিত হওয়া সম্ভব হয়েছিল মাত্র তিনটি ক্ষেত্রে এবং সেই জন্যেই পদার্থবিদ্যার খুব কম ক্ষেত্রেই সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্বের দেখা পাওয়া যায়। এদের সবগুলিই মহাকাশে ঘটিত ঘটনা নিয়ে এবং যেখানে স্থান-কালের বক্রতা স্থির—সেখানে। অধুনা যদিও মসবয়ের এফেক্ট একটি পরীক্ষাকে পৃথিবীপৃষ্ঠতঃ ঘটনার উপর পরীক্ষাকে সম্ভাব্যের কাছাকাছি এনেছে, তবুও স্থান-কালের বক্রতার আলোড়নের স্থান সেখানে নেই। মাধ্যাকর্ষণ-তরঙ্গ স্থান-কালের বক্রতায় আলোড়ন, ঠিক যে আলোড়ন সমুদ্রবক্ষে চলমান জাহাজের কাছে দেখি। সুতরাং পরীক্ষায় মাধ্যাকর্ষণ-তরঙ্গ ধরতে পারা শুধু যে একটি নতুন পরীক্ষা তা নয়, আইনষ্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্বের যে অংশ এযাবৎ আদৌ পরীক্ষিত হয় নি, সেই রকম একটি পরীক্ষা।

প্রবন্ধের গোড়াতেই ঘূর্ণায়মান দণ্ডের কথা বলা হয়েছে। ঐ দণ্ডের আলোচনায় দুটি বিষয় পরিস্ফুট হয়েছে। দণ্ডটির ঘূর্ণনহেতু যে মাধ্যাকর্ষণ-তরঙ্গের উদ্ভব হবে, তা যন্ত্রে ধরবার মত শক্তিশালী করতে হলে দণ্ডটির ঘূর্ণনবেগ খুবই বেশী করতে হয়। এত অধিক বেগে ঘুরতে গেলে কিন্তু দণ্ডটি ভেঙ্গে যাবে। সুতরাং এই পরীক্ষা সম্ভব নয়। দ্বিতীয় যা পরিস্ফুট হয়েছে তা এই যে, ঘূর্ণিত দণ্ড উৎসারিত মহাকর্ষণ-তরঙ্গ খানিকটা শক্তি নিয়ে যাবে—এই কারণে দণ্ডটির ঘূর্ণনবেগ ক্রমেই কমে আসবে বটে, কিন্তু আরও অন্যান্য কারণে দণ্ডটির ঘূর্ণনবেগ আরও দ্রুত কমবে। সুতরাং সরাসরি মহাকর্ষণ-তরঙ্গ না দেখে দণ্ডটির ঘূর্ণনবেগের হ্রাস মাত্র দেখেই যে মহাকর্ষণ-তরঙ্গ সম্বন্ধে কিছু অনুমান করা যাবে, সে আশাও নেই।

পরীক্ষায় মহাকর্ষণ-তরঙ্গের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে হলে প্রথমে প্রয়োজন মহাকর্ষণ-তরঙ্গের উদ্ভব ঘটানো, তারপরে প্রয়োজন, সেই তরঙ্গ যন্ত্রে ধরা। যদিও আইনষ্টাইন ও এডিংটনের পরেও মহাকর্ষণ-তরঙ্গ সম্বন্ধে কয়েক জন বিজ্ঞানী তত্ত্বীয় চিন্তা করেছেন এবং তদ্দারা বিজ্ঞান-জগৎ কিছু লাভবানও হয়েছে, তবু মহাকর্ষণ-তরঙ্গ যন্ত্রে ধরবার প্রারম্ভে যে তত্ত্বীয় চিন্তার প্রয়োজন ছিল, সে সম্বন্ধে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ-

ক্ষেপ করেন অধ্যাপক জোসেফ ওয়েবর। সেটি প্রথমে বর্ণনা করা যাক।

স্থিতিস্থাপক বস্তু বলতে কি বোঝায়, সে কথা অনেকেই জানেন। প্রায় সব বস্তুর উপরেই চাপ বা টান পড়লে বস্তুটিতে কিছু সঙ্কোচন বা সম্প্রসারণ ঘটে। বস্তুর অঙ্গের সব স্থানেই যে সমানভাবে এই সম্প্রসারণাদি ঘটবে, তা নয়। চাপ বা টানের ধর্মের উপর নির্ভর করে, কি রকম সম্প্রসারণ বা সঙ্কোচন কখন কোথায় ঘটবে। সম্প্রসারণ ও সঙ্কোচনের তরঙ্গ কখনও কখনও বস্তুটিতে উদ্ভব হতে পারে। বিজ্ঞানী ওয়েবর প্রমাণ করেন যে, মহাকর্ষণ-তরঙ্গ অর্থাৎ স্থান-কালের বক্রতার তরঙ্গ স্থিতিস্থাপক বস্তুতে কম্পনের সৃষ্টি করতে পারে। অনুরূপভাবে স্থিতিস্থাপক বস্তু থেকেও মহাকর্ষণ-তরঙ্গের উদ্ভব সম্ভব। অন্যান্য বহু তত্ত্বীয় গবেষণার মত এই গবেষণাতেও কিছু আদর্শীকরণ ছিল। ওয়েবর বস্তুতঃ প্রমাণ করেন যে, স্প্রিং-এ বাঁধা দুটি ভারী বস্তু মহাকর্ষণ-তরঙ্গের দোলায় দোল খেতে পারে। যেহেতু স্থিতিস্থাপক বস্তুমাত্রেই যেন স্প্রিং-এ বাঁধা বহুসংখ্যক অণুর সমষ্টি, সেহেতু মহাকর্ষণ-তরঙ্গের দোলায় দোল খাবে, এমন মনে করা যায়। কিন্তু কেমনভাবে বিভিন্ন ধরণের তরঙ্গ বিভিন্ন ধরণের দোলন বা কম্পনের সৃষ্টি করবে, সে সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন।

স্প্রিং-এ বাঁধা বস্তুকে একটু কাঁপিয়ে দিলে এবং বাইরে থেকে কোনও বল (Force) তার উপর কার্যকরী না হলে সেটা একটা বিশেষ কম্পাঙ্কে কম্পিত হয়; অর্থাৎ একই অবস্থা থেকে বার বার সেই অবস্থায় ফিরে আসে। সেকেণ্ডে যতবার ফেরে, সেই সংখ্যাটির নামই কম্পাঙ্ক (Frequency)। শুধু স্প্রিং-এ বাঁধা বস্তু কেন, একটি সুতায় ঝোলানো অল্প ওজনের বলও ঝুলিয়ে দিলে একটা বিশেষ কম্পাঙ্কে দোলে। এই কম্পাঙ্কের নাম দেওয়া যায় স্বাভাবিক কম্পাঙ্ক (Natural frequency), অর্থাৎ বহিস্থ বলের অভাবে যে কম্পাঙ্ক, তারই নাম স্বাভাবিক কম্পাঙ্ক। বহিস্থ বল যদি প্রযুক্ত হয় এবং বলটি যদি বিশেষ কম্পাঙ্কে বাড়ে-কমে, তাহলে অবশ্য স্প্রিং-এ বাঁধা বস্তুটি বলের কম্পাঙ্কেই কম্পিত হবে। কিন্তু বলটির কম্পাঙ্ক তার স্বাভাবিক কম্পাঙ্কের চেয়ে ভিন্ন হলে কম্পনের পরিমাণটা অল্প হবে। বলের কম্পাঙ্ক স্বাভাবিক কম্পাঙ্কের কাছাকাছি হলে ঐ পরিমাণ আরও বাড়বে এবং স্বাভাবিক কম্পাঙ্কের সমান হলে কম্পন খুবই শক্তিশালী হয়ে উঠবে। এসবই দীর্ঘদিন তত্ত্বে প্রমাণিত ও বহুধা পরীক্ষিত। ওয়েবর প্রমাণ করেন যে, মাধ্যাকর্ষণ-তরঙ্গ স্থিতিস্থাপক বস্তুর উপর অর্থাৎ আদর্শীকৃত স্প্রিং-এ বাঁধা বস্তুর উপর বহিস্থ বলের মতই কাজ করে—অর্থাৎ তরঙ্গের কম্পাঙ্ক স্থিতিস্থাপক বস্তুটির স্বাভাবিক কম্পাঙ্কের সমান হলে স্থিতিস্থাপক বস্তুটিতে শক্তিশালী তরঙ্গের উদ্ভব হয়, অন্যথায় অল্প শক্তিশালী তরঙ্গের উদ্ভব হয়। এই তত্ত্বের উপর নির্ভর করেই অধ্যাপক ওয়েবরের যন্ত্র।

যন্ত্র নির্মাণের প্রথমেই এলো, কোন্ ধাতু বা অধাতু নির্মিত বস্তুকে মাধ্যাকর্ষণ-তরঙ্গের দ্বারা কম্পিত করা সুবিধাজনক হবে। ডক্টর রবার্ট ফরোয়ার্ড অধ্যাপক জোসেফকে এই সম্বন্ধে পরামর্শ দেন। অ্যালুমিনিয়ামকেই তিনি এই কাজের জন্যে প্রকৃষ্ট মনে করেন। অতঃপর ডক্টর সিসিক ও অধ্যাপক ওয়েবর একত্রে যন্ত্রের দ্বারা মাধ্যাকর্ষণ-তরঙ্গ উৎপন্ন করে অন্য একটি যন্ত্রে এই তরঙ্গ ধরেন। তরঙ্গটি ধরা হয়েছিল 154 সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্যের 20 সেন্টিমিটার ব্যাসবিশিষ্ট একটি অ্যালুমিনিয়াম স্তম্ভে। একে একটি বায়ুশূন্য কক্ষে রাখতে হয়েছিল এবং কম্পনটিকে দর্শনযোগ্য অবস্থায় আনবার জন্যে পিউজোইলেকট্রিক কেলাস ব্যবহার করতে হয়েছিল। এই কেলাসের বর্ণনা

অত্র নিষ্প্রয়োজন—শুধু জেনে রাখলেই হলো যে, অ্যালুমিনিয়াম স্তম্ভের কম্পন ধরবার জন্যে আরও একটি যন্ত্র এই পরীক্ষায় ব্যবহৃত হয়েছে। এই পরীক্ষা হয় প্রায় 1967 সালের ফেব্রুয়ারী মাসে।

1967 থেকে 1969 সালের মধ্যে অধ্যাপক ওয়েবরের যন্ত্রাগারে আরও অনেক জানবার মত ঘটনা ঘটেছে। এই সময়ের মধ্যে বা কিছু হয়তো তারও আগে কৃত আরও কয়েকটা অনুরূপ যন্ত্র তৈরি করা হয় এবং বেশ কয়েকটি কল্পনা সামনে রেখে অধ্যাপক ওয়েবর তাঁর গবেষণা চালিয়ে যান। চন্দ্র ও গ্রহাদির 3600 কম্পাঙ্কের তরঙ্গ ধরবার যন্ত্র, পাল্‌সারের তরঙ্গ ধরবার চেষ্টা—এইরূপ আরও বেশ কয়েকটি চেষ্টা অধ্যাপক ওয়েবরের গবেষণাগারে চলতে থাকে। তবে বিশেষ করে বলবার মত যা ঘটেছে, তা 1660 কম্পাঙ্ক আশ্রয় করে। এই বিষয়ে অবশ্যই কিছু বর্ণনার প্রয়োজন।

বর্ণনা আরম্ভ করবার আগে বলা দরকার, উক্ত অ্যালুমিনিয়াম স্তম্ভকে কম্পিত দেখলেই যে, সে কম্পন মহাকর্ষণ-তরঙ্গঘটিত, একথা মনে করা সর্বৈব ভুল। পৃথিবীর কম্পন, শব্দ ইত্যাদি নানা কারণে স্তম্ভ উত্তেজিত অর্থাৎ কম্পিত হতে পারে। কোন্ কোন্ কারণে কতটা কম্পন হওয়া সম্ভব, সেটা বিশ্লেষণ ও পরীক্ষার বিষয়। যে যে কারণে কম্পন হতে পারে বলে সন্দেহ, তার মধ্যে কিছু হয়তো বিশ্লেষণের পর বোঝা গেল যে, এরা কম্পন ঘটাবে না, আবার কিছুর সম্বন্ধে বোঝা গেল যে, এদের সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান হওয়া প্রয়োজন। ওয়েবরের দল বিশেষ ভীত শব্দ সম্পর্কে—তাই তাঁদের যন্ত্রের জন্যে তাঁরা শব্দহীন প্রকোষ্ঠ নির্মাণ করেছেন। আরও একটা ভয় ছিল মহাজাগতিক রশ্মিকে—এর কথা পরে বক্তব্য।

1969 সালের প্রায় মাঝামাঝি অধ্যাপক ওয়েবরের যন্ত্রাগারে ছয়টি অ্যালুমিনিয়াম স্তম্ভ ছিল। এদের মধ্যে চারটি 153 সেন্টিমিটার লম্বা এবং অন্য দুটির একটি 66 ও একটি 61 সেন্টিমিটার লম্বা। 66 সেন্টিমিটার লম্বা একটি স্তম্ভ মেরিল্যাণ্ডের 100 কিলোমিটার দূরস্থিত অ্যারাগন জাতীয় যন্ত্রাগারে (Aragonne National Laboratory) স্থাপিত। পরীক্ষায় যদি দেখা যায় যে, মেরিল্যাণ্ড ও অ্যারগনস্থ যন্ত্র একই সঙ্গে কম্পিত হচ্ছে, তাহলে বুঝতে হবে, এই কম্পনের উত্তেজনা আসছে মহাজগৎ থেকে। পৃথিবীপৃষ্ঠস্থ কম্পন অ্যারাগন থেকে মেরিল্যাণ্ড যেতে যে সময় লাগে ও পৃথিবী কম্পনের কেন্দ্র কোথায় হলে প্রায় একত্র মেরিল্যাণ্ড ও অ্যারাগনে কম্পন পৌঁছাবে—এসব হিসাব করে এই সম্ভাবনা খুবই কম দেখা গেছে। 1/2 সেকেণ্ডেরও কম একটি বিশেষ সময়ের মধ্যে কম্পন অ্যারাগন ও মেরিল্যাণ্ডে হলে তাকে ওয়েবরের দল 'একত্র-কম্পন' বলছেন। বহুসংখ্যক 'একত্র-কম্পন' দেখে মহাজগৎ থেকে আগত এই কম্পন সম্বন্ধে উক্ত বিজ্ঞানীবৃন্দ প্রায় নিঃসন্দেহ।

আগেই বলা হয়েছে যে, যে কম্পাঙ্কে প্রধানতঃ পরীক্ষা চলছে, তা হলো 1660। সুপারনোভার কারণ এই কম্পাঙ্ক মহাজগৎ থেকে আসা খুবই স্বাভাবিক এবং যন্ত্রেও তা ধরা পড়েছে। এখন প্রশ্ন হলো, এই তরঙ্গ মহাজগৎ থেকে আগত হলেও এটা কি মহাকর্ষণ-তরঙ্গই বটে? 1969 সালে অধ্যাপক যখন তাঁর কীর্তি—বিশেষ করে 1967 থেকে 1969-এর কীর্তি—লোকসমক্ষে উপস্থিত করেন, তখনও এই প্রশ্নের ঠিক উত্তর দেওয়া হয় নি। 1970-এর এপ্রিলে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে ঘোষিত হয়েছে যে, মহাজাগতিক রশ্মির কারণে তাঁদের যন্ত্রের কম্পন ঘটবে না। সুতরাং কম্পনের কারণ যে মাধ্যাকর্ষণ-তরঙ্গ, সে সম্বন্ধে আরও নিঃসন্দেহ হওয়া গেল।

চাঁদ শব্দশূন্য। এই জন্যে ও অন্যান্য কারণে চাঁদ বৈদ্যুতিক তরঙ্গ ধরবার যন্ত্র বসাবার প্রকৃষ্ট স্থান।

বিখ্যাত বিজ্ঞানী ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল বৈদ্যুতিক তরঙ্গের সম্ভাবনার কথা বলেছিলেন—পরে তাকে যন্ত্রে ধরেন হার্টস (Hertz)—আইনষ্টাইনের অনুমিত মাধ্যাকর্ষণ-তরঙ্গ সেই মত যন্ত্রে ধরলেন অধ্যাপক ওয়েবর। তাঁদের গবেষণা আরও অগ্রসর হলে—আরও অজ্ঞাত কম্পাঙ্কের তরঙ্গ নিয়ে কাজ হলে—এক কথায়, বিজ্ঞান-জগৎ এই বিষয়ে আরও নিঃসন্দেহ হলে (সত্যানুসন্ধানে চট্ করে নিঃসন্দেহ হওয়া ভুল) ওয়েবরের কীর্তি বিজ্ঞান-জগতে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

প্রত্নতাত্ত্বিক সময় নির্ধারণে বিজ্ঞানের অবদান

মিনতি চক্রবর্তী

প্রত্নতত্ত্ব বলিতে সাধারণতঃ মানুষের তৈয়ারী প্রত্নবস্তুর বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা বুঝায়; অর্থাৎ প্রাচীন মানুষ যাহা করিয়াছে তাহা যদি কোনও স্থান হইতে চিহ্নস্বরূপ উদ্ধার করা যায়, তাহা হইতে সেই সময়ের মানুষের শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান আহরণ করাই প্রত্নতত্ত্বের প্রধান উদ্দেশ্য। এই কারণে কোনও প্রাচীন স্থানের সময় নির্ধারণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বর্তমানে আমাদের আলোচ্য বিষয় হইল প্রত্নতাত্ত্বিক সময় নির্ধারণে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা আমাদের কিরূপে সাহায্য করে।

প্রত্নতাত্ত্বিক সময় নির্ধারণ সাধারণতঃ দুই রকমভাবে হইতে পারে:—

প্রথমটি হইল আপেক্ষিক সময় নির্ধারণ আর দ্বিতীয়টি হইল পরম সময় নির্ধারণ।

আপেক্ষিক সময় নির্ধারণ—যখন কোনও স্থানের অবিদিত সময়কে অন্য স্থানের বিদিত প্রত্নতাত্ত্বিক সময়ের সহিত তুলনা করিয়া আপেক্ষিকভাবে সময় নির্ধারণ করা হয়, তাহাকে বলা হয় আপেক্ষিক সময় নির্ধারণ। এইভাবে যে সময় নির্ধারিত হইয়া থাকে, তাহা সাধারণতঃ বৃহৎ অর্থে ব্যবহৃত হয়; যেমন—পুরাপ্রস্তর যুগ (Paleolithic Age), মধ্যপ্রস্তর যুগ (Mesolithic Age) প্রভৃতি।

আপেক্ষিকভাবে সময় নির্ধারণ নিম্নলিখিত প্রকারগুলিতে পাওয়া যায়:—

(ক) **প্যালিণ্টোলজিক্যাল**—এই পদ্ধতিতে সময় নির্ধারণে প্রাচীন প্রাণীর জীবাশ্মের সাহায্য লওয়া হয়। এই জীবাশ্মগুলি প্রাচীন মেরুদণ্ডী অথবা অমেরুদণ্ডী প্রাণীর হওয়া চাই। এইরূপ কোন প্রাণীর জীবাশ্ম যদি কোন একটি বিশিষ্ট স্তরে বা স্তূপের উপর পাওয়া যায়, তাহা হইলে সেই প্রাণীটির অস্তিত্ব যে যুগে ছিল, সেই যুগ হইতে সেই বিশিষ্ট স্তরের সময় তুলনামূলকভাবে নির্ণয় করা যাইতে পারে। যদিও কোনও স্থান হইতে টাইপ ফসিল (যাহা কোনও বিশিষ্ট সময় ও বিশিষ্ট কালচারের নির্দেশ দেয়) পাওয়া যায়, তাহা প্রত্নতাত্ত্বিক সময় নির্ধারণে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অবলম্বন করে। ভারতবর্ষের নর্মদার উপকূলে পুরাপ্রস্তর যুগের যে স্তরবিন্যাস পাওয়া গিয়াছে, তাহার নিম্নভাগে এইরূপ একটি মেরুদণ্ডী প্রাণীর জীবাশ্ম পাওয়া গিয়াছে। ইহার নাম এলিফ্যাস অ্যাণ্টিক্যুয়াস নোমাডিক্যাস এবং ইহার অস্তিত্ব হইতে এই স্থানের সময় নির্ধারিত হইয়াছে প্লাইস্টোসিনের মধ্যভাগ।

(খ) **প্যালিওবটানিক্যাল**—এই ভাবে সময় নির্ধারণে প্রাচীন প্রাণীর জীবাশ্মের

পরিবর্তে প্রাচীন উদ্ভিদের জীবাশ্মের সাহায্য লওয়া হয় এবং কোনও স্তরের ভিতর ঐ জীবাশ্মের উপস্থিতি হইতে উহার সময় নির্ধারিত হইয়া থাকে।

(গ) **ইভোলজিক্যাল**—আবহাওয়া পরিবর্তনের মাত্রা নির্ধারণের দ্বারা এই পদ্ধতিতে সময় নির্ধারিত হয়। বিভিন্ন সময়ে প্রাকৃতিক যে পরিবর্তন সাধিত হয়, যেমন—প্লুভিয়াল পিরিয়ডে কোনও স্থানে সঞ্চয় ও ইন্টারপ্লুভিয়াল পিরিয়ডে ক্ষয় হইলে সেই সঞ্চয় ও ক্ষয়ের মাত্রা লক্ষ্য করিয়া ঐ স্থানের সময় নির্ধারিত হইতে পারে। ভারতে সোয়ান উপত্যকায় এইভাবে সময় নির্ধারিত হইয়াছে।

টাইপোলজিক্যাল—এইভাবে সময় নির্ধারণে মানুষ কর্তৃক তৈয়ারী ও ব্যবহৃত প্রাচীন আয়ুধ, হাতিয়ার অথবা মৃৎপাত্রের সাহায্য লওয়া হয়। খননকার্যের ফলে ঐ সকল প্রত্নবস্তু যদি কোন বিশিষ্ট স্তর হইতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে ঐ সকল বস্তু একটি বিশিষ্ট ঐতিহাসিক অথবা প্রাগৈতিহাসিক সময়ের নির্দেশ করে। এখন, অনুরূপ আর একটি প্রত্নবস্তু যদি অন্য কোন স্থান হইতে উদ্ধার করা যায় এবং উহাদের গঠন-কৌশল যদি এক রকমের হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে ঐ বস্তুটি পূর্বোক্ত সময় নির্ধারিত বস্তুটির সমসাময়িক এবং ঐ বস্তু হইতে সেই স্থানের সময় নির্ধারিত হয়।

ম্যাগ্নেটিক—পোড়া মাটি, ইট, চুল্লী, টেরাকোটা প্রভৃতি জিনিষ, যাহার মধ্যে লৌহজাতীয় পদার্থ আছে, তাহা কোন স্থানের সময় নির্ধারণে সাহায্য করে। এই সকল পদার্থ যদি অপরিবর্তিত অবস্থায় কোন স্থানে থাকে, তাহা হইলে তাহারা পৃথিবীর চুম্বকীয় ভ্রামক প্রাপ্ত হয়। যে সকল বস্তু এইরূপ ভ্রামক প্রাপ্ত হয়, তাহা সময়ের দীর্ঘ ব্যবধানে কোনরূপ পরিবর্তিত হয় না। আমরা জানি, পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্র ক্রমশঃ পরিবর্তিত হইতেছে। যদি উপরিউক্ত কোন বস্তু কোন স্থান হইতে উদ্ধার করা যায়, তবে ঐ সকল বস্তু পোড়াইলে তাহা হইতে লৌহজাতীয় পদার্থ পৃথক করা যায় এবং দেখা যায় যে, সেই লৌহের চৌম্বকত্ব প্রাপ্তির ফলে তাহা যে যুগের তৈয়ারী, সেই যুগের পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রের দিগ্‌নির্ণয় করিতেছে। এই পদ্ধতিতে সময় নির্ধারণের জন্য অন্য একটি বস্তুর (যাহার সময় পূর্বে নির্ধারিত হইয়াছে) সাহায্য লওয়া হয়। যদি উদ্ধারপ্রাপ্ত বস্তুর সময়, সময়-নির্ধারিত বস্তুর সময়ের সহিত মিলিয়া যায়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, দুইটি বস্তুর নির্মাণকার্য একই সময়ে সম্পন্ন হইয়াছে অর্থাৎ দুইটি বস্তু একই সময়ের।

ফ্রান্সের থেলিয়ার, ইংল্যাণ্ডের কুক, আইতকেন এবং জাপানের ওয়াটনেবল এই পদ্ধতির সাহায্যে অনেক স্থানের সময় নির্ধারণ করিয়াছেন।

কেমিক্যাল—কোন কোন ক্ষেত্রে প্রত্নতাত্ত্বিক বস্তুসমূহের রাসায়নিক পরীক্ষার দ্বারা সময় নির্ধারিত হইতে পারে। ইহা কার্বন-14 পদ্ধতির ন্যায় বস্তুসমূহের আভ্যন্তরীণ পরীক্ষার দ্বারা নির্ধারিত হইয়া থাকে। কার্বন-14 পদ্ধতিতে সাধারণতঃ 70,000 বৎসর পর্যন্ত সময় নির্ধারণ করা সম্ভব। কিন্তু তাহার অধিক হইলে কার্বন বহনকারী বস্তুসমূহ তাহাদের তেজস্ক্রিয়তা নষ্ট করিয়া ফেলে। সেই জন্য যে সকল হাড় 70,000 বৎসর পূর্বেকার (যেমন প্লাইস্টোসিন যুগের প্রথম ভাগের), রাসায়নিক পরীক্ষার দ্বারা তাহার সময় নিরূপিত হইতে পারে। এই পরীক্ষার জন্য হাড়জাতীয় পদার্থের আভ্যন্তরীণ ফ্লোরিন, নাইট্রোজেন এবং ইউরেনিয়ামের প্রয়োজন হইয়া থাকে।

খননকার্যের ফলে মাটি হইতে প্রাচীন মানুষ বা অন্য কোনও প্রাণীর যে সকল হাড় পাওয়া যায়, সেগুলির অভ্যন্তরে যে হাইড্রোক্সি-

অ্যাপেটাইট থাকে, সেগুলির মাটির অভ্যন্তরের জল শোষণ করিবার একটি সহজাত প্রবণতা থাকে। এই সকল ক্লোরিন হাইড্রোক্সি-অ্যাপেটাইটের সহিত বিক্রিয়া করিয়া হাড়ের মধ্যে বর্তমান থাকে। যতদিন এই সকল হাড় মাটির মধ্যে থাকিবে, ততদিন উহার অভ্যন্তরের ক্লোরিনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। হাড়ের এই ক্লোরিন গ্রহণ করিবার একটি নির্দিষ্ট সীমা আছে, যাহার বেশী ক্লোরিন আর হাড়গুলি গ্রহণ করিতে পারে না। এই হাড়ের ক্লোরিনের পরিমাণ নির্ধারণ করিয়া উহার সহিত অন্য কোন নির্ধারিত সময়ের হাড়ের তুলনা করিয়া প্রথমোক্ত হাড়ের সময় নির্দেশিত হয়। তবে এই পদ্ধতিতে একটি অঞ্চলের হাড়ের গুণাগুণ পরীক্ষার দ্বারাও সময় নির্ধারিত হইতে পারে। কারণ গ্রাউণ্ড ওয়াটারে ক্লোরিনের পরিমাণ স্থানানুযায়ী পৃথক হইয়া থাকে।

হাড়ের আভ্যন্তরীণ ইউরেনিয়ামের পরিমাণ দেখিয়াও উহার আপেক্ষিক সময় নির্ধারিত হইতে পারে। কারণ সদ্য-প্রাপ্ত হাড়সমূহে ইউরেনিয়াম থাকে না।

ডেনড্রোক্রোনোলজিক্যাল- বিজ্ঞানের যে শাখায় সাধারণতঃ বৃক্ষের বলয় গণনা করা হয়, তাহাকে বলা হয় ডেনড্রোক্রোনোলজি। গাছের অভ্যন্তরে যে ক্যাম্বিয়াম থাকে, তাহার কর্মক্ষমতায় প্রতি বৎসর গাছের বাৎসরিক বৃদ্ধি-বলয়ের সৃষ্টি হয়। এই বৃদ্ধি-বলয়গুলি গাছের পুরাতন অংশ ও ছালের মধ্যে থাকে। সাধারণতঃ যে ঋতুতে (যেমন বসন্তকালে) গাছের বৃদ্ধি হইতে থাকে, তখন গাছে বড়, পাত্‌লা প্রাচীর-বিশিষ্ট কোষ গাছের কাঠে যুক্ত হয়। গ্রীষ্ম অথবা বর্ষার শেষের দিকে ঐ কোষগুলি আরও বৃদ্ধি পাইতে থাকে। পরের বৎসর বসন্তে একই প্রকারে আবার নূতন কোষ উৎপন্ন হইয়া গাছের বলয়ের সৃষ্টি করে। গাছের অভ্যন্তরে এইরূপ নূতন ও পুরাতন অর্থাৎ ছোট ও বড় বলয়ের সৃষ্টির ফলে একটি নির্দিষ্ট সীমা পাওয়া যায়।

গাছের যে স্থানে এই বলয়ের সৃষ্টি হয়, সেই অংশ হইতে একটি পাত্‌লা গোলাকার অংশ কাটিয়া উহার উপর কোন তরল পদার্থ দিয়া পরীক্ষাগারে বলয়ের সংখ্যা গণনা করা হয়। এই গণনা সাধারণতঃ গোলাকার অংশের ব্যাসার্ধ ধরিয়া করা হয়। প্রতিটির 10টি বলয় যেখানে শেষ হইয়াছে, সেখানে একটি পিনের দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। যে বলয়গুলির বেধ খুব পাত্‌লা, সেগুলিকে চিহ্নিত করা হয় না, কেবলমাত্র গণনা করা হয়। কিন্তু যে সকল বলয়ের বেধ বেশ মোটা অথবা পার্শ্ববর্তী বলয়ের তুলনায় মোটা, তাহাই কেবল চিহ্নিত করা হয়।

গাছের বলয় গণনার পদ্ধতি কয়েক রকমের হইতে পারে। নিম্নে Douglass-এর পদ্ধতিটির বিষয় আলোচনা করা যাইতেছে :—

ডগলাস গাছের বলয়ের বেধ নির্ণয় করিয়া একটি সরল রেখার উপর কতকগুলি লম্ব টানেন। যে বলয়গুলি সাধারণ বেধের, সেগুলিকে কেবল B, BB প্রভৃতি অক্ষরের দ্বারা চিহ্নিত করেন এবং যে বলয়গুলির বেধ একটু বেশী মোটা, সেগুলিকে কেবল বড় বড় লম্বাকৃতির রেখার দ্বারা চিহ্নিত করেন। তারপর ঐ রেখাগুলির পরিবর্তন দেখিয়া তাহা হইতে গাছের বলয়ের সংখ্যা নির্ণয় করেন।

বৈজ্ঞানিক গ্লক যে পদ্ধতির আবিষ্কার করেন, তাহাতে তুলনামূলকভাবে বলয়ের সংখ্যা বাহির করা হয়। ইহাতে সাধারণতঃ দুই রকম গাছের বলয় লওয়া হয়। কতকগুলি গাছ লওয়া হয়, যাহাদের প্রকৃত বলয় আছে। আবার কতকগুলি নূতন উদ্ভিদ লওয়া হয়, যাহাদের প্রকৃত বলয়ের সংখ্যা পাওয়া যায় না। কোনও প্রাচীন উদ্ভিদের বলয় কোনও নূতন উদ্ভিদের বলয়ের সহিত মিলিয়া যাইতে পারে। উভয় গাছের

বলয়গুলি যদি এইরূপে মিলিয়া যায়, তবে একটি বৃক্ষের আভ্যন্তরীণ বলয়ের সহিত ও অন্য বৃক্ষের বাহিরের বলয়ের সহিত একটি সরল রেখা টানিয়া সময় নির্ধারিত হয়। যে সকল বৃক্ষের প্রকৃত বলয় পাওয়া যায় না, এই পদ্ধতিটি সেই সকল ক্ষেত্রে অনুসরণ করা হয়। উভয় পরীক্ষাতেই যে সকল গোলাকার অংশ লওয়া হয়, তাহার ব্যাস, মূলের উপর হইতে সেই অংশের উচ্চতা, যে স্থান হইতে উদ্ভিদটিকে লওয়া হইয়াছে, সেই স্থানবিশেষের বিবরণ বা Topography ও অবস্থান, যে মাটি হইতে উদ্ভিদটিকে তোলা হইয়াছে তাহার প্রকৃতি, পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে কোন প্রস্তর বা গাছ-গাছড়া যদি পাওয়া যায়, তাহা চিহ্নিত করা হয়। গোলাকার অংশ যদি মূলের কাছাকাছি বৃক্ষের কোনও স্থান হইতে পাওয়া যায়, তবে সেই অংশ সময় নির্ধারণের পক্ষে সর্বাধিক উপযুক্ত।

ভার্ভ-ক্লে অ্যানালিসিস—বৈজ্ঞানিক De Geer 1878 সালে সর্বপ্রথম এই পদ্ধতির উদ্ভাবন করেন। বরফাবৃত স্থানে হিমবাহ হইতে বরফ গলিবার পর হিমবাহনিঃসৃত যে জল থাকে, তাহার উপর প্রতি বৎসর কতকগুলি স্তর পড়ে। এই স্তরগুলিকে সুইডিশ ভাষায় বলা হয় ভার্ভস (Varves) এবং স্তরের সমাবেশকে ভূতাত্ত্বিকগণ ভার্ভ-ক্লে (Varve clay) অথবা স্যাণ্ডস বলিয়া থাকেন। এই সমাবেশ সাধারণতঃ লেক, টারমিনাল মোরেন, সমুদ্র বা নদীর উপরেই হইয়া থাকে। গ্রীষ্মকালে বরফ যখন খুব বেশী-মাত্রায় গলিতে থাকে, তখন বরফাবৃত অঞ্চলের নিকটবর্তী জলাধারসমূহে খুব বেশী মাত্রায় এই ভার্ভ-ক্লে-র সমাবেশ দেখা যায়। এই সমাবেশে অপেক্ষাকৃত স্থূলকায় কণিকাগুলি সাধারণতঃ নীচের দিকে এবং সূক্ষ্মতর কণিকাগুলি উপরি-ভাগে জমিতে থাকে এবং সূক্ষ্মতম কণিকাগুলি সর্বাপেক্ষা উপরে থাকে। পরের বৎসর আবার সেই স্থানে এইরূপ ভার্ভ-ক্লের সমাবেশ হয়। এই-ভাবে বৃক্ষের বলয়ের ন্যায় জলাধারসমূহে এক-একটি বলয়ের সৃষ্টি হয়। প্রতিটি বলয় এক-একটি বৎসরের নির্দেশ করে। প্রতি বৎসরের এই সমাবেশ হইতে বৃক্ষের গোলাকার অংশ লইয়া উহা হইতে সেই স্থানের সময় জানা সম্ভব। যদি কোন স্থানের ভার্ভ অন্য কোন স্থানের ভার্ভের সহিত মিলিয়া যায়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে দুইটি স্থানের ভার্ভ একই সময়ে গঠিত হইয়াছে। এইভাবে ভার্ভ-ক্লে পরীক্ষা করিয়া কোনও বিস্তৃত স্থানের সময়ের নির্দেশ পাওয়া যায়। ড গীয়ার এই পদ্ধতির উপর ভিত্তি করিয়া নির্দেশ করিয়াছেন যে, উত্তর ইউরোপের শেষ শৈত্যযুগের সমাপ্তি 12,000 বৎসর পূর্বে হইয়াছিল।

পোলেন অ্যানালিসিস—এই পদ্ধতিটি উদ্ভিদ-বিজ্ঞানের উপর ভিত্তি করিয়া গঠিত হইয়াছে। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে বিভিন্ন স্থানের পরাগরেণুর পরীক্ষার দ্বারা একটি সময়-নির্দেশ পাওয়া যায়। এই পরাগ সাধারণতঃ দেখা যায় উদ্ভিদের পচা শিকড়বিশিষ্ট জলা-ভূমির মৃত্তিকার উপর জৈব পদার্থসঞ্চিত হ্রদ এবং কর্দমাক্ত স্থানের উপর। এই পরাগসমূহ বহুদিন ধরিয়া জমা হইবার পর বাতাসের সংস্পর্শে জীবাশ্মে পরিণত হয়। কোনও স্থানের পরাগ পরীক্ষা করিয়া সেই স্থানে কি ধরণের ফুলের আধিক্য ছিল, তাহা জানিয়া আবহাওয়া সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়। এই আবহাওয়া নির্ণয় করিয়া সেই স্থানের সময় নির্দেশ করা সম্ভব। পোলেন অ্যানালিসিসের একটি প্রধান উদ্দেশ্য হইল—উদ্ভিদের উপাদানের পরিবর্তন লক্ষ্য করা। একটি নমুনা হইতে বিভিন্ন সময়ে উদ্ভিদের উপাদানের যে পরিবর্তন হয়, তাহা বোঝা সম্ভব নয় বলিয়া বিভিন্ন রকমের নমুনা লওয়া হয়।

পোলেন অ্যানালিসিসের ফলাফল সাধা-

রণতঃ তালিকার পরিবর্তে চিত্রের সাহায্যে সূচিত করা হয়। প্রত্যেকটি পোলেন নির্দেশের জন্য একটি বিশিষ্ট চিহ্নের সাহায্য লওয়া হয়। কেহ কেহ প্রতিটি উদ্ভিদের গণ (Genus) অথবা প্রজাতির (Species) জন্য একটি মানচিত্র তৈয়ারী করেন এবং তাহা হইতে বিভিন্ন পোলেনের আবর্তনের ব্যবধান মাপিয়া সময় নির্ধারণ করেন।

আলট্রাসোনিক—বৈজ্ঞানিক স্পেক্ট এবং বার্গ সর্বপ্রথম এই পদ্ধতির উদ্ভাবন করেন। তাঁহারা প্রমাণ করেন যে, প্রাণীদের হাড়ে শব্দোত্তর তরঙ্গের বেগ সময়ানুযায়ী ধীরে ধীরে কমিয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ নূতন হাড়ে শব্দোত্তর শব্দ-তরঙ্গের যে বেগ দেখা যায়, তাহা 500 বৎসর পূর্বের হাড়ে শব্দোত্তর শব্দ-তরঙ্গের বেগের ঠিক অর্ধেক, আবার 5000 বৎসর পূর্বেকার হাড়ের শব্দোত্তর শব্দ-তরঙ্গের বেগ তাহারও অর্ধেক। হাড়ের এই শব্দোত্তর শব্দ-তরঙ্গের বেগ সময়ানুযায়ী হ্রাস পাইবার মাত্রা সর্বত্র সমান নয় এবং এই ভাবে যে সময় নির্ধারিত হয়, তাহা ভ্রমশূন্য নয়। তাহা ছাড়া এই পদ্ধতিতে সময় নির্ধারণে কতকগুলি বাধা সৃষ্টিকারী প্রক্রিয়া, যেমন —ক্যালসিফিকেশন, সিলিসিফিকেশন অথবা ফেরুজিনাইজেসন প্রভৃতির হাড়ের উপর বিভিন্ন রকম বিক্রিয়ার ফলে বাধা সৃষ্টি করে।

ষ্ট্যাটিগ্রাফিক জিওমরফিক—এই পদ্ধতিটি ভূতাত্ত্বিক স্তরবিন্যাসের উপর নির্ভর করিয়া প্রবর্তিত হইয়াছে। অধঃক্ষেপণ ও ক্ষয়ের ফলে পৃথিবীর উপর যে বিভিন্ন স্তর, নদীতটচত্বর প্রভৃতির সৃষ্টি হয়, তাহার উপর যদি কোন প্রত্নবস্তু পাওয়া যায়, তাহা হইলে ঐ ভূতাত্ত্বিক স্তরের সময় নির্ধারণ সম্ভব। যে স্তরে ঐ প্রত্নবস্তু পাওয়া যাইবে, তাহার সহিত নিকটবর্তী কোন অধঃ-ক্ষেপের ভূতাত্ত্বিক স্তরের স্তরবিন্যাসের সম্পর্ক টানিতে হইবে। যদি উভয়ের স্তরবিন্যাসের সম্পর্ক এক হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, উভয় স্তর এক সময়ে গঠিত হইয়াছে। এই পদ্ধতিতে ভারতের ব্রহ্মগিরির সময় নির্ধারণ করা হইয়াছে।

নদীতটরেখার স্তরবিন্যাসের পরিবর্তন—যদি কোন প্রত্নবস্তু সমুদ্র বা নদীর তীর-সংলগ্ন কোন স্থানে পাওয়া যায়, তাহা হইলে তাহার সময় নির্ধারণ সম্ভব হয়। এই তীরসংলগ্ন স্থানগুলি পূর্বে যে ঐ স্থানে নদী অথবা সমুদ্র ছিল এবং ভূমির উচ্চতা অথবা সমুদ্র-পৃষ্ঠের পরিবর্তনের ফলে সম্পূর্ণ নিমজ্জিত হইয়াছে, তাহা নির্দেশ করে। ঐ তীরসংলগ্ন যে সকল প্রত্নবস্তু পাওয়া যাইবে, সেগুলিকে যে সময়ে ঐ ভৌগোলিক পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল, সেই সময়ের বুঝিতে হইবে।

বালুকাস্তূপের স্থান পরিবর্তনের হার—ষ্ট্রং নামক বৈজ্ঞানিক প্রমাণ করেন যে, বালিয়াড়ি বিচলনের জন্য যে নির্দিষ্ট সময় লাগে, তাহা বায়ব অধঃক্ষেপের সর্বাপেক্ষা কম সময়ের সহিত মিলিয়া যায়। এইভাবে প্রকৃতিতে বালিয়াড়ি বিচলনের সময় মাপিয়া সেই স্থানের সময় নির্ধারণ সম্ভব করা হয়।

ট্রাভারটাইন সঞ্চয়ের হার—স্তরের অন্তর্ভুক্ত স্ট্যালাগমাইট ও স্ট্যালাকটাইট সঞ্চয়ের হার নির্ধারণপূর্বক সেই স্থানের আবহাওয়া সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়। কোন স্থানের আবহাওয়া নির্ধারণ করিতে পারিলে তাহা হইতে সেই স্থানের সময় নির্ধারণও সম্ভব হয়।

তেজস্ক্রিয়তার পদ্ধতি—এই পদ্ধতিতে সময় নির্ধারণে মোটামুটিভাবে পরম সময় নির্ধারণ (Absolute dating) সম্ভব হয়।

তেজস্ক্রিয় পরমাণুগুলির রশ্মি বিকিরণের হার সাধারণতঃ অর্ধ-জীবনকাল বা হাফ লাইফের দ্বারা প্রকাশ করা হয়। তেজস্ক্রিয় পদার্থের বিকিরণের সঙ্গে সঙ্গে উহার পরমাণুগুলি

রূপান্তরিত হইতে থাকে। যে সময়ের মধ্যে তেজস্ক্রিয় পদার্থের অর্ধেক সংখ্যক পরমাণুর রূপান্তর ঘটে, তাহাকে ঐ পদার্থের হাফ লাইফ বলা হয়। পরীক্ষামূলক গবেষণার সাহায্যে তেজস্ক্রিয় পদার্থের নিউক্লীয় বিভাজনের ধ্রুবক নির্ণয় করা যায়। এই ধ্রুবকের সাহায্যে ঐ তেজস্ক্রিয় পদার্থের হাফ লাইফ নির্ণয় করা সম্ভব। কোন তেজস্ক্রিয় পদার্থের হাফ লাইফ জানা গেলে যে প্রস্তরে ঐ পদার্থ থাকে, আমাদের ইচ্ছানুযায়ী কোনও শূন্য সময় (O-time) হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত সেই প্রস্তরের সময় নির্ধারণ সম্ভব হয়।

কার্বন-14—আমরা জানি, বাতাসে কার্বন ডাই-অক্সাইড, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন প্রভৃতি আছে। এই কার্বন ডাই-অক্সাইডে কার্বনের পারমাণবিক ওজন 12। বায়ুস্তরের উপরিভাগে যে নাইট্রোজেন-14 আছে, তাহা নভোরশ্মি হইতে আগত নিউট্রনের সহিত বিক্রিয়ার ফলে একটি নির্দিষ্ট অনুপাতে কার্বন^{14} উৎপন্ন করে। এই কার্বন-^{14} তেজস্ক্রিয় পদার্থ। বিক্রিয়াটি এইরূপ:—

নিউট্রন + নাইট্রোজেন-14 = প্রোটন + কার্বন^{14}। এই কার্বন পরমাণুগুলি বাতাসের অক্সিজেনের সহিত বিক্রিয়ার ফলে কার্বন ডাই-অক্সাইড তৈয়ারী করে। এই শেষোক্তরূপ কার্বন ডাই-অক্সাইডে কার্বনের পারমাণবিক ওজন 14 এবং ইহা জীবমণ্ডলে সঞ্চালিত হয়। উদ্ভিদ যখন বাতাসের সহিত কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে, তখন এই কার্বন^{14} কার্বন ডাই-অক্সাইডের সহিত উদ্ভিদের দেহে প্রবেশ করে। প্রাচীন উদ্ভিদসমূহের দেহ হইতে এই কার্বন^{14} বাহির করিয়া লওয়া হয়। এই তেজস্ক্রিয় কার্বন^{14} তাহার পর তেজস্ক্রিয় রশ্মি বিকিরণ করিতে থাকে। অতঃপর যে স্থান হইতে প্রাচীন উদ্ভিদ লওয়া হইয়াছিল, সেই স্থান হইতে কিছু নূতন উদ্ভিদ লওয়া হয়। অনুরূপভাবে ঐ সকল উদ্ভিদের দেহ হইতেও কার্বন^{14} বাহির করিয়া উহার তেজস্ক্রিয়তার পরিমাণ নির্ণয় করা হয়। এই দুই প্রকার উদ্ভিদের তেজস্ক্রিয়তার পরিমাণ তুলনা করিয়া প্রাচীন উদ্ভিদটির সময় নির্ধারণ করা সম্ভব হয়। পরীক্ষার দ্বারা নির্ণয় করা হইয়াছে কার্বন^{14}-এর অর্ধজীবনকাল 5,560 বৎসর। এই পদ্ধতিতে 50,000 বৎসরের মধ্যেকার উদ্ভিদের সময় নির্ধারণ করা সম্ভব। এইভাবে সময় নির্ধারণে যে ভ্রম ধরা হয়, তাহা হইল 100 হইতে 12,000 বৎসর।

তেজস্তিলকের (Pleochroic halo) বর্ণায়নের তীব্রতা পরিমাপ পদ্ধতি—পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, তেজস্ক্রিয় পরমাণুগুলি আল্‌ফা কণা বিকিরণ করে। আল্‌ফা কণাগুলির বিশেষ ধর্ম হইল এই যে, সেগুলি কাচ, স্ফটিক এবং অভ্রের বর্ণবিকৃতি বা উহাদের রঞ্জিত করিতে পারে। এই অংশগুলিকে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নীচে বৃত্তাকার অংশরূপে দেখা যায়। এই বৃত্তাকার অংশগুলির নাম তেজস্তিলক (Pleochroic halo)। অণু-বীক্ষণ যন্ত্রের নীচে এই বৃত্তাকার অংশগুলির সমবর্তন তল পরিবর্তনের ফলে প্রাখর্যের পরিবর্তন ঘটে। একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ প্রাখর্য হইতে রঞ্জন ঘটিতে কতটা বিকিরণ ঘটে, তাহা স্থির করা হয়। এইভাবে একটি নির্দিষ্ট তালিকা-সূচী প্রস্তুত করা হয়। কোন নির্দিষ্ট প্রস্তরের বিকিরণের দ্বারা প্রাখর্য স্থির করা হয়। যে প্রাখর্য পাওয়া যায়, তাহার জন্য কতটা আল্‌ফা কণা দরকার, তাহা তালিকা-সূচী হইতে বাহির করা হয়। এই আল্‌ফা কণা বিকিরণ করিতে যে সময় লাগে, তাহা হইতে ঐ নির্দিষ্ট প্রস্তরের সময় বাহির করা হয়।

ইউরেনিয়াম ও হিলিয়ামের অনুপাত—ইউরেনিয়ামের পরমাণু বিভাজনের ফলে আটটি আল্‌ফা কণা নির্গত হয়। আল্‌ফা কণা দুই

একক ধনবিদ্যুৎযুক্ত হিলিয়াম পরমাণু। ঘনীভূত পদার্থের মধ্যে এই হিলিয়াম পরমাণুর গতি খুব কম হইবার ফলে ইহাদের অধিকাংশই প্রস্তরের মধ্যে আট্‌কা পড়িয়া যায়। এই পদ্ধতি প্রয়োগ করিবার জন্ত প্রস্তরের মধ্যে যে থোরিয়াম থাকে, তাহার পরিমাণ নির্ণয় করা দরকার। কারণ থোরিয়ামও হিলিয়াম কণার বিকিরণ ঘটায়। সূর্যরশ্মি হইতেও হিলিয়াম কণা বিকিরিত হয়। এই হিলিয়াম কণার পরিমাণ মাপিবার পর উপরি-উক্ত ফর্মূলার সাহায্যে সময় নির্ধারণ করা হয়।

$$T = \frac{88\ He}{U+0{\cdot}27\ Th} \times 10^6 \text{ years.}$$

ইউরেনিয়াম লেড^{206} এবং থোরিয়াম লেড^{208}-এর অনুপাত—ইউরেনিয়ামের বিভাজনের ফলে যে স্থায়ী পদার্থ পাওয়া যায়, তাহা হইল লেড^{206}। মাস-স্পেকট্রোমিটার নামক যন্ত্রের সাহায্যে দেখা হয় লেড^{206}-এর পরিমাণ কত বা লেড^{208}-এর পরিমাণ কত। লেড^{206}-এর ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত ফরমূ্লার (1) সাহায্যে সময় নির্ধারিত হয়। আর লেড^{208}-এর ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত ফর্মূলা (2)-এর সাহায্যে সময় নির্ধারিত হয়।

$$(1)\quad t = 15{\cdot}15 \times 10 \log\left(1 + 1{\cdot}58\,\frac{Pb^{206}}{U}\right) \text{ years}$$

$$(2)\quad t = 46{\cdot}2 \times 10^9 \log\left(1 + 1{\cdot}116\,\frac{Pb^{208}}{Th^{232}}\right) \text{ years.}$$

এই পদ্ধতির সাহায্যে সময় নির্ধারণের সুবিধা এই যে, লেড^{208} স্থায়ী পদার্থের পরিমাণ প্রাকৃতিক সংস্পর্শে কম ক্ষয় হয়।

ইউরেনিয়াম-লেড ও অ্যাক্টিনিয়াম-লেড-এর অনুপাত—পূর্বোক্ত পদ্ধতির ন্যায় লেড^{206} ও লেড^{207}-এর পরিমাণ মাস-স্পেকট্রোমিটার যন্ত্রের সাহায্যে মাপিবার পর নিম্নোক্ত ফর্মূলায় ফেলা হয়।

$$\frac{\text{লেড}^{206}}{\text{লেড}^{207}} = \frac{1}{139}\left(\frac{e^{\lambda u^{235} t} - 1}{e^{\lambda u^{238} t} - 1}\right) \text{ years.}$$

(λ= নিউক্লিয় বিভাজন ধ্রবক)

লেড^{210} ও লেড^{206}-এর অনুপাত—

ইহা চার নম্বর পদ্ধতির পরিবর্তিত রূপ। প্রাচীন প্রস্তরে লেড^{210} ইউরেনিয়ামের সহিত একই সমতায় থাকে। মাস-স্পেকট্রোমিটারে প্রথমে লেড^{206}-এর পরিমাণ মাপা হয়, তাহার পর রেডিও কেমিক্যাল অ্যানালিসিসের দ্বারা লেড^{208}-কে মাপা হয়। অতঃপর নিম্নোক্ত ফমূলার সাহায্যে সময় নির্ধারিত হয়।

$$t = 15{\cdot}15 \times 10^9 \log\left(1+1{\cdot}58\,\frac{Pb^{206} + Pb^{210}}{U}\right) \text{ years.}$$

পটাশিয়াম^{40} ও আরগন-এর অনুপাত— পটাসিয়াম^{40} তেজস্ক্রিয় পদার্থ। ইহা আরগন স্থায়ী পদার্থ বা ক্যালসিয়াম দিতে পারে। আরগন^{40}-এর পরিমাণ মাপিয়া ফর্মূলায় ফেলা হয়—

$$\frac{A^{40}}{K^{40}} = \frac{\lambda K}{\lambda K + \lambda_B}\left[e^{(\lambda_B + \lambda K)t} - 1\right]$$

রুবিডিয়াম ও ষ্ট্রনসিয়ামের অনুপাত—রুবিডিয়াম[87] তেজস্ক্রিয় পদার্থ। ইহা বিশ্লেষণ-পূর্বক স্থায়ী পদার্থ ষ্ট্রনসিয়াম দিতে পারে। মাস-স্পেকট্রোমিটারের দ্বারা ষ্ট্রনসিয়াম[87]-এর পরিমাণ মাপিয়া নিম্নোক্ত ফর্মুলায় ফেলা হয়—

$$t = \frac{6{\cdot}2 \times 10^{10}}{0{\cdot}6993} \times \frac{Sr^{87}}{Rb^{87}}$$

তেজস্ক্রিয়াজাত লেড ও সাধারণ লেড-এর অনুপাত—যে প্রস্তরের মধ্যে লেড[206], লেড[207] এবং লেড[208]—এই তিনটি পদার্থ থাকিবে, সেই প্রস্তরগুলিরই এই পদ্ধতির সাহায্যে সময় নির্ধারণ করা যাইবে। লেড[206], লেড[207] ও লেড[208]-কে রেডিওজিনিক লেড (Radiogenic lead) বলা হয়। তেজস্ক্রিয়াজাত নহে, এরূপ আদিম লেড-এর 206 ও 207-এর অনুপাতের সহিত তেজস্ক্রিয়াজাত লেড-এর উক্ত আইসোটোপগুলির অনুপাত তুলনা করিয়া প্রস্তরের সময় নির্ধারণ করা যায়।

উদ্ভিদের পুষ্টি ও বৃদ্ধিতে রসায়নের ভূমিকা

রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়*

মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর মত উদ্ভিদের দেহও নানাপ্রকার রাসায়নিক উপাদানে গঠিত। আমাদের দেহের পুষ্টি ও বৃদ্ধি যেমন কয়েকটি হর্মোনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে, উদ্ভিদ-দেহের পুষ্টি এবং বৃদ্ধিও তেমনি কয়েকটি হর্মোনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

হর্মোন হচ্ছে কতকগুলি রাসায়নিক উপাদানে গঠিত এমন এক শ্রেণীর পদার্থ, যা দেহের কোন বিশেষ ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর দেহে অন্তঃস্রাবী হর্মোনগুলির সন্ধান বহু পূর্বেই পাওয়া গেছে এবং সেগুলিকে সনাক্ত করাও সম্ভব হয়েছে। কিন্তু উদ্ভিদ-দেহের হর্মোনগুলির সন্ধান ও সেগুলির সনাক্তকরণ সম্ভব হয়েছে সাম্প্রতিক কালে।

এখন পর্যন্ত উদ্ভিদ-দেহের পুষ্টিসহায়ক তিন শ্রেণীর গুরুত্বপূর্ণ হর্মোনের সন্ধান পাওয়া গেছে। এই তিন শ্রেণীর হর্মোন হচ্ছে, অক্সিন (Auxin) জিবারেলিন (Gibberelin) এবং সাইটোকি-নিন (Cytokinin)। এই তিন শ্রেণীর হর্মোনের আলোচনা প্রসঙ্গে আর একটি হর্মোনের কথা স্বভাবতঃই এসে পড়ে—যার প্রভাব হচ্ছে বিপরীত, অর্থাৎ যা উদ্ভিদের পুষ্টি ও বৃদ্ধিতে সহায়তা না করে বরং তা রোধ করে থাকে। সেটি হচ্ছে অ্যাবসিজিক অ্যাসিড (Abscisic acid) বা সংক্ষেপে ABA।

উদ্ভিদের শারীরতাত্ত্বিক কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণে এই হর্মোনগুলির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। কয়েকটি জৈবিক পরীক্ষায় দেখা গেছে, ABA-এর ভূমিকা হচ্ছে অপর তিনটি হর্মোনের বিপরীত; অর্থাৎ প্রথমোক্ত হর্মোন তিনটি যেখানে উদ্ভিদের পুষ্টি ও বৃদ্ধিতে সহায়তা করে, ABA সেখানে উদ্ভিদের পুষ্টি ও বৃদ্ধি রোধের পক্ষে সহায়ক হয়। এই

*দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ, কলিকাতা-29।

প্রসঙ্গে ইথিলিনের (Ethylene) কথাও উল্লেখ করতে হয়। দীর্ঘকাল থেকে জানা আছে, উদ্ভিদের পুষ্টি ও বৃদ্ধির নিয়ন্ত্রক হিসাবে ইথিলিনের প্রভাব আছে যথেষ্ট এবং উদ্ভিদের দেহাভ্যন্তরেই তা সংশ্লেষিত হয়ে থাকে। এই নিবন্ধে আমাদের আলোচনা সীমিত থাকবে উদ্ভিদের পুষ্টি সহায়ক তিন শ্রেণীর হর্মোনের মধ্যে।

অক্সিন

উদ্ভিদের দেহে অক্সিনের প্রভাবে যেসব প্রতিক্রিয়া দেখা যায়, তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে—কাণ্ডের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি, মূলের বৃদ্ধিরোধ, অস্থানিক মূলের উৎপত্তি, পাতা ও ফলের পতনরোধ এবং পরাগযোগ ছাড়াই ফলের উৎপত্তি।

উদ্ভিদ-দেহ থেকে যেসব অক্সিন এখন পর্যন্ত পৃথক করা সম্ভব হয়েছে, তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে ইণ্ডোল-3-অ্যাসেটিক অ্যাসিড বা সংক্ষেপে AA।

CH_2COOH

N

H
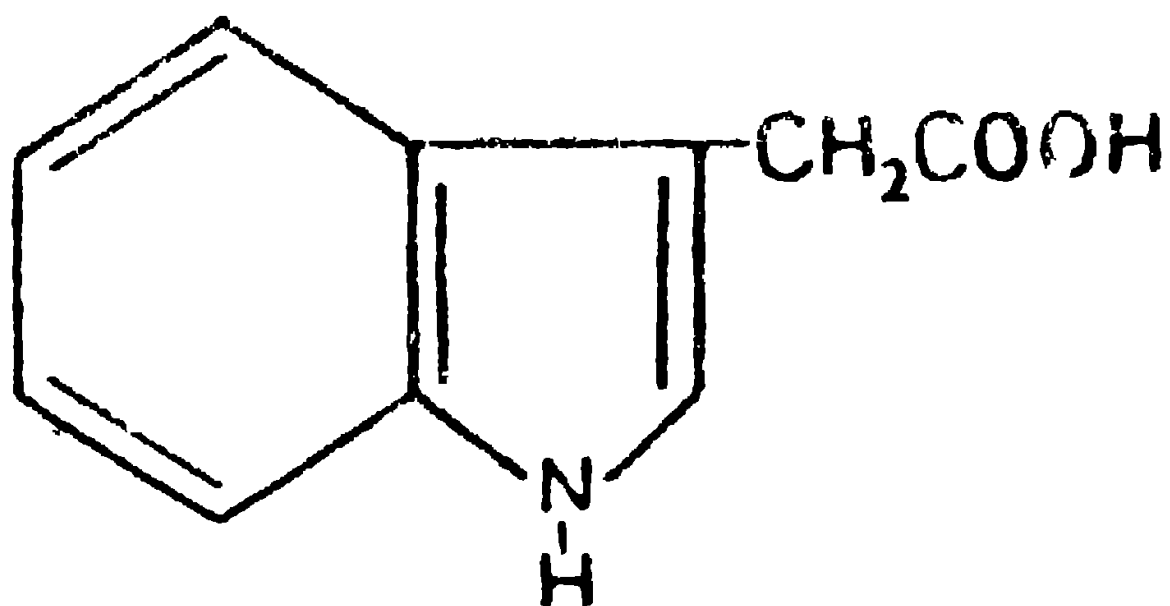
ইণ্ডোল-3-অ্যাসেটিক অ্যাসিড

অনুরূপ প্রতিক্রিয়া বহু সংশ্লেষিত অক্সিন যৌগেও দেখা গেছে। এই ধরণের সংশ্লেষিত অক্সিন বর্তমানে বিশেষ বিশেষ আগাছানাশক হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। লঘু দ্রবণে অক্সিনগুলি আগাছা বিনাশে খুবই কার্যকর। কিন্তু অধিক মাত্রায় অক্সিন ব্যবহার করলে মূল গাছই দু-এক সপ্তাহের মধ্যে মরে যায় অথবা কাণ্ড বিদীর্ণ হয়ে ও পাতার আকার বিকৃত হয়ে কিম্ভূতকিমাকার হয়ে দাঁড়ায়।

বিশেষ বিশেষ উদ্ভিদের উপর অক্সিনগুলি যে কাজ করে, তার মূলে আছে কয়েকটি কারণ:

(1) যেসব গাছ অক্সিনের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়, দেখা যায় সাধারণতঃ তাদের পাতা প্রশস্ত ও অনুভূমিকভাবে ছড়ানো হয়ে থাকে। এর ফলে বীরুতঘ্ন (Herbicide) দ্রবণ যখন স্প্রে করে পাতার উপর ছিটানো হয়, তখন সেই দ্রবণের কণাগুলি সহজেই পাতায় লেগে থাকে; কিন্তু যেসব গাছের পাতা সরু ও খাড়াভাবে ছড়ানো থাকে, তাদের পাতার উপর এই দ্রবণের কণাগুলি লেগে থাকে না এবং তার ফলে এই সব গাছে অক্সিন দ্রবণের তেমন কার্যকারিতা দেখা যায় না।

(2) অক্সিনের আগাছানাশক বিষক্রিয়ায় একবীজপত্রী উদ্ভিদের তুলনায় দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদ তাড়াতাড়ি প্রভাবান্বিত হয়।

(3) কোন কোন উদ্ভিদের ত্বকে বীরুতঘ্ন সহজেই অনুপ্রবেশ করে। সংশ্লেষিত অক্সিনের অনেকগুলির ক্রিয়া উদ্ভিদ-দেহে দীর্ঘস্থায়ী হয়, কারণ IAA-এর মত জৈবিক বিক্রিয়ায় তারা সহজে বিশ্লিষ্ট হয় না।

ব্যবহারিক ক্ষেত্রে অক্সিনের আর একটি মূল্যবান উপযোগিতা হলো—যেখানে প্রাকৃতিক পরাগযোগ ঘটে না, সেখানে অক্সিনের সাহায্যে উদ্ভিদে ফল উৎপাদন করা যায়। সংশ্লেষিত অক্সিনের দ্রবণ যখন টোম্যাটো গাছের উপর স্প্রে করা হয়, তখন একেবারে স্বাভাবিকভাবেই সে গাছে ফল ধরে এবং সেই ফলে সাধারণতঃ কোন বিচি থাকে না।

জিবারেলিন

বর্তমান শতাব্দীর চতুর্থ দশকে জাপানে এই শ্রেণীর হর্মোন প্রথম আবিষ্কৃত হয়। জাপানে ধানগাছে Gibberella fujikuroi নামে এক প্রকার ছত্রাকের দ্বারা সৃষ্টি রোগ সম্পর্কে অনুসন্ধান চালাবার সময় জিবারেলিন আবিষ্কৃত হয়। যেসব ধান গাছ এই ছত্রাকের দ্বারা

আক্রান্ত হয় নি, তাদের সঙ্গে তুলনা করে দেখা গেছে, এই ছত্রাকাক্রান্ত ধানগাছ তাদের চেয়ে সরু ও লম্বা হয় এবং বৃদ্ধির দিক থেকে তাদের ছাড়িয়ে যায়। 1938 সালে এই ছত্রাকের কোষমুক্ত নির্বীজিত নির্যাসে এমন একটি রাসায়নিক পদার্থের সন্ধান পাওয়া যায়, যা উদ্ভিদ-দেহের বৃদ্ধির পক্ষে সহায়ক। জাপানী বিজ্ঞানীরা এই নির্যাস থেকে রাসায়নিক পদার্থটিকে পৃথক করতে সক্ষম হন এবং তার নাম দেন জিবারেলিন। এখন পর্যন্ত 27টি জিবারেলিন সনাক্ত করা গেছে। এদের মধ্যে সমধিক পরিচিত হচ্ছে জিবারেলিক অ্যাসিড GA_3। বাণিজ্যিক
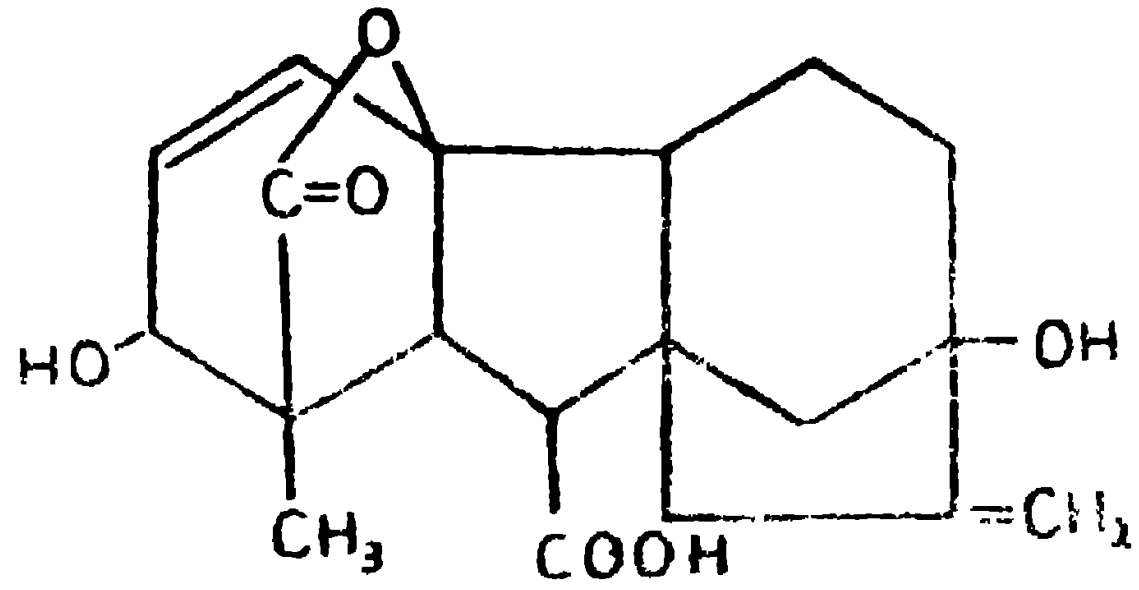
জিবারেলিক অ্যাসিড

ভিত্তিতে এই রাসায়নিক পদার্থটি প্রস্তুত করা হয় ছত্রাক চাষের পচন (Fermentation) থেকে। রাসায়নিক গঠন-বৈশিষ্ট্যের বিচারে GA_3 থেকে অপরাপর জিবারেলিনের পার্থক্য অতি সামান্যই, কিন্তু জৈবিক ক্রিয়াকলাপে তাদের মধ্যে পার্থক্য প্রচুর। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় Forget Me Not নামক ফুলগাছে GA_7 এবং GA_1 ব্যবহার করে সহজেই ফুল উৎপাদন করা যায়, কিন্তু GA_3, GA_4, GA_6 এবং GA_9 ব্যবহার করলে ফুল ধরে না।

জৈবিক ক্রিয়াকলাপের তারতম্যের হেতু সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের অভিমত হচ্ছে, এই ফুলের গাছগুলি সাধারণতঃ পর্যাপ্ত পরিমাণে জিবারেলিন উৎপাদন করে যতদূর সম্ভব বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। কিন্তু এই শ্রেণীর খর্বকায় গাছগুলি পর্যাপ্ত পরিমাণে জিবারেলিন উৎপাদন করতে পারে না বলে তাতে ফুল ধরে না। লক্ষ ভাগের এক ভাগ ঘনত্বে যদি জিবারেলিন রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করা হয়, তাহলে দেখা যায়, উদ্ভিদের বিটপ ও অন্যান্য অঙ্গের বৃদ্ধি ত্বরান্বিত হয়। খর্বকায় সীমজাতীয় গাছের পাতায় GA_3-এর উপরিউক্ত ঘনত্বের দ্রবণ ব্যবহার করলে গাছের আকারে একটা অদ্ভুত পরিবর্তন দেখা যায়, কিন্তু এই দ্রবণ যদি প্রয়োগ না করা হয়, তা হলে আকারে কোন পরিবর্তনই দেখা যায় না।

জিবারেলিনের এই বৃদ্ধিসহায়ক ক্রিয়া দেখে অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে, এই ক্রিয়াকে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উদ্ভিদের ফলন বৃদ্ধির কাজে লাগানো যেতে পারে, কিন্তু এখনও পর্যন্ত তা সম্ভব হয় নি। বস্তুতপক্ষে পরীক্ষায় দেখা গেছে, জিবারেলিন উদ্ভিদবিশেষের পুষ্টিবৃদ্ধিতেই শুধু সহায়তা করে, কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে তার পরিমাণ বৃদ্ধির পক্ষে সহায়ক নয়। তবে ইক্ষু-শর্করা গাছে জিবারেলিন ব্যবহার করে শর্করার পরিমাণ বৃদ্ধি করা গেছে এবং শণজাতীয় গাছের ফলন বৃদ্ধির ক্ষেত্রেও কিছু সুফল পাওয়া গেছে।

সাইটোকিনিন

উদ্ভিদের বৃদ্ধিসহায়ক তৃতীয় শ্রেণীর হর্মোন হচ্ছে সাইটোকিনিন। 1955 সালে হেরিং স্পার্মের DNA থেকে কাইনেটিন (Kinetin) নামে একটি রাসায়নিক পদার্থ পৃথক করবার পর সাইটোকিনিনের আবির্ভাব হয়। তামাকগাছের Tobacco callus টিসুতে কোষবিভাজনে (Cyto kinesis) পূর্বোক্ত রাসায়নিক পদার্থটি সহায়ক বলে এর নাম দেওয়া হয় কাইনেটিন। কিন্তু যেহেতু N_6-প্রতিস্থাপিত অপর বহু অ্যাডেনিন (Adenine) জাতীয় রাসায়নিক পদার্থ একই ফল দেয়, সেহেতু তাদের থেকে পার্থক্য

বোঝাতে সাইটোকিনিন নামটির প্রস্তাব করা হয় এবং এই শ্রেণীর সমস্ত হর্মোনের সাধারণ নামকরণ করা হয় সাইটোকিনিন। উদ্ভিদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গঠন-নিয়ন্ত্রণে, শাখা-প্রশাখার বিস্তারে এবং ফুল ও বীজের অঙ্কুরোদ্গম ত্বরান্বিত করার কাজে সাইটোকিনিন সহায়ক বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন।
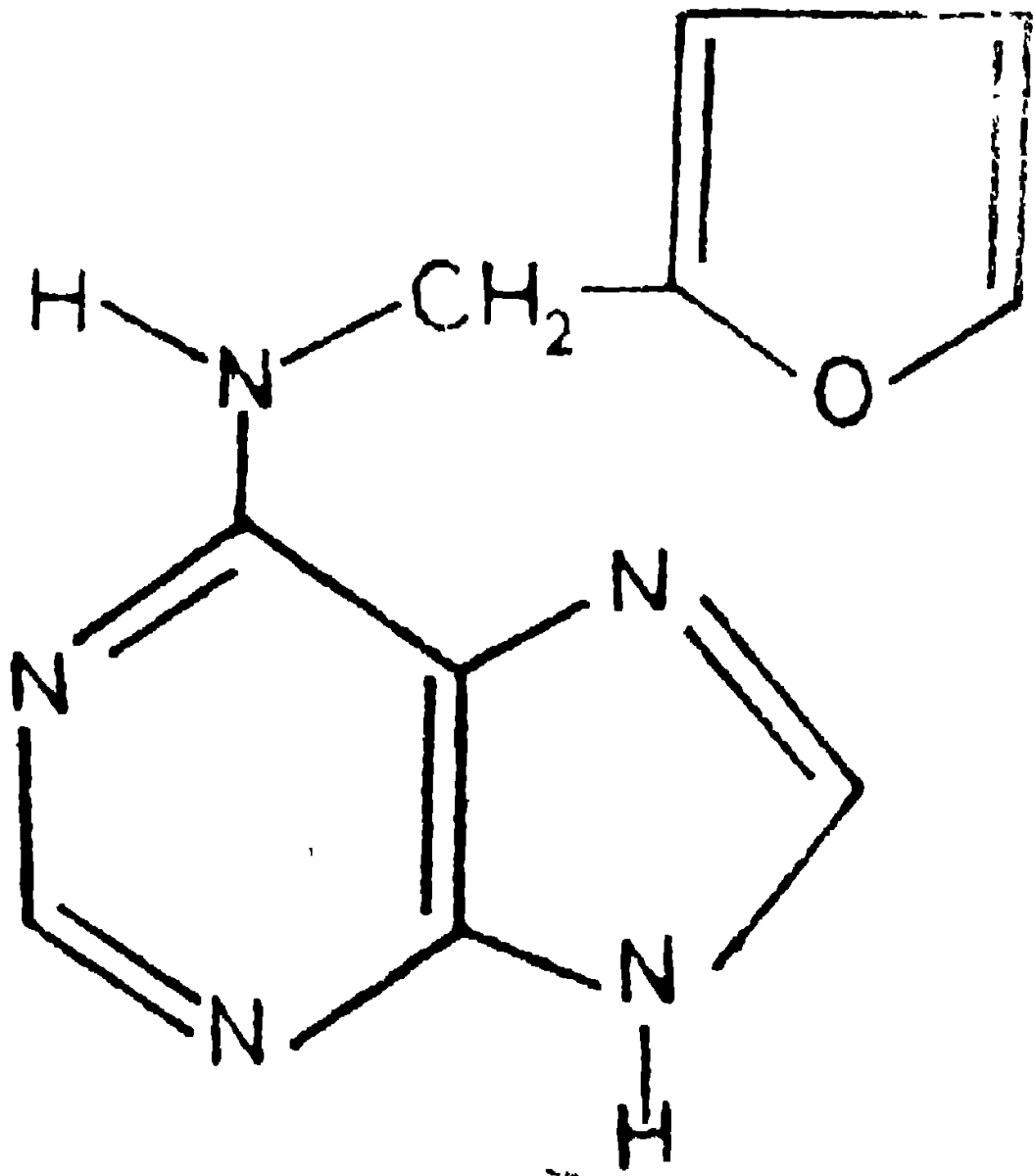
কাইনেটিন

উদ্ভিদ-দেহে সাইটোকিনিন এত অল্প পরিমাণে থাকে যে, তাদের পৃথক ও সনাক্ত করা খুবই দুরূহ। এর ফলে 1964 সালের আগে পর্যন্ত কোন সাইটোকিনিন পৃথক করা সম্ভব হয় নি। 1964 সালে ভুট্টার অপক্ক অন্তর্বীজ থেকে জিয়াটিন (Zeatin) নামে প্রথম প্রকৃতিজ সাইটোকিনিন পৃথক করা সম্ভব হয়। পরবর্তী কালে একাধিক উদ্ভিদ-সাইটোকিনিন আবিষ্কৃত হয়েছে।

খর্বকায় আপেল গাছের ফুল ও ফলের উপর সাইটোকিনিনের ক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। দেখা গেছে, সাইটোকিনিনের প্রভাবে আপেল ফলের আকৃতি বিশেষভাবে পরিবর্তিত হয়। কি ধরণের এবং কি পরিমাণ সাইটোকিনিন ব্যবহার করা হয়, তার উপর ফলের পুষ্টি ও বৃদ্ধির তারতম্য নির্ভর করে। উদ্যানপালনবিদ্যায় (Horticulture) অক্সিন এবং জিবারেলিন যেমন ব্যবহার করা হয়, অনুরূপভাবে সাইটোকিনিনও প্রয়োগ করা যেতে পারে।

অ্যাবসিজিক অ্যাসিড

আগেই বলা হয়েছে অক্সিন, জিবারেলিন ও সাইটোকিনিন যেমন উদ্ভিদের পুষ্টি ও বৃদ্ধিতে সহায়তা করে, অ্যাবসিজিক অ্যাসিড তার বিপরীত প্রভাব বিস্তার করে থাকে; অর্থাৎ
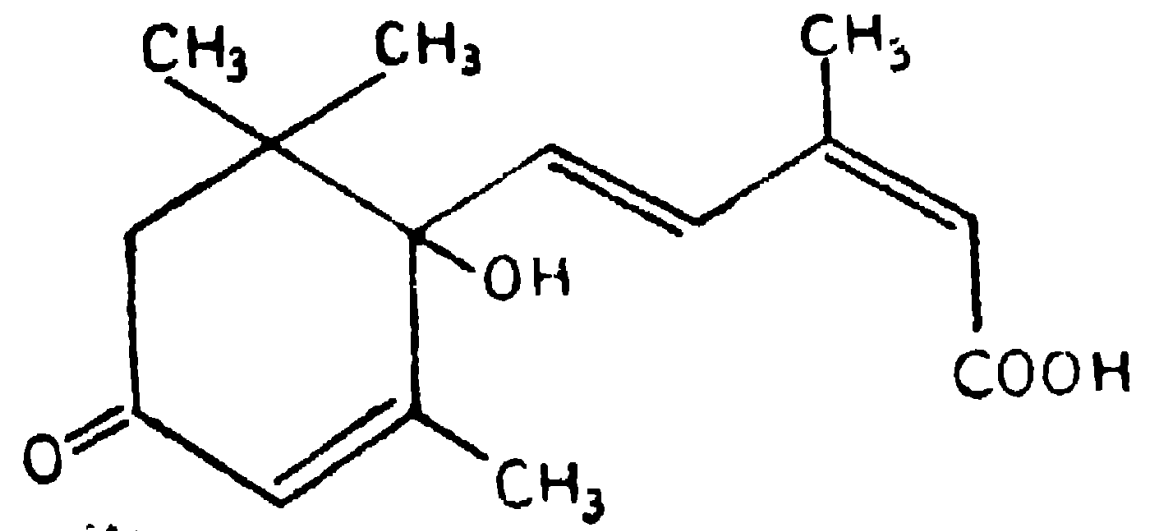
অ্যাবসিজিক অ্যাসিড

শেষোক্ত এই হর্মোনটির প্রভাবে উদ্ভিদের পুষ্টি ও বৃদ্ধি রুদ্ধ হয়ে থাকে। বৃদ্ধিরোধক এই হর্মোনটিকে সর্বপ্রথম পৃথক ও সনাক্ত করা হয় 1965 সালে। ঘাস, সীম, আলু, আপেল ইত্যাদি বহু উদ্ভিদে ABA-এর অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া গেছে। পরীক্ষায় দেখা গেছে, ABA উদ্ভিদের ফল ও পাতা তাড়াতাড়ি ঝরিয়ে দেয় এবং ফুল ও অঙ্কুরোদ্গম দীর্ঘায়িত করে।

উদ্ভিদ-দেহে এই হর্মোনগুলি কিভাবে কাজ করে, তার জৈব-রাসায়নিক পদ্ধতি এখনও পর্যন্ত সম্যকভাবে উপলব্ধি করা যায় নি। এই বিষয়ে ব্যাপক গবেষণার প্রয়োজন। এই হর্মোনগুলির জৈব-রাসায়নিক ক্রিয়াকলাপ যেদিন সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করা যাবে, সেদিন উদ্ভিদরাজ্যে তার উপযোগিতা পুরামাত্রায় কাজে লাগানো যাবে এবং শেষ পর্যন্ত আমরা হয়তো এই হর্মোনগুলির সাহায্যে উদ্ভিদের পুষ্টি ও বৃদ্ধির ক্ষেত্রে পুরাপুরি নিয়ন্ত্রণ সাধনে সক্ষম হবো।

ভারতের মহাকাশ গবেষণা

শঙ্কর চক্রবর্তী

গত কয়েক বছর ধরে মহাকাশ গবেষণার ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের একটি ভূমিকা তৈরি হয়ে চলেছে। চাঁদে মানুষের অবতরণের ঘটনার পাশে এই ভূমিকাকে তত উজ্জ্বল মনে না হলেও এর বৈজ্ঞানিক তাৎপর্য রয়েছে যথেষ্ট পরিমাণেই। বর্তমান প্রবন্ধে মহাকাশ-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ভারতের এই ভূমিকার একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় আমরা গ্রহণ করবার চেষ্টা করবো।

1962 সালে সংযুক্ত রাষ্ট্রীয় পরিষদের বৈজ্ঞানিক ও কারিগরীবিদ্যা-সংক্রান্ত উপসমিতি মহাকাশের শান্তিপূর্ণভাবে ব্যবহারের জন্যে নিরক্ষীয় এলাকার কোন অঞ্চলে একটি আন্তর্জাতিক সন্ধানী রকেট উৎক্ষেপণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার কথা বিবেচনা করেন। ভারত সরকার অগ্রণী হয়ে ভারতের জমিতে এই জাতীয় একটি পরীক্ষা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার আগ্রহ প্রকাশ করেন। ভারতের প্রস্তাব গৃহীত হবার পর ভারতের পারমাণবিক সংস্থার তৎকালীন ডিরেক্টর ডক্টর হোমি ভাবা এবং মহাকাশ গবেষণা কমিটির প্রধান ডক্টর বিক্রম সরাভাইয়ের উপর এই রকেট উৎক্ষেপণ কেন্দ্র সংগঠনের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। তিন মাসের মধ্যে ভারতের দক্ষিণ প্রান্তে থুম্বা নামে একটি জায়গাকে এই কাজের স্থান হিসেবে নির্বাচন করা হলো।

থুম্বা থেকে 1963 সালের 21শে নভেম্বর ভারতের প্রথম সন্ধানী রকেট উৎক্ষেপণ করা হয়েছিল।

থুম্বা

থুম্বা ভারতের দক্ষিণ প্রান্তে কেরালা রাজ্যের রাজধানী ত্রিভান্দ্রাম শহর থেকে 16 কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত। থুম্বার সবচেয়ে বড় ভৌগোলিক বিশেষত্ব হলো, জায়গাটি রয়েছে পৃথিবীর চৌম্বক বিষুবরেখার উপর। পৃথিবীর চৌম্বক বিষুবরেখার কাছাকাছি মহাদেশের জমির উপর থুম্বার মত রকেট উৎক্ষেপণ কেন্দ্র পৃথিবীর আর কোথাও নেই।

পৃথিবীর চৌম্বক বিষুবরেখার উপর কোন জায়গা থেকে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানকার্যের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। কারণ এখানে বায়ুমণ্ডলের ঊর্ধ্ব অঞ্চলে, ভূপৃষ্ঠের উপর 90 থেকে 130 কিলোমিটারের মধ্যে একটি Electrojet বা বিদ্যুৎস্রোত প্রবাহিত হচ্ছে। এই বিদ্যুৎস্রোতের প্রকৃতি এবং ধর্ম সামগ্রিকভাবে বিজ্ঞানীরা আজও সঠিকভাবে জেনে উঠতে পারেন নি। কিন্তু গোটা পৃথিবীর আবহাওয়া তৈরির পিছনে ঐ বিদ্যুৎস্রোতের যে একটি সুদূরপ্রসারী প্রভাব রয়েছে, তা সহজেই বোঝা যাচ্ছিল।

চৌম্বক বিষুবরেখার কাছে পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্র পুরাপুরিভাবে অনুভূমিক অবস্থায় রয়েছে। পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রভাব আবার ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে সবচেয়ে জোরালো এবং দক্ষিণ আমেরিকার উপর সবচেয়ে দুর্বল। পৃথিবীর চৌম্বক বিষুবরেখার কাছাকাছি নিম্ন অক্ষাংশের অঞ্চলে মহাজাগতিক রশ্মির অত্যন্ত শক্তিশালী কণাসমূহ এসে বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে।

এসব কারণের জন্যে থুম্বার উপরে কয়েক-শ' কিলোমিটার বিস্তৃত একটি অঞ্চল রয়েছে (এর অবস্থিতি হলো আয়নমণ্ডলের F স্তরের উপরে), যার বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানকার্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

চৌম্বক বিষুবরেখার উপর কোন জায়গা থেকে আয়নমণ্ডল-সংক্রান্ত গবেষণারও বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে।

বায়ুমণ্ডলের যে অঞ্চল পৃথিবীপৃষ্ঠের উপরে 30 কিলোমিটার থেকে 200 কিলোমিটারের মধ্যবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত, সন্ধানী রকেট হলো তার গবেষণার একমাত্র মাধ্যম। কারণ এই অঞ্চলটি যেমন গবেষণার যন্ত্রপাতিসজ্জিত বেলুনের পরিক্রমা-অঞ্চলের উর্ধ্বে, তেমনি আবার কৃত্রিম উপগ্রহগুলির পরিক্রমা-পথেরও অনেক নীচে অবস্থিত। এই অঞ্চলের অনুসন্ধানের কাজে থুম্বা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। সন্ধানী রকেটের পরিকল্পনা যথেষ্ট ব্যয়বহুল না হবার ফলে ভারতবর্ষের পক্ষে তাকে কাজে রূপ দেওয়াও সম্ভব ছিল।

সন্ধানী রকেট

1963 সালের 21শে নভেম্বর থুম্বা কেন্দ্র থেকে উর্ধ্বাকাশে প্রথম যে রকেটটি ছোঁড়া হয়, সেটি পাওয়া গিয়েছিল আমেরিকার National Aeronautics and Space Administration বা NASA নামে বৈজ্ঞানিক সংস্থার কাছ থেকে। রকেটটি ছিল এক স্তরবিশিষ্ট। ঘণ্টায় এটি প্রায় 3500 কিলোমিটার বেগ অর্জন করেছিল এবং পৃথিবী থেকে এর সর্বোচ্চ দূরত্ব দাঁড়িয়েছিল প্রায় 180 কিলোমিটার। পৃথিবী থেকে 100 কি. মি. দূরত্বে রকেটটির মাথায় বসানো Payload-রূপী আধার থেকে 30 কিলোগ্র্যামের মত সোডিয়াম বাষ্প নির্গত করে একটি কৃত্রিম মেঘের সৃষ্টি করা হয়। সূর্যালোকিত সেই মেঘের চেহারা যে রকম সর্পিল গতি লাভ করেছিল, দক্ষিণ ভারতের কয়েকটি জায়গা থেকে তার আলোকচিত্র গ্রহণ করে উর্ধ্বাকাশে বায়ুমণ্ডলের গতিবিধি ও তাপমাত্রা সম্বন্ধে বেশ কিছু নতুন তথ্য সংগৃহীত হয়।
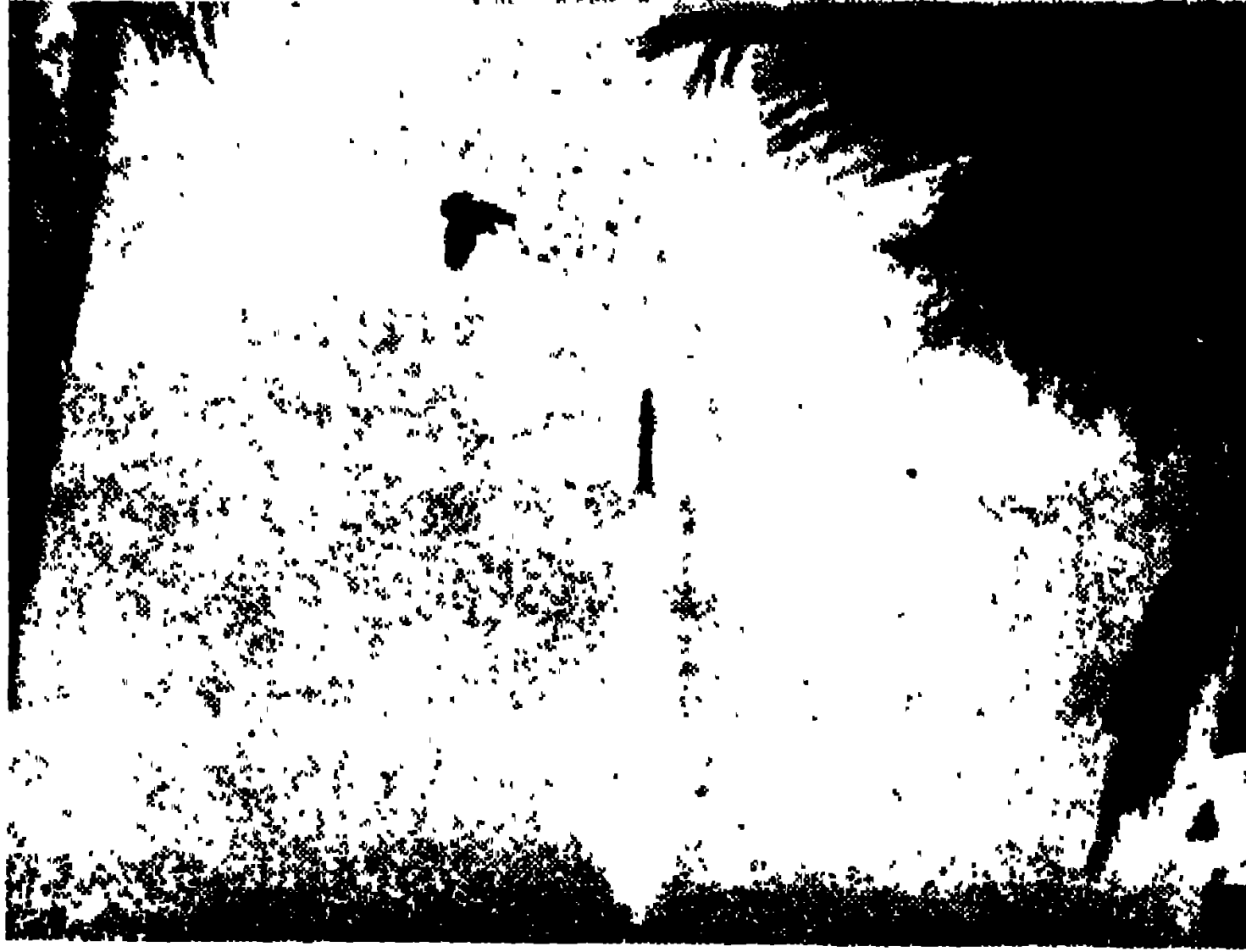
ভারতের থুম্বা কেন্দ্রে তৈরী একটি রকেট উৎক্ষেপণ করা হচ্ছে।

থুম্বাতে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ক্ষেত্র ক্রমেই বিস্তৃত হতে থাকে। ফ্রান্স, সোভিয়েট ইউনিয়ন, পশ্চিম জার্মেনী, জাপান প্রভৃতি দেশের বিজ্ঞানীরা এখানে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাকার্যে অংশগ্রহণ করতে থাকেন।

1967 সালের 31শে অগাষ্ট থুম্বা থেকে রোহিণী নামে দুটি রকেট ছোঁড়া হয়। এই রকেট দুটির সমগ্র অংশ তৈরি করেছিলেন ভারতীয়

বিজ্ঞানীরা—এটিই ছিল ঘটনাটির সবচেয়ে বড় বিশেষত্ব।

থুম্বা থেকে গত কয়েক বছর ধরে ভূপৃষ্ঠের প্রায় 50 কি. মি. উচ্চতায় বায়ুমণ্ডল-সংক্রান্ত গবেষণার জন্যে মেনকা নামে বেশ কিছু আবহাওয়া রকেট পাঠানো হয়েছে। ভারতের মৌসুমী বায়ুর গতি-প্রকৃতি বোঝবার জন্যে ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে ব্যাপক আবহাওয়া-সংক্রান্ত অনুসন্ধানের প্রয়োজনীয়তা বিজ্ঞানীরা অনেক দিন ধরেই উপলব্ধি করছিলেন। টাইরস ও নিম্বাস শ্রেণীর আবহাওয়া উপগ্রহগুলির কাছ থেকে Automatic Picture Transmission System-এর মাধ্যমে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের মত ভারত মহাসাগরীয় এলাকারও বহু ছবি (প্রতিটি প্রায় 10 লক্ষ কিলোমিটারব্যাপী অঞ্চল জুড়ে) বোম্বাইয়ের কোলাবাতে আবহাওয়া কেন্দ্রের হাতে এসে পৌঁছয়। এই সব ছবির মাধ্যমে ভারত মহাসাগরে নিরক্ষীয় অঞ্চলের উপরে জুলাই মাসেও সবচেয়ে ঘন দুটি মেঘের স্তরের অস্তিত্ব ধরা পড়ে, যে দুটি স্তরের মাঝে আবার স্বল্প ঘন একটি মেঘের স্তরও ছিল। ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর অনুসন্ধানের কাজে একে একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্যরূপে গণ্য করা হচ্ছে।

থুম্বা বর্তমানে একটি আন্তর্জাতিক আবহাওয়া গবেষণা কেন্দ্ররূপে গড়ে উঠেছে। থুম্বার বিশেষ ভৌগোলিক অবস্থানের জন্যে শান্তিপূর্ণ কাজে মহাকাশ গবেষণার সহযোগিতার উদ্দেশ্যে ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী 1968 সালের গোড়ার দিকে থুম্বা কেন্দ্রটিকে রাষ্ট্রসংঘের হাতে অর্পণ করেন।

1969 সালের 26শে ফেব্রুয়ারী থুম্বাতে সেন্টর নামে একটি রকেটের পরীক্ষার কাজ সাফল্য-মণ্ডিত হয়। ফ্রান্সের সঙ্গে সহযোগিতায় ভারতীয় বিজ্ঞানী ও ইঞ্জিনীয়ারেরা দুই স্তরবিশিষ্ট এই রকেটটিকে এদেশেই তৈরি করেন। ফ্রান্সেরই সাহায্যে সেন্টর রকেটের জন্যে প্রয়োজনীয় কঠিন জ্বালানী তৈরির একটি কারখানাও থুম্বাতে চালু করা হয়েছে, যেখানে পরবর্তী কালে সম্পূর্ণ-ভাবে ভারতীয় মালমশলার সাহায্যে জ্বালানী তৈরির ব্যবস্থাকে গড়ে তোলা হবে।

মহাকাশ গবেষণা

থুম্বা মহাকাশ কেন্দ্র থেকে এপর্যন্ত 70টিরও বেশী সন্ধানী রকেট মহাকাশে পাঠানো হয়েছে এবং ভারতে তৈরী 50টিরও বেশী রকেটকে সাফল্যের সঙ্গে ছোঁড়া হয়েছে। রকেট প্রকল্পের মাধ্যমে ভারতের মহাকাশ গবেষণার বৈজ্ঞানিক উদ্দেশ্যকে প্রধানতঃ চারটি ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমতঃ, উর্ধ্বাকাশের অনুসন্ধানের মধ্য দিয়ে আয়নমণ্ডলের তড়িতাবিষ্ট কণিকা বা আয়ন এবং তড়িতনিরপেক্ষ (Neutral) কণিকা সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করা। দ্বিতীয়তঃ, ভূ-চৌম্বক নিরক্ষরেখার উপর যে Electrojet বা বিদ্যুৎ-স্রোত প্রবাহিত হচ্ছে, তার সঙ্গে যুক্ত চৌম্বক ও বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র সম্বন্ধে গবেষণার কাজ পরি-চালনা এবং সৌরদেহের ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সেগুলি কিভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে, তা পর্যবেক্ষণ করা। তৃতীয়তঃ, বায়ুমণ্ডলের উপরের দুটি স্তর—ষ্ট্র্যাটোস্ফিয়ার ও মেসোস্ফিয়ার অঞ্চলে আবহবিদ্যা-সংক্রান্ত গবেষণা এবং চতুর্থতঃ জ্যোতির্বিদ্যার কয়েকটি ক্ষেত্র, বিশেষ করে দূরবর্তী নক্ষত্রলোক থেকে কি পরিমাণে রশ্মি বিকিরিত হচ্ছে, তার পরিমাপ সংগ্রহ করা।

থুম্বা থেকে রকেট ক্ষেপণের মাধ্যমে নিরক্ষী অঞ্চলের উপরে বায়ুমণ্ডলের উর্ধ্বস্তরের গঠন প্রকৃতি ও গতিবিদ্যা-সংক্রান্ত বহু তথ্য লা' করা সম্ভব হয়েছে। রকেটের মাথায় বসানো বৈজ্ঞানিক আধার থেকে বাষ্পের মেঘ ছড়িয়ে দিয়ে ভূপৃষ্ঠের উপরে 30 থেকে 60 কিলোমিটারের মধ্যবর্তী অঞ্চলে বায়ুর বেগ মাপা হয়েছে। আবা

বায়ুমণ্ডলের মেসোস্ফিয়ার অঞ্চলে ঐ আধার থেকে লক্ষ লক্ষ তামার টুকরা ছড়িয়ে দিয়ে রেডারের সাহায্যে ঐ টুকরাগুলির গতি-বিধির উপর লক্ষ্য রেখে সেখানে বায়ুর গতি এবং দিক নির্ণয় করাও সম্ভব হয়েছে।

ভারতীয় বিজ্ঞানীরা আয়নমণ্ডলের বৈদ্যুতিক প্রকৃতি ও গঠনসংক্রান্ত গবেষণার জন্যে রকেটের মাথায় চাপিয়ে Electronion probe, Plasma roise probe, Ultraviolet detector এবং Ion mass-spectrometer জাতীয় যন্ত্র পাঠিয়েছেন।

ভূ-চৌম্বক নিরক্ষরেখার উপর বিদ্যুৎস্রোতের গঠন, বিস্তৃতি এবং গতিবিধি সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে রকেটের মধ্যে Proton Precession Magnetometer নামক যন্ত্র পাঠানো হয়েছে। জানা গেছে, থুম্বার 105 কিলোমিটার উপরে এই বিদ্যুৎস্রোতের সর্বোচ্চ তীব্রতা হলো প্রতি বর্গ-কিলোমিটার ক্ষেত্রে 500 অ্যাম্পিয়ারের মত।

নৈনিতালে অবস্থিত উত্তর প্রদেশের রাষ্ট্রীয় মানমন্দির, আমেরিকার Smithsonian Astrophysical Observatory-র সঙ্গে সহযোগিতায় গত দশ বছর ধরে আলোকরশ্মির সাহায্যে কৃত্রিম উপগ্রহগুলির গতিপথ পর্যবেক্ষণের কাজে নিযুক্ত রয়েছে। এই জাতীয় কাজ করা হচ্ছে পৃথিবীর আরো এগারটি কেন্দ্র থেকে। নৈনিতাল এবং অন্যান্য কেন্দ্রের সংগৃহীত তথ্যের সাহায্যে পৃথিবীর অভিকর্ষ ক্ষেত্র এবং তার চেহারার সঠিক জ্যামিতিক পরিমাপ (Geodesy নামে বিজ্ঞানশাস্ত্রের যা বিষয়বস্তু) নির্ধারণ করা এবং পৃথিবীর কেন্দ্রের পরিপ্রেক্ষিতে ঐ স্থানগুলির স্থানাঙ্ক (Co-ordinates) প্রায় নির্ভুলভাবে 15 মিটারেরও কম বিচ্যুতির সঙ্গে নির্ণয় করা সম্ভব হয়েছিল। এভাবে সংগৃহীত আরো কয়েকটি তথ্য থেকে জানা গিয়েছিল যে, ত্রিভান্দ্রামের কাছে সমুদ্রপৃষ্ঠ সিঙ্গাপুরের নিকটবর্তী সমুদ্রপৃষ্ঠের তুলনায় পৃথিবীর কেন্দ্রের 90 মিটার কাছে রয়েছে এবং ডোভারের কাছাকাছি ইংলিশ চ্যানেলের সমুদ্রপৃষ্ঠের তুলনায় এই নৈকট্যের পরিমাণ 140 মিটারের মত।

1962 সালে মহাকাশে X-রশ্মি নির্গমনকারী নক্ষত্রের আবিষ্কার জ্যোতির্বিদ্যার জগতে এক নতুন গবেষণাক্ষেত্র উন্মুক্ত করে দিয়েছিল। এই জাতীয় বহু নক্ষত্র থেকেই কোন আলোক বা রেডিও-তরঙ্গ নির্গত হতে দেখা যায় না। 1968 সালের এপ্রিল মাসে আমেদাবাদের Physical Research Laboratory এবং টোকিও বিশ্ব-বিদ্যালয়ের Institute of Space and Aeronautical Science, X-রশ্মি জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ে একটি যুক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করে। SCO-X-1, Centaurus-X-2 এবং TAU-X-1 প্রভৃতি নক্ষত্র থেকে নির্গত X-রশ্মির পরিমাণ ও শক্তির মাত্রা নিরূপণের জন্যে ঐ দুই বিজ্ঞান সংস্থা যৌথ-ভাবে রকেট উৎক্ষেপণ করেন। দক্ষিণ গোলার্ধের আকাশের একটি সাধারণ পর্যবেক্ষণ বা জরীপের কাজ করাও ঐ পরীক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। SCO-X-1 নক্ষত্রটি থেকে নির্গত আলোক ও X-রশ্মির মধ্যেকার পারস্পরিক সম্পর্ক আবিষ্কার করবার জন্যে একই সঙ্গে ভারতের কোদাইকানাল মানমন্দির ও টোকিওর জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক মানমন্দির থেকে নজর রাখা হয়। মাঝে মাঝেই সন্ধানী রকেট উৎক্ষেপণের দ্বারা ঐ নক্ষত্রটি থেকে X-রশ্মির নির্গমনের পরিমাণ সময়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কিভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে, তার উপর-নজর রাখা হয়েছে।

আগামী দিনের পরিকল্পনা

থুম্বা কেন্দ্রে গত আট বছরের বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর আগামী দশকের জন্যে ভারতের মহাকাশ গবেষণার ক্ষেত্রে এক বিস্তৃত কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। এই কর্মসূচীর অন্যতম

প্রধান লক্ষ্য—মহাকাশ গবেষণার জন্যে প্রয়োজনীয় যাবতীয় সরঞ্জাম তৈরির ব্যাপারে যতদূর সম্ভব স্বাবলম্বিতা অর্জন করা।

থুম্বা একটি জনবহুল এলাকায় অবস্থিত এবং থুম্বা থেকে কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপণ করা যাবে একমাত্র পশ্চিম দিকেই। ফলে পৃথিবী পশ্চিম থেকে পুবে আপন অক্ষের উপর ঘণ্টায় যে 1760 কিলোমিটার বেগে ঘুরে চলেছে, সেটি আর কৃত্রিম উপগ্রহের বাহক রকেটের দেহে যুক্ত হবে না। এই অসুবিধাগুলির কথা ভেবে ভারতের পূর্ব উপকূলে অন্ধ্র প্রদেশে শ্রীহরিকোটার কাছে একটি দ্বীপে আর একটি রকেট উৎক্ষেপণ কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এখান থেকে রকেটগুলিকে ছোঁড়া হবে পুব দিকে, ফলে পৃথিবীর ঘণ্টায় 1760 কিলোমিটাররূপী বেগ আপনা-আপনি ওদের দেহের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাবে।

আগামী দশকের ভারতীয় মহাকাশ কার্যক্রমের আর একটি কাজ হলো—সন্ধানী রকেটের সাহায্যে ভারতের মৌসুমী বায়ুর গতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে আমাদের ধারণাকে আরো উন্নত করা এবং মাঝারি ধরণের আবহাওয়ার পূর্বাভাষকে আরো নিখুঁত করা। এর ফলে আমাদের জাতীয় অর্থনীতিও যথেষ্ট পরিমাণে উপকৃত হবে, যেহেতু বৃষ্টির উপর আমাদের কৃষিকাজের এক বিরাট অংশকে এখনো নির্ভর করতে হয়।

থুম্বা কেন্দ্রে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে নিরক্ষীয় অঞ্চলে, বিশেষ করে ভারত মহাসাগরীয় এলাকায় আবহবিদ্যা বিষয়ে আমাদের পূর্বেকার ধারণা ইতিমধ্যেই অনেক বেশী সম্পূর্ণতা লাভ করেছে।

ত্রিভান্দ্রামে কৃত্রিম উপগ্রহগুলির গতিপথ পর্যবেক্ষণকারী একটি কেন্দ্র অদূর ভবিষ্যতে গড়ে তোলা হবে। ঐ কেন্দ্রের সংগৃহীত তথ্যের সাহায্যে দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন জায়গার স্থানাঙ্ক পূর্বের তুলনায় অনেক বেশী নির্ভুলভাবে নির্ধারণ করা সম্ভব হবে।

আমেরিকার NASA-র সঙ্গে ভারতের একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। এই চুক্তি অনুযায়ী আমেরিকা 1972 সালের মাঝামাঝি নাগাদ ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলের উপর ভূপৃষ্ঠ থেকে 35,900 কিলোমিটার দূরে একটি বৃত্তাকার কক্ষপথে একটি কৃত্রিম উপগ্রহ প্রতিষ্ঠা করবে এবং দু-বছরের জন্যে ওর ব্যবহারের সম্পূর্ণ সুযোগ ভারতের হাতে তুলে দেবে। সমগ্র ভারতভূমি থেকে কৃত্রিম উপগ্রহটিকে সব সময়েই মাথার উপরে একই জায়গায় স্থিরভাবে অবস্থান করতে দেখা যাবে।

উপগ্রহটির দৃশ্যগোচর এলাকার দুটি বহু দূরবর্তী অঞ্চল এই synchronous বা সমগতিসম্পন্ন কৃত্রিম উপগ্রহটির মাধ্যমে পরস্পরের মধ্যে অতি নিখুঁত রেডিও ও টেলিভিসন যোগাযোগ ব্যবস্থাকে গড়ে তুলতে পারবে। টেলিভিসন অনুষ্ঠানকে বহু দূরবর্তী কোন স্থানে পৌঁছে দেবার জন্যে যে একাধিক রিলে ষ্টেশনের প্রয়োজন হয়, এক্ষেত্রে সে ছাড়াই কাজ চলবে। আমেদাবাদে, কৃত্রিম উপগ্রহের সঙ্গে পরীক্ষামূলকভাবে যোগাযোগ স্থাপনের জন্যে যে কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, তা আলোচ্য কৃত্রিম উপগ্রহটির কাছে ভারতের টেলিভিসন অনুষ্ঠানকে পৌঁছে দেবে।

ভারতীয় বিজ্ঞানীদের দৃঢ় বিশ্বাস, আগামী 1973 সাল নাগাদ তাঁরা ভারতের প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহকে মহাকাশে প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন। কৃত্রিম উপগ্রহটির বাহক রকেট হবে চারটি পর্যায়বিশিষ্ট, রকেটের মাথায় চাপানো উপগ্রহরূপী বৈজ্ঞানিক আধারটির ওজন হবে 30 কিলোগ্র্যামের মত এবং ভূপৃষ্ঠ থেকে 400 কিলোমিটারের দূরবর্তী একটি কক্ষপথে বস্তুটি

পৃথিবীকে পরিক্রমা করে চলবে। কৃত্রিম উপগ্রহের বাহক রকেট, আভ্যন্তরীণ এবং রকেটের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণের উপযোগী জটিল যন্ত্রপাতি সংক্রান্ত গবেষণা এবং নির্মাণের কাজ থুম্বার মহাকাশ-বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিবিদ্যা কেন্দ্রে চলেছে।

এই দশকের শেষের দিকে 1980 সাল নাগাদ মহাকাশ-বিজ্ঞানে ভারতের অগ্রগতি যে পর্যায়ে পৌঁছুবে, তাতে প্রায় 1200 কিলোগ্র্যাম ভরবিশিষ্ট একটি রেডিও ও টেলিভিসন যোগাযোগ রক্ষাকারী কৃত্রিম উপগ্রহকে ভূপৃষ্ঠের 35,900 কিলোমিটার উর্ধ্বে একটি বৃত্তাকার কক্ষপথে প্রতিষ্ঠার আশা রাখেন ভারতীয় বিজ্ঞানীরা। ওটি হবে একটি synchronous কৃত্রিম উপগ্রহ এবং ওকে সব সময়ে একই জায়গায় অবস্থান করতে দেখা যাবে।

মহাকাশ-বিজ্ঞানে ভারতের অগ্রগতি ক্রমেই সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে চলবে, সে আশাই আমরা পোষণ করি।

পেঁয়াজ

প্রণবকুমার তপস্বী*

খাদ্যশস্যের মধ্যে পেঁয়াজ একটি পরিচিত নাম। পৃথিবীর সর্বত্র এর জনপ্রিয়তা অবিসংবাদিত। পেঁয়াজের বৈজ্ঞানিক নাম Allium cepa, এটি লিলি পরিবারের অন্তর্গত। এর আদি জন্মস্থান মধ্যপ্রাচ্যে। তাছাড়া পশ্চিম এশিয়া ও ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলেও প্রাচীনকাল থেকে এর চাষ হয়ে আসছে। বর্তমানে পেঁয়াজ পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই জন্মায়—বিশেষ করে উষ্ণ অঞ্চলে এর ব্যাপক চাষ হয়। ভারতবর্ষে উৎপন্ন প্রধান প্রধান শস্যের মধ্যে পেঁয়াজ একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। অধিকাংশ তৈরী খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে পেঁয়াজ একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। মাছ, মাংস কিংবা ডিমের তরকারীতে এটি অবশ্য প্রয়োজনীয়। তরকারীর স্বাদ ও মান বাড়াতে পেঁয়াজের বিকল্প নেই।

পেঁয়াজের উপকারিতা—পেঁয়াজ চক্ষুরোগের একটি ভাল ওষুধ। চোখ টনটন করা, চোখ দিয়ে জল পড়া, কিংবা চোখের দৃষ্টি কমে যাওয়া, চোখ লাল হওয়া ও পিঁচুটি পড়া প্রভৃতি রোগ পেঁয়াজ উপশম করে। প্রত্যহ সকালে বা রাত্রে শোবার আগে একটি করে পেঁয়াজ চিবিয়ে খেলে চোখের কোন রোগের তেমন আশঙ্কা থাকে না এবং চোখের দৃষ্টিশক্তিও বৃদ্ধি পায়।

দাঁত ভাল রাখবার জন্যে পেঁয়াজ খুব উপকারী। পেঁয়াজ চিবানোর ফলে এথেকে মুখের মধ্যে যে রস নির্গত হয়, তা দাঁত এবং মুখের ক্ষতিকারক জীবাণুগুলিকে ধ্বংস করে অথবা ঐগুলির আক্রমণের আশঙ্কা দূর করে। এর ফলে দাঁত ও মুখগহ্বর জীবাণুশূন্য হয় এবং সজীবতা লাভ করে। সম্প্রতি একজন খ্যাতনামা রাশিয়ান চিকিৎসক মন্তব্য করেছেন যে, কেউ যদি প্রত্যহ একটি করে পেঁয়াজ চিবিয়ে খায়, তাহলে সে কখনও দাঁত বা মাড়ির রোগে ভুগবে না।

পেঁয়াজের আর একটি গুণ হচ্ছে—উষ্ণ অঞ্চলে গ্রীষ্মকালে লু-এর আক্রমণের বিরুদ্ধে এর ব্যবহার। যদি কেউ প্রত্যহ একটি করে পেঁয়াজ খায়, তবে সে লু-এর আক্রমণের

*এগ্রোনোলজি রিসার্চ ইউনিট, ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনষ্টিটিউট, কলিকাতা-35

বিরুদ্ধে পূর্ণ প্রতিরোধশক্তি অর্জন করবে। অনেকের ধারণা, কেউ যদি সারাদিন পকেটে একটি করে পেঁয়াজ রাখে—তাতেও নাকি লু-এর আক্রমণ ঠেকিয়ে রাখা যায়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, গরম দেশে মারাত্মক লু-এর আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যে পেঁয়াজ মানুষের পরম বন্ধুর মত কাজ করে।

পেঁয়াজের সবচেয়ে বড় গুণ (যার খবর এখনও অনেকেই জানেন না) হচ্ছে হৃদ্‌রোগে এর বিশিষ্ট ভূমিকা। অনেকেই জানেন, শিরার অভ্যন্তরে রক্ত জমাট বেঁধে যাওয়া হৃদ্‌রোগের একটি অন্যতম কারণ। রক্তজমাট বাঁধবার কাজে অন্যতম উল্লেখযোগ্য উপাদান হচ্ছে ফাইব্রিন (Fibrin)। এটি সরু সুতার মত জিনিষ, যা রক্তের কোষগুলিকে ঘিরে ধরে প্লেটলেট নামক আর এক প্রকার কোষের সহযোগিতায় রক্তকে জমাট বাঁধায়। সাধারণতঃ শরীরের মধ্যে এই রক্ত জমাট বাঁধবার কাজ হয় না। কোন জায়গা কেটে গেলে রক্ত বাইরে বেরিয়ে এসে জমাট বাঁধে। কিন্তু শরীরের শিরা-উপশিরার মধ্যে হঠাৎ যদি ফাইব্রিন রক্ত জমাট বাঁধবার কাজ আরম্ভ করে দেয়, তখন সেই জমাট-বাঁধা রক্ত স্বাভাবিক রক্ত চলাচলের পথ বন্ধ করে দেয় এবং হৃৎপিণ্ডের উপর প্রবল চাপের সৃষ্টি করে। এটাই হৃদ্‌রোগের একটি অন্যতম কারণ। পেঁয়াজের ভূমিকা হলো, এটি জমাট-বাঁধা রক্তের মূল কারণ ফাইব্রিনকে ফাইব্রিনোলাইসিস (Fibrinolysis) অর্থাৎ তরল করে দেয়, যাতে জমাট রক্তও অপসারিত হয়ে যায় এবং রক্তের চলাচল আবার স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। ফ্রান্সে একটা রীতি প্রচলিত আছে, যখন কোন ঘোড়ার পায়ের শিরার মধ্যে রক্ত জমাট বাঁধে, তখন তাকে পেঁয়াজের তরকারী খাইয়ে সারিয়ে তোলা হয়। এই সূত্র ধরে তিনজন ভারতীয় বিজ্ঞানী—ডাঃ এন. এন. গুপ্ত, আর. মেহরোত্রা এবং এ. সরকার 1966 সালে সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেন যে, চর্বিযুক্ত খাদ্যের সঙ্গে পেঁয়াজ যোগ করে হৃদ্‌রোগীকে খাওয়ালে রোগীর রক্তের ত্বরিত জমাট বেঁধেযাওয়া কমে তো যায়ই, উপরন্তু ফাইব্রিনের রক্ত জমাট বাঁধবার ক্ষমতাও কমিয়ে দেয় অর্থাৎ ফাইব্রিনের তরল হয়ে যাবার প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করে। এর পর ডাঃ মেনন ও তাঁর সহকর্মীরা ভাজা পেঁয়াজ ও সিদ্ধ পেঁয়াজ নিয়ে আরও কাজ করেন এবং দেখান যে, রক্তের ফাইব্রিনোলাইসিসের ক্ষমতা ভাজা পেঁয়াজের আরও বেশী পরিমাণে আছে।

পেঁয়াজের মধ্যে আছে মূল স্নেহজাতীয় পদার্থগুলি (Essential oils), Allypropyl, Disulphide, Catechols, Thiopropionealdehyde, Protocatechuic acid, Thiocyanates এবং কিছু ক্যালসিয়াম, ফস্‌ফরাস, লৌহ এবং ভিটামিন। এগুলির মধ্যে কোন্‌টি বা কোন্‌গুলি এই ফাইব্রিনোলাইসিস ত্বরান্বিত করবার কারণ, তা এখনও জানা সম্ভব হয় নি। জানা গেলে শুধু সেই জিনিষটি দিয়েই হৃদ্‌রোগের আরও ভাল ওষুধ তৈরি করা সম্ভব হতে পারে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, হৃদ্‌রোগীদের পক্ষেও পেঁয়াজ একটি বিশেষ উপকারী পদার্থ। প্রত্যেক হৃদ্‌রোগী বা প্রেসারের রোগী প্রত্যহ কিছুটা করে ভাজা পেঁয়াজ বা পেঁয়াজি অথবা পেঁয়াজ সিদ্ধ খান (অবশ্য পেটের অবস্থা বুঝে) তাহলে হৃদ্‌রোগের হঠাৎ আক্রমণ থেকে কিছুটা নিশ্চিন্ত থাকতে পারবেন। প্রত্যহ পেঁয়াজ ভক্ষণ হৃদ্‌রোগের অন্য যে কোন পেটেন্ট ওষুধ অপেক্ষা অনেক বেশী ফলদায়ক।

চিকিৎসার ক্ষেত্রে পেঁয়াজের আরও অনেক ব্যবহার দেখা যায়। দিনে দিনে পেঁয়াজের আরও অনেক গুণ আবিষ্কৃত হচ্ছে। আমাশয়, সর্দি, ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রভৃতি রোগেও পেঁয়াজ ভাল কাজ করে।

মহাবিশ্ব

আব্দুল হক খন্দকার *

দিনের বেলায় সূর্যের প্রখর আলোয় মহাকাশের অনেক কিছুই আমাদের দৃষ্টির অগোচরে থেকে যায়। মনে হয়, আমাদের এই পৃথিবী এবং দূর আকাশের সূর্য ছাড়া বিশ্বলোকে যেন বিস্ময়কর আর তেমন কিছুই নেই। কিন্তু সূর্য যখন বিদায় নেয়, তখন বেশ বোঝা যায়—মহাকাশে শুধু সূর্য আর পৃথিবীই নয়, আরও অনেক রহস্যময় বস্তু রয়েছে—আকাশের চাঁদ, রাশি রাশি তারকা, বিচিত্র নীহারিকা, আবছা মেঘের মত দিগন্তবিস্তৃত ছায়াপথ ইত্যাদি। আকাশের এই জ্যোতিষ্কগুলির মধ্যে কোনটি উজ্জ্বল, কোনটি নিষ্প্রভ, কোনটি বা মিট্‌মিট করে জ্বলে, কোনটিকে আবার মনে হয় যেন স্থির, নিষ্কম্প। যেগুলি মিট্‌মিট করে জ্বলে, সেগুলি হলো তারা, আর যেগুলি স্থির কিরণ ছড়ায়, সেগুলি হলো গ্রহ অথবা উপগ্রহ। গ্রহের সংখ্যা অবশ্য বেশী নয়—জানার মধ্যে এখন এদের সংখ্যা হলো নয়টি, কিন্তু তারার সংখ্যার কোন পরিমাপ করা সম্ভব নয়—সারা জীবনেও গুণে শেষ করা যাবে না।

এদের মধ্যে ঔজ্জ্বল্যে এবং দীপ্তিতে যেটি সহজেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, সেটি হলো চাঁদ—পৃথিবীর একমাত্র উপগ্রহ, সকল জ্যোতিষ্করাশির মধ্যে আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী। চাঁদকে যদিও আমরা সবচেয়ে কাছের প্রতিবেশী বলছি—তবুও পৃথিবী থেকে তার দূরত্ব প্রায় দু-লক্ষ উনচল্লিশ হাজার মাইলের মত। রাতের আকাশে চাঁদ সবচেয়ে উজ্জ্বল দেখালেও তার কিরণ কিন্তু স্নিগ্ধ। অবশ্য এই আলো তার নিজস্ব নয়, সূর্যের আলো চাঁদের বুকে প্রতিফলিত হয়েই এই স্নিগ্ধ আলোর উৎপত্তি ঘটিয়ে থাকে। পৃথিবী থেকে চাঁদের জন্ম অধুনা হয়েছে—চান্দ্রশিলা পরীক্ষা করে সম্প্রতি এই মতবাদ সম্বন্ধে অবশ্য সন্দেহ করা হয়েছে।

পৃথিবী থেকে সূর্যের গড় দূরত্ব প্রায় 9 কোটি 30 লক্ষ মাইল। চাঁদ পৃথিবীর চেয়ে আকারে ছোট—পৃথিবীর প্রায় এক-চতুর্থাংশ, কিন্তু সূর্য পৃথিবীর চেয়ে আয়তনে 13 লক্ষ গুণ বড়, অর্থাৎ সূর্যের দেহের মধ্যে পৃথিবীর মত 13 লক্ষ বিরাটকায় বস্তুপিণ্ড অনায়াসে স্থান পেতে পারে। পৃথিবী থেকে বহু দূরে আছে বলেই সূর্যকে অত ছোট দেখা যায়—আসলে কিন্তু সূর্যই আমাদের সব কিছু। সূর্য একদিকে যেমন আমাদের পৃথিবীর জন্মদাতা, তেমনি আমাদের সকল সত্তা—আমাদের জীবনধারণের সকল রকমের শক্তি এবং কর্মপ্রেরণার মূল উৎস। শুধু পৃথিবীর উপরই যে সূর্যের আধিপত্য, তা নয়—সমগ্র সৌরজগৎ জুড়েই রয়েছে তার বিশাল প্রভাব। নয়টি গ্রহ এবং তাদের উপগ্রহ (সর্বমোট 31টি) ও গ্রহাণুপুঞ্জ প্রভৃতি নিয়ে মহাশূন্যের কোটি কোটি মাইল জুড়ে যে সৌরজগৎ বিস্তৃত, তার মধ্যে সূর্যই একচ্ছত্র সম্রাট। তার বিপুল মহাকর্ষের আকর্ষণে গ্রহগুলি তার সৃষ্টির আদি থেকে তাকে অবিরাম প্রদক্ষিণ করে চলেছে। সূর্যের বিপুল শক্তির সামান্য অংশ লাভ করেই পৃথিবী হয়েছে এমন শস্যশ্যামলা, অগণিত জীবজন্তুর বাসস্থল এবং বিচিত্র বৃক্ষলতা ও ফল-ফুলে হয়েছে সমৃদ্ধ। সূর্যের তাপ ও আলোর প্রেরণায় পৃথিবীতে জেগেছে

* পি. সি. এস. আই. আর. ঢাকা—5, পূর্ব-পাকিস্থান।

একদিন প্রাণের স্পন্দন, আর সেই প্রাথমিক জীবনস্পন্দন কালে বর্ধিত এবং বিস্তৃত হয়ে দিনে দিনে ভরে তুলেছে পৃথিবীর এই বিরাট সম্পদ।

সূর্যের অভাবে চাঁদ যেমন অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে যাবে—তার এই কিরণ যেমন আর দেখা যাবে না কোন দিন, তেমনি পৃথিবীও হারাবে তার যাবতীয় সম্পদ—গাছপালা, জীব-জন্তু সব কিছুই বিলুপ্ত হয়ে যাবে। পৃথিবীতে চিরতরে সাঙ্গ হবে সকল সৌন্দর্য, সকল জীবজন্তুর জীবনধারা—আলোর অভাবে অন্ধকারে আচ্ছন্ন হবে সমগ্র পৃথিবী আর তাপের অভাবে ডুবে যাবে সে তুহীন শীতলতার অতলে।

কিন্তু এমন যে বিরাট সূর্য, যার তুলনায় পৃথিবী অনেক ক্ষুদ্র, জানা গেছে—সেই সূর্যও শূন্য আকাশে তেমন কোন গৌরবের আসনে সমাসীন নয়। সূর্যের চেয়েও বিরাট—তার চেয়েও উজ্জলতর বস্তু বিরাজ করছে মহাশূন্যের বুকে—পৃথিবী থেকে যাদের দূরত্ব আরও অনেক বেশী। সেগুলকে আমরা বলি নক্ষত্র বা তারকা। অবশ্য সব তারকাই যে সূর্যের চেয়ে বড় এবং বেশী উজ্জল তা নয়, তবে বেশীর ভাগ তারকাই সূর্যের চেয়ে বড়—তার চেয়েও উজ্জল। অবশ্য ছোট কিংবা বড়ই হোক, সব তারকাই রয়েছে পৃথিবী থেকে বহু দূরে, আর তাদের সংখ্যারও কোন সীমা নেই। খালি চোখেই আকাশে 7 হাজারের মত তারকা দেখতে পাওয়া যায়। ক্যালিফোর্ণিয়ার মাউন্ট প্যালোমারের দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে 10 কোটির মত তারকা দৃষ্টিগোচর হয়ে থাকে। আকাশের আলোকচিত্র নিলে এই সংখ্যা দাঁড়ায় আরও অনেক বেশী। আবার এমন অনেক তারকাও আছে, যেগুলি নিষ্প্রভ—এক কালে জ্বলে জ্বলে সেগুলি এখন নিবে গেছে।

কাজেই বিশ্বে তারকার সংখ্যা নির্ণয় করা সত্যই কঠিন। প্রখ্যাত বিজ্ঞানী জেম্‌স জীন্‌স তারকাগুলির সংখ্যার হিসাব দিতে গিয়ে তাই নিরুপায় হয়ে বলেছেন যে, পৃথিবীর সমস্ত সাগর উপকূলে যত বালিকণা রয়েছে, সমগ্র বিশ্বে তারকার সংখ্যাও অনেকটা তেমনি।

যাহোক, এই তারকারাশি যেমন অগণিত, পৃথিবী থেকে তাদের দূরত্বও তেমনি অভাবনীয়। আমাদের সবচেয়ে কাছে রয়েছে যে তারকাটি, তার দূরত্ব 25,000,000,000,000 মাইলের মত; অর্থাৎ ঘণ্টায় 25 হাজার মাইল গতি-সম্পন্ন রকেটের পক্ষেও এই তারকাটিতে পৌঁছুতে প্রায় 1 লক্ষ 15 হাজার বছর লাগবে। সর্বাপেক্ষা দ্রুতগামী রকেটে চড়ে সারাজীবন পাড়ি দিয়ে তো দূরের কথা, সবচেয়ে দীর্ঘজীবী মানুষের বয়সকে বিশ হাজার গুণ বাড়িয়ে দিয়েও সেই সময়ের মধ্যে এই তারকাটির কাছাকাছি পৌঁছুতে পারা যাবে কিনা সন্দেহ! এর পরের তারকাটির দূরত্ব মাইলের হিসাবে প্রকাশে যদি তেমন অসুবিধা নাও দাঁড়ায়, তথাপি তার পরের তারকাগুলির দূরত্ব মাইলের হিসাবে প্রকাশ করতে গেলে হয়রানির আর অন্ত থাকবে না। কাজেই এই অসুবিধার জন্যে বিজ্ঞানীরা তারকাগুলির দূরত্ব নির্ণয় করতে অন্য এক মাপকাঠির সাহায্য নিয়েছেন। সে মাপকাঠি হলো আলোর গতি। মাত্র এক সেকেণ্ডেই আলো 1 লক্ষ 86 হাজার মাইল দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে। এক সেকেণ্ড আলো যতটা পথ পাড়ি দেয়, তা যদি বেশী দূরের জিনিষের দূরত্ব পরিমাপ করবার কাজে ব্যবহার করা যায়, তবে তাদের দূরত্ব প্রকাশের কাজটি যেমন সহজ হয়, তেমনি তাদের দূরত্বের পরিমাপ করবার ব্যাপারেও সুবিধা হয়। সূর্যের কথাই ধরা যাক। পৃথিবী থেকে সূর্য যে 9 কোটি 30 লক্ষ মাইল দূরে রয়েছে, সে দূরত্ব যদি আলোর মাপকাঠিতে মাপা যায়, তবে সূর্যের দূরত্ব দাঁড়াবে আট আলোক-মিনিটের সামান্য কিছু বেশী। এমনি ভাবে সব-চেয়ে নিকটের তারকা—প্রোক্সিমা সেণ্টোরাই,

যার দূরত্ব হলো 25 লক্ষ কোটি মাইল—আলোর মাপকাঠিতে তার দূরত্ব দাঁড়াবে 4·2 আলোক-বছর এবং লুব্ধকের (Sirius) দূরত্ব দাঁড়াবে, 8·7 আলোক-বছর। এর পর অবশ্য আরও অনেক তারকাই রয়েছে, কিন্তু সেগুলির দূরত্বের কথা বলতে গেলে তা লিখে শেষ করা যাবে না কোন দিন। তাই সবচেয়ে দূরের তারকাটির দূরত্বের কথাই এখানে বলছি। এই দূরত্ব হলো 1½ কোটি আলোক-বছর। কাজেই দেখা যায়, আকাশের বুকে ছোট ছোট প্রদীপের মত মিট্‌মিট করে জ্বলছে যে তারকাগুলি, তাদের দূরত্বের তুলনায় আমাদের চাঁদ বা সূর্যের দূরত্ব ধরতে গেলে, কত তুচ্ছ! তাছাড়া এই নক্ষত্রগুলি পৃথিবী থেকে শুধু যে দূরে দূরেই অবস্থান করছে তা নয়, তাদের পরস্পরের মধ্যেও রয়েছে দুস্তর ব্যবধান।

তারকাগুলির দূরত্বের কথা বলতে গিয়ে একটি বেশ মজার কথাও মনে আসে। এই মুহূর্তে যে তারকাটিকে আমরা প্রত্যক্ষ করছি, তা যে সত্য সত্যই আকাশের বুকে এখন বিরাজ করছে—তার কিরণ ছড়াচ্ছে, এমন কথা কিন্তু বলা চলে না। হয়তো অনেক আগেই সে তারকাটি ধ্বংস হয়ে গেছে, হয়তো বা তার কোন নিশানাই নেই—জ্বলে জ্বলে সেটি হয়তো এখন অথবা অনেক আগেই নিবে গেছে। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, অসীম দূরত্বের জন্যে তার এক কালের অস্তিত্ব তাকে এখনও আমাদের দৃষ্টি থেকে মুছে দিতে পারে নি। তবে হিসেব করলেই দেখা যায়, এতে আশ্চর্য হবার তেমন কিছু নেই। সবচেয়ে কাছের তারকা প্রোক্সিমা সেন্টোরাই-এর কথাই ধরা যাক। মনে করা যাক, 4 বছর আগে কোন কারণে সেই তারকাটি ধ্বংস হয়ে গেছে। আমাদের কাছ থেকে এর দূরত্ব হলো 4·2 আলো বছর; অর্থাৎ 4·2 বছর আগে প্রেক্সিমা সেন্টোরাই আকাশের বুকে যে কিরণ ছড়িয়েছে, সেই কিরণ সেকেণ্ডে 1 লক্ষ 86 হাজার মাইল বেগে ছুটে আসা সত্ত্বেও পৃথিবীতে পৌঁছুতে তার সময় লাগবে দীর্ঘ 4·2 বছর। তারকাগুলির অস্তিত্ব আমরা জানতে পারি তাদের আলোর সূত্রে। কাজেই প্রোক্সিমা সেন্টোরাই ধ্বংস হবার সময় যে শেষ আলোক-রশ্মিটি পৃথিবীতে পাঠিয়েছে, আমাদের কাছে আসতে তার লাগবে 4·2 বছর। কাজেই তার ধ্বংস হবার সংবাদ 4 বছর পরেও আমরা জানতে পারবো না, জানবো 4 বছরের আরও প্রায় আড়াই মাস পরে। কাজেই 4 বছর আগে তা ধ্বংস হলেও তাকে আমরা দেখতে পাব আকাশে। পৃথিবী থেকে কোন তারকা 10 লক্ষ আলোক-বছর দূরে রয়েছে বললে বুঝতে হবে—বিদ্‌ঘুটে, বিরাটাকারের জন্তুজানোয়ার যখন পৃথিবীর বুকে বিচরণ করতো, তখন সেই তারকাটি যে আলো ছড়িয়েছিল, সেই আলোই আমরা এতদিন পর আজ প্রত্যক্ষ করছি।

আগেই বলেছি, আয়তনে পৃথিবীর চেয়ে 13 লক্ষ গুণ বড় যে সূর্য, তার চেয়েও অনেক বড়, অনেক উজ্জ্বল তারকা মহাকাশের বুকে বিরাজ করছে। সূর্যের ব্যাস যেখানে 8 লক্ষ 65 হাজার মাইল, সেখানে সবচেয়ে বড় তারকাটির ব্যাস হলো 180 কোটি মাইল। বস্তুতঃ সূর্য একটি সাধারণ তারকা ছাড়া আর কিছুই নয়। অন্য তারকাগুলির তুলনায় সূর্য আমাদের অনেক কাছে আছে বলেই তাকে আমরা অন্য তারকাগুলির চেয়ে বড় দেখি, তার তাপ ও আলো আমরা বেশী করে পাই। বিজ্ঞানী-দের মতে, সূর্য আয়তনে—এমন কি, তার তাপ ও ঔজ্জ্বল্যের দিক থেকেও একটি মাঝারি ধরণের তারকা মাত্র। আবার বিশ্বজগতের তুলনায় এই সূর্য, এই অগণিত তারকা, সকলে মিলেও তেমন বিশাল কিছু নয়, মহাবিশ্বের এক অতি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র, বা বিপুল বিশ্বের বিশালতাকে শুধু আভাস-

ইঙ্গিতে কেবল যেন প্রকাশ করবার প্রয়াস পাচ্ছে। মহাশূন্যের অগণিত তারকারাশিকে নিয়ে গঠিত যে ছায়াপথ, সুদূরের শত শত নীহারিকা যেন বিশাল এক সমুদ্রবক্ষে ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত ক্ষুদ্র দ্বীপপুঞ্জের মত এক-একটি ভাসমান ক্ষুদ্রকায় বিশ্ব।

শীতের রাতে আকাশের দিকে তাকালে দেখা যায়, আকাশের উত্তর দিগন্ত থেকে সুরু করে মাথার উপর দিয়ে একটি জ্যোতির্ময় নদী যেন দক্ষিণ প্রান্তে মিশে গেছে। একে ছায়াপথ বা ইংরেজীতে গ্যালাক্সি বলে। খালি চোখে ছায়াপথকে দেখায় হাল্কা মেঘের মত, কিন্তু শক্তিশালী কোন দূরবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে দেখলে দেখা যাবে, সেখানে ভীড় করে রয়েছে রাশি রাশি তারকা। বিজ্ঞানীদের ধারণা, এই ছায়াপথে 10 হাজার কোটির মত ছোট-বড় নানা আকারের তারকা রয়েছে। সম্পূর্ণ আকাশকে আমরা যদি একেবারে দেখতে পেতাম, তাহলে দেখা যেতো, এই ছায়াপথটি যেন একটি বিরাট বলয়ের মত পৃথিবীকে বেষ্টন করে রয়েছে। সমগ্র বিশ্বে আজ পর্যন্ত প্রায় এমন 100 কোটি ছায়াপথের সন্ধান পাওয়া গেছে। অন্ধকার রাতে যে ছায়াপথটিকে আমরা সারা আকাশে পরিব্যাপ্ত থাকতে দেখি, তার একটি বিশেষ নাম দেওয়া হয়েছে—ইংরেজীতে যাকে বলে মিল্কিওয়ে।

এই মিল্কিওয়ের অন্তর্ভুক্ত হলো আমাদের পৃথিবী, যার আকার অনেকটা আতসী কাচের মত। পৃথিবী যে ছায়াপথে অবস্থান করছে—মিল্কিওয়ে সেই ছায়াপথটির সীমানা নির্দেশ করে থাকে। আমাদের এই ছায়াপথটি, যার মাঝের অংশটি লেন্সের মত চওড়া, তার ব্যাস হলো 10 হাজার কোটি আলোক-বছরের মত। আদিতে লোকের ধারণা ছিল যে, সৌরজগৎটি এই ছায়াপথের কেন্দ্রে অবস্থিত। কিন্তু অধুনা জানা গেছে যে, সূর্য এর কেন্দ্র থেকে দু-হাজার পাঁচ-শ' কোটি আলোক-বছর দূরে রয়েছে এবং এই সৌরজগৎটিও মোটেই স্থির নয়, প্রচণ্ড বেগে ঘুরপাক খাচ্ছে। অবশ্য ছায়াপথের কেন্দ্রকে প্রদক্ষিণ করতে সূর্যের সময় লাগছে প্রায় 225 কোটি বছর; অর্থাৎ বিজ্ঞানীরা যে অনুমান করেন, তাতে 200-300 কোটি বছর আগে পৃথিবী তথা সৌর জগৎ সৃষ্টির যে সূচনা ঘটেছিল, তখন থেকে আজ পর্যন্ত সূর্য প্রবল বেগে ঘুরপাক খেয়েও একবারই মাত্র এই ছায়াপথের কেন্দ্রটিকে প্রদক্ষিণ করতে সক্ষম হয়েছে।

আমাদের এই ছায়াপথটি, যার ব্যাস 10 হাজার কোটি আলোক-বছর, মাইলের হিসাবে তার ব্যাস যে কত দাঁড়াবে—কত বৃহৎ যে তার আয়তন, সহজে তা ধারণা করা যায় না। আবার সমগ্র বিশ্বে একটি-দুটি নয়, ইতিমধ্যেই 100 কোটি ছায়াপথের সন্ধান পাওয়া গেছে। আরও অজানা কত ছায়াপথ রয়েছে, তার হিসাব কে করবে? ছায়াপথের বাইরে যে সকল ছায়াপথ রয়েছে, সেগুলিকে আমরা দেখতে পাই এক-একটি নীহারিকারূপে। শক্তিশালী দূরবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে এদের কোনটিকে দেখায় উজ্জ্বল হাল্কা মেঘের মত, কোনটিকে দ্যুতিমান চরকির মত, আবার কোনটি মোটেই উজ্জ্বল নয়, অনেকটা নিষ্প্রভ। বিজ্ঞানীদের মতে, যেগুলি উজ্জ্বল, সেগুলি অতি সূক্ষ্ম গ্যাসীয় পদার্থে গঠিত। অনেকের মতে এরা নিজেরা জ্যোতির্ময় নয়, কাছাকাছি তারকার আলোয় আলোকিত। অতি শক্তিশালী দূরবীক্ষণ যন্ত্র দিয়েও এদের মধ্যে কোন তারকার সন্ধান পাওয়া যায় নি। চরকির মত নীহারিকাগুলিই কিন্তু বিজ্ঞানীদের কৌতূহলী করে তুলেছে সবচেয়ে বেশী। এরা যেন বিশালাকার প্রজ্বলিত গ্যাসের এক-একটি চরকি—মহাশূন্যে বন্ বন্ করে ঘুরছে অবিরাম। নিষ্প্রভ নীহারিকাগুলির নিজস্ব কোন আলো নেই। সুদূরের তারকাপুঞ্জের মাঝে তাই এদের দেখা যায় ঘন কালো মেঘের

মত। মনে হয়, রেণু রেণু ধূলিমেঘে ঢাকা আচ্ছাদনের মধ্যে মাঝে মাঝে যেন এক-একটি কালো সুড়ঙ্গের মুখ হাঁ করে রয়েছে। নিষ্প্রভ নীহারিকাগুলি আমাদের দৃষ্টিকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করে দেয় যে, তাদের পিছনের তারকাগুলিকে আমরা দেখতে পাই না।

পৃথিবী থেকে বহু দূরে রয়েছে যাবতীয় নীহারিকা। আমাদের কাছের দুটি নীহারিকার দূরত্ব হলো 1 লক্ষ আলোক-বছরের মত। দূরের নীহারিকাগুলি যাদের সন্ধান মেলে শুধু আলোকচিত্রের সাহায্যে, সেগুলি রয়েছে 10 কোটি আলোক-বছর দূরে। অ্যাণ্ড্রোমিডা নীহারিকাটি আমাদের কাছ থেকে প্রায় কুড়ি লক্ষ আলোক-বছর দূরে আছে।

বিজ্ঞানীরা বলেন, এক-একটি নীহারিকার মধ্যে নিহিত রয়েছে কোটি কোটি তারকা। পৃথিবী থেকে বহু দূরে রয়েছে বলে নীহারিকার তারকাগুলিকে যেন মিলেমিশে একাকার হয়ে থাকতে দেখা যায়।

নীহারিকা সম্পর্কে জানতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা আবার জেনেছেন আর এক বিস্ময়কর ব্যাপার। একমাত্র অ্যাণ্ড্রোমিডা ছাড়া সকল নীহারিকাই তীব্র গতিতে আমাদের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। অ্যাণ্ড্রোমিডা আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে সেকেণ্ডে প্রায় 200 মাইল গতিবেগে। আর আমরা সেকেণ্ডে প্রায় 25 হাজার মাইল গতিতে দূরে সরে যাচ্ছি। প্যালোমারের দূরবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে যে সকল অস্পষ্ট বস্তু দেখতে পাওয়া যায়, তাদের মধ্যে কতকগুলি নাকি সেকেণ্ডে 60 হাজার মাইল গতিতে পৃথিবী থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। কাজেই এই সব নীহারিকা বা অস্পষ্ট বস্তুকে কিছু দিন পরে আর আমরা দেখতে পাব না। চিরকালের জন্যে তারা চলে যাবে আমাদের দৃষ্টির বাইরে সীমাহীন বিশ্বের কোন্ সুদূর লোকে, কে জানে।

প্রায় সকল নীহারিকাই আমাদের কাছ থেকে এমনি ভাবে যে অসীম ব্যবধান রচনা করে চলছে, সে জন্যে অনেকে অনুমান করেন যে, মহাবিশ্ব ক্রমাগতই প্রসারিত হয়ে চলেছে। হিসেব করে দেখা গেছে যে, 150 কোটি বছর পরে মহাবিশ্বের আয়তন দাঁড়াবে এখনকার চেয়ে দ্বিগুণ।

কাজেই দিনে দিনে যতই নানাপ্রকার যন্ত্রপাতির সাহায্যে মহাশূন্যে আমাদের দৃষ্টি প্রসারিত হচ্ছে, বিস্ময়ও আমাদের ক্রমাগত ততই বেড়ে চলেছে। অবশ্য বিস্ময়ের ব্যাপার শুধু এদিক থেকেই নয়—অন্য দিকেও রয়েছে। আমরা জানি, পৃথিবী স্থির নয়, অনবরত ঘুরছে নিজের মেরুদণ্ডের উপর, সূর্যের চার ধারে, অনেকটা লাটিমের মত টলমল করে। সূর্যও গতিশীল—একদিকে যেমন অভিজিৎ নক্ষত্রকে লক্ষ্য করে তীব্র গতিতে ছুটছে, তেমনি আবার আমাদের ছায়াপথের কেন্দ্রকে ঘিরে সেকেণ্ডে প্রায় 175 মাইল বেগে প্রদক্ষিণ করছে। তারকাগুলিও গতিশীল—এমন কি, যে তারকারাশি কিংবা গ্যাসীয় পদার্থের সমষ্টিতে ছায়াপথ গঠিত, জানা গেছে সেগুলিও স্থির নয়, তীব্র তাদের গতিবেগ। কেন যে সব কিছুই এমন গতিশীল—ছুটছে তীব্র গতিতে কিংবা ঘুরপাক খাচ্ছে তীব্র বেগে, তা আমরা সঠিক জানি না। তবে এটুকু জানা গেছে যে, মহাবিশ্বে সব কিছুই গতিশীল। শুধু মাত্র বড় বড় বস্তুর মধ্যেই যে এই গতিশীলতা বিদ্যমান তা নয়, সকল পদার্থের মধ্যে রয়েছে যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পরমাণু—এমন কি, পরমাণুর মধ্যেও যে ততোধিক সূক্ষ্ম বিদ্যুৎ-কণা রয়েছে—বিজ্ঞানীরা তাদের মধ্যেও পেয়েছেন তীব্র গতিবেগের সন্ধান। কাজেই দেখা যায়, বিশ্বে কোন কিছুই স্থির নেই। সবাই চঞ্চল—সব কিছুই অস্থির। সমগ্র বিশ্ব জুড়ে চলছে যেন এক অপরূপ নৃত্য। আর এই বিশ্বনৃত্যে, এই চঞ্চল গতিছন্দে, যোগ দিয়েছে ছোট-বড় যাবতীয় বস্তু।

এমনি ছোট-বড় যাবতীয় বস্তু নিয়ে যে বিশাল বিশ্বজগৎ, সে যে কত বড়, তার ধারণা আমাদের আসে না। মহাবিশ্বের আয়তন সম্পর্কে যতটুকু জানা গেছে, তাতে জানা যায় যে, মহাবিশ্বের ব্যাস অনেকটা 260 কোটি আলোক-বছরের মত; অর্থাৎ পৃথিবী সৃষ্টির সময়ে যদি কোন আলো মহাবিশ্বের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তের দিকে চলতে থাকে, তবে তার সুদীর্ঘ চলার পথ শেষ হবে একেবারে আমাদের আধুনিক জামানায় এসে। কাজেই খালি চোখে, দূরবীক্ষণ যন্ত্র এবং অধুনা আবিষ্কৃত রেডিও-দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে মহাবিশ্বের যে বিশালতার পরিচয় আমরা পাই, তা একদিকে যেমন আমাদের বিস্ময়াবিষ্ট করে, অপরদিকে তেমনি এই মহাবিশ্বের মাঝে আমাদের অস্তিত্বকে করে তোলে অতি নগণ্য, অতি তুচ্ছ– প্রাণে জাগায় পরম নৈরাশ্য। একদিন মানুষের ধ্যান-ধারণায় পৃথিবীই ছিল বিশাল, আকাশের চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-নক্ষত্র প্রভৃতি জ্যোতিষ্ককে পৃথিবীর চেয়ে বড় বলে সে ভাবতে পারে নি—শুধু নয়, নিজেকে সে দাবী করেছে সৃষ্টির সেরা জীব তাই হিসেবে আর সেই শ্রেষ্ঠত্বের সূত্রে সে ভেবেছে বিশ্বের সব কিছু একমাত্র তার জন্যেই সৃষ্টি হয়েছে, শুধু তারই উপকারার্থে—তারই মঙ্গলের নিমিত্ত! এই ধারণার বশবর্তী হয়ে তাই সে কল্পনা করেছে, সমগ্র বিশ্বের কেন্দ্রস্থলে রয়েছে পৃথিবী। ভেবেছে, এই পৃথিবীর তাবেদারে তাকে ঘিরেই ঘুরছে চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-নক্ষত্র আর নীহারিকা—এক কথায় আকাশের যাবতীয় জ্যোতিষ্ক। কিন্তু আজ আমরা কি দেখছি? মহাবিশ্ব তো দূরের কথা, মহাবিশ্বের এক অতি ক্ষুদ্র অংশ জুড়ে রয়েছে যে সৌর জগৎ, তারই এক সাধারণ গ্রহ হলো আমাদের এই পৃথিবী। বৃহস্পতি, শনি প্রভৃতি গ্রহ তার চেয়েও অনেক বৃহৎ। সূর্য মোটেই তার চারদিকে ঘুরছে না, বরং সে নিজেই প্রদক্ষিণ করছে সূর্যকে, আকারে সূর্য তার চেয়ে তের লক্ষ গুণ বড়। অন্য-দিকে এই সূর্যও আবার তেমন বিরাট কিছু নয়—একটি মাঝারি গোত্রের তারকা মাত্র। এমনি সূর্যের সমান এবং তার চেয়ে ছোট-বড় প্রায় 10 হাজার কোটি তারকা নিয়ে গঠিত হয়েছে এক-একটি ছায়াপথ—যাদের মোটামুটি ব্যাস হলো 17 হাজার কোটি আলোক-বছর। আবার সেই ছায়াপথের সংখ্যাও কম নয়—100 কোটির মত। এই 100 কোটি ছায়াপথ 260 কোটি আলোক-বছর ব্যাসের মহাবিশ্বে ছড়িয়ে আছে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়ে, যেন এক মহাসমুদ্রে ভাসমান ক্ষুদ্র দ্বীপপুঞ্জের মত। মহাবিশ্বের এই বিশালতা তাই আমাদের ঠিক বোধগম্য হয় না, উপলব্ধি করতে পারি না আমরা সে বিশালত্ব। মোটের উপর এই ছায়া-পথের বিশালতা আমাদের কল্পনাতীত। কাজেই এমনি বিপুল মহাবিশ্বের মাঝখানে আমাদের পৃথিবীর স্থান যে কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়, তা সহজেই অনুমেয়।

বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে দূরবীক্ষণ, রেডিও-দূরবীক্ষণ যন্ত্র প্রভৃতি আবিষ্কারের সূত্রে সুদূর নক্ষত্র-লোকেও আমাদের দৃষ্টি প্রসারিত হয়েছে। অনেক কিছুই আমরা জেনেছি সত্য, কিন্তু তবু অনেক কিছুই আজও আমাদের অজানা রয়ে গেছে। কবে এবং কখন চন্দ্র বা সূর্যগ্রহণ হবে, কতক্ষণই বা তা স্থায়ী থাকবে, কখন কোন্ ধূমকেতু আমাদের আকাশ সীমা লঙ্ঘন করবে—বিজ্ঞানীরা আজ নিশ্চিতভাবেই সে কথা বলতে পারেন। কিন্তু আজও তাঁরা সঠিকভাবে বলতে অক্ষম, কখন এবং কি ভাবে এই মহাবিশ্বের সৃষ্টি হয়েছে। সে কি চিরন্তন, না তার বিলুপ্তি ঘটবে কোন দিন? এই বিশ্ব বা মহাবিশ্ব কি সসীম, না অসীম? কেউ কেউ বলেছেন—বিশ্ব সসীমও নয়, সুস্থিরও নয়—সুরু থেকে সে শুধু সম্প্রসারিত হয়েই চলেছে! আবার কেউ কেউ বলেছেন—না, তা নয়, বিশ্ব বিশাল হলেও সসীম—একবার সঙ্কুচিত হচ্ছে, পুনরায় প্রসারিত হচ্ছে। যে মহাকালের স্রোতে আমরা

ভেসে চলেছি, তার সুরু যে কোথায়, কোথায় যে, তার শেষ, কেন এই বিশালকায় বিশ্বলোকের সৃষ্টি, আর কেনই বা সেখানে আমাদের স্বল্পক্ষণের জন্যে উপস্থিতি—কোন বিজ্ঞানীই তা আজও বলতে পারেন না। কেউ কেউ বলেছেন, এই সৃষ্টির আদিও নেই, অন্তও নেই—সমগ্র বিশ্ব জুড়ে চলছে ভাঙা-গড়া—একদিকে ধ্বংস, অন্য দিকে সৃষ্টি—দুই-ই চলছে সমান তালে। যা ধ্বংস হচ্ছে, তাথেকেই সৃষ্টি হচ্ছে নতুনের, প্রতিনিয়ত চলছে এই ভাঙা-গড়ার খেলা—যার আদি নেই, সমাপ্তি নেই, আর এমনি ভাবেই চলবে তা অনন্ত কাল ধরে।

সঞ্চয়ন

ক্যান্সার রোগের নতুন ওষুধ

জীবন্ত কোষের ভিড়ের মধ্যেও রোগদুষ্ট মারাত্মক কোষ কি করে এমন বিপুল পরিমাণে বেড়ে যেতে পারে, ক্যান্সার রোগের চিকিৎসকদের কাছে সেটি হলো এক বিরাট প্রহেলিকা।

জনৈক মার্কিন বিজ্ঞানী এই রহস্য ভেদ করতে গিয়ে ক্যান্সার রোগদুষ্ট কোষের মধ্যে এক প্রকার রাসায়নিক পদার্থের সন্ধান পেয়েছেন। এই পদার্থ ঐ রোগদুষ্ট কোষগুলি থেকে বেরিয়ে আসে এবং সংলগ্ন সুস্থ ও স্বাভাবিক কোষসমূহের ক্যান্সার রোগগ্রস্ত কোষের মত বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্তিতে সাহায্য করে। রোগদুষ্ট কোষের চারপাশের কোষসমূহের এই বৃদ্ধি কি কারণে ঘটে থাকে? ক্যান্সার রোগাক্রমণের ফলে ঐ কোষের গঠন-প্রণালীর মধ্যে কি কি পরিবর্তন ঘটেছে, তা জানা গেলেই এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যেতে পারে এবং এই বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণের পথেরও সন্ধান দিতে পারে।

ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের আণবিক জীব-বিজ্ঞানী ডাঃ হ্যারি রুবিন একটি মুরগীর ভ্রূণকে ক্যান্সার জীবাণু বা ভাইরাস দিয়ে সংক্রামিত করবার চার-পাঁচ দিন পরে ভ্রূণটির কোষ পরীক্ষা করে ঐ রাসায়নিক পদার্থের সন্ধান পান। তাঁর ধারণা, যে সকল রক্তসংবাহক নালী ও সংযোজক তন্তুর জন্যে রোগদুষ্ট কোষের অনিয়ন্ত্রিত বৃদ্ধি ঘটে এবং ঐ সকল কোষ বেঁচে থাকে, সেই সকল শিরার কোষ ও তন্তুসমূহের বৃদ্ধির মূলে রয়েছে রাসায়নিক পদার্থ। তাছাড়া ক্যান্সার রোগদুষ্ট কোষসমূহের অস্বাভাবিক বৃদ্ধির মূলেও ঐ বস্তুটি থাকতে পারে।

ঐ রাসায়নিক পদার্থ ক্যান্সার রোগের চিকিৎসার এক নতুন পথের ইঙ্গিত দিয়েছে। রোগদুষ্ট কোষের সন্নিহিত স্বাভাবিক সুস্থ কোষের বৃদ্ধি কোন রাসায়নিক উপাদানের সাহায্যে প্রতিহত করতে পারলে এই ব্যাধি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে। এই বৃদ্ধি প্রতিহত হলে রোগদুষ্ট কোষগুলি বেঁচে থাকবার জন্যে রক্তসংবাহক নালী বা ব্লাড ভেসেল ও সংযোজক তন্তুর কোন রকম সাহায্য পাবে না।

ঐ পদার্থ কি কি রাসায়নিক উপাদানে গঠিত, তা এখনও পুরাপুরি জানা যায় নি। ডাঃ রুবিন এই প্রসঙ্গে বলেছেন যে, যতটুকু জানা গেছে তাতে মনে হয়, ঐ বস্তুটি কোন প্রোটিন অথবা এন্‌জাইম হতে পারে।

তবে পরীক্ষাগারে দেখা গেছে, ভাইরাস-দুষ্ট কোষ থেকে ঐ রাসায়নিক পদার্থ পৃথক করে নিলে স্বাভাবিক কোষসমূহের সাময়িক

অস্বাভাবিক বৃদ্ধি ঘটে। কিন্তু এর ফলে ঐ সকল কোষের প্রকৃতির কোন পরিবর্তন ঘটে না এবং এরা মারাত্মক ক্ষতিকরও হয় না।

ডাঃ রুবিন গত পনেরো বছর ধরে পশুর ক্যান্সার রোগের ভাইরাস নিয়ে গবেষণা করছেন। এক্ষেত্রে তিনি একজন প্রখ্যাত বিজ্ঞানী। বর্তমানে তিনি ক্যান্সার রোগ সম্পর্কে যে তথ্যানুসন্ধান ও গবেষণায় ব্যাপৃত রয়েছেন, তা যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশন্যাল ক্যান্সার ইনস্টিটিউটও সমর্থন করছেন।

অন্যান্য কোষের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে থাকবার সময় প্রত্যেকটি জীবন্ত কোষের আকার, আয়তন ও বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করবারও ক্ষমতা থাকে। এই বিষয়টির উপরেও ডাঃ রুবিনের নতুন উদ্ভাবন বিশেষভাবে আলোকপাত করতে পারে।

গবেষণাগারে জীবন্ত প্রাণী ও উদ্ভিদের কোষ নিয়ে গবেষণার সময় দেখা গেছে, অন্যান্য কোষের সঙ্গে মিলিত হয়ে থাকবার সময় ক্যান্সার রোগ-বাহক ভাইরাস ও কোন কোন রাসায়নিক উপাদান জীবন্ত কোষকে অন্যান্য কোষ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারে এবং ঐ কোষের অস্বাভাবিক বৃদ্ধির কারণ হতে পারে। সাধারণতঃ যে সকল রাসায়নিক উপাদান ঐ সকল কোষকে স্বাভাবিক বৃদ্ধির পথে চালিত করে, তাদের কাজে পুরাপুরি বাধা সৃষ্টি করতে পারে।

ঐ রাসায়নিক পদার্থের অস্তিত্ব নিরূপণ এবং জীবদেহে তার প্রতিক্রিয়া পরীক্ষার উদ্দেশ্যে ডাঃ রুবিন গবেষণাগারে মুরগীর ভ্রূণের কোষে রুস সারকাম নামক ভাইরাস প্রয়োগ করেন। পাখীর দেহে এই সকল ভাইরাস ক্যান্সার রোগ সৃষ্টি করে থাকে।

কয়েক দিন পরেই যখন দেখা গেল, সংক্রামিত কোষগুলি মারাত্মক হয়ে উঠেছে এবং দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে, তখন ডাঃ রুবিন ঐ সকল কোষের চারপাশের জলীয় অংশ এবং ভাইরাসগুলিকে সযত্নে বের করে আনলেন। ভাইরাসমুক্ত এই জলীয় অংশ বিভিন্ন সময়ে কয়েকবারই বের করে আনা হলো। তারপর স্বাভাবিক মুরগীর ভ্রূণের জীবন্ত কোষের মধ্যে ঐ জল ঢোকানো হলো।

তখন দেখা গেল, যেখানে স্বাভাবিক সুস্থ কোষের সংখ্যা খুব কম এবং দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে, সেখানে ঐ জলীয় অংশ প্রবিষ্ট হওয়ায় তেমন কোন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় নি। কিন্তু যেখানে কোষগুলি ঘন সন্নিবিষ্ট এবং যাদের বৃদ্ধি খুবই মন্থর, ঐ জলীয় অংশ প্রবিষ্ট হবার তিন দিন পরে দেখা গেল, ঐ সকল কোষ দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে, কোষগুলি দ্বিগুণিত হয়েছে এবং ক্যান্সার রোগদুষ্ট কোষের মত অস্বাভাবিক আকৃতি নিয়েছে। 100 ঘণ্টার পর দেখা গেল, ঐ সকল কোষ আবার স্বাভাবিক আকার ও স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসেছে।

রুস সারকাম ভাইরাসের তুলনায় ঐ রাসায়নিক পদার্থ প্রয়োগের ফলে কোষসমূহের বৃদ্ধি দ্রুততর হয়ে থাকে। ডাঃ রুবিন ঐ রাসায়নিক পদার্থ কোন্ কোন্ মৌলিক উপাদানের সমবায়ে গঠিত, তা নিরূপণের চেষ্টা করছেন। ক্যান্সার রোগের ওষুধ উদ্ভাবনের পক্ষে এটি হবে একটি বিরাট পদক্ষেপ।

পরমাণু ভাঙ্গবার বৃহত্তম যন্ত্র

অ্যাটম স্ম্যাসার নামে পরমাণু ভাঙ্গবার পৃথিবীর বৃহত্তম যন্ত্র নির্মাণের কাজ প্রায় সমাপ্তির পথে। 1971 সালের মাঝামাঝি সময়েই এটি চালু হতে পারে। বিজ্ঞানী ও যন্ত্র-নির্মাতারা মনে করেছিলেন, এই যন্ত্র নির্মাণের কাজ শেষ হতে আরও এক বছর লাগবে।

আমেরিকার ইলিনয় রাজ্যের উত্তরাঞ্চলে সহর ব্যাটাভিয়ার কাছে 6800 একর জমির উপর মার্কিন পারমাণবিক শক্তি কমিশন এই বৃহত্তম বৈজ্ঞানিক যন্ত্রটি তৈরি করছেন। গত দু-বছর ধরে এর নির্মাণকার্য চলছে। 50,000 কোটি ইলেকট্রন ভোল্টে এটি চালিত হবে। তবে প্রথমে 20,000 কোটি ইলেকট্রন ভোল্টে এটি চালিত হবে বলে পরিকল্পনা করা হয়েছিল। এই যন্ত্রটির ছয় কিলোমিটার পরিধির চারপাশে রয়েছে বিশ টন ওজনের 1000 চুম্বক। এগুলি আছে মাটির নীচে। এই যন্ত্রের সাহায্যে হাইড্রোজেন পরমাণু থেকে বের করে আনা প্রোটনচ্ছটার গতি বাড়ানো হবে এবং আলোর গতির কাছাকাছি এসে দাঁড়াবে। আলোক-তরঙ্গের গতি প্রতি সেকেণ্ডে 1,86,326 মাইল।

মনুষ্য-সৃষ্ট কোন রশ্মির অগ্রভাগে এরকম প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক শক্তিকে এর আগে আর এভাবে কেন্দ্রীভূত করা হয় নি। এই প্রোটন রশ্মিচ্ছটার অগ্রভাগ পরমাণুর কেন্দ্রে এসে আঘাত করবে এবং পরমাণুটি ভেঙ্গে যাবে। ঐ ভাঙ্গা পরমাণুর কেন্দ্রীনের পদার্থসমূহ গবেষণাগারে পরীক্ষা করে দেখা হবে। পরমাণু সম্পর্কে এই ধরণের তথ্যানুসন্ধান এর আগে সম্ভব ছিল না। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, পদার্থের মৌলিক গঠন ও প্রকৃতি সম্পর্কে এই তথ্যানুসন্ধানের ফলে অনেক কিছু জানা যাবে।

আমেরিকার মধ্য-পশ্চিমাঞ্চলের সহর ব্যাটেভিয়ার সন্নিকটবর্তী ন্যাশন্যাল অ্যাকসিলেরেটর লেবরেটরীর এই নতুন অ্যাটম স্ম্যাসার বা পরমাণু ভাঙ্গবার যন্ত্রটি হবে একটি বিশেষ আকর্ষণ। কেবল আমেরিকারই নয়, ভারত, পশ্চিম ইউরোপ, ক্যানাডা, অষ্ট্রেলিয়া যুক্তরাজ্য, ইজ্‌রায়েল এবং জাপানের বিশিষ্ট পদার্থ-বিজ্ঞানীদেরও এই যন্ত্রের সাহায্যে পরমাণু সম্পর্কে গবেষণা ও তথ্যানুসন্ধানের সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হবে।

এর আগে 1960 সালে আর একটি পরমাণু ভাঙ্গবার যন্ত্র নির্মাণের কাজও সেখানে সমাপ্ত হয়েছে। এটি ছিল 3,300 কোটি ইলেকট্রন ভোল্টের। এই যন্ত্রটি স্থাপিত হয়েছে নিউইয়র্কের ব্রুকহ্যাভেন লেবরেটোরীতে। সোভিয়েট রাশিয়ায়ও 7,600 কোটি ইলেকট্রন ভোল্টের একটি যন্ত্র সারপুখভে স্থাপিত হয়েছে। আমেরিকার এই নতুন যন্ত্রটি হবে এক্ষেত্রে পৃথিবীর বৃহত্তম ও সবচেয়ে শক্তিশালী পরমাণু ভাঙ্গবার যন্ত্র।

নিউইয়র্কের ব্রুকহ্যাভেন লেবরেটারীর এই যন্ত্রটি পরমাণু সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধানের ক্ষেত্রে নতুন অধ্যায় রচনা করেছে। কিন্তু পরমাণু কেন্দ্রের গভীরে আঘাত করে তা ভাঙ্গবার মত শক্তি ও তীব্রতা ঐ যন্ত্রটির প্রোটনচ্ছটার নেই। তত্ত্বের দিক থেকে বহু পদার্থ-বিজ্ঞানীই বলেছেন যে, পরমাণুতে প্রাথমিক যে সকল কণার সন্ধান পাওয়া গেছে, তার চেয়ে গভীরে পরমাণুর কেন্দ্রে অন্যান্য মৌলিক কণার আর একটি স্তর থাকতে পারে। 1960-এর দশকে ব্রুকহ্যাভেনের যন্ত্রের সাহায্যে পরমাণুর কেন্দ্রে পজিট্রন, মেসন, মিউন, হাইপেরন, লেপ্‌টন এবং অন্যান্য বহু মৌলিক কণার সন্ধান পাওয়া গেছে। পরমাণুর কেন্দ্রে 100-টিরও বেশী মৌলিক কণা বা সাব-নিউক্লিয়ার কণার অস্তিত্ব পদার্থ-বিজ্ঞানীদের ধাঁধায় ফেলেছে। তাঁদের ধারণা, মৌলিক পদার্থের একটি সহজ গঠন-প্রণালী রয়েছে।

এই অদ্ভুত, বিস্ময়কর পৃথিবীতে বস্তুর স্তর এবং শক্তি পরস্পর বিনিময়যোগ্য—একটি অন্যটিতে রূপান্তরিত হয় এবং এক অনাদি শক্তির বন্ধনে পদার্থের বিভিন্ন উপাদানসমূহ আবদ্ধ রয়েছে, ছিট্‌কে বেরিয়ে আসছে না। মৌলিক পদার্থের গভীরে এই সকল বিষয়ে তথ্যানুসন্ধানের সুযোগ বিজ্ঞানীরা এই প্রথম এই যন্ত্রের সাহায্যে পাবেন।

পরমাণুর কেন্দ্রে মৌলিক কণার আর একটি

স্তরের অস্তিত্বের কথা প্রথম জানিয়েছিলেন ক্যালিফোর্ণিয়া ইনষ্টিটিউট অব টেক্‌নোলোজির নোবেল পুরস্কার বিজয়ী পদার্থ-বিজ্ঞানী ডাঃ মুরে গেলম্যান। পদার্থের চরম মৌলিক উপাদানের সন্ধান ব্যাটেভিয়ার এই অ্যাটম স্ম্যাসারটিই দিতে পারে। সেদিন হয়তো মৌলিক পদার্থের মূল উপাদান তৈরি করাও সম্ভব হবে। তবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের গবেষণাগারেই এর সন্ধান চলছে। 1969 সালে অষ্ট্রেলিয়ার বিজ্ঞানীরা এর অস্তিত্ব সম্পর্কে আংশিক প্রমাণ পেয়েছেন বলে জানিয়েছিলেন। কিন্তু পৃথিবীর বিজ্ঞানী-সমাজ এই বিষয়ে কোন উচ্চবাচ্য করেন নি।

বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে হামেশাই দেখা যাচ্ছে যে, নতুন উদ্ভাবন প্রচলিত ধারণাকে সম্পূর্ণ বদ্‌লে দিয়ে যায়। পদার্থের মূল উপাদান উদ্ভাবনের জন্যে যে তথ্যানুসন্ধান চলছে, এই নতুন পরমাণু ভাঙ্গবার যন্ত্রটি তাতে বিশেষভাবে আলোকপাত করতে পারে। এই সম্পর্কে যতটুকু জানা গেছে, তাতে তার মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে বলে বিজ্ঞানীদের ধারণা। মৌলিক পদার্থ যে কি কি উপাদানে গঠিত, তা নির্ণয় করবার ও তার প্রকৃতি নিরূপণের চেষ্টায় বিজ্ঞানীরা সফলকাম হলে পদার্থের গঠন ও প্রকৃতি যে সকল নিয়মে নিয়ন্ত্রিত হয়, তা সম্পূর্ণ জানা গেলে বিজ্ঞানের ইতিহাসে আর একটি নতুন অধ্যায় রচিত হবে এবং এর তাৎপর্য হবে সুদূরপ্রসারী।

ঘর গরম করতে রঙের অভিনব ভূমিকা

রং শুধু দেয়ালের সৌন্দর্য বৃদ্ধিই করবে না, এখন থেকে তা ঘরকে গরমও করতে পারবে। যে কোন সাধারণ রঙের মতই এই নতুন রং স্প্রে বা ব্রাসের সাহায্যে লাগানো যাবে।

তবে এই রঙের একটু বৈশিষ্ট্য আছে। সেই বৈশিষ্ট্য হলো, এই রং বিদ্যুৎ সঞ্চালন করতে সক্ষম। তার কারণ, এই রঙে উদ্ভিজ্জ তেল বা রঞ্জনের বদলে রয়েছে সিলিকেট।

বৈদ্যুতিক উনুনকে যেমন, তেমনি এই রংকে 'সুইচ অন' করা বা বিদ্যুৎযুক্ত করা যায়। কিন্তু বৈদ্যুতিক উনুনে হাত দিলে যেমন 'শক্' খেতে হয়, এতে তেমন কোন আশঙ্কা নেই এবং রং-লাগানো দেয়াল কখনই বিপজ্জনকভাবে গরম হয়ে ওঠে না। এই রং একেবারেই নিরাপদ—এমন কি, শিশু ও গৃহপালিত পশুদের পক্ষেও। বাড়ীর যে সাধারণ বিদ্যুৎ-সরবরাহের ব্যবস্থা, তার সঙ্গেই দেয়ালগুলি সংযুক্ত থাকে—শুধু মাঝপথে একটি ট্র্যান্সফরমারের সাহায্যে বিদ্যুৎ-প্রবাহের শক্তি 40 ভোল্টে নামিয়ে রাখা হয়। দেয়ালের মাথায় ও তলায় দুটি অ্যালুমিনিয়াম পাত্ বসানো থাকে—এদের মাধ্যমে সারা দেয়ালে বিদ্যুৎ সঞ্চালিত হয়।

দেয়ালে সাধারণভাবে যে রং লাগানো হয়, তার চেয়ে এই রঙের খরচ খুব বেশী নয়। এদিকে বিদ্যুতের খরচ অতি অল্প। এই ব্যবস্থায় বাড়তি জায়গাও ছেড়ে দিতে হয় না। দেয়ালগুলি সহজে অল্প সময়ের মধ্যে সমভাবে গরম হয়ে ওঠে। 'সুইচ অফ' করে দিলেও দেয়ালগুলি অনেক সময় পর্যন্ত গরম থাকে।

প্রি-ফ্যাব্রিকেটেড দেয়ালগুলি গৃহ-নির্মাণের সময়েই রং করে দেওয়া সম্ভব। এভাবে গৃহ নির্মিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই ঘর গরম করবার ব্যবস্থাও হয়ে যায়।

ছয় মাস ধরে পরীক্ষা করে দেখা গেছে, এই রঙের বিশেষ গুণ নষ্ট হয় না। আশা করা যায়, শীঘ্রই এই রং বাজারে দেখা যাবে।

আবিষ্কারকেরা এই রঙের নাম দিয়েছেন 'স্প্রে-অন সেণ্ট্রাল হিটিং'। লণ্ডনের নিকটে টেডিংটনের বৃটিশ পেণ্ট রিসার্চ স্টেশনে এটি উদ্ভাবিত হয়েছে।

কুষ্ঠরোগ নিরাময়ের নতুন ওষুধ

অ্যাণ্ড্রু ওয়াকার এই সম্বন্ধে লিখেছেন—পৃথিবীর দেড় কোটি থেকে দু-কোটি লোক এখনো কুষ্ঠরোগে ভোগে, যদিও আধুনিক ওষুধের দ্বারা এই রোগ নিরাময় করা সম্ভব। বৃটিশ লেপ্রোসি রিলিফ অ্যাসোসিয়েশনের মেডিক্যাল সেক্রেটারির ভাষায়—যদি কুষ্ঠরোগসংক্রান্ত আমাদের বর্তমান জ্ঞানকে ঠিকমত কাজে লাগানো যায়, তাহলে বর্তমান সময়েই এই রোগ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে এবং অদূর ভবিষ্যতেই তা নির্মূল করা অসম্ভব হবে না।

এই পরিপ্রেক্ষিতে বৃটিশ লেপ্রোসি অ্যাসোসিয়েশন পশ্চিম আফ্রিকার সিয়েরালিওনের জন্যে গত বছর একটি প্রকল্পের কথা ঘোষণা করেন। সিয়েরালিওনে কুষ্ঠরোগীর আনুমানিক সংখ্যা 50,000।

এই রোগের আধুনিক চিকিৎসায় একে প্রশাসনিক সমস্যা হিসাবেই বেশী করে দেখা হচ্ছে। রোগীদের এক কলোনীতে জড়ো করবার চেয়ে বাড়ীতে রেখে চিকিৎসা করায় অধিকতর ভাল ফল পাওয়া যায় বলে এখন মনে করা হয়।

1965 সালে পূর্ব আফ্রিকার মালাউইতে একটি পুরোধা প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছিল। তাথেকেই প্রমাণিত হয়েছে যে, এই নতুন পদ্ধতি কত কার্যোপযোগী। ল্যাণ্ড রোভার বা কখনো সাইকেলের সাহায্যে গ্রামে গ্রামে চিকিৎসার সুযোগ পৌঁছে দেওয়া হয়। কয়েকটি কেন্দ্র থেকে চিকিৎসার উদ্দেশ্যে রোগীকে প্রতি সপ্তাহে পরিদর্শন করা হয় এবং এতে চিকিৎসার ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ থাকে। এভাবে ব্রানাটিয়ের 2,000 বর্গ মাইল এলাকা থেকে কুষ্ঠরোগ বিতাড়িত করা সম্ভব হয়েছে।

প্রাচীন কাল থেকেই কুষ্ঠরোগের কথা জানা আছে। মধ্যযুগে ইউরোপে এই রোগের খুবই প্রাদুর্ভাব ছিল। সেই সময় রোগীদের প্রতি সাধারণের মনে কুসংস্কারজনিত ভয়ের ভাব দেখা যেত।

একটি গ্রীক শব্দ—রুক্ষ বা খস্‌খসে থেকে এই রোগের নামের উৎপত্তি। এই রোগ মূলতঃ ত্বককে তাই করে তোলে। কিন্তু এর জন্যে রোগীকে কলোনীবদ্ধ করে রাখবার প্রয়োজনীয়তা নেই। এই রোগ সামান্যভাবে সংক্রামক—সংক্রমণের জন্যে দীর্ঘস্থায়ী শারীরিক সান্নিধ্য ঘটা চাই।

এই রোগের কারণ যক্ষারোগের অনুরূপ এক প্রকার জীবাণু। ড্যাপসোন (Dapsone) বা ডি. ডি. এস. (DDS) নামে এক ওষুধে এই রোগ নিরাময় হয়। পূর্ব নাইজেরিয়ায় কাজ করবার সময় ডাঃ জন লোয়ে নামে এক মেথডিষ্ট মিশনারি এই ওষুধ আবিষ্কার করেন।

স্বল্প মূল্যের এই ট্যাবলেটগুলি নিয়মিত ব্যবহার করলেই রোগ সেরে যায়, কিন্তু বর্তমানে পাঁচ জনে একজন মাত্র রোগীকে এইভাবে চিকিৎসা করা হয়ে থাকে। তার নানা কারণ রয়েছে। একটি হলো রোগ নির্ণয়ের অসুবিধা—সংক্রমণের পর থেকে এই রোগ প্রকাশ পেতে 5 বছর সময় লেগে যায়। আর একটি কারণ হলো—এর সঙ্গে আতঙ্ক জড়িয়ে থাকে; তাছাড়া এই রোগে সহজে লোক মরে না, শুধু পঙ্গু হয়ে পড়ে। সংশ্লিষ্ট দেশের সরকার অনেক সময় এই রোগের চিকিৎসাকে অগ্রাধিকার দেন না।

যাহোক, এটি এমন একটি রোগ, সহজে ও স্বল্প ব্যয়ে যার নিরাময় করা সম্ভব, শুধু ইচ্ছা থাকা চাই। আশা করা যায়—কালক্রমে কুষ্ঠরোগ সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করা সম্ভব হবে।

চা

শ্রীমণীন্দ্রনাথ দাস

চা-ই সবচেয়ে সুলভ, নির্দোষ এবং উদ্দীপক পানীয়। চা-পান প্রথমে চীনদেশে সুরু হয় এবং ক্রমশঃ পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই ছড়িয়ে পড়ে। ইংরেজী Tea কথাটি চীনদেশের আময় ভাষার Tay শব্দটি থেকে গৃহীত, আর চা শব্দটিও চৈনিক—ক্যান্টন থেকে এসেছে। বাইবেল বা সেক্সপীয়রের রচনায় চায়ের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। যতদূর জানা যায়, 350 খৃষ্টাব্দে চীন দেশের গ্রন্থকর্তা কুও পো তাঁর লেখা অভিধান আর ইয়াতে চায়ের প্রথম উল্লেখ করেন। খুব সম্ভব চায়ের আদিম উৎপত্তিস্থান দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া; অর্থাৎ দক্ষিণ-পশ্চিম চীন, উত্তর-পূর্ব ভারত, বর্মা, শ্যাম এবং ইন্দোচীনের সীমান্তবর্তী অঞ্চলই চায়ের সর্বপ্রথম উৎপাদন স্থল বলে অনুমিত হয়। চায়ের বিষয় প্রথম বই চা চিং লেখেন চৈনিক পণ্ডিত লুঈ খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে। তখনকার কালে ফুটন্ত লবণাক্ত জলে চা ভিজিয়ে পান করা হতো। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর বহু পূর্বেই চীন থেকে জাপানে চা আনীত হয়। 1684 খৃষ্টাব্দে জার্মান প্রকৃতি-বিজ্ঞানী ও ডাক্তার এণ্ড্রিয়াস ক্লিয়ার যবদ্বীপে চায়ের প্রচলন করেন।

1815 সালেও কর্নেল ল্যাটার আসামীয় উপ-জাতিদের মধ্যে চা-পানের অভ্যাস দেখতে পেয়েছিলেন। 1823 সালে মেজর রবার্ট ব্রুস উত্তর আসামে স্বভাবজাত বন্য চা-গাছ আবিষ্কার করে-ছিলেন।

বঙ্গীয় সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন টার্নার 1783 সালে দৌত্যকার্য উপলক্ষ্যে যখন তিব্বতে তাশি লামার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যান, তখন এই প্রদেশেও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ব্যাপকভাবে চা-পানের অভ্যাস প্রচলিত ছিল। ভুটানের রাজা দেবরাজ তাঁকে চা-পানে আপ্যায়িত করেন—এই চা জল, আটা, মাখন ও লবণ দিয়ে তৈরি হয়েছিল। হল্যাণ্ডের লোকেরাই সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দশকে সর্বপ্রথম ইউরোপে চা আমদানী করে। 1618 সালে রাশিয়ায়, 1648 সালে প্যারিসে এবং 1650 সালে ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকায় চায়ের প্রচলন হয়।

ভিনিসের সুপ্রসিদ্ধ ভূ-পর্যটক গিয়াম্বাতিস্তা রামুসিও 1559 খৃষ্টাব্দে তাঁর লেখা ভ্রমণ-কাহিনীতে চীনদেশের চায়ের কথা সর্বপ্রথম লিপিবদ্ধ করেন। বিখ্যাত ডাচ নাবিক হিউগো লিন স্কুটেন 1598 সালে রচিত তাঁর ভ্রমণ-বৃত্তান্তে বিশেষ করে চায়ের কথা বলেছেন। 1658 সালে মার্কিউরাস পলিটিকাস নামে লণ্ডন থেকে প্রকাশিত এক সংবাদপত্রে প্রথম চায়ের বিজ্ঞাপন বের হয়। সামুয়েল পেপিস 1660 সালে তাঁর দিন-লিপিতে লিখেছেন—আমি এক পেয়ালা চীন দেশের পানীয় চা আনতে বলেছি, যা এর আগে কখনও পান করি নি।

1600 থেকে 1858 সাল পর্যন্ত প্রায় আড়াই-শ' বছর ধরে চায়ের আমদানী-রপ্তানী বাণিজ্যে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী একাধিপত্য করেছিল। আমেরিকায় 1773 সালের চা আইন রাষ্ট্রবিপ্লবের অন্যতম কারণ হয়েছিল। 1778 সালে স্বনামধন্য উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী ও ভৌগোলিক সার জোসেফ ব্যাঙ্কস ভারতবর্ষে চায়ের চাষের কথা উত্থাপন করেন। এরপর 1834 সালে ভারতের তৎকালীন বড়লাট উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক এদেশে চা উৎপাদনের উদ্দেশ্যে একটি কমিটি গঠন করেন। এতে কোম্পানির উদ্ভিদতত্ত্ববিদ্ ওয়ালিচ ও দুজন ভারতীয়

এবং তিন জন বণিক যোগ দেন। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত প্রধানতঃ চীনদেশ থেকেই সারা পৃথিবীতে চা রপ্তানী হতো। 1856 সালে ভারতবর্ষ থেকে প্রথম চা চালান হয়। ভারত থেকে 1885 সালে নিয়মিতভাবে বিদেশে চা রপ্তানী হতে থাকে। যবদ্বীপ থেকে চা আসে 1864 সালে আর সিংহল থেকে চা যায় 1880 সালে।

1753 খৃষ্টাব্দে স্বনামধন্য বৈজ্ঞানিক কার্ল লিনে চা-গাছের নামকরণ করেন Thea sinensis, কিন্তু বর্তমানে একে Camellia sinensis বলা হয়। চা-গাছ চৈনিক ও আসামীয়—এই দুই উপ-জাতিতে বিভক্ত। সিংহল দ্বীপে 1870 সালে কফির ফসল ব্যাধিবিধ্বস্ত হবার পর থেকে সেখানে চা চাষের সূচনা হয়। রাশিয়া 1847 সাল থেকে চায়ের আবাদ আরম্ভ করে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ডাক্তার চার্লস সোপার্ড (1890-1915) প্রায় পঁচিশ বছর ধরে চা চাষের চেষ্টা করে বিফল মনোরথ হন—ঐ দেশের জলবায়ু অনুকূল হলেও শ্রমিকদের পারিশ্রমিকের হার খুব বেশী হবার দরুণ চা-শিল্প লাভজনক হয় নি। নিরক্ষবৃত্তের 42° উত্তর এবং ও 33° দক্ষিণ পর্যন্ত প্রধানতঃ চা-গাছ রোপিত হয়ে থাকে। পৃথিবীর গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলে মৌসুমী জলবায়ুতে সমুদ্রসমতল প্রদেশ থেকে 6000 ফুট উঁচু পর্যন্ত জায়গা চা চাষের পক্ষে অনুকূল।

চা-গাছ চিরহরিৎ—25 থেকে 50 ফুট অবধি দীর্ঘ হয়। চায়ের পাতা এক ইঞ্চি থেকে দুই ইঞ্চির বেশী লম্বা হয় না। সাধারণতঃ গাছ ছেঁটে 3 থেকে 5 ফুটের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা হয়। চায়ের ফুলে সাধারণতঃ পাঁচটি সাদা পাপড়ি ও বহু সংখ্যক হলদে রঙের কেশর থাকে। ফুলের ব্যাস প্রায় এক ইঞ্চি। চায়ের ফল সবুজ রঙের, মার্বেলের গুলির মত বড় হয় এবং ওজনে প্রায় দুই গ্র্যামের মত। ভিতরে দুই-তিনটি গাঢ় বাদামী রঙের বীজ থাকে।

চা-গাছ প্রথমে বীজ থেকে উৎপন্ন হয়। ছয় মাসের মধ্যে গাছগুলি ছয়-সাত ইঞ্চি বড় হলেই অন্যত্র নিয়ে পাঁচ ফুট অন্তর লাগানো হয়ে থাকে। চার বছর পর থেকেই গাছ থেকে চায়ের পাতা সংগ্রহ করা হয়। এক-একটি চা-গাছের গড় আয়ু তিরিশ-চল্লিশ বছর হবে। এক একর জমিতে তিন-চার হাজার চা-গাছের ঝোপ জন্মায়। সাররূপে পটাস, অ্যামোনিয়াম সালফেট ও ফস্‌ফেট ব্যবহৃত হয়। কখনও কখনও চা-গাছ কীট-পতঙ্গ ও ছত্রাকের আক্রমণে ব্যাধি-গ্রস্ত হয়ে পড়ে। এর প্রতিকারের জন্যে তাম্র-ঘটিত রাসায়নিক পদার্থ প্রয়োগ করা হয়।

চা-গাছ যথেষ্ট বড় হলে নির্দিষ্ট সময়ে (সাধারণতঃ শীতকালে) শ্রমিকেরা প্রত্যেকটি ডাল থেকে দুটি পাতা ও একটি কুঁড়ি চয়ন করে ঝুড়িতে ভর্তি করতে থাকে। চারটি চায়ের ঝোপ থেকে গড়ে প্রতি বছর প্রায় এক পাউণ্ড চা পাওয়া যায়। চা-গাছের প্রায় 3200টি শাখাগ্র ছিঁড়ে নিলে তবেই এক পাউণ্ড আন্দাজ চা-পাতা পাওয়া যায়। সংগৃহীত চায়ের পাতা এরপর পুরা একদিন ঘরের মধ্যে বা উন্মুক্ত সূর্যালোকে রেখে রসশূন্য করা হয়। তারপর ঘন্টা তিনেক ধরে ঐ চা-পাতা পাকানো হয়। চায়ের পাকানো পাতা দুই-তিন ঘন্টা আর্দ্র হাওয়ায় ছড়িয়ে দিয়ে অল্প গাঁজানো হয়। এর ফলে পাতায় কষার গুণ কমে গিয়ে তাতে সুগন্ধের সঞ্চার হয়ে থাকে। সর্বশেষে একটি উষ্ণ কক্ষে আধ ঘন্টা পাতাগুলিকে রেখে গরম বাতাস দিয়ে শুষ্ক করা হয়।

পরিপক্ক চা সবুজ, কালো ও মাঝারী—এই তিন রকমের হয়। সবুজ চা-পাতা সংগ্রহের পরেই শুষ্ক করা হয়। কালো চা গাঁজানোর পর শুষ্ক করা হয় আর মাঝারী চা অল্প অক্সিজেনযুক্ত

হবার পর রসশূন্য করা হয়ে থাকে। মরক্কো ও আফগানিস্থানে সবুজ চায়ের কিছু সমাদর আছে। সর্বশেষে আকার অনুযায়ী চা-পাতাকে পূর্ণপত্র, ভগ্নপত্র ও চূর্ণপত্র—এই তিন শ্রেণীতে ভাগ করে এক-শ' পাউণ্ড করে কাঠের বাক্সের ভর্তি করা হয়। পৃথিবীতে প্রায় 1500 রকমের চা উৎপন্ন হয় এবং তাথেকে আবার 2000 রকমের মিশ্রণ তৈরি করা হয়ে থাকে।

পৃথিবীর মোট কুড়িটি দেশে চা উৎপন্ন হয়। 1958-60 সালে বিভিন্ন দেশে চা উৎপাদনের হার এই রকম ছিল—

ভারতবর্ষ	319	হাজার টন
সিংহল	185	” ”
চীন	147	” ”
জাপান	77	” ”
ইন্দোনেশিয়া	43	” ”
সোভিয়েট রাশিয়া	32	” ”
পূর্ব আফ্রিকা	31	” ”
পাকিস্তান	24	” ”

বর্তমান বিশ্বের বাজারে শতকরা প্রায় 80 ভাগ চা ভারতবর্ষ ও সিংহল থেকে আসে। এর মধ্যে 44 ভাগ চা এখন ভারত থেকেই রপ্তানী হয়ে থাকে। 1959 সালে সারা পৃথিবীতে 170 কোটি পাউণ্ড চা ব্যবহৃত হয়েছিল। এর মধ্যে 52 কোটি পাউণ্ড গ্রেট বৃটেন, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র 10 কোটি পাউণ্ড এবং ভারতবর্ষ 25 কোটি পাউণ্ড চা ব্যবহার করেছিল। যুক্তরাজ্য, ভারতবর্ষ ও সিংহল থেকে নিজ প্রয়োজনের দুই-তৃতীয়াংশ ও চীন থেকে এক-তৃতীয়াংশ চা আমদানী করে। 1952 সালে পৃথিবীতে বার্ষিক জনপ্রতি চা-পানের হার এরূপ ছিল—

বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জ 9 পাউণ্ড, অষ্ট্রেলিয়া 6·5 পাউণ্ড, নিউজিল্যাণ্ড 5 পাউণ্ড, ইরাক 4 পাউণ্ড, ক্যানাডা 3·4 পাউণ্ড, মরক্কো 3·2 পাউণ্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা 2 পাউণ্ড, ঈজিপ্ট 1·78 পাউণ্ড, হল্যাণ্ড 1·58 পাউণ্ড, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ·66 পাউণ্ড, ভারতবর্ষ 9 আউন্স মাত্র। আজকাল আমেরিকার লোকেরা চায়ের চেয়ে বেশী কফি পান করে আর ইংল্যাণ্ডবাসীরা কফি অপেক্ষা অনেক অধিক চা ব্যবহার করে, কিন্তু অতীতে এর ঠিক বিপরীত অবস্থা ছিল।

1960-61 সালে বিভিন্ন দেশ থেকে চা রপ্তানীর হার এই প্রকার ছিল—

ভারতবর্ষ	212	হাজার টন
সিংহল	188	” ”
চীন	43	” ”
ইন্দোনেশিয়া	37	” ”
পূর্ব আফ্রিকা	29	” ”

সমগ্র ভারতবর্ষে প্রায় 10,000 চা-বাগান আছে, সর্বসমেত দশ লক্ষ লোক এখানে কাজ করে। এই ব্যবসায়ে প্রায় 70 কোটি টাকা নিয়োজিত আছে। ভারতের মোট উৎপন্ন চায়ের মধ্যে শতকরা প্রায় 70 ভাগ আসামেই উৎপন্ন হয়, বাকী দশ ভাগ দার্জিলিং অঞ্চলে এবং অবশিষ্ট কুড়ি ভাগ দক্ষিণ ভারতের নীলগিরি, মহীশূর, ত্রিবাঙ্কুর, কোচিন ও কুর্গে উৎপন্ন হয়ে থাকে। প্রতি বছর গড়ে এদেশে 55 কোটি পাউণ্ড চা উৎপন্ন হয়। এর মধ্যে স্বাদে ও গন্ধে দার্জিলিঙের চা-ই সর্বোৎকৃষ্ট।

সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইংল্যাণ্ডে যখন চায়ের ব্যবহার আরম্ভ হয়, তখন পাউণ্ড প্রতি চায়ের দাম ছিল প্রায় 10 পাউণ্ড। এখন সর্বোৎকৃষ্ট চায়ের মূল্য পাউণ্ড প্রতি 4 পাউণ্ড আন্দাজ হবে। চায়ের নীলাম ও বিক্রয়-কেন্দ্র প্রধানতঃ লণ্ডন, কলিকাতা, কলম্বো, চট্টগ্রাম ও কোচিন।

চা উত্তেজক পানীয়, রাসায়নিক বিশ্লেষণে এতে ক্যাফিন, ট্যানিন ও সুগন্ধ তৈল পাওয়া যায়। ক্যাফিন নামক উপক্ষারটি মস্তিষ্ক, হৃৎপিণ্ড ও বৃক্ককে প্রত্যক্ষভাবে উত্তেজিত করে। ট্যানিন একটু কষায় স্বাদবিশিষ্ট। এক পেয়ালা চায়ে

প্রায় এক গ্রেন ক্যাফিন ও প্রায় দুই গ্রেন ট্যানিন থাকে। ভারতীয় কালো চায়ে 2% থেকে 3% ক্যাফিন এবং 6% থেকে 10% ট্যানিন থাকে। আর চীনদেশের চায়ে 2% থেকে 3·7% ক্যাফিন এবং 5% থেকে 10% ট্যানিন বর্তমান। সাধারণতঃ ফুটন্ত গরম জলে তিন-চার মিনিট চায়ের পাতা ভিজিয়ে নেবার পর ছাঁকনিতে ছেঁকে তাতে দুধ ও চিনি মিশিয়ে পান করা হয়। দুধ চায়ের কষায় স্বাদ নষ্ট করে দেয়, আর চিনি মিষ্টতা ও সুস্বাদ আনে। চা-পানের পনেরো মিনিটের মধ্যেই ক্যাফিনের ক্রিয়া আরম্ভ হয়ে যায়।

সমানভাবে দেহ-মনের পক্ষে উত্তেজক ও আনন্দদায়ক এবং তৃপ্তিকর অথচ সস্তা পানীয় বলেই চায়ের এত আদর। অবসন্ন ও ক্লান্ত শরীরে চা কি রকম উপভোগ্য এবং উপকারী, তা আর কাউকে নতুন করে বলে দিতে হবে না। তবে অতিরিক্ত চা-পান করলে অজীর্ণ, অনিদ্রা এবং হৃৎপিণ্ডের গতি দ্রুত ও অনিয়মিত হবার সম্ভাবনা আছে।

গ্রীষ্মকালে আমেরিকায় দুধের সর ও চিনি মিশ্রিত বরফশীতল চা-পানের প্রথা প্রচলিত। রাশিয়াতে নেবুর রসের সঙ্গে চিনি কিম্বা জ্যাম মিশিয়ে চা-পান করা খুব প্রীতিপদ মনে করা হয়। এক সময় মধ্যএশীয় অঞ্চলে মাখন ও লবণ সহযোগে চা পান করা হতো।

চায়ের আরক প্রস্তুত-প্রণালী :

(1)

সর্বোৎকৃষ্ট চা	175	ভাগ
দারুচিনি	3	,,
লবঙ্গ	3	,,
ভ্যানিলা	1	,,
র‍্যাম (60% মন্ত)	1000	,,

কঠিন উপকরণগুলি চূর্ণ করে নিয়ে প্রায় তিন দিন ধরে অ্যালকোহলে ভিজিয়ে রাখতে হবে। তারপর সেই সুরাসার ছেঁকে পৃথক করতে হবে। ঠিকমত তৈরি হলে এই তরল মিশ্রণ বেশ স্বচ্ছ, উজ্জ্বল ও উত্তেজক পানীয় হয় এবং অনেক দিন ভাল থাকে।

(2)

চা চূর্ণ	1	আউন্স
চিনি	3	,,
বিশুদ্ধ সুরা	10	,,
জল	10	,,

দুই সপ্তাহ ভিজাবার পর ছেঁকে নিতে হবে।

চায়ের সরবৎ :

(3)

চা	8	আউন্স
চিনি	36	,,
ফুটন্ত গরম জল	16	,,

(4)

চা	2	আউন্স
ফুটন্ত গরম জল	20	,,
সাইট্রিক অ্যাসিড	$\frac{1}{8}$	,,
চিনি	56	,,

প্রথমে ফুটন্ত গরম জলে প্রায় 5 মিনিট কাল চা ভিজিয়ে নেবার পর সেই ক্বাথ ছেঁকে নিয়ে তাতে সাইট্রিক অ্যাসিড ও চিনি যোগ করতে হবে।

জৈব যৌগের কাঠামো নির্ণয়ে ভর-বর্ণালীমিতি

কালীশঙ্কর মুখোপাধ্যায়*

ভর-বর্ণালীমিতি বা মাস্-স্পেকট্রোমেট্রি আধুনিক যুগের রসায়ন-বিজ্ঞানীদের, বিশেষ করে ভেষজ-রসায়নবিদ্‌দের একটি অতি প্রয়োজনীয় ও জনপ্রিয় পদ্ধতি। এই জনপ্রিয়তার মূলে রয়েছে এই পদ্ধতির সরলতা ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণী ক্ষমতা। বর্তমান যুগে ভেষজ-রসায়ন-বিজ্ঞানীরা যে সব জৈব যৌগ নিয়ে কাজ করে থাকেন, সেগুলি প্রাকৃতিক জগতে খুব কম পরিমাণে পাওয়া যায়, যার ফলে যৌগের কাঠামো নির্ণয়ের প্রচলিত রাসায়নিক পদ্ধতিগুলি ভালভাবে পরিচালনা করা বেশ কষ্টসাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু অতি অল্প (1মিঃ গ্র্যাম বা আরও কম) যৌগ নিয়ে এবং খুব সহজভাবে ভর-বর্ণালীমিতির পদ্ধতি পরিচালনা করে পরীক্ষাধীন যৌগের কাঠামো সম্পর্কে সঠিক সংবাদ সংগ্রহ করা অসম্ভব নয়। সুতরাং এই রকম একটা পদ্ধতির ব্যাপক বিস্তার যে সকল রসায়ন-বিজ্ঞানীদের কাম্য হবে, সেটা খুবই স্বাভাবিক। প্রকৃতপক্ষে ইদানীং কালে অধিকাংশ ভেষজ জৈব যৌগের কাঠামো নির্ণয় প্রধানতঃ ভর-বর্ণালীর সঠিক বিশ্লেষণের ভিত্তিতেই হচ্ছে।

ভর-বর্ণালীমিতিকে এক কথায় ইলেকট্রন শক্তির সহায়তায় পরিচালিত একটা বিশেষ যান্ত্রিক প্রয়োগ-কৌশল বলা যেতে পারে। এই বিশেষ প্রয়োগ-কৌশলটি মূলতঃ রাসায়নিক পদার্থের ভর (Mass) নির্ণয় এবং আইসোপগুলির পৃথকীকরণের কাজেই প্রয়োগ করা হয়। এই পদ্ধতিতে একটা বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে কোন একটি পদার্থকে কিংবা পদার্থের মিশ্রণকে (সাধারণতঃ আইসোটোপের মিশ্রণ) মাঝারী শক্তিসম্পন্ন ইলেকট্রন-রশ্মির শক্তি দিয়ে ক্রমাগত আঘাত করা হয়। এর ফলে নানান ধরণের আয়ন তৈরি হয় ; যেমন—

(ক) $M+e^{-}=M^{-}$

(খ) $M+e^{-}=M^{+}+2e^{-}$

(গ) $M+e^{-}=M^{+n}+(n+1)e^{-}$
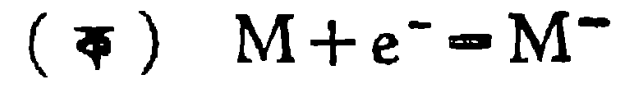
(M এখানে কোন পদার্থ বা পদার্থের মিশ্রণ এবং e^{-} হচ্ছে ইলেকট্রন)

এরপর ঐ আয়নগুলিকে পৃথক করে তাদের ভর নির্ণয় করা হয়। এই সম্পর্কে একটা কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, ভর-বর্ণালীমিতির ক্ষেত্রে ইউনিপজিটিভ আয়নই সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। কারণ অন্যান্য আয়নের চেয়ে এগুলিই তাড়াতাড়ি তৈরি হয়। যে বিশেষ যন্ত্রটির সাহায্যে ইলেকট্রন-রশ্মি পরিচালিত করে ইউনিপজিটিভ আয়ন তৈরি করা হয় এবং পরে সেগুলিকে পৃথক করা হয়, তাকে ভর-বর্ণালীমিতি যন্ত্র বলা হয়ে থাকে। এই ধরণের বিভিন্ন রকম ব্যবহারের কথা রসায়নশাস্ত্রে উল্লেখিত আছে। তাদের মধ্যে ডেম্পস্টার ও অ্যাষ্টনের তৈরি যন্ত্র দুটিই বেশী ব্যবহৃত হয়।

এই যান্ত্রিক পদ্ধতির মূলনীতি হচ্ছে—ব্যবহৃত ইলেকট্রন-রশ্মির সাহায্যে পরীক্ষাধীন মিশ্রণ থেকে প্রথমে ইউনিপজিটিভ আয়ন তৈরি করা এবং পরে ঐ আয়নগুলিকে বৈদ্যুতিক শক্তির সহায়তায় যন্ত্রস্থিত চৌম্বক সীমানায় নিক্ষেপ করা। এখন পজিটিভ আয়নগুলি তাদের ভর অনুযায়ী

*রসায়ন বিভাগ, কৃষ্ণনগর সরকারী কলেজ, নদীয়া।

চৌম্বক সীমানার বিভিন্ন স্থানে গিয়ে পড়বে। যদি আয়নটা খুব ভারী হয় অর্থাৎ ভর বেশী হয়, তাহলে সেটা আয়নের উৎপত্তিস্থলের কাছাকাছি যে চৌম্বক সীমানা আছে, সেখানে গিয়ে পড়বে আর আয়নটা হাল্কা হলে উৎপত্তি-স্থলের অনেক দূরের চৌম্বক সীমানায় গিয়ে পৌঁছুবে। এই ভাবে এই পদ্ধতিতে বিভিন্ন পজিটিভ আয়ন পৃথক করা হয়। এর পর ভর নির্ণয়ের জন্যে ঐ আয়নগুলিকে আয়ন-সংগ্রাহকের ভিতরে নেওয়া হয়। তাহলে প্রশ্ন উঠবে, প্রত্যেকটি আয়নের জন্যে কি পৃথক পৃথক আয়ন-সংগ্রাহকের দরকার? না, পৃথক পৃথক শক্তি) যে কোন একটাকে ধীরে ধীরে পরিবর্তন করলে দেখা যাবে, কোন নির্দিষ্ট নিক্ষিপ্ত শক্তিতে কোন একটি বিশেষ আয়নই ঐ নির্দিষ্ট চৌম্বক সীমা অতিক্রম করে সংগ্রাহককে পৌঁছুতে পারে। প্রকৃতপক্ষে ভর-বর্ণালীমিতি যন্ত্রে আয়নের উৎপত্তিস্থল ও সংগ্রাহকের মধ্যবর্তী দূরত্ব একই রাখা হয় এবং চৌম্বক শক্তি ও নিক্ষেপিত শক্তির যে কোন একটিকে অপরিবর্তিত রেখে অন্যটিকে আস্তে আস্তে বাড়ানো হয়। দেখা গেছে, নিক্ষিপ্ত শক্তিকে একই রেখে চৌম্বক শক্তি পরিবর্তন করলে ভালভাবে ভর নির্ণয় করা সম্ভব হয় (1নং চিত্র)
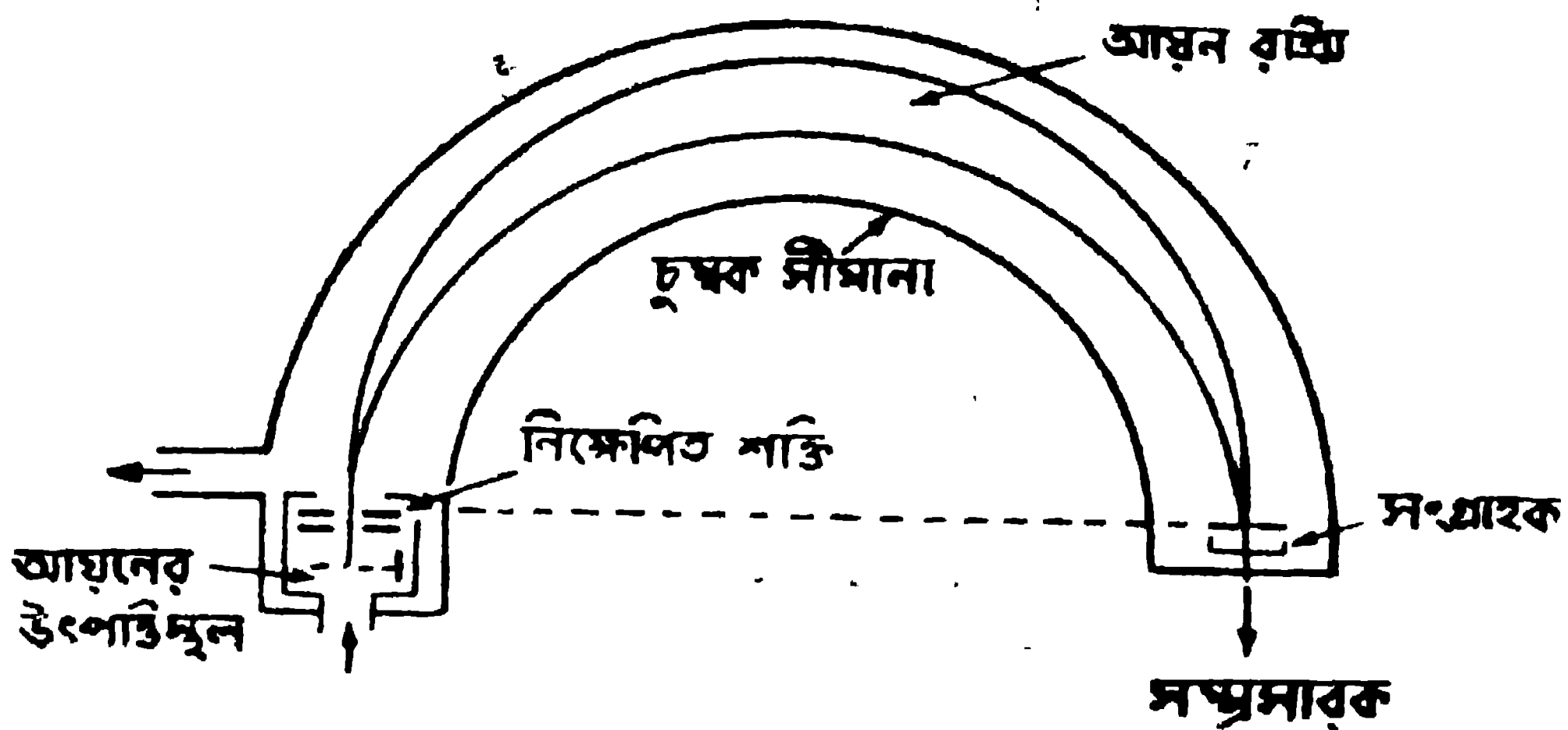
1নং চিত্র

সংগ্রাহক নেবার দরকার নেই। একটি মাত্র সংগ্রাহক থাকলেই যথেষ্ট। কেন না, আমরা জানি, কোন একটি বিশেষ আয়ন চৌম্বক সীমানার কোন্ জায়গায় গিয়ে পড়বে, তা এক দিকে যেমন তার ভরের উপর নির্ভর করে, অন্য দিকে তেমনি নির্ভর করে, কি পরিমাণ বিদ্যুৎ-শক্তির সহায়তায় তাকে নিক্ষেপ করা হচ্ছে বা কি রকম শক্তিসম্পন্ন চৌম্বক সীমানায় সেটা বিক্ষিপ্ত হচ্ছে। সুতরাং আয়নের উৎপত্তি-স্থল ও সংগ্রাহকের দূরত্ব একই রেখে চৌম্বক শক্তি এবং নিক্ষেপিত শক্তির (অ্যাক্সিলারেটিং

যখন ঐ আয়নটি সংগ্রাহকে পৌঁছয়, তখন একটা বিশেষ সঙ্কেতের সৃষ্টি হয় এবং সেই সঙ্কেতটিকে তখন অ্যাম্প্লিফায়ারের সাহায্যে বর্ধিত করে ঠিকমত লিপিবদ্ধ করা হয়[1]।

1. সঙ্কেতগুলিকে লিপিবদ্ধ করবার জন্যে ভর-বর্ণালীমিতি যন্ত্রে রেকর্ডার থাকে। সাধারণতঃ তিন প্রকার রেকর্ডার ব্যবহৃত হয়। যথা—অসিলোগ্রাফ, পেন ও ইঙ্ক রেকর্ডার এবং ডিজিটাইজার। এর মধ্যে অসিলোগ্রাফ এবং ডিজিটাইজার যুক্তভাবে ব্যবহার করলে সন্তোষ-জনক ফল পাওয়া যায়।

এই প্রসঙ্গে যে কথাটা মনে রাখা একান্ত দরকার, তা হচ্ছে, ঐ বিশেষ সঙ্কেতটি কখনই আয়নের অনাপেক্ষিক (অ্যাবসোলিউট) ভরের নির্দেশক নয়। সব সময় ওটা ভর (m) এবং চার্জ (e, ইলেকট্রন-রশ্মির শক্তি)-এর অনুপাতকে (m/e) বুঝিয়ে থাকে। এখন ঐ m/e সঙ্কেতটিকে লেখচিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। এই লেখচিত্রের এক অক্ষ আয়ন সঙ্কেত (m/e) এবং অন্য অক্ষ আয়নের আপেক্ষিক তীব্রতা[2] নির্দেশ করে। এর ফলে ঐ লেখচিত্রের বিভিন্ন m/e স্থানে পৃথক পৃথক আয়ন সঙ্কেতগুলি শৃঙ্গের আকারে অবস্থান করে এবং বিশেষ একটি m/e স্থানের মান নির্দিষ্ট একটি আয়নের ভরের পরিমাপক হিসাবে কাজ করে।

উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি, ভর-বর্ণালীমিতির আসল কথা হচ্ছে, কোন পদার্থ কিংবা পদার্থের মিশ্রণ থেকে ইউনিপজিটিভ আয়ন তৈরি করে তাদের ভর নির্ণয় করা। সুতরাং যদি কোন যৌগ থেকে অনুরূপভাবে ইউনিপজিটিভ আয়ন তৈরি করা সম্ভব হয়, তাহলে ভর-বর্ণালীমিতির সাহায্যে সেই সব যৌগের ভর নির্ণয় করা অসম্ভব নয়। প্রকৃতপক্ষে জৈব যৌগগুলি ইলেকট্রন-রশ্মির আঘাতের ফলে আয়নিত হয় এবং দেখা গেছে যথেষ্ট শক্তিসম্পন্ন ইলেকট্রন-রশ্মির আঘাতে বহু পারমাণবিক জৈব যৌগগুলি টুকরা টুকরা হয়ে ভেঙ্গে গিয়ে অনেক ইউনিপজিটিভ আয়ন তৈরি করতে পারে। এখন ঐ টুকরাগুলির ভর নির্ণয় করে ঠিকমত সন্নিবেশিত করতে পারলে পরীক্ষাধীন ঐ বহু-পারমাণবিক অণুটির পুরা কাঠামো সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট ধারণা আমাদের জন্মাতে পারে এবং এই মূলনীতিই হচ্ছে আলোচ্য যান্ত্রিক প্রয়োগ-কৌশলের বৈশিষ্ট্য এবং জনপ্রিয়তার প্রধান কারণ।

এখন প্রশ্ন হলো, কি কি পরিমাণ ইলেকট্রন শক্তি ব্যবহার করলে ইউনিপজিটিভ আয়ন তৈরি হবে? এর উত্তরে বলা যেতে পারে, ইলেকট্রন-রশ্মির আঘাতের ফলে কোন্ অণু থেকে তখনই একটা ইলেকট্রন বেরিয়ে যেতে পারে[3], যখন সেই আঘাতকারী ইলেকট্রন-রশ্মির শক্তি ইলেকট্রন-আহত ঐ অণুর আয়নীকরণ শক্তির (আয়োনাইজেশন পোটেনশিয়াল) সমান কিংবা তার চেয়ে বেশী। জৈব যৌগের আয়নীকরণ শক্তি সাধারণতঃ 7 থেকে 15 ইলেকট্রন-ভোল্টের মত হয়। কাজেই জৈব অণুকে আয়নিত করতে হলে কম পক্ষে ঐ ধরণের শক্তিসম্পন্ন ইলেকট্রন-রশ্মি ব্যবহার করতে হবে। কিন্তু ব্যবহৃত ইলেকট্রন-রশ্মির শক্তি যদি অণুর আয়নীকরণ শক্তির সমান হয়, তাহলে অণুটিকে আয়নিত করতে হলে ঐ ব্যবহৃত শক্তিকে পুরাপুরিভাবে পরীক্ষাধীন অণুতে স্থানান্তরিত করতে হবে (যা অনেক ক্ষেত্রে সম্ভব নাও হতে পারে)। এই রকম ক্ষেত্রে খুব কম তীব্র আণবিক শৃঙ্গ ভর-বর্ণালীতে বিধৃত হয়। কিন্তু ইলেকট্রন-রশ্মির শক্তির পরিমাণ বাড়ালে পরীক্ষাধীন অণুটির আয়নিত হবার সম্ভাবনাও বেড়ে যাবে এবং তার ফলে ভর-বর্ণালীতে উল্লেখযোগ্য তীব্র আণবিক শৃঙ্গের ইঙ্গিত পাওয়া যাবে। এই জন্যেই এই পদ্ধতিতে আণবিক-আয়নের উৎপত্তির জন্যে সাধারণতঃ 30 থেকে

2. সবচেয়ে বেশী তীব্র যে সঙ্কেতটি তাকে মূল সঙ্কেত ধরা হয় এবং সেই সঙ্কেতের জন্যে যে শৃঙ্গটি পাওয়া যায়, তাকে মূল শৃঙ্গ বলা হয়।

3। ইলেকট্রন হচ্ছে নেগেটিভ কণা, সুতরাং সে রকম একটা কণা অণু থেকে বেরিয়ে গেলে একটা ইউনিপজিটিভ আয়ন তৈরি হবে। এই ইউনিপজিটিভ আয়নকে আণবিক আয়ন বা মলিকিউলার আয়ন (M^+) বলা হয় এবং এর ভরকে আণবিক ভর বলা হয়।

50 ইলেকট্রন-ভোল্ট শক্তিসম্পন্ন ইলেকট্রন-রশ্মি ব্যবহার করা হয়।

এবার ব্যবহৃত ইলেকট্রন-রশ্মির শক্তির পরিমাণ যদি ধীরে ধীরে আরও বাড়ানো হয় এবং পরীক্ষাধীন অণুটি যদি বহু-পারমাণবিক হয় (জৈব যৌগগুলি প্রায়শঃ এরূপ হয়ে থাকে), তাহলে দেখা যাবে, ঐ বর্ধিত অতিরিক্ত শক্তি এমন একটা স্তরে গিয়ে পৌঁছুবে, যখন তা ঐ আণবিক আয়নের মধ্যস্থিত কোন একটা বিশেষ বাহুকে ভাঙবার পক্ষে যথেষ্ট। এর ফলে বিবেচনাধীন অণুটির খণ্ডীয়করণ ঘটতে থাকবে। আণবিক আয়নের মত এক্ষেত্রেও অণুর খণ্ডীয়করণের সম্ভাবনা ইলেকট্রন-রশ্মির শক্তির বৃদ্ধির সঙ্গে বাড়তে থাকে। তাই উল্লেখযোগ্য এবং বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ভর-বর্ণালী পাবার জন্যে সাধারণতঃ 60 থেকে 90 ইলেকট্রন-ভোল্ট শক্তির ইলেকট্রন-রশ্মি ব্যবহার করা হয়। এই সব ভর-বর্ণালীগুলি কিন্তু বেশ জটিল। কারণ বহু-পারমাণবিক যৌগে বিভিন্ন ধরণের বাহু থাকতে পারে এবং তাদের ভাঙনের ফলে বিভিন্ন ভরখণ্ডের সৃষ্টি হতে পারে। সুতরাং ভর-বর্ণালীতে অনেক ভর-শৃঙ্গ পাওয়া যাবে। একটা উদাহরণ দিলে এই কথার যাথার্থ্য খুব সহজেই বোধগম্য হবে। ধরা যাক, ABCD একটা কাল্পনিক বহু-পারমাণবিক অণু এবং এটাকে যথেষ্ট শক্তিসম্পন্ন ইলেকট্রন-রশ্মি দিয়ে আঘাত করা হলো। এর ফলে অণুটির নিম্ন পরিকল্পনা অনুযায়ী পরিবর্তন ঘটতে পারে।

$$ABCD + e^- \longrightarrow ABCD^+ + 2e^- + ABCD^{\cdot} \quad \cdots \quad (1)$$

$$ABCD^+ \longrightarrow A^+ + BCD^{\cdot} \quad \cdots \quad (2)$$

$$\longrightarrow \underline{AB^+ + CD^{\cdot}} \quad \cdots \quad (3)$$

$$\downarrow \qquad \downarrow$$

$$A^+ + B^{\cdot} \quad A^{\cdot} + B^+ \quad \cdots \quad (4)$$

$$\longrightarrow CD^+ + AB^{\cdot} \quad \cdots \quad (5)$$

$$\longrightarrow AD^+ + BC^{\cdot} \text{ ইত্যাদি} \quad \cdots \quad (6)$$

$$ABCD^+ + ABCD \longrightarrow [ABCD.\ ABCD]^+ \rightarrow ABCDA^+ + BCD \quad \cdots \quad (7)$$
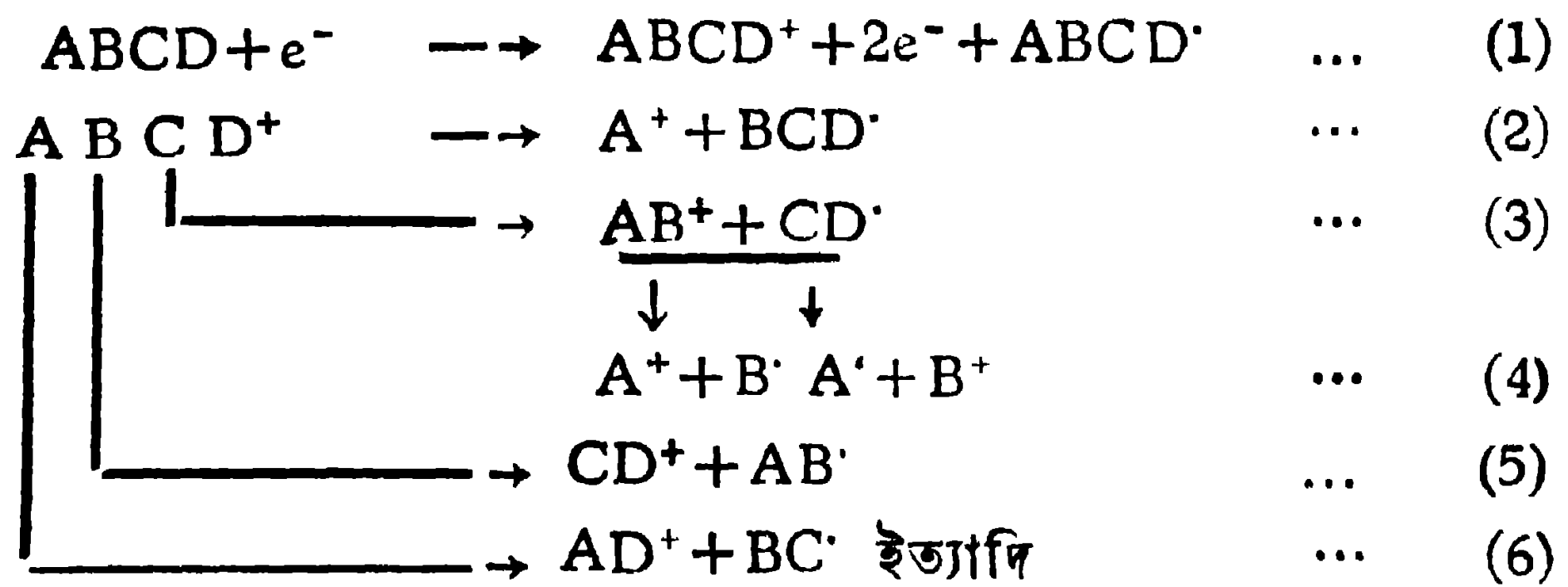
উপরের পরিকল্পনা থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, আণবিক আয়নের সঙ্গে নিউট্র্যাল ভরখণ্ডেরও সৃষ্টি হয় এবং পরে সেই আণবিক আয়ন ভাঙবার ফলে অনেকগুলি ইউনিপজিটিভ আয়ন তৈরি হয়। যেহেতু ভর-বর্ণালীতে যে কোন পজিটিভ আয়ন বিধৃত হতে পারে, সেহেতু এই ধরণের বহু-পারমাণবিক অণুর ভর-বর্ণালীতে অনেকগুলি ভর-শৃঙ্গ দেখা যাবে।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা উল্লেখ করা অত্যন্ত প্রয়োজন। অনেক সময় দেখা যায়, আণবিক আয়নের জ্যামিতিক গঠন এমনই যে, সেটা ভেঙে ভরখণ্ড তৈরি হবার আগে তার পুনর্বিন্যাস ঘটে যায় এবং সে সব ক্ষেত্রে ঐ পুনর্বিন্যস্ত আয়ন থেকে এমন এক বা একাধিক ভরখণ্ড তৈরি হয়, যাদের সঙ্গে মূল অণুর কোন রকম যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যায় না। সুতরাং এই রকম পরিস্থিতিতে যৌগের কাঠামো নির্ণয়ে ভর-বর্ণালীর সঠিক বিশ্লেষণ বেশ জটিল হয়ে পড়ে। ঠিক এই ধরণের জটিলতা নিয়োপেনটন হাইড্রোকার্বনের

$$\left[\begin{array}{c} CH_3 \\ | \\ CH_3-C-CH_3 \\ | \\ CH_3 \end{array}\right]$$
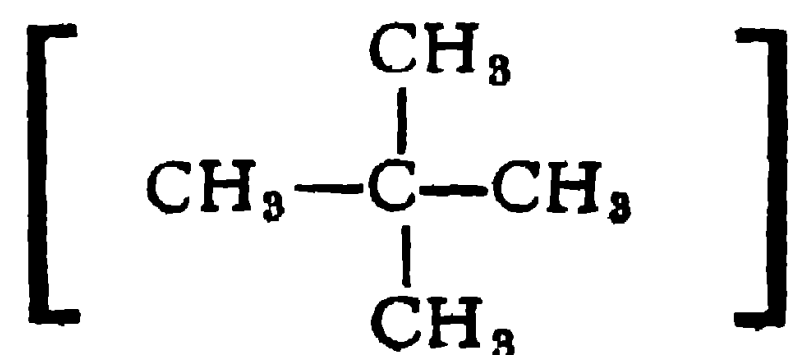
ভর-বর্ণালীতে দৃষ্টি হয়। দেখা যায় ঐ যৌগের m/e 29 স্থানে একটা শৃঙ্গ আছে। হাইড্রো-কার্বনজাতীয় যৌগের ক্ষেত্রে সাধারণতঃ ইথাইল পুঞ্জ (-C_2H_5)-এর উপস্থিতির জন্যে উক্ত স্থানে শৃঙ্গ দেখা যায়। নিয়োপেনটেনে কিন্তু সে রকম ইথাইলপুঞ্জ নেই, অথচ ঐ শৃঙ্গটি ভর-বর্ণালীতে দেখতে পাওয়া যায়। এই ব্যতিক্রমকে ব্যাখ্যা করতে গেলে আণবিক আয়নের পুনর্বিন্যাস ঘটছে—এই রকম কল্পনা করতেই হবে। এই ধরণের পুনর্বিন্যাস সাধারণতঃ অসম-পারমাণবিক (হেটারো-অ্যাটমিক) যৌগগুলিরই বিশেষত্ব এবং সেক্ষেত্রে এই জাতীয় পুনবির্ন্যাসের কৌশল এবং প্রয়োজনীয় কাঠামো সম্পর্কে মোটামুটি জ্ঞান থাকলে ভর-বর্ণালীর সঠিক বিশ্লেষণ করা মোটেই দুরূহ নয়।

আরও একটা কথা এখানে বলে রাখা দরকার। আমরা জানি আয়নগুলি বেশ কম পরিমাণে তৈরি হয়। সুতরাং বেশী পরিমাণে পড়ে থাকা অপরিবর্তিত (নিউট্র্যাল) অণুগুলি ক্রমাগত ইলেকট্রন-রশ্মির আঘাতের ফলে আণবিক আয়নের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হতে পারে। এই সংঘর্ষের ফলে নিউট্র্যাল অণু থেকে একটা পরমাণু বা পরমাণুপুঞ্জ বিচ্ছিন্ন হয়ে আণবিক আয়নের সঙ্গে যুক্ত হয় এবং তখন অন্য একটা আয়ন তৈরি হয় (সমীকরণ নং 7), যার ভর বিবেচনাধীন অণুর চেয়ে বেশী। সুতরাং এই রকম অবস্থায় আণবিক ভর নির্ণয়ে বেশ জটিলতার সৃষ্টি হতে পারে। অবশ্য যে পারিপার্শ্বিক অবস্থায় ভর-খণ্ডীয়করণ পরিচালনা করা হয়, তাতে নিউট্র্যাল অণু থেকে শুধুমাত্র হাইড্রোজেন বিচ্ছিন্ন হতে পারে তাই। (M+1) শৃঙ্গই সাধারণতঃ ভর-বর্ণালীতে বিধৃত হয়। (M+1) ভর-শৃঙ্গ প্রধানতঃ সেই সব যৌগের (অ্যামিন, ইথার, এস্টার ইত্যাদি) ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ, যাদের আণবিক আয়নটা খুবই নরম এবং ভঙ্গুর, কিন্তু (M+1) আয়নাটা বেশ শক্ত ও স্থায়ী। অতএব এখানেও আমরা দেখছি, যৌগের জ্যামিতিক কাঠামোর ভূমিকা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। কেন না, আণবিক আয়নের স্থায়িত্ব বা নিউট্র্যাল অণু থেকে হাইড্রোজেনের বিচ্যুতি মোটামুটিভাবে জ্যামিতিক গঠনের উপর নির্ভরশীল।

উপরিউক্ত আলোচনার ভিত্তিতে এখন সুস্পষ্টভাবে বলা যায় যে, আণবিক আয়নের উৎপত্তি এবং পরবর্তী কালে তার খণ্ডীয়করণ সাধারণতঃ নিম্নলিখিত তথ্যের উপর নির্ভর করে :—

(ক) পজিটিভ আয়নের স্থায়িত্ব।

(খ) যে বাহুটা ভাঙবে, তার দৃঢ়তা (বণ্ড-এনার্জি ।

(গ) নিউট্র্যাল খণ্ডের স্থায়িত্ব।

(ঘ) পরীক্ষাধীন যৌগের জ্যামিতিক কাঠামো।

এই সব তথ্যগুলির মধ্যে পজিটিভ আয়নের স্থায়িত্বই হচ্ছে সবচেয়ে বেশী তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ এর উপরই নির্ভর করছে ভর-শৃঙ্গ বা ভরখণ্ড-শৃঙ্গের তীব্রতা এবং একথা এখন আর আমাদের অজানা নেই যে, শৃঙ্গের তীব্রতাই হচ্ছে ভর-বর্ণালীর ব্যাখ্যানের প্রধান ভিত্তি। পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর দেখা গেছে, যৌগের মধ্যে পাই-ইলেকট্রন ব্যবস্থা উপস্থিত থাকলে কিংবা যৌগের কাঠামো চক্রাকার হলে আণবিক আয়নের স্থায়িত্ব বৃদ্ধি পায় এবং পরিবর্তপুঞ্জ, বিশেষ করে অসম-পারমাণবিকপুঞ্জ আণবিক আয়নের খণ্ডিত হবার প্রবণতা বৃদ্ধি করে।

বিজ্ঞান-সংবাদ

তাপ পারমাণবিক সংযোজন

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিজ্ঞানীরা নিয়ন্ত্রিত তাপ পারমাণবিক সংযোজন বা কনট্রোল ও থার্মো-নিউক্লিয়ার ফিউশন ঘটানোর জন্যে গত 20 বছর ধরে চেষ্টা করছেন।

সমুদ্রের জলে সস্তায় ভারী হাইড্রোজেন বা ডয়টেরিয়াম পাওয়া যায়। এই সস্তা ইন্ধন ব্যবহার করে প্রচুর পরিমাণে বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদন করবার উপযোগী রি-অ্যাক্টর তৈরি করাই বিজ্ঞানীদের লক্ষ্য।

এক্ষেত্রে উন্নতি খুবই মন্থর গতিতে হয়েছে। তার প্রধান কারণ—প্রথমতঃ বিদ্যুতায়িত প্রচণ্ড উত্তপ্ত গ্যাসীয় বস্তুকণাকে ধরে রাখবার উপযোগী পাত্র চাই। এই সকল কণা একে অন্যকে প্রতিহত করে। এই ভীষণ উত্তপ্ত গ্যাসকে বলা হয় প্লাজ্‌মা। যে কোন পাত্রে ঐ গ্যাস রাখা মাত্র তা বাষ্প হয়ে উবে যাবে। তাই বিজ্ঞানীরা ঐ গ্যাস ধরে রাখবার পাত্র উদ্ভাবনে ব্রতী হয়েছেন।

সম্পূর্ণ ফাঁকা একটি পাত্রের মাঝখানে চৌম্বক ক্ষেত্র দিয়ে ঘিরে প্লাজ্‌মা রাখা যায় কিনা, সে নিয়ে বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে দেখছেন। কিন্তু সমস্যা দেখা দিয়েছে—প্লাজ্‌মাও বিদ্যুৎবাহী। ফলে চৌম্বক ক্ষেত্রের উপর এর প্রতিক্রিয়া হয় এবং চৌম্বক ক্ষেত্র দিয়ে একে ঘিরে রাখা সম্ভব হয় না, বেরিয়ে আসে।

বিজ্ঞানীরা বর্তমানে এই ত্রুটি দূর করবার পথে খানিকটা এগিয়ে গেছেন। ক্যালিফোর্ণিয়ার স্যানডিয়াগোর গাল্‌ফ জেনারেল অ্যাটমিক সংস্থার বিজ্ঞানী ডাঃ তিহিরো ওকাওয়া কর্তৃক একটি নতুন যন্ত্র উদ্ভাবিত হয়েছে।

যন্ত্রটি হলো সম্পূর্ণ ফাঁকা উঁচু গোলাকার একটি আধার। এর ব্যাস 16 ফুট। এর মধ্যে খুব পাত্‌লা রড দিয়ে অনেকগুলি গোল রিং ঝোলানো আছে। ঐ সকল রিঙের মধ্যে বিদ্যুৎ-শক্তি চালিত হলেই চৌম্বক ক্ষেত্রের সৃষ্টি হয় এবং এর তীব্রতা বাইরের দিকে বেড়ে যায়। ফলে নির্দিষ্ট স্থানে প্লাজ্‌মাকে ধরে রাখা যায়। তিনি 0·07 সেকেণ্ড প্লাজ্‌মা আটক করে রাখতে সক্ষম হয়েছেন। এই সময় পূর্বেকার তুলনায় 10 গুণ বেশী। ওকাওয়া এই প্রসঙ্গে বলেছেন যে, হাইড্রোজেন পরমাণুর সংযোজন ঘটাবার জন্যে প্রথমতঃ প্লাজ্‌মাকে বেশ কিছু সময় যাতে ধরে রাখা যায়, তার ব্যবস্থা করতে হবেই, কারণ সংযোজন ঘটাবার রি-অ্যাক্টর তৈরির পথ সন্ধানের জন্যে বেশ কিছু বার কোন আধারে প্লাজ্‌মা রেখে সংযোজন ঘটাতে হবে।

দক্ষিণ মেরু অঞ্চলে জীবাশ্মের সন্ধান

দক্ষিণ মেরু অঞ্চলে ভূগর্ভে খনন করে মার্কিন বিজ্ঞানীরা অধুনালুপ্ত এক প্রকার সরীসৃপ জাতীয় জীবের প্রস্তরীভূত কঙ্কালের অংশবিশেষ উদ্ধার করেছেন। এই সকল জীব 20 কোটি বছর পূর্বে আফ্রিকা ও এশিয়ায় বিচরণ করতো।

পৃথিবীর মহাদেশসমূহ বর্তমানে যেমন একটি অন্যটি থেকে বিচ্ছিন্ন, বহু কোটি বছর পূর্বে এরকম ছিল না। পৃথিবীর মোট স্থলভূমি একটি বা দুটি খণ্ডে বিভক্ত ছিল। তারপর ধীরে ধীরে নানা খণ্ডে বিভক্ত হয়ে এগুলি সরে সরে যায়। বিজ্ঞানীদের এই কথার প্রমাণ এই জীবাশ্ম আবিষ্কারে পাওয়া যায়।

একটি মত অনুসারে একদা দক্ষিণ মেরু অঞ্চল ছিল নিরক্ষবৃত্ত এলাকার খুব কাছে এবং এর সঙ্গে ছিল বর্তমান আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা,

ভারত ও অষ্ট্রেলিয়া। এই বিরাট ভূখণ্ডকে বলা হতো গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ড।

1928 সালে দক্ষিণ মেরু অঞ্চলে যে বার্ড অভিযান চালানো হয়, তাতে প্রধান বিজ্ঞানী হিসাবে অংশ গ্রহণ করেছিলেন অ্যারিজোনা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত ভূ-বিজ্ঞানী ডাঃ লরেন্স এম. গুল্ড। তিনি এই প্রসঙ্গে বলেছেন—এই আবিষ্কারে অতীত যুগের গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ড নামে এক বিরাট মহাদেশের অস্তিত্ব সম্পর্কে আর কোন সন্দেহ রইলো না।

এই জীবাশ্মটি লিসট্রোসোরাস নামে অতিকায় জন্তুর মাথার একাংশ। জন্তুটি দেখতে ছিল অনেকটা হিপোপটেমাস বা জলহস্তীর মত। ঐ সকল জন্তু ভারত ও আফ্রিকায় প্রচুর ছিল। জন্তুটি জলচর হলেও এর পক্ষে সম্ভবতঃ আফ্রিকা থেকে বহু সমুদ্র পেরিয়ে দক্ষিণ মেরুতে যাওয়া সম্ভব ছিল না—এই দুটি অঞ্চলের মধ্যে ছিল বিরাট ব্যবধান।

দক্ষিণ মেরু অঞ্চলে আবিষ্কৃত এটিই প্রথম মেরুদণ্ডী প্রাণীর জীবাশ্ম। ডাঃ গুল্ড বলেছেন, দক্ষিণ মেরু অঞ্চলে যে সব জীবাশ্ম পাওয়া গেছে, তাদের মধ্যেই কেবল নয়, আজ পর্যন্ত অতীত যুগের যে সকল জীবাশ্ম উদ্ধার করা হয়েছে, তাদের সকলের মধ্যেই এটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে রয়েছে।

দক্ষিণ মেরু থেকে 400 মাইল দূরবর্তী ট্র্যান্স অ্যানটারটিক পর্বতমালার বালিপাথরের স্তূপ থেকে এই প্রাগৈতিহাসিক জীবের প্রস্তরীভূত কঙ্কালটি উদ্ধার করা হয়েছে।

দোষমুক্ত ডি. ডি. টি. তৈরির উদ্যোগ

কীটবিনাশক ডি. ডি. টি-র ব্যবহার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ক্যানাডা, সোভিয়েট ইউনিয়ন, জাপান, পশ্চিম জার্মেনী, নরওয়ে, ডেনমার্ক, সুইডেন, নেদারল্যাণ্ডস ও হাঙ্গেরীতে আংশিক ভাবে নিষিদ্ধ হয়েছে। কীটঘ্ন দ্রব্য হিসাবে এর বিশ্বজোড়া খ্যাতি থাকলেও আবহাওয়া দূষিত করবার মত এরকম বস্তু আর নেই। পৃথিবীর উন্নতিশীল রাষ্ট্রসমূহে ম্যালেরিয়া, টাইফয়েড প্রভৃতি রোগ নিয়ন্ত্রণে এবং কীট-পতঙ্গ থেকে ফসল রক্ষা করবার উদ্দেশ্যে এখনও ডি. ডি. টি. ব্যবহার করা হচ্ছে, এর আংশিক বা পুরাপুরি ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয় নি।

তবে সর্বদোষমুক্ত একপ্রকার ডি. ডি. টি. তৈরির জন্যে চেষ্টা করা হচ্ছে এবং পরীক্ষামূলক-ভাবে ঐ ধরণের ডি. ডি টি. তৈরি করাও হয়েছে। মানুষ অথবা জীবজন্তুর পক্ষে ক্ষতিকর নয় বলে প্রমাণিত হলে আগামী এক বছরের মধ্যে এসকল বাজারে ছাড়া হবে এবং পরিণামে বিভিন্ন দেশে এর ব্যবহার সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞাও তুলে নেওয়া হতে পারে।

ছড়াবার পর চার-পাঁচ দিনের মধ্যেই ডি. ডি. টি., ডি. ডি. ই নামে যৌগিক পদার্থে রূপান্তরিত হয়। জলে অথবা যেখানেই প্রয়োগ করা হোক না কেন, বহু রকমের মাছ ও পোকামাকড় ডি. ডি. ই-তে মরে যায়। মানুষের পক্ষে উপকারী বহু পোকামাকড়ও এর মধ্যে রয়েছে। ডি. ডি. ই. খুবই বিষাক্ত দ্রব্য।

ক্যালিফোর্ণিয়ার এরোজেট জেনারেল কর্পো-রেশন নামে একটি সংস্থা ডি. ডি. টি. পাউডারের সঙ্গে অন্য একটি উপকরণ মিশিয়ে এক নতুন ধরণের কীটঘ্ন দ্রব্য তৈরি করেছেন। ডি. ডি. টি-কে বিষমুক্ত করবার জন্যে এতে রাসায়নিক অনু-ঘটক হিসাবে কি উপকরণ যোগ করা হয়েছে, তার নাম প্রকাশ করতে ঐ সংস্থা সম্মত নন। বর্তমানে ঐ সংস্থার গবেষণাগারের মাছের উপর এই নতুন ধরণের ডি. ডি. টি প্রয়োগ করা হচ্ছে। এই বস্তুটি কতখানি বিষমুক্ত হয়েছে, তা বর্তমানে নিরূপণ করা হচ্ছে।

আভ্যন্তরীণ দপ্তরের পদার্থ-বিজ্ঞান বিভাগের ডিরেক্টর ডাঃ অ্যালপোনস্ করজিয়াতি এ-সম্পর্কে বলেছেন যে, এই নতুন ধরণের ডি ডি. টি. যে অনেকখানি দোষমুক্ত, এতে বিষ সৃষ্টি যে অনেক কম হয়ে থাকে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এর কার্যকারিতা প্রমাণিত হলে এই নতুন ধরণের ডি. ডি. টি-র দ্বারা পৃথিবীর শিল্পোন্নত এবং উন্নতিশীল উভয় অঞ্চলই বিশেষভাবে উপকৃত হবে। পুরনো ডি. ডি. টি-র তুলনায় এর মূল্য দ্বিগুণ বেড়ে গেলেও খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধি ও মানুষের স্বাস্থ্যরক্ষার ক্ষেত্রে নতুন ধরণের ডি. ডি. টি-র তাৎপর্য ও সুফল অনুধাবন করলে এই মূল্যবৃদ্ধি যৎসামান্যই মনে হবে।

পৃথিবীর স্বল্পোন্নত রাষ্ট্রসমূহে ফসল সংরক্ষণের জন্যে যে কীটঘ্ন দ্রব্যাদি ব্যবহার করা হয়, তাদের অর্ধেকেরও বেশী ডি. ডি. টি. এবং সংশ্লিষ্ট উপকরণ দিয়ে তৈরি হয়ে থাকে। রাষ্ট্রসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার ধারণা পৃথিবীর উন্নতশীল রাষ্ট্রসমূহে ডি. ডি. টি. প্রয়োগ না করলে অর্ধেকেরও বেশী তুলা নষ্ট হয়ে যেত। ব্রেজিলে পেয়ারা প্রভৃতি ফল সংরক্ষণের জন্যে ব্যাপক ক্ষেত্রে ডি. ডি. টি. প্রয়োগ করা হয়।

ঐ সকল দেশে জনস্বাস্থ্য রক্ষার জন্যে ডি. ডি. টি-র প্রয়োগ অপরিহার্য। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার ডিরেক্টর জেনারেল এম. জি. ক্যানডো বলেছেন যে, জনস্বাস্থ্য রক্ষার ক্ষেত্রে ডি. ডি. টি-র স্থান অন্য কিছু দিয়ে পূরণ হতে পারে না। এর ব্যবহার সীমিত করলে পৃথিবীর বেশীর ভাগ উন্নতিশীল রাষ্ট্রে স্বাস্থ্যরক্ষার ক্ষেত্রে গুরুতর সমস্যা দেখা দেবে।

পৃথিবীর কোন কোন গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলে মোট মৃত্যুর শতকরা 20টি এবং শিশু মৃত্যুর শতকরা 10টি এখনও ম্যালেরিয়ার জন্যেই হয়ে গেছে। জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে এখনও মানুষের অন্যতম বড় শত্রু ম্যালেরিয়া। ম্যালেরিয়া রোগবাহক মশককুলের বৃদ্ধি এখনও ডি. ডি. টি. ছড়িয়েই নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

নভেম্বর — 1970

ত্রয়োবিংশ বর্ষ — একাদশ সংখ্যা

জীবন-ত্রাণ যন্ত্র

দুর্ঘটনায় অজ্ঞান হয়ে গেলে এই যন্ত্রের সাহায্যে জ্ঞান ফিরিয়ে আনা সহজ। মুখে মুখোস লাগিয়ে প্লাস্টিকের ব্যাগ টিপলেই প্রচুর হাওয়া ফুস্‌ফুসে ঢুকে যায় এবং ফুস্‌ফুস থেকে নিঃসৃত হাওয়া অন্য একটি নল দিয়ে বেরিয়ে যায়। পশ্চিম জার্মেনীর লুইবেকে এই যন্ত্রটি উদ্ভাবিত হয়েছে।

হাম্‌ফ্রি ডেভির শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার

বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী হাম্‌ফ্রি ডেভিকে একজন প্রশ্ন করেছিল—আপনার সবচেয়ে বড় আবিষ্কার কোন্‌টি? ডেভি সগর্বে উত্তর দিয়েছিলেন—মাইকেল ফ্যারাডে। গরীব কামারের ছেলে বই বাঁধাইকারী তেরো বছরের কিশোর ফ্যারাডের মধ্যে বিস্ময়কর সম্ভাবনার সন্ধান পাওয়া সত্যই ডেভির একটি বড় আবিষ্কার। শুধু সন্ধানই নয়, অখ্যাত সেই ছেলেটিকে বিশ্ববিখ্যাত মাইকেল ফ্যারাডে করে গড়ে তোলবার সব কৃতিত্বই ছিল সার হাম্‌ফ্রি ডেভির।

লণ্ডনের কাছে ছোট্ট একটি গ্রামের গরীব কামার পরিবারে 1791 খৃষ্টাব্দে ফ্যারাডের জন্ম হয়। বিদ্যালয়ে পড়াবার মত আর্থিক সামর্থ্য তাঁর পিতামাতার ছিল না। তেরো বছর বয়সেই জীবিকা অর্জনের জন্যে ফ্যারাডেকে বই বাঁধাইয়ের কাজ করতে হয়। কিন্তু কাজের চেয়ে তাঁর মন বেশী পড়ে থাকতো বইয়ের পাতায়, বিজ্ঞানের বই পেলে বাঁধবার আগে সবটা পড়ে ফেলতেন। না পড়ে কোন বিজ্ঞানের বই তিনি কখনও ফেরৎ দিতেন না। ডেভির প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ছিল অপরিসীম, তাঁর কাছে বিজ্ঞান শেখবার প্রবল বাসনা ছিল ফ্যারাডের। ডেভির দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্যে তিনি তাঁর বক্তৃতাগুলি সযত্নে টুকে নিতেন। টুকে নেবার সময় সংশ্লিষ্ট চিত্রাদিও এঁকে রাখতেন। পরে সেগুলি বাঁধিয়ে ডেভির কাছে পাঠিয়ে দিতেন। ডেভি তাঁর আগ্রহ দেখে খুবই সন্তুষ্ট হয়ে জানতে চান—তাঁর ইচ্ছা কি? ফ্যারাডে লেবরেটরীতে একটি চাকুরীর প্রার্থনা জানান। ফ্যারাডের আন্তরিক বিজ্ঞানানুরাগ বুঝতে ভুল করেন নি ডেভি। তিনি রয়্যাল ইনষ্টিটিউসনের একটি লেবরেটরীতে অ্যাসিষ্ট্যান্টের পদে ফ্যারাডেকে নিয়োগ করেন। এই চাকুরীতে নিয়োগ সম্বন্ধে একটি সুন্দর গল্প আছে। ডেভি তখন রয়্যাল ইনষ্টিটিউসনের ডিরেক্টর। ফ্যারাডেকে চাকুরী দেবার ব্যাপারে তিনি ইনষ্টিটিউসনের একজন কর্মকর্তার মতামত জিজ্ঞাসা করলে কর্মকর্তাটি জবাব দেন—বেশ তো, ওকে শিশি-বোতল পরিষ্কার করবার কাজে নিয়োগ করুন। ছেলেটি রাজী হলে বোঝা যাবে, তার মধ্যে পদার্থ আছে, রাজী না হলে জানবেন—কোন কাজের নয়। ডেভি সেই মত শিশি-বোতল পরিষ্কার করবার কাজে যোগ দেবার জন্যে ফ্যারাডেকে নিয়োগ পত্র পাঠান। ফ্যারাডেও সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে যান। পরে ডেভি তাকে অ্যাসিষ্ট্যান্টের পদে উন্নীত করেন।

ফ্যারাডের কাছে বিজ্ঞান-সাধনার সুযোগের দ্বার খুলে গেল। ডেভির কাছে তিনি লাভ করলেন শিক্ষা আর লেবরেটরীতে হাতে-কলমে পরীক্ষা করবার সুযোগ। বিজ্ঞানের তত্ত্বগুলিকে পরীক্ষার কষ্টিপাথরে যাচাই করবার জন্যে ছিল ফ্যারাডের অসীম

আগ্রহ। আর সেই সঙ্গে বিজ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগের নতুন নতুন দ্বার খুলে দেবার উদ্দেশ্যে তাঁর চেষ্টার অন্ত ছিল না।

1825 খৃষ্টাব্দে মাইকেল ফ্যারাডে তাঁর লেবরেটরীর অধ্যক্ষের পদে উন্নীত হন। রসায়নের কাজেও তিনি আত্মনিয়োগ করেন। ফ্যারাডে আবিষ্কার করেন অনেক কিছু। সেগুলির কোনটিই ছোট নয় এবং প্রতিটির ব্যবহারিক মূল্যও অপরিমেয়। তবে তড়িৎ-চুম্বকীয় আবেশই তাঁর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার। 1820 খৃষ্টাব্দে বিজ্ঞানী অরষ্টেড দেখিয়েছিলেন যে, কোন তারের মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রবাহিত হবার সময় কাছে কোন চৌম্বক শলাকা থাকলে তা বিচলিত হয়। অরষ্টেডের এই পর্যবেক্ষণ সম্বন্ধে ফ্যারাডে পরীক্ষা করে দেখতে গিয়ে 1831 খৃষ্টাব্দে তাঁর বিখ্যাত তড়িৎ-চুম্বকীয় আবেশের সূত্র আবিষ্কার করেন। এই সূত্রের মধ্য দিয়েই তড়িৎ ও চুম্বকের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের বিষয় জানা যায়। এই অবিস্মরণীয় আবিষ্কার বিদ্যুৎকে ব্যাপকভাবে কাজে লাগাবার সন্ধান দেয়, আর সেই সঙ্গে মানুষের দৈনন্দিন জীবন ও সভ্যতায় বিদ্যুতের অপরিহার্য ভূমিকার সূচনা হয়।

ফ্যারাডের তড়িৎ-বিশ্লেষণের সূত্র রসায়ন ও পদার্থবিদ্যার মধ্যে সুদৃঢ় সেতু রচনা করে। এই সূত্রই আবার ধাতুশিল্প ও অন্যান্য শিল্পের বিস্ময়কর অগ্রগতির সোপান গড়ে তোলে। 1825 খৃষ্টাব্দে তিনি অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন বেঞ্জিন আবিষ্কার করেন। তাঁর এই আবিষ্কার জৈব রসায়নের বিপুল সম্ভাবনাময় অ্যারোম্যাটিক শাখার সূত্রপাত করে। এই আবিষ্কারটি হয় একটু বিচিত্র ধরণে। সে সময় তিমির তেল থেকে পাতনের দ্বারা প্রাপ্ত গ্যাসকে বাড়ীর আলো জ্বালাবার কাজে ব্যবহার করা হতো। গ্যাস থাকতো উচ্চ চাপে লোহার পাত্রে। গ্যাস কোম্পানী দেখলেন—শীতকালে এই গ্যাস থেকে খুব উজ্জ্বল আলো পাওয়া যাচ্ছে না। এই সমস্যা সমাধানের জন্যে কোম্পানী ফ্যারাডেকে বলেন। ফ্যারাডে দেখলেন, উচ্চ চাপ আর ঠাণ্ডায় এই গ্যাসের একটি অংশ তরল হয়ে যায়। গ্যাসের এই অংশই আলো-কে উজ্জ্বল করে। শীতকালে এই গ্যাস তরল অবস্থায় থাকবার ফলে ততটা উজ্জ্বল আলো দিতে পারে না। ফ্যারাডে এই তরল অংশকে পৃথক করেন। এটিই হলো জৈব রসায়নের অতি মূল্যবান যৌগ—বেঞ্জিন।

ফ্যারাডের অন্যান্য বহু আবিষ্কারের মধ্যে বিভিন্ন রকমের সঙ্কর-লৌহ প্রস্তুত, বিভিন্ন অপ্‌টিক্যাল কাচ প্রস্তুত, সমতলীয় একমুখী আলোক-রশ্মিকে চৌম্বক ক্ষেত্রের দ্বারা বিক্ষিপ্তকরণ প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 1867 খৃষ্টাব্দে বিজ্ঞান-সাধনার অন্যতম প্রধান হোতা--সার হামফ্রি ডেভির শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার মাইকেল ফ্যারাডে ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

উমা চট্টোপাধ্যায়

পৃথিবীর বয়স

তোমাদের কাউকে যদি প্রশ্ন করা হয়—তোমার বয়স কত? তাহলে নিশ্চয়ই তোমার জন্ম-তারিখ থেকে প্রশ্নের দিন পর্যন্ত হিসেব করে তোমার বয়সটা বলবে, তাই নয় কি? কারোর বয়স জানতে গেলে তার জন্ম-তারিখটা জানা অত্যাবশ্যক। পৃথিবীরও যদি বয়স নির্ণয় করতে হয়, তাহলে তার জন্ম-তারিখটা অর্থাৎ কবে এই পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছিল, তা আমাদের জানতে হবে। মহাশূন্যে এই পৃথিবীটার কেমন করে সৃষ্টি হয়েছিল, সে সম্পর্কে বৈজ্ঞানিকেরা যেমন অনুশীলন করেছেন, তেমনি ঠিক কত বছর আগে এই পৃথিবীটা মহাশূন্যে তার নিজের কক্ষপথে স্থাপিত হয়ে সৌরপরিবারের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল, তা নিয়েও তাঁরা দীর্ঘকাল গবেষণা করেছেন। পৃথিবী ও বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সম্পর্কে মানুষের কৌতূহলের সীমা-পরিসীমা নেই। ভাবতে কেমন লাগে বল তো—আজকের এই শস্য-শ্যামল সুন্দর পৃথিবীটা একদিন শুধু জ্বলন্ত গ্যাসীয় পিণ্ডমাত্র ছিল, তারপর ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হবার পর তার বুকে পাহাড়-পর্বত, নদী-সমুদ্র, স্থলভূমি, আরো পরে জীবন অর্থাৎ উদ্ভিদ ও প্রাণীর ক্রমবিকাশ শুরু হয়েছিল।

পৃথিবীর বয়স নির্ধারণ করবার জন্যে বৈজ্ঞানিকেরা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। এক এক করে পদ্ধতিগুলির কথা বলছি।

সমুদ্রের তলদেশে প্রতি বছর পলি জমা হচ্ছে এবং তার ফলে সমুদ্রের তলদেশে পলিস্তরের উচ্চতা প্রতি বছরই মোটামুটি নির্দিষ্ট হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এখন যদি কোন এক বছরের জমা পলিস্তর এবং সমগ্র পলিস্তরের উচ্চতা মাপা যায়, তাহলে পৃথিবীর বয়স সম্পর্কে একটা সংখ্যা খাড়া করা যাবে। এই হিসাবে পৃথিবীর বয়স ছ-কোটি পাঁচ লক্ষ বছরের কাছাকাছি বলে জানা গেছে। কিন্তু পৃথিবীর বয়স এর চেয়ে অনেক বেশী হবে—কারণ, প্রথম অবস্থায় পলি জমা হওয়া সম্ভব ছিল না এবং ভূত্বকও এই দীর্ঘ সময়ে বহু পরিবর্তনের সম্মুখীন হয়েছে।

আর একটা পদ্ধতি হচ্ছে—পৃথিবী প্রতি বছরই তাপ হারাচ্ছে এবং প্রায় নির্দিষ্ট হারেই। বৈজ্ঞানিকেরা কোন এক বছরে পৃথিবী কর্তৃক বর্জিত তাপ এবং সৃষ্টির প্রথম অবস্থা থেকে বর্জিত তাপের মোট হিসাব করে বলেছেন, পৃথিবীর বয়স চার কোটি বছরের কাছাকাছি। এই হিসাবটিও নির্ভুল নয়; কারণ যে সব কারণে পৃথিবী তাপ হারাচ্ছে, তার সবগুলি কারণ প্রথম অবস্থা থেকে এখন পর্যন্ত অপরিবর্তিত নেই।

পৃথিবীতে জীবনের অস্তিত্ব কবে থেকে প্রথম সুরু হয়েছিল, জীব-বিজ্ঞানীরা তা গবেষণা করে পৃথিবীর বয়স দশ কোটি বছরের কাছাকাছি বলে মনে করেন।

স্পষ্টতঃ পৃথিবীর বয়স এর চেয়ে অনেক বেশী হবে। কারণ পৃথিবী সৃষ্টির বহু বছর পরে পৃথিবীর বুকে জীবন পালিত হবার অনুকূল পরিবেশ গড়ে উঠেছিল।

আর একটি পদ্ধতি হলো সমুদ্র কর্তৃক লবণ গ্রহণের গড় হিসাব বের করা। সমুদ্রের গড় লবণাক্ততা হলো 3·5%, এথেকে সমগ্র জলভাগের মোট লবণের পরিমাণ নির্ণয় করা সম্ভব এবং এই পরিমাণকে বছরে সমুদ্র কর্তৃক গৃহীত লবণের গড় পরিমাণ দিয়ে ভাগ দিলে পৃথিবীর বয়স সম্পর্কে যে সংখ্যা পাওয়া যায়, তা বারো কোটি বছরের কাছাকাছি। এই পদ্ধতিটিও ক্রটিযুক্ত, কারণ সমুদ্র কর্তৃক লবণ-গ্রহণ চিরদিন সমহারে হয় নি এবং সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে আজ পর্যন্ত পৃথিবীর জলভাগ অপরিবর্তিত নেই।

পৃথিবীর বয়স নির্ণয়ে সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি হলো, তেজস্ক্রিয় পদার্থ-সমন্বিত শিলার পরীক্ষা করা। তেজস্ক্রিয় পদার্থসমূহ প্রতিনিয়ত আল্‌ফা, বিটা ও গামারশ্মি বিকিরণ করে নতুন পদার্থের সৃষ্টি করছে। আল্‌ফা কণার ভর হিলিয়াম পরমাণুর ভরের সমান। আল্‌ফা কণাসমূহ নির্গত হবার পর যখন পার্শ্ববর্তী অন্যান্য পরমাণুগুলিকে আঘাত করে, তখন আল্‌ফা কণা দুটি ধনাত্মক আধানবিশিষ্ট হবার দরুণ পার্শ্ববর্তী অন্যান্য পরমাণু থেকে দুটি ঋণাত্মক আধানবিশিষ্ট ইলেকট্রন গ্রহণ করে এবং বিপরীত-ধর্মী আয়নগুলি পরস্পরের মধ্যে বিক্রিয়ায় আধান-নিরপেক্ষ হিলিয়াম গ্যাসে পরিণত হয়। বিটারশ্মি হচ্ছে ঋণাত্মক আধানবিশিষ্ট ইলেকট্রন কণার বিকিরণ। গামারশ্মি কিন্তু আধানবিহীন। তেজস্ক্রিয় পদার্থের অনুরূপ অবিরাম ভাঙ্গনের ফলে হিলিয়াম গ্যাসের সৃষ্টি হয় এবং সেই সঙ্গে পদার্থটি অন্য মৌলিক পদার্থে রূপান্তরিত হয়। ইউরেনিয়াম, থোরিয়াম, রেডিয়াম প্রভৃতি তেজস্ক্রিয় মৌলিক পদার্থ-সমূহ স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিকিরণের ফলে তেজস্ক্রিয় ধর্মবিহীন সীসায় রূপান্তরিত হয়। হিলিয়াম গ্যাসীয় পদার্থ হওয়ায় বায়ুমণ্ডলে মিশে গিয়ে হারিয়ে যায়, কিন্তু ধাতব অবশেষ সীসা পড়ে থাকে। এক গ্র্যাম রেডিয়াম 1600 বছর ধরে স্বতঃস্ফূর্ত বিকিরণের পর $\frac{1}{2}$ গ্র্যাম রেডিয়াম পড়ে থাকে। এই ভাঙ্গনের হার স্থান-কালের উপর নির্ভরশীল নয়। কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ তেজস্ক্রিয় পদার্থ যে সময়ে ভাঙ্গনের ফলে ঐ পরিমাণের অর্ধেকে দাঁড়ায়, সেই সময়কে ঐ পদার্থের অর্ধজীবনকাল (Half-life span) বলে। এই অর্ধ-জীবনকাল বিভিন্ন তেজস্ক্রিয় পদার্থের ক্ষেত্রে বিভিন্ন। যেমন—ইউরেনিয়ামের অর্ধ-জীবনকাল 760 কোটি বছর, রেডিয়ামের 1600 বছর, থোরিয়ামের 21,1000 লক্ষ বছর ইত্যাদি। শিলাখণ্ডের বিকিরণের পর অবশিষ্ট ভর এবং উৎপন্ন সীসার ভরের অনুপাত থেকে শিলাখণ্ডটির বয়স প্রায় নির্ভুলভাবে নির্ণয় করা সম্ভব। এভাবে প্রাচীনতম শিলাখণ্ডটির যে বয়স বৈজ্ঞানিকেরা নির্ণয় করেছেন, তা 250 কোটি বছরের কাছাকাছি। এখন এই শিলাখণ্ড সৃষ্টির আগে পৃথিবী প্রথমে জ্বলন্ত গ্যাসীয় পিণ্ড এবং পরে

গলিত অবস্থায় ছিল। ঠাণ্ডা হয়ে জমাট বাঁধতে, অর্থাৎ শিলার রূপ পেতে আরো 250 কোটি বছর লেগেছিল বলে বিজ্ঞানীরা মনে করছেন। কাজেই এথেকেই পৃথিবীর বয়সের একটা মোটামুটি হিসেব পাওয়া যাবে।

শ্রীজ্যোতির্ময় ছুই

টিন

এপর্যন্ত যতগুলি ধাতু আবিষ্কৃত হয়েছে, তার মধ্যে ব্যবহারের দিক দিয়ে টিনের গুরুত্ব আজ অনস্বীকার্য। ভারতবর্ষে টিনের প্রয়োজনীয়তা ক্রমশঃই বেড়ে যাচ্ছে। এই প্রয়োজন মিটাবার জন্যেই ভারত বৈদেশিক মুদ্রা খরচ করে মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যাণ্ড, বলিভিয়া, কঙ্গো, নাইজেরিয়া প্রভৃতি দেশ থেকে টিন কিনছে।

টিনের ব্যবহার চতুর্দিকেই পরিব্যাপ্ত। সঙ্কর ধাতু প্রস্তুতিতে, টিনের প্রলেপ দিতে প্রচুর টিন ব্যবহৃত হয়ে থাকে। খাদ্য সংরক্ষণের জন্যে ইস্পাতের তৈরী পাত্রের গায়ে খুব পাত্‌লা করে (·01 ইঞ্চি পুরু) টিনের প্রলেপ দেওয়া হয়। পরীক্ষা করে দেখা গেছে, টিন তৈরির সময় শতকরা 10 থেকে 15 ভাগ টিন অবিশুদ্ধতার (Scrap) জন্যে বাদ যায়। এই পরিমাণ টিনকে কাজে লাগাবার জন্যে বিজ্ঞানীরা তাই তৎপর হয়েছেন। বর্তমানে এই উদ্দেশ্যে Detinning-পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। পরিত্যক্ত ইস্পাত কণার রূপান্তরও সাধিত হয় এই পদ্ধতিতে।

ভারতবর্ষে প্রতি বছর প্রায় তিন লক্ষ টন টিন ব্যবহৃত হয়। অভিজ্ঞ মহলের ধারণা, এই চাহিদা বাড়তে বাড়তে 1970-71 সাল নাগাদ 5 লক্ষ টনে পৌঁছুবে। এই 5 লক্ষ টন অপরিশুদ্ধ টিন থেকে Detinning পদ্ধতিতে 500 থেকে 750 টন টিন পাওয়া যাবে। এর ফলে দেড় কোটি টাকা থেকে 2¼ কোটি টাকার সাশ্রয় হবে। বৈদেশিক মুদ্রার এই সাশ্রয় নেহাৎ কম কথা নয়। টিন প্রস্তুতিতে ক্ষারীয় রাসায়নিক পদ্ধতির প্রয়োগ আগেকার পদ্ধতির চেয়ে সহজ এবং সুলভ। তাই বর্তমানে বিভিন্ন দেশে এই পদ্ধতির প্রচলন খুব বেশী হয়েছে। আর একটি পদ্ধতির (অ্যালকালাইন ইলেকট্রোলাইটিক প্রোসেস) চল আজও পৃথিবীর কোন কোন দেশে দেখতে পাওয়া যায়। তবে এই পদ্ধতি অত্যন্ত ব্যয়বহুল। কারণ, প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ উৎপাদনে খরচ অত্যন্ত বেশী। ক্লোরিন-পদ্ধতি আজকাল অনুসৃত হয় না ঐ একই কারণে। 1936 সালের আগে পর্যন্ত উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে স্ট্যানিক ক্লোরাইডের প্রয়োজনীয়তা বাড়তে থাকে, অথচ ক্লোরিন-পদ্ধতিতে টিন সংগ্রহ করা হতো উৎপন্ন

স্ট্যানিক ক্লোরাইড থেকে। রেয়ন শিল্পে প্রচুর পরিমাণে টিন ক্লোরাইডের প্রয়োজন। আগেই বলেছি, ক্লোরিন-পদ্ধতিতে স্ট্যানিক ক্লোরাইড উৎপন্ন হয় অনার্দ্র ক্লোরিন ও টিনের মধ্যে বিক্রিয়ার ফলে (50°C-এর নীচের তাপমাত্রায়)। অনার্দ্র ক্লোরিনের সঙ্গে লোহার কোন বিক্রিয়া হয় না।

অ্যালকালি ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে কষ্টিক সোডার দ্রবণে তড়িৎ-বিশ্লেষণ করা হয়। পরিত্যক্ত টিনকে অ্যানোড ও বিশুদ্ধ ইস্পাত-দণ্ডকে ক্যাথোডে যুক্ত করা হয়। তড়িৎ-বিশ্লেষণের ফলে টিন স্পঞ্জের আকারে ইস্পাত-ক্যাথোডে জমা হয়। তারপর ঐ টিনকে ধুয়ে পরিষ্কার করে পরিশুদ্ধ টিন পাওয়া যায়। ছোট ছোট পাত্রের প্রয়োজন এই পদ্ধতিতে। এই পাত্রগুলিতে তড়িৎ-বিশ্লেষণের পর্ব সমাধা হয়। সেই জন্যে এই পদ্ধতি খুবই ব্যয়বহুল।

ব্যবসায়িক দিক দিয়ে লাভজনক বলে বর্তমানে এই পদ্ধতির প্রচলন প্রায় সব দেশেই হয়েছে। টিনের সঙ্গে কষ্টিক সোডার বিক্রিয়ার ফলে সোডিয়াম স্ট্যানেট ক্রিষ্ট্যাল তৈরি হয়। এই পদ্ধতিতে প্রাপ্ত টিন প্রায় শতকরা 99·95 ভাগ বিশুদ্ধ।

Central Electrochemical Research Institute (C. E. C. R. I.) বর্তমানে একটা নতুন পদ্ধতি (Acid chemical process) বের করেছেন। এই পদ্ধতি পূর্বোক্ত পদ্ধতিগুলির চেয়ে সহজসাধ্য এবং লাভজনক। এই পদ্ধতিতে টিন প্রথমে স্পঞ্জের আকার ধারণ করে। এই টিনকে পরিশোধন করলেই বিশুদ্ধ (29%) টিন পাওয়া যাবে। এই পদ্ধতিতে পরিত্যক্ত টিন কাজে লাগিয়ে খরচ কমানো সম্ভব এবং অন্যান্য পদ্ধতির তুলনায় এই পদ্ধতিতে অনেক কম সময় লাগে। এই পদ্ধতি যেমন সহজ, তেমনি প্রয়োজনীয় প্ল্যাণ্ট তৈরির খরচও কম। কাঁচা ও অপরিশুদ্ধ মালের তো অভাব নেই আমাদের দেশে, কাজেই এগুলির সদ্ব্যবহার করা যেতে পারে এই পদ্ধতিতে।

বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে টিনের ব্যবহারও বাড়ছে। তাই টিন-শিল্পে স্বয়ম্ভরতা অর্জন করা ভারতবর্ষের পক্ষে আজ একান্ত দরকার।

চঞ্চলকুমার রায়

সংখ্যা নিয়ে খেলা

তোমরা তো অনেক কিছু নিয়েই খেলা কর। কিন্তু সংখ্যা নিয়ে খেলেছ কখনও? সংখ্যা নিয়ে খেলা—মজাদার তো বটেই, সেই সঙ্গে চমকপ্রদও। বিশ্বাস না হয় তো নীচের উদাহরণগুলি দেখ।

(ক) এমন অনেক সংখ্যা আছে যাদের যোগফল যত, গুণফলও তত।

যেমন ধর : 3 এবং $1\frac{1}{2}$

4 এবং $1\frac{1}{3}$

5 এবং $1\frac{1}{4}$

10 এবং $1\frac{1}{9}$

100 এবং 1

1000 এবং 1_{999}

এদের সবাইর যোগফল যত, গুণফলও তত। বিশ্বাস না হয় তো অঙ্ক কষে দেখ।

(খ) এমন দুটি সংখ্যা আছে, যাদের গুণফল হলো—

11,111,111,111,111,111

সেই সংখ্যা দুটি কি কি জান? আচ্ছা আমি বলি।

2,071,723-কে 5,363,222,357 দিয়ে গুণ করে দেখ তো কি পাও।

(গ) আবার এমন দুটি সংখ্যা আছে, যাদের গুণফল বেশ মজাদার অর্থাৎ 12345678987654321। বল দেখি সংখ্যা দুটি কি কি?

সংখ্যা দুটি হচ্ছে 12345679 এবং 99999999।

(ঘ) 45 সংখ্যাটা বড়ই মজাদার, তা জান কি? কি রকম মজাদার তা নীচের অঙ্কগুলি দেখলেই বুঝতে পারবে।

যোগ

123456789	যোগ করলে 45 হয়
+ 123456789	" " " "
246913578	" করলেও " "

বিয়োগ

987654321	যোগ করলে 45 হয়
− 123456789	" " " "
864197532	" করলেও " "

গুণ

123456789	যোগ করলে 45 হয়
× 2	
246913578	„ করলেও „ „

ভাগ

1234567890 যোগ করলে 45 হয়

1234567890 ÷ 2 = 617283945 যোগ করলেও 45 হয়।

আবার 9876543210 যোগ করলে 45 হয়

9876543210 ÷ 2 = 4938271605 যোগ করলেও 45 হয়

তলায় দাগ দেওয়া ভাগফল দুটি যোগ করলে পাওয়া যায়:

617283945
4938271605
5555555550 যোগ করলেও 45 হয়।

(ঙ) বেশ মজাদার একটি রাশিমালা আছে।

সেই রাশিমালাকে তুমি যে কোন সংখ্যা দিয়েই গুণ করতে পার। গুণফলে কিন্তু রাশিমালার অন্তর্গত সব কয়টি সংখ্যাকেই দেখতে পাবে।

বল দেখি সেই মজাদার রাশিমালাটি কি?

—সেটি হচ্ছে 526, 315, 789, 473, 684, 210।

(চ) 999999-কে 7 দিয়ে গুণ করলে পাবে 142857। 2 থেকে 6-এর মধ্যে যে কোনও একটি সংখ্যা দিয়ে 142857-কে গুণ করে দেখ তো কি পাও? প্রতিটি গুণফলের মধ্যেই 1 4 2 8 5 7 সংখ্যা কয়টিকেই খুঁজে পাবে।

বিশ্বাস না হয় তো অঙ্ক কষে দেখ।

শ্রীঅমরনাথ রায়

পলিওয়াটার

জলের অপর নাম জীবন। জল যে আমাদের জীবনে কতখানি পরিব্যাপ্ত, তা কারো অজানা নয়। মানুষের শরীরের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে জলের পরিমাণই হচ্ছে শতকরা 90 ভাগ। তাছাড়া সমস্ত পৃথিবীর তো তিন ভাগই জল আর মাত্র একভাগ স্থল।

অতি পরিচিত জল ছাড়া আরও এক রকম জলের কথা বিজ্ঞানীরা বলছেন। এই নতুন জলের নাম দেওয়া হয়েছে পলিওয়াটার বা অ্যানোমেলাস ওয়াটার অর্থাৎ অস্বাভাবিক জল।

পলিওয়াটারের কথা প্রথম বলেন রাশিয়ার রসায়নবিদ্ Dr. N. N. Fedyakin এবং Dr. Boris V. Deryagin 1962 সালে। তাঁরা বলেন, পলিওয়াটার জমাট বাঁধে সাধারণ জলের চেয়ে অনেক বেশী মন্থর গতিতে এবং অনেক বেশী মন্থর গতিতে বাষ্পীভূত হয়। শুধু তাই নয়, এই জল সাধারণ জলের চেয়ে অনেক বেশী স্থায়ী।

এই নতুন জলের সংবাদ স্বভাবতঃই রসায়নবিদ্‌দের মধ্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে। 1969 সালে নিউইয়র্কে আমেরিকান কেমিক্যাল সোসাইটির সভায় Prof. E. R. Lippicott, Dr. Gerald এবং আরও কয়েক জন মিলে সব সন্দেহের অবসান ঘটান এবং পলিওয়াটার তৈরির পদ্ধতির বর্ণনা প্রদান করেন। রাশিয়ার রসায়নবিদ্‌গণ যে পলিওয়াটারের কথা বলছিলেন, তা পরীক্ষার সাহায্যে প্রমাণিত হলো।

পলিওয়াটারের রাসায়নিক উপাদান কিন্তু সাধারণ জলের মতই। দুই ভাগ হাইড্রোজেন এবং একভাগ অক্সিজেনের রাসায়নিক সমন্বয়েই পলিওয়াটার উৎপন্ন হয়। তবে সাধারণ জলের চেয়ে এর কতকগুলি পৃথক ধর্ম আছে—সেগুলি ভারী মজার।

জল 0°সে. তাপমাত্রায় জমে বরফের কৃষ্ট্যালে পরিণত হয়, কিন্তু পলিওয়াটার −40°সে. তাপমাত্রায় কাচের মত অবস্থায় পরিণত হয়। বিজ্ঞানীদের মতে, পলিওয়াটারের নির্দিষ্ট ফ্রিজিং পয়েণ্ট নেই। চাপের উপর এবং তাপমাত্রা কি হারে কমছে, তার উপর নির্ভর করে −20°সে. −40°সে. অথবা −100°সে. তাপমাত্রায় জমাট বাঁধে।

জল 100°সে. তাপমাত্রায় বাষ্পীভূত হয়; কিন্তু পলিওয়াটারের তাপমাত্রা 500°সে. পর্যন্ত বাড়ানো যায়। পলিওয়াটারের ঘনত্ব সাধারণ জলের চেয়ে 40% বেশী। সাধারণ জলের মত 4°সে.-এ পলিওয়াটারের ঘনত্ব সবচেয়ে বেশী হয় না।

পলিওয়াটার তৈরির পদ্ধতি—কোয়ার্ট্‌জের তৈরি কৈশিক নলে জলীয় বাষ্প ঘনীভূত করে নলের দু-মুখ বন্ধ করে পরিস্রুত জলে ডুবিয়ে রাখা হয়। সমস্ত

ব্যবস্থাটার চাপমাত্রা খুব কমিয়ে দিয়ে প্রায় 18 ঘণ্টা ফেলে রাখলে কৈশিক নলে পলিওয়াটার তৈরি হয়। কোয়ার্ট্জ অনুঘটকের কাজ করে। তবে ঠিক কোন্ রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে পলিওয়াটার পাওয়া গেল, বিজ্ঞানীরা এখনও তা জানতে পারেন নি।

বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস—হয়তো খনিজ পদার্থের মধ্যে পলিওয়াটারের অস্তিত্ব আছে; কারণ কিছু কিছু কাদামাটির মধ্যে সাধারণের চেয়ে কিছু বেশী ঘনত্বসম্পন্ন জলের অস্তিত্বের খোঁজ পাওয়া গেছে।

মানুষের শারীরিক উপাদানের শতকরা 90 ভাগ জল, তাহলে মানুষের প্রাণধারণের পক্ষে পলিওয়াটারের প্রয়োজন আছে কি? থাকলে কতটুকু? বিজ্ঞানীরা এর উত্তর খুঁজছেন।

শ্রীসুশীলকুমার নাথ

প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন। আই. কিউ. বলতে কি বোঝায়?

বিজনবিকাশ নাগ, গোপা নাগ
শ্রীরামপুর, হুগলী।

উঃ—Intelligence Quotient শব্দ দুটির প্রথম অক্ষর নিয়ে আই. কিউ. কথাটি এসেছে। মনোবিজ্ঞানীরা বুদ্ধি পরীক্ষার মানকে এই শব্দ দিয়ে বুঝিয়ে থাকেন। কোন জিনিষের ভর, ওজন, দৈর্ঘ্য ইত্যাদির যেমন পরিমাপ করা যায়, বুদ্ধিকেও তেমনি একটা বিশেষ পদ্ধতিতে মাপা যায়। বুদ্ধির সংজ্ঞা কি—এর কোনও নির্দিষ্ট উত্তর বিজ্ঞানীরা এখনও দিতে পারেন নি। তাই শুধু বুদ্ধি না বলে বিজ্ঞানীরা "সাধারণ বুদ্ধি" কথাটাই বেশী প্রয়োগ করেন এবং তার একটা মোটামুটি ব্যাখ্যাও কল্পনা করে থাকেন। তাঁদের মতে, স্বাভাবিক লোকের বুদ্ধির পরিমাণকে সাধারণ বুদ্ধি বলা হয়।

সমবয়সী বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে বুদ্ধির পার্থক্য থাকে। বুদ্ধির এই তারতম্যকে কল্পনা করেই বুদ্ধির একটা গড় মান ধরা হয়ে থাকে, যাকে বলা হয় সাধারণ বুদ্ধি। এভাবেই কম বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিদের বোকা বলা হয় এবং বেশী বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিদের বুদ্ধিমান বলা হয়।

মনোবিজ্ঞানীরা বুদ্ধি মাপবার সময় পরীক্ষার্থীর মানসিক বয়স স্থির করেন। এই ব্যাপারে বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা আছে। একটি পদ্ধতিতে ছাত্রকে কোন নির্দিষ্ট সময়ের

মধ্যে কতকগুলি প্রশ্নের উত্তর জিজ্ঞাসা করা হয়। ঐ সময়ের মধ্যেই সমবয়সী স্বাভাবিক ছাত্রেরা প্রশ্নগুলির বেশীর ভাগ উত্তর যে দিতে পারে, পরীক্ষকের তা আগে থেকে জানা থাকে। পরীক্ষার্থী কত কম সময়ের মধ্যে বেশীর ভাগ প্রশ্নের উত্তর দেয়, তার উপর ভিত্তি করেই তার মানসিক বয়স স্থির করা হয়। কারও মানসিক বয়স কুড়ি—এর মানে কুড়ি বছরের সাধারণ ছেলে যে প্রশ্নের উত্তর যে সময়ে দেয়, সেও সেই প্রশ্নের উত্তর প্রায় একই সময়ে দেয়। মানসিক বয়স ও প্রকৃত বয়সের মধ্যে একটা সম্পর্কের সাহায্যে বিজ্ঞানীরা আই. কিউ. মেপে থাকেন।

$$\text{আই. কিউ.} = 100 \times \frac{\text{মানসিক বয়স}}{\text{প্রকৃত বয়স}}$$

স্বাভাবিক ব্যক্তিদের আই. কিউ.-এর মান হয় 100। বয়স হওয়া সত্ত্বেও যারা খুবই হীনবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির পর্যায়ে পড়েন অর্থাৎ যাদের বুদ্ধি শিশুর মত, মনোবিজ্ঞানীদের ভাষায় তাদের ইম্বেসাইল (Imbecile) বলা হয়। তাদের আই. কিউ. খুবই কম হয়ে থাকে। বয়স হওয়া সত্ত্বেও যাদের মানসিক বয়স আট, তাদের বলা হয় ইডিয়ট (Idiot)। মানসিক বয়স যাদের বারো, তাদের বলা হয় মোরন (Moron)। এসব ব্যক্তিদের বুদ্ধি ঠিকমত বিকশিত হয় না। মনোবিজ্ঞানীদের মতে, সাধারণ ব্যক্তিদের বুদ্ধি প্রায় কুড়ি বছর বয়স পর্যন্ত বাড়ে। এই বয়সের মধ্যেই মস্তিষ্ক ঠিকমত বিকশিত হয়ে যায়। বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধি বাড়তে পারে, কিন্তু আই. কিউ. মোটামুটি অপরিবর্তিত থেকে যায়। বুদ্ধি বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধির প্রয়োগ যথাযথ ও সুষ্ঠু হবার জন্যে যে মানসিক ও চারিত্রিক বল, অধ্যবসায় ইত্যাদির প্রয়োজন হয়, তা হয়তো পূরণ হয় না—তাই আই. কিউ. অপরিবর্তিত থেকে যায়।

শ্যামসুন্দর দে*

*ইনষ্টিটিউট অব রেডিও ফিজিক্স অ্যাণ্ড ইলেকট্রনিক্স, বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাতা-9

শোক-সংবাদ

ডক্টর দ্বিজেন্দ্রলাল গঙ্গোপাধ্যায়

প্রখ্যাত মনোবিজ্ঞানী ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান বিভাগের প্রাক্তন প্রধান ডক্টর দ্বিজেন্দ্রলাল গঙ্গোপাধ্যায় 13ই অক্টোবর এক পথ-দুর্ঘটনায় আহত হন এবং 14ই অক্টোবর এস. এস. কে. এম. হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল 67 বছর।

ডক্টর গঙ্গোপাধ্যায়ের আদি বাসভূমি ছিল অধুনা পূর্ব পাকিস্থানের অন্তর্গত ফরিদপুর জেলায়। তিনি হেয়ার স্কুল, প্রেসিডেন্সী কলেজ—কলিকাতা

দ্বিজেন্দ্রলাল গঙ্গোপাধ্যায়

এবং লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন। বিখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ্ স্বর্গীয় ডক্টর গিরীন্দ্রশেখর বসু তাঁকে মনোবিজ্ঞান অনুশীলনের জন্যে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। ডক্টর গঙ্গোপাধ্যায় শিল্প-মনোবিজ্ঞান, অপরাধ-বিজ্ঞান, সমাজতত্ত্ব, শিশু-মনোবিজ্ঞান সম্পর্কিত গবেষণায় খ্যাতি লাভ করেছিলেন। তিনি কাউন্সিল অব সোসাল অ্যাণ্ড সাইকোলজিক্যাল রিসার্চ এবং শীলায়ণ স্থাপনের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। প্রধানতঃ তাঁরই উৎসাহে অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরীসমূহের ডিরেক্টর জেনারেল একটি সাইকোলজি-সেল স্থাপন করেছিলেন। গত কয়েক বছর ধরে তিনি অপরাধ-প্রবণ কিশোরদের চিকিৎসা ও চরিত্র-সংশোধনাগার প্রভৃতিতে কয়েকটি নতুন মনস্তাত্ত্বিক সূত্র চালু করেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় তিনি ভারত সরকারের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের মনস্তাত্ত্বিক পরামর্শদাতা ছিলেন।

1960 সালে ডক্টর গঙ্গোপাধ্যায় ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের মনোবিজ্ঞান শাখার সভাপতি নির্বাচিত হন। তিনি ইণ্ডিয়ান সাইকোলজিক্যাল অ্যাসোসিয়েসন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান বিভাগের প্রাক্তন ছাত্রদের সমিতি এবং সরকারপুল মানসিক হাসপাতালের সভাপতি এবং ইণ্ডিয়ান অ্যাকাডেমি অব সাইকোঅ্যানালিসিস-এর সহ-সভাপতি ছিলেন। বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সঙ্গে তিনি বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন। তিনি বিজ্ঞান পরিষদের সহ-সভাপতি এবং কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হয়েছিলেন। তাছাড়া অন্যান্য অনেক প্রতিষ্ঠান, যেমন—ক্যালকাটা অ্যাসোসিয়েসন ফর মেন্টাল হেল্‌থ্, ইনষ্টিটিউট অব চিলড্রেনস ফিল্ম, প্যাভ্‌লভ ইনষ্টিটিউট, ইণ্ডিয়ান ব্রেন রিসার্চ অ্যাসোসিয়েসন, লুম্বিনী পার্ক মানসিক হাসপাতাল, বোধী পীঠ, জে. বি. এন. এস. টি. এস., কলিকাতা মূক ও বধির বিদ্যালয়, বালীগঞ্জ ব্রতী সংঘ, শিক্ষা সমস্যা পত্রিকা প্রভৃতির সঙ্গে নানাভাবে যুক্ত ছিলেন। এক সময়ে তিনি 'ছোট গল্প' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকাও প্রকাশ করেছিলেন।

বিবিধ

1970 সালে বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার

1970 সালে পদার্থ-বিজ্ঞানে দু-জনকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। এঁদের একজন হচ্ছেন ফ্রান্সের লুই নীল অপর জন সুইডেনের হ্যান্স্ আল্‌ফ্‌ভেন। দু-জনই অধ্যাপক। অধ্যাপক নীলের জন্ম 1904 সালে লিয়ঁতে। অধ্যাপক আল্‌ফ্‌ভেনের বয়স 62।

রসায়নশাস্ত্রে 1970 সালে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন আরজেন্টিনার বুয়েনস আয়ারসের অধ্যাপক লুই এফ. লেলয়র। এঁর জন্ম হয় 1906 সালে ফ্রান্সে।

1970 সালে চিকিৎসা-বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন বৃটেনের সার বার্ণাড কাট্‌জ, সুইডেনের উল্‌ফ্‌ ফন ইউলার এবং আমেরিকার জুলিয়াস অ্যাক্সেলরড।

চাঁদের মাটি নিয়ে লুনা-16 ফিরে এসেছে

মহাকাশ প্রযুক্তিবিদ্যার এক নতুন ইতিহাস সৃষ্টি হয়েছে। সোভিয়েট রাশিয়ার মনুষ্যবিহীন চান্দ্রযান লুনা-16 চাঁদের মাটি নিয়ে চব্বিশে সেপ্টেম্বর (1970) সোভিয়েট কাজাখস্তান সাধারণ-তন্ত্রের পূর্ব নির্দিষ্ট স্থানে স্বাভাবিকভাবে অবতরণ করেছে বলে সোভিয়েট সংবাদ সরবরাহ সংস্থা 'টাস' সংবাদ দিয়েছে। এর আগে কখনও মনুষ্য-বিহীন যানে করে চাঁদ থেকে মাটি আনা হয় নি। লুনা-16 ভূপৃষ্ঠে অবতরণের দু-ঘণ্টা পরে এই খবর ঘোষণা করা হয়েছে।

চাঁদের মাটি নিয়ে চান্দ্রযানটি দেজকাজগান সহরের দক্ষিণ-পূর্বে আশী কিলোমিটার দূরে নেমেছে। চাঁদের মাটি বা চান্দ্র শিলাবাহী মডিউলটিকে প্যারাস্যুটের সাহায্যে নামতে দেখা যায়। উদ্ধারকারী দলটির চোখের সামনে ক্যাপসুলটি প্যারাস্যুটের সাহায্যে ভূপৃষ্ঠে নেমে আসে। তারপর একটি হেলিকপ্‌টারে ওটিকে তুলে নেওয়া হয়। ক্যাপসুলটির উদ্ধারে একটা জটিল চন্দ্রাভিযানের সাফল্যজনক পরিসমাপ্তি ঘটলো।

লুনা-16-কে গত 13ই সেপ্টেম্বর (1970) উৎক্ষেপণ করা হয়।

চাঁদের শিলা খনিজ পদার্থের কণিকা দিয়ে গঠিত

মস্কো থেকে এ. পি. প্রেরিত এক খবরে জানা যায়, গত 24শে সেপ্টেম্বর লুনা-16 চাঁদ থেকে পৃথিবীতে যে শিলা এনেছে, সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র 3রা অক্টোবর তার প্রাথমিক পরীক্ষার ফল প্রকাশ করেছে।

সরকারী সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান টাস বলেছে যে, ঐ শিলা প্রধানতঃ ক্ষুদ্র শস্যদানার মত খনিজ পদার্থের কণিকা দিয়ে গঠিত এবং দেখতে ধূসর বর্ণের। বাইরে থেকে মনে হয় কণিকাগুলির সংযুক্তি খুব ঘন এবং তাদের মধ্যে আসঞ্জন শক্তিও (একত্রে এঁটে থাকবার শক্তি) আছে বেশ।

টাস আরও বলেছে, চাঁদের এই শিলায় যে পরিমাণ গামারশ্মি আছে, তা সামান্য পরিমাণ—প্রাকৃতিক তেজস্ক্রিয় পদার্থসমন্বিত পৃথিবীর শিলার চেয়ে খুব বেশী নয়।

থোরিয়াম থেকে ইউরেনিয়াম-233

বোম্বাই থেকে সংবাদ সংস্থা ইউ. এন. আই. জানাচ্ছে—ভারত তেজস্ক্রিয় পদার্থ থোরিয়াম থেকে ইউরেনিয়াম-233-কে আলাদা করে নেবার কৌশল আয়ত্ত করেছে।

বোম্বাইয়ের ভাবা পরমাণু গবেষণা কেন্দ্রের জ্বালানী বিভাগের ভারতীয় বিজ্ঞানী ও ইঞ্জিনীয়ারেরা এর ফলে পরমাণু প্রযুক্তিবিভার ক্ষেত্রে এক বৃহৎ কৃতিত্বের অধিকারী হলেন।

ভারতের কেরল উপকূলে যে পরিমাণ থোরিয়াম রয়েছে, পৃথিবীর কোথাও তা নেই। এই বিপুল পরিমাণ থোরিয়ামকে অতঃপর ভারতে পরমাণু শক্তির সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদনে অতি সহজেই ব্যবহার করা চলবে।

ভাবা গবেষণা কেন্দ্রের বিজ্ঞানী ও ইঞ্জিনিয়ারেরা সংবাদ সংস্থার প্রতিনিধিকে বলেছেন, পরীক্ষামূলক চেষ্টায় আমরা সামান্য পরিমাণ থোরিয়াম নিয়ে সাফল্যলাভ করেছি এবং সেটা যে কোন পরিমাণ থোরিয়াম সম্পর্কেও প্রযোজ্য হবে।

জোণ্ড-8 ফিরে এসেছে

রাশিয়ার স্বয়ংক্রিয় মহাকাশ স্টেশন জোণ্ড-8 সাত দিনের মহাকাশ পরিক্রমা সেরে 27শে অক্টোবর পৃথিবীতে ফিরে এসেছে বলে টাস জানিয়েছে। গত 24শে অক্টোবর জোণ্ড-8 চাঁদকে প্রদক্ষিণ করে।

মস্কোর সময় বিকাল 4-55 মিনিটে মহাকাশযানটি ভারত মহাসাগরের পূর্বনির্ধারিত স্থানে নামে। একটি সোভিয়েট উদ্ধারকারী জাহাজ সাজসরঞ্জামসহ যানটিকে তুলে নেয়।

গত 20 অক্টোবর আরোহীবিহীন জোণ্ড-8-কে মহাকাশে পাঠানো হয়েছিল।

বুধ ও শুক্রগ্রহ সম্পর্কে অনুসন্ধান

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র 1974 সালে একটি 893 পাউণ্ড (405 কিলোগ্রাম) ওজনের আরোহীবিহীন মহাকাশযান উৎক্ষেপণ করবে, যা শুক্র ও বুধ গ্রহদ্বয়কে অতিক্রম করে যাবে। এই সর্বপ্রথম মানুষ বুধকে সবচেয়ে কাছ থেকে দেখতে পাবে।

একটিমাত্র মহাকাশযানের দুটি গ্রহকে অতিক্রম করবার ঘটনা এই প্রথম প্রত্যক্ষ করা যাবে। এই দশকের শেষ দিকে স্বয়ংক্রিয় মহাকাশযান কর্তৃক সৌরজগতের দূরবর্তী গ্রহগুলি পরিক্রমার ভূমিকা এটি।

জাতীয় বিমান-বিজ্ঞান ও মহাকাশ সংস্থা ঘোষণা করেছেন যে, 1973 সালের শরৎকালে একটি ক্যামেরাবাহী ম্যারিনার মহাকাশযান শুক্রগ্রহের দিকে উৎক্ষেপণ করা হবে। মহাকাশযানটি 1974 সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ঐ গ্রহটির কাছে যাবে। অতঃপর মহাকাশযানটি বুধের দিকে অগ্রসর হবে। 1974 সালের মার্চ মাসে যানটি বুধের 1000 কিলোমিটার দূরত্বের মধ্যে আসবে।

টেলিস্কোপসমন্বিত ক্যামেরার সাহায্যে ম্যারিনার 42 সেকেণ্ড অন্তর একবার করে বুধের আলোকচিত্র গ্রহণ করবে এবং অধিকাংশ ছবিই সরাসরি পৃথিবীতে পাঠাবে। পৃথিবী থেকে বুধের দূরত্ব 10 কোটি কিলোমিটার।

মহাকাশ সংস্থা জানিয়েছেন যে, পৃথিবী থেকে উচ্চশক্তিসম্পন্ন দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে গৃহীত চাঁদের ছবি যেমন হয়েছিল, বুধের এই ছবিগুলিও অনুরূপ মানের হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

নয়টি গ্রহের মধ্যে বুধ সম্পর্কেই সবচেয়ে কম তথ্য জানা গেছে। বুধ সূর্যের সবচেয়ে কাছের গ্রহ। এই গ্রহটি সূর্য থেকে মাত্র 5 কোটি 80 লক্ষ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। বিজ্ঞানীদের ধারণা, এই গ্রহে উত্তাপ এত বেশী যে, সেখানে জীবনের কোন অস্তিত্ব নেই।

ক্যামেরাটি ছাড়া ম্যারিনার মহাকাশযানে বুধের আবহমণ্ডল, আয়নমণ্ডল, ব্যাসার্ধ এবং এর পৃষ্ঠদেশের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তথ্য লিপিবদ্ধ করবার জন্যে অন্যান্য বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতিও সন্নিবিষ্ট থাকবে।

কাগজ, আখের ছিবড়া ও তুষ প্রভৃতি থেকে প্রোটিনসমৃদ্ধ খাদ্য

সেলুলোজের অকেজো উপাদান বা সেলুলোজ ওয়েষ্ট থেকে প্রোটিনসমৃদ্ধ খাদ্য তৈরির একটি

পরীক্ষামূলক কারখানা সম্প্রতি আমেরিকার লুই-জিয়ানা স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঞ্জিনীয়ারেরা তৈরি করেছেন। ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীদের গবেষণালব্ধ ফলাফলের ভিত্তিতেই এই কারখানাটি তৈরি হয়েছে। উদ্ভিদের দেহকোষ সেলুলোজ নামে জৈব পদার্থ দিয়ে গঠিত। কাঠের মণ্ড বা গুঁড়া, কাগজের মণ্ড, তুলা, বিভিন্ন উদ্ভিজ্জ আঁশ প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর সেলুলোজ।

ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা গবেষণাগারে পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, মাইক্রো-অরগ্যানিজম্ বা অতি ক্ষুদ্র জীবাণু, সেলুলোজ ওয়েষ্টকে পুষ্টিকর প্রোটিনে পরিণত করে। যেসব বিভিন্ন জীবাণু বিভিন্ন সেলুলোজের মূল উপাদানগুলিকে পৃথক করে, তাদের সন্ধান করবার জন্যে ব্যুরো অব সলিড ওয়েষ্ট নামে একটি সংস্থা ঐ বিশ্ববিদ্যালয়কে এই বিষয়ে গবেষণা চালাবার জন্যে অর্থ সাহায্য দিয়েছেন।

ব্যুরোর ডিরেক্টর রিচার্ড ডি. ভোগান এই প্রসঙ্গে বলেছেন যে, কৃষি ও বিভিন্ন শিল্পের পরিত্যক্ত অংশ ও সহরগুলির আবর্জনা ফেলা—একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই সকল আবর্জনা ও কৃষির পরিত্যক্ত অংশ, যেমন আখের ছিব্ড়া, তুষ প্রভৃতি ও অন্যান্য আবর্জনাকে পুষ্টিকর প্রোটিন খাদ্যে পরিণত করলে এই সমস্যার সম্যক সমাধান তো হবেই, তাছাড়া মানুষ ও পশুর পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব মেটানোতে বিশেষভাবে সাহায্য করা হবে।

বর্তমানে আখের ছিব্ড়াকে এই ব্যাপারে কাজে লাগানো হচ্ছে। এই পদ্ধতিতে প্রথমতঃ এদের গুঁড়া করা হয়। তারপর ঐ গুঁড়া জীবাণুযুক্ত করে গাঁজানোর একটি যন্ত্রের মধ্যে রাখা হয়। সেখানে অতি ক্ষুদ্র জীবাণু ঐ গুঁড়ার মূল উপাদান-গুলিকে পৃথক করে দেয় এবং এর রাসায়নিক রূপান্তর ঘটায়।

ঐ রূপান্তরিত বস্তুতে আছে 1 কোষবিশিষ্ট শতকরা 50 ভাগ প্রোটিন, যা খাদ্য হিসাবে গ্রহণ-যোগ্য এবং এর রং বাদামী।

বিজ্ঞানীদের ধারণা, এই পদ্ধতিতে ভবিষ্যতে সংবাদপত্র, কাষ্ঠখণ্ড, খড়, ঘাস এবং ভুট্টাগাছ প্রভৃতি থেকেও প্রোটিনসমৃদ্ধ খাদ্য উৎপাদন করা সম্ভব হতে পারে।

অধ্যাপক প্রিয়দারঞ্জন রায় সম্মানসূচক 'ডক্টরেট' ডিগ্রীতে ভূষিত

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই বছরের সমাবর্তন উৎসবে প্রখ্যাত রসায়ন-বিজ্ঞানী অধ্যাপক প্রিয়দারঞ্জন রায়কে সম্মানসূচক ডকটরেট ডিগ্রীতে ভূষিত করা হয়েছে। রসায়নশাস্ত্রে অধ্যাপক রায়ের অবদানের জন্যে তার স্বীকৃতি বহু পূর্বেই পাওয়া উচিত ছিল। এই সম্মানে অধ্যাপক রায়ের গৌরব বৃদ্ধি হওয়া অপেক্ষা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যা-লয়ের সম্মানই বৃদ্ধি পেয়েছে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ইতিপূর্বেই তাঁকে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রী প্রদান করেছেন।

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-6

দ্বাবিংশ বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন-1970

পরিষদ ভবন

29শে সেপ্টেম্বর '70
মঙ্গলবার, 5-30টা।

কার্যবিবরণী ও গৃহীত প্রস্তাবাবলী

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের দ্বাবিংশ বার্ষিক সাধারণ অধিবেশনে মোট 32 জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক সত্যেন্দ্র নাথ বসু মহাশয়ের সভাপতিত্বে সভার কাজ সম্পন্ন হয়।

1। কর্মসচিবের বার্ষিক বিবরণী

পরিষদের কর্মসচিব মহাশয় এই অধিবেশনে উপস্থিত সভ্যগণকে স্বাগত জানাইয়া গত 1969-'70 সালের জন্যে পরিষদের বিবিধ কাজকর্ম ও আর্থিক অবস্থাদি সম্পর্কে তাঁহার লিখিত বার্ষিক বিবরণী পাঠ করেন। তিনি বলেন যে, গত মে '70 মাসে পরিষদের দ্বাবিংশ বার্ষিক প্রতিষ্ঠা-দিবস অনুষ্ঠানের সভায় পঠিত কার্যবিবরণীতে আলোচ্য বছরে পরিষদের বিভিন্ন কর্মপ্রচেষ্টা ও আর্থিক অবস্থাদি বিষয় বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছিল এবং তাহাই মোটামুটিভাবে 1969-'70 সালের বার্ষিক বিবরণী হিসাবে গণ্য করা যাইতে পারে। সেই জন্য বর্তমান এই বার্ষিক সাধারণ অধিবেশনের সভায় তিনি পরিষদের কাজকর্ম ও অবস্থাদি সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী প্রদান করেন।

এই বিবরণীতে তিনি পরিষদের আদর্শানুযায়ী মাতৃভাষা বাংলায় বিজ্ঞানের প্রচার ও প্রসার সাধনের উদ্দেশ্যে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' মাসিক পত্রিকা, জনপ্রিয় বিজ্ঞান পুস্তক, বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক, বিজ্ঞানবিষয়ক বক্তৃতা দান, পাঠাগার ও 'হাতে কলমে বিভাগ' পরিচালনা প্রভৃতি বিভিন্ন কর্ম-প্রচেষ্টার উল্লেখ করেন। পরিকল্পনা অনুযায়ী বিবিধ কাজের বাস্তব রূপায়ণে যেসব আর্থিক দায়দায়িত্ব পরিষদের উপর বর্তিয়াছে তাহার উল্লেখ করিয়া কর্মসচিব মহাশয় সভ্যবৃন্দের সাহায্য ও সহযোগিতার আহ্বান জানান।

2। হিসাববিবরণী ও ব্যয়বরাদ্দ

গত 1969-'70 সালের পরীক্ষিত হিসাব-বিবরণী ও উদ্বৃত্তপত্র (ব্যালান্স সিট) পরিষদের কোষাধ্যক্ষ শ্রীপরিমলকান্তি ঘোষ মহাশয় সভার অনুমোদনের জন্য উপস্থাপিত করেন।

পরিষদের বিভিন্ন তহবিলের উক্ত পরীক্ষিত হিসাববিবরণী ও উদ্বৃত্ত পত্র মুদ্রিতাকারে সভ্য-গণের বিবেচনার জন্য যথাসময়ে নিয়মানুযায়ী প্রেরণ করা হইয়াছিল। কোষাধ্যক্ষ মহাশয় সাধারণভাবে বিবরণীগুলি পাঠ করেন এবং উপস্থিত সভ্যগণের দ্বারা সেইগুলি সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত ও গৃহীত হয়।

অতঃপর কোষাধ্যক্ষ মহাশয় পরিষদের বিদায়ী কার্যকরী সমিতি কর্তৃক রচিত ও অনুমোদিত বর্তমান 1970-'71 সালের জন্য পরিষদের আনুমানিক ব্যয়বরাদ্দ বা বাজেট পত্র সভ্য-গণের অনুমোদনের জন্য সভায় পেশ করেন। যথোচিত আলোচনার পরে উক্ত ব্যয়বরাদ্দ

পত্রও উপস্থিত সভ্যগণ কর্তৃক সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত ও গৃহীত হয়।

3। কার্যকরী সমিতি গঠন

বর্তমান 1970-'71 সালের জন্য পরিষদের নূতন কার্যকরী সমিতির কর্মাধ্যক্ষমণ্ডলী ও সাধারণ সদস্যের মনোনয়ন পত্রের চূড়ান্ত তালিকা কর্ম-সচিব মহাশয় সভায় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপিত করেন এবং সভ্যগণ কর্তৃক তাহা সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়। বর্তমান 1970-'71 সালের জন্য পরিষদের নূতন কার্যকরী সমিতির বিভিন্ন পদে ও সাধারণ সভ্যরূপে উক্ত তালিকা অনুযায়ী সভ্য-গণের নিম্নলিখিত নাম সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত হইল বলিয়া সভায় ঘোষিত হয় :

কার্যকরী সমিতি

কর্মাধ্যক্ষমণ্ডলী :

সভাপতি—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু
সহঃসভাপতি—শ্রীইন্দুভূষণ চট্টোপাধ্যায়
শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল ভাদুড়ী
শ্রীবলাইচাঁদ কুণ্ডু
শ্রীমৃণালকুমার দাশগুপ্ত
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মৈত্র
শ্রীরুদ্রেন্দ্রকুমার পাল
কোষাধ্যক্ষ—শ্রীপরিমলকান্তি ঘোষ
কর্মসচিব—শ্রীজয়ন্ত বসু
সহযোগী কর্মসচিব—শ্রীরবীন বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীশ্যামসুন্দর দে

সাধারণ সদস্য :

1। শ্রীঅজিতকুমার সাহা
2। শ্রীঅনাদিনাথ দাঁ
3। শ্রীঅমূল্যধন দেব
4। শ্রীআশুতোষ গুহঠাকুরতা
5। শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য
6। শ্রীদিলীপকুমার ঘোষ
7। শ্রীপঙ্কজনারায়ণ রায়
8। শ্রীব্রহ্মানন্দ দাশগুপ্ত
9। শ্রীমণীন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায়
10। শ্রীরাধাকান্ত মণ্ডল
11। শ্রীরমেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র
12। শ্রীরবীন্দ্রনাথ রায়
13। শ্রীশঙ্কর চক্রবর্তী
14। শ্রীসুর্যেন্দুবিকাশ কর
15। শ্রীহেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

4। সারস্বত সংঘের সংঘসচিব নির্বাচন

শ্রীব্রহ্মানন্দ দাশগুপ্ত বর্তমান বছরের (1970-'71) জন্য সর্বসম্মতিক্রমে সারস্বত সংঘের সংঘসচিব নির্বাচিত হন।

5। হিসাব-পরীক্ষক নির্বাচন

পরিষদের বিভিন্ন তহবিলের বর্তমান 1970-71 সালের হিসাবপত্র পরীক্ষা করিবার জন্য হিসাব-পরীক্ষক (অডিটর) নির্বাচন বিষয়ে যথোচিত আলোচনার পরে এইরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, পরিষদের পূর্বতন হিসাব-পরীক্ষক প্রতিষ্ঠান মেসার্স মুখার্জী অ্যাণ্ড গুহঠাকুরতা অ্যাণ্ড কোং, চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস গত কয়েক বৎসর যাবৎ যথোচিত দক্ষতার সহিত পরিষদের হিসাবপত্র পরীক্ষা করিয়াছেন; অতএব উক্ত প্রতিষ্ঠানেরই বর্তমান বর্ষের জন্যও পরিষদের হিসাব-পরীক্ষক পদে নির্বাচিত হওয়া বাঞ্ছনীয় হইবে। সভাপতি মহাশয়ের প্রস্তাবক্রমে অতঃপর উক্ত মেসার্স মুখার্জী গুহঠাকুরতা অ্যাণ্ড কোং বর্তমান 1970-'71 সালের জন্য পরিষদের হিসাব-পরীক্ষক পদে সভায় সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত হন।

6। অনুমোদকমণ্ডলী নির্বাচন

পরিষদের নিয়মতন্ত্রের বিধান অনুসারে এই বার্ষিক সাধারণ অধিবেশনের কার্যবিবরণী ও গৃহীত প্রস্তাবাবলীর অনুলিপি চূড়ান্তভাবে অনুমোদনের জন্য নিম্নলিখিত সদস্যগণ অনুমোদক হিসাব সভার সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত হন—

1। শ্রীসূর্যেন্দুবিকাশ কর
2। শ্রীপ্রফুল্লপ্রসূন চট্টোপাধ্যায়
3। শ্রীমণীন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায়
4। শ্রীমৃণালকুমার দাশগুপ্ত
5। শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল ভাদুড়ী

নিয়মানুসারে অধিবেশনের সভাপতি ও পরিষদের কর্মসচিবসহ উপরিউক্ত নির্বাচিত পাঁচ জন অনুমোদকের দ্বারা এই অধিবেশনের কার্য বিবরণী ও গৃহীত প্রস্তাবাবলী অনুমোদিত ও স্বাক্ষরিত হইলে তাঁহা চূড়ান্তভাবে গৃহীত বলিয়া গণ্য হইবে।

7। সভাপতির ভাষণ

বার্ষিক সাধারণ অধিবেশনের এই সভায় পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় উপস্থিত সভ্যগণকে ও অন্যান্য ব্যক্তিদের পরিষদের প্রতি তাঁহাদের শুভেচ্ছা ও সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। দেশের বর্তমান অবস্থায় গঠনমূলক কাজের সবিশেষ গুরুত্ব সম্পর্কে তিনি আলোচনা করেন।

পরিষদের কাজকর্মের প্রসারের জন্য সকলের সক্রিয় সহযোগিতা যে একান্ত প্রয়োজন, সেই দিকে সভ্যগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া তিনি তাঁহার ভাষণ শেষ করেন।

স্বাঃ সত্যেন বোস
সভাপতি
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

স্বাঃ জয়ন্ত বসু
কর্মসচিব
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

অনুমোদকমণ্ডলীর স্বাক্ষর

স্বাঃ শ্রীসূর্যেন্দুবিকাশ কর
স্বাঃ শ্রীমণীন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায়
স্বাঃ শ্রীপ্রফুল্লপ্রসূন চট্টোপাধ্যায়
স্বাঃ শ্রীমৃণালকুমার দাশগুপ্ত
স্বাঃ শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল ভাদুড়ী

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস কর্তৃক পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-6 হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ 37/7 বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত
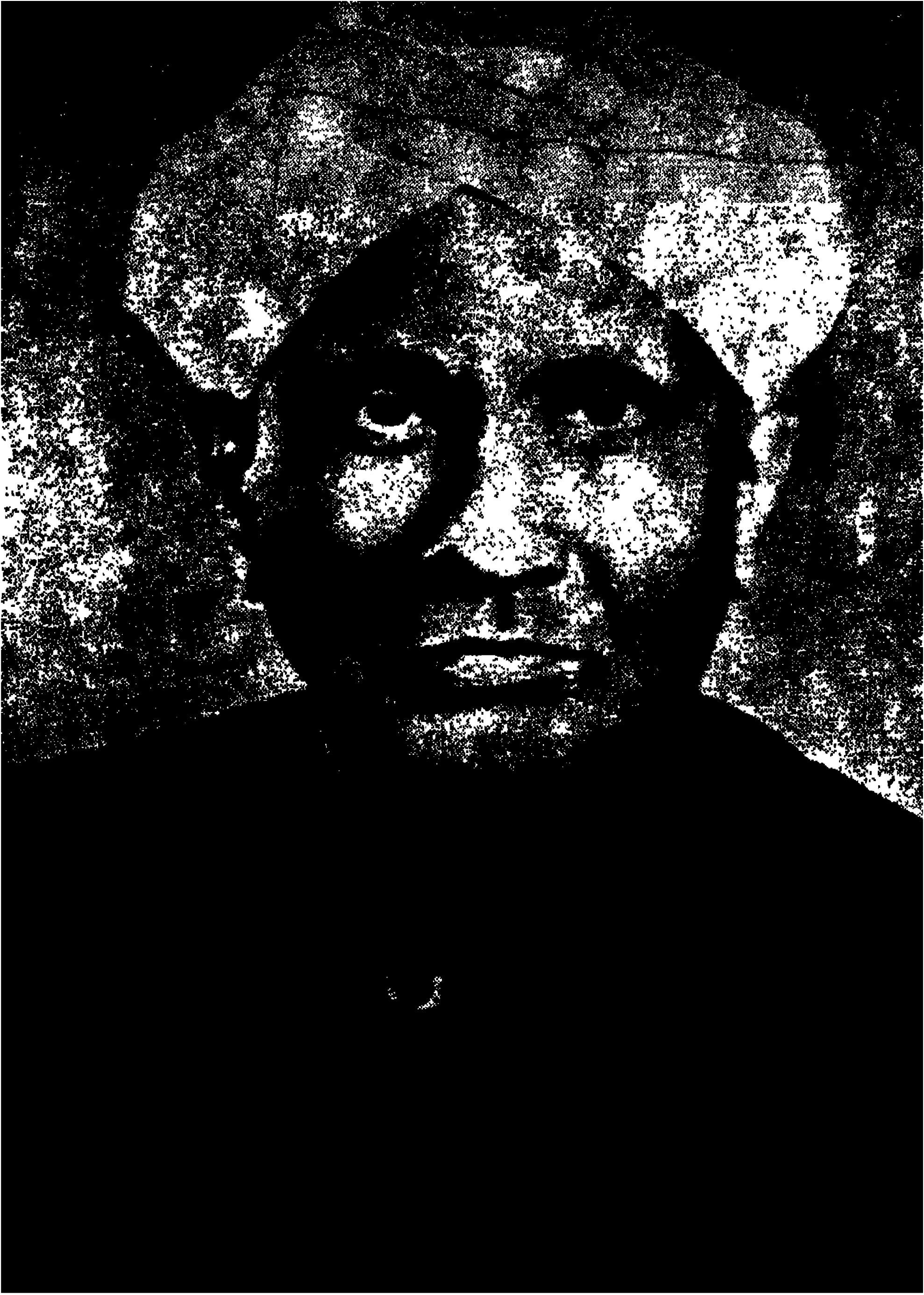
অধ্যাপক চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রামন

জন্ম—7ই নভেম্বর, 1888

মৃত্যু—21শে নভেম্বর, 1970

অধ্যাপক রামনের স্মৃতির প্রতি বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের শ্রদ্ধাঞ্জলি

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

ত্রয়োবিংশ বর্ষ | ডিসেম্বর, 1970 | দ্বাদশ সংখ্যা

মহাজাগতিক রশ্মির আলোকে

হীরেন্দ্রকুমার পাল*

দৈনন্দিন জীবনে কখনো কখনো আমাদের চোখের সামনে ছোটখাটো এমন সব ঘটনা ঘটে, যাদের আমরা কোন গুরুত্ব দিই না এবং উপেক্ষা করে থাকি। কিন্তু এদের মধ্যেও বিরাট সম্ভাব্যতার বীজ নিহিত থাকতে পারে এবং যথোচিত আকৃতি ও নিষ্ঠাসহকারে অনুধাবন করলে এদের মধ্যেও নতুন আলোকের সন্ধান মিলতে পারে—বিজ্ঞানের ইতিহাসে এরকম ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত আছে। মহাজাগতিক রশ্মির আবিষ্কারও এই পর্যায়ে পড়ে।

স্বর্ণপত্র তড়িৎ-জ্ঞাপক যন্ত্র (Gold leaf electroscope) নামক একটি যন্ত্র আছে, যা পদার্থ-বিজ্ঞানের গবেষণাগারে বহুল ব্যবহৃত হয়। এতে প্রধানতঃ একখানি হাল্কা স্বর্ণপত্র খাড়া ধাতব শলাকার গায়ে যুক্ত থেকে ঝুলে থাকে। শলাকার মাথায় তড়িৎ-আধান আরোপ করলে তা শলাকার মাধ্যমে প্রবাহিত হয়ে পত্রকে আহিত করে এবং উদ্ভূত বিকর্ষণের ফলে তার মুক্ত প্রান্ত শলাকা থেকে আলাদা হয়ে দূরে সরে যায়। প্রদত্ত আধান অথবা তজ্জনিত বিভবের উপর বিচ্যুতির পরিমাণ নির্ভরশীল। ক্ষুদ্রতম বিচ্যুতিও অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরিমাপ করা যায়। বায়ু অথবা অন্য কোন গ্যাস পরিবেষ্টিত হয়ে শলাকা ও পত্র একটি ভূ-সংলগ্ন আধারের ভিতরে অন্তরিত হয় এবং সুরক্ষিত অবস্থায় থাকে। তাই স্বভাবতঃ এই যন্ত্র থেকে তড়িৎ-ক্ষরণের

---

*পদার্থবিদ্যা বিভাগ; বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির, বেলুড়।

কোন সম্ভাবনা নেই। অবশ্য ঐক্স-রে সম্পাতে অথবা অন্য কোন প্রভাবাধীন যন্ত্রের মধ্যস্থিত গ্যাস আয়নিত হলে বিপরীত চিহ্নাত্মক আয়ন আকর্ষণ করে আহিত পত্র ও শলাকা উভয়েই নিস্তড়িৎ হয়ে পড়তে পারে। পত্রখানি তখন পুনরায় এসে মিলিত হবে শলাকার গায়ে, যেমন ছিল অনাহিত অবস্থায়।

আসলে কিন্তু দেখা যায়—প্রত্যক্ষ কোন কারণ ব্যতিরেকেই সে যন্ত্র তার আধান হারাতে থাকে। ঘটনাটি ঘটে এত ধীর গতিতে যে, স্বভাবতঃই তা দৃষ্টি এড়িয়ে যায় অথবা অকিঞ্চিৎকর বলে মনে হয়। কিন্তু এই তুচ্ছ ঘটনাই এককালে অনুসন্ধিৎসু বিজ্ঞানীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। এর ফলেই এমন এক গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার সম্ভব হয়েছিল, যার শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে আজ কোন দ্বিমত নেই।

প্রথমে মনে করা হতো, ঐ অভাবিত তড়িৎ-ক্ষরণের মূলে রয়েছে জল-স্থল-অন্তরীক্ষে ছড়িয়ে থাকা তেজস্ক্রিয় পদার্থের ছিটাফোঁটা। অথবা এ-ও হতে পারে যে, আবহমণ্ডলে অজানা এবং স্বয়ম্ভু কোন আয়নীভবন-প্রক্রিয়া নিত্যই চলেছে। ঐতিহাসিক দিক থেকে বলতে গেলে 1910 সালে বৈজ্ঞানিক হেস্-ই সর্বপ্রথম বেলুনের সাহায্যে তড়িৎজ্ঞাপক যন্ত্র উর্ধ্বে পাঠিয়ে লক্ষ্য করেন যে, বেলুন যত উপরে ওঠে, তড়িৎক্ষরণের হারও হয় তত বেশী। কিছুকাল পরে কোল্‌হর্স্টার এই বিষয়টি সমর্থন করেন। তিনি দেখেন যে, ভূপৃষ্ঠ থেকে ছয় মাইল উর্ধ্বে তড়িৎক্ষরণের হার ভূপৃষ্ঠের চেয়ে প্রায় ত্রিশ গুণ অধিক। অতএব একথা পরিষ্কার যে, এই ঘটনার উৎস পার্থিব কিছু নয়। হেস্-এর অনুমান, বায়ুমণ্ডলের বাইরে থেকে আসা কোন অজ্ঞাত বিকিরণই এর জন্যে দায়ী। বায়ুস্তম্ভের স্তর একই প্রস্থচ্ছেদবিশিষ্ট 10 মিটার উঁচু জল কিংবা 1 মিটার পুরু সীসার সমান। কাজেই যে বিকিরণ এই বায়ুস্তর ভেদ করে পৃথিবীতে এসে পৌঁছুতে পারে, তার ভেদ-শক্তি যে কি বিপুল, তা সহজেই বোধগম্য।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসানে 1921 সালে, পুনরায় বিজ্ঞানীদের মনোযোগ এই সমস্যার প্রতি আকৃষ্ট হয়। আমেরিকার অধ্যাপক মিলিকান ও তাঁর সহকর্মীরা এর গুরুত্ব সম্যক উপলব্ধি করেন এবং প্রথমে আঁদে পর্বতগুহায় যন্ত্রপাতি রেখে তাঁরা পরীক্ষা আরম্ভ করেন। বলা বাহুল্য, এই কাজের জন্যে পর্বতগুহা নির্বাচনের উদ্দেশ্যে ছিল, সেখানে যন্ত্র সব দিক থেকেই সুরক্ষিত থাকবে এবং কেবল গুহামুখের ভিতর দিয়েই উর্ধ্বাগত সম্ভাব্য বিকিরণ এসে যন্ত্রে প্রবেশ করবে। এই পরীক্ষা থেকে জানা গেল, যন্ত্রের অভ্যন্তরে আয়নীভবনের মাত্রা বিকিরণের দিক-নির্ভর নয়। দুপুর বেলায় সূর্য যখন মাথার ঠিক উপরে থাকে অথবা মধ্য রাত্রে এই মাত্রা সমান। নক্ষত্রমণ্ডলের ‘তল’ (Galactic plane) দৃশ্যমান অথবা অদৃশ্য যা-ই হোক না কেন, এই মাত্রার কোন তারতম্য পরিলক্ষিত হয় না। সুতরাং আলোচ্য বিকিরণ যে সূর্য অথবা সংশ্লিষ্ট নক্ষত্রপুঞ্জ থেকে আগত নয়, তাও অবধারিত। অন্তরীক্ষের সব দিক থেকেই পৃথিবীর উপর—তার উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধে সমভাবে অবিশ্রান্ত বর্ষিত হচ্ছে এই অজানা বিকিরণ। তাই এর নাম দেওয়া হয়েছে মহাজাগতিক রশ্মি (Cosmic rays)।

ভূপৃষ্ঠ থেকে বিভিন্ন উচ্চতায় এবং ক্যালি-ফর্ণিয়া ও বলিভিয়ায় তুষার-গলা জলে পূর্ণ যে হ্রদ আছে, তার নীচে নানা স্তরে স্বয়ংলেখ তড়িৎ-জ্ঞাপক যন্ত্র পাঠিয়ে মিলিকান ও তাঁর সহ-কর্মীরা দেখতে পেলেন যে, বায়ুমণ্ডলের উর্ধ্বতম স্তর থেকে সুরু করে নীচের দিকে আয়নীভবনের মাত্রা ক্রমশঃ কমতে থাকে। এর ফলে আরো বিশদভাবে প্রমাণিত হলো যে, উর্ধ্বাকাশ থেকেই এই রশ্মির আগমন হচ্ছে।

তীব্রতম গামারশ্মির তুলনায় এই রশ্মির ভেদ-

শক্তি প্রায় দশ গুণ অধিক। কাজেই তাকে অতিহ্রস্ব তরঙ্গের গামারশ্মি বলে কল্পনা করাই স্বাভাবিক। এই রশ্মিও সুষম (Homogeneous) নয়। এর পরিশোষণ বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, এতে ভেদশক্তির তারতম্যানুযায়ী চার রকম উপাদান আছে। তবে গাণিতিক বিশ্লেষণ-পদ্ধতির ফল এক্ষেত্রে সুনিশ্চিত হতে পারে না বলে কার্যক্ষেত্রে এই রশ্মিকে দু-ভাগে বিভক্ত মনে করাই সমীচীন। এক অংশকে বলা হবে শক্ত বা তীক্ষ্ণ এবং অন্য অংশকে বলা হবে নরম। তীক্ষ্ণ বলতে এই বোঝায় যে, তিন মিটার পুরু সীসা ভেদ করলে তার প্রাখর্য কমে মাত্র অর্ধেক, আর নরম বলতে বোঝায় মাত্র দশ সেঃ মিঃ সীসাতেই সে নিঃশেষে পরিশোষিত হয়ে যায়। মহাজাগতিক রশ্মির তীক্ষ্ণতম অংশের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য 8×10^{-10} সেঃ মিঃ। এই তরঙ্গ উৎপাদন করতে যে পরিমাণ শক্তি লাগে, তা 150×10^{6} ভোল্টের মত। এত প্রচণ্ড শক্তি উদ্‌গীরণ কোন জ্ঞাত প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই সম্ভব নয়। এমন কি, সর্বাপেক্ষা জোরালো তেজস্ক্রিয় বিভাজন থেকে যে শক্তি পাওয়া যায়, তার চেয়েও বহু গুণ বেশী এই শক্তি।

1927 সালে হল্যাণ্ড থেকে সমুদ্রপথে জাভা যাত্রার কালে ক্লে লক্ষ্য করেন যে, চৌম্বক বিষুবরেখায় বিকিরণের তীব্রতা উত্তর অথবা দক্ষিণের উচ্চ অক্ষাংশ থেকে 10 কি 12 শতাংশ কম। মহাজাগতিক রশ্মির গবেষণায় অগ্রসর হয়ে অধ্যাপক কম্পটন যে বিশ্ব-পর্যবেক্ষণ অভিযান সংগঠিত করেছিলেন, তাতেও এই বর্ণনার যাথার্থ্য প্রতিপন্ন হয়েছিল। তাঁরা আরো দেখেছিলেন যে, একই দ্রাঘিমা বরাবর উত্তর মেরু থেকে আরম্ভ করে প্রায় 45° পর্যন্ত বিকিরণ-প্রাখর্য মোটামুটি অপরিবর্তিত থাকে, অতঃপর বিষুবরেখা অবধি ক্রমশঃ কমে যায়। প্রাখর্যের হ্রাস সমুদ্রপৃষ্ঠে প্রায় 11 শতাংশ এবং 4360 মিটার উর্ধ্বে প্রায় 33 শতাংশ। সমপ্রাখর্যের রেখাগুলি ভূচৌম্বক অক্ষরেখার সঙ্গে প্রায় হুবহু মিলে যায়। এর কারণ এই হতে পারে যে, নভোমণ্ডলে মহাজাগতিক রশ্মির যাত্রাপথ ভূচৌম্বক ক্ষেত্রের দ্বারা প্রভাবিত এবং বিকিরণটি ধনাত্মক কণিকা দিয়ে তৈরি।

প্রাখর্য-বিন্যাসের একটা স্থূল ব্যাখ্যার জন্যে প্রায় উত্তর-দক্ষিণে প্রলম্বিত কাল্পনিক ভূ-চুম্বকের ভ্রামক-মান (Moment) $8{\cdot}1\times10^{25}$। তড়িৎ-চৌম্বক একক ধরে নিয়ে হিসাব করলে দেখা যায় যে, পৃথিবীর চৌম্বক অক্ষাংশ λ-তে পৌঁছুতে হলে কোন আহিত কণিকার ন্যূনতম শক্তি হওয়া চাই $1{\cdot}9\times10^{10}$ $\cos^{4}\lambda$ ইলেকট্রন ভোল্ট। অতএব আপাতদৃষ্টিতে চৌম্বক মেরুতে পৌঁছুতে হলে ঐ কণিকার কোন শক্তি না থাকলেও চলে আর থাকলে তো কথাই নেই। কিন্তু ভূচৌম্বক বিষুবরেখায় পৌঁছুবার জন্যে সে শক্তি কম পক্ষে $1{\cdot}9\times10^{10}$ ইঃ ভোঃ (e.v.) হওয়া দরকার। কাজেই আপতিত কণিকাগুলির শক্তির মাত্রা যদি একটা বিশেষ পরিসরের মধ্যে নিবদ্ধ থাকে, তাহলে বিষুবরেখার চেয়ে উর্ধ্বতর অক্ষরেখায় উপরই অধিকতর কণিকা বর্ষণের সম্ভাবনা। কিন্তু এটাই সব কথা নয়। এই ব্যাপারে আর একটি প্রশ্নও বিবেচ্য। সেটা হলো বায়ুমণ্ডলের দ্বারা ঐ কণিকাগুলির পরিশোষণ। তাই ক্ষীণ শক্তির কণিকাগুলি যদিও তাত্ত্বিকভাবে মেরুতে পৌঁছুবার ক্ষমতা রাখে, তথাপি প্রায় 10 মিটার পুরু জলের সমতুল্য বায়ুমণ্ডলে পরিশোষিত হয়ে সেগুলি পূর্বেই বন্দী হয়ে যেতে পারে। তবু গোটা বায়ুমণ্ডল অতিক্রম করতে না পারলেও তার ভিতরে অন্ততঃ কিছুটা অগ্রসর হতে বাধা নেই। এতে বেশ বোঝা যায়, কেন বিকিরণ-প্রাখর্য বায়ুমণ্ডলের উর্ধ্বস্তরেই অপেক্ষাকৃত বেশী। যে সব কণিকা ভূচৌম্বক বিষুবরেখার উপর বায়ুমণ্ডল পর্যন্ত এসে পৌঁছয়, সেগুলির শক্তির পরিমাণ গড়ে 3×10^{10} ইঃ ভোঃ বলে জানা

গেছে এবং সেগুলির সংখ্যা প্রতি বর্গসেন্টিমিটারে প্রতি মিনিটে প্রায় দুটি করে।

বিকিরণ-প্রাবর্ত পরিমাপের জন্যে আয়নী-ভবনের-প্রকোষ্ঠকে সাধারণতঃ অধিক চাপের আর্গন গ্যাস দিয়ে ভর্তি করা হয়। কিন্তু এতে কণিকাগুলি কোন্ দিক থেকে আসছে, কত সেগুলির সংখ্যা, কি-ই বা সেগুলির সঠিক পরিচিতি ইত্যাদি বিষয় জানবার সুবিধা নেই। এসব তথ্য জানতে হলে আর একটি পৃথক যন্ত্রের প্রয়োজন। তার নাম গাইগার কাউন্টার (Geiger counter)। এই রকম দুটি যন্ত্র একই লাইনে এবং অল্প ব্যবধানে স্থাপন করে একটি ভাল্‌ব্‌ পরিবর্ধক বর্তনীর সঙ্গে জুড়ে দিতে হয়।

এরূপ যান্ত্রিক কৌশলের সাহায্যে দেখা যায় যে, কোন দিঙ্‌মণ্ডলীয় ভুজকোণের (Azimuth) জন্যে পশ্চিম দিক থেকে আগত কণিকার সংখ্যাই সমধিক। আবার বিষুবরেখার উপর এই আধিক্যের মাত্রা 45° থেকে 60° দিঙ্‌মণ্ডলীয় ভুজকোণের জন্যে সর্বোচ্চ, যা 14 শতাংশ পর্যন্ত হতে পারে। এই ব্যাপারটিও সহজেই হৃদয়ঙ্গম করা যায়, যদি অন্ততঃ সরলতার খাতিরেও আমরা ধরে নিই যে, আগন্তুক কণিকাগুলি ধনাত্মক এবং খাড়াভাবে বিষুবরেখার উপর এসে পতিত হচ্ছে। এই জন্যে সেগুলিকে অধোমুখী তড়িৎ-প্রবাহরূপে গণ্য করা যেতে পারে। আবার ভূচুম্বকের উত্তর ও দক্ষিণ মেরু যথাক্রমে ভৌগোলিক দক্ষিণ ও উত্তর দিকে অবস্থিত থাকায় অনুভূমিক চৌম্বক বলরেখা দক্ষিণ দিক থেকে উত্তরাভিমুখে প্রসারিত। এমতাবস্থায় উল্লিখিত তড়িৎ-প্রবাহ অনুভূমিক চৌম্বক বলরেখাকে লম্বভাবে ছেদ করছে। তাতে তড়িৎ-বল-বিজ্ঞানের বিধান অর্থাৎ Fleming's left hand rule অনুযায়ী প্রবাহের গতিপথ পূর্বদিকে বেঁকে যাবে এবং এজন্যে কণিকাগুলি পশ্চিম দিক থেকেই আসছে বলে প্রতীতি জন্মাবে। যেহেতু ধনাত্মক, সেহেতু কণিকাগুলিকে সাধারণতঃ প্রোটন বলেই অনুমান করা হয়, যদিও মতান্তরে আল্‌ফা-কণা অর্থাৎ হিলিয়াম কেন্দ্রীনের সম্ভাবনাকেও উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

এই কথাটা এখানেই বলে রাখা ভাল যে, এই সব কণিকা, যেগুলি প্রতিনিয়ত পৃথিবীর বুকে এসে হানা দিচ্ছে, সেগুলি আদি অর্থাৎ প্রাথমিক পর্যায়ের নয়। সেগুলি হচ্ছে বায়ু-কেন্দ্রীনের সঙ্গে আদি কণিকার সংঘর্ষজনিত দ্বিতীয় পর্যায়ের কণিকা। তাহলেও এগুলির উপরই পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে প্রাথমিক কণিকা সংক্রান্ত বহু খবরও মিলতে পারে। কেন না, গতি-বিজ্ঞানের নিয়মানুসারে এগুলি প্রাথমিক কণিকার দিক ধরেই ধাবিত হবে। অধিকন্তু সেগুলির উচ্চ শক্তির পরিপ্রেক্ষিতে বায়ুমণ্ডলের ভিতর দিয়ে সেগুলির যাত্রাপথের দৈর্ঘ্য নগণ্য বলে তাতে ভূচৌম্বক-বিচ্যুতি হবে খুব সামান্যই। এমতাবস্থায় এগুলির মধ্যেও আদি কণিকার পূর্ব-পশ্চিম বৈসাদৃশ্য (East-west assymetry) অব্যাহত থাকবে।

উইলসনের মেঘ-প্রকোষ্ঠের সাহায্যে ভূপৃষ্ঠের নিকটস্থ কণিকাগুলির অনুসৃত পথ দৃষ্টিগোচর করে তোলা যায়। এর পিছনে যে নীতিটি সক্রিয়, সেটি হচ্ছে—এই পথের উপরে উৎপন্ন আয়নের গায়ে জলীয় বাষ্প তরলীভূত হয়ে যে বারিবিন্দুর সৃষ্টি করে, সেগুলিরই পর পর সজ্জিত চিহ্নগুলি ফটোপ্লেটে অঙ্কিত হয়ে অনুসৃত পথের নিশানা দেয়। অধ্যাপক ব্ল্যাকেট গাইগার কাউন্টার ও মেঘ-প্রকোষ্ঠের সমন্বয়ে এমন এক অভিনব যন্ত্র উদ্ভাবন করেন, যাতে অনায়াসে অত্যল্প কালের মধ্যেই নিখুঁত-ভাবে কণিকাগুলির ক্রান্তিপথ ফটোপ্লেটে বন্দী করা যেতে পারে। কিন্তু এভাবে তোলা ছবি থেকে সংশ্লিষ্ট কণিকার পরিচয় উদ্ধার করা অত্যন্ত

সহজ নয়। কেন নয় এবং কি তার প্রতিকার, নিম্নোক্ত বর্ণনা থেকে তা উপলব্ধি করা সম্ভব হবে।

যদিও তেজস্ক্রিয় পদার্থ-নিঃসৃত বিকিরণের ক্ষেত্রে এই ছবি থেকে আল্‌ফা কণা, প্রোটন ও ইলেকট্রনের পথাঙ্কের পার্থক্য বুঝতে কষ্ট হয় না—যেহেতু, তৎসংশ্লিষ্ট আয়নীভবনের ঘনত্ব (অর্থাৎ প্রাচুর্য) হুবহু এক নয়, তথাপি মহাজাগতিক রশ্মি-নিহিত কণিকা সম্পর্কে এই বিচার-পদ্ধতি খাটে না। কারণ, এই কণিকাগুলি এমন প্রচণ্ড শক্তিশালী যে, আয়নীভবনের ঘনত্ব মুখ্যতঃ সেগুলির গতিবেগ এবং আধান-মাত্রার উপরই নির্ভর করে। অতএব বিপুল, সমান বেগে ধাবিত প্রোটন ও ইলেকট্রন-সঞ্জাত এই ঘনত্বের মধ্যে উল্লেখযোগ্য তারতম্য হবার কথা নয়। এমতাবস্থায় অতি ক্ষিপ্রগতির কণিকাকে সুনিশ্চিতভাবে সনাক্ত করতে হলে অধিকতর তথ্যের প্রয়োজন।

সে তথ্য মিলবে জ্ঞাত মানের চৌম্বক ক্ষেত্র প্রয়োগে আলোচ্য কণিকার ক্রান্তিপথে যে বক্রতা উৎপন্ন হয়, তার পরিমাপ থেকে। চৌম্বক ক্ষেত্র যত জোরদার হবে, বক্রতাও হবে তত বেশী। হরেক রকম পরিচিত কণিকার জন্যে বিভিন্ন শক্তির চৌম্বক ক্ষেত্রজনিত বক্রতা এবং সংশ্লিষ্ট আয়ন-ঘনত্ব পূর্বাহ্নে নির্ধারণ করে লেখচিত্রের সাহায্যে অজ্ঞাত কণিকাকে সনাক্ত করতে হয়; এছাড়া উপায়ান্তর নেই।

এভাবে পর্যবেক্ষণ চালিয়ে দেখা গেছে, অধিকাংশ স্থলেই এই সব কণিকা 10^{11} ইঃ ভোঃ-প্রমাণ শক্তির ইলেকট্রন ছাড়া অন্য কিছু নয়, যদিও মাঝেমধ্যে ছবিতে দু-একটা প্রোটন-পথও ধরা পড়েছে। তবে শেষোক্তটি খুবই দুর্লভ, ঘটনা প্রতি দু-হাজার ইলেকট্রনে একটি মাত্র প্রোটন—এই অনুপাতে। এই প্রোটন হয়তো মহাজাগতিক রশ্মির দ্বারা মেঘ-প্রকোষ্ঠের সন্নিকটে কেন্দ্রীনের বিভাজনের ফলেই উদ্ভূত।

1933 সালে অধ্যাপক অ্যাণ্ডারসন সর্বপ্রথম মেঘ-প্রকোষ্ঠের ফটোগ্রাফে যুগ্ম পথাঙ্ক লক্ষ্য করেন। প্রতিটি যুগ্ম রেখা যেন প্রকোষ্ঠের ভিতরে অথবা তার নিকটে একই উৎস-বিন্দু থেকে নির্গত। রেখাদ্বয়ে আয়ন-প্রাচুর্য সমান। চৌম্বক-বক্রতাও তাই; কিন্তু বিপরীতমুখী। এই ধরণের সমান বক্রতা থেকে সংশ্লিষ্ট পথচারীদ্বয়ের আধানমাত্রাও যে সমান, সেই ইঙ্গিতই বহন করে। কিন্তু বিপরীত বক্রতা থেকে দুটি বিকল্প সিদ্ধান্ত হতে পারে; যথা—(1) যদি উভয় পথচারী একই উৎস-বিন্দু থেকে রওনা হয়, তাহলে তাদের আধান হবে বিপরীত চিহ্নাত্মক, আর (2) যদি কোন বিশেষ এবং দুর্বোধ্য যোগাযোগের ফলে তারা পরস্পরের বিপরীত দিকে ধাবিত হয়, তাহলে তাদের আধান হবে সমচিহ্নাত্মক। সিদ্ধান্ত দুটির কোন্‌টি এস্থলে গ্রহণীয়, তা নির্ণয়ের গুরুত্ব অপরিসীম। বলা বাহুল্য, অ্যাণ্ডারসন নিজেই অগ্রণী হয়ে এই সমস্যার সমাধান করেছিলেন। এর জন্যে তিনি যে কৌশল অবলম্বন করেছিলেন, তা হচ্ছে—প্রকোষ্ঠের ভিতর কণিকা দুটির পথিমধ্যে 6 মিলিমিটার পুরু একখণ্ড সীসার ফলক স্থাপন করে পূর্ব ব্যবস্থাপনাতেই তিনি পুনরায় ছবি তোলেন। এবারে দেখা গেল, ফলকের পশ্চাদ্দিকে উভয় রেখারই বক্রতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ব্যাখ্যায় প্রথম সিদ্ধান্তকেই গ্রহণ করতে হয়। কেন না, তাহলে ফলকের ভিতরে পরিশোষণের ফলে উভয় পথচারীরই গতিবেগ পশ্চাদ্দিকে হ্রাস পাবে, আর এটাই হবে বক্রতা বৃদ্ধির হেতু।

অতএব নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হলো যে, কণিকাযুগল একই উৎস-সম্ভূত এবং তন্মধ্যে একটি ধনাহিত, অন্যটি ঋণাহিত। অধিকন্তু, ধনাহিতটি যে প্রোটন নয়, তাও বোঝা গেল ছবিতে তার গতিবেগের বহর দেখে। পক্ষান্তরে এই উত্তাল গতিবেগ ইলেকট্রন-জাতের স্বপক্ষেই সাক্ষ্য দেয়।

উপরিউক্ত বৃত্তান্ত থেকে এই সিদ্ধান্তও অপ্রতিরোধ্য হয়ে পড়ে যে, এখন আমরা একটি নতুন কণিকার সন্ধান পেয়েছি, যা ধনাহিত এবং যাকে ইলেকট্রনের প্রতিচ্ছায়া মনে করা যেতে পারে। এই ধনাহিত ইলেকট্রনের নাম হলো পজিট্রন। ইলেকট্রন ও পজিট্রনের আধান/ভর (e/m) অনুপাত এবং ভরও অভিন্ন।

মনে এখন স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগবে, এই যমক কণিকার জন্ম হলো কোথায় এবং কিভাবে? আইনষ্টাইনের সুবিখ্যাত ভর-শক্তি সমতুল্যতা নীতির (Equivalence of mass and energy) পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্নের একটা সুন্দর জবাব মিলে। এই নীতি অনুসারে ইলেকট্রন বা পজিট্রনের ভর $\cdot 5\times10^6$ ইঃ ভোঃ শক্তির সমতুল্য। অতএব শক্তির বিনিময়ে এগুলির সৃষ্টি সম্ভব। যেহেতু নিস্তড়িৎ কোন কিছু থেকে ঋণাধান নিষ্কাশিত করতে হলে সমপরিমাণ ধনাধানের আবির্ভাব অপরিহার্য, সেহেতু শক্তির জঠর থেকেও ইলেকট্রন ও পজিট্রন যুগপৎ জন্মলাভ করতে পারে। আর যে পরিমাণ শক্তির বিনিময়ে এই রূপান্তর সংঘটিত হবে, তার ন্যূনতম পরিমাণ হলো $2\times\cdot5\times10^6 = 10^6$ ইঃ ভোঃ।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, এক নিগূঢ় তত্ত্বের পরিকল্পনায় ডিরাক এই জাতীয় যুগ্মকণিকার অস্তিত্ব সম্বন্ধে পূর্বাহ্ণেই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। অ্যাণ্ডারসনের গবেষণা এখন সেই ভবিষ্যদ্বাণীকে বিমূর্ত করে তুললো।

অতএব দেখা যাচ্ছে, উপযুক্ত ব্যবস্থায় 10^6 ইঃ ভোঃ অথবা ততোধিক শক্তিসম্পন্ন ফটোন পরিশোষণের ফলে ইলেকট্রন-পজিট্রন যুগল জন্মাতে পারে। কিন্তু এরূপ প্রচণ্ড শক্তিশালী ফটোন মহাজাগতিক রশ্মি ভিন্ন অন্য কিছু থেকে সচরাচর লভ্য নয়। একমাত্র ব্যতিক্রম হিসাবে থোরিয়াম-C″- থেকে উদ্ভূত গামারশ্মির নাম করা যেতে পারে। বস্তুতঃ আন্ডারসন, ব্ল্যাকেট এবং ওকচিয়ালিনি এই কণিকাযুগল সৃষ্টির চেষ্টায় থোরিয়াম-C″ ব্যবহার করে আকাঙ্ক্ষিত সাফল্য অর্জন করেছিলেন। অধুনা কতিপয় কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকেও পজিট্রন পাওয়া যাচ্ছে বলে সংবাদ আছে।

ইলেকট্রন ও পজিট্রনের তড়িতাধান বিসদৃশ বলে একে অন্যকে স্বভাবতঃই আকর্ষণ করবে এবং এর ফলে তাদের মধ্যে যে মিলন বা সংঘর্ষ ঘটবে, তাতে উভয়েরই বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু তখন তাদের ভরের দশা কি হবে? বিজ্ঞানী বলেন, সে ভরের বিনিময়ে দেখা দিবে ফটোন অর্থাৎ বিকিরণরূপী শক্তি। এই কারণে সাধারণ ঘনত্ব-বিশিষ্ট পদার্থেও পজিট্রনের জীবনকাল নিরতিশয় সংক্ষিপ্ত হতে বাধ্য। যমজ ইলেকট্রন-পজিট্রনের আবির্ভাব ও বিলয়—উভয়েই কল্পনার স্তর উত্তীর্ণ হয়ে অধুনা পরীক্ষাগারে নিরীক্ষণসাধ্য বাস্তবে পরিণত হয়েছে।

তড়িৎ-চৌম্বক তত্ত্বের শিক্ষা এই যে, পদার্থের দ্বারা প্রতিহত হলে চলন্ত ইলেকট্রন (অথবা পজিট্রন) তার শক্তি কিছুটা হারিয়ে ফেলে এবং হৃতশক্তির কিয়দংশ আত্মপ্রকাশ করে এক্স-রে-রূপী বিকিরণের মধ্য দিয়ে। দেখা গেছে, ইলেকট্রনের শক্তি $1\cdot5\times10^8$ ইঃ ভোঃ-এর বেশী হলে তার অপচিত শক্তির অধিকাংশই এভাবে রূপান্তরিত হয়ে থাকে। সুতরাং একথা স্বতঃসিদ্ধ নয় যে, শক্তি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইলেকট্রনের ভেদ-শক্তিও বাড়বে। মনে রাখা দরকার, এই ভেদ-শক্তির একটা সর্বোচ্চ সীমা আছে এবং সে সীমা 10 সেঃ মিঃ সীসা দিয়ে সূচিতব্য। যেহেতু গোটা বায়ুমণ্ডল প্রায় 100 সেঃ মিঃ সীসার তুল্য, সেহতু সহজেই বোঝা যায় যে, মেঘ-প্রকোষ্ঠের ফটোগ্রাফে আমরা যে সকল ইলেকট্রনের সাক্ষাৎ পাই, সেগুলি বায়ুমণ্ডলের

ভিতরে ভূপৃষ্ঠের অনতিদূরে অর্থাৎ সামান্য কয়েক মাইলের মধ্যেই উৎপন্ন হয়েছে।

এবার আমরা মহাজাগতিক রশ্মির ধারাবর্ষণ সম্বন্ধে আলোচনা করবো। ধরা যাক, প্রচুর শক্তি নিয়ে কোন ইলেকট্রন আবহমণ্ডলের ভিতর দিয়ে ছুটে আসছে। এমতাবস্থায় বায়ুকণার সঙ্গে সংঘর্ষে সেটির শক্তি দ্রুত ক্ষয়িত হয়ে তার বদলে কতিপয় শক্তিশালী ফটোনের সৃষ্টি করবে। এগুলি আবার পদার্থের কেন্দ্রীনে উপস্থিত হলে ইলেকট্রন-পজিট্রন যুগলের অভ্যুদয় ঘটাতে পারে। এই যুগলের শক্তির মাত্রাও বিপুল হওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। ফলে বায়ুকণা থেকে প্রতিহত হয়ে সেগুলি উভয়েই পৃথকভাবে আরও ফটোনের সৃষ্টি করবে। প্রক্রিয়াটি পুনঃ পুনঃ চক্রাকারে চলবে এবং তাতে ইলেকট্রন, পজিট্রন ও ফটোন কণিকাত্রয়ের দ্রুত বংশবিস্তার ঘটতে থাকবে। পরিশেষে যখন এই লক্ষ লক্ষ কণিকা ঝাঁকে ঝাঁকে পৃথিবীতে নেমে আসবে, তখন একমাত্র প্রবল বৃষ্টিধারার সঙ্গেই সেগুলির তুলনা করা চলবে। এরই নাম ধারাবর্ষণ। নিঃসন্দেহে, এই ঘটনা এক বিরাট শক্তির প্রকাশ। এই ধারাবর্ষণ আবিষ্কারের কৃতিত্ব অধ্যাপক ব্ল্যাকেটের। কেউ কেউ একে বিস্ফোটন (Burst) আখ্যাও দিয়ে থাকেন। মহাজাগতিক রশ্মির অপেক্ষাকৃত নরম অংশটি সম্ভবতঃ উল্লিখিত তিন রকমের কণিকার সাহায্যেই গঠিত এবং মেঘ-প্রকোষ্ঠের ছবিতে এদেরই পথচিহ্ন বিধৃত হয়। ধারাবর্ষণের একটি তাৎপর্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, বায়ুমণ্ডলের উচ্চতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বর্ষিত কণিকার সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়তে থাকে এবং ঊর্ধ্বতম সীমায় আরোহণ করবার পর পুনরায় কমতে শুরু করে।

আউগের এবং আরও কয়েকজন বিজ্ঞানী প্রায় 25 একর জায়গা জুড়ে বহু গাইগার কাউন্টার সন্নিবেশিত করে সেগুলির সাহায্যে যুগপৎ ধারাবর্ষণের প্রকৃতি অধ্যয়ন করেছেন। তাঁরা লক্ষ্য করেছেন, প্রতি বর্গগজের উপর এই করকা-বর্ষণের সংখ্যা হয় প্রায় 25। তার মানে, প্রায় 10 লক্ষ কণিকা এসে পৃথিবীর বুকে একই সঙ্গে হানা দিচ্ছে। হাইসেনবার্গ মনে করেন, এই সব শক্তিশালী বিস্ফোটনের মূলে রয়েছে পারমাণবিক বিস্ফোরণ এবং সেই বিস্ফোরণ ঘটাচ্ছে দুর্দান্ত শক্তির বাহক কোন কণিকা।

পূর্বেই বলা হয়েছে, মহাজাগতিক রশ্মির একটা শক্ত অংশও আছে, যা জলের 240 মিটার অবধি ভেদ করতে সক্ষম। তাই সে অংশ ইলেকট্রন কিংবা ফটোন দিয়ে গঠিত হতে পারে না—এমন কি, প্রোটন দিয়েও নয়। এহেন ভেদশক্তির জন্যে সেগুলির শক্তির মাত্রা এতই বিরাট (উদ্ভট) হওয়া প্রয়োজন যে, তাতে কল্পনাও হার মানবে। হিসাবে দেখা যায়, এর সুষ্ঠু ব্যাখ্যার জন্যে চাই এমন এক কণিকা, যার ভর হবে ইলেকট্রন ও প্রোটনের মাঝামাঝি। এই কণিকার নাম মেসন। কিন্তু গবেষণাগারে সে ছিল তখনো অজ্ঞাত।

প্রসঙ্গতঃ আর একটি বিষয়ের অবতারণা এখানে এসে পড়ে। সর্বাধুনিক তত্ত্বানুযায়ী পরমাণু কেন্দ্রীনের অভ্যন্তরে রয়েছে কিছু ধনাত্মক প্রোটন ও কিছু নিস্তড়িৎ নিউট্রন। এগুলিকে একত্রে ধরে রাখবার জন্যে এমন একটি আকর্ষণ বলের দরকার, যা প্রোটন-প্রোটন বিকর্ষণকেও পরাভূত করবে। কিন্তু কিভাবে উৎপন্ন হয় সে বল? ঝানু ঝানু তাত্ত্বিকেরা এই নিয়ে অনেক মাথা ঘামিয়েছেন। যুকাওয়ার অনুধ্যান হচ্ছে, উল্লিখিত মেসনও কেন্দ্রীনেরই বাসিন্দা এবং সেগুলি ঘন ঘন প্রোটনের অভ্যন্তর থেকে নিউট্রনের অভ্যন্তরে অথবা এর বিপরীত দিকে যাওয়া-আসা করে। এতে প্রোটন নিউট্রনে এবং নিউট্রন প্রোটনে রূপান্তরিত হয়। আবার প্রোটন থেকে প্রোটনে অথবা নিউট্রন

থেকে নিউট্রনেও (নিস্তড়িৎ) মেসনের আনাগোনা চলে রূপান্তর ছাড়াই। আন্তঃকেন্দ্রীন কণাগুলির মধ্যে এই জাতীয় মেসন-বিনিময়ের ফলেই উদ্ভূত হয় সেই ঈপ্সিত আকর্ষণ, বা বিনিময় বল নামে খ্যাত।

বহু চেষ্টার পর আজ গবেষণাগারে মেসনের সাক্ষাৎ মিলেছে। অধ্যাপক অ্যাণ্ডারসন এবং আরো কয়েক জন বিজ্ঞানী মহাজাগতিক রশ্মির মেঘ-প্রকোষ্ঠ ফটোগ্রাফে মেসনেরও পথচিহ্ন আবিষ্কারে কৃতকার্য হয়েছেন। অধিকন্তু মাপজোখের দ্বারা এটাও তাঁরা জানতে পেরেছেন যে, মেসন-কণিকা ইলেকট্রনের চেয়ে প্রায় দুই শত গুণ ভারী। অবশ্য এই মানের অল্প-বিস্তর হেরফেরও হয়ে থাকে। কারো কারো মতে, এই তারতম্য দেখে সন্দিগ্ধ বা বিস্মিত হবার কিছু নেই—কেন না, সেই ভর নির্ভর করে কেন্দ্রীনের রূপান্তরের নমুনা বা ধরণের উপর। ভরের তারতম্য সত্ত্বেও এটা লক্ষণীয় যে, মেসনের আধান-মাত্রা সর্বদাই অভিন্ন। সে মাত্রা হয় ইলেকট্রন-আধানের সমান, নয়তো 0। আধান থাকলে তা ঋণাত্মক অথবা ধনাত্মক দুই-ই হতে পারে। মেসনের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, মুক্তাবস্থায়ও সে অস্থায়ী ও ভঙ্গুর; তাই অত্যল্প কালের মধ্যেই বিশ্লিষ্ট হয়ে ইলেকট্রন অথবা পজিট্রনে পরিণত হয়। কিন্তু ভরবেগ এবং শক্তি-সংরক্ষণ নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষার জন্যে দ্বিতীয় একটি নিস্তড়িৎ কণিকাও ইলেকট্রনের সহজাত হওয়া দরকার—এটাই তত্ত্বের দাবী। এই আগন্তুকের নাম নিউট্রিনো। বীক্ষণাগারে আজ পর্যন্ত সেটি ধরা দেয় নি। ভবিষ্যতেও হয়তো দেবে না।

তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে বীটারশ্মি নির্গমনের ব্যাপারে ইতিপূর্বে যে কিছু অসঙ্গতি পরিলক্ষিত হচ্ছিল, তা মেসন আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে দূরীভূত হয়ে গেছে। এখন এই কথাটা বেশ বোঝা যাচ্ছে যে, বীটাকণিকার আদি রূপ হচ্ছে এই মেসন। কেন্দ্রীন-বিভাজনের সময় মেসনই সমস্ত শক্তি কুক্ষিগত করে নির্গত হয় এবং পরে সে বীটাকণিকা (ইলেকট্রন) ও নিউট্রিনোতে বিভক্ত হয়ে যায়। তখন ঐ দুটি কণিকা নিজেদের মধ্যে সে শক্তি ভাগাভাগি করে নেয়। আরো জানা গেছে, অস্থায়ী মেসনের গড় পরমায়ু এক সেকেণ্ডের পাঁচ লক্ষ ভাগের এক ভাগ মাত্র!

আবহমণ্ডলের উর্ধ্ব স্তরে যদি 10^{10} ইঃ ভোঃ শক্তি নিয়ে কোন মেসন বিমুক্ত হয়, তাহলে তার পক্ষে নীচের বায়ুস্তর বিদীর্ণ করে পৃথিবীতে এসে পৌঁছুবার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু স্পষ্টতঃই সে প্রাথমিক পর্যায়ের কণা হতে পারে না। তাহলে এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, মেসন সৃষ্টির মূলে কি ব্যবস্থা সক্রিয়? যতদূর বোঝা যায়, ব্যবস্থাটা হচ্ছে এই যে, উর্ধ্ব স্তরে বায়ু-কেন্দ্রীনের সঙ্গে বহিরাগত প্রাথমিক বিকিরণের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী প্রোটন এবং ভারী কেন্দ্রীনগুলির সংঘর্ষের ফলেই কেন্দ্রীন ভেঙে গিয়ে প্রথমে মুক্তি লাভ করে মেসন এবং পরে তা থেকে ইলেকট্রন উপজাত হয়। কিছু প্রোটনও ঐ মেসনের সঙ্গী হতে পারে। তখন মেসন স্বয়ং অথবা প্রোটনসহ মহাজাগতিক রশ্মির তীক্ষ্ণ অংশ উৎপাদন করবে আর কোমল অংশটি গঠিত হবে—পূর্বেই বলা হয়েছে—মেসন-সম্ভূত ইলেকট্রন যে ধারাবর্ষণ উৎসারিত করে, তার মাধ্যমে।

আপাতদৃষ্টিতে তুচ্ছ, অকিঞ্চিৎকর একটা ঘটনাকে ধৈর্য, অধ্যবসায় এবং নিষ্ঠাসহকারে অনুসরণ করে বিজ্ঞানীরা আজ বিশ্বরহস্যের এক পরম বিস্ময়ের মুখোমুখী এসে দাঁড়িয়েছেন। ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে অবিরত চলেছে যে উত্তাল শক্তির উদ্গীরণ, কি তার হেতু, কোথায় তার উৎস? এই ভেবে বিজ্ঞানীরা আকুল। সত্য কথা বলতে গেলে, এই সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্ত অধ্যাবধি কিছু হতে পারে নি। তবে জল্পনা-

কল্পনারও অন্ত নেই। অধ্যাপক মিলিকান বলেন, মহাশূন্যে প্রোটন ও নিউট্রন কণিকার মিলনে হিলিয়াম, নাইট্রোজেন প্রভৃতি পরমাণু নিত্য নূতন গঠিত হচ্ছে এবং তাতে যে ভর-হ্রাসের উদ্ভব হয়, তা-ই আইনষ্টাইনের সুবিখ্যাত সূত্রানুযায়ী ($E=mc^2$) শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে। পক্ষান্তরে অধ্যাপক এডিংটন ও অধ্যাপক জীন্স মনে করতেন যে, প্রোটন ও ইলেকট্রনের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ বা সংস্পর্শের ফলে প্রোটনের বিনাশ ঘটছে এবং তার সমুদয় ভরই শক্তিরূপে পুনঃ-প্রকাশিত হচ্ছে মহাজাগতিক রশ্মির ভিতর দিয়ে। মতান্তরে, বিশ্ব-সৃষ্টির গোড়ার দিকে পদার্থ-জগতের নিয়ম ও সূত্রাদি অন্য রূপ ছিল এবং তখনই এই রশ্মির জন্ম সম্ভব হয়েছিল। তারপর থেকে এযাবৎ সে আবদ্ধ বিশ্বের অভ্যন্তরে শুধু পরিভ্রমণ করেই চলেছে। রাশিয়ান পদার্থবিদ্ গুইন্স-বার্গের ধারণা হলো—প্রাথমিক মহাজাগতিক কণিকা সঞ্জাত হচ্ছে, তারকামণ্ডলীর অন্তঃস্থলে কেন্দ্রীন-বিস্ফোরণের ফলে। অতএব এগুলি নাক্ষত্রধূলি ছাড়া কিছুই নয়; আর এই প্রক্রিয়াতেই নক্ষত্র-সমূহের বিয়োজন, বিভাজন ও বিধ্বংসলীলাও সংঘটিত হচ্ছে মহাবিশ্বে।

কৃষি-সমস্যার সমাধানে সংশ্লেষিত উদ্ভিদ-হর্মোনের ভূমিকা

মনোজকুমার সাধু*

বিশ্বের উন্নতিকামী দেশগুলির চরম লক্ষ্য হলো খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভ করা। উন্নত ধরণের বীজ, পর্যাপ্ত সার ও জল সরবরাহ, কীট-পতঙ্গ ও রোগের আক্রমণ প্রতিরোধকল্পে যথাযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ ইত্যাদি শস্য ফলনের হার উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করলেও কতকগুলি সমস্যা এখনও কৃষকদের বিশেষভাবে বিব্রত করে থাকে। তবে ইতিমধ্যে কয়েকটি আশ্চর্য-জনক রাসায়নিক পদার্থের আবিষ্কারের ফলে কৃষির ঐ সব জটিল সমস্যা সমাধানের পথে দৃঢ় পদক্ষেপ সম্ভব হয়েছে। আজ থেকে প্রায় 40 বছর পূর্বে অক্সিন নামে যে উদ্ভিদ-হর্মোন আবিষ্কৃত হয়, তা আজ কতকগুলি ফসলের ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। প্রাকৃতিক অক্সিনের মধ্যে ইণ্ডোল অ্যাসেটিক অ্যাসিড (IAA) প্রধান এবং প্রতিটি উদ্ভিদের মধ্যে এর উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। তথাপি কৃষি-সমস্যার সমাধানে কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত অক্সিনের ব্যবহারই সর্বাধিক; কারণ উদ্ভিদের উপর এর প্রভাব বিচিত্র ও অতুলনীয়। অক্সিনের বহুমুখী কর্মক্ষমতা নিয়ে সমগ্র বিশ্বে বিশদ গবেষণা সুরু হয়েছে এবং ইতিমধ্যেই আমরা এর ব্যবহারিক ও ব্যবসায়িক উপযোগিতা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠেছি। অক্সিন ব্যবহারের প্রধান সুবিধা হলো এই যে, খুব অল্প পরিমাণে প্রয়োগ করলেই ঈপ্সিত ফল পাওয়া যায়, সময় ও অর্থের সাশ্রয় হয়। নীচে কৃষি-সমস্যা ও তার সমাধানে অক্সিনের ভূমিকা বর্ণনা করা হলো।

আনারস, লেচারি ও বাঁধাকপির গাছে ফুল নিয়ন্ত্রণ—আনারস সুস্বাদু ও পুষ্টিকর ফলগুলির মধ্যে অন্যতম। আনারস চাষের প্রধান সমস্যা হলো এই যে, সব গাছে একই সঙ্গে ফুল ধরে না, যার জন্যে আনারসের ক্ষেত থেকে বার বার ফল তোলবার ঝামেলার সম্মুখীন হতে হয়। কিন্তু বর্তমানে পশ্চিম দুনিয়ার প্রগতিশীল দেশগুলিতে

*কৃষি বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

ন্যাপ্‌থলিন অ্যাসেটিক অ্যাসিড (NAA) নামে কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত একটি উদ্ভিদ-হরমোনের ব্যবহারের ফলে বছরের যে কোন সময়ে সব গাছে একই সঙ্গে ফল ধরানো সম্ভব হচ্ছে। একর প্রতি মাত্র 25 গ্র্যাম NAA প্রয়োগ করলেই এই আশ্চর্যজনক ফল পাওয়া যায়।

আবার কতকগুলি ফসল, যেমন—সেলারি ও বাঁধাকপির গাছে তাড়াতাড়ি ফুল আসা কাম্য নয়। আল্‌ফা ক্লোরোফেনোক্সি প্রোপিয়োনিক অ্যাসিড নামে আর একটি অক্সিনের 100 ppm জলীয় দ্রবণ গাছে স্প্রে করলে অসময়ে ফুল আসা বন্ধ হয়। গাছে ফুল ধরা নিয়ন্ত্রণে অক্সিনের ভূমিকা নিয়ে বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে এবং এর সঠিক বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেওয়া আজও সম্ভব হয় নি।

অনুপযুক্ত প্রাকৃতিক পরিবেশে টোম্যাটো চাষ—শীতপ্রধান দেশে শীতকালে টোম্যাটো চাষ করা বেশ কঠিন। টোম্যাটো গাছের বৃদ্ধি ও ফলন পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার উপর নির্ভরশীল। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকলে বা দিনের দৈর্ঘ্য কম হলে ফুলের আভ্যন্তরীণ গঠনের পরিবর্তন হয়, পরাগ উৎপাদন হ্রাস পায় ও পরিণামে পরাগ-সংযোগ ব্যাহত হয়। আবার পরাগ-সংযোগ হলেও অতিরিক্ত শৈত্যের প্রভাবে অনেক সময় পরাগ-নালীকার বৃদ্ধি ব্যাহত হওয়ায় গর্ভকোষের মধ্যস্থিত ডিম্বাণু নিষিক্ত হয় না। গর্ভকোষের অক্সিন ফলের প্রাথমিক বৃদ্ধির জন্যে যথেষ্ট হলেও পরবর্তী বৃদ্ধির পক্ষে অপ্রতুল। নিষিক্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে ডিম্বাণুর মধ্যে অক্সিন প্রস্তুত হতে থাকে এবং নিষিক্ত ডিম্বাণুটি ফলের বৃদ্ধির জন্যে প্রয়োজনীয় অক্সিন সরবরাহ করে এবং ফলটি স্বাভাবিকভাবেই বড় হতে থাকে। কিন্তু অনিষিক্ত ডিম্বাণুর অক্সিন প্রস্তুতির স্বাভাবিক ক্ষমতা না থাকায় গর্ভকোষের বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায় এবং কালক্রমে ফলটি ছোট অবস্থায় শুকিয়ে ঝরে পড়ে। এই সমস্যাটি আজ আধুনিক কৃষকদের আর বিব্রত করতে পারে না। বিটা-ন্যাপ্‌থক্সি অ্যাসেটিক অ্যাসিড (β-Napthoxy acetic acid—50 ppm), অথবা প্যারান্যাপ্‌থক্সি অ্যাসেটিক অ্যাসিড (15 ppm) অথবা α-o-chloraphenoxy propionic acid (40 ppm)-এর জলীয় দ্রবণ সময়মত স্প্রে করলে অনুপযুক্ত পরিবেশেও গাছে ফুল ও ফল ধরে।

আবার ঐ সব দেশে বিরাটকায় কাঁচের ঘরে নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে টোম্যাটো চাষ করে উপরিউক্ত সমস্যাটি সমাধানের চেষ্টাও চলছে। অবশ্য এই সঙ্গে অন্য আর একটি সমস্যা আবির্ভূত হয়েছে, তা হলো কাচের ঘরের মধ্যে স্বাভাবিক বায়ু চলাচল না থাকায় এক ফুলের পরাগরেণু অন্য ফুলের গর্ভমুখে পতিত হবার (Cross pollination) সম্ভাবনা খুবই কমে যায়। পরাগ-সংযোগ ব্যতিরেকে সাধারণতঃ গাছে ফল ধরে না বা ফল ধরলেও বীজের অত্যল্পতাহেতু ফলের আকার অত্যন্ত ছোট হয়। এই ক্ষেত্রেও অক্সিন ব্যবহার করে বিনা পরাগ-সংযোগে নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে বীজহীন ফল পাওয়া সম্ভব হচ্ছে।

গাছ থেকে অকালে ফলের পতন রোধ—আপেল, ন্যাসপাতি, অ্যাপ্রিকট ও লেবু বাগানের অন্যতম মুখ্য সমস্যা হলো এই যে, সম্পূর্ণরূপে পরিপক্ব হবার পূর্বেই বেশ কিছু ফল গাছ থেকে ঝরে যায়। অনেক সময় 30-50 ভাগ ফল অসময়ে ঝরে যাওয়ায় ফলন উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায়। গাছ থেকে ফল ঝরে যাবার সময় দেখা যায় যে, গাছের শাখার সঙ্গে ফলের বোঁটা যেখানে সংযুক্ত থাকে, সেখানে অ্যাবসিসন স্তর (Abscission layer) নামে একটি কোষস্তরের সৃষ্টি হয়। ঐ স্তরটি অসংখ্য ক্ষুদ্রকায় কোষের সমষ্টি এবং কোষগুলি পরস্পরের সঙ্গে অত্যন্ত আলগাভাবে সন্নিবিষ্ট থাকে, যার ফলে বায়ু-

প্রবাহের বেগ প্রবল হলে অথবা অনেক সময় আপনার ভারে ফলগুলি সহজেই স্থানচ্যুত হয়। এই অ্যাবসিসন স্তরের সৃষ্টি, ফল ও শাখার অক্সিনের পরিমাণের ভারসাম্যের উপর নির্ভর করে। কোন কারণে (যেমন, ডিম্বাণু নিষিক্ত না হলে বা নিষিক্ত ডিম্বাণু নষ্ট হয়ে গেলে বা ঐটি পূর্ণাঙ্গ বীজে পরিণত হলে) ফলের মধ্যে অক্সিনের পরিমাণ কমে গেলে অ্যাবসিসন স্তরের সৃষ্টি ত্বরান্বিত হয় এবং অবশেষে ফলটি ঝরে পড়ে। সিন্থেটিক অর্থাৎ সংশ্লেষিত অক্সিন 2, 4, 5—ট্রাইক্লোরোফেনোক্সি অ্যাসেটিক অ্যাসিড (245—T) বা 2, 4, 5—ট্রাইক্লোরোফেনোক্সি প্রোপিয়োনিক অ্যাসিড (2, 4, 5-TP) একর প্রতি 48 গ্রাম হিসাবে প্রয়োগ করলে অকালে ফলের পতন রোধ হওয়া ছাড়াও ফলের বৃদ্ধি ত্বরান্বিত হয়, আকার বৃদ্ধি পায় এবং ফলের রং ও উৎকর্ষ সাধিত হয়।

ফলের সংখ্যা হ্রাস—অকালে ফল ঝরে যাওয়া যেমন কাম্য নয়, তেমনি কোন কোন গাছে অতিরিক্ত ফল ধরাও বাঞ্ছনীয় নয়। কারণ—(1) অতিরিক্ত ফল ধরলে ফলের আকার হ্রাস পায় ও উৎকর্ষের অবনতি ঘটে, (2) আপেল, অলিভ ইত্যাদি গাছে কোন এক বছর অতিরিক্ত ফল ধরলে পরবর্তী বছরে মোটেই ফল ধরে না বা অত্যন্ত কম ফল ধরে। কিছু দিন আগে পর্যন্ত ছোট থাকাকালীন কিছু কিছু ফল হাত দিয়ে তুলে ফেলে উপরিউক্ত সমস্যাটির মোকবিলা করা হতো। এই ব্যয়বহুল ও সময়সাপেক্ষ পদ্ধতির বিকল্প হিসাবে বর্তমানে আপেল ও ন্যাসপাতি গাছে ন্যাপ্‌থ্যালিন্‌ অ্যাসেটিক অ্যাসিড (NAA) ও ন্যাপ্‌থ্যালিন অ্যাসিটামাইড স্প্রে করে বিশেষ সুফল পাওয়া গেছে।

শস্যক্ষেত্রে আগাছা দমন—শস্যের অন্যতম প্রধান শত্রু হচ্ছে আগাছা। এর প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো—1। এটি শস্যের প্রয়োজনীয় খাদ্যোপাদান ও জল শোষণ করে, 2। শস্যক্ষেত্রে ছায়া সৃষ্টি করে, 3। নানান ধরণের রোগ ও পোকামাড়কে আশ্রয় দেয়, 4। অনেক সময় মূল থেকে ক্ষতিকারক পদার্থ নিঃসৃত করে। ঠিক সময় আগাছা দমন করলে ফলন বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়। প্রধানতঃ হাত দিয়ে বা যন্ত্রপাতির সাহায্যে আগাছা দমন করা হলেও অক্সিনের দ্বারা আগাছা নিয়ন্ত্রণ ক্রমেই বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করছে। এই বিষয়ে 2, 4-ডাইক্লোরোফেনোক্সি অ্যাসেটিক অ্যাসিডের (2, 4-D) ভূমিকা সর্বাগ্রগণ্য। আগাছা নিয়ন্ত্রণে 2, 4-D-এর একটি বিশেষ নির্বাচনী ক্ষমতা রয়েছে, যার জন্যে এর প্রয়োগে সরু পাতার গাছ, যেমন—ধান, গম, যব প্রভৃতি শস্যের কোন ক্ষতি হয় না, কিন্তু চওড়া পাতার গাছ সহজেই আক্রান্ত হয়। 2,4-D-র আগাছা নিয়ন্ত্রণ-প্রক্রিয়া সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকেরা বিভিন্ন মত পোষণ করেন। বহুল প্রচলিত অভিমত হলো—1। এটি উদ্ভিদের শ্বাসক্রিয়ার গতি অস্বাভাবিকভাবে বাড়িয়ে দেয়, ফলে উদ্ভিদ-কোষে শর্করাজাতীয় খাদ্য সঞ্চয়ের ঘাটতি হয়ে পড়ে 2। এই পদার্থটি দ্বিবীজপত্রী গাছের ক্যাম্বিয়াম টিস্যুর অনিয়মিত বৃদ্ধিতে সাহায্য করায় ফ্লোয়েম টিস্যু নষ্ট হয়ে যায়, 3। এটি কোষের প্রোটিন বস্তুর অহেতুক বিশ্লেষণে সহায়তা করে, ফলে সাইটোপ্লাজমের ঘনত্বের হেরফের হয় এবং প্রয়োজনীয় এন্‌জাইম ধ্বংস হয়ে যায় বা এর কর্মক্ষমতা হ্রাস পায় এবং 4। এটি উদ্ভিদের দেহে পটাসিয়াম ও ফস্‌ফরাসের স্বাভাবিক বিপাকক্রিয়ায় বাধা দেয় এবং বিশৃঙ্খল বিপাকক্রিয়ার জন্যে বিষাক্ত পদার্থের সৃষ্টি হয়। এযাবৎ সংগৃহীত তথ্য থেকে একথা সুনিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, উপরিউক্ত কারণগুলি একক বা সম্মিলিতভাবে 2,4-D-এর আগাছা দমন ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রিত করে, যা আবার উদ্ভিদের প্রকার ভেদ, এর বয়স, অক্সিন প্রয়োগের

মাত্রা, পারিপার্শ্বিক অবস্থা ইত্যাদির উপর নির্ভরশীল।

শাখা কলমের দ্বারা গাছের সংখ্যা-বৃদ্ধি—গাছের বংশ বা সংখ্যা-বৃদ্ধি প্রধানতঃ বীজের দ্বারা হয়। তবে এর একটা অসুবিধা হলো এই যে, বীজ থেকে উদ্ভূত গাছটি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জন্মদাতা গাছের বৈশিষ্ট্য ধারণ করে না। বীজ ছাড়া গাছের বংশ বা সংখ্যা-বৃদ্ধির সহজতম উপায় হলো কলমের সাহায্য নেওয়া। তবে কিছু কিছু গাছের কলমে সহজে শিকড় বের হয় না। উদ্যান-বিশারদগণই ইণ্ডোল বিউটিরিক অ্যাসিড (Indole butyric acid) ও ন্যাপ্থ্যালিন অ্যাসেটিক অ্যাসিড এবং এই দুটি অক্সিনের মিশ্রণ বিভিন্ন গাছের শাখা কলমে ব্যবহার করে বিশেষ সুফল পেয়েছেন। অক্সিন ব্যবহারের প্রধান প্রধান সুবিধাগুলি হলো এই যে, 1। এতে শিকড়ের বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করবার সময় ও অর্থের সাশ্রয় হয়, 2। প্রায় সব কলমেই শিকড় বের হয়, 3। প্রতিটি কলমে অসংখ্য ছোট ছোট শিকড় বের হয়, যেগুলি গাছের পরবর্তী বৃদ্ধির জন্যে বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়। অক্সিন কিভাবে শাখা কলমে শিকড় বের হতে সাহায্য করে, সে সম্পর্কে বিশেষ কিছু এখনও জানা যায় নি। বিভিন্ন গবেষণার ফল থেকে শুধু এটুকুই বলা যায় যে, অক্সিন শাখা কলমের শর্করা ও নাইট্রোজেনঘটিত খাদ্যবস্তুর সঙ্গে জটিল যৌগিক বিক্রিয়ার সূচনা করে, যার ফলে প্রথমে ক্যালাস টিস্যু ও পরে ঐ ক্যালাস টিস্যু থেকে শিকড় নির্গত হয়।

পশ্চিম আফ্রিকা ও পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে কোকো গাছের শাখা কলমে IBA ও NAA-মিশ্রণ ব্যাপক হারে ব্যবহৃত হচ্ছে। রবার, কফি 364 ইত্যাদির শাখা কলমেও অক্সিনের ব্যবহার ক্রমেই জনপ্রিয়তা অর্জন করছে।

উপরে বর্ণিত বিষয়গুলি ছাড়াও আরও অনেক ক্ষেত্রে অক্সিন ব্যবহৃত হচ্ছে, যেমন—সংরক্ষণ-কালে আলু, পেঁয়াজ ইত্যাদির অঙ্কুরোদ্গম বন্ধ করা এবং অঙ্কুরের সুপ্তিকাল প্রলম্বিত করা, ক্রীষ্টমাস গাছের পাতার পতন রোধ, নেবু, বীজহীন আঙ্গুর, ষ্ট্রবেরি ইত্যাদির ফলের আকার বৃদ্ধি ইত্যাদি।

উপসংহার—কৃষি-সমস্যার সমাধানে অক্সিনের ভূমিকা নিয়ে এই পর্যন্ত যে আলোচনা করা গেল, তা মূলতঃ শীতপ্রধান দেশের ফসলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। গ্রীষ্মপ্রধান দেশের ফসলের উপর এর প্রভাব নিয়ে বিশেষ গবেষণা হয় নি। তাই এর প্রয়োগও এই সব দেশে সীমিত। আম ও লিচু আমাদের পরিচিত ফলগুলির মধ্যে অন্যতম, বিশেষ করে আম স্বাদে ও গন্ধে অতুলনীয়। তবে আপেলের মত এরও সমস্যা হলো এক বছর প্রচুর আম ফলে এবং পরবর্তী বছরে মোটেই আম ফলে না বা অত্যন্ত কম ফলে। তাছাড়া অকালে আম ঝরে যাবার সমস্যাও রয়েছে। আম, লিচু ও পেয়ারা গাছের আর একটা সমস্যা হলো—বীজ থেকে জন্মানো গাছ সাধারণতঃ জন্মদাতা গাছের সব বৈশিষ্ট্য ধারণ করে না ও নিকৃষ্ট ধরণের ফল দেয়। আবার ঐ সব গাছের শাখা থেকে কলম করাও যায় না, কারণ ঐ কলমে সহজে শিকড় বের হয় না। এই সম্পর্কে বিশদ গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে।

অক্সিন ছাড়া আরও দুটি উদ্ভিদ-হর্মোন—জিবারেলিন ও কাইনেটিন নিয়েও ব্যাপক গবেষণা সুরু হয়েছে এবং উদ্ভিদের জীবনকালে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় এই দুটির বিশেষ প্রভাব লক্ষ্য করা গেছে। ভবিষ্যতে হয়তো এমন দিন আসবে, যখন এর সাহায্যে খাদ্য-সমস্যার যথার্থ সমাধান করা সম্ভব হবে।

ট্রেসার পদ্ধতি

মিহিরকুমার কুণ্ডু*

ট্রেসার বা আইসোটোপীয় পদ্ধতি অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ। বিজ্ঞানের অজস্র সমস্যার সহজ অথচ সুনিশ্চিত সমাধানে এর অবদান অনন্য-সাধারণ। জীব-বিজ্ঞান, শারীর-বিজ্ঞান, রসায়ন-বিজ্ঞান, পদার্থ-বিজ্ঞান প্রভৃতি বিজ্ঞানের বিবিধ শাখার উন্নতিতে এর ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিশেষতঃ জীব-বিজ্ঞান ও রসায়ন-বিজ্ঞানের অনেক সমস্যাই অত্যন্ত জটিল, দুরূহ, অথচ সেগুলির গুরুত্ব এবং তাৎপর্য অপরিসীম। এই সব সমস্যাবলীর সুষ্ঠু সমাধান করতে হলে এসম্পর্কে বিশদ জ্ঞান অত্যাবশ্যক। ট্রেসার পদ্ধতির প্রয়োগ করে এই ধরণের অজস্র সমস্যাবলীর উপর আলোকপাত করা সম্ভব হয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে কষ্টসাধ্য এবং সময়সাপেক্ষ পদ্ধতির মাধ্যমে লব্ধ অনেক সিদ্ধান্তের যাথার্থ্য বা অযাথার্থ্য ট্রেসার পদ্ধতির সাহায্যে অনেক সহজে, অনেক দ্রুত এবং সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

ট্রেসার পদ্ধতিতে বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের আইসোটোপসমূহ ভৌত, রাসায়নিক বা জীব-রাসায়নিক পরিবর্তনের পর্যায়বলী সনাক্তকরণে ব্যবহার করা হয়। এটা সম্ভব হয় এগুলির ধর্মের কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের দরুণ। আমরা জানি, মৌলিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশ বা পরমাণু দুটি অংশে বিভক্ত—একটি নিউক্লিয়াস, যার প্রধান কণিকা ধনাত্মক (+) আধানসম্পন্ন প্রোটন এবং নিস্তড়িৎ নিউট্রন। পরমাণুর ভর কার্যতঃ এগুলির সম্মিলিত ভরের উপর নির্ভরশীল। নিউক্লিয়াসকে ঘিরে রয়েছে ঋণাত্মক (−) আধানসম্পন্ন ইলেকট্রনের স্তর। ইলেকট্রনের ভর অত্যন্ত নগণ্য, একটি প্রোটনের ভরের $\frac{1}{1840}$ ভাগ মাত্র। ইলেকট্রন ও প্রোটন, উভয়ের আধানের মান সমান, আবার পরমাণু সামগ্রিকভাবে নিস্তড়িৎ। স্পষ্টতঃই, পরমাণুতে ইলেকট্রন ও প্রোটনের সংখ্যা সমান। পরমাণুর রাসায়নিক ধর্ম মূলতঃ ইলেকট্রনের সংখ্যা ও বিন্যাসের উপর নির্ভরশীল। আইসোটোপগুলির প্রোটন ও ইলেকট্রনের সংখ্যা সমান, কিন্তু নিউট্রনের সংখ্যা বিভিন্ন, অর্থাৎ এগুলির রাসায়নক ধর্মাবলী অভিন্ন। ভৌত, রাসায়নিক বা জীব-রাসায়নিক পরিবর্তনে এগুলি অবিকল একইভাবে ব্যবহার করে, পার্থক্য কেবল পরমাণুর ভরে। কোন কোন আইসোটোপ আবার অস্থায়ী, এগুলির সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এগুলি তেজস্ক্রিয় রশ্মি, যথা—আল্ফা, বিটা এবং গামারশ্মি বিকিরণ করে। স্পষ্টতঃই, স্থায়ী আইসোটোপগুলির পরমাণুর ভরের বিভিন্নতা পরিমাপ করে এবং তেজস্ক্রিয়তার সাহায্যে অস্থায়ী বা তেজস্ক্রিয় আইসোটোপগুলিকে চিহ্নিত করা যায়। ফলে বিশেষ মৌল বা যৌগের সঙ্গে চিহ্নিত আইসোটোপটি মিশিয়ে ভৌত বা রাসায়নিক পরিবর্তনের বিভিন্ন পর্যায়ে মৌল বা যৌগটির পরিবর্তন অনুধাবন বা অনুসরণ করা সহজেই সম্ভব। বস্তুতঃ এই ভাবে বিজ্ঞানীরা বহু জটিল রাসায়নিক বা জীব-রাসায়নিক প্রক্রিয়ার বিভিন্ন পর্যায় সম্পর্কে সুনিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সক্ষম হয়েছেন। চিহ্নিত মৌলটি অত্যল্প পরিমাণে উপস্থিত থেকে ভৌত বা রাসায়নিক প্রক্রিয়ার বিভিন্ন পর্যায়বলী অনুসরণ ও নির্দেশ করে বলে একে ট্রেসার

*ফলিত রসায়ন বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

মৌল (Tracer element) এবং এই পদ্ধতিকে ট্রেসার পদ্ধতি নামে অভিহিত করা হয়। এটি একটি আলট্রামাইক্রো পদ্ধতি অর্থাৎ এই পদ্ধতির সাহায্যে অবিশ্বাস্য রকম স্বল্পপরিমাণ পদার্থের সনাক্তকরণ সম্ভব। কোন কোন ক্ষেত্রে এই পদার্থের পরিমাণ 10^{-10} গ্র্যাম পর্যন্ত হতে পারে।

সাধারণতঃ কিভাবে কোন নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত আইসোটোপ অনুসন্ধের পদার্থের কোন বিশেষ স্থানে স্থাপিত করা হয়—একটি উদাহরণের সাহায্যে তা দেখানো যায়। একটি কার্বন যৌগের বিষয় কল্পনা করা যাক, যার মধ্যে একাধিক কার্বন পরমাণু রয়েছে, যেমন—অ্যাসেটিক অ্যাসিড, $CH_3 \cdot COOH$। এর মিথাইল ($\underline{C}H_3$) পুঞ্জে রয়েছে একটি কার্বন পরমাণু আর দ্বিতীয়টি রয়েছে কার্বক্সিল ($-\underline{C}OOH$)—পুঞ্জে। মিথাইল বা কার্বক্সিল বা উভয় পুঞ্জের C নিম্নলিখিত বিক্রিয়ার সাহায্যে চিহ্নিত আইসোটোপ $\overset{*}{C}$-এর (এখানে $\overset{*}{C}$ বলতে C-14 অর্থাৎ 14 পরমাণুভর বিশিষ্ট তেজস্ক্রিয় কার্বন পরমাণু বোঝানো হচ্ছে) দ্বারা প্রতিস্থাপিত করা যায়:

(i)
$$Ba\overset{*}{C}O_3 \xrightarrow{\text{অ্যাসিড}} \overset{*}{C}O_2 \xrightarrow[\text{বিজারণ}]{H_2/\text{ অনুঘটক}} \overset{*}{C}H_3OH \xrightarrow{P/I_2} \overset{*}{C}H_3I$$
$$\xrightarrow{NaCN} \overset{*}{C}H_3CN \xrightarrow[\text{আর্দ্র বিশ্লেষণ}]{H_2O} \overset{*}{C}H_3\ COOH$$

(ii)
$$\overset{*}{C}O_2 \xrightarrow[500^\circ C]{NH_3+K} K\overset{*}{C}N \xrightarrow{CH_3I} CH_3\overset{*}{C}N \xrightarrow{H_2O} CH_3.\overset{*}{C}OOH$$

(iii)
$$\overset{*}{C}H_3I+K\overset{*}{C}N \longrightarrow \overset{*}{C}H_3.\overset{*}{C}N \xrightarrow{H_2O} \overset{*}{C}H_3.\overset{*}{C}OOH$$
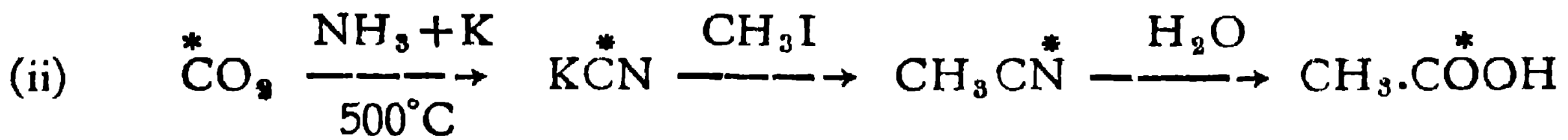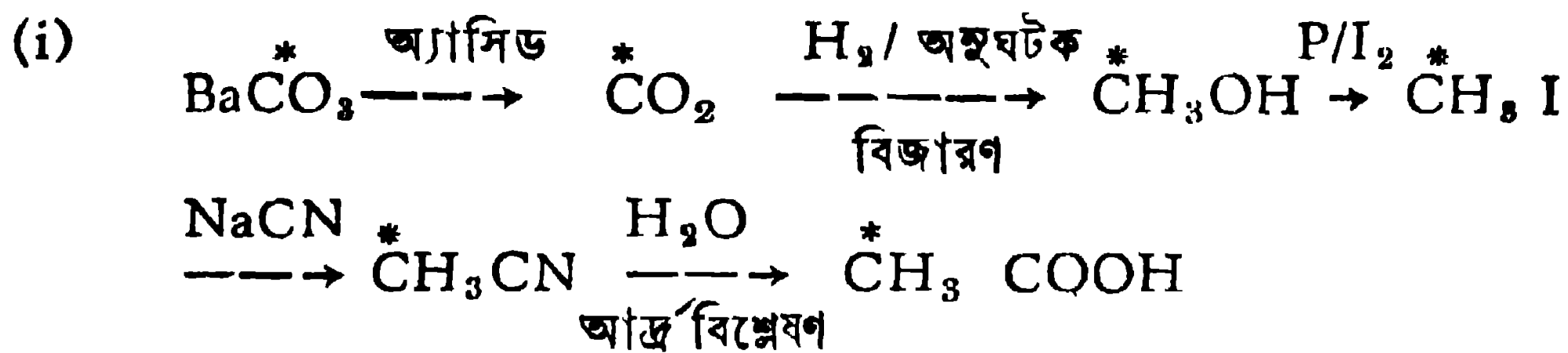
পূর্বেই বলা হয়েছে, এই পরিবর্তনের ফলে যৌগের রাসায়নিক বা জীব-রাসায়নিক ধর্মের কোন ব্যাঘাত বা পরিবর্তন হয় না। ফলে বিক্রিয়াকালে যৌগটির বিভিন্ন অংশের ব্যবহার অপরিবর্তিত থাকবে এবং তেজস্ক্রিয়তার পরিমাপ করে বিক্রিয়ার পর্যায়বলী সহজে অনুসরণ করা যেতে পারে। ধরা যাক, অ্যাসেটিক অ্যাসিড, যার মিথাইল কার্বন চিহ্নিত ($\overset{*}{C}H_3.COOH$) কোন প্রাণীদেহে প্রবেশ করানো হলো। প্রাণীদেহ থেকে নির্গত দ্রব্যের সঙ্গে কার্বন ডাই-অক্সাইড বেরিয়ে আসে। প্রশ্ন হলো, এই কার্বন ডাই-অক্সাইড মিথাইল কার্বন, না কার্বোক্সিল কার্বন থেকে উদ্ভূত? নির্গত কার্বন ডাই-অক্সাইডের কার্বন পরমাণুর তেজস্ক্রিয়তা পরিমাপ করে প্রমাণিত হয়েছে, নিঃসরিত CO_2 কার্বক্সিল কার্বন থেকে উদ্ভূত।

পূর্বে বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল, প্রাণীদেহের ক্ষয় অতি মন্থর গতিতে হয়। জীর্ণ খাদ্য থেকে উদ্ভূত শক্তি প্রাণীকে চলাফেরা প্রভৃতির দরুণ নিত্য-প্রয়োজনীয় শক্তি সরবরাহে সীমিত থাকে, একটি নগণ্য ভগ্নাংশ মাত্র ক্ষয়িত দেহকোষের প্রতিস্থাপনে ব্যয়িত হয়; অর্থাৎ জীব-রাসায়নিক বিক্রিয়াটি মূলতঃ স্থিতিশীল সাম্যাবস্থায় থাকে। সোয়েনহাইমার ও রিতেনবার্গ এবং তাঁর সহকর্মীবৃন্দ 1938 সালে এবং পরবর্তী কালে ডয়টেরিয়াম (হাইড্রোজেনের আইসোটোপ, D বা H-2) এবং N-15 ট্রেসার মৌলরূপে ব্যবহার করে প্রমাণ করেন যে, এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। দেহস্থিত ফ্যাট, প্রোটিন ও কার্বহাইড্রেট এবং খাদ্যের সঙ্গে আগত ফ্যাট, প্রোটিন ও কার্ব-হাইড্রেটের মধ্যে সতত বিনিময় হয়, অর্থাৎ এগুলি গতিশীল সাম্যাবস্থায় থাকে। তিসির তেল

সংক্রান্ত এই বিজ্ঞানীদের পরীক্ষা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিসির তেলের ফ্যাটি অ্যাসিডের অণুগুলি দ্বি বা ত্রি-অসম্পৃক্ত (Di or tri-unsaturated) বন্ধনীসমৃদ্ধ। তাঁরা প্রথমতঃ ডয়টেরিয়ামের সাহায্যে এই ফ্যাটি অ্যাসিডের অণুগুলি আংশিক সম্পৃক্ত করেন। চিহ্নিত ডয়টেরোফ্যাট প্রাণীদের খাওয়াবার পর তাঁরা বিস্মিত হয়ে লক্ষ্য করলেন, প্রাণীদের দেহ থেকে নিঃসৃত ডয়টেরিয়ামের পরিমাণ, খাদ্য (ডয়টেরোফ্যাট) রূপে প্রবিষ্ট ডয়টেরিয়ামের তুলনায় অনেক কম—ডয়টেরিয়ামের বৃহত্তর অংশই দেহস্থিত ফ্যাটের মধ্যে সঞ্চিত হয়। একটি পৃথক পরীক্ষায় বিজ্ঞানীরা খাদ্যের মধ্যে ফ্যাটের পরিমাণ কমিয়ে দিলেন। উদ্দেশ্য হলো—প্রয়োজনীয় শক্তির জন্যে প্রাণী যেন দেহস্থিত ফ্যাট ব্যবহার করতে বাধ্য হয়। এক্ষেত্রে তাঁরা লক্ষ্য করলেন, ডয়টেরোফ্যাট প্রধানতঃ দেহস্থিত ফ্যাটের অন্তর্ভুক্ত হয়, সঙ্গে সঙ্গে ব্যয়িত হয় না। কিন্তু স্বাভাবিক (চিহ্নিত নয়) ফ্যাট খাওয়ানো আরম্ভ করবার পর দেখা গেল, দেহস্থিত চিহ্নিত ফ্যাটের পরিমাণ ধীরে ধীরে কমতে আরম্ভ করে। ডয়টেরিয়াম প্রধানতঃ D_2O (ভারী জল) বা DHO (ভারী ও সাধারণ জলের সংমিশ্রণ) রূপে নিঃসরিত হয়। স্বাভাবিক খাদ্যের সঙ্গে প্রয়োজনীয় জলের পরিবর্তে যদি ভারী জল সাধারণ জলের (H_2O) সঙ্গে এমন অনুপাতে মেশানো হয় যে, দেহস্থিত ডয়টেরিয়াম এবং খাদ্যের সঙ্গে আগত ডয়টেরিয়ামের মধ্যে সমতা রক্ষিত হয়, তাহলে কিন্তু দেহস্থিত ফ্যাটে যে পরিমাণে ডয়টেরিয়াম বৃদ্ধি পায়, ঠিক সেই পরিমাণে দেহে সঞ্চিত ডয়টেরোফ্যাট থেকে ডয়টেরিয়াম হ্রাস পায়। এই সব পরীক্ষা থেকে সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায়, প্রাণীদেহে জল ও ফ্যাটের মধ্যে গতিশীল সাম্যাবস্থা বর্তমান। হাইড্রোজেন বা ডয়টেরিয়াম ত্যাগ করে সম্পৃক্ত ফ্যাট অসম্পৃক্ত হয়, পক্ষান্তরে জল থেকে হাইড্রোজেন বা ডয়টেরিয়াম গ্রহণ করে অসম্পৃক্ত ফ্যাট সম্পৃক্ত হয়।

পরবর্তীকালে প্রমাণিত হয়েছে যে, এই ধরণের গতিশীল সাম্যাবস্থায় কেবলমাত্র এক-অসম্পৃক্ত বন্ধনীযুক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড অংশগ্রহণ করে। অধিকতর অসম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড, যথা—লিনোলিক বা লিনোলেনিক অ্যাসিড এই ভাবে সম্পৃক্ত হয় না বা সম্পৃক্ত ফ্যাট থেকে উৎপন্ন হয় না অর্থাৎ দেহ এগুলির সংশ্লেষণে অক্ষম। খাদ্যের সঙ্গে এগুলিকে অবশ্যই সরবরাহ করতে হবে। এই জন্যে এই ধরণের অ্যাসিডগুলিকে অপরিহার্য ফ্যাটি অ্যাসিড বলা হয়।

সোয়েনহাইমার এবং রিত্তেনবার্গের অ্যামিনো অ্যাসিড সংক্রান্ত পরীক্ষার ফলও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এঁরা অ্যামিনো ($-NH_2$) পুঞ্জের নাইট্রোজেন N-15 আইসোটোপ দিয়ে প্রতিস্থাপিত করে কতকগুলি অ্যামিনো অ্যাসিড তৈরি করেন। অতঃপর খাদ্যের সঙ্গে এই সব চিহ্নিত অ্যামিনো অ্যাসিড প্রাণীদের খাওয়ানো হয়। তাঁরা লক্ষ্য করলেন, খাদ্যের অ্যামিনো অ্যাসড সরাসরি এবং দ্রুত দেহস্থিত প্রোটিনের (প্রোটিন একাধিক অ্যামিনো অ্যাসিডের রাসায়নিক সমন্বয়ে তৈরি একটি জটিল জৈব যৌগ) অন্তর্ভুক্ত হয়, তাছাড়া জীব-রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রোটিনের এক অ্যামিনো অ্যাসিড থেকে অন্য অ্যামিনো অ্যাসিডে অ্যামিনো নাইট্রোজেনের ($-NH_2$) স্থান বিনিময় হয়। এর একমাত্র ব্যতিক্রম অপরিহার্য অ্যামিনো অ্যাসিড লাইসিন।

প্রাণীদেহের অণু-পরমাণু সতত পরিবর্তনশীল। খাদ্যরূপে আগত মৌলিক কণার সঙ্গে দেহস্থিত সদৃশ মৌলিক কণার অবিরাম বিনিময় চলছে। এই বিনিময় ফস্ফরাস এমন কি, অস্থি-র ক্যালসিয়ামের সঙ্গেও হয়ে থাকে। এই ভাবে কালক্রমে প্রাণীর দেহকোষ নতুন নতুন মৌলিক

কণার সমন্বয়ে কার্যতঃ সম্পূর্ণ নতুনভাবে তৈরি হয়। দেহস্থিত লৌহকণিকা কিন্তু সাধারণভাবে বিনিময় বিমুখ। তেজস্ক্রিয় লৌহ (Fe-59) প্রয়োগ করে দেখা গেছে, এর একটি নগণ্য অংশমাত্র রক্তের লৌহ-কণিকার অন্তর্ভুক্ত হয়। কেবলমাত্র রক্তে লৌহের পরিমাণ হ্রাস পেলে দেহ বহিরাগত লৌহকণিকা গ্রহণ করে। ট্রেসার পরীক্ষায় জানা গেছে, শরীরের মধ্যে লৌহ ফেরিটিন নামে লৌহ প্রোটিনের জটিল যৌগরূপে সঞ্চিত থাকে এবং এই যৌগটি নির্দিষ্ট পরিমাণে থাকে। শরীরের মধ্যে লৌহ যতই প্রবেশ করানো হোক না কেন, ফেরিটিন এই সীমা ছাড়িয়ে যায় না। কখনো যদি কোন কারণে ফেরিটিনের পরিমাণ নির্দিষ্ট সীমার নীচে নেমে যায়, যেমন—গর্ভাবস্থায় বা দ্রুত বৃদ্ধিকালে, যখন শরীর হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, তখনই কেবল দেহ লৌহ গ্রহণ করে। এই অবস্থায় শরীরে লৌহের যোগান দেওয়া বিশেষ আবশ্যক।

অনেক জটিল রোগ নির্ণয়ে ট্রেসার পদ্ধতি অপরিহার্য। এর একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ—রক্তের ব্যাহত সঞ্চালন ও দায়ী অংশটির অবস্থান নির্ণয়ে তেজস্ক্রিয় সোডিয়াম পরমাণুর (Na-24) প্রয়োগ। Na-24 চিহ্নিত খুব সামান্য পরিমাণ লবণজল রোগীর হাতের শিরায় প্রবেশ করানো হয়। এরপর একটি তেজস্ক্রিয়তা পরিমাপক যন্ত্র (এক্ষেত্রে গামারশ্মি পরিমাপক যন্ত্র) পায়ের পাতা সংলগ্ন করে স্থাপিত করা হয়। রক্ত-সঞ্চালন স্বাভাবিক হলে সত্বর পায়ের পাতায় তেজস্ক্রিয়তা ধরা পড়বে এবং এর পরিমাণ দ্রুত বৃদ্ধি পেয়ে সর্বোচ্চ মানে পৌঁছুবে। কিন্তু যদি রক্ত-সঞ্চালন ব্যাহত হয়, তাহলে এই প্রক্রিয়াটি মন্থর গতিতে অগ্রসর হবে। তেজস্ক্রিয়তা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাবে। পরিমাপক যন্ত্রটি শরীরের বিভিন্ন অংশের সান্নিধ্যে স্থাপন করে ব্যাহত সঞ্চালনের প্রকৃত অবস্থানটি নির্ণয় করে চিকিৎসা করা সম্ভব। এই একই প্রক্রিয়ায় হৃৎপিণ্ডের রক্ত-সঞ্চালন বা রক্ত-সঞ্চালনে কোন অস্বাভাবিকতা থাকলে, তা নির্ধারণ করা যায়। এক্ষেত্রে তেজস্ক্রিয়তা পরিমাপক যন্ত্রটি বুকের উপর বা সান্নিধ্যে স্থাপন করা হয় আর সঙ্গে সংযুক্ত থাকে একটি স্বয়ংক্রিয় লেখনীযন্ত্র। ফলে সঙ্গে সঙ্গে সম্পূর্ণ সঞ্চালন-প্রক্রিয়াটির একটি স্বয়ংক্রিয় লেখ (Graph) তৈরি হয়ে যায়।

কোন কোন যৌগের কয়েকটি বিশেষ স্বাভাবিক এবং অস্বাভাবিক বা আক্রান্ত টিস্যুতে সঞ্চিত হবার প্রবণতা দেখা যায়। এই বিশেষ প্রবণতার সুযোগ নিয়ে এই সব যৌগের তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের সাহায্যে শরীরে অনেক জটিল, দুর্নির্ণেয় রোগের, যথা—ক্যান্সার, টিউমার প্রভৃতির অস্তিত্ব এবং অবস্থান নির্ণয় করা যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে—মস্তিষ্কে টিউমার হলে তার অস্তিত্ব বা নির্ভুল অবস্থান নির্ণয়ে সাধারণ প্রচলিত পদ্ধতি প্রায় অসহায়। এই সব ক্ষেত্রে মার্কারি-203 চিহ্নিত নিওহাইড্রিন বা গ্যালিয়াম-68 চিহ্নিত ইথিলীন ডাইঅ্যামিন টেট্রা অ্যাসেটিক অ্যাসিডের জটিল যৌগ প্রয়োগ করে আশ্চর্য ফল পাওয়া গেছে। উপযুক্ত তেজস্ক্রিয়তা নির্ধারক যন্ত্রের সাহায্যে স্বয়ং তেজস্ক্রিয়তা লেখ (Radioautography বা autoradiography) বা তেজস্ক্রিয়তার আলোকচিত্র তুলে টিউমারের অস্তিত্ব ও নির্ভুল অবস্থানের সংশয়াতীত, প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া সম্ভব।

কোষ-জীববিদ্যার ক্ষেত্রেও ট্রেসার পদ্ধতির অবদান কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। দেহের কোষ দুটি অবিকল সদৃশ কোষে বিভক্ত হতে পারে বলেই প্রাণীদেহের বৃদ্ধি ও ক্ষয়িত টিস্যুর প্রতিস্থাপন সম্ভব। কোষের এই বিভাজন জীব-বিজ্ঞানে মাইটোসিস নামে পরিচিত। প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ হতে একটি নির্দিষ্ট সময় লাগে; সময়কাল প্রাণী ও কোষের প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। প্রত্যেকটি কোষে ডিঅক্সিরিবোনিউক্লিক অ্যাসিড বা

সংক্ষেপে ডি. এন. এ. থাকে। ডি. এন. এ. কোষের নিউক্লিয়াসে থাকে। প্রাণীর বংশধারা অর্থাৎ বংশপরম্পরায় যে সাদৃশ্য দেখা যায়, তার সূত্র এই ডি. এন. এ. নিয়ন্ত্রণ করে। কোষের অ্যামিনো অ্যাসিড থেকে বিভিন্ন প্রোটিন সংশ্লেষণের সূত্রাবলীও এদের নিয়ন্ত্রণে। ডি. এন. এ. অণুগুলির একটি একক বৈশিষ্ট্য—এগুলির মধ্যে থাইমিন নামে একটি নাইট্রোজেনঘটিত জৈব ক্ষারক অবশ্যই থাকবে। থাইমিনের একটি হাইড্রোজেন পরমাণু তেজস্ক্রিয় ট্রাইসিয়াম (হাইড্রোজেনের আইসোটোপ T বা H-3) দিয়ে প্রতিস্থাপিত করে ডি. এন. এ. চিহ্নিত করা যায়। মাইটোসিসের প্রাক্কালে কোষের ডি. এন. এ.-এর সংখ্যা দ্বিগুণ হয়। এই জন্যেই নবজাত কোষ ও মাতৃকোষে (সৃজনের অব্যবহিত পরে) ডি. এন. এ.-এর সংখ্যা সমান থাকে। প্রত্যেক কোষই মাইটোসিসে সক্ষম নয়। কোন্ কোষ মাইটোসিসে সক্ষম, আর কোন্ কোষ নয়—চিহ্নিত ডি. এন. এ. ব্যবহার করে তা জানা গেছে। এই ট্রেসার পরীক্ষায় আরো জানা গেছে যে, সুস্থ টিস্যুর ক্ষেত্রে প্রতি 100টি সুষ্ঠ কোষের মধ্যে প্রায় 50টির বিভাজন হয়। এর ফলে প্রাণীদেহে কোষের সংখ্যা অপরিবর্তিত থাকে। কিন্তু ক্যান্সার-আক্রান্ত কোষ অস্বাভাবিক দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পায়। এর কারণ, এই সব ক্ষেত্রে অনেক বেশী সংখ্যক কোষের মাইটোসিস হয় এবং মাইটোসিস প্রক্রিয়ার সময়কালের কিন্তু কোন হেরফের হয় না। সুস্থ পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির ক্ষেত্রে ক্ষয়িত টিস্যু প্রতিস্থাপিত করতে শতকরা প্রায় তিনটি কোষের মাইটোসিস হয়।

ট্রেসার পদ্ধতি প্রয়োগ করে উদ্ভিদের আলোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার পর্যায়বলীর উপর উল্লেখযোগ্যভাবে আলোকপাত করা সম্ভব হয়েছে। সূর্যালোকে সবুজ উদ্ভিদ কার্বন ডাই-অক্সাইড এবং জল থেকে জটিল পদার্থ, যথা—সুগার, স্টার্চ, সেলুলোজ প্রভৃতির (সমষ্টিগতভাবে যেগুলির নাম কার্বোহাইড্রেট) সংশ্লেষণ করতে পারে। উদ্ভিদের এই ক্ষমতাকে আলোকসংশ্লেষণ বলা হয়। কার্বোহাইড্রেট তৈরির কালে সর্বদাই অক্সিজেন গ্যাস (O_2) নির্গত হয়। কার্বোহাইড্রেটগুলির মধ্যে সরলতম কার্বোহাইড্রেট—গ্লুকোজ ও ফ্রুকটোজ। দুটিই উদ্ভিদে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। উভয়েরই সাধারণ সঙ্কেত $C_6H_{12}O_6$। আলোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় এগুলির উৎপাদনের সামগ্রিক বিক্রিয়াটি নিম্নোক্তভাবে দেখানো যেতে পারে:

$$6CO_2+6H_2O+\text{শক্তি}\xrightarrow{\text{ক্লোরোফিল}} C_6H_{12}O_6+6O_2$$
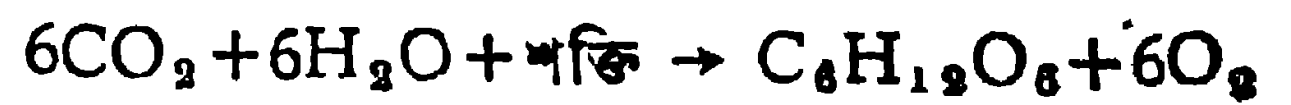
আলোকসংশ্লেষণ ক্রিয়ায় ক্লোরোফিল অপরিহার্য। এর অনুপস্থিতিতে আলোকসংশ্লেষণ হয় না। প্রশ্ন হচ্ছে, নির্গত O_2, CO_2 না H_2O থেকে উদ্ভূত? 1941 সালে মার্কিন বিজ্ঞানী এস. রুবেন ও তাঁর সহকর্মিগণ তেজস্ক্রিয় অক্সিজেন-18 চিহ্নিত কার্বন ডাই-অক্সাইড বা জল ব্যবহার করে দেখান যে, নির্গত অক্সিজেন জল থেকে উৎপন্ন। তাঁরা তেজস্ক্রিয় কার্বন-14 ব্যবহার করে কার্বন ডাই-অক্সাইড থেকে কার্বোহাইড্রেট সংশ্লেষণের বিভিন্ন রাসায়নিক পর্যায়ের উপরও আলোকপাত করেন। তাঁদের গবেষণা থেকে আরো প্রমাণিত হয়েছে যে, আলোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় কেবলমাত্র কার্বোহাইড্রেটই উৎপন্ন হয় না, কার্বোহাইড্রেট নিঃসন্দেহে মুখ্য পদার্থ, কিন্তু এই প্রক্রিয়ায় অ্যামিনো অ্যাসিড এবং ফ্যাটও কিয়ৎ পরিমাণে তৈরি হয়।

বিশুদ্ধ রসায়নে কোন বিশেষ বিক্রিয়ার গতিপথ সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হতে ট্রেসার পদ্ধতির প্রয়োগ বহুল প্রচলিত। উদাহরণ স্বরূপ অ্যাসিড ও অ্যালকোহলের মধ্যে বিক্রিয়ার ফলে এস্টার তৈরির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

কৃষিক্ষেত্রেও ট্রেসার পদ্ধতির উপযোগিতা

উল্লেখযোগ্য। গাছপালার বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করতে এবং তাদের সতেজ ও পুষ্ট করতে প্রায়ই মাটিতে ফস্‌ফরাস সার ব্যবহার করা হয়। বিভিন্ন প্রকারের ফস্‌ফরাস সার পাওয়া যায়। কোন বিশেষ জমিতে কোন্ ধরণের ফস্‌ফরাস সার সবচেয়ে উপযোগী, তা সব সময় স্পষ্ট নয়। গাছ কতটা ফস্‌ফরাস গ্রহণ করেছে, রাসায়নিক বিশ্লেষণ করে তা নির্ণয় করা যায়, কিন্তু এই ফস্‌ফরাসের কতটা মাটি থেকে আর কতটা সার থেকে এসেছে, তা বলা অসম্ভব। তেজস্ক্রিয় ফস্‌ফরাস চিহ্নিত সার ব্যবহার করে এই পার্থক্য বা কোন বিশেষ সারের কার্যকারিতা নির্ধারণ করা যায়।

গাছের ক্লোরোফিলে কোন লৌহ নেই, কিন্তু এর উৎপাদনে লৌহের উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজন। মাটিতে এর পরিমাণ কম হলে গাছ ক্লোরোসিস রোগে আক্রান্ত হয়। ক্লোরোফিলের উৎপাদন ব্যাহত হওয়ায় পাতার রং সবুজ না হয়ে হলদে হয়, আলোকসংশ্লেষণ-ক্রিয়াও হ্রাস পায়। আবার কখনো কখনো জমিতে লৌহ উপযুক্ত পরিমাণে থাকা সত্ত্বেও গাছের ক্লোরোসিস হতে দেখা যায়। ট্রেসার পরীক্ষায় এই সব ক্ষেত্রে জমিতে এক বা একাধিক এমন সব যৌগের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়েছে, যেগুলি গাছের লৌহ গ্রহণে ব্যাঘাত ঘটায়।

শিল্পেও তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের প্রভূত প্রয়োগ লক্ষণীয়। কয়লার মধ্যে গন্ধক থাকে। গন্ধক জৈব যৌগ আর অজৈব যৌগ সাধারণতঃ পাইরাইট (FeS_2) রূপে থাকে। কয়লা থেকে কোক তৈরির কালে এই গন্ধকের কিছু অংশ সালফার ডাই-অক্সাইডরূপে বেরিয়ে যায়, অবশিষ্টাংশ কোকের অন্তর্ভুক্ত হয়। গন্ধকের কোন্ অংশ বেরিয়ে যাবে বা কোন্ অংশ কোকের মধ্যে থাকবে, তার কি কোন নিশ্চয়তা আছে, অর্থাৎ এর সঙ্গে গন্ধকঘটিত যৌগের প্রকৃতির কোন সম্পর্ক আছে কি? কয়লার মধ্যে তেজস্ক্রিয় গন্ধক চিহ্নিত পাইরাইট ব্যবহার করে দেখা গেছে, কয়লা এবং কোক উভয়ের মধ্যেই জৈব এবং অজৈব যৌগের গন্ধকের অনুপাত সমান অর্থাৎ যৌগের প্রকৃতির সঙ্গে উক্ত প্রক্রিয়ার কোন সম্পর্ক নেই।

কোন বস্তুর প্রাচীনত্ব, যেমন—পৃথিবীর বয়স কত, কোন্ ফসিল কত বছরের পুরনো, কোন্ শিলা কত বছর আগে সৃষ্ট হয়েছিল—তা নির্ণয় করতে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের জুড়ি নেই। এক্ষেত্রে রহস্য সমাধানের সূত্র রয়েছে অনুসন্ধেয় বস্তুতে, কোন বিশেষ তেজস্ক্রিয় মৌলের অর্ধ-জীবনকালের মধ্যে। তেজস্ক্রিয় মৌলের অর্ধ-জীবন (Half life) বলতে বোঝায়, যে সময়ের মধ্যে তেজস্ক্রিয়তার তীব্রতা অর্ধেক হ্রাস পায়। কার্বন-14-এর অর্ধ-জীবন 5730 বছর অর্থাৎ কার্বন-14-এর তেজস্ক্রিয়তার পরিমাণ কোন এক সময়ে ক হলে 5730 বছর পরে এর পরিমাণ হবে ক/2, আরো 5730 বছর পরে তেজস্ক্রিয়তা ঐ বিশেষ সময়ের তুলনায় হবে (ক/2) / 2 বা ক/4 ,—এই ভাবে তেজস্ক্রিয়তা হ্রাস পেতে থাকে। জীবজন্তুর মৃত্যুর পর কার্বন-14 গ্রহণ করবার ক্ষমতা বন্ধ হয়ে যায়। এই সময় প্রতি লক্ষ কোটি কার্বন-12 পরমাণুর সঙ্গে কার্বন-14 থাকে 1টি। সুতরাং কোন প্রাচীন কার্বন যৌগঘটিত বস্তুর কার্বন-14-এর বর্তমান তেজস্ক্রিয়তা পরিমাপ করে 50,000 বছরের মধ্যে সৃষ্ট বস্তুর বয়স নির্ণয় করা সম্ভব। বস্তুতঃ কার্বন যৌগঘটিত বহু বস্তু, যেমন—বহু ফসিলের প্রাচীনত্ব বিজ্ঞানীরা নির্ধারণ করতে সক্ষম হয়েছেন।

অপরাধ ও অপরাধীর সনাক্তকরণেও তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে। এই সব ক্ষেত্রে 1936 সালে জি. হেভেজি এবং এইচ. লেভি প্রবর্তিত তেজস্ক্রিয়তা বিশ্লেষণ পদ্ধতির ব্যবহার বিশেষ প্রচলিত।

পদ্ধতিটির মূল কথা হলো, অনুসন্ধেয় বস্তুর কোন বিশেষ মৌল উপযুক্ত পরমাণু-কেন্দ্রীন বিক্রিয়ার সাহায্যে বা মৌলকণাগুলিকে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপে রূপান্তরিত করা। অতঃপর এই সব তেজস্ক্রিয় আইসোটোপগুলির স্বরূপ ও পরিমাণ বিকিরিত রশ্মি, যথা—বিটা বা গামারশ্মি এবং আইসোটোপগুলির অর্ধ-জীবনকালের সাহায্যে নির্ণয় করা হয়। এর পর নির্দিষ্ট মৌল বা মৌলগুলির পরিমাণ জানা আছে, এমন কোন সদৃশ সুপরিজ্ঞাত বস্তুর সঙ্গে অবিকল একই অবস্থায় তুলনা করে বিশ্লেষ্য অজ্ঞাত পদার্থ সম্পর্কে জ্ঞাতব্য তথ্যাবলী সুনিশ্চিতভাবে জানা সম্ভব। এই পদ্ধতির সাহায্যে জানা গেছে যে, মানুষের চুলও তার আঙ্গুলের ছাপের মতই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। চুলের মধ্যে অত্যল্প পরিমাণে কয়েকটি মৌল থাকে। এগুলির পরিমাণ ও অনুপাত ব্যক্তিবিশেষের উপর নির্ভরশীল। সেন্ট হেলেনা দ্বীপপুঞ্জে নেপোলিয়নের মৃত্যুর পর এই পদ্ধতি প্রয়োগ করে তাঁর মাথার চুলে অস্বাভাবিক পরিমাণ আর্সেনিকের অস্তিত্ব ধরা পড়ে। এথেকে অনেকের সন্দেহ হয় যে, আর্সেনিক-দুষ্ট হয়ে নেপোলিয়ন মারা যান।

মানব কল্যাণে ট্রেসার পদ্ধতি এক বিপুল সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত করেছে। বিজ্ঞানের বিবিধ শাখায় প্রযুক্ত ট্রেসার পদ্ধতি ব্যবহারের অতি সামান্য অংশ এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। নব নব সমস্যার সমাধানে, অপ্রত্যাশিত জটিলতার গ্রন্থি মোচনে এর উপযোগিতা বলবার অপেক্ষা রাখে না এবং স্পষ্টতঃই ভবিষ্যতেও বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে, মানবের কল্যাণসাধন ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানে এই পদ্ধতি অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করবে।

অবলোহিত রশ্মি

শ্রীপ্রদীপকুমার দত্ত*

সূচনা—তেশিরা কাচে সূর্যের আলো পড়লে সাতটি রঙের সৃষ্টি হয়। এর কারণ সূর্যালোক সাতটি রঙের সমষ্টি। এই সাতটি রং ছাড়া সূর্যালোকের একটা বিরাট অংশ আমাদের চোখের রেটিনার অগোচরে থেকে যায়। কিন্তু অদৃশ্য হলেও এই বিরাট অংশের প্রভাব আমাদের উপর কম নয়। গ্রীষ্মের প্রচণ্ড দাবদাহের জন্যে দায়ী সূর্য থেকে আগত অবলোহিত রশ্মির প্রচণ্ড প্রভাব আমাদের রেটিনায় না থাকলেও ত্বকের উপর যথেষ্ট আছে। অবলোহিত রশ্মিও দৃশ্য আলোকের মতই বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গ। তবে তার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য অপেক্ষাকৃত বেশী এবং এই দৈর্ঘ্য লাল আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য এবং মাইক্রো-তরঙ্গের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের মধ্যবর্তী সীমার মধ্যে অবস্থিত। তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য অনুযায়ী অবলোহিত রশ্মিকে তিনটি অংশে বিভক্ত করা যায়—(1) একটি অংশ, যেটি লালের ঠিক পরেই থাকে, (2) আর একটি অংশ, যেটি মাইক্রো-তরঙ্গের নিকটবর্তী এবং (3) এই দুই-এর মধ্যেকার অংশ।

1800 সালে সার উইলিয়াম হার্সেল একটি সৌর বর্ণালীতে লাল অংশের পাশে একটি কালো অংশ দেখেন। এই অংশটিতে অবস্থিত একটি থার্মোমিটার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা সূচিত করে। এথেকে তিনটি সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায়—(1) দৃশ্য আলোকের

*পদার্থ-বিজ্ঞান বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান।

বর্ণালীর পরে রয়েছে একটি অদৃশ্য বর্ণালী, (2) এই অদৃশ্য বর্ণালীও আলোকের মত কোনও শক্তির প্রকাশ এবং (3) এই বিকিরণ তাপীয় ঘটনার সৃষ্টি করে এবং এর উৎস কোন তাপীয় বস্তু। 75 বছর পরে এই বিকিরণটির নামকরণ করা হয় অবলোহিত বিকিরণ। অবলোহিত রশ্মি আবিষ্কারের পর বহু বছর পর্যন্ত এটি নির্দেশনের কোনও উপযুক্ত উপায় জানা ছিল না। 1917 সালে টি. ডাব্লিউ. কেস আবিষ্কার করেন যে, থ্যালাস সালফাইড কোষের উপর অবলোহিত রশ্মির প্রভাব খুব বেশী। প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের সময় জার্মেনী ও অপর কয়েকটি দেশ সামরিক প্রয়োজনে অবলোহিত রশ্মি ব্যবহারের জন্যে কয়েকটি যন্ত্র তৈরি করে। প্রকৃত পক্ষে দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের পর থেকে অবলোহিত রশ্মির গবেষণা দ্রুত তালে এগিয়ে চলেছে।

উৎস ও প্রকৃতি—অবলোহিত রশ্মির উৎস হলো তাপীয় বস্তু। প্রত্যেক বস্তুই অবলোহিত রশ্মি বিকিরণ করে এবং বিকিরণের পরিমাণ বস্তুর তাপমাত্রার উপর নির্ভরশীল। আবার একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় একটি বিশেষ তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের বিকিরণের শক্তি সর্বোচ্চ হয়। তাপমাত্রা যত কম হয়, এই সর্বোচ্চ শক্তি তত বেশী তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যে পাওয়া যায়। 1নং তালিকা থেকে এটি প্রতীয়মান হবে। তালিকাটি একটি সূত্রের সাহায্যেও প্রকাশ করা যায়। সূত্রটি হলো—$\lambda m = \frac{2897}{T}$, এখানে তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য λ হলো মাইক্রোনে (1 মাইক্রোন $= 10^{-4}$ সেন্টিমিটার) এবং তাপমাত্রা T হলো তাপমাত্রার চরম স্কেলে, λm হলো $T^{\circ}K$ তাপমাত্রায় বিকিরিত অবলোহিত রশ্মির সর্বোচ্চ তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য। অবলোহিত রশ্মির আর একটি ধর্ম হলো বস্তুর তাপমাত্রা যত কম হয়, বস্তু থেকে অবলোহিত রশ্মির বিকিরণ তত বেশী তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য থেকে আরম্ভ হয়। উদাহরণ-স্বরূপ 300°K তাপমাত্রায় বিকিরিত অবলোহিত রশ্মির সর্বনিম্ন তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য হলো 4 মাইক্রোন আর 1000°K তাপমাত্রায় বিকিরিত অবলোহিত রশ্মির ক্ষেত্রে তা হলো 1 মাইক্রোনেরও কম।

1নং তালিকা

তাপমাত্রা (চরম স্কেলে)	নির্গত সর্বোচ্চ তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য (মাইক্রোনে)
11000°	0·45
1000°	3·0
500°	5·0
300°	9·8
373°	7·8
273°	10·5
77°	38·0

তালিকা (1নং) থেকে আরও দেখা যায় যে, বস্তুর তাপমাত্রা যত কমই হোক না কেন, তাথেকে অবলোহিত রশ্মি বিকিরিত হচ্ছে; অর্থাৎ পৃথিবীর, শুধু পৃথিবীরই বা কেন, সমগ্র বস্তুজগতের প্রতিটি বস্তু প্রতিনিয়ত অবলোহিত রশ্মি বিকিরণ করে চলেছে।

নির্দেশন—অবলোহিত রশ্মির নির্দেশন প্রধানতঃ দু-ভাবে করা হয়—(1) তাপীয় উপায়ে ও (2) ফটোনের দ্বারা। তাপীয় উপায়ে অবলোহিত রশ্মি যে তাপ সৃষ্টি করে, তার সাহায্য নেওয়া হয় এবং এদের সাড়া দেবার ক্ষমতা তাদের শক্তি শোষণের ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। থার্মোকাপ্‌ল্, বোলোমিটার প্রভৃতি এই কাজে বহুল ব্যবহৃত হয়। থার্মোকাপ্‌লের একটি জোড়ামুখ বিকিরণের সাহায্যে উত্তপ্ত হলে যে থার্মোবিভবের সৃষ্টি হয়, তার দ্বারা বিকিরণের পরিমাপ করা যায়। বায়ুশূন্য পাত্রে অবস্থিত বিস্‌মাথ্-অ্যান্টিমনি থার্মোকাপ্‌লই সবচেয়ে বেশী ব্যবহৃত হয়।

বোলোমিটারের মূল তত্ত্ব তাপমাত্রার সঙ্গে পদার্থের রোধের পরিবর্তনের মধ্যে নিহিত।

ধাতু এবং অর্ধ-পরিবাহী এই কাজে ব্যবহার করা হয়। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে যন্ত্রটিকে ট্র্যানজিষ্টর বোলোমিটার বলা হয়।

তাপীয় নির্দেশকের সীমাবদ্ধতা হলো—তার সাড়া দেবার দ্রুততা খুব বেশী নয়। এদের সময়-ধ্রুবক হলো কয়েক মিলিসেকেণ্ড।

ফটোনের নির্দেশক যন্ত্রের সাড়া দিবার দ্রুততা অপেক্ষাকৃত বেশী এবং এদের সময়-ধ্রুবক কয়েক মাইক্রো সেকেণ্ড হলেও মাত্র কয়েকটি ক্ষেত্রে বর্ণালীর সীমাবদ্ধ অংশে এদের ব্যবহার সীমিত। এই সমস্ত যন্ত্রে অর্ধ-পরিবাহীর উপর অবলোহিত রশ্মির প্রভাব কাজে লাগানো হয়; যথা—ফটো-পরিবাহক, ফটো-ভোল্টাইক ও ফটো-তড়িৎ-চুম্বকীয় ঘটনা।

নিকট অবলোহিত রশ্মির ক্ষেত্রে কম তল-শক্তি (Work function) সম্পন্ন বস্তুর উপর রশ্মি আপাতত হলে বস্তু থেকে ইলেকট্রনের নির্গমন হয় এবং সেই ইলেকট্রনগুলি একটি জিঙ্ক সালফাইডের প্রতিপ্রভ পর্দায় আঘাত করে পর্দার উপর সবুজাভ আলোকের সৃষ্টি করে। এই ধরণের যন্ত্রগুলিকে ইমেজ কনভার্টর বলে। এদের 1·2 মাইক্রোন পর্যন্ত ব্যবহার করা যায়। আরও একটি উপায়ে ফটো-বৈদ্যুতিক ঘটনার সাহায্যে অবলোহিত রশ্মির নির্দেশন সম্ভব। তা হলো—যে ইলেকট্রন-গুলি বস্তু থেকে নির্গত হচ্ছে, সেগুলিকে একত্রিত করে ফটো-তড়িতের পরিমাপ করা। 1·3 মাইক্রোন পর্যন্ত তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের অবলোহিত রশ্মির নির্দেশন ফটোগ্রাফির সাহায্যে করা যায়। অবশ্য এর জন্যে সায়ানিন রঞ্জকের দ্বারা ফটো-গ্রাফিক প্লেটকে বেশী সুগ্রাহী করা প্রয়োজন।

অবলোহিত রশ্মির বিভিন্ন অংশে যে সব নির্দেশক যন্ত্র ব্যবহার করা হয়, তার একটা তালিকা নিয়ে প্রদত্ত হলো।

0·72 মাইক্রোন— 1·5 মাইক্রোন— ফটো-বৈদ্যুতিক কোষ, ডাই-ইলেকট্রিক কোষ, ফটো-গ্রাফিক প্লেট, ইমেজ কনভার্টার টিউব, প্রভিপ্রভ বস্তু এবং লেড সালফাইড কোষ।

1·5 মাইক্রোন—6·0 মাইক্রোন—লেড সাল-ফাইড, লেড সেলেনাইড, ইণ্ডিয়াম অ্যান্টিমোনাইড, লেড টেলুরাইড, ফটো-পরিবাহক, ফটো-ভোল্টাইক ও ফটো-বিদ্যুৎ চৌম্বক নির্দেশক এবং ডপ্‌ড্‌ জার্মেনিয়াম নির্দেশক।

6·0 – 1000 মাইক্রোন—থার্মোকাপ্‌ল্‌, বোলো-মিটার, ডপ্‌ড্‌ জার্মেনিয়াম এবং সিলিকন নির্দেশক।

ব্যবহার—অবলোহিত রশ্মির ব্যবহার মূলতঃ সামরিক প্রয়োজনেই হয়। এর গবেষণা এবং উন্নতিও সামরিক প্রয়োজন মেটাবার তাগিদেই হয়েছে। তবে মানুষের নানাবিধ প্রয়োজনে এর বহুল ব্যবহারও প্রচলিত আছে। সামরিক কার্যে অব-লোহিত রশ্মির ব্যবহারের কারণ প্রধানতঃ দুটি—(1) এটি অদৃশ্য রশ্মি; সুতরাং লক্ষ্যবস্তুর উপর অব-লোহিত রশ্মিপাত করে শত্রুর অগোচরে কোনও বিশেষ ব্যবস্থায় বস্তুটিকে দেখা যেতে পারে। এই ধরণের ব্যবস্থা করা হয় সক্রিয় যন্ত্রে; (2) সমস্ত জিনিষই অবলোহিত রশ্মির উৎস-স্থল একথা আগেই বলা হয়েছে। তাই উপযুক্ত অবলোহিত নির্দেশকের সাহায্যে সামরিক লক্ষ্যবস্তু (যথা—মানুষ, চিম্‌নি, জেট ইঞ্জিন প্রভৃতি) থেকে নির্গত অবলোহিত রশ্মির দ্বারা তাদের সনাক্ত করা যায়। এই ধরণের যন্ত্রগুলিকে নিষ্ক্রিয় বলা হয়।

শত্রুর অবস্থান নির্ণয়ে আজ রেডারের সঙ্গে সঙ্গে অবলোহিত রশ্মির ব্যবহার খুবই গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে এবং অনেক ক্ষেত্রে অবলোহিত রশ্মি রেডার অপেক্ষা বেশী কৃতিত্বের অধিকারী। রেডারের মত এই সব অব-লোহিত রশ্মির যন্ত্রের কোনও সর্বনিম্ন দূরত্বের সীমা-বদ্ধতা নেই। এদের ব্যবহারও রেডার অপেক্ষা অনেক সহজ ও সরল। এর বিশ্লেষণী ক্ষমতা

রেডার অপেক্ষা বেশী, অথচ খরচ কম। 1 ফুট ব্যাসের অ্যান্টিনাসহ একটি তিন সেন্টিমিটার রেডারের পক্ষে 5 মাইল দূরবর্তী ছুটি এরোপ্লেনকে আলাদাভাবে ধরা তখনই সম্ভব, যদি প্লেন ছুটির মধ্যে দূরত্ব অন্ততঃ 1 মাইল হয়। কিন্তু একটি অবলোহিত রশ্মি নির্দেশক একটি প্লেনের ছুটি ইঞ্জিনের মধ্যেও পার্থক্য ধরতে পারে।

এই সব কাজে যে সব যন্ত্র প্রায়ই প্রায়ই ব্যবহৃত হয়, সেগুলির দু-একটির কার্য-প্রণালী সম্বন্ধে সামান্য কিছু আলোচনা হয়তো অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

(1) প্রতিবিম্ব গঠনকারী সক্রিয় যন্ত্র—এই যন্ত্রে টাংষ্টেন ফিলামেন্ট বাতি কিংবা জেনন আর্ক বাতিকে অবলোহিত রশ্মির উৎস হিসাবে ব্যবহার করা হয়। বাতির দৃশ্য আলোক উপযুক্ত ফিল্টারের সাহায্যে ছেদন করা হয়। লক্ষ্যবস্তু থেকে প্রতিফলিত হয়ে অবলোহিত রশ্মি দূরবীক্ষণ যন্ত্রে বস্তুর প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করে। অবলোহিত রশ্মির দূরবীক্ষণ যন্ত্র যখন বন্দুকের সামনে লাগানো থাকে, তখন অন্ধকারেও লক্ষ্যবস্তুকে গুলি করা সম্ভব হয়।

(2) প্রতিবিম্ব গঠনকারী নিষ্ক্রিয় যন্ত্র—পূর্বেই বলা হয়েছে, এই ধরণের যন্ত্রে অবলোহিত রশ্মির কোনও উৎস ব্যবহার করা হয় না এবং লক্ষ্যবস্তু থেকে নির্গত রশ্মিই কাজে লাগানো হয়। থার্মোগ্রাফ এবং এভাপোরোগ্রাফ হলো এই ধরণের ছুটি যন্ত্র। এভাপোরোগ্রাফে যে প্রতিবিম্বের সৃষ্টি হয়, তার প্রতিটি অংশের বর্ণ লক্ষ্যবস্তুর তাপমাত্রার উপর নির্ভরশীল। বিভিন্ন তাপমাত্রার লক্ষ্যবস্তুর জন্যে প্রতিবিম্বে বিভিন্ন বর্ণের প্রকাশ হয়। এই বর্ণ অবশ্য লক্ষ্যবস্তুর নিজস্ব বর্ণ নয়। তবুও এথেকে তাপমাত্রার প্রকৃত অবস্থা জানা সম্ভব। তাপমাত্রা এবং বর্ণের চার্ট থেকে সহজেই লক্ষ্যবস্তুর প্রকৃতি নির্ণয় করা যায়। যন্ত্রটি 1° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রার পার্থক্য নিরূপণ করতে পারে। রসায়নশিল্পে এবং চিকিৎসাশাস্ত্রে এই যন্ত্রটি আজকাল বহুল ব্যবহৃত হয়ে থাকে। থার্মোগ্রাফের সাহায্যে দাবানলের কেন্দ্রস্থল এবং তার মধ্যে মানুষের অবস্থান নির্ণয় করা যায় খুব সহজেই।

অবলোহিত রশ্মির আর একটি প্রয়োজনীয় ব্যবহার হলো—অবলোহিত স্পেক্ট্রোস্কোপি। পদার্থের আণবিক কম্পন, ঘূর্ণন এবং গঠন জানবার কাজে এর গুরুত্ব অপরিসীম। তাছাড়া ভারী জল প্রস্তুতে, এন্‌জাইম নির্ধারণে, ভিটামিন, ঔষধ ও খাদ্য বিশ্লেষণে, চিকিৎসাবিদ্যায়, কৃষি-গবেষণায়, তন্তু, কয়লা, দুগ্ধ, রবার, প্লাষ্টিক প্রভৃতি শিল্পে এর উল্লেখযোগ্য ব্যবহার আছে।

হিমবাহ

সন্তোষকুমার দে

তুষার যুগে (যা আট হাজার বছর আগে শেষ হয়ে গেছে) পৃথিবীর প্রায় 30% শতাংশ ছিল বরফে ঢাকা। তার পর পৃথিবীর উত্তাপ বাড়বার ফলে বরফ গলে গিয়ে এখন দুই মেরুর কাছে সমভূমিতে প্রায় সারা বছর ধরে তুষারপাত হয় ও বরফ জমে থাকে। পৃথিবীর এই অংশে বরফের স্তূপ যখন বিরাট আকার ধারণ করে, তখন তার পাশের কতক অংশ দেখলে মনে হয় যেন বরফের একটা মস্ত বড় জিভ্ বেরিয়ে আছে। এই রকম বড় বড় বরফের অংশ যখন ভূমির ঢালের জন্যে নীচের দিকে চলতে থাকে, তখন তাকে বলা হয় (গ্ল্যাসিয়ার) বা বরফের নদী। ভারতের উত্তর দিকে কারাকোরাম পর্বতের গ্রেট বালটরো (36 মাইল) পৃথিবীর দীর্ঘতম হিমবাহ। এছাড়াও এভারেষ্টের শৃঙ্গের কাছে আছে রংবুক, কাংশুক প্রভৃতি অনেক হিমবাহ। গঙ্গা থেকে নীলনদ এবং সেখান থেকে রোন নদী পর্যন্ত যত বড় বড় নদী আছে, সবারই উৎপত্তির উৎস হলো এই হিমবাহ। পৃথিবীর প্রায় তিন ভাগ সুপেয় জল (2 কোটি 90 লক্ষ ঘন কিলোমিটার) এই হিমবাহের বরফের মধ্যে সঞ্চিত আছে এবং সেখান থেকেই তা আহৃত হয়।

হিমবাহের জন্ম—অল্প কথায় বলতে হলে বলা চলে, গ্রীষ্মে যে পরিমাণ বরফ গলে, শীতে সেই পরিমাণ গলনের চেয়ে বেশী তুষারপাত হলে হিমবাহের সৃষ্টি হয়। গলনের পরে এই অতিরিক্ত তুষারপাত বছরের পর বছর জমতে জমতে কঠিন বরফে পরিণত হয়। পরিবর্তনটা হয় এইভাবে—হাল্কা তুষার প্রথমে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তুষার কণিকায় পরিণত হয়। তার পর সমুদ্রের জলের লবণাংশ কমতে থাকলে এই তুষারকণা তুষার-ঝটিকায় তাড়িত হয়ে একত্রিত হয় এবং ক্রমশ: জমাট বেঁধে একটি বিরাট স্তূপে পরিণত হয়। বছরের পর বছর এভাবে তুষারের কাজ চলতে থাকায় তুষারের স্তূপ কঠিন থেকে কঠিনতর হতে থাকে।

হিমবাহের গতিবেগ সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন স্থানে হিমবাহের গতিবেগ স্বাভাবিক কারণেই বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। আল্পস্ অঞ্চলে হিমবাহ প্রতিদিন এক ফুটও এগোতে পারে না, অথচ গ্রীনল্যাণ্ডে তার গতিবেগ বেশ দ্রুত। হিমবাহ প্রতিদিন সেখানে প্রায় 6 ফুট গতিতে এগিয়ে চলে। আবার লক্ষ্য করা গেছে হিমবাহের পাশের দিকের চেয়ে মাঝখানের গতিবেগ বেশী। সেখানেও আবার নীচের দিকের তুলনায় উপরের দিকের গতিবেগ দ্রুততর। সম্প্রতি একটি অতি বেগবান হিমবাহের খবর পাওয়া গেছে। 1966 সালে একজন বিমান-চালক ক্যানাডার ষ্টীল পর্বতের উপর দিয়ে উড়ে যাবার সময় 35 কি: মি: চওড়া একটি হিমবাহকে, সামনের সবকিছু ভেঙেচুড়ে ভাসিয়ে নিয়ে ঘণ্টায় আধ মিটারের বেশী অর্থাৎ সারা দিনে প্রায় 15 মিটার বেগে চলতে দেখতে পান।

আগেই বলা হয়েছে, মেরুঅঞ্চলের কাছাকাছি বিস্তীর্ণ অংশে তুষারস্তূপ সবচেয়ে বেশী পরিমাণে জমে থাকে। পৃথিবীর শেষ তুষার যুগের সময় উত্তর আমেরিকা এবং ইউরোপের উত্তর-পশ্চিম অংশে বর্তমান সময়ের তুলনায় অনেক বেশী পরিমাণে তুষার জমে ছিল। দক্ষিণ মেরুর নিকটবর্তী অঞ্চলেও অ্যাণ্টার্কটিক তুষারস্তূপ

বর্তমানের তুলনায় পূর্বে অনেক বেশী বিস্তৃত ছিল। ঐ সময়কে কোয়ার্টারনারী বরফযুগ বলা হয়। বর্তমানে উত্তর গোলার্ধে গ্রীনল্যাণ্ডে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে অ্যান্টার্কটিক অঞ্চলে বিস্তীর্ণ তুষারস্তূপ দেখতে পাওয়া যায়। সারা পৃথিবীর 97% শতাংশ হিমবাহ এই দুই জায়গায় অবস্থিত।

অ্যান্টার্টিক তুষারস্তূপের আয়তন 14·25 কোটি বর্গ কিঃ মিঃ; অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকা-সমেত সমগ্র ইউরোপের সমান। এই সমগ্র মহাদেশ 3,350 মিটার পুরু বরফের স্তূপে আবৃত। শুধু বরফ আর বরফ—মাঝে মাঝে এখানে-সেখানে আন্দিসের মত উঁচু উঁচু পর্বত মাথা তুলে জেগে আছে।

দ্বিতীয় বৃহৎ বরফস্তূপ হলো উত্তর গোলার্ধের গ্রীনল্যাণ্ড। এখানকার তুষারস্তূপের আয়তন 1·7 মিলিয়ন বর্গ কিঃ মিঃ। এখানকার মালভূমি থেকে বড় বড় তুষারশৈল সমুদ্রে নেমে গিয়ে ভেসে বেড়ায়। সুমেরু ও কুমেরু অঞ্চলের বিরাট তুষারস্তূপের কতক অংশে মাঝে মাঝে ভাসতে ভাসতে সমুদ্রে এখানে-ওখানে এসে পড়ে। জলের চেয়ে বরফ হাল্কা, তাই হিমবাহের 1/9 অংশ জলের উপর ভেসে থাকে। এই রকম ভাসমান তুষারস্তূপকে বলে হিমশৈল। এই রকম একটি বৃহৎ হিমশৈলে ধাক্কা খেয়ে 1912 সালে 14ই এপ্রিল তখনকার দিনের বৃহত্তম প্রমোদ তরী টাইটানিক, যা কখনও ডুববে না বলে কর্তৃপক্ষ দম্ভ করে বলেছিলেন—আটলান্টিক মহাসাগরে ডুবে যায়।

আরও অনেক হিমবাহ আছে, কিন্তু সেগুলি গ্রীনল্যাণ্ড ও অ্যান্টার্টিকার হিমবাহের তুলনায় ছোট। এশিয়া, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা, ইউরোপ, আফ্রিকা এবং নিউজিল্যাণ্ডেও সেগুলির দেখা মেলে।

একজন বিজ্ঞানী বলেছেন—যদি অ্যান্টার্টিকার তুষারস্তূপ সবটাই গলে যায়, তাহলে সমুদ্রের উচ্চতা 50 থেকে 60 মিটার বেড়ে যাবে। ফলে লণ্ডন, নিউইয়র্কসমেত পৃথিবীর সমস্ত নিম্নভূমি ডুবে যাবে। তবে এই তুষারস্তূপের গলবার ভয় আপাতত নেই—যদিও তুষারস্তূপের গলনের জন্যে মানুষ খানিকটা দায়ী। সারা পৃথিবীর কল-কারখানা থেকে যে সব আবর্জনা ও দূষিত পদার্থ নদীপথে সমুদ্রে এসে পড়ছে, তাতে সমুদ্রের উষ্ণতা খানিকটা বেড়ে যাচ্ছে, আবহাওয়ারও পরিবর্তন হচ্ছে। পৃথিবীর উষ্ণতা বাড়লে এবং তার ফলে হিমবাহগুলি কিছু পরিমাণে গলে গেলেও সমুদ্রের জল এমন কিছু বাড়বে না, যার জন্যে এখন থেকেই আতঙ্কগ্রস্ত হতে হবে। কেন না, দেখা যাচ্ছে যে, গত বারো হাজার বছরে (16,000-4,000 খৃঃ পূঃ) সমুদ্রপৃষ্ঠ মাত্র 100 মিটার উচ্চতায় বেড়েছে। প্রতি 100 বছরে সমুদ্রের জল প্রায় এক মিলিমিটার বাড়ছে।

পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে সঞ্চিত বরফরাশিকে প্রধানতঃ তিন ভাগে ভাগ করা যায়:—(1) মহাদেশীয় তুষারস্তূপ, (2) উপত্যকার হিমবাহ আর (3) পাদদেশের হিমবাহ (পিড্‌মণ্ট গ্ল্যাসিয়ার)।

প্রথমটির কথা আগেই বলা হয়েছে। উপত্যকার হিমবাহ সম্বন্ধে সংক্ষেপে বলা যায় যে, বহু পূর্বে তুষার যুগে উচ্চভূমিতে তুষার সঞ্চিত হয়ে যে বরফের অঞ্চল সৃষ্টি হয়েছিল, তাথেকে বিভিন্ন উপত্যকার ভিতর দিয়ে হিমবাহ নীচের দিকে নামতে সুরু করেছে। একেই বলে উপত্যকা হিমবাহ। পরবর্তী যুগেও পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে বড় বড় পাহাড়-পর্বতে যে বরফের স্তূপ জমে থাকে, তাথেকে আগের বিভিন্ন উপত্যকার মধ্য দিয়ে হিমবাহ প্রবাহিত হয়। এই রকম হিমবাহকে কেউ কেউ পার্বত্য হিমবাহ বলেন। পার্বত্য অঞ্চলে তুষার-স্তূপ যদি কোন কারণে কম জমে বা সেখানকার উত্তাপ বেড়ে যায়, তাহলে হিমবাহের প্রবাহের পরিমাণও কমে যায়। এই রকম অবস্থাকে হিমবাহের পশ্চাদপসরণ বলে। গত 100

বছরের মধ্যে আণ্ডিস অঞ্চলের হিমবাহগুলির যথেষ্ট পশ্চাদপসরণ লক্ষ্য করা গেছে।

পর্বত-পাদদেশের হিমবাহ—পার্বত্য অঞ্চল থেকে যখন কোন হিমবাহ উপত্যকার মধ্য দিয়ে নীচে নেমে আসে এবং পর্বতের পাদদেশে বিস্তৃত হয়, তখন তাকে বলা হয় পাদদেশের হিমবাহ। আইসল্যাণ্ড ও অ্যান্টার্টিকায় এই রকম হিমবাহ দেখা যায়। উত্তর আমেরিকার আলাস্কাতে প্রায় দেড় হাজার বর্গমাইল জায়গায় এই রকম একটা হিমবাহ দেখতে পাওয়া গেছে।

আলাস্কা, গ্রীনল্যাণ্ড প্রভৃতি দু-একটা জায়গা ছাড়া এই সব বরফের দেশে মানুষের বসবাস নেই। সাধারণ জাহাজ এই সব দেশের তুষার-নদীতে যাতায়াত করতে পারে না। সেখানকার যান হলো বল্গাহরিণের টানা স্লেজগাড়ী। অথচ এই সব দেশ প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ। আলাস্কার কথাই ধরা যাক—বিশেষজ্ঞদের মতে, এখানে 2 হাজার থেকে 4 হাজার কোটি ব্যারেল তেল সঞ্চিত আছে। এত বেশী তেল পৃথিবীর আর কোথাও নেই। এই তেল আনা যাবে কি করে, সেটাই হলো সমস্যা। আলাস্কা থেকে আমেরিকার পূর্বাংশে চেষ্টার সহরের শোধনাগারে এই তেল আনতে হলে কঠিন বরফ ভেঙ্গে প্রায় দশ হাজার মাইল পথ অতিক্রম করতে হবে। এই দীর্ঘ পথে পাইপ-লাইন বসিয়ে তেল আনা যায় বটে, কিন্তু সেটা অত্যন্ত ব্যয়বহুল ব্যাপার এবং প্রচণ্ড শৈত্যে সেই পাইপ-লাইন কত দিন স্থায়ী হবে এবং পাইপের ভিতর তেল জমে গিয়ে পাইপ ফাটিয়ে দেবে কিনা—সে সব কথাও ভাববার বিষয়।

এই সমস্যা সমাধান করবার জন্যে গত বছর আমেরিকার এক তৈল কোম্পানী (হাম্বল অয়েল অ্যাণ্ড রিফাইনিং কোং) একটি অভিনব ব্যবস্থা গ্রহণ করে সফল হন। 1005 ফুট লম্বা ম্যানহাটান নামে একটি দেড় লক্ষ টনের তেলবাহী জাহাজ 24 অগাষ্ট, 1969 সালে পেনসিলভেনিয়ার চেষ্টার সহর থেকে 95 জন নাবিক, বৈজ্ঞানিক ও সাংবাদিক নিয়ে যাত্রা সুরু করে। বরফের স্তূপ ভাঙ্গতে হবে জেনে সঙ্গে নিয়েছিল দুটি বরফ-ভাঙ্গবার জাহাজ (আইস ব্রেকার) এবং কয়েকটি হেলিকপ্টার—আশেপাশে চারদিকে নজর রাখবার জন্যে। গ্রীনল্যাণ্ডের তটভূমি পার হবার পরেই আরম্ভ হলো পথের দুর্গমতা। কয়েক দিন নরম বরফ ঠেলে জাহাজ অগ্রসর হলো। তারপর আর এগুনো গেল না, যদিও জাহাজের মাথাটা বরফ ভাঙ্গবার উপযোগী করে বিশেষ ধরণের ইস্পাতে তৈরি ছিল। এবার বরফভাঙ্গবার জাহাজ দুটি জমাট বরফ ভাঙ্গতে আরম্ভ করলো। বিরাট বিরাট বরফের চাং ভেঙ্গে ফেলে ক্রমাগত জাহাজের পথ করে দিতে থাকে। এমনিভাবে ম্যাক ক্লিওর প্রণালীতে এসে জাহাজ 12 ঘণ্টা আটকে পড়ে থাকলো। এখানকার বরফেরস্তূপ বহু বছরের পুরনো হওয়ায় তার কাঠিন্য ছিল অত্যন্ত বেশী। যতদিন যায় ততই সামুদ্রিক বরফের লবণের ভাগ কমতে থাকে, ফলে বরফ অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে। কাজেই এই আতকায় জাহাজটি আর অগ্রসর হতে না পেরে দিক পরিবর্তন করে প্রিন্স-অব-ওয়েলস্ প্রণালীতে ফিরে যায়। আবার বরফ-ভাঙ্গবার জাহাজ গেল এগিয়ে, বরফের স্তূপ ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিয়ে প্রধো উপসাগর পর্যন্ত পথ পরিষ্কার করে দিয়ে উত্তর আলাস্কায় পয়েন্ট-ব্যারোস্থিত তৈলকূপ পর্যন্ত ম্যানহাটানের পথ করে দিল। তার পর সেখান থেকে তেল নিয়ে নভেম্বরে ফিরে এলো ম্যানহাটান আমেরিকায়। যাওয়া-আসার খরচ পড়লো চার কোটি ডলার। এত খরচ করে কোম্পানীর লাভ থাকলো কিনা, জানা যায় নি। তবে পাইপ দিয়ে তেল আনতে হলে ব্যারেলপ্রতি খরচ হতো এর চেয়ে 60 শতাংশের বেশী। এই অভিযান অবশ্য সফল হয়েছে, কিন্তু ব্যবসায়ের দিক দিয়ে লাভজনক করতে হলে তেল সংগ্রহের ব্যাপারে আরও ব্যয়-সংক্ষেপ করা যায় কিনা তাই এখন ভেবে দেখা হচ্ছে।

হিমাঙ্কের নীচে জীবন

দেবব্রত নাগ এবং জগৎজীবন ঘোষ*

পৃথিবীর প্রায় তিন ভাগ জল এবং এক ভাগ স্থল। সেখানে কত যে বিভিন্ন আকৃতি ও প্রকৃতির জীবন ছড়িয়ে আছে, তা গুণে শেষ করা যায় না। একটু বিশেষভাবে লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, ওরা সবাই কোন না কোন রকমে একে অন্যের উপর নির্ভরশীল। জীব-জগতের এক-একটি প্রাণী বিভিন্ন রকম কলাকৌশল আয়ত্ত করে নানাপ্রকার প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও বেঁচে আছে। যারা প্রতিকূল অবস্থা সামলে উঠতে পারে নি, তারা ক্রমশঃ তাদের অস্তিত্ব হারিয়েছে। ভাবলে আশ্চর্য হতে হয় যে, এখনও পৃথিবীর কোন কোন স্থানে এমন অনেক জীব বাস করছে, যারা হিম-শীতলের নীচের তাপমাত্রায় থাকতেই অভ্যস্ত। এমন একটি প্রতিকূল অবস্থায় বেঁচে থাকবার উদ্দেশ্য কি থাকতে পারে—তা সঠিক বলা শক্ত। তবে মানব-কল্যাণে এর বিশিষ্ট ভূমিকার আভাস পাওয়া যাচ্ছে।

এই প্রবন্ধে আমরা হিমশীতল কিংবা তারও নীচের উষ্ণতা উপেক্ষা করে কিভাবে বিভিন্ন প্রাণী বেঁচে থাকে, সে বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করবো।

হিমশীতল অঞ্চল—পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতা স্থান ও কালের উপর নির্ভরশীল। উষ্ণতা কোথাও হিমশীতলের নীচে $-70^{\circ}C$ আবার কোথাও হিমশীতলের অনেক উপরে প্রায় $+40^{\circ}C$। যদিও ক্রান্তি অঞ্চলের উঁচু জায়গাগুলি বাদ দিলে সেখানকার উষ্ণতা শীত-গ্রীষ্মে কখনই হিমাঙ্কের নীচে নামে না। উত্তর এবং দক্ষিণ মেরু অঞ্চলের উষ্ণতা কিন্তু শীত-গ্রীষ্মে সব সময়েই হিমশীতল কিংবা তারও নীচে থাকে।

হিমাঙ্কের নীচে বেঁচে থাকবার প্রকারভেদ—প্রাণীদের দেহে জলের আধিক্য সবচেয়ে বেশী। হিমাঙ্কের নীচে ঐ জল বরফে পরিণত হয়, কিন্তু তবু এমন একটি প্রতিকূল অবস্থায় বেঁচে থাকবার তাগিদে কিছু কিছু প্রাণীর দেহকোষে প্রাণ-রাসায়নিক বিক্রিয়াগুলি এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের এমন সব বিবর্তন হয়েছে, যা ওদের বাঁচিয়ে রাখছে। আধুনিক বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে প্রাণীদের হিমাঙ্কের নীচের তাপমাত্রায় বেঁচে থাকবার কারণগুলি পরিষ্কার হয়ে ফুটে উঠছে।

হিমশীতল কিংবা তারও নীচের উষ্ণতায় যে সব প্রাণী বেঁচে থাকে, তারা মূলতঃ দু-রকমের। একদল হিমশীতলের প্রভাব নানাভাবে এড়িয়ে চলে। অন্য দল জীবন-চক্রের কোন এক সময়ে হিমশীতলের প্রভাব থেকে বেঁচে থাকবার জন্যে প্রচণ্ড সহন-ক্ষমতা আয়ত্ত করে।

হিমশীতল অবস্থা ভালবাসে যারা—হিমশীতল কিংবা তারও নীচের উষ্ণতায় থাকতে যারা অভ্যস্ত তারা অনেক রকমের হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ ল্যাব্রাডোর অঞ্চলের মাছগুলির কথা বলা যায়। ঐ সব অঞ্চলে পাহাড়ের মধ্যে বহু জলাশয় দেখতে পাওয়া যায়। গ্রীষ্মকালে জলাশয়গুলির উপরিতলের উষ্ণতা $+5^{\circ}C$-এর বেশী ওঠে না, কিন্তু শীতকালে জলের উষ্ণতা প্রায় $-1{\cdot}7^{\circ}C$ নেমে যায়। যে সব মাছ জলাশয়গুলিতে দেখতে পাওয়া যায়, গ্রীষ্মকালে তাদের রক্তের হিমাঙ্ক $-0{\cdot}8^{\circ}C$। সুতরাং শীতকালে যখন জলাশয়গুলির উষ্ণতা $-1{\cdot}17^{\circ}C$-এ থাকে, তখন তাদের রক্ত

*প্রাণ-রসায়ন বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

জমে যাওয়া খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু দেখা গেছে, শীতকালে ওদের রক্তের হিমাঙ্ক −0·8°C-এরও নীচে নেমে যায়। শীতকালে ঐ অঞ্চলে কড্ মাছ এবং স্কালপিন মাছের রক্তের হিমাঙ্ক যথাক্রমে −1·47°C এবং −1·50°C থাকে। কি কি বিশেষ কারণে কড্ এবং স্কালপিন মাছের রক্তের হিমাঙ্ক শীতকালে কম থাকে, তা জানতে গিয়ে দেখা গেল যে, শীতকালে যখন ঐ সব মাছ হিমশীতলের নীচে ঘুরে বেড়ায়, তখন তাদের রক্তে বিশেষ এক রকম রাসায়নিক পদার্থ নির্গত হয়। অনেক পরীক্ষা করেও বৈজ্ঞানিকেরা ঐ মাছগুলির রক্ত থেকে সঠিক পদার্থটি উদ্ধার করতে পারেন নি।

হিমশীতলতা এড়িয়ে চলে যারা—কিছু সংখ্যক প্রাণী দেখা যায়, যারা হিমশীতলতা কিংবা তার নীচের উষ্ণতায় থাকতে পারে না। এরা প্রধানতঃ পাখী এবং স্তন্যপায়ী জীব। বিভিন্ন উষ্ণতার তারতম্য সহ্য করবার জন্যে এদের কারুর দেহে প্রচুর চর্বি থাকে আবার কারুর দেহে প্রচুর লোম থাকে, আর পাখীদের থাকে প্রচুর পালক। এদের মধ্যে যারা শীতকালটা জড়বৎ কাটিয়ে দেয়, তারা সাধারণতঃ গ্রীষ্মকালে অনেক কাজকর্ম সেরে রাখে। শীতকাল সুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে তাদের দেহের উষ্ণতা স্থানীয় বায়ুমণ্ডলীয় উষ্ণতার সঙ্গে সমতা রক্ষা করে থাকে, যদিও এরা বেশী শীত সহ্য করতে পারে না এবং হিমশীতলতার নীচেও বাঁচতে পারে না। যদি স্থানীয় উষ্ণতা হিমশীতলতার কাছাকাছি নেমে যায়, তবে এরা নিষ্ক্রিয় জড় অবস্থা থেকে আবার জেগে ওঠে এবং অধিক পাচন প্রক্রিয়া থেকে প্রয়োজনীয় তাপ উৎপন্ন করে।

হিমশীতলতায় বেঁচে থাকে কেমন করে—ল্যাব্রাডোর অঞ্চলের কড্ ও স্কালপিন মাছের কথা আগেই বলেছি। ঐ অঞ্চলে কিছু সংখ্যক জলাশয় আছে, যেখানে আরও একদল মাছ এক অদ্ভুত উপায় অবলম্বন করে বেঁচে আছে। এদের বেঁচে থাকবার উপায়টি বুঝতে গেলে হিমশীতলতার নীচের উষ্ণতা সম্পর্কে খানিকটা প্রাথমিক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। সাধারণতঃ লক্ষ্য করা যায় যে, একটি পাত্রে খানিকটা জল নিয়ে তাকে না নেড়ে উষ্ণতা যদি খুব ধীরে ধীরে হ্রাস করা যায়, তবে দেখা যাবে হিমশীতলতার নীচে প্রায় −20°C উষ্ণতায়ও ঐ জল বরফে পরিণত হয় না। এটি জলের অতিশীতল অবস্থা। ঐ অবস্থায় পাত্রটিকে একটু নেড়ে দিলে কিংবা পাত্রে একটি ছোট্ট বরফকণা ফেলে দিলে সঙ্গে সঙ্গে জল জমে কঠিন বরফে পরিণত হয়। অতিশীতল অবস্থায় জল জমে বরফ না হবার ঘটনাকে কিছু কিছু মাছ কাজে লাগিয়ে নিজেদের বেঁচে থাকবার পথ সুগম করে নিয়েছে। সাধারণতঃ ল্যাব্রাডোর অঞ্চলের জলাশয়গুলিতে যে সব মাছ দেখতে পাওয়া যায়, তাদের রক্তের হিমাঙ্ক −0·9°C থেকে −1·0°C। কিন্তু জলাশয়ে নীচে যে সব অঞ্চলে মাছগুলি ঘুরে বেড়ায়, সেখানকার উষ্ণতা বছরের সব সময়ই প্রায় −1·7°C-এ থাকে। উল্লেখযোগ্য মাছগুলি হলো—Boregadus saida, Lycodes turneri, Liparis koefoedi, Gymnacanthus tricuspis এবং Icelus spatula। এদের অতিশীতল অবস্থা থেকে তুলে নিয়ে যদি একটি জলাশয়ে বরফ দিয়ে রাখা যায়, তবে সঙ্গে সঙ্গে তাদের মৃত্যু ঘটে। কিন্তু সাধারণ অবস্থায় যখন এরা জলাশয়ের নীচে অতিশীতল অঞ্চলে ঘুরে বেড়ায়, তখন ওরা বেশ ভালভাবেই বেঁচে থাকে। কিভাবে মাছগুলি বেঁচে থাকে, তা পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, বছরের সব সময় ওরা ওদের রক্তের উষ্ণতা অতিশীতল অবস্থায় রাখতে পারে। যদিও অতিশীতল অবস্থায় সামান্য আলোড়নের ফলে রক্ত জমে কঠিন হয়ে যাওয়াই স্বাভাবিক,

তথাপি পরীক্ষা করে মাছগুলির রক্তে এমন কতকগুলি রাসায়নিক পদার্থ পাওয়া গেছে, যা অতিশীতল অবস্থায় মাছগুলির রক্ত জমতে বাধা দেয়।

হিম-রোধক পদার্থ—কোন্ কোন্ রাসায়নিক পদার্থ রক্তকে অতিশীতল অবস্থায় তরল রাখতে সাহায্য করে, তা জানবার জন্যে বিশেষ রকম পরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষার উপাদান হিসাবে কিলি ফিস্ নামক মাছকে কাজে লাগানো হয়। অনেকগুলি মাছকে কয়েকটি সমান ভাগে ভাগ করা হয় এবং এক-একটি ভাগের মাছকে বিভিন্ন উষ্ণতায় থাকতে অভ্যস্ত করানো হয়। যে সব মাছ 20°C এবং 10°C-এ থাকতে অভ্যস্ত, তাদের রক্তে বিশেষ কোন রাসায়নিক পরিবর্তন দেখা যায় নি। যদিও উষ্ণতা আরও কমতে থাকলে রক্তে কতকগুলি পদার্থের আধিক্য লক্ষিত হয়। আবার কতকগুলি পদার্থের পরিমাণের কোন রকম পরিবর্তন দেখা যায় নি। যে সব পদার্থের পরিমাণ বাড়ে, সেগুলি হলো সোডিয়াম, ক্লোরাইড, ম্যাগ্নেসিয়াম, ক্যালসিয়াম ইত্যাদির আয়ন এবং প্রোটিন নয় এমন নাইট্রোজেনঘটিত যৌগিক পদার্থ—কোলেস্টেরোল, গ্লুকোজ ইত্যাদি। আর যে সব পদার্থ প্রায় একই পরিমাণে থাকে, সেগুলি হলো পটাসিয়াম, বাইকার্বনেট, ফস্ফেট আয়ন এবং প্রোটিন। যখন মাছগুলিকে প্রায় –1°C-এ থাকতে অভ্যস্ত করানো হয়, তখন তাদের রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ বাড়তে দেখা যায়। যদিও অন্যান্য পদার্থগুলির বিভিন্ন উষ্ণতা পরিবর্তনের ফলে বিশেষ কোন তারতম্য হয় না বললেই চলে। কেবল গ্লুকোজই নয়, গ্লুকোজের সমজাতীয় আরও কতকগুলি পদার্থ, যেমন—সরবিটল, ফ্রুক্টোজ, সুক্রোজ, ম্যানিটল ইত্যাদি পদার্থগুলি অতিশীতল অবস্থায় রক্তকে তরল রাখতে সাহায্য করে। পদার্থগুলিকে হিমরোধক (Cryoprotective agents) বলা হয়। কতকগুলি হিমরোধক পদার্থের গঠনাকৃতি নিম্নে দেওয়া গেল।

যদি এই সব জৈব পদার্থের গঠন-প্রকৃতি ভালভাবে লক্ষ্য করা যায়, তবে দেখা যাবে এদের সবার মধ্যেই বহু সংখ্যক হাইড্রক্সিল বা —OH মূলক আছে। এথেকে ধারণা হয় যে, যে সব পদার্থে —OH মূলক অধিক সংখ্যায় থাকে, সেগুলি অতিশীতল অবস্থায় রক্তকে অপরিবর্তিত রাখতে সাহায্য করে। যদিও কোন্ বিশেষ প্রক্রিয়ায় উল্লিখিত রাসায়নিক পদার্থগুলি অতিশীতল অবস্থায় রক্তকে জমতে দেয় না, তার সঠিক কারণ জানা যায় নি।

গ্লিসারল
ম্যানিটল
সরবিটল
গ্লুকোজ
ফ্রুক্টোজ
সুক্রোজ

কয়েকটি হিমরোধক পদার্থের গঠনাকৃতি।

তবে অনুমান হিসাবে বলা যায় যে, উষ্ণতা হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে জলের অণুগুলি হাইড্রোজেন বন্ধনীর দ্বারা পরস্পর যুক্ত হয়ে ক্রমে বরফে পরিণত

হয়, কিন্তু উল্লিখিত রাসায়নিক পদার্থগুলিতে একাধিক $-OH$ মূলক থাকায় ওগুলি জলের অণুগুলিকে হাইড্রোজেন বন্ধনীর দ্বারা পরস্পর যুক্ত হতে বাধা দেয়।

হিমাঙ্কের নীচে প্রাণীর সহনশক্তি—হিমশীতল কিংবা তারও নীচের উষ্ণতায় যে সব প্রাণী নানা কলাকৌশল আয়ত্ত করে বেঁচে থাকে, এপর্যন্ত তাদের কথাই বলা হয়েছে। এবার যাদের কথা বলবো, তারা প্রতিকূল অবস্থায় বেঁচে থাকবার সহনক্ষমতা অর্জন করেছে। এরা জীবন-চক্রের কোন এক সময় $-273^{\circ}C$-এর কাছাকাছি উষ্ণতা পর্যন্ত সহ্য করতে পারে। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যায় যে, গাছের অঙ্কুর কিংবা বীজের অতিশীতল অবস্থা সহ্য করতে পারবার কারণ হলো—এরা খুব সহজে এবং তাড়াতাড়ি অনার্দ্র হতে পারে। ফলে কোষের ভিতর বরফকণা জমে কোষের কোন ক্ষতি করতে পারে না। আর একটি কারণ হলো—যতই এরা অনার্দ্র হতে থাকে, ততই কোষের ভিতরকার পদার্থগুলি ঘনীভূত হতে থাকে, ফলে যদিও বা অল্প পরিমাণ জল থেকে যায়, তার হিমাঙ্ক $0^{\circ}C$-এর অনেক নীচে নেমে যেতে বাধ্য হয়।

কোষ ক্ষতিগ্রস্ত হয় কেন ?—সাধারণতঃ দেখা গেছে যে, কোষের ভিতরকার জল বরফে পরিণত হলেই কোষের বেশী ক্ষতি হয়, কিন্তু কোষের বাইরের জল বরফ হলে তা কোষকে সঙ্কুচিত করে বটে, কিন্তু কোষের খুব একটা ক্ষতি হয় না। কোষের ভিতর জল বরফে পরিণত হলে তা কোষের বিভিন্ন সক্রিয় রাসায়নিক পদার্থের গঠন-প্রকৃতি পাল্টে দেয়; ফলে কোষের প্রাণ-রাসায়নিক বিক্রিয়াগুলি নানাভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু এই ধরণের যুক্তি সব সময় খাটে না। কখনও কখনও দেখা গেছে যে, কোষের বাইরে জল বরফ হওয়ায় কোষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এক্ষেত্রে সঠিক কারণ খুঁজে পাওয়া যায় নি। বলা হয়েছে যে, উষ্ণতা কমবার সঙ্গে সঙ্গে কোষ ক্রমশঃ অনার্দ্র হতে থাকলে কোষের বাইরে জলের পরিমাণ বাড়তে থাকে। কোষের ভিতরে জলের পরিমাণ কমবার ফলে প্রধানতঃ সোডিয়াম ক্লোরাইডের ঘনত্ব বাড়তে থাকে এবং কোন এক সময় প্রচুর সোডিয়াম ক্লোরাইড থাকবার জন্যে কোষের প্রোটিন অণুগুলির গঠন-প্রকৃতি পাল্টে যায়; ফলে প্রোটিনগুলি অকেজো হয়ে পড়ে। প্রোটিন অকেজো হলে কোষের বিভিন্ন প্রাণ-রাসায়নিক বিক্রিয়াগুলি বিঘ্নিত হয়। এসব ক্ষেত্রে গ্লিসারল কিংবা অন্যান্য শর্করা জাতীয় পদার্থগুলি কোষের ভিতরকার দ্রবণের হিমাঙ্ক কমিয়ে দেয় বলে জল জমে বরফ হতে পারে না। এমন কি, যে ঘনত্বে সোডিয়াম ক্লোরাইড কোষের ক্ষতিসাধন করে, তাও হতে বাধা দেয়।

হিমশীতল কিংবা অতিশীতল অবস্থায় জীব-কোষ যে বিভিন্ন ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তার আরও একটি কারণ জানা গেছে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, প্রোটিন অণুতে বহু সংখ্যক $-SH$ মূলক থাকে। এগুলিকে থায়োল (Thiol) মূলক বলা হয়। উষ্ণতা হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে কোষ যখন অনার্দ্র হতে থাকে, তখন কোন এক বিশেষ উষ্ণতায় প্রোটিন অণুগুলি পরস্পর জুড়ে যায়। একটি প্রোটিন অণুর বহু সংখ্যক $-SH$ মূলক অপর একটি প্রোটিন অণুর $-SH$ মূলকের খুব কাছাকাছি এলে ঐ $-SH$ মূলকগুলির মধ্যে বিনিময় কিংবা—SH মূলকগুলি জারিত হয়ে —S—S— বন্ধনী তৈরি হয়। এভাবে দুটি প্রোটিন অণু জুড়ে একটি নতুন প্রোটিন অণু তৈরি হতে পারে। এবার উষ্ণতা কিংবা কোষের আর্দ্রতা বাড়িয়ে দিলে নতুন প্রোটিন অণুটির গঠনে বিকৃতি ঘটে। এমনি করে প্রথমে উষ্ণতা হ্রাস এবং পরে উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে প্রোটিন অণুগুলি প্রাণ-রাসায়নিক গুণাবলী হারিয়ে ফেলে। গ্লিসারল কিংবা ঐ ধরণের অণুগুলি যে সব

জীব-কোষে পাওয়া গেছে, সেগুলি প্রোটিন অণুর —SH মূলকের সঙ্গে হাইড্রোজেন বন্ধনী তৈরি করে। ফলে অতিশীতল অবস্থায় প্রোটিন অণুগুলি পরস্পর সংলগ্ন হতে পারে না এবং প্রোটিনের প্রাণ-রাসায়নিক গুণাবলীও বজায় থাকে।

হিম-জীববিদ্যার ভবিষ্যৎ—হিমশীতল কিংবা অতিশীতল অবস্থায় প্রাণীদের বেঁচে থাকবার মূলে যে সব কারণগুলির কথা বলা হয়েছে, মানব সমাজে তা কি কি কাজে লাগতে পারে, সে সম্পর্কে অনেকেই চিন্তা করতে সুরু করেছেন। হিমশীতল অবস্থায় জীবকোষের বহু প্রয়োজনীয় ধর্মগুলি অনেক দিন বাঁচিয়ে রাখা যায়। মানুষের জীবনকাল সুদীর্ঘ করতে কিংবা মানুষের জরা রোধ করতে এই ধরণের পরীক্ষার যথেষ্ট মূল্য আছে বলে মনে হয়। হিমশীতল কিংবা অতি-শীতল অবস্থার প্রয়োজনীয়তা শল্যচিকিৎসায় ইতিমধ্যেই যথেষ্ট প্রসার লাভ করেছে।

যদিও হিমশীতল কিংবা অতিশীতল অবস্থা সহ্য করে কিছু সংখ্যক প্রাণী বেঁচে থাকে, তথাপি মানুষের পক্ষে সাধারণভাবে এত কম উষ্ণতা সহ্য করা সম্ভব নয়। হিমশীতল অঞ্চলে যে সব মানুষ বাস করে কিংবা যে সব অতন্দ্র প্রহরী দিনের পর দিন প্রবল শীত সহ্য করে দাঁড়িয়ে থাকে, প্রায়ই তাদের হাতের আঙ্গুল খসে পড়তে দেখা যায়। এর কারণ হলো আঙ্গুলের surface area বেশী থাকবার দরুণ খুব সহজেই ঐ অঙ্গগুলি শৈত্যের প্রভাবে ঠাণ্ডা হয়ে যায়। ফলে সাধারণভাবে রক্ত চলাচল হতে পারে না—এমন কি, পাচন প্রক্রিয়া থেকে উৎপন্ন উপযুক্ত তাপও সরবরাহ হতে পারে না। ফলে ঐ অঙ্গগুলির কোষের সক্রিয়তা ক্রমশঃ লোপ পেতে থাকে এবং কোন এক সময় আঙ্গুলগুলি খসে পড়ে।

তবে প্রাণীদের শীত সহ্য করবার ক্ষমতা বাড়ানো যায় কিনা, সে সম্পর্কে একদল বৈজ্ঞানিক ইতিমধ্যে ইঁদুরের উপর পরীক্ষা করে দেখিয়েছেন যে, ইঁদুরের শীত সহ্য করবার ক্ষমতা অনেক গুণ বাড়িয়ে দেওয়া যায়। স্ত্রী-ইঁদুরগুলিকে যদি বাল্যাবস্থায় ঠাণ্ডা জায়গায় থাকতে অভ্যস্ত করা যায়, তবে ওদের বাচ্চাগুলি শীত সহ্য করবার ক্ষমতা লাভ করে। শীতপ্রধান জায়গায় যে সব মানুষ বাস করে, তাদের দেহে অধিক তাপ প্রধানতঃ পাচন প্রক্রিয়া থেকেই উৎপন্ন হয়। কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে স্ত্রীলোকদের শীতপ্রধান স্থানে বেশ কিছুদিন রাখলে তাদের সন্তানেরা কতটা শীত সহ্য করবার ক্ষমতা অর্জন করবে, তা ভাল ভাবে জানা নেই। এই সম্পর্কে ভালভাবে পরীক্ষা হলে তা হিমশীতল অবস্থা সহ্য করবার ক্ষমতা অর্জন করতে মানুষকে সাহায্য করবে। কেবল তাই নয়, হিমরোধক পদার্থগুলি কিভাবে শীতপ্রধান স্থানে মানুষের দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োগ করা যায়, সে সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক গবেষণা এখন থেকেই সুরু হওয়া উচিত।

বিভিন্ন পরীক্ষার ফল থেকে এমনও কিছু কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে, যা অন্য গ্রহে প্রতিকূল অতিশীতল অবস্থায় বেঁচে আছে, এমন একটি জীবসমাজের অস্তিত্ব খুঁজে বের করতে সাহায্য করবে।

বিজ্ঞান-সংবাদ

লিউকেমিয়া রোগের ওষুধ আবিষ্কার

বোম্বাই থেকে পি. টি. আই. কর্তৃক প্রচারিত এক সংবাদে জানা যায়, ক্যান্সার রিসার্চ ইনষ্টিটিউটের একদল গবেষক ডাঃ এম. এস. সহস্রবুধের পরিচালনায় লিউকেমিয়া চিকিৎসার ক্ষেত্রে একটা বড় রকমের সাফল্য লাভ করেছেন। লিউকেমিয়া রোগ হলো রক্তের শ্বেত কণিকার ক্যান্সার।

ডাঃ সহস্রবুধ গত 24শে অক্টোবর সাংবাদিক-দের জানান যে, তাঁরা অ্যান্টি-লিউকেমিয়া সিরাম উৎপাদনের একটি সহজ পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন। এর প্রয়োগে শরীরের স্বাভাবিক কণিকাগুলিতে বা অন্যান্য ব্যাপারে কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে না। তিনি বলেছেন, সুস্থদেহের 'ও' গ্রুপের রক্তের শ্বেত কণিকার সঙ্গে উপযুক্তভাবে একটি রাসায়নিক ফ্লুরো-ডি-নাইট্রো-বেঞ্জিন মিশিয়ে সেটি তাঁরা অ্যান্টিজেন হিসাবে ইঁদুর, ঘোড়া ও লিউ-কেমিয়া রোগগ্রস্ত মানুষের দেহেও ব্যবহার করেছেন।

ধূমপানের কুফল

বেশী সিগারেট খেলে শ্বাস-প্রশ্বাসের যন্ত্রে যে ক্যান্সার হয়, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিয়েছেন পঃ জার্মেনীর হামবুর্গ গবেষণা কেন্দ্রের ডিরেক্টর ডাক্তার ওয়াল্টার ডোটেনহ্বিল। দেড়-শ' ইঁদুরকে একটানা আশীটি সিগারেটের ধোঁয়া শুঁকিয়ে শুঁকিয়ে তিনি দেখিয়েছেন যে, তাদের বেশীর ভাগের ফুসফুসে ক্যান্সারের আক্রমণ ঘটে। পঃ জার্মেনীর সিগারেট শিল্পের তরফ থেকে এই গবেষণা চালানো হয়েছিল। সিগারেট কোম্পানীগুলি এখন মৃদু সিগারেট তৈরির কথা চিন্তা করছে। ডাক্তার ডোটেনহ্বিলের গবেষণায় দেখা গেছে যে, তামাককে ইথাইল অ্যালকোহল দিয়ে শোধন করলে ক্যান্সার হবার সম্ভাবনা অনেক কমে যায়। এজন্যে ভবিষ্যতে নাকি তামাকের রাংতা (ফয়েল) দিয়ে সিগারেট তৈরি হবে।

পারমাণবিক ঘড়ি

লক্ষ বছরে এক সেকেণ্ডের হেরফের হলেও হতে পারে—এরকম একটি পারমাণবিক ঘড়ি তৈরি হয়েছে পশ্চিম জার্মেনীতে। বিজ্ঞানীরা বলেছেন, জ্যোতির্বিজ্ঞান অনুযায়ী সেকেণ্ডের ব্যাখ্যা নির্ভুল নয়, 9, 172, 671, 770 সিজিয়াম অ্যাটমের স্পন্দনে যে সময় লাগে, তাকেই প্রকৃত এক সেকেণ্ড বলা চলে। এই ঘড়িতে সেই ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিদ্যুৎ ও চুম্বক থেকে যাতে কোন বিঘ্ন না ঘটে, সে জন্যে এই ঘড়িতে বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে।

শুক্রগ্রহের রহস্য

সৌরমণ্ডলীতে শুক্রগ্রহটি হলো পৃথিবীর নিকট-তম প্রতিবেশী। মহাকাশ-যুগে মহাকাশ সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধানের ব্যাপারে যে সকল গ্রহ মানুষের দৃষ্টিকে সবচেয়ে বেশী আকর্ষণ করেছে, তাদের মধ্যে এই গ্রহটি অন্যতম। সোভিয়েট ইউনিয়ন এই গ্রহাভিমুখে নতুন আর একটি তথ্যসন্ধানী রকেট প্রেরণের পর এই গ্রহ সম্পর্কে জানবার আগ্রহ আরও অনেকখানি বেড়ে গেছে। মার্কিন মহাকাশ-বিজ্ঞানীরাও শুক্রের রহস্য উদ্‌ঘাটনের জন্যে কিভাবে কখন এই গ্রহের সৃষ্টি হয়েছে, কি কি উপাদানে এই গ্রহ গঠিত—ইত্যাদি বিষয় জানবার জন্যে খুবই উৎসুক। পৃথিবীসহ সৌরমণ্ডলীর প্রায় সকল গ্রহই ঘড়ির কাঁটা যে দিকে ঘোরে, তার বিপরীতমুখী হয়ে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে।

নিজের অক্ষদণ্ডের উপরেও ঐ সকল গ্রহ এই ভাবেই আবর্তিত হচ্ছে। শুক্রগ্রহও ঐ সকল গ্রহের মতই সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে। কিন্তু এই গ্রহটি নিজের অক্ষদণ্ডের উপর অন্যান্য গ্রহের মত আবর্তিত হয় না—ঘড়ির কাঁটা যে দিকে ঘোরে, এটি সেই দিকেই ঘুরছে ; অর্থাৎ শুক্রগ্রহে যদি কেউ থেকে থাকে, তবে সে দেখবে শুক্রের আকাশে সূর্য পশ্চিম দিকে উদিত হচ্ছে আর অস্ত যাচ্ছে পুব দিকে। বিজ্ঞানীরা আজও এই রহস্যের সন্ধান করতে পারেন নি।

'বিজ্ঞান জিজ্ঞাসা'

সম্প্রতি বহরমপুর থেকে 'বিজ্ঞান জিজ্ঞাসা' নামক একটি মাসিক পত্রিকা (55, একজিবিশন বাগান রোড, গোরাবজার, ডাকঘর বহরমপুর, জেলা মুর্শিদাবাদ, মূল্য প্রতি সংখ্যা 25 পয়সা) প্রকাশিত হচ্ছে। ডিসেম্বর মাসে (1970) পত্রিকাটির এক বছর পূর্ণ হবে। মফঃস্বলে প্রকাশিত এই জাতীয় বিজ্ঞান মাসিকের গুরুত্ব যথেষ্ট। পত্রিকাটিতে বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে সহজবোধ্য প্রবন্ধাদি এবং বিজ্ঞান সংক্রান্ত আরও নানা তথ্যাদি প্রকাশিত হয়। তবে প্রবন্ধ, সংবাদ ইত্যাদির সঙ্গে প্রাসঙ্গিক ছবি দু-একখানা দিতে পারলে পত্রিকাটি সাধারণের কাছে আরও আকর্ষণীয় হতো। আমরা পত্রিকাটির উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।
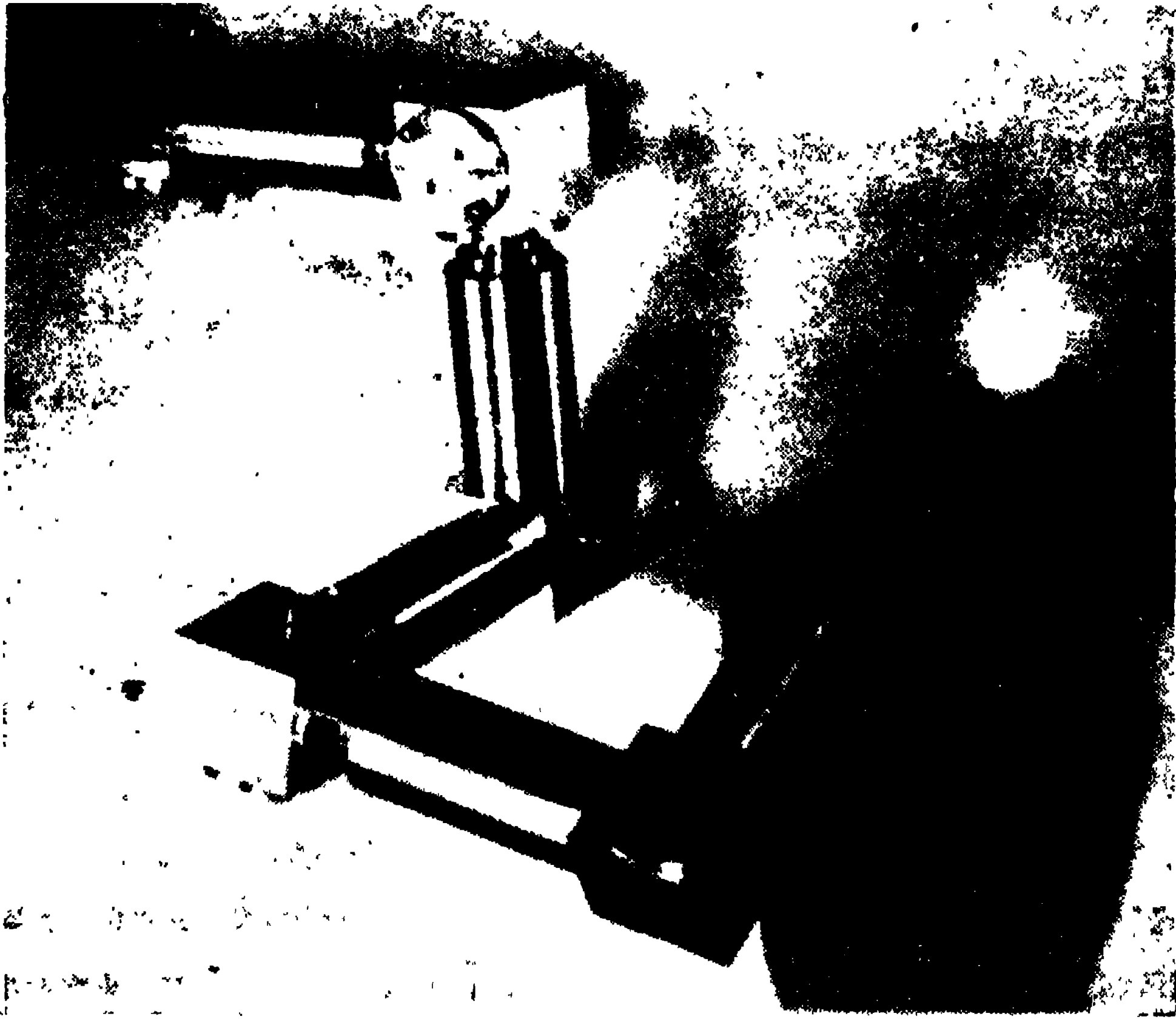
শল্যচিকিৎসকদের ব্যবহারোপযোগী লেসার রশ্মির এক রকম আলোর ছুরি। এই ছুরিটিকে যে কোন দিকে নড়ানো যায়। লেসার রশ্মিকে বাহুর উপরে স্থাপিত প্রিজ্‌মের মধ্য দিয়ে ইচ্ছামত যে কোন ভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

শোক-সংবাদ

প্রোফেসর সি. ভি. রামন

প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ও নোবেল পুরস্কারবিজয়ী প্রোফেঃ চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রামন গত 21শে নভেম্বর ব্যাঙ্গালোরে 82 বছর বয়সে পরলোক গমন করেছেন।

প্রোফেঃ রামন 1888 সালের 7ই নভেম্বর দক্ষিণ ভারতের ত্রিচিনোপল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মাদ্রাজের প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে বি. এ. ও এম. এ. ডিগ্রী লাভ করেন। বি. এ. ডিগ্রী অর্জন করবার পূর্বেই তিনি বিজ্ঞানের মৌলিক গবেষণায় কৃতিত্বের পরিচয় দেন। 1906 সালে আলোক-বিজ্ঞানে তাঁর মৌলিক গবেষণার বিষয় লণ্ডনের ফিলোসফিক্যাল ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়। সে সময়ে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ভারতীয় যুব সম্প্রদায়ের উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণের কোন সুবিধা ছিল না। কাজেই তিনি ভারত গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক অনুষ্ঠিত এক প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় যোগদান করেন এবং পরীক্ষায় সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করে মাত্র 19 বছর বয়সে গেজেটেড অফিসাররূপে ইণ্ডিয়ান ফাইন্যান্স ডিপার্টমেণ্টের কাজে নিযুক্ত হন। 1907 সালের জুন থেকে 1917 সালের জুলাই পর্যন্ত তিনি কলকাতা, নাগপুর এবং রেঙ্গুনে দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই কাজে নিযুক্ত থাকা সত্ত্বেও তিনি বৈজ্ঞানিক গবেষণায় বিরত থাকেন নি। এই সময়ের মধ্যেই নেচার, ফিলোসফিক্যাল ম্যাগাজিন, ফিজিক্যাল রিভিউ পত্রিকায় তাঁর মৌলিক গবেষণা সংক্রান্ত প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হয়।

গবেষণায় কৃতিত্বের জন্যে তাঁর প্রতি বিদ্বজ্জন সমাজের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় এবং 1915 সালে সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তাঁকে পদার্থ-বিজ্ঞানের পালিত চেয়ার গ্রহণের আমন্ত্রণ জানান। বিজ্ঞানের সেবায় পুরাপুরি আত্মনিয়োগ করতে পারবেন বলে ভবিষ্যৎ আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করেও তিনি সার আশুতোষের এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন এবং সরকারী চাকুরী পরিত্যাগ করে 1917 সালে বিজ্ঞান কলেজে যোগদান করেন। যোল বছর তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। 1921 সালে বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয় সম্মেলনে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরূপে ইংল্যাণ্ডে যান। তিনি কলকাতার ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েসন ফর দি কালটিভেসন অব সায়েন্সের অবৈতনিক সেক্রেটারী পদেও নিযুক্ত ছিলেন। ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বৌবাজারের এই ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েসনের লেবরেটরীতে তাঁর অধিকাংশ গবেষণার কাজ পরিচালিত হয়েছিল।

1924 সালে প্রোফেসর রামন লণ্ডনের রয়েল সোসাইটির ফেলো (এফ. আর. এস.) নির্বাচিত হন। ঐ বছরেই তিনি যুক্তরাজ্যে বৃটিশ অ্যাসোসিয়েসন ফর দি অ্যাডভ্যান্সমেণ্ট অব সায়েন্সের অধিবেশনে যোগদানের জন্যে আমন্ত্রিত হন। তিনি টরোণ্টোতে বৃটিশ অ্যাসোসিয়েসন এবং ইণ্টার ন্যাশন্যাল কংগ্রেস অব ম্যাথেমেটিক্সের অধিবেশনে আলোর বিচ্ছুরণ বা স্ক্যাটারিং সম্বন্ধে আলোচনার সূত্রপাত করেন। পরবর্তী সময়ে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের ফিলাডেলফিয়ার ফ্রাঙ্কলিন ইনষ্টিটিউটের শতবার্ষিকী উৎসবে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন। যুক্তরাষ্ট্রে থাকবার সময় প্রোফেসর রামন প্রোফেঃ আর. কে. মিলিকানের আমন্ত্রণে ক্যালিফোর্ণিয়া ইনষ্টিটিউট অব টেকনোলজীতে ভিজিটিং প্রোফেসর হিসাবে চার মাস অতিবাহিত করেন। 1925 সালে তিনি

ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন এবং ঐ বছরেই মস্কো ও লেনিনগ্রাড অ্যাকাডেমী অব সায়েন্সের আমন্ত্রণে ঐ প্রতিষ্ঠানের দ্বি-শতবার্ষিকী উৎসবে যোগদানের জন্যে তিনি পুনরায় ইউরোপ যাত্রা করেন।

1929 সালে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট প্রোফেসর রামনকে নাইট উপাধিদানে সম্মানিত করেন। 1928 সালে ইটালিয়ান সোসাইটি অব সায়েন্সেস ম্যাটেউচি মেডাল এবং 1930 সালে রয়েল সোসাইটি হিউজেস মেডাল দিয়ে তাঁকে পুরস্কৃত করেন। 1930 সালে তিনি রামন একেক্ট নামক যুগান্তকারী আবিষ্কারের জন্যে পদার্থবিস্থায় নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। তিনি নোবেল পুরস্কারের অর্থের বৃহদংশই তাঁর লেবরেটরীর কাজের জন্যে (ক্রষ্ট্যালোগ্রাফী) হীরক ক্রয়ে ব্যয় করেন। তাঁর মৃত্যুর আগে পর্যন্তও তিনি হীরক সংগ্রহ করে গেছেন এবং মোট 700-এর বেশী হীরকখণ্ড সংগ্রহ করেন। 1941 সালে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের ফ্রাঙ্কলিন পদক লাভ করেন। ক্রষ্ট্যালোগ্রাফী সম্বন্ধে গবেষণায় তিনি খুব আগ্রহী ছিলেন এবং 1948 সালে হার্ভার্ডে অনুষ্ঠিত প্রথম আন্তর্জাতিক ক্রষ্ট্যালোগ্রাফী কংগ্রেসে যোগদান করেন।

'মলিকিউলার স্পেক্ট্রাম' সম্বন্ধে আলোচনার উদ্বোধনের জন্যে 1929 সালে তিনি ফ্যারাডে সোসাইটি কর্তৃক আমন্ত্রিত হন এবং এই উপলক্ষে ইউরোপের বহু গবেষণা কেন্দ্র পরিদর্শন ও বক্তৃতা প্রদান করেন। নোবেল পুরস্কার গ্রহণ উপলক্ষে 1930 সালে, প্যারিসে ডক্টরেট ডিগ্রি গ্রহণ উপলক্ষে 1932 সালে, প্যারিস এবং বলোগ্নায় আন্তর্জাতিক ফিজিক্স কংগ্রেস উপলক্ষে 1937 সালে তিনি ইউরোপ পরিভ্রমণ করেন। তিনি ইণ্ডিয়ান জার্নাল অব ফিজিক্স-এর সম্পাদনাও করেছেন।

1933 সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে ব্যাঙ্গালোরের ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব সায়েন্সের ডিরেক্টর হিসাবে যোগদান করেন এবং চার বছর পরে পদত্যাগ করেন। তিনি ইণ্ডিয়ান অ্যাকাডেমি অব সায়েন্স প্রতিষ্ঠানের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। 1943 সালে তিনি রামন রিসার্চ ইনষ্টিটিউট স্থাপন করেন। পরবর্তী কালে এখানেই তাঁর বৈজ্ঞানিক গবেষণা পরিচালিত হয়।

দেশ-বিদেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে তিনি অনেক সম্মান ও উপাধি লাভ করেছেন। প্যারিস ইউনিভার্সিটি অনারেরী ডি. এস-সি, গ্লাসগো ইউনিভার্সিটি এল. এল. ডি., ফ্রেইবার্গ ইউনিভার্সিটি অনারেরী পি-এইচ. ডি ডিগ্রি দিয়ে তাঁকে সম্মানিত করেছেন। কলকাতা, বম্বে, মাদ্রাজ, বারানসী হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়ও তাঁকে অনারেরী ডি. এস-সি ডিগ্রি দিয়ে সম্মানিত করেন। গ্লাসগোর রয়েল ফিজিক্যাল সোসাইটি, জুরিক ফিজিক্যাল সোসাইটি, মিউনিকের ডয়েট অ্যাকাডেমি, হাঙ্গারিয়ান সায়েন্স অ্যাকাডেমি, ইণ্ডিয়ান কেমিক্যাল ও ম্যাথেমেটিক্যাল সোসাইটি এবং অন্যান্য বহু প্রতিষ্ঠানের তিনি ফেলো নির্বাচিত হন। 1929 সালে তিনি ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের মূল সভাপতি নির্বাচিত হন। তিনি আমেরিকার অপ্‌টিক্যাল সোসাইটির অনারেরি ফেলো এবং ফরাসী অ্যাকাডেমির করেন অ্যাসোসিয়েট এবং রাশিয়ান অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সের করেসপণ্ডিং মেম্বর নির্বাচিত হন। 1949 সালে প্রোফেঃ রামন ভারতের জাতীয় অধ্যাপক নির্বাচিত হন। 1954 তাঁকে 'ভারতরত্ন' উপাধি দিয়ে সম্মানিত করা হয়। 1961 সালে তিনি পন্টিফিক্যাল অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সে নির্বাচনের জন্যে ভ্যাটিকান কর্তৃক মনোনীত হন। 1957 সালে তিনি আন্তর্জাতিক লেনিন পুরস্কার লাভ করেন।

প্রোফেসর রামন অন্তরের কামনায় বৈজ্ঞানিক গবেষণায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন এবং জীবনসায়াহ্নেও সেই গবেষণা চালিয়ে গেছেন—এটাই হলো

হলো তাঁর জীবনের প্রধান বৈশিষ্ট্য। বিদেশের গবেষণাগারসমূহে শিক্ষালাভ না করেও নিজের চেষ্টায় তিনি বিজ্ঞানীমহলে শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন।

নীরস পদার্থবিদ্যায় গবেষণায় ব্যাপৃত থাকলেও প্রোফে: রামনের সৌন্দর্যস্পৃহা এবং রসবোধও কম ছিল না। সঙ্গীত যন্ত্র, আলোক-তরঙ্গের বিচিত্র অভিব্যক্তি, সমুদ্রের রং, পাখীর পালকের বর্ণ-বৈচিত্র্য, শামুক-ঝিনুকের খোলার রামধনুর রং, স্ফটিকের কম্পন, বিশেষ করে ফ্লোরেসেন্স, ফস্‌-ফোরেসেন্স প্রভৃতি বিষয় সংক্রান্ত হীরকের গঠন, আণবিক সংস্থান ও সৌসাদৃশ্য বিষয়ে বিবিধ গবেষণার মধ্যেও তাঁর সূক্ষ্ম সৌন্দর্যবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। এক্স-রশ্মির ডিফ্র্যাক্‌শন এবং ফুলের রং সম্বন্ধেও তিনি উল্লেখযোগ্য গবেষণা করেছেন। প্রোফে: রামন এবং তাঁর অনুগামীরা বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা করলেও মূলতঃ সেগুলি আলোক-বিজ্ঞানেরই বিভিন্ন দিক মাত্র। ক্রিষ্ট্যাল-ফিজিক্স, বিশেষতঃ ডায়মণ্ড-ফিজিক্সের উপরই তাঁর অনুরাগ ছিল বেশী। বিজ্ঞানীমহলে ডায়মণ্ড-ফিজিক্স সম্বন্ধে প্রোফে: রামন ছিলেন একজন অবিসম্বাদী বিশেষজ্ঞ।

ইন্দুভূষণ চট্টোপাধ্যায়

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের অন্যতম সহ-সভাপতি, অবিভক্ত বাংলার কৃষি বিভাগের শারীরবৃত্তির রসায়নবিদ্‌ এবং ভারত সরকারের সহ-কৃষি কমিশনার ইন্দুভূষণ চট্টোপাধ্যায় গত 27শে অক্টোবর 1970, ভোরে হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল 85 বৎসর। সম্প্রতি তাঁর জামাতা কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের নিউরোলজি ও সাইকিয়াট্রি বিভাগের প্রধান ডাঃ জে. বি. মুখার্জীর অকাল মৃত্যুতে তিনি প্রচণ্ড মানসিক আঘাত পান।

তিনি বারাণসীর সেন্ট্রাল হিন্দু কলেজ ও নাগপুরের কৃষি কলেজে শিক্ষালাভ করবার পর শিক্ষানবীশ হিসাবে নাগপুর এবং পরে পুসার ইম্পিরিয়াল এগ্রিকালচার্যাল রিসার্চ ইনষ্টিটিউট থেকে Dr. J. W. Heathe-এর তত্ত্বাবধানে কৃষি-রসায়ন এবং জীবাণু তত্ত্ব সম্বন্ধে স্নাতকোত্তর শিক্ষা গ্রহণ করেন। Sabour Agricultural Callege-এ কৃষিবিষয়ক শিক্ষক হিসাবে তিনি কর্ম-জীবন সুরু করেন (1912—1915)। অখণ্ড

ইন্দুভূষণ চট্টোপাধ্যায়

বাংলার ঢাকায় অবস্থিত প্রাদেশিক Agricultural Chemist-এর বিভাগে তিনি যোগদান করেন। তাঁকে 1932 সালের জানুয়ারী মাসে অবিভক্ত বাংলার Physiological Chemist হিসাবে নিযুক্ত করা হয়। তিনি Agricultural Chemist হিসাবেও কিছুকাল কাজ করেন। ইতিমধ্যে তিনি Indian Institute of Dairing and Animal Husbandry-তে (ব্যাঙ্গালোরে) প্রখ্যাত গবেষক Dr. F. J. Warth-এর তত্ত্বাবধানে প্রাণীর পুষ্টি বিষয়ক গবেষণা করেন। 1943 সালে

এই কাজ থেকে অবসর নেন। অবসর গ্রহণের পর তিনি ভারত সরকারের সহকারী কৃষি অধ্যক্ষ-রূপে এবং 18 মাস এগ্রিকালচারাল কমিশনারের অনুপস্থিতিতে কমিশনারের গুরু দায়িত্ব দক্ষতার সঙ্গে পালন করেন। তিনিই প্রথম বাঙালী, যিনি সর্বপ্রথম এই পদের অধিকারী হন। এর পর তাঁর বার্ধক্য সত্ত্বেও ডক্টর পি. সি. মহলানবীশ তাঁর ষ্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনষ্টিটিউটে গবেষণামূলক কাজে তাঁকে নিযুক্ত করেন এবং তিনিও 75-80 বছর বয়স পর্যন্ত একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে গবেষণার কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

Physiological Chemist থাকবার সময় তিনি তাঁর সমস্ত উৎসাহ ও উদ্দীপনা প্রাণীদের পুষ্টি বিষয়ক গবেষণায় নিয়োগ করেন এবং প্রাণীদের খাদ্য ও পুষ্টি সম্বন্ধে প্রচুর গবেষণা করে এই বিষয়ে যথেষ্ট আলোকপাত করে গেছেন। বিশেষ করে তাঁর উদ্ভাবিত পরিপাক পরিমাণ নিরূপণের পদ্ধতি (Special method of estimating digestibility) ভারতের বাইরেও স্বীকৃতি লাভ করে। এছাড়া তিনি চুনের প্রয়োজনীয়তা এবং জীবদেহে ফস্‌ফেটের রাসায়নিক রূপান্তর বা বিপাক সম্বন্ধীয় পদ্ধতির উদ্ভাবন করেন। পুষ্টি ও কৃষি এবং অনুরূপ অন্যান্য বিষয়ে তিনি প্রচুর গবেষণা করে এই সব বিষয়ে পুস্তিকা রচনা করেন। এই সঙ্গে দৈনিক পত্রিকা, ভারতবর্ষ, বসুমতী, বসুন্ধরা ইত্যাদিতে খাদ্য ও পুষ্টি প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে প্রবন্ধাদি প্রকাশ করেছেন। তাছাড়া তাঁর "Is our country really deficeit in food" নামক পুস্তিকা বিশেষ সমাদর লাভ করেছে। তিনি কর্মজীবনে কৃষি ও পুষ্টি সম্বন্ধে যথাক্রমে পনেরো ও একুশটি, ইণ্ডিয়ান স্টাটিস্টিক্যাল ইনষ্টিটিউটে উনিশটি, একটি হিন্দীসহ আঞ্চলিক ভাষায় উনত্রিশটি এবং প্রখ্যাত কৃষি বৈজ্ঞানিকদের জীবনী বিষয়ে চারটি—মোট অষ্টআশীটি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রচনা করেন।

তিনি নিজের গবেষণা ও অনুরূপ কাজে ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান, যেমন—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, Dept. of Agr. West Bengal, Indian Science Congress ইত্যাদির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রেখেছিলেন। তিনি ভারত সরকারের Imperial Council of Agricultural Research এর সদস্য এবং পরে Indian Council of Agricultural Research-এর সদস্য ছাড়াও Nutrition paper-এর Specialist Refree ছিলেন। তিনি West Bengal Board of Agriculture, Animal Husbandry and Veterinary, State Agricultural Research Committee, Faculty of Agriculture, Indian Dairy Science Association, Indian Science Congress, Socio-Economic Research Institute, Calcutta Science Club, Bharatiya Sanskrit Parishad এবং অনুরূপ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

রেডিও-ফটো

খবরের কাগজ বা কোন সাময়িক পত্রিকা খুলে যখন চোখ বুলিয়ে দেখ, তখন চোখে পড়বে হঠাৎ একটা ছবি, যার তলায় ছোট করে লেখা আছে—রেডিও ফটো। এই সম্পর্কে তোমাদের জানবার কৌতূহল হওয়া খুবই স্বাভাবিক। কেন না, যে ক্যামেরা সাধারণতঃ তোমরা দেখে থাক তাতে ছবি তোলা খুবই সহজ—তবে সঙ্গে সঙ্গে সেটাকে হাজার হাজার মাইল দূরে পাঠানো খুবই শক্ত ব্যাপার। এই সব ক্ষেত্রে যে আলোকচিত্র গ্রহণের পদ্ধতি প্রচলিত আছে, তাকে বলে বেতারচিত্র বা Radio-photographic পদ্ধতি। এখানে মনে রাখতে হবে, এই পদ্ধতির সঙ্গে টেলিভিশনের তফাৎ আছে। বেতারচিত্র প্রেরণ পদ্ধতিতে প্রেরিত চিত্রটির সঙ্কেত কোন দূরবর্তী স্থানে পাঠাবার পর তার একটি নিখুঁত স্থির চিত্র পাওয়া যাবে। কিন্তু টেলিভিশনের ক্ষেত্রে হবে ঠিক তার বিপরীত; অর্থাৎ চলমান চিত্রটি বেতারে প্রেরণ করবার পর দর্শক তার সামনে ঠিক সেই দৃশ্যটির চলমান অবস্থার তাৎক্ষণিক প্রতিচ্ছবি দেখতে পাবে। যাহোক, রেডিও ফটোগ্রাফিতে তোলা ছবি বেতার-তরঙ্গ মারফৎ এসে ধরা দেয় একটা বিশেষ ধরণের গ্রাহক-যন্ত্রে এবং তৎক্ষণাৎ বিশেষ প্রকার কাগজে তার ছাপার কাজ সরাসরি সংঘটিত হয়। এই ধরণের প্রত্যেক ক্যামেরার সঙ্গে একটি করে ফটো-ইলেকট্রিক সার্কিট থাকে, যা এর তোলা ছবি দূরবর্তী স্থানে পাঠাতে সক্ষম হয়। যতটা সহজে বলা হলো এর গঠন-কৌশল কিন্তু ততটা সরল নয়। সেটা বুঝতে গেলে প্রথমতঃ ফটো-সেল সম্বন্ধে ভালভাবে জানতে হবে। এই ফটো-সেল বা আলোক-কোষের ব্যবহার আজকের যুগে অত্যন্ত ব্যাপক। রেডিও-ফটো ছাড়াও, বিভিন্ন প্রকার টেলিভিসন এবং দূরপাল্লার ক্ষেত্রে যাবতীয় দৃশ্যমান বস্তুর সরাসরি সঙ্কেত প্রেরণে এর জুড়ি নেই। ফটো-সেল এমন একটি যান্ত্রিক ব্যবস্থা, যার মধ্যে এক প্রকার বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় আলোর বিকিরণ ক্রিয়ার ফলে। এই বিদ্যুৎকে বলা হয় আলোক-বিদ্যুৎ বা ফটো-ইলেকট্রিসিটি।

সাধারণতঃ তিন রকমের ফটো-সেল আমরা দেখতে পাই—(1) ফটো-এমিসন জাতীয়, যার মধ্যে যে কোন একটি ইলেকট্রোডের উপর বিকিরিত আলো এসে পড়লে ইলেকট্রন

কণিকা নির্গত হয়; (2) ফটো-কণ্ডাক্টিভ জাতীয়, যার মধ্যে বিকিরিত আলো এসে পড়লে সেলের Ohmic বাধার সৃষ্টি করে। (3) ফটো ভল্টাইক জাতীয়, যার মধ্যে বিকিরিত আলো একটি ইলেকট্রোমোটিভ ফোর্স উৎপন্ন করে। এর মধ্যে ফটো-ভল্টাইক জাতীয় সেলের ব্যবহার সবচেয়ে বেশী। তার কারণ প্রধানতঃ তিনটি: (1) প্রচুর বিদ্যুৎ-শক্তির উৎপত্তি, (2) যথেষ্ট শক্তিসম্পন্ন এবং (3) বাইরের কোন ব্যাটারীর সাহায্য ব্যতিরেকেই কর্মক্ষম। এছাড়া সকল প্রকার দৃশ্যমান আলোর ক্ষেত্রেই এই সেলটিকে ব্যবহার করা চলে।

বেতার আলোকচিত্রের ক্ষেত্রে এই কোষকে ব্যবহার করা হয়। এই জাতীয় কোষগুলির অবশ্য উন্নত সংস্করণের ইলেকট্রোডগুলি নানা প্রকার ধাতু এবং ধাতব যৌগিক দিয়ে তৈরি হয়। এগুলি পরস্পরের সংস্পর্শে পাশাপাশি অবস্থিত থাকে। প্রধানতঃ নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে সাজানো থাকে: তামা এবং তামার অক্সাইড (Cu_2O) ঘটিত, রৌপ্য-লৌহের সেলেনাইড জনিত, লৌহ-সেলেনিয়াম জাতীয়।

এই ফটো-সেলের সঙ্গে বেতার আলোকচিত্র বা অন্য কথায় নিখুঁৎ চিত্র প্রেরণ-পদ্ধতির সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। রেডিও-ফটো যন্ত্রের দুটি প্রধান অংশ আছে—একটির কাজ প্রেরণ করা আর অপরটির কাজ প্রেরিত চিত্র গ্রহণ করা।

1নং চিত্র
প্রেরক-যন্ত্র

1নং চিত্র থেকে বোঝা যায় যে, প্রেরক-যন্ত্রের মুখ্য অংশগুলির মধ্যে আছে—(1) একটি নিয়ন্ত্রিত ঘূর্ণায়মান কম্পক (R. C. Osclillator), (2) একটি ছোট মোটর, যেটা গিয়ারের সাহায্যে স্যাফ্ট-এর সঙ্গে যুক্ত, (3) একটি লেড স্ক্রু, (4) একটি স্ক্যানিং বা বিশ্লেষক ড্রাম, (5) একটি উত্তেজক আলো এবং (6) একটি ফটো-টিউবের ব্যবস্থা।

এই যে ফটো-টিউব সার্কিট, এতে আছে একটি ফটো-সেল, যার একমাত্র কাজ

হলো, কোন বস্তু থেকে আসা আলো-কে বিদ্যুৎ-তরঙ্গে পরিণত করে দূরে পাঠিয়ে দেওয়া। নিশ্চয়ই এবার জানতে ইচ্ছা হয়, কেমন করে এই ছবি পাঠানো যায়। প্রথমে মোটরের সাহায্যে আবর্তিত স্যাফ্‌ট-এর সঙ্গে লাগানো বিশ্লেষক ড্রামটিকে স্যাফ্‌ট-এর চারদিকে ঘোরাতে হবে। এই ড্রামটির ঘূর্ণনকাল হবে প্রতি সেকেণ্ডে 1 পাক। এটা হবে নিজের চারদিকে। অপর দিকে দৈর্ঘ্য বরাবর হবে প্রতি পাকে 1 ইঞ্চির 100 ভাগের এক ভাগ। এই ভাবে দৃশ্যটির বা ছবিটির প্রতিটি অংশ সরতে থাকবে এবং তার সামগ্রিক ক্ষেত্রের প্রতিটি মৌলিক ক্ষেত্রাংশ থেকে আসা আলো ফটো-টিউবকে ক্রমাগত উত্তেজিত করবে। এইভাবে টিউবটি একটি নির্দিষ্ট হারে সমগ্র চিত্রটিকে বিভক্ত করবে। এই হারটি হচ্ছে প্রতি সেকেণ্ডে 1000টি মৌলিক ক্ষেত্রাংশ। সুতরাং যদি চিত্রটিতে 500,000 মৌলিক ক্ষেত্রাংশ থাকে, তবে ফটো-টিউবটি তাকে মাত্র 8 মিঃ সামগ্রিকভাবে ভাগ করতে পারবে। কোন কোন ক্ষেত্রে তার চেয়েও কম সময়ে এই কাজটি সম্পন্ন হয়ে থাকবে। সুতরাং ছবিটির নির্দেশ প্রেরণের কাজও খুব দ্রুতগতিতে হবে। এখন ছবি থেকে যে সঙ্কেত গেল, গ্রাহক-যন্ত্র তাকে ধরলো এবং প্রথমেই তাকে বর্ধিত করে নিল। ফলে একটি নির্দেশক নিওন আলো জ্বলে উঠলো। সেই আলোক রশ্মিকে একটি ছোট ছিদ্রের ভিতর দিয়ে পাঠানো হলে সেটা গিয়ে কেন্দ্রীভূত হবে একটি আলোক-স্পর্শকাতর কাগজের উপর। এই কাগজটি জড়ানো থাকে একটি ড্রামের উপর। সমগ্র গ্রাহক-যন্ত্রটি প্রেরক-যন্ত্রের অনুরূপ। তবে এই যন্ত্রটি সাধারণতঃ একটি অন্ধকার ঘরে
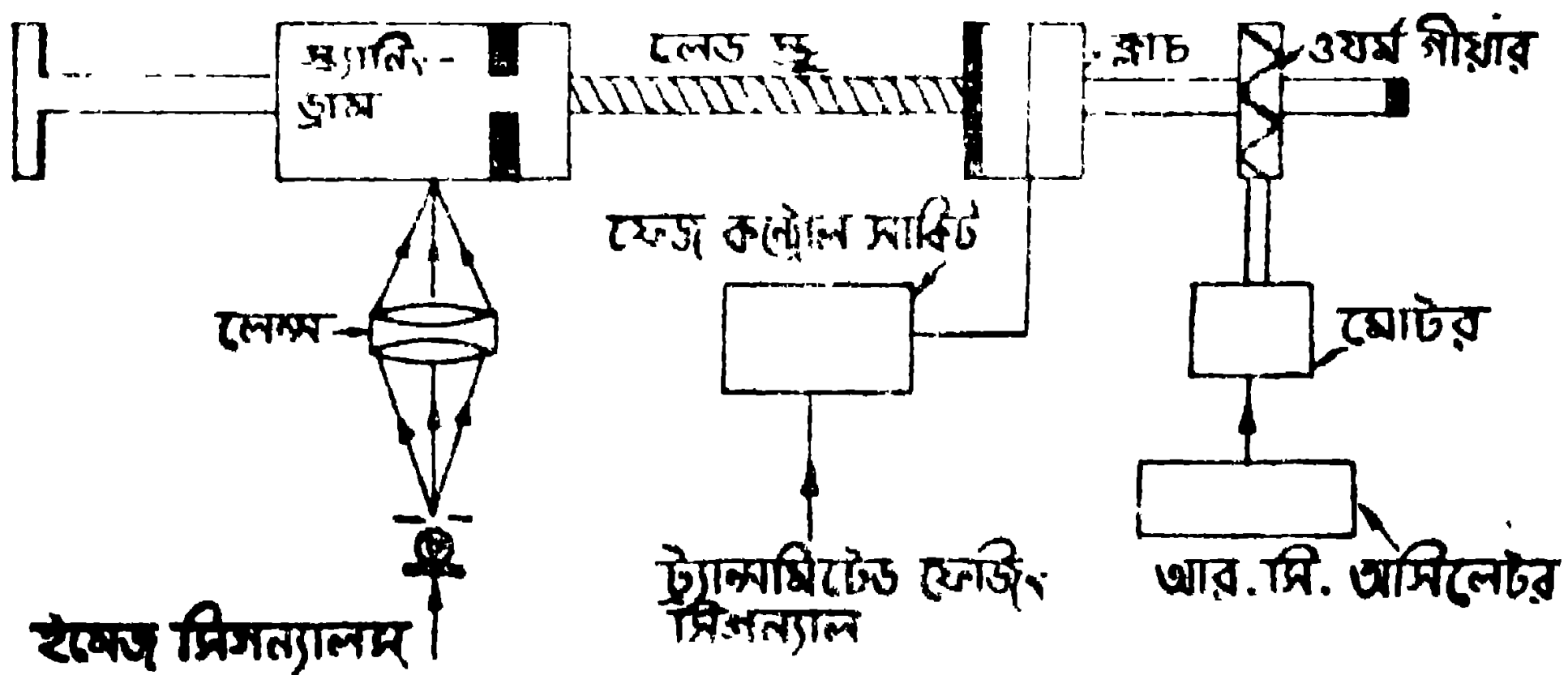
2নং চিত্র
গ্রাহক-যন্ত্র

অথবা চতুর্দিক ঢাকা এমন একটি প্রকোষ্ঠে রাখা হয়, যেখানে ঐ নিওন ল্যাম্পের আলো ছাড়া আর কোন বাইরের আলো প্রবেশ না করে। এখন গ্রাহক-যন্ত্রের বিশ্লেষক ড্রামটি প্রেরক-যন্ত্রের বিশ্লেষক ড্রামের সঙ্গে ঠিক সমহারে আবর্তিত হচ্ছে। সুতরাং আলোক-স্পর্শকাতর কাগজের একটি বিশেষ মৌলিক ক্ষেত্রাংশে পড়া আলোর তীব্রতা নির্ভর করে

সেই মুহূর্তে রেকর্ডার ল্যাম্পের উপর আসা আলোক-সঙ্কেতের তীব্রতার উপর। তোমরা পূর্বেই জেনেছ যে, এই সংঙ্কেতের তীব্রতা নির্ভর করে ঐ মুহূর্তে প্রেরিত ছবিটির বিশ্লেষিত মৌলিক ক্ষেত্রাংশের ঔজ্জ্বল্যের উপর। অতএব চিত্র গ্রহণের কাগজটি ঘূর্ণায়মান অবস্থায় বিভিন্ন তীব্রতার আলোক রশ্মির দ্বারা আলোকিত হয়। যখন বিশ্লেষণ-ক্রিয়া শেষ হয়, তখন কাগজটি ডেভেলপ করা হলে একটি সুন্দর প্রতিচ্ছবির সৃষ্টি হয়। অবশ্য বর্তমানে সরাসরি প্রতিচ্ছবি গ্রহণের অনেকগুলি পদ্ধতি প্রচলিত হয়েছে. যার ফলে ফটোগ্রাফীর প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম, অন্ধকার প্রকোষ্ঠ প্রভৃতির আর প্রয়োজন হয় না। পদ্ধতিগুলির মধ্যে একটিতে প্রতিচ্ছবি গ্রহণ করা হয় একটি বিশেষ ধরণের কাগজের উপর দহন-ক্রিয়ার সাহায্যে। গ্রাহক ল্যাম্পের পরিবর্তে সেখানে একটা ষ্টাইলাস অথবা অনুরূপ সুচালো কোন যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। একটি জোরালো আলোক-সঙ্কেত গ্রহণ করবার পর প্রচণ্ড শক্তিসম্পন্ন বিদ্যুৎ-স্তরের সৃষ্টি হয় ড্রাম এবং ষ্টাইলাস প্রান্তের মধ্যে এবং লব্ধ বিদ্যুৎ-প্রবাহ কাগজটির সাদা অংশকে দহন করে আর সঙ্গে সঙ্গে কালো আস্তরণের সৃষ্টি হয়। এই আস্তরণের ঘনত্ব নানা জায়গায় নানা রকম হবার ফলে সম্পূর্ণ বিশ্লেষণের পর একটি নিখুঁৎ প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায়। গ্রাহক-যন্ত্রের দ্বারা উৎপন্ন সঙ্কেতগুলির উপযুক্ত পরিবর্ধন এবং তাদের আপেক্ষিক প্রসারতা নির্দিষ্ট করলে তার ফলে পছন্দমত সাদা-কালোয় মেশানো একটি তুলনামূলক ছবি পাওয়া যায়। তবে ঐ সঙ্কেতগুলিকে ঠিকমত নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। কোন কোন সময় ছবি অস্পষ্ট হয়। কেন না, সে ক্ষেত্রে সঙ্কেতগুলির আসবার পথ খুব দীর্ঘ হওয়ায় ভিন্ন ভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ে। তাই নানা প্রকার গোলমালজনিত বাধা ছবির মধ্যে অসাম্য এবং দাগের সৃষ্টি করে। সেই কারণে একটি কম্পন-নিয়ন্ত্রক ব্যবহার করা হয়। বর্তমানে বেতার আলোকচিত্র প্রেরণে কম্পন-নিয়ন্ত্রকটিকে 88 মেগা সাঃ থেকে 108 মেগা সাঃ ব্যাণ্ডে কাজ করানো হয়। আধুনিক কালে এই পদ্ধতির আরও উন্নতি হয়েছে। এখন এক জোড়া নিয়ন্ত্রকের দ্বারা কম্পন-নিয়ন্ত্রণ করা হয় এবং গ্রাহক-যন্ত্রে কোন রকম অস্পষ্টতা বা এলোমেলো ভাব অনেকাংশে দূর করা হয় একটি Limiter-এর সাহায্যে। সঙ্কেতগুলির ক্রমাগত নিয়ন্ত্রণের ফলে একটি পরিষ্কার নিখুঁৎ আলোকচিত্র পাওয়া যায়।

এই ধরণের চিত্র প্রেরণ-পদ্ধতি মিলিটারীতে এবং খবরের কাগজের অফিসে ব্যবহার করা হয়। আলোকচিত্র, লেখা বা ছাপানো কোন বিষয়, চার্ট বা মানচিত্র, ছবি প্রভৃতি তাড়াতাড়ি পাঠাবার কাজ এর দ্বারা সহজে সম্ভব হয়। বড় হলে বিষয়টি আরও বেশী করে জানতে পারবে, তখন তোমাদের ধারণা আরও পরিস্কার হবে।

শ্রীবিশ্বনাথ বড়াল

ভারতের জাতীয় পাখী—ময়ূর

অপরূপ রূপলাবণ্য এবং বহু ঐতিহ্যের অধিকারী ময়ূর যে ভারতের জাতীয় পাখী, সে কথা নিশ্চয়ই তোমাদের জানা আছে। ময়ূরকে ভারতের নিজস্ব পাখী বললে ভুল হয় না। এদেশের কয়েকটি জায়গা বাদ দিলে প্রায় সব অঞ্চলেই ময়ূর পাওয়া যায়। রাজস্থান, উত্তর প্রদেশ প্রভৃতি অঞ্চলে এদের প্রায় সর্বত্রই দর্শন মেলে। পশ্চিম বঙ্গের দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, বাঁকুড়া প্রভৃতি অঞ্চলেও ময়ূর দুর্লভ নয়। ভারত ছাড়া সিংহল, ব্রহ্মদেশ, পাকিস্তান, মালয়, ইন্দোচীন প্রভৃতি দেশেও এদের দেখা মেলে। ভারতে যে ময়ূর দেখা যায়, তার বৈজ্ঞানিক নাম পাভো ক্রিস্‌টেটাস। আর মালয়, ইন্দোচীন প্রভৃতি দেশে যে ময়ূর দেখা যায়, তাদের বলা হয়—পাভো মিউটিকাস।

ভারতীয় ময়ূর এদেশ থেকে নানা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। শোনা যায়—আলেকজাণ্ডারের সময় এদেশ থেকে ময়ূর নিয়ে যাওয়া হয়েছিল গ্রীসে। সেখান থেকে যায় ইউরোপের বিভিন্ন দেশে। প্রায় দু-হাজার বছর আগে ইরানেও ময়ূর নিয়ে যাওয়া হয়।

ময়ূর সমতল ভূমি থেকে প্রায় চার-পাঁচ হাজার ফুট উঁচু পার্বত্য অঞ্চলে থাকতে পারে, তবে তারা খুব উঁচু পাহাড়ে বাস করে না। পাহাড়, জঙ্গল, ঝোপ-ঝাড়ের কাছে যদি জলের উৎস থাকে, তবে সেই সব জায়গা এদের পছন্দ। এরা খুব জল খায়, তাই বোধ হয় জলাশয়ের কাছাকাছি বাস করবার দিকেই ঝোঁক। ঝোপ-ঝাড়, বন-জঙ্গলের কাছে নদী-নালা আছে—এমন সব অঞ্চলেই তারা বাসা তৈরি করে।

ময়ূর সামাজিক পাখী। বনে-জঙ্গলে এরা ঘুরে বেড়ায় দলবেঁধে। একটি ময়ূর তিন-চার বা কিছু বেশী স্ত্রী-ময়ূর নিয়ে এক পরিবারভুক্ত হয়ে বাস করে। দিনের বেলায় এরা মাটির উপর চরে বেড়ায়, তবে গাছের উপর যে থাকে না, তা নয়। দুপুরে কড়া রোদ উঠলে ঝোপ-ঝাড় বা বন-জঙ্গলে আশ্রয় নেয়। সাধারণতঃ ভোরের আলো ফুটে উঠলে বা বিকেলের দিকে এরা বেরিয়ে পড়ে খাদ্যের সন্ধানে। এরা প্রায় সর্বভুক্—নানা রকম শস্য, ফলমূল, ফুলের কুঁড়ি, কচি পাতা, ঘাস-পাতা, ছোট ছোট সরীসৃপ জাতীয় প্রাণী প্রভৃতি এদের খাদ্য। গৃহপালিত ময়ূর ধান, চাল, গম, যব, কপির পাতা, ফল ইত্যাদি খেয়ে থাকে। রাত্রিবেলায় এরা গাছের ডালে গিয়ে আশ্রয় নেয় এবং দলবল নিয়ে সারারাত সেখানেই কাটায়। ভোরের আলো ফুটে উঠলে আর সূর্য ডুবে গেলে এরা এক রকম শব্দ করে, যাকে বলা হয় কেকাধ্বনি। তবে ভয় পেলে এরা যে শব্দ করে, তা কিন্তু কেকাধ্বনি নয়।

ময়ূরের দৃষ্টিশক্তি অতি প্রখর। শোনবার ক্ষমতাও বেশ আছে। সর্বদাই এরা খুব সতর্কভাবে চলাফেরা করে। বনের মধ্যে কোন শত্রুর আগমন হলে এরা সহজেই তা বুঝতে পারে এবং চঞ্চল হয়ে ওঠে, আর বিপদ-সঙ্কেত জানাতে স্ত্রী-পুরুষ মিলে এক রকম শব্দ করে। এরা বেশ লাজুক পাখী। অনেক সময় ময়ূরের আওয়াজ পেলেও তাদের দেখা মেলা ভার। লোকালয়ের কাছাকাছি যে সব ময়ূর থাকে, তারা মানুষকে এড়িয়ে চলে। তবে অনেক সময় তাদের গ্রামের মধ্যে বা লোকালয়ে ঘোরাফেরা করতেও দেখা যায়। এরা পোষও মানে। পোষ মানলে ময়ূর মালিকের হাত থেকে খাবার নিয়ে খায় আর তার পিছনে পিছনে ঘোরে। তবে এরা অন্য কোন পোষা পাখীদের উপর বড় একটা সদয় ব্যবহার করে না।

প্রয়োজনমত ময়ূর হাঁটা-চলা বা ওড়া দুই-ই করতে পারে। নদী-নালা, জলাশয় প্রভৃতি তারা উড়ে পার হয়। আবার বিপদের সময় ছুটে পালাতেও পারে। মজবুত পা-দুটি তাদের একাজে সহায়তা করে। পুরুষদের পা-দুটি শত্রুকে আক্রমণের হাতিয়ার হিসাবেও ব্যবহৃত হয়। তাছাড়া পা দিয়ে মাটি খোঁড়া, আঁচড়ানো প্রভৃতি কাজও হয়। অনেক সময় অসতর্ক মুহূর্তে মানুষকেও এরা আক্রমণ করে থাকে।

স্ত্রী-ময়ূর বছরে একবার করে ডিম পাড়ে। সাধারণতঃ এরা তিনটি থেকে আটটি পর্যন্ত ডিম দিতে পারে। গাছের কোটরে বা শুকনো লতা-পাতা, ঘাস বা খড়কুটা দিয়ে তৈরী বাসায় এরা ডিম পাড়ে। পোষা ময়ূরী বাগানে বা তার আশেপাশে লতা-পাতা, ঘাস ইত্যাদি জমা করে তার মধ্যে ডিম পাড়ে বলে জানা যায়। প্রায় তিন ইঞ্চি লম্বা ডিমগুলির রং সাদা, পীতাভ বা হাল্কা বাদামী। বাচ্চা অবস্থায় অন্ততঃ বেশ কিছুটা বড় না হওয়া পর্যন্ত স্ত্রী-পুরুষ ভেদ করা শক্ত। পুরুষদের পুচ্ছ সম্পূর্ণ সৌন্দর্যমণ্ডিত হতে দু-তিন বছর সময় লেগে যেতে পারে। তবে বাচ্চাদের ঝুঁটি বা শিখা থাকে। ময়ূর দীর্ঘজীবী পাখী।

রামধনুর মত বর্ণবিকাশী অপরূপ পুচ্ছ আর নৃত্যের জন্যে ময়ূরের সবচেয়ে বেশী খ্যাতি। কিন্তু এই পুচ্ছ বা পেখমের বাহার শুধু পুরুষ ময়ূরদেরই আছে, ময়ূরীদের পেখম নেই। বর্ষা-সমাগমে যখন তারা পেখম তুলে নাচে, তখন তা অপরূপ দেখায়। পুচ্ছটি বেশ লম্বা। পুরুষ ময়ূর লম্বায় প্রায় ছ-ফুট পর্যন্ত হয়ে থাকে আর তার পুচ্ছটি হয় প্রায় চার ফুটের মত। ঝোপ-ঝাড়ে চলাফেরা করবার সময় এই পুচ্ছ কোন বাধার সৃষ্টি করে না। এদের পুচ্ছ বেশ হাল্কা ও নমনীয়, তবে বেশ মজবুত ও শক্ত। ময়ূরপুচ্ছ কিন্তু আসলে লেজ নয়, লেজের আচ্ছাদন বলা যেতে পারে। আসল লেজ থাকে এর তলায়। ময়ূর ইচ্ছামত পুচ্ছ খুলতে বা বন্ধ করতে পারে। পেখমতোলা পুচ্ছে বিচিত্র রঙের ঝিকিমিকি দেখা যায়। পুচ্ছের সব পালক কিন্তু সমান নয়। এই পালকে থাকে চক্র আঁকা। ময়ূরকে সংস্কৃতে সহস্রলোচন পাখী বলা হয়। এদের পেখমের পালকের চক্রগুলির জন্যেই এই নাম। শিখা আছে বলে এদের শিখীও বলা হয়।

খাদ্য হিসাবেও ময়ূর একদিন জনপ্রিয় ছিল। প্রাচীন রোম, ইউরোপের ভোজসভায়, বড়দিনের সময় ইংল্যাণ্ডে ও আরও নানা স্থানে ময়ূরের মাংসের কদর ছিল। সম্রাট অশোকও একদিন ময়ূরের মাংসের ভক্ত ছিলেন। অবশ্য তাঁর সময়েই পরে ময়ূর-হত্যা নিষিদ্ধ হয়। মহাভারত ইত্যাদিতে দেখা যায় যে—অভিষেক, ভোজসভায় ময়ূরের মাংসের এক বিশেষ স্থান ছিল। কথিত আছে—ঋতুভেদে ময়ূরের মাংস খেলে নাকি দেহের উপকার হয়। বর্তমানে ভারতবর্ষে ময়ূরের মাংস খাওয়ার চলন নেই। তবে এই সেদিন পর্যন্তও হায়দরাবাদের নিজাম তাঁর সম্মানিত অতিথীদের ময়ূরের মাংস দিয়ে আপ্যায়িত করতেন। ভারতে ময়ূর পবিত্র পাখীরূপে সম্মানিত, কারণ এর সঙ্গে ধর্মবিশ্বাস জড়িয়ে আছে। তাছাড়া তোমরা নিশ্চয় শুনেছ সাহাজানের ময়ূর সিংহাসনের কথা, ময়ূরপঙ্খী নাওয়ের কথা। শ্রীকৃষ্ণের চূড়ায় ময়ূরের পাখা শোভা পায় বা দেব সেনাপতির বাহন যে ময়ূর, তাও তোমাদের অজানা নয়। জৈন সন্ন্যাসীরাও ময়ূরের পালক ধারণ করতেন। দেব-দেবীর অঙ্গসজ্জায়, রাজমুকুটে ও বীর যোদ্ধাদের উষ্ণীষেও শোভা পেত একদিন ময়ূরের পালক। দেবালয়ে, রাজপ্রাসাদে, উদ্যানে, ধনীগৃহে, ঋষির আশ্রম ও তপোবনে ময়ূর-ময়ূরী একদিন মহাউল্লাসে বিরাজ করতো। আজও তার কিছু কিছু নিদর্শন পাওয়া যায়। তাছাড়া গানে, কবিতায় ও সাহিত্যে ময়ূর বহু উল্লেখিত এবং সমাদৃত হয়েছে নানা শিল্পকলায়। এদেশের কাব্য, সাহিত্য, ধর্ম, ইতিহাস, পুরাণ, রূপকথা, শিল্পকলা প্রভৃতিতে আমাদের জাতীয় পাখী ময়ূর এমনভাবে জড়িয়ে আছে যে, যার তুলনা বিরল।

শ্রীবিশ্বনাথ মিত্র*

---

*প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন

ট্যাকিওন্‌স্

তোমরা জান আলোই সবচেয়ে দ্রুতগামী। আর এও জান যে, এর গতিবেগ সেকেণ্ডে প্রায় 1 লক্ষ 86 হাজার মাইল বা 2 লক্ষ 97 হাজার 6 শ' কিলোমিটার। একবার চিন্তা করে দেখ তো—কি প্রচণ্ড গতিবেগ নিয়ে আলো ছুটে চলছে।

আলোর চেয়েও দ্রুতগামী কণিকা আছে—এই কথা শুনে চমকে উঠলেন বৈজ্ঞানিকেরা। এতদিন ধরে আমরা যা জেনে এসেছি, সে কথা তাহলে ভুল? বিজ্ঞান-জগতের সকলে অবাক হয়ে ভাবতে থাকেন—কি সে জিনিষ?

কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কিন পদার্থ-বিজ্ঞানী ডক্টর জেরাল্ড ফেনবার্গ (J. Feyn-

berg) আলোর চেয়ে দ্রুততর কণিকার কথা বলেছেন। নাম তার ট্যাকিওন্‌স্ (Tachyons)। শব্দটি গ্রীক ভাষা থেকে নেওয়া। গ্রীক ভাষায় শব্দটির অর্থ হলো দ্রুতগতি।

ট্যাকিওন্‌সের গুণাগুণ বা ধর্ম সম্বন্ধে ডক্টর ফেনবার্গ যা বলেছেন, সেকথা এবার বলছি। এই বিরাট বিশ্বের সব জায়গাতেই এই কণিকার অবাধ গতি। প্রচণ্ড গতিবেগ নিয়ে কণিকাগুলি ঘুরে বেড়ায়। কোন কোন সময় এদের গতিবেগ এমন প্রচণ্ড হয় যে, তা অসীমে (Infinity) গিয়ে পৌঁছায়। সাধারণ বস্তুর গতি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শক্তির পরিমাণও সে অনুপাতে বেড়ে যায়, কিন্তু এই কণিকাগুলির ধর্ম তার ঠিক উল্টো রকমের; অর্থাৎ গতিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শক্তির পরিমাণও সেই অনুপাতে কমে যেতে থাকে।

আমরা জানি, সাধারণ বস্তু আলোর গতি পেলে নিজেদের অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলবে, তখন তাদের ভর (mass) শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে যাবে।

আইনষ্টাইনের তত্ত্বানুযায়ী শক্তিকে E, ভরকে m এবং শূন্যে আলোর গতিবেগকে c ধরলে—

$E=mc^2$ অর্থাৎ শক্তি তখন বস্তুর ভর ও আলোর গতিবেগের বর্গের গুণফলের সমান হয়; অর্থাৎ আলোর গতিতে বস্তুর ভর শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। সাধারণ বস্তুর গতির যেখানে শেষ, ট্যাকিওন্‌সের গতির সেখান থেকেই সুরু। তাই এই কণিকাগুলিকে বের করতে হলে আলোর চেয়ে বেশী গতির মধ্যে তাদের খুঁজে নিতে হবে।

গবেষণাগারে ট্যাকিওন্‌সের অস্তিত্ব প্রমাণ করবার প্রধান বাধা হলো, তার এই প্রচণ্ড গতি, যা আলোর চেয়েও বেশী। আর এক বাধা কণিকাগুলি তড়িৎ-আশ্রিত নাও হতে পারে বলে ডক্টর ফেনবার্গের ধারণা।

সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী আইনষ্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদের ভিত্তিতেই ডক্টর ফেনবার্গ এই কাল্পনিক কণিকার অস্তিত্বের কথা বলেছেন। তত্ত্বগতভাবে অঙ্কশাস্ত্রের জটিল হিসাব দেখিয়ে তাঁর সূত্রটিকে তিনি প্রমাণ করেছেন।

সংবাদে প্রকাশ, ট্যাকিওন্‌সের অস্তিত্ব প্রমাণ করবাব জন্যে ইতিমধ্যে গবেষণাগারে বেশ কয়েক বার চেষ্টা করা হয়েছে। এর অস্তিত্ব প্রমাণিত হলে বিজ্ঞানের পরিধি যে আরও বিস্তৃত হবে, সে সম্বন্ধে কোন দ্বিমত নেই।

বিজ্ঞানীরা বলেছেন, ট্যাকিওন্‌সের গুণাগুণ বা ধর্ম আমাদের পরিচিত বস্তুকণিকা থেকে বেশ কিছুটা আলাদা। অনেক পদার্থ-বিজ্ঞানী আশা করেন যে, গবেষণাগারে ফেনবার্গের নতুন এই তত্ত্বটি প্রমাণ করা হয়তো সম্ভব হবে।

ডক্টর ফেনবার্গের নাম দেওয়া এই নতুন কণিকা ট্যাকিওন্‌সের বিষয় জানবার জন্যে বিজ্ঞানীদের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র বিশ্ববাসী আজ গভীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন।

কারণ এই তত্ত্বটি প্রমাণিত হলে কেমন করে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হলো, তা হয়তো আবার নতুন করে ভেবে দেখতে হবে।

অদূর ভবিষ্যতে ডক্টর ফেনবার্গের সূত্র ধরে আলোর চেয়ে দ্রুতগতিতে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বিদ্যুৎ-শক্তির আদান-প্রদান করা যাবে, যা এখন অসম্ভব। এক গ্রহ থেকে অন্য গ্রহের দূরত্ব আলোক-বর্ষ (আলো এক বছরে যতটা দূরত্বে যায়) দিয়ে না মেপে এই নতুন ট্যাকিওনস্ দিয়ে মাপা হবে। গ্রহগুলির পারস্পরিক যোগাযোগও করা যাবে অনেক কম সময়ে।

আগামী দিনে বিজ্ঞান-জগতে নতুন দ্বার খুলে যাবে ট্যাকিওনস্ আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে।

অজয় গুপ্ত

গতিশীল মহাদেশ

আশ্চর্য মনে হলেও কথাটা সত্য যে, মহাদেশও গতিশীল; এই বিষয়ে গবেষণারত বিজ্ঞানীদের মতে, এখন আমরা দেশ, মহাদেশ ও মহাসাগরগুলিকে পৃথিবীপৃষ্ঠে যেখানে-সেখানে দেখতে পাই। প্রথমে কিন্তু সে রকম মোটেই ছিল না; কয়েক কোটি বছরের ব্যবধানে আদি অবস্থান থেকে বর্তমানে এরা অনেকখানি সরে গেছে। গতিশীল মহাদেশের এই তত্ত্বটির প্রথম আভাস দেন ফ্রান্সিস বেকন, প্রায় সাড়ে তিন-শ' বছর আগে। এরপর 1907 সালে আমেরিকার অধ্যাপক ডবলিউ. এইচ. পিকারিং এবং 1910 সালে এফ. বি. টেলর এই তত্ত্বটি নিয়ে বিশদ আলোচনা করেন। 1928 সালে প্রকাশিত তাঁর পুস্তকে টেলর একটি চমকপ্রদ সংবাদ দেন। তাঁর মতে, ক্রিটেসাস যুগে চাঁদ ধরা পড়েছিল পৃথিবীর আকর্ষণে। ফলে পৃথিবীপৃষ্ঠে অবস্থিত সমুদ্র ইত্যাদিতে প্রচণ্ড জলস্ফীতি দেখা দেয়। এই আলোড়নের ধাক্কায় মূল ভূখণ্ড কয়েকটি ক্ষুদ্রতর অংশে ভেঙে যায়। ফলে বর্তমান গ্রীনল্যাণ্ড থেকে উত্তর আমেরিকা এবং মধ্য অ্যাটলাণ্টিক অঞ্চল থেকে আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

মহাদেশগুলির আদি অবস্থান সম্বন্ধে বিজ্ঞানীরা বলেন, বহু কোটি বছর আগে বর্তমান বিষুবরেখার উত্তর ও দক্ষিণ দিকে দুটি বিরাট ভূখণ্ড বা মহাদেশ ছিল। এর প্রথমটির নাম দেওয়া হয়েছে লোরেসিয়া এবং অপরটির নাম গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ড। বর্তমান সমগ্র ইউরোপ ও এশিয়া, গ্রীনল্যাণ্ড এবং উত্তর আমেরিকা ছিল লোরেসিয়ার অন্তর্গত, আর গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ডের মধ্যে ছিল এখনকার আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া এবং

মেরু অঞ্চল। ভারতবর্ষ ছিল অবশ্য শেষোক্ত মহাদেশের অন্তর্গত। এই দুই ভূখণ্ডের মধ্য দিয়ে বয়ে যেত বিরাট টেথিস সাগর। স্বাভাবিক কারণে এই সাগর পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে বটে, তবে বর্তমান ভূমধ্যসাগর সেই প্রাচীন টেথিসেরই একটা অংশ বলে বিজ্ঞানীদের ধারণা।

গতিশীল মহাদেশের তত্ত্বটি প্রথম বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন জার্মেণীর বিখ্যাত ভূতত্ত্ববিদ্ আল্‌ফ্রেড ওয়েগ্‌নার। 1915 সালে তাঁর 'দি অরিজিন অফ কন্টিনেন্টস এ্যাণ্ড ওশান্স' নামক বিখ্যাত গ্রন্থে ওয়েগ্‌নার এসম্বন্ধে বহু তথ্য ও প্রমাণ উপস্থাপিত করেন। তাঁর মতে, আদিতে বিশ্বে ছিল কেবলমাত্র একটি বিরাট ভূভাগ বা Pengoea। মেসোজোয়িক যুগে সেটি ভাঙ্গতে সুরু করে; উত্তপ্ত প্রাথমিক শিলার উপর দিয়ে এই সব টুক্‌রা ভূখণ্ড ভেসে যাবার সময় সামনে জমে-ওঠা আবর্জনাগুলিকেও ঠেলে নিয়ে যেতে থাকে। পরবর্তী যুগে এইসব আবর্জনাই সঞ্চিত হয়ে সৃষ্টি করেছে হিমালয়, আল্পস্ ইত্যাদি পৃথিবীর বৃহৎ বৃহৎ পর্বতশ্রেণী। ওয়েগ্‌নার বলেন, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম উপকূল অঞ্চলে অবস্থিত পর্বতশ্রেণীর উৎপত্তি হয়েছে মহাদেশগুলির পশ্চিম অভিমুখী গতির ফলে।

সাম্প্রতিক কালে এ নিয়ে কিছু কিছু পরীক্ষা হয়েছে। কয়েক মাস আগে আমেরিকার প্রসিদ্ধ ভূতত্ত্ববিদ্ ডক্টর লরেন্স গোল্ড তাঁর দলবল নিয়ে দক্ষিণ মেরু অঞ্চলে গিয়েছিলেন এই বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে; সেখানে প্রাপ্ত বিভিন্ন জিনিষের মধ্যে আছে লিস্ট্রোসউরা নামক প্রাগৈতিহাসিক সরীসৃপের প্রস্তরীভূত কঙ্কাল, দক্ষিণ মেরু থেকে 400 মাইল দূরে পাহাড়ের নীচে এটি পাওয়া গেছে। কঙ্কালটি লম্বায় প্রায় আড়াই হাত, প্রাণীটির আকৃতি বড় বিচিত্র, এর চোখ দুটি কিছু উত্তোলিত এবং নাক দুটি চোখজোড়ার মাঝখানে মাথার খুলির উপর অবস্থিত অর্থাৎ এর শ্বাসকার্য চলতো মস্তিষ্কের মধ্য দিয়ে। জন্তুটি যে জলচর ছিল, তাতে সন্দেহ নেই। এছাড়া অভিযাত্রীদল প্রাগৈতিহাসিক প্রাণী ডায়নোসরের পূর্বপুরুষ বলে বর্ণিত থিয়োকোডোন্ট-এর ফসিলও এখানে পেয়েছেন। ইতিপূর্বে এই জন্তুটির ফসিল দক্ষিণ আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা এবং উরুগুয়েতেও আবিষ্কৃত হয়েছে। এই সব মূল্যবান আবিষ্কার থেকে বিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্ত করেছেন—এক সময়ে পৃথিবীর দক্ষিণ প্রান্তে ছিল একটি বিরাট ভূভাগ। বিজ্ঞানীরা সেটির নাম দিয়েছেন গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ড। বর্তমানে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা এবং বৃক্ষবিরল হলেও দক্ষিণ মেরু এক সময় উষ্ণ অঞ্চলের অন্তর্গত ছিল এবং ঘন অরণ্যও দেখা যেত এর বিভিন্ন স্থানে। তাছাড়া বর্তমান অবস্থানে আসবার আগে দক্ষিণ মেরু যে এককালে দক্ষিণ আফ্রিকা এবং দক্ষিণ আমেরিকার সঙ্গে একই ভূখণ্ডের অন্তর্গত ছিল, এটি তারই অকাট্য প্রমাণ।

হিমবাহ নিয়ে গবেষণার সময় বিজ্ঞানীরা কয়েকটি বিচিত্র ব্যাপার লক্ষ্য করেছেন। প্রাচীন গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ড জুড়ে ছিল বরফ ও হিমবাহের বিস্তীর্ণ রাজত্ব। বর্তমান গ্রীষ্মমণ্ডলের

যে সব অংশ গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ডের অন্তর্গত ছিল বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন, প্রচণ্ড গরম হলেও সে সব অঞ্চলের কোথায়ও কোথায়ও কিন্তু এখনো হিমবাহের অস্তিত্বের চিহ্ন দেখা যায়। এই প্রাচীন মহাদেশের হিমবাহিক পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে যে, এগুলি নিরক্ষরেখা থেকে দূরে সরে এসেছে অথচ আমরা জানি, বরফের স্বাভাবিক গতি সব সময় উষ্ণতর অঞ্চলের দিকে। এথেকে এমন সিদ্ধান্ত করলে বোধ হয় ভুল হবে না যে, অতীতে কোন এক সময়ে এই অঞ্চলটি হিমমণ্ডলের অন্তর্গত ছিল, তারপর সরে গিয়ে বর্তমান স্থানে উপস্থিত হয়েছে।

সমুদ্রের তলদেশ পরীক্ষা করতে গিয়ে বিশেষজ্ঞেরা একটানা লম্বা উচ্চভূমির সন্ধান পেয়েছেন। এর প্রথমটি আছে মধ্য অ্যাটলান্টিক অঞ্চলে, দ্বিতীয়টি ভারতবর্ষ ও আফ্রিকার মাঝামাঝি ভারত মহাসাগরের তলদেশে, তৃতীয়টি অষ্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ মেরুর মধ্যবর্তী স্থানে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এগুলিই হচ্ছে প্রাচীন গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ডের সীমা। মহাদেশটির উত্তর প্রান্ত মধ্য হিমালয়ের পর্বতশ্রেণী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এক সময় বিরাট টেথিস সাগর বয়ে যেত হিমালয়ের উপর দিয়ে, সেখানকার বিভিন্ন চূড়ায় পাওয়া বিভিন্ন সামুদ্রিক জীবের দেহাবশেষ থেকে একথা বুঝতে অসুবিধা হয় না। এক সময় বিরাট হিমালয় পর্বত মগ্ন ছিল সমুদ্রগর্ভে।

ভারতবর্ষের ভূপ্রকৃতি পরীক্ষা করতে গিয়ে বিজ্ঞানীদের চোখে পড়েছে—এখানকার অন্যান্য অঞ্চল অপেক্ষা বিন্ধ্য পর্বতের দক্ষিণ প্রান্তের ভূমি তুলনামূলকভাবে সাম্প্রতিক কালে গঠিত। তাঁদের মতে, এর গঠনকাল কার্বনিফেরাস এবং মেসোজোয়িক যুগের মধ্যবর্তী সময়। সাম্প্রতিক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে যে, ভারতবর্ষের এই অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতির সঙ্গে অষ্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা, ম্যাডাগাস্কার এবং দক্ষিণ আমেরিকার কোন কোন অঞ্চলের মাটির যথেষ্ট মিল আছে। তাছাড়া ভারতবর্ষের মধ্য প্রদেশে ডায়নোসরের যে ফসিল পাওয়া গেছে, তার সঙ্গে সুদূর ম্যাডাগাস্কার, ব্রেজিল, উরুগুয়ে এবং প্যাটাগোনিয়ায় আবিষ্কৃত একই ফসিলের মধ্যে অদ্ভুত সাদৃশ্য বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেছেন।

মূল মহাদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আসার ক্রিয়া এখনো পৃথিবীর কোন কোন অঞ্চলে চলছে। আফ্রিকার রিফ্ট উপত্যকা অঞ্চলে ব্যাপারটা পরিষ্কার বুঝতে পারা যায়। বিশেষজ্ঞদের অনুমান, আরব ও ম্যাডাগাস্কার যেমন একদিন মূল মহাদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল, তেমনি সুদূর ভবিষ্যতে পূর্ব আফ্রিকাও একদিন মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। তাছাড়া গ্রীনল্যাণ্ডের দ্রাঘিমার দৈর্ঘ্য মাপতে গিয়েও একটা বিচিত্র জিনিষ বিজ্ঞানীদের চোখে পড়েছে। তাঁরা দেখেছেন, দেশটি প্রতি বছর ইউরোপের মূল ভূখণ্ড থেকে 25 থেকে 30 গজ করে সরে যাচ্ছে, সুতরাং কয়েক লক্ষ বছর পরে এটি বেশ কয়েক মাইল দূরে সরে আসবে—এমন অনুমান করা অস্বাভাবিক নয়।

বিজলি সেন

সূর্যশিশির

সূর্যশিশির—আসলে একটি গুল্মজাতীয় ছোট্ট উদ্ভিদ ছাড়া আর কিছুই নয়। ইংরেজীতে একে বলে Sun dew আর জীব-বিজ্ঞানীর ভাষায় এর নাম Drosera। এদের বাস সাধারণতঃ আসামের পাহাড়ী অঞ্চলে—খাসিয়া ও জয়ন্তীয়া পাহাড়ে, আর দক্ষিণ ভারতের পশ্চিম-ঘাট পাহাড়ে; তাছাড়া বাংলা দেশের কোন কোন স্থানে বালুকাকীর্ণ এলাকায় এদের সাক্ষাৎ মেলে। এদের দূর থেকে দেখলে পানের পিক বা লাল লাল থোকা বলে মনে হয়।

দেখতে ছোট হলেও এরা কাজে মোটেই ছোট নয়। এরা এক-একটি ক্ষুদে রাক্ষস, ছোট ছোট পোকা-মাকড় ধরে সহজেই হজম করে ফেলে। নেহাৎ জীবন-রক্ষার তাগিদেই এদের পোকা-মাকড় ধরে খেতে হয়। কারণ প্রত্যেক জীবদেহই প্রোটিন নামক জটিল রাসায়নিক পদার্থ ছাড়া জীবনধারণ করতে পারে না এবং এই জটিল পদার্থ গঠনকারী উপাদানগুলির মধ্যে নাইট্রোজেন অন্যতম। কিন্তু সূর্য-শিশির যে মাটিতে জন্মায়, সে মাটিতে নাইট্রোজেন থাকে না; কাজেই এরা প্রোটিন তৈরি করতে পারে না। এই কারণেই এরা জীবদেহ থেকে প্রোটিন সংগ্রহের এক বিশেষ কৌশল আয়ত্ত করে নিয়েছে।

ইঞ্চি চারেক লম্বা ছোট ছোট গাছ ভোরের আলোয় ঝলমল করে, মনে হয় পাতার উপর যেন শিশির জমে রয়েছে। পাতাগুলি মাটির উপর গোলাকারে সাজানো থাকে আর তাদের মাঝখান থেকে ফুলসমেত ডাঁটা বেরিয়ে আসে। এই পাতাগুলিই হচ্ছে এক-একটি ফাঁদ। এদের উপরের গা থেকে খাড়াভাবে কতকগুলি শুঁড় সাজানো থাকে। এই শুঁড় থেকে অনবরত ফোঁটা ফোঁটা মধুর মত মিষ্টি রস বেরিয়ে এসে মাথায় জমা হয়। এই ফোঁটাগুলিই সূর্যের আলোয় ঝলমল করে ওঠে, আর পোকা-মাকড়েরা মধুর লোভে ভুল করে পাতার উপর এসে বসে। তখন তো ওরা জানে না যে, ওগুলি মধুমাখা আঠালো পদার্থ ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই শুঁড়গুলি পোকাটাকে ধীরে ধীরে পাতার গায়ে আটকে ফেলে জারক-রস দিয়ে সম্পূর্ণ হজম করে ফেলে। মৃতদেহটার রস শুষে নেবার পর আবার ফাঁদ পেতে বসে নতুন শিকারের আশায়। এমন কি, এও দেখা গেছে যে, এক টুক্‌রা মাংস পাতার উপর ফেলে দিলেও একই রকম ব্যাপার ঘটে থাকে।

মৃদুলা মৌলিক*

*কেন্দ্রীয় উদ্ভিদ সংরক্ষণাগার, ভারতীয় উদ্ভিদ উদ্যান, হাওড়া-3

প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন 1। সাইক্লোট্রোন কি ?

মলয় ভদ্র, বারাসত

প্রশ্ন 2। ডাবের জলের উপকারিতা কি ?

অমিতা বন্দ্যোপাধ্যায়
শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়
হালিশহর

উঃ 1। বস্তুকণিকাকে ত্বরান্বিত করলে তার শক্তি বৃদ্ধি পায়। গবেষণাগারে বস্তুকণিকাকে ত্বরান্বিত করবার কাজে যে সমস্ত বিভিন্ন ধরণের যন্ত্র ব্যবহৃত হয়, সাইক্লোট্রোন সেগুলির মধ্যে অন্যতম। এই যন্ত্রে পরিবর্তী তড়িৎ-প্রবাহের সাহায্যে বস্তুকণিকাকে ত্বরান্বিত করা হয় ও চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রয়োগে এর গতিপথ নিয়ন্ত্রিত হয়। সাধারণতঃ ভারী বস্তুকণিকাকেই এই বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় ক্ষেত্রের মধ্যে ক্রমশঃ বৃত্তাকার পথে আবর্তনের সাহায্যে ত্বরান্বিত করা হয়। পরীক্ষামূলক পদার্থবিদ্যার গবেষণায় পরমাণুর রাজ্যের রহস্য উদ্ঘাটনে এই সমস্ত শক্তিশালী কণিকা কাজে লাগে।

উঃ 2। আমাদের শরীর গঠনের কাজে বিভিন্ন প্রকার ধাতব লবণের প্রয়োজন অপরিহার্য। এই সমস্ত ধাতব লবণ বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের সংমিশ্রণে গঠিত। ডাবের জলকে রাসায়নিক উপায়ে বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে, এর মধ্যে সাধারণতঃ সোডিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগ্‌নেসিয়াম, পটাসিয়াম, লোহা, তামা, ফস্‌ফরাস, ক্লোরিন ইত্যাদি আছে। এগুলি ছাড়াও ডাবের জলে প্রোটিন, শর্করা, স্নেহজাতীয় পদার্থ এবং বিভিন্ন ভিটামিনের উপস্থিতিও প্রমাণিত হয়েছে। ডাবের জলে যে সমস্ত ভিটামিন পাওয়া যায়, সেগুলি হচ্ছে ভিটামিন বি-2, ভিটামিন বি-6, ভিটামিন-3, ভিটামিন-সি ইত্যাদি।

ডাবের জলে উপস্থিত বিভিন্ন মৌলিক উপাদানগুলির মধ্যে সোডিয়াম পাকস্থলীতে পাচক রসে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড উৎপাদনে ও দেহকোষগুলির স্বাভাবিক কাজ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। ক্যালসিয়াম ও ম্যাগ্‌নেসিয়াম দাঁত, অস্থি ইত্যাদির গঠন ও জৈব-অনুঘটকের বিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে। স্নায়ুকেন্দ্রিনের কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার ক্ষেত্রে

পটাশিয়ামের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। লোহা ও তামা রক্তে লোহিত কণিকা ও হিমো-গ্লোবিন সৃষ্টির কাজে সাহায্য করে। এইভাবে ডাবের জলের বিভিন্ন মৌলিক উপাদান আমাদের শরীর গঠনের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে।

ডাবের জলে উপস্থিত ধাতব পদার্থগুলি ছাড়া অন্যান্য পদার্থগুলি, অর্থাৎ শর্করা, প্রোটিন, বিভিন্ন প্রকার ভিটামিনও আমাদের সুস্থ শরীর গঠনের ক্ষেত্রে অপরিহার্য। দেহকোষগুলির সজীবতার জন্যে জল খুবই প্রয়োজনীয়। কাজেই উপরিউক্ত প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি ছাড়াও ডাবের জলের জলীয় অংশটুকুও ফেলা যায় না।

শ্যামসুন্দর দে*

* ইনষ্টিটিউট অব রেডিওফিজিক্স অ্যাণ্ড ইলেকট্রনিক্স, বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাতা-9

বিবিধ

চাঁদের বুকে সচল সোভিয়েট মহাকাশযান লুনোখোদ-1

ইতিপূর্বে চাঁদের বুকে দু-বার মানুষ তাদের পদচিহ্ন রেখে এসেছে। মার্কিন মহাকাশযান অ্যাপোলো-11 এবং অ্যাপোলো-12-র দু-জন করে মহাকাশচারী সাফল্যের সঙ্গে চাঁদের বুকে পদার্পণ করেন এবং সেখানে নানা বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান চালিয়ে নিরাপদে পৃথিবীতে ফিরে এসেছেন। মানুষের মহাকাশ অভিযানের ইতিহাসে এটি এক ঐতিহাসিক ঘটনা। কিন্তু এতদিন পর্যন্ত চন্দ্রপৃষ্ঠে মানুষ যেসব মহাকাশযান পাঠিয়েছিল, সেগুলি চাঁদের বুকে নেমে এক স্থানে অবস্থান করে যথানির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান সম্পন্ন করেছে। গত 17ই নভেম্বর মহাকাশ-অভিযানের ক্ষেত্রে আর একটি ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটলো। সেদিন ভারতীয় সময় সকাল 9টা 17 মিনিটে সোভিয়েট মহাকাশযান লুনা-17 থেকে একটি স্বয়ংক্রিয় আট চাকার যান লুনোখোদ-1 চাঁদের বর্ষণ সাগর অঞ্চলে নেমে পৃথিবী থেকে প্রেরিত নির্দেশ অনুযায়ী চলাফেরা সুরু করে।

চাঁদের বুকে লুনোখোদ-1-এর এই সচল কার্যকলাপ মহাকাশ প্রযুক্তিবিদ্যার দিক থেকে নিঃসন্দেহে একটি বিস্ময়কর ঘটনা। সোভিয়েট ইউনিয়নের ভূপৃষ্ঠস্থ মহাকাশকেন্দ্র থেকে যে সব নির্দেশ পাঠানো হয়েছে, লুনোখোদ তা যথাযথ-ভাবে পালন করেছে এবং নানা ধরণের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা নির্ভুলভাবে সম্পাদন করেছে। লুনোখোদকে একটি ট্যাক্সিও বলা যেতে পারে। ঐ ট্যাক্সীতে রয়েছে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের প্রতীক, লেনিনের প্রতিকৃতি, বেতার যোগাযোগের ব্যবস্থা,

টেলিভিশন যন্ত্র এবং নানা ধরণের বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি। এই সব যন্ত্রপাতির মধ্যে একটি হচ্ছে, ফ্রান্সে নির্মিত একটি লেসার প্রতিফলক। মহাকাশ-বিজ্ঞানে ফ্রান্স ও সোভিয়েট ইউনিয়নের মধ্যে সহযোগিতার চুক্তি অনুসারে ফ্রান্স এই যন্ত্রটি দিয়েছে বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

পৃথিবীর বুকে চলমান যানের চাকার সঙ্গে চন্দ্রপৃষ্ঠে চলমান লুনোখোদের চাকার বিশেষ কোন সাদৃশ্য নেই, যদিও সেগুলির কার্যপ্রণালী প্রায় একই রকম। চন্দ্রপৃষ্ঠে চলমান যানকে এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে, যাতে বায়ুশূন্যতা ও তাপমাত্রার বিরাট তারতম্যের মধ্যে সে সঠিকভাবে কাজ চালাতে পারে। চন্দ্রপৃষ্ঠের সংযুতি ও গঠন ভূপৃষ্ঠ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের; কাজেই এই সব বিষয় বিবেচনা করেই লুনোখোদকে নির্মাণ করা হয়েছে।

লুনোখোদ চন্দ্রপৃষ্ঠের টেলিভিশন ছবি পৃথিবীতে পাঠিয়েছে। ছবিগুলি চমৎকার—পূর্ণ দৃশ্যের সে সব ছবিতে চাঁদের বুকে লুনোখোদের চলাচলের দাগগুলিও স্পষ্ট বোঝা গেছে। ছবিতে লুনোখোদ তার যন্ত্রাংশগুলিকেও পৃথিবীকে দেখিয়েছে।

লুনোখোদ পাঁচ দিন ধরে যথানির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের পর চাঁদের দেশে দীর্ঘ শীতরাত্রি (পৃথিবীর সময়ের হিসাবে 14 দিন) নেমে আসায় নিষ্ক্রিয় ও চলচ্ছক্তিহীন হয়ে যায়। কারণ সূর্যরশ্মিই এতদিন লুনোখোদের সকল শক্তি জুগিয়ে এসেছিল। 8ই ডিসেম্বর চাঁদের বর্ষণ সাগরের আকাশে আবার সূর্য উঠলে সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা লুনোখোদকে সক্রিয় করবার চেষ্টা করবেন।

লুনোখোদ-1 পৃথিবীর বুকে ফিরে আসবে
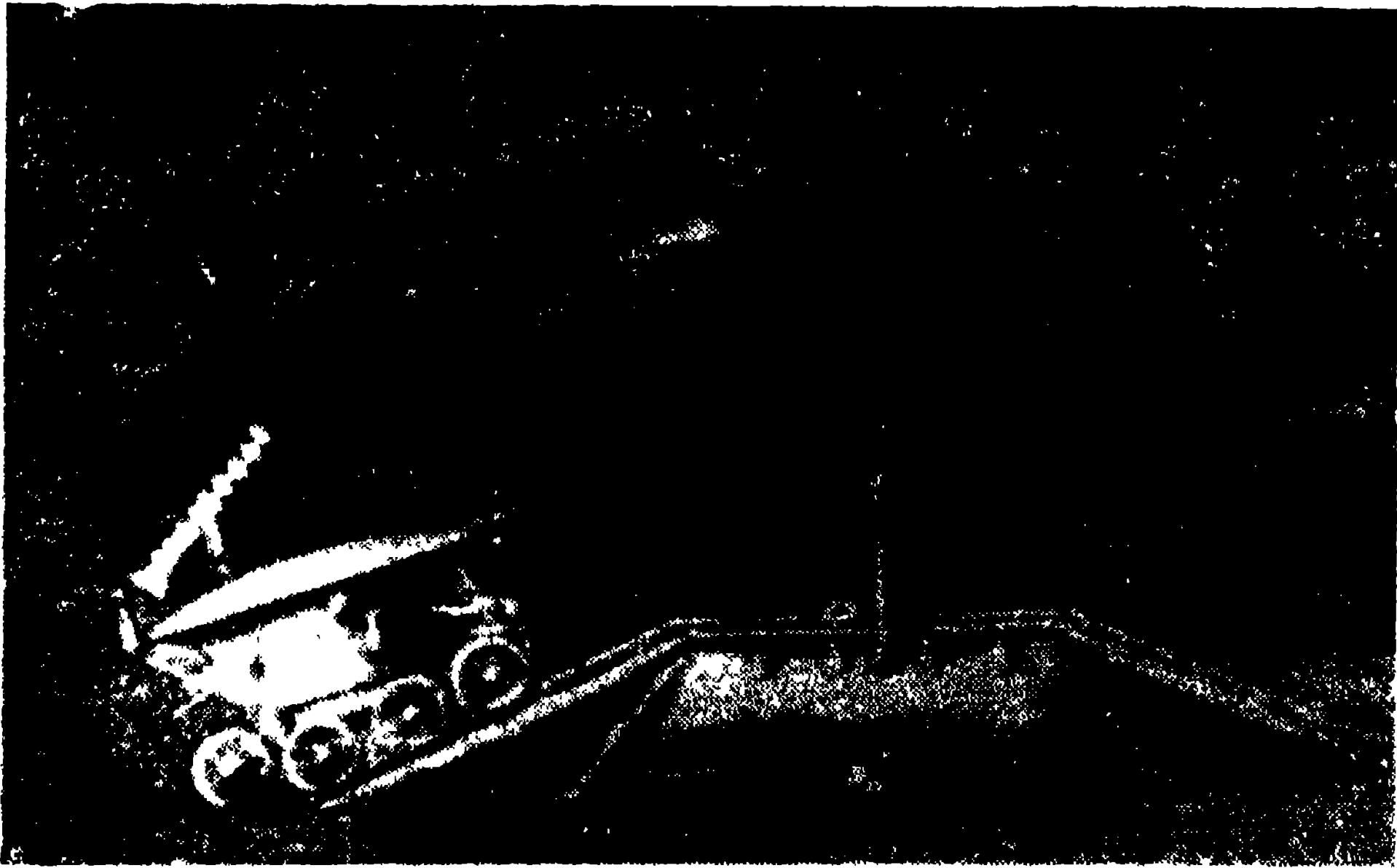
চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণের পর লুনোখোদ-1 লুনা-17 মহাকাশযান থেকে নেমে আসছে। (শিল্পীর পরিকল্পিত)

না। কারণ ফিরে আসবার উপযোগী রকেট নিয়ে সে চাঁদে যায় নি। লুনোখোদের এই সাফল্য ভবিষ্যতে দূরান্তরের গ্রহে স্বয়ংক্রিয় যান প্রেরণের পথ প্রশস্ত করবে। ভাবীকালে লুনোখোদের অনুগামীরা মঙ্গল, শুক্র বা আরও দূরবর্তী গ্রহে গিয়ে সেখানকার তথ্য পৃথিবীর মানুষকে জানাতে পারবে বলে বিজ্ঞানীরা আশা করেন।

করোনারী অক্লুশন সম্বন্ধে জনপ্রিয় বক্তৃতা

5ই অগাষ্ট '70 বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের উদ্যোগে বিজ্ঞান পরিষদ ভবনে 'করোনারী অক্লুশন' সম্বন্ধে একটি লোকরঞ্জক বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হয়। বক্তৃতাটি প্রদান করেন বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের অন্যতম সহ-সভাপতি ডাঃ যোগেন্দ্রনাথ মৈত্র। ঐ বক্তৃতা-সভার সভাপতিত্ব করেন বঙ্গীয় বিজ্ঞার পরিষদের সভাপতি জাতীয় অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু। করোনারী অক্লুশনের কারণ, লক্ষণ এবং প্রতিকারের পন্থা প্রভৃতি বিষয়ে ডাঃ মৈত্র শ্রোতাদের বুঝিয়ে বলেন। বক্তৃতার শেষে কলিকাতাস্থ যুক্তরাষ্ট্রের তথ্য কেন্দ্রের সৌজন্যে ঐ বিষয়সংশ্লিষ্ট দুটি চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়।

কৃত্রিম জীবন সৃষ্টি

লণ্ডন থেকে এ. পি. ও এ. এফ. পি. কর্তৃক প্রচারিত এক সংবাদে জানা যায়—বৃটিশ জীব-বিজ্ঞানী জেম্‌স্ ড্যানিয়েল্লি ঘোষণা করেছেন যে, তিনি কৃত্রিম উপায়ে যন্ত্রাগারে 'জীবন সৃষ্টি করতে পেরেছেন।' বৃটিশ বেতারে এক টেলিফোন সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছেন, নিউইয়র্ক স্টেট ইউনিভার্সিটির জীব-বিজ্ঞান গবেষণাগারে তিনি অন্য জীব-কোষের অংশ জুড়ে দিয়ে আর একটি নতুন জীব-কোষ সৃষ্টি করেছেন। শেষোক্ত এই জীব-কোষ শুধু বেঁচেই থাকে নি, বংশবৃদ্ধিও করেছে। ডক্টর ড্যানিয়েল্লি উক্ত গবেষণাগারের অধ্যক্ষ।

ডক্টর ড্যানিয়েল্লি বলেছেন, দরজির দোকানে ইচ্ছামত মাপ ও আকৃতির পোষাক তৈরির মত দশ থেকে বিশ বছরের মধ্যে মানুষ নির্দিষ্ট নক্শা অনুযায়ী স্তন্যপায়ী জীব সৃষ্টি করতে পারবে। তিনি আরও বলেছেন—অবশ্য কৃত্রিম মানব প্রজাতি সৃষ্টির দিকে না গিয়ে মানুষের বংশগত ব্যাধিগুলি দূর করবার দিকেই আপাততঃ মন দিতে হবে।

নিউইয়র্ক থেকে এ. পি. আরও জানিয়েছেন যে, নিউইয়র্ক স্টেট ইউনিভার্সিটির গবেষক দল কৃত্রিম উপায়ে এই প্রথম জীব-কোষের সংশ্লেষণ ঘটাতে পেরেছেন। তাঁরা এককোষী অ্যামিবার দেহ ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে ফেলেছেন এবং অতঃপর অন্য অ্যামিবার দেহাংশ জুড়ে নিয়ে নতুন অ্যামিবার সৃষ্টি করেছেন। নবজাত অ্যামিবা শুধু প্রাণেই বেঁচে থাকে নি, বংশবৃদ্ধিও করেছে।

এই গবেষণার উদ্যোক্তা হচ্ছেন মার্কিন মহাকাশ-পরিক্রমা সংস্থা। তাঁদের বিশেষজ্ঞ দল এই আবিষ্কারকে জীব-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নতুন ও বিস্ময়কর পদক্ষেপ বলে অভিনন্দিত করেছেন। অবশ্য নিউইয়র্ক টাইমস বিশেষজ্ঞদের উক্তি উল্লেখ করে বলেছেন, এর মধ্যে চাঞ্চল্যকর কিছু

থাকলেও আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্যে প্রতীক্ষা করা উচিত হবে।

চিকিৎসা-বিজ্ঞানের নতুন অধ্যায়—এণ্ডোস্কোপি

হামবুর্গ থেকে ইউ. এন. আই. এবং ডি. পি. এ. কর্তৃক প্রচারিত এক সংবাদে প্রকাশ—দেহাভ্যন্তরবীক্ষণ পদ্ধতি, ইংরেজী নাম এণ্ডোস্কোপি—চিকিৎসা-বিজ্ঞানে এক নতুন ও রোমাঞ্চকর অধ্যায়। অতঃপর চিকিৎসা-বিজ্ঞানকে দেহাভ্যন্তরে রোগ নির্ণয়ের জন্যে আদৌ অনুমানের উপর নির্ভর করতে হবে না।

নানা দেশে, বিশেষ করে জাপানে এই পদ্ধতিটির অনুসরণ করা সুরু হয়েছে। পদ্ধতিটি হচ্ছে এরূপ—মানবদেহের যে সকল স্বাভাবিক দ্বারপথ রয়েছে—চোখ, কান, নাক ইত্যাদি, সেগুলির মধ্য দিয়ে মিনি-ক্যামেরা দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়ে রঙীন ছবি তুলে নিয়ে আসা হচ্ছে। ক্যামেরাটির চেহারা হাতের কড়ে আঙুলের মত, স্বচ্ছন্দে গলার মধ্য দিয়ে ঢুকিয়ে দেওয়া যায়। মিনি-মাইক্রোস্কোপও রয়েছে, শরীরে সামান্য একটু আঁচড় কেটে এটিকে দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়ে দিলে সেটি নির্ভুলভাবে রোগ-যন্ত্রণার উৎসটি দেখে নিতে পারে।

পেটের ভিতরে টিউমারটির অবস্থান আসলে কোথায় এবং তার অবস্থানটিই বা কিরূপ, ক্যামেরা তার নির্ভুল ছবি তুলে এনে ডাক্তারকে দেবে।

পৃথিবীর সেরা এণ্ডোস্কোপিস্ট জাপানের ডাঃ হিরোসি ওসিসো রোগীর পাকস্থলীর প্রাচীরের ঠিক কোন্ স্থানটিতে কতটা ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে, তা দেখিয়ে দিতে পেরেছেন।

অনুরূপভাবে মূত্রদ্বার দিয়ে মিনিটেলিস্কোপ প্রবেশ করিয়ে রোগীর গলস্টোনের অবস্থান দেখে নিয়ে অস্ত্রোপচার করা হয়েছে।

কৃত্রিম রক্ত

চারলটভিল (ভার্জিনিয়া) থেকে রয়টার কর্তৃক প্রচারিত এক সংবাদে প্রকাশ—কৃত্রিম হৃদ্‌যন্ত্র নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যাপারে বিজ্ঞানীরা কৃত্রিম রক্ত ব্যবহার করেছেন। ক্যাষ্টর অয়েল, জিলাটিন ও নোনা জলের মিশ্রণে এই রক্ত তৈরি করা হয়েছে।

ভার্জিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর অধ্যাপক ডক্টর লিলেন্ট সাংবাদিকদের জানান—আসল রক্ত এই পরীক্ষার অনুপযোগী। সেটা ব্যয়সাধ্য তো বটেই, তাছাড়া খোলা জায়গায় রাখলে জমাট বেঁধে যায়।

পান্না অধ্যুষিত অঞ্চল

নয়াদিল্লী থেকে পি. টি. আই. কর্তৃক প্রচারিত এক সংবাদে জানা যায়—রাজস্থানের উদয়পুর ও আজমীরের মধ্যে একটি দেড়-শ' মাইল বিস্তীর্ণ এলাকায় পান্না পাওয়া যাবে বলে রুশ বিশেষজ্ঞেরা জানিয়েছেন। এমন কি, রাশিয়ার বিখ্যাত পান্না এলাকা থেকে যে পরিমাণ পান্না পাওয়া যায়, এখান থেকেও সেই পরিমাণ পান্না পাওয়া যাবে বলে রুশ বিশেষজ্ঞদের অভিমত। একদল রুশ ভূতত্ত্ববিদ্ সম্প্রতি এই অঞ্চলটি ঘুরে গিয়েছেন। এঁরা

এখানে আসেন জাতীয় খনি উন্নয়ন করপোরেশনের উদ্যোগে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে, রাজস্থানের পান্নার আন্তর্জাতিক খ্যাতি আছে এবং এথেকে হীরকের চেয়েও বেশী অর্থ পাওয়া যায়।

বিশিষ্ট কৃষি-বিজ্ঞানীর 1970 সালের শান্তির জন্যে নোবেল পুরস্কার লাভ

সম্পূর্ণ এক নতুন ধরণের গম ও ভুট্টা আবিষ্কারের জন্যে 1970 সালে আমেরিকার কৃষি-বিজ্ঞানী ডাঃ নরম্যান আর্নেস্ট বরলগকে নোবেল পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করা হয়েছে। পৃথিবীর খাদ্য-সমস্যা সমাধানে এই সব গম ও ভুট্টা খুবই সহায়ক হতে পারে, কারণ এই সব গমের ফলন খুব বেশী হয়ে থাকে। দূরপ্রাচ্যে এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে যে অতিরিক্ত ফলনশীল ধান উদ্ভাবিত হয়েছে, তাও পরোক্ষভাবে এই আবিষ্কারের ফল।

এই নতুন ধরণের গমের চাষ ইতিমধ্যেই ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, তুরস্ক, ইজরায়েল, জর্ডন, টিউনিসিয়া, সুদান, আফগানিস্থান প্রভৃতি দেশে হয়েছে এবং বিশেষ রূপে ভারত, পাকিস্তান ও মেক্সিকোতে এই ধরণের গম ও ভুট্টা চাষ করে যে পরিমাণে ফসল পাওয়া গেছে, এই পরিমাণ ফসল অন্য জাতের ভুট্টা ও গম চাষ করে এর আগে আর পাওয়া যায় নি।

পূর্ব পাকিস্থানে প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড়

13ই নভেম্বর পূর্ব পাকিস্থানে প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড়ে লক্ষ লক্ষ লোক নিহত, আহত ও নিখোঁজ হয়েছেন। সর্বাপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে হাতিয়া, রামগতি, ভোলা ও চরজব্বর—এই চারটি দ্বীপ। পূর্ব পাকিস্থানের এই প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড় সাম্প্রতিক কালের প্রচণ্ডতম বিপর্যয়। ক্ষয়-ক্ষতির বিস্তৃত বিবরণ এখন পর্যন্তও সঠিক নির্ণীত হয় নি।

ভ্রম সংশোধন :—নভেম্বর '70 সংখ্যায় 'জ্ঞান বিজ্ঞানে'র 686 পৃষ্ঠার (চ) চিহ্নিত পংক্তিতে '7 দিয়ে গুণ করলে' এই স্থলে 'গুণের' পরিবর্তে 'ভাগ' হবে।

শ্রীমিহিরকুমার ভট্টাচার্য কর্তৃক পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-6 হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ 37/7 বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত